উত্তরাধিকার

জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্ম : ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ ; ৬ ফাল্গুন ১৩০৫। (লাবণ্য দাশ জানিয়েছেন, কবির জন্মসাল ১৮৯৮। দ্রষ্টব্য : বিষ্ণু দে-সম্পাদিত 'একালের কবিতা'র ভূমিকা।) পিতা : সত্যানন্দ দাশ ; মাতা : কুসুমকুমারী দাশ। পিতা (১৮৬৩-১৯৪২) স্নাতক, স্কুল-শিক্ষক, 'ব্রহ্মবাদী' নামে একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, প্রবন্ধকার। মাতা (১৮৮২-১৯৪৮) কবিতা লিখতেন। মাতামহ চন্দ্রনাথ দাশ হাসির গান ও কবিতা লিখতেন। জীবনানন্দরা তিন ভাইবোন : জীবনানন্দ, অশোকানন্দ (জন্ম ১৯০১) ও সুচরিতা (জন্ম ১৯১৫)।

শৈশব : বাড়িতে মায়ের কাছে বাল্যশিক্ষার সূচনা। ভোরে ঘুম থেকে উঠে শুনতেন পিতার উপনিষদ আবৃত্তি আর মাতার গান। পরিবারভুক্ত অন্য সকলের মতো পরিচারক-পরিচারিকাদেরও আত্মীয়জ্ঞান করতেন এবং তাদের কাছে বসে নানারকম কাহিনী, ছড়া ইত্যাদি শুনতেন। অনেক গাছ ও পাখির নাম এদের কাছেই শেখা। লাজুক হলেও খেলাধুলো, ভ্রমণ ও সাঁতারের অভ্যেসও ছিল। ছেলেবেলায় একবার কঠিন অসুখে পড়লে মাতা ও মাতামহের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ আগ্রা দিল্লি ভ্রমণ।

শিক্ষা : ব্রজমোহন স্কুল, বরিশাল ; ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল ; প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ম্যাট্রিক (১৯১৫, প্রথম বিভাগ) ; আই.এ. (১৯১৭, প্রথম বিভাগ) ; বি.এ. (১৯১৯, ইংরেজিতে অনার্স) ; এম.এ. (১৯২১ ; ইংরেজি, দ্বিতীয় বিভাগ)। আইন অধ্যয়ন করেন, কিন্তু পরীক্ষা দেননি।

বিবাহ : ৯ মে ১৯৩০। বিবাহ হয় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে। পাত্রী খুলনার রোহিণীকুমার গুপ্তের কন্যা লাবণ্য গুপ্ত। লাবণ্য বিবাহের পরে স্নাতক, পরবর্তীকালে শিক্ষয়িত্রী। সন্তান : মঞ্জুশ্রী দাশ (জন্ম ১৯৩১) ও সমরানন্দ দাশ (জন্ম ১৯৩৬)।

কর্ম : অধ্যাপনার কাজেই কর্মজীবনের শুরু এবং সমাপ্তি। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য কলকাতার দৈনিক পত্রিকা 'স্বরাজ'-এর সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনায় নিযুক্ত ছিলেন। ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন কিছুদিন। এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করেছেন। অধ্যাপনা—সিটি কলেজ, কলকাতা (১৯২২-২৮) ; বাগেরহাট কলেজ, খুলনা (১৯২৯ : মাস তিনেক) ; রামযশ কলেজ, দিল্লি (১৯৩০-৩১) ; ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (১৯৩৫-৪৬) ; খড়গপুর কলেজ (১৯৫১-৫২) ; বরিষা কলেজ (১৯৫৩) ; হাওড়া গার্লস কলেজ (১৯৫৩-৫৪)।

[বাকি অংশ পরবর্তী ফ্লাপে]

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা একাডেমী
গ্রন্থাগার
ঢাকা

কবি জীবনানন্দ দাশ
এর
জন্মশতবর্ষে
[১৮৯৯-১৯৯৯]

বাংলা একাডেমীর
সশ্রদ্ধ নিবেদন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরাধিকার

বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক

২৭ বর্ষ ২-৩-৪ সংখ্যা □ এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৯৯

বাংলা একাডেমী
গ্রন্থাগার
ঢাকা

সম্পাদক
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
ওবায়দুল ইসলাম

বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরাধিকার

বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক
২৭ বর্ষ ▫ ২–৩–৪ সংখ্যা
[কবি জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা]
বৈশাখ-পৌষ ১৪০৬ ।। এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৯৯

বাএপ ৬০১
[২০০০–২০০১ ভাসাসপ পত্রিকা–৪]
প্রধান সমন্বয়কারী : সাঈদা বেগম
মুদ্রণ সমন্বয়কারী : বাকিয়ার রহমান

প্রকাশকাল
২১ ফেব্রুয়ারি ২০০১
[শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস]

প্রকাশক
আবদুর রব খান
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রণ
বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ ও রঙিনচিত্র মুদ্রণ
মমিন অফসেট প্রেস
কাঁটাবন বাবুপুরা ঢাকা

পোর্ট্রেট
শাহ্‌জাহান আহ্‌মেদ বিকাশ

প্রচ্ছদ ও স্কেচ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
সুলভ : একশত পঞ্চাশ টাকা ▫ শোভন : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

UTTARADHIKAR : a literary quarterly [Vols. 2-3-4 Year 27] April-Dec. 1999 Commemorative issue on the birth centennial of Poet Jibanananda Das [1899 -1999], Editor : Syed Anwar Husain, Executive Editor : Obaidul Islam. Published by Bangla Academy Dhaka 1000. First Ed. 21st February 2001.
Price : Offset Paper Tk. 250.00 ▫ Plain Paper Tk. 150.00

ISBN 984-07-0601-2

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরাধিকার

২৭ বর্ষ ২-৩-৪ সংখ্যা ।। বৈশাখ-পৌষ ১৪০৬/এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৯৯

সূ চি প ত্র

প্র ব ন্ধ : প র্ব ১

নি বে দি ত প ঙ্ ক্তি মা লা : প র্ব ১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

.... নি বে দি ত প ঙ্ ক্তি মা লা : প র্ব ১

প্র ব ন্ধ : প র্ব ২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

.... প্র ব ন্ধ : প র্ব ২

অ ন্য র ক ম অ ব লো ক ন

প্র ব ন্ধ : প র্ব ৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

..........প্র ব ন্ধ : প র্ব ৩

নি বে দি ত র ঙ চি ত্র
[কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা অবলম্বনে ছবি]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্র ব ন্ধ : প র্ব ৪

নি বে দি ত প ঙ্ক্তি মা লা : প র্ব ২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্র ব ন্ধ : প র্ব ৫

প রি শে ষ

এ পত্রিকায় প্রকাশিত সকল লেখার মতামত, মন্তব্য, ভাবনা, বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণত লেখকের—বাংলা একাডেমীর নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ ব ত র ণি কা

কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবর্ষ দু'বছর আগেই পূর্ণ হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় কবির জন্মশতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন দৈনিকের বিশেষ ক্রোড়পত্র, সাময়িকী-সাপ্তাহিকীর বিশেষ সংখ্যা এবং পুস্তিকা-গ্রন্থাদি। নিঃসন্দেহে এসব আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে কবির প্রতি 'গভীর, গভীরতর' অনুরাগ ভালোবাসা—শ্রদ্ধাবোধ থেকেই।

প্রচণ্ড আত্মাভিমান নিয়ে কবি লক্ষ্য করেছেন 'ঘৃণার আক্রোশ', 'অবহেলা' আর 'উপেক্ষা'র বিষয়াদি। আনন্দের কথা এই যে কবির জীবদ্দশাতেই ঘটে গেছে এ-সবের ক্ষয়। সমকালীন পাঠক-সমালোচকবৃন্দ তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন ; তবে একটু দেরিতে, এই যা। জীবনানন্দের মানস-প্রকৃতির অসাধারণত্ব এখানেই—তিনি একই সঙ্গে সহজ-সরল এবং দুর্বোধ্য-জটিল। 'বিস্ময়' ও 'বিপন্ন'-বোধ তাঁকে তাড়া করেছে জীবনব্যাপী।

তাঁর মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও উদ্ধার হয়েছে তাঁর অপ্রকাশিত লেখা—কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি এবং এ-সবের মধ্যে নব নব রূপে তিনি উদ্ভাসিত হচ্ছেন। এই অপ্রকাশিত লেখাগুলোর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে এমন বহু বিষয় ও গদ্যশৈলীর বহুমাত্রিক বিন্যাস যা জীবনানন্দকে গভীর ও প্রবলভাবে আবিষ্কার ও উপলব্ধির ক্ষেত্রটিকে ক্রমেই আরও প্রসারিত করে তুলছে।

সসংকোচে ও বিনম্রচিত্তে স্বীকার করছি আমরা পরিকল্পনা মতো দু'বছর আগে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করতে পারিনি। কোনো অজুহাতই এর যোগ্য কারণ হতে পারে না। যথাসময়ে যে সব কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না এটি তার আরেকটি উদাহরণ হয়ে থাকলো। আমরা দুঃখিত, আরও বহু লেখকের লেখা, শিল্পীর ছবি এবং তথ্য-উপাত্ত এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি—এ কেবলি আমাদের অক্ষমতা—আর সেই সঙ্গে সমধিক সত্য যে, আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা নিরন্তর ও অব্যাহত ছিল—শেষাবধি।

কবি জীবনানন্দের মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত যাঁরা জীবনানন্দের লেখা এবং তাঁকে নিয়ে পুস্তকাদি রচনা এবং সংকলন সম্পাদনা ও প্রকাশ করে প্রজন্মান্তরের পাঠকের কাছে জীবনানন্দকে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

উত্তরাধিকারের এই বিশেষ সংখ্যার জন্য বাংলা একাডেমীর বাইরে থেকে যাঁরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। অগ্রজ আবদুল মান্নান সৈয়দ যিনি আড়াই বছর আগে এ বিষয়ে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং পত্রিকা প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা পরামর্শ এবং কভার ফ্লাপে জীবনানন্দের জীবনপঞ্জি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অধ্যাপক আবু তাহের মজুমদার বেশ কয়েকটি মূল্যবান লেখা সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে অনেক শ্রমের হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন এবং তাঁর সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর এ পত্রিকার কাজকে নিয়ত অগ্রসর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে ; অনুরূপভাবে চট্টগ্রাম থেকে অধ্যাপক মাহবুবুল হক কয়েকটি লেখা ও ছবি পাঠিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন ; জনাব ফয়সাল শাহরিয়ারও প্রায় সব সময় এই বিশেষ সংখ্যাটির খোঁজ-খবর নিয়েছেন—এঁদের মতো আরও অনেকেই যাঁরা কেবল লেখা পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি—পত্রিকার প্রকাশনা, ভালো-মন্দ নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শনের সঙ্গে পরামর্শ ও মতামত দিয়ে উপকৃত করেছেন। কবির প্রতি যেমন, বাংলা একাডেমীর প্রতিও তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও প্রবল প্রাণাবেগ আমাদের সব সময় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। এঁদের সকলকে—একাডেমীর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শিল্পীদের নিকট থেকে ছবি পাওয়ার ব্যাপারটি খুবই অনিশ্চিত বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত নিরাশ হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী, শিল্পী হাশেম খান এবং শিল্পী রফিকুন নবীর মূল্যবান শ্রম ও পরামর্শ সংখ্যাটির সৌকর্য বৃদ্ধি করেছে বলে আমরা মনে করি। অকালপ্রয়াত শিল্পী কাজী হাসান হাবিব-এর 'বনলতা সেন' ছবিটি জনাব ফিরোজ সারোয়ারের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং শিল্পী-পারিবারের অনুমতি নিয়ে মুদ্রিত।

পত্রিকা প্রকাশের শেষ পর্যায়ে এসে কিছু মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটেছে—যার উল্লেখ এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করি।

এক. জন্মগতভাবে প্রাপ্ত হেমোফিলিয়া নামক রোগে আক্রান্ত ছিলেন বাংলা একাডেমীর অন্যতম উপপরিচালক জনাব মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্। শেষের দুই বৎসরাধিক কাল তিনি বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন—সেই সূত্রে একাডেমীর প্রকাশনাসমূহের মুদ্রকও বটে। হাসপাতালে শুয়েই তিনি খোঁজ-খবর নিয়েছেন এ পত্রিকার ছাপার অগ্রগতি বিষয়ে। সকলের অজান্তে আরেক ঘাতকব্যাধি 'লিভার-সিরোসিস' কাউকে তেমন জানার সুযোগ না দিয়েই শেষবারের মতো হাসপাতালে ভর্তির ৩য় দিনে ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় তাঁকে অন্যজীবনে স্থানান্তর করে দিলো। আমার কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গই এখানে আনা উচিত নয়—তাঁর প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হবে, একথা না বললে—আমার জীবনের ৩৪ বছরের বন্ধু-সঙ্গী যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা-আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করেছে—আমাদের দৌড়-ঝাঁপ এ পত্রিকার জন্যে, না জানি এই পত্রিকা না-দেখার কতখানি অতৃপ্তি আর বেদনা সে সঙ্গে নিয়ে গেল।

দুই. ঘটনাক্রমে এই একই তারিখ ছিল বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক এবং এই পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের শেষ কর্মদিবস। তিনি তাঁর পূর্বের কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে প্রত্যাবর্তন করলেন, তিনিও নিয়ে যেতে পারেননি এ পত্রিকার কপি—তাঁর হাতে পৌঁছুবে নিশ্চয়।

পরিশেষে, এই সংখ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে শ্রম দিয়ে এই পত্রিকা-প্রকাশকে নির্বিঘ্ন ও সাবলীল-সুন্দর করতে নিরন্তর সচেষ্ট ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বজনাব নূরুল ইসলাম মৌলিক, আনোয়ারুল হক, মো. মোবারক হোসেন, মীর হোসেন, বাবুল হোসেন, আলতাফ হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রূপসী বাংলার কবিকে আবারও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। জয়তু জীবনানন্দ।

অমর একুশে ২০০১
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

ওবায়দুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি জীবনানন্দ দাশ [১৮৯৯ - ১৯৫৪]

শিল্পী : শাহজাহান আহমদ বিকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনলতা সেন
আবুল হোসেন

আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশই প্রধান ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে আলোচনা সাহিত্যিক অসাহিত্যিক সব মহলেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মফস্বলবাসী এবং স্বভাবতই নিঃসঙ্গ বলেই তাঁর এই বদনসিব কি না জানি না, মনে হয় আধুনিক বাঙলা কাব্যের প্রধান গতিপথ থেকে তাঁর অসঙ্কুচিত নিঃশব্দ পলায়নই এ অবহেলার মূলে। অথচ এই শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে যে নতুন কাব্যধারার প্রবর্তন এবং রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা জীবনানন্দ তার একজন প্রধান, অক্লান্ত অথচ নির্জন কর্মী। তবু আজকালকার সমালোচকের মুখে তাঁর নাম আরো ঘন ঘন শুনি না তার কারণ জীবনানন্দ দাশের কবিতা একান্তরূপেই একটি বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গির প্রতীক, কোনো নতুন ভাবধারা অথবা নবাবিষ্কৃত আঙ্গিকের বিদ্রোহী বাহন নয়। কিন্তু চরম ও পরম বিশ্লেষণে যে কোনো সাহিত্যপ্রচেষ্টা, বিশেষরূপে কবিতা-রচনা, একটি মানসিক ভঙ্গি ও তার সার্থক রূপায়ণ ছাড়া আর কী হতে পারে? এবং যে কবি একটি সম্পূর্ণ নতুন চেতনিক রাজ্যের ছত্রপতি, তাঁর বিবক্ষার ও বক্তব্যের আঙ্গিক যে স্বতন্ত্র হবে সে তো স্বতঃসিদ্ধ।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যবিচার কঠিন, নানা কারণে। রবীন্দ্র-বিদ্রোহী হয়েও তিনি একান্তরূপেই রোমান্টিক, এমন কি তাঁর অনেক রচনাই নজরুলীয় পুনরুক্তিপূর্ণ। একজন সমালোচক একবার লিখেছিলেন যে জীবনানন্দই বাংলার সেরা প্রতীকী কবি এবং প্রতীকীবাদ বলতে মোটামুটি যদি এই বুঝায় যে তা উপমা তুলনা অলঙ্কার অনুষঙ্গের আবর্তে পাঠকের মনে এমন একরকমের মোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা যার প্রধানতম গুণ কেবল একটি সুর, তা হলে এ কথা অনস্বীকার্য। অথচ কে না দেখেছে তাঁর কবিতা আর যা-ই হোক প্রতীকীবাদসুলভ বাহুল্য বর্জিত নয়। বক্তব্যকে ঘনীভূত করবার জন্য তিনি প্রতীক ব্যবহার করেন না, বরং একটি কথায় প্রকাশ করা যায় এমন যে ভাব তাকেও তিনি প্রায়ই কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ছবি কি চিন্তার মধ্য দিয়ে জাহির করেন। 'ইয়ার্ন'-শব্দটির সঙ্গে নাকি 'টেল' কথাটির কী রকম যোগসূত্র আছে; সেই বিচারে অন্নদাশঙ্কর বলেছেন, প্রমথ চৌধুরী আমাদের সেরা গল্পবাগীশ। কাব্যের মজলিশে চৌধুরী মহাশয়ের সেরা কাউন্টারপার্ট জীবনানন্দ দাশ।

স্বভাবতই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার বিদ্রোহ যে দ্বিতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সেই সাম্যবাদী দৃষ্টিও তাঁর নেই। শুধু 'বনলতা সেন'ই নয়, জীবনানন্দ রাজনৈতিক কবিতা যদি লিখেই থাকেন তা হলেও তাদের সংখ্যা এককের অঙ্ক ছাড়িয়ে যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখা, রঙ, আর চেতনার কোন এক অচেনা অজানা রাজ্যের একটি উদাস করুণ প্রশান্ত সুর, এই তো জীবনানন্দের কবিতা। স্বভাবতই তাঁর বেশির ভাগ রচনা প্রকৃতি-বিষয়ে, এমন কি নিছক প্রেমের কবিতার মধ্যেও তাঁর প্রাকৃতিক প্রলেপ আমাদের বিস্মিত প্রশংসা কাড়ে। হাক্সলী সাহেবের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় প্রকৃতির মধ্যে একটি স্বাভাবিক কোমলতা আছে, মধ্যযুগীয় ফিউডল সমাজ যার সন্ধান রাখতো। জীবনানন্দের বিশিষ্টতা এই প্রকৃতিময় ষ্টাইলে ; এবং কোন্ কবিই না অনুভব করেছেন যে পয়ারের দীর্ঘ চরণগুলি যুক্তাক্ষর বর্জিত হলে এমন টেনে টেনে চলে যে ভাষার এক রকমের নরম অবসন্ন চাল আসে। আসলে একই-সুরে-বাঁধা শব্দসংযোজিত পয়ার একান্তরূপেই কৃষিযুগের ছন্দ। এবং জীবনানন্দ মনে প্রাণে মফস্বলবাসী, কেবল সশরীরে নয় ; তাঁর কাব্যে তাই পয়ারের ছড়াছড়ি।

কিন্তু এ কবির কাব্যের প্রাণ হলো তার অদ্ভুত মিশ্রণে ; অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, পুরোনোর সঙ্গে নতুনের অসম্ভবে-সম্ভবে, অবিশ্বাস্যে-বিশ্বাস্যে, গ্রামের সঙ্গে নগরের অপূর্ব সংযোজনে। বিদিশা, শ্রাবস্তী আর সিংহল সমুদ্রতীর ছেড়ে যেই এসে দেখি 'নাটোরের বনলতা সেন' তার পাখির নীড়ের মতো চোখ মেলে বলে 'এতদিন কোথায় ছিলেন', আকস্মিক বিস্ময়ের বিদুৎস্পর্শে আমরাও শিহরিত হই। এত দূর আর এত কাছে, এই মিলিয়ে জীবনানন্দের টেকনিক।

জীবনানন্দও বিষ্ণু দে-র মতো সুন্দর পঙ্‌ক্তিপ্রধান কবি। তাঁর এক একটি উপমাই একটি কবিতার স্বাদ আনে এবং সে উপমা বেশির ভাগ সময়েই বক্তব্য স্বচ্ছ ও অর্থকরী করবার জন্য ব্যবহৃত হয় না, কেবলমাত্র একটি আবহাওয়া সৃষ্টিই তাদের উদ্দেশ্য। স্বভাবতই রচনা মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। একটি ভাবের সঙ্গে অপর একটি বক্তব্যের সুদূরতম যোগসূত্র আবিষ্কারও দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ পাঠক অন্ধকার দেখতে পারেন, জীবনানন্দ এলিওটের উদ্ধৃতি তুলে বলবেন, কবিতার জন্যই কবিতা।*

* ১৯৩৬ সালে প্রথম প্রকাশিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি জীবনানন্দ দাশ

রণেশ দাশগুপ্ত

এক ।। কবি প্রসঙ্গ

রূপসী বাংলার জীবনানন্দ দাশের পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল পদ্মাপারে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত গাউ-পাড়া গ্রামে। সে গ্রাম এখন পদ্মাগর্ভে। গ্রাম ভেঙ্গে যাওয়ার অনেক আগেই জীবনানন্দ দাশের পিতামহ সর্বানন্দ দাশ বরিশাল শহরে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। সেই থেকেই জীবনানন্দ দাশও বরিশালবাসী ছিলেন। শহরে হলেও জীবনানন্দ দাশ রূপসী বাংলার সবুজ আঁচল ধরেই যেন বড় হয়ে ওঠেন। নারিকেল আর সুপারি গাছের কুঞ্জ দিয়ে ঘেরা ভিটায় মাছের চোখের মতো ঝকঝকে ছোট একটি পুকুর আর পরিচ্ছন্ন একটি আঙ্গিনাকে নিয়ে আধা শহুরে আধা-গ্রামীণ ধরনের কয়েকটি ছোট বড় ঘর। এমনি একটি ঘরেই জীবনানন্দ দাশের শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং সাংসারিক জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছিল। এম. এ. পাশ করে তিনি হয়েছিলেন অধ্যাপক এবং অধ্যাপনারও অধিকাংশ সময় কাটিয়েছিলেন তিনি বরিশালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে জীবনের শেষের দিকে কলকাতায় সাংবাদিকের কাজ নিয়েছিলেন সাময়িকী সম্পাদক হিসেবে। বলতে গেলে এই সময়টাতেই তিনি হয়েছিলেন ঘর-ছাড়া। বরিশালের গোলপাতায় ছাওয়া বেড়ার ঘরের জানালার পাশে ছোট টেবিলে হাত রেখে তাঁর অনেক কবিতাই রচিত। কলকাতা মহানগরী কিংবা দিল্লী কিংবা শিলং পাহাড়ে ছাত্রাবস্থায় কিংবা অধ্যাপনা ব্যপদেশে কিংবা নিছক হাওয়া বদলের সময় তাঁর কবির চোখ গভীর কৌতূহল আর বোধ নিয়ে চারিদিকের সবকিছু দেখে মনোমুকুরে অনেক কিছু অনেক ছবি জমা করেছিল ; তাঁর হৃদয় বীণা তুলে নিয়েছিল অজস্র সুর ; কিন্তু বরিশালের নিভৃত নিকেতনকে ঘিরে ছন্দিত ছিল যে রূপসী বাংলার সুভাসিত ছবি আর সুর, তাতেই সাধা ছিল তাঁর দুটি বড় বড় চোখ, বাঁধা ছিল তাঁর বিনম্র হৃদয়।

জীবনানন্দ দাশের বাবা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মা কুসুমকুমারী দাশ কবিতা লিখতেন সাংসারিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে। পিসিমা স্নেহলতা দাশ (বড়দি) বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপয়িত্রী প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রশান্তি ছিল পরিবেশে। অশ্বিনী দত্তের শিক্ষাব্রতের আদর্শে পরিবারটি ছিল উৎসর্গিত। সর্বানন্দ ভবনের দায়িত্ব ছিল বরিশাল শহরে শিক্ষাবিস্তারের। স্বচ্ছলতা যাকে বলে তা' ছিল না। সত্যানন্দ দাশ সে যুগের গ্রাজুয়েট হওয়া সত্ত্বেও সংসার ছিল টানাটানির সংসার। তবে মর্যাদা ছিল। এই পরিবেশে থেকেই জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিগত চরিত্র গড়ে উঠেছিল সহজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারল্যকে মূল উপকরণ করে। কোনরকম উগ্রতা, অসহিষ্ণুতা কিংবা বিলাসিতা বা বাবুগিরি তাঁকে পেয়ে বসতে পারেনি। ইংরেজি সাহিত্যে গভীর জ্ঞান থাকলেও তাঁর কথাবার্তা ছিল একান্তভাবেই দেশী। হয়তো—কিছুটা উদাসীন ছিলেন বেশভূষায়, কিন্তু শ্লথ ছিলেন না। বিবাহ করেছিলেন ঢাকার ইডেনের ছাত্রী লাবণ্য গুপ্তকে। সে সময়ে ঢাকা শহর খুব জম–জমাট হয়ে উঠেছিল ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র বুদ্ধদেব বসুর নেতৃত্বে 'প্রগতি গ্রুপ' যে সাহিত্য পত্রিকা বের করেছিলো, তার দৌলতে জীবনানন্দ দাশ নতুন বাংলা কবিতার অনন্যসাধারণ মুখপাত্র হিসেবে প্রকট ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছিলেন তরুণসমাজের পক্ষ থেকে। বুদ্ধদেব বসুরা দাবী করেছিলেন, জীবনানন্দ দাশের অবস্থান রবীন্দ্রনাথের সূর্যমণ্ডলের বাইরে। এই অবস্থায় আত্মপ্রচারের কিংবা নিজেকে নাটকীয় ভাবে দাখিল করার সুযোগ ছিল তাঁর। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ সেই সুযোগকে কাজে লাগাননি। তাঁকে নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে, তখন শান্ত স্থির ভাবে অপেক্ষা করেছেন তিনি এই বিতর্কের একটা সুদূর–প্রসারী সিদ্ধান্তের জন্যে। বিতর্কের পাত্র হওয়া আর জনপ্রিয় হওয়ার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি হয়তো ছিলেন সদাজাগরুক। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ'শ ছাব্বিশ সাতাশ সালে। বইটি অবিক্রিত থেকে গিয়েছিল। তবে এর মধ্যে কয়েকটা সুর বেরিয়ে এসেছিল, যাদের আলাদা করে ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি ঢাকার 'প্রগতি' পত্রিকায় এক ধরনের অভিনব কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন মুক্ত ছন্দে। বাংলার রূপকথার ছাঁচে গল্প বলার ধারায় কবিতায় তিনি নিয়ে এসেছিলেন লৌকিকতার আমেজ। মানবসভ্যতার ইতিহাস–চেতনার সঙ্গে মিশ্রিত করেছিলেন রূপসী বাংলার নিসর্গপ্রীতিকে। সম্ভবত এই সময়েই ইংরেজি কাব্যের অনুশীলন পর্যায়ে ডি. এইচ. লরেন্স এবং ইয়েটসের কবিতা তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং আদিমতা অথবা লৌকিক বা রূপকথার কাব্যিক পরিমণ্ডল নির্বাচনে তিনি ভরসাও পেয়েছিলেন এই দুই কবির তদানীন্তন খ্যাতি ও স্বীকৃতি থেকে। কিন্তু নিজের সাফল্য সম্বন্ধে জীবনানন্দ দাশ ছিলেন ভবিষ্যৎবাদী। বিশেষ করে যখন তাঁর 'ক্যাম্পে' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল তরুণ অতরুণ নির্বিশেষে সকল মহলে, তখনও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যৎবাদী। তিনি অপেক্ষা করতে রাজী ছিলেন কুড়ি পঁচিশ বছর, সর্বজনীন স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতির জন্যে। বলতেনও একথা তিনি তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গদের। নাটকীয়তাবিমুখ হওয়ার দরুনই কি তিনি তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই–এর নাম রেখেছিলেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি ?' এই কারণেই কি বরিশাল শহরকে তিনি প্রায় ছাড়েননি বললেই চলে ? অধ্যাপনার ছক্ বাঁধা জীবনে নিজেকে অপদস্থ মনে করেননি ?

দোহারা গড়নের সাধারণ বাঙালি চেহারার এই মানুষটি শান্ত প্রকৃতির হলেও প্রাণ–প্রাচুর্যে ভরপুর ছিলেন। নির্লিপ্ত তিনি ছিলেন না। মনে রাখতে হবে, বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ দাশের অভ্যুদয় ঘটে কাজী নজরুল ইসলামের পাশাপাশি। মানুষের জয়গানে মুখর প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের আধুনিক ধারাতে তাঁর লেখার হাতেখড়ি। যে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়েছিল, সেই পত্রিকাতেই জীবনানন্দ দাশের দীর্ঘ ঘোষণাপন্থী কবিতা ছাপা হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে আরও অনেকের মতো উদাত্ত কবিতা লিখেছিলেন তিনি। এই যুগটি যখন ব্যাপক উৎপ্রেক্ষার পরে গভীরাশ্রয়ী হলো, তখন আরও অনেকের মতো জীবনানন্দ দাশও 'গভীর সুরে গভীর কথা' বলার দিকে ঝুঁকলেন। কাজী নজরুল ইসলাম যখন বাংলা গজল আর গীত রচনায় মনোনিবেশ করলেন, তখন জীবনানন্দ দাশ রূপকথার মালমসলা নিয়ে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এটা ঠিক জীবনবিমুখতা ছিল না। এটা জীবনকে এক ধরনের নতুনভাবে দেখা। তাঁর মধ্যে প্রাণ–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচুর্যের অভাব কোনোদিনই ছিল না। পরবর্তীকালের বহু কবিতাই এর সাক্ষ্য দেবে। 'হাওয়ার রাত' কিংবা 'সিন্ধু সারস' এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

তবে একথা ঠিক, জীবনানন্দ দাশের জীবনের পরিপ্রেক্ষিত ছিল একদিকে যেমন সুদূর অতীতে, তেমনি অনাগত ভবিষ্যতের কল্পলোকে নিবদ্ধ। কোনো ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো করার প্রয়াজন তাঁর কাছে যেন বাড়াবাড়ি মনে হতো। তিনি অবশ্য ছিলেন মূলত প্রগতিপন্থী ; ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের ১৯৪৩ সালের প্রকাশিত 'কেন লিখি' অভিমত গ্রন্থে এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু তিনি কোনো ধরনের 'জ্বলন্ত বিশ্বাসে' রাজি ছিলেন না। হয়তো এই কারণেই তিনি তাঁর কাব্যিক জিজ্ঞাসার চারপাশে একটা অবিশ্বাসী মনোমণ্ডলকে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নিবন্ধাবলীতে যেখানে মতামত দেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে, সেখানে এই কারণেই বোধ হয় তাঁর লেখা একই সঙ্গে ঋজু আর তির্যক। সুরকে তিনি নিংড়ে বার করে নিয়েছেন তাঁর গদ্য লেখা থেকে। জনতা এখানে তাঁকে সোজাসুজি পায়নি।

অথচ সুরই হচ্ছে তাঁর কবিতার প্রাণ। লৌকিক বাংলা কবিতার সুরে বিংশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষের পদাবলী লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ। তিনি যে গদ্যকবিতা লিখেছেন, তাও একই গ্রামে বাঁধা। সাধু ক্রিয়াপদ আর গ্রামীণ কথা সুরের তটিনীতে মালা হয়ে ভেসে চলেছে। বেশ কিছু বর্বর শব্দ আছে, কিন্তু সবই পেলব হয়ে গিয়েছে লেখার সুরের ঝংকারে। তাঁর অবিশ্বাসী মনোমণ্ডল এখানে হয়ে গিয়েছে সুর সৃষ্টিতে আত্মহারা।

জীবনানন্দ দাশের এই বিশেষ সুরের পক্ষপাতীরাই এক সময়ে ব্যতিক্রম দাবী করে বসেছিলেন এবং এই দাবী মেটাতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন ইচ্ছাকৃত বেসুরো কবিতা। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে এর পরিচয় আছে ছত্রে ছত্রে। শেষের দিকে তিনি এই ব্যতিক্রমের কর্কশতাকে বহাল রেখে বেসুরোকে মিলিয়ে নিয়ে আসছিলেন একটা নতুনতর ভাষার প্রসারিত সঙ্গতিতে। এই সময়েই মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

তিনি যা রেখে গিয়েছেন, তাতে তাঁর নিষ্ঠা ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। তাঁর ভবিষ্যৎমুখী মন বহুমুখী হয়ে সূর্যকর আর জ্যোৎস্নার মতো নিষিক্ত হয়ে রয়েছে তাঁর কবিতার মধ্যে।

দুই।। কাব্য পরিচয়—প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে

প্রথমেই দেখা যাক যে প্রচলিত ধারণাগুলি দ্বারা জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে বিচার করার প্রবণতা গড়ে উঠেছে, সেগুলি কি?

এই ধারণাগুলি নিম্নরূপ। যথা, জীবনানন্দ দাশ পৃথিবী-পলাতক কবি। নিজেকে নির্বাসিত করেছেন তিনি নিসর্গের রাজ্যের চিত্রকার হিসেবে। বিশুদ্ধ সুন্দরের উপাসক কবি তিনি, সমাজ সচেতন নন, তিনি শুধুমাত্র আত্মসচেতন অথবা আত্মনিমগ্ন। কবি বাস্তবকে পরিহার করে রূপকের জগতে বাস করেছেন। তিনি বড়জোর তাঁর প্রণয়িনীকে পাশে রাখতে রাজী হয়েছেন তাঁর নির্জন পরিবেশের অনুভব রাশির সাক্ষী হিসেবে। ইতিহাসে তিনি এক ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক। দেশ ও কালের বাইরে নিজেকে স্থাপন করেছেন তিনি। কখনোবা সাগরে সাগরে নাবিক-মনা কবির অশেষ যাত্রা। তিনি হেঁয়ালির কবি। তাঁর দয়িতা রহস্যময়ী মর্মময়ী শুধু, যদিও তার রূপরেখা নিছক ইন্দ্রিয়াশ্রিতা, স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু ধরা যায় না। তিনি চির বিদায়ের কবি। বাংলার ষড়ঋতুর মধ্যে একটি মাত্র ঋতুর আবেদন তাঁর মনে। সে হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমন্ত। ঝরা পাতা আর ফসল কেটে নেওয়া রিক্ত মাঠের কবি তিনি। সুতরাং বিষণ্ণতাই তাঁর কবিতার মূল সুর। ক্লান্তি, অবসাদ, অবকাশ, অবসর, মৃত্যু আর বিচ্ছেদকে নিয়েই তাঁর জীবন বোধ। এইসব কারণেই আধুনিক বাংলা কবিতাতে তিনি অনন্য–সাধারণ। তিনি একটি বিচ্ছিন্ন কবিসত্তা। যেমন রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদী মানবতা–বোধ থেকে, তেম্‌নি কল্লোল যুগের বিদ্রোহী মানবতাবাদ থেকে তিনি মুক্ত, বিচ্ছিন্ন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত আধুনিক কবি তিনি, কাব্যিক আঙ্গিকে বিশেষ করে। রবীন্দ্র–গীতিকবিতার ধারা থেকে সচেতনভাবে মুক্ত এক অত্যাধুনিক রীতি প্রবর্তক কবি।

উপরোক্ত ধারণাগুলি কি সঠিক? কিংবা এদের কি পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়? জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভারের পাঠকপাঠিকারা এইসব ধারণার সমর্থনে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাবেন অনেক কবিতায়। যেমন একটা দৃষ্টান্ত : "এরকম হিরণ্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে?" প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের পর থেকে শুরু করে বিশেষ করে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হবার পরে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটানা লেখার বিশেষ একটা ধারাবাহিকতা থেকে কবি চিহ্নিত হয়ে এসেছেন অনুরাগী–বিরাগীদের কাব্য জিজ্ঞাসাতে বিচ্ছিন্নতার লক্ষণে। 'কবিতার কথা' নাম দিয়ে জীবনানন্দ দাশ যে নিবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার মধ্যেও একটা প্রয়াস পাওয়া গিয়েছে কবির তরফ থেকে নিজের কবিসত্তাকে আলাদা–ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে না হলেও অন্তত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে। এখানে সামাজিকতা সম্বন্ধে সংশয় আছে।

সুতরাং, জীবনানন্দ সম্বন্ধে এতাবৎকালের এই বদ্ধ ধারণাগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যেতে পারে না। এদের সত্যতা ও যথার্থতা সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে কবিতাবলীর ছত্রে ছত্রে। এইসব ছত্রে যে অনুভবপুঞ্জ রয়েছে তাদের নাকচ করবো কি করে। কিন্তু কবিতার বিচার–পদ্ধতিকে প্রচলিত খাতে আবদ্ধ না রেখে অর্থাৎ একধরনের প্রমাণকে আরও মজবুত করার জন্যেই যুক্তি খুঁজে বার করার চেষ্টা না করে যদি কবি, তাঁর কবিতা এবং তাঁর ধ্যানধারণা সমন্বিত নিবন্ধকে ইতিহাস–সিদ্ধ করার চেষ্টা করা যায় এবং নৈসর্গিকতা কিংবা অসামাজিকতাকেও একটা বিশেষ সমাজের বিশেষ সময়ের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখবার চেষ্টা করা যায়, তাহলে আরও এমন অনেক কথা বেরিয়ে আসবে, যেগুলি আমাদের দেবে জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে নতুন ধারণা। জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কাব্যসম্ভারকে চোখের সামনে রেখেই এ দাবী করা যেতে পারে। কারণ কয়েকটি বিশেষ কবিতা এবং বিশেষ করে কয়েকটি প্রসিদ্ধ পঙ্‌ক্তি এই কবি এবং তাঁর কাব্যকীর্তি সম্বন্ধে এমন একটা বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করে এসেছে যে, তাঁকে রূপকথার জগতের মানুষ বলে সর্বত্র দাখিল করা হয়ে থাকে। এই রূপকথার জগতের ধারাতে আধুনিক বাংলা কবিতায় এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের আধুনিক কবিতায় যে রীতি গড়ে উঠেছে ১৯৫২ সালের পরের দুই দশকে, তাকে জীবনানন্দী বলে চিহ্নিত করার দরুন এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, সমগ্র কাব্যসম্ভার হাতে না নিয়ে জীবনানন্দ সম্বন্ধে অন্য কথা বলা যায় না। অথচ 'ঝরাপালক' নামক কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থেই যথেষ্ট প্রমাণ ছিল যে, কবি সক্রিয় রাজনীতিকেও অস্পৃশ্য মনে করতেন না। এরা প্রথম দিকে এমন সব কবিতা যেগুলির গাঁথুনি কাঁচা অথবা যেগুলি হয়তো অপরিণত এবং পরানুসারী বলে বিবেচিত হওয়ার দরুন স্বয়ং কবির সামগ্রিক কাব্যপ্রেক্ষিতেও আসেনি। তাই শুধু এই কবিতা কয়টিকে ভিত্তি করে তাঁকে জীবনমুখী বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলে অভিহিত হতে পারে। তবে সে প্রয়োজনও নেই। কারণ, কাব্যসম্ভারের পরবর্তী পর্যায়ের স্তবকে স্তবকে এমন সব প্রমাণ পাওয়া যাবে, যাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারবো যে, জীবনানন্দ দাশের নব নব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচারের প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ কবি ও তাঁর কবিতা সম্বন্ধে নতুন নতুন যুগের তরফ থেকে নতুন নতুন কথা বলার উপকরণের অভাব নেই। এ ব্যাপারে 'কবিতার কথা' নিবন্ধ গ্রন্থ থেকেও উপকরণ নেওয়া যেতে পারে।

তিন।। কাব্য পরিচয় : নববিচার ১

জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'কবিতার কথা' নিবন্ধ–গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন : 'আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা খচিত অভিব্যক্তি হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যেই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাগ্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে চায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় আভা, তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয় না, পদ্য লিখিত হয় মাত্র, ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে ; কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থা অনুভব করে ; বুঝতে পারে যে তারা সঙ্গতির ভিতর রয়েছে, অসংস্থিত হয়ে পীড়া দিচ্ছে না।"

এই বক্তব্যটিকে চাবীকাঠি করে যদি জীবনানন্দ দাশের কাব্যের জীবনমুখিতার বিচারে প্রবৃত্ত হতে চাই, তাহলে হয়তো প্রশ্ন আসবে, জীবনানন্দ দাশের কি নিজের তরফ থেকেই কোনো প্রয়াস ছিল তাঁর সামাজিক কিংবা জাতিগত অথবা মানবীয় চেতনাকে সৌন্দর্যের মোড়কের মধ্যে লুকিয়ে রাখার, অথবা এ বক্তব্য অন্য কবিদের সম্বন্ধে তাঁর সহনশীলতার একটা প্রকাশ মাত্র?

এখানে এই প্রশ্নটির মীমাংসা করে নিতে গিয়ে প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, তাঁর কবিতা যে স্বপ্নমঙ্গল কিংবা আকাশকুসুম নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঢালাওভাবে প্রথম দিকের কবিতাতে, 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের কবিতায়, কিংবা শেষের দিকের কবিতায়, যেমন ১৯৪৬–৪৭ নামক কবিতাতে, যেখানে রূপসী বাংলা ক্ষুধিতা বাংলাতে পরিণত হয়েছে। রূপসী বাংলা শুধু 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলির খেলা' নয় ;—সেখানে রয়েছে বেহুলা আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অভিযাত্রার প্রতীক। 'রাত্রির কোরাস' কবিতায় দেখা গিয়েছে বিশ্বযুদ্ধের অমানুষিকতা তাঁর মনে কী প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল। 'সময়ের তীর' কবিতাটিও এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এইসব কবিতায় অবশ্যই প্রমাণিত যে, সামাজিক কিংবা জাতিগত অথবা মানবিক সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদকে লুকিয়ে রাখার জন্যে যে সুপারিশ করেছেন তিনি সেটা তাঁর নিজের প্রতিও প্রযোজ্য ছিল। তিনি লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন সামাজিক সমস্যাকে, একথা মানতেই হবে। সুন্দরীর কটাক্ষের নিচে শিরা উপশিরার মতোই অত্যন্ত নিরেট বাস্তবকে তিনি প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করে এসেছেন। এ চেষ্টা অনেকে করেননি, কিংবা এই প্রয়োজনকেও হয়তো অনেকে অবান্তর মনে করে এসেছেন। কিন্তু আসল কথাটা এই যে, বাস্তবকে খুব বেশী গ্রহণ করেছেন বলেই জীবনানন্দ দাশ তাকে ঢাকবারও তাগিদ অনুভব করেছেন এত বেশী।

যখন তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন কিংবা প্রকাশনার জন্যে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় পাঠাতে থাকেন, তখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করেছেন, অর্থাৎ নিজের লেখা কবিতার দায়িত্ব গ্রহণের বয়স হয়েছে তাঁর। 'দেশবন্ধু' সম্পর্কে লেখাটির কথাই ধরা যাক। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ। তিনি সজ্ঞানে এই কবিতা লিখেছেন। এই কবিতাটি পড়লেই বুঝতে পারা যায়, এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের একটি বহির্মুখি কবিতাতে সুন্দর শব্দ নিয়ে পরীক্ষা করার দিকেও তাঁর একটি প্রবণতা বেরিয়ে এসেছে। তবে যে চিন্তার লাভাপ্রবাহ বেরিয়ে এসেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের স্বাধীনতা সংগ্রামের গণ-অভ্যুত্থানে এবং যে চিন্তা কল্লোলযুগে নজরুলের কবিতায় বন্যার জলের মতো বেরিয়ে এসেছিল, তার সংক্রমণ থেকে জীবনানন্দ দাশ রেহাই পেতে চেষ্টা করেননি। 'ঝরা পালক' নামক তাঁর প্রথম 'কাব্য গ্রন্থে' দেশবন্ধু সম্পর্কে কবিতাটি স্থান করে নিয়েছিল। এজন্যে জীবনানন্দ দাশ কুণ্ঠা অনুভব করেননি। কিন্তু এরপরে তিনটি কারণে, মনে হয়, জীবনানন্দ দাশ 'শিরা উপশিরাকে সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে' স্থাপন করতে চেয়েছিলেন সঙ্গতি বা নন্দনের কথাটা মূলগতভাবে চিন্তা করেই।

এই তিনটি কারণের একটির কথা আগেই বলেছি। নজরুল যেমন গজলে এবং গানে গেলেন, জীবনানন্দ তেমনি নিছক নিসর্গে আর রূপকথায় গেলেন। গণপ্লাবনের ধারা তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। সে সময়ে যদি কবির মনে এসে থাকে নিসর্গ কিংবা রূপকথার দিকে ঝোঁক, তবে তার মূলে কাজ করেছে রাজনৈতিক সামাজিক তরঙ্গ দোলার উত্থান পতন। সামাজিক টানাপোড়েনের ঊর্ধ্বে কিংবা নিম্নে নিজেকে নির্বাসিত করতে পারেননি বলেই একটানাভাবে কল্লোলযুগের জাতীয়তা অথবা মানবতার জের টেনে নিয়ে যেতে পারেননি কবি। শিরা উপশিরা থেকে সুন্দরীর কটাক্ষে চলে যাওয়াটা হেঁচকা টানেও সম্ভব হয়নি। একটা কাঁটা নিরন্তর মনের মধ্যে ছিল, যেটা খচ খচ করে বেজেছে কবির মনের মধ্যে। 'কবিতার কথা'র উপরোক্ত বক্তব্যটির উদ্ভবও এই কাঁটার খোঁচায়। তবে সুন্দর কবিতা লেখার দিকে তিনি ঝুঁকলেন ইতিহাসের সাময়িক অবরোহনের টাল সামলাতে। দ্বিতীয় যে কারণে জীবনানন্দ দাশ সৌন্দর্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন জীবনের রূঢ় বাস্তবকে সঙ্গে রেখেও, সেটি হচ্ছে সম্ভবত কালোত্তীর্ণ কবিতা লেখার চিন্তা। কবি তাঁর একাধিক লেখাতে সময়-সচেতনতাকে প্রকাশ করেছেন। সময়ের একটা ঢেউ চলে যাবার পরে আরেকটা ঢেউ আসবে, কারণ, অতীতে কতবার গিয়েছে এসেছে। কবির চিন্তনে আগামী দিনের আদৃতির নিশ্চয়তা-বোধ এসেছে সময়ের আদ্যোপান্ত চিন্তা থেকে। 'বনলতা সেন' নামক কবিতাটি মুক্তার মতো জমানো রয়েছে এই কালোত্তীর্ণ চিন্তার শুক্তিতেই। এটা কোনরকমের প্রাগৈতিহাসিক অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থবিরতাবোধ থেকে উদ্ভূত হয়নি। অতীত এখানে স্থবির ছবি হয়ে যায়নি। সময় সম্বন্ধে এখানে যেমন একটা সুস্পষ্ট জঙ্গম ধারণা বেরিয়ে এসেছে, তেমনি কবিতার সত্তা কিংবা রূপ সম্বন্ধেও একটা কালোত্তীর্ণ তাগিদ দানা বেঁধে উঠেছে। এই তাগিদ হচ্ছে এমন সৌন্দর্য বা রূপ সৃষ্টির তাগিদ, যে রূপ জীর্ণ হবে না, ঠুনকো হবে না। অস্থায়ী হবে না, একান্ত ক্ষণিকের হবে না। একটা সমস্যার নিরসনেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে না। আন্দোলনের একটা ঢেউ থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে না। এই ভবিষ্যৎমুখী বোধ থেকেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন 'অন্ধকার থেকে' কবিতাটি। কিংবা তিনি আরও লিখতে পেরেছিলেন :

> ভাবা যাক—ভাবা যাক—
>
> ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি ভেদ করে শোনা যায়
> শুশ্রূষার মতো শতশত জল ঝর্ণার ধ্বনি।

এইসব কবিতা আশাবাদিতায় ছাড়িয়ে গেছে তাঁরই লেখা লাইনটিকে যেখানে তিনি বলেছেন, 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।'

তৃতীয় যে কারণে আঙ্গিক বা রূপ বা সৌন্দর্য-সঙ্গতির দিকে ঝুঁকেছিলেন কবি, সেটা হচ্ছে বাংলাভাষার গভীরে তলিয়ে নবনব ধ্বনিবহুল শব্দ বার করে এনে একটা বিশিষ্টতা নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসা তাঁর লেখায়। এখানে তিনি দুটি উপাদানকে বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। একটি, নতুন ধরনের বাক্‌রীতি। দ্বিতীয়টি শব্দযোগ। শব্দযোগই বলবো। কারণ, যদিও একে নতুন শব্দ ব্যবহার বলা উচিত রীতিমাফিক, তবু এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন এদের তিনি যে এই শব্দগুলি জোড়া লেগে গেছে বহু ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দের সঙ্গে। ঝর্ণার স্রোতের মধ্যে যেমন নুড়িগুলি জল–বুদবুদের মতো নরম হয়ে যায়, তেমনিভাবে বাইরের থেকে আমদানি করা শব্দকে তিনি কোমল করে নিয়েছেন তাঁর প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। রবারের বল, স্প্লিন্টার কিংবা অবলঙ, প্রপেলার, স্কাইলাইট, মাইক্রোফোন শব্দে হোঁচট খেতে হয় না পঙ্‌ক্তি পড়তে গিয়ে। কিন্তু যেসব শব্দ ভিতর থেকে নেওয়া তাদের ব্যবহারে কোমলতার ধার ধারেননি তিনি। ওড়াউড়ি'র মতো মৃদু শব্দ অবশ্য আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্রিয়ার প্রয়োগে তিনি যেন মৃদু হেসে বর্বরতার আমদানি করেছেন। এগুলি ইচ্ছাকৃত প্রয়োগ বলেই মনে হয়। 'ছড়ায়ে রয়েছে' 'শেখায়েছি' 'সূর্যকে সরায়ে দিয়ে' 'আলো ঠিকরায়ে গেলে' 'কাটায়েছিলাম'— প্রভৃতির প্রয়োগ প্রণিধানযোগ্য। 'ছড়িয়ে', 'কাটিয়ে' লেখেননি। বর্ণনাতে একধরনের দ্বন্দ্বাত্মক ব্যবহার করেছিলেন তিনি, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক কবিতারই দ্বন্দ্বাত্মক দ্বৈতসত্তার পরিচায়ক, কিন্তু যার প্রয়োগে মৃদুভাষী অনন্যতা আনার প্রয়াস আছে :

> এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,—জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।
> (সপ্তক)

অথবা

> ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস।
> অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।

অথবা

> মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
> বুঝেছি নিখিল বিষ কীরকম মধুর হতে পারে।
> (তোমাকে)

আধুনিক কবিতার দ্বন্দ্বাত্মক দ্বৈতসত্তা জীবনানন্দের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে চূড়ান্ত যন্ত্রণা নিয়েও।

চার ॥ কাব্য পরিচয় : নববিচার ২

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, জীবনানন্দ দাশ বিশের দশকে কিংবা তিরিশের দশকে 'শিরা উপশিরাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে যে 'সুন্দরীর কটাক্ষ' নির্বাচন করলেন এবং তদানুযায়ী শুরু করলেন দ্বন্দ্বাত্মক কাব্য রীতির পরীক্ষা–নিরীক্ষা, সেখানেও সেই আধুনিকতারই জের টানলেন যার জন্ম হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর–কালের প্রভাতী বাংলা কবিতায়। অবনত মানুষের অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার কথা জানালেন তিনি।

একথা মানতেই হবে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর গণ্ডী ভেঙে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর ভবিষ্যতের সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎকে অঙ্গীকৃত করেননি। আর এই কারণেই তাঁর শেষ পর্যায়ের কয়েকটি দুর্দান্ত রকমের সমাজসচেতন ও কল্লোলিত কবিতাতেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবাত্মক শপথ উচ্চারিত হয়নি। 'এইসব দিনরাত্রি' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার সঙ্গে এটি তুলনীয়। তিনি তাঁর একাধিক কবিতায় কয়েকজন যুগমানবের মধ্যে নাম করেছেন লেনিনের। ইতিহাসের সময়ধারাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিহ্নিত করতে গিয়ে নাম করেছেন সোবিয়েটের। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে এইসূত্রে একটা কথা অনায়াসে বলা যায়। তাঁর কবিতার ধারা মরুপথেও পথ হারায়নি, আবার কোন বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী সরোবরেও পরিণত হয়নি। শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বৃহত্তর আশাই বরং তাঁর লেখায় ধ্বনিত। তাঁর লেখায় বাক্‌রীতিতে পুনরাবৃত্তির দিকে একটা ঝোঁক পরিলক্ষিত হলেও কোনো একটিমাত্র নিরীক্ষার পর্যায়ে তিনি কখনও আবিষ্ট থাকেননি। তিনি সব সময়ে পথ করে বেরিয়ে এসেছেন। এজন্য তিনি নিরন্তর পরিশ্রম করেছেন। এই মেহনতের জঙ্গম ধারা তাঁর কাব্য সম্ভারের পর্যায় থেকে পর্যায়ে প্রণিধানযোগ্য। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য করা দরকার যে, তিনি যদি শুধু আত্মনিমগ্ন নিসর্গবাসী কবি হতেন, তাহলে তাঁর কাব্যসম্ভারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'আমি' এমন অজস্র ভাবে 'আমরা' হয়ে উচ্চারিত হতে পারতো না। 'তিমির হননের গান' কবিতার মধ্যে এই 'আমরা' আশ্চর্য আশাবাদী দ্যোতনা নিয়ে জেগে উঠেছে তাঁর বহুতর সংশয় এবং যন্ত্রণার মধ্যে। 'আমরা'র মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ দাশ নবজীবন পিয়াসী জনতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছেন, একথা নিশ্চিত করে বলায় যায় :

এসো আমরা যে যার কাছে—যে যার যুগের কাছে সব
সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠি।
নবপৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে

(সূর্যপ্রতিম)

পাঁচ ।। স্বাধীন বাংলাদেশে

জীবনানন্দ দাশ যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছেন এটা তাঁর কাব্যের বিপ্লবাত্মক উপাদান হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে বিশেষভাবে বিবেচিত হবে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কবির হাতের তালুতে আমলকীর মতো ধৃত না থাকলেও তাঁর একটা বিশেষ বিশ্ববীক্ষা ছিল। তিনি বিশ্বদর্শনে প্রাজ্ঞ ছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের দিকে ঝোঁক এত প্রবল ছিল যে তাঁর কোনো-কোনো কবিতা বিশ্ব-ইতিহাসের ধারা বর্ণনায় পরিণত। আবহমান বাংলা এবং বাঙালিকে গভীরভাবে ভালবাসার ব্যাপারটাকে এই বিশাল পটভূমিতে আশ্চর্য সঙ্গতির সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন তিনি। যোগসূত্র হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রতি সমানুভূতি। যোগসূত্র হচ্ছে বাস্তবের গভীরে অনিবার্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম চলবার সময় অত্যন্ত বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভারের দুটি সংস্করণ এক বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটির জনপ্রিয়তা তখনকার পরিবেশে একটা বিপ্লবাত্মক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশে। স্বভাবতই আরও নতুন নতুনভাবে এর মূল্যায়ন হবে আরও ব্যাপক জনপ্রিয়তার মধ্যদিয়ে।

যাঁরা এই কাব্যসম্ভার প্রকাশে প্রথমাবধি কাজ, সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা এবং পাঠক-পাঠিকাদের শুভেচ্ছা।*

১৯৬৯ সালে প্রথম প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার' এবং ১৯৭২ সালে এর পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে গৃহীত। প্রকাশক : খান ব্রাদার্স এন্ড কোং ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথম জীবনানন্দের কবিতা পড়েছিলাম, তারপর কলকাতায় 'কবিতা'র পুরনো সংখ্যাগুলো কেনার জন্য একদিন 'কবিতা ভবনে' যাই। তখন বুদ্ধদেববাবুই প্রথম তাঁর আশ্চর্য কবিত্বশক্তির কথা বারংবার উল্লেখ করেছিলেন। স্কুলে পড়ি তখন—ম্যাট্রিক দেবো। সেইকালে আমরা দুই বন্ধু তাঁর অনুকরণে কবিতা লেখার প্রয়াস করেছিলুম।

তারপর তাঁকে প্রথম দেখি যখন আমরা আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন তিনি। শ্যামরঙের স্বাস্থ্যবান মানুষ। চল্লিশোত্তর বয়স তখন। পরণে—ধূতি, পাঞ্জাবি, পাম্প-সু। কাঁধে পাট করে রাখা একখানা চাদর, হাতে একটি কি দুটি বই। মুখ তাঁর সর্বদা ভারি, গম্ভীর, চোখে আশ্চর্য চাঞ্চল্য এবং তীক্ষ্নতা। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতেন। আমি আর আমার আরেক বন্ধু নির্মল চট্টোপাধ্যায় তাঁকে অবাক হয়ে দেখতুম ; কখনো ক্লাসের অবকাশে মাঠের ধারে শুয়ে শুয়ে পড়তুম তাঁর কবিতা। তখনও পর্যন্ত তাঁর শেষতম কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। কিছু দিন পরে 'কবিতা ভবন' থেকে 'এক পয়সায় একটি' কবিতা সিরিজে প্রকাশিত হলো তাঁর 'বনলতা সেন'। আমাদের মধ্যে সেদিন রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। নতুন বয়সের অনভিজ্ঞ মনের কাছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যে সাড়া জাগাতে পারেনি, 'বনলতা সেন' দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছিলো। 'বনলতা সেন' কবিতাটি আমরা যত্রতত্র মুখে মুখে আবৃত্তি করে বেড়াতুম। কলেজের এক অনুষ্ঠানেও আবৃত্তি করলুম একদিন।

একদিন বাড়িতে গেলাম তাঁর। কলেজে তাঁর প্রখর গাম্ভীর্যের জন্য কাছে এগোতো না কেউ। সবারই ধারণা ছিলো তিনি ভীষণ রাশভারি প্রকৃতির লোক। আমরাও অবকাশ পেতাম না কথা বলার। বাড়ি তাঁর একটা মেয়ে ইস্কুলের কম্পাউন্ডের মধ্যে, খুব সম্ভবত সে ইস্কুলটা তাঁর পিতারই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। বাংলো ধরনের বাড়ি—উপরে শণের চাল। বেড়া আধেক ইট আর আধেক বাঁশের। কিন্তু ভিতরে সাহিত্য-পাঠকের কাছে আশ্চর্য এক জগৎ। বই—বই আর বই। বাংলার, বাংলার বাইরের অসংখ্য পত্রিকা। সবই সযত্নে গুছিয়ে রাখা—দেখেই মনে হয় বার বার পড়া। একধারে একটা ছোটো টেবিল। হয়তো তাঁর লেখার। অন্দরে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং বালিকা কন্যা মঞ্জু দাশ। তাঁরাও কবিরই মতো স্বল্পভাষী—নির্জনতাপ্রিয়। সেইকালে মঞ্জু দাশের বোধ হয়, বয়স দশ কি বারো 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন তাঁর বাড়িতে না গেলে 'জীবনানন্দবাবু অসামাজিক মানুষ' এই ধারণা করেই চির দিন দূরে থেকে যেতাম। সে ধারণা অচিরেই ভেঙে গেল। অমন রাশভারি চেহারার ভিতরে একটি সহজ সরল শিশুর মন খুঁজে পেয়ে আমরা চমৎকৃত হয়ে গেলুম।

আমরা তখন লেখার মকশো করছি। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ—কতো কী! আর মুখে 'প্রগতি-সাহিত্যে'র বাণীর খই ফুটছে। এই সময় কলেজে একদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় এক প্রগতিশীল ছাত্র—'কবি', হঠাৎ কথার মাঝখানেই তাঁকে প্রশ্ন করলে : আপনি জনগণের কবিতা লেখেন না কেন?

তার সাহস দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

জীবানানন্দবাবু এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েকবার তার এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আস্তে প্রশ্ন করলেন : তুমি এই প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলনের মধ্যে আছো বুঝি?

সে বললে : হ্যাঁ। অবশ্যই। আমরা এই সমাজ ব্যবস্থাকে বদলাতে চাই—কায়েম করতে চাই শোষণহীন সমাজব্যবস্থা । সেখানে কবি-সাহিত্যিকেরাও আমাদের সঙ্গে আসবেন তাঁদের বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী পরিত্যাগ করে—মার্ক্সবাদ যে নতুন পথ দেখিয়েছে—

কথার মাঝখানেই জীবনানন্দবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : তুমি কার্ল মার্ক্স পড়েছো ? ডস ক্যাপিটল?

ছাত্র-'কবি'টি থতমত খেয়ে বললে : না।

জীবনানন্দবাবু একটুকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে হাসি গোপনের বহু চেষ্টা করেও অকস্মাৎ উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন। হঠাৎ সে হাসি। এমন আচম্বিতে বেরিয়ে আসা—যে, অবাক হয়ে দেখতে হয় তাঁকে। সঙ্গে হাসা যায় না। ছাত্রটি ভ্যাবাচ্যকা খেয়ে পালিয়ে বাঁচলো।

জীবনানন্দবাবুর এই হাসিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবেগকে চেপে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। ভালো লাগার আবেগকেও--অসংযত জীবনযাপন তো দূরের কথা-- রচনাতেও ছিলেন তিনি সংযমী। হাসির আবেগকেও লুকিয়ে রাখতে চাইতেন তিনি। অনেক সময় দেখা গেছে যে হাসির প্রসঙ্গ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেক ক্ষণ, সেইকালে অকস্মাৎ বাঁধভাঙার মতো করে বেরিয়ে পড়েছে তাঁর হাসি। তবু এমন হাসতে তাঁকে তাঁর বন্ধুবান্ধব ছাড়া কেউ কখনো দেখেনি।

বন্ধু-সংখ্যা তাঁর প্রচুর নয়। অচিন্ত্যবাবু, প্রেমেনবাবু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বুদ্ধদেববাবুও শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে খুব। 'কল্লোল' যুগের বহু লেখকের সঙ্গেই তাঁর জানাচেনা ছিলো। বরিশালের মানুষ হলেও, সেখানে কার্যোপলক্ষে থাকতে হলেও ছুটি-ছাটায় কলকাতায় যেতেন। দেখা-সাক্ষাৎ হতো অনেকের সঙ্গেই। যাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাঁরা তাঁর সত্যিকারের মনটিকে চিনেছেন। নয়তো বাইরে তিনি নির্জনতাপ্রয়াসী, আত্মকেন্দ্রিক, অর্থাৎ ভদ্রতাহীন ভাষায় অসামাজিক বলেই পরিচিত ছিলেন। বরিশালের মতো মফস্বল শহরে থেকেও তাঁর মনকে আমি কোনোদিন হাঁপিয়ে উঠতে দেখিনি। নিজের বাড়ি—তার সামনের মাঠ এবং ইংরেজি সাহিত্যের অসংখ্য কাব্য ও কবিতার বই-ই ছিলো তাঁর সবচেয়ে বড়ো সুহৃদ। শিক্ষকতায় তিনি সর্বজনপ্রিয় হতে পারেননি। এ অতৃপ্তি তাঁর মনে অবশ্যই ছিলো। তাঁর কবিতা অন্যান্য অধ্যাপক মহলে উপহাসের খোরাক জুগিয়েছে, দেখেছি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরবর্তী কবিতাগুলোতে 'সুররিয়্যালিস্ট' প্রভাব যতো বেশি প্রকট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠতে লাগলো তত বেশি দুর্বোধ্য হতে লাগলো তাঁর কবিতা। সেই অনুপাতে হতে লাগলো অভিযোগ।

অনেক দিন তিনি জানতে চেয়েছেন, বাস্তবিকই তোমরা কিছু বুঝতে পারো না?

সত্যি কথা বলতে কী অনেক কবিতারই রসোদ্ধার সম্ভব হতো না, কিন্তু পড়তে ভালো লাগতো খুবই। কয়েকটি কবিতা ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি। সে ব্যাখ্যা এবং পরে কবিতাগুলি আবার পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ ছিলো না। আঙ্গিকে এবং উপমায় তাঁর মতো পরীক্ষা অধুনাকালের মধ্যে আর কেউই করেননি। তিনি বলতেন, 'উপমাই কবিত্ব'। একটি কবিতাতে একটা লাইনে ছিলো—আগুন-বাতাস-জল ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, হয়ে হয়ে—ইত্যাদি।

আনাড়ির মতো প্রশ্ন করেছিলাম, এতগুলো 'ব্যবহৃত' কেন লিখেছেন? বুঝিয়ে বললেন, বিষয়টার বহু ব্যবহারের একঘেয়েমিকে প্রকট করবার জন্য। 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে একটি উপমা আছে 'পাখির নীড়ের মতো চোখে'র। আরেকটিতে আছে—কাল রাতের হাওয়ায় আমার মশারি মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো ফুলে উঠে স্বাতি নক্ষত্রের কাছে চলে গিয়েছিলো—প্রভৃতি।—উপমা ও প্রতীক ব্যবহারে তিনি অসাধারণ। মাত্র 'বনলতা সেন' কবিতাটিই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু এগুলোও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের কবিতা। এর আগে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ছিলো 'ঝরাপালক'। সুন্দর সাবলীল ছন্দোবদ্ধ কবিতা। নজরুল ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা মনে পড়িয়ে দেয় সেসব কবিতা।

এর পরেই শুরু করেন গদ্য ছন্দে কবিতা। সে-ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠ হলেন।

আমরা প্রথম বয়সে মনে করছি গদ্য কবিতা লেখা খুবই সহজ। যেমন ভেবেছি কার্টুন ছবি দেখে যে, সে আঁকা সহজ। সেই কারণেই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দেখাদেখি গদ্য কবিতা লেখার হিড়িক পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পরে বুঝলাম, Basic Drawing জানা না থাকলে যেমন কার্টুন দূরের কথা কোনো ছবিই আঁকা চলে না, তেমনি ছন্দে পাকা হাত না হলে গদ্য কবিতা লেখাও সম্ভব নয়। গদ্য কবিতাতেও যে ছন্দে আছে, থাকে—তা নতুন কবিযশঃলিপ্সুরা খেয়ালই করেন না।

ছন্দে পাকা হাত ছিলো বলেই গদ্য কবিতার ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতে পারলেন।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের বই 'বনলতা সেন' এবং পূর্বাশা লিঃ থেকে প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী'। 'মহাপৃথিবী'তে তাঁর পরীক্ষা আরো পরিণত এবং অন্বেষা আরো গভীর। 'পূর্বাশা'র সম্পাদক শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য এই কালে তাঁর সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। এর আগে অবশ্য বুদ্ধদেববাবু 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'নিরুক্ত' কবিতা-পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত লিখতেন। প্রত্যেকটি আধুনিক কাব্যমহল জীবনানন্দকে নতুন পথের দিশারী বলে স্বীকার করে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলো। তাঁর এর পরের বই 'সাতটি তারার তিমির'।

বরিশাল থেকে তিনি চলে গেলেন কলকাতায় দেশভাগের পরেই। বরিশালে আমরা তাঁর অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছিলুম। তিনি আমার বরিশালের বাসায় এসেছেন অনেকদিন। আমাদের ছোটো টিনের ঘরের দোতলায় তাঁকে সাহিত্যের আড্ডাতেও পেয়েছি। একদিন সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড্ডায় অচিন্ত্যকুমারকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন বলে মনে পড়ছে। মনে তাঁর কোনো ঘোর-প্যাঁচ বা সঙ্কীর্ণতা ছিলো না—সহজ সরল সাদাসিদে এবং নিরহঙ্কার ছিলেন তিনি। আরো ছিলেন বিনয়ী।

অনেকবার কলকাতায় এসেছি তাঁর সঙ্গে। একদিনের কথা মনে পড়ে। রেল-পথের দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া, মাদার ও পলাশের গাছগুলি লাল হয়ে ছিলো। মাটির ভাঁড়ে করে চা খেতে খেতে সেইদিকে তাকিয়ে বাংলা কবিতার আলোচনা ভুলে গিয়েছিলুম।

কলকাতায় থাকতেন ১৮৩, ল্যান্সডাউন রোডে। দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকায় কাজ নিলেন কিছুদিন পরে। রবিবারের সাময়িকী সম্পাদনার কাজ। তাঁর আগ্রহে সে-কাগজে কয়েকটি গল্প লিখেছিলুম। আজকের দিনের সবচেয়ে বড়ো গল্পলেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্ভবত 'পদক' গল্পটিও সেই কাগজে প্রকাশিত হয়েছিলো। 'স্বরাজ' বন্ধ হয়ে যাবার পরে একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করেছিলাম তিনি, আমি ও নির্মল চট্টোপাধ্যায় মিলে। কিন্তু 'বিজ্ঞাপন' সংগ্রহে তিনজনই অপটু ছিলাম বলে শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলালো না।

তবু মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে—একসঙ্গে বেড়িয়েছি—গল্প করেছি। কিন্তু দেশভাগের অব্যবহিত পরেই কলকাতার অর্থনৈতিক জীবনে যে আলোড়ন এসে পড়েছিলো—তাতে করে বেশি দিন আর সম্পর্ক রাখা চললো না। ঢাকায় আসার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। গত বছর কলকাতার বন্ধু নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছিলাম তিনি কোথায় অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন। প্রশ্ন করে জেনেছিলাম, আমার খবরাখবরও তিনি নিতেন নির্মলের কাছ থেকে। অতঃপর এই অপঘাত মৃত্যু।

এর মধ্যে তাঁর লেখার সঙ্গে যোগাযোগ হারাইনি। এই সেদিনও 'চতুরঙ্গে' তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতার ওপর আলোচনাটি পড়ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে তাঁর আশ্চর্য গদ্যের কথা। যাঁরা তাঁর গদ্য প্রবন্ধগুলি 'কবিতা', 'পূর্বাশা', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকায়, বার্ষিকী 'বৈশাখী' প্রভৃতিতে পড়েছেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন তাঁর নিজস্ব একটি গদ্যরীতি ছিলো। তা যেমন সুরেলা, তেমনি সুখপাঠ্য। বাংলা গদ্যে ও কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি যে অসাধারণত্বের ছাপ রেখে গেলেন তা তাঁকে অবশ্যই অমর করে রাখবে।

কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে তাঁর খ্যাতি সাহিত্য-মহলের চৌকাঠ পেরিয়ে সাধারণ্যে পৌঁছয়নি। কারণ তিনি ছিলেন স্বল্পবাক, চলতেন ভিড় এড়িয়ে, লিখতেন না ঘন ঘন, সভায় না হতেন সভাপতি, না করতেন বক্তৃতা। সবচেয়ে বড়ো কথা না ছিলেন তথাকথিত ভাবে 'ফ্যাসীবিরোধী' বা 'প্রগতিশীল'। সেই কারণে তাঁরই জীবিতকাল তাঁর চেয়ে বহু বহু গুণে নিকৃষ্ট 'প্রগতিশীল' কবির ঢাক পিটিয়ে আমরা শ্রান্ত হয়ে গেছি—কিন্তু তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেইনি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হয়েও সাধারণ-নন্দিত হননি। না হয়েছেন এ-যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু তার জন্য, তাঁকে আমি জানতুম বলেই বলতে পারি, খেদ করতে দেখিনি কোনোদিন। বরঞ্চ যাঁদের কাছে তিনি শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, তাঁরা মুষ্টিমেয় হলেও, তাঁদের নিয়েই তিনি খুশি থেকেছেন। তিনি নিজেই বলতেন : খ্রিষ্টান পাদরীরা যেমন জনতার হাজার হাজার বর্গমাইলের দিকে তাকিয়ে বাইবেল বিতরণ করেন শ্রেষ্ঠ কাব্য সে-রকম ভাবে বিতরিত হবার জিনিস নয়।—কথাটি অবশ্য তাঁর নিজের কবিতা সম্বন্ধেই তিনি বলেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির জগঝম্প তাঁর কানের কাছে কাছে বাজিয়ে বাজিয়ে তাঁকে এতো বিব্রত করা হয়েছিলো যে সম্প্রতি তাঁর কবিতায় তার ছাপ এসে পড়ছিলো। কিন্তু যতোদূর জানি তা তাঁর কাব্য-ধারাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। সেদিন পশ্চিম বাংলা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে সম্মানিত করেছে—তাঁরো এহেন সম্মানের প্রত্যাশা আমরা করছিলাম। মনে পড়ে বুদ্ধদেববাবু একদা বলেছিলেন যে সাম্প্রতিক কালের কবিযশঃলিপ্সুরা জীবনানন্দের আশ্চর্য রকম অনুকরণ করেন। এতো অনুকারক আর কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে ঘটেনি। কথাটা অতি সত্য। সাম্প্রতিক কালের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দকে অনুকরণের প্রাবল্য খুবই বেশি। সেই কারণে যতো তাঁর দান গ্রহণ করে আমরা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি—ততই তাঁকে আড়ালে রেখেছি—পাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠায় বাধা ঘটে। আর তাঁকে অস্বীকার করেছেন সংস্কারবদ্ধ সমালোচকেরা।

তবু জীবনানন্দ দাশ স্বনামখ্যাত হয়ে রইবেন। তাঁরই কথায় বলি : সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। তিনি তাঁদের একজন। অসাধারণ একজন।*

---

* ১৯৫৫ সালে কোলকাতা থেকে 'ময়ূখ'-এর প্রথম প্রকাশকালে এই নিবন্ধের লেখক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পরবর্তীকালে শামসুদ্দীন আবুল কালাম নাম পরিগ্রহণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশ এবং শব্দের সীমানা

সৈয়দ আলী আহসান

একজন কবির কাছে শব্দ হচ্ছে বিশ্বাসের অনুকূলে জাগ্রত একটি চৈতন্য। শব্দ একজন কবির বিশ্বাসকে প্রকাশ করে, অনুভূতিকে উল্লেখ করে এবং সর্বময় আনন্দকে চৈতন্যের দ্বারপ্রান্তে আনে। শব্দগুলো নানা রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে, যেমন বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম এবং ক্রিয়া। একজন কবি নামবাচক শব্দের সাহায্যে এবং তার গুণগত মান নির্ধারণের মাধ্যমে এবং কর্মকে চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে শব্দের ব্যবহারকে প্রত্যয়িত করেন। একজন কবি যখন বলেন, "রমণী তার উষ্ণ কর্ণাভরণ খুলে রাখলো" তখন বাক্যটির প্রতিটি শব্দ একেকটি নতুন দায়ভাগের পরিচয় বহন করে। কর্ণাভরণের সঙ্গে রমণীর যোগসূত্র আছে। কেননা রমণীরই কর্ণাভরণ থাকে আবার শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে কর্ণাভরণে উষ্ণতা সঞ্চারিত হয়। আবার খুলে রাখার মধ্য দিয়ে একটি বিশ্রামের কথা বোঝা যায়। এভাবেই কবি কীট্‌স 'ইসাবেলা' নামক কবিতায় নায়িকাকে শীতের রাতে তার শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে শয়নের প্রস্তুতির জন্য তৈরি করছেন। কয়েকটি শব্দ এখানে একত্রিত হয়ে একটি কাহিনীর রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করছে। আমরা এখানে কীট্‌সকে বিশেষণ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখতে পাই। সাধারণভাবে একটি অলঙ্কারকে কেউ উষ্ণ বলবে না, কিন্তু কীট্‌স উষ্ণ শব্দটি ব্যবহার করে একটি শরীরী অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে এভাবে শরীরী অনুভূতি শব্দে সমর্পণ করতে একমাত্র কীট্‌সই সম্ভবপর করেছিলেন। সে জন্য কীট্‌সকে বলা হয়ে থাকে যে তিনি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। একটি বিশেষণের সাহায্যে কত বিস্ময়করভাবে তিনি অনুভূতির তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন তা বুঝিয়ে বলা কঠিন। 'নাইটিঙ্গেল পাখির প্রতি' কবিতাটিতে আমরা এ রকম কতকগুলো আশ্চর্য শব্দের ব্যবহার পাই। যেমন 'তন্দ্রাভিভূত আচ্ছন্নতা' ইংরেজিতে শব্দ দুটি হচ্ছে 'drousy' এবং 'numbness'। আচ্ছন্নতাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য তিনি তন্দ্রাভিভূত কথাটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এমন এক আচ্ছন্নতায় তিনি চেতনার দ্বারপ্রান্ত থেকে সরে যাচ্ছেন যে আচ্ছন্নতা তন্দ্রার মতো। মূল বক্তব্যটা হচ্ছে কবি যখন অকস্মাৎ নাইটিঙ্গেল পাখির গান শুনলেন তখন তাঁর মনে হলো যে পাখির সুরেলা কণ্ঠস্বরটি তাঁকে এক প্রকার তন্দ্রাচ্ছন্ন বিভূতির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তিনি এর সঙ্গে আবার কয়েকটি বিশেষ্য ব্যবহার করেছেন যেগুলোর অর্থ ব্যক্তির একটি অসাধারণ নিদর্শন বহন করে। এই ক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে aches এবং অন্যটি হচ্ছে 'pains'। দু'টি শব্দই সমার্থক কিন্তু প্রয়োগের মাধ্যমে একটি রসাবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলছেন, আমার চিত্ত ব্যথাতুর হচ্ছে এবং একটি তন্দ্রাচ্ছন্নতা বেদনায় মূর্ছিত হচ্ছি। বিশ্বসাহিত্যে এ কবিতাটি অসাধারণ কবিতা। বিশেষণ ব্যবহারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিগূঢ়তায় এবং ক্রিয়ার একপ্রকার স্পন্দনে হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ করা হয়েছে। কীট্‌সের শব্দ ব্যবহারের অসাধারণত্ব ইংরেজি কাব্যকে একটি নতুন সৌন্দর্যে বিশ্বস্ত করেছে।

বাংলা কবিতায় আমরা সর্ব প্রথম রবীন্দ্রনাথকে শব্দ-সচেতন দেখি। তবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা ব্যাখ্যাসূত্র আছে, যে জন্য তাঁর উপমা এবং ক্রিয়াগুলো বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। সেখানে একটি বিস্তার পাওয়া যায় এবং কবি এই বিস্তারের মধ্যেই মাধুর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে কিছু বলেন না, অবশ্য শেষের দিকে তাঁর কাব্যে সংক্ষেপীকরণ এসেছে। আজীবন তিনি বিস্তারকে অবলম্বন করে ব্যাখ্যা দিয়ে তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যেমন রমণীর পরিত্যক্ত আবরণকে তিনি বলছেন : "শ্রী অঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ এখনও জড়িত তাহে।" এখানে শরীরের উষ্ণতা আবরণের মধ্যে রয়ে গেছে সেটি বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। কীট্‌স্ এক্ষেত্রে হয়তো একটি উপমা মাত্র ব্যবহার করতেন অথবা ব্রাউনিংও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন পাঠককে সংকটাপন্ন না করতে। রবীন্দ্রনাথ বিশেষণকে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি। তিনি ভেবেছেন পাঠককে কবির বিশ্বাসের আয়ত্বের মধ্যে এনে ফেলাই ভালো। আমরা অনেক পরে এসে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে এই বিস্তারকে একটি সজীব ভঙ্গিতে পাই। যেমন ঝিলম নদীর বাঁকা স্রোত যখন অন্ধকারে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এসেছে তখন সে দৃশ্যকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।" এখানেও দেখতে পাচ্ছি বিশেষণ ব্যবহার করে একটি প্রতিমা নির্মাণ না করে তিনি বিষয়টি বিস্তারিত করে বললেন।

বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশের আবির্ভাবটি শব্দ ব্যবহারের একটি নতুন বিস্ময়কে জন্ম দিয়েছে। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেননি। তিনি চেষ্টা করেছেন কীট্‌স্-এর মতো নানা প্রক্রিয়ায় শব্দের উত্তাপ এবং বিস্ময়কে তুলে ধরতে। একজন কবি যখন কবিতা রচনা করেন তখন তাঁর সামনে একটি বিরাট সমস্যা থাকে। মানুষের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় স্পষ্টতা হচ্ছে তার অনুভূতি। কবিকে চেষ্টা করতে হয় যাতে শব্দগুলো এই অনুভূতিকে তুলে ধরতে পারে। এই অনুভূতি হচ্ছে স্পর্শের অনুভূতি, স্বাদের অনুভূতি এবং দৃষ্টির অনুভূতি। এই সব কটি অনুভূতিকে শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা খুব সহজ নয়। দর্শনের অনুভূতি একটি সহজ এবং স্বাভাবিক অনুভূতি। এটি সকল কবির মধ্যেই থাকে এবং থাকতে হয়। কেননা দৃষ্টির অধিকার না থাকলে কেউ কবিতা লিখতে পারে না। অবশ্য দৃষ্টির সঙ্গে স্মৃতিকেও যুক্ত করতে হয়। কেননা আমরা যা দেখি তা অতীতের সঙ্গে যুক্ত করেই দেখি এবং এই যুক্ত করার মধ্য দিয়েই আমরা দ্রষ্টব্যকে একটি বিশ্বাসের পটভূমিতে স্থাপন করি। এই দর্শনের অনুভূতি আধুনিক বাংলা কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তা একটি পূর্ণতা পেয়েছে। তবে জীবনানন্দ দাশের মধ্যে তা একটি নতুন রূপ নিয়েছে। তিনি দেখা এবং অনুভব করাকে একত্রে যুক্ত করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে তিনি যা দেখছেন তার মধ্যে অতীতের সম্মোহন আছে এবং বর্তমানের গ্রহণযোগ্যতা আছে। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থটি এর একটি চমৎকার নিদর্শন। এই কাব্যগ্রন্থে কবি দর্শন ইন্দ্রিয়কে অত্যন্ত প্রখর, সুস্পষ্ট এবং আবেগে চঞ্চল করেছেন। আমরা অতীতকে অতীত হিসেবে পাইনা, তাকে বর্তমানের সংবেদনের মধ্যে পাই। একজন কবির জীবনে দর্শন-ইন্দ্রিয়টি সবচেয়ে প্রবল ইন্দ্রিয়। তিনি দর্শনের সাহায্যে ঘ্রাণের আভাস পান, স্বাদের আভাস পান এবং স্পর্শের আভাস পান। এভাবে দর্শন হচ্ছে একটি অনন্য চৈতন্যের দ্বার। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কুশলী বর্ণনার মধ্য দিয়ে দর্শনকে একটি সীমাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। বাংলা কাব্যে আমরা জীবনানন্দের মধ্যেই প্রথম দর্শনের কুহক, কুহেলিকা, আনন্দ এবং উৎসবকে একই সঙ্গে পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতায় ক্রিয়া ব্যবহারটি একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বক্তব্যের উপলব্ধি, বিশেষত্ব এবং স্পষ্টতা ক্রিয়ার সাহায্যেই ঘটে থাকে। ফরাসি সাহিত্যে ক্রিয়া নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা ঘটেছে এবং জেমস জয়েস ক্রিয়াকে প্রায় বিলীন করে ফেলেছেন তাঁর রচনায়। কিন্তু ক্রিয়ার স্বতঃসিদ্ধ প্রবাহকে কেউ কখনও বিনষ্ট করতে পারেনি। ইংরেজ কবি কীট্‌স ক্রিয়ার দ্বারা বক্তব্যকে সম্পন্ন করেছেন, সুশীল এবং সুমার্জিত করেছেন। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ ক্রিয়াকে গদ্যের তাৎপর্যে বহমান রেখেছেন এবং দীর্ঘ কবিতায় ক্রিয়াকে এমনভাবে প্রত্যয়ের মধ্যে রেখেছেন যাতে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে 'বিভিন্ন কোরাস' নামক দীর্ঘ কবিতাটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আমি এখানে কবিতার একটি পর্বের কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস,
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে ক'রে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত
হ'য়ে উঠে নদী
দেখা দেয় বিকেল অবধি,
অসংখ্য সূর্যের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়ায়ে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে দ্যাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা।

অন্য একটি উদাহরণ :

মৃত্যুরে বেসেছি ভালো সকলের আগে আমি,—মৃত্যুরে তবুও করে ভয় ;
কখন অনেক পথ ঘুরে এসে ক্লান্ত হ'য়ে তারপর আর একবার
আমার শীতল হাত খুঁজে' তুমি—ভুল ক'রে মরণের কাস্তের ধার
হৃদয়ে তুলিয়া ল'বে ;—জেগে আছি তাই আমি—অন্তরের সকল বিষয়
ছড়ায়ে রেখেছি আজ ;—কখন আসিবে তুমি,—কোথায় পায়ের শব্দ হয়,—
অপেক্ষায় ব'সে আছি ;—যদিও লেগেছে ভালো মৃত্যু আর মৃত্যুর আঁধার !
ঘুমের সময় তবু সব শেষে,—তার আগে পৃথিবীতে জেগে প্রতীক্ষার
অনেক সময় ধরে,—অনেক আড়ষ্ট রাত তার আগে মাঠে পড়ে রয় !

আর একটি উদাহরণ :

তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু,
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি
আজো এই পৃথিবীতে র'য়ে গেছ।
কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখিরো মতন কোনো হৃদয়ের তরে।
পাখি নেই।

উপরের প্রথম উদাহরণটি 'সাতটি তারার তিমির' থেকে, তৃতীয়টিও তাই। দ্বিতীয় উদাহরণটি একটি অপ্রকাশিত কবিতা থেকে। এই কবিতাটি 'বিভাব' বলে একটি স্মরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে জীবনানন্দ দাশ ইংরেজি কবি কীট্‌স-এর মতো ক্রিয়াকে খুবই সুস্পষ্ট, প্রত্যয়িত এবং স্বপ্রকাশ রেখেছেন। তিনি ক্রিয়াকে উহ্য রাখবার চেষ্টা করেননি অথবা সুকৌশলে বিলীন করেননি। ক্রিয়াকেই তিনি নির্মম দায়ভাগে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করেছেন। এক্ষেত্রে ইংরেজ কবি কীটসের সঙ্গে তাঁর অপূর্ব একটি মিল দেখা যায়। কীট্‌স 'এনডিমিয়ন' এবং 'হাইপিরিয়ান' দু'টি দীর্ঘ কবিতায় ক্রিয়ার একটি সচলতা দেখিয়েছেন যা গতানুগতিক মনে হয় কিন্তু অত্যন্ত তীব্রভাবে সরল। কীট্‌সের 'ওড'গুলোতেও আমরা ক্রিয়ার এই সরলতাগুলো প্রত্যক্ষ করি। কবির মূল উদ্দেশ্য ছিল একেক অবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি করানো। আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রকৃতি যেমন সুস্পষ্ট অথবা কোনো ঘটনা যেমন সুস্পষ্ট এবং সে সব ক্ষেত্রে ক্রিয়ার প্রকরণকে অনুভব করা যায় না। কীট্‌সের কবিতাগুলোও সে রকম। নাইটিঙ্গেল পাখির গানটি যখন কবিকে আকুল করলো তখন সেই আকুল অবস্থাকে তিনি নানা পর্যায়ে প্রকাশ করলেন। সে জন্য ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়েছিল এবং সে সমস্ত ক্রিয়া অত্যন্ত সরল এবং তীক্ষ্ণ। হৃদয় ব্যথিত হওয়া অথবা চৈতন্য বিমূঢ় হওয়া অথবা হেমলক পান করা এগুলো বারবার উপস্থিত করে কবি একটি মানসিক অবস্থা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন যা অন্য উপায়ে সম্ভব ছিল না। জীবনানন্দ দাশের কবিতার তিনটি উদ্ধৃতি দিব। তাঁর ক্রিয়া ব্যবহারের একই ধরনের পদ্ধতি লক্ষ্য করি। প্রথম উদাহরণে ঘাসের উপর দিয়ে বাতাসের ভেসে যাওয়া কথাটা এসেছে, নদীর নাম মনে করার কথা এসেছে, চতুর্দিক সুস্পষ্ট হওয়ার কথা এসেছে। সূর্যের চোখে আনন্দ গড়িয়ে পড়ার কথা এসেছে এবং মানুষের দুঃখ প্রকাশিত হওয়ার কথা এসেছে। এগুলো এত সরল অথচ প্রত্যয়সম্ভূত যে এগুলোকে এড়ানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয় উদাহরণেও তেমনি ক্রিয়াগুলো অতি সরল এবং সুস্পষ্ট বিশ্বাসকে প্রমাণ করেছে। কবি কোনো মুহূর্তের জন্য তাঁর ইচ্ছাকে জটিল কোনো আবর্তে জড়াতে চাননি। বাতাস যেমন সতত প্রবাহিত হয় এবং পাতা নিশ্চিন্তে ঝরে পড়ে, জীবনানন্দ দাশের বক্তব্যটিও ক্রিয়ার স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে আমাদের একটি বিশ্বাসের বলয়ে নিয়ে আসে। এখানে আরেকটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি। এটা 'বিভাব' স্মরণ সংখ্যা থেকে :

সন্ধ্যার প্রথম তারা চিনিয়াছে তারে,—
পশ্চিমের সমুদ্রের পারে
সেই এক দেশ আছে ;

যখন দিনের শেষ আলো এসে পড়ে
এক সমুদ্রের বুকে,—তারপর,—আর এক সাগরে
পশ্চিমের আকাশের তলে
যখন একটি তারা—প্রথম এসেছে তার স্থলে ;
সেই এক দেশ ওঠে জেগে
সকল মেঘের শেষে পশ্চিমের মেঘে !

এখানেও ক্রিয়ার ব্যবহারগুলো নিশ্চিন্ত বরাভয়ের মতো আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সমসাময়িক কবি বিষ্ণু দে'র একেবারে বিপরীত। উভয়েই ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, কিন্তু জীবনানন্দ দাশ যেখানে ইংরেজি সাহিত্যের গতিধারার প্রতি বিশ্বাসী, বিষ্ণু দে সেখানে বিশ শতকের কাব্যরীতির বিপর্যয় নিয়ে অভিভূত। জীবনানন্দ দাশের সমসাময়িক আর একজন কবি অমিয় চক্রবর্তী—তিনিও পাশ্চাত্য শব্দের ভাংচুরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা কবিতায় গ্রহণযোগ্য করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ আধুনিক ইংরেজি কাব্যে বিচিত্র ভাংচুর সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু কখনই তিনি বাংলা কবিতায় তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করেননি। জীবনানন্দ দাশের একটি অতি পরিচিত কবিতা পরীক্ষা করে দেখা যাক। কবিতাটির নাম 'আট বছর আগের একদিন'। আমি কবিতার প্রথম দিক থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। উদ্ধৃতিটি সবারই জানা, তবুও বিষয়গত পরীক্ষার জন্য উপস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে :

শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'ল তার সাধ।

বধূ শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

এই কবিতাটিতে আধুনিক কালের অবক্ষয়, বিমর্ষতা, দৈন্যদশা এবং বিপর্যয়ের চিহ্ন আছে। এখানে কবি ইচ্ছা করলে টি. এস. এলিয়টের কাব্যভঙ্গী অবলম্বন করতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে 'প্রুফরক' অথবা 'দি হলোম্যান'-এর ভঙ্গী নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে ক্রিয়াগুলোকে তীক্ষ্ণ শরের মতো ব্যবহার করেছেন। একটি ভয়ঙ্কর বিপর্যস্ত মলিন অবস্থার মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করাবার জন্য এই ভঙ্গীটি প্রয়োজন ছিল। একের পর এক সহজবোধ্য ক্রিয়ার তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করে তিনি আমাদের সচকিত করেছেন।

জীবনানন্দ দাশ ক্রিয়ার সফল প্রয়োগ এবং তা বিকীরণের মধ্য দিয়ে মানুষের অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ শব্দে তুলে ধরেছেন। কবি যখন বলেন, "গভীর ঘন পাতার মধ্য থেকে সকাল বেলার মধুভরা ফল তিনি কুড়িয়ে নিয়ে ঝুড়িতে ভরছেন", অথবা যখন বলেন, "সকাল বেলার আলোকে মনে হয় যখন সবুজ ঘন পাতার মধ্যে পাকা হলুদ ফল", অথবা যখন বলেন, "যেখানে অনেক ঘাস ছিল এবং যে ঘাসের মধ্যে রাতের বেলা চাঁদের প্রতিধ্বনি হারিয়ে যাচ্ছে সেই ঘাসের মধ্যে সে হেঁটে চলেছে", অথবা যখন বলেন, "রাতের শিশির যখন পড়ে তখন আমি পালিয়ে যাই এবং পালিয়ে যাবার পথে শিশির বিন্দুগুলোকে কালো মৌমাছির মত চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে যাই",—তখন আমরা অনুভব করি যে, কবি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ক্রিয়ার বিকিরণের সাহায্যে স্পর্শের নিগূঢ়তম চৈতন্যকে শব্দে তুলে ধরবার জন্য। আমি এ উপমা কটি Edith Sitwell-এর কবিতা থেকে নিয়েছি। এই উদাহরণের সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের শব্দ ব্যবহারের মিল আছে। আমি নিম্নে জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করছি :

১. পাখির মতন কেঁপে—ডানা মেলে—হিমচোখ বুজে
অধীর পাতার মত পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে উড়ে ঘর ছেড়ে কতো দিকে গিয়েছে যে ভেসে,—
নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ বুজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমাতে চেয়েছে,—তবু—ব্যথা পেয়ে গেজে ফেঁসে,—
তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁট উঠেছিল হেসে!

(অনেক আকাশ)

২. ফেনার মতন তারা ঠাণ্ডা—শাদা,—
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে জড়ায়ে যায় সাগরের জলে!
ঢেউয়ের মতন তারা চলে!
সেই জল—মেঘেদের স্তন
ঠাণ্ডা,—শাদা,—বরফের কচির মতন!
তাহাদের শরীর পিছল!
কাঁচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!

(পরস্পর)

৩. আমার হৃদয়—এক পুরুষ হরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা পিছে ফেলে রেখে
তোমাকে কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোন এক বসন্তের রাতে?

(ক্যাম্পে)

৪. আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
বসে থাকি; কামরাঙা লাল মেঘ যেন মৃত মণিয়ার মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে—আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে;
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে;
পৃথিবীর কোন পথ এ কন্যারে দেখেনিকো—দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,
জানি নাই এত স্নিগ্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে
পৃথিবীর কোন পথে: নরম ধানের গন্ধ-কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল ধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখান,
কিশোরের পায়ে-দলা মুথা ঘাস,—লাল-লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরি মাঝে বাংলার প্রাণ:
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের

(আকাশে সাতটি তারা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাবো পৃথিবীর থেকে ;
রূপ ছেনে তখনো হৃদয়ে কোনো আসে নাই ক্লান্তি—অবসাদ,
তখনো সবুজ এই পৃথিবীরে ভালো লাগে—ভালো লাগে চাঁদ
এই সূর্য নক্ষত্রেরা ডালপালা ;—তখনো তোমারে কাছে ডেকে
মনে হয় যেন শান্ত মালয়ের সমুদ্রের পেল পাখি—দেখে
জ্যোৎস্নায় মালয়ালী—নারিকেলফুল সোনা সৌন্দর্য অবাধ
নরম একাকী হাত—জলে ভেজা মসৃণ ;—এই রং সাধ
কৃমি হয়—কাদা হয়—তবু, আহা ; চলে যাবো তাই মুখ ঢেকে
তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাবো পৃথিবীর থেকে।

(পৃথিবীতে থেকে। তোমার সৌন্দর্য চোখে)

উপরের উদাহরণগুলো জীবনানন্দ দাশের ক্রিয়ার সহজ অথচ সুচতুর ব্যবহারের প্রমাণ বহন করে। তিনি ক্রিয়ার সচলতা, বিকীরণ এবং সুস্পষ্টতা এমন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন যে কোমল স্পর্শের আনন্দ এবং শান্তির অনুভূতি অন্তরঙ্গ মমতার সুরে ফুটে উঠেছে। একটি উদাহরণে একটি শীতল স্পর্শের কথা আছে যে স্পর্শ বরফের মতো এবং পিচ্ছিল। অপর একটি উদাহরণে একটি বিস্ময়ের পরিচয় আছে। বসন্তের রাত্রে একটি পুরুষ হরিণের চঞ্চলতার সাথে কবি তার হৃদয়ের তুলনা করেছেন। জীবনানন্দ দাশ ক্রিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে স্পর্শের একটি বিশিষ্ট উপলব্ধিকে তাঁর কবিতায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সে উপলব্ধি হচ্ছে একটি শান্ত এবং মমতার স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শের উপলব্ধি। এই উপলব্ধিকে স্বাক্ষরিত করতে গিয়ে তাকে বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ দীঘি, ঘন বনের অন্তরাল, পুরনো ঘাট যেখানে শেওলা জমেছে এবং গৃহকর্মে নিযুক্ত মাতা এবং ভগিনীর কথা বারবার উচ্চারণ করতে হয়েছে। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তিনি এভাবে যে মমতার রাজ্য নির্মাণ করেছেন সেখানে আজ পর্যন্ত একচ্ছত্র অধিকার তাঁরই। জীবনানন্দের উপাদান সীমাবদ্ধ সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সীমাবদ্ধ উপাদানের উপর আপন পূর্ণ অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তার কবিতার সমস্ত শব্দ, ধ্বনি, উপমা এবং অর্থের সৌষম্যে একটি মাত্র চিত্ররূপ নির্মাণ করেছে যে চিত্ররূপ তা হচ্ছে মমতার, এবং শান্তির আশ্রয়ের। উপাদান এবং শব্দের সীমাবদ্ধতা জীবনানন্দ দাশের চিন্তাকে বিচিত্রমুখী করতে দেয়নি, কিন্তু না হলেও একটিমাত্র তাৎপর্যের ক্ষেত্রে শব্দ তিনি তার শব্দকে অর্থবহতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দিয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশ আধুনিক ইংরেজি কবিতা গভীর এবং অন্তরঙ্গভাবে পড়েছেন। বিভিন্ন শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়। তিনি তার বিভিন্ন শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আধুনিক ইংরেজি কাব্যের উপকরণের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেন। তাঁর কাব্যচেতনা চিত্রধর্মী এবং সেই চিত্র গ্রামের পুরনো উদ্ভিদ-রাজ্যের, সরু নিস্তরঙ্গ নদীর, সন্ধ্যার অন্ধকারের—যে অন্ধকারে কাক এবং কোকিলের গায়ের রং মিশে গেছে। জীবনানন্দ দাশের পরিচিত্রিত বাংলার গ্রাম একটি নির্জন আশ্রয়ের মতো। এই নির্জন আশ্রয়ে কর্মরত মানুষের কোলাহল নেই, শুধু মধ্যযুগের কাব্যগত স্মৃতির উদ্‌ঘাটন আছে। নিস্তরঙ্গ পুকুরের পাড়ে সন্ধ্যা যে নির্জনতার সৃষ্টি করে, মধ্যযুগের কাব্যের নায়ক-নায়িকারাও নিস্তব্ধ পদক্ষেপে তার কবিতায় ছায়ার মতো দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়ায়। জীবনানন্দ দাশের এই স্বভাবটি পুরোপুরি চিত্রকরের।

শব্দের সীমানা কথাটার অর্থ হচ্ছে ব্যবহৃত শব্দের অর্থের ব্যাপকতা, বিস্তার এবং বিস্ময়কর তাৎপর্য। একজন কবির কাছে তার শব্দ শুধু অভিধানগত অর্থ নিয়ে বিদ্যমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে না। তিনি তাকে বিস্তৃত করেন এবং নতুন মহিমা দান করেন। কবি কীট্‌স যখন বলেন 'Shady Sadness' অর্থাৎ 'ছায়াচ্ছন্ন বেদনা তখন আমরা বেদনাকে একটি নতুন রূপে পাই। তিনি অনেক বেদনা বা গভীর বেদনা না বলে ছায়াচ্ছন্ন বেদনা বলেছেন। পর্বতের সানুদেশে পর্বতের ছায়া এসে যখন পড়ে তখন উপত্যকাকে যেমন ক্লান্ত, বিমর্ষ মনে হয় তেমনি 'ছায়াচ্ছন্ন বেদনা' কথাটির অর্থ হচ্ছে এক ধরনের বিমর্ষতা বা ক্লান্তি। কীট্‌সের শব্দ ব্যবহারের এই চাতুর্যটি জীবনানন্দ দাশ পেয়েছিলেন। তিনি বিভিন্নভাবে শব্দকে পরিচিত করেছেন। একটি তরল মূর্ছাহত সময়ের অঘটনকে তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছেন। জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা 'হায় চিল' পাঠ করে দেখা যেতে পারে :

হায় চিল, সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে !
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে !
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালবাসে !
হায় চিল, সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

এ ক্ষুদ্র কবিতাটিতে শব্দগুলো তাদের অর্থের সীমারেখা ভেঙ্গে শূন্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং কবি একটি চিলের পরিচয়, তার বর্ণাঢ্যতা, পক্ষবিস্তার এবং সময়ের দিগবলয়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার চিত্র উপস্থিত করেছেন। আরেকটি কবিতা হচ্ছে 'ঘাস'। কবিতাটিতে তিনি সকাল বেলার আলোকে কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলো বলে চিহ্নিত করেছেন। এ বর্ণনাটি অতুলনীয়। আমরা ঘাসের রং শীতের ভোরে উঠে ব্যাখ্যা করতে পারিনা। একটি মৃদু সবুজ আভা ঘাসের সবুজ কচি পাতা ছুঁয়ে থাকে যে 'সবুজ ঘাস' বললে বোঝানো যায় না। জীবনানন্দ দাশ তার অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে কচি লেবুপাতার সবুজের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। বাংলাদেশের প্রকৃতিকে তাঁর মতো নিগূঢ় করে আর কেউ দেখেছেন কিনা সন্দেহ। এর পাশাপাশি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শব্দ ব্যবহার চপেটাঘাতের মতো মনে হয়। শব্দের কৌমার্য অপহরণ করে তিনি তাকে একটি নিষ্ঠুর কঠোরতার মধ্যে উপস্থিত করেছেন। জীবনানন্দ দাশ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি গভীর মমতার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকৃতিকে আমাদের মানস-চৈতন্যের সঙ্গে ওতপ্রোত করেছেন। 'জীবন' বলে তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা আছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থে। কবিতাটি থেকে সাতাশ নম্বর স্তবক উদ্ধৃত করছি :

জীবন,—আমার চোখে মুখ তুমি দেখেছ তোমার,—
একটি পাতার মতো অন্ধকারে পাতা—ঝরা গাছে ;—
একটি বোঁটার মতো যে-ফুল ঝরিয়া গেছে তার ;—
একাকী তারার মতো, সব তারা আকাশের কাছে
যখন মুছিয়া গেছে,—পৃথিবীতে আলো আসিয়াছে ;—
যে ভালোবেসেছে, তার হৃদয়ের ব্যথার মতন ;—
কাল যাহা থাকিবে না,—আজই যাহা স্মৃতি হয়ে আছে ;—
দিন-রাত্রি—আমাদের পৃথিবীর জীবন তেমন !
সন্ধ্যার মেঘের মতো মুহূর্তের রং লয়ে মুহূর্তে নতুন !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরের স্তবকটি যেন সমগ্র কবিতাটার অন্তঃসার। জীবন কি, জীবনের তাৎপর্য কোথায়, কোন অন্তর্নিহিত সত্য নিয়ে জীবনের বিকাশ ঘটে—এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন, কিন্তু জীবনানন্দ দাশ শব্দের অর্থের সীমানা ভেঙে একটি অলৌকিকের সীমানায় এসে জীবনের অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। অন্য একটি কবিতায় আবার নতুন করে জীবনের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কবিতাটর নাম 'প্রেম'। এটাও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র একটি কবিতা। এর অষ্টম স্তবকে কবি বলছেন : মৃত্যু যদি জীবনেরে রেখে যায় তবে সেই জীবনকে প্রজ্জ্বলিত করে তার আলো চোখের তারার সামনে তুমি উপস্থিত করবে। স্তবকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

জীবনের মুখ চেয়ে সেইদিনো রবে জেগে,—জানি !
জীবনের বুকে এসে মৃত্যু যদি উড়ায় উড়ানি,—
ঘুমন্ত ফুলের মতো নিরন্ত বাতির মতো ঢেলে
মৃত্যু যদি জীবনেরে রেখে যায়,—তুমি তারে জ্বেলে
চোখের তারার 'পরে তুলে লবে সেই আলোখানি !
সময় ভাসিয়া যাবে,—দেবতা মরিবে অবহেলে,—
তবুও দিনের মেঘ আঁধার রাত্রির মেঘ ছানি
চুমো খাবে !— মানুষের সব ক্ষুধা আর শক্তি লয়ে
পূর্বের সমুদ্র ওই পশ্চিম সাগরে যাবে বয়ে !

গ্রামীণ প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য, আলোর বিকিরণ, কোমলতা এ সব কিছুকে জীবনাননদ দাশ গভীরভাবে ধারণ করে মানুষের চিত্তের সম্পদ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই তাঁর কবিতায় শব্দ নতুন তাৎপর্য পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সময়ভাবনার বিচার

আহমদ রফিক

সময় নিজে একটি মাত্রা হলেও একাধিক মাত্রায় তার বিচরণ, এমন কি সেখানে আত্মিক সম্পর্কের প্রকাশ। স্থান-কালের সম্পর্ক নিয়ে বিজ্ঞানীর যেমন আগ্রহ ও হিসাব-নিকাশ তেমনি কৌতূহল কবি-দার্শনিকেরও। তবে যার যার পথে নিজ নিজ অনুধাবনায়। বস্তু-জগতের সৃষ্টি নিয়েও একই কথা। সময়ের আদি, অন্ত ও স্বরূপ নিয়ে বিজ্ঞানীর মতো কবির মনেও প্রশ্ন রয়েছে, রয়েছে প্রশ্নের জবাব পাওয়ার চেষ্টা, তবে বিজ্ঞানী থেকে ভিন্ন পথে ভিন্ন সমীকরণে—বস্তু ও সময়ের শক্ত সমীকরণের আঙ্কিক পথে নয়, বলাইবাহুল্য।

সময় নিয়ে, সময়ের নানা মাত্রিকতা নিয়ে কবির ভাবনা বাংলা সাহিত্যেও নতুন কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল বিজ্ঞান চেতনা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। সময় ও বস্তুবিশ্ব, প্রাকৃত বিশ্ব নিয়ে জীবনানন্দ দাশের অনুধাবন তাঁর কবিতায় পরিণত পর্যায়ে এতটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে তা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য সেই সঙ্গে সময়কে ঘিরে কবির ইতিহাস-চেতনাও বাঙ্ময় হয়ে ওঠেছে 'ইতিহাসের গ্রন্থি সূত্র' রচনার তাগিদে। তাঁর এ ইতিহাস-চেতনা যেমন সৃষ্টির মূল বিন্দু নিয়ে তেমনি মানব সমাজ নিয়েও।

বস্তুজগৎ ও জীবজগৎ নিয়ে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বিচার এত দ্রুত পালটাতে শুরু করেছে যে কিছু মৌলিক বিষয়ের সর্বশেষ ধারণা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে বিজ্ঞানের সত্য জানা কঠিন হয়ে ওঠে, অর্থাৎ সে জানা সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞানের চোখে সত্য আপেক্ষিক বিধায় (প্রসঙ্গত সত্যের মানবিক রূপ, আপেক্ষিক রূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন সংলাপ স্মর্তব্য) কদিন আগেকার সত্য প্রায়শ পরবর্তী জ্ঞানের আলোয় বাতিল হয়ে যায়, সেখানে নতুন সত্য, বলা যেতে পারে সত্যের নয়ারূপ দেখা দেয়।

সময়কে একদা পরম ('অ্যাবসলিউট') বলে বিবেচনা করা হতো, বিশেষ করে দার্শনিকের দৃষ্টিতে। কিন্তু আপেক্ষিকতার বিচারে সময়ের ধারণায় পরিবর্তন ঘটেছে। সময় হয়ে উঠেছে এক আপেক্ষিক অস্তিত্ব যা আরো অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল। স্থান-কালের সম্পর্ক নিয়ে পূর্ব-ধারণায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটার ফলে দেখা যাচ্ছে, সময় প্রকৃতপক্ষে স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নয়। স্থান-কালের সমন্বিত অস্তিত্বই এখন বিজ্ঞানের সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিক বস্তুর 'ত্রিমাত্রা' যে তার অবস্থান নির্দেশ ও অনুধাবনের জন্যে যথেষ্ট নয় তেমন সন্দেহ এখন বিজ্ঞানীদের মনে দৃঢ়ভিত্তি পেয়ে যাচ্ছে। প্রচলিত তিন মাত্রার ধারণা এখন সময়কে নিয়ে চার মাত্রায় পৌঁছে যেতে চাইছে। এমন কি নব্যবিজ্ঞানী বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যত বিজ্ঞানীদের হাত ধরে এদিক থেকে আরো এক মাত্রার সংযোজন ঘটে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

বস্তুজগতের সঙ্গে সময়ের সংশ্লিষ্টতা তাই বিজ্ঞান–সত্যের ভিত্তিতে যেন এক অনিবার্য বিষয়, বলা যায় এদের পরস্পরনির্ভরতা তথা পারস্পরিকতা। তাই স্থান–কালের ধারণা বাদ দিয়ে বিশ্বভুবনে কোনো ঘটনার কথা ভাবা যায় না। এমন কি ধরে রাখা যায় না সম্পর্কে সনাতন ধারণা যে বিশ্ব অপরিবর্তনীয় এবং স্থির নিয়মে ধৃত তার অস্তিত্ব, বরং প্রচলিত ধারণা থেকে সরে এসে ভাবতে হয় যে মহাবিশ্ব শুধু গতিশীলই নয়, ক্রম–প্রসারণশীলও তার অস্তিত্ব, এর শুরু সম্ভবত সময়ের নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে।

এমন ধারণার পেছনেই সমর্থন বেশি যে অন্তহীনতা থেকে নয় স্থান কালের সুনির্দিষ্টতা থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভব। কিন্তু বস্তুর সূক্ষ্মতম পর্যায়ে বস্তুকণার আচরণ বা বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে গিয়ে দেখা যায় এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তার রাজত্বে যা মহাবিশ্বভুবন সম্পর্কেও সত্য, এবং এক অপরিহার্য মৌল বৈশিষ্ট্য হিসেবেই সত্য। এ অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই সব কিছুর স্থিতি। সেক্ষেত্রে এমন ধারণা কবি বা দার্শনিকের মনে জাগতেই পারে যে মানুষের জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সময়–মুহূর্তগুলো অনিশ্চয়তার ওপরই নির্ভরশীল। অনিশ্চয়তাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। তাহলে বিশ্বপ্রকৃতি যে স্থির নিয়মের রাজত্বে সে বিশ্বাস ধরে রাখা সত্যই কঠিন হয়ে পড়ে।

কোয়ান্টামতত্ত্বের আলোয় এ অনিশ্চয়তা সূত্রকে টেনে এনে বিজ্ঞানীদের পক্ষে একটি বিষয় স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব হয়েছে যে আপাত–অবিশ্বাস, অনিশ্চয়তার মধ্যেও বস্তুকণার অবস্থান ও গতি পরস্পর–বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এদের রয়েছে এক সমন্বিত চরিত্রের অস্তিত্ব। বস্তুর নানারূপ থেকে স্থান কালের নানা প্রতিভাসে সর্বত্রই বিজ্ঞানীর চোখে ধরা পড়ছে সময়ের মধ্য দিয়ে সমগ্রতার অস্তিত্ব। স্বভাবতই বিজ্ঞানীর লক্ষ্য হয়ে উঠেছে সেই সমগ্রতার ভিত্তি অনুসন্ধান এবং তার রহস্য ভেদ।

বস্তুজগতে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের নিঃসঙ্গ এককতার পরিবর্তে সমগ্রতার অস্তিত্ব সন্ধানের পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানের বিচারে এর স্বরূপ উন্মোচন। বিজ্ঞানী বা দার্শনিক বা কবির উপলব্ধিতে এই সমগ্রতা সৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে বিবেচ্য। যেমন মানবভুবনে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় ব্যক্তি বা ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির প্রকাশ যা নানা বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন জৈবধর্মের বিচারে তেমনি সমাজতত্ত্বের হিসাবে। যেমন মানবিক চেতনার ভুবনে তেমনি বিজ্ঞানীর মহাবিশ্বের তাত্ত্বিক ভুবনে।

কোয়ান্টামতত্ত্বের মূল ধারণায় তাই বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের স্থলে সমষ্টি বা 'প্যাকেট' (কোয়ান্টাম) যেমন আলোর আচরণের ক্ষেত্রে 'একক' হিসেবে সত্য তেমনি এই সত্য সাধারণ বস্তুকণা সম্পর্কেও ভিন্ন নয়। আর অনিশ্চয়তা সূত্রের ভিত্তিতে যদি এমন কথা ভাবতে হয় যে বস্তুকণা ক্ষেত্রবিশেষে তরঙ্গের মতো আচরণ করে, এবং তা তরঙ্গকণার মতোই, তাহলে সমন্বয়ের সত্য, সমগ্রতার ভিতটাই সত্য হয়ে ওঠে। দ্বৈতচেতনার মধ্যেও দেখা যায় সব কণাই এক অর্থে তরঙ্গ। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের আলোক–তরঙ্গ তখন বিশেষ অর্থে কণাসমষ্টি বা কণাতরঙ্গ হয়ে ওঠে।

দুই

মানব সমাজে জীবনযাত্রার বাস্তবতায় যেমন সঙ্গীর উপস্থিতি প্রায়শ অপরিহার্য, বস্তুজগতে তেমনি প্রতিটি কণার প্রায়শ রয়েছে সঙ্গী, এবং তা বিপরীত চরিত্রের প্রতিরূপ নিয়ে (মানব–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবীর বিপরীত লিঙ্গের জোটবন্ধনের মতোই)। কোনো সময়ে সেই কণা-প্রতিকণার সংঘাতে বস্তুকণার ধ্বংস বা লয় ঘটে যেতে পারে যেমন ঘটে মানব-মানবীর বৈপরীত্যবোধের সংঘাতে বিচ্ছেদ এবং প্রেমের অবসান বা লয়। তবে সব সময়ে নয়, সব ক্ষেত্রে নয়। আবার নতুন সৃষ্টিও সেক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তা না হলে আলো-আঁধারের বৈপরীত্য পেরিয়ে নতুন দেখা দেবার কথা নয়।

এমন এক সূত্রের দুশ্চিন্তায় সর্বাধুনিক চেতনার বিজ্ঞানী একথা ভাবতেই পারেন যে বস্তুকণা দিয়ে যদি ব্যক্তি মানুষ সৃষ্টি সম্ভব হয় তাহলে প্রতিকণার সাহায্যে প্রতিমানব তৈরিও অসম্ভব কিছু নয়। এবং সেই সূত্রের ধারাবাহিকতায় একদিন আকস্মিক প্রতি-পৃথিবী সৃষ্টিও অস্বাভাবিক নয়। আপাতত এমন সম্ভাবনা বিজ্ঞান-ফ্যান্টাসি মনে হলেও ভবিষ্যত সময় হয়তো ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটাতে পারে। তবে কেমন হবে সে পৃথিবীর রূপ সে ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য বর্তমান বিজ্ঞানী করেননি। এসব সম্ভাবনা বা ভাবনা থেকে একটি সত্য ঠিকই বেরিয়ে আসছে যে আপাত-বিজোড় অস্তিত্ব আসলে জোড়েরই অন্য এক তাত্ত্বিক রূপ যার বাস্তবতা একেবারে কুহক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এখানেও কিন্তু পূর্বকথিত সমন্বয়ের ধারণা, সমগ্রতার তত্ত্বই সামনে এসে দাঁড়ায়।

বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানের নানামুখী অন্বেষায় এই সমন্বয়ের রূপই যেন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন শক্তির নানা রূপে বা বস্তু থেকে শক্তি ও শক্তি থেকে বস্তুর রূপান্তরে তেমনি কণা ও তরঙ্গের রূপ প্রতিরূপে। সব কিছু মিলিয়ে এক মহাসমন্বয়ের ধারণা বিজ্ঞানীর মনে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে যখন তার চোখের সামনে ঘটে চলেছে শক্তির হ্রাস থেকে হালকা কণা বা প্রতিকণার উদ্ভব, যখন দেখা যাচ্ছে ভাঙ্গনের ফলে তৈরি ভগ্নাংশ কণিকা এবং প্রতি-ইলেক্ট্রনের মধ্যে কোনো প্রকার ভিন্নতা উপস্থিত নেই। এমন সব উদ্ভটত্বই সত্য হয়ে উঠছে বিজ্ঞানের বস্তুজাগতিক ক্ষেত্রে।

এ ভাবেই রূপ-প্রতিরূপের (যা কবির লেখাতেও ধরা দেয়) মধ্য দিয়ে, শক্তির সমতা বিধানের মধ্য দিয়ে, অনিশ্চয়তা ও বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর বস্তুজগতের সম্ভাবনা তৈরি হয় তার শুরু বা শেষ থাকে না, স্রষ্টার ধারণাও তখন অর্থহীন হয়ে ওঠে। অবশ্য প্রতিবস্তু থেকে প্রতিরূপী জীবনের অভিব্যক্তিও সম্ভব হতে পারে যদি কখনো বস্তুকণার গতি বিপরীত দিকে, পেছনদিকে তাড়িত করা সম্ভব হয়। সময়ের দিকনিশানাও তখন পিছনদিকে চলবে। কিন্তু এখনো তেমন সম্ভাবনার আভাস মেলেনি গ্রহান্তরে জীবনের কোনো ভিন্নতর প্রকাশে।

বিজ্ঞানী স্টিফেন হাউজ কথিত সময়ের যাত্রা ('সময়ের তার') একমুখী নিশানাই নিশ্চিত করে চলেছে। অতীত থেকে ভবিষ্যতকে বিচ্ছিন্ন করে সময়ের অগ্রসর যাত্রাই নিশ্চিত করছে। ঘটনার সময়-নির্ভর পরিবর্তন তথা বিশৃংখলার ক্রমবর্ধমান রূপ ('এনট্রোপি')-ই প্রকৃতপক্ষে ঐ 'সময়ের তীর' ('অ্যারো অব টাইম') যে ভুত-ভবিষ্যতকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে দেয়। বিশৃংখলা শব্দটি এক্ষেত্রে ভিন্ন রকম শোনালেও এটা আসলে সময়ান্তরেরই কথা, সময়ের পরিবর্তন অর্থাৎ এক সময় থেকে অন্য সময়ে যাওয়ারই কথা।

এখানে বিজ্ঞানী কবি-চেতনার সাহায্য নেন তুলনা টানতে গিয়ে। তার হিসাবে গাছে ফুটে থাকা গোলাপ যেমন সৌন্দর্যের প্রতীক তেমনি এক সুশৃঙ্খল অবস্থারও প্রতীক। কিন্তু ফুলের ঝরে যাওয়ার অবস্থান্তর কবির চোখে হয়তো ট্রাজিক কিন্তু বিজ্ঞানীর চোখে সময়ের হিসাবমাফিক এক বিশৃঙ্খলা অবস্থা এক মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে যাত্রা। সে যাত্রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনের দিকে, আপাতত পেছন দিকে নয়। কারণ ঝরে-যাওয়া ফুলটাকে ইচ্ছা করলেই তার আগের অবস্থানে অর্থাৎ অতীতে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাকে পূর্ব-অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে না।

সময় এভাবেই বাস্তব জগতের পরিপ্রেক্ষিতে অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিক-নিশানা ঠিক করে এগিয়ে চলে। যেমন জলস্রোত তার তরঙ্গের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলে, পেছন ফিরে তাকায় না (রবীন্দ্রনাথের 'চঞ্চলা' নদীর মতো)। 'সময়ের তীর' সময়ের দিক নির্দেশক। অর্থাৎ থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্রের কথাই যেন। 'ঘটনা সময়ের হাত ধরে বিশৃঙ্খলা তথা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একদিকে তার গতিনির্দেশ করে, যেমন জীবন সময়ের নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে মৃত্যুর মুহূর্তে পৌঁছে যায়, তারপর অন্তহীন সময়ের অন্ধকারে (এদিকটা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রবলভাবে এসেছে)।

সময়ের এ পরিবর্তন মানুষের বোধে ধরা পড়ে তার মস্তিষ্ককোষের ক্রিয়ায় ঘটে-যাওয়া সময় অর্থাৎ অতীতকে স্মৃতিরূপে ধরে রাখার মধ্য দিয়ে। এ ধারণ অঘটিত ভবিষ্যত সময়ের নয়। সময়ের তাত্ত্বিক বিষয়ও যদি মানব-চেতনায় প্রতিফলিত হতে পারে তাহলে অন্যান্য প্রাকৃত ঘটনাও মানবমস্তিষ্কে ধরা দিতে পারে, চেতনে বা অবচেতনে যেখানেই হোক। বস্তুজগতের প্রসারণও যদি ঐ সময়ান্তরের দিকেই হয়ে থাকে তাহলে বস্তুর অবশেষ রূপ, তার আদি-অন্তের বিষয়ও মানব-চৈতন্যে ধরা দিতে পারে। তাহলে এমন ধারণা কি ঠিক হবে যে সময় যেমন একদিকে চলে বস্তুও তেমনি প্রসারণের দিকে চলবে, পেছন ফিরে সংকোচনের দিকে যেতে চাইবে না যে অবস্থায় বিশ্বভুবনের লয়। অর্থাৎ লয় নয়, স্থিতিই কি তাহলে সত্য? এনিয়ে মতভেদ বিস্তর।

ভবিষ্যতে এই দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া সম্ভব হতে পারে যে এই বিশ্বের জন্ম কেন, কোন প্রয়োজনের টানে? কোনো উদ্দেশ্য কি এর পেছনে রয়েছে? এমন প্রশ্ন আজকের নয়, সেই মধ্যযুগের ইরানি কবি-বিজ্ঞানী ওমর খৈয়ামেরও। কেন আসা, কোথায় যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে। এসব গূঢ় প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রয়োজন তত্ত্বেরও সমগ্রতা। একটি পূর্ণ সমন্বিত তত্ত্বই পারে বিশ্বলোক ও মানবলোক বিষয়ক সকল যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য জবাব পরিবেশন করতে। ঘুরেফিরে সেই সমগ্রতারই ধারণা বা তত্ত্ব। বিজ্ঞানীদের চেষ্টা এখন সেদিকে। কিন্তু একথাও সত্য যে এ মুহূর্তে তেমন সম্ভাবনা বিজ্ঞানীদের হাত থেকে দূরেই রয়ে গেছে। এখনও তা ভাসমান তত্ত্বের মতোই।

তিন.

কবিতার সঙ্গে সময়ের এবং সেইসঙ্গে সৃষ্টি বিষয়ক প্রশ্নাদির তাত্ত্বিকতার বয়ান আপাতবিচারে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু কবি জীবনানন্দ দাশের পরিণত বয়সের জিজ্ঞাসা ও কবিতার ভাবরূপের অনুধাবনে বিষয়টা অপ্রাসঙ্গিক নয়। আশ্চর্য যে তাঁর কবিতায় উল্লিখিত কিছু মৌল জিজ্ঞাসা গভীরভাবে উঠে এসেছে। তাছাড়া কবি নিজেই কবিতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন একথা বলে যে, 'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো, কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কবি চেতনায় সময়ের উপলব্ধি বিষয়ক স্বীকৃতি কথাগুলোতে রয়েছে। একজন কবির উপলব্ধি আধুনিকতা ও বিজ্ঞানবোধে সিক্ত হতে পারলেই এ ধরনের কথা বলা সম্ভব। শুধু গদ্যেই তেমন ভাবনার প্রকাশ নয়, তাঁর কবিতায় সময় বিষয়ক নানা মাত্রিক উপলব্ধির প্রকাশ পর্যাপ্ত। আর আশ্চর্য যে কবির মৃত্যুর কয়েক দশক পরেও সেই সময়চেতনা বিজ্ঞানের হাত ধরে ক্রমশ নতুন বোধের এবং নতুন মাত্রা অর্জনের দিকে এগিয়ে চলেছে। চেষ্টা চলছে মহাবিশ্ব সৃষ্টি থেকে মানব সৃষ্টির কার্যকরণ সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য ধারণা এবং বহুপরিচিত বহুকালের প্রশ্নগুলোর সঙ্গত জবাব পাওয়ার। এ ধরনের চেষ্টায় কবি তাঁর শৈল্পিক পদ্ধতিতেই অংশ নিয়ে থাকেন, যেমন নিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ।

সময় ও সৃষ্টিবিষয়ক বিজ্ঞানের আধুনিকতম ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে বা না হয়েই হোক জীবনানন্দ দাশ সময়, সৃষ্টি তথা বস্তুজগতের রহস্যময়তা নিয়ে প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন। প্রাকৃতিক জগৎকে মানবিক বস্তুজগতের সঙ্গে একাকার করে নিয়ে গঠে ওঠে তার এ উপলব্ধির ভুবন। একজন স্বপ্নচারী রোমান্টিক কবি, একজন স্বভাবপ্রেমিক কবির চৈতন্যে এমন আলোড়ন বড় একটা সচরাচর ঘটনা নয়। কারো কারো চোখে অস্বাভাবিকও বটে।

তবু একথাই সত্য যে জীবনানন্দ দাশের বোধের জগৎ ছিল বহুমাত্রিক। তার কাব্যজীবনের প্রথম দিকটা ছিল প্রেম ও প্রকৃত অভিসারের তীব্রতায় জারিত। সেই স্বাপ্নিক রোমান্টিকতার আবেগ কিছুটা নিস্তেজ হয়ে আসার পর 'নক্ষত্রের তিমির আর আগুন' দুই-ই তাঁকে সমান আকর্ষণে অভিভূত করতে থাকে। তবে সেখানে স্থির ও দূরদর্শী হতে তার সময় লাগেনি। সময় ও ইতিহাসচেতনায় ভর করে সৃষ্টি ও জীবনের তাৎপর্য, বিশেষ করে অবশেষ অর্থের টানে তাঁকে ক্রমে গভীরতর বোধে নিয়ে যায়। ভাবনা যেমন সময় থেকে সময়ে যাওয়া, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রান্তরে যাওয়া নিয়ে তেমনি অন্ধকার থেকে আলোতে বা আলো থেকে অন্ধকারে যাওয়া-আসা নিয়ে।

'ফ্রম ডার্কনেস উই কাম, টু ডার্কনেস উই গো' সত্য হলেও একমাত্র সত্য বা শেষ সত্য নয় এমন ভাবনা যেমন কোনো কোনো কবির তেমনি জীবনানন্দেরও। তাই তাঁর কথা,

> গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।
> বীজের ভিতর থেকে কী করে অরণ্য জন্ম নেয়—
> জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর,
> কী করে এ প্রকৃতিতে—পৃথিবীতে, আহা
> ছায়াছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,
> আমরা জেনেছি সব, অনুভব করেছি সকলি।

আর এ অনুভব থেকে এসেছে এমন উপলব্ধি যে, 'আসন্ন সূর্য যেমন আপনাকে বলয়িত করে নেয় নব নব মৃত সূর্যে তেমনি ইতিহাস-ধুলো-বিষ উৎসারিত করেও নবতর মানুষের প্রাণ মৃত্যুর স্তর ভেদ করে নীলাভ-আকাশ-নির্দেশী !' উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে যাত্রা তাই মানুষের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ অনুভব করেন, গভীর অন্ধকারের গর্ভ থেকে উজ্জ্বল অগ্নিময় নয়। নক্ষত্রের জন্ম হয়, জন্ম নেয় নব নব গ্রহ, যেখানে একসময় জীবনের উদ্ভাস ফোটে। 'সময়ের সমুদ্রের পারে রোদে আর অন্ধকারে উজ্জ্বল প্রাণ শিখাও সত্য যেখানে সাহস সাধ স্বপ্ন সবই আছে।' যে প্রাণ বুঝি 'ইতিহাসচেতনার প্রতীক এক পাখি' যে 'সূর্য থেকে সূর্যের পরিক্রমায় সময়কে মুছে ফেলে অন্য এক গভীর সুসময় নিয়ে আসে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে সময়ের অস্তিত্ব ঘিরেই মানুষের অস্তিত্ব। সময়হীন মানুষের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই 'সময়ের নির্মম হাতেই মানব অস্তিত্বের বিনাশ অর্থাৎ মৃত্যু এক বাস্তব সত্য। সেজন্যই মৃত্যু নামক অনিবার্য সত্যকে মেনে নিয়েও জীবনানন্দের আকাঙ্ক্ষা সময়ের সঙ্গী হওয়া—

> সময়ের সাথে সাথে আমরা সময় হয়ে হয়ে
> যতদিন জেগে আছি এমনি জাগিতে শুধু চাই।
> আমরা চলিতে চাই আকাশ বাতাস পায়ে দলে।

জীবনানন্দ কি এখানে সময় জয় করার ইঙ্গিত দিয়েছেন অথবা সময় থেকে কিছু অর্জনের আভাস? মানুষের কল্পনা যেখানে শেষ হয় তার ওপারে তো অনন্ত শূন্যতা। মহাবিশ্বের সীমানাহীনতায় সময়েরও রয়েছে সেই শূন্যতা। তবু মানবিক সময়ের ধারণা সেতুর মতো শূন্যতাকে স্পর্শ করতে চায়। যে সময় হারিয়ে যায় তাকে চেতনায় ধরে রাখার মতো করে। তাই মনে হয় হারিয়ে-যাওয়া জীবন আর বস্তু-পৃথিবীর সময় 'বাতাস আকাশ নক্ষত্র নীড় খুঁজে/বসে আছে প্রকৃতির পলকে নিবিড় হয়ে।' আর অর্জনের কথা ভেবে কবির মনে হয় 'সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে' তাকে আমাদের চৈতন্য আলোকিত করে তোলে? হয়তো করে না তাই সময়ের 'চেতনার দানে আমাদের অন্তর্দীপ্ত' হাত পারাটাই বুঝি সবচেয়ে বড় অর্জন হিসেবে বিবেচ্য।

সময়কে জীবনানন্দ দাশ বরাবরই 'সেতুর' সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে-সেতুপথে সময়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীর অনিশ্চয়তাও পুরোপুরি বাদ দিতে পারা যায় না বলে সময়ের বিশৃংখলা অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবনমৃত্যু, প্রেম-অপ্রেমের মুখোমুখি হতে হয় মানুষকেও। এর মধ্যেও সৃষ্টির গভীরবোধ প্রেম নেমে আসে, রক্তের গভীরে মিশে যায়। তখন এমন বোধে আত্মস্থ হওয়া চলে যে 'প্রেম ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।' এই প্রেম নিয়েই জীবনের অর্থময়তা প্রকাশ পায়, সৃষ্টির অর্থও কবির চোখে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

চার.

মূলত জীবনানন্দ দাশের কবিতা মধ্যপর্ব থেকে এবং বিশেষভাবে 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় পৌঁছে সময়ভাবনাকে বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরেছে। সময়ভাবনা কবিতাভাবনাকে জড়িয়ে রেখে নানামাত্রিক ডালপালা মেলে দিয়ে জটিলতা থেকে জটিলতার মধ্য দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে চেয়েছে। বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের মতো কবিও সৃষ্টির যুক্তিগ্রাহ্য অর্থবা তাৎপর্য খুঁজে পেতে চেয়েছে যেমন চেয়েছে কবি জীবনানন্দও। চেয়েছেন জীবনের ক্ষেত্রেও।

যুগে যুগে কবি-দার্শনিকদের কিছু চিরন্তন প্রশ্ন গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। কিন্তু সে সবের সদুত্তর মেলেনি। অন্তত মেলেনি যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর। তবু 'কোথায় ছিলাম, কেন আসা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি'—এমন জিজ্ঞাসা যেমন ইরানি কবি-বিজ্ঞানী ওমর খৈয়ামকে দীর্ণ করেছে তেমনি তাড়িত করেছে বিশ শতকের বাঙালি কবি জীবনানন্দ দাশকে। কবিও ভেবেছেন :

> ছিলাম কোথায় যেন নীলিমার নিচে ;
> সৃষ্টি মনের কথা সেইখানে আবছায়া করে
> প্রথম রচিত হতে চেয়েছিল যেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অনন্ত সময় সে কথার ভার বহন করে চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর জন্য কি কোন স্থির সুসংবাদ সে বয়ে এনেছে?' এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না। বরং 'মানুষের চিন্তা ব্যথা প্রয়াণের ধূসর হলুদ ফেনা'র তমসা থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে সময়ের মর্মস্থলে অন্য এক তমসায় অবশেষে গতি' হয়ে ওঠে।

সময় যদি ব্যক্তিচেতনার ভিত্তিতে সমকালে হয়ে থাকে তাৎক্ষণিক বাস্তবতা বা অভিজ্ঞতার সমষ্টি আর অতীত এক স্বপ্নময়তা তথা স্বাপ্নিক রোমান্টিকতার উৎস সেক্ষেত্রে নিকট–ভবিষ্যত প্রত্যাশার হলেও দূর–ভবিষ্যত যেন এক অন্তহীন অন্ধকার সময়ের প্রতীক। সে এমন এক সময়মাত্রা যার শুরু থাকলেও শেষ নেই। জীবনানন্দের সময় বা সময়ের অন্ধকার এমনই এক বিজ্ঞানমাত্রিক ধারণার প্রকাশ ঘটায়। সে অর্থই সময়–আঁধারে জীবনের পরিণতি মৃত্যুর নির্মম শীতলতায়। এই জীবনসত্য সময়ের হাত ধরে সাধারণ সত্যে পরিণত। এর অর্থ জন্মের অনিবার্য পরিণাম মৃত্যু। এই সত্যই জীবনানন্দের উপলব্ধিকে আরো কিছু সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে একাকার করে নিয়েছে।

জন্ম থেকে সময়ের যাত্রায় মৃত্যুর মতো ইতিহাসও একই নিয়মে গড়ে ভাঙ্গে। ভেঙ্গে গড়ে একাকার হয় নতুন করে জন্মের জন্য। যেমন মানব সভ্যতার ইতিহাস—মিশরীয়, সুমেরীয়, আসিরীয় সভ্যতা এযুগে এসে নতুন করে ভিন্ন চরিত্রে পরিস্ফুট। এখানেও হন্তারক সময় সেই ভাঙ্গাগড়ার কারিগর। এই সময়ের হাত ধরে কবি 'ইতিহাস থেকে ইতিহাসহীনতায়' বিচরণ করেন সৃষ্টির এবং সেই সঙ্গে জীবনের রমস্যময়তার সদর্থ খুঁজে পেতে।

এর অর্থ কি বিজ্ঞানী কাল্পনিক সময়কে (Imaginary Time) বাস্তব সময়ে (Real Time) টেনে এনে জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা? কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় বহু দেখা পাখি অর্থাৎ জ্ঞান পাখি অন্তহীন সময়ে বিচরণ করেও 'জ্ঞানের অগম্য ধাঁধায় শূন্যকে শূন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। মানব চেতনাকে নিঃসঙ্গতায় ছুঁড়ে ফেলে।' ইতিহাস তখন যেন 'অবিরল শূন্যের গ্রাস'। সেখানে মানুষ একা ও নিঃসঙ্গ। তবু কবি তার যে 'মহাজিজ্ঞাসায় প্রেমিক মানুষের জন্য কিছু সম্ভাবনার আলো জ্বেলে রাখেন। সে আলো অবশ্যই 'সময়' থাকে অনন্ত অমার পটভূমিতে অনিমেষ জ্বলে' থাকতে দেখা যায়।

বিজ্ঞানীর চোখে সময়ের এক নির্মোহ নিয়ন্ত্রক রূপ প্রতিফলিত যা আবার কবির চোখে সেই সঙ্গে নির্বিকার নির্মমতা নিয়ে পরিস্ফুট। যে—কবি প্রেম বা নারীর মৃত্যুর মধ্যে সময়ের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা অনুভব করেন তিনিই আবার সময়ের ব্যাপ্তি থেকে আহরিত জ্ঞানের সাহায্যে মানবিক মননের জ্বরা ও স্থবিরতার অবসান ঘটানোর কথা ভাবেন। অর্থাৎ জীবনানন্দের চোখে সময় বস্তুজগতের বহুমাত্রিকতায় সংশ্লিষ্ট।

জাগতিক বিশ্ব থেকে মানবিক সমস্যার নানাদিকে জীবনানন্দের অন্বেষা আকাঙ্ক্ষিত জবাব পায়নি বলেই বোধ হয় তাঁর কবিতায় নৈরাশ্যবোধ প্রাধান্য পায় যা কবির একাধিক প্রশ্নজালি কবিতায় বিভিন্নমুখী সংশয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছে। সে সংশয়ে জটিলতা কম নয়। আর ঐ জটিলতার কারণে 'সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ' কিংবা 'অন্ধাকার বা মৃত্যুই অনন্ত শান্তি' হয়ে ওঠা সত্ত্বেও এসব বিষয়ে কবি নিঃসংশয় হতে পারেননি। বরং একাসনে বিপরীত বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। তাই একবার নক্ষত্রের দিকে আরবার প্রান্তরের দিকে তার গভীর দৃষ্টিপাত চৈতন্যের নিরালোকে আলো জ্বালাবার চেষ্টায় নিরত। বুঝতে পারেন বিজ্ঞানের সূত্র একবার সত্য থেকে মিথ্যায় পরিণত হয়ে আবার নতুন করে সত্যকে ধরতে চেষ্টা করে চলেছে। উদ্দেশ্য অবশেষ সত্য খুঁজে পাওয়া। জীবনানন্দের কাব্যিক প্রচেষ্টাও এদিক থেকে ভিন্ন ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানের ঐ অনিশ্চয়তা তত্ত্বের মতো জীবনানন্দের সময় ভাবনাও মহাবিশ্ব, মানববিশ্ব অর্থাৎ সৃষ্টিজীবন ইত্যাদি মৌল বিষয় কেন্দ্র করে অনিশ্চয়তায় দোলায়িত হয়েছে। কিছুতেই শেষ সিদ্ধান্তে বা অনুধাবনায় পৌঁছানো যায়নি। তাঁর সাতটি তারায় যেমন অদ্ভুত তিমির বা অন্ধকারের গভীরে অন্তহীন ঘুমের সাধ, সেসব পেরিয়ে চৈতন্যে এমন বিশ্বাসও কালবেলায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে,

অমাময়ী নিশি যদি স্বজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানব হৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্বলে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে ;

মাঘ সংক্রান্তির রাতে তার এ অনুভব সময়, প্রকৃতি ও পৃথিবীর অন্ধকার প্রেক্ষাপটে একদিকে সময় অন্যদিকে প্রেমিক নারীর উজ্জ্বল প্রতীকে জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে জ্বলতে থাকে। তাঁর বিশ্বাস 'মহাবিশ্ব একদিন মহাসংকোচনের মধ্য দিয়ে অন্তহীন তমিস্রার' রূপ নিতে চাইলেও একসময় সে প্রসারণ পর্যায়ে পৌঁছে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার উপযোগী উষ্ণ ও আলোকিত হয়ে উঠবে। যেখানে রোদের উষ্ণতা ও জীবনের কাকলি নিয়ে প্রকৃতি ও পৃথিবী গভীর মানবিক পরিবেশ তৈরি করবে। কবির এ বোধ তো প্রকৃতই একজন বিজ্ঞানীর।

সময়ের তাৎপর্য কবির চোখে নানাকৌণিক বিন্দু থেকে ধরা পড়ে বলে এর প্রকাশ ঘটে যথেষ্ট বৈচিত্র্য নিয়ে। বস্তুজগতের দ্বৈতরূপ কবি জীবনানন্দের জন্য যে মর্মযাতনা বা সমস্যা—যার প্রকাশ ঘটতে পারে একদিকে 'বালিপ্রলেপী মরুভূমি' অন্যদিকে 'ঘাসের প্রান্তর' রূপে তা 'সময়ের সেতুপথে' বিলীন করে দেবার ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে সময় চেতনারই এক বিশেষ প্রকাশ ঘটায়। যে-সময় 'বেলা থেকে অবেলার' দিকে যাত্রা করে 'অন্ধকার চেতনা নিয়ে বিশৃংখল সময়-সমাজের দিকে চলে যায়' তার জন্য কালবেলার পরিণতিই নিশ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এ কালবেলা সময়-বাস্তবতা-ভিত্তিক হয়েও সামাজিক বাস্তবতাকে বড় করে দেখে। তাই সময়ের হাত ধরেই কালবেলা থেকে উত্তরণ অর্থাৎ নতুন ভবিষ্যত সময়ে পৌঁছানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়।

জীবনানন্দ দাশের চোখে সময়ের রূপান্তর সময়ের 'শাদা-কালো' রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়—যেমন আলো-আঁধারের বৈপরীত্যে। অদ্ভুত সে বৈপরীত্যের অনুভবে মগ্ন থেকে বস্তুজগতের কণা-প্রতিকণার দ্বন্দ্বই যেন ধরতে বা বুঝতে চেয়েছেন কবি। ফলে আলো-আঁধারের মতো আশা-নিরাশা, আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতা, প্রেম-অপ্রেম বা আনন্দ-যন্ত্রণার দ্বৈত রূপের মধ্য দিয়ে কবি জীবনানন্দ অনেকটা বিজ্ঞানীর মন নিয়ে জীবনের সদর্থ বা প্রকৃত অর্থ ও সৃষ্টির তাৎপর্য খুঁজে পেতে ও বুঝে দেখতে চেয়েছেন। এবং এর মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের সমগ্রতাবোধে পৌঁছাতে চেয়েছেন। এ সমগ্রতার বোধ সময় সমাজজীবন ও প্রাকৃত পারিপার্শ্বিক নিয়ে।

আজকের বিজ্ঞানীরা স্থান, কাল ও বস্তুজগতের পারস্পরিকতায় ঐ সমগ্রের সূত্রই সন্ধান করছেন সৃষ্টির বিশাল পরিসরে। বুঝতে চেষ্টা করছেন সৃষ্টির পেছনে নিহিত উদ্দেশ্য—অবশ্য বিজ্ঞান চেতনার আলোয়। তবু বিজ্ঞানী তখন কবি। একদিকে বিজ্ঞানীর সমস্যা জটিল প্রশ্নের আঙ্কিক সমাধানের চেষ্টা অন্যদিকে কবি-দার্শনিকের গভীর জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়ার তাত্ত্বিক আগ্রহ। সেজন্যই কোনো কোনো আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানী-নভোবিজ্ঞানী একাধারে বিজ্ঞানী ও কবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানী তাঁর সময়ের ধারণা একাধিক মাত্রায় প্রসারিত করে-দিয়ে বিশ্বের প্রতি সমতা–অপ্রতিসমতা, অনিশ্চয়তা–বিশৃংখলার অর্থ তার সমস্যা সমাধানের পথে খুঁজে পেতে চেষ্টা করছেন। আর কবি জীবনানন্দ তাঁর 'ধাধার উত্তর' পেতে মহাসময়ের হাত ধরে 'মহাজিজ্ঞাসা'র পথ ধরে চলেন। শক্তিকে তিনি অনুভব করেন সময়ের প্রেক্ষাপটে বস্তুজগতের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে। পুরনো বস্তুকণার ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে নতুন বস্তুকণার আবির্ভাব দেখতে চান কবি। ভাঙ্গন থেকে শক্তির প্রকাশের মধ্য দিয়ে নবসৃষ্টির প্রতিফলন দেখেছেন যেমন রবীন্দ্রনাথ তেমনি নজরুল ইসলাম তাঁদের কবিতায়। জীবনানন্দের কবিতায়ও এ সত্যই পঙ্‌তির পর পঙ্‌তিতে পরিস্ফুট :

এ মহাসময়েরি কাছে
নদী ক্ষেত বনানীর ঝাউয়ের ঝরা সোনার মতন
সূর্যতারাবীথির সমস্ত অগ্নির শক্তি আছে।

যে–শক্তির গভীর গতিপ্রবাহের তাড়নায় নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জীবনানন্দ সেখানে নিজেকেই টেনে এনেছেন এই বলে :

...হে গভীর গতির প্রবাহ
...আমার শরীর ভেঙ্গে ফেলে
নতুন শরীর করো—

এই 'আমি' ধরে নেওয়া চলে যে কবির দৃষ্টিতে জীবনলোকেরই প্রতীক। 'বেলা অবেলা কাল বেলা'র (যা আসলেই জীবনানন্দের সময়–বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ) একাধিক পংক্তিতে কবি বিনষ্ট পৃথিবীর পরিবর্তে নতুন সৃষ্টির কথা বলেছেন। এবং সেখানে সময় তার সহায়ক শক্তি। সময়কে সঙ্গে নিয়ে অন্বিষ্ট ভবিষ্যত বিন্দুর গন্তব্যে পৌছানোর কোনো বিকল্প নেই কবির চোখে :

...মনে হয় আজকের চেয়ে আরো দূর
অনাগত উত্তরণলোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি স্বর্গ নেই,

শান্তির আশ্রয় প্রীতিময় স্থান কালের বিশ্বই কাম্য যা একদা 'অমৃতের বিশ্ব' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল :

শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে উদ্বেলিত হ'য়ে অনুভব করে গেছি
প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা,...
যা হয়েছে—যা হতেছে—এখন যা শুভ্রসূর্য হবে
সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে করে লবে।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে সে মহাজাগতিক 'অগ্নিশিল্প'র লক্ষ্য তো (মানবীয় জগতের শিল্পের মতোই) নব সৃষ্টি কাজ সম্পন্ন করা। আর তা করতে হলে সময়ের বর্ধমান বিশৃংখলা (বিজ্ঞানীর ভাষায় 'সময়ের তীর') তথা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, যেতে হবে ব্যক্তিক্রমের মধ্যদিয়ে বস্তুলোক ও মানবলোকের জন্ম দিতে :

...তা হতে হলে আমাদের জ্ঞাতকুলশীল
মানবীয় সময়কে রূপান্তরিত হয়ে যেতে হয় কোনো
দ্বিতীয় সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানীর মতো সময়ের রূপান্তর এভাবেই কবি জীবনানন্দেরও আকাঙ্ক্ষিত। কবির চোখে পুরনো পৃথিবী, নষ্টভ্রষ্ট পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু 'নতুন পৃথিবীও জন্ম নেয়নি'। সফলতার কোনো সম্ভাবনা তাৎক্ষণিক সময়ে চোখে পড়ে না। কবি ঠিকই বুঝে নেন 'সফলতা রয়ে গেছে বিজ্ঞানের সজীব পাতায়', সে সফলতা 'জীবনের জন্য আজো নেই'। তাই কবির উপলব্ধি—সময়ের বিশৃংখলার পথ ধরে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার কোনো বিকল্প নেই :

> যা হবে তা আজকের নরনারীদের নিয়ে হবে
> যা হ'ল তা কালকের মৃতদের নিয়ে হ'য়ে গেছে।

নয়া সৃষ্টির স্বপ্ন নিয়ে অতীত থেকে ভবিষ্যত সময়ের যাত্রায় ঠিকই সম্ভাবনার ভুবন দেখা দেয়। এবং বিজ্ঞানের নিয়মের বাইরে নয় :

> যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে :
> আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোয় আজ
> যে-দোর কঠিন, নেই মনে হয়; সে দ্বার খুলে দিয়ে
> যেতে হবে আবার আলোয়, অসার আলোর ব্যসন ছাড়িয়ে।

সে সম্ভাবনা অবশ্য জন্মের সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে মৃত্যুকে প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়ে :

> একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে :
> সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিল খেতে
> সূর্যাস্তের সাথে চলে গেছে।

এই চলে-যাওয়া শেষ কথা নয় বলে সময় ক্রমাগত আসে। আর আসে বলেই কবির মনে হয় :

> কাল তবু—হয়তো আগামীকাল।
> তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।

সময় আমাদের সঙ্গে যেমনই ব্যবহার করুক, যেমন নির্মোহ বা নির্মম হোক তবু মানুষ যে সময়ের অস্তিত্বেই অস্তিত্বশীল, মানুষ যে তার প্রয়োজনেই সময়কে বাদ দিয়ে বা সময়ের হাত এড়িয়ে চলতে পারে না এ বিজ্ঞানসত্য কাব্যসত্য হিসেবে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের ভাবনায়—ভাবনা থেকে তাঁর কবিতায়। কবি নিশ্চিত যে সময় এমন এক নিয়তি যার ওপর নির্ভর করেই মানুষকে নিজ অবস্থান তৈরি করে নিতে হয়, তা সময় তাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করুক বা নাই করুক। আত্মশক্তিতে শুদ্ধ চেতনায় ভর দিয়েই তা করতে হবে :

> নিরন্তর বহমান সময়ের থেকে খসে গিয়ে
> সময়ের জালে আমি জড়িয়ে পড়েছি ;
> যতদূর যেতে চাই এই পটভূমি ছেড়ে দিয়ে—
> চিহ্নিত সাগর ছেড়ে অন্য এক সমুদ্রের পানে...
> মনে হয় এই আধকণা জল দিয়ে দ্রুত রক্ত নদীটিকে
> সচ্ছল অমল জলে পরিণত করতে চেয়েছি।

কবির এই ইচ্ছা সময়কে সঙ্গে নিয়েও সময়কে জয় করে চলার ইচ্ছাই প্রতিফলিত করে। কিন্তু জীবনানন্দের শৈল্পিক ধারণায় আরো একটি গভীর বিষয় এসবের সঙ্গে জড়িত যা হলো কবির প্রেম ধারণা যা তাঁর সমগ্র চিন্তায় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করেছে, কবিতায় প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সে-প্রেমের মর্মবিন্দুতে নারী বা মানুষ সেই থাকুক এই সমন্বয়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিই সৃষ্টির—নব সৃষ্টির প্রধান উদ্দীপক উৎস। এ সত্য যেমন কবি বুঝেছেন, প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায় তেমনি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর পাঠকদেরও।

পাঁচ.

জীবনানন্দের চিন্তার জগৎ, তাঁর কাব্যভাবনার জগৎ এভাবেই সময়-ধারণা নিয়ে আলোড়িত ও আবর্তিত হয়েছে। কবি সময়ের প্রবল প্রভাব অনুভব করেছেন যেমন প্রাকৃতিক বস্তুজগতের অসীম রহস্য আর বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে তেমনি পৃথিবী সমাজ ও জীবনের বহমান জটিলতার দিকে নজর ফিরিয়ে। তাঁর উপলব্ধি বিজ্ঞানের সমান্তরাল স্পষ্টতায় কাব্যসত্য হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে একাধিক কবিতায়। সময়ের বহমানতায় নির্ভর সৃষ্টি ও জীবন ঘিরে কবির সে উপলব্ধি :

সে কোন্ প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
অঙ্কুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে !
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ—
যেই রাত্রি,—নেমে আসে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রেরে গুণে
যেই রাত্রি, আমি তার চোখে চোখ, চুলে তার চুল নেব বুনে।

জীবনের প্রবহমানতা, সৃষ্টির ধারাবাহিকতা, মৃত নক্ষত্রের স্থলে নতুন নক্ষত্রের জন্ম—এভাবে সময়ের দানে কবির চেতনায় সত্য হয়ে ওঠে।

তাঁর রোমান্টিক চেতনা, প্রকৃতিতে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে থাকার বাসনা এবং আকাশ-পৃথিবীর বিস্ময়কর আকর্ষণে অভিভূত হয়ে হাজার ঘটনাবলী কি নিছক কৌতূহল, প্রাকৃত সৌন্দর্যের টান নাকি গভীরতর বিজ্ঞানমনস্ক উপলব্ধির জের? তাঁর দিনলিপিতে দেখা যায় প্রায়ই তিনি নক্ষত্র মেঘ আকাশের দিকে গভীর বিস্ময়ের বোধ নিয়ে তাকান, তাকিয়ে চিন্তায় মগ্ন হন, বিজ্ঞানের ধারায় দু'একটি মন্তব্য রাখেন। সময়ের বিভিন্ন বাঁকগুলোও তাঁর চিন্তার প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়। সময় তখন নানা তাৎপর্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কবি চেতনায়।

আবার ক্ষয়েজীর্ণ, কুটিল, স্বার্থপর, অপরিচ্ছিন্ন আমাদের মানবসমাজ এবং সেই সমাজের চাপতাপ শুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষা-বিদ্ধ কবিকে ক্লান্ত করে, মনে হতাশা-নিরাশা থেকে ভিন্নতর 'বোধ' জন্ম নেয় যা কখনো হতে পারে বৈনাশিক। এসব খবর পাঠক তার কবিতার মধ্যেই পেয়ে যান। বুঝতে কষ্ট হয় না সুস্থ পৃথিবীর অভাব, শুদ্ধ প্রণয় আর ভালোবাসার অভাব জীবনানন্দের জীবন ও কবিতাকে কী গভীর প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত করে, নিয়ে যায় হতাশা-নৈরাশ্যের পথ ধরে মৃত্যুচেতনার দিকে গভীর স্তব্ধতার অন্ধকারে যেখানে অন্তহীন সময়ের অন্ধকারে লীন হয়ে থাকাই মনে হয় সর্বোত্তম শান্তি। যন্ত্রণার জ্বালা থেকে মুক্তি।

আর এই সূত্রে অন্ধকারের সঙ্গে গড়ে ওঠে গভীর সখ্য, সময় সেক্ষেত্রে তার সেতুবন্ধন। অন্ধকারের নানাকৌণিক গভীর লালিত হওয়ার আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করেন কবি। সেখানে তার কবিতায় বহু উল্লিখিত সূর্য, নক্ষত্র, আকাশ, সমুদ্র সব কিছু ছেড়ে তিনি যে অনন্ত অন্ধকারে মিশে থাকতে চান জীবনের নতুন প্রত্যাশায় সে তো সময়েরই আরেক অবস্থা। সে অবস্থা কেউ চায় আবার কেউ চায় না। এইসব বিরূপ অবস্থা থেকে, বাস্তব ও কল্পনার সংঘাত থেকে জীবন ও মৃত্যু, সময় ও সৃষ্টির রহস্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন কবি। বুঝতে চান বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত এমনি সব অবস্থার পেছনে কোন্ সূত্র, কোন্ সত্য লুকিয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি করে সময় ও বস্তুজগতের সম্পর্ক নিয়ে প্রচলিত ধারণা থেকে ভিন্নতর বিজ্ঞাননিষ্ঠ উপলব্ধিতে পৌঁছে যান কবি জীবনানন্দ দাশ—যে-উপলব্ধিতে প্রশ্ন, সংশয়, অনিশ্চয়তাও কম নয়। তাঁর পরিণত পর্যায়ের কবিতায় এসব জটিলতার গভীর ছায়া নামে আবার কখনো আলো জ্বলে লাল নীল, সোনালি রূপালি বা কমলা রঙের বিচিত্র ভাবনার। অবশ্য মাঝে মধ্যে সময় সম্পর্কে প্রচলিত সনাতন ধারণাও তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, সময়কে দেখেছেন স্থির, অপরিবর্তনীয় রূপে। তবে তেমন ধারণা তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। বরং সময়ের নানামাত্রিক শক্তিমান রূপই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে বিজ্ঞাননিষ্ঠ ভিন্ন ও বিচিত্র বোধের জগতে।

কবিতা থেকে কবিতায় জীবনানন্দ অনুভব করেছেন সময়ের নানা অবস্থান, অনুভব করেছেন কেমন করে 'আপতিত কাল মানুষ বহন করে' চলে। সময়কে পরম বা সুস্থির ভেবে স্থির হতে পারেননি বলে 'সময়সীমার ঢেউয়ে অধোমুখ হয়ে মরণের অপরিমেয় ছটা থেকে উপলব্ধি জন্ম নিতে পেরেছে যে পৃথিবীর জীবন গভীর।' সময় সম্পর্কে, বস্তুজগৎ ও জীবন সম্পর্কে এভাবেই কবি এক বিজ্ঞান-নির্ভর ধারণায় পৌঁছে যান।

বিজ্ঞান চেতনার কারণে অন্ধকার নিয়ে কবির নেতিবাদী ধারণাও ভিন্ন মেরুর লক্ষ্য স্থির করে নেয়। কবি অনুভব করেন গাঢ় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা, দেখতে পান 'সময়ের অমেয় আঁধারে জ্যোতির তারণকণা'। কিংবা এমন অবাক উপলব্ধি—'সময়ের জ্বলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি'। একি কৃষ্ণগহ্বরের মতো কোনো সৃষ্টিউৎসের ইঙ্গিত? সেক্ষেত্রে 'তুমি' নারীর প্রতীকে ধরিত্রী তুলে ধরে। এ ধরনের বিজ্ঞানসম্মত বস্তুসত্য নির্ভর ধারণার প্রকাশ ঘটে কালবেলা থেকে পরবর্তী কবিতাবলীর পংক্তিতে। প্রতিফলিত হয় মহাবিশ্ব, প্রাকৃত জগৎ এবং মানবভুবনের জীবননির্ভর রূপ ।

তাই অন্ধকারের স্থবির সময় যেমন জীবনানন্দের কাছে সত্য তেমনি সত্য 'মৃত্যুর হিমগুম' পেরিয়ে 'প্রাণীকম্পন লোকের নীড়'। স্থবিরতা থেকে গতিময় সময়ের ডানা ধরে প্রাণময়তায় পৌঁছানো এবং সেই সূত্রে এমন উপলব্ধি যে 'জ্বলন্ত তিমিরগুলো আমাদের রেণুসূর্যশিখা' আর এই 'রেণুসূর্য' থেকে অবশেষে সৃষ্টি। জীবনানন্দের কবিতায় কৃষ্ণসূর্য থেকে শুভ্রসূর্য এবং পরে প্রাণময় ভুবনের অস্তিত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে।

এমনকি বিজ্ঞানীর বিশ্বাস পেরিয়ে কবি-দার্শনিকের মতো এমন বিশ্বাসও জেগে ওঠে যে 'এইসব ব্যাপ্ত অনুভব থেকে মানুষের মন তার চারদিকে উপস্থিত অস্থিরতা ব্যথা বাধা ভয় অতিক্রম করে মানুষের জন্য বিপুল এক আশ্রয় তৈরি করে গেছে।' সে আশার পেছনে রয়েছে মানুষের সহজাত প্রাকৃত বোধ থেকে তৈরি সততা ও বিচক্ষণতা, জ্ঞান থেকে আলো আর সর্বোপরি সব মানুষের জন্য সব মানুষের ভালোবাস।' কিন্তু সময়ের দিকে বাস্তব চোখে সাদা চোখে তাকিয়ে কবি বারবার আশা-নিরাশা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের মধ্যে দোলায়িত হয়েছেন। হয়েছেন এই ভেবে যে ঐ উত্তরণ কতটা সম্ভব? এ প্রশ্নের পরও আবার এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে সব কিছু যদি ঠিকঠাক মতো এলে এবং মানুষ যদি অসৎ না হয় তাহলে সে উজ্জ্বল অনুভব নিয়ে সময়ের আকাঙ্ক্ষিত তীরে ঠিকই পৌঁছাতে পারবে সেক্ষেত্রে জন্ম নিতে পারে নয়া সূর্যের ভুবন বা চেনা সূর্যেরই নয়া ভুবন।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর শৈল্পিক বোধ নিয়ে অবাস্তব আশার জগতে বাস করতে চাননি। বস্তুজগৎ এবং সৃষ্টির বিভিন্ন দিকে চোখ রেখে সময়ের প্রভাব প্রকৃতি থেকে মানবজীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর লক্ষ্য করে এমন বিশ্বাসে স্থিত হন যে 'সময় মানুষের জন্য তৈরি হয়নি'। সে তার হিসাব মতোই চলে। তা সত্ত্বেও কবি মানুষের জন্য, মানব প্রজাতির জন্য কিছু আশা, কিছুটা সম্ভাবনার এক ফালি জায়গা রেখে দিয়েছেন। ভেবেছেন 'মানুষই সত্য বিশালতর আলোর প্রয়োজনে'। কিংবা এমন প্রত্যাশা।

মহাপ্রাণের বৃক্ষ ও তার পাখি তো বারবার
ভস্ম হয়ে জাগছে হরিৎ—নব হরিৎ গাছে।

তখন এমন বিশ্বাসও জেগে ওঠে :

আমরা দুজন যেন সৃষ্টির প্রথম
অন্ধ রাত্রি ছেদ করে শাদা আর কালো
যে নদী মৃত্যুর গন্ধ বুকে নিয়ে এসেছিল তার
ক্লান্ত তৎপরতার চেয়ে অন্য আলো—অন্য এক আলো।

অন্তহীন সময়ের অন্ধকারে জীবনানন্দ এমনি এক আশার আলো, তাত্ত্বিক আলো তুলে ধরেছেন, জাগিয়ে রেখেছেন নিজের জন্য এবং সবার জন্য।

কবি জীবনানন্দের সময়-ধারণা তাঁর বস্তুজগৎ সামনে রেখেও আধুনিক বিজ্ঞানীর স্থান কাল-নির্ভর বস্তুধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। বরং সময়কে নিয়ে বস্তুজগতের মধ্যে সব কিছুর একটা অস্তিত্বগত সমগ্রতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর চেতনায় বড় হয়ে উঠে। বাস্তব পৃথিবীর সব কিছু দেখেশুনে কখনো কখনো সময়ের ওপর আস্থা ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে, তবু আশার আলো চোখে নিয়ে ভবিষ্যত সময়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন কবি। অপেক্ষা করেন সময়ের জন্য, যে-সময়কে এখনো মানুষ দেখে নিতে পারেনি। তবু তিনি জানেন পেছন ফেরার বদলে তাকে অনেক পথ হাঁটতে হবে—কবি জীবনানন্দের কল্পনায় তা হতে পারে অনেক দূরের যাত্রা, হয়তো বা বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনো নক্ষত্র বা গ্রহের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি জীবনানন্দের কাব্যে জীবন, প্রেম ও প্রকৃতি

আলিমুজ্জামান চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য, সজীব, শক্তিশালী, সচেতন কবি জীবনানন্দ দাশ। মনন-মেধায়, চিন্তা-চেতনায় চিত্রকল্প রচনায় আঙ্গিক নির্মাণ পদ্ধতিতে তাঁর কাব্য-কবিতা স্বকীয় স্বতন্ত্র ধারা অনুসারী ও বিস্তারী। জীবনানন্দ দাশ সত্যিকার অর্থেই একজন অতি আধুনিক রীতি প্রবর্তক প্রভাবশালী কবি।

কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনে বস্তুত আনন্দবাদী প্রসন্ন জীবনবোধ কখনই সুবাসিত সুধাময় কুসুমিত হয়ে ওঠেনি। তাঁর নিকট জীবন এক পরম ঐশ্বর্যময়, স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে-ছন্দে বিলসিত, উজ্জ্বল গৌরববাহী আনন্দ সত্তার একান্ত আধার নয়। তাই, তাঁর কাব্য-কবিতায় জীবন পরম আনন্দ-উচ্ছ্বাসে, উচ্ছ্বলিত সৌন্দর্য মহিমায় উচ্চকিত মাহাত্ম্য-মহত্ত্বে দীপ্তিময় সৌন্দর্যশ্রী হয়ে ওঠেনি। জীবনের উচ্চমুখী জয়গান তাঁর কণ্ঠে এমন উচ্চতল উদাত্ততায় উচ্চারিত হয়নি।

ক্লান্ত-শ্রান্ত, বিবর্ণ বিষণ্ণতা কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্য-কবিতার মূল সুর ও মর্মকাহিনী। তাঁর কাব্য পর্যালোচনায় সহজাতভাবেই প্রশ্ন জাগে তিনি কি পৃথিবী পলাতক কবি? পৃথিবীর রূপ-রস, বর্ণ-সুধা-গন্ধ থেকে পালিয়ে পালিয়ে ফেরেন?—অবকাশ, অবসর, অবসাদ, মৃত্যু, বিচ্ছেদ, শূন্যতা, ক্লান্তিকে অবলম্বন করেই তাঁর জীবনবোধের প্রাগ্রসরমানতা ও পরিব্যাপ্তি। সচরাচর, স্বভাবসিদ্ধ শ্রেণী-বিন্যাসের মর্মমূল থেকেই কবিকে সমাজ-সচেতন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। তিনি আত্মসচেতন, আত্মনিমগ্ন কবি। বাস্তবকে, বৃত্তমানকে পরিহার করে রূপকের জগতে বসবাসের অন্তহীন, অকৃত্রিম ইচ্ছা তাঁর। যাযাবরী, ভ্রমণ-পিয়াসী এক নৈমিত্তিক, চলমান সত্তার অধিকার-ভোগী এ কবি। বন্দরে বন্দরে প্রতিনিয়ত এক পরিভ্রমণশীল, চল-চঞ্চল নাবিক তিনি। জীবনে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় অফুরন্ত। অতলা অনুপম সৌন্দর্যের স্বপ্নিল মোহনীয়তা তাঁর আকর্ষণীয়, অমূল্য সম্পদ। বিশুদ্ধ সুন্দর ও সৌন্দর্যের তিনি কুণ্ঠাহীন একনিষ্ঠ সাধক।

বহু বৈচিত্র্যময়, নিত্যনিয়ত প্রেম-আলোড়িত, অতৃপ্ত, বেদনাবিদীর্ণ জীবন তাঁর নয়। তাঁর দয়িতা রহস্যময়ী, মর্মময়ী শুধু। এ দয়িতার রূপরেখা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; দর্শনযোগ্য কিন্তু স্পর্শাতীত।

প্রেম জীবনের এক নৈসর্গিক অনুষজ্ঞ। বিরহ-বিচ্ছেদ, বেদনা, মান, অভিমান, পূর্বরাগ, অভিসার, আস্তি-কাতরতায় প্রেমের সহজাত বিচ্ছুরিত প্রকাশ। জীবনানন্দ দাশে প্রেমের এ সর্বজনীন রূপবৈচিত্র্য সহজ সারল্যে অনুদ্ঘাটিত। কবির দয়িতা যেন এক স্বপ্নিল প্রতিচ্ছায়া। —অতীতের প্রতিচ্ছবি। অতীতের স্বপ্নময়তায় তাঁর নায়িকাদের নিমগ্ন বিহার। বাস্তব জগতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখ-দুঃখ, আহ্লাদ-বেদনাজড়িত ভূমিতে জীবনানন্দ দাশের নায়িকাদের উল্লসিত বিচরণ অতিক্ষীণ ও স্বল্প। অতীতের নায়িকাদের মুখচ্ছবি স্বপ্নময়তায় কবির সম্মুখভাবে উদ্ভাসিত হয়। 'কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের দীপ্তশ্রী মুখমণ্ডল কবির স্বপ্নচারী মানসপটে ভেসে ওঠে। শেফালিকা বোস, সুরঞ্জনা, সবিতা, সুচেতনা প্রমুখ নারীর কথা এক আধবার উচ্চারিত হলেও তাদের প্রতি কবি-মনের তৃষ্ণাগমন আস্তিকাতরতা, বিরহ-বেদনার অধীর প্রেমানুরাগের ভাষা উচ্চারিত হয় কতটুকু? কবির কাব্য-কবিতায় বনলতা সেনের নাম স্বমহিমায় ও সদর্পে উচ্চারিত। বনলতা সেন যে তাঁর বিষণ্ন, বিষাদগ্রস্ত, খিন্ন-ক্লিষ্ট জীবনে দু'দণ্ড শান্তি দিতে পেরেছিলেন তারই সুস্মিত স্বীকৃতি কবির ঐশ্বর্যময় ছন্দে ও ভাষায়—

চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

এই শান্তিদায়িনী নাটোরের বনলতা সেনের সৌন্দর্যশ্রী বর্ণনায় কবির কী অননুকরণীয় পারঙ্গমতা ও নৈপুণ্য! কবি-বর্ণনায়—

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;

প্রেম সম্পর্কে কবির এক বিচ্ছিন্ন মনোভঙ্গী ক্রিয়াশীল, সকর্মক থেকেছে বলেই দয়িতাদের প্রতি কবির এই প্রায় নির্মোহ অবস্থান। কবি-জীবনের এ এক মৌল স্বরূপ-অবস্থান।

জীবন চেতনায় সামগ্রিকভাবে কবি নারীর প্রতি অপরিমেয়ভাবে শ্রদ্ধাশীল। কবির ভাষায়—

মানবকে নয় নারী, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিশ্ব কী রকম মধুর হ'তে পারে।

কবির ঐকান্তিক বিশ্বাস : একমাত্র নারীকে ভালোবেসেই নিখিল বিশ্বের স্বাদ-মাধুর্য, আনন্দ-সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

বিষণ্ন বিষাদগ্রস্তিতা, শূন্যতার মধ্যে অবস্থান সত্ত্বেও কবি আসলে নৈরাশ্যবাদী নন। যদিও কখনো, কোনো মুহূর্তে তাঁর মনে হয়—

কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ
বহুদিন থেকে শান্তি নেই—

তবুও অন্যত্র তাঁর আশা-ব্যঞ্জক ব্যঞ্জনা—

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—
এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।

অথবা,

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে,
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল—
—সূর্য মানে আলো।

কিংবা,

আজ রাতে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে—
—তবুও হৃদয়ে গান আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃত প্রস্তাবে কবি জীবনানন্দ দাশ ক্লান্ত, ক্ষয়িষ্ণু, বিশীর্ণ পটভূমির অন্তরালে জীবনের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নচারী এক আত্মনিমগ্ন কবি। আপন চেতনার অন্তরালবর্তী কোনো শ্যামল, মায়ামেদুর ছায়ায় দাঁড়াতে তাঁর নিদারুণ অনীহা ও সুস্পষ্ট দ্বিধাগ্রস্ততা।

নিসর্গের এক নিপুণ, দক্ষ রূপকার কবি জীবনানন্দ দাশ। প্রকৃতিকে বাস্তবস্বরূপে তিনি তাঁর কাব্য–কবিতায় প্রতিবিম্বিত ও উপস্থাপিত করেছেন। এ প্রকৃতি বস্তুত বাংলার সবুজ, শ্যামল ছবি। প্রকৃতি কবি–চেতনাকে এমন সমাচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে কবি স্বীয় সত্তাকে প্রকৃতির মধ্যে আকীর্ণ করে দিয়ে আত্মস্থ হওয়ার সুপরিচ্ছন্ন পথ সন্ধান করেছেন। ঘাসের সবুজ ঘ্রাণ সোনালী মদের মতো গেলাসে গেলাসে পান করার সাধ তার অনিবার,—অহরহ।

> আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের, এই ঘ্রাণ
> হরিৎ মদের মতো
> গেলাসে গেলাসে পান করি।

তাঁর প্রাণ–জড়ানো সাধ—

> ঘাসের ভেতর ঘাস হ'য়ে জন্মাই।

বাংলার প্রকৃতি কবিচিত্তে এক দুরন্ত, দুর্নিবার প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। বাংলার নিসর্গচিত্র তাই তাঁর কবিতায় এমন সাড়ম্বর মহিমায় উচ্ছ্বসিত। আম, জাম, বট, করমচা, কাঁঠাল, হিজলের ছায়ায় তাঁর মানসলোক শান্ত, স্নিগ্ধ ও ছায়ামেদুর। বাংলাকে ভালোবেসেই তিনি বাংলার প্রকৃতিকে অঝোরধারায় ভালোবেসেছিলেন। কবির জীবন আর বাংলার প্রকৃতি একাত্মক বন্ধনভূমে আবদ্ধ। বাংলার মুখের চেয়ে অন্য কোথাও—অন্য কারু মুখ এমন সুদর্শন, সুন্দর ও আকর্ষণীয় বলে কবিচিত্ত গ্রহণে সমর্থ হয়নি।

কবির স্বকণ্ঠ উচ্চারণ—

> বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ
> খুঁজিতে যাই না আর :

বাংলার আবহমান সৌন্দর্য, শ্যাম–প্রকৃতি কবিচিত্তকে মুগ্ধ করে রেখেছে আজীবন। এমন বিজন ঘাস, গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা, হিজলের ক্লান্ত পাতা, বটের অজস্র ফল কবিচিত্তে স্বপ্নজাল রচনা করে। কবির অনায়াসসিদ্ধ বর্ণনা—

> কোথাও দেখিনি, আহা, এমন হিজল ঘাস—প্রান্তরের পারে—
> নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে—নীল বুকে আছে তাহাদের
> গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা ঢের,
> হিজলের ক্লান্ত পাতা—বটের অজস্র ফল ঝরে বারে বারে
> তাহাদের শ্যাম বুকে ;—

বাংলার মানুষকে—এদেশের প্রকৃতিকে ভালোবেসেই কবিচিত্তের মুক্তি ঘটেছে। কবিচিত্তের প্রকৃতি–ধারণা কখনও বা মানবাত্মায় বিলীয়মান। নদীর মধ্যে আপন কন্যার স্বরূপ দর্শন করেন কবি। মানব ও প্রকৃতি এ স্থলে এক ও অভিন্ন।

কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনবোধ ও প্রকৃতি–প্রেম মূলত বাংলার মানুষের জীবন–সৌন্দর্য, গৌরব–গ্লানি, জয়–পরাজয় এবং নৈসর্গিক রূপমাধুর্যের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা ও গ্রথিত। প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি দ্বন্দ্বহীন মমত্ববোধেই তাঁর কবিচিত্তের জাগরণ, নিষ্ক্রমণ ও ঊর্ধ্বগতি সঞ্চয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তি ও কবি জীবনানন্দ দাশ : তাঁর স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

জীবনানন্দ দাশের কবিতা, কবিমানস এবং তাঁর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার স্বরূপ ও অবদানের পরিমাপ এবং মূল্যায়ন করতে হলে, কবির আবির্ভাবকালের পটভূমি, তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জীবনানন্দের পূর্বসূরি ও সমসাময়িক কবিদের কাব্যসাধনা ও তাঁদের অবদানের দিকেও স্বভাবতই দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা, কোনো কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীই আকস্মিকভাবে এবং স্বয়ম্ভূরূপে আবির্ভূত হননা, তাঁর আত্মপ্রকাশ, শিল্প বা কাব্য সাধনা ও অবদানের পিছনে কোনো না কোনো ইতিহাস ও ঐতিহ্য থাকে, পূর্বসূরি ও সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে থেকেই, তাঁদের ধারা ও অবদানকে স্বীকরণ এবং আত্মস্থ করে নিয়েই একজন প্রতিভাবান ও সৃষ্টিধর্মী কবি তাঁর স্বকীয়তা অর্জন করেন, স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখেন। কোনো-কোনো কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি ঘটে অনেকটা সন্তর্পণে, সংগোপনে ও ধীর লয়ে—অর্থাৎ দীর্ঘকালের সাধনার ফল হিসাবে, আবার কারো ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনেক কম সময়ের পরিধিতেই, এমন কি প্রায় আকস্মিকভাবেই, কোনো কোনো কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী আবির্ভাবের স্বল্পকালের মধ্যেই সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর এঁকে দেন।

আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসের দিকে তাকালেও লক্ষ্য করা যাবে যে, প্রথম আধুনিক কবি এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকবি ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, সনেট বা চতুর্দশপদী রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর প্রতিভা, মেধা, শ্রম ও সাধনায়, সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান 'মেঘনাদবধ কাব্য' উপহার দেন, যুগ-স্রষ্টা কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। বস্তুত, 'মেঘনাদবধ' কাব্যই তাঁর সৃষ্টিধর্মী ও অভিনবত্বপ্রয়াসী প্রতিভার পরিণত ফসল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম রূপকার এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডলে অনেকটা নিভৃত সাধনার মতো চললেও, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার পরিচয় দিতে এবং স্বকীয়তার ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখতে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়েছে, অনেক শ্রম ও সাধনার স্বেদ ঝরাতে হয়েছে। সুদীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককালের শ্রমে ও সাধনায় এবং সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার স্পর্শে রবীন্দ্রনাথকে কাব্যসাধনায় শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে আরোহণ করতে হয়েছে। অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহীচেতনার অসামান্য রূপকার এবং অন্যতম যুগ-স্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিগত বিশ শতকের বিশের দশকে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের স্বল্পকালের মধ্যেই মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য পূর্বসূরিদের কাব্যধারাকে আত্মস্থ ও স্বীকরণ করে নিয়ে, ভাব, ভাষা, ছন্দ এবং আঙ্গিক ও রূপরীতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুনত্ব এনে, 'বিদ্রোহী' ও অন্যান্য বিদ্রোহী চেতনামূলক এবং হিন্দু-মুসলিম উভয় ঐতিহ্যের ধারক ও জাগরণধর্মী কবিতা-গান ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর এঁকে দেন। বিশ-বাইশ বছরের সাহিত্যসাধনায় তিনি জাতীয় কবির মর্যাদাও অর্জন করেন। নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' এবং 'বিষের বাঁশী'ই বিদ্রোহী ও যুগ-স্রষ্টা কবিকে চিনিয়ে দেয়। নজরুলের এই অর্জনের মূলে কাজ করেছে পারিবারিক পরিবেশ ও কৈশোরে 'লেটো'র দলে তাঁর পালা ও গান রচনার অভিজ্ঞতা, আরবি-ফারসি ইত্যাদি ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃত-উর্দু ইত্যাদি ভাষা ও সাহিত্য, পুঁথি-সাহিত্য, লোক-সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং পরবর্তী জীবনে করাচীতে অবস্থানকালে সৈনিক কবি নজরুলের ফারসি সাহিত্য এবং ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও গভীর পরিচয়।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাবান ও সৃষ্টিধর্মী কবি এবং তিরিশের পঞ্চপ্রধান কবির অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা ও কবিমানস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উপরে তাঁর পূর্বসূরি ও সমসাময়িক তিন যুগ-স্রষ্টা কবির প্রসঙ্গ এবং কাব্যসাধনা ও অনন্যসাধারণ সাফল্যের পটভূমি উল্লেখিত হলো এ-কারণে যে, জীবনানন্দ দাশও পারিবারিক পরিবেশেই এবং অনেকটা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসাবেই কাব্যসাধনা শুরু করেন এবং পরবর্তী-জীবনে দেশী-বিদেশী বিশেষত ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে এবং তাতে গভীরভাবে অবগাহন করে, স্বদেশী পূর্বসূরি ও সমসাময়িক কবিদের রচনা থেকে প্রভাব ও পরিগ্রহণের মাধ্যমে এবং সে-সব আত্মস্থ ও স্বীকরণ করে নিয়ে তাঁর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার বিকাশ ঘটান এবং অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখেন। এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা অর্জনে জীবনানন্দ দাশকে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, এমনকি এক আধুনিক 'পল্লী কবি' জসীমউদ্দীনের কাব্যধারায়ও অবগাহন করতে এবং সেই প্রভাবকে আত্মস্থ করে নিয়ে স্বকীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হয়েছে, তা অনস্বীকার্য। জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' এর পাঠকমাত্রই ঐ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্দীনের রচনার প্রভাব ও পরিগ্রহণের পরিচয় পাবেন, এটাও লক্ষ্য করবেন যে, সে-সব প্রভাব ও পরিগ্রহণকে আত্মস্থ করে নিয়ে—জীবনানন্দ দাশ একজন স্বতন্ত্র কবিরূপে বিকশিত হচ্ছেন, তাঁর নতুন কাব্যভূবন ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠছে। এ-বিষয়ে আমরা পরবর্তী পর্যায়েও তথ্য-তত্ত্বের ভিত্তিতে আলোকপাত করবো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জীবনানন্দ দাশের মাতা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন সেকালের একজন খ্যাতনামা কবি, এবং জীবনানন্দ দাশ যে মায়ের এই কাব্যসাধনার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন, শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতি এবং মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার প্রতিও যে আকর্ষণ সেই সূত্রেও জন্মেছিল তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। রামায়ণ-মহাভারত, লোক-পুরাণ, পুঁথি-গাঁথা এবং হিন্দু-ঐতিহ্যের সঙ্গে, বিশেষভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমার সঙ্গে শৈশব, কৈশোর ও যুবা-বয়সেই যে জীবনানন্দ দাশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল, তা অস্বীকার করা চলে না। এমনটি ঘটেছিল বলেই জীবনানন্দ দাশের হাতে সৃজিত হতে পেরেছে 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ।

জীবনানন্দ দাশের মাতা কবি কুসুম কুমারী দাশ তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় (যা একদা পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ছিল) লিখেছেন : 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।' আমাদের দেশে যুগে-যুগেই এমন অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন, যারা বড় হয়েছেন 'নিজ নিজ কাজে'র মাধ্যমে। কুসুম কুমারী দাশের পুত্র কবি জীবনানন্দ দাশ 'কথার কারবারী' বা কবি-কথাশিল্পী-প্রবন্ধকার হলেও, তাঁর নিজের কাজের জন্যে অর্থাৎ সাহিত্যে-বিশেষত কাব্যে অসাধারণ অবদানের জন্যই তিনি দেশের কৃতী-সন্তানরূপে কীর্তিত হচ্ছেন। জীবনানন্দ দাশের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতা অর্জনের পটভূমি যে শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে বরিশালে নিজ-গৃহে অবস্থানকালে পিতৃ-মাতৃস্নেহে গড়ে উঠেছিল, এ-সত্য অস্বীকার করা চলে না। এ বিষয়ে জীবনানন্দ দাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের 'বাল্যস্মৃতি' থেকেই তার হদিশ মেলে। অশোকানন্দ লিখেছেন, "ছোটবেলায় আমরা মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছি। সে পাঠ খুব বেশীক্ষণের জন্য নয়। খেলবার, বাগানে বেড়াবার, প্রজাপতির পেছনে দৌড়াবার, ঘুড়ি উড়াবার, প্রচুর অবকাশ ছিল। স্নেহের শাসন হয়তো ছিল, কিন্তু আমরা কোনোদিন প্রহার লাভ করিনি।... সুতরাং আমাদের বাল্যজীবন বিশেষ কোনও বিধি-নিষেধ অথবা অতিরিক্ত অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নিষ্পেষ্ট হয়নি। পড়া, লেখা ও দৈনিক জীবনযাপনের মধ্যে অনেকখানি স্বাধীনতা ছিল।... অতি প্রত্যুষে মা গান করতেন ; 'মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে/তোমার বিশ্বের সভাতে/আজি এ মঙ্গল প্রভাতে...' বাবা উপনিষদের শ্লোক আওড়াতেন।... ছোটবেলা থেকে দাদা নানা বিষয়ের বই পড়তে ভালোবাসতেন। তখনকার দিনে আজকালকার মত ছোটদের পড়বার বই বেশি ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারত দাদা অনেকবার পড়েছিলেন। তাঁর মনের খোরাক জোগাবার জন্য বাবা মাঝে মাঝে একটা Exercise Book-এ গল্প ও নানা বিষয়ের সরস রচনা প্রাঞ্জল ভাষায় লিখে রাখতেন। বাবা প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে একবার করে বই-এর দোকানে নিয়ে যেতেন (এবং বিভিন্ন ধরনের বইপত্র কিনেও দিতেন—বর্তমান লেখক) ... দাদা ইংরেজি বা বাংলা কবিতা পড়ছেন, প্রহ্লাদ এক হাঁটু কাদা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনছে দেখা যেত। পড়া শেষ হয়ে গেলে সে বলত, 'খোকাবাবু' আপনি বড় সুন্দর পড়েন।" [বাল্যস্মৃতি, অশোকানন্দ দাশ, ময়ূখ, জীবনানন্দ সংখ্যা, পুনর্মুদ্রণ : 'বিভাব' শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯২]।

অশোকানন্দ দাশের সুদীর্ঘ 'বাল্যস্মৃতি' পাঠ করলে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের আলোকে কবি জীবনানন্দ দাশের মানসগঠন, প্রতিভা-বিকাশের পটভূমি এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মের স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ অনুধাবন সহজ হবে। আর এটাও উপলব্ধি করা যাবে যে, স্থান ও কালের এবং পারিবারিক পরিবেশের ভিন্নতা সত্ত্বেও, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং জীবনানন্দ দাশের মানসগঠনে, কবি-প্রতিভার বিকাশে এবং সৃষ্টিকর্মে সাফল্য অর্জনে প্রায়ই একই প্রক্রিয়া কাজ করেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মানসগঠনে ও কবি-প্রতিভার বিকাশে রামায়ণ-মহাভারত পঠনের অভিজ্ঞতা, রবীন্দ্রনাথের মানস ও কবি-প্রতিভার বিকাশে বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত ও ফারসি সাহিত্য অধ্যয়ন এবং নজরুলের মানসগঠন ও কবি-প্রতিভার বিকাশে ইসলামি আদর্শ ও ইতিহাস-ঐতিহ্যমূলক রচনা, হিন্দু ঐতিহ্যমূলক রচনা, হিন্দু-মুসলিম পুরাণ, লোক-সাহিত্য এবং ফারসি সাহিত্য পাঠ যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সর্বোপরি, ইউরোপীয় সাহিত্য-বিশেষত ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশের মানসগঠন ও কবি-প্রতিভার বিকাশে অশেষ অবদান রেখেছে তা-ও সত্য। হিন্দু মধুসূদন ছিলেন ধর্মান্তরণের মাধ্যমে খ্রিষ্টান, রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দাশ উভয়েই ছিলেন ধর্মে ব্রাহ্ম, আর কাজী নজরুল ইসলাম মুসলমান এবং ইসলামধর্মী হওয়া সত্ত্বেও সর্বধর্মের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবান, এক মহৎ মানবতাবাদী, তাঁর রচনায় রয়েছে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার ও সংগ্রাম-সাধনার কথা। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ—এই তিন মহৎ মানবতাবাদী কবির থেকে বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের এখানেই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য। ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও এবং উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদিতে পাঠ নেওয়ার পরও, জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবি-জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং অনেকটা কাজী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলামের প্রভাবে এবং অনুসরণের ফলে মুসলিম ঐতিহ্যমূলক এবং ধর্মীয় বিষয়েও কবিতা রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। হয়তো জীবনানন্দ দাশের মাতা এবং পিতার উদার চিন্তা-চেতনার প্রভাবও এর পেছনে কাজ করে থাকবে। জীবনানন্দ দাশের ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্যমূলক কবিতার কিছু উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা হলো ;

দীর্ঘ দিবস ব'য়ে গেছে যারা হাসি অশ্রুর বোঝা
চাঁদের আলোকে ভেঙেছে তাদের রোজা
আমার গগনে 'ঈদরাত' কভু দেয়নি যে হায় দেখা
পরাণে কখনো জাগেনি 'রোজার' ঠেকা।

(জীবনমরণ দুয়ারে, ঝরাপালক)

ইসলামি আদর্শ, মুসলিম ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে যাঁরা কাব্য রচনা করেননি, তাঁদের রচনাতেও চরিত্রের স্বাভাবিকতা, পরিবেশের বাস্তবতা এবং চিন্তাধারার বিকাশের প্রয়োজনে কখনো-কখনো মুসলিম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উপাদান গৃহীত হয়েছে। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে যুগে-যুগেই তার পরিচয় মেলে। শুধু মুসলমান কবিদের রচনায়ই নয়, হিন্দু কবিদের রচনায়ও এর স্বাক্ষর আছে। আধুনিক বাংলা কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ এবং আরও অনেকের রচনায়ই বিষয়ানুসারে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু শব্দ ব্যবহারেই নয়, উপমা-চিত্রকল্পেও জীবনানন্দ নজরুলের মতোই এই ঐতিহ্যের নিপুণ ব্যবহার করেছেন। 'শঙন দরিয়া', 'স্বপন সুরা', 'রেখেছি দিওয়ানা করে', 'নাচে জিঞ্জির', 'খেয়ালের খোশ-পেয়ালা', 'গজল গানের রেওয়াজ', 'খুন রোশনাই'—এমনি ধরনের অজস্র শব্দের ব্যবহার জীবানন্দ দাশের কবিতায় রয়েছে। এমন কি 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখেছেন,

'মহামৈত্রীর বরদ তীর্থে—পুণ্য ভরত পুরে
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরিষে নামাজের সুরে সুরে
আহ্নিক হেথা শুরু হয়ে যায় আজান বেলায় মাঝে
মুয়াজ্জেনদের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে ;
জপে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে
সন্ধ্যা উষায় বেদবাণী গায় কোরানের স্বরে স্বরে
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির।'

(হিন্দু-মুসলমান, ঝরাপালক)

জীবনানন্দ দাশের উদ্ধৃত কবিতাংশে অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকটা কল্পনা প্রশ্রয় পেয়েছে, অসামঞ্জস্যও ঘটেছে। তবুও এ-সত্য অনস্বীকার্য যে, সম-বয়সী হওয়া সত্ত্বেও জীবনানন্দ দাশ নজরুলের প্রভাবে এবং মানবিক উদারতার কারণে ও হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রত্যাশায় এ-ধরনের কবিতা রচনা করেন, যদিও পরবর্তীকালে তিনি এই ধারা অব্যাহত রাখেননি। উল্লেখ্য, সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল সেইকালে অর্থাৎ বিশ শতকের বিশের দশকেই খ্যাতিমান কবি, সমসাময়িক—এমন কি পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি কবিদের ওপর নজরুলের প্রভাব প্রবল। জীবনানন্দ দাশে নজরুলের প্রভাব বর্তেছে দেশাত্মবোধ, স্বাদেশিক অনুপ্রেরণা ও সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। নবজাগ্রত চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবিমনে নজরুল স্বাভাবিক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবেই প্রেরণার জোয়ার এনেছেন। রূপতৃষ্ণায় জীবনানন্দ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে ঝুঁকলেও, এই প্রবণতা তাঁর চিত্তে অধিককাল স্থায়ী হয়নি, যেমন স্থায়ী হয়নি নজরুলের উদ্দামতার প্রতি তাঁর প্রাথমিক আকর্ষণ। জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসৃষ্টি ও গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিকে না ঝুঁকে হয়তো সহজ নিরাভরণ সৌন্দর্যচেতনায় সত্যেন দত্তে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সাম্যবাদী চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধও এর পেছনে কাজ করে থাকবে। কবি জীবনের সূচনাপর্বে মনের অপরিণত রূপ তাঁকে গভীরতার দিকে টেনে নেয়নি। এ-সময়কার সমাজ-পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পটভূমি এবং কাব্যপ্রয়াসের পটভূমিও স্মরণযোগ্য। "তখনকার দিনের নিরুত্তাপ সমাজ-জীবনে নতুন অনুভূতির উত্তাপ নিয়ে অকস্মাৎ যে ভাববন্যা এসে উপস্থিত হয়েছিল—তাকে আমরা বলতে পারি অসহযোগ আন্দোলন। সুপ্ত দেশাত্মবোধ জেগে উঠে বাঙালির মনে যতোটা সাড়া তুলল, বাংলাদেশের আবেগপ্রবণ কবিদের মনে তার চেয়ে অনেক বেশি তা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাংলা কবিতায় অসহযোগ আন্দোলনের দান অবিস্মরণীয়। সত্যেন দত্তের দেশাত্মবোধই তাঁর শেষের দিকের কাব্যগুলোকে বিবেকানন্দনীয় সমাজচেতনায় রঞ্জিত করে দিয়ে গেছে। তা'ছাড়া এই দেশাত্মবোধ—জাতিকে নিবিড় আত্মীয়বোধে চিনে নেওয়া—কুসংস্কারে নাগপাশ মাকড়শার জালের মতো হেলায় দু'পাশে সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থেকেই আরেকজন কবির নবজন্ম হল—তিনি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। সত্যেন দত্তীয় কাব্যভঙ্গীর পথে যাঁরা সার্থকতার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই নজরুলের পথে দাঁড়ালেন। 'ঝরাপালক' এর যুগে কাব্যরচনার শৈশবে জীবনানন্দের মধ্যে তাই আমরা একটি প্রাণপূর্ণ বিদ্রোহী সত্তার আবির্ভাব দেখতে পাই। সত্যেন দত্তের সাবেকী পথ ছেড়ে তাঁরই নতুন পথে যে জীবনানন্দের বিচরণ, সেই পথচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় 'ঝরা পালক' এর 'দেশবন্ধু', 'হিন্দু-মুসলমান', 'বিবেকানন্দ', 'পতিতা' প্রভৃতি কবিতায় :

নৃত্য-গীত হাসি-অশ্রু উৎসবের ফাঁদে
হে দুরন্ত দুর্নিবার—প্রাণ তব কাঁদে !
ছেড়ে গেলে মর্মন্তুদ মর্মর-বেষ্টন,
সমুদ্রের যৌবন-গর্জন
তোমারে ক্ষেপায়ে দেছে, ওহে বীর-শের
টাইফুন-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছে
অতীত আখের
হে জলধি পাখী !

(নাবিক, ঝরা পালক)

এ-ধরনের কবিতাগুলোতে আমরা নজরুলের ধ্বনিই শুনতে পাই। নজরুলের সাহচর্য ছাড়া সেদিন মুক্ত যৌবন তার ভাষা খুঁজে পায়নি। সত্যেন দত্তে যৌবনের উদ্দামতা ছিলনা, মোহিতলালের যতটুকু ছিল তাও উদ্দেশ্যমূলক—তাই গম্ভীর। নির্বাধ, উদ্দেশ্যহীন, যুক্তিহীন যৌবনের প্রাণচঞ্চলতায় নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আবেগ-ঘন মন নিয়ে জীবনানন্দ যে নজরুলের দিকেই ঝুঁকে পড়বেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই [সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আধুনিক কবিতার ভূমিকা, পৃ. ৩০]। উল্লেখ্য, জীবনানন্দ দাশ পরবর্তী জীবনে 'নির্জনতম কবি' হিসাবে চিহ্নিত ও খ্যাত হলেও বিশ ও ত্রিশের দশকে রাজনৈতিক চেতনাও তাঁর মধ্যে ছিল, এবং তিনি রাজনীতি নিয়েও নজরুলী-ঢঙে কবিতা লিখেছেন, বিশের দশকে নজরুল-পরিচালিত ও সম্পাদিত 'গণ-বাণী' পত্রিকার প্রচ্ছদ-কভারেও জীবনানন্দ দাশের কবিতা মুদ্রিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও উল্লেখযোগ্য যে, নজরুলের অনুজপ্রতীম ও প্রীতিধন্য ছান্দসিক কবি আবদুল কাদিরও সেকালে অর্থাৎ তাঁর কাবসাধনার প্রাথমিক পর্বে নজরুলের প্রভাবে অনেক রাজনৈতিক কবিতা লিখেছেন, আর সে-সব নজরুল-সম্পাদিত 'লাঙল' ও 'গণবাণী'তে মুদ্রিত হয়েছে।

আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান পুরুষ এবং বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং তিরিশের পঞ্চপ্রধান কবি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তীসহ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য খ্যাতিমান কবি—এমনকি চল্লিশের দশকের খ্যাতিমান কবিদের কাব্যসাধনার শুরু, প্রতিভার বিকাশ এবং খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন ব্রিটিশ শাসনামলে, সেই পরাধীনতার যুগে। ব্রিটিশ শাসনামলেই বাংলা কাব্যের তথা বাংলা সাহিত্যের বিশ্বস্বীকৃতি লাভ ঘটে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্তির মাধ্যমে। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি ছিল রাষ্ট্রভাষা এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যমও ছিল ইংরেজি। ফলে ইংরেজির ব্যাপক চর্চা ছাড়াও, ইউরোপীয় সাহিত্য বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের এবং বিশেষভাবে ইংরেজি কাব্যের চর্চাও ছিল সুধীমহলে, সাহিত্যসমাজে ব্যাপক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঊনিশ শতকে বাংলা কাব্যে যে আধুনিকতার নতুন ধারা ও চিন্তা-চেতনা বয়ে আনেন তা যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফল, তেমনি ইংরেজি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে নবজাগরণ তথা রেনেসাঁরও ফল। বাংলা কাব্যে স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি চেতনা এবং জাতীয়তাবোধ ও ঐতিহ্যানুরাগ কোনো না কোনোভাবে সর্বযুগেই ছিল ; কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামলে বিদেশী শাসক ও তাঁদের সংস্কৃতির সংস্পর্শে এবং সংঘর্ষে স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি এবং নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্যবোধ নবরূপে জাগ্রত হয়। মনে রাখতে হবে, বিশ্বসাহিত্য বিশেষত ইউরোপীয় সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে বিদেশী সাহিত্যে বিশেষভাবে অবগাহন করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে 'মহাকাব্য' রচনা করলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটের জন্ম দিলেন—সেও তো ঊনিশ শতকের এবং ব্রিটিশ পরাধীনতার যুগের ঘটনা। মধুসূদন মধ্যযুগের আধ্যাত্মিকতা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মানসকেই কাব্যের উপজীব্য করে তুললেন, যদিও ঘটনা সংগ্রহের জন্য তাঁকে রামায়ণের কাছেই যেতে হয়েছে। নবযুগের ধর্ম হিসাবে পৌরাণিক কাহিনীকে অবশ্য মধুসূদন নতুনরূপে উপস্থিত করেছেন, 'রাবণকে গ্রান্ড ফেলো' হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টিকর্মে 'রাম-লক্ষণ ম্লান-জ্যোতি এবং বিভীষণ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিসাবে ঘৃণ্য।' প্রচলিতের বিরুদ্ধে এবং দেবতাবাদের বিরুদ্ধেও মধুসূদন বিদ্রোহের নিশান তুলে ধরেছেন, মানবতাবাদের অধিষ্ঠান ঘটিয়েছেন। তবে এ-ও স্বীকৃত সত্য যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাতৃভাষাপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার কথা বললেও, তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ করেননি, সমর্থন জানাননি উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের সূচনা—১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিপ্লব'-এর প্রতি। উল্লেখ্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূচনা করলেও তাঁর মহাকাব্যে সাধারণ মানুষের অধিষ্ঠান ঘটেনি, স্থান পায়নি তাদের জীবনে প্রচলিত ভাষা বা মুখের বুলি। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম রূপকার এবং প্রধানত মধ্যবিত্ত মানসের রূপকারও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গ্রহণেচ্ছু ও সৃজনধর্মী মনের, শিল্পদৃষ্টির কল্যাণে বাংলা সাহিত্যকে বহু বৈচিত্র্যমণ্ডিত, সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী করেছেন। তাঁর রচনায় অধ্যাত্মিক ও মানবিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, চেতনার সূক্ষ্ম কারুকাজে বাংলা কাব্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও মহিমাময় করে তুলেছেন। উদার মানসচেতনায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ নানা কুসংস্কারের আগল ভেঙে, কাব্য আঙ্গিকের ও কাব্যভাষার পরিবর্তন সাধন করে নানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপরীতিতে মানবমুক্তির বাণীই উচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাজনীতি এবং স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতাপ্রীতি ইত্যাদি সবকিছুকেই রচনার উপজীব্য করেছেন। তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নজরুলের মতো বিদ্রোহ না করলেও, ব্রিটিশ শাসন ও অত্যাচার-নিপীড়নের তীব্র সমালোচনা করেছেন, 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশের প্রদত্ত 'নাইট' উপাধিও বর্জন করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিমানস ও কাব্যসাধনার এই ধারা এবং উভয়ের প্রতিভা বিকাশের পটভূমি জানা দরকার এই কারণে যে, উনিশ ও বিশ শতকের—এই দুই কবির প্রভাব তাঁদের সমসাময়িক এবং উত্তরসূরি কবিদের মধ্যেও বর্তেছে। এমনকি তিরিশের কবিদের কেউ কেউ মাইকেল এবং রবীন্দ্র-কাব্যধারার সমন্বয়ের চেষ্টাও করেছেন, তাঁদের কবিতার ভাষায়, ছন্দে এবং আঙ্গিক ও রূপরীতিতে। অন্যদিকে তিরিশের কোনো কোনো কবি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যধারার সমন্বয়ের চেষ্টাও করেছেন, তাঁদের কবিতার ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে। তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে'র রচনায় যে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বর্তেছে সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অপর দিকে, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রভাব যে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের কবিতায় বর্তেছে তা অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য, কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্র-কাব্যের এবং কাব্যধারার বিরোধিতা করেননি, ত্রিশের আধুনিক কবিদের মতো রবীন্দ্র-কাব্যধারার বিরুদ্ধে ঘোষণা করেননি কোনোরূপ অনাস্থা বা বিদ্রোহ। বরং নজরুল সমগ্র বাংলা কাব্যের বিশেষত রবীন্দ্রকাব্যের ধারাকে অধিগত, আত্মস্থ ও স্বীকরণ করে নিয়ে, ঐতিহ্য উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করে, বাংলা কাব্যে ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে নতুনত্ব এনে—বিচিত্র বিষয়কে বিশেষত সমকালীন রাজনীতি, স্বাধীনতার ও জাতীয় নবজাগরণ আন্দোলন এবং বৃহত্তর জনজীবনকে উপজীব্য করে, বিদ্রোহী চেতনার রূপায়ণের মাধ্যমে বাংলাকাব্যে নতুনত্ব এনেছেন, রবীন্দ্রোত্তর যুগে 'যুগ-স্রষ্টা' ও 'জাতীয় কবি'-রূপে পরিকীর্তিত হয়েছেন। তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি এবং রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব জীবনানন্দ দাশ নজরুলের ভাবনা-চিন্তা ও কবিতার প্রভাব-বলয়ে কিভাবে তাঁর কবি-জীবনের সূচনাপর্বে অন্তরিত হয়েছিলেন, সে-কথা এ নিবন্ধের পূর্ববর্তী অধ্যায়েই উদ্ধৃতিসহ উল্লেখিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, বিশ শতকের বিশের দশকে উপমহাদেশের বিশেষত অবিভক্ত বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটে, এবং অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে জীবনানন্দ দাশ বিদ্রোহী কবি নজরুলের কাব্যধারায় প্রভাবিত হলেও মূলত রোমান্টিক মানসপ্রবণতার অধিকারী এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার এবং মধ্যবিত্ত মানসেরও রূপকার জীবনানন্দ দাশ ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই অধিকতর সংলগ্ন। তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'ঝরাপালক' এর অনেক কবিতায় এর পরিচয় দীপ্তিমান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'আমি এক জন্ম রোমানিটক'। তিনি নিজেকে 'মডার্ন বাউল' রূপেও আখ্যায়িত করেছেন। জীবনানন্দ দাশও যে মূলত 'রোমান্টিক' এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার সেটা তাঁর সূচনাপর্বের কবিতায়ই লক্ষ্য করা যায়, অনুভব করা চলে। নিজের কবিসত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আমি কবি—সেই কবি'-তে সেই সুদূরকালেই বলেছেন,

আমি কবি—সেই কবি—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি' হেরি ঝরা পালকের ছবি !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনমনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙুল মেঘের পানে।
মৌন নীলের ইশারায় কোন কামনা জাগিছে প্রাণে।
বুকের বদলে উথলি উঠিছে কোন কাজরীর গানে
দাদুরী কাঁদানো ... দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি'।
স্বপ্ন সুরার ঘোরে
আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা করে'।

কাব্যরচনার প্রথম পর্বেই জীবনানন্দ দাশে রোমান্টিক স্বপ্নলোকে পরিভ্রমণ ও কল্পনার গহনে যাত্রা এবং বাস্তবের পটে ফিরে আসার দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মানস-চেতনা ও বেদনাবোধের পরিচয় আরও স্পষ্ট গাঢ়বদ্ধ হয়েছে 'নীলিমা' শীর্ষক কবিতায় :

রৌদ্র ঝিলমিল
উষার আকাশ, মধ্য নিশীথের নীল
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা দাও তুমি বারে বারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে।

(নীলিমা, ঝরা পালক)

একই 'নীলিমা' শীর্ষক কবিতায় জীবনানন্দ দাশের আত্ম-উন্মীলন এবং স্বগত-সংলাপের মতো উচ্চারণ :

চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছে মায়াবী
জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি
কোন দূর যাদুপুর রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী।

জীবনানন্দ দাশ রোমান্টিক মানসপ্রবণতার অধিকারী এবং স্বপ্ন সৌন্দর্যবোধের রূপকার হলেও তিনি তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি এবং রবীন্দ্র-রোমান্টিকতা আর মাইকেলী ক্লাসিকতার সমন্বয়কামী সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো উচ্চারণ করেননি যে, 'সহেনা সহেনা এই জনতার জঘন্য মিতালী'। এর কারণ, জীবনানন্দ দাশ তাঁর সমসাময়িক ও সহযাত্রী কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো নগরবাসী এবং সম্পূর্ণ নাগরিক কবি ছিলেন না, সমাজের উচ্চকোটিতেও তাঁর অধিবাস ছিল না। জীবনানন্দ দাশের শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং চাকুরি-জীবনের এক বৃহৎ অংশই কেটেছে মফঃস্বলে—পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) বরিশালের শহরে ও গ্রামীণ পরিবেশে। গ্রাম বাংলার বিশেষত বরিশাল অঞ্চলের গ্রামীণ পরিবেশ ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য মহিমার সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের অন্তরঙ্গ ও গভীর সম্পর্কের বিষয়টি যেমন কবি-ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের 'বাল্যস্মৃতি' পাঠ করে জানা যায়, তেমনি জীবনানন্দ দাশের কবিতা—বিশেষত 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ পাঠ করেও অনুভব এবং উপলব্ধি করা চলে। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, নজরুলের প্রভাবে জীবনানন্দ দাশ রাজনীতি-সচেতন হয়েছিলেন, রাজনীতি বিষয়ক কবিতাও রচনা করেন, জনহৃদয়ের সঙ্গে তাঁর এক ধরনের মানস-আত্মীয়তাও জন্ম নিয়েছিল। সুতরাং, রোমান্টিক জীবনানন্দ দাশের পক্ষে জনবিরোধী কোনো বক্তব্য উচ্চারণ সম্ভব হয়নি। রাজনীতির সঙ্গে এবং সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষত তেমন সম্পর্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না রাখলেও জীবনানন্দ দাশের পরবর্তীকালের কবিতায়ও পরোক্ষভাবে এবং নানা রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে রাজনীতি ও সমাজনীতি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা-বেদনা বিধৃত হয়েছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাশই নয়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও ছিলেন মূলত রোমান্টিক মানসপ্রবণতার অধিকারী এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার। তাঁর কবিতায়ও বিদ্রোহী চেতনার পাশাপাশি প্রেম, প্রকৃতি এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যমহিমা অজস্র কবিতা-গানে বিধৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, 'জনতার কোলাহলে একা বসে ভাবনার' বিশেষ মানসপ্রবণতা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আজীবন নানারূপে ও রঙে ধরা দিয়েছে। এই মানসপ্রবণতার নিরিখেই সম্ভবত বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জন', 'নির্জনতম' কবি আখ্যা দিয়েছিলেন।

কবি সমাজ-বাসিন্দা এবং সজীব প্রাণসত্তা ও প্রতিক্রিয়া-উন্মুখ চিত্ত হিসাবে দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম—সব কিছুকে তার কাব্যের বিষয়ীভূত এবং অন্তর্গত করে নিতে পারেন, কিন্তু সবকিছুকেই আসতে হবে সৌন্দর্যের রূপে, কল্পনাকে তৃপ্তি দিয়ে। জীবনানন্দ দাশ—এই বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "অন্য সমস্ত প্রতিভার মতো কবি-প্রতিভার কাছে শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হলে যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাঁকে খুঁজতে হবে ; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজ- নীতি নেই, ধর্মও নেই—কিংবা সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ-সমস্ত জিনিস যেন এ-সমস্ত জিনিস নয় আর ; এ-সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ সারবত্তা ও ব্যবহারিক প্রচার অন্যান্য মনীষী ও কর্মীদের হাতে যেন—কবির হাতে আর নয়।" [কবিতার কথা, জীবনানন্দ দাশ]।

জীবনানন্দ দাশের উপরোক্ত বক্তব্য পাঠে তাঁকে কলাকৈবল্যবাদী কিংবা 'শিল্পের জন্য শিল্প' নীতিতে বিশ্বাসী মনে হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্যও উপলব্ধ হবে যে, জীবনানন্দ দাশের মতে, কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আমরা জানি, কবিতার বিষয় বলে আলাদা বা স্বতন্ত্র কোনো বিষয় নেই, থাকতে পারে না। বিশ্ব চরাচরের এবং মানবজীবনের সকল বিষয়ই কাব্যের উপজীব্য হতে পারে, এবং যুগে-যুগে তা হয়েছেও। সবকবি এবং বিশেষভাবে বলতে গেলে রোমান্টিক মানসপ্রবণতার অধিকারী কবি এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার কবিও অনেক সময়ই শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব ও ভূমিকা কি, তিনি কি সমাজ-সমস্যার ও জীবন-সমস্যার প্রত্যক্ষ রূপকার হবেন, নাকি শুধু শিল্প-সৃষ্টির সাধনায় ব্রতী থাকবেন—এ নিয়ে মানস-দ্বন্দ্বে ও টানাপোড়েনে ভোগেন। জীবনানন্দ দাশেরও এ-ধরনের দ্বন্দ্ব-সংশয় এবং মানসিক টানাপোড়েন ছিল। অনেক প্রতিভাবান ও সৃষ্টিধর্মী বড় কবির মধ্যেও দ্বৈতভূমিকার পরিচয় মেলে—অর্থাৎ তারা সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেমন কাব্য রচনা করেন, তেমনি শিল্প-সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও কাব্যসাধনায় ব্রতী হন। বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা তাঁর পরবর্তী কাজী নজরুল ইসলামের রচনায়ও কবির দ্বৈত ভূমিকার পরিচয় পাই। সেখানে এঁরা শুধু কবি নন, 'সমাজের কল্যাণকামী দিশারী' পুরুষও। কিন্তু সমাজ-সত্তার সাথে কিছুটা পরিমাণে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও জীবনানন্দ দাশের কাব্যসাধনার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ভূমিকা ঠিক অনুরূপ নয়। আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর 'শুদ্ধতম কবি' শীর্ষক গ্রন্থে যাকে বলেছেন "ভিজে সামাজিক বেদনা, রূঢ় সামাজিক ব্যঙ্গ, কঠিন সামাজিক বাস্তব বেদন-ব্যঙ্গ-বাস্তব' ইত্যকার বিষয়াবলীকেও জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় ফলিয়ে তুলেছেন সামাজিক দায়িত্ব চেতনায় নয়, বরং বলা যেতে পারে কবি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্তারই উন্মীলন অথবা উৎসারণ হিসাবে। নজরুলে এসব এসেছে দায়িত্ব সচেতনতা ও কর্তব্যবোধের পথ ধরে—নজরুলের সৃষ্টি-প্রতিভা এসবকে অনায়াসে করে তুলেছেন কাব্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত, কিন্তু জীবনানন্দ দাশ কবিতাকে সামাজিক দায়িত্ব পালন কিংবা কল্যাণ-সাধনের হাতিয়ার মনে করেননি, তিনি কবিতাকে দেখেছেন জীবনেরই ভিন্নরূপ উৎসারণ হিসাবে—স্বপ্নকল্পনা ও সৌন্দর্যের পথ ধরে যার উদ্ভাসন এবং অমিত বিস্তার। বস্তুত, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং বাস্তব-জীবনের সমস্যা-সংকট এবং সংগ্রাম-সাধনার কাব্যরূপায়ণের প্রবণতা এবং ক্ষমতা সকল কবির সমভাবে থাকে না।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' এ রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে নজরুলের অনুসরণে কিছু কবিতা রচনা করলেও তিনি স্বল্পকালের মধ্যেই নিজের স্বতন্ত্র কবিমানস, কবি-প্রকৃতি ও চারিত্র্য অবিষ্কার করেন। জীবনানন্দ দাশ 'যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—সেই শিল্পের রাজ্যে তাঁকে খুঁজতে হবে—এই বিশ্বাস থেকে নতুন ধরনের কাব্যরচনায় ব্রতী হন, যার সূচনা 'ঝরা পালক'-এর কিছু কিছু কবিতার মধ্যেই স্ফূরিত হয়েছিল। জীবনানন্দ দাশের কবিমানসের অন্তর্মুখী প্রবণতা এবং চেতনা, সেই সঙ্গে তাঁর বিশুদ্ধ শিল্পগত ধ্যান-ধারণা অর্থাৎ কবিতা-শিল্প জীবনানন্দে কিভাবে গড়ে উঠেছে, সমসাময়িকদের প্রভাব-বলয় থেকে কিভাবে বেরিয়ে এসে তিনি নিজের শিল্পভুবন গড়ে তুলেছেন, তা অনুধাবন করতে হলে জীবনানন্দের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহের বিশেষত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'রূপসী বাংলা' এবং তাঁর গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত কাব্যসমগ্রের শরণ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, জীবনানন্দ দাশ নিজস্ব প্রতিভাবলে, শিল্প-সচেতনতায় এবং শ্রমে ও সাধনায় রবীন্দ্রোত্তর যুগে এবং তিরিশের কবিদের মধ্যেও স্বতন্ত্র পথ কেটে নিয়েছেন। কিন্তু এজন্য তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কাব্যধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়নি। ত্রিশের কবিরা এবং 'কল্লোল' যুগের কবিরাও রবীন্দ্রকাব্যধারার বিরুদ্ধে—তাঁর রোমান্টিক-আধ্যাত্মবাদী এবং 'গীতললিত-কল্লোলিত' ধারার বিরুদ্ধে অনাস্থা উচ্চারণ করেছিলেন, বিদ্রোহও ঘোষণা করেছিলেন। ত্রিশের অন্যতম প্রধান কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন, "যুগধর্মে দীক্ষা গ্রহণ তার (আধুনিক বাঙালী কবির) অবশ্য কর্তব্য। এ কথা না মেনে তার উপায় নেই যে, প্রত্যেক সৎ কবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর, এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে দেশ কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাদের সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে উভয়ের যোগফলকে যদি পরীর রাজ্য বলা যায়, তাহলে বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।' (সূর্যাবর্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৩৬)। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আরও বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশতঃ জগৎ কেবল ভাবের উপাদান নির্মিত নয়, তাহাতে বস্তুর দৌরাত্ম্যই সর্বব্যাপী ; এবং এই রুক্ষ, অভব্য বস্তুতন্ত্রের পটভূমিতে 'বলাকা'র গম্ভীর শালীনতা কেমন ব্যর্থ ঠেকে।' [ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, কুলায় ও কালপুরুষ, পৃ. ৪৯] কিন্তু জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্র-কাব্য সম্পর্কে সম্ভবত এ-ধরনের কোনো মন্তব্য করেননি। ত্রিশের কবিরা ইউরোপীয় সাহিত্য—বিশেষত ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের প্রধানত কাব্য-সাহিত্যের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং তারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা থেকে ভিন্ন পথে পদচারণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশের ভাষায়, "আধুনিক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য দিকটার অভ্যুত্থান হ'ল নতুন সময় তার নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে। মধুসূদন যেমন বিদেশী সাহিত্যিকদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী, রবীন্দ্র-বঙ্কিমও তাঁদের কাছে অল্পাধিক গিয়েছিলেন ; বর্তমান কবিদেরও অল্পবিস্তর পরস্পর নিঃসক্ত বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী তেমনি বোদলেয়র ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের থেকে শুরু করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়েট্‌স, এলিয়ট ও পাউন্ডের নিকটে গেল খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমা সে সব জায়গায় খুঁজে পেয়েছে ব'লে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালি কবির তেমন মন জোগাতনা ; অন্তত যাঁরা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মার্লামে ও পল ভারলেন, রঁসার ও ইয়েটস ও এলিয়টের সদর্থক নব্য নঙর্থক মনন— বিচিত্রার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কাব্যলোক থেকে উচ্চারণ করলেন 'এ পাখার বাণী' যেখানে শেষ পর্যন্ত কবিগুরুর অভাবনীয় ভাবনা-প্রতিভা আমাদের জানিয়ে গেল যে, 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ তখন এ জিনিসকে মর্মান্তিক শ্রদ্ধায় সমসাময়িকতার অসাচ্ছন্দ্যের থেকে ঘুচিয়ে দিয়ে আধুনিকেরা বর্তমান সময়ের জন্য অন্তত—আধুনিকেরা গ্রহণ করলেন এলিয়টকে ...।" [রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, জীবনানন্দ দাশ] আবু সয়ীদ আইয়ুব দত্তের মতে, "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক কবি ও কাব্যতত্ত্বকারদের মতের দিক থেকে যতটা গরমিল, তার চেয়ে অনেক বেশি বৈপরীত্য মনের গড়নের দিক দিয়ে ; হৃদয়াবেগের প্রতিন্যাসের দিক দিয়ে। সে-বৈপরীত্য মূলত আস্তিক ও নাস্তিক হৃদয়-মনের। ভগবান মানা না-মানার কথা আমি বলছিনা, আমি বলছি জগৎ সংসারের প্রতি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মনোভঙ্গীর কথা : একদিকে বিস্ময় অনুরাগ আগ্রহ ও আনন্দ ; অন্যদিকে অনীহা, বিরক্তির প্রত্যাখ্যান ও তিক্ততার কথা।" [কাব্যে আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৮৮০-৮১ শক]

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতি এবং 'ললিত-গীত-কল্লোলতা'র বিরুদ্ধে এক ধরনের অনাস্থা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখের কাব্যধারার মধ্যেই অন্তরিত ছিল। তবে 'কল্লোল'-এর কবিরাই রবীন্দ্র-বিরোধিতার কথা সরবে উচ্চারণ করেন এবং তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা ও কাব্যরীতি বর্জন করে নতুন ধরনের কবিতা রচনার চেষ্টা করেন, এবং সে উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় বিশেষত ইংরেজি ও ফরাসি-সাহিত্যের ভাণ্ডারে হাত পাতেন। জীবনানন্দ দাশ ইউরোপীয় সাহিত্যের বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের শুধু অভিনিষ্ট পাঠকই ছিলেন না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকও ছিলেন। তাঁর শিক্ষক পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন গ্রন্থানুরাগী এবং একজন প্রবন্ধ লেখকও। বরিশালে তাঁদের নিজেদের বাসগৃহ 'সর্বানন্দ ভবনে' ছিল সমৃদ্ধ পাঠাগার। জীবনানন্দ দাশ তাঁর জ্ঞানযোগী পিতা সম্পর্কে লিখেছেন, "একমাত্র জ্ঞানযোগই যে বাবার অন্বিষ্ট ছিল সে-কথা সত্য নয়, কিন্তু মধ্যবয়স পেরিয়েও অনেকদিন পর্যন্ত সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান—এমন কি গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় তাঁকে প্রগাঢ় হয়ে থাকতে দেখেছি—মানুষের জীবন ও চরাচর সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব একটা বিশুদ্ধ ধারণায় পৌঁছবার জন্যে। নিজের হিসেবে পৌঁছতে পেরেছিলেন তিনি। উচ্ছ্বাস দেখিনি কখনও তাঁর, কিন্তু জীবনে অন্তঃশীল আনন্দ স্বভাবতই ছিল—সব সময় প্রায়। কিছু গদ্য ছাড়া বাবা সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেননি, কিন্তু পাঠ করেছিলেন অনেক, আলোচনার প্রসারে ও গাঢ়তায় আমাদের ভাবতে শিখিয়েছিলেন, দৃষ্টি তিনিই খুলে দিয়েছিলেন।" জীবনানন্দ দাশের এই স্মৃতিচারণ ও বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট যে, জ্ঞান-সাধনা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা এবং কাব্যসাধনার প্রেরণা তিনি ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতি এবং রোমান্টিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হলেও, হয়তো পারিবারিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের কারণেই ব্রাহ্ম-পরিবারের সন্তান জীবনানন্দ দাশ ত্রিশের আর পাঁচজন কবির মতো বামপন্থী ভাবধারায় ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-চেতনায় প্রাণিত হননি। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় জীবন-জগৎ, সমাজ-সভ্যতা, ব্যক্তিজীবন ও সামষ্টিক জীবন এবং তাদের সমস্যা-সংকট, মূল্যবোধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবক্ষয় ইত্যাদি বহু কিছুই বিধৃত হয়েছে, তবে সে-সব রূপ পেয়েছে শান্ত, স্নিগ্ধ ও স্থিতধীরূপে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ইত্যাদি সংকট তাঁকে ভাবিত ও পীড়িত করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি স্বভাবের যে মৌল চারিত্র্য অর্থাৎ আত্ম-অন্তর্মুখিনতা এবং বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সবকিছুর দিকে তাকানো, সুখ ও দুঃখবোধকে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে এবং অনুভূতির গভীরে ধারণ—তা তিনি বিসর্জন দেননি, কখনো তেমন উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেননি। হয়তো এ কারণেই, জীবন-জগৎ, সমাজ-সংসার এবং 'মহাপৃথিবী' সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নানা দৃষ্টিকোণ আর অনুভূতি-উপলব্ধি থেকে বহু কথা ও ভাবনা-চিন্তা উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে 'নির্জনতম' কবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ নৈরাশ্যের সুরে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো উচ্চারণ করেননি ; 'ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কি ফল পাবে/ মনস্তাপেও লাগবেনা আর জোড়া।'

কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা সমাজ-সীমার বাসিন্দা হলেও, সৃষ্টির মুহূর্তে তারা নিঃসঙ্গ জগতের অধিবাসী এবং নির্জনতমও বটে ; সে-অর্থে জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম' কবি বা 'নিঃসঙ্গ' কবি বলা চললেও, ব্যক্তি-মানুষ জীবনানন্দ দাশ যে নিছক গম্ভীর প্রকৃতির এবং গুমড়া-মুখো ব্যক্তিসত্তা ছিলেন না, তা নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট : "বাইরে থেকে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা তাঁকে নির্জন গম্ভীর, নির্জন স্বপ্নলোকবাসী বলেছেন ; বলেছেন সর্বক্ষণ একটা অদৃশ্য দূরত্বের বেষ্টনী তৈরি করে তাঁর নিজের চারিদিকে তিনি সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন। কিন্তু কত সময় দেখেছি স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসে হাসি পরিহাসে, কৌতুক গল্পে কেবলমাত্র আমাদের সঙ্গেই নয়, বাইরেরও যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে যেতে সঙ্কোচ করেনি তাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতেন। এত মজার মজার কথা বলতে পারতেন যে, হেসে কুটিপাটি হয়ে যেতে হতো। যে মানুষ অত গুরু-গাম্ভীর্যের কবিতা লিখতেন, তিনি যে অমন চারিদিক উচ্চকিত করে প্রকম্পিত হাসি হাসতে পারতেন, বা অন্যকেও হাসিয়ে হাসিয়ে ক্লান্ত করে দিতে পারতেন, তা যেন না দেখলে বিশ্বাস করাই যায় না।" [কাছের জীবনানন্দ, সুচরিতা দাশ] জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যেমন গুরু-গাম্ভীর্যের পরিচয় মেলে, তেমনি লঘু-পরিহাস, ব্যঙ্গ-কৌতুক এবং হাস্যরসেরও আস্বাদন পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশ ছিলেন মূলত প্রকৃতিপ্রেমিক, স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার, তিনি ছিলেন মানবতাবাদী এবং শুভ ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী। স্বপ্ন, সৌন্দর্য, সুখ ও শান্তি ছিল তাঁর আরাধ্য। যেখানেই তিনি এসবের ব্যত্যয় ও বিপর্যয় লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই তাঁর মানবিক মূল্যবোধ জেগে উঠেছে, ব্যথিত হৃদয় ক্ষরিত হয়েছে, তিনি কবিতায় এসবের কথা যেমন গুরু-গাম্ভীর্যের সঙ্গে, প্রশান্ত ও স্থিতধী চিত্তে উচ্চারণ করেছেন, তেমনি ব্যথাহত হৃদয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুকের সঙ্গেও বলেছেন, কখনো-কখনো আশ্রয় নিয়েছেন রূপক ও প্রতীকের। ব্যক্তিহৃদয়ের বেদনার কথা জীবনানন্দ দাশ বিধৃত করেছেন, তিনি লিখেছেন দৈশিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক সমস্যা-সংকট আর মানবিক বিপর্যয়ের কথা, সভ্যতার সংকটের কথা। জীবনানন্দ দাশ ইউরোপীয় সাহিত্যে এবং বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে অবগাহন করলেও তিনি স্বদেশ ও নিজের ঐতিহ্যের কথা কখনো বিস্মৃত হননি, তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ এবং অন্তিমকাল কলকাতা মহানগরীতে কাটলেও মনোগতভাবে তিনি ছিলেন গ্রাম-বাংলার তথা বরিশালের অধিবাসী। যেখানেই কর্মব্যাপদেশে অবস্থান করুন না কেন, তিনি আজীবন মনোগতভাবে এবং কল্পনার জগতে অধিবাস করেছেন নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমার মধ্যে, গ্রাম-বাংলায়।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যালোচনা ও তাঁর কবিতার মূল্যায়ন আমার এ-রচনার মূল লক্ষ্য বা অভীষ্ট নয় ; প্রকৃতিপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক এবং শুভ ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা জীবনানন্দ দাশের অর্থাৎ ব্যক্তি ও কবি জীবনানন্দ দাশের কবি-চারিত্র্য এবং প্রতিভা বিকাশের স্বরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে ধরাই অভীষ্ট। জীবনানন্দ দাশের কিছু কবিতার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি থেকেই এখানে বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। এ নিবন্ধের গোড়াতেই জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' থেকে কিছু কবিতাংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। নিচে কবির অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কিছু কবিতাংশ উদ্ধৃত হলো :

১. জীবনের শুভ অর্থ, ভালো করে জীবন ধারণ
অনুভব ক'রে তবু তাহাদের কেউ কেউ আজ রাতে যদি
ঐ জীবনের সব নিঃশেষে সীমা
সমুজ্জ্বল, স্বাভাবিক হয়ে যাবে মনে ভেবে
স্মরণীয় অঙ্কে কথা বলে,
তা'হলে সে কবিতা কালিমা
মনে হবে আজ?

২. আজকে সমাজ
সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর
তিমির বিদায়ী অনুসূর্যের কাজ।

৩. --তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।

৪. তিমির হননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমির বিলাসী?
আমরা তো তিমির বিনাসী
হতে চাই।

আমরা তো তিমির-বিনাশী।

৫. তবুও ভোরের বেলা বারবার ইতিহাসে সঞ্চারিত হয়ে
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হয়।—

৬. তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে যে-কিছু উদ্ধৃতাংশ উপস্থাপিত হলো, তা থেকেই স্পষ্ট যে তিনি তথাকথিত 'নির্জনতম' কবি হলেও, জীবন-জগতে এবং মানব-সংসারের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তি ও কবিসত্তার নোঙর বাঁধা, তিনি মানবতাবাদী, শুভ ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী এবং জীবনধর্মী আর সত্য, সুন্দরে বিশ্বাসী এবং আশাবাদী, যদিও তিনি উচ্চারণ করেছেন যে, 'কোথাও আঘাত ছাড়া--তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।' প্রকৃতিপ্রেমিক, স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার এবং আশাবাদী কবি জীবনানন্দ দাশ পৃথিবীর প্রতি, মানবসভ্যতার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বাস থেকে কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে উচ্চারণ করেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

২. যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের চোখে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শান্তি অথবা সাধনা

শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। ব্রাহ্ম-পরিবারের সন্তান এবং বেদ ও উপনিষদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত, ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক জীবনানন্দ দাশ বিদ্রূপের সুরে এবং ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে উপরোক্ত কথা উচ্চারণ করলেও তিনি আসলে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি, মানব সভ্যতা ও মানবপ্রেমের ধারা যে শত বিপর্যয়ের মধ্যেও অব্যাহত থাকবে, এ বিশ্বাস তাঁরও রয়েছে। অন্যথায় তিনি 'বনলতা সেন' কবিতা লিখতে পারতেন না, তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হতো না : 'তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।/মানুষের কাছ থেকে মানুষের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়/শেষ হবে।" প্রকৃতপক্ষে, 'বনলতা সেন' তো বিশেষ নারী অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা নয়, সে হৃদয়বান এবং প্রেম ও শান্তির প্রতীক এক চিরন্তন মানবী—যে আবহমানকাল ধরে প্রেম-প্রীতি ও শান্তির ধারাকে অব্যাহত রেখেছে এবং শত প্রতিকূলতার মধ্যেও রাখবে। 'বনলতা সেন' কবিতার প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তি 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'—এতো কোনো ব্যক্তির প্রেম ও শান্তির অন্বেষায় পথযাত্রা নয়, বরং চিরকালের মানবযাত্রারই অন্যনাম। জীবনানন্দ দাশ যখন উচ্চারণ করেন : 'আমাকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন'—তখন মানবযাত্রার পর, চিরকালের মানবীর কাছে দু'দণ্ড শান্তি-স্বস্তি লাভের প্রতীকীরূপই ব্যঞ্জিত হয়।

স্বদেশের সমাজ-পরিবেশ, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা জীবনানন্দের কবিতায় নানারূপেই বিধৃত হয়েছে। ইতিহাস-ভূগোলের পাতা এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের জগৎ পরিক্রমা করেও এই প্রকৃতি ও মানবপ্রেমিক কবি স্বদেশের পরিবেশ প্রকৃতিকে কখনো বিস্মৃত হননি। গ্রামীণ প্রকৃতি ও পরিবেশকে, নদী-নিসর্গ ও বনরাজিনীলাকে পটভূমিতে রাখলেও, ইউরোপীয় সাহিত্যে অভিজ্ঞ, ইংরেজি কাব্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক এবং আধুনিক জীবনচেতনা ও মনোভঙ্গির অধিকারী জীবনানন্দ গ্রাম্যতা ও স্থূলতাকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর কবিতায় বর্ণনাধর্মিতা এবং 'চিত্ররূপময়তা' একটা প্রধান আকর্ষণীয় ব্যাপার হলেও, বহু কবিতায় তিনি রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারের মাধ্যমে এক ধরনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা এবং কিছুটা জটিলতারও আশ্রয় নিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ যেমন ব্যক্তিজীবনে স্বদেশের বহুস্থান—গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর, প্রকৃতি ও পরিবেশ পরিক্রমা করেছেন, তেমনি কল্পনার জগতে পরিভ্রমণ করেছেন ইতিহাস-ভূগোলের এবং মানবসভ্যতার বিভিন্ন অধ্যায়ের কীর্তিত বহু স্থান। 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনি যখন উচ্চারণ করেন :

১. হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরও দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. মহান সাগর নগর গ্রাম নিরূপমা নদী,
যদিও কাহারো প্রাণে আজ রাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয়, অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা যাবে ;
অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধরে চলে ;

জীবনানন্দ দাশের আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা নতুনভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে বলবেন :

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী
আমি বহে আনি ;
একদিন শুনেছে যে সুর—
ফুরায়েছে—পুরানো তা—কোন এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার বক্তব্য, ভাষা, ভঙ্গী, ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতি যে নতুন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে প্রকাশের তথা উপস্থাপনের নতুনত্বই অর্থাৎ শিল্পরূপ নির্মাণের ভিন্নতাই বক্তব্যকে নতুনত্ব দেয়, তা বাণী হয়ে ওঠে। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় : 'ইতিহাসের আবহমানতায়, হাজার বছর পথ-হাঁটা অযুত হৃদয়ের পরিক্রমায় জীবনান্দের অনুভূতিতে এমন একটা সমগ্রতার স্বাদ এসেছিল যা' ব্যক্তিতেই আবদ্ধ থাকেনি শুধু, প্রেমেই প্রীত হয়নি কেবলমাত্র, ইতিহাস প্রতিফলিত এবং সমাজ-সভায় সমাহিত হয়ে যা' নতুন সার্থকতা, অন্য অর্থময়তার সন্ধান করেছে।' [মহত্তম কবি জীবনানন্দ দাশ] আগেই বলেছি, জীবনানন্দ ছিলেন আশাবাদী কবি, ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবন এবং সমাজ-সংসারের শত সমস্যা-সংকট এবং আত্মীপড়ন আর চারদিকের হানাহানি ও অমানবিকতার বেদনাদায়ক রুঢ় অভিজ্ঞতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বহু কবিতায় বিধৃত আশাবাদিতার কথা। 'তিমির হননের গান' যিনি গেয়েছেন, তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে :

নব নব মৃত্যু শব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে নাকি মানুষকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে।
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
জয় অস্ত সূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' এর যুগে জীবনানন্দের উচ্চারণ ছিল কিছুটা উচ্চকণ্ঠ, এবং আত্মগত উপলব্ধির কথা আর স্বগত-সংলাপের ভঙ্গী কোনো-কোনো কবিতায় থাকলেও মনোকথনের ধরন তাতে কম ছিল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকেই জীবনানন্দ দাশ অনেকটা দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় হয়ে উঠেন, আত্মগত উপলব্ধির কথাও কিছুটা জটিল রূপ ধারণ করে এবং 'মহাপৃথিবী'তে ও 'সাতটি তারার তিমির' এ তা আরও দুর্জ্ঞেয় এবং জটিলরূপে প্রতিভাত হয়। 'ঝরা পালক' এ রোমান্টিক-স্বপ্নকল্পনা ও সৌন্দর্যবোধ অনেক কবিতায় রূপায়িত হয়েছে, কবির শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের গ্রাম-জীবনের অভিজ্ঞতা ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যপ্রীতিও ছায়া ফেলেছে, তবে এই দিকটি ব্যাপক ও গভীর হয়েছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে। শৈশবে, কৈশোরে ও যৌবনে বরিশাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরে এবং সন্নিহিত জনপদে অবস্থান ও বসবাসকালে প্রকৃতি ও পরিবেশ আর নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা জীবনানন্দ দাশের কল্পনাপ্রবণ ও স্বপ্নমেদুর মনে কিভাবে ছায়া ফেলেছিল, হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল তা কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের 'বাল্যস্মৃতি' থেকেই জানা যায়। তিনি লিখেছেন, "ছোটবেলা থেকেই আমাদের রক্তে—বিশেষ করে দাদার হাঁটার নেশা ছিল। ... প্রায় ছোটবেলা থেকেই বরিশালের উপকণ্ঠে শ্মশানভূমির পাশ দিয়ে আমরা দুজনে হেঁটেছি, অবাক হয়ে কখনো বা লাশকাটা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। কখনো আরও দূরের পাল্লা, শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পথে। বর্ষাকালে নদীর তীরে কত সন্ধ্যায় হেঁটেছি, নদী যখন স্ফীত হয়ে পথকে ছুঁয়ে দিচ্ছে—অথবা শীতকালে নদীর রেখা যখন বহুদূরে সরে গেছে, নদীর মধ্যে—ধানক্ষেতের মধ্যে নেমে গেছি, সেসব ধানক্ষেত রাত্রির নীরব মুহূর্তে অন্ধকারে স্নান করে শীর্ণা নদীর সঙ্গে। নদীর ওপারে দেখেছি সবুজ অন্ধকার।" কল্পনা-প্রতিভার অধিকারী এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার জীবনানন্দ দাশের দেখার তীর্যক দৃষ্টি, গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর অনুভূতিশীল হৃদয় ছিল বলেই শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন গ্রাম-জীবন, গ্রামীণ পরিবেশ আর নৈসর্গিক সৌন্দর্যমহিমা ভিত্তিক অনেক উচ্চাঙ্গের কবিতা। জীবনানন্দ দাশের কবিতায়—চিল, পাখি, হরিণ, প্যাঁচা, বেতফল, ধান, শস্য, ঘ্রাণ, সমুদ্র, জল, আকাশ, মানুষী, মাংস ইত্যাদি যেন পুনঃপুনঃ উল্লেখিত হয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীক ও রূপক হিসাবে—তা-ও গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা, গ্রামীণ পরিবেশ রচনায় দক্ষতা এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মিলবে :

১. দেখেছি সবুজ পাতা অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।
(মৃত্যুর আগে)

২. আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখে ঘসি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।
(ঘাস)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ঘাস, ফরিঙ, হরিণ, কমলালেবু, ধান, শস্যক্ষেত, ইঁদুর ইত্যাদি অজস্র বার ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতাকে এবং পরিবেশ প্রকৃতিকে হৃদয়ে গভীরভাবে ধারণ না করলে এটি সম্ভব হতো না। প্রকৃতির প্রতি জীবনানন্দ দাশের প্রবল আসক্তির কথা, নিরিবিলি ও শান্ত পরিবেশের প্রতিও তাঁর আকর্ষণের কথা তাঁর আত্মজনেরা বলেছেন, কাব্য- সমালোচকেরাও উল্লেখ করেছেন। বরিশালে নিজেদের বাসগৃহ 'সর্বানন্দ ভবনে' অধিবাসকালে কোন্ প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনানন্দ দাশ কাব্য রচনা করতেন, তার বিবরণ দিয়েছেন কবির বোন সুচরিতা দাশ :

> ইজিচেয়ারে বসে দাদা লিখছেন, প্রগাঢ় তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন তিনি। সামনেই কৃষ্ণচূড়া গাছে হাজার রক্তিম পুষ্পস্তবক, লাল আগুনে জ্বলছে ; গাছের তলায় সবুজ মাটিতে অশেষ সবুজ ঘাসের তরতরে প্রাণ স্পন্দনের মখমল তার ওপর আলো-আঁধারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচল ছায়া-ছবি, নিপুণ আলপনা। এইত লিখেছিলেন, কখন যেন আনমনা হয়ে গেছেন রৌদ্রছায়ার সেই ছন্দোভঙ্গি দেখে, ঘাসের নিবিড়ে, ঘাস ফড়িংয়ের নৃত্যপরায়ণতায় অভিনিবিষ্ট হয়ে গিয়ে। একটা বিড়াল কখন থেকে ঘোরাঘুরি করছে আসছে-খাচ্ছে—অন্ধকারের মত নরম পায়ে, লাফালাফি করছে আলোছায়ার চঞ্চলতার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে। ঘাসের বুকে আঁচড় দিচ্ছে, মাটির বুকে, কখনো বা ছুটে গিয়ে কৃষ্ণচূড়ার গাছের গাঁয়েই নখের জোর পরীক্ষা নিচ্ছে। রোদের সঙ্গে, প্রকৃতির নম্র হৃদয়ের সঙ্গে এই কলহ দেখে কেমন যেন কৌতুক বোধ করেছিলেন দাদা, কিংবা ব্যথিতই হয়েছিলেন। কবিতা লিখলেন। এখন 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে সেই কবিতাটি রয়েছে—'বিড়াল'। [কাছের জীবনানন্দ, সুচরিতা দাশ]

জীবনানন্দ দাশ তাঁর পরবর্তী জীবনে এবং জীবনের শেষ অধ্যায়েও—কলকাতা মহানগরীতে অবস্থানকালেও দীর্ঘ পথ হাঁটার, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে যাওয়ার এবং অলিগলিতে ঘোরার অর্থাৎ যথাসম্ভব প্রকৃতি ও পরিবেশের সান্নিধ্য লাভের অভ্যাস ত্যাগ করেননি। তাঁর এই অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের 'বাল্যস্মৃতি'তে। কিন্তু বিরাট বিরাট সৌধরাজি পরিবেষ্টিত, ইট-কাঠ-পাথর-বালিতে নির্মিত, অসংখ্য যন্ত্রযানে আর নাগরিকে প্রায় দমবন্ধ ও কোলাহল-মুখরিত মহানগরীতে জীবনানন্দ প্রকৃতি আর নৈসর্গিক সৌন্দর্য মহিমার সাক্ষাৎ পাবেন কোথায়? প্রকৃতি প্রেমিক কবিকে তাই কল্পনায় বরিশালে এবং গ্রাম-জনপদেই অধিবাস করতে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম রূপকার রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য মহিমার নিকট-সান্নিধ্য লাভ করেছেন পূর্ববাংলায়—শিলাইদহে, শাহজাদপুরে, পতিসরে কুঠিরবাড়িতে অবস্থানকালে, পদ্মার বুকে 'বোটে' অবস্থান ও পরিভ্রমণসূত্রে। আর বিদ্রোহী কবি নজরুল যে বাংলাদেশের বিশেষতঃ পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান ও পরিভ্রমণকালে প্রকৃতি ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমার সান্নিধ্য লাভ করেন, তা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অজস্র প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা ও গানের উৎস পূর্ববাংলার প্রকৃতি, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও কথাটা বহুলাংশে সত্য। জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতিবিষয়ক এবং প্রকৃতি ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যমহিমাকে কেন্দ্র করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানা চিন্তা-চেতনা ও দর্শনসঞ্জাত ও মানবিক মূল্যবোধকেন্দ্রিক কবিতাও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর কল্পনা-প্রতিভারই ফল। ত্রিশের অন্য দুই প্রধান কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে'ও প্রকৃতি-আশ্রয়ী হয়েছেন, তাঁরা মানব ও মানবীর অর্থাৎ মানবজাতির শুভ ও কল্যাণকামনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তা-চেতনা এবং শুভ ও কল্যাণকামনার পেছনে কাজ করেছে এক ধরনের দর্শনসঞ্জাত ধ্যান-ধারণা ও ভাবনা-চিন্তা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'সোহংবাদী' আর বিষ্ণু দে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ, তাঁদের রচনায় হৃদয়বত্তার চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তি বা মননশীলতারই প্রাধান্য, তাদের রচনারীতি অনেকটা ধ্রুপদী তথা ক্লাসিকধর্মী, বিশেষভাবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যরীতি ও কাব্যভাষা। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি অনেকটাই অভিধাননিষ্ঠ, কঠিন ও দুরুচ্চার শব্দ ব্যবহারের প্রতি তাঁর প্রধান প্রবণতা। রচনায় ক্লাসিকধর্মী হলেও, তাঁর দর্শনসঞ্জাত কবিতার বিশেষত প্রেম ও প্রকৃতির অন্তরালে রয়েছে লিরিসিজম বা গীতিপ্রবণতা। মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের ভাষার এক ধরনের সমন্বয়ের চেষ্টা রয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তে। অন্যপক্ষে, বিষ্ণু দে'ও রচনায় বহিরাঙ্গিক দিকটি কিছুটা দুর্জ্ঞেয় ও জটিল, এবং তাঁর কাব্যভাষা অনেকখানি দুরুচার্য ও দুর্বোধ্য হলেও, তিনিও মূলত গীতিপ্রবণতা বা লিরিসিজমেরই অনুসারী, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাঁর সাযুজ্য। বিষ্ণু দে টি. এস. এলিয়টের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং Waste Land তথা 'পোড়োজমি'র কবির অনুসরণে লিরিসিজমকে বর্জন করতে চেয়েছেন, রুগ্ন, অভব্য ও বস্তুতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যদিও এলিয়টের ধর্মপ্রাণতা তাঁর নেই। জীবনানন্দ দাশ এলিয়টের দ্বারা নয়, বরং ইয়েটসের কাব্যধারায়ই অধিকতর প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁর কাব্যদর্শনও প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ ও কল্যাণবোধকেন্দ্রিক, কোনো সাম্যবাদী বা সমূহবাদী অথবা নাস্তিক্যবোধের দ্বারা রঞ্জিত নয়। জীবনানন্দ দাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ তাঁর 'বাল্যস্মৃতি'তে জীবনানন্দ সম্পর্কে লিখেছেন,

> দাদা ধর্মের অনুষ্ঠান পরবর্তীকালে পছন্দ করতেন না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের সারবস্তুতে বিশ্বাসবান ছিলেন। যে-ধর্মের হাওয়ায় দাদা বড় হয়ে উঠেছিলেন, উপনিষদের সে-ধর্মের নির্দেশ হচ্ছে, অন্ধকার থেকে আলোতে যাওয়ার সাধনা। মানুষের জীবনে পতন আছে, অন্ধকার আছে, কিন্তু তা চিরন্তন নয়, উদ্যম ও সাধনাযোগে পতনকে পশ্চাতে ফেলে ধ্রুব সত্যে, আলোকে পৌছতে হবে। বিশ্বচরাচরের সর্বত্র, প্রকৃতির সমস্ত উপকরণে বিশ্ববিধাতার মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রতিফলিত হয়েছে, উপনিষদুক্ত এই ধর্মের বাণী হচ্ছে এই। বাল্যে, কৈশোরে অথবা প্রথম যৌবনে তাঁর (জীবনানন্দ দাশের) শিক্ষা-দীক্ষা, তাঁর পরিবেশ, এমন কি তাঁর ধর্ম তাকে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল জীবনের ছবি দেখিয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় হতাশার সংক্রমণ আছে, দুঃখ-বেদনা এবং দীর্ঘশ্বাসও আছে, কিন্তু আশাবাদী কবি 'নিখিল নাস্তির' গান উচ্চারণ করেননি। আশাবাদী কবি বলেছেন, 'এসো আমরা যে যার কাছে—যে যার যুগের কাছে সব/ সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠি।/নব পৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে।' এই নব পৃথিবীরই স্বাপ্নিক ছিলেন জীবনানন্দ দাশ।

জীবনের দাবির প্রতি পিঠ ফিরিয়ে নয়, বরং এইসব দাবিকে অঙ্গীকার করে নিয়ে এবং শিল্পের দাবিকে অধিক মূল্য দিয়ে জীবনানন্দ ক্রমাগত একটি নিজস্ব রীতিভঙ্গি গড়ে তোলার দিকে নিবিষ্ট হয়েছেন, তাই কেবলমাত্র শিল্প এবং বিশুদ্ধ শিল্পই হয়েছে তাঁর অভীষ্ট ; কিন্তু তাই বলে জীবনানন্দ কলাকৈবল্যবাদী বা তুরীয়লোকের বাসিন্দা ছিলেন না। জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রধান পটভূমি তাঁর স্বদেশ ও সমাজ এবং পরিচিত পরিবেশ ও প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ যেমন কল্পনায় 'উজ্জয়িনী' নগরীতে পরিভ্রমণ করেছেন, কালিদাসের কালে চলে গেছেন, তেমনি বাস্তবে ফিরে এসেছেন স্বদেশের পটভূমিতে। তাঁর বিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ উচ্চারণ করেছেন : হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,/সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে/অনেক ঘুরেছি আমি/ বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে/সেখানে ছিলাম আমি/আরও দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে।' কিন্তু এই মানসভ্রমণ সত্ত্বেও, জীবনানন্দ স্বদেশের পটভূমিতে ফিরে এসে বলেছেন, 'আমাকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।' বস্তুত জীবনানন্দ দাশের কবিতায় 'ঝরাপালক' এর যুগেই ইতিহাস-ভূগোল পরিক্রমার পরিধি ছিল আরও ব্যাপক। তাই ব্যক্তিস্বরূপে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন : 'আমারে দেখেছে সে যে অসীরীয় সম্রাটের বেশে/আমি ছিনু 'ক্রবাদুর' কোন দূর 'প্রভেন্স' প্রান্তরে/স্পেইনের 'সিয়েরয়ে' ছিনু আমি দস্যু অশ্বারোহী।' ...কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বের প্রান্তর থেকে বাংলার প্রান্তরে ছিল তাঁর পরিক্রমা। 'বাংলার মাঠ-ঘাটে ফিরেছিনু বেণু হাতে একা/গঙ্গার তীরে কবে কার সাথে হয়েছিল দেখা।' লক্ষণীয় যে ইতিহাস-ভূগোল আর ঐতিহ্যের পরিক্রমা থেকে জীবনানন্দ ক্রমান্বয়ে এসেছেন ভারতীয় ইতিহাস-ভূগোল ও ঐতিহ্যের পটে, ক্রমে ক্রমে একেবারে বাংলার প্রান্তরে। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও, জীবনানন্দ দাশের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায়ও এর পরিচয় রয়েছে। বাইশ মাত্রার অক্ষরবৃত্তর পয়ার ছন্দে অনেকগুলি চতুর্দশপদী বা সনেট কবিতার সিকোয়েন্সের (সনেট পরম্পরার) মাধ্যমে জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে তাঁর স্বদেশপ্রেম, ইতিহাস-প্রীতি, ঐতিহ্যবোধ আর সৌন্দর্যতৃষ্ণা এবং প্রকৃতি ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যমহিমার প্রতি গভীর অনুরাগ ফুটিয়ে তুলেছেন। অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

১. তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাব ; দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে—একবার—দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে ;
দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—শাদা শাখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে : সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুরের ধারে।

২. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাইনা আর ; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম–বট–কাঁঠালের–হিজলের–অশ্বথের করে আছে চুপ ;
ফণী–মনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙ্গা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমন হিজল–বট–তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

৩. আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল–ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হ'ব—কিশোরীর–ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়।

জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ থেকে এখানে বহুল–উদ্ধৃত, আবৃত্ত এবং আলোচিত তিনটি চতুর্দশপদী কবিতার অষ্টক (আট পঙ্ক্তি) উপস্থাপিত হলো। যাঁরা সমগ্র 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ পাঠ করেছেন, তাঁরা জীবনানন্দ দাশের স্বদেশপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, ঐতিহ্যানুরাগ এবং সৌন্দর্য–তৃষ্ণা যেমন লক্ষ্য করবেন, তেমনি লক্ষ্য করবেন কবির বর্ণনা–কুশলতা। জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সাতটি তারার তিমির' প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক কবিতা 'জটিল, দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য, মনে হলেও, 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুচ্ছ অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও সুন্দর এবং সহজেই হৃদয়–সংবেদ্য। উল্লেখ্য, জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'য় নষ্টালজিয়া, স্মৃতিচারণ, বিষাদ–বাতাস এবং সর্বোপরি প্রাঙ্গণে নিমজ্জমানতা থাকলেও, ইয়েটসের কাব্যের মতো নতুনের পটে পুরাতনের উদ্বেজনা কিংবা উজ্জীবন নেই। জীবনানন্দ যেখানে নষ্টালজিয়া–আক্রান্ত, স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের হাতে আত্মসমর্পিত, সেখানে 'আয়ারল্যান্ডের দেশ–পুরাণের নবরূপায়ণকারী' ইয়েটস 'আধুনিক মানসের আত্ম–আবিষ্কারের' সাথে সাথে কাল সচেতনতা ও নবজীবনবোধে উজ্জীবিত। যে–অর্থে ইয়েটসে রেনেসাঁস বর্তমান, সে–অর্থে জীবনানন্দে 'রূপসী বাংলা'য় কোনো নবনির্মাণ নেই। রূপকে প্রতীকে ইয়েটস প্রাক্তন এবং পুরাণের পটে বর্তমান জীবন–অভীপ্সা রূপায়িত করেছেন, কিন্তু জীবনানন্দে বর্তমানকালের মানুষ অনুপস্থিত। ইয়েটস যে–ভাবে লোক–কাহিনীকে আয়ারল্যান্ডের দেশ–পুরাণকে বর্তমান জীবনের বাণীবাহক করে তুলেছেন, লিরিক–কবি জীবনানন্দ সেভাবে লোক–পুরাণের নবরূপায়ণ ঘটাননি। উল্লেখ্য যে, মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের Leaves of grass–এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঘাস' নবজীবন ও জাতীয়তাবোধ আর নবজাগরণের প্রতীক, অন্যদিকে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় 'ঘাস' সবুজিমা ও প্রাণসতেজতার প্রতীক। ইংরেজি কবিতা বিশেষত ইয়েটস, শেলী, কীটস, হুইটম্যান, অ্যালান পো, ডিলান টামাস প্রমুখের কবিতা যে জীবনানন্দকে প্রভাবিত এবং নবসৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল, তা সমালোচকেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

সাহিত্যের প্রভাব ও পরিবহন কোনো নতুন বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বিদেশী কবিতার—এমনকি স্বদেশী কবিতারও সমৃদ্ধ অংশ কবিমাত্রকেই উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করে তাঁর কল্পনা-প্রতিভার বিকাশে সাহায্য জোগায়। শুধু উপজীব্য বিষয়ের দিক থেকে নয়, সেই পরিগ্রহণ রচনার আঙ্গিক এবং রীতিভঙ্গীর দিক থেকেও ধনাত্মক বিবেচিত হতে পারে। বাংলা কাব্যে সৃষ্টিশীল পরিগ্রহণ শুধু মাইকেলকে নয়, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মনোবিকাশে এবং কল্পনা-প্রতিভার বিকাশেও বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। জীবনানন্দ দাশ যে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুল এবং তিরিশের তাঁর সমসাময়িক কবিদের চেয়ে রচনার বিষয়, ভাষা, ভঙ্গী এবং আঙ্গিক ও রূপরীতিতে আলাদা হয়ে গেছেন, তাঁর একটা নিজস্ব কল্পনা ও স্বপ্নের জগৎ, আবেগ-অনুভূতির এবং চিন্তা-ভাবনার ভুবন তৈরি করতে পেরেছেন, তাঁর পেছনে রয়েছে বিদেশী সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা এবং নিজের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা। জীবনানন্দ দাশ মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মতো কবিতার ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতি নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন—এমন নয়। জীবনানন্দ দাশ ছন্দোবদ্ধ, অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতা লিখেছেন, রচনা করেছেন গদ্যছন্দের কবিতা বা ফ্রী ভার্স। কবিতার প্রবহমানতা এবং নানা স্তবক বিন্যাসের পরিচয় রয়েছে তাঁর কবিতায়। বাংলা কবিতার তিন প্রধান ছন্দ—মূল ছন্দ অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তে কবিতা রচনা করলেও, জীবনানন্দের প্রিয় ছন্দ অক্ষরবৃত্ত বা অক্ষরমাত্রিক ছন্দ এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন' অক্ষর বৃত্ত ছন্দে রচিত হলেও, জীবনানন্দ সেখানে পঙ্‌ক্তি বা স্তবক-বিশেষে অক্ষরমাত্রিকতার আমদানী করে এবং মধ্যমিল দিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। কবিতাটির সূচনা এইভাবে : হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'। দ্বিতীয় স্ববকের প্রথম পঙ্‌ক্তি : চুল তার কবেকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, অতিদূর সমুদ্রের পর/, —কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ছন্দের চারিত্র্য অনুসারে এতে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের মাত্রাশক্তি, বর্ণ বা হরফ অনুসারেই নির্ণিত। সে হিসাবে প্রথম পঙ্‌ক্তিটি অর্থাৎ হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে সর্বমোট ২২-মাত্রার অধিকারী এবং এর পর্ববিভাগ এইরূপ : হাজার বছর ধরে/আমি পথ হাঁটিতেছি/পৃথিবীর পথে = ৮ + ৮ + ৬ = ২২, অথচ দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তি অর্থাৎ 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'—সর্বমোট ১৮ মাত্রার অধিকারী এবং এর পর্ববিভাগ এইরূপ ; 'চুল তার কবেকার/অন্ধকার/বিদিশার/নিশা = ৮ + ৪ + ৪ + ২ = ১৮, অথচ কবিতাটিতে ব্যবহৃত শব্দাবলী : চারিত্র্য অনুসারে এর পর্ববিভাগ সহজেই হতে পারে এইরূপ : 'চুল তার/কবেকার/অন্ধকার/বিদিশার/নিশা = ৪ + ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৮, আবার একটু টেনে, এগিয়ে আবৃত্তি করলে এর মাত্রাশক্তি = ৪ + ৪ + ৫ + ৪ + ২ = ১৯ মাত্রা হওয়াও বিচিত্র নয়। কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হলেও, এই পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত শব্দাবলী (অন্য দুয়েকটি পঙ্‌ক্তিতেও আছে) মাত্রাবৃত্তের চারিত্র্যধর্মী, এমনকি 'অন্ধকার' শব্দটিতে অন্ত্যস্থ যুগ্মধ্বনি 'একমাত্রা' গণ্য হওয়া সত্ত্বেও। অধিকন্তু, পঙ্‌ক্তিটিতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্ত্যমিলের সাযুজ্যে যে অনুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে, তা-ও মাত্রাবৃত্তের এই চারিত্র্যের কারণেই। কবিতাটির অন্যান্য পঙ্‌ক্তিতে শব্দ ব্যবহারের পদ্ধতিই যেন এমন যে তাতে মাত্রাবৃত্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারিত্র্য কল্পনা করা যায় না এবং সে-কারণে অনুপ্রাসের প্রত্যাশাও অর্থহীন। অথচ কবিতাটির শেষ-পঙ্ক্তি ; 'থাকে শুধু অন্ধকার/মুখোমুখি বসিবার/বনলতা সেন = ৮ + ৮ + ৬ = ২২ মাত্রার প্রথম দুই পর্বেও অনুপ্রাসের যাদু সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাতে অনুপ্রাস সৃষ্টির সুযোগ এবং সম্ভাবনা বেশি। অথচ অনুপ্রাণিত কবিতায় কবির আত্মপ্রকাশ অবলীলাময় হয়ে উঠলে অক্ষরবৃত্তের কবিতাতেও যে পঙ্ক্তি কিংবা স্তবক-বিশেষে আশ্চর্য অনুপ্রাস সৃষ্টি হতে পারে জীবনানন্দের আলোচ্য 'বনলতা সেন' কবিতাটিতেও রয়েছে এর চমৎকার পরিচয়।

জীবনানন্দের কাব্য পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করবেন যে, 'টানা' 'এলানো' ভঙ্গী তাঁর কবিতার একটা অনুভবযোগ্য ও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যুক্তবর্ণের বা যুগ্মধ্বনির ব্যবহারও তাঁর কবিতায় কম। 'ঝরাপালক' এর কোনো-কোনো কবিতায় পরিবর্তমান কবিমানসের লক্ষণ হিসাবে যদিও তা দৃষ্টিগ্রাহ্য। তাঁর প্রথম পর্বের কবিতায় অলঙ্করণ প্রবণতার অনুষঙ্গ হিসাবে শব্দচয়ন রীতিও হয়েছে অনুরূপ। ধ্বনি-গাম্ভীর্য এবং শব্দের ব্যঞ্জনার বদলে ওজনের দিকেই এসব কবিতায় জীবনানন্দের দৃষ্টি : 'বসুধার অশ্রু-পাংশু আতপ্ত সৈকত/ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ/লক্ষকোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,/এই ধূলি—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার/[নীলিমা] এ-ধরনের কবিতায় গুরু-গম্ভীর ও ওজনদার শব্দ-সমবায় শব্দারম্ভরেরই জন্ম দিয়েছে, জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য যে নিমজ্জমানতা—তা এতে কোনোরূপ রসাবেশ সৃষ্টি করেনি। অথচ 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থেই জীবনানন্দের পরিবর্তিত কবি-স্বভাবের এবং কবি-স্বরূপের লক্ষণ দেখা গেছে কোনো-কোনো কবিতায় :

১. ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল
ডালিম ফুলের মত ঠোঁট যার—
রাঙা আপেলের মত লাল যার গাল
চুল যার শঙ্খনের মেঘ—আর আঁখি
গোধূলির মত গোলাপী রঙিন
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুম-পথে-স্বপ্নে কত দিন।

২. সেদিন এ ধরণীর
সবুজ দ্বীপের ছায়া—উতরোল তরঙ্গের ভিড়
মোর চোখে জেগে জেগে ধীরে ধীরে হোল অপহৃত,—
কুয়াশায় ঝরে পরা আতসের মত।

'ঝরাপালক' এর দুটি কবিতাংশ থেকে যে উদ্ধৃতি উপস্থিত করা হলো, তা থেকেই স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, জীবনানন্দ ক্রমান্বয়ে যুক্তবর্ণের ব্যবহার কমিয়ে, কথ্যরীতির শব্দ ও বাক্যবন্ধের মধ্যে সাধুরীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাঁর কবিতার 'টানা' ও 'এলানো' ভঙ্গিটি গড়ে তুলেছেন। শুধু জীবনানন্দে নয়, সমসাময়িককালে রচিত অজিত দত্তের কোনো কোনো কবিতায়ও এই সাধুরীতির ব্যবহার—এলানো-টানাভঙ্গী এবং রূপকথার রাজ্যে মানস-পরিভ্রমণ লক্ষণীয়। উদাহরণ :

যেখানে রূপালি ঢেউয়ে দুলিছে ময়ূরপংখী নাও
যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে
কুঁচের বরণ কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে
চুল এলায়েছে যেথা, কালো আঁখি সুদূরে উধাও
(পাশাবতী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যুক্তবর্ণের বিরলতা এবং 'টানা', 'এলানো' ভঙ্গী জীবনানন্দ দাশের কবিতায় শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে থাকেনি, তা সাধারণ চারিত্র্যে পরিণত হয়। রবীন্দ্র-নজরুল এবং ত্রিশের অন্যান্য আধুনিক কবিদের থেকে এভাবেই জীবনানন্দ আলাদা হয়ে যান, স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন।

কবি-সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের অবলম্বন ভাষা এবং কাব্যভাষাই তাঁর স্বাতন্ত্র্যের বা স্বকীয়তার প্রধান পরিচায়ক। কবিতার বিষয়, ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প—যাই হোক না কেন, তার সবকিছুই নির্মিত হয় ভাষার সাহায্যে। জীবনানন্দ দাশ কাব্যভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুলের অনুসরণ ও অনুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে তাঁর স্বতন্ত্র জগৎ ও কাব্যপরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন, তাঁর ভিন্নধর্মী কাব্যরীতিও গড়ে উঠেছে, কবিতায় রাবীন্দ্রিক ও নজরুলীয় আঙ্গিক-প্রকরণ অনুসরণ না করে জীবনানন্দ ধীরে ধীরে দৃঢ়বদ্ধ গঠনের চেয়ে কিছুটা শিথিলরূপ ও টানা-এলানো ভঙ্গিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অসামান্য প্রতিভা ও কল্পনাশক্তির অধিকারী এবং কাব্যরূপ নির্মাতা জীবনানন্দ ভাষার ক্ষেত্রে তৎসম ও প্রচলিত ঘরোয়া শব্দ—এমনকি গ্রামীণ শব্দ এবং বাকবন্ধ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জীবনানন্দের স্বতন্ত্র এবং সনাক্তযুক্ত কাব্যভাষাও একেবারে মৌলিকতামণ্ডিত নয়, তা রবীন্দ্রনাথেরই ভাষাবৃত্তের অনেকটা অন্তর্গত। এ-কথা বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের কাব্যভাষা সম্পর্কেও কম-বেশি প্রযোজ্য। অন্যদিকে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যভাষা মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের ভাষার এক সংমিশ্রণ, আর বিষ্ণু দে'র কাব্যভাষা মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের কাব্যভাষারই সংমিশ্রণ যেন। ত্রিশের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশই সামগ্রিক বিচারে স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল, তিনি বাংলা ভাষার এক প্রধান কবি।

১৯৫৪ সালে জীবনানন্দ দাশের মর্মান্তিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আমি এই প্রকৃতি-প্রেমিক, স্বপ্ন, সৌন্দর্যবোধের রূপকার এবং জীবনবাদী কবির স্মৃতির উদ্দেশে লিখেছিলাম নিম্নোক্ত কবিতাটি। এটি 'ময়ূখ' পত্রিকার জীবনানন্দ সংখ্যায় এবং 'জীবনায়ন' শীর্ষক কাব্য-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়। কবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে কবিতাটি এখানে উপস্থাপিত হলো।

তথ্যসূত্র

১. ময়ূখ, জীবনানন্দ সংখ্যা, ১৯৫৪।
২. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা।
৩. কবিতা ও প্রসঙ্গ কথা, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্।
৪. শুদ্ধতম কবি, আবদুল মান্নান সৈয়দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের কবিতা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছিল প্রাণপণ সেই সময়টা কাব্যচর্চার পক্ষে উপযোগী সময় ছিল এরকম বললে বাড়িয়ে বলা হবে, তবু সেই সময়ে কাব্যের চর্চা হয়েছে, এবং রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত তো বটেই, জীবনানন্দ দাশের কবিতাও এমন এক ধরনের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যা তাঁদের কবিতার পূর্বতন জনপ্রিয়তার তুলনায় ভিন্ন প্রকারের। সেই সময়ে অনেক কবিতা গান হয়ে উঠেছে, গান হয়ে বের হয়ে এসেছে মুদ্রিত পুস্তকের সংরক্ষিত এলাকা থেকে ; নিষিদ্ধ বেতার ও যুদ্ধের শিবিরের প্রায়-অসম্ভব সূত্র ধরে, নিপীড়নসৃষ্ট বিপন্নতা ও মুক্তির জন্য তুলনাবিরল ব্যাকুলতার সঙ্গে মিশে অনেক পরিচিত কবিতা নিজেদের আবেদন ও তাৎপর্যকে নতুনতর দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত করে নিয়েছে। কবিতা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ অবশ্য এদেশে নতুন কোনো ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম অনেক আগে থেকেই অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছেন আমাদের সমবায়ী প্রচেষ্টাসমূহে। মুক্তিযুদ্ধে সুকান্ত আসবেন এও অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ এলেন কি করে? তিনি তো কবি নন উত্তেজনা ও অনুপ্রেরণার, সংগ্রাম ও সংঘর্ষের? বরং তিনি ভয় করেন উদ্যম ও উৎসাহকে, ভয় করেন রূঢ়ভাবে প্রকাশিত নিজেই নিজের কাছে প্রতিহত সেই অস্থির জগৎকে যেখানে আছে "শত শত শূকরের চীৎকার", আছে "শত শত শূকরীর প্রসববেদনা।" জনতার কবি নন জীবনানন্দ দাশ, বরং কবি তিনি জনান্তিকের, কবি তিনি কবিদের।

কিন্তু তবু না এসে উপায় ছিল কি জীবনানন্দ দাশের? মুক্তিযুদ্ধে ক্রোধ ছিল, ছিল প্রতিহিংসার বাসনা, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি গভীর এক মমতা। জীবনানন্দ দাশ গভীর ভালোবাসার, সলজ্জ মমতার এবং মমতামিশ্রিত বিষণ্ণতার কবি। শুধু মমতা নয়, তাঁর কবিতা যেন আমাদের জাতিগত স্মৃতিচারণ, যেন বহু কালের আমরা, এইখানে, তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে নিজেদের জাতিগত কণ্ঠস্বরকে প্রকাশ করতে পারছি একটি বিনম্র স্বরগ্রামে। তাঁর পক্ষে না এসে উপায় কি? উপায় কি যুদ্ধের সঙ্গে ছায়ার মতো না থেকে?

জীবনানন্দ অবশ্যই চিত্রের কবি। সেই চিত্রের মধ্যে বাংলাদেশই প্রধান, যে বাংলার নাম দিয়েছেন তিনি রূপসী বাংলা। রূপসী, কিন্তু সোনালী নয়, সোনার নয় আদৌ। এই বাংলা জাতীয়তাবাদী নয়, অর্থাৎ আত্মসন্তুষ্ট, সঙ্কীর্ণ ও আস্ফালনকারী বাংলা নয় কোনো মতেই। এ বাংলা বরং এক নম্রতার, কৃষিকার্যের এবং বলা যায় অবক্ষয়েরও, যেখানে পচা শসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে, আছে হোগলা, আছে আঁশটের ও পেঁচার ঘ্রাণ, অথচ যার মুখ মায়ের মুখের মতো, যার সঙ্গে আমাদের যোগ প্রাণের, যোগ আবহমান কালের। জীবনানন্দ দাশ অনেক দূর দূর দেশে গেছেন, তাঁর আমি হাজার হাজার বছর ধরে হাঁটছেন, কাল পার হয়ে, পার হয়ে স্থান, পার হয়ে মিশর, ব্যাবিলন, নিনেভ, কাবেরী, জাভা, ইন্দোচীন। কিন্তু সেইসব দেশ ও কাল যেন বাংলাদেশেরই সম্প্রসারণ। যেন চিরকালের বাংলাদেশই বিস্তৃত হয়ে, ব্যাপক হয়ে, সম্প্রসারিত হয়ে গেছে নানান বিন্দুতে নানান নাম ধরে।

কিন্তু শুধু ছবিই আঁকেননি জীবনানন্দ, শুধু ছবিই যদি আঁকতেন তবে এত বড় কবি হতেন না তিনি, প্রাণ কেড়ে নিতে পারতেন না আমাদের, আমাদের বিষয়ী ও সন্দিগ্ধ বুদ্ধিকে ফাঁকি দিয়ে। তাঁর কবিতার মধ্যে প্রাণের একটা স্বতঃপ্রবাহ ধারা আছে, অথচ যার উৎসে বা প্রবাহে উত্তেজনা নেই, নেই আস্ফালন। একথা সত্য যে, তাঁর কবিতায় যৌবন নেই, যে-যৌবন অতি প্রত্যক্ষরূপে আছে নজরুল ইসলামে, আছে সুকান্ত ভট্টাচার্যে এবং এও সত্য যে, বাইরে থেকে মনে হয় তাঁর ছবি স্থির ছবিই, কিন্তু তাঁর সব ছবিকে একত্র করে আছে একটা প্রাণ যা নম্র কিন্তু অনমনীয়, আছে একটা নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা যা প্রচ্ছন্ন কিন্তু দৃঢ়। ঝড় অথবা বজ্র নির্ঘোষের রূপকার তিনি অবশ্যই নন, কিন্তু ঝড় ও বজ্র নির্ঘোষের পরিপূরক যে শান্ত পাখি, শীতের মাঠ, বা ধানসিঁড়ি নদী তাদের মধ্যেও প্রাণ আছে বটে, সেই প্রাণ জীবন্ত করে রেখেছে তাঁর সকল ছবির সমাহারকে।

বলা যায়, বাংলাদেশের অনির্বাণ প্রাণটিকে ধরে এনেছেন জীবনানন্দ দাশ। ধরে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর কবিতায়, প্রতিষ্ঠিত করে প্রবহমান রেখেছেন। একেকটি কবিতার মধ্যে অনেকগুলো ছবি, ছবির সঙ্গে আছে টুকরো টুকরো অনুভব, আর সকল ছবিকে জড়িয়ে ধরে আছে বড় একটা আবেগ। এই আবেগের শুধু যে ধারণ করবার শক্তি আছে তা নয়, সেই সঙ্গে আছে ছবির সঙ্গে ছবিকে যুক্ত করবার, গ্রন্থিত করে তুলবার শক্তি। আছে গ্রন্থনার পথে ছবিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করবার রাসায়নিক শক্তি। এই শক্তির জন্যই প্রত্যেকটি কবিতা জীবন্ত এবং পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হয়েও স্বতন্ত্র। আর জীবনের যে-বড় গুণ অপ্রত্যাশিততা তাও প্রভূত পরিমাণে আছে তাঁর কবিতায়, তাঁর শব্দ বা চিত্র কোনোটাই নতুন নয়, অপরিচিত নয়, কিন্তু তাদের সমাবেশ, তাদের পারম্পর্য সম্পূর্ণ নতুন। প্রত্যেকটি কবিতা আপন ভুবনবিহারী, তারা বাইরের ধমক মানে না, মানে না বহিরারোপিত পূর্বপরিকল্পনা। জীবনানন্দের উপাদান-উপকরণকে নতুন বলা যাবে না কিছুতেই। সনাতন নিসর্গ, পুরাতন সাহিত্য, স্থবির লোকশিল্প, মৃত সভ্যতা—এসব বিষয় অনেকে অনেকবার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এদেরকে প্রাণবন্ত করবার, সংযুক্ত করবার এবং প্রত্যেকটি কবিতায় তাদেরকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নবীন ও স্বতন্ত্র জীবন দান করবার যে-সৃজনীশক্তি তা জীবনানন্দ দাশের যেমন ছিল অনেকেরই তেমন ছিল না। যেমন, তুলনার কারণে বলা যায়, ছিল না কায়কোবাদের। কায়কোবাদও সংগ্রহ করেছেন নানান জায়গা থেকে, নানান সময় থেকে, তাঁর কবিতাতে আয়োজন ও সমাবেশের অভাব নেই, কিন্তু অভাব আছে সৃষ্টির, সৃষ্টি সেখানে উপাদান-উপকরণের নিচে, আয়োজন সমাবেশের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। কায়কোবাদ সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত। তাঁর মধ্যে রাসায়নিক শক্তি ছিল না সংযুক্ত করবার, বিদ্যুৎপ্রতিম শক্তি ছিল না পুরাতনকে জীবনস্পৃষ্ট করবার। অথবা ধরা যাক, জীবনানন্দ দাশের প্রসিদ্ধ গুরুচণ্ডালির কথা। কায়কোবাদেও গুরুচণ্ডালি আছে, যেমন জীবনানন্দে আছে গ্রাম্য ক্রিয়াপদ, বিয়োবর মতো 'ইতরজনোচিত' শব্দ, সেই সঙ্গে আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এঞ্জিন, হাইড্রান্ট, রিস্টওয়াচেরাও। কিন্তু কায়কোবাদে যা পীড়াদায়ক শিথিলতা, জীবনানন্দে তাই শিল্পের বিশিষ্ট সৌন্দর্য। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, মানুষের ভাষা "অনুভূতি দেশ থেকে আলো না পেলে নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল।" সেই আলো, সেই আভাকে প্রতিনিয়ত দেখি তাঁর নিজের লেখায় (যে-আভা আছে বলেই উপরুদ্ধৃত চরণ দু'টি গদ্যের সংগঠন সত্ত্বেও গদ্যাতিরিক্ত হয়ে উঠেছে) এবং সে আভারই অভাব আছে কায়কোবাদে। কায়কোবাদের মৌলিক ব্যর্থতা জীবনানন্দ দাশের সাফল্যের মানদণ্ড, যদি তেমন কোনো মানদণ্ডের প্রয়োজন হয়।

জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা, বলাবাহুল্য, শুধু বাঙালিত্বের নয়, সেই সম্পর্ক মানবিক, অর্থাৎ দেশোত্তীর্ণও বটে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা গোপন ও মানবিক বাসনা থাকে গৃহপ্রত্যাগমনের। আমরা সকলেই স্বর্গ খুঁজি, হারানো স্বর্গ, যে স্বর্গ আছে আমাদের শৈশবে, আদর্শায়িত ও নিরাপদ অতীতে। ঘরে ফেরার এই বাসনা প্রবলতর হয় সামনে যখন দেখি অপেক্ষা করছে বিপদ, উঁকি দিচ্ছে অনিশ্চয়তা, ভ্রূকুটি করেছে সঙ্কট। জীবনানন্দ দাশ নিজে চেয়েছেন ফিরে যাবেন ঘরে, এবং তাঁর সেই চাওয়ার কাব্যগত রূপটিকে আমাদের সামনে এনে, তাঁর নিজ হাতে-গড়া ভুবনটিতে আমাদেরকে প্রবেশাধিকার দিয়ে আমাদের তৃপ্ত করেছেন। তাঁর এই জগৎটা গ্রামীণ বটে, কিন্তু গ্রাম্য নয়, এ জগৎ প্যাস্টরাল কবিতার জগৎ, যেখানে সংঘর্ষ নেই, নেই বিরোধ কোনো প্রকারের। চিতাবাঘ যেখানে তার হিংস্রতা হারিয়েছে, হারিয়ে একত্র বাস করছে হরিণের সঙ্গে ; শুধু একত্রবাস নয়, হরিণ যেখানে "খেয়েছে তার আমিষী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে"। (বাঘে গরুতে একঘাটে পানি খাওয়ানোতে যদি ক্ষমতার প্রকাশ থেকে থাকে, তবে সন্দেহ কি কবির এই ক্ষমতা অনেক বেশি প্রতাপান্বিত, অনেক বেশি অঘটনঘটন পাটিয়সী।) জীবনানন্দ দাশের এই ভুবনটি আমাদের প্রতিদিনের জীবনের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ, অনেক বেশি সন্তোষসাধক। এই জগৎ অবকাশের, নিরাপদজীবনের, এবং অজ্ঞাতবাসের।

প্রতিদিনের জীবনকে, তার রূঢ়তাকে, তার বিরূপতাকে জীবনানন্দ অবশ্যই জানতেন। তিনি সলজ্জ মানুষ ছিলেন, অনেক চিঠি অনেককে লেখেননি, অনেক কথা বলেননি অনেকের কাছে, কিন্তু জীবিকার সমস্যা তাঁর জীবনেও ছিল সে কিছু অসত্য কথা নয়। সেই সঙ্গে নিজের দুর্ভোগের মধ্যে জানেন তিনি এই সর্বজনীন সত্য যে, যন্ত্রসভ্যতার কালে "মানুষ ও মেশিনের যৌথ শক্তিবলে/নীলিমাকে আটকেছে ইঁদুরের কলে"; জানেন "কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ/অন্ধকার, সংস্কার, ব্যজস্তুতি, ভয়" ; জানেন কেমন করে "নিরাশার জন্ম হয়।" শ্রেয় ও মঙ্গলের যে-বোধ আছে তাঁর মনে, বারে বারে তা আহত, পীড়িত, রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। সেইজন্য তিনি অন্ধকারকে চান,

> হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
> আবার ঘুমাতে চেয়েছি আমি,
> অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত
> মৃত্যুর মত মিশে থাকতে চেয়েছি

এবং তিনি ডাক দেন আমাদের সকলকে :

> মরমের যত তৃষ্ণা আছে,—
> তারি খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে
> তোমরা চলিয়া এসো
> তোমরা চলিয়া এসো সব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারকে চান, ভয় করেন সূর্যকে, কেননা

দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি
দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে

এই নির্দেশকে তিনি অমান্য করতে চান, অমান্য করে আত্মরক্ষা করতে চান, সেইজন্য অন্ধকারকে খোঁজেন, খোঁজেন আশ্রয়ের গৃহকে। প্রেম নয়, প্রকৃতিও নয়, জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রধান কথা হচ্ছে তাঁর ঘর খোঁজা। এবং ঘর খুঁজতে যেয়েই তিনি বাংলাদেশকে খুঁজে পেয়েছেন।

তাঁর সমসাময়িক কালের রুষ্ট বিরূপতা আছেই, সেই সঙ্গে আছে ব্যক্তিত্বকে নিয়ে, আছে মনুষ্যত্বের তথাকথিত দায়কে নিয়ে, বিদপগ্রস্ত হওয়া।

আমি অনেকদিন—অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর
জীব ব'লে বুঝতে পেরেছি আবার ;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা ;

সেইজন্য তাঁর "সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে"। "মাথায় চিন্তার ব্যথা/জীবন্ত কৃমির কাজ"কে তিনি অবশ্যই পরিহার করতে চান, যেমন পরিহার করতে চান সেই বিপন্ন বিস্ময়কে যা "আমাদের ক্লান্ত করে/ক্লান্ত—ক্লান্ত করে।" এই বোধের কথা জীবনানন্দ দাশের সব পাঠকই জানেন :

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে,
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;

যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় লাশকাটা ঘরে, যেখানে ক্লান্তি নাই, নাই কেননা "চিৎ হয়ে আছি টেবিলের পরে।"

পলায়নতৎপর বললে তাঁকে আসামী করা হয়, তাঁকে খাড়া করা হয় আসামীর কাঠগড়ায়, তাই সেই নাম না দেওয়াই ভালো। কিন্তু এ সত্যে কোনো মিথ্যা নেই যে, আত্মগুপ্তির জন্য তিনি অন্ধকারকে চান। এই অন্ধকার সাধারণ অন্ধকার নয়, এ আছে হৃদয়ের ভেতর, জ্ঞানের সনির্বন্ধ অন্ধকারের মতো, দিবাস্বপ্নের জগতের মতো। এ অন্ধকার মৃত নয় স্তব্ধ লোষ্ট্রের মতো ; এর জীবন আছে, আর আছে অবিনশ্বরতা :

উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আলো শেষ হয়।
পৃথিবীর পুরোনো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার,—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয় !
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব
নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয়।

কিন্তু এই অনিঃশেষ গৃহে যাবেন কেমন করে? তিনি চলে যান অনায়াসে, তাঁকে কষ্ট করতে হয় না, যেমন হয়েছে কীট্‌স্‌কে, তাঁর নাইটিঙ্গল কবিতায়। কষ্ট করতে হয়েছে বলেই আবেগের প্রবলতা প্রকাশ পেয়েছে নাইটিঙ্গলে। আবেগের কোনো অভাব নেই জীবনানন্দের অন্য কবিতাতে, আমাদের বক্ষ্যমাণ উদ্ধৃতিসমূহে—সর্বত্র তিনি আবেগসমৃদ্ধ, কিন্তু কীট্‌স্‌ যেমন করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছেন প্রবল থেকে প্রবলতর অনুভব ও আবেগের পথ ধরে, যেমন করে ইন্দ্রিয়বেদিতার এক দুঃসহ ও কেন্দ্রীভূত চাপে বিনষ্ট করেছেন নিজের মানবসত্তাকে, এক হয়ে গেছেন পাখির জগতের অন্ধকারের সঙ্গে, অনুভব ও আবেগের সেই প্রবলতা, ইন্দ্রিয়বেদিতার সেই ক্রমান্বয়ে তীব্র হয়ে ওঠা জীবনানন্দ দাশে নেই। যদিও আবেগ ও ইন্দ্রিয়বেদিতা পুরোপুরি আছে তাঁর কবিতাতে। এই কারণেই কীট্‌সের মতো গাঢ় বা গভীর নয় তাঁর জগৎ। আবেগের বিচারে তিনি ইয়েট্‌সের মতো, এলিয়টের মতো নন, যে এলিয়টের বাক্‌চাতুরিতে জীবনানন্দ দাশের অনুরাগ ছিল না, যেমন অনুরাগ ছিল না ইয়েট্‌সেরও ! ইয়েট্‌সের কবিতার প্রভাব আছে জীবনানন্দ দাশের কবিতাতে—সেই প্রভাব একান্ত স্বাভাবিক, কেননা সাযুজ্য আছে উভয়ের প্রকৃতিতে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ ইয়েট্‌স নন। ইয়েট্‌সে যে অন্বেষণ আছে, আছে অতৃপ্তি, বীরত্বের প্রতি আসক্তি, জীবনানন্দ দাশে তা নেই। আর নেই আত্মবিবর্তন। (তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় অন্যের প্রভাব আছে বটে, কিন্তু সে সকল রচনা যথার্থরূপে জীবনানন্দীয় নয়, জীবনানন্দীয় রচনার স্বরূপ প্রায় অবিচলভাবে অপরিবর্তিত।) কীট্‌স্‌কে যেমন করে ফিরে আসতে হয়েছিল নাইটিঙ্গলের জগৎ থেকে, জীবনানন্দ দাশকেও তেমনি ফিরে আসতে হয় মাঝে মাঝে, আসতে হয় তুলনায় স্থূলতর কারণে। "ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাস" হঠাৎ এসে হানা দেয়, আর সেই আলো শুধু বহির্জগতের নয়, শুধু সমসাময়িক কালের নয়, সেই আলো ব্যক্তিগত বোধ ও বুদ্ধিরও বটে।

জীবনানন্দে ওজস্বিতা নেই। ওজস্বিতা আসে বিরোধ থেকে, জীবনানন্দ দাশে বিরোধ নেই। তাই বলে গাড়লের মতো স্থূল যে বহির্জগৎ তাকে তিনি মেনে নেননি, তাকে জয় করেছেন যেমন করে বাংলাদেশের প্রকৃতি জয় করে নিয়েছে বহিরাগত মানুষকে, মানুষের কীর্তিকে। ওজস্বিতার অভাব ঋণাত্মক বিষয় ; ধনাত্মক দিকে আছে কোমল ও নম্র শব্দের ব্যবহার, আছে তাঁর ক্রিয়াপদসমূহের ক্রিয়াবিমুখতা। আবেশ, আহ্লাদ, আলস্য, অবসন্ন, নরম, কুড়েমি, ক্লান্ত, ধূসর—এই ধরনের শব্দ তাঁর কবিতায় ঘুরে ঘুরে আসে। এমনকি যখন ক্ষোভ প্রকাশ করতে চান, অথবা ক্রোধ, তখনও তাঁর স্বরগ্রাম উঁচু হয় না, কর্কশ হয়ে ওঠে না কিছুতেই। "হলুদ-দু' ঠ্যাং তুলে নেচে রোগা শালিখের মতো যেন কথা বলে চলে তবু জীবন", এই কথার মধ্যে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু হলুদ দু-ঠ্যাং তুলে নাচা রোগা শালিখের সঙ্গে জীবনের তুলনায় জীবনের মধ্যকার রূঢ়তাটা স্পষ্ট হয় না, বরং কিছুটা প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে এইজন্য যে, শালিখের হলুদ ঠ্যাং ও ঠ্যাং-এর নৃত্য অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে প্রীতিপ্রদ অনুষঙ্গে।

শুধু প্রচ্ছন্ন নয়, তুলনা বিষয়কে দূরবর্তীও করে—অনুরাগের ক্ষেত্রে যেমন, বিরাগের ক্ষেত্রে তেমনি। "সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে", এই পঙক্তিতে ক্ষুধা আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি নিকটের অভিজ্ঞতা, অন্ধকার এবং হাতও তাই, কিন্তু ক্ষুধা যখন বিবর হলো, হলো অন্ধকার, হয়ে স্পর্শ পেল সৌন্দর্যের, তখন সে আর অতি নিকটের রইল না, দূরে সরে গেল অনেকটা। "নীলিমাকে আটকেছে ইঁদুরের কলে", এই পঙক্তিতে আকাশ ইঁদুরে পরিণত হয়েছে সত্য, কিন্তু পরিণত হয়ে যে কাছে এগিয়ে আসেনি। নালি ঘায়ে তাজা ন্যাকড়া ঢোকার অভিজ্ঞতা অন্য কেউ যদি বর্ণনা করতেন তবে শিউরে উঠতাম হয়তো, হয়তো দুঃসহ হতো শ্রবণের অভিজ্ঞতা, কিন্তু জীবনানন্দের "তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছিল নালি ঘায়ে" এই লাইনে শিউরে ওঠা নেই, এতে নেই দুঃসহতা। দার্শনিক কান্ট যে বলেছেন, দূরের জিনিস ভয়াবহ হলেও সুন্দর, সেই তত্ত্বের সত্য জীবনানন্দ দাশের বিরাগের পঙক্তিতে প্রমাণিত হয়। বস্তুত দূরত্ব সৃষ্টি তাঁর কাব্য সৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, দ্বীপ ও নাবিক তাঁর প্রিয় উপমা, সেইজন্য অতি পরিচিত বস্তু তাঁর হাতে পড়ে দূরবর্তী হয়ে দাঁড়ায়, তাঁর পৃথিবী কখনো দ্বিমাত্রিক থাকে না, তাতে প্রসারতার তৃতীয় মাত্রা সকল সময়েই যুক্ত হয়ে যায়। নগরের কথা তাঁর কবিতায় আছে, কিন্তু সেই নগর সমর সেন-এর স্পষ্ট নগর নয়, সে নগর নিকটের হয়েও দূরবর্তী।

সামাজিক তথা পাবলিক বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লেখেননি, লেখা স্বাভাবিক ছিল না তাঁর পক্ষে ; এবং যখন লিখেছেন তখন সেই কবিতার গান্ধী বা চিত্তরঞ্জন আমাদের পরিচিত মানুষ থাকেন না, তাঁরা ইতিহাসের, বলা যায় ঐতিহাসিক রূপকথার অংশ হয়ে দাঁড়ান। গান্ধী যেন "সময়ের অমেয় আঁধারে/জ্যোতির তারণকণা", যেন "অন্তঃশীলা করুণা-প্রসারিত হাতের মত", যেন তিনি "নচিকেতা বুদ্ধদেব/ঈশা"। পৃথিবীর পতিতকে (শুধু ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষকে নয়) তিনি ভালোবাসেন "গভীর নারীর চেয়ে অধিক গভীরতর ভাবে।" গান্ধী চলেছেন যাত্রী হিসাবে, জীবনানন্দের গভীর ও প্রসারিত পৃথিবীর ভেতর দিয়ে।

২.

জীবনানন্দ দাশ মনে করতেন কবিতায় উপমার গুরুত্ব অতুলনীয়। 'উপমাতেই কবিত্ব' বলেছেন তিনি। এই বলাতে যুক্তির কোনো দুর্বলতা নেই। কবিকে চেনার প্রথম নিরিখ তাঁর উপমাই। জীবনানন্দ বিশেষভাবে পরিচিত তাঁর উপমার জন্যই। তাঁর উপমা একবারেই তাঁর। এবং তাদের প্রবাহও প্রাণবন্ত।

জীবনানন্দের অনেক উপমাই মনে রাখবার মতো। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই তিনি শেলীর কবিতাতে উপমার ব্যবহার লক্ষ করেছেন ; বোঝা যায়, পছন্দ করেছেন। কবিতাকে তিনি স্মরণীয় উক্তির সংস্কার হিসেবে দেখেন না, দেখেন অবিভাজ্য সমগ্র হিসেবে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি কোলরিজকে স্মরণ করিয়ে দেয় যিনি প্রত্যেকটি কবিতাকে মনে করতেন প্রাণসমৃদ্ধ দেহ, যার কোনো অঙ্গই বিভাজ্য নয় অন্য অঙ্গ থেকে। কিন্তু জীবনানন্দের অনেক পঙক্তিই স্মরণীয়। তাঁর কবিতা ঝড় নয়, নদীর ধীর প্রবাহের মতো, যাকে যতবার দেখা যায়, মনে হয় নতুন দেখছি।

আমরা কিছু উপমা লক্ষ্য করবো,

১. তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে

২. উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিল–পুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো

৪. (হায় চিল) তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে

৫. তোমার চোখের মতো ম্লান বেত ফল

৬. প্রণয়ীর ঠোঁটের ধারালো চুম্বনের মতো

৭. যে আমারে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ কোনোদিন দেখিনি
সেই নারীর মতো ফাল্গুন সকালে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে

৮. রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল

৯. স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো দুধে আর্দ্র

১০. কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস

১১. মেঘ আর রৌদ্রের ধারে ছিলাম গাছের মতো ডানা মেলে—
পাশে তুমি রয়েছিল ছায়া

১২. কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরার মতো
এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে তাদের বিষাক্ত বিষাদ স্পর্শ
অনুভব করে হাঁটছি আমি ফুটপাথে

১৩. রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো

১৪. চীনা বাদামের মতো বিশুদ্ধ বাতাস

১৫. খেলার বলের মতো তাদের হৃদয় (পাখিদের)

১৬. যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়িয়েছে আকাশের পাশে
আরেক আকাশ যেন

১৭. সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ

১৮. মৃত্যুর মতন জেগে রয়েছে সময়

১৯. জোৎস্না রাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শালের
মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ

এই তালিকা অনায়াসে আরো দীর্ঘ হতে পারতো ; কিন্তু জীবনানন্দের উপমার বৈশিষ্ট্য এখানে সহজেই চোখে পড়ে। যেমন, 'মতো' ও 'যেন' ব্যবহার। এ ধরনের ব্যবহার যে নজরুলে কম তা আমরা লক্ষ করেছি। উপমা ও উপমানকে নজরুল এক করে দেওয়া পছন্দ করতেন। নজরুল হচ্ছেন বিশ্বাসের কবি, তিনি ততটাই বিশ্বাসী জীবনানন্দ যতটা সংশয়বাদী। নজরুলের আধুনিকতা সমসাময়িকতায় এবং সেই সমসাময়িকতাকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় ; জীবনানন্দের আধুনিকতা সংশয়বাদিতায়। ওই সংশয়ের কারণে তিনি প্রচুর পরিমাণে তবু, তবুও, হয়তো, অথবা, কিংবা, ব্যবহার করেন। নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী, কিন্তু তথাপি তিনি ঈশ্বর–নির্ভর ; জীবনানন্দের জগতে ঈশ্বর অনুপস্থিত। সে জন্যই তিনি উঁচু গলায় কথা বলতে অভ্যস্ত নন, নিয়ম, রীতি, তথ্য এসব জানেন, কিন্তু জেনেও নিঃসংশয় হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেন না, ব্যতিক্রম সম্ভব বলে মনে করেন তাই 'তবু' ধরনের অব্যয়গুলো ব্যবহার করেন। এবং একের সঙ্গে অপরের তুলনা করবার সময়ে দু'টিকে অভিন্ন করে তোলেন না। যে কোনো বিষয়কে নজরুল অনায়াসে মানুষের রূপ দেন, জীবনানন্দ তা দেন না। নজরুল ও জীবনানন্দ উভয়ের জগৎ ইন্দ্রিয়সংবেদী। শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, দৃশ্য, স্বাদ সবই রয়েছে। দু'জনেই চোখ বড় বড় করে দেখেন। তাতে বিস্ময় থাকে, কৌতুকও খেলে যায়। কিন্তু তফাৎ আছে। নজরুল যে পরিমাণ শব্দনির্ভর, জীবনানন্দ ততটা মোটেই নন। প্রাণের স্পন্দন, নদীর প্রবহমাণতা, পাখির ডাক, আপনজনদের কথোপকথন এসব তিনি উপভোগ করেন ; কিন্তু ভয় করেন ঝড় বজ্রবিদ্যুৎ উচ্চকণ্ঠস্বর ইত্যাদিকে। 'ইতিহাসযান' কবিতায় লিখেছেন,

> সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
> ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই

এর বিপরীতে যা চান তাহলো লীন হয়ে যাওয়া

> ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
> চাই।

তিনি নরম কোমল ইত্যাদি পছন্দ করেন। কীটসের মতো। তাঁর কবিতায় ধান ও ফল পেকেছে, শশা হয়তো পচে গেছে। হিজল গাছ দাঁড়িয়ে আছে নদীর ধারে। এই নদী দুর্দান্ত নয়। এ হচ্ছে ধানসিঁড়ি, জলসিঁড়ি যদিও প্রবহমাণ। তার জগতে ঘুম আছে, রয়েছে স্বপ্ন এবং মৃত্যুর বিপরীতে সৃষ্টিশীলতা। তার প্রিয় ঋতু প্রবল বর্ষণ নয়, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম নয়, প্রিয় ঋতু শান্ত হেমন্ত, যেখানে একদিকে রয়েছে ফসলের পূর্ণতা, অন্যদিকে ফসল কাটার পরের অবসাদ। শীত আসছে, তবু আসেনি। আকাশে মেঘ আছে, নক্ষত্র দেখা যায়। এবং নিচে অনেক ঘাস। শিশির-পড়া শুরু হয়েছে। শিশিরই, বৃষ্টি নয় ; থুরথুরে পেঁচা থাকে জেগে।

না, শব্দের নন, জীবনানন্দ বরঞ্চ কবি হলেন স্পর্শ ও গন্ধের। উপরের উপমাগুলোতে স্পর্শ-সজাগতা স্পষ্ট। প্রণয়ীর ঠোঁটের চুম্বন ধারালো, যে গভীর মুখ দেখা হয়নি সে প্রণয়ীও এসে স্পর্শ দিয়ে যায়। 'হাওয়ার রাত'-এ তার মনে হয়

> যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
> তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ
> সঙ্গে করে এনেছে

উপস্থিতিটি প্রায় শরীরী, যদিও সে শরীর মানুষের নয়। যে আসে সে তার নিজস্বতা নিয়েই আসে, অনুষঙ্গগুলো সঙ্গে থাকে। ১৯২৬ সালে বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা চিঠিতে কবি বলেছিলেন, "বেদান্তের দেশে জন্মেও কায়াকে ছায়া বলা তো দূরের কথা, ছায়ার ভেতরই আমি কায়াকে ফুটিয়ে তুলতে চাই।" ছায়ারা ছায়া থাকে না, কায়া হয়ে ওঠে। এখন মরণ ভালো একথা কীট্‌স্ যেমন করে বলেছিলেন নাইটিঙ্গেলের গান গাওয়া সেই রাতে, জীবনানন্দও তেমনি অনুভব করছেন,

> অনেক নক্ষত্রে ভ'রে গেছে এই সন্ধ্যার আকাশ—
> এই রাতের আকাশ—এখন মরণ ভালো, শরীরে
> লাগিয়া রবে এই সব ঘাস ;
> অনেক নক্ষত্র রবে চিরকাল যেন কাছাকাছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নক্ষত্র, আকাশ, ঘাস সবকিছুই তার অনুভবের জগতের মধ্যে এসে গেছে। তবে লক্ষ করবার বিষয় কীট্‌স্‌ যেমন করে গান শুনছিলেন পাখির, জীবনানন্দ তা করছেন না, তিনি পাচ্ছেন স্পর্শের আনন্দ, যে আনন্দকে স্থায়ী করার জন্য তিনি মৃত্যুকে চাইছেন। তবে এ মৃত্যু মৃত্যু নয়। এ হচ্ছে ঘুম। কবি তাকান প্রকৃতির দিকে, প্রকৃতি তাকায় তাঁর দিকে,

মোঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে...
চেয়ে আছে ;—যেমন সে তাকায়েছে কত রাত—নাই লেখাজোখা

কুয়াশার কুমারী আঙুল অলসভাবে তাঁর দেহ ছেনে যায়। রাঙা রোদ নারীর মতো স্পর্শ করে। তবু জীবনানন্দের জগতে প্রকৃতি অর্ধেক জীবন্ত মাত্র, বাকি অর্ধেক নির্ভর করে মানুষের ওপর। প্রকৃতি মানুষের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, মানুষ ছাড়া তার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, এই বোধটা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ছিল, এটা আমরা বিভূতিভূষণের উপন্যাসেও দেখতে পাই। জীবনানন্দ মানুষকে এককভাবে অতটা বড় মনে করেন না। তাঁর নদী তখনি জীবন্ত হয় যখন তাঁর নিজের হৃদয়ে নদী থাকে, নইলে নয়। 'নদীরা' কবিতায় লিখছেন,

নদী কেন বেঁচে থাকে?—একদিন এই নদী শব্দ ক'রে হৃদয়ে বিস্ময়
আনিতে পারে না আর ; মানুষের মন থেকে নদীরা হারায়—শেষ হয়।

রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে বলেছেন,

মানুষের মনে দীপ্তি আছে
তাই রোজ নক্ষত্র ও সূর্য মধুর।

সম্পর্কটা পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার। কেবল প্রকৃতি নয়, অন্য ক্ষেত্রেও এটা সত্য। ভাষার ক্ষেত্রেও। ভাষা তখনি কিছু দেবে যখন সে কিছু পাবে। বিজ্ঞানও তাই। '১৯৪৬-৪৭' শীর্ষক কবিতায় আছে,

মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থাকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া ; বিশেষণ ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কংকাল...
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু।

প্রকৃতি মানুষের সেবক, বন্ধু, পথপ্রদর্শক ইত্যাদি নয়, পটভূমিও নয়, পরস্পরের পরিপূরক তারা, নর-নারীর মতো। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে তাঁর হৃদয়ে। কিন্তু মিশে যান যদিও তবু ফিরে আসবেন এই পৃথিবীতে, হয়তো ঘাস নয়তো শঙ্খচিল হয়ে। আসবেন মানবিক যে মমতা হৃদয়ের মধ্যে থাকে স্মৃতির আকারে, তারই টানে।

ওই যে স্পর্শানুভব সেটি চুম্বনের আকারে এসেছে যেমন, তেমনি এসেছে হাতের ভেতর দিয়ে। হাত অত্যন্ত কার্যকর জীবনানন্দের কবিতায়। 'নগ্ন নির্জন হাত' নামে তাঁর কবিতা রয়েছে। অন্য কবিতাতে হাতের প্রচুর ব্যবহার। যেমন,

১. সান্ত্বনার মতো এসে বাতাসের হাত
অশ্বত্থের বুকে থেকে নিভিয়ে ফেলেছে খাড়া সূর্যের আলো

২. মরণের হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে?

৩. সন্ধ্যার ধূসর সজল
মৃদু হাত খেলিতেছে হিজল জামের ডালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. চলে–ধোয়া স্নিগ্ধ হাত

৫. সন্দেহের হাত

৬. পৃথিবীর বাধা–এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে, স্বপ্নের হাতে
আমি তাই আমারে তুলিয়া দিতে চাই

৭. সব ছেড়ে আমাদের মত
ধরা দিতো যদি স্বপ্নের হাতে
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর—,

৮. অন্ধকারের এ–হাত আমি ভালোবাসি ; চেনা নারীর মতো
অনেক দিনের অদর্শনার পরে আমার হাতের কাছে এসে

৯. সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে

১০. অন্ধকার থেকে খুঁজে কখন একবার আমার
হাত কোলে তুলে নিয়ে
গালে রেখে দিলো তার : 'রোগা হ'য়ে গেছে এত—চাপা পড়ে
গেছ যে হারিয়ে
পৃথিবীর ভিড়ে তুমি', ব'লে সে খিন্ন হাত ছেড়ে দিলো ধীরে ;
শান্ত মুখে—সময়ের মুখপাত্রীর মতো সেই অপূর্ব শরীরে
নদী নেই—হৃদয়ের কামনা ব্যথা শেষ হ'য়ে গেছে কবে তার ;
নক্ষত্রেরা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর।
('জর্ণাল : ১৩৪৬')

শেষ উদ্ধৃতিটা বিশেষ ভাবে লক্ষ করবার মতো। এখানে হাত আছে, নদীও রয়েছে, নদী হচ্ছে হৃদয়ের কামনা–বাসনা। অন্যত্র নদীতে রয়েছে শুশ্রূষার জল। হাত স্পর্শ দেয়, সান্ত্বনাও দেয়। দিতে পারে সাহসও। জীবনানন্দের শিরদাঁড়া খুবই শক্ত, তবু ভয় যে নেই তাও নয়। 'রূপসী বাংলা' নামে যে বই তাঁর মৃত্যুর পরে বের হয়েছে, তার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা'। নীলিমা বিধ্বস্ত হয়নি, তবে ত্রস্ত ছিল তো বটেই, তিনি নিজেও তাই ছিলেন।

জীবনানন্দের অমনোযোগী পাঠকও দেখবেন তাঁর পৃথিবীটা কেমন ঘ্রাণে পরিপূর্ণ। ব্যতিক্রম বাদ দিলে, এই ঘ্রাণ বিরক্ত করে না, দূরে সরায় না। সমৃদ্ধ করে। তাঁর কথাসাহিত্যে গন্ধ পাওয়া যায়। সে গন্ধে কল্পনার জায়গা নেই, বরঞ্চ খুবই বাস্তবিক। যেমন, 'মাল্যবান' উপন্যাসে। সেখানে মাছের গন্ধ মোটেই প্রীতিকর নয়। কিন্তু কবিতার গন্ধে কল্পনা আছে, এবং তাতে বিতৃষ্ণা নেই। প্রধান ঘ্রাণ মৃত্তিকার, বিশেষ করে বাংলার মাটির যেমন,

আমি সেই বাংলার—তাহার মাটির ঘ্রাণ ল'য়ে ফেলেছি যে–দেশে

গন্ধের তালিকাও দীর্ঘ হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহানগরীর মৃগনাভি, বেদনার গন্ধ ; গন্ধ পেঁচার, চালের, ফেনার, হাঁসের গায়ের, উৎসবের, ধানের, অঙ্গারের, আদিম রাত্রির,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রৌদ্রের, চাল-ধোয়ার, জলের চামড়ার, শিশুর মুখের, জলের ধুপের ও ঝিঁঝির। মৃত গলিত আমিষের গন্ধও রয়েছে, তবে সেটা ব্যতিক্রম। অতিচমৎকার সব পঙক্তিতে তিনি লিখেছেন,

১. আমার দেহের গন্ধে পাই তার (পৃথিবীর) শরীরের ঘ্রাণ

২. ফেনসা ভাতের গন্ধে আজ মুকুলের গন্ধ মিশে যায় যেন বার বার

৩. সমুদ্রের সেই জল পৃথিবীর ঘ্রাণ নিতে আসে

৪. নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার পৃথিবীটিকে মাখে

৫. হে মৃত্যু...
আমার হৃদয়ের ভিতর
সেই সুপক্ক রাত্রির গন্ধ পাই আমি

৬. রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে
স্বপ্নের

স্পর্শের সঙ্গে ঘ্রাণ মিলে জগতটাকে ইন্দ্রিয়ঘন করে তুলেছে। একটি বিশেষ গন্ধ হচ্ছে নতুন বীজের। জীবনানন্দ যখন বলেন, 'নতুন বীজের গন্ধে ভরে দেয় আমাদের মন', তখন যে খুব একটা কাব্যিক উক্তি করেন তা নয়। আশা জিনিসটা খুবই অকাব্যিক, শুভের মতো। তাদের তুলনায় হতাশা ও অশুভ অধিক কাব্যসম্মত। আশাকে নজরুল কাব্যিক করেছেন। একদিকে আন্তরিকতা এবং অন্যদিকে আশার বিপরীতে কাজ করছে যে অশুভ তার সম্পর্কে অবহিতির সাহায্যে ; সর্বোপরি কল্পনাপ্রতিভা তো অবশ্যই ছিল। জীবনানন্দ অশুভ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত। কোটি কোটি শূয়রের আর্তনাদ তাঁর কানে এসেছে। পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখের খবর তিনি রাখেন। তবুও তিনি আশাবাদী, এবং সে জন্যেই, ওই তবুওর কারণেই তাঁর আশাবাদটা নির্ভরযোগ্য।

দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।
... ...
সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রম মুক্তি হবে
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;

মুক্তি হবে ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে ; হবে তা মনীষীর কাজে। জীবনানন্দের দু'টি নির্ভরতার একটি হচ্ছে মানুষের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মনীষা। তাঁর আস্থা তাপে নয়, আলোতে। এ-কথা তিনি বহু জায়গায় বলেছেন। আরেকটি নির্ভরতা হলো মানুষের হৃদয়, যে-বিষয়েও তিনি বার বার উল্লেখ করছেন। যেমন,

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি। (হে হৃদয়)

এই হৃদয়ই 'উম' দেয় শীতের রাতে। নদী উপমা হয়ে যায় হৃদয়ের, শুশ্রূষাপ্রবণতার কারণে। 'কমলালেবু' নিয়ে কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ, সেখানেও বক্তব্যটা শুশ্রূষার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার যখন দেহ থেকে বার হ'য়ে যাব
আবার কি ফিরে আসিব না আমি এই পৃথিবীতে?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে

জনগণ মেধা পছন্দ করে না, তারা সেবা চায়। মেধাকে তারা ভয় করে। এবং সেবা চাওয়ার দরুন ভেঙে ধ্বসে যায় অমোঘ সমিতি। জীবনানন্দের পক্ষপাত মেধার প্রতি, এখানে তিনি একাধারে প্লেটো ও উপনিষদের ঐতিহ্যে লালিত, ব্রাহ্ম সমাজেরও। তিনি সেবা নয় শুশ্রূষা দেবেন, রুগ্ন এই পৃথিবীকে, তার মানুষকে। এবং বলা যাবে যে, তিনি মানুষের চেয়ে বড় মনে করেন মনুষ্যত্বকে, এবং মনুষ্যত্বের চেয়েও বড় বলে জানেন জীবনকে। এই জীবনের সম্ভাবনা অতীতে দেখা গেছে, ভবিষ্যতেও দেখা যাবে।

আসলে তিনি বহুর নন, কতিপয়ের। নজরুল যেমন সকলকে নিজের করে নিতে চান, বন্ধু বলে, জীবনানন্দ তেমনটা করেন না। তিনি আপনজনদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। যে জন্য দেখা যায় তাঁর কথাসাহিত্যে দাম্পত্য জীবনটাই মুখ্য উপজীব্য হয়ে ওঠে। এবং অপর দিকে যেখানে হৃদয়ের উষ্ণতা না থাকে সেখানে নায়কদের, বিশেষ করে নায়কদের জীবনে ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা আসে। তিনি ভাবালু নন ; বিভূতিভূষণের সমালোচনা করেছিলেন ওই ঔপন্যাসিকের ভাবালুতা লক্ষ করে ; জীবনানন্দ যুক্তির সঙ্গে বিচার করতে চান, যে জন্য তার গল্প-উপন্যাসে মৃত্যু খুব সহজে ঘটে, এবং তিনি মৃত্যুর কোনো বর্ণনা দেন না।

কিন্তু ভিত্তিটা কি? এই গভীর গভীরতর এই অসুখের মধ্যেও তিনি ভরসা করছেন কিসের ওপর? আমরা 'সুচেতনা' কবিতায় তাঁর বক্তব্যটি স্মরণ করতে পারি,

এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।....

যে আপনজনকে তাঁর বড়ই প্রয়োজন সে একজন নারী। মহিলাই বলা যাবে। নারী সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি প্রথাগত ; নজরুল যেমন মেয়েদেরকে বিভিন্ন রূপে দেখেছেন, জীবনানন্দ তা দেখছেন না। তিনি প্রেয়সী হিসাবেই তাকে দেখেন। এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বেশ পুরুষতান্ত্রিক। দেহ উপেক্ষিত নয়, দেহকে তিনি শরীর বলছেন, তাঁর আগে ওভাবে কেউ বলেনি। যেমন,

তোমার শরীর,
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার ; তারপর, মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানি নি তা,
হয়েছে মলিন
চক্ষু এই ;—ছিঁড়ে গেছি—ফেঁড়ে গেছি—পৃথিবীর
পথে হেঁটে হেঁটে ('১৩৩৩')

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের ভেতরেও সেই তাড়না আছে বনের হরিণ যা অনুভব করে। 'ক্যাম্পে' কবিতার সেই আলোচিত পঙক্তিগুলোতে,

> তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে ;
> তাহাদের হৃদয়ের বোন
> বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে জোৎস্নায়
> পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে-আস্বাদে ;
> কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ আর নাই যেন ;

হরিণের যে অসহায়ত্ব সেটা মানুষেরও বটে। 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?' বনলতা সেনের সেই যে আপনি সর্বনামে সম্বোধন সেটা খুবই স্বাভাবিক। এখানে 'তুমি' মস্ত বড় ছন্দপতনের কারণ ঘটতো ; কবি সেটা ঘটাতে দেননি। সত্য বটে তাঁর আরেক নায়িকা অন্ধকারে প্রিয় পুরুষটির হাত তুলে নিয়ে বলেছিল 'রোগা হয়ে গেছ এত' ; কিন্তু সে তো আর আগের মহিলাটি নেই, তার কামনা ব্যথা সব বিগত হয়েছে, নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে সব। আপনি তুমির সম্পর্কটিই স্বাভাবিক, এর বাইরে পা বাড়ালে তা নিতান্ত কৃত্রিম শোনাতো। এঁরা দু'জন পাশাপাশি থাকতে চান, একজন বৃক্ষ, অপরজন ছায়া। পরিচিত ভূখণ্ডে তাদের স্থান-সঙ্কুলান হয় না,

> আমাদের দু'জনার মতো দাঁড়াবার
> তিল ধরনের স্থান তাহাদের বুকে
> আমাদের পৃথিবীতে নেই ('ভাষিত')

এই স্থানাভাবের কারণ হচ্ছে সময়ের শত্রুতা। সময় জীবনানন্দের কবিতায় অনিবার্যরূপে উপস্থিত। একটি সময় হচ্ছে ব্যক্তিগত ; ঘড়ির কাঁটার মতো যে চলে, এবং ব্যক্তিকে নিয়ে যায় মৃত্যুর অভিমুখে। এই সময় মানুষের চিরকালের শত্রু। আরেকটি সময় সমসাময়িক ইতিহাস ; এ-ও বৈরিতা করছে মানুষের সঙ্গে। জীবনানন্দ এই উভয় সময়ের মুখোমুখি হবেন তাঁর ইতিহাস-চেতনা দিয়ে। এই ইতিহাস দীর্ঘ ; এতে মানব সভ্যতার গোটা ইতিহাসটাই উপস্থিত রয়েছে। সমালোচকেরা লক্ষ করেছেন যে বনলতা সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতার একটি সমান্তরালবর্তিতা রয়েছে। তবে দু'টি পার্থক্য তৎক্ষণাৎ চোখে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রিয় তার প্রেমিককে তুমি বলেই সম্বোধন করছে, আপনি না বলে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে ইতিহাস উজ্জয়িনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার বাইরে যায়নি ; কিন্তু জীবনানন্দ চলে গেছেন সিংহল, বিদিশা, শ্রাবস্তীতে, অতিদূরবর্তী দারুচিনি দ্বীপে। অন্যত্র তিনি নিওলিথিক যুগ থেকে শুরু করে বেবিলন এশিয়া মিশর গ্রীস ফিনিশিয়া হিন্দুসভ্যতা মুসলিম সভ্যতা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন।

ইতিহাসে মানুষের যে অর্জন সেটা টিকবে। সময় সেখানে হেরে যাবে। মৃত্যু আসবে, কখনো ভিক্ষুকের মতো, কখনো বা শিকারী হয়ে ; কিন্তু আশার দিকটি এটি যে, ব্যক্তি আবার ফিরে আসবে। হয় তো মানুষ নয়, হয়তো অন্য কোনো বেশে। আসলে সময়কে জীবনানন্দ জয় করবেন স্থান দিয়ে। মানুষের ইতিহাসের যে দীর্ঘপথ তাঁর কল্পনায় ভেসে ওঠে সেটি স্থানের। ইতিহাস স্থানে স্থানে থেমেছে এবং নিজের কাজ রেখে গেছে। "সবারে ভুলায় মৃত্যু—হে সময়, তুমি মৃত্যুরে ভুলাও" ; এবং এই সময় কখনো স্থানে পরিণত হয়, কখনো বা স্থানের সঙ্গে সমঝোতায় আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটকথা, জীবনানন্দের কবিতায় কালের স্থান বড়। কিন্তু স্থান ছাড়িয়ে যায় কালকে। আর এই স্থানের কেন্দ্রে আছে বাংলা, আরো নির্দিষ্ট করে বললে পূর্ববঙ্গ। তাঁর ঘোষণা খুবই স্পষ্ট, অত্যন্ত মমতাময়, এবং একজন সংশয়বাদীর পক্ষে যথেষ্ট দৃঢ়। যেমন,

ক. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর

খ. তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব

গ. যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের থেকে—দূর কুয়াশায়
চলে যাব সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে,—সেদিন দু'দণ্ড এই বাংলার তীর—
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা একা কি ভাবিব, হায়

ঘ. শুয়েছি ভোরের রোদ ধানের উপর
মাথা পেতে

ঙ. বাংলার মাঠে শুয়ে ঘুমায়েছি...
তার ঘাসে আমি হ'য়ে গেছি ঘাস

চ. একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলায়
জেগেছিল ; বাঙালী নারীর মুখ দেখে রূপ চিনেছিলো দেহ একদিন ;

জীবনানন্দের কল্পনা প্রতিভার বিশেষ শক্তি প্রকাশ পায়। পরস্পরবিরোধী উপাদানকে একত্র করায়, এবং সেই সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে সূক্ষ্ম কৌতুকপ্রবণতা। কবির এই দু'টি গুণকে অবশ্যই চিনতে হবে, তাঁকে জানার জন্য। বিপরীতকে মেলানোর কাজটা সব বড় কবিই করেন। নজরুল করেছেন, জীবনানন্দও করেন, তাঁর নিজের মতো করে। তাঁর সুবিনয় মুস্তফীর আশ্চর্য দক্ষতা ছিল বেরাল ও বেরালের মুখে ধরা ইঁদুরকে এক সঙ্গে হাসাতে পারার। অনুপম ত্রিবেদী ধরা পড়েছিল হেগেল ও মার্কসের হাতে, একজন তাকে ডান কান ধরে টান দিয়েছিল, অন্যজন টান দিয়েছিল বাম কান ধরে। যাদুবলে এও সম্ভব যে, ধোবা আর গাধা একসঙ্গে এসে জলে মুখ দেখবে এবং পরস্পরের পিঠে চড়ে চলে যাবে। কিন্তু আরো এক ধরনের ঐক্য রয়েছে, সেটা হলো ইতির সঙ্গে নেতির সংশ্লেষণ। এবং সেই সঙ্গে রয়েছে ইতির মধ্যে নেতির উপস্থিতি। এই যে সংশ্লেষণ সৃষ্টি ও বিদ্যমান সংশ্লেষণ দেখতে পাওয়া, এ কাজ তাঁর কল্পনাশক্তি করতে পারে, এবং করতে থাকে। তিনি লিখেছেন,

সৃষ্টির নাড়ীর 'পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়
অনন্ত বেদনার সাথে মিশে রয়েছে অমোঘ আমোদ
তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণ শোধ।

বেদনা ও আমোদের পারস্পরিক ঋণ শোধের কাজটা তাঁর নিজের সৃষ্টির মধ্যে সর্বদাই ঘটে, যে জন্য তাঁর কাব্যে 'মতো' এবং 'তবুও' 'কিংবা' 'অথবা' এবং 'হয়তো পাই ; বেদনার মধ্যেও আশাবাদ লক্ষ করি, বিষণ্ণতাও বৈদগ্ধ্যকে পরিহার করা অত্যাবশ্যক ভাবে না। বিরোধাভাসও বার বার পাওয়া যায়।

তাই দেখি সাতটি তারার সপ্তর্ষি কেবল আলো নয় তিমিরও সৃষ্টি করে, যার স্বীকৃতি তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের শিরোনামে রয়েছে। অন্যত্র দেখা যাবে, শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্যোদয় ঘটছে আবার বিপরীতে অফুরন্ত রৌদ্রের মধ্যেও তিমির রয়েছে। তারার আলোকের ভেতর সন্ধান পাওয়া যাবে 'নিরালোকে'র। বিস্ময় কবিকে বিপন্ন করছে। হাজার বছর ধরে তিনি হাঁটছেন, কিন্তু আবার নীড় খুঁজছেন, থাকবার। স্থিতিকে মেলাতে চান চলমানতার সঙ্গে। অন্ধকারকে মনে হয় যেন 'আলোর রহস্যময় সহোদর'। সাগরের মাঝখানে খোঁজ পান নীল মরুভূমির। দুপুরবেলায় সন্ধ্যা আসে, ভোরের বেলায় উড়ে যায় 'রাত্রিকরোজ্জ্বল' সমুদ্রের পাখি। অন্ধকার সুস্বাদু হয়ে ওঠে। আকাশের নক্ষত্র এবং পৃথিবীর ঘাস একত্র হয়ে যায় তাঁর কল্পনাতে। মনে পড়ে, সফোক্লেস ও মহাভারত মানব জাতির ব্যর্থতা জেনেই মহত্ত্ব অর্জন করেছিল ; তাই জিজ্ঞাসা জাগে, 'আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে?'

এই যে বিরোধ এর মধ্যে কৌতুকেরও স্থান রয়েছে। বলাইবাহুল্য, তাঁর কৌতুকবোধ নজরুলের মতো উচ্চাহাস্যপ্রবণ নয়, ব্যঙ্গাত্মকও নয়, এ হাসি বৈদগ্ধ্যপূর্ণ, এবং অত্যন্ত গভীর বিষয়েও একে পাওয়া যাবে। যেমন, 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় ; সেখানে বিষয়টা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কিন্তু ওই যে লোকটি ক্লান্তির হাতে ক্লান্ত হয়ে এখন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে, এবং এমন এক অবস্থানে চলে গেছে যেখানে ক্লান্তি তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না, এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা কৌতুক আছে বৈকি। তার মরিবার হয়েছে সাধ, অথবা বহুকাল ঘুম হয়নি—তাই লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার। প্রধান আঁধারে একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিল চলে একা একা। থুর থুরে অন্ধ প্যাঁচা গাঢ় সমাচার জানায়, চোখ পাল্টায়। বুড়ি চাঁদকেও দেখা যায়। ট্র্যাজেডির লেখকেরা কমেডিকে যে কেন ভয় পান না বোঝা যায় এ ধরনের লেখা পড়ে। এমনকি বনলতা সেন যখন পাখির নীড়ের মতো মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করেন, এতদিন কোথায় ছিলেন, তখন সেই চোখেও প্রশ্নে কৌতুকের প্রসন্নতা যে নেই তাই বা কি করে বলি? আছে বলেই বোধ করে ওই নারী অত জীবন্ত। অন্যত্র তিনি খুলির অট্টহাসি শুনতে পান ; এবং লক্ষ করেন,

> আকাশ নিজের স্থানে নেই মনে হলো
> আকাশ কুসুম তবু ফুটেছে পাপড়ি অনুসারে।

এবং শুনতে পান

> কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড়
> নারীর রা দেখে হো হো করে হাসে

চোখে ভেসে ওঠে এমন দৃশ্য যে,

> ক. এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মত বার হয়
>
> খ. শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে
> তবুও কেবল দ্বীপ বানালো যে যার
> নিজের অবক্ষয়ের জলে

'লঘু মুহূর্তে' লক্ষ্য করেছেন, ভিখিরীদের স্বপ্নের উড়ো নদীতে

> হাড় হাভাতে ও হাড় এসে জলে
> মুখ দ্যাখে—যত দিন মুখ দেখা চলে।

'রাত্রি' কবিতায় তাঁর যে যথার্থ-কারণে-সুখ্যাত পঙক্তি কয়টি সেখানেও কৌতুকের একটি বোধ বিলক্ষণ কাজ করছে। স্মরণ করা যাক,

> হাইড্যান্ট খুলে নিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
> অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটর কার গাড়লের মতো গেল কেশে
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ; সতর্ক সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহ ভাবে প'ড়ে গেল জলে।
তিনটি রিকশ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাস ল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদু বলে।।

এই যে অত্যন্ত জীবন্ত, চলমান ও একান্ত নিজস্ব ছবি এটি তৈরি কখনোই সম্ভব হতো না যদি-না কবির কল্পনাপ্রতিভায় কৌতুকের একটি উপাদান থাকতো। বিভূতিভূষণের লিখায় যে বিষণ্ণতা ও ভাবালুতা লক্ষ করেছেন জীবনানন্দ, সেটা জীবনানন্দের নিজেরও হতে পারতো, কৌতুকবোধ না থাকলে। 'সমারূঢ়' নামের সেই কবিতাটিতে সেই অধ্যাপকটিকে কবি যে বলেছেন 'বরং তুমি নিজেই লেখোনাকো একটি কবিতা' সেটা ক্রোধের কথা নয়, ঠাট্টার কথা। ঠাট্টা বলেই ছায়াপিণ্ডটি উত্তর দিতে পারেনি। গ্রে স্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় তিনি দেখেছেন চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনের পাশে,

একজন দুইজন কুঠে
চুপে চুপে আসে এইখানে
যেই মাংস পাবে নাকো শুধু তার ছবি দেখে—
ঘ্রাণে থেকে—আরক্ত আশ্বাসে

দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতায় স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে লোকদের ওঠা নামার খবরও তিনি রাখেন, এবং জানেন যে ওইপথে যেতে হলে 'হুণ্ডী হাতে অগ্রসর হয়ে যেতে হয়।'

স্বগতোক্তির মতোই বলেছেন,

আমি বলি আমিও তো কবিতা লিখতেই চাই
কিন্তু পেটে কিছু পাব নাকি?
যার জোরে আশাপ্রদ কবিতা লিখতে পারা যায়
জীবনের জায়গান করে?

বিরক্তি যে একেবারে নেই তা নয়, তবু বৈদগ্ধ্যের কারণে বিরক্তি শিল্পমূল্য হারায়নি। যেমনটা দেখতে পাই এ ধরনের চিত্রকল্পে,

একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিলো
তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিল দশ জন মূর্খের বিক্ষোভে।

তাঁর দেখার ও কল্পনার জগতে দ্বন্দ্ব আছে, সেই দ্বন্দ্বে প্রাণবন্ততা রয়েছে। মূল দ্বন্দ্বটা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে সময়ের। এরই অপর নাম জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর বিরোধ। মানুষ এক দিকে যেতে চায় সময় ঠেলে দেয় তাকে বিপরীত দিকে। এই বিরোধটা নানাভাবে এসেছে তাঁর কবিতায়। একটি ছবি এই রকমের—

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে
আমাদের দু'জনকে নিতে চায় সেই শব্দহীন মাটি ঘাসে
সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনোদিন সেদিকে যাবে না
তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চলে যায় কি গভীর সহজ অভ্যাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিরোধকে দেখে তিনি উল্লসিত হন না ঠিকই, একটা বিষণ্নতা তাঁর কাব্যে আছে বৈকি, তাঁর আবহাওয়াটা প্রধানত হেমন্তেরই। কিন্তু হেমন্ত শীতের পূর্বাভাস বটে, তবে শীত নয় ; সেখানে আভা আছে, দীপ্তি পাওয়া যায়, প্রচণ্ড রোদ নেই আবার শীতে কুঁকড়ে যাওয়াও নেই। ভেতরে একটা আমোদ রয়েছে, যেটি কৌতুকের দ্বারা পুষ্ট। বেদনার সংবিতকে সঙ্গে নিয়েই তিনি কৌতুকপ্রবণ।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যভাষাতেও এক ধরনের আমোদ আছে, তিনি বাদ দেন না, মধ্যবিত্তের শুচিবাই তাঁর নেই। সব বড় কবিরই নিজস্ব ভাষা থাকে, জীবনানন্দেরও থাকবার কথা ; আছেও। নজরুলের ভাষা যেমন তাঁর নিজের, জীবনানন্দের ভাষাও তেমনি। এই ভাষাতে পূর্ববঙ্গ অনাত্মসচেতনভাবে উপস্থিত। যে গুরুচণ্ডালির জন্য জীবনানন্দ বিখ্যাত, পূর্ববঙ্গের ভাষার মধ্যে তা পাওয়া যায় ; সে ভাষায় শীতের 'উম' যেমন থাকে, শীতটা হিম সে খবরও তেমনি থাকে ; কোনটা সাধু কোনটা গ্রাম্য খেয়াল থাকে না, মিশে যায় ; আধুনিক জীবনের শব্দও এসে যায়, অনায়াসে। বাংলা কবিতার ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ যেখানে পৌঁছে দিয়েছিলেন, জীবনানন্দ সেখান থেকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন, ভিন্ন ভিন্ন দুই দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কবিমানস : উপসংহার
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

মানব ইতিহাসের বহমানতার ধারণা থেকেই জীবনানন্দ দাশ বিশ্বমানবিক ঐতিহ্যের যাকিছু শ্রেষ্ঠ তার উত্তরাধিকার দাবি করেছেন। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, পাউণ্ড ও এলিয়টের মতোই পূর্বসূরি কবিবৃন্দের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনিও সন্ধান করেছেন নিজস্ব প্রাসঙ্গিকতা।

কবি–জীবনের সূচনায় ছিল আত্ম–আবিষ্কারের মুগ্ধতা :

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি ;
একদিন শুনেছ যে–সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ !
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার ;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক ;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনো—
নতুন এ—আর সব হারানো—পুরোনো।

(কয়েকটি লাইন : কাব্য–সম্ভার পৃ. ১৫)

সমগ্র কবি–জীবনে এই 'নতুন'—নির্মাণে তিনি অভিনিবিষ্ট হয়েছেন, অধীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নানা বর্ণালোকে। গ্রাম–জীবনে যেমন তিনি বিনষ্টিকে দেখেছেন তেমনি দেখেছেন নগর–জীবনের 'নীলিমা' ঢেকে যাচ্ছে কালো ধোঁয়ায়। সভ্যতার সম্ভাবনাহীনতার উপলব্ধি নিয়ে মনে হয়েছে : সহজ নয় সাধারণ কৃষকের মতো 'উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে থাকা ('বোধ', কাব্যসম্ভার, পৃ. ৩৪) ; এমনকি কৃষকের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে যেয়েও নয় :

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল ?
বাল্‌টিতে টানিনি কি জল ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনলতা সেন দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ শিল্পী : কাজী হাসান হাবিব

কাস্তে হাতে কতোবার যাইনি কি মাঠে?
মেছোদের মতো আমি কতো নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি;
পুকুরের পানা শ্যালা—আঁশটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে;

কিন্তু এ-জীবন 'অবাধ' থাকেনি; 'চলে গেছি ইহাদের ছেড়ে'। ভালোবাসাও পরিণামে 'ধুলো আর কাদা'। বোধ, উপলব্ধিই কবিকে স্বতন্ত্র করেছে:

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?

কেননা— মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।

আত্মোপলব্ধিও শান্তিপ্রদ নয়, কেননা আস্থা নেই সমকালে, প্রেমে কি ভবিষ্যতে:

আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে:
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!

মানুষ অর্থাৎ সমকাল, মানুষী অর্থাৎ প্রেম, শিশু অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কোনো কিছুতেই সম্ভাবনা নেই, আস্থা নেই—'এই বোধ—শুধু এই স্বাদ'। পরিণামে তাই সমকালীন বাস্তবতার তীব্র চিত্রাবলী:

চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ-গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা-পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
সে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব

(বোধ: কাব্য-সম্ভাব পৃ. ৩৫-৩৭)

'ক্যাম্পে' কবিতার অসামান্য নাট্যিক দ্যোতনায় 'বসন্তের রাতে' যখন 'লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন-স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে' তখনই 'হিংসা' প্রবল হয়ে ওঠে, শোনা যায় 'বন্দুকের শব্দ':

প্রেমের সাহস—সাধ—স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই অনিবার্য উপসংহার :

এই ব্যথা,—এই প্রেম সব দিকে র'য়ে গেছে,—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে,—মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

(কাব্য-সম্ভার পৃ. ৪৫-৪৬)

'১৩৩৩' শীর্ষক কবিতায় কবির প্রেমোপলব্ধির উচ্চারণ : 'দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের ঝরে যায় মন'। এই কবিতায় 'শরীর' শব্দের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুকে মুগ্ধ করেছিল। প্রেমিকা একদা তার 'শরীর নিয়ে' এসেছিল, আজ সে নেই, কবি পৃথিবীর পথে ছিন্ন-ভিন্ন, বহুলাংশে সুধীন্দ্রনাথের মতো স্মৃতিদীর্ণ :

তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার ;—তারপর,—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানিনি তা,—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই ;—ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি,—পৃথিবীর পথে হেঁটে—হেঁটে
কতো দিন রাত্রি গেছে কেটে !
কতো দেহ এলো,—গেলো,—হাত ছুঁয়ে—ছুঁয়ে
দিয়াছি ফিরায়ে সব ;—সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
বসে আছি,—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া !

(কাব্য-সম্ভার পৃ. ৬৩)

প্রেম এবং আশার পূর্ণতাও মানুষকে একাকিত্বের বিপন্নতায় টানে। প্রেমের পূর্ণতার বা মিলনের মুহূর্তেই সুধীন্দ্রনাথ মৃত্যু কামনা করেছিলেন গভীর রোমান্টিকতায়। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় জীবনানন্দের উপলব্ধি রোমান্টিকতার নয়—বিপন্নতার, বিস্ময়ের :

বধূ শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো-জ্যোৎস্নার,—তবু সে দেখিল
কোন ভূত ? ঘুম ভেঙে গেলো তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

বিস্ময়ের কারণ—প্রকৃতি-সংলগ্ন সকল প্রাণীই জীবনাকাঙ্ক্ষী :

তবুও তো প্যাঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

তবু জাগতিক অর্থে পরিপূর্ণ মানুষ—যার প্রেম আছে—আশা—আছে, সেই মানুষ আত্মহত্যা করে কেন? জীবনে মানুষ প্রকৃতি-বিচ্যুত—মৃত্যুতেই প্রকৃতিতে বিলীনতা—এই উপলব্ধিতে? কবির ভাষায়:

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়িহাতে গিয়েছিলে তবু একা একা;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

(কাব্য-সম্ভার পৃ. ১৮৬-৮৭)

কবির ধারণা; প্রকৃতির সব উপাদান—অশ্বত্থের শাখা, জোনাকির ভিড়, প্যাঁচা, যবের ঘ্রাণ, হেমন্ত বিকেল—এই আত্মহননের প্রতিবাদী ছিল। জীবন তবুও ছিল জীবনের ভারেই খুব ক্লান্ত:

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছি টেবিলের প'রে।

(কাব্য-সম্ভার পৃ. ১৮৮-৮৯)

সাতটি তারার তিমিরে'র 'আকাশলীনা' কবিতায় প্রেম এক প্রৌঢ় মিনতির প্রতিধ্বনি। সুরঞ্জনাকে যুবকের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করার মধ্যে যে-ব্যাকুলতা, স্পষ্টতই তা বয়সের বিঘ্নে ব্যাকুল:

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বোলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা:
নক্ষত্রের রূপালি আগুন-ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো আর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে যুবকের প্রেম সুরঞ্জনার মৃত্তিকা–হৃদয়ে 'ঘাসের' মতই স্বাভাবিক, সতেজ ;

কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে।

প্রথমে প্রশ্ন, তারপরই উপলব্ধির বিস্ময় ;

আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ ;
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

তাই উপসংহারে মেনে নেয়ার স্বাভাবিকত্ব ;

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস ;
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

(কাব্য–সম্ভার পৃ. ২৪৯)

জীবনানন্দ দাশের নগর–বিতৃষ্ণার অসামান্য কবিতা 'সাতটি তারার তিমির'–এর 'রাত্রি'। প্রতি দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিলযুক্ত চার চরণের আট স্তবকের কবিতার প্রথমেই নগরের কুশ্রী প্রত্যক্ষ ; এখানে হাইড্র্যান্ট ফেঁসে যায়, কুষ্ঠরোগী জল চেটে নেয় এবং সভ্যতার প্রতীক 'মোটরকার' 'গাড়লের মত' কেশে যায়, 'অস্থির পেট্রল ঝেড়ে'।

হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে—

এই ঘটনার উপমা হিসেবে কবি যে অসাধারণ চরণ রচনা করেন তাও নগরের ভয়াবহতারই চিত্রকল্প :

সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।

রাত্রির পরবর্তী দৃশ্য চাঞ্চল্যের ; পরাবাস্তবগন্ধী :

তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো যাদুবলে।

এই নগরে কবির কাজও হঠকারিতা–উদ্ভূত :

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে ;
চিনেবাদামের মতো বিশুদ্ধ বাতাসে।

নগরের প্রাণ–স্পন্দন যন্ত্রোদ্ভূত—চতুর্থ স্তবকে তার চিত্র :

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

পঞ্চম স্তবকে এরই প্রলম্বন : নাগরিক জীবনের টেনশনের চিত্র ও চেতনা :

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে ;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকে এই নগরের আন্তর্জাতিক চারিত্র্য এবং গানের চরিত্রভ্রষ্টতা তীব্র-রেখায় ফুটে উঠেছে :

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী ;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে, সোনা, তেল, কাগজের খনি।
ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে ;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

কবিতার শেষ স্তবকের প্রথম দু'চরণে এই বৃদ্ধ নিগ্রোর চোখে নগরের 'মহৎ রাত্রির' স্বরূপ দর্শন এবং শেষ দু'চরণে পূর্ববর্তী দু'চরণে প্রতিষ্ঠিত 'জঙ্গলের' পশুর সঙ্গে নগরের 'জন্তু'-দের তন্তুজ পার্থক্য নির্দেশ—অসামান্য শ্লেষোত্থিত। নিগ্রোর চোখে :

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।

কবির চোখে :

তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।
(কাব্য-সম্ভার পৃ. ২৫২-৬০)

এই নগরেই কবি দেখেন,

ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র-বৌ সকলে নারাজ।
(লঘু মুহূর্ত : কাব্য-সম্ভার পৃ. ২৬১)

এই অনাত্মীয় নগর, এই রাত্রি, এই বিংশ শতাব্দীর তিমির যতই অনিবার্য হোক কবি শেষ পর্যন্ত গেয়ে ওঠেন তিমির হননের গান। প্রথমে সংশয় :

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী ?

কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রত্যাশা ও প্রত্যয় :

আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।
(তিমির হননের গান : কাব্য-সম্ভার পৃ. ২৮১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি-জীবনের উদ্বোধনে জীবনানন্দ যেমন নজরুল-অনুসারী মানুষের জয়গান করেছিলেন, তেমনি যেন পূর্ণবৃত্তে ঘুরে এসে কবি-জীবনের উপসংহারে তিনি আবার জয়ধ্বনি করে ওঠেন জীবনের সম্ভাবনার, অরুণোদয়ের :

সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চ'লে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।
....
নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির যাট বসন্তের তরে !
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;—
জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়,

(সময়ের কাছে : কাব্য-সম্ভার পৃ. ২৮৭-৮৯)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তব্ধতাতাড়িত জীবনানন্দ

বেলাল চৌধুরী

আবহমান বাংলা ও বাঙালির কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতার সুপ্রাচীন ধারা এবং রবীন্দ্রনাথে লালিত হয়েও একটা বিশেষ সময় থেকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নতুন নিজস্ব এক রীতি উদ্‌ঘাটন করে বিগত শতাব্দীর অর্ধেকেরও বেশি এমন এক জীবনানন্দীয় ধারা প্রবর্তন করেছেন যা যুগপৎ আধুনিক, বিস্ময়কর এবং অননুকরণীয়। আপাদমস্তক বাঙালি জাতিসত্তায় নিবেদিতপ্রাণ জীবননান্দ দাশ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন ইংরেজি ভাষার ছাত্র এবং শিক্ষক। বিশ্বসাহিত্য মন্থন করে তিনি যে সব অমৃত নির্যাস তুলে এনেছিলেন তা এক কথায় তুলনারহিত। এখানে আরেকটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়—তাঁর সমকালীন অর্থাৎ তিরিশের কবিদের দু'একজন ব্যতিরেকে বেশির ভাগই তাঁর নিজেরই মতো ইংরেজি ভাষার ছাত্র এবং শিক্ষক।

চিন্তা চেতনায় মননে পুরোপুরি বাঙালি হয়েও ভেতরের বৈশ্বিক বোধের তাড়নায় তিনি এতটাই আলোড়িত ছিলেন, নিজের অন্তর্জগতের গভীর গহনে ডুব দিয়ে বাংলা কবিতার প্রাণস্পন্দনকে সম্পূর্ণ এক আলাদা শিখরে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও কবি হিসেবে জীবনানন্দের পরিচিত সমধিক, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় জীবনানন্দ না হলে বাংলা গদ্যের বর্তমান, বলতে গেলে একেবারে হালফিলের, ষোলকলা বিকাশ কখনওই সম্ভব হতো কি না ঢের সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। জীবৎকালে জীবিকার অনন্যোপায় দৃশ্যত যৎসামান্য গদ্যরচনা এবং প্রকৃত বড় কবিদের অবশ্যকরণীয় কবিতা বিষয়ক কিছু নিবন্ধ ছাড়া তাঁর আর কোনও রকমের গদ্য রচনার কথা জানা যায়নি। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে তাঁর অসংখ্য অজস্র গদ্যরচনা আবিষ্কৃত হয়ে সবার মুখের রা কাড়া বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম হয়েছে। অসম্ভবভাবে অর্ন্তমুখী ও গোপনচারী জীবনানন্দ কাঁড়ি কাঁড়ি লেখা সত্ত্বেও সেগুলো কেন নিজের জীবদ্দশায় না ছাপিয়ে অতিশয় সংগোপনে ট্রাঙ্কের ভেতর খাতা বন্দি করে ধূসরতর করে তুলেছিলেন সেও এক বিস্ময়। গদ্যে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে সামান্য অদলবদল ঘটিয়ে যে গতিশীলতার সঞ্চার করেছিলেন তাকে অনবদ্য বললেও কমই বলা হয়। প্রচলিত সহজ শব্দাবলি বা চলতি ভাষার বাগ্‌ধারা ব্যবহারে জীবনানন্দের নৈপুণ্য প্রশ্নাতীত।

'কোনো কোনো বৃদ্ধ এসে অত্যাচার করে,
যুবাদের ভিড়ে কোনো কাজ নেই!
চারিদিকে সর্বগ্রাসী দরিদ্রতা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ সাকুল্যে বেঁচেছিলেন মাত্র পঞ্চান্ন বছর। একেবারে প্রথম থেকে ধরা গেলে তাঁর সাহিত্যজীবন কমবেশি পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি হওয়ার কথা নয়। জীবনানন্দ কিংবা তাঁর বিষয়ে কি শেষ কথা বলে কিছু আছে না বলা যায়? জন্মশতবর্ষপূর্তিতে এসেও তাঁর সঠিক জন্ম তারিখটি এখনো সংশয়াতীত হতে পেরেছে কি? ১৭, ১৮ কিংবা ১৯–ও বলেন কেউ কেউ। সাংসারিক ও সামাজিক. জীবনে যেমন পেশাগত দিক থেকেও অধ্যাপনা বা সাংবাদিকতায় তাঁর সাফল্য বলতে কিছুই নেই। একমাত্র কবিতা ছাড়া তাও বা বলি কি করে এই যে এখন এতদিন পর খাতার পর খাতায় লিখিত কবিতা, গল্প এমনকি উপন্যাসও পাওয়া যাচ্ছে বা আবিষ্কৃত হচ্ছে রাশি রাশি নিত্য নতুন অপ্রকাশিত এবং অমুদ্রিত। তাঁর পীড়িত জীবন, অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য পরিবার ও সমাজকেও ছেড়ে কথা কইছেন না অনেকেই।

সমকালে তাঁর কবিতা প্রত্যাশিতভাবে তেমন আদৃত না হলেও সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসুর মতো কবিরা এবং একান্ত অনুরাগী ভক্ত কয়েকজন তরুণ যারা তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন তাঁরা ছাড়া আর কেউই যে উৎসাহ বা অনুপ্রাণিত বোধ করেননি সে কথা তো আজ সকলেরই জানা। এখানে আরও একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই তরুণরাও অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে 'ময়ূখ' বের করেছিলেন তারাও কেমন যেন নিশ্চুপ মেরে গিয়েছিলেন হয়তো ঘটনার আকস্মিকতায় কিংবা নিজেদের জীবন ও জীবিকার তাগিদে।

তবে ঐ শোকাবহ মৃত্যুর প্রায় এক যুগ অর্থাৎ ষাটের দশকে দেখা গেছে ঘোরতরভাবে কাব্যাদর্শে বিভক্ত বঙ্গীয় কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবনানন্দের নাম ক্ষীণতর হয়ে এসেছে। ভাঁটার টান লাগতে শুরু করেছে যেন। অবশ্য এর আরেকটা কারণ সম্ভবত ততদিনে যেসব পত্র–পত্রিকায় নিয়মিতভাবে জীবনানন্দের কবিতা ছাপা হত সেগুলি এবং বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকাও বলতে গেলে প্রায় উঠেই গেছে। বুদ্ধদেব বসু নিজেও নানাবিধ রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কিংবা নতুন করে অধ্যাপনা শুরু করেছেন বা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা'র প্রকাশনাও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া দেহ মনে তিনিও কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত, অপ্রকৃতিস্থ। তবে বাংলা কবিতার আলোচনার বিচারে জীবনানন্দ দাশকে একেবারে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি কারো পক্ষেই। এছাড়া নতুন কবি ও কবিযশো–প্রার্থীদের ভেতর উত্তরোত্তর তাঁর কবিতার প্রভাব ও কদর ক্রমবর্ধমানতার দিকেই এগিয়ে গেছে। বুঝুক চাই নাই বুঝুক একবার পাঠের পর জীবনানন্দে আচ্ছন্ন হয়নি এমন মানুষ খুব কমই দেখা যায়।

উত্তররৈবিক পর্বে জীবনানন্দের কবিতা যে সম্পূর্ণ একটা আলাদা আবহ নির্মাণে সমর্থ হয়েছিল সে কথা অবশ্যই আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মাঝে সাময়িক একটা ঝিমুনিভাব এলেও অচিরকালের মধ্যেই কবির বিকাশ, ব্যাপ্তি, সাহিত্যিক আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য স্বকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রতিক্রিয়া ও অবদানের নতুন করে মূল্যায়নে ব্রতী হন কবিতাপ্রেমীরা। এমনই এক কাকতাল যে ঘটনাবহুল বিগতপ্রায় শতাব্দী শেষে শুধু নতুন শতাব্দীই নয় নতুন সহস্রাব্দের প্রাক্কালে বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল কবির জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে দুই বাংলাতেই। দেশ–বিদেশে প্রবাসী বাংলাভাষীরাও পিছিয়ে নেই। একই সঙ্গে দুই প্রধান এবং সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার কবির মধ্যে দু'জনের কবিকৃতি দু'ধরনের। দু'জনেরই সৃষ্টিকাল সংক্ষেপিত হয়েছিল আকস্মিকভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবলভাবে মুখর ও উদ্দাম নজরুল দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণেই আমৃত্যু নির্বাক অবস্থায় কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করেন আর নিভৃতচারী স্বভাবলাজুক জীবনানন্দ প্রাণ হারান শোকাবহ দুর্ঘটনায়। নজরুলের কাব্যে ছিল সময়োপযোগী তারুণ্য, বিদ্রোহের প্রকাশ, বৈপ্লবিক অভিঘাত। এ ছাড়া পরিগণিত হয়েছিলেন নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে। আর বাংলা কাব্যপ্রেমীদের কাছে অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন কবি জীবনানন্দের স্থান হয়েছিল উত্তররৈবিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে। কিন্তু তার নামের ভেতরেই ছিল এক দারুণ বিড়ম্বনা আর করুণ অসঙ্গতি। কবির জীবনে আনন্দ তো দূরের কথা জীবনযুদ্ধ তাঁকে করে তুলেছিল বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছিল নিরানন্দ। জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থানকারী বিদ্রোহী নজরুল জন্মশতবর্ষে উদ্‌যাপনা যতটা আড়ম্বর ও প্রচার পাচ্ছে তার তুলনায় জীবননিষ্ঠ জীবনানন্দের জন্মশতবার্ষিক উদ্‌যাপনা অনেক ম্লান ও ম্রিয়মাণ। দু'জনেরই জীবন অদ্ভুত সব বৈশিষ্ট্যে ভরা। একজন দুর্মরভাবে অন্তর্মুখী, অন্যজন বহির্মুখী। এর পরেও একজন স্বল্প সময়ের জন্য হলেও অন্যজন দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও সবশেষে নিজের কাব্য ও কাব্যভাষা যে স্বতন্ত্র মহিমায় নির্মাণ করে নিতে পেরেছেন তা শতাব্দী তো শতাব্দী সহস্রাব্দকেও ছাপিয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। চরিত্রগত বৈপরীত্য সত্ত্বেও নজরুলের প্রতি জীবনানন্দ ছিলেন অকৃত্রিমভাবে শ্রদ্ধাশীল। আত্মগত ঘোরের মধ্যে থাকা জীবনানন্দের কাছে কবিতা ছাড়া অন্য কিছুর প্রবেশাধিকার কতটুকু ছিল তা অনুমানসাপেক্ষ হলেও হতে পারে। তবে ধ্যানে-জ্ঞানে-নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তিনি যে আদ্যন্ত কবিতায় সমর্পিতপ্রাণ ছিলেন এর ভেতরে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই তা যতই তাঁকে গোপনচারী নিভৃত বিলাসী বলা হোক না কেন। শুধু বাংলার মুখই নয় প্রকৃতি ও নগর দুই-ই প্রায় সমান গুরুত্বে জীবনানন্দের ভাষ্যে উঠে এসেছে। চল্লিশের দশকে নগরজীবনের রক্তাক্ত পটভূমিকা, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, দেশভাগ ও ত্যাগ মারী-মন্বন্তর জীবনানন্দকে যে কতটা নিদারুণ মর্মাহত করেছিল তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বহু কবিতায় এবং লেখায়। সেই সঙ্গে ধরা পড়ে শূন্যগর্ভ সময়ের প্রতি কবির ঘৃণার তীব্রতা ও স্বাতন্ত্র্য। উৎপাটিত উৎপীড়িত হয়ে তাঁর আজন্ম প্রিয় বরিশাল ছেড়ে যাওয়াটা তিনি কিছুতেই যে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি তার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় তাঁর লেখা থেকেই। কিন্তু তার পরেও তাঁকে যেতে হয়েছিল। হয়তো সে-সব কারণেই ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরপরই তিনি ভাষা বিষয়ে একটি সুচিন্তিত মূল্যবান প্রবন্ধও লিখেছিলেন। নাগরিক তিক্ততা, গ্লানি ও বক্র বাচনভঙ্গির স্বকীয়তায় জীবনানন্দ ছিলেন বৈশিষ্ট্যময় এবং উজ্জ্বল।

'নৌজ্ঞান এবারে গভীরতর হয়েছে
যদিও কেবলই বিপদ আছে
বাঁকে-পথে-তবু যাত্রীরা বিপন্ন চিরদিন।'

সবকিছুর পরেও বলা যায় জীবনের প্রতি তাঁর আস্থা অপরিসীম থাকলেও এক ধরনের অস্থিরতা তাঁকে সর্বদাই উদ্বেগাকুল করে রাখত। মানুষ এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য অন্বেষণে তাঁর প্রাণ ছিল ক্লান্তিহীন। একই সঙ্গে তাঁর গভীর দৃষ্টিতে মানুষের যাবতীয় গ্লানি, ব্যর্থতা, প্রতারণা—সমস্তই প্রখর দাগ ফেলেছিল। একেবারে অবোধ শিশুর মতো হৃদয় থাকা সত্ত্বেও তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে মানবসভ্যতার রূঢ় অধঃপতন। তবুও নিজে মানুষের শক্তি ও সাধনার ওপর অবিচল থাকতে চেয়েছেন। দারুণ পিপাসার্তের মতো দেখেছেন বাংলার চিরন্তন রূপের সৌন্দর্য। বিশ্বসভ্যতার বিস্তীর্ণ আবহ। বংশপরম্পরায় পেয়েছিলেন সাধকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিরায়ত আশ্বাস। শিল্প-সংস্কৃতির ওপর গভীর মমতা দিয়ে রচনা করেছেন নিবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকে অন্তর দিয়ে অনুভব করে লিখেছেন মূল্যবান প্রবন্ধ। কবিতাকে দিয়েছেন নিজস্ব শৈলী। গল্প-উপন্যাসে এনেছেন আধুনিক মননশীল গঠন ও জটিল চরিত্র চিত্রণ। ব্যক্তিজীবনে কত অসহায়ত্ব ; তবু কি আশ্চর্য পৌরুষ। কবিতায় উপমা প্রয়োগে কী অসাধারণ প্রমত্ত মনের অধিকারী ছিলেন। ইতিহাসের ভিতর মানুষ এবং প্রকৃতিকে আনন্দ-বেদনায় একাকার করে দেখেছেন। দেশপ্রেমে প্রাণ ছিলো চিরন্তন প্রেমিকের মতো উৎসর্গীকৃত। খ্যাতি কিংবা প্রশংসা প্রলুব্ধ করতে বা টলাতে পারেনি এতটুকু। তাঁর সেই অমর বাণীর মতোই তিনি বেঁচেছিলেন সম্পূর্ণ এক সত্তা নিয়ে।

> 'প্রেম যে তবুও প্রেম—স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে রবে।
> বাঁচিতে সে জানে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধ

আবু তাহের মজুমদার

১

সাহিত্যে, বিশেষ করে কাব্যসাহিত্যে, বিচ্ছিন্নতাবোধ নতুন কোনো ব্যাপার না হলেও সাহিত্যের একটি বিশেষ উপাদান বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে এর আবির্ভাব অনেক পরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। আগের সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কিত সচেতনতা, বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের বা এখনকার মতো, একরকম ছিল না বললেই চলে। বিচ্ছিন্নতাবোধ বুঝাতে যে ইংরেজি শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা হলো 'alienation'। আগের সাহিত্য সমালোচনায় এ শব্দটিও এখনকার মতো ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। ইংরেজি সাহিত্যেও নয়। বাংলা সাহিত্যেও নয়। প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ সংক্রান্ত উপাদান গবেষণার বিষয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ইউরোপে যে ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধের উন্মেষ ও বিকাশ তা প্রাচীন ইংরেজি সাহিত্যেও নেই, তবে প্রাচীন মহাকাব্য *বেউলফ* এ জীবনের অসারতা সম্পর্কে যে পৌনঃপুনিক ব্যঞ্জনা রয়েছে তাকে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ হিসেবে হয়ত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা বৈশ্বিক বিধানের অন্তর্গত এ উপলব্ধিতে ভাস্বর হলেও *দি ওয়েনডারার* কবিতায় নির্বাসনে যাওয়ার ব্যাপারটিও বিচ্ছিন্নতাবোধের অন্বিষ্ট হিসেবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। যে বিচ্ছিন্নতাবোধ আমাদের উপজীব্য আমরা সম্ভবত তার প্রথম সার্থক অভিব্যক্তির মুখোমুখি হবো শেক্সপীয়ারের নাটক *হ্যামলেট*-এ যেখানে জীবন যন্ত্রণা এবং যুগযন্ত্রণা যুগপৎভাবে নায়ক হ্যামলেটের মনকে চরমভাবে বিপন্ন-বিপর্যস্ত করে প্রেমিক ওফেলিয়া এবং নিকটতম বন্ধু হোরেশিও থেকেও অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং তাকে আত্মহননের পথে উদ্বুদ্ধ করেছে :

> O! that this too too solid flesh would melt,
> Thaw and resolve itself into a dew ;
> Or that the Everlasting had not fix'd
> His canon, 'gainst self-slaughter ! O God ! God !
> How weary, stale, flat, and unprofitable
> Seem to me all the uses of this world.
> Fie on't! Ah fie! 'tis an unweeded garden,
> That grows to seed, things rank and gross in nature
> Possess it merely.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বাণীবন্ধেরই মুখর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় হ্যামলেটের সবচেয়ে পরিচিত এবং উদ্ধৃত আত্মকথনে :

> To be, or not to be : that is the question :
> Whether 'tis nobler in the mind to suffer
> The slings and arrows of outrageous fortune,
> Or to take up arms against a sea of troubles,
> And by opposing end them? To die : to sleep ;

জীবনানন্দ আত্মহত্যার কথা না ভাবলেও মৃত্যুর কথা যে কত ভেবেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একটি মানসিক বিপর্যয়কারী পরিস্থিতির মুখোমুখি, পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে নির্দেশিত, অসহায়তার শিকার, অনুকূল পরিবেশ-প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, হ্যামলেট আত্মধিক্কারে ক্ষতবিক্ষত হন :

> The time is out of joint ; O cursed spite,
> That ever I was born to set it right!

সবকিছুরই মূলে হলো : 'Something is rotten in the state of Denmark'। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলার এবং মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের পর সংবেদনশীল কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের নিকট যেমন মনে হয়েছিল—Something is rotten in the state of this world। তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল চরম মানসিক সঙ্কটে। আত্মিক সঙ্কটেও।

ইংরেজ রোমান্টিক কবিরাও স্বতন্ত্র্যভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত ছিলেন। ফরাসি বিপ্লবোত্তর পরিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেননি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ আশ্রয় নিলেন প্রকৃতির বুকে—

> When the fretful stir
> Unprofitable, and the fever of the world,
> Have hung upon the beatings of my heart— ;

প্রকৃতির মধ্যে তিনি অনুভব করেন :

> The anchor of my purest thoughts, the nurse,
> The guide, the guardian of my heart, and soul
> Of all my moral being.

কোলরিজ আশ্রয় খুঁজলেন প্যান্টিসোক্রেসির স্বপ্নলোকে—চলে যেতে চাইলেন আমেরিকায়, এবং সমর্পিত হলেন অতিপ্রাকৃতে। বাইরন দেশ ছেড়ে চলে গেলেন ইউরোপে। 'চাইল্ড হেরোল্ড' হলেন, 'ম্যানফ্রেড' হলেন এবং শেষটায় প্রাণ দিলেন গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। শেলী কাতর কণ্ঠে 'ওয়েস্ট উইন্ডে'র কাছে আবেদন জানালেন—

> Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud!
> I fall upon the thorns of life! I bleed!
> A heavy weight of hours has chained and bowed
> One too like thee : tameless, and swift, and proud.

শেষে আশার বাণী শুনিয়েছেন : "If Winter comes, can Spring be far behind?" "Spring far behind"-ই থেকে গেছে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন তিনি দেখে যেতে পারেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি। তখন পরিবর্তন হয়ও নি। কীটস আশ্রয় নিলেন গ্রীসের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যলোকে, মধ্যযুগে ; ভুলে যেতে চাইলেন :

> The weariness, the fever, and the fret
> Here, where men sit and hear each other groan ;

এবং পালিয়ে যেতে চাইলেন "into the forest dim" এবং "Fade far away, dissolve, and quite forget"। পারেন নি। জীবন যন্ত্রণার নিদারুণ প্রহারের মধ্যে থেকেই বিদায় নিতে হয় এ পৃথিবী থেকে। ভিক্টোরিয়ানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধে বেশি আক্রান্ত ছিলেন ম্যাথিউ আর্নল্ড। টেনিসন শেষ পর্যন্ত সংকট কাটিয়ে উঠলেও আর্নল্ড পারেন নি। চারদিকে মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং বস্তুতান্ত্রিকতার থাবা বিস্তার ও তার বিবেচনায় অপ্রতিহত নৈরাজ্য তাকে ব্যথিত ও বিপর্যস্ত করে। তিনি পৃথিবীকে দেখেন এমন একটি যুদ্ধক্ষেত্ররূপে যেখানে

> We are here as on a drakling plain
> Swept with confused alarms of struggle and flight,
> Where ignorant armies clash by nigh.

তাঁর পৃথিবীতে যথার্থ অর্থে কোনো 'joy', কোনো 'love', কোনো 'light', কোনো 'certitude', কোনো 'peace' বা কোনো 'help' নেই। তাই সান্ত্বনা এবং নিরাপত্তা সন্ধান করেন প্রেমিকার আনুগত্যে এবং ভালোবাসায়—'Ah, love, let us be true/To one another'! লক্ষ করলে দেখা যাবে যে উপরে উল্লিখিত সব জীবনজ্বর, জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনা, প্রকৃতির বুকে আশ্রয় গ্রহণ—সবকিছুই জীবনানন্দের কবিতার ভুবনে কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান। এবং তার বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে উল্লিখিত বিচ্ছিন্নতাবোধের অনেক মিল রয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যসেবী জীবনানন্দের বোধের জগতে তার পঠন-পাঠনের বহু কিছুই অঙ্গীভূত হয়ে তার মেধা ও মননকে সমৃদ্ধ এবং বিকশিত করেছে, সহায়তা করেছে তার অন্তর্বেদনা, জীবনযন্ত্রণা, যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে। তিনি ত মানুষের রূপে আর পৃথিবীতেই আসতে চাননি। মনুষ্য জীবনের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন। পৃথিবীতে আসতে চেয়েছিলেন পাখি রূপে।

২

তবে বিচ্ছিন্নতাবোধের ক্ষেত্রে বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের তিরিশের দশকের কবিদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর অভিজ্ঞতার বোধ-বিদারী অভিঘাত এবং এই অভিঘাতকে নিজেদের কাব্যের শরীর ও আত্মার নির্মাণে যে সব ইংরেজ বা ইউরোপীয় কবি শৈল্পিকভাবে ব্যবহার করেছেন তারা। এসব কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং মহত্তম হলেন টি. এস. এলিয়ট। যার প্রভাব, বলা যায়, একরকম কালজয়ী হয়েছে। ইউরোপীয় কবিদের ভূমিকাও বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা যে দুজন ইংরেজ কবির কবিতায় তুমুলভাবে চিত্রায়িত হয়েছে তারা হলেন Siegfried Sassoon এবং Wilfred Owen। যুদ্ধসৃষ্ট যে যন্ত্রণার ছবি জীবনানন্দের কবিতায় পাওয়া যায়—'পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা, মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, স্প্লিন্টারের অনন্ত নক্ষত্র', ইত্যাদি, তা পাঠকদের স্যাসুন এবং ওয়েনের কবিতার কথা মনে করিয়ে দেবে এবং জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতাবোধের একটি দিকও উন্মোচিত করবে। জীবনানন্দের অনেক কবিতায় যুদ্ধের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে তা স্যাসুনের কবিতায় বিধৃত হয়েছে—'He's young ; he hated war' (The Death Bed)। ওয়েনের 'flights of bullets' (Exposure) জীবনানন্দে নানাভাবে এসেছে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে 'stuttering rifles' 'rapid ratle' (Anthem for Doomed Youth) এবং 'The pity of war, the pity war distilled' (Strange Meeting)–এর কথাও। জীবনানন্দের কোনো কোনো কবিতা ম্যাক্‌নিসের "Prayer Before Birth"-এর ভয়াবহতার কথাও মনে করিয়ে দেবে। এরা সবাই জীবনানন্দের সমসাময়িক। তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানুষের বিচ্ছিন্নতা এবং ভাব আদান প্রদানের ব্যর্থতা, ইত্যাদি সবচেয়ে সার্থকভাবে এবং ব্যাপকভাবে এসেছে এলিয়টের কবিতায়। তার প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা "The Love Song of J. Alfred Prufrock" বিচ্ছিন্নতাবোধের এক নির্ভুল দলিল। অবক্ষয়ী অভিজ্ঞতার অভিঘাতে অন্তঃসারশূন্য হয়ে যাওয়া এক লোকের ক্লান্তি এবং যাপিত জীবনের গ্লানিবিদ্ধ এক করুণ আলেখ্য। অবক্ষয় এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রকটভাবে চিত্রিত হয়েছে 'Gerontion', 'The Waste Land', The Hollow Men' ইত্যাদি কবিতায়। আর আত্মার রিক্ততার ভাব বিধৃত হয়েছে 'Ash Wednesday'–তে। এগুলোর মধ্যে 'The Waste Land' ভয়াবহতম। এলিয়টের নাটকেও বিচ্ছিন্নতাবোধ নানাভাবে এসেছে। *The Cocktail Party*-তে Celia-র কণ্ঠে একাকীত্বের করুণ আর্তি দু'বার উচ্চারিত হয়। দাম্পত্য সম্পর্কের বিপর্যয় এবং জগত–জীবন সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটে নিজের অস্তিত্ব ও সত্তা সম্পর্কে একটি গভীরতর উপলব্ধি এ একাকীত্বের এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ :

No. I mean that what has happened has made me aware
That I've always been alone. That one always is alone
Not simply the ending of one relationship,
Not even simply finding that it never existed
But a revelation about my relationship

With every body.
No...it isn't that I want to be alone,
But that everyone's alone–or so it seems to me.
They make noises, and think they are talking to each other ;
They make faces, and think they understand each other.
And I'm sure that they don't.

Choruses from 'The Rock' এর প্রথমটিতে তিনি প্রশ্ন করেন 'Where is the Life we have lost in living'? Celia-র মতো জীবনানন্দের জীবনেও তো সম্পর্কের—দাম্পত্য সম্পর্কের—বিপর্যয়ের অন্তঃস্রোত বহমনা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও জীবনানন্দকে আলোড়িত এবং বিক্ষুব্ধ করে, মানসিক সংকট সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতাবোধের দিকে ঠেলে দেয়। তবে তার যুগে বিচ্ছিন্নতাবোধে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ব্যক্তি জীবনেও নিঃসঙ্গতা তাকে আজীবন তাড়া করেছে। সম্ভবত এ নিঃসঙ্গতা ছিল প্রধানত মানসিক ও শৈল্পিক। কবিতায় তার নির্ভুল সাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। বুদ্ধদেব বসুও বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত ছিলেন এবং মানুষকে মনে করতেন এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। একটি ব্যক্তিসত্তা আরেকটি ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু জীবনানন্দকে শুধু বিচ্ছিন্নতাবোধের কবি বললে তার প্রতি অবিচার করা হবে, কারণ তার অনেক কবিতাতেই বলিষ্ঠ জীবনবাদী কণ্ঠস্বর জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে। ইংরেজি সাহিত্যের পঠনপাঠন তার বিচ্ছিন্নতাবোধকে তীব্রতর এবং ব্যাপকতর করেছে, যদিও জীবনের প্রতি ভালোবাসাও পাশাপাশি চলেছে হাত ধরে। তবে বিচ্ছিন্নতাবোধের কবিতা সংখ্যায় অনেক বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

জীবনানন্দের সমসাময়িকদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাতেই বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রকোপ পরিলক্ষিত হয় সবচেয়ে বেশি। বস্তুত এই দুই কবির মধ্যে কে বেশি বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার ছিলেন তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। শেষ বিচার-বিশ্লেষণে অবশ্য বলতেই হবে যে বিচ্ছিন্নতাবোধের—একাকীত্বের—ঘোষণা সুধীন্দ্রনাথ দত্তে যত তীব্রভাবে প্রকট জীবনানন্দে বুঝিবা ততখানি নয়। দু'জনই ইতিহাসের ক্রান্তিকালে—যখন উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম উত্তাল থেকে উত্তালতর হচ্ছে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমবর্দ্ধমান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকটের আবর্তে জনজীবন বিপর্যস্ত—কাব্য সাধনা শুরু করেন। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলিও দুজনের জীবনকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। জীবনানন্দের জীবন আর্থিক অসচ্ছলতায় ছিল পর্যুদস্ত। একান্নভুক্ত বৃহৎ পরিবারের অসুবিধাসমূহ তাকে আক্রান্ত করে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন রীতিমতো সম্পদশালী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশে বিদেশে ঘুরেছেন, একাকী ইউরোপে থেকেছেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলেই কবি। কিন্তু তিনি ছিলেন জীবনানন্দের বিপরীত—আলাপী, হাসিখুশি, সামাজিকতায় এবং বন্ধুবাৎসল্যে উৎসাহী, একটি বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত, সুরসিক ইত্যাদি। এতদ্‌সত্ত্বেও জীবনযন্ত্রণা তিনি এড়াতে পারেন নি। আক্রান্ত হন সুগভীর নৈরাশ্যের তীব্র উপলব্ধিতে। এই নৈরাশ্য ছিল বহুমাত্রিক এবং এই নৈরাশ্য থেকেই উদ্ভব তীব্র বিচ্ছিন্নতাবোধের। কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে তিনি জোর দিয়েছেন অভিজ্ঞতার উপর এবং অভিজ্ঞতা তাকে করেছে বিশ্লেষণ-মনস্ক, আর বিশ্লেষণ-মনস্কতার ফলে জগত ও জীবনের দুর্বিষহ দিকগুলি তার চোখে উদঘাটিত হয়েছে প্রকটভাবে।

তার নৈরাশ্য, হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের একটি উৎস ছিল প্রেমে পরিতৃপ্তিহীনতা, স্মৃতির যন্ত্রণা, শূন্যতাবোধ এবং এক ধরনের না পাওয়ার বেদনা। "কস্মৈ দেবায়" প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন :

> জানি তবু
> তোমার উদীর্ণ আবির্ভাবে
> মোর শূন্য পরিপূর্ণ হয় নাই কভু ;
> অবলুপ্ত অতল অভাবে,
> তোমার অজস্র দান
> বরঞ্চ গিয়েছে রেখে নেতির প্রমাণ।

স্মৃতিকাতর কবি মৃত্যু কামনায় সমর্পিত :

> অভাবে তোমার
> অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
> কাম্য শুধু স্থবির মরণ।
> নিরাশ অসীমে আজও নিরপেক্ষ তব আকর্ষণ
> লক্ষ্যহীন কক্ষে মোরে বন্দী ক'রে রেখেছে, প্রেয়সী ;
> গতি অবসন্ন চোখে উঠিছে বিকশি
> অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিঃসার নির্মোকে।
> আমার জাগর স্বপ্নলোকে
> একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমারই স্মরণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই আর্তহাহাকার এবং শূন্যতাও বিচ্ছিন্নতাবোধ তীব্রতর হয়েছে "অর্কেস্ট্রা" (নাম) কবিতায়, যখন মৃত্যুকেই ধ্রুব সখা বলে মনে হয় :

বিশ্বজগৎ হিম কুয়াশায় ঘেরা ;
দীর্ঘশ্বাসে বিষায়িত মোর গেহ ;
রবি, শশী, তারা—সর্ববল্লভেরা,
সকলে উধাও ; দূরে কাছে নেই কেহ।।

কে জানে কোথায় আজিকে সে পলাতক,
সে মায়ামৃগীরে কে ধরেছে, ফাঁদ পাতি ?
মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা,
যাতনা, শুধুই যাতনা সুচির সাথী।।

কবি নিজেকে যেন আবিষ্কার করেন অসীম শূন্যতায়, যখন

গতাসু হতাশ ; বিলাপ চেতনাহত।

ক্রন্দসী কাব্যগ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের হতাশা, শূন্যতাবোধ এবং পরিণামে বিচ্ছিন্নতাবোধ আরও প্রগাঢ় হয়েছে ; হয়েছে অতলান্ত এবং আরও বিধ্বংসী। মূল্যবোধে এবং যা কিছু জীবন সহায়ক তার বিপর্যয়ের ফলে কবির মানসলোকেও ঘটেছে নিদারুণ বিপর্যয়। "উট পাখি" কবিতায় উটকে লক্ষ করে তিনি বলেন :

আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
... ...
প্রাক পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা।।

অসহায় একাকীত্বের দুর্বিষহ তাড়না ইত্যাদির ফলে জীবনের বিকৃত মুখব্যাদানটাই যেন প্রকট হয়ে উঠে :

জীবনগণিকা
ঘৃণ্য সংক্রামক ব্যাধি প্রসাধনে ঢেকে,
সার্বজন্য অভিসারে ডেকে
ভুলাবে কি আত্মহারা পরাণ পুরুষে ?
(প্রত্যাখ্যান : ক্রন্দসী)

সভ্যতার নামে বর্বরতার উত্থান, মুক্তির নামে বন্ধনের কুটিল চাতুর্য কবির মনে উচ্চকিত করে প্রতিবাদের ভাষা। নারীর ছলনা মোহভঙ্গের নির্মমতায় বিদ্ধ করে কবির মন ও মানস এবং প্রকটিত করে তার বিচ্ছিন্নতাবোধের স্বরূপকে :

গুহাবাসী নৃসিংহেরে বাঁধিব না শীলের শৃঙ্খলে,
পরাব না সভ্যতার শ্লীল ছদ্মবেশ ;
ঢাকিবারে গলিত শবের গন্ধ
রজনী গন্ধার গুল্ম করিব না শ্মশানে রোপণ ;
নারীরূপী কঙ্কালের প্রলোভনে ভুলে
বীর্যের অনন্তশয্যা পাতিব না বিকচ শ্মশানে ; (ঐ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনাশী পরিস্থিতিতে কবির কাম্য মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ কিছু :

হানো তীক্ষ্ম সর্বনাশ, তীব্র ক্ষতি, বৈরিতা নির্মম ; (ঐ)

কালের বিধ্বংসী প্রহার আর 'রক্ত লোভাতুর' থাবার ছোবল হতে কারোরই 'অব্যাহতি' নেই, এই অসহায় উপলব্ধি কবির অন্তরে জাগায় তীব্র নৈরাশ্য :

জীবনের মরুপ্রান্তে স্মরণের অখ্যাত বসতি,
তারেও করিবে ছারখার
... ...
হে কাল, হে মহাকল ?
(কাল : ক্রন্দসী)

'কাল' কবিকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তার বসুধাকে জীর্ণ করেছে। চূর্ণ করেছে তার দেবালয়। তার 'ভস্মশেষ পারিজাত বনে...পাংশুল ধূলি মাথা খোঁড়ে'। নিঃসঙ্গতা বিকট ব্যাদানে গ্রাস করে তাকে। তার কণ্ঠ চিরে বের হয় মর্মঘাতী আর্তনাদ :

আমি একা, আজ আমি একা। (ঐ)
তোমার সংহার হতে নেই কারও অব্যাহতি।
নিরুত্তর, সবই নিরুত্তর : (ঐ)

নিজের জীবন যে সম্পূর্ণ অকিঞ্চিকর, তুচ্ছতা আর গ্লানিতে আকীর্ণ, নিজের স্বতন্ত্র সত্তার ক্ষয় অবলোকন করে যাওয়া ছাড়া নাস্তিগর্ভ জীবনে যেন আর কিছুই করার নেই, এরকম একটা বোধে প্রপীড়িত তিনি ; অধঃপতনের শিকার :

মনে হয় স্বার্থপর, অকিঞ্চন, উঞ্ছজীবী আমি,
আমার ইতর লোভে অমৃত বঞ্চিত অন্তর্যামী
বুভুক্ষায় মরে আজ ;...
... ...
নাস্তিগত প্রাক্তন তিমিরে
আমার স্বতন্ত্র সত্তা হতে থাকে ক্রমাগত ক্ষয়, ;
ফুরায় ইন্দ্রিয়বোধ ; মূক হয় বাচাল হৃদয় ;
(লঘিমা : ক্রন্দসী)

কবির 'কলিকাতা' থেকে সৌন্দর্য অন্তর্হিত ; 'খড়ি মাখা বেশ্যারা' 'ঠক, জুয়াচোর, কানা, খোঁড়া, কুষ্ঠরোগীর দল' ভিড় করে আছে এদিকে সেদিকে ; আর 'আরোগ্যহীন রোগের' বিষ দিচ্ছে হাতছানি। জীবন এখন পশুর জীবনের মতো (বিরাম-ঐ)। নৈরাশ্যের বিচ্ছিন্নতাবোধের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করেছে তাকে। চারদিকে শুধু অন্ধকার : 'অন্ধকারে নাহি মিলে দিশা॥' এমনি একটি ভয়াবহ উপলব্ধিতে কবি আচ্ছন্ন—'যন্ত্রণাই/জীবনে একান্ত সত্য।'

জীবন শূন্যতার কারা।
জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী ;
(নরক : ঐ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মৃত্যু" কবিতায় তার একান্ত উচ্চারণ 'হে বসুধা, আবার ফিরায়ে লও মোরে, (*ক্রন্দসী*)। জীবন এখানে দুর্বিষহ, 'সংকুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রব্যুহ যেন।' জীবনের পারিপার্শ্ব হয়ে উঠেছে শ্বাসরোধকারী :

মনে হলো আশা নাই,
মনে হলো ভাষা নাই পিঞ্জরিতর্থ ব্যর্থতা বলার
(সমাপ্তি : ঐ)

"প্রার্থনা" কবিতাটিতেও রয়েছে বিধ্বংসী ভয়াবহতার চিত্র, যেখানে কবি নিজেকে সমর্পণ করেন এক মর্মস্পর্শি ব্যাকুল প্রার্থনায়—"হে বিধাতা,...দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।" সার্বিক অবক্ষয় গ্রাস করেছে তার পৃথিবী—এখানে "নিরালম্ব নিরালোকে... দেবদ্বিজপ্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়।"

সংবর্ত কাব্যগ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পৌছেন নৈরাশ্যচেতনার এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের ক্লাইমেক্সে। আধুনিক সভ্যতার—মনুষ্য সভ্যতার অন্তসারশূন্যতা, বিভৎস বিকার, তথাকথিত উন্নত বিশ্বে মূল্যবোধের ব্যাপক বিপর্যয়, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শঠতার জয়যাত্রা ইত্যাদি তার চেতনা দলিত মথিত করে। প্রথম কবিতা "নান্দীমুখ"-এ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধানে পর্যুদস্ত কবি। সমাজবাদের প্রতীক 'কাস্তে, হাতুড়ি' এখন অত্যাচারের হাতিয়ার আর 'বিপ্রলব্ধ বিশ্বমানব বিষাদে'। ব্যর্থ সভ্যতা। "উপসংহার"-এও চিত্র একই—"হেথা নাস্তি পৃষ্ঠে, পুরোভাগে।" কবির আহ্বান :

প্রনষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে তমিস্রার লজ্জাবস্ত্রে আজ
এসো নগ্ন মনুষ্যত্ব ঢাকি।

বিধাতার ব্যর্থতার ব্যাপক উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে কবির অসহায় উচ্চারণ : "আর্তনাদ ছাড়া আজ নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নেই" (উজ্জীবন)। কি দুঃসহতার অসহায় শিকার কবিসত্তা : "বস্তুত জোয়ারে/ততটাই ফিরে আসি, যতখানি এগোই ভাঁটাতে" (জেসন)। এরূপ স্থবিরতার আবর্তে বিচ্ছিন্নতাবোধ অনিবার্য। আরেকটি ভয়ঙ্কর নৈরাশ্য উদ্রেককারী কবিতা "সংবর্ত", যেটিতে মূর্ত যুদ্ধ-মত্ততা, যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়, রাষ্ট্রপতিদের শঠতা, সমাজবাদের ব্যর্থতা, যুদ্ধের ভয়াবহতা ইত্যাদি। আজ "বৃথা স্বপ্ন ; সঙ্কল্প অক্ষম" এবং "অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী"। "১৯৪৫" কবিতাটিতে সমকালীন যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির রূঢ় ব্যবধানের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এসব দেখে শুনে কবি "অনিকেত নির্বাক নাস্তিতে"। "যযাতি" ও এক অন্তহীন নৈরাশ্যের এবং মোহ-ভঙ্গের আলেখ্য। "১৯৪৫"-এর মতো "প্রত্যাবর্তন"-ও আলোকপাত করে সমকালীন যুদ্ধ পরিস্থিতির উপর, রাষ্ট্রপতিদের কপটতার উপর, মুখোশধারী সুবিধাবাদীদের ভূমিকার উপর। বৈজ্ঞানিক অর্জন যে শেষ পর্যন্ত মানবসমাজের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনে নি সে কথাও বলেন কবি।

"জেসন্" কবিতাটি যন্ত্রণার একটি আত্মজৈবনিক উপাদানকে হঠাৎ করেই যেন পাঠকদের চোখের সম্মুখে উন্মোচিত করে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিঃসন্তান ছিলেন এবং সারাজীবন এ ব্যাপারটি তার মনঃপীড়ার কারণ ছিল এবং এটি তার বিচ্ছিন্নতাবোধে প্রভাবও বিস্তার করেছিল। তিনি বলেন "ফলত নিরবলম্ব, নিঃসন্তান, নিঃস্ব আজ আমি।"

পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে দেখা যাবে যে নৈরাশ্য এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং জীবনানন্দের মধ্যে উৎসগত অনেক মিল রয়েছে। সমকালীন আর্থসামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা, যুদ্ধ, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সভ্যতার ব্যর্থতা, প্রেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিতৃপ্তিহীনতা ইত্যাদি দু'জনকে সমভাবে ব্যথিত করেছে এবং জন্ম দিয়েছে বিচ্ছিন্নতা-বোধের। আত্মজৈবনিক অনেকগুলি কারণেও দু'জন বিচ্ছিন্নতাবোধে ভুগেছেন।

৪

জীবনানন্দের নিজের জীবন ও তার জন্য বিচ্ছিন্নতাবোধের উৎস ছিল। তার সময়ও ছিল তার অপ্রতিরোধ্য প্রতিপক্ষ। সৃষ্টিশীল জীবনও ঘটনা প্রবাহের প্রভাব অস্বীকার করতে পারে না ; কিন্তু ঘটনা প্রবাহকে আত্মস্থ করে অতিক্রম করে যায় এবং জীবনের ঘটনা প্রবাহোত্তর নতুন তাৎপর্যে উপনীত হয়। যারা পারে না তারা কালের এবং ঘটনার অধীন থেকে যায় এবং তাদের কবিতা কালিক সীমাবদ্ধতার অপ্রেরণাদায়ী আবর্তে নিমজ্জিত হয়। কোনো কবিই তার জীবনকে অস্বীকার করে এগুতে পারে না। তিনি একাধারে কালবর্তী এবং কালাতিক্রমীও। তবে তিনি তার অভিজ্ঞতাকে সকলের অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত—এলিয়ট যাকে বলেছেন 'continual extinction of personality'—করতে পারেন। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব বিলোপনের মাধ্যমে সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিত্ব কি তার লেখা থেকে মুছে যায়?—যায় না। তার অভিজ্ঞতার অভিঘাত কি মুছে যায়?—যায় না। কবিতার 'আমি' প্রায়শই কবি, আবার কবির যে সত্তা সৃষ্টি করে তাও। জীবনানন্দ তার জীবনের ঘটনাকে কবিতায় একাধারে ধারণও করেছেন, আবার অতিক্রমও করে গেছেন। মহৎ কবি। ফলে কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধের অনেক কারণ তার নিজের জীবনেও খুঁজে পাওয়া যাবে, যেমনি পাওয়া যাবে দেশজ এবং বৈশ্বিক ঘটনার আবর্তে। বহির্জীবন তাকে যত যন্ত্রণায় জর্জরিত করেছে, মথিত আবেগের উন্মাদনায় অস্থির করেছে, আলো থেকে ঠেলে দিয়েছে অন্ধকারের দিকে, ততই তিনি হয়েছেন অন্তর্মুখী। যে যত বিচ্ছিন্নতাবোধে পীড়িত সে তত অন্তর্মুখী। নিজের চারদিকে এক দুর্ভেদ্য অন্তরাল তৈরি করে নেয়, যা তার জীবনাচরণে বার বার প্রতিভাত হয়। তিনি কাছে থেকেও দূরের, আপন হয়েও যেন পর—সপ্রাণ উপস্থিতি সত্ত্বেও যেন নির্বাসিত। জীবনানন্দ সবার মধ্যে থেকেও যেন এক ধরনের নির্বাসিত জীবনই যাপন করে গেছেন। একাকীই থেকেছেন। 'প্রত্যাখ্যাত এবং কোণঠাসা হয়ে' তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ গাঢ়তর হয়েছে। তার মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণায় ভূমেন্দ্র গুহ লেখেন—'কৃত্রিম নিদ্রার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে সর্বাধিক শান্তির নিদ্রায় অভিভূত'। হসপিটালে মৃত্যু শয্যায় তার শেষ প্রগাঢ় এবং চিত্তবিক্ষোভকারী উচ্চারণ ছিল 'ধূসর পাণ্ডুলিপির রঙ সারা আকাশ জুড়ে'।

৩১.১০.৪২ (খ্রি.) তারিখের একটি চিঠিতে জীবনানন্দ লিখেছিলেন—"...অধ্যাপনা জিনিষটা কোনো দিনই আমার তেমন ভালো লাগেনি। যে সব জিনিষ যাদের কাছে যে রকম ভাবে শিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তাতে আমার বিশেষ আস্থা নেই। এ কাজে মন তেমন জাগেনা ; তবু সময়-বিশেষে অন্য কোনো প্রেরণার চেয়ে বেশি জাগে তা' স্বীকার করি।" অথচ তাকে জীবিকার জন্য শেষ অবধি এই অধ্যাপনার উপরই নির্ভর করতে হয়। এর ফলে তার অন্তর্জগত বেদনার্ত হওয়ারই কথা। তার কর্ম জীবনের শুরুই অধ্যাপনা দিয়ে। প্রথমে তিনি ১৯২২ সালে কলকাতার সিটি কলেজের ইংরেজির টিউটর পদে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ সালে চাকরিচ্যুত হন। এ সময়টা তার জীবনের অন্যতম ভয়াবহ দুর্ভোগের, কারণ সজনীকান্ত দাস যেভাবে শালীনতা বিবর্জিত ভাষায় শনিবারের *চিঠি*-তে 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে জীবনানন্দের কবিতাকে আক্রমণ করেন তাতে কোনো কবিরই মাথা ঠিক থাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা নয়। মর্মযাতনায় দগ্ধ কবি নিজেকে আরও গুটিয়ে নেন। বিচ্ছিন্নতাবোধ আরও শক্ত করে দানা বাঁধে তার মনে। ১৯২৯-এর দিকে জীবিকা নির্বাহের জন্য তাকে গৃহ শিক্ষকতাও করতে হয়। ১৯৩১ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত *পরিচয়* পত্রিকায় 'ক্যাম্পে' কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর অশ্লীলতার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় তীব্র আক্রমণ। তখনকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে এ আক্রমণ অযৌক্তিক ছিল তা বলা যাবে না, কারণ তিনি লেখেন :

আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়,—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে!

জীবনানন্দের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাকুরি নিয়ে তা ছেড়ে দিয়েছেন, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাকুরিচ্যুত হয়েছেন। দিল্লীর চাকরিটি তিনি হারিয়েছেন অবহেলার কারণে। ১৯২৯ সালে। এরপর ১৯৩৫ সালে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগদান করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে বেকার জীবনের দুর্বিষহ অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হয়। এ সময়েও তার বিচ্ছিন্নতাবোধ গভীরতর হয়ে থাকতে পারে। তার জীবনযন্ত্রণায় অন্য এক মাত্রা যোগ করে তার বাসভবনের একটি কক্ষে সাবলেটে বসবাসকারী এক বিধবা মহিলার নিত্য-বিব্রতকর অসামাজিক আচরণ। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে এ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

জীবনানন্দকে প্রায়শই দুঃসময়ের মুখোমুখি থাকতে হয়েছে। ২.৭.৪৬ (খ্রি.) তারিখের এক চিঠিতে তিনি লেখেন "সম্প্রতি বড় ঝঞ্ঝাটের ভিতর আছি; লিখবার তাগিদ নেই।" শারীরিক অসুস্থতাও তার জীবনকে বিড়ম্বিত করে। মৃত্যুর বছর—৯.৩.৫৪ (খ্রি.) তারিখের এক চিঠিতে তিনি লেখেন "আমার শরীর আজকাল অসুস্থ"।

জীবনানন্দ খড়গপুর কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকের চাকুরি নেন। কিন্তু ছুটি নেয়ার অপরাধে তিনি চাকুরিচ্যুত হন। সেটা ১৯৫০-৫১ সালের ঘটনা। জীবনানন্দ দারুণ অর্থকষ্টে নিপতিত হন। এর আগেও যে তার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল তা কিন্তু নয়। বস্তুত অর্থকষ্ট ছিল তার নিত্যসহচর। চাকুরিচ্যুত হবার পর একটি চিঠিতে তিনি তার এক প্রাক্তন সহকর্মীকে লেখেন—"বর্তমান অবস্থায় আমি যা চেয়েছি, সেই টাকার একটা কিস্তি অন্তত এই চিঠি পেয়েই আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা না করলে কিছুতেই হয় না আর।" এই অর্থনৈতিক টানাপোড়েনই সম্ভবত তার দাম্পত্য জীবনকে মর্মন্তুদভাবে বিষিয়ে দিয়েছিল।

জীবনানন্দ এবং লাবণ্য দাসের অসুখী জীবন সম্বন্ধে বিরাম মুখোপাধ্যায় জানান ; "নিজের বাসাতেই কবি থাকতেন বহিরাগতের মতো। একদিন হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদি স্ত্রী আপনার আমন্ত্রণে ঘনিষ্ঠ হবার প্রস্তাবে সায় না দেয় কি করবেন? কি করা উচিত?" দাম্পত্য সম্পর্কের এই অস্বাভাবিকতার প্রতিফলন পাওয়া যায় *বনলতা সেন* গ্রন্থের "সুদর্শনা" কবিতায় :

এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর; তুমি দান করো নিত ;
সময় তোমাকে সব দান করে মৃতদার বলে
সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর ফলে হয়ত তাঁকে যৌন-অবদমনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল, যা তাঁর মধ্যে হতাশা এবং মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তাঁকে আরও অন্তর্মুখী করে তোলে। তিনি তাঁর কামনা-বাসনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেন এবং মানসিকভাবে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। স্ত্রী লাবণ্যও অন্য কামনা-বাসনা তাড়িত হয়ে জীবনানন্দ থেকে দূরে সরে যান এবং এ দূরত্ব শেষ অবধি কমে নি। জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতাবোধ কোনোভাবে প্রশমিত হয় নি। বিরাম মুখোপাধ্যায় আরও লেখেন—"শুনেছি, শ্রীমতী জীবনানন্দ নাকি প্রায়ই বাড়ি ফিরতেন বেশি রাত করে। জীবনানন্দের মধ্যে সব সময়ে ম্রিয়মাণতা লক্ষ্য করেছি। ... স্বামী-স্ত্রীর এই অস্বাভাবিক সম্পর্ক শুধু জীবনানন্দের চারিত্রিক সংযমের জন্যই অশালীন চেহারা নিতে পারে নি। ক্রমশ উভয়ের মধ্যেই স্পষ্ট হচ্ছিল, যে যাঁর মেরুতেই বাঁচতে চান। জীবনানন্দ সংসারের চেয়ে কবিতার মধ্যেই প্রচণ্ডভাবে বাঁচতে চান। অপরপক্ষে শ্রীমতী দাশ শান্ত সম্পন্ন পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে সিনেমা-নাটকের জগতের নায়িকা হিসাবে পর্দায় বা মঞ্চে আত্মপ্রকাশের জন্য অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সাহায্য সহযোগিতা খুঁজছেন। সাধারণ্যে এসব প্রকাশ পেতে থাকল। ঘটনাটা যতক্ষণ আড়ালে রাখা যায় তার জন্য কবি চেষ্টার কসুর করেন নি।"

মিনু সরকারের ভাষায়—"লাবণ্য দাশ, জীবনানন্দের স্ত্রী ও আমার খুব কাছের লোক ছিলেন। তাঁর মুখে জীবনানন্দ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুনেছি।... মা-বাবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা, ভাই-বোনদের জন্য নিবিড় স্নেহপ্রীতি, ছেলেমেয়েদের জন্য ভালবাসা আর উৎকণ্ঠা, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি জীবনানন্দের আচরণে কোথাও একটা নিঃশব্দ উদাসীনতা লক্ষ্য করতেন লাবণ্য। তার কারণ কি সে বিষয়ে তিনি অবশ্য আমাকে কিছু বলেন নি। অন্তত নিজের ত্রুটির কথা বলেন নি।... লাবণ্য দাশের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে আমার অসুবিধে হয় নি যে জীবনানন্দের বিবাহিত জীবন যেমন সুখের ছিল না, তেমনই সুখের ছিল না লাবণ্য দাশের দাম্পত্য জীবনও।"

ভুমেন গুহ লিখেছেন—"জীবনানন্দের মৃত্যুর পর লাশ তখনও বাড়িতে...এক সময়ে জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দাশ আমাকে ঝুলবারান্দার কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, অচিন্ত্যবাবু এসেছেন, বুদ্ধদেব বসু এসেছেন, সজনীকান্ত এসেছেন, তাহলে তোমাদের দাদা নিশ্চয়ই বড়ো মাপের সাহিত্যিক ছিলেন; বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি অনেক কিছু রেখে গেলেন হয়তো, আমার জন্য কি রেখে গেলেন, বলো তো।" জীবনানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র অমিতানন্দ দাশ লিখেছেন : "জীবনানন্দের বিয়ে সম্বন্ধ করে হয়েছিল, তাঁর সম্মতিতেই।... কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওঁদের দু'জনের মধ্যে ভালো মনের মিল হয় নি—আর তার প্রতিফলন রয়েছে জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে।"

জীবনানন্দের মৃত্যু দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আত্মহত্যা হয়ে থাকলে তা বিচ্ছিন্নতাবোধের চরম এবং চূড়ান্ত প্রকাশ, কারণ জগত এবং জীবন উভয় থেকে তিনি নিজেকে চির-বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। জীবনানন্দের পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনা সুখের ছিল না। অরবিন্দ গুহের ভাষায়—"স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন জীবনানন্দের একটা দ্বন্দ্বের কথা সঞ্জয় ভট্টাচার্য অকপটে ব্যক্ত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়েছেন যে জীবনানন্দ তার থেকে মুক্তি খুঁজছিলেন"। সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন : "আমার মনে হয় জীবনানন্দ ঠিক ট্রেন-দুর্ঘটনায় মারা যান নি। যদিও এই কথাটিই সর্বত্র বলা হয়ে থাকে এবং আমরা দেখেছি, তথাপি আমার ধারণা, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।" ব্যক্তিজীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতাই কি এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ? জীবিকার অনিশ্চয়তা, কবি হিসেবে স্বীকৃতি না-পাওয়া, স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন ও স্বামীর প্রতি অবহেলা-অবজ্ঞা? ভুমেন গুহ তো এবার জানিয়েছেন, "হাসপাতালেও শেষ দিকে জীবনানন্দকে দেখতে যেতেন না লাবণ্য দাশ"। "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন"—এই হ্যামলেটীয় উচ্চারণে (The world is out of joint) কি তার একান্ত পৃথিবীতে বিচ্ছিন্নতা-ভারাক্রান্ত করুণ অসহায়তা প্রতিফলিত হয় নি? একটা ব্যাপার এখানে স্পষ্ট যে জীবনানন্দ সংসারী বা সংসারবুদ্ধিসম্পন্ন বা বিষয়-আশয় চেতনাসম্পন্ন ছিলেন না, ফলে লাবণ্য দাশের ঈপ্সিত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। সংসারের জাগতিক ব্যাপারটাত তাকেই দেখতে হতো। আরেকটি করুণ দিক হলো জীবনানন্দের কাব্যসাধনা স্পষ্টতই তার মধ্যে কোনো ঔৎসুক্য বা আগ্রহ জাগায় নি। জীবনানন্দ তার কাছে থেকে দাম্পত্য সুখত দূরের কথা, কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও কোনো অনুপ্রেরণা পান নি। কি দুঃসহ পরিস্থিতি! এ পরিস্থিতি পাঠকদের মনে করিয়ে দেবে ইংরেজ রোমান্টিক কবি কোলরিজ ও তার স্ত্রী সারা ফ্রিকারের কথা। কোলরিজ কোনোদিনই বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন না। ফলে সংসারে অভাব অনটন লেগেই ছিল। তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত অসুখী। তাছাড়া সারারও কোনো কাব্যবোধ ছিল না। স্বামীর কাব্য সাধনা তার মনে কৌতূহল বা আগ্রহ জাগায় নি। পরে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

জীবনানন্দ স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতের মধ্য দিয়ে বড় হন। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাঢোল। তারপর যুদ্ধের সময়ের এবং যুদ্ধোত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় ; এরপর বিশের দশকের হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা, চল্লিশের দশকের দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং এ ধরনের চলমান অশান্তি তার বোধকে বিপর্যস্ত করেছে। হতাশা, রক্তপাত, অন্ধকার তার বোধকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে এক শ্বাসরূদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সারা ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করেছিল এক ধরনের মানবিক এবং সভ্যতার বন্ধ্যাত্বের বোধ। কাব্যে এলিয়ট এটির সবচেয়ে সার্থক রূপকার। উপন্যাসে Lawrence। তার উপন্যাস *Lady Chatterley's Lover*-এ বুর্জোয়া শিল্প উৎপাদন প্রভাবিত সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা কিভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায় এবং জীবনে বন্ধ্যাত্ব আনে--যা চূড়ান্ত ব্যাখ্যায় সভ্যতারই বন্ধ্যাত্ব--তারই এক আলোড়নকারী আলেখ্য। এসব এদেশের কবিদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে এবং যারা অতিসংবেদী তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রগাঢ় করে।

৫

জীবনানন্দ দাশ এবং তার সমসাময়িক কয়েকজন কবি বিংশ শতকের প্রথমার্ধের কয়েকটি ইউরোপীয় শিল্প ও কাব্যান্দোলন দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই আন্দোলনগুলি বিভিন্নভাবে এই কবিদের বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রকটিত করতে সহায়ক হয়েছিল। অবশ্য শুধু বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে এই আন্দোলনগুলির তাৎপর্য যথাযথভাবে অনুধাবন করা যাবে না। কারণ এগুলি এসব কবির মেধা ও মননের সমৃদ্ধিতে বিরাট অবদান রেখেছে এবং যুগোপযোগী ও মেধাপযোগী কাব্যভাষা নির্মাণে সহায়তা করেছে। শুধু তাই নয়, জগত ও জীবনকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এবং বিচার করায় উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবনের গভীরতর বোধকে সাধারণ কাব্যভাষায় প্রকাশ করা কঠিন; বিশেষ করে মূল্যবোধের অবক্ষয়, আপাত বিরোধী দ্বান্দ্বিক অবস্থানের রূপায়ণ, বিধ্বংসী অভিজ্ঞতার অভিঘাতের আলেখ্য অংকন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ কাব্যভাষায় সম্ভব নয় বলা চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত মানবতা এবং বন্ধ্যা সভ্যতা ও বিপর্যস্ত মূল্যবোধ কাব্যভাষার পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ভাষায় এবং প্রকাশে বহুমাত্রিকতার জটিল পথপরিক্রমা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এদেশের কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত ও জীবনানন্দ দাশ কম বেশি এসব আন্দোলন দ্বারা আলোড়িত এবং অনুপ্রাণিত হন। বুদ্ধদেব বসু অগ্রজ এবং পথিকৃতের ভূমিকা অলঙ্কৃত করলেও প্রভাবলয়ে বেশি দীপ্র হন সুধীন দত্ত এবং জীবনানন্দ দাশ।

এই আন্দোলনগুলির মধ্যে এইসব কবিদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণগুলি হলো Dadaism বা 'দাদাবাদ', Expressionism বা 'প্রকাশবাদ', Impressionism বা 'বাস্তবরূপবাদ', Surrealism বা 'পরাবাস্তববাদ' এবং Futurism বা প্রচলিত রীতি বিরোধী প্রতীকের খেয়ালখুশি মতো ব্যবহার। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে এখানে 'দাদাবাদে'র প্রাসঙ্গিকতা হলো পরাবাস্তববাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক—পরাবাস্তববাদের উদ্ভবই হলো দাদাবাদ থেকে। আর পরাবাস্তববাদ জীবনানন্দ এবং সমসাময়িক অনেক কবিকেও প্রভাবিত করেছে এবং অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতাবোধের আলোকিত এবং কুশলী অভিব্যক্তিতে সহায়তা করেছে। 'দাদাবাদ' শিল্প ভাস্কর্য ও সাহিত্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐতিহ্যবিরোধী কিন্তু ক্ষণস্থায়ী আন্দোলন। এর মূলমন্ত্র হলো সবকিছুতেই অবিশ্বাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ওই মতবাদ প্যারিসে জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'Nothing' বা কিছু–না বা শূন্য হলো দাদাবাদের ভাষার মূলশব্দ। শিল্প ও সাহিত্যে এই দর্শনের অভিব্যক্তি হলো কোলাজ–সৃষ্টিতে অসম্পর্কিত বস্তু ও শব্দের যুক্তি বহির্ভূত বিন্যাসে। এলিয়ট এবং পাউন্ড এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে বাংলা কাব্যসাহিত্যে এর কিছুটা প্রভাব এসে থাকতে পারে। 'এক্সপ্রেশানিজম' বা 'প্রকাশবাদ' ১৯০৫ সালের জার্মান চিত্রকলা বিষয়ক একটি আন্দোলন। এর প্রবক্তাদের লক্ষ্য ছিল বাহ্যিক বাস্তবতাকে পরিহার করে নিজেদের এবং বিশ্বের একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত কল্পদৃশ্যের উপস্থাপন করা ; অন্যভাবে বলতে গেলে বাইরের জীবন অপেক্ষা অন্তর্জগতের মর্মোদঘাটন ; অভিব্যক্তিই নিয়ন্ত্রিত করবে আঙ্গিক, চিত্রকল্প, যতিচিহ্ন, পদবিন্যাস ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোনো নিয়মগত বিধি–বিধান এবং লেখার যে কোনো উপাদানকে ভাঙচুর করা যাবে। হপকিন্‌স, রয় ক্যাম্পবেল এবং এডিথ সিটওয়েলের কবিতায় এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

ইম্প্রেসনিজম বা বাস্তবরূপবাদ একটি চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি। এর অনুসারীরা গতানুগতিক বিধিনিষেধ পরিহার করে নিজেদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বস্তুকে অবলোকন করেন এবং সেভাবে ছবি আঁকেন। এর অনুসারীরা আলোর ক্ষণস্থায়ী প্রভাব নিয়ে ভাবতেন এবং কোন কিছুর পলায়নপর অস্পষ্ট ধারণার মন্ময় আলেখ্য অঙ্কন করতেন। সঠিক কোনো উপস্থাপনায় তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, বরং নিজের কাছে কেমন লেগেছে তা–ই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসি প্রতীকবাদী কবিদের বাস্তবরূপবাদী কবি বলা হয়। ইংরেজি সাহিত্যে এ ধরনের কবির দৃষ্টান্ত হলো অস্কার ওয়াইল্ড এবং আর্থার সাইমন্স।

সারিয়েলিজ্‌ম বা অধিবাস্তববাদ বা পরাবাস্তববাদ মূলত ফরাসি চিত্রকলা ও সাহিত্য বিষয়ক একটি আন্দোলন, যার লক্ষ্য হলো যুক্তিতর্ক ও বিধিবিধানের সীমাকে উপেক্ষা করে অবচেতনের রূপায়ন। এখানেই দাদাবাদের সঙ্গে এর নৈকট্য। পরাবাস্তববাদীদের লক্ষ্য ছিল অচেতন মনের ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ এবং সচেতন মনের সঙ্গে এর ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধন। পরাবাস্তববাদীরা যুক্তির ধার না ধেরেই কাজ করেন যাতে এই কাজের ফলাফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচেতনের ক্রিয়াকলাপ প্রতিফলিত হয়। এর অনুসারীদের মতে মনকে 'logic' এবং 'reason'-এর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। ফ্রয়েডের চেতন-অবচেতন তত্ত্ব এদের প্রভাবিত করে। এই মতবাদের অনুসারীদের বিশেষ আগ্রহ ছিল স্বপ্ন এবং কুহেলিকার প্রভাব-চর্চায়। চেতন মনের দোরগোড়ায় ঘুমন্ত এবং জাগ্রত অবস্থার ব্যাখ্যাও ছিল তাদের অভীষ্ট। এটা এমন এক ধরনের বিস্মৃত অবস্থা যেখানে মনের অতল গভীরে অদ্ভুত সব ব্যাপার বাস্তবরূপ লাভ করে। ফিউচারিজম ইউরোপের একটি সাহিত্য আন্দোলন। এটির অভীষ্ট ছিল প্রচলিত রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রতীকের যদৃচ্ছা ব্যবহার। এর অনুসারীরা চেয়েছিল ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন আঙ্গিক, নতুন বিষয় এবং নতুন বাণীভঙ্গির উদ্ভাবন। দাদাবাদ, প্রকাশবাদ এবং পরাবাস্তববাদের উপর এটির প্রভাব লক্ষ করা যায়। জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতাবোধ সংক্রান্ত সব কবিতায় এসব আন্দোলনের কোনো না কোনোটির বা একই কবিতায় একটি, দু'টি বা তিনটির প্রভাব দেখা যায়। এই আন্দোলনগুলির প্রভাবে জীবনানন্দের মেধা ও মনন বহুমাত্রিকতা লাভ করে। তবে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ প্রভাব বিচ্ছিন্নতাবোধ সংক্রান্ত এবং জীবনবাদী উভয় প্রকার কবিতাতেই লক্ষিত হয়। বিচ্ছিন্নতাবোধ সংক্রান্ত কবিতায় এ প্রভাব কার্যকর হয়েছে জীবনজ্বর, যুগজ্বর এবং অবক্ষয় ও ভাঙ্গাগড়ার রূপায়ণকে গভীরতর এবং ব্যাপকতর করায়। আর জীবনবাদী কবিতায় এই আন্দোলনগুলির কোনো কোনোটি নান্দনিকতার এক অধরা মাধুর্য এবং স্বপ্নময়তার ঐশ্বর্য দান করেছে। এসব আন্দোলন প্রভাবিত বিচ্ছিন্নতাবোধ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে :

আন্দোলনের নাম	বিচ্ছিন্নতাবোধ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি কবিতার নাম
Expressionism	*ধূসর পাণ্ডুলিপি*—পরস্পর, বোধ, ক্যাম্পে ; *বনলতা সেন*—হাওয়ার রাত, শঙ্খমালা, নগ্ন নির্জন হাত, কমলালেবু ; *মহাপৃথিবী*—আট বছর আগের একদিন, গোধূলিসন্ধির নৃত্য ; *বেলা অবেলা কালবেলা*—সময়ের তীরে ; *শ্রেষ্ঠ কবিতা*—তবু, এই সব দিন রাত্রি, এইখানে সূর্যের, ১৯৪৬-৪৭ ; *অগ্রন্থিত কবিতা*—বাঙালি পাঞ্জাবি মারাঠি গুজরাটি।
Dadaism/ Surrealism	*বনলতা সেন*—বনলতা সেন, হাওয়ার রাত, আমি যদি হতাম, নগ্ন নির্জন হাত, শিকার ; মহাপৃথিবী—নিরালোক।
Impressionism	*ঝরা পালক*—পিরামিড ; *ধূসর পাণ্ডুলিপি*—মৃত্যুর আগে ; *বনলতা সেন*—বনলতা সেন।
Futurism	*ঝরা পালক*—আমি কবি, সেই কবি ; *ধূসর পাণ্ডুলিপি*—নির্জন স্বাক্ষর, বোধ, জীবন-৮,১৬ ; *বনলতা সেন*—অন্ধকার, মিতভাষণ, কমলালেবু ; *সাতটি তারার তিমির*—বিভিন্ন কোরাস ; *বেলা অবেলা কালবেলা*—শতাব্দী, দেশ কাল সন্ততি ; *শ্রেষ্ঠ কবিতা*—তবু।

৬

কবি হিসেবে জীবনানন্দকে যত অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়েছে বাংলা ভাষায় সম্ভবত আর কোনো কবিকে অনুরূপভাবে অভিষিক্ত করা হয় নি। শুরু থেকেই জীবনানন্দের কবিতাই এসব বর্ণনাত্মক বা বৈশিষ্ট্যনির্ধারক অভিধার উৎস। বিচ্ছিন্নতাবোধ কোনো অভিধা হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবির্ভূত হয় নি, তার কবিতা বিশ্লেষণ করে তার যাপিত জীবনের গ্লানি সংবেদী হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, পাঠকেরা নিজেরাই বাংলা কাব্যের এই অনন্যসাধারণ কবি-ব্যক্তিত্বের জগতও জীবন-বিচ্ছিন্নতাবোধ উপলব্ধি করতে পারে। যে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম *ঝরা পালক*, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, তার ভুবন যে দুর্বিষহ-'out of joint' তা'ত আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুরুতেই তিনি ঘোষণা দেন—

> আমি কবি—সেই কবি,—
> আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি ! (ঝরা পালক)

কেমন পৃথিবীতে তার বসবাস ?—

> পড়ে আছে হেথা ছিন্ন নিবার, পাখির নষ্ট নীড় !
> হেথায় বেদনা মা-হারা শিশুর, শুধু বিধবার ভিড়। (ঐ)

কাতর আঁখি, ঝরা পালক, ছিন্ন নীবার, নষ্ট নীড়, মা-হারা শিশুর বেদনা, বিধবার ভিড়—কি ভয়াবহ বেদনাবিদ্ধ এক অসুস্থ পৃথিবীর এবং জীবনের নিদারণ দৃশ্যপট উন্মোচন করে কবি পাঠকদের আহ্বান জানালেন তার কাব্যভুবনে। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তেও অনুরণিত ঝরে যাওয়ার আর চলে যাওয়ার সুর। প্রথম কবিতার নামেই উচ্চকিত কারণ্যের মর্মস্পর্শী সুর— "নির্জন স্বাক্ষর"। যুথবদ্ধ জীবনের স্নেহ-ভালোবাসার প্রগাঢ় সলিলে অবগাহন করার অবকাশ পেলে হয়ত এ বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁকে আক্রান্ত করত না। বাস্তব জীবনেও একরকম বিচ্ছিন্ন ছিলেন সবার কাছ থেকে। নিজেকে সব সময়ে সযত্ন প্রয়াসে অন্তরালে রাখতেন। যার সঙ্গে জীবন ও যৌবনের অন্তরঙ্গতম সম্পর্ক সে-ও আসলে ছিল কতদূরের। দুজনের জীবন তৃষা প্রবাহমান ছিল দুই বিপরীত খাতে।

জীবনানন্দকে অন্ধকারের কবি বললে অতিশয়োক্তি হবে না। তাঁর কবিতার প্রাঙ্গণের বিরাট একটা অংশ জুড়ে অন্ধকারের প্রভাব-বিস্তারী উপস্থিতি পাঠকদের মনে এই বোধ জাগায় যে মানসিকভাবে তিনি আলোর ভুবন থেকে প্রায় নির্বাসিতই ছিলেন বলা চলে। শরীরীভাবে যে আলোর উদ্ভাসে তিনি স্নাত হয়েছেন তা হয়ত তাঁর কাছে ছিল অন্ধকারেরই নামান্তর। অন্ধকার নিয়ে আর কোনো কবির এমন গভীর মগ্নতার কথা মনে পড়ে না। তাঁর আলোময় কবিতাও আছে। তাঁর কবিতায় উল্লেখ আছে দুপুরের জ্বলন্ত সূর্যেরও। কিন্তু তা-ও আচ্ছন্ন এক অস্বাভাবিকতায়। "মৃত্যুর আগে" কবিতায় অন্ধকার ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও এ অন্ধকার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনন্ত অন্ধকারের দিকে ক্রমাভিসারী। মৃত্যুর মুখও ধূসর। কবি যে কত বিচ্ছিন্ন তা ফুটে উঠেছে জীবনের শেষ অন্ধকার যাত্রায় পাখ-পাখালির ডাক ছাড়া আর কারও উষ্ণ উদ্দীপক কণ্ঠস্বরের বা স্নেহ-ভাষণের কথা তাঁর মনে আসছে না। "অন্ধকার" শিরোনামের কবিতাটি অন্ধকার সম্পর্কিত সবচেয়ে ভয়াবহ কবিতা। মানব জীবন সম্বন্ধে তাঁর সব মোহের অবসান হয়েছে। মৃত্যুর গভীর অন্ধকার ঘুম থেকে তিনি আর জাগতে চান না :

> ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
> কোনদিন আর জাগব না জেনে
> কোন দিন জাগব না আমি—কোন দিন জাগব না আর—
> ... ...
> হায় উৎসব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে
থাকতে চেয়েছি।
কোন দিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনি নি কোন দিন,
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর ;
এই সব ভয়াবহ আরতি।
গভীর অন্ধকারের ঘুমের আশ্বাসে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?

(বনলতা সেন : বনলতা সেন)

"শতাব্দী" কবিতাতে অন্ধকার মানুষের অবক্ষয় আর ব্যর্থতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট :

চারিদিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে, শুনি ;
... ...
অন্নে ক্ষুধা মিটে গেলেও মনের ভিতরের
ব্যথার কোনো মীমাংসা নেই জানিয়ে দিয়ে আকাশ ভরে জ্বলে,

(বেলা অবেলা কালবেলা)

মনের ভেতরের মীমাংসাতীত ব্যথা কি বিচ্ছিন্নতাবোধ ? বিচ্ছিন্নতাবোধ একটি তীব্র মানসিক সঙ্কট। 'মনের ভিতরের' ব্যথাও তাই। সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তে বিপর্যস্ত কবি পৃথিবীর সবকিছুই দেখেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন :

অলঙ্ঘ্য অন্তঃশীল অন্ধকারে ঘিরে আসে সব;
জানে তাহা কীটেরাও, পতঙ্গেরা, শান্ত শিব পাখির ছানাও;
বনহংসীশিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব
স্বস্তি চায়;—হে সৃষ্টির বনহংসী, কী অমৃত চাও ?

(দেশ কাল সন্ততি : ঐ)

জীবনানন্দের 'অন্ধকার' প্রায়শই প্রতীকের গভীর তাৎপর্যে ভাস্বর হয়ে উঠে। 'তবু' কবিতাতে এটা লক্ষণীয়। প্রথমে তিনি অন্ধকার অবস্থার বর্ণনা দেন :

সে অনেক রাজনীতি রুগ্ননীতি মারী
মন্বন্তর যুদ্ধ ঋণ সময়ের থেকে
উঠে এসে এই পৃথিবীর পথে আড়াই হাজার
বছরে বয়সী আমি ;
বুদ্ধকে সচক্ষে মহানির্বাণের আশ্চর্য শান্তিতে
চলে যেতে দেখে—তবু—অবিরল অশান্তির দীপ্তি ভিক্ষা ক'রে
এখানে তোমার কাছে দাঁড়ায়ে রয়েছি ;

(শ্রেষ্ঠ কবিতা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পরই আসে পায়ের–নিচের–মাটি–ক্ষয়ে–যাওয়া শ্বাসরুদ্ধকর এক ইঙ্গিত :

আজ এই পৃথিবীর অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস
কেবলি শিথিল হয়ে যায় ; (ঐ)

একটি বিশ্বাসহীন পৃথিবীতে মানবিক সম্পর্কের অবক্ষয় এবং ধ্বংস অনিবার্য। শিথিল সম্পর্কের ভুবনে ধীরে ধীরে থাবা বিস্তার করে বিচ্ছিন্নতাবোধ।

"১৯৪৬–৪৭" কবিতায় ও অন্ধকার বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রবল অধিকারে। উঁচু স্তরের লোকজনেরা—শোষকেরা, ক্ষমতাধরেরা—

সবি নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়
বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়,
(শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এবং ভবিষ্যতে ইচ্ছাপূরণের কথা—

ভেবে তারা অন্ধকারে লীন হ'য়ে যায়। (ঐ)

এই কবিতাতেই কবি অন্ধকারকে নিয়ে ব্যাঞ্জিতিও করেছেন, আবার বিদিশার নিশার মতো নান্দনীকতায় অভিষিক্তও করেছেন :

সূর্য অস্তে চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—

কিন্তু কোথায়?—'নিভে গেছে সব'।

জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকড় অন্ধকারের মধ্যেই প্রোথিত। এই অন্ধকার আলোর অভাব নয়, মৃত্যুর প্রতীক : যেমন "১৯৩৬" শিরোনামের কবিতায়—

রূপ প্রেম : সবি অন্ধকার;
সবি দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ; কঙ্কাল হবার—শূন্যে মিলেয়ে যাবার।
(অগ্রন্থিত কবিতা)

"অদ্ভুত আঁধার এক" কবিতায় অন্ধকার এক অসামান্য প্রতীকী ঐশ্বর্যে মণ্ডিত এবং সমৃদ্ধ হয়ে সমকালীন মূল্যবোধের অবক্ষয়, অমানবিকতা, যুগের দিশারী হবার যোগ্যদের চরম দুরবস্থা, ভ্রষ্ট এবং নষ্টদের উর্ধ্বারোহন আর মানবতাবোধ এবং মূল্যবোধসম্পন্নদের হীনাবস্থায় নিক্ষেপ তাকে ক্ষুব্ধ করেছে এবং তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধকে করেছে তীব্রতর :

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখানো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।
(অগ্রন্থিত কবিতা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অনবদ্য কবিতাটি আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে Yeats–এর "The Second Coming"–এর ভুবনে নিয়ে যায় যেখানে নিয়ন্ত্রণাতীত চিত্ত–বিক্ষোভে কবি ফেটে পড়েন।

Things fall apart ; the centre cannot hold ;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned ;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

অন্ধকারেই কবি নিমজ্জিত থাকতে চান, কারণ এই অন্ধকারেই তিনি খুঁজে পান তার বিপর্যস্ত আত্মার নিদান। এই অন্ধকার থেকে তিনি জাগতিক বাস্তবতার বিষজর্জর নির্দয় পরিবেশে ফিরে আসতে চান না। আবেগ মথিত এবং হতাশা ক্লান্ত কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় গভীর বিষাদের উচ্চারণ :

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া
আমাকে জাগাতে চাও কেন।

বুদ্ধদেব বসু ঠিকই আখ্যা দিয়েছিলেন যে জীবনানন্দ দাশ নির্জনতার কবি। জীবনানন্দের ওই সময়ের জীবনের যে আলেখ্য তিনি এঁকেছেন তা সঠিকভাবে তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে। জীবনানন্দ কেবলই অন্তরালে থাকে। সবাইকে এড়িয়ে চলে। খোদ বুদ্ধবসু নিজেও তো তাঁর দেখা পেতেন না। আড্ডায় নেই। আসরে নেই। কোনো হইহুল্লোড়ে নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যার কবিতার প্রশংসা করেছেন তাকে কোথাও দেখা যায় না। এমন এক গভীর দুঃখে মগ্ন তাঁর সমস্ত আকাশ। সমস্ত পৃথিবী। যে বয়সে জগত ও জীবনকে জয় করে নেবার দুর্বার উল্লাসে উদ্দীপ্ত হবার কথা সে বয়সেই জীবনানন্দ নিজেকে সমর্পণ করেছেন নির্জনতার নিবিড়তায়। এখনকার পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারেন যে বিচ্ছিন্নতাবোধই জীবনানন্দকে নির্জনতার নিবিড়তায় আশ্রয় খুঁজে নিতে বাধ্য করেছে। তবে অবশ্যই নির্জনতাই তাঁর একমাত্র কবি পরিচয় নয়। তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতার এটি একটি দিক। তাঁর অন্তর্জগত ও বহির্জগতের নির্জনতার এই মেলবন্ধন থেকেই উদ্ভব হলো দ্বিতীয় অভিধা–'নির্জনতা'র কবি। প্রথম অভিধা রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত, তিনি 'চিত্ররূপময়' কবি।

যিনিই বিচ্ছিন্ন তিনিই নির্জন। একাকী। জীবনানন্দের কবিতার প্রায় সর্বত্রই এই বোধ কোনো না কোনোভাবে প্রতিফলিত। শুরু থেকেই সম্ভবত মানুষ ও সমাজের সঙ্গে, চলমান পৃথিবীর সঙ্গে, তিনি নিজেকে খাপখাওয়াতে পারেন নি। সম্ভবত মানুষের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা প্রবল। কোণঠাসা হতে হতে মানুষের উপর আস্থাই হারিয়ে ফেলেছিলেন। পেশাগত জীবনাভিসারে শেষ পর্যন্ত সমর্পিত হন হতাশার্জজর বিবরে, যেখান থেকে ত্রাণলাভের দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁকে শুধু ছলনাই করেছে। বুদ্ধদেব বসু ছাড়া তাঁকে আর কেউ তেমন করে কাব্য ভুবনে সাদরে বরণ করে নি। তাঁর দাম্পত্যজীবনের টানাপোড়েন হয়ত অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্তর্জগতে শুরু হয়ে গিয়েছিল ক্ষয়ের বেদনার্ত তরঙ্গাভিঘাত। চাপা ছিলেন। কাউকে কিছু জানতে দেন নি। মনোজগতে হয়ত জীবনানন্দ এবং লাবণ্য—দুজনেই বেছে নিয়েছিলেন জীবনবীক্ষার দুই সমান্তরাল পথ। এ জ্বালা যে কত মর্মান্তিক তা সাধারণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পক্ষে বোঝা কঠিন। ঘরে থেকেও যে ঘরের বাইরের নির্জনতাইত তাঁকে নিবিড় সান্নিধ্যে উষ্ণ করবে। নিজেকে আর সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নির্বেদের এক অবিচ্ছেদ্য অন্তরালে কবি নিজেকে নির্বাসিত করেছিলেন। তাঁর বিপুল সংখ্যক কবিতাতেই এর স্বাক্ষর বর্তমান। কিন্তু তাই বলে তিনি একেবারে জীবন বিমুখ হওয়ার মতো উপায়হীনতার শিকার হন নি। নির্জনতার অন্তঃপুর থেকেই তাঁর মানবতাবাদী হৃদয় পৃথিবীর আর্তমানুষদের জন্য উদ্বেল হয়েছে, উৎকণ্ঠিত হয়েছে; জীবনবোধের আর মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল প্রতিবাদী কণ্ঠ নিনাদিত হয়েছে। তবুও সব শেষে একথা বলতেই হবে যে এতসব সত্ত্বেও, সব জীবনবাদিতা সত্ত্বেও, 'শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয়' সত্ত্বেও, জীবনানন্দ অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতে নির্জনতা আর বিচ্ছিন্নতাবোধের করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। মৃত্যুর পর বুঝিবা এ কারণেই অনেকের মনকে এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছে তাঁর মৃত্যু দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা। নির্জনতা প্রিয়তা মানসিক সঙ্কটেরই পরিচায়ক। পরিচায়ক যুগ, জগত এবং জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার, যা বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি করে। কিন্তু জীবনানন্দ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কবি। কীটসের কণ্ঠস্বর তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধকে ছাড়িয়ে ধ্বনিত হতে পারে নি। বর্তমান তাঁর কাছে দুঃখেরই রয়ে গেছে। জীবনানন্দ নির্জনতার মধ্যে থেকেও জীবনের জয়গান গেয়েছেন, অনন্ত সূর্যোদয়ের কথা বলেছেন। সরাসরি নির্জনতাকে উপলক্ষ করে তাঁর লেখা কবিতা সংখ্যায় নিতান্তই নগন্য। কিন্তু অন্যান্য কবিতায় চিত্রকল্প নির্মাণ, কবিতার বিষয়বস্তু, পরিণতি তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রকটিত করে। *ঝরা পালক*-এর শেষ কবিতাটি দেখা যাক :

> চোখ দু'টো ঘুমে ভরে
> ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে।
> ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিল গোপন,—স্বপন কদিন রয়।
> এসেছে গোধূলি গোলাপিবরণ,—এ তবু গোধূলি নয়।
> সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়,

ফসল কাটার গান হলে জীবনের ইতিবাচক দিকের প্রতিফলন হতো। 'ঝরা ফসলে'র মানে রিক্ততার, নিঃস্বতার, আশাভঙ্গের গান দিয়ে আজ বুক ভরতে হয়েছে। 'গোপন' নিশ্চয়ই বুকে বা হৃদয়ে-স্বপ্ন, আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা সবি শেষ। গোলাপিবরণ গোধূলি—কতনা সুন্দর, কত প্রত্যাশার সম্ভাবনায় প্রাণময়। কিন্তু রিক্ততা আজ সব কিছু অবলুপ্ত করে দিয়েছে। সঙ্গীবিহীন তারাটি—আর সব তারা থেকে বিচ্ছিন্ন তারাটি—নিজের সাথে নিজে কথা বলে। স্বগত সংলাপ।

"নির্জন সাক্ষর" *(ধূসর পাণ্ডুলিপি)* একটি প্রেমের কবিতা হলেও বিচ্ছিন্নতা বোধের করুণ আর্তিতে শেষ পর্যন্ত এটিও ভারাক্রান্ত হয়। এর কারণ হৃদয়ের গহবরে যে-জিনিস বেঁচে থাকে তা হলো "নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসন"। বিচ্ছিন্নতাবোধ এখানে তীব্রতর রূপ ধারণ করেছে। নিঃশব্দ ত নির্জন বলেই। অন্তর্জগতের এক হিরণ্ময় অনুভূতি। কবি পৃথিবীর আর সব মানুষেরই মতো। কিন্তু তিনি তাদের বৃত্তের বাইরে চিরাচরিত জীবনযাপনের কর্মধারায় থেকেও নিজের দোষেই বিচ্ছিন্ন। কাজেই নির্জন নিঃসঙ্গ। এবং নিদারুণভাবে একাকী। 'বোধ' কবিতায় এ ভাব সুস্পষ্ট :

> সকল লোকের মাঝে ব'সে
> আমার নিজের মুদ্রাদোষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা? (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

"বোধ" যদি সৃষ্টিশীলতার তাড়না হয়ে থাকে এবং তাঁর জীবনে শৈল্পিক বিচ্ছিন্নতা থাকে, তবু তা তাঁকে নির্জনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর গ্লানিময় যাপিত জীবনের নির্বেদ, তাই আর সব মানুষের মতো হয়েও—আর সব মানুষের মধ্যে বাস করেও তাঁর চিত্তবিদারী উচ্চারণ :

তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী! (ঐ)

মানসজগতে শিল্পী চিরদিনই নির্জন। জীবনানন্দ তাঁর শৈল্পিক ভুবনে নির্জন ছিলেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রতিকূলতার অভিঘাতে বার বার জর্জরিত হয়ে প্রকৃতির নির্জনতায় আশ্রয় খুঁজেছেন। নির্জনতা আরও প্রকট হয়েছে নিসর্গের বুকে একাকী জলধারার কলস্বরের সঙ্গে তুলনায় :

বলি আমি এই হৃদয়ের :
সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোন দিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনদিন! (ঐ)

মানুষ, মানুষী এমনকি শিশুদের মুখ দেখেও সে কোনোদিন আনন্দ পাবে না। অন্তর্জগতে কি বিধ্বংসী বিপর্যয় হলে এমনটি হতে পারে তা উপলব্ধি করাও কঠিন। জীবনানন্দ বহির্জগতে জীবনাচরণে অন্তর্জগতের এই ভয়াল কালো মেঘের ছায়াকে আড়াল করে রাখতে পারে নি। এলিয়ট ত—"The Waste Land"-এ অনেক আগেই সভ্যতার বন্ধ্যাত্বের পাশাপাশি ব্যক্তি মানুষের অসহায়তা, একাকীত্ব আর ভাববিনিময়ের অসামর্থ্যতার ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন। একা একা কথা বলা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? লাবণ্যর সঙ্গে জীবনের শুরুটা তাঁর ভালোই ছিল। অন্তরঙ্গ ছিল। কিন্তু একসময়ে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। তার দিক থেকে ভালোবাসা ছিল একটি বহতা নদীর মতো। যার প্রবাহে, মনে হয়, একদিন ভাটা পড়েছিল। কিন্তু লাবণ্যর দিক থেকে এ প্রবাহ বোধ হয় একদিন শুধু থেমেই যায় নি, ঘৃণা আর উপেক্ষার উষর মরুর রূপ নিয়েছে। সবই 'নক্ষত্রের দোষ', বলেন জীবনানন্দ। লাবণ্য তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে আর আগের মতো আগ্রহী ত থাকেই নি, বরং মাঝে মাঝেই অস্বীকৃতির ক্রুশে তাঁকে বিদ্ধ করেছে। পরিণাম কবির জন্য ভয়াবহ। অন্তর্জগতেই হোক আর নিসর্গেই হোক নির্জনতা ছাড়া তাঁর আর ঠাঁই কোথায়? এই পংক্তিমালায় কি এই অরন্তুদ বেদনাার করুণ চিত্রটি ফুটে উঠেনি?—

আমারে সে ভালবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে—বারে
ভালবেসে তারে ;
তবুও সাধনা ছিল একদিন,—এই ভালবাসা,
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি ; যে নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি ;
তবু এই ভালবাসা—ধুলো আর কাদা—।

(বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

অনেক অমিল সত্ত্বেও পাঠকদের চকিতে মনে পড়বে Browning-এর বিখ্যাত মনোলগ "Andrea del Sarto"-র ভাগ্যহত, প্রত্যাখ্যাত, উপেক্ষিত, অবিশ্বস্ততার শিকার নায়ক এন্ড্রিয়ার কথা— 'I feel He laid the fetter, Let it lie! দোষ 'He' এবং 'নক্ষত্র' যারই হোক দুজনের ক্ষেত্রেই ভালোবাসার নদীর ধারা হারিয়েছে ধুলো আর কাদায়।

বিচ্ছিন্নতাবোধ জীবনানন্দকে তাড়িত করেছে প্রকৃতির অন্তর্গত নির্জনতাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে এবং সে নির্জনতার রূপনির্মাণে। এ ধারায় "মৃত্যুর আগে" সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'নির্জন খড়ের মাঠ', 'পউষ সন্ধ্যা', 'নরম নদীর নারী', অন্ধকারের 'আকন্দ ধুন্দুল', 'জোনাকি', 'নিরব চাঁদ', 'পুরানো পেঁচা', 'বক', 'বুনোহাঁস', 'সন্ধ্যার কাক', 'মাছরাঙ্গা', 'নক্ষত্র', 'আকাশ', 'সবুজ পাতা', 'অঘ্রাণের অন্ধকার হয়েছে হলুদ', 'হিজলের জানালা', 'বুলবুলি', 'ইঁদুর', 'নির্জন মাছ', 'পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে', 'মিনারের মত মেঘ', 'সোনালী চিল', 'বেতফল', জ্যোৎস্নারাতে', 'খড়ের চালের ছায়া', 'ঝিঁঝির ডাক', 'লাল বটফল', 'নির্জন মাঠের ভিড়', 'নীল আকাশ', 'রাতের তারা',—সবই নির্জনতার প্রতীক। এসবের সঙ্গেই কবির মানসিক সংলগ্নতা গভীর থেকে গভীর হয়। এখানে কারো কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের বেদনা নেই, যুথবদ্ধ জীবনের অন্তর্গত গ্লানি নেই, শহরের অমানবিক যান্ত্রিক পরিবেশ নেই। কিন্তু এখানেও জীবন নিরাপদ নয়—শিকারীর গুলি এখানেও তাণ্ডব সৃষ্টি করতে পারে।

"*রূপসী বাংলা*"-য় কবির নির্জনতাপ্রিয়তা বিস্তৃতরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিসর্গ-প্রীতি-সংশ্লিষ্ট হৃদয়ের সমস্ত আহরিত ঐশ্বর্য তিনি উজাড় করে দিয়েছেন এ গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছে এক অনতিক্রম্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায়। বাংলার রূপ তাঁকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে, এত গভীরভাবে যে সন্ধ্যায় 'খয়েরী ডানা শালিখের', 'হলুদ ঠ্যাং' ও তাঁর ইন্দ্রিয়-কল্পনাকে এড়াতে পারে নি ; যেমন পারে নি "মৃত্যুর আগে" কবিতায় 'নির্জন মাছের চোখ' এবং বেতফল ইত্যাদি। কবিতার পর কবিতায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রাম-বাংলার এমনি সব বিষয়বস্তু তাঁর কাব্যের উপাদান হবার পরম ঐশ্বর্যে ভাস্বর হয়েছে। 'হলুদ ঠ্যাং' ও শিল্প সৌকর্যে সংস্থাপিত হয়ে কাব্যের শরীরে এমন অসাধারণত্ব লাভ করতে পারে তা আগে কে জানতো। কিন্তু এ সবই কি শুধু হৃদয়ের অপ্রতিরোধ্য টানের—ভালবাসার জন্য ? অবশ্যই হৃদয়ের টান ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবোধের তাড়না। বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁর প্রকৃতি প্রেমকে আরও গাঢ় করেছে। ইংরেজ রোমান্টিক কবিরাও অন্তর্জগত এবং বহির্জগতের জ্বালাযন্ত্রণার উপশমের জন্য প্রকৃতির বুকে নিজেদের সমর্পন করেছেন। জীবনানন্দের এই যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একান্ত উচ্চারণ "তোমরা যেখানে সাধ চলিয়া যাও—আমি এই বাংলার পারে/রয়ে যাব"—একি শুধু ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়, পাখ-পাখালির আনন্দ-কলরবে, সুখময় জীবনের শিহরণ দেখার জন্য? এসবের সঙ্গেইত নিবিড় হয়ে রয়েছে 'মেয়েলি হাত সকরুণ', 'শাদা শাঁখার', 'ধূসর বাতাসে শঙ্খের মতো' কান্না। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র 'স্বপ্নের হাতে' কবিতায় কবি তাঁর ব্যথা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের উৎসবের কথা উচ্চারণ করেছেন করুণ আর্তিহত চিত্তে :

> পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
> হৃদয়ে বেদনা জমে।

নির্জনতায় কবি একান্তে নিজেকে পান নিজের মতো করে।

জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনার এক পিঠে রয়েছে নান্দনিকতা এবং আরেক পিঠে রয়েছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। নান্দনিকতা বলা হলো এ কারণে যে অতীত সভ্যতার এসব উপাদান—শহর, নগর, বন্দর ইত্যাদি তাঁর কাব্যে সংযুক্ত হয়ে অতীতকে এক রূপময় মাধুর্যে মণ্ডিত করে এক অভূতপূর্ব কল্পলোকের সৃষ্টি করে, পাঠকের মধ্যে সৃষ্টি করে এক স্বপ্নাচ্ছন্নতা। অতীতকে শুধু নবজীবনই দান করা হয় না, পাঠকদের মধ্যেও ঘটান হয় এক নবচেতনার উন্মেষ। বহুমাত্রিকতার ঐশ্বর্যে কবিতা হয় সমৃদ্ধ এবং আবেদনঘন। বর্তমান যখন দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠে নির্মমতার, যন্ত্রণার, প্রত্যাখ্যানের, যুগজ্বরের, আশা নিরাশার, ক্লান্তির, স্বপ্নভঙ্গের কারণে তখন কোনো কোনো কবি শিল্পী হয়ে উঠেন অতীতচারী—ইতিহাস চেতনা যার একটি লক্ষণ। আর কোনো কোনো কবি শিল্পী একটি উদ্দীপক ভবিষ্যতের ছবি আঁকেন। বর্তমানের জ্বালাযন্ত্রণার আলেখ্য থাকে তাদের কর্মে, কিন্তু লক্ষ একটাই—শীত যদি আসেই বসন্তের আর দেরি নেই। শেলী ছিলেন এরকম বলিষ্ঠ আশাবাদের কবি। কিন্তু জীবনানন্দের মিল তাঁরই মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দীপ্ত রূপকার কীটসের সঙ্গে, যার লাবণ্য-সংকট না থাকলেও ছিল কাছাকাছি ফেনীব্রন-সংকট : চাইতেন না তাঁর সুরঞ্জনা (ফেনীব্রন) আর কারো কাছে যাক বা কারো সঙ্গে নাচুক বা পার্টিতে যাক। ফেনীব্রন থোড়াই কেয়ার করত এসবের। ফলে কীটসের মানসিক সংকট এবং যন্ত্রণা হয়ে উঠে তীব্রভাবে বেদনাদায়ক। এর সঙ্গে যুক্ত হয় পারিবারিক বেদনাজর্জর যত ইতিকথা। আর নিজের বক্ষে ধারণ করেছিলেন ক্ষয় রোগের অনিবার্য মৃত্যুবীজ। তাঁর কাল এগিয়ে আসল না সম্ভাবনার কোনো ইঙ্গিত নিয়ে। তাই ঠাঁই নিলেন মধ্যযুগে আর গ্রীসের নান্দনিক সৌন্দর্যলোকে। একবারই শুধু আশার সান্দ্র বাণীতে তিনি মুখর হয়েছিলেন :

> Shed no tear—O shed no tear!
> The flower will bloom another year.
> Weep no more—O weep no more!
> Young buds sleep in the root's white core.

কিন্তু এটিই কীটসের প্রথম এবং শেষ আশাবাদের কবিতা।

জীবনানন্দ যে শুধু পলায়নের জন্যই অতীতের সভ্যতাখ্যাত অনেক শহর নগর এবং বন্দরে গিয়েছেন তা কিন্তু নয়, গিয়েছেন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ অতীতকে এবং সংশ্লিষ্ট নানা অনুষঙ্গকে উদ্ধার করে নিজের কাব্যভুবনকে অভিনব উপকরণে আরও আবেদনঘন করতে। অতীতকে বর্তমানে এনে কাব্যের সঞ্জীবনী লাবণ্যে মনোহরণ করে তুলতে গিয়ে তাঁর যে সাধনা তা তাঁকে তাঁর মানসিক সংকট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে শৈল্পিক সহায়তা দান করেছে। এখানেই বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে তাঁর ইতিহাস চেতনার সম্পর্ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝরা পালক-এর "একদিন খুঁজেছিনু যারে" কবিতার করুণ আর্তি এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে মূর্ত করে। অতীতের ব্যঞ্জনা কবিতাটিকে দিয়েছে ব্যাপ্তি এবং গভীরতা :

একদিন খুঁজেছিনু যারে
বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি-আঁধারে,
... ...
যার লাগি ছুটে গেছি নির্দয় মসুদ্ চীনা তাতারের দলে,
আর্ত কোলাহলে
তুলিয়াছি দিকে দিকে ব্যথা বিঘ্ন ভয়,
আজ মনে হয়
পৃথিবীর সাঁজদীপে তার হাতে কোনদিন জ্বলে নাই শিখা।

কবিতাটিতে মনে হয় বনলতা সেনের একরকম আগাম সংবাদ পাওয়া যায়। এখানে কবি কল্পলোকে মানসীর সন্ধান পান না, সে কল্পলোকেই থেকে যায়। আর "বনলতা সেন"-এ বনলতা সেন সাঁজদীপ জ্বালাবার দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ না থাকলেও সন্ধ্যায় মুখোমুখি বসার অনাবিল ঐশ্বর্যে অম্লান। এ গ্রন্থের "মিশর" ও "পিরামিড" কবিতা দুটিতে ইতিহাসের ব্যবহার লক্ষণীয়। "মিশর" কবিতায় কবি পাঠকদের নিয়ে যান মিশরের সেই সুদূর অতীতে— পিরামিডের যুগে 'ঈশিশে'র সময়ে, কুমীরপূজার কালে, ফ্যারাওদের আমলে। মিশরের সেই দিন আজ নেই। এখন ভিন দেশী শোষক ও তস্করদের হানায় একদা জর্জরিত মিশর আবার জেগে উঠছে। পিরামিড অনন্তকালের জীবনযাত্রার, ভাঙ্গাগড়ার, উত্থান-পতনের, জয়-পরাজয়ের মৌন সাক্ষী। "অবিচল স্মৃতির মন্দির"। কবির ভাষায় "প্রিয়ার বক্ষের পরে বসি একা নীরবে করিছ শুধু শবের সাধনা"। কিন্তু *রূপসী বাংলা*-র "সেই দিন এই মাঠ" কবিতায় কবি আবহমান বাংলার নিসর্গের অবিনশ্বরতার পাশাপাশি প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসের উল্লেখ করেন : 'এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে'। কিন্তু *বনলতা সেন* গ্রন্থের "হাওয়ার রাত" কবিতায় অন্য প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয় এ দু'টি স্থান। বেবিলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো...আকাশ'। কল্পনায় ছাই হয়ে যাওয়ার আগের বেবিলনে তিনি নান্দনিক সফরে গিয়ে রানীর ঘাড়ের শাল দেখে এসেছেন। 'যে রূপসীদে'র তিনি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছেন 'কাল তারা' 'অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়' আবির্ভূত হয়েছিল। কবির চেতন থেকে অবচেতনে এবং অবচেতন থেকে চেতনে এই যে শৈল্পিক পারাপার তা তাঁকে বাস্তবতার রূঢ়তা থেকে সরে যেতে সহায়তা করেছে, সেই বাস্তবতা যা তাঁর মধ্যে বেদনা-বিধুর বিচ্ছিন্নতাবোধের উদ্ভব ঘটিয়েছে। 'বনলতা সেন'-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের অনুসন্ধান কি অমূলক হবে? মনে হয় না। বিচ্ছিন্নতাবোধের একটি উৎস না পাওয়ার বেদনা। জীবনে যা রয়ে গেছে চির-দুর্লভ, ঘরের বনলতা সেন যেখানে বিপরীত যাত্রার দাবদাহে জীবনকে করেছে বিপর্যস্ত, তখন স্বপ্ন-কল্পলোকের বনলতা সেনইত একটু শান্তি দিয়েছে, খবর নিয়েছে, অন্ধকারে মুখোমুখি বসেছে ও। হোক না শৈল্পিক সান্ত্বনা। স্বপ্নের অর্জন। "নগ্ন নির্জন হাত" কবিতায় কবির :

মনে হয় কোন বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।
ভারত সমুদ্রের তীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন্ এক প্রাসাদ ছিল ;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।
... ...
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

এটিও একটি ভয়ানক কবিতা। এক বিলুপ্ত নগরীর প্রাসাদের রূপ জাগছে কবির হৃদয়ে। কবি নিশ্চিত নন কোথায়। ভারত সমুদ্রের তীরে বা ভূমধ্যসাগরের তীরে বা টায়ার সিন্ধুর পারে। এখন সে নগরীও নেই সেই প্রাসাদও নেই। সেই প্রাসাদের মূল্যবান আসবাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে 'আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা'। কি ভৌতিক কি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। 'আর তুমি নারী'। আর কবি প্রিয়াও আসবাবের তালিকাভুক্ত। তার মানবীয় কোনো অধিকার বা কর্তৃত্ব নেই। সে কি পরিচারিকা? 'রক্তিম গেলাসে' 'নগ্ন নির্জন' হাতে সে 'তরমুজ মদ' পরিবেশন করে। যে 'নারী' ছিল সে এখন একটি নগ্ন হাত মাত্র। কারণ নির্জন শব্দের উল্লেখ শরীরের সব অংশের অনুপস্থিতিকে প্রকট করছে। সবই অশরীরী এবং কুহেলিকাময়। কবির মন ভারমুক্ত হলো মনের রুদ্ধ কপাট খুলে, কিন্তু লাবণ্য কি বুঝেছিল সংসার—দাম্পত্যসম্পর্ক—প্রাণহীন হয়ে পড়েছে? বিচ্ছিন্নতাবোধ কত তীব্র হলে এরকম একটি ভয়াবহ চিত্র আঁকা যায় তা সহজেই অনুমেয়।

অতীত ইতিহাসের নগরে বন্দরে গিয়েও কবি মুক্তি পান নি। যে নারী তাঁর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল তার স্মৃতি তাঁকে তাড়া করেছে বহুস্থানে এবং বহুভাবে। আলোচ্য কবিতাটিতে ভয়াবহভাবে। বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁকে কোথাও শান্তি বা স্বস্তি দেয় নি।

যুগজ্বর, জীবনজ্বর, অবসাদ, মানব জীবন সম্বন্ধে চরম মোহভঙ্গ এবং ক্লান্তি ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্য বহুলাংশে দায়ী। 'The weariness, the fever, and the fret' Keats-কেও পর্যুদস্ত করেছিল। মানুষ পরস্পরের যন্ত্রণার আর্তচিৎকার শোনে। নিজেদের হাতে কোনো সমাধান নেই সঙ্কটের। নারীও তাদের জ্বালাযন্ত্রণার উৎস। এই প্রবল চাপের মুখে যারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না তারা ধীরে ধীরে স্বজন ও জগত এবং জীবনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অবশ্যই মানসিকভাবে। লোকচক্ষুর অন্তরালেও থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন জীবনানন্দ দাশ। কীটস ত নিজের দেশই ত্যাগ করলেন। চলে গেলেন ইটালিতে এবং শেষ নিঃশ্বাসও ফেললেন সেখানে। এদিক দিয়ে কীটসকে বলা যায় কালসঙ্গতিহীন। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁর কালের প্রভাবকে এড়াতে বা অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাঁর বয়স পনেরোর মতো। এবং সমসাময়িক কবিদের কাব্য পাঠ করে তিনি অভিজ্ঞতার ডালি পূর্ণ করেছেন এবং প্রভাবিতও হয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং এর ধ্বংসলীলার অভিজ্ঞতার জন্য তাঁকে কারও দ্বারস্থ হতে হয় নি। রাজনৈতিকভাবে দেশে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল সময়ের মধ্য দিয়েই পথ চলেছেন, যদিও এসবের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল না। সব দেখেশুনে নজরুলের মতো তিনি ক্ষেপতে পারেন নি। অবসাদ আর ক্লান্তিতে আক্রান্ত হয়েছেন। মানুষের ব্যাপারে তিনি হয়ে পড়েছিলেন চরমভাবে বীতশ্রদ্ধ। আস্থাহীন। মানুষের ব্যাপারে তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ এত প্রবল ছিল যে মানুষ হয়ে তিনি আর জন্মাতেই চান নি। চেয়েছিলেন শঙ্খচিল শালিকের বেশে পৃথিবীতে পুনরাগমন করতে। 'পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর' সম্পর্কেও তাঁর সচেতনতা ছিল।

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র "পরস্পর" কবিতার রূপকথার অবয়ব বিদীর্ণ করে বাস্তব পৃথিবীর অসুস্থতাই ফুটে উঠেছে :

রূপ ঝ'রে যায়,—তবু করে যারা সৌন্দর্যের মিছা আয়োজন—,
যে যৌবন ছিঁড়েফেঁড়ে যায়,
... ...
শরীরের ঘুন রাখে ঢেকে,
ব্যর্থতা লুকায়ে রাখে বুকে,
দিন যাহাদের অসাধে,—অসুখে !—
দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
চোখে ঠোঁটে অসুবিধা, ভিতরে অসুখ।
কে যেন নিতেছে তারে খেয়ে !—
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর,—ফোঁপরার মতো ক'রে এরে লয় শুষে
দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষে !...

একটি নিদারুণ অবক্ষয়ের ছবি। সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী, তবু তার আয়োজন অব্যাহত থাকে। 'যে যৌবন ছিঁড়েফেঁড়ে যায়' পাঠকদের তাৎক্ষণিকভাবে Keats-এর 'Where youth grows pale, and spectre-thin and dies'-এর কথা মনে করিয়ে দেবে। একইভাবে সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়ীত্ব মনে করিয়ে দেবে একই কবিতার (Ode to a Nightingale) আরেকটি চরণ "Where Beauty cannot keep her lustrous eyes"-এর কথা। "অসাধে, ... অসুবিধা"... জীবন পরিপূর্ণ। এ অসুস্থ পৃথিবী—যেখানে ভেদাভেদহীনভাবে আদিম বর্বরতার শিকার হয় নারী সৌন্দর্যের—বসবাসের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী। জীবনানন্দের চোখে তথাকথিত সভ্যমানুষের কুৎসিৎ চেহারা ফুটে উঠেছে সব রকম বিতৃষ্ণা এবং নির্বেদের অনুষঙ্গে। এরকমই অবক্ষয়ী আরেকটি চিত্র পাওয়া যায় 'বোধ' *(ধূসর পাণ্ডুলিপি)* কবিতায় :

চোখে কালোশিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পঁচা চালকুমড়ার ছাঁচে,

এইত পৃথিবী,—যেখানে অসুস্থতাই—জীবনজ্বরই—বাস্তবতা। নিত্যসঙ্গী।

জীবনানন্দ যে চৈতন্যের কবি তা এ পৃথিবীতে খাপ-খাওয়ার কথা নয়। মানুষের অমানবিকতা, সৌন্দর্যবোধহীনতা, লোভ, জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিপ্রবাহ রুদ্ধ করার প্রবণতা, নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আনন্দধামে অনায়াসে পৈচাশিক ধ্বংসলীলা চালানোর উন্মত্ততায় মেতে উঠা, বিবেকহীন নিষ্ঠুরতা, কবিকে মর্মান্তিকভাবে আহত ও বিচ্ছিন্ন করেছে যাপিত জীবনের জগত থেকে। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*'র "ক্যাম্পে" কবিতাটিতে শিকারের হৃদয়হীন দিকটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মোচন করা হয়েছে। যেখানে 'দখিনা বাতাসে/চাঁদের আলোয়' 'কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন !', 'মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়', সেখানে নিষ্ঠুর ঘাতক হিসেবে আবির্ভূত হয় শিকারীরাই—মানুষ :

বন্দুকের শব্দ শুনি ;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
... ...
এইখানে প'ড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে উঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে
... ...
আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব...

যেখানে নির্দয় খাদক চিতাও মৃগীর রূপ-মুগ্ধ নান্দনিক বোধে দীপ্ত, সেখানে মানুষের আবির্ভাব ঘাতকের নির্মমতায়। মানুষ কিভাবে জীবন ও নিসর্গের ছন্দ ও ঐকতানকে পাশবিক লোলুপতায় গুঁড়িয়ে দেয় এখানে তা-ই মূর্ত হয়ে উঠেছে। শিকারীর হাতে হরিণদের এই নির্মম মৃত্যু কবিকে তাঁর প্রেমিকার হৃদয়হীনতার—নির্মমতার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়ে মানুষের কাছে' তেমনি কবিও এসেছিলেন তাঁর 'ঘাইহরিণী'—প্রেমিকার—দয়িতার কাছে। কিন্তু তাঁর 'ঘাইহরিণী' শিকারীর লোলুপতায় আর নির্মমতায় তাঁকে মর্মে মেরেছে, করেছে জগত এবং জীবন বিচ্ছিন্ন, যার ফলে তাঁকে আজ অসহায়তার যূপকাষ্ঠে মাথা পেতে ভাবতে হচ্ছে—

কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি? (ক্যাম্পে : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

তাইত?—তিনিওত এক মৃত হরিণ। কেন ভাববেন অন্যসব মৃত হরিণের কথা? জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতাবোধ এখানে তীব্রতম। সম্ভবত কবিতাটির এই অংশে তিনি সবচেয়ে বেশি আত্মজৈবনিক—বিশেষ করে নির্দয় দয়িতার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে। উদ্বেল বসন্তের অম্লান বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে যে সম্পর্কের সুনিবিড় অভিষেক তা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে?—

কোন এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোন এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকেনি কি কেউ এস জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
ওই ঘাইহরিণীর মত?
আমার হৃদয়—এক পুরুষ হরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমার কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ওই মৃত মৃগদের মতো
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোন এক বসন্তের রাতে?
তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে!
মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস লয়ে আমরাও প'ড়ে থাকি;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মতো—।
প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না কি?
দোনালার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা একা শুয়ে থেকে;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে চুপে ভুলে যেতে হয়। (ঐ)

বিচ্ছিন্নতার উষর বালুকাবেলায় একাকীত্বই তার সহচরী—বিকল্প। 'একা একা শুয়ে থেকে' কেটে যায় তার একদা বসন্তের রাতের স্মৃতিবিধুর বিবর্ণ প্রহরগুলি। যাপিত জীবনের চাহিদা মেটাতে তবু বন্দুকের শব্দ—ব্যথা, ঘৃণা, মৃত্যু—ভুলে যেতে হয়। বেঁচে থাকতে হয় যন্ত্রণার কাঁটাবিদ্ধ ক্ষরণ-দীর্ণ হৃদয় নিয়ে:

যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন;—(ঐ)

শিকারী আর দয়িতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দয়িতা শিকারী আর কবি তার অসহায় শিকার। তাইত *রূপসী বাংলা*-র "এই সব ভাল লাগে" কবিতায় কবি তাঁর ভালবাসাকে 'ভুল' আখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে "১৩৩৩" শিরোনামের বেদনাবিধুর আত্মজৈবনিক কবিতাটির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। তীব্র মানসিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে দৈহিক প্রেমের অতৃপ্তি ও প্রত্যাখ্যানের উত্তরণ ঘটে বিচ্ছিন্নতাবোধে। প্রত্যাখ্যানের বেদনাদগ্ধ অপরিতৃপ্ত জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতাবোধ এই কবিতাটির ছত্রে ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে:

তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;—তারপর,—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্‌দিকে জানিনি তা,—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই; ছিড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি,—পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
কতদিন রাত্রি গেছে কেটে!

(ধূসর পাণ্ডুলিপি)

সেই ১৯৩৭ সালের আগেই জীবনানন্দ বিধ্বংসী যৌন সমস্যায় নিক্ষিপ্ত হন। অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং একান্তভাবেই ব্যক্তিগত এ সমস্যা তাঁর ব্যথা-বিপন্ন ব্যক্তিসত্তাকে আর সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আড়ালে নিয়ে যেতে তাঁকে বাধ্য করে। তাঁর অন্তরে বিরহ-মিলনের দোলাচল ত বন্ধ থাকে নি, ফলে ব্যথা হয়েছে তীব্রতর, গভীরতর এবং একই সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবোধও:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া !
তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার ;—তারপর,—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন দিকে,—(ঐ)

কবি আজ একটি বিপন্ন উপলব্ধিতে আত্মসমর্পিত :

আমারে চাও না তুমি আজ আর,—জানি ;

দয়িতা আজ অন্য পথের পথিক—কবির জন্য এক বিমুখ প্রান্তর। ফলশ্রুতি : নিঃসঙ্গতা, রিক্ততা, বিচ্ছিন্নতা :

আমি এই সমুদ্রের পারে
ব'সে আছি একা আজ,—ঐ দূর নক্ষত্রের কাছে
আজ আর প্রশ্ন নাই,—মাঝরাতে ঘুম লেগে আছে
চক্ষে তার,—এলোমেলো রয়েছে আকাশ !
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা ! (ঐ)

কবির জীবনের বিচ্ছিন্নতা-উদ্ভুত অবিন্যস্ততা প্রকৃতির বুকেও সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে। মনে দুঃখ থাকলে প্রকৃতির মধ্যেও দেখা যাবে তার প্রতিফলন—শোনা যাবে দুঃখের দুন্দুভি। তাঁর অন্তরে নিষ্পেষিত আবেগের যে 'smouldering weight' তা তাঁকে আত্মহননের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে :

জানি আমি—আমি যাব চ'লে
তোমার অনেক আগে ; (ঐ)

স্বাভাবিক মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, কিন্তু অস্বাভাবিক মৃত্যু হতাশ মনের দুঃসাহসী পরিকল্পনার ব্যাপার। জীবনানন্দ লাবণ্যর অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন। যদিও কবিতাটি লেখার বহু বছর পর। এ দীর্ঘ সময় তিনি ভুগেছেন দুর্বিষহ মানসিক যাতনা—ক্ষান্তিহীন বিচ্ছিন্নতাবোধে। মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু দুর্ভোগের অশনি সঙ্কেতে মন কাতর হয়, প্রেম হয় অকালপ্রয়াত :

—দেহ ঝরে,—ঝ'রে যায় মন
তার আগে !
…   …   …   …
দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের ঝ'রে যায় মন ! (ঐ)

সমুদ্রের পারে একাকী বসে জগত এবং জীবন বিচ্ছিন্ন ব্যথাতুর কবি ভাবেন তার বিচ্ছিন্নতারই কথা—রোমন্থন করেন বিরহ-শরাহত স্মৃতি ; বার বার ঘুরে ফিরে আসে মৃত্যু-চিন্তা :

জানি আমি খুঁজিবেনা আজিকে আমারে
তুমি আর ;—নক্ষত্রের পারে
যদি আমি চ'লে যাই,
পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই
যদি আমি,—
আমারে খুঁজিতে তবু আসিবেনা আজ ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার পায়ের শব্দ গেল কবে থামি
আমার এ নক্ষত্রের তলে।
জানি তবু—নদীর জলের মতো পা তোমার চলে ;—
...   .
যদি আজ পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই,
যদি আমি চলে যাই
নক্ষত্রের পারে,—
জানি আমি, তুমি আর আসিবেনা খুঁজিতে আমারে !
...   .
একবার ভালবেসে—যদি ভালবাসিতে চাহিতে তুমি সেই ভালবাসা !
...   .
একবার ভালবেসে কেন আমি ভালবাসি সেই ভালবাসা ! (ঐ)

প্রেম নিয়ে কবির স্বপ্ন ছিল অশেষ :

আমি শেষ হব শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হলে !
তুমি যদি বেঁচে থাকো,—জেগে রবো আমি এই পৃথিবীর' পর,—
যদিও বুকের 'পরে রবে মৃত্যু,—মৃত্যুর কবর !
(প্রেম : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

কিন্তু প্রেমাপ্লুত এই স্বপ্ন ছিল ক্ষণস্থায়ী। কবির জীবনে এই প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। স্বল্পায়ু প্রেম তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত করেছে :

একদিন—একরাতে করেছি প্রেমের সাথে খেলা !
একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা।
একদিন একরাত ;—তারপর প্রেম গেছে চ'লে,—
...   .
... ... রয়না কিছুই তবু,—সব শেষ হয়,—
সময়ের আগে তাই কেটে গেল প্রেমের সময় ! (ঐ)

মানুষত বটেই,—নক্ষত্রও ঝ'রে যায় মনের অসুখে ;—কিন্তু, তারপরও—প্রেমের পায়ের শব্দ তবুও আকাশে বেঁচে আছে। কিন্তু তাতে সান্ত্বনা কোথায় ?—

যে ব্যথা মুছিতে এসে পৃথিবীর মানুষের মুখে
আরো ব্যথা—বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে,—
ওগো' প্রেম,—সেই সব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে ! (ঐ)

যেখানেই প্রেম সেখানেই ব্যথা, যেখানে ব্যথা সেখানেই বিচ্ছিন্নতাবোধ। ব্যথাবিদ্ধ নিদ্রাহীনতা।

যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দিয়েছে। হরণ করেছে তার সৌন্দর্যবোধ আর নিসর্গ প্রেম। অধঃপতনের এই যুগে :

মনের নদীর পার নেমে আসে তাই সন্ধ্যাবেলা
সন্ধ্যার অনেক আগে !—দুপুরেই হয়েছি একেলা !
আমরাও চরি-ফিরি কবরের ভূতের মতন !
বিকালবেলার আগে ভেঙ্গে গেছে বিকালের মেলা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীর রয়েছে, তবু মরে গেছে আমাদের মন।
হেমন্ত আসেনি মাঠে,—হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়ের বন!
(জীবন-৭ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

আমাদের রক্তের ভিতর
বরফের মত শীত,—আগুনের মত তবু জ্বর!
(জীবন-৮ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এই পরিস্থিতিতে জীবনের দুর্লভ স্বপ্নের প্রহর বিলীন হবে নষ্ট মানবিকতায়—এটাইত স্বাভাবিক :

সমস্ত পৃথিবী ভ'রে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস
দোলা দিয়ে গেল কবে! বাসিপাতা ভূতের মতন
উড়ে আসে!—কাশের রোগীর মত পৃথিবীর শ্বাস,—
যক্ষ্মার রোগীর মত ধুঁকে মরে মানুষের মন! —
জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ।
(জীবন-১৬ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

'জীবনের চেয়ে' 'নিভৃত মরণ' 'সুস্থ'—যিনি তীব্র বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার শুধু তিনিই এরকম মন্তব্য করতে পারেন। 'বাসিপাতা ভূতের মতন উড়ে আসে' Shelley-র 'Ode to the West Wind'-র হেমন্তের 'the leaves dead/Are driven like ghosts from an enchanter fleeing'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। কবির মোহমুক্তি ঘটে গেছে। *রূপসী বাংলা*-য় তিনি বাংলার রূপ আর ধ্বংস প্রত্যক্ষ করেন পাশাপাশি। আবহমান বাংলার সৌন্দর্যের স্থায়ী রূপগুলিতে ক্ষয়ের আর ধ্বংসের অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রবেশ ঘটেছে : "যে শালিখ মরে যায়"-এ কবি বলেন :

যে শালিখ মরে যায় কুয়াশায়—সে তো আর ফিরে নাহি আসে;
কাঞ্চনমালা যে কবে ঝ'রে গেছে; ...
দেখে নাকি তারাবনে প'ড়ে আছে বিচূর্ণ দেউল,...
বিশুষ্ক পদ্মের দীঘি-ফোঁফরা মহলা ঘাট, হাজার মহাল
মৃত সব রূপসীরা : (রূপসী বাংলা)

কবি বিদীর্ণ চিত্তে দেখেন "রূপসী বাংলা" এখন "শ্মশানের' দেশ। তাঁর চারদিকে শূন্যতা—ধ্বনিত হারানোর করুণ ক্রন্দন। "আজ তারা কই সব?"-এ শোনা যায় এক বিচূর্ণ হৃদয়ের আর্তহাহাকার :

আজ তারা কই সব? ওখানে হিজল গাছ ছিল এক—পুকুরের জলে
বহুদিন মুখ দেখে গেছে তার; তারপর কি যে তার মনে হ'ল কবে
কখন সে ঝ'রে গেল, কখন ফুরাল, আহা,—চ'লে গেল কবে যে নীরবে
তাও আর জানি নাকো; —ঠোঁট-ভাঙ্গা দাঁড়কাক ওই বেল গাছটির তলে
রোজ ভোরে দেখা দিত—অন্যসব কাক আর শালিখের হৃষ্ট কোলাহলে
তারে আর দেখি নাকো—কতদিন দেখি নাই; সে আমার ছেলেবেলা হবে,
জানালার কাছে এক বোলতার চাক ছিল—হৃদয়ের গভীর উৎসবে
খেলা ক'রে গেছে তারা কতদিন—(রূপসী বাংলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ধরনের কবিতার মূলসুর ধ্বনিত Oliver Goldsmith-র "The Deserted Village", Charles Lamb-এর "The Old Familiar Faces", Thomas Moore-এর "The Journey Onwards", এবং "The Light of Other Days", ও Thomas Hood-এর "Past and Present"-এ। 'সে আমার ছেলেবেলা হবে'ত Lamb—এর "In my days of childhood" এবং Moore-এর "Of boyhood's years" (The Kight of Other Days)। এসব কবিতার প্রভাব প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া জীবনানন্দ Wordsworth-র "Yarrow Visited"-এর কথাও ভেবে থাকতে পারেন। এসব কবিতার স্মৃতি তাঁর সৃজনী মেধাকে সমৃদ্ধ করেছে। মানুষের প্রতি কবি আস্থা হারিয়েছেন অনেক আগে। যে বিধ্বংসী অভিজ্ঞতার অভিঘাতে কক্ষচ্যুত হয়ে তিনি রূপসী বাংলার রূপমুগ্ধতায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন পরম-প্রশান্তির প্রত্যাশায় সেখানেও দেখেছেন শ্মশানের আর ক্ষয়ের ছবি। তাঁর মানসলোকে হয়ে গেছে এক অভাবিতপূর্ব আমূল পরিবর্তন—না, মনুষ্য জীবন আর নয় ; মানুষের সঙ্গে আর কোনো বন্ধন, মানুষের সঙ্গে আর কোনো যুথচারিতার জীবন নয়। যদি আবার আসতেই হয় হৃদয়ের এই রূপসী বাংলায় তাহলে (আবার আসিব ফিরে) :

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হ'ব—(রূপসী বাংলা)

কিন্তু কবির বোধ হয় শিকারীর দোনালা বন্দুকের কথা মনে নেই। মনে নেই গুলির আঘাত এড়িয়ে ("মৃত্যুর আগে") বুনোহাঁসের ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়ায় কথা। *বনলতা সেন*-এর 'আমি যদি হতাম' কবিতায় তিনি হতে চেয়েছেন 'বনহংস' :

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি ;
কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে ;

দুটি হাঁস ফাল্গুনের চাঁদনী রাতে উষ্ণ-কোমল ঐকতানে পাখা মেলে দিত আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াবার আনন্দে। কিন্তু নিরাপত্তা কোথায়? এই নিভৃত নিরালার নির্মল নিসর্গেও তো 'হয়তো গুলির শব্দ', 'হয়তো গুলির শব্দ আবার'। বিচ্ছিন্নতা-বিপন্ন কবির কাছে এও বরং কাম্য—প্রতিদিন তিলে তিলে মরার চেয়ে একবারেই সব শেষ হয়ে যেত :

আজকের জীবনের এই টুকরো মৃত্যু আর থাকতনা ;
থাকতনা আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার ;

"আমি যদি হতাম" কবিতাটি স্পষ্টতই W.B. Yeats-এর ১৮৯১ সালে প্রকাশিত *The Rose* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত "The White Birds" কবিতাটি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই কবিতায় Yeats-এরও একান্ত অভিলাষ—"I would that we were, my beloved, white birds on the foam of the sea ! যুগযন্ত্রণা এবং জীবনযন্ত্রণা, জাগতিক এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং অনিত্যতার প্রেক্ষাপটে Yeats সময়ের এবং দুঃখের সীমা-অতিক্রান্ত অমরত্ব কামনা করেছেন সাদা পাখিতে রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

For I would we were changed to white birds on the
wandering foam : I and you!
I am haunted by numberless islands, and many a
Danaan shore,
Where Time would surely forget us, and sorrow came
near us no more ;
Soon far from the rose and the lily and fret of the
flames would we be,
Were we only white birds, my beloved, buoyed out on
the foam of the sea!

Yeats-এর মতো জীবনানন্দ ও 'Time', 'Sorrow' এবং 'fret of the flames' থেকে, এ জগতের নির্দয় মনুষ্যত্বহীনতা থেকে, 'বনহংস' হয়ে মুক্তির প্রার্থনায় নিজেকে সমর্পিত করেছেন এবং Yeats-এর মতোই কবিতাটি সমাপ্ত করেছেন প্রারম্ভিক কামনা দিয়ে :

আমি যদি বনহংস হতাম,
বনহংসী হতে যদি তুমি ;
কোন এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

অবশ্য "কমলালেবু" কবিতায় তিনি আবার মানুষ হিসেবে জন্ম নিতে চেয়েছেন রোগীর সেবা করার জন্য :

আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটি হিম কমলা লেবুর মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

কিন্তু এই পুনঃর্জীবনকামনায় কোনো উত্তাপ নেই, হৃদয়ের উষ্ণতাবিহীন এই কামনায় বরং পৃথিবীর সব ক্লান্তি, সব অবসন্নতা যুগের এবং জীবনের সব জ্বর একীভূত হ'য়ে অশুভ করে তুলেছে তার আগমন। 'হিম কমলালেবুর করুণ মাংস' নিয়ে আসবেন মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে। এই 'করুণ মাংস' আমাদের মৃত হরিণের মাংসের কথাই বরং মনে করিয়ে দেয়। জীবনকে বিদায় দিতে আসবেন, উজ্জীবিত করতে নয়। অথচ পাখি হয়ে আসতে তাঁর কি আগ্রহ।

যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ফলাফল কবির মনে মানবসমাজ ও সভ্যতার অবক্ষয় ও ধ্বংসের অমোচনীয় ছবি এঁকে দিয়েছে। "সবিতা" *(বনলতা সেন)* কবিতায় যুদ্ধ তাঁর কাছে 'এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন'। 'সুচেতনা' *(বনলতা সেন)* কবিতায়ও তিনি যে যুগজ্বর তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবোধের অবক্ষয়ী আবর্তে নিক্ষেপ করেছে তাঁকে চিহ্নিত করেছেন : "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'। পৃথিবীর অসুস্থতা সম্পর্কে এত সরাসরি বক্তব্য তিনি খুব কম কবিতাতেই দিয়েছেন। এই অসুখের একটি খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় *বনলতা সেন*-এর একটি কবিতা 'মিত ভাষণ'-এ :

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে ;
বড়ো বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা ;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সঙ্কল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সূর্যতামসী" কবিতাতেও যুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে :

অগণন মানুষের মৃত্যু হ'লে—অন্ধকারে জীবন ও মৃতের হৃদয়
বিস্মিতের মত চেয়ে আছে ;
(সাতটি তারার তিমির)

কবিতাটি চকিতে আমাদের Wilfred Owen-এর "Strange Meeting" কবিতাটির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে : যেখানে দুজন মৃত সৈনিক পরস্পরের মুখোমুখি হয়। মানুষ মানুষকে ধ্বংস করার জন্য আতঙ্কজনক সব অস্ত্র উদ্ভাবন করেছে। "রাত্রির কোরাস"-এ কবি জানান :

তুচ্ছ নদী—সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
র'য়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কনভয়,—
... ...
নগরীর—পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম
তবুও কেবলি ভেঙ্গে যায়
স্প্লিন্টারের অনন্ত নক্ষত্রে।
(সাতটি তারার তিমির)

এক অস্বাভাবিক অবস্থা করায়ত্ত করেছে বিভিন্ন মহাদেশকে :

পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ ;
পূর্ব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা ;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা ;
ইয়াঙ্কীর লেনদেন ডলারে প্রত্যয় ;—(ঐ)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকট এবং অবক্ষয় সমগ্র মানবজাতিকে আক্রান্ত করেছে। "উত্তরসামরিকী"-তে অঙ্কিত হয়েছে এর ভয়াল চিত্র :

একটি বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে নিভে গেছে প্রায়।
আমাদের আধো-চেনা কোনো-এক পুরোনো পৃথিবী
নেই আর। আমাদের মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবী
আসেনি তো।
(বেলা অবেলা কালবেলা)

একটি মৃত এবং অন্যটি অনাগত—বিশ্বাসের এই দুই পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে Matthew Arnold-এর নায়ক (Stanzas from the Grande Chartreuse) যে হতাশা-ক্লান্ত বিড়ম্বিত উচ্চারণ করেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে :

Wandering between two worlds, one dead,
The other powerless to be born,
With nowhere yet to rest my head,

জীবনানন্দেরও তো একই অবস্থা। অন্তর্জগতের বিচ্ছিন্নতাবোধের ক্ষেত্রে নিঃস্ব-রিক্ত এই কবিরও তো মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। বর্তমান পৃথিবী থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ; অন্য কোনো পৃথিবীর ঠিকানা তাঁর জানা নেই। যুদ্ধবাজেরা মানবিক আচরণ ও মূল্যবোধের কোনো রকম ধারই ধারে না। যারা অসহায় দলিত হয় বেশি তারা। "সময়ের তীরে" কবিতাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে এই দুঃসময় আর দুর্বিষহ অবস্থা :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে মাতাল সেনানায়কেরা
মদকে নারীর মত ব্যবহার করছে,
নারীকে জলের মতো ;
তাদের হৃদয়ের থেকে উত্থিত সৃষ্টিবিসারী গানে
নতুন সমুদ্রের পারে নক্ষত্রের নগ্নলোক সৃষ্টি হচ্ছে যেন ;
কোথাও কোনো মানবিক নগর বন্দর মিনার খিলান নেই আর ;
একদিকে বালিপ্রলেপী মরভূমি হু হু করছে ;
আর একদিকে ঘাসের প্রান্তর ছড়িয়ে আছে—
আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যের মতো অপার অন্ধকারে মাইলের পর মাইল।
শুধু বাতাস উড়ে আসছে ;
স্খলিত নিহত মনুষ্যত্বের শেষ সীমানাকে
সময়সেতুলোকে বিলীন ক'রে দেবার জন্যে,
উচ্ছ্রিত শববাহকের মূর্তিতে।
(বেলা অবেলা কালবেলা)

জগত ও জীবনের এটিও একটি বিধ্বংসী চিত্র। মনুষ্যত্ব নিহত, স্খলিত মানবিকতা এখন এক বিধ্বস্ত প্রান্তর—মরভূমি। কবিতার শেষে আশাবাদ ধ্বনিত হলেও শববাহকের মূর্তিই যেন থাকে প্রাধান্য বিস্তার করে। কেবল সুস্থ মানসিকতাই পারে বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রতিহত করতে। কিন্তু অন্তর্জগতে যে বিপর্যস্ত বিপন্ন এবং বহির্জগতেও যে কোণঠাসা, বৈষয়িকভাবে অসফল এবং সেজন্য দাম্পত্য জীবন পর্যন্ত বেদনা জর্জর, কবি হিসেবে যে বিলম্বিত স্বীকৃতির অনাদর পীড়িত তার পক্ষে বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা কঠিন। জীবনানন্দ মানসিকভাবে বেশ সবলও ছিলেন বলেই আশাবাদের পতাকাও উড়িয়েছেন, কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি, হয়তো বা বিচ্ছিন্নতাবোধের নিরাপদ অন্তঃপুর তাঁকে 'দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল'। কিন্তু জীবনের বিকারগ্রস্তরূপ তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। তিনি নিজেওতো এক ধরনের বিকারের শিকার—যেজন্য তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না স্বাভাবিকভাবে এবং জীবন সঙ্গীনী লাবণ্যও—যার লক্ষ্য স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন—মনের দিক থেকে অনেক দূরে।

"আট বছর আগের একদিন" কবিতাটিতে জীবনানন্দ জীবনের বিকারের সার্থক রূপকার। হতাশা আর আশাবাদের শীতল এবং উষ্ণ সহ-অবস্থানের ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে এই বিকার। আত্মহত্যার এমন অসাধারণ কাব্যিক ব্যবহার আজ পর্যন্ত সম্ভবত আর কেউ করেন নি। একটা মৃতদেহ অশ্বত্থ গাছের ডালে ঝুলেছিল :

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা ;
(মহাপৃথিবী)

'লাশকাটা ঘর' কি ভয়াবহ আর ভীতিপ্রদ ! এর যাবতীয় অনুষঙ্গ মনে শুধু হতাশাই জাগায়। একটি আকস্মিক সম্ভাবনা মনের দুয়ারে হঠাৎ উঁকি মারে : লাবণ্যর সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্বের চরম কোনো মুহূর্তে জীবনানন্দ কি আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন ?—

বধূ শুয়ে ছিল পাশে—শিশুটিও ছিল ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত ? ঘুম কেন ভেঙ্গে গেলো তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার। (ঐ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বধু পাশে শুয়ে ছিল, শিশুটিও ছিল। প্রেমও ছিল। আশাও ছিল। ছিল রাজ্যপাট, ক্ষমতার দীপ্ত জয়রথও। তবু সব ছেড়েছুড়ে গৌতম গেলেন নির্বাণের খোঁজে—এক ইতিবাচক অভিসারে। আর এই কবিতায়, একই পরিবেশে, জীবনানন্দের নায়ক সমর্পিত হলো স্বেচ্ছামৃত্যুর কোলে। একজন নিজের মুক্তির সঙ্গে নিয়ে এল বিশ্বমানবের মুক্তির বাণী ; হলো বুদ্ধ ; অন্যজন মৃত্যুর হিম শীতল স্পর্শের প্রশান্তিতে নীরব নিথর। "বিভিন্ন কোরাস" কবিতাটিতে বিকার বেশ তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে :

> একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
> তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোন মরণের কাছে।
>
> (সাতটি তারার তিমির)

> রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
> চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়? (ঐ)

এ কবিতাটিতেও আশাবাদ ও হতাশার অবস্থান। বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং যুথবদ্ধতার আত্যন্তিক দ্বন্দ্ব।

মেশিন-সভ্যতার প্রাধান্য কবিকে আতঙ্কিত করেছে। অসহায়ভাবে কবি লক্ষ করেছেন মানুষ জীবনের স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলেছে। মেশিনের প্রভু মানুষ আজ মেশিনের দাস। শান্তি পলাতক। মানুষ জীবনানুগ সব হৃদয়বৃত্তি ভুলে গেছে আর নিসর্গ থেকে হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন। কি ভয়াবহ অবস্থা !

> কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ ;
> বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
> নীড় নেই
> পাখির মতন কোনো হৃদয়ের তরে।
> পাখি নেই।
> মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
> ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল ব'লে
> আজ তার মানবকে কী ক'রে চেনাতে পারে কেউ।
> চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
> নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু
> মানুষ এখনো বিশৃঙ্খল।
> দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
> কেবলি আহত হ'য়ে মৃত হ'য়ে স্তব্ধ হয় ;
> এছাড়া নির্মল কোন জননীতি নেই।
>
> (জনান্তিকে : সাতটি তারার তিমির)

মেশিন এমনভাবে জীবনকে—মানুষকে—প্রভাবিত করছে যে মেশিনের সাথে সহযোগিতা করে মানুষ প্রকৃতিকে বিকৃত করে দিচ্ছে। কবি বলেন ('এইখানে সূর্যের')

> মানুষ ও মেশিনের যৌথ শক্তিবলে
> নীলিমাকে আঁটকেছে ইঁদুরের কলে।
>
> (শ্রেষ্ঠ কবিতা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেশিন-সভ্যতা প্রভাবিত পৃথিবীতে মানুষ নিজেরই নিজেদের থেকেই শুধু নয় প্রকৃতি থেকেও বিচ্ছিন্ন—যেমন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন কবি নিজে :

প্রকাণ্ড ধীমান এক দেবদার—বিবরের থেকে
প্রশান্ত বায়ুর শব্দ নাড়ে ;
'হে মানুষ' বলে সে ডাকেনা কোনো জনগণদের।
আমি ক্লান্ত প্রাণ আজ প্রলাপ পাণ্ডুর পৃথিবীতে ;
... ...
আজ এই পৃথিবীর
স্তূপীকৃত—অন্ধ—নির্বান্ধব—
লোহার শকটভরা আবিষ্ট মানব।
কিংবা আরো অশ্লীল তাহাদের শবঃ

(কালাতিপাত : অগ্রন্থিত কবিতা)

কবি নিজেই শুধু বিচ্ছিন্ন নন, প্রকৃতির মধ্যেও তিনি অবলোকন করেন বিচ্ছিন্নতাবোধ। প্রকৃতির মধ্যে একদা জীবনের যে ঐকতান ছিল তা আজ শুধু বিপন্নই নয়, বিলীনও বটে। সিংহ আজ সার্কাসের খাঁচায় বন্দী : 'স্থবির সিংহ এক—আফিমের সিংহ—অন্ধ—অন্ধকার।' কবির কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয় অমোঘ বিঘোষণ : (শীতরাত : মহাপৃথিবী)

সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
পাবে না আর
পাবে না আর।
বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খ'সে-খ'সে
চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ।
হে পৃথিবী,
হে বিপাশামদির নাগপাশ,—তুমি
পাশ ফিরে শোও,
কোন দিন কিছু খুঁজে পাবে না আর। (ঐ)

কবিও কি সিংহের মতো জীবন-সার্কাসের খাঁচায় বন্দী? বিচ্ছিন্ন বেঁচে থাকার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ থেকে? যুথবদ্ধ জীবন থেকে? প্রিয় পরিজন থেকে? নইলে কেন বলবেন—'এই সব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে'? (ঐ)

অতিমাত্রায় মৃত্যু সচেতনতাও বিচ্ছিন্নতাবোধের একটি লক্ষণ। বৈনাশিক জীবনজ্বর—যন্ত্রণাক্লান্ত বিচ্ছিন্নতাবোধাক্রান্ত, প্রেম-পীড়িত কবি কীটসও সব বেদনা উপশমকারী মৃত্যুর হাতে জ্বালাহীন সমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তি খুঁজেছেন :

...for many a time
I have been half in love with easeful Death,
Call'd him soft names in many a mused rhyme,
To take into the air my quiet breath ;
Now more than ever seems it rich to die,
To cease upon the midnight with no pain,...

(Ode to a Nightingale)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যভাবনার অন্যতম অন্তর্গত বিষয়ও ছিল মৃত্যুচেতনা। এই চেতনা নানাভাবে তাঁর কবিতায় বিধৃত হয়েছে। জীবনানন্দও মৃত্যুকে বিষয়বস্তু করে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন এবং অন্যান্য অনেক কবিতায়ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে। লেখালেখির প্রায় শুরু থেকেই মৃত্যু তাঁকে ভাবিত করেছে। তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছে। মরণকে নিশ্চিত জেনে, একটি অনিবার্য বাস্তব জেনে কিংবা 'জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে', যেমন 'আশার পিছনে ভয়'—একথা জেনে এবং প্রত্যহ কোথাও না কোথাও মৃত্যুর শোকাবহ ঘটনা দেখে বা খবর শুনে আলোড়িত মন অনুভূতির তরঙ্গাভিঘাতকে কথার শৈল্পিক বাঁধনে বেঁধে রাখতে চায়। আর যিনি জীবনে অতিষ্ঠ, রূঢ় বাস্তবতার দ্বারা নির্যাতিত, স্বপ্ন ও আশা ভঙ্গের বেদনায় চৌচিরহৃদয়, সবচেয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের শূন্যতায় নিপীড়িত, বিভিন্ন সমস্যা দ্বারা নিরন্তর তাড়িত তিনি মৃত্যুকে মুক্তির অমোঘ দুয়ার হিসেবে বরণ করতে পারেন। জীবনানন্দ হয়তো এসব কারণের সবগুলি দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কোনো কোনো কারণ হয়তো তার মর্মমূল স্পর্শ করেছে। জীবনের একটা পর্যায় গিয়েছে যখন একটা দ্বান্দ্বিক ব্যাকুলতায় মন দ্বিধাবিভক্ত, তখন মৃত্যু-বিষয়ক প্রথম কবিতা "জীবন-মরণ দুয়ারে আমার"-এ তিনি বলেন :

জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, কারে যে বাসিব ভালো
একা একা তাই ভাবিয়া মরিছে মন।

(ঝরা পালক)

"শ্মশান" *(ঝরা পালক)* কবিতায় চির-মৃত্যু'র...মৌন শ্মশান'কে ঘিরে তার ভাবনা-কল্পনার জাল বিস্তৃত হয়। মৃত্যুই পরিবর্তনের, পালাবদলের ধারক ও বাহক—

নতুন আকাঙ্ক্ষা আসে—চ'লে আসে নতুন সময়,—
পুরানো সে নক্ষত্রের দিন শেষ হয়,
নতুনেরা আসিতেছে ব'লে !—

(নির্জন স্বাক্ষর-ধূসর পাণ্ডুলিপি)

জীবনানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি এখনও ইতিবাচক। এই পংক্তিনিচয় পাঠকদের Tennyson-এর কবিতা Morte D' Arthur"-এর "The old order changeth, yielding place to new"-এর কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। কিন্তু "অবসরের গান"-এ কবি মৃত্যুকে একটি কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথ ব'লে মনে করেছেন :

সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে
শহর-বন্দর-বস্তি-কারখানা দেশালইয়ে জ্বেলে
আসিয়াছি নেমে এই ক্ষেতে ;
শরীরের অবসাদ—হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।
শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভিজা পথ ধ'রে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই ম'রে
দিনের আলোয় নীল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন ;

(ধূসর পাণ্ডুলিপি)

'শরীরের অবসাদ' এবং 'হৃদয়ের জ্বর'-এ কবি তখনই আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আর কখনো তিনি বিরাম লাভ করেন নি : অন্তর্জগত এবং বহির্জগত—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটোতেই একটানা বসবাস করে গেছেন দয়াহীন দুঃসময়ের সঙ্গে। *রূপসী বাংলা*-র কবিতাগুচ্ছে এর স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি। যেমন "যতদিন বেঁচে আছি"-তে—

> পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে
> ধান সিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব ব'য়ে,

এ গ্রন্থের অনেক কবিতায় তিনি মৃত্যুর কথা বলেছেন, মৃত্যুর পর কি হয়ে এই বাংলায় ফিরে আসার সাধ তা বলেছেন, বাংলার অন্তহীন বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ নিসর্গ-প্রীতির কথা বার বার আবেগঘন উচ্চারণে পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করেছেন, কিন্তু প্রিয়পরিজন বা অন্যান্য নিকটজনের, বন্ধুবান্ধবের বা আর কোনো মানুষের কোথাও কোনো উপস্থিতি নেই। যেমনটি পাওয়া যায় নি 'মৃত্যুর আগে' কবিতায়—কবি পাখ-পাখালির ডাকের স্মৃতি বুকে ধারণ করে পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নিয়েছেন। এখানে তিনি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিসর্গ সংলগ্ন এবং যুথবদ্ধ- জীবন বিচ্ছিন্ন। এ গ্রন্থের আরও কয়েকটি কবিতা দেখা যেতে পারে—"যেদিন সরিয়া যাব"।

> যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়
> চ'লে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
> ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে ; ... ...
> ... ...
> সেদিন র'বেনা কোন ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা ঘাসের ধূলায়
> জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—

"ঘুমায়ে পড়িব আমি"—

> ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে
> শিয়রে বৈশাখ মেঘ—
> —কোন এক শঙ্খবালিকার
> ধূসর রূপের কথা মনে হবে... ... ...
> ... ...
> পাঁচশো বছর আগে হয়তো বা—সাতশো বছর
> কেটে গেছে তারপর তোমাদের আম জাম কাঁঠালের দেশে ;

"ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন"

> ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে ;
> ... ...
> শালিখ খঞ্জনা আজ কতদূর ওড়ে—
> কতখানি রোদ-মেঘ—টের পাব শুয়ে শুয়ে মরণের ঘোরে।

"যখন মৃত্যুর ঘুমে"

> যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে রবো—অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে
> কাঁঠাল গাছের তলে হয়তো বা ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে—

"যদি আমি ঝ'রে যাই"

> যদি আমি ঝ'রে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়
> যখন ঝরিছে ধান বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে ম্লান চোখে বুঁজে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মনে হয় একদিন"

মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিব না আর ;
দেখিবনা হেলেঞ্চার ঝোপ থেকে এক ঝাড় জোনাকি কখন
নিভে যায় ;

"একদিন কুয়াশায়"

একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবেনা কেউ খুঁজে আর, জানি ;
হৃদয়ের পথ–চলা শেষ হল সেই দিন—

রূপসী বাংলা–র "এই সব ভাল লাগে" কবিতাটিতে জীবনানন্দ বোধ হয় তীর্যকভাবে লাবণ্যর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মূল্যায়নমূলক উল্লেখ করেছেন যা তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধের উপর আলোক–পাতকে গভীরতর করে। এটির সঙ্গে তুলনীয় একটি কবিতাও চোখে পড়ে নি। লাবণ্য সম্পর্কে কোনো বিতর্কে না গিয়েও একথা বলা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে যে ঘর–গেরস্থালীর প্রতিদিনকার ঝক্কিঝামেলার যে ঝড় লাবণ্যকে ভীষণ অভাব অনটনের সংসারে সহ্য করতে হতো জীবনানন্দ তার কতটুকু খবর রাখতেন? নিতান্ত অশৈল্পিক হলেও একথাত নিরেট সত্য এবং রূঢ় বাস্তব যে খালি পেটে বেশি সময় কবিতাও লেখা যায় না এবং শুধু কবিতায় সব সময়ে সংসারে স্বচ্ছলতা বা স্বাচ্ছন্দ্য আসে না। তবু দেখা যাক জীবনানন্দ তাঁর মূল্যায়নে কি বলেছেন—

(এই সব ভালো লাগে) : জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে
আমাদের ঘুমাতে দেখে বিছানায়,—আমার কাতর চোখ, আমার বিমর্ষ ম্লান চুল—
এই নিয়ে খেলা করে : জানে সে যে বহুদিন আগে আমি করেছি কি ভুল
পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালবেসে,
পউষের শেষ রাতে আজো আমি দেখি চেয়ে আবার সে আমাদের দেশে
ফিরে এল ;

পরোক্ষ হলেও এখানে লক্ষ করা যায় অন্তর্জগতের নিরন্তর যন্ত্রণার জ্বালামুখের এক অবাধ উন্মোচন। জীবনানন্দ শেষ পর্যন্ত এ উপলব্ধিতে বিমথিত হলেন যে তাঁর ভালবাসায় ভুল ছিল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। বাকি জীবন এ ভুলের সঙ্গেই তাঁকে বসবাস করতে হয়েছে। বাধ্য করেছে পারিবারিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাও। তাই সেই 'কাতর চোখ' সেই রূপসীকে দেখে আর কখনো খুশির আলোকে ঝলমল করে উঠে নি। 'বিমর্ষ ম্লান চুলেও বয়নি বসন্তের প্রফুল্ল বাতাস। 'কাতর চোখ' *বনলতা সেন*–এর 'শঙ্খমালা'য় কবির 'নীলাভ ব্যথিত' 'চোখের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানেও কবি গভীরভাবে আত্মজৈবিক। হৃদয়ের একটি ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে দেখা যায় ভেতরে কি যন্ত্রণার আগুন জ্বলছে অহরহ। ভয়াবহভাবে। 'জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালী রোদ এসে আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়' লাইনটি সম্ভবত John Donne-এর "The Sunne Rising" কবিতার 'Busie old foole, unruly Sunne, Why dost thou thus, Through Windowes, and through curtaines call on us?" পংক্তিগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত।

"অবসরের গান"–এর *(ধূসর পাণ্ডুলিপি)* মধ্যেও কবি পৃথিবীর সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুর মধ্যেই খোঁজেন মুক্তি। যশের প্রতিও তার কোনো লোভ নেই। 'শরীরের অবসাদ' আর 'হৃদয়ের জ্বর' মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছাড়া ভোলা সম্ভব হচ্ছে না কবির পক্ষে। চরম পথ। কিন্তু জীবন থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন হলে, জীবনকে কতখানি বিতৃষ্ণার, উপেক্ষার, আর জগতকে কতখানি বসবাসের অযোগ্য মনে করলে কবি বলতে পারেন, তিনি মাছির মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরতে চান। কোনো বীরত্বের জয়গাথা নেই, নেই কোনো উত্তেজনা। পশুদের জীবন কত দায়মুক্ত : অবসাদ নেই, জীবনজ্বর নেই, হৃদয়ের জ্বর নেই। কাজ থেকে ছুটি পেলে নিরুপদ্রপে ঘাস খায় :

যেন কেন ব্যথা নেই পৃথিবীতে,—আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি?
'কেন মৃত্যু খোঁজো তুমি?' চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ।

(নিরালোক : মহাপৃথিবী)

দুঃসহ ক্লান্তির ভারে তিনি জীবনে বেঁচে থাকার সব আশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি কি "আট বছর আগের একদিন"-এর নায়কের মতো আত্মহননের পথ বেছে নেয়ার কথা ভেবেছেন? কারণ—

লাশ কাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;

কবির মনে বোধ হয় আত্মহত্যার বিষয়টি উঁকি দিয়ে গেছে। জীবনযুদ্ধে কতখানি ক্লান্ত হলে, হতাশার কত গভীরে নিক্ষিপ্ত হলে, নিজেকে কতখানি বিপন্ন-বিচ্ছিন্ন মনে করলে মানুষ এরকম চিন্তার চোরাবালিতে খাবি খেতে পারে জীবনানন্দ তার একটি অত্যন্ত করুণ উদাহরণ।

যে ট্রামের ধাক্কায় শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দের জীবন প্রদীপ নিভে যায় সেই ট্রাম লাইন নিয়ে লেখা 'ট্রামের লাইনের পথ ধরে' কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধ, জীবনের অকিঞ্চিতকরতা, তুচ্ছতা, গ্লানি, অর্থহীনতা সবই প্রকটিত হয়েছে এক করুণ হৃদয়বিদারী আর্তির দীর্ঘশ্বাসে :

ট্রামের লাইনের পথ ধরে হাঁটি : এখন গভীর রাত
কবেকার কোন সে জীবন যেন টিটকারী দিয়ে যায়
'তুমি যেন রড ভাঙ্গা ট্রাম এক—ডিপো নাই, মজুরীর প্রয়োজন নাই
কখন এমন হলে হায়!'
আকাশে নক্ষত্রে পিছে অন্ধকারে
কবেকার কোন সে জীবন ডুবে যায়।

(অগ্রন্থিত কবিতা)

জীবনানন্দের জীবন অন্তর্জগতে বিচ্ছেদের ও বিচ্ছিন্নতার হাহাকারের—

আশা নয়—সাধ নয়—প্রেম স্বপ্ন নয়
চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়;

(পাখি : অগ্রন্থিত কবিতা)

শুধু যে কবিতাতেই জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রকট তা নয়; তাঁর চিঠিপত্রে, বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসেও তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এক্ষেত্রে সবার আগে সম্ভবত তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস *কারুবসনা*-র নামই উল্লেখ করতে হবে। এই উপন্যাসের নায়ক জীবনজ্বরে আক্রান্তত বটেই, বিচ্ছিন্নতাবোধে একেবারেই বিপর্যস্ত। এই উপন্যাসের বহুকিছুর সঙ্গে জীবনানন্দের জীবনের বহুকিছুর প্রায় নির্ভুল মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসের শুরুতে স্টেশনে দেখা বইয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে : "ছেঁড়া-খোড়া মালিকের সঙ্গবিহীন গ্রন্থিহীন জীবনের জর্জরতার অপরাধ এদের চোখে মুখে।" এই বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ একারণে যে উপন্যাসটি শেষ করার পর দেখা যায় যে এটিতে নায়কের জীবনও প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসের এক জায়গায় নায়ক বলেন : "কিন্তু সংসার ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষদের জীবনের পদ্ধতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে কোথাও না কোথাও সম্পূর্ণ [ভিন্নতা] ও জটিলতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি আমি।" আরেকটি উদ্ধৃতি উপন্যাসটিতে জীবনানন্দের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণাকে আরও প্রগাঢ় করবে—"কার বাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ই শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা, পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখ, লালসা, কলরব, আড়ম্বরের ভিতর কল্পনা ও স্বপ্ন চিন্তার দশ্ছেদ্য অঙ্কুরের বোঝা বুকে বহন করে বেড়াবার জন্মগত পাপ। কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে। আমার সংসারকে ভরে দিয়েছে ছাই-কালি-ধূলির শূন্যতায়। যে-উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্কোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা স্বরাজ পার্টি গঠন করতে পারত, কিংবা কংগ্রেস, অথবা একটা মোটর কার, কিংবা একটা নামজাদা বই, বা চায়ের দোকান, অথবা একজন অক্লান্ত কর্মী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যবসায়ী উকিলকে, কিংবা সচ্চরিত্র হেড মাস্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে [সেই] আকাঙ্খা-উদ্যম নেই আমার।"

জীবনানন্দের গল্পেও বিচ্ছিন্নতাবোধের স্বাক্ষর রয়েছে। "নিরুপম যাত্রা" গল্পটির কথাই ধরা যাক। এ গল্পে নায়কের বিচ্ছিন্নতাবোধ এতই প্রকট যে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর পর নায়কের শবদাহ নিয়েও সঙ্কট দেখা দেয়। গল্পটি থেকে তিনটি উদ্ধৃতি বিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণাকে সুস্পষ্ট করবে : "বিছানাটা বাঁধতে-বাঁধতে ভাবল—এ পাঁচ বছর জীবনটাকে নেড়েচেড়ে দেখলাম, সংসারে যারা সফল হবে তাদের জাত আলাদা : ভালোবাসার চেয়ে সফলতাকেই তারা ভালবাসে বেশি—আমার ঠিক উল্টো, প্রেম, দাক্ষিণ্য, মমতার, ঘরানা গন্ধেই তৃপ্তি !" "সারারাত ছট-ফট করে সকালবেলা যখন সে মারা গেল তখন তার অসুখের খবরও কেউ জানে না—"। "প্রভাতের রুদ্ধ ঘরে মাছির ভনভনানি, অসহ্য গুমোট ও মশা এক-এক সময় মৃতের পক্ষেও যেন অসহ্য হয়ে ওঠে—"।

এভাবে দেখা যায় যে জীবনানন্দর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। কবিতা, উপন্যাস এবং গল্পে ও চিঠিতে বিচ্ছিন্নতাবোধের কালোছায়া জীবনানন্দের জীবনের একটি করুণ দিককে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে উদঘাটিত করেছে।

তথ্যপঞ্জি

১. এই নিবন্ধের ৩ নং সেকশনের সব উদ্ধৃতি এবং জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য দেখুন সৈয়দ, আবদুল মান্নান : "অপরূপ সিন্দুকের ডালা খুলে যাচ্ছে কবি জীবনানন্দ দাশের অজানা জীবন কাহিনী", *পূর্ণিমা*, ঈদ সংখ্যা, ১৯৯৯, দ্বাদশ বর্ষ ১৮-১৯, পৃ. ৩০-৩৯

২. এই নিবন্ধে জীবনানন্দ দাশের কবিতার সব উদ্ধৃতির জন্য দেখুন সৈয়দ, আবদুল মান্নান (সংকলিত ও সম্পাদিত) : *প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ*, প্রকাশক—অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, বৈশাখ ১৪০১, এপ্রিল ১৯৯৪-দ্বিতীয় প্রকাশ

৩. চিঠিপত্রের উদ্ধৃতি ও কিছু তথ্যের জন্য দেখুন *বিভাব*, জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল), কলকাতা-৬৮, পৃ. ৪৩৯, ৪৫৬, ৪৬০, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৭

৪. উপন্যাস এবং গল্প থেকে উদ্ধৃতির জন্যে দেখুন *জীবনানন্দ সমগ্র* তৃতীয় খণ্ড, *করবাসনা* প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০১৩, পৃ. ১, ৩৭ ; বড় গল্প—নিরুপম যাত্রা, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭

৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা থেকে উদ্ধৃতির জন্য দেখুন *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ*, ভূমিকা বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩, পুনর্মুদ্রণ : ১৩৯১ অগ্রহায়ণ, ডিসেম্বর ১৯৮৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার নির্মাণশৈলী

জীবনানন্দ দাশের অনতিক্রান্ত নেপথ্য দৃষ্টি

মনিরুজ্জামান

এক ॥ প্রাক-কথন

শিল্প মাত্রেই আলোছায়ার খেলা। দুই বিপরীত উপস্থাপনা নিয়েই সাহিত্য ও শিল্পের লুকোচুরির বাঁধনা। এর সহজ উদাহরণ শিল্পে যেমন লাইট এন্ড শেড, কিংবা লাল এবং কালোর ব্যবহার ; সাহিত্যেও তেমনি আশার আলো ও নৈরাশ্যের বেদনা বা পীড়ন, সুখ-দু:খ, জীবন-মৃত্যু প্রভৃতির নাটকীয় উদ্ভাসন, পরিচিত্রণ। এর বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যের বর্ণনা পাই জীবনানন্দ দাশের কবিতায়—তাঁর বৈপরীত্যিক ভাব ও চিত্রছায়ার নানা দ্বৈততায়, যথা—'অফুরন্ত রৌদ্রের তিমির', 'সজন ও নির্জন', 'অনন্ত সূর্যের অস্ত', 'ধূসর দীপ', 'কত কাছে তবু কত দূর', 'আকাশ আরো নীল করে দিয়ে গেছে ধবল ডানার ফেনা।'—ইত্যাদি। জীবনানন্দ এ দুয়ের অধিকল্পী দ্বিবিধতার সম্পর্ক বুঝেছিলেন আত্ম-ঘনিষ্ঠতার ভিতরে, যেমন—'আলোর রহস্যময়ী সহোদরের মতো এই অন্ধকার।' আর এখানেই লক্ষ্য করেন তিনি সেই জটিলতার গ্রন্থি—যার উন্মোচন-প্রয়াসী কবি জীবনানন্দ দাশকে তাই কেবল অন্ধকার বিদিশার নিশা, কুয়াশা, গোধূলি, রৌদ্রের গন্ধ কিংবা জোনাকির আলো বা জ্যোৎস্না ও শিশিরের কবি বলা যাবে না,—আরও নানা 'বিপন্ন বিস্ময়'-এর কবিও তিনি। দ্বন্দ্বই শুধু নয়, 'দ্বন্দ্বোত্তরণ'ও তাঁর অনেক কবিতায় স্পষ্ট,—*বনলতা সেন* (১৯৫২) কাব্যের 'সুচেতনা' কবিতা থেকে তাঁর এই নব অভীপ্সা একেবারে শেষ অবধি জাগরুক। অরুণ সেন তাই 'মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প' কবিতা থেকে (*বেলা অবেলা কালবেলা* ১৯৩৪/১৯৬১) শেষ অংশটুকু উদ্ধৃত করে ('ফ্যাক্টরির সিটি এসে ডাকে যদি ...') প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবের উপকরণে তাঁর কবিতা যখন পরিকীর্ণ, ... জীবনের সংঘাতের মুখোমুখি তিনি নিজেরই মতো করে, তখন কী ভাবেই বা অস্বীকার করা যাবে এই কবির আত্মবিস্তারের মাহাত্ম্য ?'

বস্তু সত্যের বৈপরীত্য ও dichotomy-এর অভিঘাত কবি মনে প্রতিক্রিয়া আনে। জীবনানন্দের বেদনা প্রধানত 'ক্লান্তি' ও 'স্বপ্নাচ্ছন্ন বোধ'—দ্বয়েই বিলসিত ও নিষ্ক্রান্ত,—অন্যান্য প্রকাশ খন্ডিত, তাৎক্ষণিক। বেদনাই তার আলম্বন ও সঞ্চারীভাব। (তুং : 'যে ব্যথা মুছিতে এসে পৃথিবীর মানুষের মুখে/আরো ব্যথা—বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে,—/ওগো প্রেম,—সেই সব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে।' অথবা 'আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।') আচম্বিতে বাল্মিকী যেমন শোকাভিভূত হলেন ক্রৌঞ্চযূথের একটির শরাহত মৃত্যুতে ও মিথুন-বিরহিনী সহচরী ক্রৌঞ্চীর প্রান্তর শোকাকুলাকর ক্রন্দন-আরাবে,—যখন তিনি শব্দ-বিহ্বল হলেন (বলা চলে শব্দ-বন্দী হলেন ছন্দাঘাতী করুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষ্ক্রমণে),—তিনি কবি হলেন। কিন্তু আদি কবি যা বুঝেছিলেন,—আত্মকৃত করে, ছন্দীকৃত ভাবআত্মদহনে প্রোজ্জ্বলিত করে ও গীতরসে সিঞ্চিত করে,—তার সেই প্রকাশ নির্মাল্যের নিভৃত বেদন, তার শায়খ বেঁধা চরণ ও শব্দের অবিস্মরণীয় সংঘাত ভাষ্যকারদের বোঝার অগম্য হয়ে উঠলো নিগূঢ় রহস্যের আঁধারে। ভাষ্যকার বা সমালোচক ('চোখে তার অক্ষক পিচুটি/ বেতন হাজার টাকা মাসে') আজও বলে দিতে অক্ষম কেন কবিতা অকারণ বেদনা-জাত ('তাই লাশ কাটা ঘরে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে'), কেনই বা কবিতার বাক্য শৃঙ্খলা, শব্দ অনুষঙ্গ, সাযুজ্য (তুং. 'আকাঙ্ক্ষার রক্ত অপরাধ') চিরদিনই জিজ্ঞাস্য হয়ে থাকে?

কবি সমালোচক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন—'তাঁর (জীবনানন্দের) কবিতায় অনেক শব্দের মানে নেই, মানে হয় না, কিন্তু প্রতিটি শব্দই অবধারিত।' অভিনিবেশিত পাঠ থেকেই প্রশ্ন তুললেন তিনি,—'জীবনানন্দ দাশ ভুলছন্দ লিখতেন কেন।' হাজারো 'কেন'-ই তো সেই কোবিদ-ফসল।—না, এই কেন'র কোনও উত্তর নেই, হয় না।—কবিতা এমনই।

দুই।। প্রশ্নাধিক প্রশ্ন

কবিতার প্রধান অস্ত্র তার শব্দ। চেনাশব্দ, অচেনাশব্দ, বিদেশী শব্দ এবং শব্দ প্রসঙ্গতি। [দ্রষ্টব্য, ৫.০] কিন্তু, 'নরম নদী', 'নরম ঘাসের আলো', 'ঘাসের পাখনা', 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ', 'শিশিরের শব্দ', 'বঙ্গোপসাগরের কালো বাতাস',—এসব? অথবা—'বিমনা' ; 'বিয়োবার কাল', 'ফুটাতেছে', 'তাহারে,' 'উহারে', 'যেই',—ইত্যাকার শব্দ? ১৩৩৬ সালে 'প্রগতি' পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশের খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে তাই প্রশ্নটা ছিল গভীর। আবার একই শব্দও কবি কতবার লেখেন অথচ দুই ব্যবহারে পার্থক্য ঘটে যায় তাতে দারুণ। অন্য কবির থেকেও ভীষণ আলাদা রকম হয়ে যায় সেই ব্যবহৃত শব্দরূপ। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, 'জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ যে জটিল মানসগ্রন্থি উন্মোচনের জন্য কবিতায় অব্যয় ব্যবহার করেছেন, সুকান্ত সেই জটিল মানসগ্রন্থি উন্মোচনের জন্য কবিতায় অব্যয় ব্যবহার করেন নি ; অব্যয় ব্যবহারের জন্য সুকান্তর কবিতা অযথা জটিলতা-আক্রান্ত হয় নি।' ধ্রুব মুখোপাধ্যায় বলেন—"জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত 'তবু' অব্যয় জীবনের দুই বিপ্রতীপ জটিল ভাবনা পরম্পরাকে যেন ব্যক্ত করে।" অশ্রুকুমার দেখিয়ে দিলেন "('তাই/লাশ কাটা ঘরে/ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে...') মারাত্মক এই বিচ্ছিন্ন 'তাই' অব্যয়ের ব্যবহার। কোনো কারণ নেই, 'তাই' কার্য ঘটেছে।"

জীবনানন্দ কি তবে দুর্বোধ্য কবি শিবিরের একজন? তাঁর '*সাতটি তারার তিমির*' কোনও প্রশ্ন চিহ্ন নয়, বরং বিস্ময় তো বটেই,—'বিপজ্জনক দুরূহতাও'। অশোক মিত্রের ভাষায়, 'সে অর্থ, দুঃখের বিষয়, কোনো আপাত দার্শনিক সন্ধাভাষায় আচ্ছন্ন।' তেমনি বনলতা সেন পূর্ণনাম, পদবীতেও সম্পূর্ণ, তবু যে কেন চেনা যায় না এ রহস্য কে বোঝাবে? ['ছায়াপিন্ড দিল না উত্তর']-অজর অক্ষর অধ্যাপক বা সমালোচক কবির (জীবনানন্দের এবং প্রায় সকল কবিরই) করুণার পাত্র হলেও কবিতার সার্থকতা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সংকট সৃষ্টি করেন তাঁরাই। জীবনানন্দ দাশ তাই জীবন এবং সমালোচকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েও কবিতাকে হৃদয়ে ধারণ করেন—

'আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
তবুও হৃদয়ে গান আসে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি ও ভাষ্যকার বা সমালোচকের এই পার্থক্য যুগান্তরের। তারা বোঝেন না যে কবিরা ব্যাখার অপেক্ষা করেন না। সমালোচক বলেন কবি ব্যাকরণহীন, অভিধান–অমান্য। কিছুই বোঝা যায় না। সমালোচক আবদুল হক লক্ষ্য করলেন, 'কবিতা যত প্রাচীন ততো আয়াস সাধ্য, আর যতো আধুনিক ততো অনায়াস সাধ্য হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।'—অর্থাৎ ব্যাপারটা সেভাবে ঘটে নি। তিনি দেখলেন, 'আগের কবিতা আর আগের দিনের কবিতাই ভাল, এখনকার কবিতা কঠিন, দুর্বোধ্য, দুরূহ।' এই পরিপ্রেক্ষিতে কবি জীবনানন্দের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ—'*বনলতা সেন* এবং তার পূর্বে এবং পরেও কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর কাব্যে পর্যাপ্ত অর্থনির্মলতা ছিল। সে-প্রসাদ ইদানিং লুপ্যমান।' ['*কবিতা*'-পত্র থেকে উদ্ধৃত]–এরই বা কারণ কি?

আসলে কবিতার ভিতরেও বদল ঘটছে। প্রমথ বিশীর কথা মনে পড়ছে, তিনি বলেছিলেন, 'তখনকার সাহিত্য একটা ভারতীয় [প্রাচ্য?] বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই ছোটখাট ব্যাপারগুলি বাদ দিলে মোটামুটিভাবে তা Urbanity গুণে পৌঁছতে পেরেছিল। এখন বৈদেশিক প্রভাব বেড়েছে কিন্তু পূর্বতন Urbanity গুণ তাতে বিরল, বড় জোর তাঁকে Sub-urban বলা যেতে পারে।' কবিতার স্বভাব বদলের এটাই কি কারণ? জীবনের গতির প্রসঙ্গটা কি গৌণ,—ব্যক্তিত্বের তীব্রতা, একাকীত্বের প্রকটতা, স্বাধীনতা এসব কি অর্থময় নয়? নাকি সমগ্রতার খণ্ডনেরই প্রকাশ এগুলি? অখণ্ডকে পুননির্মাণ বা খন্ড থেকে অখন্ডতামুখী প্রস্থানেই কবির গন্তব্য, নাকি Rituality—আনুষ্ঠানিক কৃত্যমাত্র?

তিন ॥ 'লাশকাটা ঘর'

বস্তুত আধুনিক সাহিত্যের যে রূপ ও তাতে যে সংকটের প্রকাশ আমরা দেখি তা এক মহা ট্র্যাজেডির বিষয়। এ সাহিত্য বিবিক্ত, নির্বেদ এবং মানুষও আজ ক্ষুদ্র গণ্ডির স্বার্থ ও নির্জন একাকীত্বের সর্বনাশকে জীবিকা করেছে। কবিতা মন আজ অনেক কিছুকেই পরিত্যাগ করেছে সেই কৃচ্ছসাধনের বিলাসে। সময়ও কবিতাকে আঘাত করেছে যত্রতত্র। আমাদের সময়ে বাংলাদেশে কবিতার সবচেয়ে দু:স্বপ্নের কাল ছিল আইউবী দশকে যখন রবীন্দ্র–চর্চা নিষিদ্ধ করেছিল তাঁবেদার সরকার এবং ধ্বনি বিজ্ঞানী প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাইকে 'রবীন্দ্রসংগীত রচনা' না করায় সেই প্রশাসনের নিন্দাগঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল। প্রমথ বিশীর সেই উক্তিটি আজও স্মরণযোগ্য :

> 'কোন একনায়কতন্ত্রের দেশে রবীন্দ্র–সাহিত্য যেমন সম্ভব নয়, তেমনি গণতন্ত্র লোপ পাইলে রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্য ও মর্যাদার হানিও অনিবার্য। রবীন্দ্রসাহিত্য বলিতে যে ভাব–সমষ্টি আমরা বুঝি তাহার মূলে আছে গণতন্ত্র ও উদার শিক্ষা।'

কবিতার মূল্য এই মানসিক ঔদার্য ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ দাবি করে। যতদিন মানুষ তাকে উদারভাবে ও স্বাভাবিকতার মধ্যে নিতে চাইবে ; জীবনযাত্রা ব্যাহত না হলে কবিতাও ততদিন থাকবে। কাব্যং সজীবতি। কবিরা কবিতায় নতুন অর্থ দেবে, নতুন মানুষের ভাবনাগুলিই রূপময় হয়ে উঠবে নতুন দিনের নতুন কবিতায়। তবে বর্তমানও অবহেলার নয়, কবিরা বর্তমানকেই উপজীব্য করে কবি হন—'ভবিষ্যতের নই নবী' এই অংহকারী আত্মপ্রতিষ্ঠ কবি–উক্তি শুধু নজরুল কেন, বুদ্ধদেব বসুও তাঁর *কালের পুতুলে* সজোরেই ঘোষণা করেছেন।

কবি, কবিতা ও কবিতার অর্থ প্রসঙ্গে এর অধিক বলার থাকে না। অবশ্য ভাষার প্রসঙ্গ এর সাথেই জড়িত। ভাষা স্বয়ম্ভু নয়, স্বাধীন নয়, স্থিরও [Static] নয়,—সে পরিবেশ কাতর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবেশ নির্ভর। ভাষার জন্য সমাজ নয়, সমাজের জন্য ভাষা। কবিতা যে সমাজে বাঁচে, বৃদ্ধি পায়, আধুনিক হয়, সর্বাজনীনতা লাভ করে,—ভাষা সে সমাজের চাহিদার ফসল। কবিতার আবেদন নঙর্থক হলে তার ভাষাও আবেদন শূন্য, তাৎপর্যহীন ও নীরক্ত হয়। দুর্বোধ্য ভাষা বলে স্বতন্ত্র ভাষা নেই, ওটা ভাষা ব্যবহারের 'কৃত্রিমতা' ও একটা 'ভাষা-সংকট।' সুতরাং [বিশেষত] কবিতাকে কোটরাগত করার অপকৌশল। আবদুল হক ঠিকই বলেন—'দুর্বোধ্যতার বিলাস কবিতার পক্ষে প্রায় আত্মহত্যারই শামিল।' তিনি উল্লেখ করেন,—'মুনাফাসর্বস্ব স্থূল আনন্দকামী সমাজে সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতির পরিসর কতটুকু?' এবং প্রশ্ন করেন,—'কবিতা কি তার এই সংকীর্ণ পরিসরকে সংকীর্ণতর হতে দেবে দুর্বোধ্যতার মোহে?'

অবশ্য কৌশলাকৃত অর্থগূঢ় কবিতাও সমাজের প্রয়োজন হয়, হতে পারে, যেমন হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য-তাড়িত বৌদ্ধসমাজে—চর্যাপদে, যেখানে সন্ধাভাষার ব্যবহার ছিল খুব আবশ্যিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তার নামকরণ হয়েছিল সহজিয়া কাব্য। পদাবলী ছিল এই ভাষাগূঢ়তা-রোধী, অথচ অধ্যাত্ম ধারার ভিন্ন কাব্য। ধর্মের ভিত্তি ও দেবকল্পনা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকলে মানুষের কথা উঁকিঝুঁকি দিতে থাকলো, তখনি কবি বললেন,—

'অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল'।

ভাষার লোকজ আহরণ, অতীতিক প্রত্যাবর্তন, বৈদেশি তন্তুবায়ন এসবই তিরিশী কবিতার চারিত্র্যফল। এই পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দের কবিতার শান্ত পেলব উজ্জীবন বাংলা কবিতার আর এক মাইলস্টোন।

চার॥ নিরবধি বিপন্নতা ও অন্তর্গত মহিমা

কবিতায় সাধারণত বোধের জগৎ ও বোধের প্রকাশই মুখ্য। সমালোচকের মতে ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হচ্ছে কবিতা : 'Golden thread of human thought'। জীবনানন্দের ভিতর দেখি 'অন্তর্গত বোধ' খেলা করে, সেটা কি? তাঁর কবিতা পাঠ করে নয়, গন্ধ, স্পর্শ এবং স্বপ্নের ভিতর নিতে হয়। তাঁর কবিতা শুধু চক্ষু, কর্ণ নয়, সর্ব ইন্দ্রিয়ের কবিতা। কবি একই সাথে সমান্তরাল জগৎ নির্মাণ করেন,—কাল 'অন্ধকার নির্জন,' 'গোধূলি' কিংবা 'ভোর' হয় নিরপেক্ষ অর্থরূপে, গতিহীন অন্তহীন অথচ শোভাময়রূপে—এবং স্থানের রূপ হয় ইতিহাসের অশ্বখুরে অতীতের বন্দরে বন্দরে কুয়াশার চাদর ['নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার'] ; —কবিতায় স্পেসিয়াল এন্ড টেম্পোরাল ডাইমেনসন বা পরস্পরছেদী সম্পর্ক ভেঙে পড়ে এইভাবে। ফলত তাঁর কবিতার রূপ আপাত সরল এবং ব্যাখ্যার অতীত।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মাত্র উল্লেখ সম্ভব। তবে সাধারণ যে ব্যাখ্যা কাঠামোটি অবয়বিক ও মিশ্র-নান্দনিক [Aesthetics], আমাদের লক্ষ্য আপাতত: সেখানেই, কারণ প্রকাশ বিজ্ঞানও [Semeiotics] এর অর্থরূপ, গঠন ও ছন্দোগত [Prosodic] দিক এবং সংযোগ [Communication] তত্ত্ব ব্যাখ্যায় সমর্থ। আপাতত আমাদের লক্ষ্য সীমিত। অর্থরূপ ও গঠনের দিক থেকে বাকরূপগঠন [Sentence grammar], বাক্যছাঁদ [Stylistics] ও আন্তবাক সম্পর্ক নিয়ে যে পাঠ সৃষ্টি [text], তার উপাদানগুলির অবস্থান [distribution], ফাঁক [Anaphora, ellipsis ইত্যাদি] জোড় [link, semantic Newness ইত্যাদি] প্রভৃতির দিক থেকে একটা পরিপূরক আলোচনা নির্মাণ সম্ভব হলে জীবনানন্দ দাশের কবিতার বৈশিষ্ট্যগত দু'একটি অতিরিক্ত দিক উন্মোচন সহজ হতো সন্দেহ কি। আমরা সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিহ্ন-বিজ্ঞান ও সন্দর্ভী ব্যাকরণের গভীর প্রসঙ্গে না গিয়েও খানিকটা তার পরিধি স্পর্শ করা যায় কিনা পরে তাও দেখার চেষ্টা করবো এই আলোচনার ক্রম-উত্তরণে। [দ্রষ্টব্য, ৫ এবং ৬]

ক. ভাবের দিক থেকে বা ভাবের আন্তসংযোগগত কারণে জীবনানন্দ দাশের কবিতা কয়েক প্রকার। একরূপে কিছু কবিতা দ্বিত্বক, অর্থ পরিপূরকতা ও পুনরাবৃত্তিই যার উদ্দেশ্য। '*বনলতাসেন*' গ্রন্থে নাম কবিতা এবং 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' প্রায় প্রতিধ্বনিকর। তেমনি অগ্রন্থিত কবিতা 'তোমায় আমি' ও *শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থের 'তোমাকে ভালবেসে' প্রায় এক। কখনওবা শুধু কবিতাংশেরও প্রতিধ্বনি বা পুনরুল্লেখ পাই কিছু কিছু কবিতায়,—হুবহু বা স্বল্পসাদৃশতায়ও (হায় চিল/হে চিল ; এই ভিজে মেঘের দুপুর/ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ-দুপুর ; ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন/ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ; মুখোমুখি বলিবার বনলতা সেন/শুধালাম আমি শুধু, '*বনলতা সেন*'? ; পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে .../ হে চিল, সোনালী চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে না কি প্রাণ? ; হায় চিল ... মেঘের দুপুরে/হে চিল, চিলের গান জ্যৈষ্ঠের দুপুরে—ইত্যাদি।) এবং অন্যরম Co-referencial সম্পর্ক দেখি 'বনলতা সেন' কাব্যের প্রথম ও শেষ কবিতায় (১৯৫২ সংস্করণ)—যেন এই দুই আদ্য-অন্ত্য বন্ধনী কিংবা নদীর দুই পাড়,—বাকী কবিতাবলী অন্তবর্তী ঢেউ কিংবা স্রোত। 'চিল' কবিতারও একটি ছায়া-কবিতা আছে মনে হয়,—'*রূপসী বাংলা*'র ২৩ নং কবিতাটির কথা তাই মনে পরবে অন্তত,—অথবা 'মহাপৃথিবী'-র 'সিন্ধুসারস' কবিতাটিও।

খ. কবি কিছু কবিতায় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, কবিতার বিষয়ের মধ্যে তারা সরাসরি এসে পড়ে, বক্তব্যের কারণ হয়, অথবা casual reference দেন কবি। কখনো শিরোনামেও তার প্রাধান্য থাকে। এতে নাটকীয় আবহ সৃষ্টি (যা কবির প্রিয় প্রকরণ), আত্মসংলাপন, কখনো dramatic monologue গড়ে, ওঠে এই ভাবে। 'শ্যামলী', 'সুদর্শনা' প্রভৃতিতে কবি বক্তামাত্র, 'শঙ্খমালা'য় নায়িকার স্মৃতি-উক্তি ও কবির প্রতিক্রিয়া, 'বনলতা সেনে'ও তাই তবে কবির সম্পৃক্তি এখানে তন্ময়তার অধিক। *বনলতা সেনের* 'সুরঞ্জনা' এবং *সাতটি তারার তিমিরে* 'আকাশ লীনা' কবিতার নায়িকা এক—সুরঞ্জনা—হতে পারে এরা জোট কবিতা—এবং Co-referencial। প্রেমের অপূর্ব নির্মিতি। তবে নির্বাচনের দিক থেকে নায়িকা শ্রেষ্ঠতার কবিতা 'শঙ্খমালা' (এ পৃথিবী একবার পায় তারে')। লোকজ আবহ এর অপর মাত্রা। 'সুচেতনা'-তে প্রতীকীব্যঞ্জনা ও ইতিহাস চেতনা কবির সৃষ্টিশীলতার ও ভাববৈচিত্র্যের প্রমাণ। এই কবিতারই সেই অমর পংক্তি : 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।'

কবি নায়িকাদের নাম সম্বোধন বা উল্লেখ [reference] করেন অবিরত গানের ধুয়ার মতোন,

—'অথচ যার মুখ আমি কোনদিন দেখিনি',—

[এ যেন বুদ্ধদেব বসুর সেই 'শাদা হাত খানি'], এ নায়িকারা পূর্ণ পরিচায়কত্মক যেমন নাটোরের বনলতা সেন ['বনলতা সেন'], অথবা পূর্ণনামা যথা নীহিরিকা মিত্র ('হে জননী হেজীবন'), মৃণালিনী ঘোষ ('শব'), অরুনিমা সান্যাল ('বুনোহাঁস') অথবা হয়তো একেবারেই ডাক নাম, যথা বনচ্ছবি ('শান্তি ভালো')। সুরঞ্জনা কবির ঈর্ষার সৃষ্টি ; অন্যেরা রূপকথা বা কবির স্বপ্ন-বিলাসিতার হেতুলগ্ন। তাই '*রূপসীবাংলা*'-য় এই নামের অজস্র ভিড়—প্রপাত, সংবর্ত দেখি। আবার নায়িকা নামের অনুপস্থিতি সাধারণ সর্বনাম বা নাম নির্দেশের বিকল্পমাত্র নয়, যথা, শরীরিনী, মিতভাষণ, বুনোহাঁস, তুমি, আমাকে তুমি, দু'জন, নগ্ন নির্জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত প্রভৃতি। নামাশীর্ষ কবিতার প্রায় সবই স-ব্যঞ্জনাদ্যক। এদের অনুপস্থিতিই দ্বিতীয় পুরুষ বা শ্রোতা-নারী। এই সব কবিতার ও অন্যত্র যেখানে নায়িকার উল্লেখ ('রাধিকা' সহ) কোথাও অভিসার বা মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ নেই। যেন শাশ্বতী নক্ষত্র হয়ে তারা মিলন-বিরহ নিরপেক্ষ। এ জন্যই কি তীর্যকরূপ বা 'কে'-বিভক্তি শুধু বক্তাপুরুষের ('উত্তম পুরুষ') রূপের সাথেই সীমাবদ্ধ? একবার 'জর্নাল : ১৩৪৬' কবিতায় স্পষ্ট 'তোমাকে' ক্রমশ অস্পষ্ট তৃতীয় পুরুষ হয়ে গেল,—আবার অন্যত্র 'তুমি' কবিতায়—'আর কাকে পাব' ব্যবহার এলেও তো সেই পরিচিত dimension-এর লোপই হলো বিষয়—

বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারে পাখি গেল উড়ে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

'অঘ্রাণ প্রান্তরে' এই নিরপেক্ষ (Neutrality of the kind) ও নির্লিপ্ত ব্যঞ্জনার পুনরুক্তি পাই এভাবে—

প্রেমে বা অপ্রেমে নয়—নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব।

জীবনানন্দের নায়িকারা সবাই প্রেম-নারী নয়, কেউ নির্দিষ্টসূত্রে বিস্তৃত, সম্ভাষিত এবং কেউ অনির্দিষ্টসূত্রে আকাঙ্খিক সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যযুক্ত ; প্রেমনারীরা প্রথমকাব্যে 'ছায়াপ্রিয়া' ও পরে 'এক তরফা প্রেমে' (সৈয়দ আবদুল মান্নান) নারীমাত্র ('আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে')। কবি প্রেমে জীবনের নিরবচ্ছিন্নতা দেখেন না, 'অনেক সময় মৃত্যু আছে কিন্তু মৃত্যু বিচ্ছেদ-রচনাকারী নয়।' প্রেমবেদনা ও স্মৃতি নিসর্গের গহনপথ আবিষ্কার করে দেয় জীবনানন্দের কবিতায়। প্রেম মৃত্যু ও নিসর্গ একের ভিন্ন নাম মাত্র।

গ. সৎকবি পূর্বজ ও সমকালীন কবির কাছে দায় বহন করেন, প্রভাব নেন, ঋণী হন। বলা হয়, 'এই ঋণ নেওয়ার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁদের কবি স্বভাবের বৈশিষ্ট্য, আর প্রভাবিত হয়েই তাঁরা অন্তর্গত হয়ে ওঠেন প্রবহমান ঐতিহ্যের।' (অশ্রুকুমার শিকদার) আধুনিক বাংলা সাহিত্য জন্ম লগ্ন থেকেই পশ্চিমাক্রান্ত। রবীন্দ্র-পর কবিরা প্রধানত ইয়েটস-এলিয়ট প্রেমী ; জীবনানন্দ দাশও এর ব্যতিক্রম নন।

জীবনানন্দ সমকালীন ধারার যাতনা এবং চাপ থেকেই প্রথমে অ-রবীন্দ্র কাব্যধারার এবং পরে ইংরেজি সাহিত্যের প্রচলিত ধারার (উল্লেখিত ইয়েটস প্রভৃতি) অনুগামী হলেন বা হতে দ্বিধা করলেন না।—

ইয়েটস : 'I would that we were, my beloved, white birds on the foam of the sea!'

জীবনানন্দ : 'আমি যদি হতাম বনহংস,/বনহংসী হতে যদি তুমি, ...'

উভয় কবিতায় শাব্দ-সমিধ এক, উভয় কবিতায় বক্তব্য-চূড়া নির্মাণের ধারকশব্দ এক, এবং উভয় কবিতায় বক্তা-পুরুষ (monologue)-ই আদ্যক [সর্বনাম-'আমি'/'I (would)'] এবং ইত্যাদি ...।

জীবনানন্দ : 'হায় চিল, ...কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ...'

ইয়েটস : 'O curlew, cry no more in the air
Because your crying brings to my mind
Passion dimmed eyes'

জীবনানন্দ : '..........তার ম্লান চোখ মনে আসে'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সব অসম্ভব মিল ও আক্ষরিক যোজন তবুও দুই ভিন্ন জগতের। কবিদের ভাব ও স্বভাব অপাপবিদ্ধ। উদ্ধৃত কবিতাংশে ইংরেজি রোমান্টিক কবিতা ধারারই সাধারণ ধর্মগুলি বিধৃত, বাংলা কবিতায় যে কোনও কবিই তাকে অনায়াসে তুলে আনতে পারতো সমভাবাত্মক মনোযোগে কিংবা পাঠাভ্যাসের সংবর্তনে। আধুনিকতার আলিঙ্গন রৌদ্রের অলিন্দ এনেছিল এভাবেই। ভেতরের দরদালানের লবেজান অন্ধকার একটু রৌদ্র স্পর্শ ['রৌদ্রের গন্ধ'] নিয়েছিল অনেক কবির ম্লান চিত্তে। রক্ষণশীলতার নিষ্ক্রান্তি দৃষ্য হয় নি নব সৃজনলতিকা বিতানে। জীবনানন্দ তো চাতাল পেরিয়ে উঠোনেই এসে গেলেন এই নিষ্ক্রান্তির বেগে। এবং সেখানে বিস্তৃর্ণ ফেল্ট এবং আসন্ন প্রসবা হরিণী ও চিতার শিকারী ধাবমানতা। রাবীন্দ্র ইন্দ্রিয়তা নয়—খগোলে যে নক্ষত্ররাজি, ভূগোলে যে নৈসর্গি বিতান,—এসব তো শৈশবের আসাম জঙ্গলের ও উত্তর ভারতের ফরেষ্টরেঞ্জার কাকার বাড়ির স্মৃতির সঞ্চয়। তবু বরিশালকে [ধানসিড়ি, জলসিড়ি, কীর্তনখোলা, কালীদহ, গাঙুর আর রূপসা নদী] পুটুলিতে বেঁধে নিয়ে গেছেন,—যেখানেই গেছেন।

> মানুষের সব ক্ষুধা আর শক্তি লয়ে
> পূর্বের সমুদ্র অই পশ্চিম সাগরে যাবে বয়ে !
>
> ('প্রেম')

> পড়িব কি ঝ'রে
> পৃথিবীর শস্যের ক্ষেত্রে
> আর একবার আমি—
> নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে।
>
> ('পিপাসার গান')

অথবা, কেবলি—

> বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/ খুঁজিতে যাই না আর

তাই পশ্চিমী অস্থিরতা, মৃত্যুকাতরতা, কুয়াশামদিরতাময় জীবনানন্দ শেষ অবধি ঠিকানায় পৌঁছে যান।

ঘ. ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র, কলেজ ম্যাগাজিন এসব পেরিয়ে ১৯২৫ থেকে কবি স্থির এবং নিয়মিত। ঝরাপালক (১৯২৭) দিয়ে গ্রন্থযাত্রা। তারপরই জীবন বাস্তবতা। যাই হোক, ইতিহাস অনুধ্যান মুখ্য না হলে, *'ধূসর পাণ্ডুলিপি'* (১৯৩৬) থেকেই কবির যাত্রা ধরে নিতে পারি। কবির সকল রচনার পরিচয় এখনও লিপিবদ্ধ হয় নি, অনেক রচনাই অগ্রন্থিত, অনেক গ্রন্থ প্রকাশে কবির অভিভাবকতাও পায় নি। জীবনানন্দ প্রসিদ্ধ তাঁর দু'একটি কাব্যেই। এর মূলে আর কিছু নয়—কাঠামোকে মূল্য দিয়ে কবিতা লেখা যে অসম্ভব, মাইকেলের মতো জীবনানন্দ দাশও তা' বুঝেছিলেন—যিনি ইতোপূর্বে *'ঝরাপালক'* প্রকাশ করে নজরুল সত্যেনদত্ত ও তাঁদের সমকালীন অন্যান্য বড় কবির ছায়াশ্রয় ত্যাগ করতে পারেন নি কিছুতেই। জীবনানন্দ প্রথম থেকেই রবীন্দ্রজীবী ছিলেন না, সুতরাং প্রকৃতির রূপ নয়—নৈসর্গিক আস্বাদনই (হয়তো আরও ভাল বলা হয় 'কবিতার নৈসর্গিকায়ন') তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠলো এবং 'কল্লোল' থেকে 'কবিতা' পর্যন্ত সমকালীন কাব্য পরিস্থিতির আলোকাভিসারের সহযাত্রী হলেন। (অশ্রুকুমার শিকদারের ভাষায় 'ন্যাচারালিস্ট') অবশ্য ইদানিংকার পুনর্বিচার তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিতে উৎসুক সে অন্য সমকালীনতার বাস্তবতায়,—যার সংযোগ ও সংলগ্নতার দীপ্তি ক্রমশ: *'বেলা অবেলা কালবেলা'* অবধি ব্যাপ্ত ও সংস্থিত। *'সাতটি তারার*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিমির' পর্যন্ত কবির সেই অন্তর্লোকের নহ-আচ্ছন্ন ও অনীন্দ্রিয়তার সমুৎসারিত ভাবেরই, তথা জীবন ও পরিবেশ ঘটিত সত্যেরই, নৈকষ্য প্রকাশ বলে এখন মনে করা হচ্ছে। কাব্যের মূল্যায়ন যুগে যুগে বদলায়। জীবনানন্দ দাশ কেন ট্রাম-পিস্ট হন এখন সে কষ্টবোধে পাঠকের হাহাকার জাগে। কিন্তু সেকালে সমালোচনা-পিষ্ট হয়েই তিনি লিখতেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' একটি চরণ এই :

> 'আজ রাত্রে আমার আহ্বান
> ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
> তবুও হৃদয়ে গান আসে।'

গভীর আত্মবিশ্বাসে এই কাব্যেই নজরুলী ঘোষণাও করেছিলেন কবি—

> 'কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
> আমি বহে আনি ;
> ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন কিছুর
> আছে প্রয়োজন,
> তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
> আর নাই কেউ।'

পুরাতনের প্রয়োজন ফুরায়ে নতুনের কোন আকাঙ্ক্ষাপূরণ করলেন এসে কবি ?—এই কাব্যের 'মৃত্যুর আগে' পড়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'চিত্ররূপময়'। এটাই হলো স্থায়ী বিশেষণ এবং কবি-প্রকৃতি বোঝার প্রায়-অবিকল্পী, অতএব সর্বনাশা চাবিকাঠি। গোধূলিলগ্নতা ও পরাবাস্তবতার কথা এসেছে আরও পরে। কবিকে সঠিক বোঝা হয় নি এই ক্ষোভে বড় প্রবন্ধ লিখবেন বলেছেন তিনি—*'কবিতার কথা'* হয়ত তারই ছায়াপাত।— কবি জীবনকে দেখেছেন সময় এবং পরিসরের সম্পর্কযুক্ততায়,—তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন বোধের ভিতরে, শব্দচিত্রে এবং নানারূপের ছায়ায়। কিন্তু জীবনকে আড়াল করেন নি,—

> সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে
> দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মতো ফুটে।
> ('অনেক আকাশ')

এই বিশ্বাস ও এই মহা আশ্বাসই (এবং 'কুয়াশার মতো সব বাধা যাবে স'রে') তাঁকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে—

> পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি
> বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী।

এই বাস্তবের পেছনে গভীর অন্য কোনও বাস্তবের স্তরে কবিদৃষ্টি স্থাপিত হয়েছে 'নতুন কিছুর প্রয়োজনেই'—(পরাবাস্তবকে তিনিই দেখেন বাংলা কবিতায় এক সন্ধি-লগ্নে)।

পাঁচ ।। সশব্দ জীবনানন্দ : 'আরো কিছু আছে তারপরে'

কাব্য চন্দন বণিতা—নাগরিকতার ত্রিলক্ষণ আজ অতীত পরাহত। মাল্যচন্দ শুকিয়েছে, 'আকাশের চাঁদ বুঝি কাস্তে', এবং নিয়মতান্ত্রিকতায় 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'। অপুষ্পক প্রেমে কবির নায়িকারা, বণিতারা আজ শ্রমজীবী—সে কংকর ভাঙে ছায়াবিরল কোন সাইটে বসে, যেমন হিন্দী কবি নিরালা বলেন,—'ও পাথর তোড়তি এলাহাবাদ কি পথ-পর' সেখানে কবি-অনুভূতির সামগ্রিকতা ব্যক্তি কলরোলি মাত্র। ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বরগুপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত মধ্যযুগীয় হত-নাগরিকতার উদ্ভাস ক্রিয়া স্তব্ধ হয় বিহারীলালের এলিজি বা শোক ও ব্যক্তি নির্মাণী কবিতাবলীর মধ্য দিয়ে এবং মাইকেলী রেনেশাঁর অধীত প্রত্যাবর্তনে। বাংলা কবিতার মৌল ভিত্তি আবারও ফিরে পায় নিসর্গই। জীবনানন্দ অনায়াসেই প্রবাহে এসে যুক্ত হন—স্বভাব প্রকৃতিতে ও নৈসর্গি প্রকৃতির শোভমানতা সৃষ্টিতে। কিন্তু এই নিসর্গ বহুস্তরী—কবির সৃষ্টিতে সেটাইতো শুধু সেই 'ধুয়া', সেই refrain—ঘাসের ওপারে ঘাস, বাতাসের ওপারে বাতাস, অথবা 'আবহমান' কবিতার সেই ঠোক্কার খাওয়া চরণটিই মাত্র—

ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূর চ'লে যাই—চেয়ে দেখি আরো কিছু আছে তারপরে।

কবিতার সাধারণ চারিত্র্য-তবে আর মূলে কি? মানুষের শরীরি জগৎ উপেক্ষিত না হয়েও ('নগ্ন নির্জন হাত' এবং এর নানা রেফারেন্স দ্রষ্টব্য) এবং বিষয়ের স্থান কাল পরিপ্রেক্ষিত যথাবৎ হয়েও কবিতার আনুভূমিক সূত্র (horizontality, spatial references)ও আলম্বিক তথা কালধারার গুণ ও বৈশিষ্ট্যাদির (Verticality & temporal relations) পরস্পরচ্ছেদী ক্রিয়া ধারাবাহিকতার অতীত হয় কেন? (চিত্র দ্রষ্টব্য)

চিত্র : ১

(ধারাবাহিক অখণ্ডতা)

চিত্র : ২

(ধারাবাহিকতা মুক্ত) বা বিযুক্ত

চিত্র : ৩

(ধারাবাহিকতা খণ্ডিত)

বস্তুত কবির কালযাত্রা আনুভূমিকতার মাত্রাগৌরব বৃদ্ধিতে। এটাই বাস্তব।

মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
যেই স্পষ্ট নির্লিপ্ততে—তাই-ই ঠিক ; ওখানে স্নিগ্ধ হয় সব।

এখানে ১ম চরণে 'স্থির' ও 'সনাতন' কর্ম বা অভ্যাস প্রত্যাভাসিত হয়েছে। ২য় চরণে 'স্থির'-ধর্মের ব্যত্যয় বা ধারাবাহিকতার খণ্ডন ঘটেছে যা দিয়ে বা যেখানে-ঘটনা ও বোধের নাটকীয় বৈপরীত্যের অভিঘাত সঞ্চারিত/কবির উক্তি যুক্ত হয়েছে—'তাই-ই ঠিক'। এটা অতিরিক্ত--'redundancy'/কবি ততক্ষণ সত্যের ভূমিতে পদবিষ্ট। ডেরিডীয় অর্থে এ 'অন্য খেলা' ('কোনো এক বোধ কাজ করে'), এখানেই কবির অন্তর্দৃষ্টির উদ্বাহন। বিষ্ণুদে-র ব্যাখ্যাটি এখানে প্রাসঙ্গিক—কবির আভ্যাসিক প্রেরণা ও মানসধৃত মৌলরূপের পরিসাধনের যে পার্থক্য তাই তাকে New horizon বা স্বতন্ত্র ও আধুনিক ধারার দিকে নিয়ে গেছে। এটাই লক্ষ্য। কবির সিদ্ধি সেখানেই।

বর্ণিত এই ধারাবাহিকতার চ্যুতি সৃষ্টিশীলতা (creativity rule)-র দিকে থেকে আসলে ঐতিহ্যের সনাতন পাল ছেদন অর্থাৎ এক শাশ্বত সাহিত্যকৃত্য, যা যুগযন্ত্রণার ভিতর নানা অভ্যাসক্রম ও অভিজ্ঞতারই ফসল। কবি জীবনানন্দ দাশ তাকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন কখনও অনুসরণে, কখনো স্বভাব সৃজনে, কখনো আবার বর্জন ও সযত্ন নিরীক্ষণে। কিন্তু কখনও কেন্দ্রচ্যুত হন নি লক্ষ্য নির্মাণে, লক্ষ্যবস্তু স্পর্শ করার ক্ষেত্রে। বিচিত্রতার স্বাদ নিয়ে অভাবিতপূর্ব বিনির্মাণকে তিনি সম্ভব করেছেন এভাবে। সনাতনকে চূর্ণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর সেই অলাত সাফল্য বুঝি নিহিত তাঁর উপকরণেরই ব্যবহারী সংবর্তে।—

কবিরা পর-ভাষী নন, স্ব-ভাষী ; আপনার ভাষাকে আপনি সৃজন করে নেন। শব্দই তার বাহন। বলা হয় ক্রমাগত শব্দ ব্যবহারে, কবি তাঁর শব্দ-পথ চিনে নেন অচিরে। অর্থাৎ এই ভাবে কবির নিজস্ব শব্দ ও শব্দভুবন সৃষ্টি হয়। এই শব্দ সৃষ্টি উদ্দেশ্য বিরহিত বা লক্ষ্যহীন নয়। (দ্র. ২)

জীবনানন্দ দাশ শব্দ ব্যবহারে মিত স্বভাবী ছিলেন, খুঁতখুঁতেও ছিলেন। শব্দ ব্যবস্থায় ছিলেন বহু ব্যাকরণী, বহুস্তরী এবং বিরামান্তিক বহু চিহ্নযুক্ত (সাধারণ বিরামচিহ্নগুলির অতিরিক্ত)। এই ভাবে শব্দ ব্যবহারে কবির উদ্দেশ্য ছিল ত্রিমোহনা সৃষ্টি—ভদ্রভাষা (মিষ্টি ভাষা, দয়াময়, কাব্যময়, স্ত্রীলিঙ্গান্তক ও সাধু সংস্কৃতির ভাষা), ব্যবহারী ভাষা (কার্যকরতা যুক্ত ও অর্থসম্পাতি ফিল্ড বা ক্ষেত্রযুক্ত) এবং লোকজ ভাষার সংগীতি-সিম্ফনী ঝরানো। তিনটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক :

১. 'দীর্ঘ কালকেতু তুলে বাধা দিতে চেয়েছে রাসভ' (প্রেম অপ্রমের কবিতা)।

২. 'ছ-মাস গাধাকে আর মনীষীকে মিহি ছয় মাস।' (ঘাস)।

৩. 'আর যে-বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে'। (কোরাস), অথবা 'আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে/বিয়োবার দেরী নাই,—' (অবসারের গান), 'হাতুড়ি করাত দাঁত নেহাই তুরপুন/পিতাদের হাত থেকে ফিরে ফিরতির মতো অন্তহীন/সন্ততির সন্ততির হাতে/কাজ ক'রে চ'লে গেছে কত দিন।' (ইতিহাস যান)।

অন্য কবিতাবলী থেকে হয়তো আরও ভাল আরও স্পষ্ট উদাহরণ মিলতে পারে, আপাতত আমাদের কাজ এতেই যথেষ্ট। আরও বলা যায়, তাঁর এই উদ্দেশ্য শব্দের একক রূপেই নয়,—যেমন এর অভিধানী, ব্যাকরণী, আর্থতাৎপর্যিক (Semeiotic) নানা প্রকরণের নানা মাত্রিকতার গড়ণে সুবিস্তৃত, তেমনি-এর বাইরেও প্রসারিত। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে এর আলোচনা এখানে আবশ্যক।

রবীন্দ্র কবিতায় সাধু ক্রিয়া, সাধু-চলিতের মিশ্রণ এবং স্থানিক ক্রিয়া বা প্রাচীনাগত (archaic) ক্রিয়া, সর্বনাম, ক্রিয়াবিশেষণ, নামধাতু প্রভৃতির বৈচিত্র্য তাঁর শেষ কবিতাটিতে পর্যন্ত অনবরত আসাযাওয়া করে, জীবনানন্দ দাশের কিছু কবিতা ছাড়া যেমন—'অদ্ভুত আঁধার এক' প্রভৃতি কিংবা প্রাপ্ত, প্রথম ও শেষকবিতা ইত্যাদি এবং *বেলা অবেলা কালবেলা*-র অধিকাংশ কবিতা ক্রিয়ার এইরূপ ব্যবহার তাঁর প্রথম কাব্য *ঝরা পালকে*র প্রথম কবিতা ('আমি কবি—সেই কবি') থেকে অগ্রন্থিত কবিতাবলী পর্যন্ত তার বিস্তার। অনেক ক্ষেত্রে কবিতায় শিরোনামেও এই রীতি কার্যকর পাওয়া যায়, যেমন—সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে (অগ্রন্থিত), যেই সব শিয়ালেরা (*সাতটি তারার তিমির*), ইহাদেরি কানে (*মহাপৃথিবী*), এবং ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল (*ঝরা পালক*)।

জীবনানন্দের সাধু ক্রিয়া বা সাধুরূপী নামধাতু ও প্রযোজক ক্রিয়া এবং সংযোগমূলক/যৌগিক ক্রিয়া 'উড়িয়া যায়'—*ধূ. পা*) 'দিয়েছি ফিরায়ে'—(*ঐ*), 'ঘুমায়ে থাকি'—(*ঐ*) ; 'ঘুমায়ে গিয়াছে'—*বে. অ. কা.*; 'চালায়ে গিয়েছে'—(*ঐ*) প্রভৃতি কাব্যিক প্রয়োজন সিদ্ধিতেই সৃষ্ট এবং ব্যবহৃত। কোথাও অন্ত্যমিল, কোথাও পার্বিক সমতা বিধান ও মাত্রাগত সৌকর্য সাধন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাও আবার অনুপ্রাসমাত্র। ক্রিয়া মেলে দিয়ে ভাববৈচিত্র্য সাধন ও ভাবকে প্রগাঢ়করণের কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছেন এভাবে। কয়েকটি প্রক্রিয়া, যথা—

ঘটমানতা রূপ : জন্মাতেছে ('পৃথিবীর রৌদ্র'), নাচিতেছে ('তার স্থির প্রেমিকের নিকট'), ঘুমাতেছিলাম ('মেয়ে'), পাটাতেছে ('মহাত্মাগান্ধী'), ফুরাতেছে ('ইতিহাস যান') এবং হতেছে ('পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে') ইত্যাদি।

নিত্য রূপ : গেছিলো ('মৃত্যু স্বপ্ন সংকলন'), লবে (ঐ), বুঝিবে ('তার স্থির প্রেমিকের নিকট')।

অসমাপিকা রূপ : থামায়ে, দাঁড়ায়ে, নামায়ে, হারায়ে ইত্যাদি। বা মুষড়ে ফেলিতে ইত্যাদি।

পুরাঘটিত রূপ : দাঁড়ায়েছে ('বিস্ময়'), ঘুমায়েছে ('পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে')।

অসমাপিকার সহকারী ক্রিয়া সহযোগে ৩ (তিন) বা ততোধিক ক্রিয়াসংগঠন পাই প্রচুর।

৩ = 'বলে চুপে থামিলাম' (আঘ্রাণ প্রান্তর : *ব/সে.*) ; 'জানায়ে দিতেছে এসে' (অনেক আকাশ : *ধূ/পা*); 'ভয় পেয়ে থেমে গেল মেয়ে' (মেয়ে) ; 'এসে চলে গেছে ..' ইত্যাদি।

৪ = 'সমুদ্র পারে চুপে থামি/চেয়ে দেখি' (সিন্ধুসারস : *ম/প্*) ; 'পথছেড়ে শান্ত হয়ে চলে যায়' (পথ হাঁটা : *ধূ/পা*) ইত্যাদি।

—এই সব ক্রিয়ার আধিক্যের বা বিশেষ ব্যবহারের একটা প্রধান হেতু হতে পারে যে, ইংরেজি আয়াম্বিক ধরনে যেখানে বাংলায় অক্ষরবৃত্তিক পয়ার ছন্দকে ২৮ বা ততোধিক মাত্রার পর্ববৃদ্ধির দোলন ঘটিয়েছেন, সেখানে তাঁর ভাষা বেশি মাত্রায় ক্রিয়া নির্ভর হয়েছে। এছাড়া ক্রিয়ার দ্বিবিধ বিকীরণ অর্থ বিকলন ঘটাতেও সহায়ক হয়। যেমন—'যেতেছে হারায়ে' এই রূপের বিকল্প হয় না * যেতেছে হারিয়ে, কিংবা * যাচ্ছে হারায়ে। যেমন অন্যরূপ হয় না এই অন্ত্যক্রিয়ার, যখন কবি বলেন, 'সেই নারী নেই আর ভুলে তারা শতাব্দীর অন্ধকার ব্যসনে ফুরাবে।'

ক্রিয়া সময়জ্ঞাপক ও সময়ান্তক। জীবনানন্দের কাব্যে সময়ের কাল পারাপার বহু বিখ্যাত। কিন্তু শুধু ভাবে নয় রূপেও তিনি একই ক্রিয়ার নানারূপ এবং কখনো বা একই সাথে এই রূপবৈচিত্র্য উপভোগ করেছেন, যেমন *বেলা অবেলা কালবেলায়* 'সূর্য নক্ষত্র নারী' কবিতার তৃয় বা অন্তিক বিন্যাসে পরপর তিনটি চরণে ক্রিয়ায় বিভিন্নতা এসে মাত্রাযোগের কারণে—

যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম,
তাই শুধু কাটায়েছি।
কাটায়ে জেনেছি এই-ই শূন্য

এরকম ত্র্যক ব্যবহার না হলেও পাশাপাশি বা কাছাকাছিতে এমন ক্রিয়ান্যাস পাওয়া যায় আরও :

প্রেম কি আসে নি তবু?—একে তার ইশারা আসুক!
প্রেম কি চলিয়া যায় প্রাণেরে জলের ঢেউত্র ছিঁড়ে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢেউ–এর মতন তবু তার খোঁজে প্রাণ আসে, ফিরে!
যতদিন বেঁচে আছি আলেয়ার মত আলো নিয়ে,—
তুমি চলে আস প্রেম,—

('প্রেম' *ধূ/পা.*)

অথবা, একই কবিতায় একটু পরেই—

চ'লে আসি,—চ'লে যাই,—আকাশের পায়ে ইতস্তত: !—
ভেঙে যাই,—নিভে যাই,—আমরা চলিতে গিয়ে–গিয়ে।

অথবা,—

জ্যোৎস্না চ'লে যায়,—তবু তুমি যাও চ'লে
তার আগে ;—যা বলেছ একবার, যাবে নাকি আবার তা'বলে

('অনেক আকাশ' : *ধূ/পা*)

কবির 'সমারূঢ়' ('বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—') কবিতায় যেখানে ইংরেজি কবিতার ভাবও আরূঢ় (তু: The scholar : W.B. yeats), যেখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহারটি এইরূপ :

চলিতরূপ : লেখোনাকো, হেসে, নয় বসে আছে, নেই, চেয়েছিলো, খেয়েছিলো
সাধারণরূপ : দিলো না, পাওয়া যায়
সাধু রূপ : বলিলাম, বুঝিলাম
অসমাপিকা রূপ : খুঁটি

ক্রিয়ার এই মিশ্রণে রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যই ('অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে') অনুসৃত হয়ে থাকবে,—যদিও পূর্ববর্তী সকল কবির প্রায় রচনাই এই উদাহরণে আকীর্ণ। জীবনানন্দ দাশ কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে। *ধূসর পাণ্ডুলিপির* 'পঁচিশ বছর পরে'–এর প্রথম চরণ ও শেষ চরণে (৩৩ সংখ্যক) চলিত ক্রিয়া–বন্ধনী থাকলেও মধ্যবর্তী ক্রিয়াসমূহ মিশ্র এবং সাধুক্রিয়ারই আধিক্য—

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে—
বলিলাম : 'একদিন এমন সময়
আবার আসিও তুমি—আসিবার ইচ্ছা যদি হয় !—
পঁচিশ বছর পরে।'
এই ব'লে ফিরে আমি আসিলাম ঘরে ;
... ...
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে। (পঁচিশ বছর পরে)

এখানে কেবল তৃতীয় চরণটিতে মিশ্রণ ঘটে নি। তাঁর একই চরণে অমিশ্র সাধুর উদাহরণও প্রচুর (যেমন 'ক্যাম্পে' কবিতায়)—

'কাহারে সে ডাকে',
'তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে'
—ইত্যাদি
আবার মিশ্রণের উদাহরণও সম–প্রতিযোগী—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সবাই থামিলে পরে মনে হল—
একদিন আমি যাব চলে'
(পরস্পর)
'সে এসে পাখির মত স্থির হয়ে বাঁধে নাই নীড়
—(অনেক আকাশ)

শেষের দিকে আরবি-ফারসি ব্যবহারের মতো সাধু-চলিত মিশ্রণও অনেক কমে গেছে—*'বেলা অবেলা কালবেলা'* থেকে (যদিও গ্রন্থটির রচনাকাল ধরে তা বলা মুসকিল)।

যাই হোক, যেখানে চলিত ক্রিয়া রেখেছেন সেখানে ছন্দের খাতির আছে, বিলম্বিত গতি রক্ষার বিকল্প প্রয়াস আছে, ও প্রসার স্থলে পদশোষণ আছে, ইত্যাদি। এভাবে অস্তিক্রিয়ার বৈপরীত্যে (নাহি>নাই), নি:শেষ (নেই আর) প্রভৃতি ছাড়াও পাদপূরক বল (-ক)এর আঞ্চলিক রূপ পাই অর্থগাঢ়তার প্রয়োজনে—

অন্তর্বেদনা জ্ঞাপক— 'আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো' (ক্যাম্পে)
অনুরোধাত্মক—'যেয়ো নাকো' (হায় চিল)
আদৌভাবদ্যোতক—'খুঁজে পাবে নাকো কেউ' (অনেক আকাশ) ;
'এ কন্যারে দেখে নিকো' (*রূপসী বাংলা*)

একই রকম আঞ্চলিক রূপপ্রসারের ব্যবহার দেখি তুলনা-স্থলে (মতো-মতোন, মতন) :

'অন্ধকার রাতের মতন' (অনেক আকাশ)

'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায় (*ধূ-পা.*) 'তারে', 'তাহারে' 'যেই' এবং কর্ম-পূর্ব (কখনও বিধেয় পূর্ব—'তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই' প্রভৃতি ধরনের প্রকাশে) ক্রিয়া-অধিকাংশত সাধু ক্রিয়া ব্যবহারও তারই একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। পরস্পর দুই চরণে এই বৈপরীত্য দেখা যাবে :

'তোমারে রাখিবে ধ'রে সেই দিন পৃথিবীর 'পরে ; —
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।'

তবে কবি নিজের নিয়ম নিজেই ভাঙেন, ভেঙ্গেছেন বারবার, অবিরত। *ঝরাপালকে* (১৯২৮) নজরুল ও অন্যান্য সমসাময়িক কবিদের প্রভাব-চিহ্ন বহন করতে গিয়েও কবি এই মিশ্র ছায়ার আশ্রয় ছেড়ে কেবল চলিত ক্রিয়ার ব্যবহারেও পারঙ্গমতা অর্জন করেছেন ('বনের চাতক—মনের চাতক', প্রভৃতি)। তাতে অবশ্য নজরুলী দেছে, মাগছে, কাঁদতে আছে প্রভৃতিও বাদ যায় নি।

পরে *মহাপৃথিবীর* (১৯৪৪) অনেক কবিতাতেও বিশেষত শেষের কটি কবিতায় চলিত ক্রিয়ার অমিশ্র ব্যবহার বেশ উজ্জ্বল। আর *বেলা অবেলায় কালবেলায়* (১৯৬১)-তে সাধু ক্রিয়াই তুলে দিলেন যেন কবি—অবশ্য দুই একস্থলে পুরনো ক্রিয়ারূপের ছাঁদ ফিরে এসেছে কৌশল ('Strategy')-এর কারণেই মাত্র।

কেবল ক্রিয়াপদ নয়, সর্বনামী বিশেষণ ('যেই সব'), সর্বনামের তীর্যকরূপ (জীবনানন্দে পরিচিত সর্বনাম 'তাহাকে'-বিরল; 'তাহারে' সাধারণ), অব্যয় (না, মতোন, তাই), বিশেষণ (ঢের), রূপকথা-সূত্র (রাজকন্যাদের, রূপবতীদের, কঙ্কাবতী, শঙ্খমালাদের নাম ও স্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়! অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?

শিল্পী : সফিউদ্দিন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম), বিশেষ্য (সাপমাসী, ধুলো খড়), বহুত্ব বোধকতা (ক্রিয়া দ্বিত্ব, সর্বনামী চিহ্নের প্রসার), দ্বিক্রিয়ার অসমাপিকতা (রয়েছিল উঠি, ঢের দিন চলে গেলে আবার), ক্রিয়া বিশেষণ (ঢের আগে), ইত্যাদির ব্যবহারও বিশিষ্টতা মুখর। সৈকত আসগর (১৯৯৩), ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮৫) প্রমুখ সমালোচকদের হাতে এই আলোচনার বিস্তার দেখা যায় (যদিও সীমিত)। এখানে বিশেষভাবে যা উল্লেখ্য তা'হল যে, জীবনানন্দের এই শব্দ ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যের কারণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান দুস্তর হয়েছে কিন্তু তিনি সংলগ্নচ্যুত হন নি। বন-নদী-পাখি, বিশেষত এই তিন এলাকার শব্দরাজির উৎস অতিলোকজ কেন্দ্রভূমি ; সেই সব শব্দের অতিব্যবহারও আছে তাঁর কবিতায়--তাঁর প্রথম দিকের নজরুল-মোহিতলাল সত্যেনদত্তীয় আরবি-ফার্সি শব্দ, স্বকীয় অর্জন বৈদেশি শব্দ ও বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব শব্দ (শবর, হরিণী, সনকা, বেহুলা. লহনা, মানিকমালা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা এবং ক্রিয়া বিশেষণ—বিমনা ইত্যাদি) ছাড়িয়ে তাঁর বিত্তশালী শব্দভূমিতে যে আয়ুধ সজ্জিত, তার ঐশ্বর্যই তাঁকে দূরস্থ করেছে। কিন্তু সর্বত্রই বহুমাত্রিকতা ধারণের মধ্যেই মহাকালের ও মহাজীবনের হৃদয় লগ্ন হার্দ্য বৈতালিক তিনি। এই সাথে তাই বলা আবশ্যক, তাঁর একক শব্দের অর্থ খোঁজাও পণ্ডশ্রম। জগদীশ ভট্টাচার্য যেমন বলেন,—'দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশা'র—এখানে নদী, নারী, ফুল, কুয়াশা এই পাঁচটি শব্দ তাঁদের নিজস্ব অর্থ সত্তা হারিয়ে রাসায়নিক মিশ্রণে একীভূত হয়ে এমন একটা অর্থময়তা সৃষ্টি করেছে যা ব্যবহৃত শব্দের একটিতেও নেই।' উল্লেখ্য এই চরণটি ও তাঁর বহুবচন নিষিক্ততা গ্রন্থবদ্ধ সংস্করণে আসার আগে সাময়িকীতে প্রকাশিত সংস্করণে ছিলই না ('কবিতা' পত্রিকার চরণটি এইরূপ : 'দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর কোলে নিমগ্ন দেউল।' অর্থাৎ নদীর ফেলে যাওয়া অর্ধমগ্ন মন্দিরের রূপে কালের নির্মমতা ও মৃত্যুর অমোঘ পরিণতির একটি ছায়াচিত্র বা চিত্ররূপ নির্মাণই সেখানে মুখ্য ছিল অর্থাৎ এটি ছিল ব্যক্তি দৃষ্টিক চিন্তা মাত্র)।

কবির শাব্দ ত্রিমোহনায় আরবি-ফার্সি শব্দ ক্রমে শূন্য কোঠায় নেমে আসে ও বৈদেশি পাশ্চত্য শব্দের হার বৃদ্ধি পায়। তাঁর সৃজনী মানসিকতার এই গতিশীল ও বিবর্তনশীল চারিত্র্য এবং বৈদেগ্ধ্যরুচির অবিরত ওঠা নামার মধ্যে কবির শব্দ-যাত্রা অন্তিম মুখী নয়, বরং এক কেন্দ্রিয় তাৎপর্যে বিদ্ধ। শব্দের আচ্ছাদন বদল কবিতার স্বভাবকেও মোচড় দেয় ('অটোমেটিক রাইটিং' তত্ত্ব এজন্যই খারিজ হয় তাঁর সম্মুখ ধারার উদ্ভাসনে)। তাই ক্রিয়া বা অব্যয়, যোজনাত্মক শৃঙ্খলার শব্দ বা শব্দ অবলোপন—দূরান্বয় বা ellipsis প্রভৃতির ব্যবহার-রূপ যে বৈচিত্র্য আনে তা তাঁর কবিতার 'শোভমানতা'কেই ধারণ করে রাখে। নির্মিতির চারুতা ও অর্থদ্যুতি সৃষ্টির এটাই তাঁর অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী কৃত্য। তাই 'নরম নদীর নারী ফুল ছড়াতেছে কুয়াশার'-এর সমান্তরাল ভাবতে কষ্ট হয় না—'তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে/বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।' এবং 'সেইখানে যুথচারী কয়েকটি নারী/ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে/মেধাবিনী' ; যাদের 'পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ'। এরা সমান্তরাল, তবে দূরবর্তী ; দূরবর্তী কিন্তু সমকেন্দ্রীয়। বৈচিত্র্যে এরা সমবৃন্তক।

ছয়॥ হায় চিল

বর্ণিত জীবনানন্দী কবিতার আবহাওয়া ও কবিতার প্রধান বা বিশেষ কয়েকটি ধারার উল্লেখ থেকে এবং কবির ভাষানির্মাণের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির প্রসঙ্গ মনে রেখে এবার একটু ভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথা, সামগ্রিক পাঠের দিক থেকে আলোচনা দিয়ে সমাপ্তি টানতে চাই। আমরা ইতোমধ্যেই আভাসে জেনেছি এবং এখানে পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে বিশেষত কাব্য সমালোচনার পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি পরিপূরক ধারণা সৃষ্টি করতে পাঠ-সান্দর্ভিক বিশ্লেষণ ইতিবাচক ও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, সন্দেহ নেই। তবে সমস্যা তার প্রয়োগ নিয়ে। একটি উপযুক্ত মডেল এখনও গবেষণা সাপেক্ষ। সাধারণভাবে ও সাধারণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের প্রত্যাশায় এখানে কেবল সংক্ষিপ্ত ও পরিধিক আলোচনা উপস্থিত করা গেল।

আমরা প্রয়োজনীয় আলোচনার জন্য বিশেষ পাঠ (Literary Text) এবং এক্ষেত্রে একটি বিশেষ কবিতা-নির্ভরতার কথা ভাববো। মনে রাখা দরকার বিশেষ কবিতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-সমালোচনা-সারবক্তব্য ও মনোজ-শায়ন নিয়ে নানাজনের নানা তীরন্দাজী বাণ আগেও যেমন এখনও তেমনি সুলভ। উদাহরণত হালের একটি আলোচনা খুই মূল্যবান সংযোজন বলে স্বীকৃত হয়েছে,— *জীবনানন্দ দাশের 'মৃত্যুর আগে'*—(ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত, ঢাকা ১৯৯৯ : ২৪৮ পৃষ্ঠা), তারই একটি মহৎ সাক্ষ্য। এই গ্রন্থের দুটি আলোচনার (সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও ———) সার এখানে প্রথমে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এই গ্রন্থের অন্যান্য আলোচনার মত (যথা জ্যোতির্ময় দত্ত, ময়ুখ চৌধুরী, আবু তাহের মজুমদার, সম্পাদক স্বয়ং ও অন্যান্যদের আলোচনার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই) এ দু'টিও কবিদের সাধারণ প্রবণতাগুলির মূল্যায়নে কার্পণ্য করে নি। কবিতায় কেউ কেউ বিশেষ পরিস্থিতিতে ও ভিন্ন আবহাওয়া সৃষ্টিতে বৈরী, কঠোর, আপাত অ-নান্দনি প্রসঙ্গ বা প্রপঞ্চ তুলে আনলেও কবি মাত্রের প্রিয় প্রসঙ্গ ফুল চাঁদ পাখি মেঘ নদী প্রভৃতি। এর মধ্যে ভিন্নতর বিষয় এলেও তা' কোমল আধারেই রূপ নেবে, এটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের সাগর, নজরুলের সিন্ধু, কিংবা পর্বত-গিরি, শিঙা কিংবা ওঙ্কার ধ্বনি প্রচণ্ডতার প্রতীক নয়। বৈরী সেনা বেষ্টিত গর্জনশীলা সমুদ্রকে দেখে মাইকেলের যে ফুল মালিকার কথাই মনে পড়েছিল সেও এই জন্যই—'কি সুন্দর মালা আজি পড়িয়াছ গলে/প্রচেতঃ !' নির্জন একাকী কোনও মেঘখণ্ড যে পর্বত-উপত্যাকার ওপর দিয়ে ভেসে চলে যায়, তাকে রোমান্টিক যুগের ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ যত ভিন্নভাবেই লক্ষ্য করুন, তাকে কখনও বজ্রাঘাতী করে চিহ্নিত করেন নি। তাঁর কাব্যে প্রেমের আবহাওয়া রচনায়ও মেঘের অবস্থান ঘটে ভিন্ন উপমেয়তায়। রবীন্দ্রনাথেও মেঘের পরে মেঘ জমে, কিন্তু হৃদয়-ময়ূর তখন নৃত্যাশীলা সপেখম। কালিদাস মেঘের প্রসঙ্গে নদী, নদীর প্রসঙ্গে মেঘ,—এই খেলা খেলেছেন এবং সরযূ শিপ্রা রেবার প্রবাহ কি আশ্চর্য সজীব ! চর্যার কবিদের সেই পদ্মা, রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনের উদ্দিষ্ট সত্তা—'হে পদ্মা, তোমার আমার দেখা শতবার' ; মাইকেলের করুণ সম্বোধন নিয়ে বয়ে চলে অবিরাম শৈশব স্মৃতি সিক্ত কপোতাক্ষ নদ। কিন্তু জীবনানন্দে (গঙ্গা ব্যতীত, তবে গঙ্গা-সাগর তাঁর প্রিয়) যাবৎ নদনদী খালবিল ছেয়ে থাকলেও নদীর বর্ণনা দেন নি—'কবেকার পাড়াগাঁর মত তারা সব' ; তাই তাঁর কাব্যে জলাঙী, জলসিড়ি, কীর্ত্তিনাশা, গাঙুর কিংবা ভৈরব সবই প্রতীক মাত্র। 'হায় চিল' (এখানে এবং আরও বহু কবিতায় চিল এবং দুপুর অতি প্রিয় ও পরিচিত প্রতীক) কবিতায় ধানসিড়িও বিশেষত 'হায় চিল' কবিতায়, কোনও নদীর রূপ মাত্র, ছায়ারূপ,—হয়তো একটা ভৌগোলিক অবস্থান, যেখান থেকে সবল পাখির স্বরের (আর্ত চিৎকার?) ভিতর দিয়ে কবি সরাসরি গ্রহণ করেন পরিবেশ, ইতিহাস, রূপকথা এবং প্রেমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীকে—স্পর্শে গন্ধে আলোয় ও ম্লানভ করুণতায় ; নির্মাণ করেন স্বপ্নসম্ভব রূপবাণী, ভ্রমণ করেন রূপকথার জগতে। শব্দ এখানে মাত্র গুটি কয়—বেতফল, সিক্ত মেঘ, দুপুর, চোখ, পৃথিবী, রাঙা রাজকন্যা—মাত্র কয়টি শব্দই (পরে তালিকা দ্রষ্টব্য) যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে একটি সমগ্রতার অংশরূপে—কৃষকের ফসল ক্ষেতে যেমন ছিটানো থাকে বীজ ধান, এও যেন ঠিক তার মতো। একটি পরিপূর্ণতার ফসলের রূপে এই সব শব্দ তাৎপর্য পায়, যেন অন্য এক কথাসরিৎসাগর।

উল্লিখিত আলোচনা দুটিতে 'মৃত্যুর আগে' কবিতা প্রসঙ্গেও প্রায় সমান্তরাল ও পরিপূরক আলোচনা পাই। প্রথমে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করছি :

"ব্যবচ্ছেদ পর্ব"

'মৃত্যুর আগে' কবিতার প্রধান চিন্তা/চিত্রকল্প/রং/বোধ-অনুভূতির একটি তালিকা তৈরি করলে (ক) কবিতাটির চক্রাকার বর্ণনা এবং (খ) সান্ত্বনা/প্রবল শূন্যতা অথবা নেতির অনুপস্থিতি বিষয়ে আমাদের ধারণা একটু শক্তিশালী হবে।

স্তবক

১. সন্ধ্যা, নরম/কুয়াশা, নারী, অন্ধকার/ফসলহীনতা
২. অন্ধকার, শীত/রাত্রি, পেঁচা, অন্ধকার, শীত, রাত
৩. নীল/জ্যোৎস্না, ধান, সন্ধ্যা, রোদ, বারো মাস
৪. সবুজ, অঘ্রান, হলুদ, শীত, রাত, ইঁদুর, ধূসর/গাছ, সন্ধ্যা, আঁধার, ঘুম
৫. নরম, গাঢ়/রাত, জ্যোৎস্না, বৈশাখ, সবুজ/বাতাস, নীলাভ/নোনা
৬. লাল লাল/ফল, নির্জন, নীল, মৃদু/ছায়া, সন্ধ্যা, ভোর, ধান সবুজ
৭. বহু দিন মাস, অন্ধকার, ধূসরতা, ম্লান/ধূপ
৮. রাঙা/বাসনা, ধূসর/মৃত্যু, স্বপ্ন, সোনা

মৃত্যুর আগে বহুবচনীয় মানব কোনো স্থির চিন্তার দিকে যে ধাবিত হচ্ছে, এই ফিরে ফিরে আসা বিপরীতচিন্তাসূচক শব্দাবলী এবং তাদের পাশাপাশি অবস্থান গ্রহণ তা সূচিত করে না। একটা প্রবল শূন্যতার বোধ যে তীব্র হচ্ছে, দীর্ঘস্থায়ী কোনো হাহাকার ধ্বনি-তাও প্রতীয়মান হয় না, যেহেতু এমন কিছু চিত্র আছে, যেগুলো ভিন্ন চিত্র ও ধ্বনি সৃষ্টি করে (ভোর, সবুজ ধান, ইত্যাদি)। 'হায়, আমি থাকব না সেই দৃশ্যপটে' ধরনের চিন্তা আছে এই কবিতায়, কিন্তু সেটি একবচনীয়, বহুমানুষের চেতনায় সেটি তার কষ্টের ধারটি হারায়।

শুরু থেকেই বেশ আকীর্ণ জীবনানন্দের ছবিগুলি, কিন্তু একাধিক ছবি একসাথে মিছিলে বেরোয় বলে, সার্বিক অর্থে, জীবনেরই একটা আখ্যান হয়ে দাঁড়ায় কবিতাটি। পরে, *রূপসী বাংলা* থেকে নিয়ে কত কবিতাতেই না এসব ছবি ফিরে ফিরে এসেছে, কিন্তু প্রতিবারই কি নতুন জহরসেন মজুমদার, নতুন বোধ সৃষ্টি করেছে সেগুলো। জীবনানন্দ দাশের অনেক শূন্যতার কবিতা আছে, যেগুলোতে প্রথম থেকেই পরিব্যাপ্ত হয় শূন্যতার বোধটি। 'মৃত্যুর আগে' এই শ্রেণীতে পড়ে না।

দ্বিতীয় বিশ্লেষণটি আর একটু ভিন্ন। প্রথমে ৭টি অনুচ্ছেদের প্রত্যেকটিতে একটি পুনরাবৃত্ত সাধারণ সর্বনাম (প্রথম পুরুষ, বহুবচন)-এর বিধেয়ক মূল ক্রিয়া ও ক্রিয়ানুষঙ্গী পূরক ও বিবর্ধক পদগুলো (Correlational Complements) উদ্ধৃত করেছেন তিনি, যেমন 'আমরা হেঁটেছি যারা ... /বেসেছি যারা / দেখেছি যারা / ...ফিরেছি যারা' ইত্যাদি। তাঁর মতে 'আমরা' এখানে 'সবাই নই, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কিম্বা একজন আমি-র প্রবল শরীরী উপস্থিতি—'। সাধারণের দৃষ্টি ও কবির দৃষ্টিতে এইখানে প্রভেদ ঘটে যায়। জীবন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুর দ্বন্দ্বও উপস্থিত হয়েছে—‘এই দ্বন্দ্বে দেখা যাচ্ছে কুয়াশা এবং পউষ মৃত্যুর চিহ্নবাহী।’ তারপরই তিনি নিম্ন বিশ্লেষণে চলে এসেছেন—

কিন্তু হাঁস এবং ফুল স্পষ্টত জীবনের সংকেতবাহী। ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতাটির ভিতরটা স্পষ্ট ক’রে দেওয়া যায় এই রেখাচিত্রে :

পেঁচা	ঘাস					অগাধ জীবন
বক	ধান					রোদ-জ্যোৎস্না-রূপ
জোনাকি	হিজল					
ইঁদুর	আকন্দ					
হাঁস	বট	ভোর	বিকেল	সন্ধ্যা	রাত্রি	
বুনো হাঁস	ধুন্দুল					
চিল	খড়					নিরুত্তর শান্তি-
মাছরাঙা	অশ্বথ					কুয়াশায় উড়ন্ত কাক
বুলবুলি	সুপুরি					
ঝিঁ ঝিঁ	বেত					ধূসর মৃত্যুর মুখ
মাছ						

এই শব্দ কুঞ্জি ও শব্দ-বৈপরীত্যতায় কবির জগৎ বিশ্লেষণের উপযোগী হয়ে ওঠে। একদিকে সেই জীবন ও কালের সন্ধি লগ্নসমূহ যেখানে ‘যার সঙ্গে রয়েছে মানুষের গাঢ় ইন্দ্রিয় সংবেদনার যোগ’—তার তরঙ্গক্রম, যা নিয়ে ‘বারোমাসের মুগ্ধতা’ (তুং. সৈয়দ মনজুরুল ইসলামও বলেছেন ‘কবিতাটি বহু মানুষের অভিজ্ঞতার এক বারমাসী’।) এবং এর অন্তর্তলে অন্যদিকে তখন বুনন চলে ‘অস্তিত্বের মূলে মৃত্যুর গূঢ় বার্তা’— ‘আত্মমগ্ন গীতলতার ... অনিঃশেষ অনুরণন।’

যাই হোক উভয় আলোচনাই কবিতার শব্দবয়ন ও বার্তাবয়ন স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। এবারে কবি রচিত সংভাষ (‘সুপ্রণীত লেখা’)-টির অন্যান্য ‘আকর সূত্রে’র দিকেও লক্ষ্য দিতে সচেষ্ট হবো। কবির যে কোনও রচনার একটা সূত্র তার পংক্তি (বাক্য-উপাদান)-মধ্যে নিহিত, অপরটির অস্তিত্ব তার রচিত এই পংক্তিমালারই (পূর্ণ বাক্য এবং তার সহায়ক, পরিপূরক ও প্রসঙ্গ মূলক বাক্যাতীত সংগঠনের) আন্তগঠন রহস্যকূপে। দুটোই ‘বিদেহ’, সন্দর্ভ-বিজ্ঞান তাকে একত্র করতে সূত্রাবদ্ধ করেছে। সূত্রের উপসূত্র আছে, এগুলিকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়—

বাহ্য প্রকরণ সূত্র : (Cohesion and further interpretations)

১. প্রসঙ্গ (context)
২. পূর্বানুমান (presupposition)
৩. প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্পাদি (iconic feature)

আভ্যন্তরীণ সূত্র : (Semiotic whole : Units of Text)

১. বাক্য-ব্যাকরণীয় বিষয় (Sentencial aspects)
২. আন্তবাক্য সম্পর্কসূত্র (Inter Sentence links)
৩. অন্তবাক্য বিধি তথা ঐক্যবিধির প্রকার (Intra-Sentence relationship--Intra-Textual phenomenon)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূত্রসমূহ কোনও বিশেষ মডেলের অনুকরণে এখানে উপস্থাপিত হয় নি, তবে বিভিন্ন চিন্তাসূত্রের এটি একটি সমীকরণও বটে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়েও বলা যায় যে কাব্যিক চরণ (diction) ও কাব্যোপম উপাদান রাশি (ইংরেজিতে যাকে বলে Literalism, তাতে আক্ষরিকতা এবং ভ্রমাত্মকতার ভাবটাই মুখ্য, এখানে তার উন্নয়নটাই উদ্দিষ্ট) যখন কবির ধারণা-পরম্পরাকে রেখাঙ্কিত করে, তখন তা যেমন কোনও স্বয়ংক্রিয় ধারণার (automatic writing) অবসান ঘটায়—তেমনি ছক বা স্থির পথে চলা থেকেও deviation সৃষ্টি করে এবং তখনও তার পেছনে কোনও না কোনও 'সৃজনী সূত্র' ক্রিয়াশীল হয়। (এগুলি প্রচলিত ব্যাখ্যাধর্মী আলোচনাকে redundant করে তোলে।)

সুতরাং বাক্যের আকাঙ্ক্ষিত উপাদান প্রত্যক্ষ না থাকলে, যেমন বাক্য দুরান্বয়ী হলে, পাইক (J.L.Pike) বর্ণিত 'অর্থ-জোটের ক্রিয়াশীলতা'য় ফাঁক বা শূন্যগর্ভতা দেখা দিলে, অসম্পূর্ণ গঠন হলে,—ইত্যাদি ক্ষেত্রে কবিতা কেন তাকে গ্রহণ করে, সেই ব্যাখ্যাই এখানে উদ্দীষ্ট। একক বা বিচ্ছিন্ন বাক্য রচনার মতো পদ রচনায় বাক্যতাত্ত্বিক প্রণালী খানিকটা পথ হয়তো সহায়ক হয়,—কিন্তু পরে তাকে একাই চলতে হয়। তখনই তাকে প্রচলিত অর্থে বাক্য বলা যায় না, কেননা বাক্য সবসময়ই বহিস্তরীয়, গভীর স্তরের বাক্য প্রচলিত ও ব্যবহারী ব্যাকরণ গ্রহণ করে না। কবিতায় বাক্য তাই একস্তরীয় বিষয়ও নয়। অতএব রূপান্তরী ব্যাকরণ এই আভ্যন্তরীণ গঠন বোঝার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়ক সূত্র মাত্র,—সন্দর্ভী বিশ্লেষণ তারই সম্প্রসারণ তত্ত্বভিত্তিক নব্য জ্ঞান।

এখানে বলা আবশ্যক, বাক্যে থাকে অব্যবহিত উপাদান, নির্দিষ্ট কাঠামো (ও PS-rule) এবং গভীর তলের গঠন ও রূপান্তর সূত্র, আর সন্দর্ভে থাকে উৎস (source) এবং আকর সূত্র (যাবৎ বাক্য-শোষণ, সর্বনামীকরণ, প্রসঙ্গ ধারণ...)-প্রযুক্ত লক্ষ্য (Goal)। সন্দর্ভে বাক্য একটি আধার-উপাদান মাত্র। তাতে বাক্য-শীর্ষণ ও বিষয় ধারার অর্থএককের জোড় (paired semantic components) নিয়ে পূর্ণতার লক্ষ্যে একটা সম্পর্কসূত্র গড়ে ওঠে,—যা একক বাক্যে বা TG-ব্যাকরণী সূত্রে লব্ধ বাক্য-এককে সম্ভব হয় না। যেমন নিম্ন বাক্যগুলি—

১. চিলের কান্নার কষ্ট আছে।
২. রূপকথার রাজকন্যাদের কষ্ট।
৩. বেতের ফলের মতো যার দুঃখ দুঃখ চোখ ছিল, তার কষ্ট।
৪. কষ্টের কথা মনে হলে কষ্ট বাড়ে।
৫. কেউ কষ্ট চায় না।

—বাক্যগুলির প্রাতিস্বিকতায় একটা literal doggerel ধরনের ছাপ পাওয়া যেতে পারে, কারণ তাতে নতুন অর্থ সংযোগ ঘটেনি,—তবে ১-৫ বাক্যগুলি গুভীর স্তরে পরস্পর গ্রথিত। এখানে শীর্ষ, হেতু, ঘটনা ও পরিণাম আছে।

প্রদত্ত পাঁচটি (১-৫) বাক্যের সংহত গঠনটিকে একটি Text বা পাঠ কল্পনা করতে পারি,—যাইহোক, 'আন্তবাক্য ব্যাকরণী' মতে ('The grammar of elements connecting sentences in a manner that together they qualify to be called a 'text'.')। এই রূপটিকে 'ক'-পাঠ ধরে এবং 'হায় চিল' কবিতার (দ্রষ্টব্য '*পরিশিষ্ট*') পংক্তিমালার সামগ্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠকে 'খ'-পাঠ ধরে (পরে বিশ্লেষণ ও সারণিসমূহ দ্রষ্টব্য) নিম্ন সূত্রগুলি ও কবিতার আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলির আভাষ লক্ষ্য করা যায় :

সারণি ১

ক্রমিক নং	প্রদত্ত ক-পাঠ	প্রদত্ত খ-পাঠ	আর্থ সম্পর্ক (ক→খ)
১.	(১)	(১)-(৩)/(৬)-(৭)	বাক্যশীর্ষণ ও বিষয়শনাক্তি *বনাম* সাযুজ্যস্থাপন
২.	(২)	(৪)	নেই
৩.	(৩)-(২)	(৩)-(৪)	সম্পর্কিত সূত্র : ক্ষয় *বনাম* বৃদ্ধি*
৪.	(৪), (৫)	(৫)	নেই

সন্দর্ভবিশ্লেষণ নিয়ম অনুসারে যে কেউ ক/(২) এবং ক/(৪) কে অতিরিক্ত (redundant) বলে বাতিল করতে পারেন। অন্যান্য বাক্য ক্ষেত্রে রূপান্তরীসূত্রও কাজে আসবে না। কিন্তু অর্থগভীরতায় ভিন্ন ভিন্ন সূচকও এখানে প্রায় সমসূত্র চিহ্নিত করে, যেমন ৩ নং ক্রমিকের ক্ষেত্রে হয়েছে।* কিন্তু (ক)-পাঠে চাবী শব্দটি 'কষ্ট', (খ)-পাঠে তার সর্বনামীকরণ ঘটেছে এবং বাক্য-'শীর্ষণে'র রূপান্তর ঘটেছে। (তুমি→তোমার→তার →তাহারে→তুমি) রূপান্তর ও ভাবের সঞ্চালনটি গতিময় ও 'চক্রাকারে' সম্পূর্ণ।

এই পাঠ ও পাঠের উপাদানাবলী তিনটি বিষয়কে নির্দেশ করে, যা মহৎসৃজনীসূত্র (creativity rule) নির্দেশক :

১. ভাষার সামগ্রিক আধার (reservoir) থেকে ব্যক্তিগত প্রবণতায় নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন, উদ্ধার ও প্রয়োগ।
   (এটা একটা নৈর্বাচনিক প্রক্রিয়া ও 'পারঙ্গমতা' বিশেষ)
২. ক. উক্ত নৈর্বাচনিক ও ব্যবহারিক পারঙ্গমতায় ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিত্বের রূপ (ছাপ) আরোপ ;
   খ. এবং মননী ক্ষমতা (characteristics of Intellectual capacity) ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভাষায় 'মনোমুকুরের' (mirror of mind) প্রতিফলন ঘটানো।
৩. শৈলী অভিজ্ঞানের মুক্তি। (তাই বলা হয় 'শৈলী' লেখকের ব্যক্তিত্বের তথা আভ্যন্তরীণ চৈতন্যের প্রকাশরূপ। এবং 'Stylistic judgements relate to deep structure', এ কথাও মিথ্যা নয়।)

কবির (জীবনানন্দ দাশের) নৈর্বাচনিক প্রক্রিয়া বড় বিচিত্র, সে কথা আগেও বলেছি, সেখানে তার পারঙ্গমতা তাঁকে একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মনন ঐশ্বর্য এবং ঋদ্ধ প্রকাশ-শৈলী আজ আধুনিক বাংলা কবিতার ঐতিহ্য। কবিতাটির ('হায়

---

* কান্নার সুর → বেত ফল : ম্লান চোখ →সব রাজকন্যার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও রূপ :: নিরাকার থেকে সাকার কল্পনা (খ-পাঠ)। ক-পাঠের ক্ষেত্রে ক/(২)-(৩)-এ, এই অর্থরূপ অসম্ভব তবে অপেক্ষিত (যথা, ক/(৪)-(৫) দ্রষ্টব্য। অন্যদিকে, খ-পাঠেও অর্থের তুলনীয়তা প্রশ্ন যোগ্য। রূপকথার গল্প-নায়িকা রাজকন্যাদের রূপ-যৌবন-দুঃখ ও দুঃখের উত্তরণ আছে ; বেতের ফলের মতো ম্লান চোখের কোনও ইতিহাস নেই, তাকে ইতিহাসের ভেতর টেনে আনা হয়েছে,—এখানে 'মতো' ব্যবহার করা হয়েছে তাই। তবু তা অন্তর্ব্যাপ্ত, শাশ্বত ও রোমান্টিকতা আভাসিত। ক-পাঠে যদি এই 'কষ্ট' হয় পরিচিত (কারণ এ কার কষ্ট তার বর্ণনা বা উল্লেখ মাত্রে তা সাধারণ হয়ে ওঠে), খ-পাঠে তা ব্যাপ্ত নানা উপাদানে। তা হৃদয়ের অনন্ত খনন, চিরন্তন বেদন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিল'–এর প্রসঙ্গই এখানে মুখ্য) সন্দর্ভ–গঠন বিশ্লেষণের মধ্যে তার প্রসঙ্গতির যৌক্তিকতা সহজেই অনুমেয়।

এই প্রণালীতে একটি পাঠে (Literary Text) পংক্তিমালার ঐক্য নির্দেশ, অর্থগভীরতা বা ব্যঞ্জনাসৃষ্টির কৌশল বর্ণনা আসলে তা কবির মনোগত তথ্যেরই প্রকাশ্য বিবরণী।

আবার সন্দর্ভে আভ্যন্তরীণ সংক্রিয়া ছাড়া বহিঃসূত্রেরও প্রাধান্য থাকে। যেমন কখনও কোনও কবিতার চরণার্থ কিছু বিশেষ সূত্রে (reference) কবি লাভ করে থাকেন। উত্তর রোমান্টিক যুগেও লন্ডনের ফুটপাথে শ্রমিকদের সান্ধ্য খাবারের ঝাঁঝালো ঘিঞ্জি গন্ধ লেগে থাকাটা কবিদের সন্ধ্যাবর্ণনার কাব্যিক পংক্তিতে স্থান লাভ করতো, শ্রমিকদের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকেই। এই অতিরিক্ত তথ্য জানা থাকলে কবিতা বুঝতে যে সহজ হয় বা ঐ বিশেষ শব্দের জায়গায় এসে হোঁচট খেতে হয় না, তা বলা বাহুল্য। 'হায় চিলে'র প্রসঙ্গে W.B. Yeats–এর কথা ও বিশেষভাবে '*He reproves the curlew*' কবিতার কথা বলা হয়েছে থাকে (এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধের গোড়ার দিকেও মন্তব্য করা আছে দেখুন)। এখানে দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের এই উক্তিটি সন্দর্ভ ব্যাখ্যায় প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন,—'(ইয়েটসের) long heavy hair–এর গাঢ় এলোচুলের পাটরাণীদের বদলে এখানে কেবলই পরিচিতার রূপকন্যা হয়ে দূর যাওয়ার, বেদনা হয়ে ফিরে আসার কথা, তবু ইয়েটসের শেষ নীতিপ্রতিম ছত্রে ('there is enough evil in the crying of wind') কবিতার যে ঘের পড়ে গেছে সে স্থলে এখানে ৩, ৪ ও ৫ প্রতি পঙ্‌তিতে ক্রমাগত প্রসার এবং লক্ষ্যান্তর রচিত হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।' জীবানান্দ 'চিল' ব্যবহার করেছেন এবং বার বার নানা শব্দমালার গ্রন্থন সাজিয়ে চিলকে বুঝিয়েছেন অথচ অন্যত্র নিজেরই উক্তি ছিল এই রকম : 'ইয়েটসের সেই কারলিউ পাখির *নিরালা মর্মান্তিক* গান বাতাসে ভেসে আসছে—আমাদের জলদিঘির জলপিপির মতো হয়তো অনেকটা।' তাকেই হৃদয় খুঁড়ে জাগানো বেদনার বেদনার মহৎ উৎস করলেন কবি। এ বেদনা কেমন বা সে কখন জাগে? স্বপ্নে না বাস্তব জাগরণের করুণতম মুহূর্তে? বাক্যরূপটি এখানে অপ্রধান, মুখ্য নয়,—পংক্তিমালায় তখন অন্য ব্যঞ্জনা। এটাই Discourse goal। তাই আর কোন কথা বা ব্যাখ্যা দিলেন না কবি, শুধু সরে গিয়ে মুখ–চরণদুটির পুনরুক্তি ঘটালেন। প্রারম্ভিক চরণদুটির এই পুনরাবৃত্তি ও ধুয়ারূপে (refrain) সংঘটনাতেই এই কবিতার চরম মোক্ষণ ঘটলো।

শৈলীর বিষয়ে তবু কথা থেকে যায় বলে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাটা দিয়েই বুঝতে হয় যে, 'ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, ধ্বনিতত্ত্ব ও রচনার শরীরগত বাক–বৈশিষ্ট্যের ওপর রীতি বিজ্ঞান একান্তভাবে নির্ভরশীল ও দেশে এ নিয়ে নানা ধরণের গবেষণা চলেছে, আমাদের দেশে (ভারত) মারাঠি, হিন্দী, গুজরাটী, তামিল প্রভৃতি সাহিত্যে স্টাইলিস্টিক আলোচনার অনেকগুলি গ্রন্থ লেখা হয়েছে, কিন্তু বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এখনও এ ব্যাপারে লেখক ও পাঠকের ততটা কৌতূহল আকর্ষণ করতে পারে নি।' সন্দর্ভী আলোচনা উভয় দিকের একটি ভারসাম্যও (balance) বলা চলে তাই। ভারতীয় অপর সমালোচক সুরেশ কুমার ১৯৭৭ সনে* তাঁর আলোচনায় এই সব সমস্যা এড়াবার জন্য একটি মডেল উপস্থাপন করেন, যার মৌলভিত্তিতে আছে দুটি প্রকরণ,—তিনি আর্থ একক–এর দিক থেকে যে কোনও Text–কে ভাগ করার কথা বলেন এবং তার Topic (প্রসঙ্গ) এবং Comment

---

* এখানে Indian Linguistics পত্রিকায় এই রচনাটির প্রকাশ সন ধরা হলেও আসলে প্রবন্ধটি পঠিত হয় জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ৫ম সর্বভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক সম্মেলনে (১৯৭৪), যেখানে আমারও একটি প্রবন্ধ ছিল। একই সম্মেলনে পঠিত দিল্লী কলেজের সত্য পাল জুলকা এবং আমার বন্ধু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে মহীশূর কেন্দ্রিয় ভারতীয় ভাষা সংস্থার উপ–সংস্থা ERLC (ভুবনেশ্বর)–এর গবেষক শ্রী প্রদীপ দে আরও দুটো প্রবন্ধ পাঠ করেন,—এখানে আমি সেগুলোরও সাহায্য নিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(বিধেয় বিস্তার)-কে বলতে চান ঐ পাঠের মুখ্য আর্থ একক (principal semantic units)। কবিতায় থাকে refrain বা ধুয়া, অনেক ক্ষেত্রে তা 'নিরর্থ', ছড়া কবিতায় কিংবা মহৎ কবিতায়ও (উল্লেখ্য সেক্সপীয়রের 'টুয়েলফথ নাইট' নাটকেই আছে 'with hay, ho, the wind and the rain' এই নন-সেন্স রিফ্রেইনের পুনরাবৃত্তি ; নজরুলে যেমন 'দে গরুর গা ধুইয়ে'—এগুলির প্রসঙ্গে 'হায় চিল'-এর প্রথম দুই লাইন ও শেষ দুই চরণের মিল ও পার্থক্য আমাদের বুঝে নিতে হবে)।—আর্থরূপ একটা ছাঁদে (pattern) পরিণত হলেও প্রধান রূপটির পাঠগত (T) ধারণা স্পষ্ট হতে থাকে, অন্যান্য রূপ 'ব্যাকরণীয়', যথা—আন্তঃবাক্য সম্পৃক্ত পূর্ব প্রসঙ্গ, পুনরাবৃত্তি, পাঠ-ব্যতিক্রমের চিহ্ন প্রতীক, ধুয়া, বৈপরীত্যতা (contrast) ও সহায়ক অন্যান্য মাধ্যম। (যেমন দ্রষ্টব্য-জীবনানন্দে সর্বনামের রূপ ব্যবহার : তা বহু বিচিত্র)-এগুলি উক্ত সন্দর্ভ বিশ্লেষকদের মতে qualify the description as the woeful story of the (subject). এখানে কবিতায় যা মুখ্য তা তার সংযোজন পরিকল্পনা (cohesion design)। তার ফর্মূলা এই রূপ :

$$R+C = f$$

R (সূত্র বা rules) এবং C (বৈপরীত্য বা contrastive elements) মিলে সংক্রিয়া এবং অন্তর্গত সংযোজনের প্রক্রিয়াগুলি (f = function)-কে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে সহায়তা করে।

এখানে বিষয়টি আর একটু বুঝে নেওয়ার জন্য সন্দর্ভ গঠনের আরও দু'একটি প্রসঙ্গে উল্লেখ রাখা প্রয়োজন। সন্দর্ভ বা পাঠের (এখানে Literary Text) একজন অন্যতম উদগাতা ছিলেন ডোলেজেল (L.Dolezel, 1971)। তাঁর মতে এই সব বিশ্লেষণে সবার আগে প্রয়োজন নিজস্ব পরিভাষা, নিজস্ব ব্যাখ্যা-কাঠামো ও লক্ষ্য (Turget), যাতে তা স্বাতন্ত্র্য অর্জনে সক্ষম হয়। শৈলীতাত্ত্বিকদের লক্ষ্যও আপাতত তাই. তবু ভিন্নতা-ক্রমেই এরা প্রণালীতে এবং কৌশল-প্রকরণে স্বতন্ত্র। অভিনবত্ব সেখানেই। আগে বাক্য পরম্পরার শৃঙ্খলায় Cohesion-সমস্যা নিয়ে ভাবা হতো না, দৃষ্টি দেওয়া হতো না আন্ত-বাক্যের শিকলি সংযোগতত্ত্বের দিকে (Chain-linkage)। পরে দেখা গেল উপরিস্তরের বাক্যশৃঙ্খলা বাক্যগঠনের একমাত্র বর্ণনা কৌশল হতে পারে না। গভীর স্তরে যে পুরো-চিন্তা, প্রসঙ্গতির ভাবনা ও প্রতীকী বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রিয়া করে সে কথা এখানে অবহেলিত থেকে যায়। এভাবেই পাঠগত শৃঙ্খলার (Textuality) মধ্যে চলে আসে কতগুলি নতুন ধারণা, যেমন—সুবিন্যস্ত পাঠ (T-wellformedness), পাঠ-গ্রাহ্যতা (T-acceptability), পাঠ-বৈপরীত্যতায় সমনীতি (T-tolerance), অনুচ্ছেদ উপচ্ছেদ মধ্যে বাক্যাবলীর সংযোগতা ও একত্র মিশ্রণ (combinability) এবং এমনি আরও নানা প্রসঙ্গ ও প্রকরণগত চিন্তা। আন্তবাক্য সংযোজন প্রক্রিয়া ও গঠন ঐক্য সূত্র থেকেই এই চিন্তার ও পদ্ধতির প্রসার।

বিশ্লেষণ

কবি জীবনানন্দ দাশের 'হায় চিল' কবিতার discourse design টি এবার পরীক্ষা করা যেতে পারে। স্বীকার করতে দোষ নেই একটি নিরীক্ষাধর্মী সাধারণ বর্ণনা বা বিবরণ মাত্র প্রদানই এখানে উদ্দেশ্য এবং পূর্বের সমস্ত আলোচনার একটি সারসংক্ষেপ দিয়েই এই মডেলটি পরিকল্পিত। বাংলা ভাষায় পরিভাষাগত সমস্যা আছেই, ব্যাখ্যা কাঠামো প্রদানেও নিঃসংশয় হওয়া দুরূহ মাত্র। বিশ্লেষণটিতে গভীরস্তরের (deep structure) ব্যাকরণও সম্পৃক্ত কিন্তু এখানে তাকে আলোচ্য বিষয় নেওয়া করে সম্ভব হয় নি, তবে আভাষ রাখার চেষ্টা করেছি। সব মিলিয়ে বিশ্লেষণটিকে ত্রিস্তরী করতে হলো (১ শব্দ-সংকেত বিশ্লেষণ, ২ সন্দর্ভ গঠন বিশ্লেষণ, ৩ বয়ানাংশের একরৈখিক গঠন বিশ্লেষণ), বিশেষত মডেলটিতে TG বা গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তরের প্রসঙ্গটি অ-মুখ্য রাখার কারণে। হেতু, TG-ব্যাকরণে 'ক্রিয়াশীলতা'র ধারণাটি বাক্য গঠন ক্ষেত্রে আবশ্যিক বা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবশ্য সন্দর্ভ-বিশ্লেষণে কখনও কখনও তাকে জরুরিও মনে করা হয়ে থাকে। ('discourse is a functional whole.') এই পরিপ্রেক্ষিতেই ও আমাদের পূর্বব্যাখ্যা সূত্রে নিম্ন সারণিসমূহ দ্বারা আমরা প্রথমে পংক্তিমালার উপাদানগুলি চিহ্নিত করবো ও পরে তাদের পরস্পরিক সংযোজনগত—সম্পর্ক গঠনের এবং পদমালার ঐক্যভিত্তির প্রতি ইঙ্গিত করবো।—

বিষয় : 'হায় চিল', জীবনানন্দ দাশ

(১৩৪২ : গ্রন্থে ১৩৪৯/১৯৪২ ; ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সংস্করণ)

[এক]. **ভাষিক উপাদান** (*Linguistic elements*) :

ক. পাঠ একক তথা শাব্দ-পরিসংখ্যান—

মোট শব্দ সংখ্যা	: ৭০ (মূল শব্দ ৪৮, ব্যবহার মাত্রা ৬৮ বা ৭০)	= ১০০%
তৎসম	: ১০	= ১৪.২৮%
তদ্ভব	: ৪০	= ৫৭.১৪%
দেশী	: ২+ (-কো ; ধানসিড়ি) + [আবার], [-টি]	= ২.৮৫%+
বিদেশী	: ০০	
দ্বিত্ব শব্দ	: (১) অন্তর্ভুক্ত	
দ্বৈত ক্রিয়া	: (২) অন্তর্ভুক্ত	
পুনরাবৃত্ত	: ১৮	= ২৫.৭১%

খ. পাঠ এককের ব্যাকরণী চিহ্ন—

বিশেষ্য শব্দ (১৫) :	কানা, চিল, চোখ, ডানা, ধানসিড়ি, নদী, পৃথিবী, বেতের ফল, মন, মেঘ, রাজকন্যা, রূপ, সুর, হৃদয়
বিশেষণ (৫) :	ভিজে, মতো, ম্লান, রাঙা, সোনালী
সর্বনাম রূপ (৬) :	কে, তার, তাহারে, তুমি, তোমার, সে
নির্দেশক (২) :	এই, -টির
অব্যয় (৬) :	আবার, আর, কেন, না, যে, হায়
ঔপভাষিক প্রত্যয় (১) :	-কো
ক্রিয়া (৫) :	আনো, আসে, কেঁদো (না), গেছে, ভালবাসে
অসমাপিকা (৫) :	উড়ে উড়ে, খুঁড়ে, চলে, ডেকে, নিয়ে
ক্রিয়া বিশেষণ (৩) :	দুপুরে, দূরে, পাশে
কারক বিভক্তি (২) :	এ, রে
সম্বন্ধ রূপ (২) :	র, এর
বহুবচন রূপ (১) :	দের

গ. পাঠের বিরাম চিহ্ন/বাক্য গঠন—

প্রশ্ন (১) :	আনো?
বিস্ময় (৩) :	আসে! পাশে! ভালবাসে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাড়ি (১) : অন্ত্য (সর্বশেষ) চরণ
কমা (৪) : চিল, (× ৪)
সেমিকোলন (১) : রূপ নিয়ে দূরে ;

(প্রশ্ন বাক্য ১, বিস্ময় বাক্য ৩, পূর্ণবিরাম বাক্য ১, মোট বাক্য ৫, পংক্তি ৭)

[দুই]. **সন্দর্ভ-উপাদান** (Constituent parts of a discourse with functional value) :

চরণ (পঙ্ক্তি)	উপাদানাংশ (ক-গ)*	বিষয় (১)	আভ্যন্তরীণ [গভীরতল গঠন] সূত্র	বিধেয়ক (৩)	পূরক (৪)	বিবর্ধক (৫)	বাক্য-অন্ত্যরূপ
১	ক (১,৫)	চিল$_১$	[তুমি]	—	—	হায়	—/,/
	খ(৪,–৫)			—	সোনালীডানা	(–এর) চিল$_২$	—/,/
	গ(৪–৫)				ভিজে মেঘ–	(–এর) এই দুপুরে	—
২	ক(১,৩,৪ ৫)	তুমি	[চিল]	কেঁদো	না	–কো,	/,/
	খ(৩,৫)			উড়ে উড়ে		আর	
	গ (৪.৫)				নদী/ ধানসিড়ি	(–টির) পাশে !	# ১
৩	ক (৩)		[আমার]	মনে আসে			
	খ(১,৩–৫)	তোমার		কান্না–	সুর–	–এর/এ	
	·গ(১,৪/৪–৫)	তার			ম্লান চোখ বেতোর ফল	(–এর) মতো	# ২
৪	ক(১,৩)	সে	—	চলে গেছে	যে		
	খ(৩,৪,৫)			রূপ নিয়ে	পৃথিবী/রাঙা রাজকন্যা–	(–এর)–দের মতো	
	গ (৫)					দূরে;	
৫	ক(১,৩,৫)	তাহার (–এ)	[তুমি]	ডেকে আনো ?		আবার/কেন	# ৩
	খ(১,৩,৫)	কে		হৃদয় খুঁড়ে		হায়	
	গ(৩,৪)			জাগাতে ভালবাসে !	বেদনা		# ৪
৬	১ ক–গ						
৭	২ ক–গ						# ৫/১

* ক, খ, গ ইত্যাদি উপাদান নির্দেশক, সংযুক্ত সংখ্যা কলাম বা স্তম্ভ নির্দেশক, ( ) প্রথমবন্ধনীভুক্ত শব্দাংশ বিভক্তি বা নির্দেশক চিহ্ন, [ ] তৃতীয় বন্ধনীভুক্ত শব্দ বাক্যে অনুক্ত (গভীর তল)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[তিন]. বয়ান জরীপ (*Text-structure*) :

১। নৈরাশ্যিক সম্বোধন, অব্যয় {হায়}, বিশেষ্য, কর্তৃ ভূমিকা {চিল$_১$}, বিশেষণ {সোনালী}, বিশেষণ, সম্বন্ধ–এর {ডানা–এর}, বিশেষ্য, শূন্য বিভক্তি, পুনরাবৃত্ত {চিল$_২$}, নির্দিষ্টতা {এই} বিণ, ক্রিয়াত্মক {ভিজে}, বি→বিণ, সম্বন্ধ–এর {মেঘ–এর}, বি. কালাধিকরণ এ–বিভক্তি {দুপুর–এ}, {বিরাম চিহ্নহীন চরণ সীমা}#।

—সূত্র (R) =পুনরাবৃত্তি (Re), বৈষম্য (C), অধীন খণ্ডবাক্য (em-S)

২। দ্বিতীয় পু. বা শ্রোতাপুরুষ–চিহ্ন {তুমি}, অব্যয়, বর্তমান প্রসঙ্গ এখনও , আদৌ, পুনর্বধি {আর}, অসমাপিকা ক্রি দ্বিত্ব {উড়ে উড়ে}, বি. অধি. নদীনাম {ধানসিড়ি নদী}, বিভক্তিযুক্ত পদাশ্রিত নির্দেশক বা নির্দিষ্টকরণ অব্যয় {–টির}, ক্রিয়া বিণ, অধিকরণ {পাশে}, # {বিস্ময় চিহ্ন বিরাম}।

—সরল বাক্য (S_1)+ যৌগিক ও অসমাপিকতা (Infinite)

৩। দ্বিতীয় পু. তীর্যক,–এর সম্বন্ধ {তুমি–এর}, বিণ→বি.–এর সম্বন্ধ {কান্না–এর}, বি.করণ, ভাবাধিকরণ এণজাত এ {সুর–এ}, বি./বি.–এর {বেতের ফলের}→বিণ. লক্ষণী–সাদৃশ্য, উপমা {মত}, তৃতীয় ভিন্ন পু..–এর চিহ্ন {তা–র}, বিণ {ম্লান}, বি. কর্ম শূন্য বিভক্তি {চোখ}, যৌগ–ক্রি {মনে আসে}, {বিস্ময় বিরাম} #।

—সরল বাক্য+বহুবর্ধক

৪। বি.–এর {পৃথিবী–এর}, বিণ {রাঙা}, বি. সমাস–এর, বহু বচন {রাজকন্যা–দের}, সাদৃশ্য {মতো}, তৃতীয় পু. {সে}, সম্বন্ধসূচক সর্বনামী অব্যয় {যে}, ক্রি দ্বৈত তৃতীয় পু. রূপ, অতীত {চলে গেছে}, বি. {রূপ}, ক্রি, অসমা. {নিয়ে} অধি. এ বিভক্তি {দূর–এ}, উপবাক্যসীমাচিহ্ন {বিরাম চিহ্নে অসম্পূর্ণ ভাব,—সেমিকোলন}।

—জটিল বাক্য (S_2), আশ্রিত (em-S)।

৫। ক্রিয়া বিণ. পুনর্বার {আবার}, তৃতীয় পু. তীর্যকরূপের ব্যতিক্রম গঠন, archaic বা প্রাচীনতা {তাহারে<(তাহার–এ)}, প্রশ্ন অব্যয় {কেন}, ক্রিয়া অসমা. {ডাক–ইয়া>এ}, ক্রি দ্বিতীয় পু. চিহ্ন {আন}, বাক্যসীমা চিহ্ন {প্রশ্ন}। প্রশ্ন অব্যয়/ অনির্দিষ্ট সর্ব. {কে}, আক্ষেপ অব্যয় {হায়}, বি. কর্ম, শূন্য বিভক্তি {হৃদয়}, অস. ক্রি. {খুঁড়–এ<ইয়া}, কর্ম. বি. {বেদনা}, অস.ক্রি {জাগা–তে<ইতে}, ক্রি, তৃতীয় পু. চিহ্ন {ভালবাস–এ}, বাক্যসীমাচিহ্ন {বিস্ময়}।

—প্রশ্নবাক্য ও বিস্ময়াত্মক বাক্যের সম আবাহন। সরলগঠন, ক্রিয়ার উপর্যুপরি সংস্থান। কাল সাধারণ/নিত্য।

৬। (১)–এর পুনরাবৃত্তি।

৭। (২)–এর পুনরাবৃত্তি, {পদগুচ্ছের ক্রম ভিন্নতা}।

— ধুয়া (refrain) স্বরূপে আলঙ্কারিক প্রয়োগ ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে মোক্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রদত্ত সন্দর্ভ-বিশ্লেষণে আমরা দেখলাম উপগঠনগুলি সন্দর্ভ পাঠে একটা কৌশলগত, ব্যবহারিক ও আর্থ-সূত্রস্থাপক নিয়মাবদ্ধ। এই সম্পর্কেই উপাদানগুলি সম্পর্কিত। সম্পর্কটি উপাদান-গঠনসমূহের প্রকৃতিসূচক। যেমন—

	উপাদান-সম্পর্ক ('আর্থ একক জোট'-সূত্র)	উপাদান ও প্রকৃতি (চরণ-সম্পর্কসূত্র)
১.	কথামুখ স্বরূপ বিশেষভাবে রূপ-আধান (Setting)	দ্বিচরণগঠন ও পুনরাবৃত্তি (চরণ ১-২/৬-৭)
২.	ঘটনা (event) সংযোগ	একচরণ (৩,৫)
৩.	ঘটনা সম্প্রসারণ—উপমায় সূত্রযোগ (event)	উপচরণ (৪,৫)
৪.	প্রশ্ন ও সংশয় ইত্যাদিক্রমে ভাবের বৈপরীত্যতা ও ঘটনাগত ভাব পরিণতির পূর্বাভাস (Contrast+event-foreshadow+ repeatation)	এক চরণে বাক্যাধিক উপকরণ বা উপাদান (৫)

এখানে গঠনগত উপাদানের ভূমিকা (role) শাব্দ উপাদান (অভিধানী, ব্যাকরণী ও শৈলীসম্পৃক্ত) ও পংক্তি পরম্পরায় গতিশীল; বাক্যাদি বাহু সম্প্রসারিত গঠনে আদ্যচরণ (আদ্যক), উপ-মধ্যচরণ (মধ্যক) ও অন্ত্যক স্পর্শী। বিরাম চিহ্নের বৈচিত্র্যেও তা' বিচ্ছিতা ও দূরান্বয়তা রহিত। বাক্যাংশ, উপবাক্য, অসম্পূর্ণ বা অর্ধবাক্যাদি একটা সম্পূর্ণ অর্থ গঠনেও (তথা অর্থ ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে) সহায়ক। সুতরাং এ সবই পাঠ (text)-টির গ্রহণযোগ্যতা, পাঠ-গ্রাহ্যতা ও এককগত নিবিড় সম্পর্কেরই নির্দেশক এবং অন্তর্গত ভাবগ্রাহ্যতার ঐক্যনীতি, পংক্তিমালার আনুভূমিক বনাম আলম্বিক শৃঙ্খলাকে ঘনিষ্ঠতা দায়ী সূত্র সম্মেলনের ও সংযোগবদ্ধতা (cohesiveness) স্থাপনের প্রকাশ্য দলিলিক প্রমাণ। একইসাথে এর গভীরস্তরের গঠন ও আর্থ ব্যাকরণটিও (রূপান্তরসূত্রসহ) যথাসরল ; এতে সূল গঠনের সহায়ক পূরক বর্ধকাদি ছাড়াও 'সর্বনামীকরণ সূত্র' অনুক্ত কর্তৃকবাচক সর্বনাম পদের সাথে বিধেয়কের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনায় শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সংগঠনের নিয়মানুগ বা আনুষ্ঠানিক (formal presentation) রূপদান আধুনিক সন্দর্ভ বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়। এখানে কেবল সূত্রগুলি সামান্যরূপে সংকেতায়িত করা হলো।

সাত ॥ পরিশেষ

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে আলোছায়ার কেতুসংকেত, ভাবের ঘন সন্নিপাত ও তার কূটাভাস সবই কেন্দ্রিভূত হয় তাঁরই মনোকাতর শব্দরাজিতে। কুড়ানো বাড়ানো শব্দ—ময়ুখ চৌধুরী যাকে বলেন, 'উপেক্ষিত ক্রিয়াপদ সর্বনামের প্রতি পক্ষপাতিত্বে'র 'গেঁয়ো গোয়ার্তুমি',—সেই সব কবেকার পাড়াগাঁর শব্দ। সবই 'ব্যবহৃত ব্যবহৃত', 'উপেক্ষিত', পরিত্যক্ত আর কিছু নবজ এবং নবোঢ়া শব্দ মিলে জীবনানন্দের শব্দের ভুবন। এই দিয়েই রচিত তাঁর নির্জন পথ, আলো-অন্ধকারের গমনাগমনের রাজতোরণ। তাঁর রূপসীবাংলার ঘাটে ; বনলতাসেনের ভৌগোলিক উত্তর পথে ; মহাপথিবীর অশ্বত্থে, শ্রাবণে, শীতে ; ধূসর পাণ্ডুলিপির হলুদ পাতার ভিড়ে ; শঙ্খমালার বা রাজকন্যাদের অতীত ক্লান্তি ও ম্লান স্বপ্নে, বেলাঅবেলার অন্য উপাখ্যানে—সর্বত্রই শিকড় মেলে আছে তারা। জীবনানন্দ সেইখানে একক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য ও জীবনানন্দ"

সনৎকুমার সাহা

জীবনানন্দের প্রবাদতুল্য স্মরণীয় উক্তি, 'সকলেই কবি নয়—কেউ কেউ কবি', এই কথা যে কবিদের আসরে, এবং কবিতার আলোচনায় বার বার উচ্চারিত হয়, তাতে বোঝা যায়, তাঁর চমক, বা তাঁর সত্য এখনও নিঃশেষিত নয়, বরং তাঁর অনুরণনের রেশ প্রসারমান ব্যাপ্তিতে আরো চূড়ায় এবং আগ্রহী মনের পরতে তা সাড়া জাগিয়ে চলে। অচিরেই যে তার অবসান ঘটবে, এমনটির সম্ভাবনা প্রবল দেখি না। আসলে কবি ও কবিতার আন্তঃসম্পর্কের মূল তথ্যটিই যেন এখানে অভিনিবেশ দাবি করে। যদিও এই বাক্যের অভিঘাত সবার কাছে একই রকম, এমনটি মনে হয় না। অনেকে এ অর্থ করেন, এবং তাঁরাই বোধ হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ, যে একটি সুসম্বন্ধ সমাজের যাপিত জীবনের বৃত্তে সবার মনে কবিতা জাগে না, সবার হাতে কবিতা আসে না। যাঁরা পারেন এবং লেখেন, তাঁরাই কবি। সংখ্যায় তাঁরা অগণ্য নন, কিন্তু ক্ষমতায় বিশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট্যের মর্যাদার কথাই বুঝি বা জীবনানন্দ বলে থাকবেন। এতে তাবৎ কবিকুলের আত্মশ্লাঘা বাড়ে। পার্থিব জীবনে সফলতা-বিফলতা যাই আসুক না কেন, তাঁরা যা পারেন, আর কেউ তা পারে না, এবং তা এক আশ্চর্য স্বতোৎসারিত যাদুকরী ক্ষমতা, এই গরিমা তাঁদের তৃপ্তি জোগায়, উৎসাহিতও করে। কিন্তু কারো কারো মনে সংশয় জাগে। জীবনানন্দ কি যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের সবাইকে এক কাতারে ফেলেছেন, না কি তাঁদের ভেতরেও বাছাই করে যাঁরা সত্যিকারের কবি বলে তিনি মনে করেন, তাঁদের আলাদা করে চিহ্নিত করেছেন? যদি তাই হয়, তবে তাঁর কথার অর্থ দাঁড়ায়, 'সকলেই কবি নয়,—কেউ কেউ কবি', এবং সেখানে কবি হওয়া এমন কিছু উৎকর্ষ দাবি করে, সেই সঙ্গে মনোজগতের এমন এক আয়োজন, যা শুধু পদ রচনার পারঙ্গমতাতেই আর সীমাবদ্ধ থাকে না। কবির প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে বিরলপ্রজ বিশেষ এক প্রতিভার মুক্তি ও মোক্ষে, যা অনন্যতায় ও অমরতায় স্থিতি চায় এক একটি কবিতার অনির্বচনীয় পূর্ণতায়। একাধারে তিনি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। দৃষ্টিশক্তি ও সৃষ্টি ক্ষমতা অন্তর্জাতই শুধু নয়, অনেকখানি স্বোপার্জিতও, সব মিলিয়ে যখন তিনি ছাড়িয়ে যান সাধারণের সীমা, তখনই তিনি কবি। এবং তা দিন যাপনের গ্লানি ও প্রাণধারণের প্রাণান্ত প্রয়াসে যদি তিনি বিড়ম্বিত থাকেন, তবুও। এমন হলে কবি হয়ে পড়েন বিশেষের ভেতরেও বিশিষ্ট। চোখের সামনে কবি পরিচয়ে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, তাঁরা সবাই সে পর্যায়ে আসেন না। প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশই বাদ পড়ে যান। কিন্তু জীবনানন্দ কি এইভাবেই ভেবেছেন? বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখতে হয়, এ কারণে তাঁর প্রস্তাবনার পুরো অনুচ্ছেদটাই এখানে তুলে ধরি :

> সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি ; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকিরণ তাদের সাহায্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। সাহায্য করছে ; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না ; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয় ; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

(কবিতার কথা : কবিতার কথা)

প্রথমেই খেয়াল করি, যে কোনো কাব্য প্রচেষ্টাই জীবনানন্দর অনুমোদন পায় না। ন্যায়শাস্ত্রে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্তের মত তিনি উল্লেখ করেছেন 'হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা'র আর, 'তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণের সাহায্যের কথা। সঙ্গে সঙ্গে এও যোগ করতে ভোলেননি, ইচ্ছা করলে, বা চাইলেই যে কেউ ওই শর্ত পূরণ করতে পারে না। 'কল্পনা-প্রতিভা' বা 'ভাব-প্রতিভা' থাকতে হবে, থাকতে হবে তারই ভেতরে, বাইরে নয়, 'চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা'। এবং তা শানিত, প্রাণিত ও বিকশিত হবে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে নয়, দিক-দিগন্তে প্রসারিত আবহমান কাব্যধারার ঐতিহ্য থেকে রসদ নিয়ে এবং বাস্তবতার বহুমুখী গতিশীল সম্পর্ক-সম্বন্ধের অভিঘাত আত্মস্থ করে।

তবে এই সব শর্ত পূরণ হবার পর কবিতা সৃষ্টি স্বয়ং সব রকম বিচার বা ব্যাখ্যার অতীত অন্তর-প্রেরণার ফসল—ওই প্রেরণা-মুহূর্ত কবির বুদ্ধি-বিবেচনা বা ইচ্ছা নেমে আসে না। তাঁকে তার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়, যখন আসে, তখন, জীবনানন্দ বলছেন, 'খণ্ড বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আসাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়—একটি পৃথিবীর অন্ধকার-ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মত যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না,—পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজ-শিক্ষা, লোক শিক্ষা, নানা রকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশি করে, কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোন আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তি বোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্যশরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।' (ঐ) তাহলে দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ মনে করেন, একটি কবিতার চূড়ান্ত সার্থকতা আনন্দের সঞ্চারে, ওই আনন্দের আভা ফুটে বেরোয় গোটা কবিতা শরীরে। (অন্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা-চরণ, 'ফুটে আনন্দ বাহুতে রং ছুটে আনন্দ চরণ চুমি'। কবিতাকে ওই প্রতিমার জায়গায় বসালে জীবনানন্দ যা বোঝাতে চাইছেন, তা অনেকখানি উপলব্ধি করা যায়।) অবশ্যই এ আনন্দ কোনো মনোহারী মাধুরী মায়াই শুধু নয়। চিত্তের গভীর ভাবশুদ্ধতা তাকে জাগ্রত করে। ঈশ্বরের অনুভব বলতে আমাদের যা বোঝান হয়, এ যেন তারই তুল্য, অথবা তারই সমান্তরাল।

কবিতা রচনা, অতএব, কোন কারখানার উৎপাদন নয়, কোনো নিপুণ গৃহিনীর রন্ধনকলায় কেরামতিও নয়, বিশেষ বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণে হৃদয়ে জাগ্রত হয় কবিতা—সবার নয়, শুধু তাঁদেরই, যাঁদের 'কল্পনা-প্রতিভা' বা 'ভাব-প্রতিভা' আছে। এবং সেই সঙ্গে 'সততাপ্রসূত অভিজ্ঞতা'। বিধাতার বিশেষ বরে তাঁরা ধন্য। অন্য দিক থেকে দেখলে অদ্ভুত হবার অভিশাপে অভিশপ্ত। সাধারণের ভিড়ে তাঁরা বেমানান। যদিও সাধারণে জীবনযাপন তাঁদের নিয়তি, এবং সম্ভবত তাঁদের চেতনার আশ্রয়, এমন কি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ যখন বলেন, 'সকলেই কবি নয়—কেউ কেউ কবি'—তখন, মনে হয়, আমরা কবি বলতে যাঁদের দেখি, যাঁদের রচনা ছাপা হয়,—তাঁদের সবাইকেই কবি বলে তিনি গণ্য করছেন না। 'সব কবি নয়'—এইটিই বুঝি বোঝাতে চাইছেন। দেবদুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে যাঁরা কবি, চাইলেই তাঁদের খোঁজ মেলে না। স্বভাব কবির দেখা যদিও মিলতে পারে যেখানে সেখানে। কোন জাতিকে তার সত্যিকারের কোন কবির জন্যে হয়ত অপেক্ষা করতে হয় যুগের পর যুগ। কখনও কখনও কবি হয়ে ওঠেন মুষ্টিমেয় মাত্র কজন, অথবা, এমন কি, একজনও না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চলমানতার অন্তর্গত প্রকৃত বাস্তবতার ধারণার সঙ্গে ব্যক্তি অনুভবের যে অন্বয় তিনি খোঁজেন, তাকে পেয়ে, বা না পেয়ে, যে পরিশ্রুত মর্মবাণী তাঁর কল্পনার আকার বা মননের বিদ্যুচ্ছটায় বিকীর্ণ হয়, তা হয়তা অনেক সময় তাঁর কাল তার সীমিত প্রেক্ষাপটে প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু তার কলোত্তীর্ণ আবেদনে দাঁত বসাতে পারে না। কবির এই অনন্য মাহাত্ম্যের দিকেই মনে হয় জীবনানন্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এবং তাঁর সারা জীবনের সাধনায় ওই কবিত্বেরই তিনি আরাধনা করেছেন।

এমনটিই যদি হয়, তবে কবিত্ব শক্তির যেটুকু 'দৈবে নেশায় পাওয়া' তার কোনো ব্যাখ্যা খোঁজা নিতান্তই বাতুলতা। কিন্তু ওই 'দিব্য বিভা' ত আপনা থেকে ফোটে না। তা নিরবলম্ব নয়। 'দুই হাতে কালের' যে 'মন্দিরা সদাই বাজে', তার তাল, তার ছন্দ সে আত্মস্থ করে। কবি তাঁর চৈতন্যলোকে 'অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা' আহরণ করেন। এগুলো ব্যাখ্যাতীত নয়। কবির হৃদয়, অথবা তাঁর মন বাইরের প্রণোদনায় সাড়া দেয়। হতে পারে সে প্রণোদনা সমসাময়িক, অথবা তা হতে পারে 'বহু যুগের ওপার হতে' বয়ে আসা শিহরণ। এদের চিনে নেওয়া অসম্ভব নয়, এবং এদের ওপর ভর করে কবিতার অন্দর মহলে ঢোকার পথ ঘাটের নিশানাও কিছু কিছু হয়ত পাওয়া যায়। এদিক থেকে কবি ও তাঁর কবিতা সবটুকু না হলেও বেশ খানিকটা আলোচনা-পর্যালোচনার আওতায় চলে আসে। খুঁজে দেখা একেবারে নিরর্থক হয় না কবির মাধুকরী সংগ্রহের ঝুলি। কবিতার ওপর বস্তুগ্রাহ্য নানা দিক থেকে আলো ফেলে তার আত্মার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা যায়। জীবনানন্দও এ বিষয়ে সচেতন। বেশ স্পষ্ট করেই তিনি জানিয়ে দেন, '—কবিমানসের প্রমত্ততা ও তার মহাভাবনার দৌরাত্ম্য তাকে যতই নিরবলম্ব ও অস্পষ্ট করে তুলতে চাক না কেন—পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাকবিই এই অস্বস্তি বোধ করেছে-জনসাধারণের নিজেদের বাচনরীতির সফল স্বচ্ছতার দাবি সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি ; এ জিনিস তাকে—তার অন্তরিন্দ্রিয়কে গঠন করে আসছে সে অনেক আগেকার যুগ থেকে এমনইভাবে, যে কবিতা সৃষ্টি করার সময় সে তার আদর্শ উপায়কে যতটা স্বায়ত্ত মনে করুক না কেন, ততদূর স্বাধীন তা নয়। যে সময়ে সে বাস করেছে, এবং যে সময়ে সে বাস করেনি, যে সমাজে সে কাল কাটাচ্ছে এবং যেখানে কাটায়নি, যে ঐতিহ্যে সে আছে, এবং যেখানে সে নেই—এই সকলের কাছেই সে ঋণী। যদিও শিল্প সৃষ্টি করবার সময় এই ঋণ কঠিন উত্তমনের মত তাকে আক্রমণ করতে আসে না, এবং এই জন্যে উভয়-পক্ষেরই মঙ্গল, তবুও ঋণ বিস্মরণের মানুষ কবি নয়, এ জিনিস ঋণও নয়, উপায় বরং—মর্মার্থী হয়ে বেঁচে থাকবার ; কবির অনুচেতনায় এবং কখনো-কখনো কল্পচেতনার ভিতর সঞ্চারিত থেকে তার প্রতিভাকে সাহায্য করছে তার বিশেষ অভিজ্ঞতাকে দূষিত না করেও যতদূর সম্ভব পরার্থপর করে তুলতে।'

(মাত্রাচেতনা, 'কবিতার কথা')

অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈনাশিক, কিন্তু সে সেই সমস্ত কুয়াশাগুলোকেই কেটে কেটে চলেছে যা পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো। এই সমস্ত চেতনা নিয়েই মানবতার ও কবিমানবের ঐতিহ্য।

(উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, 'কবিতার কথা')

জীবনানন্দের এই সব উক্তি সন্দেহ নেই, এলিয়টের বহুপঠিত বিখ্যাত রচনা Tradition and Individual telent-এর প্রাসঙ্গিক মর্মবাণী মনে করিয়ে দেয়। এলিয়ট যে বলেন, 'It (tradition) involves, in the first place, the historical sense which we may call nearly indispensable to anyone who would continue to he a poet beyond his twenty fifth year ; and the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence, the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a faling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simulations order. The historical sense which is a senesce of timeless as well as of the temporal together, is what makes a writer traditional. And it is at the same time what makes a writer most acutely conscions of the place in time, of his own contemporaneity : —জীবনানন্দে যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনি। প্রতিধ্বনি,—কিন্তু হুবহু নয়। স্থান–কাল–পাত্র–ভেদে চেতনার অভিঘাতে কিছু তারতম্য ঘটে। ঐতিহ্যের প্রস্থানভূমিও ঠিক এক থাকে না। তবে এলিয়টিয় ভাবনার জীবনানন্দে সঞ্চারিত হয়ে আন্তর প্রেরণার অভিনব দিগন্তের উন্মোচন ঘটানো, এ তাঁদের উভয়ের বক্তব্যের সমর্থ নেই এক চমৎকার উদাহরণ বটে।

তবে ঐতিহ্যের ঝারাই–বাছাই ঘটে। বিকাশমান বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রূপময় বিস্তারের ওপর, এবং এযাবৎ মানুষের সমুদয় কীর্তির ওপর আপন চেতনা জগতে কবির স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। এর সবটাই কিন্তু তিনি দাবি করেন না, ব্যবহারও করেন না। তাঁর চিত্তের সাযুজ্য যেখানে যতটুকু, সেখানে ততটুকুই তিনি আহরণ করেন। সেটুকুই তাঁর ঐতিহ্যের নির্বাচন। কবিতা রচনায় তা উপযোগী মালমশলার কাজ করে। কবির কল্পনা–বা–মনন–প্রতিভায় পুরো কবিতা প্রাণ পায়। জাগ্রত হয়। জীবনানন্দের চেতনায় এভাবে উপনিষদ সোফোক্লেস–ইস্‌কাইলাস মিশে থাকে। মেশে মহাভারত, বুদ্ধ–অশোকের প্রেরণা, আর প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনের ধূসর পাণ্ডুলিপি। মেশে দূরাপসরণের প্রবল আকুতি সত্ত্বেও অনিবার্য–ভাবে, এমন কি, রবীন্দ্রনাথ। নিজেই তিনি বলেন তাঁদের 'স্বাবলম্বনের বিবর্তনের' পথে রবীন্দ্রকাব্যের 'অনপনেয় ছায়ার' কথা (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, কবিতার কথা)। তবে সবচেয়ে বেশি নিতে চান–এবং গ্রহণ করেন নিকট অতীত ও সমসাময়িক য়োরোপীয় কাব্য আন্দোলনের ভাবধারা থেকে। নতুন যুগের চিত্রকলার ছাপও তার ওপর পড়ে।

কিন্তু এই নেওয়াটাই কবিতা নয়। কল্পনা ও ধী–শক্তির একাগ্রতায় কবি চিত্তে তাদের মিশ্রণে রহস্যময় রসায়নের পরিণাম যদি পূর্ণতা পায়, তবেই জন্ম নিতে পারে একটি কবিতা। জীবনানন্দের এই রকম সব কবিতার সামনেই আমরা অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করি। 'নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার' 'তূন শূন্য করি' তার পায়ে অঞ্জলি দিই। অনুভবে অতলস্পর্শী গভীরতায় ডুবে যেতে যেতে ধন্য হই। তবু তাঁর ঐতিহ্যের যথার্থ স্বরূপ আর একবার বুঝে নেবার চেষ্টা করি। তাঁর কবিতার 'সুসীম আনন্দের' ঠিক ঠিক উপলব্ধির জন্যেও তা দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনশ্রুতি, প্রবল রোমান্টিক ভাবতন্ময়তা থেকে বেরিয়ে এসে কবিতা রচনা করেছেন জীবনানন্দ। এ নাকি ছিল বাংলায় আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সামান্য লক্ষণ। বিশেষ করে জীবনানন্দ যে রোমান্টিক নন, নিশ্চিতভাবে এই রায় দেন দীপ্তি ত্রিপাঠী। বিশদ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'রোমান্টিক কাব্যে প্রেমের বর্ণনায় যে মোহাবেশ, যে উচ্ছ্বাস থাকে, জীবনানন্দের কাব্যে তা অনুপস্থিত। যে-প্রেম তিনি পাননি, যে-প্রেম শেষ হয়ে গিয়েছে, যা আর কোনদিনও ফিরে আসবেনা জীবনানন্দ সেই অচরিতার্থ প্রেমের কবি। অথচ বিরহ বা বিচ্ছেদকে তিনি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেননি' আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়। পরে এর অনুসরণে আর সকলে চোখ কান মন বুঁজে একই কথা সমস্বরে বলে চলেছেন, কেউ আপত্তি করেননি। দীপ্তি ত্রিপাঠি আরো বলেন, 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ।...সত্যের অন্বেষায় তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে তিনি লাভ করেন নি।' শ্রীমতী ত্রিপাঠির প্রথম মন্তব্যটি অতিকথায় আক্রান্ত। দ্বিতীয়টি অযথার্থ। এটি বোঝার জন্যে আমাদের প্রথমে উনিশ শতকের য়োরোপীয় রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জীবনানন্দের ঐতিহ্যের স্বীকরণের বিষয়টিও এর সঙ্গে জড়িত।

আমরা সাধারণত এ অভিযোগ শুনতে অভ্যস্ত যে রোমান্টিকতা প্রকৃত প্রস্তাবে অহেতুক ও অর্থহীন ভাবালুতার অনুশীলন। সমাজের বাস্তব ভূমির সঙ্গে তা যোগসূত্রহীন, আকাশ-কুসুম স্বপ্ন রচনাতেই তার নিষ্ফল পরিসমাপ্তি। চিন্তা ও যুক্তির সুসম্বদ্ধ জগৎ রোমান্টিক মনের আনুকূল্য পায় না। ক্লাসিক ভাবনায় যেখানে স্পষ্টতা ও বস্তুগ্রাহ্যতা কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখে না, সেখানে রোমান্টিক মন সতত অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান। ক্লাসিক কাব্য যেন '—a kind of warehouse, a tailor's shop of language, supplying garments made to measure for any given feeling or idea'; সেখানে রোমান্টিক কবিতায় 'the 'tumult and confusion' of the imagination wrought havoc with the rules of classicism.' (আর্নস্ট্ ফিশার, দি নেসেসিটি অফ আর্ট)। এই কল্পনা-প্রতিভাই রোমান্টিক কবিদের কাছে আদ্যা শক্তি, তাঁদের প্রকৃত বাস্তবতার অনুভবের ও আত্মোপলব্ধির চাবিকাঠি, মনের গভীর গহন গোপন পুরে প্রত্যক্ষ জগৎ হানা দেয় অবিরাম। চলমান ঘটনারাশির বহুমুখী বিস্ফোরণ মনোজগতেও বিপর্যয় ঘটায়। চেতনায় প্রবল অগ্ন্যুৎপাতের মত সব কিছু তা ছত্রখান করে। কল্পনায় চলে আসে নৈরাজ্যিক প্রগলভতা। ভাবনার অখণ্ডতা ভেঙে যায়। কল্পনারাশি টুকরো টুকরো হয়ে ছড়ায়,আবার অমিত স্বেচ্ছাচারে ক্লাসিক কাব্যের নির্ধারিত নিয়ম উপেক্ষা করে অসবর্ণ মত্ততায় পরস্পর জড়াজড়ি করে। স্তাঁদালের আত্মজীবনীতে এই কথাটা ঘুরে ফিরে আসে, 'ব্যক্তি-চেতনায় স্মৃতি যেন দেওয়াল থেকে খসে খসে পড়া কোন ফ্রেস্কো চিত্র-হাত এখানে, মাথা সেখানে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর সব আর কোথাও,—ফলে বস্তুর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আর তার আয়ত্তে আসে না, সে কেবল একটার পর একটা চোখ ধাঁধানো ছবিতে ওই খণ্ডাংশগুলোর নয়, তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা এলোমেলো বলতে পারে, তাদের পারস্পরিক সংযোগ অন্ধকারে হারিয়ে যায়।' এরই বিপরীতে থাকে,—সম্ভবত এই কারণেই যেহেতু প্রত্যক্ষ বাস্তবতার নিটোল স্বরূপ আর ধরা যায় না, কিন্তু ব্যক্তি তার শক্তির সম্ভাবনাকে ক্রমাগত বাড়িয়েই চলে—রোমান্টিক মনে জেগে উঠতে থাকা বহুদিক থেকে প্রতিবিম্বিত অসীমের তৃষ্ণা, সত্যমূল্যে তাও নিখাদ, এবং একই রকম গভীরভাবে আন্তরিক। দুই প্রান্তের টানাপড়েনে ক্ষত-বিক্ষত হয় রোমান্টিক মন। চেতনায় গলে গলে পড়ে হলদে কুসুম বিদ্যুতের মত ছড়ায় ভাঙা ডিম জোড়া না দিতে পারার হাহাকার, আর অখণ্ড গোটা ডিমের স্বপ্ন। বস্তুগত উদ্ধার কিছুই চোখে মেলে না। সমস্ত অভিঘাতের তুমুল হয় কল্পনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে কল্পনার স্বেচ্ছাচার কোনো অমূলক ভাবোন্মাদনার অনর্থক পরিণাম নয়। রোমান্টিক আন্দোলনের পশ্চাৎভূমিতে থাকে য়োরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের দুই যুগান্তকারীবিপ্লব : আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় মাঝামাঝি থেকে শুরু শিল্পবিপ্লব, আর শতাব্দীর শেষ প্রান্তে, ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব। শিল্পবিপ্লব পুরোনো উৎপাদন সম্পর্কের বাঁধনগুলো, যা এতদিন মনে করা হতো অচ্ছেদ্য, ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। এখানে সেখানে গজিয়ে ওঠে কল-কারখানা। ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব হরণ করে বুর্জোয়া-শক্তি সমাজে মুখ্য ভূমিকায় চলে আসতে শুরু করে। উৎপাদন প্রভু-ভৃত্যের স্থায়ী-সম্পর্কে চিড় ধরে। বাজারে শ্রমের কেনা-বেচা শ্রমিকের ইচ্ছামত কাজ বেছে নেবার সুযোগ যেমন তৈরি করে, তেমনি তাকে গভীর অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার ভেতর ঠেলে দেয়। সমাজের পটভূমিতে কম্পমান অস্থিরতা ব্যক্তি চেতনায় ক্রমাগত আঘাত হানতে থাকে। অনুভূতিপ্রবণ মনকে তা প্রবলভাবে গ্রাস করে ফেলে। ফরাসি বিপ্লব এই বাস্তবতারই এক চূড়ান্ত বিস্ফোরণ। য়োরোপীয় মনের পুরোনো প্রাচীর এক ধাক্কায় হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়ে। গির্জা রাজতন্ত্র ও ভূস্বামীদের যে প্রভুত্ব এতদিন ছিল তর্কাতীত, তার অনড়ত্ব আর প্রত্যক্ষ থাকে না। অভিজাততন্ত্র নয়, সাধারণ মানুষ নিজেদের অস্তিত্বের অধিকার ঘোষণা করে। ফরাসি বিপ্লব ঘটনা হিসেবে যেমন বাস্তবতার ছক ওলটপালট করে দেয়, তেমনি এক অবিনাশী প্রতীকের মত বিপুল প্রেরণায় মানুষের মনে সম্ভাবনার সীমা সম্প্রসারিত করে চলে। নতুন স্বপ্নের-নতুন অভিযানের ও একই সঙ্গে নতুন আশংকার-নতুন অনিশ্চয়তার পথে তা তাকে টেনে নিয়ে চলে। বৈপ্লবিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়ে মানবাধিকারের যে ঘোষণাপত্র ফরাসি গণপরিষদে গৃহীত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে নতুনদিনের সমাজ-ব্যবস্থার স্বপ্ন-কল্পনাকেই সবার সামনে মেলে ধরে। বলা হয়, 'সব মানুষই জন্মে স্বাধীন। সবারই সমান অধিকার।' উচ্চারিত হয় 'স্বাধীনতা, সাম্য ও সহমর্মিতা'র বাণী। সামন্ত প্রভুদের অভিজাততন্ত্র-ও গির্জার সার্বভৌম ক্ষমতার দাপটকে তুচ্ছ করে এই বাণীর অনুরণন য়োরোপের অন্যত্রও জনচিত্তে আলোড়ন জাগায়।

তবে এই যুগল বিপ্লব সমাজজীবনে অস্থিরতাও বাড়ায় অনেক গুণ। শিল্পবিপ্লব সঙ্গে করে আনে শ্রমিক শোষণ ও গণ দারিদ্র্যের প্রকাশ্য প্রদর্শনী। ফরাসি বিপ্লবের পরিণতি, লোকে দেখে, ত্রাসের রাজত্বে। প্রত্যাশার সঙ্গে তাই মেশে হতাশা, সুখের হাতছানির সঙ্গে দুঃখ ভোগের অভিজ্ঞতা। বিপুল সৌন্দর্য তৃষ্ণা ও আনন্দের আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি মুক্ত পরিবেশে বিপুলতর হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনের বীভৎস ও কদর্যতার গ্লানি ব্যক্তির স্বপ্নসাধকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। ভারসাম্যহীন এক মানস জগতে সে আছড়ে পড়ে। তারই যন্ত্রণাও সেখান থেকে 'উজ্জ্বল উদ্ধারের' আর্তি রোমান্টিক মনে বাসা বাঁধে। তা থেকে তার পরিত্রাণ মেলে কদাচিৎ। বারে বারে সে স্বপ্নে ফেরে, বারে বারে বাস্তবের আঘাত তাকে মাটিতে নামায়। অনেক কিছু, অপরূপ কিছু, অসম্ভব কিছুর দিকে সে হাত বাড়ায়, কিন্তু পায় না। পরিপার্শ্বের প্রবঞ্চনা তাকে বিমর্ষ করে, আবার একই সঙ্গে ভাবলোকে উধাও হবার প্ররোচনা জোগায়। ব্যক্তি তার আমিত্বকে আপন বেষ্টনী ছাড়িয়ে বিশ্বপ্রকৃতিতে একাত্ম করে উদ্ধার পেতে চায়।

রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলনের উষালগ্নে আমরা দেখি, গ্যেটের ফাউস্ট তার ব্যক্তিস্বরূপের অমিত অহংকারে ঘোষণা করছে,

— I do not ask for Joy,
I take the way of turmoil's bitterest gain.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Of love-sick hate, of quickening bought with pain.
My heart, from learning's tyranny set free,
Shall no more shun distress, but take its toll
Of all the hazards of humanity,
And nourish mortal sadness in my soul.
I'll sound the heights and depths that men can know,
Their very souls shall be with mine entwined,
I'll load my bosom with their weal and woe,
And share with them the shipwreck of mankind.

শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বাজি রেখে যখন সে বলে,

If to the fleeting hour I say
'Remain, so fair thou art remain!'
Then bind me with your fatal chain,
For I will perish in that day.

তখন তার অনিঃশেষ অতৃপ্তিতে নতুন যুগের বিপুল সম্ভাবনার সামনে ব্যক্তি মনের প্রচণ্ড আলোড়নেরই প্রকাশ ঘটে। রোমান্টিকতার একটা দিক ফুটে উঠতে থাকে এই ভাবেই। এরই পেছন পেছন, অথবা এরই সঙ্গে জড়িয়ে থেকে অতি অনুভূতি-প্রবণ মনে বাসা বাঁধে রোমান্টিকতার উল্টো দিক। পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বোধ ও মানসিক স্থিতি আর ফিরে আসে না। সমস্ত সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তার সামনে ব্যক্তি দাঁড়ায় একা। শ্রম বিভাজন উৎপাদক ও উৎপাদনের ভেতর একৈকান্ত সম্পর্ক ভেঙে টুকরো টুকরো করে। অস্তিত্বের সংশয় ও বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তিকে গ্রাস করতে থাকে। গ্রাস করে প্রথম জীবনে কার্ল মার্কস্‌কেও। ব্যক্তিসত্তার ভঙ্গুরতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখেন, 'The relation of the worker to work...produces the relationship of the capitalist to work. Private property is...the product, the necessary result, of alienated labour, of the external relation of the worker to Nature and to himself...' ব্যক্তিসত্তার অখণ্ডতাকে ফিরে পেতে তিনি স্বপ্ন দেখেন এমন এক সমাজের যেখানে মানুষের কাজ ও ওই কাজের পরিণামফলের ভেতরে কোনো বিচ্ছেদ ঘটবে না, যেখানে ওই পরিণামফল তার স্রষ্টা বা উৎপাদনকর্তা পুরোপুরি আপন চৈতন্যে আবার অনুভব করবে। বিচ্ছিন্নতাবোধ ও সত্তার ঐক্যে ফিরে যাবার এই আকুতি পুরোপুরি রোমান্টিক। জর্মন রোমান্টিক আন্দোলনের তা প্রলম্বিত অবশেষ। মার্কস্-এর শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব অবশ্য আর রোমান্টিক থাকে না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে তা আশ্রয় করে।

জীবনানন্দ যখন 'কল্পনা-প্রতিভা' বা 'ভাব-প্রতিভার' কথা বলেন, যখন লেখেন, '—এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না, কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মণীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়।' (কবিতার কথা, 'কবিতার কথা)—তখন তিনি বিশ্বসাহিত্যে তাঁর রোমান্টিক পূর্বসুরিদেরই অনুসরণ করেন। এই কল্পনা-প্রতিভা অসংলগ্ন অপূর্ণ বা বিবর্ণ বাস্তবের প্রতিকৃতি মাত্র রচনা করেনা, তা তার অন্তর্গত নির্যাসকে ধরতে চায়, অথবা তার আদর্শ কোনো রূপের খোঁজে আত্ম নিমগ্ন হয়। এই কল্পনার মৌলিকত্ব কখনো কখনো উদ্দাম হয়, যেমন ব্লেকের কবিতায়, আবার তা বিশেষ বিশেষ পার্থিব অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা আরোপ করে প্রতিদিনের পথের ধূলা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে চেতনালোক অক্ষয় সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যেমন শেলি, কীট্‌স্। ওই সৌন্দর্য যে শুধু কান্ত-কোমল-সুরূপ-শোভন হয়, তাই নয়, হতে পারে তা রহস্যময় ও ভয়ংকর, বৈনাশিক অথচ সম্মোহক। প্রকৃতির চিরন্তনতা ও মৃত্যুর অনিবার্যতা, একই বাস্তবতার এপিঠ-ওপিঠ দেখাতে দেখাতে রোমান্টিক কবিকে কুহকের মত টানে। তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে শাশ্বতী নারীর চৌম্বক শক্তি। রোমান্টিক কবির কবিতায় এরা একাকার মিশে যায়। মিশে গিয়ে প্রতিমা হয়ে ওঠে। যেমন কীট্‌স্-এর 'La Belle Dame Sans Merci কবিতাটি। প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় গা ছমছম করা অতি-প্রাকৃতের আগ্রাসন, কিংবদন্তী থেকে উঠে আসা নিয়তির মত এক নারী, 'Full beautiful', কিন্তু 'her eyes were wild', এবং তার ছদ্মাবরণে রহস্যময় মৃত্যুর সম্মোহনজালে বন্দী নিঃসঙ্গ এক 'Knight-at-arms', শেষ স্বপ্নে যে দেখে '—pale kings and Princes too., Pale warriors, death pale were they all ; যারা তাকে সাবধান করে 'La Belle Dame sans Merci Thee hath in thrall!'—সব মিলিয়ে প্রাপ্তির-অপ্রাপ্তির, সৌন্দর্য তৃষ্ণার-সৌন্দর্যের ভয়াবহতার ও সেই সঙ্গে তার মোহাচ্ছন্নতায় স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জনের এ এক অসাধারণ রোমান্টিক ভাবোল্লাস। আমরা পরে দেখব, ভিন্ন আঙ্গিকে ও ভিন্ন প্রকরণে এই রকম ভাবাচ্ছন্নতা জীবনানন্দেও ফিরে ফিরে এসেছে। নষ্ট-মৃত বা অতিক্রান্তকে ঘিরে যে হতাশার জাল বোনা, যে অপূর্ণতার বা অনিত্যতার বেদনা, তাও রোমান্টিক কবিদের আর্তিকেই মনে করিয়ে দেয়। আবার কীট্‌স্‌কে স্মরণ করি। 'Ode to a Nightingale'-এর বহুপঠিত কটি চরণ :

The weariness, the fever, and the fret
Here, where men sit and hear each other groan ;
Where youth grows pale, and spectre thin, and dies ;
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs ;
Where beauty cannot keep her lustrons eyes,
Or new love pine at them beyond tomornow.

একই রকম আক্ষেপ ঝরে পড়ে শেলির কণ্ঠে তাঁর অনুরূপ 'To a Skylark' কবিতায়।

We look before and after
And pine for what is not :
Our sincerest laughter
With some pain is fraught ;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

মর্ত্যে স্বপ্ন-বিনাশের যন্ত্রণায় রোমান্টিক মন হাহাকার করে। তারই পরিণাম ভাব-কল্পনায় পূর্ণতার বিকল্প জগৎ রচনা, তাতে প্রস্থান করে যন্ত্রণার ক্ষণিক অবসান খোঁজা। কিন্তু বোদলেয়ারে রোমান্টিক আকুতি তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণায় একাকার। পরিপার্শ্বের বিকার তাঁকে তৃপ্তি দেয় না, কোন সুন্দরের ধ্যানেও তাঁর আশ্রয় মেলে না। 'বেদনা বিহীন অসাড় বিরাগ' তাঁর 'মরমে পশে'। তাই নিয়ে কুশ্রিতার-বীভৎসার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তাঁর অন্তহীন যাত্রা। এযেন সুন্দরের বিপ্রতীপে মুখ রেখে অসম্ভবের সাধনায় সেখানেই সুন্দরকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা। অকল্যাণের-অসুন্দরের প্রতিমার পায়েই তাঁর বার বার অর্ঘ নিবেদন। তাতেই বিচলিত হয় সুন্দরের আসন। কবিতা স্বয়ং এক অকল্পনীয় অনুভব রচনা করে চেতনায় নতুন আলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়ায়। এ অ-রোমান্টিকতা নয়, যদিও আমরা রোমান্টিকতারই এক নিখাদ আপোষহীন উদ্গিরণ। তাঁর বিখ্যাত কবিতা, The Voyage (Le Voyage) এর অন্তিম পর্যায়ে মৃত্যুকেই তাঁর সত্যসন্ধ আহ্বান :

> O Death, old captain, it is time! Raise anchor! this country lesres us, Death! make ready! If the sky and sea are black as ink, our hearts, which you know, are filled with sunbeams!
> Pour us your poison to comfort us! This fire burns our brains so, that we want to plunge to the bottom of the gulf, Hell or Heaven, what does it matter? To find something New in the depth of the Unknown!! (অনুবাদ, Anthony Hertby, the Penguin Book of french Verse-3)

শুরুতে দেখি ব্যক্তি চেতনায় জ্বলে অন্তহীন তৃষ্ণার আগুন, হৃদয়ে তিক্ত বাসনা ;

> One morning we depart, our brains full of flame, hearts swollen with ranwar and bitter desires, and we travel following the rhythm of the waves and rocking our infinity on the finite sea.

এই স্বর তীব্র রোমান্টিক। Our infinity on the finite sea—আধেয় যেন আধারের সীমার ভেতরেই তাকে অতিক্রম করে, যদিও তাতে থাকে না কোনো 'গানের ওপারে' দাঁড়িয়ে থাকা ইতি-বোধের আকুতি।

রবীন্দ্রনাথের 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে'—র সঙ্গে তফাত্‌টা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁর 'অন্য কোনখানে' এক চলমান আনন্দময় যাত্রার স্বপ্ন জাগায়। ওই আনন্দ পূর্বনির্ধারিত। এবং তাই তা রোমান্টিক আকুতির অনির্দিষ্ট পূর্ণতাকে খণ্ডন করে। বোদলেয়ারের রোমান্টিকতায় এমন কোনো বিচ্যুতি ঘটে না। তবে পদ্ধতিতে-প্রকরণে বোদলেয়ার কবিতায় নতুন মাত্রা আনেন। তাঁকে বলা হয় য়োরোপীয় কবিতায় প্রতীকী আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁর Correspondances কবিতায় বস্তুজগৎ ও মনোজগতের যোগাযোগে কবিচেতনায় অনুভবের আস্বাদনে রসায়ন ক্রিয়ায় প্রতীক-নির্ভরতার ছবিটি যেন তাত্ত্বিক চেহারা পায় :

> Nature is a temple, in which living pillars sometimes utter a babel of words ; man traverses it through forests of symbols, that watch him with knowing eyes.... There are perfumes fresh and cool as the bodies of children, mellow as oboes, green as fields ; and others that are perverse, rich and triumphant, that have the infinite expansion of infinite things—such as amber, musk, bengamin, and incense, which chant the ecstaies of the mind and senses. (অনুবাদ, Francis Scarfe, 'Bandaire', Penguin)

কবিতার অবয়বে ফলে অন্যরকম রহস্যময়তা ফোটে। তার ভেতরে যাবার পথ ঘাটগুলো আর সোজাসুজি সামনে থাকে না। আভাসে-ইঙ্গিতে, পরোক্ষ ব্যঞ্জনায় ঘুর পথের মায়ায় তা ভেতরে টানে। শেষ পর্যন্ত ওই মায়ার আকর্ষণ আর কবিতার আস্বাদন একাকার হয়ে যায়। বোদলেয়ারের অনুসরণে যখন র‍্যাঁবো বা মালার্মে কবিতা রচনা করেন, তখন তাঁদের হাতে কবিতার শরীরেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার আত্মা। প্রতীক বহন করে গূঢ় বাস্তবতার নির্যাস। আবেগমথিত রোমান্টিকতা থেকে তা অনেক দূরে সরে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে প্রতীকের হাত ধরেই বিশৃংখল বাস্তবতার অভিঘাতে দিশেহারা হৃদয়ের রোমান্টিকতাকে আবার কবিতায় সংহত করেন ইংরিজি ভাষায় আইরিশ কবি ইয়েট্‌স্‌। আমরা দেখব, এই ইয়েট্‌স্‌-এর কাব্য-কৃতীর ঐতিহ্য কি বিচিত্রভাবে বাংলার জীবনানন্দে এসে মিশেছে।

আগে দেখেছি, কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনায় জীবনানন্দ এলিয়টের ধ্যানধারণাকেও আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু কবিতা রচনায় এলিয়টকে তিনি অনুসরণ করেছেন, এমনটি মনে হয়না। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই এলিয়ট ইংরিজি কাব্যধারায় যুগান্তর আনেন তাঁর The lovesong of J. Alfred prnfrock ও অন্যান্য কবিতা নিয়ে। যে নিরাবেগ, নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি তিনি কবিতায় আনেন, তা জ্ঞানত অ-রোমান্টিক ও স্পষ্টত মননাশ্রয়ী। যুদ্ধের পর তাঁর The Waste land বা The Hollow Men প্রকৃতপক্ষে যুগমানসের বিশ্বাসহীনতা, হতাশা, বন্ধ্যাত্ব ও বিচ্ছিন্নতার অন্তর্জাত ভাষা কাঠামো রচনা করে। টুকরো টুকরো অসংলগ্ন ছবি একে অন্যের প্রতিস্থাপনে পরিপার্শ্বের আভাস জাগায়। অনুর্বর ব্যক্তিসত্তার অর্থহীন সম্পর্ক-সম্বন্ধের একঘেয়েমি ও ব্যর্থতা কটকটে শুকনো শব্দরাশির সুচিন্তিত বিন্যাসে ঝরে ঝরে পড়ে। কবিতা যেন প্রতিদিনের উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপনের গ্লানিকে চিনিয়ে দেয়, ওই জীবন যাপনের গ্লানিতেই গিয়ে মেশে। ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা, যদিও তা যেন এক অশরীরী ছায়া। বাংলায় জীবনানন্দের সমসাময়িক বিষ্ণু দে বা সমর সেন সমাজ ভাবনায় এলিয়টের বিপরীত মেরু বেছে নিলেও কবিতা রচনায় তাঁকেই গুরু বলে মানেন। এ কথা কিন্তু জীবনানন্দ সম্পর্কে বলা যায় না। এলিয়ট পরে ক্যাথলিক বিশ্বাসে আশ্রয় খুঁজেছেন। তাতে অবশ্য তাঁর কবিতার ওপর কোনো পুষ্পবৃষ্টি পড়েনি।

আমরা জানি, য়োরোপীয় সংস্কৃতিতে দর্শন, সাহিত্য ও চিত্রকলা পরস্পর পরস্পরের পুষ্টি জোগায়। বিপ্লবের পর ফ্রান্সে দাভিদ বা দেলাক্রোয়ার ছবি সমকালীন কবিতার মতই রোমান্টিক। উনিশ শতকের শেষে ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকলায় আলোছায়ার সম্পৃক্ত মায়াজাল বস্তুরাশির বিভিন্ন রূপকে একত্র করে তার ভেতরের কোনো ধারণার ঐক্য ফুটিয়ে তুলতে চায়। পরে এক্‌সপ্রেশনিস্ট ও কিউবিস্ট চিত্রকলা বস্তুর ভেতরের অসামঞ্জস্যের ওপরই জোর দেয় বেশি। বস্তুর ধারণাকে দুমরে মুচড়ে অথবা তাকে টুকরো টুকরো করে তার বিশেষ কোনো প্রকৃতিকে তা মূর্ত করে তোলে। সুররিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তববাদী চিত্র আবার স্বপ্নের অনুষঙ্গে ছবিতে প্রত্যক্ষ বাস্তবতা থেকে আলাদা করে প্রকৃত বাস্তবতার মর্মরূপ খোঁজে। সমকালীন কবিতাতেও এর ছাপ পড়ে। কবি তাঁর কাব্য রীতির খোঁজে চিত্রকলার দিকেও হাত বাড়ান। কবিতার হাত ঘুরে য়োরোপ ফেরতা এই ঐতিহ্য বাংলাতেও আসে। তবে তার প্রয়োগ ঘটলে প্রথমে তা বোঝা যায় কবিতার মেজাজে বা তার বক্তব্যে নয়, বরং তার বুননে। মেজাজের ওপর কোনো ছাপ পড়লে তা পড়ে বুননকে অবলম্বন করেই। আধুনিক বাংলা কবিতার বিচার-বিবেচনায় য়োরোপীয় ঐতিহ্যের এই দিকটি আমরা খেয়াল না করে পারি না।

জীবনানন্দ ও তাঁর সমসাময়িক কবিকুল ঐতিহ্য আবিষ্কারের অভিযানে বাংলার দিকে কতটা মুখ ফেরান, কতটুকু কী নেন, এ প্রশ্নও ওঠে। আমরা এটা শুনতে অভ্যস্ত যে সেখানে প্রত্যাখ্যানের তাগিদটাই ছিল বেশি। কবিরা নিজেদের আত্ম-ঘোষণাতেও এ কথাটা আমাদের নানাভাবে শুনিয়েছেন। তাঁদের সমস্যা ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ত্রিপাদ জমিতে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল জুড়ে তিনি তাঁদের সামনের সবটাই আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে অনুসরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে তাঁকে অতিক্রম করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এবং তাঁকে বাদ দিয়ে বা তাঁর উৎস ভূমিকে অস্বীকার করে বাংলা কবিতার সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যে তেমন কিছু আর থাকে না। ওই সব কবি তাই সজ্ঞানে নামেন তাঁকে পরিহারের সাধনায়। কাব্য ভাবনায় বা কবিতা-শরীর নির্মাণে তাঁরা অগত্যা বহির্মুখীই থেকে গেলেন। বিষ্ণু দে খোলাখুলি জানান,

> রবীন্দ্রব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
> চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধিনা, বরং
> আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
> সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
> সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
> রুদ্ধ উৎসে খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের।
>
> (২৫শে বৈশাখ : নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)

জীবনানন্দও লেখেন, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাত না ; অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মলার্মে ও পল ভারলেন, রসাঁর ও ইয়েট্‌স্ ও এলিয়টের সদর্থক বা নঙর্থক মননবিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।' (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, 'কবিতার কথা।') তবে জীবনানন্দের সদা জাগ্রত কবিসত্তা ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েও রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপিতাকে গুরুত্ব দিতে ভুল করে না। অন্যত্র তিনি তাঁকে বলেছেন 'কবিসার্বভৌম', বলেছেন 'উপরে-নিচে-সম্মুখে রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়া'র কথা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের 'বিষমানুপাতিক গতির প্রয়োজন ছিল' মেনে নিয়েও এটা ঠিকই উপলব্ধি করেন, এবং সততার সঙ্গে উচ্চারণ করেন যে, 'রবীন্দ্রকাব্যকে আধুনিকেরা—অন্তত আধুনিকদের একটা উৎকৃষ্ট পক্ষ—সজাগভাবে বিস্রস্ত হতে দিলেও, অবচেতনায় তাঁরাই কাব্যে বরাবর অনুভাবিত হয়ে এসেছে।' সে সময়ের আধুনিকতার চাহিদার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে আর একবার ফিরে দেখা তাই জরুরি মনে হয়। জীবনানন্দের কবি-মেজাজ বোঝার জন্যেও তা কিছুটা সহায়ক হতে পারে বই কি !

সাধারণভাবে এই অভিযোগ ওঠে যে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি ; রোমান্টিকতার মুদ্রাদোষে তাঁর কবিতা তরলিত। এই মুদ্রাদোষ কবিতার বিস্ময়বোধ হরণ করে। ভাবালুতার আতিশয্যে কবিতার রস সংহত হয় না ; গড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই অভিযোগ আংশিক স্বীকার করেন, যদিও একে দোষ বলে মেনে নিতে তাঁর কুণ্ঠা জাগে। 'আমি জন্ম রোমান্টিক'—তিনি লেখেন 'আমি সেই পথের পথিক/যে পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে,/পাখির ইশারা যায় যে-পথের অলক্ষ্য আকাশে।' (অনসূয়া 'সানাই')

তবে এই আত্মপরিচয় তাঁর খণ্ডিত, এবং কিছুটা বিভ্রান্তিকর। কল্পনার অনিরুদ্ধ বিস্তারে তিনি অবশ্যই রোমান্টিক। কিন্তু আবেগের আতিশয্য বা ভাবালুতায় ডুবে থাকার অভিযোগ তাঁর বেলায় খাটে না। কোনো কবিতাতেই তাঁর ভাবের শৃংখলা লুপ্ত হয় না। আবেগ সংহতই থাকে। অতিকথনের দোষ তাঁর কোনো কোনো কবিতায় ঘটে ঠিকই ; কিন্তু তাঁর অসংখ্য কবিতা, বিশেষ করে তাঁর গান—গানে কথা বাড়াবার কোন সুযোগই নেই—পরিমিতিবোধের আশ্চর্য উদাহরণ। এর চেয়ে বড় কথা, রোমান্টিক আবেগ ব্যক্তিচেতনায় বিপুল সম্ভাবনার সঙ্গে যে বিচ্ছিন্নতা, অনিশ্চয়তা ও আত্মিক যন্ত্রণাবোধ থেকে জাগে, রবীন্দ্রনাথে তা প্রবলভাবে থেকেও এক অসাধ্য প্রায় সুষমায় পরম পূর্ণতা পায়। কীট্‌স্-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

La Belle Dame Sans Merci'-র 'And no birds sing'-এর মত সংবেদনহীন প্রকৃতি, বা 'And her eyes were wild'-এর মত সুন্দরের ভয়াল সম্মোহন বা তার বৈনাশিকতা রবীন্দ্রনাথে মাঝে মাঝে ফুটে উঠলেও তা কখনোই শেষ কথা হয়ে ওঠে না। ব্যক্তি সত্তার জাগরণ তাঁর সমগ্রকে ছাড়িয়ে যায় না, ছাড়িয়ে যেতে চায় না, যা কি না আমরা দেখি য়োরোপীয় রোমান্টিক ভাব-বিপ্লবে। অবশ্যই তিনি কীট্‌স্ বা শেলির কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কিন্তু ওই প্রেরণাতেই তিনি আটকে থাকেননি, বা তাকে পরমাগতি বলে মান্য করেননি। তাঁর সর্বাস্তিবাদের পেছনে থেকেছে উপনিষদের ভাবনা। তাঁর শ্রেয়োচেতনা গড়ে উঠেছে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের আদর্শকে অবলম্বন করে, তাঁর সৌন্দর্যানুভূমিতে মিশে থেকেছে কালিদাস ও বৈষ্ণব পদাবলী। এবং সবার ওপরে চেতনাকে তিনি আমৃত্যু সজাগ রেখেছেন। অনুভবে, মননে, উপলব্ধিতে স্বকীয় সাধানায় নিজেকে তিনি বার বার অতিক্রম করেছেন। য়োরোপীয় ছাঁচে ফেলে তাঁকে রোমান্টিক বলে একপাশে ঠেলে রাখলে তাকে সুবিবেচনা বলা যায় না।

দ্বিতীয়ত, বাংলায় রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক কবিরা য়োরোপীয় ইমেজিস্ট বা সিম্বোলিস্ট কবিদের চিত্রকল্পনায় রূপ-রঙ-গন্ধ-বর্ণের দুঃসাহসী সব প্রতিস্থাপনে দারুণভাবে চমৎকৃত ও অনুপ্রাণিত হতে থাকেন। বোদলেয়ার তাঁর Correspondences কবিতার আর এক বিখ্যাত স্তবকে বলেন, like prolonged echoes which merge far away in an opaque, duf oneness, as vast as darkness, as vast as light,- pufumes, sounds and colours answer each to each. এরই প্রভাবে বাংলা কবিতাতেও তৈরি হতে থাকে নতুন নতুন শব্দ-বন্ধ, নতুন নতুন বাক্‌-প্রতিমা। তাদের অভিনবত্ব, ভাবব্যঞ্জনা ও চৈতন্যে লক্ষ্যভেদ নিঃসন্দেহে কবিতার সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিত করে, তার স্বাদে বৈচিত্র্য আনে। জীবনানন্দের কবিতা যে এতে নজর-এবং মন-কাড়ে সবচেয়ে বেশি, এ কথায় বাংলা কাব্যের প্রায় সব আগ্রহী পাঠকই বিনা দ্বিধায় সায় দেন। তবে এমন চিত্রকল্পের নির্মাণ কলার শুরু কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথেই। হতে পারে, পরবর্তী কবিকুল অনেক বেশি দুঃসাহসী, অনেক বেশি প্রাত্যহিকতায় মন, আটপৌরে ও গদ্যগন্ধী, কিন্তু উদ্ভাবনে শব্দ-বর্ণ বা গন্ধের বিষম বিচিত্র মেলবন্ধনে রবীন্দ্রনাথের অনায়াস সিদ্ধির তাঁরা অনুসারী মাত্র। তাঁর নানা গানের কলি থেকে বিক্ষিপ্ত উদাহরণ মনে আসে :

১. মোর পথিকেরে বুঝি এনেছে এবার মোর করুণ রঙিন পথ

২. তার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্য পর্বত

৩. হালভাঙা পাল ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে

৪. তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মত লাগল

৫. আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী
আমি শুনি তোমার আকাশ পারের তারার রাগিনী

৬. ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে

৭. বনের প্রান্তে ওই মালতীলতা
করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা

৮. আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণ গগনতলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীকের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ বোদলেয়ার, মালার্মে বা র‍্যাঁবোর যুগান্তকারী ধ্যান-ধারণা বা কাজ-কর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এমনটি মনে হয় না। অনেক পরে বুয়েনেস আইরেসে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো তাঁকে বোদলেয়ার পড়ায় উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। তিনি আকৃষ্ট হননি। কিন্তু প্রতীকের অসাধারণ ব্যবহার, বলা যায় অতুলনীয়, তাঁর গানে আমরা পাই। তারা অধিকাংশই অবশ্য সাবজেক্‌টিভ। পূজা-প্রেম-প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে একে অন্যে রূপান্তরিত হয়। গান হয়ে পড়ে বহুমাত্রিক। পাঠক বা শ্রোতার স্বাধীনতা থাকে তার ইচ্ছামত অনুভবে নিমগ্ন হবার। অথচ তা স্বয়ং রসের এক পূর্ণতায় গিয়ে পৌছয়। ওই পূর্ণতায় প্রতীক ও তার মূল বাস্তবতা অর্ধ-নারীশ্বরের মত লীলা-বিভঙ্গে জ্যোতির্ময়ী হয়। এদেশে শিল্প সাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহারের জন্য অবশ্য মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই তৈরি থাকে। প্রথাগত জীবনভাবনাতেই প্রতিমা সত্যগুণের জায়গা করে নেয়। প্রথার বাইরেও তার আবেদন ছড়ায়। রবীন্দ্রনাথ এই বাংলাতেই বাউল সাধকদের বিশেষ করে লালনের গানে প্রতীকের আশ্চর্য সজীব ব্যবহার লক্ষ্য করেছিলেন। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়'—তাঁর মন হরণ করেছিল। এটা আধুনিক নয়। তবে আধুনিকতার জমি তৈরিতে এরও কিছু অবদান থাকে। রবীন্দ্রনাথ একে শ্রদ্ধার সঙ্গে শিরোধার্য করেছিলেন। য়োরোপের মুখাপেক্ষী পরবর্তী আধুনিকেরা অনুরূপ সব লোকজ প্রতীক নাগরিক জীবনের সার অথবা অসারত্বের ভাবনা-প্রতিমা গড়ে তোলায় নতুন মাত্রা ও ব্যঞ্জনা দিয়ে ব্যবহার করেন। বিষ্ণু দের মত জীবনানন্দও তা করেছিলেন। তবে তাঁদের প্রতীকের উপাদান বা জগৎ একরকম ছিল না।

প্রতীকের সহায়তায় কবিতাকে বস্তুজগতের সংস্পর্শ থেকে সংগীতের বিমূর্ততায় তুলে নিয়ে যাওয়াই নাকি ছিল মালার্মের আত্যন্তিক সাধনা। শব্দ ও তার অনুষঙ্গ সবই শূন্যে মেলায়। থাকে ধ্বনি আর ধ্বনি নির্ভর চিন্তা প্রতিমা। তাতেই ফোটে কবিতার সৌন্দর্য। তাতেই তার পূর্ণতা। মালার্মের এই কাব্যভাবনা পুরোপুরি বুঝে ওঠা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। ফরাসি ভাষার ধ্বনি ব্যঞ্জনায় ঠিক ঠিক রপ্ত হলে হয়ত তা পারা যেত। অনুমান করি, কবিতাকে তিনি মোৎসার্ট, বিটোফেন বা ভগনারের সৃষ্টিতে ধ্বনির ঐশ্বর্যে যে ভাবপ্রতিমা প্রাণ পায় তারই তুল্য কোনো এক পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ দেখতে চেয়েছিলেন। এ যেন এক অসাধ্য-সাধন ব্রত। নিঃসঙ্গ শব্দ শুধুই তার ধ্বনি-মহিমায় কী করে ভাবনা ও আবেগের শুদ্ধতাকে শুধু ওই শুদ্ধতাতেই তার সমস্ত আনন্দ ও সৌন্দর্যে বিভাসিত করে, তা অনুমান করার ক্ষমতা আমার নেই। অনুবাদে উদ্দেশ্যের মর্মোপলব্ধি আমার অন্তত ঘটে না।

তবে প্রতীক, চিত্ররূপ মায়া ও ধ্বনি ব্যঞ্জনা নিয়ে (শুধুই প্রতীক নয়) রবীন্দ্রনাথের গান যেন মালার্মের কাঙ্ক্ষিত স্বর্গের চরণ স্পর্শ করে (আমার সুরগুলি পায় চরণ)। ভাবনা ও আবেগের শুদ্ধতা, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'রস' ('আমার সকল রসের ধারা), 'মর্ত্য কাছে স্বর্গ যা চায়, সেই মাধুরী', 'পদ্ম' হয়ে ফোটে। 'মধু গন্ধে ভরা—' এই গানটির কথা ধরা যাক। একটার পর একটা অসাধারণ অব্যর্থ সব চিত্ররূপ, সব মিলিয়ে এক নিখাদ রোমান্টিক রসপ্রতিমা,—আমাদের শুধু মুগ্ধ নয়, গভীর গভীর আচ্ছন্নতায় বিবশ করে ফেলে। 'শ্যাম কান্তিময়ী কোন স্বপ্নমায়া', 'রক্ত-অলক্তক-ধৌত পায়ে ধারা সিক্ত ধায়ে' বা 'মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথি প্রান্তে জ্বলে'—আমাদের মনের পর্দায় যে ছবি আঁকে, তা শেষ হয়, 'এই তারাহারা নিঃসীম অন্ধকারে কার তরণী চলে'-র রহস্যময়তায়। মধুগন্ধ ডুবে যায় গভীর অন্ধকারে। আমরা অভিভূত হই। কিন্তু গানের অন্য একটা তলে আমরা দেখি ছবির পাশে, অথবা ঠিক ঠিক বলতে গেলে, ছবির সঙ্গে মিশিয়ে ধ্বনির তরঙ্গ দিয়ে অনুভবের আর একটা জানালা খুলে দেওয়া। প্রথম দুই কলির আয়োজন দ্বিতীয় দুই কলিতে ঘনত্ব পায়, তৃতীয় ও চতুর্থ কলিতে তা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে সমস্ত চেতনার ওপর আছড়ে পড়ে। শেষ কলিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা যেন এক সমে এসে নামে, যদিও তার রেশ অনিশ্চয়তায় ও অনির্দিষ্টতায় ছড়িয়ে যায় ('কার তরণী চলে')। মালার্মে কি এর চেয়ে বেশি কিছু পেতে চেয়েছিলেন?

আমরা খেয়াল করি না, পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পড়ে যাঁরা প্রথম উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, যেমন, ইয়েট্স্, এজরা পাউন্ড, হিমেনেথ্, আঁদ্রে জিদ, তাঁরা সবাই সেখানে ওই সময়ের আধুনিক কবিতার এক একজন দিকপাল। আমাদের আধুনিক কবিরা তাঁদের অনেকের কবিতায় প্রেরণা খুঁজেছেন। সেই তাঁরাই যখন রবীন্দ্রনাথে কবিতার দিব্য বিভা খুঁজে পান, যখন তাঁদের কেউ কেউ বলেন, 'আমরা এতদিন যা করবার ব্যর্থ চেষ্টায় মগ্ন থেকেছি, রবীন্দ্রনাথ কি অনায়াসে তারই পরম রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরলেন', তখন বুঝতে হয় প্রতীক, রূপকল্পনা, 'ধ্বনি ব্যঞ্জনা ও রসরূপের সুমিত পূর্ণতায় কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ এমন এক লোকে উত্তীর্ণ করেছেন, যা ছিল তাঁদেরও অন্বিষ্ট, কিন্তু যা থেকে গেছে তাঁদের অনায়ত্ত। আমরা এদিক থেকে না দেখে অহেতুক সন্তসুলভ ভগবৎ ভাবনার নিদর্শন বলে 'গীতাঞ্জলি'কে মাথায় তুলে রেখে তার ওপর নিদারুণ অবিচার করে থাকি। এবং সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের ওপরও। আধুনিক কবিতার (যে কবিতা চিরকাল শুদ্ধ কবিতা হিসেবে আধুনিক থাকতে পারে) মর্মবাণী যে সেখানে ধ্বনিত হয়েছে, এ কথাটা বোঝার চেষ্টা করি না।

নিজেদের অভীষ্ট পথে রবীন্দ্রনাথের অগ্রযাত্রা আর কেউ না হলেও জীবনানন্দ ঠিকই ঠাহর করেছিলেন। অতি উৎসাহে তাই তিনি তাঁকে খারিজ করে দেননি। এই খারিজ না করায় জীবনানন্দের কবিসত্তার গভীর গোপন জায়গাটির কিছুটা বা আভাস মেলে। অথচ তাঁর কবিতা শরীরে রবীন্দ্রনাথের ছাপ খুঁজতে গেলে বার বার বিফলই হতে হয়। অনায়াস দক্ষতায় তিনি তাঁর নিজস্ব ভুবন গড়ে তোলেন। একে কোনোক্রমেই রবীন্দ্রনাথের জগতের সঙ্গে মেলান যায় না ; তার স্বতঃস্ফূর্ত সম্প্রসারণ বলেও মানা যায় না। কাব্য রুচিতে ও কাব্য-ব্যক্তিত্বে দুরতিক্রম্য ব্যবধান রচিত হয়। তার সবটাই অনুজ কবির সচেতন অভিনিবেশের ফল। তবু কবি স্বভাবে কোথায় যেন একটা ক্ষীণ ঐক্যের সুর বাজে। এটা উপলব্ধির, চোখে আঙুল দিয়ে দেখবার নয়। সম্পূর্ণ অরাবীন্দ্রিক কবিতা লিখেও কবিতার ঘনত্বে তিনি রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেন ; এমন কি রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করেন। প্রতীক সচেতনা, চিত্র-কল্পনা বা আনন্দের অনুধ্যান তাঁর আদৌ রবীন্দ্রনাথের মত নয়। কিন্তু সহজাত প্রেরণায় তিনি যে তাদের স্ফুরণ ঘটান, এবং কবিতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, এতে তিনিই হয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথের নিটকতম সহযাত্রী তাঁর ঐতিহ্যে মেশে, যেমন সচেতনভাবে তিনি আহরণ করেন য়োরোপীয় রীতি-প্রকরণ। তাঁর সমগ্র উত্তরাধিকারের কী তিনি নিলেন, কিভাবে তিনি নিলেন, সেইটাই এখন দেখবার।

তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় জীবনানন্দ লেখেন, 'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী, সম্পূর্ণ অবচেতনার ; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানা রকম ব্যাখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য-কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।—' তবে যা আংশিকভাবে সত্য, তার সবটুকুই কবির মস্তিষ্ক প্রসূত নয়, যদিও মস্তিষ্কেই চলে তার উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালা। ঐতিহ্যের আত্মীকরণে, সমাজ-বাস্তবতার বহুবিধ অভিপ্রায়ে ও প্রত্যক্ষ প্রকৃতির অব্যাহত প্ররোচনায় কবিচিত্তে সাড়া জাগে। তার একান্ত নিজস্ব সংবেদনে কবিতা জাগ্রত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। জন্মদাগের মত ওই সব অনুনয়ের অথবা অনুগ্রহণের ছাপ কবিতা শরীরে ফুটে ওঠে। তাকে শনাক্ত করায় তা কাজে লাগে ; যদিও কবিতার সার্বিক পরিচয় তা নয়, কখনও হতেও পারে না।

ঐতিহ্যের উপাদান কিন্তু কবির ভাবনাতে সংক্রামিত হয় ; তাঁর দেখবার চোখও অনেক সময় বিশেষ দিকে বিশেষভাবে খুলে দেয়। জীবনানন্দ যে কবিতা সৃজনে কল্পনা-মনীষা বা ভাবপ্রতিভার অগ্রাধিকার মেনে নেন, এতে তাঁর কবিচেতনায় রোমান্টিকতার বিসর্জন নয়, বরং তার আয়োজনই প্রাধান্য পায়। তবে রোমান্টিকতার মাত্রাহীন প্লাবন নয়, তার হীরকপ্রভ সংহতিই তাঁর অন্বিষ্ট। কোনো সার্থক রোমান্টিক কবিই অবশ্য ভাবালুতায় ভেসে যাননি। আমরা দেখেছি, রোমান্টিক বিপ্লবও ছিল য়োরোপে যুগল আর্থসামাজিক বিপ্লবের পরিণাম। এবং তা কখনোই মধুরের সাধনায় ন্যাকামিকে প্রশ্রয় দেয়নি। যে অনিকেত ব্যক্তিসত্তার সংরাগ ও সংক্ষোভ বাংলার আধুনিক কবিদের আলোড়িত করে তা প্রকৃত পক্ষে রোমান্টিক কর্ষণেরই প্রত্যাশিত ফসল। জীবনানন্দ নিজেও তা অস্বীকার করেন না। তাই রোমান্টিসিজ্‌মকে সংহত করার কথাই তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই। এবং তাঁর কবিতাতেও তার ছাপ তিনি মুছে ফেলেন না। আমরা তাই দেখি, কীট্‌স্ বা এ্যালাজপো তাঁর কবিতায় হানা দেয় বারবার। কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও বা কবিতার অস্থি মজ্জায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আর 'বনলতা সেন'-এর অনেক কবিতা যেন এঁদের কাছে ঋণ স্বীকার। জীবনানন্দের হেমন্ত ঋতুর বন্দনা বা বিষদ গাথা কীট্‌স্-এর হেমন্তের গান মনে করিয়ে দেয়। 'La Belle Dame Sans Merci'-র ছায়া যেন পড়ে 'শঙ্খমালা'য়। পড়ে এড্‌গার এ্যালান পো'র রহস্যময় নারী সৌন্দর্যের সর্বনাশা ধ্যানরূপেরও। 'বনলতা সেন' নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যে শুদ্ধতম উৎকৃষ্টতম রোমান্টিক কবিতার একটি। একই সঙ্গে তার শরীরে জমে থাকে 'কবেকার সমুদ্রের নুন।' এক সমুদ্র নয়, একাধিক হাজার হাজার বছরের শিল্প-সাহিত্য-সভ্যতার সমুদ্র থেকে ছেঁকে তোলা। কীট্‌স্ এবং পো'র কল্পনার রেণুও তাতে মিশে যায়।

তবে রোমান্টিক ঘনত্বে একরকম তুলনাহীন রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলো। ঘুমের মত তারা মনের পরতে পরতে জড়ায়, প্রলম্বিত লয়ে জীবনানন্দ যাকে বলেছেন, 'কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা', তার বৃত্তান্ত শোনায়। তাদের আবেদন হৃদয়ের কাছে—হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে তারা স্মৃতির স্বপ্নের ও বাস্তবের জীবন ও প্রকৃতির একীভূত সত্তার প্রবহমানতার অন্তর্লীন সুরের 'করুণরঙীন' মায়াজাল ছড়ায়। জীবন ও মৃত্যু একই সূত্রে বাঁধা পড়ে। এবং মৃত্যু অস্তিত্বের স্থায়ীরূপের স্বপ্নসাধে মিলে যায়। যেমন এই কবিতাটি :

> জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে—আর এই বাংলার ঘাস
> র'বে বুকে ; এই ঘাস : সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়—
> ইহাদের ঘোড়া আজো অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙে চলে যায়—
> এই ঘাস : এরই নীচে কঙ্কাবতী শঙ্খমালা করিতেছে বাস :
> তাদের দেহের গন্ধ, চাঁপাফুল ম্লান মাথা চুলের বিন্যাস
> ঘাস আজো ঢেকে আছে ; যখন হেমন্ত আসে গৌড় বাংলায়
> কার্তিকের অপরাহ্নে হিজলের পাতা শাদা উঠানের গায়
> ঝ'রে পড়ে, পুকুরের ক্লান্ত জল ছেড়ে দিয়ে চলে যায় হাঁস,
> আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি — শালিখ নিয়েছে নিঙড়ায়ে
> নরম হলুদ গায়ে এই ঘাস, এ সবুজ ঘাসের ভিতরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোঁদা ধূলো শুয়ে আছে — কাঁচের মতন পাখা এ ঘাসের গায়ে
ভেরেণ্ডাফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে —সাদা স্তন ঝরে
করবীর : কোন এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে গেছে ফুল,
তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে : নরম ব্যাকুল।

এবং এইরকম প্রতিটি কবিতা। আবেগের সততা তাদের ভেতরের সত্যকে প্রস্ফুটিত করে—রোমান্টিসিজম্‌কে বাদ দিয়ে নয় বরং তাকে আরো গাঢ় ও সংহত করে। এই সব অমর পঙক্তিমালা জীবনানন্দ তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি। এটা আমাকে পীড়িত ও বিস্মিত করে। তাঁর সমসাময়িক কবিকুলের নগরমনস্কতার আস্ফালনে তিনি কি কিছুটা সংকুচিত ছিলেন? তাঁদের অনেকেই যে তাঁকে দলছুট ভাবতেন, এবং তাঁকে আধুনিক বলতে যথেষ্ট কুণ্ঠিত ছিলেন, এ কথা ত আমাদের অজানা নয়। অথচ 'রূপসী বাংলা' আধুনিকতাকেও অতিক্রম করে। যখন শুনি , অথবা পড়ি,

—বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চরায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মত যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদীমাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

(বাংলার মুখ আমি)

তখন আমাদের চোখের পাতাও আর শুকনো থাকে না। করুণ গভীর রসাবেশে এক বিশুদ্ধ আবেশ সত্য অনুভবের স্বাক্ষর নিয়ে হৃদয়ের ভেতর থেকে উঠে আসে। আমরা তার কাছে পরাস্ত হই।

তবে রূপসী বাংলা'র কবিতাও একশভাগ জীবনানন্দের স্বকীয় সৃষ্টি হয়েও একশ ভাগ বাঙালি নয়। এখানে সেখানে হঠাৎ হঠাৎ কীটস্ বা অন্য কোনো ইংরেজ রোমান্টিক কবির দু-একটা কবিতা-চরণের ছায়া যেন ভেসে আসে। এতে অবশ্য 'রূপসী বাংলা' তার যাদুকরী অনন্যতা হারায় না। কাব্যিক ঐতিহ্য, দেবোত্তর সম্পত্তির মত। চাষ করবার, ফসল ফলাবার কৃতিত্ব সবটাই কবির। যাকে আমরা সাধারণত কাল-চেতনা বা ইতিহাস চেতনা বলি, জীবনানন্দের কবিতায় তা মূলত প্রবহমান মানুষের ধারায় তার নিয়তি চেতনা। এই নিয়তি একদিকে জীবন-মৃত্যুর ধারাবাহিকতায় গাঁথা অন্যদিকে ওই ধারাবাহিকতায় যুক্ত থেকে তার কীর্তিলেখায় নিজস্ব ছাপ রেখে-ছাপ মুছে ফেলে-আবার ছাপ রেখে এগিয়ে যাওয়া। এইখানে জীবনানন্দের মানস ক্রিয়া উপনিষদের ঋষির মত। ঔপনিষদিক মন্ত্রের দূরাগত রেশ যেন তাঁর বিশেষ বিশেষ কবিতায় আমরা শুনি। তিনি নিজেও'কবিতার কথা'য় একাধিক বার উপনিষদের উল্লেখ করেছেন।

তবে অন্যতর উৎসও আছে। এলিয়টের Tradition and Individual Talent-প্রবন্ধের উল্লেখ আগেই করেছি। আমাদের রবীন্দ্রোত্তর প্রধান কবিদের কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর এর প্রভাব উপেক্ষা করার নয়। অনুমান করি, জীবনানন্দও এতে একটি দৃষ্টিপথের ইংগিত পেয়েছেন—কবিতায় নিজেকে জানার ও জানাবার পথ। তিনিও লেখেন, 'মহাবিশ্ব-লোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো ; কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে বিচ্যুতির কোন মানে নেই আমার কাছে।' (কবিতা প্রসঙ্গে, 'কবিতার কথা')। তবে কবিতা লেখায় এলিয়টের চোখ ধার করে জীবনানন্দ খুব বেশি পথ হেঁটেছেন বলে মনে হয় না। ('হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে') এলিয়ট হৃদয়ানুভূতি বা আবেগকে আদৌ প্রাথমিকতা দেননি। মননের পথ ধরে অসংখ্য গাণিতিক সমীকরণের মত মানবভাগ্যের যৌক্তিক বিন্যাস তিনি পাঠ করেছেন। পরে ওই সমীকরণের সমাধানের বা সমাধানহীনতার ধাপগুলো বেছে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কবিতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সংগতির ইশারা লুপ্ত করে দেননি। পাঠকের তৃপ্তি ওই ইশারা ধরে এগিয়ে কোনো ব্যঞ্জনাময়, হতে পারে নঙর্থক বা শূন্যগর্ভ, বক্তব্যে গিয়ে পৌঁছুনোয়। এই বৌদ্ধিক আনন্দে হৃদয়ের কোনো অংশিদারিত্ব নেই। মেধার, বৈদগ্ধ্যের ও বাক্‌চাতুর্যের আছে। জীবনানন্দ মেধা বা মননকে পাশ কাটিয়ে যাননি। কিন্তু অনাসক্তভাবে হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে তার অন্তরতর আকুতিকে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই তিনি তাদের আশ্রয় করেন। কোনো যৌক্তিক সমাধানে বা সমাধানহীনতায় পৌঁছুবার জন্যে সমীকরণরাশির অন্বেষণে নয়।

কালচেতনার জীবনানন্দ এবং ইয়েট্‌স্‌-এর সমধর্মী। প্রতীকে ও চিত্রকল্পনায় সঞ্চালিত আবেগ—শুদ্ধ ও সংহত আবেগ, চৈতন্যে প্রতিফলিত আবেগ—কালের গতিময় পথ ধরে ইয়েট্‌স্‌-এর মতই তিনি শরীরী করে তোলেন ; শব্দ স্পর্শ ও গন্ধের ঘনত্বে তাকে মেদুর করে তোলেন। ইয়েট্‌স্‌-এর Byzantium কবিতার প্রথম দুই স্তবকে পড়ি :

The unpurged images of day recede ;
The Emperor's drunken soldiery are abed ;
Night resonance recedes, night-walkers' song
After great cathedral gong ;
A starlit or a moonlit dome disdains
All that man is,
All mere complexities,
The fury and the mire of human veins.

Before me floats an image, man or shade ;

Shade more than man, more image than a shade,
For Hades' bobbin bound in mummy cloth
May unwind the winding path ;
A mouth that has no moisture and no breath
Breathless months may summon ;
I hail the superhuman ;
I call it death-in-life and life-in-death.

অতীতের মানুষী মহিমায় অথবা মানবভাগ্যের বিষাদঘন শাশ্বত কোনো কল্পনায় দৃষ্টি প্রসারিত করে একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ বা অনুভবে চিরকালের ব্যাপ্তি খোঁজা, ইয়েট্‌স্‌-এর মত এই আকুতি জীবনানন্দেরও। তাঁর আবেগের কল্পনাপ্রতিমা মহাকালের পথ পরিক্রমা করে বিশেষ মুহূর্তের ভাবরূপে এসে স্থিরতা পায়, এমন উদাহরণ তাঁর কবিতায় অনেক। যেমন, বনলতা সেন, সুরঞ্জনা, নগ্ন নির্জন হাত, হাওয়ার রাত, হাজার বছর শুধু খেলা করে, নাবিক, উত্তরপ্রবেশ, ইত্যাদি। কবিতাগুলো এতই পরিচিত ও আশ্চর্য দ্যুতিময় যে এখানে তাদের কোনো উদ্ধৃতি নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। পাঠককে যে শুধু তারা চুম্বকের মত টানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই নয়, আনন্দময় প্রজ্ঞা ছড়িয়ে তার কল্পলোককে সমৃদ্ধও করে। যে সব কবিতায় প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতিমায় কালান্তরের রহস্য এসে জমে, এডগার এ্যালান পো'র অনুরূপ কবিতায় কল্পনার আলো–ছায়া সে সবে যেন হানা দেয়।

তবে জীবনানন্দের কবি–স্বভাব সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছিল বুঝি ইয়েট্‌স্‌–এরই। প্রতীকে, চিত্রকল্পনায়, এমনকি বিষয়ভাবনাতেও ইয়েট্‌স্‌ ঘুরে ফিরে তাঁর কবিতায় এসে ভর করেন। মনে হয় জীবনের জড় আর হতাশা, ব্যর্থতা ও মৃত্যু ভাবনা, সৌন্দর্য তৃষ্ণা ও অতৃপ্ত বাসনা, যুগ–জটিলতা ও যুগ–বিহ্বলতা, এসবে দুজনের মানস–বিহার যেন একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে ঘটে চলে। কাব্যিক ঐতিহ্যের কাছে হাত পাততে জীবনানন্দ বার বার ইয়েট্‌স্‌–এর দরজাতেই এসে কড়া নাড়েন। এমন কটি উদাহরণ আছে, যেখানে জীবনানন্দের সৃষ্টিকে মনে হয় ইয়েট্‌স্‌–এরই অনুসৃতি। বহুপরিচিত ও বহুল আলোচিত এই রকম ইয়েট্‌স্‌–এর 'He Reproves the Curlew', আর জীবনানন্দের 'হায় চিল।' দুটোকে পাশাপাশি রেখে পড়লে, জীবনানন্দ যাকে বলেছেন, ঋণ, আবার ঋণও নয়, বরং 'মর্মাথী হয়ে বেঁচে থাকবার' 'উপায়', তার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

ইয়েট্‌স্‌–এ, O curlew, cry no more in the air,
Or only to the water in the west ;

জীবনানন্দের 'হায় চিল'–এ একই রকম,

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে–উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে

—'The curlew'-র পরের কটি চরণ :

Because your crying brings to my mind
Passion-dimmed eyes and long heavy hair
That was shaken out over my breast ;
There is enough evil in crying of wind,

আর জীবনানন্দ একটি মাত্র পঙক্তিতে তাকে সংহত করেন,

তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে ;

কিন্তু তারপরই ইয়েট্‌স্‌কে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে উচ্চারণ করেন আশ্চর্য সুন্দর বেদনাঘন অমর পঙক্তিমালা :

পৃথিবীর, রাঙারাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালবাসে !

তারপর প্রথম দুই চরণের অল্প একটু ঘুরিয়ে পুনরাবৃত্তিতে কবিতাটির পরিসমাপ্তি।

'হায় চিল' জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠতম কবিতার একটি। কিন্তু একে কি বলা যাবে মৌলিকত্বহীন ও পরস্বাপহারী? অবশ্যই নয়। কোনো কবিতাই নিরবলম্ব সৃষ্টি হয় না। ভাষা ও ভাবনার ঐতিহ্য যে রসদ জোগায় কবি চিত্তে আপন আকুতির সঙ্গে তার দৈব রসায়নে জন্ম নেয় একটি কবিতা। সব সময় নয় ; কখনো কখনো। ইয়েট্‌স্‌–এর 'Curlew' আলোয়–মেঘে জলে–হাওয়ায় ভেসে ভেসে জীবনানন্দের চেতনার আকাশে এসে ধরা দেয়। ওই ভাবনা–বীজ তাঁর অন্তর্জগতে তিনি ধারণ করেন। পরে তার 'অমর অঙ্কুর' থেকে ফুটে বেরোয় 'হায় চিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কবিতা ততটাই মৌলিক যতটা যে কোনো সৎ ও শুদ্ধ কবিতা মৌলিক হতে পারে। একই বিষয় নিয়ে একাধিক কবির উল্লেখযোগ্য মৌলিক, কবিতা আছে। স্কাইলার্ক পাখি নিয়ে কবিতা লিখেছেন শেপি ওয়ার্ডসওয়র্থ, এবং কিছু পরে জর্জ মেরেডিথ্। একই ভাব-কল্পনা তিনটি কবিতাতেই। দৃশ্য-কল্পনাও কোথাও কোথাও এক। কিন্তু তারা একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু—'Curlew' আর 'হায় চিলের' শুরুতে দৃশ্যকল্পনা শুধু নয়, কথাও প্রায় এক। এতেও জীবনানন্দের মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। একটি কবিতায় অন্য কবিতার শব্দ বা বাক্য-বন্ধ অনায়সে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু তারপরেও সব মিলিয়ে সে হয়ে উঠতে পারে অলৌকিক। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'ঝুলন' কবিতায়, 'শুনায়েছি তারে মাথা রাখি পাশে/কত প্রিয় নাম মৃদুমধু ভাষে/গুঞ্জরতান করিয়াছি গান জ্যোৎস্না রাতে,'—অনিবার্যভাবে মনে করিয়ে দেয় কীট্স্-এর 'Ode to a Nightingale-এর '—for many a time/I have been half in love with easeful Death/call'd him soft names in many a mnsed rhyme—'. (জীবনানন্দের 'জীবন' কবিতাতেও পাই এর প্রতিধ্বনি, 'মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো—প্রিয়ার মতন।) এতে 'ঝুলন' বা 'জীবন' কবিতা তার স্বাতন্ত্র্য হারায় না। 'হায় চিলে'র ধ্বনি ব্যঞ্জনায় প্রলম্বিত হাহাকারের রেশ যেন '—Curlew' র বেদনা বিলাপকেও ছাড়িয়ে যায়। 'There is enough evil in the crying of wind'—এখানে 'evil' শব্দের অন্তরালে যে তিক্ততা ও অভিযোগের আর্তি আছে 'হায় চিল' তা থেকে দূরে সরে যায়। আর তার পরেই শুনি বেদনার গভীরতম, আত্মমগ্নতম শুদ্ধ-সত্যতর বাণী 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে।' কবিতা অমরত্ব স্পর্শ করে, যদিও তার জন্যে কবিতাটির পুরো আয়োজনেরই মূল্য আছে। কারণ, কবিতা শুধু একটি অবিনাশী বাক্যের উচ্চারণ মাত্র নয়। তার সমস্তটার দিব্য বিভাতেই তার পরিচয়।

আমরা জানি জীবনানন্দের কবিতার 'চিত্ররূপময়তা' রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেন, 'তাঁর কাব্য বর্ণনা বহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।' কাব্য বর্ণনাবহুল বলায় তা নিয়ে খুব বেশি তর্ক করা না গেলেও এতে অতি সরলীকরণ আছে। বর্ণনার পরতে পরতে ভাবার্থ বাচ্যার্থের আড়াল থেকে উঁকি মারে। তা চেতনাকে অন্য এক স্তরে তুলে নেয়, যেখানে বর্ণনা অবলম্বন মাত্র। আবার শুধুই অবলম্বন নয়, ভাবনার অনুষঙ্গীও বটে। সেখানে বর্ণনার চিত্ররূপময়তা প্রকৃত পক্ষে ভাবের বহুমাত্রিক বহুবর্ণিল সারাৎসারেরই প্রকাশমাধ্যম। তা আমাদের অতলে টানে। আমরা বোধের এক বর্ণনাতীত বাস্তবতার স্বাদ পাই। অতএব বর্ণনা হয়ে দাঁড়ায় অনেকখানে প্রকৃত বাস্তবতার প্রতীক, যে প্রকৃত-বাস্তবতার উদঘাটনই ; মনে হয়, কবির উদ্দেশ্য। তবে তাতে লেগে থাকে সুন্দরের অনুভব, যে সুন্দর অতিক্রম করে প্রত্যক্ষকে, কিন্তু রূপ আহরণ করে প্রত্যক্ষের যদিও অনেক সময় তা ধরাবাঁধা কার্যকারণ সম্পর্ক থেকে নিষ্কাসিত। বর্ণনায় তাই কোথাও কোথাও পরাবাস্তবতার ছোঁয়া লাগে। যেখানে তেমন না হয়, সেখানেও রূপ-কল্পনায় আসে অভিনবত্ব, ঘটে অভাবনীয় সংশ্লেষণ। জীবনানন্দের কবিতায় এভাবে প্রতীক ও চিত্রকল্প হয়ে ওঠে তাই একান্তই তাঁর নিজস্ব-তাঁর আত্মমগ্নতার পরিচয়বাহী। যদিও সমাজ ও কালচেতনা ওই আত্ম স্বরূপের মর্মমূলে ক্রিয়াশীল থাকে সব সময়।

এইখানে ওই চিত্রকল্পনায় বোদলেয়ারের Correspondence যেন আর একটা 'উপায়ের' মত কাজ করে। রূপ রস গন্ধ সব পরস্পর জায়গা বদল করে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। আবার ওই যুক্ত হবার চেহারায় ও মেজাজে দারুণভাবে ছাপ ফেলে সমকালীন য়োরোপীয় চিত্রকলার নানারকম ধ্যান-ধারণা, বিশেষ করে ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্ ও এক্‌স্‌প্রেশ-নিজ্‌ম্। জীবনানন্দই বোধ হয় আমাদের একমাত্র প্রধান বাঙালি কবি, যাঁর কাব্যভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়োরোপীয় চিত্রকলার নতুন নতুন ধারা থেকে ভাব আহরণ করে পুষ্ট হয়। অথচ মজা এই, য়োরোপীয় ঐতিহ্যকে এভাবে গ্রহণ করলেও তাঁর কবিতাকেই বাঙালি পাঠকের সবচেয়ে আপন মনে হয়। কবিতার গভীরে ছন্দ ও লয়ের যে মায়া তিনি রচনা করেন, তা যেন বাঙালি জীবনের নান্দনিক ঐতিহ্য থেকে উঠে এসে বাঙালি চেতনাকেই আচ্ছন্ন করে। সব রকম ঐতিহ্যের আহরণকে সৃষ্টিশীলভাবে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি স্বয়ং আপন বৃত্তে তার নিজস্বতা নিয়ে বেরিয়ে আসে। চিত্রকল্পনাও খাঁটি বাঙালি চেহারা পায়।

এইসব চিত্রকল্পনা বাংলা কবিতার পাঠকদের এত পরিচিত যে তাদের নিয়ে নতুন করে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে কটি নমুনা তুলে ধরি শুধু। অপরকে জানাবার জন্যে নয়। তাদের উল্লেখ মাত্রেই যে আনন্দ, তা আর একবার পাব বলে।

১. পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

২. সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং মুছে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
(বনলতা সেন)

৩. এই বলে ম্রিয়মান আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়িয়ে রহিল হাঁটুভর।
(দু'জনে)

৪. চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝ'রেছে দুবেলা
নির্জন মাছের চোখে,—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে,
মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নায় উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে।
নীলাভ নোনার বুকে ঘন ঘাস আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;
(মৃত্যুর আগে)

৫. জ্যোৎস্না রাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মত জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ।
(হাওয়ার রাত)

৬. হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত প্লাবিত বলিয়ান রৌদ্রের আকাশে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনী গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট
সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়। (ঐ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ।
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

৮. আমি সেই সুন্দরীর দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝ'রে পড়ে তার—
(অবসরের গান)

৯. নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝ'রে—
(নির্জন স্বাক্ষর)

১০. আমার হৃদয়—এক পুরুষ হরিণ—
(ক্যাম্পে)

১১. সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
(আকাশলীনা)

যা লক্ষণীয়, তা হলো এই সব ছবি কখনো বাস্তবের ভেতরের রূপ টেনে বের করে, কখনো বা ইংগিতধর্মী—ছবি স্বয়ং প্রতীক হয়ে ওঠে। আমরা উভয়ের টানেই আকৃষ্ট হই। তবে প্রবলভাবে য়োরোপীয় কাব্য ও চিত্রকলার ঐতিহ্যে সংলগ্ন হয়েও এরা বাংলা প্রতিমারই নানা প্রহরণ, নানা উপকরণ। ওই প্রতিমাকে প্রাণময়ী করে তার ভেতরের সত্য সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলাতেই তাদের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পনাও, আমরা দেখেছি বাংলা কবিতায় নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের চিত্রকল্পনার তফাত খুবই স্পষ্ট তবে তা ধারণগত বা প্রক্রিয়াগত নয়। তা মূলত বিষয়গত এবং কোথাও কোথাও মেজাজগত। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পনার যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই এটা বোঝা যায়। জীবনানন্দ তাঁর কল্পনা প্রতিভাকে অবশ্য আরো উদার ও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেছেন। তাঁর চিত্ররূপের ঐশ্বর্যের বিস্ময় আমাদের স্তম্ভিত করে রাখে।

এ কথা সত্য, জীবনানন্দের কবিতার সূক্ষ্ম সংবেদনা আবহমান মানব হৃদয়ের নিঃশব্দ রক্তক্ষরণের অবিরাম ধারায় সিক্ত। যে 'বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে', আর 'আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লান্ত-ক্লান্ত করে', তার গভীরে তিনি চোখ রেখেছেন স্থির। কোনো মনোরম প্রতারণায় অথবা সহজসুখের প্রলোভনে তিনি বিচলিত হননি। তাই বলে তাঁকে 'বিভ্রান্ত কবি' বলা নিতান্তই বাতুলতা। কবিতার সত্যের আরাধনায় হৃদয়ের অনুনয়ের মৃদুতম ধ্বনিটুকুও শোনার জন্যে তিনি কান পেতে রেখেছেন সারাক্ষণ। একে রোমান্টিক আকুতিই বলতে হয় ; যদিও তা বিশ শতকের আরো বৈনাশিক অস্থিরতায় ও তীব্রতর অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত। কবিতায় তাকে সংহতি দিতে যে দুশ্চর রূপ-তপস্যা ও মনন-শৃংখলার প্রয়োজন হয়, জীবনানন্দ তাতে নিবেদিত ছিলেন 'আমৃত্যু-আজীবন।' এবং তাতে যেমন কোনো শৈথিল্য দেখাননি, তেমনি নিজের কাজ সম্পর্কে কোনো দ্বিধাতেও ভোগেননি। খুব স্পষ্ট করেই জানতেন, কি তিনি লিখছেন, কেন তা লিখছেন। 'ভিড়ের হৃদয়ের' পরিবর্তন তিনি চেয়েছেন। কিন্তু ভিড়ের মানুষ তিনি হতে পারেননি। উত্তরাধিকারের কতটুকু আপন ঐতিহ্যে তিনি গ্রহণ করবেন, এটা তিনি নিজেই স্থির করেছেন। অন্য কারো দ্বারস্থ হননি। আপন বিবেচনায় আস্থাও হারাননি। 'বিভ্রান্ত' নয়, এক আত্মস্থ, স্থির-লক্ষ, অমৃত-সন্ধানী কবির নামই জীবনানন্দ দাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কাব্যের লোকজ উপাদান : সাম্প্রতিক নিরিখ

আহমদ ছফা

উনিশশো তিরিশের যুগের সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর পরিমণ্ডল রবীন্দ্রনাথের বাইরে, নজরুল ইসলামের চাইতে দূরে। কল্লোল যুগের বন্ধুদের যখন বিক্ষোভ বিদ্রোহ, অসন্তোষ একটি সীমিত বলয়ে বার বার উদাত্ত উদ্‌ঘোষণায় তরঙ্গভঙ্গে ফেটে পড়েছে, সে সময়েও জীবনানন্দ দাশ তাঁর বোধ এবং মননের ব্যথা বুকে নিয়ে আরেকটি আলাদা ভুবনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের বাইরে ছিলেন, কিন্তু রাবীন্দ্রিক স্থৈর্যের কিছুটা যেন কোনো কারণে পেয়ে গিয়েছিলেন। এই মিল সৃষ্টির কর্মকাণ্ডের ভেতরের নয় শুধু, বহিরঙ্গেও তার কিছু ছাপ মেলে। নজরুল ইসলামের বিপরীত অক্ষরেখায় তাঁর অবস্থান। একটুও আশ্চর্য শোনায় না, নজরুল ইসলামের বলবন্ত আবেগের কিছুটা তাঁতেও সঞ্চারিত হয়েছে। এ ছাড়া ছিলেন তাঁর বন্ধুবর্গ কি বুদ্ধদেব বসু, কি বিষ্ণু দে কল্লোলীয় প্রমুখ কবিদের সঙ্গে একমাত্র সমকালীনতা ছাড়া কোনো উল্লেখ্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। না ভাবের দিক দিয়ে, না শব্দ চয়নের দিক দিয়ে, না অন্তর্দৃষ্টি না জীবন দৃষ্টির দিক দিয়ে জীবনানন্দ দাশ কল্লোল যুগের অন্য কোনো কবির সমীপবর্তী নন ; না–অন্য কোনো কবি জীবনানন্দ দাশের। রাজনীতির সন্ত্রাসবাদের মতো কাব্যের সে সন্ত্রাসের যুগে জীবনানন্দ দাশকে শহর ছাড়িয়ে, কোলাহল ছাড়িয়ে একান্ত আপন মানস সংগ্রামের বিচ্ছিন্ন নির্জনতায় অবস্থান করতে হয়েছে। একজন মুখ্য কবি যাঁর রচনার মধ্যে একটি জনগোষ্ঠীর চৈতন্য নতুন আভায় মণ্ডিত হয়েছে, কাব্যের পরিধির প্রসারণ ঘটেছে ভাষার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে লোকভাষার শব্দপুঞ্জ চৈতন্যস্রোতে বাহিত হয়ে কাব্যলোকে উঠে এসেছে ; সে কবি সংস্কৃতির নানা প্রশ্নে নিজের ভূমিকা যদি পরিচ্ছন্ন না করেন যুগ সমাজ–সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা কি যদি বুঝতে পারার মতো আভাসে ইঙ্গিতে হলেও একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা না দিতে পারেন, তা'হলে সে কবিকে নানা জনের ব্যাখ্যার ওপর নানাকালের বিচারের ওপর নির্ভর করতে হয়।

জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে তাঁর বন্ধুরা যে ধারণা দিয়েছেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলা কাব্য জগতে তাই–ই কবির ব্যক্তিত্ব উদঘাটনের একমাত্র চাবিকাঠি বলে সংস্কৃতিবান মহলে প্রভাব বিস্তার করে আসছিলো। তিনি নির্জন বিশুদ্ধ চৈতন্যের কবি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধারণার বিপরীতে কোনো ধারণা কবির সামগ্রিক সৃষ্টিকর্ম ব্যাখ্যা করে কেউ দাঁড় করিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। শিল্প সাহিত্যের ব্যাপারে বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার সম্প্রসারণ না ঘটলে এককেটি যুগ এককেটি জাতি একেক জন স্রষ্টার বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করে রাখে। এদিক দিয়ে বিচার করলে শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কৃত্রিম 'জেন' আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল মহল এক রকম ভাবতো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু 'জেন' রহস্য উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গেই এতাবৎকালের পোষণ করা ধারণা পালটে গেলো। মানুষ বিষয়টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুনভাবে, নতুন অনুরাগ নিয়ে চিন্তা করতে লেগে গেলো। একেজন স্রষ্টাকে তখনই মহৎ বলা সম্ভব, যখন যুগের পর যুগের নতুন নতুন চাহিদা মিটিয়ে বিচারে তিনি টিকে যেতে পারছেন।

বাংলাদেশের গণসংগ্রামের পূর্ব পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশ ছিলেন রমণীমোহন এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের চামড়া ঘেঁষা হা হুতাশ বিষাদ এবং অল্পস্বল্প দীর্ঘশ্বাস মেশা রোমান্টিক কবি। সাধারণ্যে জীবনানন্দের এই ছিলো স্বীকৃতি। সমালোচকদের মধ্যে তাঁর কাব্যের অভিনবত্ব, কেউ ছন্দ কৌশলের মার প্যাঁচ, কেউ তাঁর কাব্যের সঙ্গীতের অনির্বচনীয়তা, কেউ আধুনিক জীবনবোধের বেদনাবিদ্ধ হতাশা পাণ্ডুর ম্লান পরিচিত এবং কেউ কেউ গুহ্য বিষয় অধ্যাত্মতত্ত্ব দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন। কারো কারো আলোচনায় চমৎকার বাহাদুরীও আছে। আবার তাঁদের সকলে যে ভুল একথা যেমন বেঠিক, সকলে সঠিক একথাও সত্য নয়। বিশেষ করে শিল্প সাহিত্যের ব্যাপারে ভুল ঠিক এ কথা দু'য়ে দু'য়ে চার হয় এমন নিশ্চয়তা সহকারে বলে দেওয়া যায় না। যাঁরা বলেন তাঁদের সম্পর্কে সাবধান থাকাই উত্তম। কিন্তু জীবনানন্দের সমালোচকদের সম্বন্ধে একটি কথা অত্যন্ত নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায়, তাঁরা এই মহৎ কবির সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনে নন্দনতত্ত্ব, যুগ চৈতন্যের ধারা বিচার ইত্যাদির কম বেশি সাহায্য গ্রহণ করলেও বিজ্ঞান এবং দর্শনকে একেবারেই বর্জন করেছেন। যে জনগোষ্ঠীর চিত্তে সম্পদের ধারাস্রোত তাঁর মধ্যে নতুন প্রবহমানতা লাভ করেছে তার থেকে কবিকে আলাদা করে রেখেছেন। বিজ্ঞান দৃষ্টি এবং দার্শনিক প্রতীতি যা তাঁর কাব্যে ঋষি বাক্যের মতো আলোকিত হয়েছে, সে সংযতবাক সিদ্ধপুরুষটির সৃষ্টির অবিনশ্বরত্ব শুধু অলঙ্কার জিজ্ঞাসার ওপর ছেড়ে দেওয়া একটি ঘোরতর অবিচার বলে মনে করি। আমি সাধারণ পাঠকদের কথা বলছিনে, বলছি তত্ত্বদর্শীদের কথা। যাঁরা শাঁস থেকে আঁটি আলাদা করে দেখাতে পারেন এবং শাঁস আঁটি উভয়ের সংযোগসূত্রটা কি, জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেন। জীবনানন্দ দাশের কাব্য সাধনায় কাব্যকলার নান্দনিক বোধের বিস্তৃতি ঘটেছে, একথা সত্যি। সঙ্গে সঙ্গে একথা সত্যি যে কবি তাঁর কাব্য সাধনাকে সামগ্রিকভাবে একটা দার্শনিক প্রতীতি এবং একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড় করাবার দুর্মর প্রচেষ্টা করেছেন। হার্বার্ট স্পেন্সরের অভিব্যক্তিবাদ এবং বেঁগসর স্বজ্ঞা তথা ইনটুইশনের ছাপ যে তাঁর কাব্যলোকে আকাশের ছায়াপথ এবং শর্করার দানার মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে, তা ওসব বিষয়ে আমাদের মতো আনাড়ির চোখেও ধরা পড়ে। এ পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশের একজন পারঙ্গম সমালোচক এলেন না এটিই বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য। তেমন একজন বোদ্ধা মনীষীর অভাবে কঠোর নৈয়ায়িক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নেড়ানেড়ীর আখড়ার গাঁজা চরসের যোগানদার বলে চিহ্নিত হয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ কোন ছার! মন পবনের নাও, লিলুয়া বাতাস ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে আমাদের গহন পরিচয়ের কারণে, শুনলেই যেমন মনটা আপনা থেকে ছল ছল করে, তেমনি তাদের অনেকের কাছে জীবনানন্দ দাশ প্রিয় এ কারণে যে আমাদের পরিচিত অনেকগুলো 'ওম' 'নাড়া' ইত্যাদি কিছু শব্দ, বাংলাদেশের কিছু গহন ধ্বনি, কিছু গভীরচিত্র যার সঙ্গে আমাদের গভীর মানসিক সন্নিহিত বর্তমান, বাংলার বিদগ্ধ সাহিত্যের অপূর্ব রসাভাসে নিয়ে আসতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা ভুলে যাই 'অসুবিধা' জাতীয় কিছু ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয় না, এমন শব্দকেও কাব্যের জগতে সম্মানের টিকিট তিনি দিয়েছেন। শব্দ-শব্দ তো ছড়িয়ে আছে চরাচরের সর্বত্র। সৃষ্টিশীল আবেগের স্পর্শেই তো শব্দ তড়িত শলাকার মতো চৈতন্য সঞ্চারী হয়। যে কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারচরের সঙ্গে সংগ্রাম করে জড় জগতে অনুভূতি প্রসারিত করে টেনে নিয়ে আসেন ভাব বহন করার মতো নতুন নতুন শব্দপুঞ্জ, কবিকে কি সে শব্দে পাওয়া যায়? ছিন্ন মালার ছড়ানো কুসুমের মধ্যে অন্তরালের অদৃশ্য সূত্র এবং অন্তরালবর্তী মালাকার কাউকে পাওয়া যাবে না যেমন জীবনানন্দ দাশকেও তেমনি তাঁর ব্যবহৃত শব্দমালার মধ্যে আবিষ্কার করতে যাওয়াটা ভুল। তেমনি ভুল হবে তাঁর ভিন্ন ধরনের ছন্দের মধ্যে আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা। সমালোচকরা এদুয়ের মধ্যেই কবির মহত্বের সন্ধান করেছেন। তাঁদের সিদ্ধি যেটুকু অন্ধের হস্তী দর্শনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। চরাচরের গহনে প্রাণ আপ্রাণ বায়ুর মতো শ্বসিত যে বেদনা যার স্পর্শে ব্যক্তির চেতনার উদ্বোধন ঘটে এবং যা সমাজ মানসের সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে সম্পর্কিত সেই বেদনার তুল্যমূল্যে স্রষ্টাকে বিচার করতে না পারা দুঃখের, খুবই দুঃখের। জীবনানন্দ এমন কবি যিনি স্থিতধী ঋষির মতো আপন বুকে হাত রেখে বলতে পেরেছেন এই বুকে যা আছে, যা প্রবাহিত হচ্ছে সব বেদনা এবং আমরা সকলে বেদনার সন্তান। এই বেদনা কি তাঁর একার? তা কি গোটা সমাজের নয়? যেহেতু তিনি সাহিত্যের দলাদলি করেননি কোনো রাজনৈতিক দলের টিকিটধারী সদস্য ছিলেন না, সভা-সমিতিতে বিদগ্ধজনোচিত ভাষণ দেননি, কাগজে চমকপ্রদ ইন্টারভ্যু করেননি, সচিত্র পত্রিকায় ছবি প্রকাশিত হয়নি, তাই তাঁর অনুরাগী গুণমুগ্ধ জনও তাঁর সম্বন্ধে অতি দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন,—তিনি নির্জন কবি। তিনি একা এবং আনমনা কবি। এগুলো খুবই একপেশে ধারণা। সমালোচকেরা শুধু কাব্যে ব্যবহৃত চমৎকার ন্যুরিয়ালিজমের ব্যথার মতো ইমেজ এবং লোকায়ত শব্দের সার্থক প্রয়োগের জন্য একজন কবি মহৎ পদবাচ্য হতে পারেন না, যুতসই ইমেজ নির্মাণের জন্যে নয়, নতুনত্ব আমদানির জন্যে নয়, সমকালীন হওয়ার জন্যে নয়, সবকিছুকে একসাথে ধারণ করার মধ্যেই তাঁর মহত্ত্ব। ছন্দের যেমন বিকাশের ধারাবাহিকতা আছে, তেমনি আছে শব্দের। তেমনি দেখা যাবে ইমেজ ইমেজকে প্রসব করছে মানব সন্তানের মতো, যাকে সমকাল বলি তাও তো ধাবমান তরঙ্গমালার আরেকটা প্রসারণ মাত্র। যখন একজন কবির সাধনায় যখন সবকিছুর ক্রমপ্রবহমানতার যাবতীয় সিদ্ধি সমসূত্রে দণ্ডায়মান হয়, তার মধ্যে জন্ম নেন একজন মহৎ স্রষ্টা। আপাতদৃষ্টিতে সভা-সমিতিতে গমনাগমন না করলেও গোটা বর্তমান সমাজের সঙ্গে তিনি অদৃশ্যসূত্রে যুক্ত। জীবনের অন্দর মহলে বায়ুমান যন্ত্রের মতো আন্দোলিত হচ্ছেন তিনি। জীবনানন্দের মতো একজন মহৎ কবির বিচারেও বিষয়গুলো কারো মন-মগজ খোঁচায়নি। সেজন্য কিছুটা দায়ী বুদ্ধির আড়ষ্টতা, কিছুটা সমাজের বাস্তব অবস্থা। তাই তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছে এবং তাঁকে ভুল বোঝার অবকাশ ছিলো। সে কারণেই কিশোর যুবকের জগত ছাড়িয়ে বুদ্ধিমান মানুষের জগতে, প্রবেশাধিকারে লাভ করতে সিকি শতাব্দী কিংবা তারো অধিককাল সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর একটা উক্তি এস্থলে স্মর্তব্য, যা মন দিয়ে গড়া তাকে মন দিয়েই খাড়া রাখতে হয়। জীবনানন্দ দাশ তাঁর জাতির কাছে যা অকৃত্রিম আবেগে মনের থেকে উচ্চারণ করেছেন, অনেক দিনের পর তা খাড়া রাখার জন্য তাঁর জাতির আরো মনের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই জন্য তাঁর জাতিকে একটা যুদ্ধ করতে হয়েছে, এই যুদ্ধে বাংলার অন্যান্য স্রষ্টার মানস-সন্তানের মতো তাঁর কোমল সন্তানও অংশগ্রহণ করছে এবং প্রমাণ করেছে জীবনানন্দের মানস সন্তানেরা কোমল বলে দুর্বল নয়। তাই আজ আমাদের এই বাংলাদেশের নতুন একটি রেনেসাঁ মন্ত্রের সম্মোহনে শিহরিত-চিত্ত কাব্যরসিক কবি জীবনানন্দ দাশকে নতুন দৃষ্টিতে নতুন ভঙ্গীতে বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি। বাংলার লোকজ ঐতিহ্যের তিনি কাব্যিক রূপায়ণ সাধন করেছেন। আরেকজন বাঙালি কবি যিনি জীবনানন্দের সমসাময়িক—তিনিও বাংলার লোকজ ঐতিহ্যের কাব্যিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধিও বড়ো সামান্য নয়। আমরা কবি জসীমউদ্‌দীনের কথা বলছি। কিন্তু জসীমউদ্‌দীন এবং জীবনানন্দ দাশের মধ্যে তফাৎটা কোথায়, কোন্ বিন্দুতে ভেদ রেখা টানবো? এ রকমভাবে বোধ হয় কথাটা বলা যায়। জসীমউদ্‌দীন লোক ঐতিহ্যের মাংস গ্রহণ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ করেছেন হাড় মাংস ছেনে তারপর প্রাণ। এটি করতে পেরেছেন, যেহেতু তিনি আধুনিক বিশ্বের কাব্যিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জানতেন আনন্দিত বোধ-বুদ্ধি-মনন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের বিশাল অংশের মধ্যে যার বিস্তৃতি, সে সুন্দরের জগতে সন্দেহের কীট প্রবেশ করেছে, ভাষা এবং ছন্দের সুরম্য প্রাসাদের লখীন্দরের বাসরঘরে কালীনাগের মতো অবিশ্বাস সংশয়ের পোকা ঢুকে কল্যাণ-সুন্দর-শিবের জগৎ মানুষের লোভ রিরংসা নলবনে মত্তহস্তীর মতো তছনছ লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ছত্রছায়ায় যেটুকু আশ্রয়-প্রশ্রয়তা তা মনকে চোখঠারা মাত্র। আসলে তা বালিয়াড়ি। জীবনানন্দ দাশের জানাশুনা জ্ঞানগম্যি তাঁকে রবীন্দ্রনাথের জগত থেকে সরিয়ে নিয়ে আলাদা আরেকটি জগতে সংস্থাপিত করেছে। সে জগত জীবনানন্দের নিজের ইঁদুর, পেঁচার জগত, মর্গের যন্ত্রণাবোধের জগত, খয়েরি হয়ে আসা শালিকের বিমর্ষ জগত, অতীতের কাহিনীর রসে অবগাহন করা ব্যথিত শান্ত বেদনা বোধের জগত। অপর দিকে জসীমউদ্‌দীনে দেখা যাবে ঐতিহ্যের কাছ থেকে হাত পেতে যা পেয়েছেন মুগ্ধ বিস্ময়ে গ্রহণ করেছেন এবং একটি সুঠাম সরল বিশ্বাসবোধ দিয়ে কাব্যিক রূপায়ণ দান করেছেন। সচেতন মনন শক্তি প্রয়োগ করে তার প্রাণের ইশারাটুকু সম্মুখগামিনী কিংবা বিশ্বব্যাপিতা দান করতে পারেননি। তার কারণ জীবনানন্দের প্রখর ইতিহাসবোধ ছিলো। নির্মোহ বিজ্ঞান দৃষ্টি ছিলো, জসীমউদ্‌দীনে তা আদৌ ছিলো না।

তবু, জীবনানন্দ দাশ দেদার লোকজ ঐতিহ্য গ্রহণ করেছেন বললে ঠিক হবে না ; লোকজ ঐতিহ্যে আধুনিক চৈতন্য স্রোত প্রবাহিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা তাঁর রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থটির উল্লেখ করতে পারি। এর সবকিছুই লোকজ। লোকভাষা, লোক-কৃষ্টি, লোকঐতিহ্যের সদ্ব্যবহার এমনভাবে করেছেন পূর্বে কোথাও এমনটি ঘটেনি। কিন্তু যে কাব্যিক চেতনা-স্পর্শে এরা মরণজয়ী প্রাণ পেয়েছে, এমন রস পেয়েছে, তা আধুনিক। তার আবেদন ইন্দ্রিয়ের জগতের দ্বারদেশ পেরিয়ে অতীন্দ্রিয়ের জগতে শিহরণের সঞ্চার করে। বচনের সীমা অতিক্রম করে অনির্বচনীয়তার স্তর স্পর্শ করে। জীবনানন্দ দাশ কাব্যিক ভাবনা চিন্তায় সুশিক্ষিত মানুষ ছিলেন, প্রাজ্ঞ ছিলেন। এমন নয় যে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মতো সমকালীন প্রসঙ্গে মেতে ওঠা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো। তার পরেও তিনি কবি খ্যাতির অধিকারী হতে পারতেন। আমরা জেনেছি তাঁর সে যোগ্যতা ছিলো, কিন্তু তিনি নিসর্গের জগত অস্ফুট ভাবনার চেনা ধূসর কুয়াশার জগত পেরিয়ে চেনা জগতে এলেন না কেন? 'বরঞ্চ চেনা জগতকেও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নিসর্গের পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে প্রসারমানতা দিতে দিতে একেবারে ধূসর কুয়াশার জগতে নিয়ে গেছেন। তার উত্তর জীবনানন্দ দাশের যুগ এবং ব্যক্তিত্ব দু'য়ের মধ্যেই খুঁজতে হবে। সেখানেই রয়েছে তার উত্তর। কোনো প্রচলিত লোকবিশ্বাস অসংশয়ে তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না, কোনো হুজুগে মেতে ওঠার যোগ্যতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। কোনো প্রবল সংস্কারের সপক্ষে বিপক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াবার মতো মানসিকতা তাঁর ছিলো না। তিরিশের যুগের কাব্যিক চেতনার সাধারণ লক্ষণ কী? সংস্কার ভেঙে নতুন সংস্কার নির্মাণ। স্বাভাবিক কারণেই তাতে গা ঢেলে দিতে তিনি অপারগ ছিলেন। এর বিপরীতে একটা পথ ছিলো সেটা বিপ্লবের—শুধু ভাষার নয় শুধু ছন্দের নয় যে সমাজের বায়ুমান যন্ত্রের ডাল থেকে জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রতিদিন অহরহ ঝুর ঝুর শব্দ ঝরে পড়ছে নতুন শব্দ টাকশালের নতুন টাকার মতো ঝলসে উঠছে, পুরোনো শব্দে নতুন প্রাণ, নতুন ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হচ্ছে, মনে প্রাণে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা, সচেতনায় অচেতনকে তুলে আনায় আস্থাশীল হওয়া। হার্বার্ট স্পেন্সারের অভিব্যক্তিবাদের মৃদু আস্থাশীল পারিবারিক কারণে ব্রাহ্মমতাবলম্বী এবং বেঁগসর স্বজ্ঞাবাদে বিশ্বাসী জীবনানন্দের জন্য তা মৃত্যু প্রমাণ অসম্ভব ছিলো। তাই তাঁকে লোকজ জগতে আসতে হয়েছে। লোকজ বিশ্বাস সংস্কার ঐতিহ্য আর যাইহোক মেকী জিনিস নয়। একটি সুদীর্ঘ আবহমানতার মাধ্যমে তা প্রাণে প্রাণে স্থান করে নিচ্ছে। তাই তিনি এসেছেন নিসর্গের কাছে। নিসর্গের আর যাই অভাব থাকুক ছলাকলা জানে না। তাই কবি গিয়েছেন অতীত ইতিহাসে। ইতিহাস মানুষের নিজের হাতের সৃষ্টি। অকথিত বেদনার প্রকাশ নয়, জীবনের সলিড এ্যাচিবমেন্ট। ইতিহাসে আস্থা রাখলে ঠকবার সম্ভাবনা স্বল্প। একজন আধুনিক মানুষের চিন্তান্বিত কামনা বা থিঙ্কিং ডিজায়ার তাকেই সোজাসুজি রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করার বদলে একটু দূরে স্থিতি দিয়েছেন। তিনি অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করতেন বলে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই বিকশিত হয়ে চলছে—কবিতা—কবিতার ভাব ভাষা ছন্দও তো তার বাইরে নয়। যদি তাঁর সাধনার মধ্যে এই নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ক্রিয়ার একটা কি দুটো সুরও বাজে একসময় মানুষের কাছে স্থান করে নেবে, এরকম একটা বিশ্বাসে স্থির নিশ্চিত থাকতে পেরেছিলেন বলেই কবিতার সাফল্য ব্যর্থতার সম্বন্ধে তিনি একরকম নির্বিকার ছিলেন এবং সর্বক্ষণ জীবনের গভীর অনুভব মসৃণ তুলিতে প্রকাশ করার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। তাঁর পছন্দ ছাড়িয়ে, লাভ ক্ষতি বাদ দিয়ে সংস্কারের সীমানা পেরিয়ে—সৃষ্টির বেদনার ঘরে যে পরিবর্তন চলছে সে শৃঙ্খলাবোধটিকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন,—নিজেকে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত রেখে। তাই তিনি ধূসর, অস্পষ্ট। কবিতা দিয়ে বিজ্ঞানকে ধরা যায় না, অনুভূতি দিয়ে চরাচরে ক্রিয়াশীল নিয়মকে বাঁধা যায় না। অন্তত জীবনানন্দ দাশ সে ক্ষমতার অধিকারী নন—তেমন প্রতিভা তাঁর ছিলো না। কিন্তু কবির অনুভূতি মিথ্যা নয় কেননা তা তাঁর অন্তর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। এতোক্ষণে আমরা জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মন্তব্য করতে পেরেছি মনে করি—তিনি অনুভবের কবি।

প্রসঙ্গত আমরা তাঁর *রূপসী বাংলা* কাব্যগ্রন্থটির উল্লেখ করছি। এই গ্রন্থে কবির অনুভূতি বিশেষ পূর্ণতা লাভ করেছে। সে নিসর্গ তিনি অনুভবে ধরতে চেয়েছেন কবি স্বয়ং তার মধ্যে বাস করেছেন, যে ইতিহাসবোধ সহানুভূতির স্পর্শে জীবন্ত করেছেন তা তাঁর আপন মাতৃভূমির ইতিহাস। এই ইতিহাসের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে সম্পৃক্তিও অতি নিবিড়, অতি গভীর। যে প্রাচীন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বেদনার বিদ্যুৎ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেছেন জীবনানন্দ দাশ নিজেও তার অংশ অপহারী। এই গ্রন্থে চেতনা আপনিই প্রসারিত হতে পেরেছে সহজ গতিতে। অনুভব যুগের সীমানা ভেদ করে ফেলেছে। কোনো রকম কষ্ট-কল্পনা কিংবা দূর-কল্পনার প্রয়োজন হয়নি। রোমান্টিক বোধ নিটোল মুক্তোর দানার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার ঝিনুকে ফুটে রয়েছে। কোনো অচেনা পথে কল্পনা অভিসার করেনি। *রূপসী বাংলা* বাংলার আবহমান কালের ব্যথার গাঁথা। যে ব্যথা বাংলার ইতিহাসের, বাংলার সংস্কৃতির, বাংলার সঙ্গীতের। কবি তার ওপর আধুনিক চেতনা প্রক্ষেপ করেছেন। তাই-ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহন মূর্তিতে ধরা দিয়েছে—সুরে, চিত্রে ভাবে আরেকটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ ব্যথার কবি নন তিনি ব্যথাবোধের কবি। এই ব্যথা *রূপসী বাংলায়* আরো সংহত হয়েছে। কারণ কৃষিভিত্তিক অনড় অটল অতীতের কোনো এক সোনার বাংলায় কবির আশা ভরসা, বিশ্বাস স্বপ্ন সব প্রোথিত ছিলো। তাই অতীতের সবকিছু লষ্ট আর্কেডিয়ার মতো হারানো স্বর্গের দীপ্তিতে প্রকাশমান হয়েছে। জীবনানন্দের সোনার বাংলা সামনে নয়, পেছনে।

মানুষ ইতিহাসে বাঁচে। জীবনানন্দ দাশও এই ইতিহাসবোধকে এড়াতে পারেননি। গৌড় বাংলার রাজন্যবর্গ, বল্লাল সেন রায় গুণাকরের সময়কাল থেকে তাঁর অনুভূতি তাঁর স্বকাল স্পর্শ করেছে, এটি যেন ঘটে গেছে কবির অজ্ঞাতে। যেমন—

মধুকুপী ঘাস ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌড়ী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি রায়গুণাকর
আসিবে না, দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার

(রূপসী বাংলা)

বেহুলা, খুল্লনা লহনা কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা এসব রূপকথা উপকথার নায়িকাদের ভীড়ে কখন বঙ্কিমের রোহিণী অনুরাধা একটেরে স্থান করে নিয়েছে।

... রাজ বল্লভের কীর্তিভাঙ্গে কীর্তিনাশা
তবুও পদ্মার রূপ একুশ রত্নের চেয়ে আরো ঢের গাঢ়
উমার প্রেমের গল্প পেয়েছে সে চন্দ্রশেখরের মতো তার জট
আরো প্রাণ তার আরো ঢের জল-জল আছে
পৃথিবীর পথে নক্ষত্রের পথে তুমি খেলিতেছ পাশা
শঙ্খমালা নয় শুধু অনুরাধা রোহিনীর কতো ভালোবাসা
পৃথিবীর রাঙা রোদ চরিতেছে আকাঙ্ক্ষার চিনিচাঁপা গাছে।

কবি হয়তো চেয়েছেন—হয়তো চাননি, কিন্তু তাঁর অনুভূতি লোকশ্রুত বেদনার বাংলার জগত থেকে স্বকালের ঘাটে আছড়ে পড়েছে। এই অনুভূতি, এই বোধ তাঁকে বাংলাদেশে নতুন পরিচয়ে চিহ্নিত করেছে। এই অকৃত্রিম অনুভূতির গুণেই তাঁর বেদনার কোমল সন্তান বাংলাদেশের গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে।

---

* লেখক শিবির আয়োজিত ও বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশে প্রথম জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুবার্ষিক আলোচনা সভায় পঠিত। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'আহমদ ছফার প্রবন্ধ' [১৯৯৩] হতে গৃহীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাল্যবানের জটিল জগত

আলী আনোয়ার

মাল্যবান পড়তে গিয়ে আমরা কিছুটা বিব্রত বোধ করি। ঠিক কি ধরনের উপন্যাস এটি? কিভাবে এটি মূল্যায়ন করতে হবে? এটি কি তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস? এ সমস্ত প্রশ্ন এই জন্য আমাদের মনে দেখা দেয় যে, এই উপন্যাসটি প্রচলিত উপন্যাসের রীতি–নীতি প্রায় কিছুই মানেনি। এতে প্লট অনুপস্থিত, চরিত্র অপ্রতুল, রিয়ালিজম প্রশ্ন সাপেক্ষ। এই উপন্যাসে তিনটি চরিত্র ছাড়া অন্যান্য যে সব চরিত্র আছে তারা অস্পষ্টই শুধু নয়, উপন্যাসে তাদের ভূমিকা প্রায় নেই বল্লেই চলে। তাদের সম্পর্কে আমরা যতটা শুনি, তাদের সঙ্গে ততটা পরিচিত হই না। সমাজ–চিত্রণ যেটি সাধারণত উপন্যাসিকরা যত্নের সঙ্গে এবং বিস্তৃতভাবে করে থাকেন, সেটিও এই উপন্যাসিকের তেমন আগ্রহ জাগায়নি। সমাজ চিত্রণের বিষয়টি উপন্যাসিক ছুঁয়ে গেছেন মাত্র এবং চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র প্রধান চরিত্র বা প্রোটাগনিস্টের মনোজগতেই তাঁর আগ্রহ এবং অন্যান্য দুটি চরিত্রকে প্রোটাগনিস্টের চোখ দিয়ে দেখেছেন। উপন্যাসের শুরুতে আমাদের পাঠকদের অবশ্য প্লট, চরিত্র, সমাজ–বাস্তবতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে প্রত্যাশা জাগ্রত হয়েছিল ; হতে পারে উপন্যাস পাঠজনিত পূর্ব সংস্কার এর কারণ অথবা হতে পারে যে কোনো গল্প সম্পর্কেই এমনই মানুষের চিরকালীন প্রত্যাশা। ফলত তা' প্রহত হলে আমরা বিব্রতবোধ করি। এই উপন্যাসটি পাঠ করে বিব্রত বোধ করার একটি দ্বিতীয় কারণ আছে সেটি হল, এতদসত্ত্বেও উপন্যাসটির আকর্ষণ আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু কেন?

প্লট নেই, চরিত্র নেই, কোনো চমকপ্রদ ঘটনাও নেই, তাহলে উপন্যাসটিকে ধরে রাখে কী? উপন্যাসটিতে যেটি আমরা লক্ষ্য করি সেটা হল এর বিশিষ্ট পরিমণ্ডল, এর পরিব্যাপ্ত আবহ যা কবিতার সগোত্রীয়। এটি বস্তুত একটি কাব্যিক উপন্যাস, যা কবিতা এবং উপন্যাসের মধ্যবর্তী একটি 'হাইব্রিড' সংশ্লেষিত ফর্ম। মনে হতে পারে যে, ঔপন্যাসিক যেহেতু মূলত একজন কবি তাই তার রচনা কাব্যগুণ পেয়েছে। এটি আংশিক সত্য মাত্র। প্রথাবদ্ধ উপন্যাস নিয়ে অসন্তোষ ও অতৃপ্তিই ঔপন্যাসিকদের ফর্ম নিয়ে নানা পরীক্ষা–নিরীক্ষায় প্ররোচিত করেছে। তাছাড়া সত্যি সত্যি উপন্যাসের নির্দিষ্ট কোনো ফর্ম নেই, নির্দিষ্ট কোনো রীতিও নেই ; জন্মলগ্ন থেকেই ইউরোপে তা বিচিত্র পথে গিয়েছে। তবে বাস্তববাদিতা উপন্যাসের সবচেয়ে প্রবল ও গৃহীত সংস্কার। এই সংস্কারটি আমরা পেয়েছি প্রধানত ইংরেজি সাহিত্য থেকে। ইংরেজদের সংস্কৃতিতে ও জীবনযাত্রায় 'র‍্যাশনালিজম' ও 'এম্পিরিসিজমে'র গভীর প্রভাব অষ্টাদশ শতক থেকেই চলে আসছে। ফলত ইংরেজি উপন্যাসেও বাস্তববাদী জীবন–চিত্রণকেই ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের মান ও পরাকাষ্ঠা বলে ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেওয়া হয়েছে। আমাদের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায় মান ও ধারণাসমূহ সবই আমরা ঐ উৎস থেকেই গ্রহণ করেছি। ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক অধমর্ণতার এটি একটি দিক। ফলত যে কোনো বাংলা উপন্যাস বাস্তববাদের সংজ্ঞা পূরণ না করলেই আমাদের সংস্কার আহত হয়, আমরা অনিশ্চয়তা আক্রান্ত হয়ে পড়ি এবং রচনাটির উপন্যাস পদবাচ্যতা নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগি। অথচ বাস্তবাতিরিক্ত উপন্যাস ইংরেজিতে কম লেখা হয়নি। ইংরেজি উপন্যাসের যুগ্মস্রষ্টার একজন ফিল্ডিং তাঁর 'জোসেফ এন্ড্রুস' উপন্যাসকে 'গদ্যে রচিত মহাকাব্য' বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং স্কট তার উপন্যাসগুলিকে বলেছিলেন রোমান্স।

ইংরেজি সব উপন্যাসকেই অতএব ঐ বাস্তববাদী সংজ্ঞার মধ্যে আঁটানো যাবে না। বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস লেখা হয়েছে ইংরাজি এবং ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায়। "কবিতাধর্মী উপন্যাসও লেখা হয়েছে, যেমন লেখা হয়েছে কাব্য-উপন্যাস। এই দুটি কিন্তু আলাদা। কাব্য-উপন্যাস কাব্য-নাট্যের মতো কবিতায় লেখা হয়। কবিতাধর্মী উপন্যাস গদ্যে লেখা হলেও তা কাব্য গুণান্বিত। কাব্য উপন্যাসের সাম্প্রতিক উদাহরণের মধ্যে আছে কাজানজাকি ও বিক্রম শেঠের রচনা। কাব্য গুণান্বিতর মধ্যে ভারজিনিয়া উলফ, হারমান হেস প্রমুখ। গ্যেটে রচিত ওয়ার্দারের দুঃখের কথা আমাদের মনে পড়বে। অতএব কাব্যধর্মী উপন্যাসেরও দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। অনেকে অবশ্য একে লিরিক্যাল উপন্যাসও বলে থাকেন। এতেও অবশ্য দ্ব্যর্থকতা গেল না। গদ্যে লেখা হলেও লিরিক্যাল উপন্যাসে ঘটনার চাইতে অনুভূতি, বিশ্লেষণের চাইতে চিত্রকল্পের ক্রমান্বয়ী যোজনা প্রাধান্য পায়। ফলত উপন্যাসের বর্ণিত জগৎ কল্পনার এক বিশিষ্ট ফর্ম বা আকার হিসেবে প্রতিভাত হয়, যা বাস্তব অতিক্রমী এবং যা চরিত্রাবলীর চেতনায় নির্মিত পুনর্নির্মিত হতে থাকে। মাল্যবান থেকে এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

"যখন দিন শেষ হয়— যখন সে কাঁচা কাঁচা কালিজিরা ধানশালি রূপশালির ক্ষেতের আলপথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে, ভাটিয়াল গান শুনে মনটা তার কেমন করে উঠত যেন, সারাদিনের সমস্ত কথা কাজ অবসন্ন শোল বোয়ালের মত দিঘীর অতলে তলিয়ে যেত যেন, ঝির ঝির ফটিক ফটিক ঝিক ঝিক ঝর ঝর করে উঠত ওপরের জল : যে জল গানের মত, যে গান দিনের মত চারিদিককার খেজুরছড়ি, নারকোল ঝির ঝির ঝাউয়ের শনশনানি ছায়া অন্ধকার একটি তারার ভেতর ; এক কিনারে চুপ করে বসে থাকত সে।" [পৃ. ১০]

*　　　　*　　　　*

"... কুয়াশানির্জন ঠাণ্ডা নিবিড় শেষরাতে দেখা যায় এই সব। এমনি শীতের রাতে ধানের ক্ষেত শূন্য হয়ে পড়ে আছে—হলদে নাড়ার খাঁজে সমস্ত মাঠ রয়েছে ছেয়ে, শীত পেয়ে দু'একটা বাঘ নেমে আসে, এমনি উদাস রাতে ফেউগুলো খুব হাঁকড়ায়, শ্মশানে হরিবোল যেন কোন দূর কুয়াশাপুরুষদের কলরোল বলে মনে হয় : লক্ষ্মীপেঁচা ডাকতে থাকে, ঘুম ভেঙে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় শীতের কুয়াশার যে কোন অন্তিম গোচড়ের ফাঁকে-ফাঁকে বৃহস্পতি কালপুরুষ অভিজিৎ সিরিয়াম যেন লণ্ঠন হাতে করে এখান থেকে যেখানে, যেখান থেকে এখানে কোন সুদূরযানের পথে চলেছে, কেমন একটা আশ্চর্য দূর পরলোকের নিক্কণ শোনা যায় যেন।" [পৃ. ১১]

*　　　　*　　　　*

"আকাশে অনেক তারা বাইরে অনেক শীত, ঘরের ভেতর প্রচুর নিঃশব্দতা, সময়ের কালো শেরওয়ানীর গন্ধের মত অন্ধকার ; বাইরে শিশির পড়ার শব্দ, না কি সময় বয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে ; কোথাও বালুঘরি নেই, সেই বালুঘড়ির ঝিরি ঝিরি শিরি শিরি ঝিরি ঝিরি শব্দ, উৎপলার ঠাণ্ডা সমুদ্রশঙ্খের মত কান থেকে ঠিকরে মাল্যবানের অন্তরাত্মায়।"

এই যে বর্ণনা এর বৈশিষ্ট্য হল যে, অভিজ্ঞতা এখানে চিত্রগুণ লাভ করেছে, এ যেন নির্বস্তুক বিমূর্ত অনুভূতির চিত্রিত রূপায়ণ। এটিই লিরিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। বাস্তবধর্মী বর্ণনায় অভিজ্ঞতার এই অতলস্পর্শী অনিকেত বিস্তার ধরা যাবে না। বাস্তববাদী বর্ণনার এই সীমাবদ্ধতার কারণেই বাস্তববাদ অতিক্রমী টেকনিকের সন্ধান করেছেন ঔপন্যাসিকরা যা চেতনাপ্রবাহ, ম্যাজিক রিয়ালিজম, লিরিকধর্মিতা প্রভৃতি বিচিত্র পথে উপন্যাসকে নিয়ে গেছে এবং যারা লিরিক উপন্যাস লিখেছেন তারা অনেকেই কবি, তবে সকলেই কবি নন।

এটাই শেষ কথা নয়। লিরিক উপন্যাসে চেতনাই বিষয়বস্তু, চেতনার উৎসারণই উপন্যাসের উপজীব্য। কার চেতনা? মূলত প্রোটাগনিস্টের। কবিতার "আমি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়, আলোচ্য উপন্যাসে যেমন মাল্যবান। কবিতার "আমিত্বে'র সঙ্গে পৃথিবীর সংঘাত থেকে যেমন কবিতার জন্ম হয়, মাল্যবানের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘাত থেকে তেমনি এই উপন্যাসের। ঐ চেতনার চিত্রিত নির্মাণ তখন একটি epistemological act হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন "গানের ভিতর দিয়ে দেখি ভুবনখানি'। প্লটের কাজ যদি হয় ঘটনার বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে অর্থের নির্মাণ, এখানে তাহলে 'চেতনা' করে ঐ অর্থ নির্মাণের কাজটি। 'চেতনার পরম্পরা' তথা অনুভবের পরম্পরা আমাদের জ্ঞানে উপনীত করে। এই অনুভবের পরম্পরাই উপন্যাসটিকে ধরে রেখেছে। অনুভবই এখানে প্লট।

এই উপন্যাসে কি তাহলে বাস্তবতা নেই? বাস্তবতার প্রয়োজন নেই? না, তা ঠিক নয়। জীবনানন্দ বাস্তব বিরহিত লেখক নন, উপন্যাসে ত নয়ই। তার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে :

"কিন্তু যে রকম একটা হিতার্থী বিজ্ঞানী রাষ্ট্রই বা আসছে কোথায়? কোনোদিকেই না। খুব গরীব একটা জাতির মানুষ মাল্যবান। তার চেয়ে ঢের দুঃস্থ নিষ্পেষিত মানুষ আছে, তাদের অবস্থা আরো ঢের খারাপ—কিন্তু তাদের পেটের সমস্যা এসব সমস্যাকে অনেকটা চেপে রেখেছে, এসব সমস্যার সমাধানেও তাদের বেশি বেপরোয়া বা মরিয়া বা সাহসিক সচ্ছলতা আছে। যেমন অন্য এক হিসাবে উঁচু শ্রেণীর ভেতরও আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মাল্যবানের মত মধ্যশ্রেণীর মানুষদের নিয়ে। মাল্যবান কি নিম্নমধ্য শ্রেণীর--না মধ্য মধ্যশ্রেণীর?"[পৃ. ১৭]

"পোলিটিকসে বাঙালীরা আজকাল গুজরাটি মারাঠী মাদ্রাজী ইউ-পি অলাদের কাছে পদে পদে ভুড্ডু খেয়ে ফিরছে—ভাবতে ভাবতে রক্ত কেমন যেন হয়ে ওঠে তার, বাঙালীর মান-সম্মান ফিরিয়ে আনবার জন্য বড় নয়াল আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করে তার—বিপ্লবের থেকে বিপ্লবে—রোম, ফ্রান্স, স্পেন, চীন—সমস্ত বিপ্লবের হয়ে—স্তনাগ্রচূড়ায় নতুন দুগ্ধের উল্লাসে নবীন পৃথিবীর জন্য।" [পৃ. ১২]

"নিজে সে অবশ্য পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন হতে পারবে না কোনদিন না—কোন প্রক্রিয়ায় না—কিন্তু পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন বাঙালীর মধ্যে আজকালই যদি না জন্মায় তাহলে এ জাতের ভরসা খুব কম। উনিশশো উনত্রিশ সালের একটা রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে এই সব কথা ভাবছিল মাল্যবান।"

"উকিল হলে মন্দ হতো না হয় ত, বেশ স্বাধীনভাবে থাকতে পারত, কারু তক্কাই রাখতে হত না ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারলে মানুষের কাছ থেকে ঢের বেশী মর্যাদা পাওয়া যেত। মনে হয় এক এক সময়। কিন্তু মফস্বলের বার লাইব্রেরিগুলোর দিকে তাকালে ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতার বড় বড় এম.এল, ডি-এল কী করে টাকা রোজগারের ব্যাপারে জেলা কমিটিপাস পি.এল এর কাছে হেরে যাচ্ছে, কোথাও কোথাও—দেখে শুনে মনে মনে মাঝে মাঝে হাসে।”

এ ছাড়াও মাল্যবানের দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি, মেসনিবাসীদের জীবনযাত্রা, মানুষের ভাষা ব্যবহারের তারতম্য প্রভৃতির চিত্রণেও তিনি অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। মাল্যবানের পরিমণ্ডলের বাস্তবতা, টেনশন ও কুশ্রিতা, মাল্যবানের দারিদ্র্য সবই অনায়াস দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু তবু এ শুধু বাস্তবতাকে ছুঁয়ে যাওয়া, বুড়ি ছুঁয়ে যাওয়ার মত ; কারণ তাঁর অন্বিষ্ট অন্য এক জগৎ, মাল্যবানের চেতনার জগৎ। বাস্তবতার জগৎ স্থানান্তরিত হয়েছে বা বলা যায় রূপান্তরিত হয়েছে, কল্পনার চেতনার জগতের দ্বারা।

এই রূপান্তর, স্থানান্তর ও নির্মাণ সবই কিন্তু মানুষের অর্থানুসন্ধানের প্রবণতা দ্বারা প্রাণিত। আমরা যে নিরন্তর গল্প শুনতে চাই তাও ঐ দুর্মর অর্থানুসন্ধানের প্রয়াস। অর্থ মানে জীবনের অর্থ। আমরা জানতে চাই 'কি আছে পথের শেষে' এবং জীবনের গল্পটি শেষ হওয়ার আগে তা বলা যায় না। তাই আমরা জানতে চাই এই যে সমাপ্তি যে কি সত্যিই 'আকস্মিক' [contingent], না কি অর্থময়তা দ্বারা চিহ্নিত তথা অনিবার্য [necessary] ? এমনটি না হয়ে উপায় ছিল না, যেমন হ্যামলেটের গল্প। সেই অনুসন্ধান আমাদেরকে শেষ থেকে শুরুতে ফিরে যেতে বাধ্য করে। কারণ সমাপ্তিই সূচনাকে এবং তৎপরবর্তী দীর্ঘ যাত্রাকে তাৎপর্যময় করে। এটাকেই আমরা বলি জীবনের 'গল্প'। ঐ পুনরালোচনা, ঐ স্মৃতি-নিবিষ্টতাই জীবনকে 'গল্পে' রূপান্তরিত করে। হ্যামলেট হোরেশিওকে বলে গিয়েছিল : আমার জীবনের গল্পটা লোককে বলো তা না হলে তারা বুঝতে পারবে না কী ছিল আমার জীবনের তাৎপর্য, কী ছিল তার অর্থ। উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় উপন্যাসের সমাপ্তিতে যে মৃত্যু দৃশ্যের প্রাদুর্ভাব দেখি তারও কারণ তাই। সব উপন্যাসই জীবনের গল্প। সব গল্পই আত্যন্তিকভাবে স্মৃতিচারণামূলক অর্থাৎ ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরে লেখক যেন পেছন ফিরে দেখছেন। তিনি গল্পটি শুরু করার মুহূর্তেই জানেন অবশ্য গল্পটি কোথায় যাবে। আমরা পাঠকরা জানি না। এটিকেই বলে প্লট। সব ঘটনা যে মৃত্যুতে শেষ হলেই একমাত্র অর্থময়তা পায় তা নয়। একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাও তা করতে পারে। উপন্যাস বা গল্প জীবনের একটি আকস্মিক অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—যথা, নায়ক-নায়িকার দেখা হওয়া থেকে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, তাদের বিয়ে হওয়া বা না হওয়া পর্যন্তই বিস্তৃত হতে পারে। এখানে প্রথম ঘটনাটি তাৎপর্য পায় কিন্তু ঐ সিরিজের শেষ ঘটনাটি থেকে। লেখক অবশ্য প্রথম তাৎপর্যটি গোপন করেন অনেক সময়, কিন্তু তিনি যে গল্পটি ঠিক ঐ সময়ের বিন্দু থেকেই শুরু করেন তাই তাকে তাৎপর্যময় করে। ফলে আমরা পাঠকরাও তা সঠিকভাবেই আন্দাজ করি। লেখক কিন্তু দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফেই বলে দেন না যে, এদের কিন্তু বিয়ে হবে না। তিনি আমাদের সমাপ্তির দিকে প্রলুব্ধ করেন এবং প্রত্যাশাকে জাগরূক রাখার জন্য, আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করার জন্য নানা রকম বাধাবিপত্তি বিপর্যয়ের সূচনা করেন, ঠিক জীবনে অধিকাংশ সময়ে যেমনটি ঘটে থাকে। আমরা নায়ক এবং নায়িকার সঙ্গে উৎকণ্ঠায় পীড়িত হই এবং বস্তুত দেবদাসের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পার্বতীর প্রেমে পড়ি, অবশ্য আমাদের পাঠকক্ষের বা শয়নকক্ষের নির্জনতায়। আমাদের সমস্ত গল্পের পেছনেই ঐ 'ইরোটিক' বাসনা কাজ করে এমন বলেছেন ফ্রয়েডকে অনুসরণ করে মনস্তত্ত্ববিদ লাকান। এবং এই গোপন অভিসারের তথা 'ন্যারেটিভ কোয়েস্ট'-এর অনিবার্য পথচিহ্ন সম্পর্কে আগেই বলেছিলেন রুশীয় লোককাহিনী বিশ্লেষক ইউজিন প্রপ। কিন্তু এ সমস্ত আমার বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যে দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, পাঠক হিসেবে বা শ্রোতা হিসেবে [লোককাহিনীর ক্ষেত্রে] আমাদের দুর্মর প্রবণতা হলো এই প্লটের অনুসন্ধান। কারণ প্লট ছাড়া আমরা কম্পাসবিহীন নাবিকের মতো দিকভ্রান্ত বোধ করি। ঐ প্লটহীনতার একটি লক্ষণ হলো কাহিনীর অসম্পূর্ণতা ; কাহিনী সমাপ্ত হয় কিন্তু সম্পূর্ণ হয় না। ফলে একটি প্লটে বিন্যস্ত সম্পূর্ণ কাহিনীর ক্ষেত্রে সমাপ্তি সূচনায় প্রতিফলিত হয়ে যে অর্থময়তা গড়ে তোলে, এক্ষেত্রে সমাপ্তির সেই তাৎপর্য থাকে না। মাল্যবানের সমাপ্তিহীন সমাপ্তি সেই কারণে আমাদের বিব্রত করে। অবশ্য জীবনানন্দই প্রথম প্লটহীন উপন্যাসের লেখক নন। গত সত্তর-আশি বছর ধরে এরকম প্লটহীন উপন্যাস লেখা হচ্ছে। যাঁরা প্লটহীন উপন্যাস লিখছেন তারা বলেছেন যে, প্লটমাত্রই কৃত্রিম। জীবনে সত্যিই কোনো প্লট নেই। আমরা প্লট আরোপণ করি আমাদের মানসিক অস্থিরতাকে, অনিশ্চয়তাকে প্রশমিত করার জন্য। প্লট এবং বাস্তবতায় কোনো মিল নেই, এমনকি শ্রেণী সংগ্রাম অনুপ্রাণিত বাস্তববাদী প্লটেরও নেই। প্লট সত্যের শত্রু। তাই যদি হবে, তাহলে অর্থনিচয় কোথায় অবস্থান করে? আবারও এখানে কবিতায় অর্থসংস্থানের প্রক্রিয়াটি হয়তো প্রাসঙ্গিক হবে। কবিতায় অর্থ বহন করে তার ভাষা, তার 'থিম' এবং চিত্রকল্প। লিরিক উপন্যাস যেহেতু কবিতার মতোই সংগঠিত হয় তাই লিরিক উপন্যাসে 'থিম', চিত্রকল্প এবং ভাষা অনেকাংশে প্লটের দায়িত্ব বহন করে। অর্থাৎ উপন্যাস তার সমগ্র দেহে তার ভাষা ব্যবহারে 'থিম' ও চিত্রকল্পে নানা ইঙ্গিত ও সঙ্কেত ছড়িয়ে যেতে থাকে যার সমাহার, পুনরুক্তিময়তা ও অন্তর্লীন বিরোধী সংলাপ থেকে অর্থের একটা প্যাটার্ন ফুটে উঠতে থাকে। তবে এই অর্থসমুচ্চয় যে একরৈখিক হবে তার কোনো কথা নেই। মানুষের অভিজ্ঞতা ও অনুভব যেহেতু একরৈখিক নয় কখনো, সেহেতু ঐ অর্থসমুচ্চয়ে বহুরৈখিকতা ও কূটাভাষ থাকাটাই বরং বেশি স্বাভাবিক।

মাল্যবানের ভাববস্তু বা থিমাটিক বিষয় কি ভাবতে পেলেই আমরা দেখব যে, অনেকগুলি দ্বৈত-ভাবনা পরস্পর গ্রথিত হয়েছে, যেগুলিকে আমরা binaries-এর বিন্যাস হিসেবে দেখতে পারি। যেমন ভালোবাসা ও ঘৃণা, মন ও শরীর, প্রকৃতি ও নগর, নৈঃশব্দ ও কোলাহল, জৈবিক সময় ও অনুভূত সময়, চেতন ও অবচেতন, মেয়ে ও পুরুষ জৈবিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, গৃহ ও গৃহহীনতা, মানুষ ও প্রাণিজগৎ ইত্যাদি। এতসব দ্বৈত ভাবনার সমাহার একেবারে নিরর্থক একেবারে তাৎপর্যহীন হতে পারে না। সর্বোপরি আছে মাল্যবানের একাকিত্বের ও বিচ্ছিন্নতার বোধ। এইসব বোধ ও বিষয়বস্তু আবার প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসের চিত্রকল্পসমূহের মধ্যে দিয়ে। চিত্রকল্পসমূহ হলো ঐ সব ভাবনার আধার ও মেটাফর।

মাল্যবান ও উৎপলার সম্পর্কের ভালোবাসাহীনতা ও তিক্ততা এবং এতদসত্ত্বেও আকর্ষণ ও আক্রোশ, বন্দীত্ব ও অসহায়তা—এই উপন্যাসের মূল আখ্যানভাগ জুড়ে আছে। মাল্যবান ভাবছে : "এই নারীটিকে নিয়ে কি করবে সে? উৎপলার এই ফাড়ন-ফোড়ন, শূন্যতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস, আড়াআড়ি ... "মাল্যবানের মারাত্মক কফের মত বুকের ভেতর বসে গেছে, বাইরে তার প্রকাশ নেই, উৎপলা তা টেরও পায় না। ঘরদোরের নিশ্চুপ বাতাসে ঘাই মেরে ফিরছে। কী হবে এই বাতাস, এই ঘরদোর দিয়ে। এই নারী নিয়ে কি করবে সে?" অন্যদিকে উৎপলাও ভাবছে আজ যে, মাল্যবানের সঙ্গে তার বিয়েটা অনিবার্য ছিল না। সে বলে "আমি হিন্দুঘরের মেয়ে, বাধ্য হয়ে আমাকে অনেক কথা বিশ্বাস করতে হয়।" ... এ বিয়ে আমার হত, কিছুতেই ঠেকাতে পারতাম না—এই বিশ্বাস। কিন্তু এটা সংস্কার, সত্য নয়। কিছুতেই সত্য নয়। তোমাকে আমি বিয়ে না করেও পারতাম। সেইটেই সত্য। ... অনুপম মহলানবীশকে তো বিয়ে করতে পারতাম আমি ... ঐ রকম একজন লোককেই বিয়ে করবার কথা আমার। সেইটেই সত্য হত।" মাল্যবানের প্রত্যুত্তর "আমারও ত তাই মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়।" সেভাবে, পাখিটাকে ফাঁদে ফেলে সেই ফাঁদটাকে সত্য বলে নির্দেশ দেবার কোন অর্থ হয় না।" [পৃ. ৩১] কিন্তু অধিকতর সত্য হলো তারা দুজনেই একই খাঁচায় বন্দি এবং অসহায়। এই অসহায়তা ফুটে ওঠে যখন এত তিক্ততা সত্ত্বেও মাল্যবান উৎপলার কাছেই অপার্থিব সুখের আশা করে অসহায়ের মতো : "সুবাতাস আর কুবাতাসের কত কাটাকাটি হল। কাটাকাটি এখনো চলছে—চলবে যে পর্যন্ত না মাটিতে মাথা রাখি। কিন্তু লালকমল, নীলকমল কালোবাতাস, শাদাবাতাস মনপবন আর চাঁদের বুড়ি মিলে কেমন যেন অপার্থিব করে তুলেছে "জীবনটাকে। আমি মাটির মানুষ তো—মাটি ছাড়া টাল সামলাতে পারব না। হাওয়ার চেয়ে সোনার শরীর ভাল, তার চেয়ে মাটির শরীর ; চালে গুড়ে, নারকোলের ঝাঁঝে কপ্পুরে ফোঁপড়ায় নবান্নের গন্ধে নবান্নের মত তুমি আর আমি, তোমার কাছে এসেছি তাই, বসেছি তাই। দাও। দেবে না?" [পৃ. ১৬]

কিন্তু মাল্যবানের গভীরে এই যে একটা মানবিক শূন্যতা আছে তা উৎপলা কোনোদিন বুঝতে পারবে না। "স্বামী-স্ত্রীর কামনা লিপ্সা হতাশার ঘূর্ণিফেনার" মধ্যে ঐ আত্যন্তিক শূন্যতাই তাকে অসহায় করে। মাল্যবানের অসুস্থতার রাত্রে মাকে মনে পড়েছিল শুধু তার। ভাবছিল : "এই ঘরেই আছেন তিনি—এই অন্ধকারের ভেতরে ... ।" মাল্যবানের মনে হলো : উৎপলাও ত মনুর মা—মা তো সে ; মাল্যবানের মায়ের মত বড়ও হয়ে উঠবে একদিন। নিজের মায়ের সঙ্গে এই মাকে মিলিয়ে ফেলে বৃষ্টির ছিপছিপে ছটফটে জল যেমন পুকুরে সমাহিত সঞ্চিত জলের শান্ত স্বরূপের ভেতর মিশে যায়, তেমনি একটা অব্যাহত মাতৃত্বের সদাত্মাকে চাচ্ছিল যেন সে। তার নিজের মা নেই আজ ... অপর নারী এসেছে এই ঘরে ; মা হয়েছে, মঞ্জুর মা। মাল্যবান আজ মনুর মার স্বামী ঠিক নয় ; মাল্যবানের সেই মৃত মা ও জীবিত উৎপলা—এই দুটি নারীকে একজনের মতন—মায়ের মতন, তার ঘরের ভেতর খুঁজে পাবার জন্য কেমন অদ্ভুত বিশালাক্ষ অস্বস্তিতে সে চারিদিকে তাকাতে লাগল : আসুক মায়ের মূর্তিতে, আসুক উৎপলার বেশে—দুজনের ভেতরই দুজনকে খুঁজে পাবে সে—পাবে একজন মাকে—মাতৃত্ব। যা এখন মাল্যবান পাবে তার কামস্পর্শহীন, জায়াঘ্রাণহীন আনন্ত্যকে।" [পৃ. ৬৬] এই ভাবনারও অবশ্য গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য মাল্যবানের জগতের জটিলতার এবং আর্তির অন্যতর উৎস সম্পর্কে আমাদের ভাবতে বাধ্য করে। সে অন্য ধরনের একটি খাঁচায়ও আবদ্ধ, অবচেতনের খাঁচা।

অন্য এক ধরনের সুখ অবশ্য সে পায়। রাতে ঘুম হচ্ছে না বলে মাল্যবান তার নিচের ঘর থেকে উৎপলার ঘরে এসেছে : "নিঃশব্দে খানিকটা এগিয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখল, নেটের মশারীর ভেতর মনু ও পালা কেমন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমুচ্ছে, কেমন শান্ত প্রীত নিঃশ্বাস তাদের। একটা ভারি নিঃশ্বাস প্রাণের ভেতর প্রচুর চুম্বনে টেনে নিল সে, সমস্ত শরীরকে আস্বাদস্নিগ্ধ করে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল সে, ভাল লাগল তার। ... কেমন স্নিগ্ধ শারীরিক মনে হল তার রাত্রিটাকে, রাত্রির এই নিঝোর সময়টাকে।" [পৃ. ১৩] কিন্তু ঐ সুখের অনুভবেও একধরনের অসহায়তা আছে যা ধরা পড়ে যখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উৎপলা বিরক্তি প্রকাশ করে।

সমস্ত উপন্যাস জুড়ে জীবনানন্দ দাম্পত্য সম্পর্কের গ্রন্থিগুলি, পরস্পর প্রবিষ্ট পর্যায়গুলি উন্মোচিত করেছেন। নারী পুরুষের সম্বন্ধ, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার মাল্যবান বোঝে না তা নয় : "বিয়ে জিনিসটা, শ্রেষ্ঠ কারিগরের কাঁচের গেলাসের মত, সহজ ও কঠিন, ভাঙবেই, জল খেতে হবেই, একটার বেশি গেলাস কাউকে দেওয়া হবে না। সে যদি তা জোর করে বা চুরি করে নেয়, সেটা অসামাজিকতা হল।" [পৃ. ১৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপলার দিকটা মাল্যবান এইভাবে দেখে : "উৎপলা দেখতে বেশ, শুধু বেশ বললে হয় না—এমনিই বেশ। সুস্থ। রুচি ও বুদ্ধির ধার মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, হৃদয়ের বিমুখতা ও কঠিনতাও তার এক-এক জায়গায় এক-একজন মানুষের তাপ বা জ্ঞান পাপের ছোঁয়ায় মোমের মত শক্ত ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে আবার। কুমারী কিশোর হিসাবে এই মেয়েটির বেশ দাম ছিল—নারী হিসেবেও। কিন্তু মাল্যবানের মত এরকম একজন লোকের বৌ হয়ে ঠিক হল না তার। উৎপলার বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই।" [পৃ. ৫৩] মাল্যবান এখন সন্দেহ করে "কোনদিনই প্রেমপ্রীতি ছিল না মাল্যবানের জন্য উৎপলার"। কিন্তু জীবনের এই বিনষ্টি নিয়তির মতোই মনে হয় মাল্যবানের। "বিয়ের আগের দিনগুলিকে তার শীতের আগে হেমন্তের, হেমন্তের আগে শরতের খেতে, মাঠে রোদে, মানুষের মুখে, পাখির কথায় যে অধিনশ্বর সম্ভাবনা থাকে হেমন্তের, যে মহাপ্রাণ কুহক থাকে আসন্ন শীতের রাতের সেই রকম মনে হয়েছে। [পৃ. ৫৩] এটাও যেন নিয়তি যে উৎপলাকে বয়ে বেড়াতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত।

স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যেই কি ঐ বিরোধের দূরত্বের, অনন্বয়ের সূত্র নিহিত? মাল্যবান ভাবে : "স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ সম্পর্কেও সৃষ্টির কারণ-করণ শালিকার ভেতর কোনো সুখশান্তির নির্দেশ নেই তো।" অথচ এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী জৈবিক আকর্ষণ তো দু'জনকেই টানে। বিষণ্ণ শ্লেষের সঙ্গে মাল্যবান ভাবছে : "অথচ মাল্যবানকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অপ্রেমে, কামনার টানে, বেশি লালসায় রিরংসায় উৎপলার মতন একজন ভাল বংশের সুন্দর শরীরের নিচু কাণ্ডজ্ঞানের, নিরেস মেয়েমানুষের কাছে ঘুরে ফিরে আসতে হবে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত, কী নিদারুণভাবে, কেমন অধমের মত, কেমন হাতে পায়ে ধরে, মেয়েটির, কখনো বা ঘরের শান্তি, কখনো বা বাইরের সুনাম, কখনো বা লালসা, অতি ক্বচিৎ প্রণয় এসে উৎপলার দিকে টানছে বলে।" [পৃ. ১৮]

এই যৌনতার প্রসঙ্গটি বার বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে এই উপন্যাসে, কখনো পরোক্ষভাবে, প্রচ্ছন্নে, কখনো প্রত্যক্ষে, অত্যন্ত তীব্রভাবে। এতবার পুনরুক্ত হয়েছে যে সন্দেহ হয়, এটি উপন্যাসের সাব-টেক্সট—যৌনতাও অর্থবহ এবং জীবনানন্দের মানবভাগ্য সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকারী উপাদান। এই প্রসঙ্গটি নানারকম চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন—দেহ।

"মাল্যবানের মনে হল, মানুষের মন সারাটা দিন—রাতের প্রথম দিকটাও বোকা হ্যাংলার মতন চায়, অপেক্ষা করে, সাধনা করে, অন্যে এসে দেবে তাকে তবে হবে। কিন্তু গভীর রাতে বিছানায় শরীরই তো স্বাদ। শরীরটাই তো সব দেয় মানুষকে। মন কী? মন কে? মন. কিছু নয়।" [পৃ. ৭০]

মাল্যবান ভাবছে : "নিজের মনটা তার স্বাতীর শিশির হলেও শরীরটা তার শুক্তি নয়, শামুক গুগলির মত ক্লেদাক্ত জিনিস। শরীরটার খাঁজে খাঁজে যে রয়েছে মাংস-মাংস পিণ্ড, সেগুলোকে অনুভব করে মাল্যবান।" একটা অদ্ভুত গলগণ্ডের মতন যেন শরীর। [পৃ. ৯১]

মাল্যবান লক্ষ্য করেছে প্রাণিজগৎ এবং মানুষ-এর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই এই ব্যাপারে। মাল্যবান শুনতে পাচ্ছে : "খানিকটা দূরে একটা বাড়ির ভেতর মহলে—হয়ত কলতলায় ভাঁড়ার ঘরে গুদোমে দুটো বেড়াল মরিয়া হয়ে "ঝগড়া করছে অনেকক্ষণ ধরে ; তাদের একটি নর একটি মাদি নিশ্চয়ই। এই শীতরাতে এই আশ্চর্য শীতে নিদারুণ কপট ঝগড়ার আড়ালে হুলো আর মেনির এই অত্যদ্ভুত রক্তোচ্ছ্বাস কাম নিয়ে জীবনের যৌনঋতুর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্যে বেড়ালের লুটোপুটি ঝুটোপুটি কান্নাকাটি করে।” কিন্তু এই সময় মাল্যবানের মনে পড়ে, “বেশি বয়সে বিয়ে করেছিল একজন শাদা দাড়িঅলা বুড়ো প্রফেসর, তাকেও ঠিক এই রকমই করতে দেখেছিল মাল্যবান, প্রায় বছর সাতেক আগে সন্ধ্যারাতেই। গলাখাকারি না দিয়ে প্রফেসর মশাই-এর ঘরে রাবারসোল জুতো পায়ে ঢুকে পড়েছিল মাল্যবান। কিন্তু এরকম হইমারণ-হইমারণ ব্যাপারে যে হবে তা তো ধারণা করতে পারেনি সে। কিন্তু সেই থেকে উপলব্ধি করেছে মাল্যবান যে সমস্ত ইতর প্রাণী [র] ... আশ্চর্য সন্তাপ উচ্ছ্বাস ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতরতাকে ভাঙিয়ে গরিয়ে, জ্বালিয়ে, নাচিয়েই মানুষ তো হয়েছে মানুষ।” [পৃ. ১১]

উপন্যাসের অন্যত্র পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা পরে মাল্যবান বলছে উৎপলাকে : “মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, একা থাকলে বেশ হত। কেউ কেউ একা থাকে বটে, যেমন আমাদের হেডমাস্টার মশাই চিরটা কাল কাটিয়ে গেলেন ; কিন্তু শেষ বয়েসে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল। মেয়েদের দর্শন দিতেন বটে, কিন্তু সাধুপুরুষ ; স্ত্রীলোকের দর্শন পাবার জন্যেই ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। লালসা জন্মাল। মেয়েরা ভাল মনে করে সেবা করবার জন্য হেডমাস্টার মশাইর হাত-পা টিপে দিত রোজ, উনিও ক্রমে ক্রমে গোপনে সুবিধে পেয়ে তাদের গাল টিপতে আরম্ভ করে দিলেন। গড়াল কেলেঙ্কারী অনেকদূর। বিয়ে হল না, তবু ছেলে হল, মেয়ে হল। তবুও সিদ্ধপুরুষ রইলেন।” [পৃ. ৬৭]

বড় বৌঠানের কাছ থেকে উৎপলার চিঠি এসেছে, তিনি অন্তঃসত্ত্বা তেরোটি ছেলেমেয়ের পরে। মাল্যবানের মন্তব্য : “এ রকম বুড়ো গিন্নিদের যে ছেলেপুলে হয় তা আমি জানতাম না। দাদার বয়েস চৌষট্টি।” মাল্যবানের ধারণা : “যদি কিছু দিতে যাও, তাহলে তাঁরা লজ্জা পাবেন। ... এ রকম ব্যাপার যে হচ্ছে, এতে এখুনি লজ্জা পাচ্ছেন।” এর উত্তরে উৎপলার তীব্র প্রতিক্রিয়া : “তুমি যখন তোমার মায়ের পেটে ছিলে, লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তিনি। না কি? ম্যাদা মাদার, ঠেলে বেরুল তো তবু লজ্জাবতীর ঝাড় থেকে। বেরুল তো। কী হল তাতে? ইঁদুরের গর্তে ঢুকে পড়ল পৃথিবীর জনমনিষ্যি সব?” [পৃ. ৪৪]

উৎপলার মেজদা ও তাঁর স্ত্রী কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন। মাল্যবান একটি মেসে ওঠে গেছে। উৎপলার শোয়ার ঘরটায় দুজনের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, ছেলেপুলেরা নিচে। মাল্যবানের এই দম্পতিকে পছন্দই হয় : “চমৎকার মানুষ—হয়ত খুঁটিনাটি নিয়ে দু'জনে বচসা করছেন, কিন্তু তার ভেতরেও পরস্পরের জন্য এক নাড়িরই টান যেন, একজোড়া বসন্তবউরির মত নীড়ের বাইরে, মুহূর্তেই নীড়ের ভেতরে মানুষের শরীর ও বোধ নিয়ে প্রত্যেক কথার ভেতর দিয়েই যৌন সম্বন্ধের মিছরি মাখানো ভালবাসার মর্ম ফুটে উঠছে।”

“মেজদা বললেন, উনি আর আমি শুই এখানে। একা বিছানায় ঘুম হয় না—পাশে যা হোক অন্তত একটা শাড়ির খসখসানি, উশখুশানি না থাকলে চলে না। বুঝলে কিনা ...”

“মেজ বৌঠান .. ছেঁচা পানের বড়ি পাকিয়ে বিরাজ বাবুকে দিয়ে গেলেন। তারপর হাত ধুয়ে বিরাজবাবুর দাবনা ঘেঁষেই যেন বসলেন—কোনো সঙ্কোচ নেই।” [পৃ. ৭৬]

মাল্যবান নিচে খোলা চাতালে কলতলায় স্নান করতে চায় না আর, দোতলার উৎপলার বাথরুমেই স্নান করতে চায়। তার কারণ হিসেবে সে বলে : “আসল কথা হচ্ছে, এক গা লোম নিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে, বৌ-ঝিদের আনাগোনা, চোখমারা মুখটেপার ভেতর চান করতে জুত লাগছে না আমার। এক একটা বৌ উপরের রেলিঙে ভর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আমার চান দেখে : “যেন শিবলিঙ্গের কাকস্নান হচ্ছে—সমুদ্রস্নান হচ্ছে। ... গামছা পরে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চান করতে হয়, চারিদিকে মেয়েরা থাকে।" উত্তরে উৎপলার তীব্র শ্লেষ : "হাঁচতে কাশতে রূপও বেরিয়ে পড়ে রূপলাল বাবুর। মেয়েরা হেঁসেলের ছাঁচড়া পুড়িয়ে, আড়ি পেতে থাকে রূপলাল বাবুকে দেখবার জন্য। হেঁসেলে দুধ ধরে যায়—গায়েগায়ে ঠাসাঠাসি মাছ পাতরি হয়ে রূপই দেখে মেয়েরা রূপসাগরের—"। মাল্যবান ভাবে : "মেয়েমানুষ—পুরুষমানুষের অন্তঃসার ও ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে ধারণাও বটে মেয়েটির। কোথায় পেল যে এ ধারণা !" [পৃ. ২১]

অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে অপ্রত্যাশিত পরিপ্রেক্ষিতেও যৌনতার কথা উঠে পড়ে। সত্যেন বাবুর স্ত্রী রমা মারা গেলে পর শ্মশান-ফেরৎ সত্যেন বাবুর শোক-বিহ্বলতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উৎপলা বলে : "ওকে তো সবাই ধরাধরি করে শ্মশান থেকে নিয়ে এসেছে। খেদার হাতির মত কেমন অবলা উতলা হয়ে পড়েছিলেন শুনলাম। ... তবু পুরুষ মানুষ তো। লেজ দিয়ে .... উড়িয়ে আবার কলাগাছ খেতে শুরু করবে। এই তো হয়ে এল বলে। বনের হাতি পোষা হাতি হবে এবার দোজবরে সত্যেনের বৌয়ের নিমতন্নে কলার পাত পড়ল বলে।" [প. ৬০]

চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েও উৎপলা একই কথা অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেনে এনেছিল। "দাড়ি যারা সত্যিই চাঁচে, প্রথম পক্ষের মাগকে শ্মশানে পোড়াতে পোড়াতে গালে হাত বুলিয়ে নেয়—দাড়িটা কামানো হল কি না দেখে নেয়।" [পৃ. ৩৮]

যৌন প্রসঙ্গের এই ক্রমান্বয়ী যোজনায় জীবনানন্দ যেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিসকোর্স গড়ে তুলছেন। অবৈধ যৌনসম্পর্কের নানা উল্লেখ ঐ ডিসকোর্সে যেন তীব্রতাই সঞ্চার করেছে। অমরেশ উৎপলা প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। ইতোমধ্যে অন্যান্য উল্লেখের দিকে তাকানো যাক।

উৎপলার অনুযোগ যে ঝি এঁটো পরিষ্কার করতে দেরি করে, ছাদটা একটা আস্তাকুড় হয়ে থাকে। "ঠাকুরের সঙ্গে ঝি পিরিত করবে, ঝি'র হাতে ঠাকুর খইনি টিপবে—তারপরতো এঁটোর কথা মনে পড়বে।" ... "কিন্তু ভাদুরানীর স্বামী রয়েছে—তবুও ঠাকুরের সঙ্গে এই রকম?" মাল্যবান বিস্ময় প্রকাশ করে। এবার উৎপলা বিস্মিত হয় : "তুমি তো আচ্ছা বেকুব দেখছি।" উৎপলা ওদের 'অন্তর্জলীর' ভেতর নাক ঢোকাতে চায় না। 'অন্তর্জলী' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করার মত। [পৃ. ২২] ঠাকুর বামদেবই ঝি'র একমাত্র গুণগ্রাহী নয়। পূর্ণকুর্মীও এই ঝি কেই ভালবাসে। পূর্নর ট্যাঁকে আজ কিছু টাকা আছে, ঝি'র সঙ্গে আজ রাতে কাজ হবে তার।" 'ঝি কাকে ভালবাসে'—মাল্যবান ভাবে। [পৃ. ৭৯]

বারবণিতাদের কথাও এসেছে। মেসে এসে মাল্যবান ফাঁপরে পড়ে গেল। "এখানে ছোকরারা থাকে, আর থাকে এমন সব লোক—বিশেষ এক রকম শারীরিক সুখের জন্য যাদের সব সময়েই লালা ঝরছে, রাতের বেলা বেরিয়ে যায় তারা। কোথায় থাকে, কী করে? কোনদিন শেষ রাতে ফিরে আসে, কোনদিন আসে না। মেসে যাদের এ রকম রাত করা বাতিক সেই, তাদেরও লালা ঝরছে বিশেষ একরকম শরীর গ্রন্থির সুখের জন্যে মেসের রাতের বিছানায় শুয়ে থেকে। বছরের পর বছর সারাটা জীবন এরা মেসেই কাটিয়ে দেয়। এছাড়া এদের গতি নেই—কিছু নেই। সংসার করার শক্তি নেই।" [পৃ. ৭৬]

বারবণিতা প্রসঙ্গটি অমরেশ বাবুর কথাতেও চলে এসেছে। মধ্যরাতে আহিরিটোলার গঙ্গায় সাঁতার কাটা হবে, তাতে অমরেশ বাবুদের একটা দঙ্গল অংশগ্রহণ করবে : "চার হাত পায়ে নিমকের বস্তার মত ভুশ করে পড়ে এক একটা সাঁতারু মুনিষ।" "যেটা বিস্ময়কর মধ্যরাতে মেয়েরা অব্দি দেখতে যাবে ভদ্দর লোকের মেয়েরা আর বেশ্যেরা যাবে, ওদিককার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়ায় পাড়ায় যেখানে যত বেশ্যা আছে। ... রাঁড়েদের সঙ্গে ভদ্রঘরের-মেয়েদের কোন হামলা হবে না স্যার, কেউ কাউকে দূর দূর বলে তাড়িয়ে দেবে না। এরাও যে মানুষ, ওরাও তা অকপটে স্বীকার করবে স্যার।" [পৃ. ৯৫] স্পষ্টতই অমরেশ ঐ বারবণিতাদের জগত এবং তাদের চলা ফেরার সঙ্গে পরিচিত এবং তাঁরাও অমরেশদের 'দঙ্গলের' বিনোদনের প্রথাবহির্ভূত ধরন সম্পর্কে পরিচিত এবং উৎসাহী। মধ্যরাতে কেন এই সাঁতার এবং তাতে বারবণিতাদের উপস্থিতিই বা কেন? কোন তান্ত্রিক ধর্মীয় সম্প্রদায় অলৌকিক সংস্কারের সঙ্গে এরা জড়িত কি? [কুম্ভমেলায় নাঙ্গা সন্ন্যাসীদের অংশগ্রহণের মতো।] অন্যথায় উনিশ শো ত্রিশের কলকাতার হিন্দু সমাজে 'ভদ্দর লোকের মেয়েরা' যাবে কেন? 'নিমকের' বস্তার মতো ভুশ করে ঝাঁপই বা কেন? নগ্নতার কারণে কি? এসব প্রশ্ন ঐ মধ্যরাতের উৎসবের 'ইরোটিক কনটেন্ট'-এর সম্ভাবনা সংক্রান্ত কৌতূহল পাঠকের মনে উদ্রিক্ত করে, কিন্তু চরিতার্থ করে না। আমরা জানতে পারি না। এতদসত্ত্বেও সমাজ সম্পর্কে তা কিছু বলে বৈকি, নারী পুরুষ সম্পর্ক সম্বন্ধেও। অন্যথায় ন্যারেটিভে এই সংবাদের জায়গা হবে কেন? সরস্বতী পূজার দিন যেমন মেসের হলরুমে বাঈনাচ হলো, সকলে মদ খেল। গয়মতি ঝি-কে নিয়ে সবাই ফুর্তি করছিল। মাল্যবান ভাবে : "সরস্বতী পূজোর সঙ্গে এ সবের কী সম্পর্ক। মদ, বাঈনাচ, ঝি—এ সবের কি দরকার!" [পৃ. ৭৮]

বারবণিতা সংক্রান্ত তীব্রতম উল্লেখ মাল্যবানের প্রতি উৎপলার শ্লেষাত্মক কথায় : "এতবড় পৃথিবীতে একজন মেয়েলোকও তোমার সঙ্গে খাতির করা দরকার মনে করল না? ... একজন বেশ্যার সঙ্গেও যদি সমানভাগে তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারতাম, তাহলে এতটা দম আটকে আসত না আমার।" [পৃ. ৩১]

মৃত্যুর চিত্রকল্পটি বার বার ঘুরে এসেছে। উপন্যাসের শুরুতেই কাহার মাহাতোরা একটি মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে তার উল্লেখ আছে। এর পরপরই কৈশোরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মাল্যবানের মনে পড়ে রাত্রির কুয়াশা-নিবিড় গ্রামের শ্মশান থেকে ভেসে আসা হরিবোল ধ্বনি, যেন কোন দূর কুয়াশা পুরুষদের কলরোল বলে মনে হয়। এ ছাড়াও প্রতিবেশী পরিবারে শিশুর মৃত্যু, সত্যেন বাবুর স্ত্রী রমার মৃত্যু বিপিন বাবুর স্ত্রীর মৃত্যু এবং একাধিক মৃত্যুর স্বপ্ন এবং অজানা যুবতীর মৃতদেহ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যেটা লক্ষণীয় তা হলো এই যে, এই সব চিত্রকল্পেও বাসনার সঙ্গে মৃত্যুর আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছে।

বিপিন বাবু ও তাঁর স্ত্রী সুখী দম্পতি, স্ত্রী স্বামীর জন্য উলের ভেল্ট বুনছিলেন : "তার উপর রাতে কিছুটা অত্যাচার হল ... কাজটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেল। রক্তের চাপ বেড়ে গেল খুব। সকাল বেলা জলচৌকিতে বসেছিলুম মুখোমুখি। আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে, ব্যস ভিরমি খেয়ে পড়ে গেলেন। তখুনি হয়ে গেল।" [পৃ. ৮৩]

মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহের পৌনঃপুনিক বর্ণনা এসেছে যা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্যও এসেছে ঐ যৌনতার পরিব্যাপ্ত পরিমণ্ডল থেকেই। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি মাল্যবানের ভাবনায় বাসনাদীর্ণ দেহ সবসময় "যৌন আগুনে পুড়ছে। শরীর ও মন দুই বিরোধী সত্তা : 'মন কিছু নয়, শরীরই স্বাদ দেয়।" রিরংসার তাড়না তো শরীরকেই ওলট পালট করে দেয় যার হাত থেকে কারো মুক্তি নেই। মন তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না (হেড মাস্টারের ক্ষেত্রেও পারেনি এবং কি আশ্চর্য, সমাজ তাকে এ জন্যে ক্ষমাও করেছে। সেই দেহকে কি মন থেকে সত্যি আলাদা করা যায়? তবে কি যৌনতাই দেহের আত্যন্তিক পরিচয়? এইসব চিন্তার প্রেক্ষিত থেকে ঐ মৃতদেহের বর্ণনা তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত দুটোর সময় কান্নাকাটির শব্দে মাল্যবানের ঘুম ভেঙে গেছে। ধীরেন বাবুর দরজার কাছে ভিড় দেখে এগিয়ে জানল, সত্যেন বাবুর স্ত্রী মারা গেছেন। "ঢুকে দেখল, একটি মেয়েমানুষের শব নিচে নামানো হয়েছে—মেয়েটির বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ হবে হয়ত, এমন সুন্দর শান্ত নিরিবিলি মুখ—কপাল চুল। সিন্দুরে মাখা মাখা। দেখে তার প্রাণের ভেতর কেমন যে করতে লাগল। অন্ধকার শীতের ভেতরে সে চুপে চুপে নিজের ঘরে ফিরে এল আবার। অবসন্ন হয়ে নিজের বিছানার ওপর বসে রইল খানিকটা সময়।" [পৃ. ৫৮] আকস্মিক ঘুম ভাঙা মধ্যরাতে মাল্যবানের জন্য অভিজ্ঞতাটি যে 'ট্রম্যাটিক' এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অস্বস্তিকরও খানিকটা। অন্যথায় অন্ধকার, চুপিচুপি, শীত, অবসন্নতা এসব অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করছে কেন? সৌন্দর্য ও মৃত্যুর এই পাশাপাশি অবস্থানই কি অস্বস্তির কারণ? মাল্যবান যে এই রকম সময়েও মেয়েটির দেহ সৌন্দর্য লক্ষ্য করছে এটাই কি অস্বস্তির কারণ? ভইয়ুরিস্টিক (voyeuristic) অপরাধবোধ—চুরি করে দেখে ফেলার গ্লানি? না, এতকিছু সে সচেতনভাবে ভাবতে পারে না—অন্তত তক্ষুণি নয়। তবে কি অবচেতনের অপরাধবোধ তাকে 'অবসন্ন' করে দিচ্ছিল? সে 'চুপিচুপি' চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল—তার সহ্য হচ্ছিল না। আমাদের শেক্সপীয়ারের 'ওথেলো' এবং ওয়েবস্টারের 'ডাচেস অব মালফি'র অনুরূপ মৃত্যু দৃশ্যের কথা মনে পড়বে। এই যে 'ভইয়ুরিজম' বা চুরি করে দেখা, এটা মাল্যবান নয়, আমরা পাঠকরা করছি কারণ ঔপন্যাসিক আমাদের সে সুযোগ করে দিয়েছেন। যে বাসনার তাড়না ন্যারেটিভের পেছনে কাজ করে, আমাদের উচ্চকিত রাখে, সেই বাসনা যেন অকস্মাৎ এই প্রাণহীন দেহে স্তব্ধ হয়ে গেছে অথচ তার সৌন্দর্য, তার যৌন আবেদন এখনো নির্বাপিত হয়নি। উপন্যাসের শুরুতেই মাল্যবানের যে মনে হয়েছিল : "বৃহৎ আলোর শরীর নিয়ে থেমে আছে চাঁদ" ঠিক তেমনি ইরোটিক সৌন্দর্য যেন তার সমস্ত উজ্জ্বলতা নিয়ে থেমে আছে। কিন্তু শুধু আমাদের পাঠকদের মনে নয়, মাল্যবানের অবচেতনেও যে এমন ভাবনা-পরম্পরা প্রবাহের মতো ভেসে যেতে পারে তার কিছু চিহ্ন উৎকীর্ণ হয়ে আছে পরবর্তীকালে মাল্যবানের স্বপ্নে। মাল্যবান রমা মারা যাওয়ার পর থেকেই মাঝে মাঝে কেমন সব মৃত্যু ও দাহের স্বপ্ন দেখে। "... আরেকদিনের স্বপ্ন সবচেয়ে ব্যথা দিল তাকে। দেখল, উৎপলা মরে গেছে। স্বপ্নের ভেতর মনে হল, উৎপলা সত্যেন বাবুর স্ত্রী সমস্ত পৃথিবীই তা জানে—মাল্যবান নিজেও খুব ভাল করেই জানে যে, দশ বারো বছর ধরে এরা পরস্পরের বৈধ স্বামী-স্ত্রী। এদের এরকম সম্পর্ক নিয়ে কোন খটকার বাষ্প নেই মাল্যবানের মনে। কিন্তু তবুও, সেই সঙ্গে সেই স্বপ্নেই উৎপলা মাল্যবানের স্ত্রীই, আর কারো কিছু নয়। এ রকম সব খাপছাড়া জিনিস স্বপ্নের ভেতর খুব সত্য ও স্বাভাবিক বোধ হচ্ছিল। দেখা গেল, উৎপলা মরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে, সমস্ত চুল এলোমেলো, কপালে মাথায় সিঁদুর ধ্যাবড়া, পরনে আশ্চর্য বিধবার থান। মড়ার খাটিয়ার ওপর শুয়ে মড়া নারী মনের, মাংসপেশীর নানা রকম নম্র, উদ্দাম আক্ষেপে নিজের মৃত্যুর বেদনা সত্যেনকে জানাচ্ছে কিন্তু শূন্যতা ও হাহাকার বিঁধছে মাল্যবানকে, মর্মস্নায়ুতে।" [পৃ. ৬১]

এই স্বপ্নকে মনস্তাত্ত্বিকরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করবেন : অনেকগুলি 'ট্র্যান্সফারেন্স বা স্থানান্তর ঘটেছে এখানে। উৎপলা নয়, রমারই মৃতদেহ দেখছে মাল্যবান। উৎপলার অন্য পুরুষের (অমরেশ/সত্যেন) প্রতি আসক্তি/আকর্ষণ এর কথা ভাবছে মাল্যবান। মাল্যবানের অবচেতন একমাত্র উৎপলার মৃত্যুই—তাঁর ঐ অস্বস্তিকর এবং অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের উপায় বলে ভাবছে ; অর্থাৎ উৎপলার মৃত্যু কামনা করছে। ঐ ঈর্ষাই এবং ঈর্ষাজনিত ভয়ানক হন্তারক ইচ্ছাই 'হাহাকার' হয়ে তার মর্মস্নায়ুতে বিঁধছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাল্যবান নিজেরই মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখছে, এক অর্থে উৎপলার কাছে সে ত মৃতই,—যে কারণে উৎপলার বিধবা বেশ ইত্যাদি ... ইত্যাদি। মাল্যবান নিজেই ঐ স্বপ্নের সম্ভাব্য ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা নিয়ে ভাবছে এবং সে সমস্ত ব্যাখ্যা তার সচেতন মন স্বীকার করতে চায় না [পৃ. ৬৩]। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য যেটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো যে, মৃতদেহটি 'মৃত' নয়, যে তার মনের মাংসপেশীর নানা 'নম্র ও উদ্দাম আক্ষেপ' সকলকে জানাচ্ছে অর্থাৎ 'ইরোটিক' আবেদন নির্বাপিত হয়ে যায়নি। মাল্যবান অন্য একটি রূপসী যুবতীর মৃতদেহের কথা বলেছে যার গা থেকে 'রূপ ফুটে বেরুচ্ছিল'।

কারো কারো অবচেতনে নয়, সচেতন মনেই যে ঐ ইরোটিক আবেদন বিক্ষেপের সৃষ্টি করতে পারে তারও বীভৎস উদাহরণ মাল্যবানের ঐ রূপসী যুবতীটি। মাল্যবান উৎপলাকে বলছে : "একজন খুব রূপসী কুড়ি একুশ বছর বয়সেই সুস্থ শরীরে হঠাৎ মারা গেল। বিকেল বেলাতে তাকে মাটি দেওয়া হল। সবাই চলে গেল। সেখানে জন-মানব কেউ ছিল না। সন্ধ্যের পরই একটা লোক এসে মাটি সরিয়ে সেই মরাকে চুরি করে নিয়ে গেল। কেন নিল বলতো? ... বেশ সুন্দরী ছিল, বেশ সোমত্ত : শবটাকে মাটি খুঁড়ে বার করবার পরও তার গা ফুটে রূপ বেরুচ্ছে, আর গতরের সে কি পুষ্টতা। ... এই জন্যেই চুরি করা হয়েছিল —।" [পৃ. ৫১]

ঘটনার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নয়, ঐ ঘটনার বর্ণনা তথা ভাষিক নির্মাণই উৎপলাকে জাগিয়ে দিল। উপন্যাসে এরপরই আছে : "মাল্যবানকে খুব বেশী জাগিয়ে দিয়েছে উৎপলা, কথায় কথায় নিজেও খুব বেশী জেগে পড়েছে আজ। নীচের ঘরে আর যেতে দেওয়া হল না মাল্যবানকে আজ রাতে।" উপন্যাসের ভাষিক বর্ণনা পাঠকের জন্য ঠিক ঐ কাজটাই করে। সে জন্যেই রোমান্টিক উপন্যাস বা গথিক উপন্যাস এত জনপ্রিয়। অন্য ধরনের উপন্যাসেও যে জন্যে আমরা বাসনার কাহিনীটাই শুনতে চাই, সেটাই আমাদের মন অধিকার করে থাকে, আমরা সেটা বারবার শুনতে চাই। 'ন্যারেটিভ অব ডিজায়ার', 'ডিজায়ার ফর ন্যারেটিভে' রূপান্তরিত হয়।

আমরা যে বারবার মাল্যবানের দুঃস্বপ্নের কথাই শুনি তা তার উৎকণ্ঠাপীড়িত অস্তিত্বই প্রমাণ করে। মাল্যবান শুধু উৎপলারই মৃত্যুদৃশ্য দেখে না, একটি স্বপ্নে সে নিজেরও মৃত্যু-দৃশ্য দেখতে পায়। "একদিন সে দেখল নিজে মরে গেছে, তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল.; সেখানে সে খুব অমায়িকভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, সকলকে নমস্কার জানাচ্ছে, বিদায় নিচ্ছে, বলছে, আপনাদের সঙ্গে তো আর দেখা হবে না, কোথায় যাই কে জানে।" ঐ স্বপ্নেতে মাল্যবানের নিরুদ্বেগ, আনন্দময় ব্যবহার থেকে মনে হয় যেন ঐ মৃত্যু সে অবচেতনায় আকাঙ্ক্ষা করেছে মুক্তি হিসেবে, হয়তো বা প্রত্যাশাই করেছে। না কি এই মৃত্যু এক ধরনের গোপন প্রতিশোধ, শিশু-কিশোররা যেমন অভিমানবশত নিজেকে কষ্ট দিয়ে মাকে শাস্তি দেয়। কারণ জেগে উঠে খানিক পরেই মাল্যবান ভাবছে যে, মনু উৎপলাকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে, যে শাস্তি সে জীবনের কাছ থেকে পেয়েছে। "মানুষের যে পাওনা বুঝে নিতে হবে স্ত্রী-সন্তানকে। কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়, চুপ হয়ে যায় সব, শান্ত নিশ্চুপতা রয়েছে। প্রথমে মাল্যবানের মৃত্যু—তারপর অনেকদিন পর হয়ত বা তার পত্নী আর সন্তানের মৃত্যু ; এই ত্রিমৃত্যুতে নিস্তব্ধ হয়ে যাবে সব। সময়ের কাছে মাল্যবানের দায়িত্ব ফুরিয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে এখনই যেন ফুরিয়ে যাচ্ছিল সব—এই রকম একটা অনুভব ঘিরে রাখছিল মাল্যবানকে।" [পৃ. ৬১] মৃত্যু-স্বপ্নের এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা 'মরবিড' অনন্যতা আমরা লক্ষ্য করি, যেন মাল্যবান অনেকদিন থেকেই নিজের মৃত্যুর কথা ভাবছে, যা বস্তুত সময়ের কৃষ্ণ-বিবরে লুপ্ত হওয়ার বাসনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারা উপন্যাসে যে মৃত্যুর এত পৌনঃপুনিক উল্লেখ, এত মৃত্যুদৃশ্যের চিত্রকল্প তার একটা তাৎপর্য এখন বোঝা যাচ্ছে। আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করার মতো এই উপন্যাসে তা হলো, বাসনা এবং মৃত্যুর পাশাপাশি অবস্থান। মৃত্যুমাত্রেই বাসনাকে প্রতিরুদ্ধ করে। অপ্রাপনীয় প্রহত বাসনার সংক্ষোভও তেমনি মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। মাল্যবানের ক্ষেত্রেও দেখি ইরোটিক কল্পনা নিরন্তর মৃত্যুর চিত্রকল্পের সঙ্গে সংগ্রথিত হয়েছে। জীবনানন্দে মৃত্যুর চিত্রকল্পে একটা প্যারাডক্স আছে। আমরা লক্ষ্য করলেই দেখব যে, মৃত্যু জীবনানন্দে বাসনা প্রতিহত করে না, তাকে উদ্রিক্ত ও জাগ্রত করে।

জীবনানন্দের মৃত্যু–চিত্রণের অন্যদিক নিয়ে এবার ভাবা যাক। মৃত্যুভাবনা অবশ্য সবসময় 'মৃত্যু' হিসেবে উল্লিখিত হয়নি ; অনেক সময়েই তা অন্য পরোক্ষ চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। শীত, কুয়াশা, অন্ধকার নৈঃশব্দ, সময় সংক্রান্ত চিত্রকল্প শুধুমাত্র ঐ সমস্ত শব্দ নির্দেশিত ধারণাসমূহেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং অধিকাংশ সময়েই অনিকেত, রহস্যময়, সম্মোহনকারী মৃত্যুর দিকেই ইঙ্গিত করেছে বা এমনকি তার প্রতিশব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। ওপরের উদ্ধৃতিতে যেমন 'শান্ত নিশ্চুপতা' বা 'সময়ের' ব্যবহার। অনত্র তার "সময়ের কাল শেরওয়ানী' শিশিরের শব্দ না কি সময়ের বালুঘড়ি ঝিরি ঝিরি শিরি শিরি"' "কালপুরুষ লণ্ঠন হাতে করে সুদূর যানের পথে চলেছেন ... দূর পরলোকের নিক্বন শোনা যায়"' অনাথ অন্ধকার ও গভীরতার ভেতর অনির্বচনীয় সময়', 'রাত্রির নিঝোর সময়', 'সময়ের সমগ্রতা'—এইসব বহুতল চিত্রকল্পকে শুধুমাত্র শব্দার্থ দিয়ে যেমন, বোঝা যাবে না তেমনি কখন তা 'কুয়াশা', 'ঘুম', 'নিঃশব্দতা'র মতোই মৃত্যুর অভিভাব রচনা করবে তাও পূর্বাপর প্রসঙ্গ, লেখকের ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ও পাঠকের অনুভূতির ওপর নির্ভর কমবে। তবে ঐসব চিত্রকল্পের পৌনঃপুনিকতাই ঐগুলিকে অর্থময়তা দান করে, বারবার পুনরাবৃত্ত হওয়ার মানেই তাতে অভিপ্রায়ের আরোপণ। স্বপ্ন–প্রক্রিয়াও মূলত অভিপ্রায়েরই পুনরাবৃত্তি যদিচ তা 'স্থানান্তর' ও 'রূপান্তরে'র মুখোশের আড়ালে আত্মগোপন করে। কিন্তু চিত্রকল্পও তো এক ধরনের রূপান্তরের মুখোশ তথা 'মেটাফরের' মুখোশ।

মাল্যবানের মন যে কুয়াশা, অন্ধকার, নৈঃশব্দের প্রতি নিরন্তর আকর্ষিত হয় তার একটা প্রণোদনা আসে তাঁর অস্তিত্বের গভীর তল থেকে। আমরা জানতে পারি "মাল্যবানের জীবনে নৈঃশব্দের খানিকটা সূক্ষ্ম মানে আছে।" [পৃ. ৩০] মাল্যবান নিজেই অনুভব করে তার অবচেতন "যেন তাকে অন্ধকারের দিকে, নৈঃশব্দের দিকে, মৃত্যুর দিকে কেবলই টানছে আর তার চেতন বলছে জেগে থাকতে" হয়তোবা উৎপলার রূঢ় বস্তু পৃথিবীতে নয়, অন্য এক 'প্রতীক পৃথিবীর' ভেতরে। কিন্তু তার উন্মূলিত সত্তা আশ্রয় পায় না কোথায়ও। উনবিংশ শতকের 'নিশায়মান সমুদ্র তীর' (ম্যাথু আর্নল্ড !) বিংশ শতকের 'উপচীয়মান, রক্ত রৌদ্রজ্বালা', 'বাণিজ্য শক্তির গোলক ধাঁধা' সবই তাকে ক্লান্ত করে, ক্লান্ত করে। শীত, রাত ও ঘুমের আকর্ষণই যেন জয়ী হয়। এত শীত, কুয়াশা, ও রাত্রিময় উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই।

মাল্যবানের আকাঙ্ক্ষা অথচ বড় কিছু নয়। সে ভাবুক, কিন্তু ভীরু। তার পরিবেশ—প্রকৃতি ও মানুষ, কেবলই তাকে খর্ব করে। বাংলা উপন্যাসে সে এক দুর্লভ প্রজাতির প্রতিনিধি : অনায়কোচিত নায়ক, তথা 'এ্যান্টিহিরো'। তার মন "মুনিয়ার মতো, মেঠো ইঁদুরের মত আকাশে আকাশে ফসলে ফসলে ভেসে যেতে চায়।" কিন্তু তার ঘরে পাখিগুলো "একেবারে বেহেড হয়ে ডিম পাড়ে। যেন পাৎবাদামের গাছ থেকে বাদাম টপাটপ করে ঝরে।"'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মেঝের ওপর পাখির বিষ্ঠা, পালক ভাঙা, ডিমের লালা ... আঁশটে এঁটো। মাল্যবানের প্রকৃতি ভাবনার এই দ্ব্যর্থকতা তাকে বিষণ্ণ করে। প্রকৃতিও তাকে খর্ব করে, তার ভাললাগাকে প্রতিহতই করে। কিন্তু তবু প্রকৃতিই তার শান্তির শেষ আশ্রয়। মাল্যবানের সুখের ভাবনায়ও তাই প্রকৃতি থেকে আহরিত চিত্র : গভীর রাতে "পাড়াগাঁর পৌষরাতে নিশ্চুপ ডানার পাখীর মত স্নিগ্ধ নৈঃশব্দে"—মনু ও পলার বিছানার পাশে সে কেবল একটু শুধু বসে থাকতে চায়। কেমন স্নিগ্ধ শারীরিক মনে হয় তার রাত্রিটাকে, রাত্রির এই নিঝোর সময়টাকে। এ টুকুই তার সুখের কামনা। কিন্তু তার স্ত্রী ঘুম ভেঙে চমকে উঠেই কঠিন গলায় বলে : "এ সময় তোমায় কে আসতে বললে। ... রাত দুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গায়েন'। [পৃ. ১৩] "বিছানায় এসে বসে মনে হল, জীবনটা এই রকমই হ্যাঁচকা ব্যাপার। ... হড়পা বানের ঠাণ্ডা স্রোতে যেন মুর্গী আমি, হাঁসের মত সাঁতার কাটতে চাচ্ছি"। [পৃ. ৭৫]

হাঁস-হাসিন, বক, বসন্ত বৌরি, ঘুঘু, শালিক, শামকল, লক্ষ্মীপেঁচা, কাক, চিল, বাজ পাখি, সারস, শঙ্খচিল প্রভৃতি অসংখ্য পাখির সঙ্গে দেখা হয় আমাদের এই উপন্যাসে। কিন্তু সর্বত্র এই ধরনের বৈপরীত্য লক্ষ্য করি। আসলে মাল্যবানের জগতে দুই প্রকৃতি আগেই বলেছি—একটি বস্তু প্রকৃতি, একটি প্রতীক প্রকৃতি—একটি 'রিয়্যাল' আরেকটি 'পারসিভ্‌ড্'। মুনিয়া আর 'পৌষরাতের নিশ্চুপ ডানার পাখী' হলো মাল্যবানের অনুভবের পাখি ; আর যে পাখি ঘরে ডিম পেড়ে গেছে, যার "হারানো নষ্ট ডিম সম্পর্কে তার কোন চেতনা নেই" সে হলো বস্তু পৃথিবীর পাখি।

মাল্যবানের সময়ের ব্যবহার সম্পর্কেও একই কথা বলা যায় : একটা হলো পার্থিব সময়, একটা অনুভবের। উপন্যাস শুরু হয় একটি নির্দিষ্ট পার্থিব সময়ে, যেমন সব উপন্যাসই শুরু হয়ে থাকে। আমরা জানতে পারি আজ মাল্যবানের বিয়াল্লিশতম জন্মদিন, ২০ অগ্রহায়ণ। উপন্যাসের অন্যত্রও এরকম ক্যালেন্ডার সময়ের উল্লেখ আছে, যথা : 'উনিশ শো ঊনত্রিশের রাত', 'শ্মশান থেকে বেলা দুটোর সময় বাড়ীতে ফিরে', 'চার পাঁচ দিন কেটে গেছে', 'পরদিন সন্ধ্যার সময়' অফিস থেকে ফিরে' ... ইত্যাদি। উপন্যাসে এমনটি জানাতে হয় কারণ, পাঠক প্রত্যাশা করে যে ঘটনা ঘটে চলেছে, চরিত্ররা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। পরিবর্তনের অনিবার্য প্রক্রিয়া চরিত্রদেরকে একটি সঙ্কটের দিকে নিয়ে চলেছে যা অচিরাৎ আনন্দময় বা বিষাদময় সমাপ্তিতে সম্পূর্ণ হবে। মাল্যবানের পাঠক যে বিব্রত বোধ করেন তার একটি কারণ এই যে, ঘটনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই উপন্যাস পরিসমাপ্ত হয়। অথচ এমনটিও হওয়ার কথা ছিল না—তারিখ ও সময় উল্লেখ করে ঘটনা ঘটে চলেছিল। কিন্তু ঘটনাতো কোথায়ও পৌছুল না। তখন আমরা পাঠকরা লক্ষ্য করি, তাই তো, ঘটনাতো প্রায় কিছুই ঘটেনি। দিনানুদৈনিকের অনুবর্তন আছে কিন্তু উপন্যাসের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ কিছুই ঘটেনি, কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। এটি উপন্যাসের দুর্বলতা বা ব্যর্থতা বই ত কি, এমন আমাদের মনে হয়। অথচ এই উপন্যাসে সময়ের কমতি নেই। 'সময়ের ভাঁড়ার' 'সময়ের শরীরের' কথা আমরা শুনি, 'সময়ের কালো শেরওয়ানী' যার গন্ধ আবার অন্ধকারের মতো—সেই গন্ধ মাল্যবান পায়, সময়ের শব্দও শুনতে পায় 'শিশিরের শব্দের মত', 'বালুঘড়ির ঝিরিঝিরি'র মতো। 'বিশৃঙ্খল সময়', 'সময়ের গোলক ধাঁধায় সে ঘুরে মরে' "তার মন এক চিমটে সময়ের কিনার থেকে ঝুলে থাকে এই সৃষ্টির ভেতর"। শেষ পর্যন্ত 'সময়ের সমগ্রতার' কাছে সে আত্মসমর্পণ করে'। কিন্তু উপন্যাস কত তারিখে শেষ হয় তা আমরা জানতে পারি না। কারণ এত যে সময় এ সবই মাল্যবানের অনুভবের সময়, যে সময়কে সে "মেটাফরিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই অনুভব করেছে। এর সঙ্গে ক্যালেন্ডার সময়ের কোন মিল নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে এই উপন্যাসে ঘটনাহীনতার যে অভিযোগ আমাদের বিব্রত করে সেও ঐ সময় সংক্রান্ত বা বলা যায় উপন্যাসের কাঠামো সংক্রান্ত ভুল বোঝার কারণেই ঘটেছে। আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখব যে, উপন্যাস যদিও জন্মদিনের উল্লেখ করে শুরু হয়েছে, তবু এই জন্মদিন অত্যন্ত 'প্যারাডক্সিক্যাল'। জন্মদিন যদিও সাধারণত সূচনার দ্যোতক, এই উপন্যাসে কিন্তু তা নয়। এখানে ঘটনা সম্পূর্ণ হওয়ার পরই উপন্যাস শুরু হয়েছে। অর্থাৎ যেন সমাপ্তি বিন্দু থেকে উপন্যাসের শুরু। বস্তুত উপন্যাস যেখানে শুরু হয়েছে, যে ভাবনারাশির দ্বারা মাল্যবান আক্রান্ত তা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতারই ফল, তারপরে আর তেমন কিছু ঘটার ছিল না। প্রথম আট পৃষ্ঠার মধ্যেই মাল্যবানকে বলতে শুনি : "আজ বিশে অঘ্রাণ, পিতৃলোক মাতৃলোক মিলে জন্মতো দিলেন, ঢের ভালো ব্যবহার তো হতে পারে এ জীবনের, তা হয়েছে? হয়নি। হবে? বোঝা কঠিন।" ফলত এ উপন্যাস মূলত পেছন ফিরে দেখা, যেমন প্রায় আর সব উপন্যাসে ঘটে থাকে যে সম্পর্কে আগেই বলেছি। তবে ঐ সব উপন্যাস মৃত্যুদৃশ্যে, তথা 'তাৎপর্যপূর্ণ' সম্পূর্ণতার মুহূর্তে, শেষ হয়—উপন্যাসের প্রবল ঘটনাস্রোত সেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটির দিকে ধাবিত হয়। এক্ষেত্রে তার উল্টোটাই ঘটেছে, উপন্যাসিক আমাদের জন্য কোনো 'প্রিভিলেজেড' (priviledged) মুহূর্ত রাখেননি। উপন্যাস শুরুর আগেই সেটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এর পরে আর তেমন কিছু ঘটার নেই। যেটুকু ঘটে তা পূর্ববর্তী ঘটনার প্রতিধ্বনি। শুধু তাই নয়, ঘটনাগুলি যেন চরিত্রাবলীর ভাবনায় ও স্মৃতিতে কোনোই ছায়া রাখে না। ফলত ঘটনাগুলিকে এক গুচ্ছ তাসের মতো শাফল করা যায়, যে কোনো পরম্পরায় সাজোনো যায় তাতে কিছু আসে যায় না উপন্যাসের। সময় নিরর্থক হয়ে পড়ে।

মাল্যবান যে নায়কোচিত নায়ক নয় সেটিও পাঠকদের অসহিষ্ণুতার বিরক্তির ও হতাশার অন্যতম কারণ। মাল্যবান 'এ্যান্টিহিরো' এই জন্য নয় যে, সে মধ্যবিত্ত কেরানি, সে দরিদ্র বা সে অসুখী ; মাল্যবান এ্যান্টিহিরো এই কারণে যে উপন্যাসে নায়কের বাসনা দ্বারা, অভিপ্রায়ের দ্বারা যেভাবে ঘটনা অনুরঞ্জিত হয়, ঘটনা বেগ লাভ করে, পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়—মাল্যবানের ক্ষেত্রে তেমন কিছুই এখানে ঘটে না। 'এ্যান্টিহিরো'র ধারণাটি একটি নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা যেটি উপন্যাসের কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চরিত্রটির সামাজিক অবস্থান, সে উঁচু তলার মানুষ না নিচু তলার মানুষ তার বিচার এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। মাল্যবান এই উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করেনি, সে এই উপন্যাসে কিছুই ঘটায়নি। সে একজন অনুভূতিপ্রবণ পর্যবেক্ষক মাত্র।

মাল্যবানের অনুভূতি প্রবণতাই তাকে তাঁর সৌকর্যহীন, ক্ষুদ্র পার্থিবতা-আক্রান্ত পরিমণ্ডল থেকে আলাদা করেছে। সে বি. এ. পাশ করেছিল, আইন পড়েছিল। "আরো অনেকদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করবার সাধ ছিল, অনেক জিনিস শিখতে ইচ্ছা, বুঝতে ইচ্ছা, নিজের মনটা যে নেহাত কেরানীর ডেস্কে আঁটা নিখেট, নিরেস কিছু নয়, মানুষকে সেটা বোঝাবার ইচ্ছা। নানা রকম ইচ্ছা—মানুষকে যে তা জানাতে চায়। এক এক সময় মনে হয় ... জীবনটাকে কোন মহৎ কাজের যেন শীর্ষে ...নিয়ে ফেলুক।" [পৃ. ১২] কিন্তু "নিজের ক্ষমতার খর্বতা যে হাড়ে হাড়ে অনুভব করে"। ফলত তার পরিবেশের সঙ্গে সে যেন ঠিক খাপ খায় না, যেন সে বহিরাগত, বিচ্ছিন্ন, অনন্বিত। উৎপলার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঐ বিচ্ছিন্নতার , অনন্বয়ের, মানসিক দূরত্বের একটি উদাহরণ মাত্র। এই বিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে পার্থিব দিক হলো, নিজের ঘরে সে পরবাসী। তাঁর শোওয়ার জায়গা নিচের তলার রাস্তার পাশের শব্দময়, ধুলোময় ঘরে, একাকী। তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ের দোতলার শোবার ঘরে থাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর অধিকার নেই। উৎপলার ভাই বেড়াতে এলে তাকে বাড়ি ছেড়ে মেসে উঠে যেতে হয় সাত মাসের জন্য। সত্যি যেন সে অস্তিত্বের প্রান্ত-নিবাসী, যেমন সে নিজেই বলেছিল— 'সময়ের কিনার থেকে সে যেন ঝুলে আছে'। তার কোনো ঘর নেই।

গিয়র্গ লুকাচ্ বলেছেন যে, উপন্যাস নামক সাহিত্য-প্রকরণ হলো আধুনিক সভ্যতায় মানুষের আত্যন্তিক গৃহহীনতারই সাহিত্যরূপ। বাস্তবিকই যন্ত্রপ্রকৌশল আশ্রয়ী পুঁজিবাদী সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি লোক তাদের সনাতন গ্রামীণ আশ্রয় থেকে উন্মূলিত হয়ে গৃহহীন হয়ে পড়েছে। নতুন নতুন বাণিজ্য-কেন্দ্রিক শহর গড়ে উঠেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। উন্মূলিত গৃহহীন জনতা সেখানে ছুটে গেছে জীবিকার সন্ধানে, নতুন গৃহের আশায়। গত দেড়শ বছর ধরে মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে, এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়ে চলেছে। দেড়শ বছর ধরেই মানুষ উদ্বাস্তু, গৃহহীন, যাযাবর। বস্তুত এই উদ্বাস্তু গৃহহীনতা আধুনিকতার সংজ্ঞায়ই পরিণত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকের এই নিরন্তর স্থানচ্যুতি এক গৃহহীন মানসিকতারই জন্ম দিয়েছে যাকে বলি 'ডায়াসপোরা'। লুকাচ অবশ্য ঐ ভৌগোলিক গৃহহীনতার অর্থে গৃহহীনতার কথাটি বলেননি ; যদিও ভৌগোলিক গৃহহীনতা তাঁর কথিত গৃহহীনতার পশ্চাদপট রচনা করেছে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় মানুষের চিন্তার ও আবেগের জগতে খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস যে ঐকিক সুনিশ্চিত আশ্রয়ের অভিভাব রচনা করেছিল, পরবর্তী কালের ক্রমান্বয়ী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দর্শনচিন্তা সেই বিশ্বাসের আশ্রয় থেকে তাকে উৎসাদিত করে ফেলে। লুকাচ একেই বলেন 'এপিস্টেমোলজিক্যাল' গৃহহীনতা। বিজ্ঞান ও দর্শন যেহেতু শতখণ্ডে মানুষের মনকে, চিত্তকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেছে—ইউরোপীয় উপন্যাস, যা এই উপদ্রুত আশ্রয়-হীনতার পরিমণ্ডলেই আবির্ভূত হয়েছিল তা ঐ হৃত সম্পূর্ণতার ও অর্থময়তার গৃহটি, যা আবেগগতভাবেও হৃদ্ধ ও কবোষ্ণ, সেই তৃপ্তিকর গৃহটি সন্ধান করে চলেছে। আমরা যে উপন্যাস পাঠ করি তাও ঐ অর্থানুসন্ধানের প্রণোদনার দ্বারাই প্রাণিত। মাল্যবানও একটি এপিস্টেমোলজিক্যাল ডিসকোর্স।

ব্যক্তি মাল্যবান দুই অর্থেই গৃহহীন, নির্বাসিত : ভৌগোলিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দুই অর্থেই। তার জীবনের প্রথম বাইশ-তেইশ বছর গ্রামেই কেটে গেছে, যেখান থেকে জীবিকার সন্ধানে তাকে শহরে চলে আসতে হয়েছে। তারপরের পনের-ষোল বছর ধরে সে কলকাতা শহর নিবাসী, যে বাধ্যতামূলক অভিবাসনকে তার নির্বাসন বলেই মনে হয়। এই উপন্যাসে যে তাকে আমরা বারবার কৈশোর ও যৌবনের গ্রামীণ জীবনের স্মৃতিচারণায় ফিরে যেতে দেখি তা ঐ নির্বাসনজনিত হাহাকার ও প্রত্যাবর্তনের দুর্মর আবেগসঞ্জাত। আমাদের পথের পাঁচালীর অপুর কথা মনে পড়ে। তার ঘরের জানালায় একটি কাক দেখতে দেখতে মাল্যবানের মনে পড়ে :

"পাড়াগাঁর বাড়িতে প্রকাণ্ড বড় উঠোন ছিল তাদের, ঘাসে ঢাকা, কোথাও বা শক্ত সাদা মাটি বেরিয়ে পড়ছে, তারই ওপর সারাদিন খেলা করত রোদ, ছায়া, মেঘের ছায়া, আকাশের চিলের ডানার ছায়া—রোদে দ্রুততায় চলিষ্ণু হীরেকষের মত তার ছটকানো। শালিখ উড়ে আসত উঠোনে ; খড়ের চালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত বক—এই সরোবর থেকে সেই সরোবরে যাবার পথে, ডানায় তাদের জলের গন্ধ, ঠোঁটে রঙের আভা, চকিত চোখ দূরের দিকে, নীলিমার দিকে। কত উঁচু উঁচু গাছ ছিল উঠোন ঘিরে ; সারাটা শীতকাল ঘুঘুর ডাকে জারুল ঝাউ পাৎবাদাম আমের বন নিম হিজলের জঙ্গল কেমন ফুকরে ফুকরে উঠত—রোদের দিকে পিঠ রেখে নিজের শরীরটাকে একটু এলিয়ে দিলে সমস্ত শরীর ঘুমে ভরে উঠত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই পাখির ডাকে। মাঝে মাঝে উঠোনে এসে পড়ত ঘুঘু, কেমন কলের মত, পাখীদের দেশের ক্ষুদে ঢেঁকীর পাড়ের মত ঘুঘুদের লেজগুলো উঠত-পড়ত, উঠত-পড়ত ঘুর-ঘুর ঘুর-ঘুর করে ছুটে যেত তারা মাঠে ঘাসে কী খুঁজত—কী চাইত? সেই পঁচিশ তিরিশ বছর আগেকার শীতের ভোরের কুয়াশার ভেতর সেই সব পাখি যেন পৃথিবীর মনে কোন দিন ছিল না। আজকের পৃথিবীটা ... এমনি এক অদ্ভুত অপৃথিবী। ফিকে কফির মত রঙের গলা ফুলিয়ে কত পাতিকাক উড়ে যেত ঠাণ্ডা জলের ওপর দিয়ে ছুঁই ছুঁই করে, কোন নদীকে কোন দিঘিকেই না ছুঁয়ে, জলের ভেতর ঝাপসা প্রতিফলিত হয়ে, শাঁ শাঁ করে কোথা থেকে উড়ে যেত তারা কোথায়; সকালের কুয়াশার দিক থেকে দূর বিদিকের পানে উড়ে যেত যেই কাকগুলো পৃথিবীটাকেই টেনে বার করবার জন্যে, উজ্জ্বল সূর্যটাকে সবাইকে পাইয়ে দেবার জন্যে—যারা কাক নয়, পাখি নয়, তাদের জন্যেও—ক্ব-ক্ব-ক্ব-ক্ব—কেমন শত চেতনার হাঁকডাক, সা লি শি, নির্জনতা।" [পৃ. ৭৭]

এই অংশটির সঙ্গে এ প্রবন্ধের প্রথম দিকে উদ্ধৃত প্রকৃতি-বর্ণনামূলক তিনটি প্যারাগ্রাফ মিলিয়ে পড়লে ঐ স্মৃতি-চারণার অন্তর্নিহিত আর্তি ধরা পড়ে। এই প্রকৃতিকেই সে নাগরিক কোলাহল ও হলাহলের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে:

"কলকাতার রাস্তার নানা রকম শব্দ কানে আসে, রাত তো দুটো, শীতও খুব হুজ্জতে কিন্তু কাদের ফিটন যেন রাস্তার ওপর দিয়ে খট খট করে চলেছে; গাড়ির ভেতর মেয়েদের হাসি, বুড়ো মানুষের মোটাগলা, ছোটদের চেঁচামেচি। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অনেক দূর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল, এমন সময় এঞ্জিনের বিকট তড়পানিতে চারিদিকের সমস্ত শব্দ গিলে খেল। এল, চলে গেল একটা লরি। মাল্যবানের মনে হল একে যদি চাকা-টায়ারের শব্দ মনে না করে বাদল রাতের ঝমঝম আওয়াজ ভেবে নেওয়া যায় তবে বেশ লাগে—খানিকটা চুলবালি খসে পড়ল চাতালের থেকে মাল্যবানের নাকে-মুখে, বাড়িটার ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে—একেবারে টাইডাল ওয়েভের মত ছুটে গেছে লরিটা। রাস্তা দিয়ে কাহার মাহাতোরা একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছে। কার যেন প্রাইভেট মোটর মাল্যবানদের বাড়ির কাছেই এসে থামল—গাড়িটা কি রকম বিগড়ে গেছে যেন; দু-চারজন মিস্ত্রি সেটা মেরামতের চেষ্টায় আছে, মবিল অয়েলের গন্ধ মাল্যবানের নাকে ঢুকল। একটা ষাঁড় ফুটপাত দিয়ে যেতে যেতে ঘঁগ-ঘড়ম করে উঠল একবার; সামনেই কাদের যেন দোতলার থেকে একটা বড় অস্পষ্ট কান্নার ও ঝগড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাল্যবানের ঘরের পাশেই ড্রেনের কাছে একটা নেড়ি কুকুর ঘুর ঘুর করে রাবিশের ভেতর থাবা নখ চালিয়ে বালিঘড়ির বাজনা বাজিয়ে চলেছে অনেকক্ষণ থেকে: কী চায় সে? কী পাবে?" [পৃ. ১১]

এই যে নাগরিক শব্দপ্রপাত তার মধ্যেও মাল্যবান প্রকৃতির কথাই ভাবছে, ভাবছে চাকার-টায়ারের শব্দটাকে যদি বাদল বরিষণের ঝম্ ঝম্ আওয়াজ ভেবে নেওয়া যায়, রাবিশের মধ্যে কুকুরের নখ আঁচড়ানোকে যদি বালি ঘড়ির খসখসানি বলে ভাবা যায় তবে হয়তো ঐ ছন্দহীন ধ্বনি ঝঙ্কারের মধ্যেও একটা সুর খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রামে দেখা ঐ পাখিগুলি হারিয়ে গেল, কাঁচপোকা জোনাকির কথা মনেও পড়ে না, আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই। সেই জন্যেই প্রকৃতি-নিবিষ্ট জীবনের স্মৃতি তাকে এভাবে ডাকে। ঐ স্মৃতি-চারণার মধ্যে দিয়েই সে যেন নাগরিক নির্বাসনের ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে চায়। প্রকৃতিই কি তবে তার হৃত টেক্সট—অর্থময়তার?

মাল্যবান কি তবে সেই দিকভ্রষ্ট পথভোলা পথিক, সেই কবি যে হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হেঁটে চলেছে—যাকে আমরা প্রথম দেখেছি উনবিংশ শতকের ইউরোপীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমান্টিক কবিতায়? ঐ প্রকৃতির আসঙ্গলিপ্সু পরিব্রাজক কবি রোমান্টিকদের আর্কে-টাইপ্যাল চরিত্র, যাকে আমরা বায়রনের মতো নির্জন সমুদ্র তীরে দেখতে পাই অথবা পথহীন ঘন বনের আশ্লেষে, অথবা ওয়ার্ডস্ওয়র্থের মতো সম্মোহিত বসে থাকতে দেখি জলপ্রপাতের ডম্বরু গর্জনের মধ্যে। কবি এ সমস্তের মধ্যেই একটা রহস্যময় ভাষা শুনতে পান যার মধ্যে আছে ঐ হৃত অর্থময়তার পুনর্বাসনের অভিজ্ঞান। মাল্যবানও কি ঐ রকম কোনো কণ্ঠ শুনতে পায়? মাল্যবানও কুয়াশা পুরুষদের দূরাগত 'কলরোল' শুনতে পায়, শুনতে পায় এক আশ্চর্য দূর পরলোকের নিক্বণ, পুরাণ পুরুষদের? মাল্যবান শুনতে পায়, কিন্তু বুঝতে পারে না, বোঝা যায় না। মাল্যবানের প্রকৃতি দুষ্পাঠ্য, কুয়াশাবৃত, রহস্যময়। তার পাখিরা এক কুয়াশার মধ্যে থেকে অন্যতর, দূরতর কুয়াশায় মিলিয়ে যায়, প্রকৃতির জলের ওপর, নাকি মনের আয়নায়, অস্পষ্ট ছায়া ফেলে। তারা কী চায়, কোথায় যায়?

শুধু তাই নয় এ প্রকৃতি উদাসীনও বটে, এমন কি এই পৃথিবী মনেও রাখে না এইসব পাখিদের। সন্দেহ জাগে, জীবনানন্দই ঐ প্রাকৃতিক আশ্রয়ের রোমান্টিক সমাধান সম্পর্কে আসলে সংশয়ান্বিত। এনলাইটেনমেন্টে যুক্তির অতিমূল্যায়নের মতো রোমান্টিসিজমে অনুভবের অতিমূল্যায়নও কি একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে? জীবনানন্দ তাই রোমান্টিসিজমের ভাবালুতাকে অতিক্রম করতে চান রূঢ় জৈবিক বাস্তবের শক দিয়ে? যে পাখিরা অনিকেত রহস্যের সঙ্কেতবাহী, তারাই মাল্যবানের ঘরে 'খায় আর হাগে, হাগে আর খায়'। মাল্যবান বলে : "পাখিদের কিছু বলি না আমি, ময়লার লপসি করছে ঘরদোর, খুব ভোগান্তি ..... একটি বেড়ালছানা কে যেন রাস্তার ধারের জানালা দিয়ে তার ঘরের ভেতর ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।"(পৃ. ৭৪) মাল্যবান তাই নিয়ে ভাবছে : "দুচার মাস বয়েস এই ছানাটির, মা নেই, ভাইবোন কিছু নেই। ... পৃথিবীতে বেড়াল-কুকুরের বাচ্চারা পথ কেটে নেয় কিংবা যায় মরে। মাল্যবান ভাবছিল, এই বাচ্চাটার বাপ-মার কথা, "কেমন হাত-পা ঝেড়ে জীবনকে ঝাড়ছে তারা ; এই বাচ্চার ঝাড়টাকে জন্ম দেবার আগে কালোকিষ্টি রাতে আর জ্যোৎস্নারাতে পরীতে পেয়েছিল ধাড়ি বেড়াল দুটোকে, কী না করেছিল তারা ; কিন্তু আগামী ঋতুর ছানাগুলোকে জন্ম দেবার আগে আবার তারা দুর্নিবার ভাবে জোড় মেলাবে এসে, কিন্তু এখন তারা গত ঋতুর, সমস্ত বিগত ঋতুর, কৃতকর্মের দায়িত্বের থেকে খালাশ। জীবনকে তারা এ-রকম করে ফাঁকি দেয়, তবুও প্রশ্রয় পায় জীবনের কাছ থেকে নব নব ঋতু সমাগম হলেই বারবার বারবার।" [পৃ. ৭১]

প্রকৃতির ভেতরেই আছে এই উদাসীনতা। শুধু প্রাণীরাই নয় মানুষের ভেতরেও আছে ঐ ভুলে যাবার প্ররোচনা। "একটি মৃতা—খুব অল্প বয়েসেই—দগ্ধ হয়েছে শ্মশানে। একটি স্বামীর শোক খুবই জায়াকেন্দ্রিক, এখনো গভীর। কিন্তু তখনই তরল হয়ে যাচ্ছে সব ; সচ্ছল সফল সময়, ব্যথা, বাচালতা, নষ্টামি, ভয়, রক্ত, রিরংসা, অনাথ অন্ধকার ও গভীরতার ভেতর মৃত্যু নয়, শূন্য নয়, অফুরন্ত সময়, সময় শুধু।" [পৃ. ৬০]

মাল্যবান যে জগৎ আমাদের সামনে তুলে ধরে তাতে নিসর্গ-প্রকৃতির মতো মানব-প্রকৃতিও অনচ্ছ, জটিল ও দ্ব্যর্থকতামণ্ডিত। মানুষ ফলত যে সমাজ তৈরি করেছে তাও নিষ্ঠুর, বিকৃতি আকীর্ণ। এ সমাজে ভালোবাসার রোমান্টিক ন্যারেটিভও আর সম্ভব নয়, অথচ পাঠক হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা ঠিক ঐ ভালোবাসার ন্যারেটিভটিই।

উৎপলা যে মাল্যবানকে ভালোবাসে না শুধু তাই নয়, সে অকারণে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে তার প্রতি বড় নিষ্ঠুর। মাল্যবান অসুস্থ, তার বমি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। উৎপলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে পাশে বসল বটে, কিন্তু গুম হয়ে। বাতাস করল, কিন্তু তাতে কোনো ভালোবাসা ছিল না ; "উৎপলার হাতপাখা আবেগে নড়েনি কখনো, সবেগে নড়ছিল কিছুক্ষণ আগে"। সে মাল্যবানের খানিক আগের কাচা কাপড়গুলো নোংরার মধ্যে ফেলে কাদা মাখামাখি হতে দিল। বমি পরিষ্কার করার জন্য তার দুটি ভাল ধুতি ব্যবহার করল : "উৎপলার মেঝে পরিষ্কার করতে করতে ঘরের কোণের একটা ড্রেনের দিকে সমস্ত বের করে দিচ্ছিল—হাত দিয়ে নয়, ধুতিটা পায়ে খানিকটা জড়িয়ে নিয়ে পা চালিয়ে কাজ করছিল সে ... যেন ভূতে তাড়িয়ে এনেছে তাকে।" [পৃ. ৬৮] ধুতিটা মাত্র পনের দিন আগে কেনা, মাল্যবানের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। উৎপলা অন্যমনস্কভাবে এ কাজ করেছে তা নয়, উৎপলা সচেতনভাবেই ভাবছে "মানুষটাকে খানিকটা নিষ্পেষিত করার জন্যই তার ভাল-ভাল দুটো ধুতি দিয়ে নোংরা জায়গাটা সে নিকিয়েছে"। উৎপলার এই ব্যবহার শুধু নিষ্ঠুর নয়, 'পারভার্স'ও বটে।

ঐ বিকৃতির মোকাবিলা করতে করতে মাল্যবানের ভেতরে সঞ্চিত রাগ ও বিবমিষা কি তাকেও 'পারভার্স' করে দেয়? বেড়াল ছানার কান্না তাকে অস্থির করে দিচ্ছিল, তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল : "সমস্ত ট্রাম-বাস-লরির নটখটি, ঘড়ঘড়ির চেয়ে এ কান্না ঢের আলাদা জিনিস, এ জিনিস সহ্য করতে হলে সৃষ্টিটাকেই বুঝে দেখতে হবে—বুঝে দেখতে হবে উপনিষদের ও আইনস্টাইন-হোয়াইটহেডের ঈশ্বরের হিসেবের গরমিলটাকে।" কাজেই পারভারসিটি কি আছে প্রকৃতিতেও?—এমন ভাবনাও ছুঁয়ে যায় তাকে। এর কিছুই রোমান্টিক প্যারাডাইমে মিশ খায় না। মাল্যবান ভাবে : "বেড়ালের ছানার মৃত্যু তাকে বেশ একটা চমৎকার মুক্তি দিয়েছিল।" [পৃ. ৭৩]

উৎপলার ভালোবাসারই বা ধরন কি? অমরেশের সঙ্গে তার সম্পর্কতো ভালোবাসার নয়, হতে পারে না। অমরেশ মধ্যবয়স্ক, একদা জমিদারি ছিল, এখন শরিকে শরিকে ভাগাভাগি ; যে তৃতীয় স্ত্রী নিয়ে ঘর করে, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে আলাদা থাকে [হিন্দু সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ ছিল না], দ্বিতীয় স্ত্রী কাত্যায়নী মারা গেছে। তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভে তিনটি সন্তান, আরেকটি আসছে। গানবাজনা করে—সেই সূত্রেই উৎপলার সঙ্গে যোগাযোগ। ভালো গায়, 'স্থিরকৌশলের সিদ্ধি' আছে। 'কিন্তু আন্তরিকতা? আত্মা?'--মাল্যবানের মনে সন্দেহ আছে। তাছাড়া মাল্যবানের কাছে তাকে 'অসার, অবুদ্ধিমান, উচ্ছ্বাসসর্বস্ব' মনে হয়। কিন্তু গড়ন পেটন ভালো, মুখ সুন্দর—"এসব ভুসিমাল হীরে হয়ে গেল উৎপলার কাছে। তাই ত হয়।" "অমরেশের গলার সুর, শরীরের বাঁধ, সমস্ত অন্তরাত্মা থেকেই কেমন একটা সুদৃঢ় কিন্তু সুলভ আত্মতুষ্টি চুঁইয়ে পড়ছে।" আজকালকার এই শিশ্নোদরতন্ত্রী এবং যা শিশ্নোদর নয় কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল—এইসব মূল্য বিশৃঙ্খলার পৃথিবীতে" অমরেশরাই স্বাভাবিক। উৎপলাকে মাল্যবান মরীয়া হয়ে প্রশ্ন করে : "অমরেশের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করবে বলো।" উৎপলার উত্তর : "কোন কিছু ব্যবস্থা করার নেই।" [পৃ. ৯৯] মাল্যবানের কি জিঘাংসা বৃত্তি জাগে না? জাগে। সাইকেলের ঝিকমিকানিটাকে ভোজালির ঝলসানির মত বলে মাল্যবানের মনে হয়।

উৎপলার সঙ্গে অনুপম মহলানবীশের সম্পর্কটা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি রোমান্টিক। কিন্তু তখন উৎপলা উদ্ভিন্নযৌবনা অনূঢ়া, স্বাধীনতাকামী সন্ত্রাসীদলে গোপনে কাজ করছে—সেই সুবাদেই পরিচয়। উৎপলার ভাষায় : "টেররিস্ট বলত সবাই অনুপম মহলানবীশকে। ডাকগাড়ি-রেলগাড়ি লুট, ব্যাংক লুট, আর্মারি লুট কত কি করেছে অনুপম--কত জেলে পচেছে, একবার ফাঁসির হুকুম হয়ে গিয়েছিল অনুপমের, কিন্তু কি করে বাতিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল, টেররিস্টদের দলে থেকেও আমি তা টের পেলাম না।” কিন্তু মাল্যবান জানে, “এরা অন্যলোক, বিষয়ী লোক। এদের কারুর সঙ্গে উৎপলার বিয়ে হলে ঠিক হত, দাঁড়িয়ে যেত। অনুপম এ্যাপ্রুভার হয়েছিল এবং বোধ হয় স্পাই ছিল।” উৎপলার কথা : “অনুপম স্বদেশী করেছে, না স্বদেশীদের লাটের কিস্তিতে চড়াচ্ছে সে সব ভেবে তাকে ভালবাসিনি আমি। সে স্পাই বুঝি? ... হবে স্পাই। এ্যাপ্রুভার হলে হবে। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পাতানোর নিয়ম আমার আর এক রকম।” [পৃ. ৩২] “কত যে সজারুর ধাষ্টামো ... আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির”—মাল্যবান ভাবে। জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের পরে এরকম বিব্রতকর চরিত্র আর বাংলা উপন্যাসে দেখা যায়নি।

মানুষ ও মানুষের সমাজ সম্বন্ধে মাল্যবানের সিদ্ধান্ত : “স্ত্রী–পুরুষের সম্পর্ক, মানুষে–মানুষে সম্পর্ক, মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলেছে—সফলতা ও সরলতাও, হারিয়ে ফেলেছে সরসতা ; আজকের বিমূঢ় পৃথিবীতে সমস্ত পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক–গ্রন্থিকে ছেদ করে অপরিমিত গণ্ডমুর্খের অপরিমেয় মনোবল পথ কেটে চলেছে।” অপুর সঙ্গে মাল্যবানের চরিত্রের মিলের কথা বলেছি। মিল তাদের অনুভূতিময়তায়, কল্পনায়, প্রকৃতি নিমগ্নতায়, সমস্ত দুঃখ ও বেদনা সত্ত্বেও মহাবিশ্বের সঙ্গে এক রহস্যময় সম্পর্ক কল্পনার ব্যাকুলতায়। কিন্তু তাঁদের জীবনের কাহিনী দুটি ভিন্ন উপন্যাসেই আমাদের উপনীত করে না, দুটি ভিন্ন epistemological universe এও উপনীত করে। জীবনানন্দ দাশ যেন নতুন করে নিজের মতো করে পথের পাঁচালীটি লিখেছেন, একটি নতুন পথের পাঁচালী, একটি অ্যান্টি–রোমান্টিক পথের পাঁচালী।

কোনো সরল সত্যে জীবনানন্দ দাশের আস্থা নেই। মানুষের সৌন্দর্য–বেদনাও সত্য, তার পারভারসিটিও সত্য। মাল্যবান যেমন বলে : “কী রকম মারাত্মক ভুল বিষের মত মিশে রয়েছে নিখিলের রক্তের ভেতর, তার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাপ্রবাহের মধ্যে। [পৃ. ৯৫] ফলত মানুষ হয়ে জন্মালে নানা রকম দুর্নিবার শাস্তি ভোগ করতে হয়, করতেই হয়।” জীবনানন্দ জীবনের বহুমাত্রিকতাকে দেখতে পান এবং উপন্যাসে সেটিই ধরার চেষ্টা করেন। কোনো আইডিয়লজিক্যাল বিশোধন, বিয়োজন বা সারাৎসারে পৌঁছানোর ইচ্ছা হয়তো মানুষের সহজাত, আমরা একটা ‘গ্রান্ড ন্যারেটিভ’ চাই, একটা প্লট চাই। কিন্তু তিনি ঐ প্রত্যাশা ও প্রলোভনকে প্রতিহত করেন, মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি আমাদেরকে উপন্যাসটি নতুন দিক থেকে পড়তে বাধ্য করেন। তার উপন্যাস ‘পলিফনিক’—বহুস্বর তার উপন্যাসের ‘টেক্সচারে’—তাঁর শতকণ্ঠ পাখিদের মতই—‘শত চেতনার হাঁকডাক, সালিশী, নির্জনতা।’

মাল্যবান একটি চিন্তাউদ্রেককারী উপন্যাসই নয়, গত ষাট বছরে বাংলা উপন্যাস–ধারায় একটি অনন্য সৃষ্টি এবং অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস।*

---

* পৃষ্ঠাঙ্কসমূহ বাংলাদেশে প্রকাশিত আহমদ মজহার সম্পাদিত ‘মাল্যবান’ সূচিত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
হাজার বছরের তারা

হাজার বছরের মৃত, শীতল, বিবর্ণ তারাদের চোখ
আরো একবার জ্বলে উঠলো, যেমন প্রাণের শিখা জ্বলে ওঠে
আষাঢ়ের মেঘ–ঢাকা রাতে স্তিমিত, নিষ্প্রভ নদীর বুকে।
আশ্চর্য ঝড়ের মতো কাল রাতে শতাব্দীর ঘুমন্ত পরীদের ডানায়
এসেছিলো প্রাণের আলোড়ন।

তারপর নিভে গেলো : উৎসবের শেষে সব ঝাড়বাতি
যেমন নিভে যায়, থেমে গেলো সব এস্রাজের টুংটাং
পেয়ালা–পিরিচের শব্দ ; তখন সমুদ্রের মতো প্রশান্তি
আকাশের মতো নির্জনতা।
বিশাল হলঘরটা এখন মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ।

বেগনি, নীল, গোলাবী পর্দাগুলোর রঙ বিবর্ণ অন্ধকারের কাছে পরাজিত :
দুরন্ত হাওয়ায় তারা উড়ছে : আমি তাকালাম....
এক রাশ নক্ষত্র প্রাণের প্রতিভা নিয়ে উড়ে এলো ধূ–ধূ নির্জন আকাশে।

হাজার বছরের মৃত, শীতল, বিবর্ণ তারাদের চোখে
প্রাণের বিদ্যুৎ খেলে গেলো....
(এই সব তারাদের কি শৈশব ছিলো না? দুরন্ত নদীর মতো
ফেনিল, উচ্ছল—এক শিলা থেকে আরেক শিলায়
লাফিয়ে পড়ার দিন?
ছিলো না যৌবন? যেখানে নারীর প্রেম
ঘাসের সবুজ, পাখির চোখ সব কিছু একাকার...।)
'অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো'
জাফরানী সকাল ছিলো, ছিলো ধুলোয় ধূসর রাঙা মাটির গোধূলি
পাহাড়তলীর মাদলের শব্দ–কাঁপা ঝাউবনের নৃত্য...

হাজার বছরের অভিজ্ঞ, প্রাচীন তারারা ভুলেছিলো সেই অভিজ্ঞান,
ভুলেছিলো : 'সব পাখি ঘরে ফেরে'
সব মাঠের সবুজ রাত্রি হয়, সব নারী প্রেয়সী হয়,
সব সূর্য বাঁশঝাড় পেরিয়ে, পেরিয়ে দিনের পরিচিত সীমানা
বিবুধ রাত্রির নীড়ে আশ্রয় খোঁজে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব ম্যমি উঠে আসে অসহ্য ক্লান্তিতে ক্ষোভে মৃত্যুর শীতল নির্মোক ছিঁড়ে,
তারা ভুলে ছিলো।

তবু তো দুরন্ত সামুদ্রিক বাতাসে ছিঁড়ে গেলো জানালার পর্দা,
নিভে গেলো ঝাড়বাতি...
বিশাল হলঘরটা কারুকার্যখচিত খিলানের দিকে চেয়ে রইলো
হাজার হাজার আদিম চোখ মেলে। আমি তাকালাম :
এক এক ক'রে হাজার বছরের মৃত তারারা জাগছে,
জাগছে কালপুরুষ, রোহিণী, পুলস্ত্য, পুলহ, অত্রি, জোহ্‌রা,
আমি দেখছি : প্রতিভার মতো উজ্জ্বল, প্রাণের মতো ব্যাপ্ত
জিজ্ঞাসা জ্বলে উঠছে সেই সব তারাদের চোখে।

হাজার বছরের ঘুম, হাজার বছরের মৃত্যু পার হয়ে
এই তারাদের চোখ এখন আলো ছড়াবে।।*

* ১৯৫৫ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ময়ূখ' থেকে গৃহীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতাউর রহমান

তবু প্রতিশ্রুতি

জন্ম থেকে চোখে আমাদের
বিস্ময়ের ঘোর
মহাপৃথিবীর এই আবর্তন নিদ্রা জাগরণ
সকল জেনেও মনে কুয়াশা জমাট
তারার তিমির মাঝে
হাটে ঘাটে বিবিক্ত প্রহর।

মায়া হরিণীর পিছে আজীবন ছুটোছুটি
ব্যর্থতার অনুতাপ জ্বালা
হঠাৎ হচ্ছে মনে চতুর্দিকে অন্ধকার
শোক–ছায়া জাল
রূপসী বাংলার কোলে
রক্ত ঝরা সন্তান সন্ততি
চারদিকে অভিনয় ভান ইন্দ্রজাল।

বুদ্ধের শুভ বার্তা নিয়ে
দ্বার থেকে ফিরে যায় দূত
কানে বাজে অবিরাম
কালবেলার আগমনী সুর—
তবু আশা তবু আলো তবু প্রতিশ্রুতি
অন্ধকার অজগর একদিন পরাজিত হবে
অতঃপর পৃথিবীতে উদার অবাধ অরুণোদয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুর রাহমান

আকাশ প্রদীপ রূপে প্রতিভাত হয়

নক্ষত্র, সবুজ ঘাস, টল টলে এক গোধূলির
রঙে গড়া একজন বড় একা নিশ্চুপ যাচ্ছেন হেঁটে, চোখ
তাঁর ভাসমান মেঘে, কালো যমজ পাম্পসু, জোড়া
ধুলোয় সফেদ প্রায়। হাঁটছেন, তিনি হাঁটছেন
ফুটপাতে বলা যেতে পারে হাজার বছর ধ'রে। নালন্দার
গভীর জ্ঞানের আভা বিচ্ছুরিত তাঁর মুখমণ্ডলে সর্বদা।

অক্লান্ত পথিক তিনি প্রান্তরে, উদ্যানে, কখনওবা
সরাইখানার কাছ ঘেঁষে প্রজাপতিময় কোনও সর্ষে ক্ষেত
বামে রেখে হেঁটে যান, দিঘির কাজল
ঠাণ্ডা জল সুস্থির আজলা ভ'রে করেন আগ্রহে পান আর
কখনও গাছের শান্ত ছায়ায় বসেন, নানা পাখি
কাছে আসে নিকট আত্মীয় ভেবে তাঁকে।

দূর অজন্তার গুহাচিত্রের যুগল নরনারী উদাসীন
সেই পথিকের পদতলে রাখে অগণিত ঘিয়ের প্রদীপ
অন্ধকারে, কলকাতার কলরোল মেশে
ধানসিড়ি নদীর কল্লোলে, ট্রামলাইন বিমুগ্ধ যাত্রা করে
আকাশে বিলীন হয়, ভাবমগ্ন যাত্রীর ধূসর পাণ্ডুলিপি
অধিক উজ্জ্বলতায় আকাশ প্রদীপ রূপে প্রতিভাত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মযহারুল ইসলাম
নন্দিত আমি

বহুদূর থেকে স্নিগ্ধ সমীরণ প্রাতিদিন বীর পদক্ষেপে
হেঁটে আসে সান্নিধ্যে আমার, সর্ব অবয়বে
বুলায় হাত আদরের। নিবিড় ছায়ার দু'বাহু ছড়িয়ে
আলিঙ্গন করে যুবতী মেঘেরা। নন্দিত আমি।
চাঁদ তার আলোর ঝরণায় আমাকে সিঞ্চিত করে
আপন জনের মত। প্রভাত সূর্যের অমেয় নিঃশ্বাস
আমার চোখে চুম্বনের মত হয়ে নামে।
আমি নন্দিত।

এই বাংলায় ধানসিড়ি পথ
নেমে যায় নদীর গহবরে তৃষ্ণার্ত
জিহ্বার মত। স্রোতের আবর্তগুলো রাখে হাত
তটের উন্মুক্ত স্তনে। তরঙ্গের সাথে ফিসফাস
কথা বলে গাং শালিকের দল। হিজল গাছের ছায়া
ডুব দেয় মধ্যাহ্নের জলে। নদী তার
চোখ খুলে রেখে দ্রুত পায়ে চলে পথ
আপন বৈভবে। ধরে রাখে তৃষ্ণার আগুন
বুকের ভেতরে। কূলে কূলে নন্দিত ফসল।

আমাকেও দু'দণ্ড শান্তির কোলে
ধরে রাখে এদেশের শ্যামল রমণী। চুলের সুরভি তার
পাখা মেলে বুকের আকাশে। শীতের গোলাপ
ঝরে তার তনু থেকে। আমি স্নাত হই।
যেন সতত নন্দিত আমি।

আমি তো নিঃস্ব নই কখনো এদেশে।
নিকানো উঠোন আছে। সবুজের নৃত্য আছে।
কোকিলের সুধাস্নাত কণ্ঠ আছে। আছে শ্রাবণের ধারা,
নক্ষত্রের হাসি। নয়নে আঁধার মেখে মমতায় ভরা
গোধুলির লগ্ন আছে। তৃষ্ণাতুর অধরের
স্পর্শ আছে। আছে বৈদগ্ধ্যের আলিঙ্গন
ঐতিহ্যের সিঁড়িতে সিঁড়িতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি বে দি ত প ঙ্‌ ক্তি মা লা

স্বপ্নের গালে গাল রেখে রাত্রি কাটে,
দোয়েল পাখির শিসে চুমু দিয়ে ঘুম ভাঙে রোজ।
পৌষের গর্ভ থেকে বেরিয়েই সরিষা ফুলের ঘ্রাণ
জানায় মিনতি, "কাছে এসো"। গতর খাটানো ঘাম
মুছে ফেলে রাতের শিশিরে বাবুইয়ের দল
কোলাহল জমা রাখে নৈঃশব্দের নীড়ে
এরা সব আমাকে শুধুই টানে হাত ধরে
কবিতার কাছে। বড়ই নন্দিত আমি।

নিশীথে পাখার ইচ্ছে কাঁধে রাখে
ভুতুম পেচক, রাতের বুকের পেশী
খণ্ড খণ্ড করে সব জোনাকির চোখ, দুপুরের চিল
ধূসর রোদের শ্বাস জড়ায় দু'পায়ে। আমি কেবলি
আমার বোধের কোটরে দিন রাত্রির লীলা
ধরে রাখি। মননের পাথর বাটিতে দুধ জমে
কামধেনু থেকে। চারিদিকে ঘুঙুর বাজিয়ে চলে
ঐশ্বর্যের লাস্যময়তা।

যাকনা যে যার মত। চলে যাক।
এই যে নন্দিত আমি, এই আমি
নিজেকেই ধরে রাখি নিজের ভেতরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলওয়ার
তোমাকে

প্রায়ই তোমার কথা স্মরণ হয়
যেহেতু বহুদূরে প্রবাহিত
তুমি এক স্বর্গগঙ্গা
যেহেতু তোমার স্মৃতি
মূর্ত করে একটি তৃণাঞ্চল
যা কিনা আমার চারদিকে ছড়িয়ে থাকে।

দূরদূরান্তের আকাশসমূহ
আমার দীর্ঘশ্বাসগুলোয়
বিদ্যুৎসঞ্চালিত করে
এবং উন্মুক্ত করে
ভালোবাসা থেকে উৎসারিত
গোপন নয়ন।

আমি সেই অদৃশ্য চোখে
নিরীক্ষণ করি তোমার সূক্ষ্ম ঊর্মিমালা
ব্যাকুল আমার অন্তর
একটি মানবীয় ল্যাগুন পেরিয়ে যাবার আশায়।

কখন তুমি আসছো?
যতো শীঘ্র ততোই উত্তম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফজল-এ-খোদা
জীবনানন্দ

জীবনানন্দ। কেউ কেউ মানে সকলেই নয়
দীর্ঘশ্বাস নিয়েই অধিকাংশের বাস
খরতাপে জ্বলে দিন রাত্রির বাতাস
মাঠেলের জলে শরীর ডোবাতে হয় ;

জীবনানন্দ ! জোছনায় কালিমা মোচন
অন্ধেরা আঁধারে থেকেও পদ্মলোচন
পরিহাসে বাড়ে শুধু ব্যর্থ পরিতাপ
সময়ের গানগুলি স্বার্থের বিলাপ ;

জীবনানন্দ ! কথার কথাই থেকে যায়
নির্ভর দৈবের কোনো ভবিষ্যৎ নেই
লাশের মিছিলে নাচে খুনি ধেই ধেই
শাপলারা ফোটে দেখি অরুণ বিভায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুল ইসলাম
জীবনানন্দ

যান তবে, একটু ঘুরে আসুন ধানসিড়ি তীরে
শ্যামল জারুল হিজল কাঁঠালের ছায়া বিছানো
পথে দু'একটি শালিক চড়ুই আর মাছরাঙা
সঙ্গে মিশে আমি ততক্ষণ নিসর্গ দর্শন করি।

কই হে রূপসী বাংলার কবি, সেই যে গেলেন
ফিরে আসছেন না দেখছি বড়ো ! কখন গেছেন
নিদারুণ অভিমানে ট্রামের শহরে নীরবেই।
না, এটা আপনি ভালতো করেননি কবি মশাই,
শহরে নিসর্গ নেই, আপনার প্রাণ নিয়ে আমি
বড্ড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, যেমন ভুলোমন আপনার,
রাস্তায় এক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারে, ঘটেও গেছে
নিশ্চয়ই। নইলে তো আপনার মতন মানুষ
ওখানে থাকার নয়, এতদিনে ফিরে আসতেন।

ওই দূর আকাশের শঙ্খচিল সোনালি ডানার
কেমন করুণ ডেকে যাচ্ছে ঠিক আপনার স্বরে
কি আশ্চর্য ! এই যে পুকুরে হাঁস সাঁতরায়, মাছ
চাল ধোয়া জলে এসে খুঁদ খায় সুখে টুপটাপ
তাহাদের শব্দে শুনি আপনার কোমল কণ্ঠের
সন্ধার গন্ধমাখা কবিতার পঙ্ক্তিমালা আর
বটের শাখায় দূরে দধিয়াল ফিঙেরা নাচায়
আপনার চুলের মতন লেজ, অন্ধকারে উঠে
যায় লক্ষ্মীপেঁচা, মনে হয় আপনিই এসেছেন
কাঁঠাল, আম্র পত্রগুচ্ছের অন্ধকারে ছদ্মবেশে
অবোধ শিশুমুখের ঘ্রাণভরা আপনার মুখ।
সকালে শিশির ঝরা পরিচ্ছন্ন ডগমগ ঘাসে
আপনার ছায়া ভাসে, অদূরের তমাল ছায়ায়
বাতাস আনন্দ তোলে, দোলে বুঝি আপনার হাত
কী যে মমতায় আহ্ মশাই জীবনানান্দ দাশ !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি বে দি ত প ঙ্ ক্তি মা লা

আল মুজাহিদী
জীবনানন্দ জীবনানন্দ দাশ

'জীবনানন্দ
আপনি অন্ধকার ভালোবাসতেন, শব্দহীন—
জোনাকির মতো, নিঃশব্দ-নির্জন?'
জীবনানন্দ প্রাগতিক অন্ধকার থেকে বললেন,
'তামসীকে জিজ্ঞেস করো তুমি।'

সমস্ত নৈঃশব্দ্য ভেঙে, আমি ছুটে গেলাম তামসীর কাছে—
'জীবনানন্দকে চেনো তুমি?'
তামসী রাত্রির গভীর বিবর থেকে উঠে এসে বললো আমাকে,
'—জীবনানন্দকে জিজ্ঞেস করো বরং।'

আমি দেখলাম—
মহাকালস্রোতের ওপর একাকী ভ্রাম্যমান একটি নেবুলা ও জীবনানন্দ দাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদ্র গুপ্ত
আগুন জ্বলছে অরণ্যে

অরণ্যে আগুন জ্বলছে
কেউ নেই অগ্নিমুখী
পলায়নপর অন্ধকার পিঠ উঁচু করে মাথা বাঁচায়
বিশ্বায়নের অগ্নি কবি তোমাকেও ছোঁয়

থিকথিকে কাদার ওপরে পানি
ধান ও তৃণ দোলে মৃগেলের ঠোঁটে
মাটিতে চুমু খেলে কক্করে ধ্বনি ওঠে
উঠছে আকাশের দিকে আকাশের রেখা

ক্যাবল ও ক্যাবলবিহীন সুপার হাইওয়ে
দুঃস্বপ্নের নিদ্রা ভেঙে উদয়চিহ্নের উল্টোদিকে
পৃথিবীকে হাঁটতে শেখাচ্ছে
চুকা ঢেকুর ওঠে কোন কিছু খেলেই
উদ্গার উদ্গার
বিপুলা বুকের ভিতরে
খুব ছোট কলিজা থেকে হরিণ–পোড়া গন্ধ উঠছে
প্রত্যেক আগামীকাল কয়লা হচ্ছে
অদ্যের তাপে
আগুন জ্বলছে অরণ্যে
ধোঁয়া উঠছে স্বপ্নের অভ্যন্তর থেকে
দলিত মথিত গলিত পৃথিবী আবার
জেগে উঠছে
একজন কবির অবিরাম অবসর নিয়ে
ধীরে ধীরে বসিবার আস্তে উঠিবার
নির্ভরতা রয়েছে আগুনে
আগুন জ্বলছে অরণ্যে পৃথিবীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ নূরুল হুদা

কুসুমকুমারী দাশের দেবদারু সন্তান

জলকে ঢেউ বানায় বাতাস
তুমি সেই বাতাসকে গ্রহণ করলে হৃৎপিণ্ডে
শীত ও হেমন্তের বাতাসে ঘূর্ণিঝড় থাকে না
তুমি হেমন্তের আকাশকেই বানালে বৈশাখী আসমান
তবে অগ্নিকণাগুলো হীরের দ্যুতি ছড়ালো
সাপগুলো হয়ে উঠলো জলফণা
গভীর অন্ধকারে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে
জেগে উঠলো দরিয়ানগর

তুমি না-বাউল না-বিদ্রোহী, তোমার আকাশে
বিদিশার বনলতা সেনের চুলে সাতটি তারার তিমির,
তোমার দিকে লাবণ্য দাশ তাকিয়ে রইলো আড়চোখে,
অধ্যাপকের চোখের কোণায় জমলো পিঁচুটি
তুমি সেই পিঁচুটির আড়ালে দোহন করলে ধবল দুগ্ধ
ধানসিড়ি সেই ধবল দুগ্ধের নদী

এ বাংলার বটপাকুড় আর হিজলতমালের শিরায় শিরায়
তোমার পরাবাস্তব জলসিড়ি বয়ে যায় নিরবধি
তার জলস্রোত কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে নেমে এসে
প্লাবিত করলো কল্লোলিনী কলকাতার ট্রামের রাস্তা

লোহিত সাঁতারে গঙ্গাতীরে তুমি তাই অগ্নিসুন্দর
তোমার মউজ বুকে পুরো বাংলাদেশ আজ বঙ্গোপসাগর
কুসুমকুমারী দাশের গর্ভজাত হে দেবদারু সন্তান
তুমি ততোটা বাক্যবাগীশ নও, যতোটা কবিতার ভাগ্যবাগীশ
তোমার কলমে ভর করেছে আফ্রোদিতি আর স্বরস্বতীর যুগল ঈশ

সন্ধ্যা হয়, চারিদিকে আলো হয় ফিকে
তোমার শ্যামল তনু দাঁড় বায় শতজন্ম পেরিয়ে অনন্তের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসীম সাহা
জীবনানন্দ : তাঁর চোখ

যেদিন ঝর্নার মতো স্বচ্ছ আর তৃষ্ণাকাতর দু'টি চোখ
নীলনদের অনাঘ্রাত কুমারীর দেহের আড়ালে লুকিয়ে থাকা
কালো ভ্রমরকে উড়িয়ে এনে সাজিয়ে দিলো
নাটোরের স্বপ্নময় রূপসীর মায়াবী শরীরে—
সেদিনই নীলনদের নীল জল আশ্চর্য ঢেউ তুলে
মিশে গেলো পদ্মার জলে।

কেন মিশে গেলো?

এইখানে ছিলো না কি মিহিন সুতোয় গাঁথা প্রিয় মসলিন?
ছিলো না কি মহুয়া–মদির ঘুমে ডুবে থাকা
কামরাঙা মনিয়ার পায়ের ঘুঙুর?
ছিলো না কি বেহুলার কলার ভেলার 'পরে
ভেসে থাকা মৃত লক্ষ্মীন্দর?
ছিলো না কি দিগন্তের ডালে ডালে রক্তিম আগুন?
তবু কেন আর্ত চোখের জলে সবকিছু ফেলে রেখে
সবুজ করুণ চোখ ছুটে গেলো দূর নদীতীরে?

অতল জলের মতো সেই চোখ
রূপসীর দেহের আগুনে ডুবে আর্তনাদ করে;
ভয়ার্ত হরিণের শীতল চাহনি নিয়ে
আকন্দ, ঘাসফুলে ছেয়ে যায় অচেনা বাগান।
গহন মায়াবী চোখ পৃথিবীর পথে পথে
অন্তহীন জ্যোৎস্নায় অবিরল স্নান সেরে
নিভৃতে বসে থাকে কোজাগরি পূর্ণিমার রাতে।

আশ্চর্য ধূসর চোখ পাহাড়ের অন্তরালে একা একা অশ্রুপাত করে;
গাংচিল, ফড়িংয়ের চিত্রিত পাখার ভেতরে ঢুকে
চরাচরে অবিরাম জ্যোৎস্না ঝরায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি বে দি ত প ঙ্ ক্তি মা লা

এমন শীতল চোখ নিবিড় সবুজে ঘেরা বাংলাদেশের মতো
অকস্মাৎ স্নিগ্ধ এক নদী হয়ে যায় ... ।
ধানসিড়ি ছুটে যায় গঙ্গা ও ভগীরথী পার হয়ে
আরো দূর নক্ষত্রের দেশে।

তাঁর চোখ বিকেলের অস্তমিত আলোর শিখার মতো
মুহূর্তেই পৃথিবীর মানচিত্রে চিরস্থায়ী স্বর্গ গড়ে তোলে।

নির্দয় নগরীর ট্রামলাইন
তবু কেন মধ্যরাতে বারবার অভিমানী নাম ধরে ডাকে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোন্দকার আশরাফ হোসেন
জীবনানন্দের চিল

ইচ্ছে করলেই এখন উড়তে পারি
বসতে পারি ইলেকট্রিকের তারে
দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেতের মাঝে মাঝে
শ্যালো মেশিনের ঘর
সবুজ গদ্যের মধ্যে বিরামচিহ্নের মতো
জেগে আছে খোড়ো বাস্তুকলা
তার মধ্যে সারারাত ধ'রে
ঘাই হরিণীর ডাক নয়
ইয়ামাহা ইঞ্জিনের ধুকপুক
জলের অন্তর্দাহ
আর দ্যাখো অন্তহীন ব্লাডলেট
মাটির গভীর থেকে তুলে আনা জননীর প্রসবযন্ত্রণা
আর ইরিধান আর
মবিল সৌরভ।

সেই কবে ধরিত্রীর পার থেকে
উড়ে গেছি শঙ্খচিল, আজ এই ভিজে
মেঘের দুপুরে
ভাবলাম দেখে নিই আছে কি না বেতের ফলের ঝোপ,
দেখলাম নেই, শুধু
আদিগন্ত ধানের বিশাল আয়োজন,
মানুষেরা পাকস্থলী হাতে
আশ্বিনের আলে ব'সে অন্ত্রগুলো ধুয়ে নিচ্ছে জলে ;
মেশিন ঘরের মধ্যে টোঙ
টোঙের মধ্যে শুয়ে সুচেতনা
হরিৎ স্বপ্নের মধ্যে পাশ ফেরে, বাইরে দুপুর
হাঁকে চাই, আরো জল, আরো পানি
হা—ফাটা মুখের মধ্যে
ঠেসে দাও শেষপারানির জল
না—হলে মেটে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি বে দি ত প ঙ্‌ ক্তি মা লা

আমি সেই জীবনানন্দের চিল, ফিরলাম
পাঁচ দশকের পরে, এই বাংলায়
এই মাঠে ঢেউয়ে, এই ইউরিয়া পটাশের গন্ধমাখা
ধানসিড়িটির তীরে, এই দিগন্তবিস্তার ক্ষুধা
আর ঝোলানো বিদ্যুৎ তার
আর ইয়ামাহা ইঞ্জিনশব্দ
ঠোঁটে নিয়ে জলকষ্ট, হায় চিল
ফিরলাম বাংলার গাঁয়ে-গঞ্জে, তারস্বর
ভিডিও গানের মধ্যে, হায় হুক্কু
ত্রিতাল বোম্বেটে সুর নীল ছবি আর এই
বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
হরিণীরা ফিরিতেছে, বস্ত্রবালিকারা
যেন মৃণালিনী ঘোষালের শব
এইমাত্র উগরে দিয়ে গ্যালো
অদূর শহর থেকে প্যাসেঞ্জার বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী রোজী
একজন সবটা জুড়ে বর্ষা শীত কিংবা

মানুষের সমগ্র দিন তেমন এক আয়তক্ষেত্র
রাত আর দিনের ভাগ বেশী যেখানে
সকাল বিকেল বড় কম।

তেমনি মানুষের চার বেলা
শৈশব কৈশোর যৌবন আর বার্ধক্য
একটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অন্যটায় যাওয়া।

দুই কাল গিয়ে তুমি তিনকালে ঠেকেছিলে
যৌবনের তারুণ্য–দীঘির দামাল
ব্যস্ত ছিলে পাখির নীড়ের সমাচারে।

তোমার অবিচল ভাবনার রথ চলন্ত ট্রামে ধাক্কা খেল
ছিটকে পড়লো তোমার গল্প–কবিতার ঝুড়ি
সব জড়ো হয়ে তোমার সৃষ্টি–সমগ্র তোমাকে ছাড়িয়ে গেল।

ক'জন এভাবে নিজেকে অতিক্রম করতে পারে
না থেকেও থেকে যেতে পারে সারাক্ষণ
জন্ম–জন্মান্তর ধরে সারাদিন সারাবেলা।

একজন মানুষের চোখের দেখা
পুরু চশমার কাঁচের দেয়াল ভেঙে যে রকম স্বচ্ছ হয়
যতটা নিবিঢ়তা পায় দু'চোখ মেলে

তোমার দেখা, মৃত্যুর কালো ভারী পর্দাকে
ততটাই শতচ্ছিন্ন করে দিয়ে
জন্ম দেয় আলোকিত স্বর্গ–নিলয়।

তোমার সমগ্র জীবন এক রূপসী বাংলার কারুকাজ
এখন সবটা জুড়ে বর্ষা শীত দেবদারু জারুলের প্রকৃতি কিম্বা
মাইল মাইল পথ হেটে চলবার মত সন্ধ্যা–সকাল।

মানুষের সমগ্র দিন দিনের চারবেলা
দুঃখের পল অনুপল সেখানে বেশি
যে জীবনে ছিলে যে জীবনে আছ সুখ কতদূর—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খায়রুল আলম সবুজ
জীবন আনন্দ

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
উচ্চারিত শব্দগুলোর হয়েছে বয়স
পঞ্চাশ ষাট কি তারও বেশি—
তার সাথে পৃথিবীরও গেছে দিন আরো কিছু—

রোগের আরোগ্য এখন হাতের মুঠোয় যেন
চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল–সে তো ফি বছর
ধরে রাখে মানুষের অস্থি মাংস
সময়ের হিসাবে আরো আরো দিন
পরীক্ষা–নিরীক্ষা চলে দিনরাত অবিরাম
দিতে হবে পৃথিবীরে সজীব সকাল
কারুকাজ চিহ্নমাখা অন্তরঙ্গ গোধূলির ছবি।

তাই, ধরে রাখে অস্থিমাংসে মানুষেরে–ধরে রাখে,
তবু সেই 'অদ্ভুত আঁধার এক' ছড়ায় শিকড় তার
নিরিবিলি পৃথিবীর বুকের ভেতর
কষ্ট রোগের মতো ভয়ঙ্কর বিস্তার তার–ভয়ঙ্কর

মানব জমিনে পোঁতা হয় নাই বৃক্ষের বীজ
পাতা নাই গহীন সবুজ, ফুলে ফলে ভরে নাই
শাখা উপশাখা আকাল লেগেছে এক নিদারুণ—
'গভীরতর অসুখ' এখন গভীরতম হয়ে থিতু হয় যেন
চলমান নদীর শরীরে শীতের নীলাভ কুয়াশার মতো—
এটুকুই নিবেদন তোমাকে এখন এতোদিন পর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসির আহমেদ
ছায়াসঙ্গী

ছায়াসঙ্গী হয়ে আছো শব্দে–কল্পনায় তুমি ছায়াময় বৃক্ষ ;
হরিৎপাতার গন্ধ নাকে লাগে রোদ্দুরের ঝাঁঝলাগা
বৃক্ষশূন্যতায়। ঘুরে ঘুরে আজো আসো জলের ঘূর্ণির মতো
জলহীন চৈতন্যের নদী সীমানায়। কে যে 'ঘুরে ঘুরে
একা কথা কয়' স্নায়ুকোষ জুড়ে ! অনিদ্রার
দুঃসহ ক্লান্তির মধ্যে মধ্যরাতেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।
যেন কাল–মহাকাল পেরিয়ে চলেছে স্মৃতি
বহতা নদীর মতো আমার সময়। বাউল তো নই
আছি সংসারের নিত্যকর্মে ; স্ত্রী–পুত্র–কন্যা পাশে
কী তৃপ্তির ঘুমের গভীরে মগ্নতায়, উদ্বাস্তু নদীর মতো
ভেসে যায় সমস্ত সংসার ! তবু আমার ভিতরে কী যে
অতৃপ্তির বোধ মাথার ভিতরে খুঁড়ে চলে দুঃখমাটি,
বিষণ্ণ বিকেল মরা রোদ নিয়ে জেগে থাকে আমার শয্যায়।

গড়িয়াহাটের মোড়ে জনস্রোতে ট্রাম যায় ;
ট্রামের ঘর্ঘর ধ্বনি ঘুমের ভিতর বেজে চলে
ট্রামের চাকার রক্ত দেখে আধোঘুমে
গোঁ গোঁ করে ওঠে আজো আধুনিক বাংলা কবিতা।

শোকার্ত কবিতা কালো ব্যাজ বুকে নিয়ে
নিঃশব্দেই হেঁটে যায় ট্রাম লাইন ধরে ;
নিঃসঙ্গ চৈতন্য ভেসে যায় রক্তস্রোতে
ট্রামের ঘর্ঘর শব্দে পিষ্ট হতে থাকে
তোমার লাবণ্য কবি ; তোমার নিসর্গ !
আমি সেই শোকগ্রস্ত ছায়াসঙ্গী অতৃপ্তির
কালো বিড়ালের নখে ছিন্নভিন্ন সারাক্ষণ ;
তুমি বৃক্ষ নির্বিকার বাতাসে মুখর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইকবাল আজিজ

জীবন ও আনন্দের ছায়া

জীবন ও আনন্দের ছায়া দেখি না অনেক দিন
কেবলই শুধে যাই মৃত্যু আর বেদনার ঋণ।
জীবন ও আনন্দের ছায়া খুঁজে পথ হাঁটি

বিদর্ভ নগর থেকে ক্লান্ত সন্ধেবেলায় হেঁটে যাই
মেরুজিন নদীতীরে—
তারপর নিওলিথ সঙ্গীতের সুর শুনি
একটানা রিমঝিম বৃষ্টি...
চোখ মেলে চেয়ে দেখি শুয়ে আছি
ধানসিড়ি নদীতীরে।
বয়ে যায় নদী বয়ে যায় জীবনের আলো
চেয়ে দেখি অতি বৃহৎ জীবনানন্দ পাশে
অতি ক্ষুদ্র বিষণ্ন কবিরা
হাজার বছর ধরে পথ হাঁটে

জীবন ও আনন্দের ছায়া খুঁজে পৃথিবী প্রবীণ হয়
জীবনান্দর ছায়া খুঁজে আমারও জীবনে সন্ধ্যা নামে
শুয়ে থাকি ধানসিঁড়ি নদীতীরে রাতের গভীর যামে

জীবন ও আনন্দের ছায়া দেখি অনেক দিন
কেবলই শুধে যাই মৃত্যু আর বেদনার ঋণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুৎফর রহমান রিটন
জীবনানন্দ

ডুমরের ফুল
লাউয়ের জাংলা
বনলতা সেন
রূপসী বাংলা
ফড়িঙের ডানা
দোয়েলের শিস
ঝরা পাতাদের
কথা ফিসফিস
পাখির পালকে
বিষাদ-ছন্দ
রৌদ্রের রঙ
পাতার গন্ধ
জীবনানন্দ
জীবনানন্দ....।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;

শিল্পী : মোহাম্মদ কিবরিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের ছন্দ ও রূপকল্প

আবদুল মান্নান সৈয়দ

প্রথম পর্ব : ছন্দ

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতাগুচ্ছে প্রধান তিনটি বাংলা ছন্দই ব্যবহার করেছেন। গদ্যছন্দও প্রয়োগ করেছেন কোনো-কোনো কবিতায়। মিলে, স্তবকগঠনে ও কাব্য-আঙ্গিকের কোনো-কোনো কুশলতায় তাঁর একটি বিশিষ্ট ঝোঁক ছিলো। তাঁর কোনো-কোনো গদ্যরচনাতেও ছন্দ-চিন্তার পরিচয় মুদ্রিত আছে। বর্তমান রচনাপরিসরে আমরা জীবনানন্দের এই ছন্দকুশলতার একটি যথাসাধ্য মানচিত্র এঁকে নিতে চাই। আমরা এই বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি কবির নয়টি কবিতাগ্রন্থ এবং তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার তিনটি সংগ্রহ।[১]

২

'... পয়ার ছন্দ যে বাংলা কবিতার প্রাণ ও আত্মা (আজ পর্যন্ত), অন্য কোনো ছন্দ যে পয়ারের এই শীর্ষদেশী মাহাত্ম্য ও গহনতার স্থান নিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ প্রধান কবিদের রচনায় তা স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে রয়েছে ... আধুনিক বাংলা কবিতায় পয়ার প্রায় সর্বব্যাপী। আমার তো মনে হয় আজকের শ্রেষ্ঠতর বাঙালী কবিরা পয়ারকে স্বচ্ছন্দে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে যত বেশি গ্রহণ করেছেন, এমন আর কোনো ছন্দকে নয়।' ('কবিতার আত্মা ও শরীর', 'কবিতার কথা') আবহমান বাংলা কবিতায় অক্ষরবৃত্তের এই প্রায়-সর্বব্যাপী রাজত্ব যেমন সত্যি, তেম্নি সত্যি জীবনানন্দের রচনাতেও। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের কিছু-কিছু চর্চা ক'রে থাকলেও কবির প্রধান ছন্দমাধ্যম র'য়ে গেছে অক্ষরবৃত্তই। এমনকি জীবনানন্দ অক্ষরবৃত্তের টানা ও এলানো, অলস ও বিস্তারিত এমন-একটি ভঙ্গি তৈরি করে নিয়েছিলেন, যা তাঁর কবিতার অমোঘ চারিত্রে পরিণত হয়েছে, এমনকি কবির উত্তরকালিক মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের কবিতাও সে গ্রাস করতে চেয়েছে তার নিজের শরীরাত্মায়।

---

১. 'ঝরা পালক' (১৯২৭) ; 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) ; 'বনলতা সেন' (১৯৫২) ; 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) ; 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১) ; 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৩) ; 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (চতুর্থ সিগনেট সংস্করণ, ১৩৭৭) ; 'সুদর্শনা' (গোপালচন্দ্র রায়-সম্পাদিত, ১৯৭৩) ; 'মহাপৃথিবী' (দ্বিতীয় সিগনেট সংস্করণ, ১৩৮০) ; 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা' (আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পা., ১৯৭৪) ; 'মনবিহঙ্গম' (১৩৮৬)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি সারাজীবন সর্বাধিক কবিতা লিখেছেন এই অক্ষরবৃত্তেই। "ঝরা পালক"–এ পনেরোটি ('নীলিমা', 'কিশোরের প্রতি', 'নাবিক', 'এক দিন খুঁজেছিনু যারে', 'আলেয়া', 'অস্তচাঁদে–র প্রথমাংশ, 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল', 'কবি', 'সিন্ধু', 'দেশবন্ধু', 'ডাহুকী', 'শ্মশান', 'পিরামিড', 'সেদিন এ ধরণীর', 'ওগো দরদিয়া') ; "ধূসর পাণ্ডুলিপি"–তে ষোলোটি ('নির্জন স্বাক্ষর', 'মাঠের গল্প', 'সহজ', 'কয়েকটি লাইন', 'অনেক আকাশ', 'পরস্পর', 'বোধ', 'অবসরের গান', 'জীবন', '১৩৩৩', 'প্রেম', 'পিপাসার গান', 'পাখিরা', 'শকুন', 'মৃত্যুর আগে', 'স্বপ্নের হাতে') ; "বনলতা সেন"–এ একুশটি ('বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'হায় চিল', 'বুনো হাঁস', 'শঙ্খমালা', 'হরিণেরা', 'সুদর্শনা', 'শ্যামলী', 'দুজন', 'অবশেষে', 'স্বপ্নের ধ্বনিরা', 'তুমি', 'ধান কাটা হ'য়ে গেছে', 'শিরীষের ডালপালা', 'হাজার বছর শুধু খেলা করে', 'সুরঞ্জনা', 'মিতভাষণ', 'সবিতা', 'সুচেতনা', 'অঘ্রাণ প্রান্তরে', 'পথ হাঁটা') ; "সাতটি তারার তিমির"–এর চল্লিশটি ('আকাশলীনা', 'ঘোড়া', 'সমারূঢ়', 'নিরঙ্কুশ', 'রিস্টওয়াচ', 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য', 'সেইসব শেয়ালেরা', 'সপ্তক', 'একটি কবিতা', 'অভিভাবিকা', 'কবিতা', 'মনোসরণি', 'নাবিক', 'রাত্রি', 'লঘু মুহূর্ত', 'হাঁস', 'উন্মেষ', 'চক্ষুস্থির', 'খেতে প্রান্তরে', 'বিভিন্ন কোরাস', 'স্বভাব', 'প্রতীতি', 'ভাষিত', 'সৃষ্টির তীরে', 'জুহু', 'সোনালি সিংহের গল্প', 'অনুসূর্যের গান', 'তিমিরহননের গান', 'বিস্ময়', 'সৌরকরোজ্জ্বল', 'সূর্যতামসী', 'রাত্রির কোরাস', 'নাবিকী', 'সময়ের কাছে', 'লোকসামান্য', 'জনান্তিকে', 'মকর–সংক্রান্তির রাতে', 'উত্তরপ্রবেশ', 'দীপ্তি', 'সূর্যপ্রতিম) ; "বেলা অবেলা কালবেলা" গ্রন্থর্ভূত ছাব্বিশটি ('মাঘ সংক্রান্তির রাতে', 'অনেক নদীর জল', 'সূর্য নক্ষত্র নারী', 'মহিলা', 'সামান্য মানুষ', 'প্রিয়দের প্রাণে, 'তার স্থির প্রেমিকের নিকট', 'অবরোধ', 'পৃথিবীর রৌদ্রে', 'সূর্য রাত্রি নক্ষত্র', 'জয়জয়ন্তীর সূর্য', 'হেমন্ত রাতে', 'উত্তর–সামরিকী', 'বিস্ময়', 'ইতিহাসযান', 'মৃত্যু স্বপ্ন সঙ্কল্প', 'পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে', 'অন্ধকার থেকে', 'একটি কবিতা', 'সারাৎসার', 'যতদিন পৃথিবীতে', 'মহাত্মা গান্ধী', 'দেশ কাল সন্ততি', 'মহাগোধূলি', 'মানুষ যা চেয়েছিল', 'হে হৃদয়') ; "জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা" গ্রন্থভুক্ত চব্বিশটি ('আবহমান' 'ভিখিরী', 'তোমাকে', 'একটি নক্ষত্র আসে', 'জর্নাল : ১৩৪৬', 'পৃথিবীলোক', 'মনোকণিকা' 'কবিতাগুচ্ছ', 'সুবিনয় মুস্তফী', 'অনুপম ত্রিবেদী', 'তবু', 'পৃথিবীতে', 'এইসব দিনরাত্রি', 'এইখানে সূর্যের', '১৯৪৬–৪৭', 'মানুষের মৃত্যু হলে', 'যাত্রী', 'স্থান থেকে', 'সে', 'রাত্রিদিন', 'আছে', 'দিনরাত', 'পৃথিবীতে এই', 'অদ্ভুত আঁধার এক', 'দুদিকে') ; "জীবনানন্দ দাশের কবিতা" গ্রন্থে চল্লিশটি ('নিবেদন', 'ভারতবর্ষ', 'রামদাস', 'জীবনসংগীত', 'রবীন্দ্রনাথ', 'এই শতাব্দী–সন্ধিতে মৃত্যু', 'নবপ্রস্থান', 'কার্তিক–অঘ্রাণ ১৯৪৬', 'যাত্রী', 'মহাজিজ্ঞাসা', ১৪–সংখ্যক কবিতা, ১৫–সংখ্যক কবিতা, 'জীবনের মানে ভালো', 'জোনাকি', 'তুমি আলো', 'ইতিবৃত্ত', 'সবারই হাতের কাজ', 'রজনীগন্ধা', 'নির্জন হাঁসের ছবি', 'দুর্দিন', 'হেমন্তের নদীর পারে', 'মৃত বর্তমানে উপেক্ষিত কবিদের উপর অনেক সমালোচনা পড়ে', 'শিল্পী', 'আমাদের বুদ্ধি আজ', ৪৩–সংখ্যক কবিতা, 'ডালপালা নড়ে বারবার', 'দানবীয়', 'কনভেনশন', ৪৭–সংখ্যক কবিতা, 'অনির্বাণ', 'ছড়া', 'ভোর ও ছয়টি বমার : ১৯৪২', 'সমুদ্রচিল', 'রবীন্দ্রনাথ', 'প্যারাডিম', 'হেমন্ত কুয়াসায়', 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইন ট্রপিকস্ পড়ে', 'কবি', 'কবের সে রাত্রি আজ', 'আশার আস্থার আধার নিজেই মানুষ') ; "সুদর্শনা" গ্রন্থে চৌদ্দটি ('এই পথ দিয়ে', 'সে', 'রশ্মি এসে পড়ে', 'অমৃতযোগ', 'অন্তরবাহির', 'আজ', 'রাত্রি ও ভোর', 'আজ', 'ফসলের দিনে', 'মরুতৃণোজ্জ্বলা', 'তুমি', 'কোনো ব্যথিতাকে', 'এখন এ পৃথিবীর', 'নদী নক্ষত্র মানুষ') ; "ধূসর পাণ্ডুলিপি"–র 'অপ্রকাশিত কবিতা' শিরোনামে পনেরোটি ('এই নিদ্রা', 'পাখি', 'অঘ্রাণ', 'শীতশেষ', 'এই সব', 'তাই শান্তি', 'পায়রারা', 'যেন এক দেশলাই',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই শান্তি', 'বুনো হাঁস', বৈতরণী', 'নদীরা', 'মেয়ে', 'নদী', 'পৃথিবীতে থেকে' কবিতাগুচ্ছ) ; "মহাপৃথিবী" গ্রন্থান্তর্গত 'আমিষাশী তরবার' শিরোনামে তেরোটি ('মৃত মাংস', 'অগ্নি', 'উদয়াস্ত', 'সুমেরীয়', 'মৃত্যু', 'আমিশাষী তরবার', 'তিনটি কবিতা', '১৩৩৬-৩৮ স্মরণে', 'ঘাস', 'সমিতিতে', 'কোরাস', 'দোয়েল', 'সমুদ্র-পায়রা') ; "রূপসী বাংলা" গ্রন্থে ষাটটি কবিতা (মোট দুশো চুরাশিটি কবিতা।)[২]

দেখা যাচ্ছে : জীবনানন্দ জীবনভোর মূলত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই চর্চা করেছেন। তাঁর সব পর্যায়েই এই ছন্দই কবির প্রধান বাহন ছিলো। তবে রূপের ও নির্মিতির পরিবর্তন হয়েছে। শনাক্তযোগ্য স্তরগুলি এই :

১. রৌদ্র ঝিলমিল
উষার আকাশ, মধ্যনিশীথের নীল
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারেবারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার প্রাচীরের পারে।
উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী,
উগ্র চুল্লীবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি ;
আরক্ত কঙ্করগুলি মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা
—মরীচিকা ঢাকা।
(নীলিমা, ঝরা পালক)

২. তুমি তা জান না কিছু, না জানিলে—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।
যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,
পথের পাতার মত তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ?

---

২. এছাড়া আমার সংগ্রহে আছে কবির অগ্রন্থিত অক্ষরবৃত্তে রচিত আরো কবিতা : 'কবি', 'পরবাসী', 'হেমন্ত', 'নিঃসরণ', 'উদয়াস্ত', 'নির্দেশ', 'গতিবিধি', 'রাত্রি, 'আবছায়া', 'নিরীহ ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান', 'আলোসাগরের গান', 'শতাব্দীশেষ', 'শীতের রাতের কবিতা', 'পটভূমিবিসার', 'বিপাশা', 'আজ', 'মহাগ্রহণ', 'নিজেকে নিয়মে ক্ষয়', 'জীবনবেদ', 'সূর্য নিভে গেলে' গুচ্ছকবিতার কয়েকটি, 'জীবন অনেক দূর', 'দুটি তুরঙ্গম', 'লক্ষ্য', 'মহাইতিহাস', 'জর্নাল ১৩৪২', 'আলোপৃথিবী', 'অন্য এক প্রেমিককে', 'অন্য প্রেমিককে', 'উপলব্ধি', 'ঐখানে সারাদিন উঁচু ঝাউবন খেলা করে', 'সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে', 'বেদুইন', 'আঁধারের যাত্রী', 'মোর আঁখিজল', 'বিজয়ী', 'কোহিনূর', 'যুবা অশ্বারোহী', 'পলাতক', 'আমরা', 'আজ', 'মৃত্যু সূর্য সঙ্কল্প', 'পৃথিবী ও সময়', 'তিমির সূর্যে', 'নদী নক্ষত্র মানুষ', 'এখানে নক্ষত্রে ভ'রে', 'কখনও মুহূর্ত', 'মাঝে মাঝে', 'জার্নাল : ৩৬', 'জর্নাল ১৯৩৪', 'কারা কবে কথা বলেছিল', '১৯৩৬', 'জর্নাল ৩৪', 'যাত্রা', 'সূর্য এলে', 'গরিমা', 'শ্রুতিস্মৃতি'।

"মনবিহঙ্গম" গ্রন্থে কিছু পূর্বগ্রন্থিত কবিতার সঙ্গে অগ্রন্থিত নতুন কিছু কবিতাও আছে। এই গ্রন্থধৃত অক্ষরবৃত্তের কবিতা : 'অনন্ত জীবন যদি পাই', 'কুহুলিন', 'রাত্রি ও ভোর', 'কবিতার খশড়া', 'দাও দাও সূর্যকে', 'মহাপতনের ভোরে', 'মহাত্মা', 'মনবিহঙ্গম', 'এখানে' 'টেবিলে অনেক বই', 'চারিদিকে পৃথিবীর', 'সুদর্শনা', 'কোনো এক জ্যোৎস্না রাতে বারবার শিকারীর গুলির আওয়াজ শুনে' প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার !
তোমার এ জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল ?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই।—
শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে।
আমি ঝরে যাব, তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে,—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে !

(নির্জন স্বাক্ষর, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

৩. সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।
সৃষ্টির মনের কথা : আমাদেরি আন্তরিকতাতে
আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা
খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্ণার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হ'য়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায় ;
মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে ; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি ; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হ'য়ে বধ ক'রে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ ক'রে ঘুমাতেছি—তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
সকলকে আলো দেবে মনে ক'রে অগ্রসর হ'য়ে
তবুও কোথাও কোনো আলো নেই ব'লে ঘুমাতেছে।

(১৯৪৬–৪৭, শ্রেষ্ঠ কবিতা)

কবির লেখা অক্ষরবৃত্তের কবিতার অনেক বদল হয়েছে : প্রথম পর্যায়ে কবি আবেগে উত্তাল ; দ্বিতীয় পর্যায়েও আবেগ উচ্চণ্ড, কিন্তু তার সঙ্গে মিশেছে ক্লান্তি, মন্থরতা, পুনরাবৃত্তি, বিষাদ ; তৃতীয় পর্যায়ে আবেগ শমিত, শাসিত, ভাষার কাব্যিকতার জায়গা নিয়েছে গদ্য-আত্মকতা, ব্যক্তিবিষাদ গভীরে গিয়ে মিশেছে বিশ্ববিমর্ষতায়। তবে, একথা সত্যি, সব পর্যায়ে মুক্তক অক্ষরবৃত্তেই কবি সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন।[৩]

---

৩. খ্যাতিমান ছান্দসিক ড. নীলরতন সেন তাঁর একটি আলোচনায় ('ছন্দকুশলী জীবনানন্দ', "জীবনানন্দ স্মৃতি" ; দেবকুমার বসু-সম্পাদিত) 'লঘু মুহূর্ত' ("সাতটি তারার তিমির") কবিতাটিকে 'মাত্রাবৃত্ত' ব'লে শনাক্ত করেছেন—যদিও কবিতাটি স্পষ্টত অক্ষরবৃত্তে রচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কবি ব্যবহার করেছেন "ঝরা পালক"-এর চৌদ্দটি কবিতায় ; ('আমি কবি,—সেই কবি', 'নব নবীনের লাগি', 'মরীচিকার পিছে' ; 'জীবন-মরণ দুয়ারে আমার', 'বেদিয়া', 'অস্তচাঁদে'-র শেষাংশ, 'বিবেকানন্দ', 'হিন্দু-মুসলমান', 'নিখিল আমার ভাই', 'পতিতা', 'চাঁদিনীতে', 'দক্ষিণা', 'যে কামনা নিয়ে', এবং 'সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়') "মহাপৃথিবীর"-এর তিনটি কবিতায় ('প্রার্থনা', 'সূর্যাসাগরতীরে' এবং 'মনোবীজ'-এর শেষাংশ) ; "শ্রেষ্ঠ কবিতায়" গ্রন্থর্ভূত একটি কবিতায় ('লোকেন বোসের জর্নাল') ; "জীবনানন্দ দাশের কবিতা" গ্রন্থর্ভূত তিনটি কবিতায় ('রামদাস', 'অলকা', 'পলাতকা')।[৪]

এই কবিতাগুচ্ছ থেকে কবির প্রথম, মধ্য ও শেষ পর্যায়ের মাত্রাবৃত্ত ছন্দব্যবহারের ধরন বোঝা যাবে।—প্রথম পর্যায়ের মাত্রাবৃত্ত প্রয়োগের প্রকৃতি 'ঝরা পালক' এবং "জীবনানন্দ দাশের কবিতা" গ্রন্থর্ভূত মোট সতেরোটি কবিতায় প্রাপ্তব্য। (লক্ষণীয়, কবি সব সময় ব্যবহার করেছেন ছ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত—অন্য কোনো মাত্রায় কখনোই নয়।) ছ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে বন্দনামূলক বা উদ্দীপক কবিতা রচনা সেকালের একটি রীতি। কালিদাসের "মেঘদূত"-এর যে-চারটি শ্লোক কবি অনুবাদ করেছিলেন, 'অলকা' নামে যা মুদ্রিত হয়েছিলো ('বঙ্গবাণী', শ্রাবণ ১৩৩৪), তা-ও অনূদিত হয়েছিলো যান্ত্রিক মাত্রাবৃত্তে। প্রথম পর্যায়ের মাত্রাবৃত্তের উদাহরণ :

আমি কবি,—সেই কবি,—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি' হেরি ঝরা পালকের ছবি।
আনমনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙুল মেঘের পানে।
মৌন নীলের ইশারায় কোন্ কামনা জাগিছে প্রাণে—
বুকের বাদল উথলি উঠিছে কোন্ কাজরীর গানে।
দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি' !
(আমি কবি,—সেই কবি, ঝরা পালক)

মধ্যপর্যায়ী মাত্রাবৃত্তের তিনটি কবিতাই "মহাপৃথিবী" থেকে গৃহীত। ততোদিনে জীবনানন্দের উচ্চারণে নিজস্বতা এসে গেছে। প্রাগ্বর্তী মাত্রাবৃত্তে অন্য কবিদের (নজরুল-মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথের) যে-ছায়া লেগে ছিলো, এখন তা নেই আর, এই মাত্রাবৃত্তেও চারিয়ে গেছে জীবনানন্দের স্বকীয় স্বর। ৬+৬+৮-এর বাঁধন ভেঙে ফেলে তাঁর মাত্রাবৃত্তও তাঁর

তিনি লিখেছেন, 'লঘু মুহূর্ত' কবিতাটি আট মাত্রার পদভাগে রচিত হয়েছে। ... ছন্দযতি ও ভাবযতির প্রয়োজন মতো কিছুটা পৃথক অস্তিত্ব দিয়েছেন, প্রয়োজনে আমাদের কেতাবী মাত্রানিরূপণের হিসাবকে কাটিয়ে গিয়েছেন অথচ ছন্দ পঙ্গু হয়নি। ... মাত্রাবৃত্তের মধ্যে অপক্ষবৃত্তের সংহত উচ্চারণ প্রয়োগ করেছেন।' হয়তো নীলরতন সেন ভুল করেছেন কবির যুক্তাক্ষরহীন শব্দসন্নিবেশ বা 'রাস্তার' 'পরস্পরের' ইত্যাদি শব্দকে ভেঙে ব্যবহারের ধরন লক্ষ্য করেননি বলে।

৪. শঙ্খ ঘোষ জীবনানন্দের ছন্দ বিষয়ক একটি আলোচনায় ('শতজল ঝরণার ধ্বনি', "ছন্দের বারান্দা", ১৩৮২) কবির গ্রন্থভুক্ত মাত্রামৃত্ত ছন্দের কবিতার সংখ্যা বলেছেন, ১৬। সম্ভবত তিনি 'অস্তচাঁদ'-এর শেষাংশ বাদে "ঝরা পালক"-এর ১৩টি কবিতা, "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-র 'লোকেন বোসের জর্নাল', এবং 'মনোবীজ' এর শেষাংশ বাদে "মহাপৃথিবী"র ২টি কবিতা হিশাবের মধ্যে ধরেছেন। 'অস্তচাঁদ'-এর শেষাংশ এবং 'মনোবীজ'-এর শেষাংশ মাত্রাবৃত্তে রচিত ব'লে এখানে যুক্ত হ'তে পারে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা আরো একটি অগ্রন্থিত কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে ; 'এই চেতনা', 'সাহিত্যপত্র' ১৩৫৫ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষরবৃত্তিক কবিতার পঙ্‌ক্তির মতো দীর্ঘ হ'য়ে গেছে। "ঝরা পালক"-এর 'অস্তচাঁদে' কবিতার প্রথমাংশ ছিলো অক্ষরবৃত্তে লেখা, শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মাত্রাবৃত্তে ; ঠিক অনুরূপ কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে "মহাপৃথিবী"-র 'মনোবীজ' কবিতায়—প্রথমাংশ অক্ষরবৃত্ত, শেষাংশ মাত্রাবৃত্তে। একই কবিতায় বিভিন্ন ছন্দের এরকম ব্যবহার কবি এই দুটি কবিতাতেই করেছেন। কবির মধ্যপর্যায়ী মাত্রাবৃত্তের নিদর্শন :

আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও ; মরি নাকি মোরা মহাপৃথিবীর তরে? পিরামিড যারা গড়েছিলো
একদিন—আর যারা ভাঙে—গড়ে ;—মশাল যাহারা জ্বালায় যেমন জেঙ্গিস যদি হালে
দাঁড়ায় মদির ছায়ার মতন—যত অগণন মগজের কাঁচা মালে ;

(প্রার্থনা, মহাপৃথিবী)

কবির শেষ-পর্যায়ের একটি মাত্র কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত ; কবির "শ্রেষ্ঠ কবিতা" গ্রন্থান্তর্গত এই কবিতাটি, 'লোকেন বোসের জর্নাল', অংশত অ-জীবনানন্দীয়। কবির অনেকগুলি কবিতাই মুক্তক মাত্রাবৃত্তে লেখা, 'লোকেন বোসের জর্নাল'-ও তাই, কিন্তু ঠিক এ ধরনের মাত্রাবৃত্তে জীবনানন্দ এম্নিতেই কখনো লেখেননি। কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :

সুজাতাকে ভালোবাসতাম আমি—
এখনো কি ভালোবাসি?
সেটা অবসরে ভাববার কথা,
অবসর তবু নেই ;
তবু একদিন হেমন্ত এলে অবকাশ পাওয়া যাবে ;
এখন শেলফে চার্বাক ফ্রয়েড প্লেটো পাভলভ ভাবে
সুজাতাকে আমি ভালোবাসি কিনা।[৫]

(লোকেন বোসের জর্নাল, শ্রেষ্ঠ কবিতা)

'কবিতার আত্মা ও শরীর' প্রবন্ধে কবি মুক্তক মাত্রাবৃত্তের উদাহরণে ভুল ক'রে মুক্তক স্বরবৃত্ত প্রথমে লিখেছিলেন বটে, কিন্তু কবিতাংশটি উদ্ধৃত করবার পর তা শুধরে নিয়েছিলেন। মুক্তক মাত্রাবৃত্ত সম্পর্কে তাঁর মত, 'এ যুগের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করবার জন্যে সর্বব্যাপী নিপীড়নের যে পরিচয় পাওয়া যায় রাষ্ট্রে ও সমাজে সেইটে কাব্যের ছন্দালোকে নিঃসংশয় রূপে প্রতিফলিত হলে মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের জন্ম হয় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। যদি হয় এবং কবিতার ছন্দ যদি যুগের নাড়ী-মূলের নির্দেশ দান করে, তাহলে এরকম মুক্তকে প্রচুর কবিতা আশা করা যায়। কিন্তু কোথায় তা?'—কবির এই অন্তর্দর্শী ব্যাখ্যায় মুক্তক

---

৫. এই কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দেয় বিষ্ণু দে-র একেবারে প্রথম পর্যায়ের অনরূপ চটুল একটি প্রেমের কবিতা : 'মন দেওয়া নেওয়া' ("চোরাবালি")। একটি স্তবক :

ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে—প্রায়ই করে
আগেকার মতো—তার মানে এই দুমাস আগের
মতো আর মন বাহবা দেয় না।
প্রেম জিনিসটা কি নির্বোধের?
দুমাস আগে এ করুণ চাউনি, পাণ্ডুর গাল,
রহস্যভরা অস্ফুট ভাষা
লাগত ভালো!
তখনের সেই অবস্থা নাকি প্রেমের বাসা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্রাবৃত্তে রচিত নজরুলের 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু' ইত্যাদি কবিতার নতুন একটি তাৎপর্য খুলে যায়। কিন্তু নজরুলোত্তর কবিতায়, দুএকটি ব্যতিক্রম বাদে,[৬] মুক্তক মাত্রাবৃত্তে লেখা ওরকম অন্তঃচেতন কবিতা খুব বেশি নেই। যে-'কঙ্কাবতী' (বুদ্ধদেব বসুর "কঙ্কাবতী" কবিতাগ্রন্থভুক্ত কবিতা) থেকে কবি উদাহরণ দিয়েছিলেন, তা-ও বোধ হয় ঠিক কবি-অভিপ্রেত অর্থ-তাৎপর্যের আওতায় পড়ে না।

৪

স্বরবৃত্ত ছন্দ জীবনানন্দ প্রথম দিকে বেশ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মধ্য পর্যায়ে কবি এ ছন্দ প্রায় প্রয়োগই করেননি ; কিন্তু একেবারে শেষ পর্যায়ে স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রবলভাবে ফিরে আসে তাঁর কবিতায়। কবির স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতা এগুলি : 'ঝরা পালক'-এর সাতটি কবিতা ('সাগর-বলাকা', 'বনের চাতক—মনের চাতক', 'চলছি উধাও', 'ছায়া-প্রিয়া', 'মিশর', 'মরুবালু', 'স্মৃতি') ; "বেলা অবেলা কালবেলা"-র দশটি কবিতা ('তোমাকে', 'সময় সেতুপথে', 'যতিহীন', 'শতাব্দী', 'প্রয়াণপটভূমি', 'নারীসবিতা', 'গভীর এরিয়েলে', 'পটভূমির', 'যদিও দিন', 'আজকে রাতে') ; "শ্রেষ্ঠ কবিতা" গ্রন্থান্তর্গত দুটি কবিতা ('তোমাকে ভালোবেসে', 'অনন্দা') ; "জীবনানন্দ দাশের কবিতা" গ্রন্থর্ভূত এগারোটি কবিতা ('হৃদয়, তুমি', 'পটভূমি', ১১-সংখ্যক কবিতা, ১২-সংখ্যক কবিতা, ১৬-সংখ্যক কবিতা, 'মনকে আমি নিজে', 'রাত্রি, মন, মানবপৃথিবী', 'জার্মানীর রাত্রিপথে : ১৯৪৫', 'সূর্যকরোজ্জ্বলা', 'চেতনা-লিখন', 'ভোরের কবি জ্যোতির কবি') ; "সুদর্শনা" গ্রন্থর্ভূত পনেরোটি কবিতা ('তোমায় আমি', 'এসো', 'অন্ধকারে', 'তোমায় আমি', 'তোমার আমার', 'জল', 'কে এসে যেন', 'তুমি আজ', 'অনেক রক্তে', 'পৃথিবী, জীবন, সময়', 'এখন ওরা', 'স্বাতীতারা', 'আলোকপাত', 'তোমাকে', 'শান্তি ভাল') ; "মনবিহঙ্গম" গ্রন্থর্ভূত দুটি কবিতা ('জীবন ভালোবেসে', শতাব্দীর মানবকে')।[৭]

কবির প্রথম ও শেষ পর্যায়ের স্বরবৃত্ত ছন্দ একেবারে আলাদা। স্মরণীয়, কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতাটিই ('বর্ষ-আবাহন') স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পর্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলালের ছাঁচ-ছাপ খুব স্পষ্ট :

> ওরে কিশোর, বেঘোর ঘুমের বেহুঁশ হাওয়া ঠেলে
> পাতলা পাখা দিলি যে তোর দূর দুরাশায় মেলে !
> ফেনার বৌয়ের নোনতা মৌয়ের—মদের গেলাস লুটে,
> ভোর-সাগরের শরাবখানায়—মুসল্লাতে জুটে'
> হিমের ঘুণের বেড়াস খুনের আগুনদানা জ্বেলে'।
>
> (সাগর-বলাকা, ঝরা পালক)

কবির শেষ-পর্যায়ের স্বরবৃত্তিক কবিতাগুচ্ছ একেবারেই তাঁর নিজস্ব। তার স্বভাবশোভন দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি, এবং অন্যান্য চরিত্রলক্ষণগুলি, তাতে প্রকট। একটি নজির ;

---

৬. যেমন বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' ("চোরাবালি"), ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' ("সাত সাগরের মাঝি")।

৭. আমার সংগ্রহে আছে কবির অগ্রন্থিত স্বরবৃত্তে রচিত আরো কয়েকটি কবিতা; 'বর্ষআবাহন', 'পৃথিবী আজ', 'সূর্য নিভে গেলো অঘ্রাণ রাত', 'এই পৃথিবীর', 'নব হরিতের গান'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেতো ; চারিদিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র ঘাস হাওয়ার প্রান্তর।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভার
বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর ;—
আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লণ্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
নিবিড় নিয়মাধীন।

(আজকে রাতে : বেলা অবেলা কালবেলা)

১৩৫৪ সালে কবি লিখেছিলেন, '... স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দে যে বহু[৮] পরীক্ষা সম্ভব হয়, উত্তীর্ণ হওয়া যায় ঢের উত্তরণলোকে, আধুনিক বাঙালী কবির সেদিকে ততটা মন নেই।' এই চেতনা থেকেই কি কবি তাঁর জীবনের শেষদিকে ক্রমাগত স্বরবৃত্তে নিজেকে রূপায়িত করতে চাচ্ছিলেন?

৫

১৯৭৪–৭৫ সালে লেখা জীবনানন্দের গদ্যকবিতা সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে আমি দেখিয়েছিলাম কবির 'গ্রন্থিত গদ্যকবিতার সংখ্যা ; "বনলতা সেন"–এ নয়টি ('হাওয়ায় রাত', 'আমি যদি হতাম', 'ঘাস', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'শিকার', 'বেড়াল', 'অন্ধকার', 'কমলালেবু', 'আমাকে তুমি') ; "মহাপৃথিবী"–তে সাতটি ('শ্রাবণরাত', 'মুহূর্ত', 'শহর', 'শীতরাত', 'আদিম দেবতারা', 'আজকের এক মুহূর্ত', 'ফুটপাথে') : মোট সংখ্যা ষোলো। অগ্রন্থিত গদ্যকবিতা : "মহাপৃথিবী"–র কবির মৃত্যুত্তর সংস্করণে যোজিত একটি কবিতা ('হঠাৎমৃত') ; "জীবনানন্দ দাশের কবিতা" গ্রন্থে সংকলিত আরো নয়টি কবিতা ('কবি', 'দিনরাত্রি', 'আমি', 'চিঠি এল', 'শবের পাশে', 'বড়ো বড়ো গাছ', 'উনিশ শো চৌত্রিশের', 'এইসব পাখি', 'সুন্দরবনের গল্প') ; মোট সংখ্য দশ।' এরপর আমি লিখেছিলাম : 'তাহ'লে, জীবনানন্দের গ্রন্থিত–অগ্রন্থিত মোট গদ্যকবিতার সংখ্যা, এখন–পর্যন্ত–প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ছাব্বিশটি।' আরো গদ্যকবিতা ইতিমধ্যে আমার সংগ্রহে এসেছে : "মনবিহঙ্গম" গ্রন্থর্ভূত 'হে জননী, হে জীবন' ও 'মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে' ; এবং 'কে কবিতা লেখে' ('যুগান্তর', শারদীয় ১৩৮৪), 'হাজার বর্ষ আগে' ('ঊষা', আষাঢ় ১৩৩৩) ও 'আশা অনুমিতি' ('একক', ১০.১.১৩৫৮)।[৯]

---

৮. 'গদ্যকবিতা' (প্রথম খণ্ড, পরিচ্ছেদ ছয়), "শুদ্ধতম কবি" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭)।

৯. অম্বুজ বসু তাঁর "একটি নক্ষত্র আসে" (১৩৮৩) গ্রন্থে 'জীবনানন্দের অসংগ্রথিত কবিতার মধ্যে আরো কিছু গদ্যকবিতার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে' ব'লে যে–তিনটি কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন, তার একটিও গদ্যকবিতা নয়—বরং তিনটিই কবির স্ব–স্বভাবী অক্ষরবৃত্তে লেখা। শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত 'যাত্রা' কবিতাটি আমি অবশ্য পুরো এখনো পাইনি, তবু যেটুকু অম্বুজ বসু উদ্ধৃত করেছেন, তাতেও প্রমাণ হচ্ছে এটি অক্ষরবৃত্তে লেখা—গদ্যকবিতা নয়। ছন্দ–অবহিত পাঠকের জন্যে তিনটি কবিতার অংশ তুলে দিচ্ছি ;

ক. কারো–কারো মন স্বভাবত নিহত চেতন ;
হাসছে খেলছে গুলগল্পে গরমে মেতে আছে—
খাচ্ছে—ছুটছে—চালানি মালের মতো দিনরাত দিচ্ছে নিচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি তাঁর মধ্যপর্যায়েই গদ্যকবিতা লেখেন, প্রথমদিকে নয়, এবং সম্ভবত শেষদিকেও নয়। তাঁর গদ্যকবিতার যে-দুটি পর্যায় তখন ভাগ করেছিলাম, তা এখনো সত্য বলেই বোধ হচ্ছে। 'হাজার বর্ষ আগে' কবিতাটিকে প্রথম পর্যায়ভুক্ত করা যায় তার সৌন্দর্য-কল্পনার বিচারে ; 'আশা, অনুমিতি' এবং 'কে কবিতা লেখে'-কে দ্বিতীয় পর্যায়ের তার মননদীপ্তির জন্যে।

৬

জীবনানন্দ তাঁর ছন্দোব্যাপারে দু'রকম স্বাধীনতা সব সময় নিয়েছেন।

অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত যে ছন্দেই লেখেন না কবি, প্রায় সব সময়ই লিখেছেন মুক্তকে। মুক্তকের প্রথম সূত্রপাত গৈরিশ ছন্দে। পরিণতি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-য়। কিন্তু 'বলাকা'-র মুক্তক থেকে তিরিশের কালের মুক্তক অনেক আলাদা হয়ে যায়। শুধু জীবনানন্দের নয়, তিরিশের প্রধান সব কবিরই মুখ্য মাধ্যম মুক্তক ছন্দ। তুলনামূলক কয়েকটি অংশ :

জীবনানন্দ : চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা,
সবুজ ঘাসের দেশ যখন' সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

(বনলতা সেন : বনলতা সেন)

দেহ—ভালোবাসা—(দেহ-মাংস) :—
সারাদিন চামড়া মাংস বিকিকিনি শেষ হয়ে গেলে
তারার আলোয় এসে খ-মানুষের মতো এরাও মানুষ ;
আচ্ছন্ন করুণ, চেতনা জেগেছে, পথ নেই, বিন্দুর ভিতরে
স্তব্ধ হয়ে রয়েছে জাহাজ—মুর্গির খাঁচার মতো যেন ;
তবুও তা নয় :—
আকার বিমুক্ত হয়ে আছে।

(যাত্রা : আনন্দবাজার পত্রিকা)

খ. কতদিন হয়ে গেল
কতবার কাঁচা ধান কার্তিকের সূর্যে গেল পেকে ;
পউষের চাঁদ পড়ে ঝরে গেল।
খড় শুধু পৃথিবীর মুখখানা ঢেকে
রয়ে গেল ;

(যাত্রা : উত্তরসূরি, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৯)

গ. কখনও মুহূর্তে আসে সূর্য আর শিশিরের জলে
ব'সে থাকবার মতো—
অথবা কখনও দেখি দিন নিভে গেছে
হরিয়াল প্রান্তরের পারে চ'লে গেছে
ডানার ঝিলিকে তার সবচেয়ে শেষ রোদ্দুরে
জ্বালিয়ে সে সূর্যকে নিভিয়ে এবার নিভে গেল।

(কখনও মুহূর্ত : দেশ, ফাল্গুন ১৩৬৬)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুধীন্দ্রনাথ : তবু চায়, প্রাণ মোর তোমারেই চায়।
তবু আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তেরে অমর্যাদা করে ;
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম—
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম।

(নাম : অর্কেস্ট্রা)

বিষ্ণু দে : চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
রাত্রির আঁধারে একা জাগে নির্নিমেষ মহাশ্বেতা
নিঃসঙ্গ হৃদয় চিরকাল
কত সন্ধ্যা গোধূলি সকাল
হৃদয় নিঃসঙ্গ
চিরকাল এক পূর্বরঙ্গে শেষ
স্নায়ুর তিমিরে শেষ নির্নিমেষ বিনিদ্র রাত্রিতে
সবারই উদ্দেশ
হাজার যাত্রীতে তাই মুখর হৃদয় শবরী শর্বরী জাগে নিঃসঙ্গ আশায়
চিরকাল নিঃসঙ্গ আশায়
শূন্য এক প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায়।

(চৈতে-বৈশাখে : সন্দ্বীপের চর)

বুদ্ধদেব : ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গের 'পরে
গগনের স্নিগ্ধ শান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হ'য়ে যেন লাগে ;
ফুটে ওঠে সোনার কলম
ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল।
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয়
পল্লব সম্পূটে।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি আমি লিখন তাহার :
'হ তরুণ, দস্যু নহো, পশু নহো, নহো তুচ্ছ কীট—
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !'

(শাপভ্রষ্ট : বন্দীর বন্দনা)

অমিয় চক্রবর্তী : অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যাম রোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে।

(বৃষ্টি : একমুঠো)

জীবনানন্দ তাঁর মুক্তকে অনেকগুলি কুশলতা যুক্ত করেন—মিল-বিন্যাসের অনিয়ম, শব্দ ও পঙ্ক্তির পৌনঃপুনিক আবৃত্তি, অতিদীর্ঘ পঙ্ক্তির প্রয়োগ ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয়, তিন রকম ছন্দেই জীবনানন্দ কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছেন—যাকে হয়তো কেউ-কেউ বলবেন ছন্দপতন।—অক্ষরবৃত্ত ছন্দে জীবনানন্দ অনেক সময় যুক্তবর্ণকে ভেঙে বা বিশ্লিষ্ট করে সিলেবল গণনা করেছেন। এইভাবে অক্ষরবৃত্তের মধ্যে মাত্রাবৃত্তের কুশলতা চারিয়ে দিয়েছেন।[১০] কয়েকটি উদাহরণ—

১. কেবলি আশঙ্কা ব্যথা নিরাশার সম্মুখীন হয়ে
মানুষের মরণের সমুদ্রের ঢেউ
রূপান্তরিত করে নিতে চেয়ে মানুষের জীবনের সুর
জেনেছে কোথাও ভয় নেই—নেই—নেই।
(উপলব্ধি : উত্তরসূরী, ১৩৬১ পৌষ-ফাল্গুন)

২. কোথাও রয়েছে যেন অবিনশ্বর আলোড়ন ;
কোনো এক অন্য পথে—কোন পথে নেই পরিচয় ;
এ মাটির কোলে ছাড়া অন্য স্থানে নয় ;
সেখানে মৃত্যুর আগে হয় না মরণ।
(আলোপৃথিবী : দেশ, ১৩৬১)

৩. কবের সে বেবিলন থেকে আজ শতাব্দীর পরমায়ু শেষ
কি এক নিমেষ শুধু মানুষের অন্তহীন সহিষ্ণুতায় ?
নক্ষত্রের এক রাত্রি—একটি ধানের গুচ্ছ—এক বেলা সূর্যের মত ?
(পটভূমিবিসার : মেঘনা, ১৩৫৪ বৈশাখ)

প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর "ছন্দপরিক্রমা" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭) গ্রন্থে লিখেছেন, '... মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে শব্দের অপ্রান্তস্থ যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদলের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের প্রতি কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯–১৯৫৪) বিশেষ প্রবণতা ছিল। তাঁর এই ছন্দোবৈশিষ্ট্যের কথা অনেকেই বলেছেন। তবে বোধ করি আবদুল মান্নান সৈয়দ-প্রণীত "শুদ্ধতম কবি" গ্রন্থেই (১৯৭২) পাওয়া যায় (পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪৪–৪৯) এ বিষয়ের সবচেয়ে বিশদ ও দৃষ্টান্তসমৃদ্ধ আলোচনা।[১১] জীবনানন্দের এই প্রয়াসকে গ্রন্থকার শুধু 'দুঃসাহসিক' ও 'বিপজ্জনক' বলেই নিরস্ত হননি। তাঁর মতে এরকম ব্যতিক্রমকে যথেষ্ট 'কুশলতার সঙ্গে' ব্যবহার না করলে মিশ্রবৃত্ত (সাবেক অক্ষরবৃত্ত) রীতির ছন্দ 'মাত্রাবৃত্তে বা স্বেচ্ছাচারী ছন্দে তথা ছন্দহীনতায় পর্যবসিত হবে।' তাঁর এই অভিমত সর্বতোভাবেই স্বীকার্য। কিন্তু জীবনানন্দের এরকম প্রয়োগ 'কোথাও শ্রবণপীড়ক হয়ে ওঠেনি', তাঁর এই মন্তব্য সর্বজনস্বীকার্য হবে বলে মনে হয় না। বস্তুত উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি একটু মন দিয়ে অনুসরণ করলেই বোঝা যায়, কবির এ রকম প্রয়োগ কবির ব্যক্তিগত ভাবসত্তানুসারী এলানো (অর্থাৎ একটানা সুরের) আবৃত্তিভঙ্গি সাপেক্ষ। এরকম আবৃত্তিকে কবির মুদ্রাদোষ বলা না গেলেও তাঁর ভাবাবেশময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু ভাষা ও ছন্দ সর্বজনীন সম্পদ, কবিরও ব্যক্তিগত সম্পদ

---

১০. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 'বাংলা ছন্দোমুক্তির জীবনানন্দীয় সূত্র' (প্রথম খণ্ড, পরিচ্ছেদ পাঁচ)। "শুদ্ধতম কবি" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭)।

১১. প্রবোধচন্দ্র সেন "শুদ্ধতম কবি"-র প্রথম সংস্করণের উল্লেখ করেছেন। "শুদ্ধতম কবি"র দ্বিতীয় সংস্করণে এই রচনাটির স্থান নির্দেশের জন্যে দ্র. ১০-সংখ্যক ফুটনোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। কবি তাঁর রচিত ছন্দে নব নব বৈচিত্র্য আনতে পারেন। কিন্তু তবু তাঁকে দেখতে হয়, যে-পাঠক যে-ভাবেই আবৃত্তি করুক তাঁর রচনার মাত্রাসমতা যেন রক্ষিত হয় এবং কারও কণ্ঠেই যেন কোথাও স্খলন না ঘটে, অর্থাৎ তাঁর রচনা যেন কোনো ব্যক্তি-বিশেষের আবৃত্তিভঙ্গি সাপেক্ষ না হয়। অবশ্য ছন্দকালাদের কথা বিবেচ্যই নয়। সর্বত্রই তাদের কণ্ঠস্খলন ঘটে।' (পৃ. ১৭৫-৭৬)

প্রবোধচন্দ্র সেনের যুক্তি অবশ্যস্বীকার্য : ছন্দ একটি বিধিসম্মত বিজ্ঞানঅনুগ ব্যাপার, এবং তার থেকে বিচ্যুতি ছন্দের বিচ্যুতিই। কিন্তু বিচ্যুতি এবং পরীক্ষার মধ্যে একটি ব্যবধান আছে। কবি যদি বিধিসম্মত ছন্দেই নিজেকে দ্বিধাহীন সমর্পণ করেন, তাহলে নতুন পরীক্ষা সম্ভব হবে না, এবং নতুন পরীক্ষা না হলে নতুন ছন্দোমুক্তিও অসম্ভব। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে-স্বাধীনতা জীবনানন্দ নিয়েছিলেন, আবহমান বাংলা কবিতায় প্রায় সব কবি (রবীন্দ্রনাথ, নজরুল সমেত) এই স্বাধীনতা নিয়েছেন ; তফাৎ এই : জীবনানন্দ এটিকে প্রায় তাঁর একটি নিজস্ব নিয়মে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। মাপা-বাঁধা ছন্দেই আমাদের কান অভ্যস্ত বটে কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটিয়েও যদি ছন্দরণন অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহলে তাকে অস্বীকার করি কি করে। যুক্তবর্ণকে ভেঙে জীবনানন্দ অক্ষরবৃত্তে যে-ভাবে ব্যবহার করেছেন, তা তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে এমনই অবিচ্ছেদ্য বলে মনে হয়, যে, তাকে স্বীকার না-করে উপায় থাকে না।

আর এই ঈষৎ স্বাধীনতা জীবনানন্দ শুধু অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই গ্রহণ করেননি, নিয়েছিলেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও। কবির মাত্রাবৃত্ত ছন্দে স্বাধীনতা গ্রহণের উদাহরণ :

১. এখন শেলফে চার্বাক ফয়েড প্লেটো পাভলভ ভাবে
সুজাতাকে আমি ভালোবাসি কিনা।
পুরোনো চিঠির ফাইল কিছু আছে :
সুজাতা লিখেছে আমার কাছে,
বারো তোরো কুড়ি বছর আগের সে-সব কথা ;
ফাইল নাড়া কী যে মিহি কেরাণীর কাজ ;

(লোকেন বোসের জর্নাল : শ্রে. ক.)

২. অনেক নবীন সূর্য দেখেছি রাতকানা যেন নীল আকাশের তলে ;
পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে ;
যা কিছু নিভৃত-ধূসর—মেধাবী তাহারে রক্ষা করে ;
পাথরে চেয়ে প্রাচীন ইচ্ছা মানুষের মনে গড়ে।

(মনোবীজ : মহাপৃথিবী)

স্মরণীয়, যে, এই কবিতা দুটিই কবির মধ্য ও শেষ-পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ের মাত্রাবৃত্তে কবি প্রচলিত পথেই চলেছেন।

স্বরবৃত্ত ছন্দেও প্রথম পর্যায়ে কবি অভ্যস্ত রাস্তায় পদচারণা করেছেন। শেষ জীবনে এই ছন্দ যখন ফিরে এলো, তখন কবি তাকে ব্যবহার করলেন অনেকখানি স্বেচ্ছাচারী ভঙ্গিতে। এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

১. মাঠের ভিড়ে গাছের ফাঁকে দিনের রৌদ্র অই ;
কুলবধূর বহিরাশ্রয়িতার মতন অনেক উড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিজল গাছে জামের বনে হলুদ পাখির মতো
রূপসাগরের পার থেকে কি পাখনা বাড়িয়ে
বাস্তবিকই রৌদ্র এখন? সত্যিকারের পাখি?
(তোমাকে, বেলা অবেলা কালবেলা)

২. কোথায় সমাজ, অর্থনীতি? স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হয়ে কি আজ চারিদিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার দ্বৈপ সাগর দখল ক'রে!
(যতিহীন : ঐ)

৭

তিন রকম ছন্দে লিখলেও, জীবনানন্দ দাশের স্বভাবী ছন্দ ছিলো অক্ষরবৃত্ত। বাংলা ছন্দের এই সবচেয়ে ব্যবহৃত ও প্রধানতম ছন্দকে তিনি নিজস্ব ধরনে ব্যবহার ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিও এক শান্তবিপ্লবী।

দ্বিতীয় পর্ব : রূপকল্প

১. সংহতির নতুন কুশলতা

জীবনানন্দ দাশের কবিতা দেখে মনে হয় ছড়ানো শিথিল অসংহত। কিন্তু আসলে সংহতির একটি নতুন কুশলতা আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ মুক্তকের পূর্ণরূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু *বলাকা*-র নিনাদিত মুক্তক থেকে জীবনানন্দের মুক্তকের তফাৎ আকাশ-পাতাল। এই পার্থক্যের একটি কারণ হয়তো দুজনের কবি-স্বভাবের আসমান-জমিন ব্যবধান—আবার কোথাও একটি নিঃশব্দ সাযুজ্য।

স্তবকবন্ধ নির্মাণে জীবনানন্দ কবিতায় গোপন প্রশাসন চালিয়েছেন বলে মনে হয়। এত সংগোপন যে আপাতচোখে ধরাই পড়ে না, তাঁর এই স্তবকবন্ধের নির্মিতি। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম প্রমুখ পূর্বজ অসাধারণ কবিদের স্তবকবন্ধের যে-চাক্ষুষ পরিমাপ তা এড়িয়ে গিয়ে জীবনানন্দের এই নিঃশব্দ সাম্রাজ্য স্থাপনা। সমসাময়িক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অতিমিত প্রত্যক্ষ সুচারু দৃশ্যমান দৃঢ়বদ্ধ স্তবকবন্ধ নির্মাণের পাশে তাঁকে যতটা ছড়ানো শিথিল অসংহত মনে হয়, আসল ঘটনা তা নয়। তাঁর স্তবকবন্ধের কারুকৌশল যেন চোখেই পড়ে না। অথচ অজস্র কবিতায় তিনি তা প্রয়োগ করেছেন। এখানেই আবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিল তাঁর : সত্যেন্দ্রনাথের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার করণকৌশল আলাদাভাবে নজরে পড়ে না যেমন, তেম্নি সুধীন্দ্রনাথের তুলনায় জীবনানন্দের কারুকৃতিও আমাদের আলাদাভাবে চোখে পড়ে না। এর একটি কারণ : সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পঙ্‌ক্তিপরিমাপী, আর জীবনানন্দের কবিতা পঙ্‌ক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। যতির ও পঙ্‌ক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে জীবনানন্দের কবিতা অনেকসময়ই তৈরি হতে থাকে স্তবকে স্তবকে। অন্তমিল কবিতায় অনুপস্থিত দেখে অনেকে যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক কবিতা মাত্রকেই মনে করেন গদ্যকবিতা, তেম্নি পঙ্‌ক্তিপরিমাপী নয় বলে জীবনানন্দের কবিতাকে অনেক কবিতাপাঠকও মনে করে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী শিথিল অসংহত অতিবিস্তারিত।

সন্দেহ নেই, জীবনানন্দের অজস্র কবিতা স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু এও নিঃসন্দেহ, জীবনানন্দের অনেক কবিতা স্তবকবন্ধের প্রশাসনে গঠিত। ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০—এরকম নানারকম স্তবকবন্ধের ছাঁচ তৈরি করেছেন কবি জীবনভোর। আমরা প্রথম এই বিষয়ের কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থ ভিত্তিক একটি পরিচয় গ্রহণ করব।—

(এক) ২-মাত্রার স্তবক।—*বনলতা সেন* কবিতাগ্রন্থের দুটি কবিতার কথা মনে করা যেতে পারে। 'বুনো হাঁস' আর 'হরিণেরা'। একটু আগেই বলেছি, জীবনানন্দ স্তবকবন্ধের প্রশাসন মেনেও পঙ্‌ক্তির স্বাধীনতা নিতেন ; এবং তা থেকে, সমকালীন সুধীন্দ্রনাথ থেকে, তাঁর কবিতার ব্যবস্থাপনা মনে হতো কিরকম ব্যভিচারী। ব্যভিচারী যে নয় বরং পঙ্‌ক্তিস্বাধীন তার একটি উদাহরণই শুধু এই একবার দেখে নেবে আমরা—প্রায় সব স্তবকগঠনেই এরকম ঘটেছে বারবার :

বু নো হাঁ স

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে

বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার ;
এক—দুই—তিন—চার—অজস্র—অপার—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে ; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা।

তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দুএকটি কল্পনার হাঁস ;

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক

কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

(দুই) ৩-পঙ্‌ক্তির স্তবক।—কয়েকটি সনেটে জীবনানন্দ এই ৩-পঙ্‌ক্তির স্তবকবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন। তেরজা-রিমা পদ্ধতি। এর একটিমাত্র গ্রন্থিত উদাহরণ—*বনলতা সেন*-এর 'পথ হাঁটা' নামে সর্বশেষ কবিতাটি। মনে হয়, জীবনানন্দ তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনায় অতি সতর্ক ছিলেন। এক ধরনের অনেকগুলি কবিতা থেকে এই একটিমাত্র নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। সনেটের বাইরে ৩-পঙ্‌ক্তির স্তবকে কোনো কবিতা লেখেননি জীবনানন্দ।

(তিন) ৪-পঙ্‌ক্তির স্তবক।—বাংলা কবিতার এটিই সবচেয়ে ব্যবহৃত স্তবকবন্ধ। জীবনানন্দ এই বহুলব্যবহৃত ৪-পঙ্‌ক্তির স্তবকেও অনেক কবিতা লিখেছেন। তবে তা আলাদা হয়ে গেছে তাঁর কবিচারিত্রে তো বটেই, পঙ্‌ক্তির স্বাধীনতার স্ব-স্বভাবেও। এরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার উদাহরণ *বনলতা সেন*-এর 'তুমি', 'ধান কাটা হয়ে গেছে', 'শিরিষের ডালপালা', *মহাপৃথিবী*-র 'স্বপ্ন', 'স্থবির যৌবন', *সাতটি তারার তিমির*-এর 'আকাশলীনা', 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য', 'নাবিক', 'রাত্রি', 'হাঁস', 'প্রতীতি', 'ভাষিত' ; *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র 'তোমাকে', 'পৃথিবীতে', 'আছে', 'দিনরাত' ইত্যাদি।

(চার) ৫-পঙ্‌ক্তির স্তবক। —স্তবকে জীবনানন্দের আগ্রহ প্রমাণিত হয় তাঁর প্রথম জীবনেই অসমপঙ্‌ক্তিক স্তবক গঠনের পরিকল্পনায় ও সংগঠনে। সাধারণত বাঙালি কবিরা জোড়-সংখ্যক স্তবক গঠনে পরিতৃপ্ত হন। জীবনানন্দ একটি ব্যতিক্রম। প্রথম গ্রন্থ *ঝরা পালক*-এই দেখা যাচ্ছে ৫-পঙ্‌ক্তির স্তবক-সম্পন্ন বেশ কয়েকটি কবিতা : 'বনের চাতক—মনের চাতক', 'সাগর-বলাকা', 'বিবেকানন্দ', 'মিশর' ও 'যে কামনা নিয়ে'। জীবনানন্দ যখন কবিতায় সার্থকতা অর্জন করলেন, তখনও দেখা যাবে এই ৫-পঙ্‌ক্তির স্তবকপ্রয়োগ—*মহাপৃথিবী*-র 'সিন্ধুসারস', *সাতটি তারার তিমির*-এর 'নিরঙ্কুশ' প্রভৃতি।

(পাঁচ) ৬-পঙ্‌ক্তির স্তবক। —এটিও বাংলায় বহুল ব্যবহৃত একটি স্তবকপ্রকরণ। জীবনানন্দ স্বাভাবিকভাবেই এই স্তবকগঠনে প্রথমে বেশ ক-টি কবিতা লিখেছেন। *ঝরা পালক*-এর 'আমি কবি,—সেই কবি', 'নব নবীনের লাগি', 'মরীচিকার পিছে', 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল', 'মরুবালু' ও 'সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়'। তারপরে কবির আত্মকীয় কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে চলল এই ছন্দ—*ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে 'মৃত্যুর আগে', *বনলতা সেন*-এ 'বনলতা সেন', 'শ্যামলী', 'হাজার বছর শুধু খেলা করে', 'সুরঞ্জনা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-য় 'সে' ইত্যাদি।

(ছয়) ৭-পঙ্‌ক্তির স্তবক। —এরকম একটি অসম স্তবকেও পরীক্ষাশীল জীবনানন্দ কবিতা লিখেছেন। *ঝরা পালক*-এ 'নিখিল আমার ভাই' লিখলেন। তারপর অনেক বছর পরে *সাতটি তারার তিমির*-এর বিখ্যাত 'লঘু মুহূর্ত' কবিতায় প্রযুক্ত হল এই স্তবক-পরিমাপ। জীবনানন্দ-যে স্তবক-কে আলাদা একটি গুরুত্ব দিতেন, তার সাক্ষ্য দেবে *সাতটি তারার তিমির*-এরই 'সপ্তক' কবিতাটি। ৭ টি পঙ্‌ক্তিতে নির্মিত এই কবিতার নামকরণই তো হয়েছে পঙ্‌ক্তির পরিমাপে। কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি :

স প্ত ক

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,—জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।
অনেক হয়েছে শোয়া ;—তারপর একদিন চলে গেছে কোন্ দূর মেঘে।
অন্ধকার শেষ হলে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে :
সরোজিনী চলে গেল অতদূর? সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের মতো পাখা বিনা?
হয়তোবা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ? জ্যামিতির
ভূত বলে : আমি তো জানি না।
জাফরান আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে :
লুপ্ত বেড়ালের মতো ; শূন্য চাতুরীর মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

(সাত) ৮-পঙ্‌ক্তির স্তবক।—এটি জীবনানন্দের একটি প্রিয় স্তবক-পরিমাপ। জীবনানন্দ শুধু দীর্ঘমাত্রিক কবিতা রচনায় বিশিষ্ট ছিলেন না—মোহিতলাল-শাহাদাৎ হোসেন-নজরুল ইসলামের হাত ধরেই এ দীর্ঘমাত্রিকতায় তাঁর এগিয়ে যাওয়া ; তার সঙ্গে তিনি নিজে যুক্ত করলেন দীর্ঘ দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির স্তবকগঠন। *ঝরা পালক*-এর 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮–পঙ্ক্তি ব্যবহার করলেন। তারপর ৮–পঙ্ক্তির স্তবক তৈরি করে কবিতা লিখলেন *বনলতা সেন*-এর 'সবিতা' ও 'সুরঞ্জনা' ; *সাতটি তারার তিমির*-এ 'গভীর এরিয়েলে' ও 'যতদিন পৃথিবীতে'।

(আট) ৯–পঙ্ক্তির স্তবক।--এমনকি ৯–পঙ্ক্তির স্তবকেও জীবনানন্দ কবিতা লিখেছেন। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র 'অনেক আকাশ' ও 'জীবন'। 'অনেক আকাশ' কবিতাটি ২২–স্তবকে এবং 'জীবন' কবিতাটি ৩৪–স্তবকে সম্পূর্ণ। এই কবিতাদ্বয়ের প্রসঙ্গে পরে আসছি।

(নয়) ১০–পঙ্ক্তির স্তবক।—৯–পঙ্ক্তির স্তবক রচনায়ও সন্তুষ্ট হলেন না কবি—১০ পঙ্ক্তির স্তবক রচনা করলেন *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র 'প্রেম' কবিতায়। সুদীর্ঘ কবিতা। জীবনানন্দের বরাবর একটি ঝোঁক ছিল দীর্ঘ কবিতা রচনার ; নিজেও বিশ্বাস করতেন ফিরে আসবে ফের দীর্ঘ কবিতা ; তবে তার উত্তরকালীন দীর্ঘ কবিতা ওরকম স্তবকবদ্ধ ছিল না—ছিল স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী।

এখন, কবির মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে তাঁর কয়েকশো কবিতা একত্রিত করা হয়েছে ; নতুন নতুন কবিতা আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে আজো। এইসব কবিতায়ও দেখা যাচ্ছে, কবি সংহতির কুশলতা হিসেবে স্তবকের সুসামঞ্জস্যকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন অনেকসময়। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারা অনুসারেই সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন ৪–পঙ্ক্তির স্তবক। কিন্তু ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ১০ প্রভৃতি পঙ্ক্তির স্তবকও রচনা করেছেন। ৪–পঙ্ক্তির স্তবক গঠনের পরেই তিনি ব্যবহার করেছেন বেশি ৬–পঙ্ক্তির স্তবক। ৩–পঙ্ক্তির স্তবকে নির্মিত কবিতাও লিখেছেন—'সন্ধ্যা হয়ে আসে' ও 'হেমন্তের রাতে'। ৫–পঙ্ক্তি আর ৮–পঙ্ক্তির স্তবক নির্মাণে যেন তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল। ৫–পঙ্ক্তিসম্পন্ন কবিতা '১৩৩৬–৩৮ স্মরণে', 'এসো', 'তোমার আমি', 'রশ্মি এসে পড়ে' প্রভৃতি। ৭–পঙ্ক্তির কবিতা 'কোরাস'। ৮–পঙ্ক্তির কবিতা 'হৃদয়, তুমি', 'কনভেনশন', 'জার্মানির রাত্রি পথে' প্রভৃতি। ১০–পঙ্ক্তির স্তবকগঠিত কবিতাও আছে—'রবীন্দ্রনাথ' (অনেকসময় পাড়ি দিয়ে ...), 'রবীন্দ্রনাথ' (দেয়ালচিত্রের শীর্ষে ...) প্রভৃতি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ তিরিশের কবি প্রত্যেকেই তাঁর নিজের নিজের ধরনে সংহতির সাধনা করেছেন। জীবনানন্দ দাশের সংহতির উপায় ছিল প্রধানত দুটি : চিত্রকল্পের প্রয়োগে আর সমান পঙ্ক্তির স্তবকের সংগঠনে। কবিতার গাঠনিক তাৎপর্য সন্ধান আমাদের এই রচনার বিষয়। তাই এখানে আমরা স্তবক প্রসঙ্গেই লিপ্ত থেকেছি।

২. স্পেনসেরিয়ান স্তবক

তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে-ই সর্বাধিক বিদেশি রূপকল্প ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দ বিদেশি (এখন আর বিদেশি আছে কী?) দুটি রূপকল্পের প্রয়োগ করেছেন তাঁর কবিতায়। প্রথম জীবনে স্পেনসেরিয়ান স্তবক ; আর অনেকদিন পর্যন্ত সনেট বা সনেটপরম্পরা। 'স্পেনসেরিয়ান স্তবক' নাম হয়েছে ইংরেজ কবি এডমান্ড স্পেনসার (? ১৫৫২–৯৯)-প্রবর্তিত রীতির কারণে। এই রীতিতে কবিতা লিখেছেন ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের অনেকে—শেলি, কীটস, বায়রন প্রমুখ। স্পেনসেরিয়ান স্তবকের প্রতি পঙ্ক্তিতে নয়টি পঙ্ক্তি থাকে, নবম পঙ্ক্তিটি দীর্ঘ, অন্তমিল–পদ্ধতি ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ ঘ। *ধূসর*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাণ্ডুলিপি গ্রন্থর্ভূত 'অনেক আকাশ' ও 'জীবন' কবিতা দুটিতে স্পেনসরীয় স্তবক প্রযুক্ত হয়েছে। 'অনেক আকাশ' কবিতার সর্বশেষ স্তবক এরকম :

সিন্ধুর ঢেউয়ের তলে অন্ধকার রাতের মতন।
হৃদয় উঠিতে আছে কোলাহলে কেঁপে বারবার !
কোথায় রয়েছে আলো জেনেছে তা—বুঝেছে তা মন
চারিদিকে ঘিরে তারে রহিয়াছে যদিও আঁধার !
একদিন এই গুহা ব্যথা পেয়ে আহত হিয়ার
বাঁধন খুলিয়া দেবে ! অধীর ঢেউয়ের মতো ছুটে
সেদিন সে খুঁজে লবে ওই দূর নক্ষত্রের পার !
সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে
দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মতো ফুটে !

৩. সনেটের বন্ধন—আবার বন্ধন ছিঁড়ে

কবিতা রচনার প্রথম পর্বেই জীবনানন্দ সনেট লিখেছিলেন। তখনকার চল্ অনুসারে ১৪-মাত্রার অক্ষরবৃত্তে ছন্দে। পরে অবশ্য জীবনানন্দ ক্রমশ আধুনিকতার নিয়ম অনুসারে ১৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্তেও কবিতা লিখেছেন। পরে তাঁর স্বকীয় চারিত্র চিহ্নিত হয় ২৬-মাত্রার, এমনকি ২৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। এ ধরনের সনেটে তিনি অনেকসময় তেরজা-রিমা মিলপদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু জীবনানন্দের মতো তুমুল রোমান্টিক কবি সনেটের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেছেন শেষ পর্যন্ত। সমমাপ পঙ্ক্তি ব্যবহার করেননি। *রূপসী বাংলা*-র সনেট-সিকোয়েন্স তার দৃষ্টান্ত। সনেট-সিকোয়েন্স জীবনানন্দ আরো লিখেছেন। ছোট-বড়। *রূপসী বাংলা*-র ধরনেই আরো একটি দীর্ঘ সনেট-সিকোয়েন্স আছে তাঁর।

এখানে রাখা হচ্ছে জীবনানন্দের নানারকম সনেটের নিদর্শন। প্রথমে উদ্ধৃত করছি ১৪-মাত্রার অক্ষরবৃত্তিক সনেট :

ভা র ত ব র্ষ

আসিয়াছে শুভ্র ঊষা, পুণ্য-বেদবতী
প্রাচীমঞ্চে, ভারতের উদয়-গগনে ;
কোন্ এক আদি মহাতপস্যার ক্ষণে
বাজিয়াছে আমাদের মঙ্গল-আরতি !
মধুমান্ সূর্যসোম ঢালিয়াছে জ্যোতি
আমাদের নদী গিরি নির্ঝর কাননে ;
অপিয়াছে শান্তি স্বস্তি নিখিলের মনে
আমাদের কাব্যকলা—মোদের ভারতী।

মৃত্যুর সাগর মন্থি অমৃতের তরে
যুগে যুগে ছুটে গেছে মোদের সন্তান।
অসুর আবাসে ভস্ম-শ্মশানের পরে
গেয়েছে তিমিরাতীত আদিত্যের গান !
বিতরি প্রেমের চরু স্বর্গ চরাচরে
মাগিয়াছে পরাবিদ্যা—চরম কল্যাণ !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮-মাত্রায় অক্ষরবৃত্তে—যা বিংশ শতাব্দীর বাংলা সনেটের প্রধান অবলম্বন—একটিমাত্র সনেট লিখেছিলেন জীবনানন্দ, 'সে'। কবিতাটি উদ্ধৃত হল :

সে

আলো যেন কমিতেছে—বিস্ময় যেতেছে নিভে আরো
আকাশ তেমন নীল? আকাশ তেমন নীল নয়,
মেয়েমানুষের চোখে নেই যেন তেমন বিস্ময়,
মাছ রাঙা শিশুদের পাখি আজ ; শিশুরাই কারো
রেশমি চুলের শিশু নয় আজ ; ভাবিতে কি পারো
প্রেমে সেই রক্ত আছে? আঘাতে রয়েছে সেই ভয়?
কুয়াশায় সেই শীত? কে সাজায় কে করে সঞ্চয়
আজ আর! জীবন তবুও যেন হয়েছে প্রগাঢ়!

নতুন সৌন্দর্য তল দেখিয়াছি—সকল অতীত
ঝেড়ে ফেলে—নতুন বসন্ত এক এসেছে জীবনে ;
শালিখেরা কাঁপিতেছে মাঠে মাঠে—সেইখানে শীত,
শীত শুধু তবুও আমার বুকে হৃদয়ের বনে
কখন অঘ্রাণ রাত শেষ হ'ল—পৌষ গেল চ'লে
যাহারে পাইনি রোমে বেবিলনে, সে এসেছে ব'লে।

তেরজা-রিমা মিলপদ্ধতিতে রচিত একটি সনেট :

শ কু ন

মাঠ থেকে মাঠে মাঠে সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে ; মানুষ দেখেছে হাট ঘাটে বস্তি, নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের ; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশ

অনেক আকাশ যেন,—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে ; যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিকহস্তিগণ
প'ড়ে গেছে ;—পড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের 'পর

এইসব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু ;—আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে,—পাথরের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে ;
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে,—বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই ; একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায় ;—কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চলে যায় যেন কোন মৃত্যুর ওপারে ;

যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ন লেগুন
কেঁদে ওঠে ... চেয়ে দেখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেইসব হূন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-সনেটবন্ধে জীবনানন্দের আত্মচারিত্র সর্বাধিক স্বাক্ষরিত, সেটি হচ্ছে মাত্রাবিতরণের স্বাধীনতা। পঙ্‌ক্তিস্বাধীন অথচ অষ্টক-ষটকে পূর্ণাঙ্গ একটি সনেট উদাহৃত হল :

পৃ থি বী র প থে আ মি

পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন বাস ক'রে হৃদয়ের নরম কাতর
অনেক নিভৃত কথা জানিয়াছি ; পৃথিবীতে আমি বহুদিন
কাটায়েছি ; বনে বনে ডালপাড়া উড়িতেছে যেন পরী জিন্
কথা কয় ; ধূসর সন্ধ্যায় আমি ইহাদের শরীরের পর
খইয়ের ধানের মতো দেখিয়াছি ঝরে ঝর্ ঝর্
দু'-ফোঁটা মাঘের বৃষ্টি,—শাদা ধুলো জলে ভিজে হয়েছে মলিন,
ম্লান গন্ধ মাঠে ক্ষেতে ... গুবরে পোকার তুচ্ছ বুদ থেকে ক্ষীণ
অস্পষ্ট করাণ শব্দ ডুবিতেছে অন্ধকারে নদীর ভিতর ;

এই সব দেখিয়াছি ; দেখিয়াছি নদীটিরে—মজিতেছে ঢালু অন্ধকারে ;
সাপমাসি উড়ে যায় ; দাঁড়কাক অশ্বত্থের নীড়ের ভিতর
পাখনার শব্দ করে অবিরাম ; কুয়াশায় একাকী মাঠের ঐ ধারে
কে যেন দাঁড়ায়ে আছে ; আরো দূরে দু'একটা স্তব্ধ খোড়ো ঘর
প'ড়ে আছে ; খাগড়ার বনে ব্যাঙ ডাকে কেন—থাকিতে কি পারে ;
(কাকের তরুণ ডিম পিছলায়ে পড়ে যায় শ্যাওড়ার ঝাড়ে।)

২৬, ২২, ২০, ১৮—এরকম মুক্তক অক্ষরবৃত্ত তথা অসমপঙ্‌ক্তিক সনেটবন্ধ লিখে জীবনানন্দ বাংলা সনেটের একটি বন্ধ দরোজা খুলে দিলেন। বাংলা সনেটের প্রবর্তয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরে এ এক আধুনিক-আশ্চর্য পরীক্ষা। জীবনানন্দের সমকালীন দুজন শ্রেষ্ঠ সনেটশিল্পী—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র সঙ্গে এর সম্পর্ক মেরু-দূর। এই ধরনের সনেট রচনার সাহসেই বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন *যে-আঁধার আলোর অধিক* কবিতাগ্রন্থটি।

৪. মিল-অমিলের খেলা

তিরিশের কবিরাই কবিতার মিল সম্পর্কে পুনর্জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন। পুনর্জাগ্রত এই অর্থে বলছি যে, আধুনিক বাংলা কবিতার জনয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত-ই প্রথমবারের মতো বাংলা কবিতায় মিল বর্জন করে কবিতাকে নবীভূত করেছিলেন। আবার, রবীন্দ্রনাথ নতুন যা যুক্ত করলেন, তা হচ্ছে মাইকেল-পূর্ব বাংলা কবিতায় দুই-দাড়ি-নির্ভর দুই-অন্তমিল-নির্ভর মিলের স্থানে বহুবিচিত্র মিলের কারিকুরি। কিন্তু তারপরই বাংলা কবিতার কয়েক দশক কেটে গেল রবীন্দ্র প্রভাবে। সব ক্ষেত্রের মতো কবিতার মিলের ক্ষেত্রেও। যতোদিন-না তিরিশের সুচেতন কবিতা আবির্ভূত হলেন। এবং কবিতায় মিলের ক্ষেত্রেও আনলেন একটি বিপ্লব। এঁদের এই মিল-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'যযাতি' (সংবর্ত) কবিতার কয়েককটি পঙ্‌ক্তিতে :

এমনকি উপস্থিত হানি
সম্ভবত অবাস্তব সুললিত সে-পদ্যের মতো,
যাতে রেণু, বেণু, কদাচ ধেনুও, মিলে, ক্রমাগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে ;
এবং অলীক ভেবে, উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনাকে
যখন করেছি ত্যাগ, সেকালে স্বকপোলকল্পিত
সর্বনাশে হাহুতাশ অবৈধ ও সাফল্যবর্জিত॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অগ্রজ রবি-প্রভাবিত কবিবৃন্দ রেণু-বেণু-ধেনু ইত্যাদি মিল মিলিয়ে অলীক স্বপ্ন রচনা করতেন, আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখতেন— সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবিবৃন্দ এই অভাব মেটানোর চেষ্টা করলেন শুধু কবিতার বিষয়ে নয়—আঙ্গিকেও। *সংবর্ত* কবিতাগ্রন্থেরই ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সেই যুগান্তকারী ঘোষণা করেছিলেন, '...আমার কাব্যজিজ্ঞাসার আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য।' কবিতার এই আধারেরই একটি, মিল। তিরিশের কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাশ এই বিষয়ের সবচেয়ে ওস্তাদ কারিগর। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অপ্রত্যাশিত মিলের রাজা।

মিল প্রসঙ্গে সুধীন্দ্র দত্তের অন্তত তিনটি কবিতার কথা বলব : *সংবর্ত* কবিতাগ্রন্থের 'যযাতি' আর *দশমী* কবিতাগ্রন্থের 'উপস্থাপন' ও 'প্রত্যুত্তর'। 'যযাতি' কবিতার পাঁচটি অংশের মিলপদ্ধতি এরকম : (এক) অন্তর্মিল ; (দুই) অন্তমিল ; (তিন) অমিল ; (চার) অন্তমিল ; (পাঁচ) সান্তর অন্তমিল। সারা বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিম এই কবিতা। 'যযাতি' কবিতার প্রথমাংশের অন্তর্মিল বা লুকোনো মধ্যমিলই পুনর্বার কবি প্রয়োগ করেছেন 'উপস্থাপন' আর 'প্রত্যুত্তর' কবিতায়। 'যযাতি' আর 'উপস্থাপন' কবিতার বহিরঙ্গ ১৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত— আবার মিলের দিক থেকে একে মুক্তক অক্ষরবৃত্তে বদলে নেওয়া যায়।

মিলের দিক থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি বিষ্ণু দে আর জীবনানন্দ দাশ। বিষ্ণু দে-কে মাঝে মাঝে মনে হয় সুধীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দের মধ্যবর্তী এক যোজকের মতো। সুধীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ধ্রুপদী চরিত্রের—জীবনে একটিও গদ্যকবিতা লেখেননি, সমকালীন কবিদের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম (জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার, মনীশ ঘটক, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত, হেমচন্দ্র বাগচী প্রমুখ সকলেই গদ্যকবিতা লিখেছেন।) বিষ্ণু দে-র মধ্যে ক্লাসিকতা-রোমান্টিকতার দ্বন্দ্ব চিরকাল চলেছে। গদ্যকবিতা তিনি সামান্যই লিখেছেন, শেষ জীবনের গদ্যাত্মক কবিতাগুলি ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না, তাঁর বিখ্যাত গদ্যকবিতা 'টপ্পা-টুংরি' সমর সেনকে মনে পড়িয়ে দ্যায়। আমার বিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো বিষ্ণু দে-রও গদ্যকবিতায় আস্থা ছিল না ; বরং বিষ্ণু দে-র কবিতা সব সময় বিস্ময়কর-রকম সাংগীতিক। ধ্রুপদ স্বভাবের জন্যেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে শুধু সমসাময়িককালের নয়—আবহমান বাংলা কবিতার পরিপ্রেক্ষিতেই দুই শ্রেষ্ঠ সনেটশিল্পী। জীবনানন্দ সনেট ও সনেটবন্ধ ও সনেটসিকোয়েন্স লিখেছেন অনেক ; কিন্তু সনেট-রচয়িতা হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠদের সমপর্যায়ভুক্ত নন। *রূপসী বাংলা* কবিতা হিসেবে অসাধারণ ; কিন্তু সনেট-কলায় দুর্বল। 'জন্ম-রোমান্টিক' রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ সফল সনেটশিল্পী নন ; 'জন্ম-রোমান্টিক' নজরুল সনেট লেখার চেষ্টাই করেননি আদৌ। বিষ্ণু দে-র কথা বলছিলাম। শেষ-পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র রোমান্টিক সত্তা তাঁর ধ্রুপদী সত্তাকে ছাপিয়ে গেছে। জীবনানন্দ আর বিষ্ণু দে—দুজনই অসম্ভব আবেগে প্লবমান শিল্পী। বিষ্ণু দে-র ক্লাসিকতা-রোমান্টিকতার দ্বৈরথ আর জীবনানন্দের জিজীবিষা-মৃত্যুইচ্ছার দ্বৈরথ এঁদের কবিতাকে সারাজীবন রেখেছে অবিশ্রাম টানাপোড়েনের মধ্যে। সেই টানাপোড়েনের ছায়া এঁদের মিলের প্রয়োগেও ছায়া সম্পাত করে আছে। দুজনারই এমন অজস্র কবিতা আছে (যা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পূর্ণ প্রতীপ), যেখানে মিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী, কোনো নিয়মিত বন্ধন স্বীকার করেনি। দুজনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা থেকে দুটি উদাহরণ পেশ করব। প্রথমে বিষ্ণু দে-র *চোরাবালি* গ্রন্থর্ভুক্ত 'ওফেলিয়া' কবিতা থেকে একাংশ :

নিয়ে এলে হাতে ঐন্দ্রজালিক মায়া,
শ্যামল ঘুমের কোমল স্বপ্নে বোনা।
জেগে দেখি মোর পৃথিবীও গেছে উড়ে।

ক্রন্দসী বুঝি তোমাকেই ঘিরে ছড়ালো ধারা !
কবে হ্রদ ভেঙে আবর্ত হবে মন্দাকিনী ?
সে প্রপাতে হোক আমার অপসুদীক্ষা সারা।

মরণে দোঁহে করিনি জয়, জীবনে বাহুডোরে
অতনুরতি বাঁধিনি আজো মোরা।
বিদায়রবি-রক্তালোকে, শিশির-সিত ভোরে
অনির্বাণ তবুও পথে ঘোরা।

দেবযানী ! সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে
শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে পাকে—এই সাধনা আমার।

এবার উদ্ধৃত করছি জীবনানন্দের *মহাপৃথিবী* গ্রন্থর্ভুক্ত 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা থেকে কয়েকটি স্তবক :

তবুও তো প্যাঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায় অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অধিকার করে আছে ইহাদের মন ;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা ;
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা এই জেনে।

বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাশ—দুজনের উদ্ধৃত কবিতাতেই দেখছি আমরা মিল-বিন্যাসের এলোমেলোমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কবিতার মিলবিন্যাসের এই বিস্রস্ততা চিরকালীন। তাঁর মিল বিন্যাসের কেন্দ্রচারিত্রই এটি। জীবনানন্দের সনেট গাঢ়বন্ধ নয় প্রায় সময়েই ; কিন্তু মিলবিন্যাস তিনি যথার্থই চেয়েছেন। নিয়মিত মিলবিন্যাসে অজস্র কবিতাও লিখেছেন। ৩-পঙ্‌ক্তির মিলান্ত কবিতাও লিখেছেন একাধিক। কিন্তু তাঁর কবিচারিত্রে যেমন আলো-অন্ধকার ভালোবাসা-ঘৃণার মিশেল, তেম্নি তাঁর মিলে সম্মিতি অনেকসময় অনুপস্থিত। তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতায়ও ('দুদিকে ছড়িয়ে আছে') আমরা দেখব এই স্বাধীন মিলবিন্যাস। এই স্বেচ্ছাচারী মিলবিন্যাসের মধ্যে তাঁর কল্পনার নির্মুক্তি ঘটেছে, আবেগের প্রস্রবণ অবারিত হয়েছে।

তাঁর মিলের আরেকটি বিশিষ্টতা হচ্ছে খুব সাধারণ প্রচলিত সাধারণ মিল তিনি প্রয়োগ করেন। বিস্ময়কর মিল তাঁর খুব অল্পই আছে। অতি সাধারণ কবি বিনয় মজুমদার 'বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থে মিল' ('কবিতীর্থ', মাঘ ১৪০৪) নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে : ঐ বইটির নয়টি গদ্যকবিতা বাদে বাকি কুড়িটি কবিতায় একেকবারে সাধারণ মিল ব্যবহার করা হয়েছে। দু-একটি কবিতার মিল উল্লেখ করি এখানে।—বিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতার তিনটি স্তবকের মিল এরকম :

প্রথম স্তবক : পথে/সাগরে/জগতে/নগরে/সফেন/সেন।
দ্বিতীয় স্তবক : নিশা/'পর/দিশা/ভিতর/ছিলেন/সেন।
তৃতীয় স্তবক : মতন/চিল/আয়োজন/ঝিলমিল/লেনদেন/সেন।

'তুমি' কবিতার তিনটি স্তবকের মিলবিন্যাস :

প্রথম স্তবক : আকাশ/ঘাস/ঘুমে/তুমি।
দ্বিতীয় স্তবক : পারে/আঁধারে/বনে/উদ্ভাবনে।
তৃতীয় স্তবক : আকাশে/অনায়াসে/উড়ে দূরে।

'অঘ্রান প্রান্তরে' কবিতার মিলবিন্যাস এরকম :

'পরে/ভিতরে ; বনে/মনে ; পাতার/অন্ধকার ; জগতে/পথে ; বাতাসে/আসে ; পাখায়/গাথায় ; নীরবতা/কথা ; ঝাউফল/অতল ; ভিতরে/নড়েচড়ে ; নাশ/আকাশ ; কণা/ধারণা ; বেছে/গেছে ; সব/নীরব।

জীবনানন্দের কবিতার মিল প্রায়ই এরকম সাদামাটা চেনা প্রাত্যহিক শব্দে। এর মধ্যে দুএকটি মিল একটু আলাদা চোখে পড়ার মতো। যেমন : 'শঙ্খমালা' কবিতায় 'হিম/রক্তিম', 'সুদর্শনা' কবিতায় 'করোনি তো/মৃত' ; 'তুমি' কবিতায় 'তুমি/ঘুমে' কিংবা 'বনে/উদ্ভাবনে' ; 'সবিতা' কবিতায় 'অবসান/খৃস্টান' ; 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায় 'নিধান/ম্লান' ইত্যাদি। সবগুলি উদাহরণই দেওয়া হল *বনলতা সেন* থেকে।

মিলের প্রসঙ্গে নির্মিল কবিতা অর্থাৎ গদ্যকবিতার কথাও এসে যায়। বিশের-তিরিশের-চল্লিশের দশকে ছিল গদ্যকবিতার ভরা জোয়ার। জীবনানন্দও ঐ 'জোয়ারে স্নাত'। ছন্দোবদ্ধ এবং মিলান্ত কবিতাই জীবনানন্দ লিখেছেন বেশি। কিন্তু গদ্যকবিতাও লিখেছেন। আত্মচারিত্রিক গদ্যকবিতা। অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ গদ্যকবিতার কারুশিল্পীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনানন্দের ঐ মিলহীন কবিতাবলি।

৫. শেষ কথা

কবিতার রূপকল্পে জীবনানন্দ কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেননি। তাঁর কবিতার বিষয়ের শান্ততা চারিয়ে গেছে তাঁর রূপকল্পেও। অতিসাধারণ অতিপ্রত্যাশিত মিল ; শিথিলায়ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সনেট ; অতিপ্রচলিত স্তবকবন্ধ—এসবের মধ্যেই মিলবিন্যাসের প্রথা ভেঙে, সনেটের প্রতি পঙ্‌ক্তির অসমান সামঞ্জস্য ছিঁড়ে বেরিয়ে, স্তবকবন্ধের কিছু নতুনত্বের মধ্য দিয়েই তিনি একটি আশ্চর্য বিস্ময়কর কবিতাপৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা কাজী নজরুল ইসলামের মতো দ্রোহী তিনি নন ; তিনি বরং তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের শব্দহীন বিপ্লবের সঙ্গেই যদিও রবীন্দ্রনাথের রূপকল্পের বৈচিত্র্যের সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না তাঁর। বিষয়ে যেমন, আঙ্গিকের অন্য সব ক্ষেত্রের মতোই কবিতার কয়েকটি রূপকল্পেই ফিরে ফিরে এসেছেন। তাঁর কবিতায় শব্দ-বাক্য-পঙ্‌ক্তি যেমন জলের মতো ঘুরে ঘুরে যেতে থাকে, তেম্নি তাঁর রূপকল্পগুলিও ঘুরে-ফিরে ব্যবহৃত হতে থাকে। রূপকল্প যে কবিতার বহিরঙ্গ নয়, আত্মারই আশবাব—জীবনানন্দের কবিতার রূপকল্প তা আর-একবার প্রমাণ করে। খুব সামান্যের মধ্যেই জীবনানন্দ যে-অনিঃশেষ রহস্য সৃষ্টি করেন, তার থেকে উৎসারিত বিষয়—বেদনা—আনন্দ কিছুতেই ফুরোয় না আমাদের, আধুনিক বাঙালি পাঠকের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক গভীর দুঃখী মনস্বী কবি

রবিউল হুসাইন

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক,
চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,

কিংবা, আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে,

অথবা, আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে,

বা, ক্লান্তির পরে ঘুম, মৃত্যুর মতন শান্তি চাই,

নতুবা, তিনি কেন ট্রামের ধাক্কায়, অনেকে বলেন, স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নেবেন।

বাংলা কবিতার অট্টালিকা যদি রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন বলা যায়, তাহলে জীবনানন্দ সেই কবিতার আত্মা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠা দুঃখী, অসহায়, দীর্ণ, ক্লান্ত মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি এবং তার বোধানুভবের নির্যাস। কল্পনা এবং স্বপ্নের সঙ্গে সহবাস করে শূন্যতার অতল দুঃখে নিমজ্জিত হয়েছেন। মানুষের চরম বোধানুসঙ্গ, অনুভবের বিচিত্র আধুনিক পরিচিহ্নিতা তার পংক্তিতে অন্য এক মাত্রায় রূপান্তরিত হয়ে হীরকদ্যুতি ছড়িয়েছে। বাংলা কবিতার চেহারা, শরীরে বাড়-বাড়ন্ত হয়েই ছিল, জীবনানন্দ তাতে পরিপক্কতা, পরিশুদ্ধতা ও বুদ্ধিশীলতা এনে তাকে জ্ঞানী ও মননশীল করে তোলার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। বুদ্ধিদীপ্ত ও ক্ষুরধার কিন্তু বিষণ্ন এক গভীর শিল্পবোধের ঠিকানার খোঁজে সারাটি জীবন হন্যে হয়ে ফিরেছেন। এখন পর্যন্ত বাংলা কবিতার সবচেয়ে গভীর দুঃখী মনস্বী কবি হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন। তার কবিতায় আছে রহস্যের আদি নিবাস। একজন মানুষ তার কবিতার ভেতরে একটু প্রবেশ করলে আর তাকে টেনে রাখা যায় না। কী এক অদৃশ্য সম্মোহনী শক্তি তার কবিতার শব্দচয়ন এবং পংক্তিমালার মধ্য দিয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে অন্য এক পৃথক ও অদৃষ্টপূর্ব জগতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিমগ্ন হন। সেই মোহে থাকে অপার বিস্ময় বিষণ্ণঘন এক অদ্ভুত এবং নতুন অভাবিত বেদনাময় শৃষ্টিশীলতার প্রসবাসুখ ও আনন্দ যা মনের ঘুলঘুলিতে আগে কখনো দেখা দেয়নি। রূপ-রস-গন্ধ, অনুভূতি এবং বোধ চিত্রকলার বিমূর্ত অভিব্যক্তির মতো জীবনানন্দের এই কবিতা নির্মাণ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। কবির কবিতা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও তার নির্দেশিত পথে নিজের মতো করে কবিতা নির্মাণে ব্রতী হয়ে পড়েন নিজের অজান্তে। পাঠক মননশীল হয়ে ওঠেন। শিক্ষিত করে তোলেন নিজেকে। নিজেকে উপকৃত করে তোলেন এবং অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে অজানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিহরণ জাগে এক ধরনের মনো–আবিষ্কারের কৃতিত্বে। কবি হয়ে যান মনোলোকের আলো–আঁধারি জগতের এক অদৃশ্য ট্যুরিস্ট গাইড।

আলো–অন্ধকারে যাই মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোনো এক বোধ কাজ করে।
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়,
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;

জীবনানন্দ মাটিতে বিচরণ করেছেন সবসময়, কিন্তু দৃষ্টি জিরাফের মতো অনেক উঁচু থেকে দিগন্তের ওপারে বিস্তৃত করেছেন। পার্থিব জগত থেকে দুদণ্ড শান্তির জন্যে অপার্থিবতার মধ্যে কালাতিপাত করেছেন। সেই জগত অন্ধকারময় আলো–আঁধারিতে ভরা আবার গোধূলীর ম্লান আলোয় বিমর্ষ কী হর্ষোৎফুল্ল, একথা নিশ্চিত করে বলেননি, বরং পাঠকের নিজস্ব বোধের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন। তখন পাঠকের দায়িত্ব তিনি তার মতো করে কবির সেই বোধে নিমজ্জিত হবেন কী হবেন না। বহুমাত্রিকতা এবং গাঢ় ও সূক্ষ্ম অনুভূতির বহু স্তরের সন্ধান জীবনানন্দের আগে কোনো কবি বাংলা কবিতায় এমনভাবে দিতে পারেননি। আধুনিক যন্ত্রণাময় বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর নাগরিক–বোধের জাত–কুশলী কবি নষ্ট সময়ের রূপকার অন্ধকারকে ‘সুকেশী’ বলে ভেবেছেন এবং অন্ধকারে একাকী নির্জনে চলতে চলতে—

আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে ;
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা একা কথা কয়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বসন্ত ও বর্ষায় নিমগ্ন, জীবনানন্দ শুধু হেমন্তে। কার্তিক আর অগ্রহায়ণ এই দুটি মাস কবির জীবনের আত্ম–আবিষ্কারে সাহায্য করেছে। তিনি এই বাংলাদেশের প্রাণকে খুঁজে পেয়েছিলেন হেমন্তে এবং প্রিয় বাউল ঋতু গায়ে মেখেই পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছিলেন। হেমন্ত শূন্যতা, অভাব আর দীর্ণতার প্রতীক। এক বাউল, উলুঝুলু মানুষ যিনি নির্জন–নিঃসঙ্গ তার জন্যেই সৃষ্ট এই ঋতুকাল। সারাটা জীবন এই ঋতু এবং ছেঁড়া–খোঁড়া সময়কে ধরে রেখেছেন। অন্য ঋতুতে অতটা দিকভ্রষ্ট না হয়ে তিনি পরম নির্ভরে হেমন্তকে নিয়ে চলেছেন। জীবনের অন্তর্লীন অর্থ হেমন্তকালেই প্রকৃতির মধ্যে ফুটে ওঠে। এই নিঃস্ব–বিধুর মনুষ্য জীবনের বিষণ্ন প্রতিচ্ছবি কবি প্রকৃতির অন্তর্গত হেমন্তচর্চার মধ্য দিয়ে উত্তুঙ্গে নিয়ে গেছেন। হেমন্ত শুধু বিষণ্ন–নিঃস্ব ভিখিরি নয়, বরং সে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে পরমার্থে যে পরের তরে উৎসর্গীকৃত স্থির সংকল্পে—

হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে ; এরকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে।
সময়ের কুয়াশায় তাতে কী হয়েছে, হেমন্ত খুব স্থির
সপ্রতিভ ব্যাপ্ত হিরণ গভীর সময় বলে
ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপাতের দিনে
উন্নতি প্রেম কাম্য মনে হলে
হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোক ভাবি ;

এ যেন হেমন্তকে নিয়ে কবিতা নয় একটি প্রবন্ধ লেখা এবং তার চুম্বক কথামালার নির্যাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার মধ্য দিয়ে সবকিছু এসে যায়, কবিতা সর্বগ্রাসী। কিন্তু স্রেফ প্রবন্ধের ভাষায় কবিতা। প্রবন্ধ জীবনানন্দের আগে কেউ এত কবিত্বময় করে সার্থকভাবে লেখেননি এবং সবচেয়ে উল্লেখ্য শেষ পর্যন্ত তা কবিতায় রয়ে গেছে। বিষ্ণু দে শব্দের পাথর নিয়ে কবিতার দেয়াল এবং ভবন নির্মাণ করেছেন একজন স্থপতি বা ভাস্করের তন্নিষ্ঠায় এবং তা কবিতা, প্রবন্ধ থেকে দূরে বলে মনে হয়, কিন্তু জীবনানন্দ প্রবন্ধকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন সার্থকভাবে। জীবনের জটিলতাময় কঠিন বাস্তবতা প্রবন্ধের উপকরণ, পরে এগুলোকে মানুষের বোধ এবং মনোলোকের অনুভূতিতে ডুবিয়ে তিনি কবিতার বারান্দায় নিয়ে এসেছেন।

জীবনানন্দের নারী সান্নিধ্য উজ্জ্বল নয়, যেমন রবীন্দ্রনাথের বেলায় ছিল। আসলে নারীরা প্রকৃতির নিয়মে সব সময় পুরুষের,সুখী বা দুঃখী যিনিই হোন না কেন, শারীরিক সৌন্দর্য, বিত্ত-বৈভব, সম্মান-খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রতি দুর্বল ও নির্ভরশীলতা-প্রত্যাশী, বিশেষ করে এই দরিদ্র ও শিক্ষাহীন দেশে প্রেমের ব্যবসায়িক মূল্য এবং তুলনামূলক স্বার্থ কাজ করে। সেইভাবে বলা যায় প্রেম যুগে যুগে সবসময় স্বার্থ-সন্ধানী যেখানে মনের ঋদ্ধতা খুব স্বাভাবিক নিয়মে কোনো কাজে আসে না। এই জটিল জগতের আধুনিককালে প্রেম তাই ভালোবাসা নয় বরং একটি ভালো বাসা বা গৃহের প্রতি ও তার মালিকের বা বংশধরদের প্রতি দুর্বল মানসিক বোধসম্পন্নতায় জারিত এবং এখন পর্যন্ত প্রেমের একচ্ছত্র অধিকারী হচ্ছে নারী। তাদের কাছেই প্রেম থাকে, বুঝে-সুঝে যে পুরুষকে দিয়ে তার কার্যসিদ্ধি হয় তাকেই তারা প্রেম দিয়ে থাকে। এতে দোষের কিছু নেই, এটাই প্রকৃতির বা সময়ের নিয়ম। পুরুষ শুধু আকর্ষিত বা আকৃষ্ট হয় এবং নারীরা আকর্ষণ করে— এভাবেই চলছে পৃথিবী। এখন জীবনানন্দের মতো সেই সময়ে নির্জন, নিঃসঙ্গ, খ্যাতিহীন, শারীরিক সৌন্দর্যহীন একটি মানুষ খুব স্বাভাবিকভাবেই কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সাড়া মেলেনি। এমন কি নিজের স্ত্রী পর্যন্তও তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এতে স্ত্রীকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না, আসলে এসব মানুষের বোধকরি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উর্ধ্বে যাওয়াই উত্তম। প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক বিবাহের প্রচলন আছে বলেই এই ধরনের মানুষদের এদেশে বিয়ে হয়, তা না হলে এই বিয়ের ভার এবং সুযোগ ও সামাজিক ক্ষমতা শুধু নারীদের প্রতি যদি ন্যস্ত হতো এবং তাই হওয়া উচিত, তাহলে জীবনানন্দ কেন, আমাদের অনেকেরই বিয়ে হওয়া খুব মুস্কিল হতো। জীবনানন্দ তাই নারীদের সুন্দর জন্তু বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর প্রেমের বা নারী-বিষয়ক কবিতা সাধারণ প্রেমের উর্ধ্বে এমন এক প্রেমহীন স্তরে গিয়ে মিশেছে যে সেখানে নারী সাধারণ নারী নয়, নারী শুধু তাঁর কবিতার বাহন, অনুষঙ্গ।

> সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন,
> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

অথবা,

> একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে
> অনেক কবিতা লিখে চলে গেলো যুবকের দল,
> পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে,
> শুনিল আর্ধেক কথা,—এইসব বধির নিশ্চল।

দূর থেকে তিনি নারীদের অবলোকন করেছেন গভীরভাবে, নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। নারীরাও কখনো তাঁর প্রতি গভীর মমতায় এগিয়ে আসেননি। বরং এখন একজন খাঁটি এবং দুঃখী কবির দুঃখময় জীবনের শেষে তাঁর লেখা কবিতার পংক্তি নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতশত প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের প্রেমে লক্ষ্য, স্থিরতা এবং গভীরতা আনতে জীবনের আগামী পথে প্রজ্জ্বলিত মশালের মতো ব্যবহার করে চলেছেন এবং চলবেন। জীবদ্দশায় তাই সব বড় কবিই সাধারণত অজ্ঞাত, অবহেলিত ও মূল্যায়নহীন হয়ে থাকেন সাহিত্যের মতো রাজনীতিতেও, যেমন অনেক দেশের জাতির প্রতিষ্ঠাতাগণকে নিয়তি আততায়ীর হাতে নিহত করাতে ভালোবাসে। এ এক অদ্ভুত নিয়ম, মহৎ ও বৃহৎ-হওয়া মানুষের জীবন কেন যে এরকম হয়।

নির্জন-প্রিয় এই কবি-মানুষটি মানুষকে এড়িয়ে চলতেন—সঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে যোগদান, তাৎক্ষণিক প্রচার, প্রশংসা, জন্মদিন পালন ইত্যাদি পর্ব, যেটাতে অমরা এখন নির্লজ্জ প্রয়াসে আগাপাশতলা বাস্তবে-স্বপ্নে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে লিপ্ত হয়ে আছি। অথচ এই মানুষের ক্ষত-বিক্ষত মনটিকে দক্ষ একজন সৃষ্টিশীল শল্য-চিকিৎসকের মতো কাটা-ছেঁড়া করে তার রহস্য উন্মোচনে তিনি সারাটি জীবন অন্ধকার পথে হেমন্তের ভেতরে আমগ্ন থেকেছেন। তার তুলনা নেই, কবি তুলনাহীন মনে হয়।

> এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো
> এইখানে
> পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারের দেশে
> এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে,
> তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই; তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই।

জীবনানন্দের যে কোনো একটি কবিতা নেড়েচেড়ে সমুদ্র-স্বাদ নেয়া যায়। মনে হয় সারাজীবন একটি কবিতাই লিখে চলেছিলেন। কবিতা ছাড়া গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সমালোচনা, কিছু ইংরেজিতে লেখা রচনা, বহু কিছু নির্জনে-নিঃশব্দে প্রাচীনকালের গুহাবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো নিভৃতে সবার অজান্তে আপন মনে চর্চা করে গেছেন কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করে। লেখা নিয়ে প্রকাশের জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন, কেউ পাত্তা দেয়নি। তাতেও তিনি হতাশ হননি। বরং সেই বুক-ভাঙা বেদনাগুলো কবিতার পংক্তির মধ্যে ঢুকিয়ে সেগুলোকে পরিপুষ্ট করে তুলে সেই হতাশার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গেছেন। এই সময়ের তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির কালে কবিতার জন্যে জীবনানন্দের জীবন-নিংড়ানো নিষ্ঠা কারো পক্ষে চিন্তা করা অসম্ভব। কতো গভীরভাবে তিনি নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন এসবে এই কথা প্রমাণিত হয়। যেকোনো কবিতার মধ্যে তার জীবন-ঘনিষ্ঠ আর্তি ও বেদনা, রহস্যময় অজানা জগত এবং গভীর-অতল বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন এই কবিতাটি ! কবিতাটির নাম 'জীবনের মানে ভালো' একটি অপ্রকাশিত কবিতা। 'এখানে নিবিড় ঘাসে শুয়ে আছি'—প্রথম লাইন, শেষ লাইন,—'আরো ভালো জীবন ও মৃত্যুর মানে'—মোট দশ লাইনের কবিতা। কবি শুয়ে আছেন, পাশে বহতা নদী, নদীতে চলমান স্টিমার, খুব দূরে বাবলা গাছের ঘন সারি, বিকেল বেলা। সেই ভোরে ঝাউবনে কবির মনে হয়েছিলো, মন মৃত্যু-অমৃত্যুর সীমার বাইরে এক অফুরন্ত সূর্যের ঋতুর লাল-নীল আলো জ্বেলে একটি স্টিমার বহুদূরে ক্রমাগত ঝাপ্‌সা হয়ে হয়ে চলেছে, কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কোনো যাত্রী কি সঙ্গে আছে তা কে জানে। এর ভেতর থেকে শান্ত-সিগ্ধতার এক নরম ছবি সন্ধ্যার আঁধারে ভেসে ওঠে। আকাশে ছ'সাতটি নক্ষত্রের দিকে কুয়াশায় মুছে যায় সে-দৃশ্য। মাদার গাছের ডালে বসে শঙ্খচিল টের পায় শিশিরের ঘ্রাণে। তখন কবির মনে হয় জীবনের অর্থ ভালো এবং তারচেয়েও ভালো জীবন ও মৃত্যুর মানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি এইভাবে সাধারণ একটি সন্ধ্যাকালের দৃশ্য চিত্ররূপময়ভাবে বর্ণনা করতে করতে একটি অপার্থিব জায়গায় নিয়ে গেছেন। জীবন, মৃত্যু, কুয়াশা, সন্ধ্যাকাশ, ঝাপ্‌সা চলমান স্টিমার —সব একটি রহস্যময় ভুবনের প্রতিভূ। কবি সেখানে মাদারের ডালে বসা শঙ্খচিলকে বসিয়েছেন কালের সাক্ষী হিসেবে। নদীর মধ্যে স্টিমার কোথায় যাচ্ছে তাও তিনি জানেন না এবং জানেন না স্টিমারটিতে আদৌ কোনো যাত্রী আছে কি না, থাকলে তারা কারা। মনুষ্যহীন স্টিমারটি সময়ের নদী বেয়ে অজানার দিকে চলে যাচ্ছে—এইসব প্রতীকী চিত্রাবলী কবিতাটিকে রহস্যে ভরপুর করে তুলেছে। এর মূলে আছে মানুষের মন, যে-মন সবসময় অফুরন্ত সূর্যের ঋতুর অর্থাৎ চির-উজ্জ্বল, অসীম, সীমার বাইরের এক বাসিন্দা। জাগতিক দৃশ্য বর্ণনা করতে করতে সবাইকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছেছেন এক অপার্থিব জগতে, মন যেখানে সূর্যকরোজ্জ্বলে দেদীপ্যমান, সর্বংসহা, কোনো কিছুর অধীনতা বা প্রভাব-প্রতিপত্তি স্বীকার করে না। সে স্বয়ম্ভূ, সর্বভূতেষু, সব কালেই বিরাজ করে, তার সম্বন্ধে কালের বিভাজন অর্থাৎ বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যত খাটে না, সে চিরস্থিতি নিয়ে মানুষের মনের ভেতর বিরাজ করছে। এবং এইজন্যে কবি বলেছেন, 'জীবনের মানে সবসময় ভালো'—একটি আশাবাদী মনের পরিচয়ে কবি ভাস্বর। আর এই সঙ্গে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'আরো ভালো জীবন ও মৃত্যুর মানে'। এই জীবনকে মৃত্যুও থামাতে পারে না যদিও সবার অদৃষ্টে মৃত্যুর করাল ছায়া পতিত হবে কিন্তু জীবনকে সে পরাভূত করতে পারবে না।

জীবনানন্দ যেন সেই মাদার গাছে বসা শঙ্খচিল, যিনি শিশিরের ঘ্রাণে টের পান সন্ধ্যার নরম আঁধার-মাখা ছবি যা দূরের অপসৃয়মান স্টিমারের সূত্র থেকে পাওয়া এবং সেই দৃশ্য মুছে যায় কুয়াশার ওপারে সুদূরের ছ'সাতটি নক্ষত্রের দিকে। কোথায় যেন শূন্যতা, একটি হাহাকার, একটি অভাববোধের সৃষ্টি হয় এই সঙ্গে। এই অভাব বা শূন্যতাবোধকে কবি আমাদের কাছে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন যেন সবকিছু ছাপিয়ে মানুষের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা ভর করে সর্বক্ষেত্রে :

> এখানে নিবিড় ঘাসে শুয়ে আছি—পাশে নদী—নদীতে ষ্টীমার,
> এদিকে বাবলার সারি বহুদূরে চলে গেছে—দূর আরো দূর—
> আজ ভোরে ঝাউবনে মনে হয়েছিল মন মৃত্যু অমৃত্যুর
> সীমার বাইরে এক অফুরন্ত সূর্যের ঋতুর।
> এখন বিকেল বেলা লাল নীল আলো জ্বেলে ঝাপসা ষ্টীমার
> কোথায় দিগন্তে যায়—কোন যাত্রী সঙ্গে আছে তার জানি নাকো ;
> কিন্তু তবু দূর থেকে শান্ত স্নিগ্ধতার
> কেমন নরম ছবি ভেসে ওঠে সন্ধ্যার আঁধারে মুছে যায়, কুয়াশার পারে
> দূর ছ'সাতটি নক্ষত্রের পানে,
> শঙ্খচিল মাদারের ডালে ব'সে টের পায় শিশিরের ঘ্রাণে।
> জীবনের মানে ভালো ; আরো ভালো জীবন ও মৃত্যুর মানে।

জীবনানন্দ তাই একজন মনস্বী কবি, নির্জন-নিঃসঙ্গ ছিলেন ঠিকই কিন্তু কোনো কিছুর প্রতি উদাসীন ছিলেন না বরং জীবনকে অতি গভীর আর নিবিড়ভাবে দেখে গেছেন। কবিতার ভাষায় তাকে নিম্নরূপে প্রতীকায়িত করার চেষ্টা করা যায়, জানি না তিনি কতোটুকু স্পষ্টভাবে শব্দের ভেতর থেকে ফুটে উঠবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসার জীবনানন্দ

মোহাম্মদ রফিক

১

কোনো কোনো কবিতা হয়তো অকারণেই রক্তমাংস চিরে-চিরে হাড় কেটে গেড়ে বসে। হয়তো-বা অকারণে নয়, তবু নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোনো-কিছু বুঝে-ওঠার আগেই কবিতাটি পেয়ে বসে। অনেকটা সেই ভূতে-পাওয়ার মতো, বেসামাল পাঠকের আর রেহাই মেলে না ইহজীবনে। এ-ক্ষেত্রে, বোধ হয় ঢেউয়ের ঘূর্ণিতে টাল খুইয়ে ফেলা বা সামাল দিতে না-পারা নায়ের উপমা অনেক বেশি যুৎসই হতো। সে নিদেন পক্ষে তিরিশ-চল্লিশ বছরের আগের কথা। পাঠক এই অধম পাঠকের সদ্য আবিষ্কৃত কবি জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতার নির্বাচিত সংকলন হাতে এসে পৌঁছেছে সবেমাত্র। যখন ইচ্ছে, যেমন ইচ্ছে, যতো ইচ্ছে, প্রতিটি কবিতার দাড়িকমাস্তবকশব্দশুদ্ধ গিলে ফেলতে চাইছে পাঠক। রয়েসয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে নয়, বলা যেতে পারে, এক লহমায়। সাধে ও বাসনায় যুগপৎ জর্জরিত ও উদ্দীপ্ত অধীর পাঠক ছুটে মরছে পৃষ্ঠা থেকে পৃষ্ঠান্তর। সহসা একটি কবিতায় পৌঁছে থমকে গেল পাঠক। স্তব্ধ এবং বিমূঢ় হয়ে বসে রইল পাঠক। বসে-থাকতে হলো তাকে। নাবালক পাঠক ওই কবিতাটিকে, অন্তত সেই মুহূর্তে কিছুতেই মিলিয়ে নিতে পারছিল না ওই গ্রন্থে সংকলিত অন্যান্য কবিতার সঙ্গে। এমন কি, তার পূর্বতন পাঠ-অভিজ্ঞতাও সাহায্যে এলো না পাঠকের। তখন আর কতটুকুই বা জীবনানন্দ পড়া ছিল সেই নিতান্ত বালকের। এবং এই হিমসিম খাওয়া অবস্থা থেকে দীর্ঘকাল মুক্তি মেলেনি পাঠক-কল্পনার। কাব্যগ্রন্থটি হাতে নিলেই, কবিতাটি যেন আপনা-আপনি নিজকে, মুক্ত করে না দিলেও, মেলে ধরেছে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে। কী করে যেন অমোঘ টান এবং অলৌকিক মনোনিবেশ ভর করে আঙুল পৌঁছে গেছে সেই নির্ধারিত পৃষ্ঠায় যেখানে মুদ্রিত হয়ে আছে কবিতাটি। বুঝি, এই কারণেই অক্টাভিও পাৎস বলতে পারে, কবিতা দাবি করে সেই কবির মৃত্যু যে তাকে সৃষ্টি করল এবং আর এক কবির জন্ম যে সেটিকে পাঠ করছে। এবার কবিতাটির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। মানুষের পরিচয় শুরু হয় প্রথমে তার আচার বা চেহারা দিয়ে এবং তার পরপরই আসে চলে নাম। নাম কী লোকটার? কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে প্রথমেই চলে আসে নাম, অতঃপর মূল্যবান হয়ে ওঠে অবয়ব। কবিতাটির একটি শিরোনাম দেওয়া আছে, হয়তো-বা জন্মদাতাই নামটি সনাক্ত করে গিয়েছে। অন্যান্য অনেক কবিতার শিরোনামের মতোই এই শিরোনামটিও সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন না হলেও সাদামাঠা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কবিতার শিরোনাম অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর। এই কবিতাটির ক্ষেত্রে তেমন কিছু না ঘটলেও নতুন কোনো তাৎপর্য বা বিস্ময় সৃষ্টি হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো কবিতার শিরোনাম কবিতা-পাঠকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতাকে আশ্চর্য আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। এইসব ব্যাপার-স্যাপার দেখেশুনে মনে পড়ে কবির সেই উচ্চারণ, এও বিস্ময় অন্তহীন। কিছুই ঠিক করে বলার নয় বা বলা যায় না বলেই হয়তো কথার টানে কথা বলা হয়ে যায় এবং কখনো কখনো কথার ভারে এবং চাপে প্রকৃত কথা বা কথা-প্রসঙ্গ হারিয়ে যেতে বসে। যে কবিতা-পাঠকের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা শুরু, সে কবিতাটির শিরোনাম অবশ্য 'তোমাকে ভালোবেসে' প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কবিতায় উল্লেখিত তুমিটা আসলে কে? কোনো বিশেষ নারী না যে কোনো নারী! কোনো নারী বা নারী সম্বন্ধীয় কোনো কিছু না হলেও কোনো কিছু যায় আসে না। ভালোবাসায় মোহিত হয়ে ভালোবাসার মতন একটি কবিতাই বটে। আপাতত, এটুকুই যথেষ্ট। পাঠকের অতিরিক্ত কিছু দাবি বা আকাঙ্ক্ষা উচ্চারণের নেই, কস্মিনকালে ছিলও না।

তবু, কালে-কালে পাঠকের সঠিকার্থেই বয়স বাড়ে। তাকেও রেহাই দেয় না কবিতা। পাঠকের দৃষ্টি এসে আটকে যায় 'তোমায় আমি' শিরোনামের অন্য একটি অগ্রন্থিত কবিতায়। এখন হয়তো-বা ওই অগ্রন্থিত শব্দটি লেখা সমীচীন নয়। লেখাটি এখন কবি জীবনানন্দ দাশের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় বা কাব্যসমগ্র'-এ বা 'কাব্যসংগ্রহ'-এ নিজস্ব জায়গা খুঁজে নিয়েছে। দুটি কবিতায়ই একই ধরনের উপমা, উৎপ্রেক্ষা যথা, জল, জলের বিন্দু, পদ্মপাতা, শিশির কিংবা শিশির ঝরার স্বর ব্যবহৃত হয়েছে। দু'টি কবিতা একই সমার্থক ভুবনে বেড়ে ওঠেছে, তাদের বলার কথাও একটিই। 'তোমাকে ভালোবেসে' কবিতার শেষ পঙ্ক্তি 'পদ্মপত্রে জল ফুরিয়ে যায়' যেহেতু জীবনের এইসব অন্তর্গূঢ় খেলা, নিরন্তর চঞ্চলতা ও হারিয়ে যাওয়া কবি বলছে, 'বুঝেছি আমি তোমাকে ভালোবেসে' (দ্র: শেষ পঙ্ক্তি, দ্বিতীয় কবিতা)। বিস্ময়, বিস্ময়ের ঘোর, এবং ঘোরের ঘূর্ণি ও বেসামাল দ্রুততায় টাল সামলাতেই যেন কবিতা দুটি আশ্রয় নিয়েছে স্বরবৃত্তের। জীবনানন্দীয় কাব্যভূমণ্ডলে সত্যিই দুরন্ত ব্যতিক্রমী ঘটনাই বটে। শুধু তাই নয়, যেন ভালোবাসায় ভালোবাসার, এই হারিয়ে-যাওয়া, খুইয়ে-যাওয়া, ভেসে-যাওয়া চিরচঞ্চলতাকে কাব্যিক অবয়বে ধারণ করতে কবি ঘুরে মরেছে একটি জীবন ধরে। 'তোমায়-আমি' শিরোনামের পাঁচ-পাঁচটি রচনা একটি চূড়ান্ত কবিতার অপেক্ষায় কবির দীর্ঘ প্রতীক্ষাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি জীবনানন্দ দাশের বেড়ে-ওঠা, হয়ে-ওঠার আজীবন আমরণ সংগ্রামের ইতিহাসে এটি কোনো স্মারক সংবাদ নয়। একটি কবিতার প্রস্তুতি চলে কবির ভেতরে হয়তো-বা অনন্তকাল। মাঝে-মধ্যে বিস্ফোরণ তো ঘটতে পারে, এবং এমনটা না-ঘটাই অস্বাভাবিক। 'বনলতা সেন' কবিতাটি পাঠকের বহুচেনা। তবে, 'বনলতা সেন'-এর উল্লেখ আছে, বা 'বনলতা সেন'-এর অনুষঙ্গ ঘুরে-ফিরে এসেছে এমন আরও নিদেন পক্ষে দুটি কবিতার সাক্ষাৎ পেয়ে যাবে পাঠক 'কবিতা সমগ্র'-এর পৃষ্ঠা ওলটাতে-ওলটাতে। আরও বহু কবিতারই সম্মুখে হকচকিয়ে থমকে যাবে পাঠক, ভেবে নেবে, একেই বলে কাব্যিক প্রস্তুতি। সে যা-ই হোক, ফিরে আসা যাক মূল প্রসঙ্গে। 'তোমাকে ভালোবেসে' কবিতাটিতে কিন্তু আমাদের বিমুগ্ধ পাঠক আজও খুঁজে পায় পদ্মপাতার ওপর এক কালে কিংবা কাল ছুঁয়ে লেপটে থাকা ফোঁটা ফোঁটা শিশির বিন্দুর মতো প্রসন্নতাকে। সেখানেই বুঝি কবিতাটির জিৎ। এমনটাই পাঠকের অভিজ্ঞতা তুমি, আমি, ভালোবাসা অনুষঙ্গে বা 'তোমায় আমি' শিরোনামে জীবনানন্দ রচিত কবিতা বিষয়ে।

২

পাঠকের মনে পড়ে, সে তখন সবে কলেজের চৌকাঠ ডিঙিয়ে পা রেখেছে অন্তরে। বন্ধু মন্ত্রণা দিল 'ইহাদেরি কানে' কবিতাটি পড়ে দেখ। তখন আমাদের পাঠক ভুগছে বয়সোচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়বৃত্তির নানা রোগে-শোকে, অসুস্থতায়। দৃষ্টির ওপরেও পাড়তে শুরু করেছে কালসিটে। প্রথম পাঠেই কবিতাটি যাকে বলে, নোঙর তুলে দড়িদড়া হালকাছিপালসুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে। একেই বুঝিবা বলে, বয়সের ধর্ম। মাঝগাঙ্গে পৌঁছে গেল নাও, কিন্তু হাওয়া বায়ুহীন রোদ্দুরের গুমোট চেপে রইল বুক। স্রোত হয়তো মিশে ছিল কবিতাটির দেহে, তবে সে বড় মিইয়ে-আসা স্রোত। টেনে-নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার, যাকে বলতে পারা যায়, মুক্তি দেওয়ার মতো টান ছিল না সেখানে। অযাচিত ভার চেপে রইল পাঠকের হাড়-পাজরায়। ঘোর কাটতে হয়তো সময় লাগে। ঘোর তো আর কাল ঘুম নয়। সময় লেগেছে এই পাঠকের ক্ষেত্রেও। কিছু স্মৃতি, কিছু অনুধ্যান, কিছু পাঠ-অভিজ্ঞান সমবেদনার হাত বাড়িয়েছে বিমূঢ়-নিশ্চল পাঠকের প্রতি। যেহেতু প্রতিটি কবিতা পাঠই এক-একটি নববিশ্বজন্মের অভিষেক। তোড়ফোঁড় ছুঁয়ে উঠে আসে জলের পাহাড়। প্রশ্ন রাখে নিজের কাছেই। উত্তর তো নিজেই ধারণ করে আপন অন্তরে। এভাবেই সংশয় বা প্রশ্ন রচনা করে প্রশ্ন বা সংশয় থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম ধাপ। হ্যাঁ, একথা ঠিক, যুবকেরা বিশেষত প্রতিভাবান যুবকেরা সুন্দরীদের নিয়ে কবিতা, কবিতা অর্থে বেদ, জীবনবেদ তো রচনা করতেই পারে, 'একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে', সে সুযোগ, অধিকার বা স্বাধীনতা তো তাদের রয়েছে। হয়তো সে সব কবিতার সবকথা পুরোপুরি সুন্দরীদের কানে না লাগতেও পারে। তারা শুনেও ভান করতে পারে না-শোনার। হয়তো এমন ঘটনা ঘটে-যাওয়ার অগণিত উদাহরণও মিলে যাবে ব্যক্তি জীবনের আনাচ-কানাচ বা ইতিহাসের সদর-অন্দর ঘাটাঘাটি করলে। তাই বলে, সকল সুন্দরী কী মূর্খ? নিশ্চয় নয়। তবে তাদেরকে মূর্খ না বললেও, বিচার-বুদ্ধিহীন বলার অন্য একটা কারণ থাকতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, দেখা যায়, সুন্দরীরা মূর্খ ও বলবানের অনর্গল তোষণ- বাক্যের বা পেশিশক্তির শিকার। তাই তো, তাদের পরিণতি এতটাই করুণ। জীবনের একটা অদ্ভুত নিয়ম আছে। যে শেষ পর্যন্ত সবকিছু পুষিয়ে নেয়, মিটিয়ে দেয় সর্বপ্রকার লেনদেন। তাই হয়তো আজীবন সুন্দরীকেও গুণে যেতে হয় পায়ে-পায়ে পারাপারের হাড় মাংসের নির্মিত এবং জর্জরিত কড়ি., মেনে নিতে হয় বিয়োগান্ত না হলেও আধাসেদ্ধ করুণ পরিণতি। একথা সবার জানা, মানুষ মূর্তি নয়। সে অকাট মূর্খও নয়, নয় বধির কিংবা নিশ্চল। ক্রমশ পাঠকের অভিজ্ঞতাই পাঠককে জানিয়ে দিল, সুন্দরীরাও অন্যান্য মানুষের মতো, হয়তো বা এইসব প্রতিভাবান যুবকদের মতোই, ব্যর্থতাবোধ তাড়িত দুঃখী অপরিপূর্ণ মানুষ। মানবভাগ্য বা নিয়তি বা ভবিতব্য কী করে এভাবে মানুষ! সেই যে নিধুবাবু গাইত তবে প্রেমে কী সুখ থাকিত/যদি, যে যাহারে ভালোবাসে/সে তাহারে ভালোবাসিত। পাঠকের মনে প্রশ্ন দেখা দিল, কবিতার দায় কী শুধু কবিতা হয়ে-ওঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কবিতার নামে কী সব ধ্যান-ধারণাই পার পেয়ে যাবে বা যায়! কিংবা পার-পেয়ে যাওয়া কী নান্দনিক বিবেচনায় সঠিক কিংবা যথোচিত। তা হলে, মানবিকতার দায়-দেনাই বা সুধাবে কে? এইসব তত্ত্বকথাই হয়তো বা বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু, এই পরিমাণ হাহাকার এবং অকরুণ তিক্ততা কালে-কালে অসহনীয় ও অস্বস্তিকর ঠেকতে শুরু করল পাঠকের।

৩

তবে, একটি বা দু'টি বা তিনটি ... কয়েকটি মাত্র কবিতাই কবির কবিতা বিচারের মাপকাঠি বা পথনির্দেশক নয়। নিয়তই কবিতার ভুবন সম্প্রসারিত হতে হতে ছাড়িয়ে চলেছে আপন সীমা পরিসীমা। সেখানেই দিন দিন বেড়ে উঠছে পাঠকের ভালোবাসা। ভালোবাসা তো অন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, তারও রয়েছে হাত-পা, নাক-চোখ, খোলা-মুখ ; সেও অইদিপাউসের মতো খুঁজে ফিরছে আপন অস্তিত্বের ঠিকানা। শেষ নেই যে অন্তহীন পথের, সেই পথ রেখা ধরে চলে আসে উৎপলা, কল্যাণী এবং তাদের অন্যান্য আলোর সহোদরা। যেন নক্ষত্রের মেলা, একদিন নিবে যাবে, মিলিয়েও গেল পথের বা স্রোতের বাঁকে। এই ছাই বা ভস্মের ক্ষণিক অঙ্গার অঙ্গীকার রেখে যায় সভ্যতার। সেই আলোয় ফের পথ চিনে-চিনে উজ্জয়িনীপুরে না হলেও, পাঠক একদা যাত্রা করে অভিজ্ঞতার ও অভিজ্ঞানের অন্য কূলে।

এইবার সেই কাহিনীর সূত্রপাত। সময়ের বা ইতিহাসের 'অগ্নিপরিধির' মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে হঠাৎ অদ্ভুত বা কিম্ভুত সংশয় দেখা দিতেও পারে, তবু, 'কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে' হয়তো বা এক পৃথিবীর সব কবিতাই ব্যক্তিক সম্পর্কের ওপর ভর করে রচিত, হয়তো বা নয়। তবে, মানতেই হবে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে অনুভবের, পুরুষ-নারীর সম্পর্কের গভীরে কোথাও সৃষ্টি হয়েছে একটি বিরাট খাদ। শুধু মাত্র 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন' হয়ে-যাওয়ার সংকল্পই ওই খাদ পূরণের জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই বুঝি কথা ওঠে ঘুরে-ফিরে জলের স্বরের মতোই আরও এক নিগূঢ় নিবিড় বিশ্বাসের, এক নাবিকের দূর সমুদ্র যাত্রার, পুনরায় ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যেই।

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা/মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে/ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে/আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে ;/তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল/দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল। পাঠককে আজ যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তার প্রাণের নারীদের নাম, ধাম, গোত্র-পরিচয়। তবে সে নিবিষ্ট চিত্তে উচ্চারণ করে যাবে, হেলেন, স্যাফো দিদো, ক্লিওপেট্রা লেসবিয়া, বিয়াত্রিচে, মাদাম বোভারি, এ্যনা, ক্যারেনিনা, অচলা, লাবণ্য ... এরাই এইসব সমুজ্জ্বল অনুপস্থিতি, পাঠককে অনুরাগে-বিস্বাদে-ভালোবাসায় হাত ধরে নিয়ে যায় মৃত মানুষের-সভ্যতার কাছাকাছি। পাঠক টের পায়, এরা সব মরে বেঁচে আছে ফের জেগে ওঠার প্রতীক্ষায়, কবিতায়-জীবনে। মনে হয়, হয়তো-বা অন্য কোনো বিস্ময় প্রতিপলে-অণুপলে জাগরিত হচ্ছে অন্য কোথাও।

সেই 'বনলতা সেন'-এর কাল ছুঁয়ে উঠে আসে 'সুরঞ্জনা' 'সবিতা' 'সুচেতনা' 'আকাশলীনা' বা আরো কেউ কেউ, যাকে শুধু বলতে ইচ্ছে করে, 'তুমি' বা লিখতে ইচ্ছে করে 'তোমাকে'। এদের, কারো মুখোমুখি চেপে ধরে অচেতন বিস্ময়, 'আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো' ; মথিত আনন্দে-বেদনায় বলে উঠতে সাধ জাগে, 'মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি। মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে ;/ হয়তো-বা শোনা যায় বিরহে কাতর কণ্ঠ, 'তুমি এক দূরতর দ্বীপ/ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;/' কিংবা হৃদয়-উপড়ানো সেই শাশ্বত বেদনার বাণী ' 'ওইখানে যেয়োনাকো তুমি,/বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে ;/', কারণ, 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস/বাতাসের ওপারে বাতাস—। আকাশের ওপারে আকাশ।/' যেহেতু 'তুমি দেখিয়েছিলে একদিন/মস্ত বড়ো ময়দান—দেবদারু পামের নিবিড়—মাথা মাইলের পর মাইল ;/' তাই যেন, সর্বপ্রকার রক্তপাত, ক্লান্তি, বিমূঢ় বিস্ময় ভাসিয়ে আজও, 'তোমার বুকের' 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ; তোমার বুকের', 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিম বিন্যাস' ; তোমার বুকের পরে আমাদের পৃথিবীর রাত ;/' তাই, এবং তাই ; একমাত্র সে জন্যেই, 'দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়—/ শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য কথারা আপাতত এখানে উহ্যই থাক। এই যে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান ; এও এক চরম পুলক ; সভ্যতারই দান। এখানেও পাঠক পৌঁছে যায় শুধুমাত্র একবারই হয়তো–বা পৃথিবীর' একবারেই পায় তারে/পায় নাকো আর'। এ এক মহাপৃথিবীর বিস্তীর্ণ ঘোর। একমাত্র ভালোবাসার, সম্পূর্ণ ভালেবাসার, অগ্নিই নিজ অন্তরে আলো জ্বেলে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে পৌঁছে যায় সেই অন্ধকূপে কেউ কেউ হয়তো কালে কালে যুগ থেকে যুগান্তরে পেয়ে গেছে তার খোঁজ। কবি জীবনানন্দ দাস তাদের অন্যতম। যা কিছু স্পর্শ করার করি স্পর্শ করেছে ভালেবাসায়। আর ভালোবাসা তাকে পৌঁছে দিয়েছে সেখানে পৌঁছে–দেয়ার, পাঠক জেনেছে, একমাত্র ভালোবাসাই মানবের অন্তিম সম্বল। এতো লেখা নয়, যেন এইমাত্র পুণ্যস্নান সেরে পাঠক পা রাখল ডাঙ্গায়। এইবার পদযাত্রা শুরু, অন্তরগহ্বরে, আপন, আপন মাটির আস্তরণ খুঁড়ে–খুঁড়ে। চাই, 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।' তাহ'লেই প্রকৃত প্রাকৃতিক জল–হাওয়ায় শাখা মেলবে মানুষে–মানুষে গজিয়ে ওঠা অপরূপ বিস্ময়। এবং একমাত্র তখনই সবকিছু সম্ভব, এমন কি হয়তো–বা কবিতা রচনাও।

পুনশ্চ

ক. কবিতায় তুমি–আমি বা আমি–তুমির ব্যবহার সেই আদিকাল থেকে। তবে 'তুমি'–'আমি' নিয়ে বা 'তোমাকে' 'আমাকে' নিয়ে প্রকৃত খেলা শুরু রোমান্টিক যুগে। কবি ভেবেছে, মুখ খুলে দিয়েছে দু'টি শব্দে ; এখন তারা অনন্ত সম্ভাবনায় আকাশ স্পর্শ করবে পরস্পরের ওপর ভর করে। কিন্তু শতাব্দীর দু'একটা কালস্রোতের বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল, তারা বরং নিজের অন্তরে হারিয়ে বা গুড়িয়ে যাচ্ছে পাকে–পাকে। কেউ কাউকে ঠাঁই দিচ্ছে না বা দিতে পারছে না আর। মেনে নিতেই হয়, কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতাও রোমান্টিক ধারারই বিংশ শতাব্দীতে আর এক অনন্য উৎসারণ। অনন্যই বটে এই ভুবনে, তুমি আমি বা আমি তুমি, হয়তো–বা পরস্পরের হাত ছুঁয়ে বা পরস্পরকে দেহ দিয়ে অবশেষে হারিয়ে বা মিলিয়ে বা খুইয়েই যায় ; তবে, তারপরও, তাদের যাত্রা বা অভিজ্ঞতা পরস্পরে লগ্ন থেকে অন্য এক পৃথিবীর দিকে, সভ্যতার ছুঁয়ে। পাঠকের উৎকণ্ঠা এক জীবনে সম্ভব কি এই উজ্জীবন। এই উৎকণ্ঠারই অপর নাম জীবনানন্দ দাশের কবিতা। আর কে না জানে, উৎকণ্ঠা মাত্রই মহাজাগতিক, চলেছে মহাজীবনের খোঁজে।

খ. যতই অস্বীকার করতে চাইনা কেন, কবিজীবনের অন্তর–বাইরের সঙ্গে কবিতার একটি দূরসম্পর্ক থেকেই যায়। এজন্যই প্রয়োজন কালপঞ্জীর ; কোন কবিতাটি কবে লেখা হয়েছিল বা কখন ছাপা হয়েছিল জেনে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। হয়তো তখন কবি–পাঠকের সম্পর্কও পেয়ে যায় নতুন মাত্রা, ঘটে অন্যত্র আলোকিত বিস্ফোরণ। আপাতত, পাঠক অপেক্ষায় রইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমকালীন কাব্যভাবনার প্রেক্ষিতে জীবনানন্দ দাশ
আজহার ইসলাম

জীবনানন্দ দাশ [১৮৯৯–১৯৫৪] জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন একটি পরিবারে যেখানে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চমৎকার পরিবেশ বিদ্যমান ছিলো। কবির পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। একান্নবর্তী একটি বড়ো পরিবারের বধূ হয়ে আসেন জীবনানন্দের মা কবি কুসুমকুমারী দাশ, যাঁর সেই বিখ্যাত চরণ 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?' এখনো ছেলেমেয়েদের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। কুসুমকুমারীর দুই ছেলে ও এক মেয়ে সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ছিলেন। শিশু তার মায়ের কাছ থেকে যে শিক্ষা পায়, সেভাবেই সে গড়ে ওঠে। জীবনানন্দ মায়ের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাতে সাহিত্যপ্রীতি ছিলো প্রধান। এই সাহিত্যপ্রীতিবশেই তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন এবং কবিতা লেখার প্রেরণা পান।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর সমকালে বাংলা কবিতার জগতে যে এক অভিনব শিল্পভাবনার কবি হিসেবে বিবেচিত হন, তার কারণ অনুসন্ধান করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে যে, এক জন্মগত অনুভবের বাইরে তিনি তাঁর কালের অনেক কবির মতো পরিবেশবিমুখ কোনো অনিশ্চয়তার ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হননি। কবিতার জগৎ যে তখন লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত ছিলো, জীবনানন্দের শিল্পীমানস সেই অনভিপ্রেত শিল্পভাবনার দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে আপন আত্মবলয়ের এক বস্তুভারমুক্ত কাব্যের জগৎ থেকেই উৎসারিত হয়।

তবে একথা ঠিক যে জীবনানন্দ তাঁর কাব্যজীবনের শুরুতে তাঁর আত্মমগ্ন ভাবনার জগতের উৎসমুখটি সহসা খুঁজে পাননি, হয়তো কবি পাগলের মতো তার সন্ধান করে ফিরেছেন। যা তাঁর আপন নয়, এরকম এক অচেনা কাব্যভুবনের সংক্ষুব্ধ পরিবেশে সাগরপারের এক অতিথি পাখির মতো ছিটকে আসা জীবনানন্দ তাঁর জগৎটি আবিষ্কারের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন ক্রমাগত, তবে কবিতা রচনা থেকে বিরত হননি। এই অবস্থায় ১৯২৭ সালে যখন ৩৫টি কবিতা নিয়ে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' বের হয়, তখন এ বইয়ের কবিতাগুলোর মধ্যে আসল জীবনানন্দকে খুঁজে পাওয়া গেলো না। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কবি প্রভাবিত হয়ে যখন কবিতা রচনা করেন, তখন কবিতার স্টাইলটি যেন সম্পূর্ণত রবীন্দ্রনাথেরই মনে হয়, যেমন,—

> বসুধার অশ্রুপাংশু আতপ্ত সৈকত,
> ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
> লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ধূলি—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে।

(নীলিমা)

'ঝরা পালকে'র একটি কবিতায় স্পষ্টত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা কুমুদরঞ্জন মল্লিক অথবা কালিদাস রায়ের প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন—

পাড়ার মাঝারে সবচেয়ে সেই কুঁদলী মেয়েটি কই!
কতদিন পরে পল্লীর পথে ফিরিয়া এসেছি ফের,—
সারাদিনমান মুখখানি জুড়ে ফুটিত যাহার খই
কই কই বালা আজিকে তোমার পাইনা কেন গো টের।
তোমার নখের আঁচড় আজিকে লুকিয়ে যায় নি বুকে,
কাঁকন-কাঁদানো কণ্ঠ তোমার আজও বাজিছে কানে।
যেই গান তুমি শিখায়ে দিছিলে মনের সারিকা-শুকে
তাহারি লালিত লহরী আজও বহিয়া যেতেছে প্রাণে।

(পলাতক)

তবে একথাও ঠিক যে 'ঝরাপালকে'র জীবনানন্দ দাশ তাঁর সমকালের প্রবীণ কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও এ বইয়ের কোনো কোনো কবিতায় তাঁর নিজস্বতার পথটি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পান। জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'অস্তচাঁদে' কবিতায়,—

দুশ্চর দেউলে কোন্—কোন্ যক্ষপ্রাসাদের তটে,
দূর উর-ব্যাবিলন্ মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড-তলে,—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মত নীলা যেইখানে ফণা তুলে উঠিয়াছে ফুলে।

জীবনানন্দের কবিতায় 'শিশির', 'হেমন্ত', 'কুয়াশা', 'হিম' ইত্যাদি শব্দের হরহামেশা ব্যবহার দেখ যায়। 'ঝরা পালক' থেকেই তার উৎসারণ; যেমন—

সে যেন ঘাসের বুকে,—ঝিল্‌মিল শিশিরের জলে ...
হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে
বকবধূটির মত কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে!
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পুবালি হাওয়ায়
হয়ত দেখেছ তারে ভূতুড়ে দীপের চোখে মাঝরাতে দেওয়ালের পরে
নিভে যাওয়া প্রদীপের ধূসর ধোঁয়ায় তার সুর যেন ঝরে।

(কবি)

কবিরা সবাই অল্পবিস্তর পরাবাস্তব। এবং পরাবাস্তব ভাবনা কবির অবচেতন মন থেকেই উৎসারিত। সমকালে জীবনানন্দই একমাত্র সুররিয়ালিজম্ বা পরাবাস্তব ভাবনার সার্থক কবি। কবির অন্তর্দৃষ্টিতে খণ্ড খণ্ড বস্তুগুলো যখন মিলিতভাবে অখণ্ড সত্যের রূপে আবির্ভূত হয়, তখনই কবির সেই বিশেষ শিল্পভাবনা তার উদ্দেশ্য চরিতার্থের পথ খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়। জীবনানন্দ দাশ এই বিশেষ শিল্পভাবনার কবি। তিরিশের অধিকাংশ কবির মনে জন্ম নেয় এমন এক বৈপ্লবিক ভাবনা যা তাঁদের কোনো সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নেওয়ার পথনির্দেশ দেয়নি। জীবনানন্দ দাশ এরকম লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরবার মানসিকতা অর্জন করেননি। তিনি যে একজন পরাবাস্তব কবি, একথা সম্পূর্ণত সত্য বলেও যদি বিবেচনা করি, তবুও এভাবে বলতে বাধ্য আমরা যে তাঁর পরাবাস্তব মন কখনো লক্ষ্যহীন জগতে বিচরণ করার প্রেরণা দেয়নি তাঁকে। জীবনানন্দের রহস্যময় মায়াপুরীর অবস্থান বাস্তবাতীত জগতে বটে, কিন্তু সেই বাস্তবাতীত জগতের মায়াপুরীকে আমরা যারা বাস্তবের অধিবাসী, তারাও যে কোনোদিন দেখিনি এমন মনে করা যাবে না ; তবে তাকে আমরা দেখেছি আমাদের স্বপ্নে, আর স্বপ্ন এমনই জিনিস যা বাস্তবের খাপছাড়া বস্তুগুলোকে পরম রমণীয় করে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। সেজন্য একমুঠো তাজা অনুভূতি যখন জীবনানন্দের মানস জগৎ থেকে হঠাৎ উড়ে আসে, যা 'জলের গন্ধ' বা 'রৌদ্রের গন্ধ' রূপে কবিতায় স্থান পায় তখন সে যে কী বস্তু, আমাদের তা জানা না থাকলেও আমরা তাতে মুগ্ধ হই। কিংবা কবি যখন বলেন, 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে', তখন তার শব্দিত স্পন্দন আমাদের কানে রেশ না তুললেও শিশিরের শব্দকে কখনোই আমাদের অবাস্তব মনে হয় না। এই বিশেষ কাব্যদ্যোতনা শুধু অনুভব্যই নয়, এই ইন্দ্রিয়াতীত ব্যঞ্জনাকে আমরা যেন আমাদের সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় দিয়েই স্পর্শ করি। তাই জীবনানন্দের কবিতা যতই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হোক, তাকে আমরা কোনোক্রমেই অসম্ভব কবি-কল্পনা মনে করি না।

জীবনানন্দের সমকালে সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী—এঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব শিল্পবৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরিচিত। কিন্তু জীবনানন্দের শুভ্র কোমল অনুভূতির প্রকাশ তাঁদের কোনো কবিতায় নেই। সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় যুক্তিতর্কের যে বেড়াজাল নির্মাণ করা হয়েছে কিংবা উত্তপ্ত বিদ্রোহের বার্তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অথবা তাঁদের বিবেচনায় সাহিত্যের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিবেশকে সজোরে উপেক্ষা করার প্রবণতা দেখানো হয়েছে—এসব কিছু তাঁদের কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপেই চিহ্নিত,—জীবনানন্দ দাশ তাঁর সহজাত শিল্পভাবনা অনুযায়ীই সমকালীন বিশিষ্ট কবিদের সেই দ্বন্দ্বসঙ্কুল অস্থির চিন্তাচেতনার জগৎ থেকে সরে এসে এক সৌন্দর্য-বিমোহন মগ্নভূমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই রুচির দিক থেকে তাঁর কবিতা ভিন্ন প্রকৃতির, মেজাজের দিক থেকে তিনি আত্মমগ্ন ভাবনার অনুসারী। অনায়াসে কবি নভোমণ্ডলের উচ্চমার্গে আরোহণ করে তাঁর কল্পলোকের নিভৃত স্থানগুলো পরিভ্রমণ করেন এবং দূর অতীতের শ্রাবস্তি-বিদিশার লুপ্তপ্রায় রাজভাণ্ডার থেকে সৌন্দর্যরাশি আহরণ করে অবলীলায় ফিরে আসেন ধানসিড়ি নদী-বিধৌত তাঁর প্রিয় রূপসী বাংলার নীল নির্জন ছোট গ্রামটিতে।

প্রকৃতি-চেতনায় জীবনানন্দ দাশ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন। উভয়েই প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের মধ্যে আত্মমগ্ন হতে ভালোবাসেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-তন্ময়তার মধ্যে পৃথিবীর রহস্যলোক আবিষ্কার করার যে প্রয়াস, কিংবা তাঁর প্রকৃতি-ভাবনা যে লোক-লোকান্তরের দিকচক্রবাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত,—জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি-মগ্নতা সেরকম কোনো দিব্যভাবনার আশ্রয়ে লালিত নয় ; তিনি তাঁর সাঙ্কেতিক বোধের অন্তরালে প্রকৃতিকে দেখেছেন তাঁর কল্পলোকের অনন্ত সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রীরূপে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমকালীন কাব্যের জগতে নগর-চেতনার যে প্রাধান্য, জীবনানন্দ দাশের শিল্পপ্রকৃতি সেই দিক থেকেও পৃথক, পল্লীপ্রধান আবহমান বাংলা তাই কবির অন্তর জুড়ে ভালোবাসার ফল্গু হয়ে বিরাজ করে। কবি যা-কিছু কল্পনা করেছেন,—বাস্তব জগতের কোনো বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়ে কবির মনের চিরায়ত সাহিত্য ভাবনা যখন পরাবাস্তব জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, সেখানে তাঁর শিল্পচৈতন্যের যে জাগরণ, প্রকৃতির বিচিত্রতা ও রহস্যের অনুসন্ধানে তাঁর যে নান্দনিক অভিযান, যেখানে উপমা অনায়াসে অসীম সৌন্দর্য রচনা করে এবং প্রতীক কবির শিল্পকর্মের রেখায় রেখায় লীলায়িত হয়ে তাঁর হাজার বছর আগের ঈপ্সিতাকে বের করে নিয়ে আসে স্পন্দিত কলতানে—কবির সেই বিশিষ্ট শিল্প-ভাবনার অন্তরালে গ্রামবাংলাই যে কবিকে স্পর্শকাতর করে তোলে,—কথাটি সত্য এই কারণে যে জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতপক্ষেই রূপসী বাংলার কবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধ : অনন্তের দিকে টেনে নেয়
রবীন সমদ্দার

[জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' মাত্র সতেরোটি কবিতা নিয়ে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৩) প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু-কে উৎসর্গিত এ কাব্যগ্রন্থে কবি-রচিত ভূমিকাও ছিল। এই প্রথম সংস্করণের সপ্তম কবিতাটি 'বোধ', যা আগস্ট ১৯২৯ (ভাদ্র ১৩৩৬)-এ 'প্রগতি'তে বের হয়। কবির কথা থেকে জানা যায়, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতানিচয় ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ (১৩৩২-১৩৩৬) সালে রচিত হয়েছে। এক হিসেবে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সব কবিতাই ১৯৩০-এর আগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ কবিতাগুলো প্রকাশের তদারকি করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু কোলকাতায় বসে এবং খুব সম্ভবত কবি তখন অবস্থান করছিলেন বরিশালে। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৩০ সালের মার্চ মাস অব্দি কবি নানা কষ্টের মধ্যে কাজ করেছিলেন দিল্লির রামযশ কলেজে—তাও মাত্র চার মাস কাল। দিল্লির উপান্তে নগ্ন পাহাড়ি এলাকায় প্রবল শীত সত্ত্বেও তিনি চাকরি ছাড়তে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর বিয়ের তারিখ নির্ধারিত হয় ৯ মে ১৯৩০ ; ভেবেছিলেন ঐ কলেজেই ফিরবেন বিয়ের পর। কিন্তু ছুটি না পাওয়ায় সেই যে চলে এলেন, আর দিল্লি ফেরেননি। এর আগেই নিয়মিত তাঁর কাজ ছিল না। এই অনিশ্চয়তার কালে জীবনানন্দ বেশ ক'একটি কবিতা লিখেছিলেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। '১৩৩৩', 'সহজ', 'পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', 'বোধ', 'অবসরের গান', 'মাঠের গল্প', 'আমরা', 'ফসলের দিন' ইত্যাদি কবিতা এদের অন্যতম। পড়তে পড়তে বেশ লক্ষ্য করা যায়, কিভাবে পরিণত কবিতার ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গি জীবনানন্দর ভেতরে তৈরি ও আত্মস্থ হতে লাগল।]

ক্লান্তি, অবসাদ, অবকাশ, অবসর, মৃত্যু আর বিচ্ছেদকে নিয়েই জীবনানন্দর জীবনবোধ। এসব কারণে আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি অনন্য-সাধারণ। 'বোধ' কবিতায় তিনি লেখেন চোখের কালশিরার অসুখের কথা, কানের বধিরতার কথা, নষ্ট শশা আর পচা চাল কুমড়োর কথা। এ কবিতায় তিনি জানান—'মাথার ভেতরে/স্বপ নয়, কোন এক বোধ কাজ করে'। বলতে গেলে পরবর্তী পাঁচ ছ' বছর কবি ছিলেন কর্মহীন। অর্থনৈতিক মন্দার ঐ দুর্যোগে কর্মহীন জীবনের অবসাদের কথা কবির লেখাতেই ফুটে উঠেছে। লাঞ্ছিত কঠিন বাস্তবের জ্বালার হাত থেকে এক ধরনের মুক্তি খুঁজেছেন নিসর্গজগতে, যা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রগাঢ় ধূসর প্রকৃতিচেতনায় আশ্বস্ত হয়। এখানে স্মর্তব্য, 'বোধ' এবং 'স্বপ্নের হাতে'র মতো ভিন্ন স্বাদের কবিতাদ্বয় বক্তব্যের দিক থেকে বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রধানত মনন নির্ভর এই অনবদ্য কবিতা দুটিই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র তীব্র ইন্দ্রিয়মগ্ন অনুভূতিগ্রাহ্য নিসর্গবলয়িত কবিতাবলী থেকে স্বতন্ত্র। যেখানে নির্মাণ ও প্রয়াণের এক অনতিপ্রখর আকাঙ্ক্ষার ইশারা মেলে। পৃথিবীর পথ ছেড়ে নক্ষত্রের পথে কিংবা দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে ধূসর স্বপ্নের দেশে যাবার ইচ্ছে হয়। মগ্নচেতনার কবি জীবনানন্দ অনুভূতি ও বিশ্বাসের নিবিড় উপস্থিতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম তীব্রভাবে অনুভব করেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেই। এ অনুভব, যার সার্থক পরিণতি আমরা লক্ষ্য করি কবির প্রায় জীবনের প্রান্তসীমায় এসে, জীবনানন্দ নিজের মধ্যে অলৌকিক বোধের ভেতরে যে উপস্থিতি নির্ণয় করেন, 'বোধ' কবিতায় প্রথম সেই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাই। এই বোধ আমাদের স্পষ্ট চেতনাগ্রাহ্য নয়। সচেতন ও অসচেতন সত্তার সমবায়ে এর জন্ম বলেই তা সাধারণ বুদ্ধির ওপরে এবং তাই অগম্য। এই বোধি-সম্পন্ন কবি নিজকে বুঝতে পারেন না, অন্যকেও বোঝাতে পারেন না। সাধারণ জীবনের মোটাদাগের জীবনাচরণের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেন না। এক অস্থিরতা বাসা বাধে। আবার জীবনের দুর্বোধ্যতম বিকাশ যেখানে জটিলতম যোগসূত্র—সেই প্রেম কিংবা স্বপ্নও এক দূর পারম্পর্যে গাঁথা। এই বোধ যাবতীয় বিশ্লেষণের বাইরে। এই দুর্বোধ্য অস্বস্তি বয়ে নিয়ে কবির অভিযাত্রা :

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভেতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে ;
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় !
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;
সব কাজ তুচ্ছ হয়,—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয় !

অন্যথায় চেনা জীবন-সত্য পার করে তিনি অনাস্বাদিতপূর্ব কিছু কি দিতে পারেন? সত্তার গভীরে অবগাহন শেষে কবি যখন উঠে আসেন, তাঁর কবিতায় সেই অলৌকিক সম্ভাবনার সংকেত থাকে যা আমাদের চেতনাবোধকে অতিক্রম করে পবিত্র আত্মাকে ছুঁয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে।

পরিবার পরিজন পরিচিতদের কাছে জীবনানন্দ নম্র লাজুক নির্বিরোধী, তবে নৈতিকতা আর অতিস্পর্শকাতরতায় পরিপূর্ণ ; ব্যক্তিত্বে অন্তর্মুখী ও নির্জনতাপ্রিয়। তাঁর চারিত্রিক মূল কাঠামোতে আমরা লক্ষ্য করি একাকিত্ব, অস্থিরতা, মৃত্যুচিন্তা জীবনানন্দর জীবন দর্শনের এক স্থায়ী ধ্রুবপদের মতো বার বার ফিরে আসছে। 'বোধ' কবিতা তাঁর অস্তিত্বচেতনার বিপন্নতার যে ভাষ্যরূপ ফুটে উঠেছে, তা-কে আমরা অস্তিত্ববাদের অস্থিরতা বলতে পারি। এই একাকিত্বজনিত বিচ্ছিন্নতা অতিক্রান্তির অভিশাপ নাকি অনিবার্য মানবিক নিয়তি—এ সংশয়ের উত্তর খোঁজের তিনি বক্ষ্যমান কবিতাটিতে, যার আঙ্গিক কথোপকথনের হলেও কৈন্দ্রিক ভাবটি অতি সুগঠিত। যেন স্বপ্ন, শান্তি, ভালোবাসা নয় 'হৃদয়ের মাঝে এক বোধ' জন্মে। সে হাতে হাত রাখে। তার কাছে সব কাজ তুচ্ছ হয়ে যায়। সব চিন্তা পণ্ড হয়। প্রার্থনা শূন্য মনে হয়। অথচ নৈর্ব্যক্তিক বোধ অদ্ভুত স্বয়ংক্রিয়তায় খুব সহজে কবির সঙ্গে চলতে পারে ; সহসা আলো কিংবা অন্ধকারে থেমে পড়তে পারে। এর থেকে যেন পরিত্রাণ নেই। একটা বহির্মুখী চিন্তা যেন কবিকে পেয়ে বসে। কোনো নিশ্চয়তার ভাষা তাঁর জানা নেই। তাঁর বোধ অন্য সবার থেকে আলাদা। কৃষকের ফসলের আকাঙ্ক্ষা যেমন সহজ স্বাভাবিকতায় মেশানো কবি সেখানে অসফল আলোর দিশা খুঁজে মরেন ! তখন তিনি জেগে থাকেন বটে আপন অস্তিত্বে, সেখানে কৃষকের জেগে থাকার স্বাভাবিক টান কোথায় তাঁর? তখন এক অন্তর্দীপ্তির আবহ নিভৃতে জেগে থাকে কবির পৃথিবীতে—তাঁর মনোধিমণ্ডলে যা জড়তাময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্যাসক্লান্ত সাড়হীন ক্লিষ্ট জীবন থেকে কোনো এক বোধ থেকে বোধাতীত এক জগতে কবিকে ক্রমাগত টানে। তখন,

স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন্ এক বোধ কাজ করে
মাথার ভেতরে !

যতই কবি এই অশরীরী শূন্যতাবোধকে এড়াতে চান, উপেক্ষা করতে চান, এমন কি 'মড়ার খুলির মতো ধ'রে আছাড়' দিতে চান, কী রকম দিব্যজ্ঞানীর মতো কবির সঙ্গে মাথার, চোখের চারপাশে জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে। তার থেকে নিস্তার নেই—

আমি চলি, সাথে-সাথে সেও চ'লে আসে।

এভাবে গৃহ-লোকালয়, প্রচলিত জীবন ও মূল্যবোধের পরিধি থেকে কবি নিজেকে বহুদূরে মনোলোকে বিচ্ছিন্ন থাকবার অভিসারী হন। নিজের কাছে নিজেরই সংশয়ী জিজ্ঞাসা—

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?

ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর 'সঙ্ অব মাইসেল্ফ'—এ আত্ম-আবিষ্কারের চেতনা যেমন নির্দিষ্ট থেকে সর্বজনীনতার লক্ষ্যে অভিসারী, জীবনানন্দ-এ সে-রকম একটি বোধ লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে, যেখানে মৈথুন, রিরংসা, প্রজননে সহজাত প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ সন্তান জন্ম দেয় কিংবা লাভ করে। কৃষক হলকর্ষণ করে, ধীবর মাছের শিকার করে। জীবনের সহজ স্রোত কবি বিচ্ছিন্ন থাকেন। তাঁর চোখে শুধু ধাঁধাঁ নাকি তাঁর পথে শুধু বাধা ? এ-সংশয়ে কী মীমাংসা খুঁজে পান কবি ? যদিও কবি এই সব স্বাদ পেয়েছেন, বাতাসের মতন অবাধে বয়েছে তাঁর জীবন। কিন্তু সদর্থক উত্তর পাননি—

—তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী !

তারপর ভালোবেসে, ঘৃণা করে, অবহেলা করে দেখেছেন 'মেয়েমানুষেরে'। উপেক্ষায় ঘৃণায় পরিত্রাণ নেই, শান্তি নেই। ভালোবাসার সাধনা তবুও ছিল একদা। জাতক নক্ষত্রের বাধা বার বার পেয়েছেন প্রেমের পথে। ধূলো আর কাদা ঘেটেও কোনো প্রাপ্তি-তৃপ্তি নেই। সহজ-সরল মানুষের মতো নেই তাঁর অগাধ শান্তির সময়। এই 'বোধ' শুধুই অলৌকিক, শুধু অনুভবযোগ্য। যাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। কিংবা থাকে বিশ্লেষণের ওধারে।

আধুনিক যুগে জীবনের মূল্যবোধগুলো বদলেছে বা পাল্টাচ্ছে জীবনানন্দ তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর মনে হয়েছিল রোম্যান্টিক ভাবনা দিয়ে বর্তমান যুগস্বরূপকে উদ্ঘাটিত করা যাবে না। এখানে বাস্তবের চেয়েও অতি বাস্তব আছে। সুররিয়ালিস্টরা পরাবাস্তবকে খুঁজতে মগ্নচৈতন্যে প্রবেশ করেছিলেন। জীবনানন্দর ওপর তাই সুররিয়ালিস্ট চিন্তার প্রগাঢ়প্রভাব। রোম্যান্টিক কবিদের অধরা সৌন্দর্যের পিয়াসী নন তিনি। পার্থিব জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা, কুশ্রীতাও তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত। এখানে অসংশয়ী স্বীকারোক্তি কবির—

আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে ;
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয় !
অবসাদ নাই তার ? নাই তার শান্তির সময় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তখনই কবির ভেতর তৈরি হয় অন্য এক জগৎ। ঘুম আর মৃত্যুবোধ যেন তাই সমার্থক হয়ে ওঠে জীবনানন্দর এই কবিতায়, আমরা এক ভিন্নজীবনের স্বাদ পাই। উৎফুল্ল আহলাদ, ঘুম—যেন শুয়ে থাকবার মতো মৃত্যু তখন কবির কাছে একাকার হয়ে যায়।

কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!

নিমগ্ন চৈতন্যে কী এক পৌনঃপুনিক বোধের খেলা চলে। রোম্যান্টিক কবিদের মতন নন তিনি। রূপকথার রূপসীরা বাসিফুলের মতো মেকি-সৌন্দর্যে পর্যবসিত। মানবিক পতন, বিপর্যয়ের, আর মৃত্যুর ছবি ফুটিয়ে কোলাজ-এর মতো ভাঙ্গাচোরা, পচনশীল, বিকৃত সচেতন রূপকল্পের আশ্রয় নেন জীবনানন্দ রোম্যান্টিক কল্পনা-বিলাসের স্বরূপে—

চোখে কালশিরার অসুখ,
কানে সেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেইসব।

এ এক বিপন্নতার ছবি। 'বোধ' কবিতার এই কৈন্দ্রিক ভাবনার বিস্তার ঘটেছে তাঁর 'আট বছর আগের একদিন' শিরোনামে আরেকটি বিখ্যাত কবিতায়। যেখানে বিপন্ন বিস্ময়ের কথা বলা হয়েছে। অর্থ, কীর্তি, স্বচ্ছলতা নয়, আরও এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে। সৃষ্টির তাড়না কবিকে অবসন্ন করে দেয়। 'বোধ' কবিতাটিতেও তিনি এই তাড়নার কথা বলেছেন—যাকে কবি এড়াতে পারেন না। সেই মহাশক্তির কাছে কবি অসহায়। গৃহী মানুষের মতো প্রেম, সন্তান, স্বচ্ছলতা, খ্যাতি কবির স্বরূপকে প্রকাশ করতে পারে না। অথচ সৃষ্টির দুর্মর আবেগের সঙ্গে কবি নিয়ত সংগ্রামে কবি ক্লান্ত। কিন্তু কেন এই ক্লান্তি?

এই ক্লান্তির পাশাপাশি জীবনানন্দ লক্ষ্য করেন সর্বব্যাপী নশ্বরতা। ওষধি হিসেবে যে-প্রেমকে তিনি চিনে নিতে পেরেছিলেন, তাকেও বুঝি নশ্বর, সাময়িক মনে হয়েছিল তাঁর। কখনও কখনও এক তীব্র নৈরাশ্য তাঁকে পেয়ে বসে।

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,

এই দুই মাত্রার ভেতরে জীবনানন্দ সব সময় দোদুল্যমান, কিন্তু ক্রমশ স্পষ্টতর হলো যে, একটি মাত্রা অন্যটির তুলনায় মহত্তর, বেশি প্রভাবশালী। আর এটাও লক্ষ্য করা যায় যে দুটি শব্দ—সচরাচর অব্যবহৃত দুটি শব্দ—'মানুষী' ও 'মেয়েমানুষ'—কীভাবে দুটো মাত্রাকে কবি উপস্থাপন করে দেন। এ জন্যে তাঁকে মায়াবী আখ্যাও দেওয়া হয়।

অথচ সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'-তে [শ্রাবণ ১৩৩৬] সম্পাদক সজনীকান্ত দাস জীবনানন্দর 'বোধ' কবিতার অংশবিশেষ তুলে কবির মাথায় ও হৃদয়ে বোধের ক্রিয়া বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থূল রসিকতা বিদ্রূপ করে লেখেন : 'মাথার মতন হৃদয় ? হৃদয়ের সহিত গোবরের তুলনা এই প্রথম'। সজনীকান্তর আরও বিদ্রূপাত্মক পরিহাস : 'কবি সব করিয়াই দেখিয়াছেন। শুধু বিবাহ করিয়া 'মেয়েমানুষেরে' দেখেন নাই। দেখিলে ভালো হইত। গরিব পাঠকেরা বাঁচিত।' আর এক সংখ্যাতে [আশ্বিন ১৩৩৬] ব্যঙ্গ করে বলেছেন, কবিতাটির নামকরণ 'গোদ' হওয়া উচিৎ ছিল। কেননা 'কবির হৃদয়ের মাংসে' কুঁজ ও গলগণ্ড ফলেছে।

তবে এ-সব ধোপে টেকেনি। 'বোধ' কবিতাটি সম্ভবত জীবনানন্দর সত্তা-উদঘাটকের কবিতা। তাঁর এক ধরনের ভয় ছিল। তা মানুষের দিক থেকেই। তাই এই কবিতায় মানুষের চেতনা দিয়ে উদ্ভিজ্জের প্রাণ, তার সত্তাকে অনুভব করতেন। এখানে হুইটম্যান-এর সঙ্গে জীবনানন্দর অনেক সঙ্গতি রয়েছে। অত সহজে কোনো কবিতায় ঘাস চিবোনোর কথা, ঘাসের শরীর ছানবার কথা বলতে পারতেন না। মানুষ প্রকৃতিকে সংহার করে ক্রূরতার আস্ফালনে প্রকৃতিকে নিঃশেষ ও নিধন করে—কবির এই ভয়। হয়তো এরই পরিপূরক তাঁর একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা বোধ।

বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য এক্ষেত্রে জীবনানন্দ-কে বুঝতে বাড়তি আলো ফেলে : 'সমস্ত প্রভাব ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃজনী শক্তি। যে-দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হয়ে ওঠে, তুচ্ছকে ঘিরে গড়ে ওঠে মহিমামণ্ডল, সেই দৃষ্টি জীবনানন্দর। অতি ছোট ছোট জিনিস নিয়ে অতি সূক্ষ্ম সঙ্গীতের জাল তিনি এমনভাবে বুনে গেছেন যে বিশ্লেষণ ধরা দিতে চায় না।

বলি আমি এই হৃদয়েরে ;
সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয় !

ছন্দের বাঁকাচোরা গতিতে, সূক্ষ্মধ্বনিতে ও বিরতিতে, পুনরুক্তিতে ও প্রতিধ্বনিতে মনে হয় যেন এই কবিতাগুলো আঁকাবাঁকা জলের মতোই ঘুরে ঘুরে কথা বলছে। এদের আবহতে আছে একটি সুদূরতা ও নির্জনতা ; আমাদের পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়ে, এই আকাশ আর পৃথিবী ছাড়িয়ে, অন্যকোনো আকাশে অন্যকোনো জগতে এক সম্পূর্ণ রূপকথার রচনা। জীবন ক্ষয়শীল ও পরিবর্তন শীল, মৃত্যুতে সব জিনিসেরই সমাপ্তি, এই আদিম বেদনা জীবনানন্দর কাব্যের ভিত্তি।' বক্ষ্যমান কবিতায় এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় না। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ছন্দ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর আরও পর্যবেক্ষণ এ-রকম : 'এই বইয়ের সবগুলো কবিতাই পয়ারজাতীয় ছন্দে—বেশীর ভাগ অসম মাত্রায়, যাকে বলতেই হয় বলাকার ছন্দ। অর্থাৎ চেহারাটা বলাকার ছন্দের কিন্তু ধ্বনি একেবারেই ভিন্ন। বলাকার তীব্রতা ও বেগ নেই এখানে ; এ ছন্দ মন্থর, যেন ইচ্ছে করে ভাঙা-ভাঙা অসমান ও পালিশ-না-করা, এ ছন্দ থেমে-থেমে ঘুরে-ঘুরে চলে, ঘুমে-ভরা, শিশির কোমল, যেন ঘুমের মধ্যে গান এসে কানে লাগে, তারপর সমস্ত রাত হানা দেয়।' 'বোধ'-এ জীবনানন্দ এ-সব নিয়েই নাড়াচাড়া করে থাকবেন। এ কবিতাটি থেকে শুরু করে '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটি পর্যন্ত জীবনানন্দর তাড়িত চৈতন্যের এই অন্বেষাপর্ব বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার জন্ম ও বিকাশের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়, যা এখনও নিত্যনতুন করে পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা

আবুল কাসেম ফজলুল হক

Capitalism violates the world as a senile old man violates a healthy young woman whom he is impotent to impregnate with anything but the diseases of senility.

—Christopher Caudwell

'উৎকণ্ঠা' কথাটার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য এমন যে, এতে একটা শক্তির ব্যঞ্জনা আছে। জীবনানন্দ দাশের [১৮৯৯–১৯৫৪] জীবনবোধ প্রসঙ্গে এর প্রয়োগ কি যথার্থ হচ্ছে? এ প্রশ্ন কারো কারো মনে জাগতে পারে। আপাতত এর উত্তরে এইটুকু বলতে পারি যে, কথাটার প্রতি আমার একটা ব্যক্তিগত দুর্বলতা আছে হয়তো ওই ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই। খুব স্বাভাবিকভাবে আমার এটাও মনে হয় যে, এই কথাটার মধ্য দিয়ে আধুনিক মানুষের জীবনের মর্মগত বৈশিষ্ট্যও অনেকখানি প্রকাশ পায়।

আধুনিক মানুষ বলতে আমি সেই মানুষদের বোঝাচ্ছি যাঁরা রেনেসাঁস, মানববাদ, এনলাইটেনমেন্ট, রিফর্মেশন, শিল্পবিপ্লব, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, উপনিবেশবাদ ও স্বাধীনতা–সংগ্রাম, বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদি প্রত্যয় ও ঘটনার মধ্য দিয়ে বিকশিত সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। আধুনিক মানুষ মানব–ইতিহাসের আধুনিক যুগেরই মানুষ। আধুনিক যুগের যেমন বিকাশ আছে, তেমনি আধুনিক মানুষেরও আছে বিকাশ। আধুনিক যুগ অনন্তকাল চলবে না, মানুষের স্বরূপও বদলাবে। এ অবস্থায় যুগবিভাগকে পুনর্বিন্যস্ত করার দরকার আছে। কথাটা আমি নৃতত্ত্বের দিক থেকে বলছি না, বলছি আর্থ–সামাজিক–রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে।

বিংশ শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে—একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য যে, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে বিপ্লব ঘটেছে এবং উপনিবেশ দেশসমূহ দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। শতাব্দীর শেষে আরো গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে। শোষণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ আর মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম—উভয়বিধ ঘটনা দ্বারাই ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতে বিংশ শতাব্দীর মানুষের জীবনোৎকণ্ঠা বিশেষ রূপ লাভ করেছে। জীবনানন্দ যেহেতু আধুনিক যুগের—বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীর মানুষ, সুতরাং তাঁর বিশেষ ধরনের জীবনোৎকণ্ঠা থাকাই স্বাভাবিক। তবে মনে হয় জীবনানন্দ অন্য সকলের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর মন খুব বেশি স্পর্শকাতর—অনুভূতিগুলো নরম, কোমল, মিহি, মসৃণ—বিষণ্ণতাভরা। অন্ধকার ও খারাপের দিক এবং অকল্যাণের সম্ভাবনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন রেখেছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদাচিত তিনি সেই আচ্ছন্নতা কাটাতে পেরেছেন। তাতে শক্তির পরিচয় দুর্লভ। আমি কবিত্বশক্তির কথা বলছি না, বলছি মানুষ হিসেবে তাঁর শক্তির কথা। অবশ্য একটা প্রশ্ন থেকে যায় : যিনি মানুষ হিসেবে দুর্বল, কবি হিসেবে তিনি কি শক্তিশালী হতে পারেন?

জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যের যে ধারায় অবস্থান করেছেন তাতে বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, কাফ্‌কা, ক্যামু প্রমুখের সাহিত্যদৃষ্টিকে ক্রমাগত মহিমান্বিত করা হয়েছে, এবং সাহিত্যে দুঃখ ও নৈরাশ্যকে, যন্ত্রণা ও মনস্তাপকে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও বিকার-বিকৃতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাঙালির ও বাংলা সাহিত্যের উন্নততর নতুন ভবিষ্যতের প্রয়োজনে এই সাহিত্যদৃষ্টির ও মতবাদের গুরুতর পুনর্বিবেচনা দরকার।

যখন বায়রন বলেন :

Sorrow is knowledge : they who know the most
Must mourn the deepest o'er the fatal truth,
The tree of knowledge is not that of life.

শেলি বলেন :

Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought.

মধুসূদন বলেন :

আশার ছলনে ভুলি   কি ফল লভিনু হায়

বিহারীলাল বলেন :

সর্বদাই হু হু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেন :

চেরাপুঞ্জির থেকে
একখনি মেঘ ধার দিতে পার
গোবি-সাহারার বুকে?

নজরুল বলেন :

মানুষ কি আমায় কম যন্ত্রণা দিয়েছে? পিঁজরায় পুরে খুঁচিয়ে মেরেছে ওরা। তবু এই মানুষ—এই পশুর জন্যই আমি গান গাই—তারই জন্য আছি আজো বেঁচে।

কিংবা,

নিশ্চল নিশ্চুপ আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।

তখন এইসব উক্তি বেরিয়ে আসে অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস রূপে এই কবিদের অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশ থেকে। এর জন্য তাঁদের দীক্ষা নিতে হয়নি কোনো modernist কিংবা আধুনিকতাবাদীর কাছে। আমি বলতে চাইছি যে, দুঃখ নিতান্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ব্যাপার নয় ; দুঃখ একেবারেই জীবনের সমবয়সী, দুঃখের অনুষঙ্গ মানব-ইতিহাসের একেবারে সূচনা থেকেই মানুষের অস্তিত্বে ও পরিবেশে অন্তর্নিহিত আছে—শিল্প-সাহিত্যেও প্রথম থেকেই দুঃখের অভিব্যক্তি আছে। সুখ ও দুঃখ দুই নিয়েই জীবন। তবে ব্যক্তিবিশেষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে সুখ কিংবা দুঃখ—দু'য়ের যে কোনো একটির প্রাধান্য ঘটতে পারে। দেশ-কালের পার্থক্যের কারণেও সুখ-দুঃখের প্রকৃতিতে পার্থক্য দেখা যায়। এখানে আমি স্মৃতি থেকে কবিদের দুঃখবোধের কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। অনুসন্ধান করলে কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে ও চিঠিপত্রে এগুলোর চেয়ে মর্মস্পর্শী উদাহরণ অসংখ্য পাওয়া যাবে।

এই-যে কবিদের উক্তি আমি উদ্ধৃত করলাম, তাঁরা দুঃখের অনুভূতি ব্যক্ত করে এমন কথাও বলেছেন যে, দুঃখের মধ্যেই জীবনকে গভীরভাবে আস্বাদন করা যায়। কিন্তু তাঁরা কেউই জীবনে দুঃখচর্চার মতবাদ খাড়া করেননি। সুখের দিকেই তাঁদের দৃষ্টি এবং সুখই তাঁরা কামনা করেছেন। এটাই স্বাভাবিক। সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের ধর্মই দুঃখকে পেছনে ফেলে সুখ সন্ধান করা। ত্যাগের মূলেও উদ্দেশ্য থাকে ক্ষুদ্র ও সাময়িক সুখের বিনিময়ে বৃহত ও দীর্ঘস্থায়ী সুখ লাভ করা। সৃষ্টির লক্ষ্যে মানুষ-যে প্রাণপাত পরিশ্রম করে, তার মূলেও কোনো না কোনো প্রকার আনন্দ বা সুখের তাগিদ থাকে।

মানুষের দুঃখের কারণ একই সঙ্গে তার স্বভাবের মধ্যে এবং পরিবেশের মধ্যে নিহিত থাকে। সাংখ্যদর্শন এবং বৌদ্ধধর্ম দুঃখের কারণ ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় সন্ধান করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জীবনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিই তো কামনা করেছে! জীবন থাকলে দুঃখও থাকে। দুঃখ দূর হতে পারে জীবন বিলুপ্ত হলেই। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, নির্বাণ জীবনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি—complete annihilation of life—ছাড়া আর কি? নির্বাণ লাভের পর জীবনের কিছু কি আর অবশিষ্ট থাকতে পারে?

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের কোনো কোনো জ্ঞানী নির্বাণ, মোক্ষ, পরমার্থ ইত্যাদি ভারতীয় প্রত্যয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেতির প্রতি ভারতীয় মনের গভীর আকর্ষণ আর ইতির প্রতি ঔদাসীন্য দেখে বিস্মিত হয়েছেন, এবং নিজেদের প্রত্যয়কে ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁরা স্থিত হয়েছেন তাঁদের সেই পুরাতন প্রত্যয়েই এবং মনে করেছেন যে, ভারতীয় অর্থে দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়সন্ধান অর্থহীন ব্যাপার। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সুখ বাড়াবার চেষ্টা করলে—সুখ বাড়াতে পারলে—তুলনামূলকভাবে দুঃখ কমে যায়। জীবনে সুখ ও দুঃখ দুই-ই থাকবে। ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্রহ্মচর্য, নিবৃত্তি, সংযম, মোক্ষ, পরমার্থ ইত্যাদি প্রত্যয়কেও তাঁরা অসঙ্গত ও ক্ষতিকর মনে করেছেন। কামনা-বাসনার বিলুপ্তি কিংবা বিনাশ তাঁরা চাননি, তাঁরা চেয়েছেন নৈতিক বিচার-ভিত্তিক পরিতৃপ্তি। ভোগবাদকে তাঁরা ফুৎকারে উড়িয়ে দেননি ; তাঁরা বিকশিত করেছেন humanism, utilitarianism, creative ethical hedonism ইত্যাদি আদর্শ। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদি আধুনিক রাজনৈতিক মতাদর্শসমূহেরও মূলে আছে এইসব নৈতিক আদর্শ। ইউরোপীয়দের পূর্বোক্ত ধারণাসমূহ গঠিত হয়েছিল ভারতীয়দের ধর্মভিত্তিক মধ্যযুগীয় জীবন-জগতদৃষ্টির ভিত্তিতে। আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে এবং আরো নানা কারণে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জীবন-জগতদৃষ্টিতে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেছে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের মানুষও বাঁচতেই চেয়েছে,—চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে, ভারতীয় মুনী-ঋষিরাও জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়ই সন্ধান করেছেন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থার পত্তন ঘটিয়েছেন। ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সুখ বাড়াবার অন্যতম উপায়—প্রধান উপায়—চিন্তায়, কর্মে, জীবনযাত্রায় বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুশীলন। উন্নত জীবনের প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও দর্শনকে তাঁরা সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে থাকেন। প্রতিকারসাধ্য দুঃখগুলোর প্রতিকার তাঁরা করেন—করতে চেষ্টা করেন—বিজ্ঞান ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শনকে অবলম্বন করে ; তারপর যথাসম্ভব দুঃখের প্রসঙ্গ এড়িয়ে সুখের এবং সুখী হওয়ার অনুশীলনে ব্রতী হন। কামনা-বাসনার বিনাশ, পরলোক, জীবন-জগত-বিমুখতা, বৈরাগ্য ইত্যাদি অল্পই স্থান পেয়েছে ইউরোপের জীবনপ্রবাহে ও ইতিহাসে। এক্ষেত্রে modernist-রা ব্যতিক্রম। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জীবনানন্দ বাংলা ভাষার 'আধুনিক'-দের ও ইংরেজি ভাষার modernist-দের আবহে ও আবর্তে তাঁর সাহিত্য-জীবন অতিবাহিত করেছেন।

Modernist বলতে আমি তাঁদেরকেই বোঝাচ্ছি যাঁরা বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে modernism নামে মতবাদ প্রচার করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে উদ্ভূত ও বিকশিত শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত নানা মত, তত্ত্ব ও কর্মনীতি একত্রে modernism নামে অভিহিত হয়েছে।

ইউরোপের অনুসরণে বাংলা ভাষায় এই মতবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবক্তা বুদ্ধদেব বসু এবং এর সূচনা ১৯২০-এর দশকে। বুদ্ধদেব বসুরা modernism-এর বাংলা করেছেন 'আধুনিকতা'। ঠিক করেছেন কি? Modern, modernity, modernism, modernist—এসব কথার অর্থে পার্থক্য আছে। বলা হতে পারে যে, বুদ্ধদেব বসুদের প্রচারিত 'আধুনিকতা' ইংরেজির অনুবাদ নয়, স্বতন্ত্র কিছু, ভিন্ন কিছু। আরো বলা হতে পারে, বিষয়টিকে ঘিরে ইংরেজিতেও শব্দ ব্যবহারে শিথিলতা ও বৈচিত্র্য আছে। এসব কথা মেনে নিয়েও আমরা বলতে বাধ্য যে, বাংলা ভাষায় বুদ্ধদেব বসুদের প্রচারিত 'আধুনিকতা' 'আধুনিক' ইত্যাদি শব্দ বিভ্রান্তিকর হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ ও আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুদের আত্মপ্রকাশের অনেক আগেই। সেটাকে বাতিল না করে এবং ইতিহাসের ধারণাকে পুনর্গঠিত না করে তাঁরা যে আধুনিকতার কথা বলেছেন, তা বিভ্রান্তিকর নয় তো কি? আবু সয়ীদ আইয়ুব বুদ্ধদেব বসুর মতবাদের সমর্থক না হয়েও modernism-এর প্রতিশব্দ রূপে 'আধুনিকতা'-ই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ইংরেজি modernism শব্দটির অনুষঙ্গে বাংলা 'আধুনিকতাবাদ' শব্দটিই সামনে আসে। আমি মনে করি, modernism-এর বাংলা হওয়া উচিত 'আধুনিকতাবাদ' ; কেউ 'আধুনিকবাদ'-ও বলতে পারেন ; তবে এক্ষেত্রে আধুনিকতাবাদই অধিকতর স্পষ্ট অর্থ দেয়। আমি আধুনিকতাবাদই ব্যবহার করব।

শিল্প-সাহিত্যের জগতে আধুনিকতাবাদের মর্মকথাটা হল : গভীর দুঃখের অনুভূতি ছাড়া কেউ কোনো সার্থক শিল্প কিংবা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। একথা অবশ্য শিল্প-সাহিত্যের সকল তত্ত্বেই কোনো-না-কোনোভাবে স্বীকৃত। তবে সেটা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসৃত দুঃখ। আধুনিকতাবাদীরা অভিজ্ঞতার প্রশ্ন বিবেচনায় আনেন না। তাঁরা বিশেষভাবে বলতে চান যে, দুঃখই জীবনের শেষ কথা—পরম সত্য। শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁরা সজ্ঞানে দুঃখের চর্চা করেন, দুঃখকে মহিমান্বিত করেন। জীবন-জগতের সদর্থক দিকগুলোকে তাঁরা সচেতনভাবে এড়িয়ে যান, তুচ্ছ জ্ঞান করেন, অবজ্ঞা করেন আর নঞর্থক দিকগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে অনেক বড় করে তুলে ধরেন। সুখের সম্ভাবনাকে তাঁরা বিবেচনায় ধরেন না। তাঁরা মনে করেন, লেখক লিখবেন অন্তরের তাগিদে—কেবল নিজের পরিতৃপ্তির জন্য, পাঠকদের নিয়ে ভাবার কোনো প্রয়োজন লেখকের নেই। তাঁরা শিল্প-সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কেবল রূপগত উৎকর্ষের উপর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখেন। লেখকের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব তাঁরা অস্বীকার করেন এবং লেখকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা দাবি করেন। শৈল্পিক নিরাসক্তির কথা তাঁরা এমনভাবে বলেন যে, গল্প-উপন্যাসে নৈতিক বিবেচনার কোনো সুযোগ থাকে না। সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতি তাঁরা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আরো নানা বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো বর্তমান আলোচনার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁদের সৃজনপ্রয়াস নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে প্রশংসিত হলেও বৃহত্তর সাহিত্য-পরিমণ্ডলে তাঁদের সাহিত্যদৃষ্টি অসঙ্গত ও কৃত্রিম বলে এবং তাঁদের দুঃখচর্চা দুঃখবিলাস বলে নিন্দিত হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একজন লেখকের বা শিল্পীর অভিজ্ঞতাজাত জীবনদর্শনই অভিব্যক্তি লাভ করে তাঁর কর্মের মধ্যদিয়ে। কোনো প্রকৃত সাহিত্যিকের সাহিত্যাদর্শ তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয় না। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ দুই-ই হয়ে থাকে বিকাশশীল। আধুনিকতাবাদীরা সাধারণত সাহিত্যিকের জীবনদর্শন সংক্রান্ত প্রশ্নকে বিবেচনায় আনতে চান না। শিল্প-সাহিত্যের মধ্যদিয়ে যে জীবনদর্শন তাঁরা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাকে অভিহিত করা যায় দুঃখবাদ বা নৈরাশ্যবাদ—ইংরেজিতে pessimism বলে। শিল্পতত্ত্বে আধুনিকতাবাদীদের জীবন-জগতদৃষ্টি অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায় যে, তাঁদের মতে—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে', 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই', 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি'—এজাতীয় উক্তি কোনো আধুনিক মানুষ করতে পারেন না। তাঁরা এমন কথাও প্রচার করেছেন যে, যে মানুষ আধুনিক তিনি অবশ্যই যন্ত্রণাকাতর, বিকারপ্রাপ্ত ও নৈরাশ্যবাদী হবেন। বিংশ শতাব্দীর মানুষ সম্পর্কে এ ধরনের কথা বুদ্ধদেব বসুরা কেবল-যে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে যাওয়ার তাগিদেই বলেছেন তা নয় ; বিশ্বযুদ্ধের তীব্র অভিঘাতে বলেছেন তাও নয় ; শিল্প-সাহিত্যের দুঃখবাদী তত্ত্বই তাঁরা ক্রমাগত প্রচার করেছেন। তত্ত্বের খাতিরে অনেক সময়ে তাঁরা বাস্তবকে এবং জীবনের সত্যকে অগ্রাহ্য করেছেন। জীবনের আদর্শ ও সাহিত্যের আদর্শকে তাঁরা আলাদা মনে করেছেন। তত্ত্ব এবং কর্মের মধ্য দিয়ে modernist-রা সংগঠিতভাবে বিশ্বব্যাপী প্রায় সকল দেশের রাজধানীতে অন্তত অর্ধশতাব্দীব্যাপী ক্রমাগত দুঃখ ও হতাশার মহিমা কীর্তন করেছেন। সাহিত্যিকের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করার সুযোগে তাঁরা কথাসাহিত্যে ব্যক্তির আত্মসর্বস্ব, আত্মরতিনির্ভর, অস্বাভাবিক, অদ্ভুত, উদ্ভট, বীভৎস সব আচরণকে মহিমান্বিত করেছেন। এক অঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীর সকল দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই সাহিত্যান্দোলন। আধুনিকতাবাদের উৎসাহী সমর্থকেরা দেখাতে চেয়েছেন যে, দুই বিশ্বযুদ্ধের তীব্র অভিঘাতে সৃষ্ট নৈরাশ্য ও জীবনের নিদারুণ পরাজয় বিবৃত হয়েছে আধুনিকতাবাদীদের কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে ও চিত্রশিল্পে। এ-ধারার পাশাপাশি সাহিত্যক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল ধারাও বিকশিত হয়েছিল বিশ্বব্যাপী—যা অনুপ্রাণিত ছিল মুক্তি, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধ জীবন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ের দ্বারা। পাঠকদের থেকে অভিযোগ ছিল যে, আধুনিকতাবাদীদের লেখা দুর্বোধ্য। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাবাদী ধারার বাইরে অন্য ধারাও ছিল : মোহিতলাল, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক, জসীমউদ্‌দীন, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফররুখ আহমদ প্রমুখ আধুনিকতাবাদী ছিলেন না। পরাজিত মানসিকতার পরিচয় নেই তাঁদের লেখায়। *শনিবারের চিঠি*-তেও কিছু শক্তিশালী লেখক ছিলেন। ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আজ পক্ষপাতমুক্ত দৃষ্টিতে *রবিবারের লাঠি*-র সঙ্গে *শনিবারের চিঠি*-র দিকেও তাকাতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী কবিরাও আধুনিকতাবাদীদের মতাদর্শকে গ্রহণ করেননি। মার্কসবাদীদেরও সংগঠিত প্রয়াস ছিল। আর আধুনিকতাবাদীরাও বুদ্ধদেব বসু প্রচারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতাদর্শের প্রতি নিষ্ঠ থেকে পারম্পর্যের সঙ্গে কাজ করতে পারেননি। দীপ্তি ত্রিপাঠীর *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* বইতে যে পাঁচজন কবি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছেন আধুনিকতাবাদী ('আধুনিক') রূপে—জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে—আসলেই কি তাঁদের সকলের লেখার মর্মে আধুনিকতাবাদের চারিত্র্য স্পষ্ট? কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু নিজেও কি আদৌ নৈরাশ্যবাদী?

জীবনানন্দ দাশ অভিহিত হয়েছেন বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক কবি, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি, প্রকৃত আধুনিক কবি, যথার্থ আধুনিক কবি, শুদ্ধতম কবি, নির্জনতম কবি, প্রকৃতির কবি, নিঃসঙ্গতার কবি, ধূসর জীবনবোধের কবি, জগত-সংসারবিমুখ, রোমান্টিক, সাররিয়েলিস্ট বা পরাবাস্তববাদী, এক্সিস্‌টেনসিয়ালিস্ট বা অস্তিত্ববাদী, আত্মমগ্ন, আত্মনিগ্রহপ্রবণ, মর্ষকামী ইত্যাদি অভিধায়। এখানে আধুনিক মানে আধুনিকতাবাদী। দুঃখ, নৈরাশ্য, হতাশা, অবক্ষয়চেতনা, বিকার, বিযুক্তি, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, সমাজ-বিমুখতা, জনবিমুখতা, জীবন-জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা, বিবমিষা ইত্যাদি কথা জীবনানন্দ সম্পর্কে, এবং যে সাহিত্য-পরিমণ্ডল ও সাহিত্যধারা তাঁকে আকর্ষণ করে প্রবল বেগে টেনে নিয়েছে তাতে, অসংখ্য কণ্ঠে অসংখ্য বার উচ্চারিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষী ভূভাগের শহরগুলোতে শিক্ষিত পরিমণ্ডলে অতিবাহিত হয়েছে যাঁদের জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁদের ভেতরে এসব কথা এত বহুবিচিত্রভাবে ক্রমাগত ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে, আজ এগুলো শুনতেও ক্লান্তি লাগে—অনীহা জাগে। তবে এ বিষয়টা দৃষ্টিতে পড়ার মতো যে, ১৯৩০-এর দশকের শুরু থেকে ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিক পর্যন্ত জীবনানন্দকে নৈরাশ্যবাদী কিংবা দুঃখবাদী রূপে উপস্থাপন করতে যাঁরা বিশেষ উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলেন, তাঁরা এবং তাঁদের উত্তরসূরিরাই পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন তাঁকে আশাবাদী প্রমাণ করতে। পশ্চিম বাংলার নক্সালবাড়ি অভ্যুত্থান (১৯৬৭) এবং পূর্ব বাংলার উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৮-৬৯) সাহিত্যপরিস্থিতিকে বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছে। আর ইউরোপেও ইতিমধ্যে modernism-এর প্রতি উৎসাহে ভাটা দেখা দিয়েছে—post-modernism নামে নতুন মতবাদ দেখা দিয়েছে। নানা উক্তি ও পুনরুক্তির এবং সত্তর বছরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দের জীবনবোধ, জীবন-জগতদৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব পাঠকদের সামনে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তাতে শক্তির পরিচয় কিংবা প্রতিভাস অল্পই ফুটে উঠেছে। এ জন্যই এই প্রবন্ধের শিরোনামে ব্যবহৃত উৎকণ্ঠা শব্দটি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ দেখতে পাই। শব্দটি লিখে ফেলার পরেই আমার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে—ঠিক হল কি। শব্দটির ব্যবহার ঠিকও হয়ে থাকতে পারে—এমন ধারণাও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে জেগেছে। দুই দশক আগে পর্যন্ত জীবনানন্দের যে আলোকচিত্রটি সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে কিন্তু একটা বলিষ্ঠতার দীপ্তি ঠিকরে বেরোয়। ছবিতে চোখ দুটো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ইদানিং দেখতে পাই, বিভিন্ন শিল্পীর তুলির স্পর্শে ছবিটি নানাভাবে বিকারপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাতে উদ্বেগ ও বিষণ্ণতার ছাপ যুক্ত হয়েছে। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, জীবনানন্দের চেহারা আকর্ষণীয় ছিল না, তাঁর কবিতা পাঠ সুন্দর হত না, তাঁর উচ্চারণে বরিশালের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ছিল, ঘটি-মহলে তিনি অভিহিত হয়েছেন বাঙাল বলে।

তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে অধিকাংশ সময়ে আমার মনে হয়েছে যে, জীবনানন্দ ব্যর্থ, ক্লান্ত, নিরানন্দ, ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে দুর্বল, বিপন্ন, বিষণ্ণ, দুঃখকাতর, অতৃপ্তকাম, হতাশ, রুগ্ন, অসুস্থ, সমাজবিমুখ, জনবিমুখ—শামুকের মতো নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখেন—সর্বত্র misfit ; জীবনানন্দে আনন্দের উপস্থিতি দুর্লভ ; 'জীবনানন্দ দাশ', 'সর্বানন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবন'—এসব নামের সঙ্গে কবি-ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ একেবারেই বেখাপ্পা। তবে মনে হয়, দেখবার মতো চোখ আর অনুভব করবার মতো হৃদয় তাঁর ছিল এবং তিনি অপরিমেয় কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন : অবক্ষয়, অপচয় ও অপব্যয়ের গভীর উপলব্ধি আর বিক্ষত হৃদয়ের বিস্রস্ত অনুভূতিকে কার্যকর ভাষারূপ দিতে তাঁর পারঙ্গমতা ছিল অপরিসীম। তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস—সব সামনে নিয়েই বলছি এসব কথা। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী এবং জীবনযাত্রা-প্রণালিও তাঁর আত্মকেন্দ্রিক, অন্তর্মুখি, স্থবিরতাপ্রিয়, কর্মকুণ্ঠ, দায়িত্ববিমুখ, আত্মমগ্ন, সৌন্দর্যপ্রিয়, প্রেমাকুল, উন্নত মূল্যবোধকামী, কবিতাগতপ্রাণ ব্যক্তিত্বের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়। উৎকণ্ঠা কথাটার মধ্যে কেবল শক্তির নয়—গতির, চলিষ্ণুতার ও অস্থিরতার ভাবও আছে। এ অবস্থায় মনে হতেই পারে যে, উৎকণ্ঠা কথাটা জীবনানন্দের বেলায় ঠিক প্রয়োগ নয়। তাঁর অতৃপ্তকাম নরম কোমল ব্যর্থতাক্লিষ্ট বেদনার্ত জীবনবোধে ততটা শক্তি ছিল না যাতে তিনি উৎকণ্ঠিত হতে পারেন। বুদ্ধদেব বসু কিংবা প্রতিভা বসু প্রথম দর্শনেই নজরুলের প্রতি যেভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, "মনে হয় লোকটার মধ্যে একটা কিছু আছে"—বলে বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনন্যসাধারণ প্রবল ব্যক্তিত্বের যে অসাধারণ চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেন, জীবনানন্দের পেছনে অনেক বেশি চিন্তাশক্তি ব্যয় করেও এবং অনেক মসৃণ তৈলাক্ত মোলায়েম সুচিন্তিত ভাষা প্রয়োগ করেও তা পারেন না।

জীবনানন্দে অবশ্য ক্রমবিকাশ আছে ; প্রথম পর্যায়ের জীবনানন্দ, মধ্য পর্যায়ের জীবনানন্দ এবং শেষ পর্যায়ের জীবনানন্দে পার্থক্য আছে। *ঝরা পালক*-এর জীবনানন্দ আর *রূপসী বাংলা*-র জীবনানন্দও এক নন। *বনলতা সেন* আর *রূপসী বাংলা*-য় জীবনানন্দ কবি হিসেবে—মানুষ হিসেবেও—সবচেয়ে উজ্জ্বল। প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের জীবনানন্দ আর কবিতা ও গল্প-উপন্যাসের জীবনানন্দকেও ভিন্ন মনে হয়। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে জীবনানন্দ দুঃখক্লান্ত মন নিয়েও ক্রমেই যেন ক্ষুব্ধ এবং কিছুটা বহির্মুখি হয়ে উঠছিলেন। তাঁর কবিতায় ও গল্প-উপন্যাসেও এর লক্ষণ দেখা যায়। সমালোচনায় ও প্রবন্ধে জীবনানন্দ বহুলাংশে যৌক্তিক ও সমাজসচেতন। তাঁর যৌক্তিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর কবিতার ও গল্প-উপন্যাসের অনুভূতির সঙ্গতি পাওয়া দুষ্কর। রচনাবলীতে তাঁর আত্মজৈবনিক ভিত্তির কথা ভাবতে গেলে মনে হয়, কবিতায় জীবনানন্দ অনেক কথা লুকাতে চেয়েছেন, কিন্তু উপন্যাসে তিনি নিজেকে—নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতাগুলোকে, ব্যর্থতার উপলব্ধি ও আত্মনিগ্রহের স্বভাবকে অনেক বেশি প্রকাশ করেছেন। প্রতিবাদের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবণতা জীবনানন্দের নিজের এবং তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়কদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। গল্প-উপন্যাসের নায়কেরা প্রতিকূলতা ও বিরূপতার মুখে নিজেদেরকে কেবল পিছিয়ে নিতে জানে—আত্মনিগ্রহকে শ্রেয়স্কর মনে করে। তবে উচ্চতর মূল্যবোধ, উন্নততর রুচি ও নবতর সৌন্দর্যের জন্য কাতরতা আছে তাঁর নায়কদের।

'শীত ঋতু ও জীবনানন্দের উপন্যাসের নায়ক' শীর্ষক প্রবন্ধে (দ্র. *পশ্চিমবঙ্গ*, কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সংখ্যা, কলকাতা ১৪০৭) মনোজ চাকলাদার মন্তব্য করেছেন : "জীবনানন্দের উপন্যাসে নায়কেরা রমনী খুঁজে পায় না, ভালোবাসার আকুতি সত্ত্বেও নারীর ভেতর হৃদয় খুঁজে পায় না, নারীরা পুরুষের সঙ্গে মিলতে পারে না পৌরুষের অভাবে। পুরুষ নেই জীবনানন্দের উপন্যাসে। পুরুষহীন সমাজে নারীরা কখনো রুক্ষ, কখনো কোমল, আবেগপ্রবণ, শরীরমন ছেড়ে দেয় আলগাভাবে, অথচ পৌরুষের কোনো উত্তাপও পায় না নারীরা, পুরুষের স্বপ্নেও তাদের স্বপ্ন মেলে না, জীবনের অর্থও খুঁজে পায় না, অপরদিকে পুরুষেরা তাদের জীবনের শীত কাটিয়ে উঠতে পারে না, নারীদের যে রক্তশূন্যতা সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ত দিতে পারে না, এভাবে শুকিয়ে যায় নারী, তার আত্মা মিলিয়ে যায়, খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের অস্তিত্ব, হারিয়ে যায়, নারীরা কবিমন নিয়ে জিন-পরীদের মতো ঘুরে বেড়ায়, পুরুষেরা ভয় পায়, ভয় পায় দেখে মনের ভেতর ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সহবাস, ভাবতে যেন তৃপ্তি, দুঃখ যেন এক বিলাস, নায়কেরা আত্মার ভেতরে মৃত, শারীরিক বা মানসিকভাবে নায়কেরা অগোচরে মরে যায়। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ভেতরে প্রশ্ন জাগে, এ নায়কদের এ পরিণতি কেন, বা রমনীরা কেন পুরুষের সঙ্গে নিজেদের হৃদয় খুলে দিতে পারে না, বা খোলা হৃদয় সত্ত্বেও পুরুষের সঙ্গে নিজেদের মর্যাদাকে সম্মানজনক মনে করে না কেন—সব চরিত্র শিক্ষিত, শিল্পবোধে সংস্কৃতিবোধে উন্নত, তবু তাদের আত্মার কষ্ট কেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নিয়তির মতো কেন?" "জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসের নারী-পুরুষেরা শ্রদ্ধাও করে না পরস্পরকে, ভালোবাসতেও পারে না পরস্পরকে। শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে নিঃশেষ হয়। এ তাদের নিয়তির মতো, মুক্তির পথও খুঁজে পায় না। অবশ্য চরিত্রেরা কেউ ঈশ্বরে বা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী নয়। তাদের প্রাতিস্বিকতাবোধও নেই স্থিরভাবে।" "চরিত্রের ভেতর অজস্র যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রতিভাস এবং অধ্যাস ও যৌন প্রতীক, মেটাফর ও তীব্র কামনা। ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্ব যেন নারী-পুরুষের চরিত্র ঘিরে। যেন যৌন আবর্তে ঘুরছে চরিত্রেরা।" প্রবন্ধটিতে আরো বলা হয়েছে, "জীবনানন্দের উপন্যাসে নায়কদের নারী সম্পর্কে চিন্তার কর্কশ ও কদর্য রূপ প্রকাশ পেলেও, নারীর অবমাননা করেননি। চরিত্রেরা নারীবিদ্বেষী কখনো, তা ব্যক্তিজীবনে যাই ঘটুক না কেন জীবনানন্দের, বলা যায় সর্বত্রই নারীর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসাই ফুটে ওঠে। বরং পুরুষদের কখনো নারীদের সমকক্ষ করে তুলতে পারেননি যাতে নারীরা সুখী হতে পারে।" "তিনি নারীরই ধ্যান করে গেছেন উপন্যাসে।" সার্বিক বিচারে মনে হয়, জীবনানন্দের নায়ক-নায়িকাদের আত্মকেন্দ্রিকতা যতটা individualistic ততটাই egocentric.

বিভিন্ন সময়ের বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দের জীবন একটাই—তাতে সময়ে সময়ে অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রকৃতি বিভিন্ন হলেও সেগুলো এক জীবনেরই অংশ—জীবনানন্দ দাশ একজনই। স্বাতন্ত্র্য নিয়েও জীবনানন্দ প্রতিনিধিত্ব করেন বিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষার আধুনিকতাবাদীদেরই ('আধুনিক')।

তবে লক্ষ্য করবার মতো আরো একটা দিক আছে। জীবনানন্দের যেসব কবিতা কাব্যানুরাগীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে আসছে—যেসব কবিতা অপেক্ষাকৃত বেশিসংখ্যক পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করেছে, সেসবের অনেকগুলোতে—যেমন বনলতা সেন, হাওয়ার রাত, নগ্ন নির্জন হাত, অন্ধকার, নিরালোক, ১৯৪৬-৪৭, অদ্ভুত আঁধার এক, বোধ ইত্যাদিতে—সত্য সত্যই গভীর জীবনোৎকণ্ঠার প্রকাশ আছে। শক্তিহীন, দুর্বল, ক্লান্ত, রুগ্ন, জীবন-জগতবিমুখ লোকের পক্ষে এই রকম উচ্চারণ অসম্ভব। তবে তাঁর অনুরাগীদের প্রিয় তাঁর লেখা এমনও অনেক কবিতা আছে যেগুলোতে দুর্বল চেতনার, রুগ্ন জীবনবোধের, বিমর্ষ চেহারার, ব্যর্থকাম মালিন্যের, ক্ষীয়মান জীবন-জগতদৃষ্টির পরিচয় অস্পষ্ট নয়। এটাও সত্য যে, তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধিতে সূক্ষ্মতা, গভীরতা, বিস্ময়বোধ ও কৌতূহলের অনুপস্থিতি দেখা যায় না কোথাও। তবে দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপ্তির অভাব লক্ষ্য করবার মতো—জীবন-জগতের সব দিকে, বহু দিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে চাননি তিনি—মহত লেখকদের, great writer-দের বেলায় যেমন দেখা যায়। তাঁর গল্প-উপন্যাস পর্যালোচনা করেও কেউ বলতে পারেন যে আধুনিকতাবাদ-নির্দেশিত সঙ্কীর্ণ গলিপথ ধরেই তিনি এগিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের লেখায় তাঁর নানা গুণাবলীর মর্মে প্রখর বিস্ময়বোধের প্রকাশ আছে বলেই তাঁর লেখা পাঠকদের কাছে মর্মস্পর্শী। পাঠক তাঁর ব্যঞ্জনাময় শব্দাবলীতে এবং চিত্ররূপময় বর্ণনায় নিজের অনেক অস্ফুট অনুভূতির ও অস্পষ্ট উপলব্ধির প্রকাশ খুঁজে পান বলেই তাঁর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। কবিতার তুলনায় তাঁর গল্প-উপন্যাসের রূপগত উৎকর্ষ কম হতে পারে ; তবে সেগুলোতেও তাঁর বিস্ময়বোধ, কৌতূহল ও মূল্যসচেতনতার ঘাটতি নেই। *রূপসী বাংলা*-র কবিতাগুলোতে অপরূপ বিস্ময়বোধ, কৌতূহল, বাস্তবের অনুসরণ, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধতা, সংবেদনশীলতা, কল্পনার বিস্তার ও গভীর জীবনবোধের পরিচয় আছে, সন্দেহ নেই ; তবে ভাষায়, প্রকাশরীতিতে, রূপকে-প্রতীকে-বাকপ্রতিমায় কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার ছাপও লেগে আছে। আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে : একজন অনুভূতি-প্রবণ স্পর্শকাতর, অহঙ্কারী, অভিমানী, অবসন্ন, অবহেলিত মানুষের জীবন-সায়াহ্নের এপিটাফ যেন *রূপসী বাংলা*-র এক-একটি কবিতা। একটি কবিতা স্মরণ করা যাক :

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো-বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গির ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায় ;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক : আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

যদি আমরা স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথের গানের কথা : 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' তাহলে *রূপসী বাংলা*-র কবিতাগুলোতে ব্যক্ত অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথের এই গানের অনুভূতির কাছাকাছি মনে হবে। দুজনের বাচনভঙ্গিতে ও জীবন-জগতদৃষ্টিতে অবশ্য মৌলিক পার্থক্য আছে। এই রকম অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কাক, সুদর্শন, লক্ষ্মীপেঁচা, ঘোলাজল ইত্যাদির প্রতীক ব্যবহার করতেন না আর বাস্তবকে এত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতেন না এবং তাঁর কল্পনার ধরনও অন্যরকম হত। রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা বিশেষ থেকে নির্বিশেষের দিকে, দেহ থেকে দেহাতীতের দিকে, সীমা থেকে অসীমের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রতি। জীবনানন্দ বিশেষ নিয়েই মগ্ন হয়ে পড়েন। যদি আমরা স্মরণ করি মধুসূদনের উক্তি : 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে'—তাহলে জীবনানন্দের ব্যক্তিত্বকে মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন এবং নিষ্প্রভ মনে হবে। উপরে উদ্ধৃত 'আবার আসিব ফিরে' শীর্ষক কবিতাটির প্রথম আট পঙ্‌ক্তিতে জীবনানন্দ নিজের অভীপ্সা ব্যক্ত করেছেন ; কিন্তু শেষ ছয় পঙ্‌ক্তিতে অন্য কারও অনুভূতি অনুমান করতে চেয়েছেন যাঁকে তিনি 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। কে এই তুমি? হয়তো কবিতাটির পাঠক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রাণ খুলে বাংলার প্রকৃতির প্রতি তাঁর অন্তহীন মুগ্ধ ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন তার সংখ্যা নির্ণয় দুরূহ ; কিন্তু বাঙালির প্রশংসা করতে সক্ষম হননি কোথাও কোনো দিন। জীবনানন্দও কি তা পেরেছেন? নীরদ চৌধুরীর প্রতি বাঙালি ক্ষিপ্ত বটে তবে তাঁর লেখায় কেবল তিরস্কার নয়, তিরস্কারের মর্মে বাঙালির প্রতি মমতাও আছে—যদিও যেভাবে বাহাদুরি প্রকাশ করে তিনি কথা বলেছেন তা শোভনতার সীমা অতিক্রম করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিও বাঙালি রুষ্ট—হিন্দু বাঙালি, মুসলমান বাঙালি—উভয়েই। বঙ্কিমের লেখায় বাঙালির প্রতি যে মমতার প্রকাশ আছে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালিকে বড় করে গড়ে তুলবার যে উৎকণ্ঠিত প্রয়াস আছে, বাংলা ভাষার আর কোন্ লেখকের লেখায় তা আছে? জীবনানন্দ বাংলার—বিশেষ করে বরিশাল জেলার নদীতীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের—অসাধারণ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রসন্ন প্রসাদে 'জন্ম-জন্মান্তরের জন্য' বাঁধা পড়েছিলেন ; কিন্তু বাংলার মানুষ তাঁকে প্রীত করেছিল, প্রসন্ন করেছিল, প্রফুল্ল করেছিল, আনন্দ কিংবা শান্তি দিয়েছিল—এমন কোনো প্রমাণ কেউ সামনে আনেননি। তাঁর একান্ত অভিনব ও দুরূহ কবিতাবলী এবং তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব—দুইই পরিহাসের বিষয় হয়েছে চতুষ্পার্শে তাঁর সহকর্মীদের অনেকের কাছে। তাঁর লেখা এবং তাঁর জীবন প্রমাণ করে—সমাজ, সভা, সমাবেশ, সম্মিলন, আসর, বৈঠক, জনজীবন ইত্যাদি থেকে দূরে থেকেছেন তিনি। মানুষকে আপন করে নেওয়া দূরের কথা, মানুষের সান্নিধ্যও তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন।

অবশ্য একদা জীবনানন্দ লিখেছিলেন : 'আমারে দু দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।' সম্প্রতি দেখলাম, কলকাতার *দেশ* পত্রিকায় 'পুরুষের জন্য, পুরুষেরই সৃষ্টি' শিরোনামে রচিত এক প্রবন্ধে জনৈক মহিলা লিখেছেন : " 'নাটোরের বনলতা সেন'—অংশত এই ঠিকানা দিয়ে আর নায়িকার নামের পরে পদবি যোগ করে বাঙালি পাঠককে একই সঙ্গে চকিত আর মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। ... কিন্তু আসলে কি 'বনলতা সেন' নামের এই কবিতাটি আমাদের খুব নতুন কিছু বলে? বলে তো সেই পুরোনো কথাই। ... পুরুষ যেভাবে নারীকে চেয়েছে সেভাবেই সে এসেছে কবিতায়।" প্রবন্ধটিতে ভদ্র মহিলা অবশ্য জীবনানন্দের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেও কার্পণ্য করেননি। তবে কোনো নারী যদি নারীবাদের পতাকা উড়িয়ে 'বনলতা সেন' সম্পর্কে বলেন : 'পুরুষের জন্য পুরুষেরই সৃষ্টি' তাহলে জীবনানন্দের শান্তির অনুভূতি মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং পরিবেশটাই হয়ে পড়ে অসুন্দর। আমার মনে হয়েছে জীবনানন্দের বনলতা কোনো রক্ত-মাংসের মেয়ে নন—যদিও তাঁর নাটোরের ঠিকানা আর নামের সঙ্গে সেন পদবি উল্লেখ করে এবং তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়ে তিনি তাঁকে বাস্তব, জীবন্ত, সবাক সত্তায় পরিস্ফুট করেছেন। আর যে শান্তি তিনি পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন তাও মনে হয় বাস্তব জগতের নয়—কল্পলোকের। জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় এমন জীবনীশক্তিসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ জীবনোৎকণ্ঠা আর কোথাও আছে কিনা বলতে পারব না ; তবে একটা স্নিগ্ধ আকুলতা সুরঞ্জনা, সরোজিনী, শ্যামলী, সুদর্শনা, অরুণিমা সান্যাল, শেফালিকা বোস ও মৃণালিনী ঘোষালকে নিয়ে দেখতে পাই। নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ, তাকে কেউ প্রেম বলেন না ; প্রেমের অপরিহার্য শর্ত এককেন্দ্রিকতা। কবিতা পড়ে মনে হয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের প্রতি এই আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। তবে বনলতার প্রতি যে আকর্ষণ তার শক্তি অনেক বেশি এবং সবকিছু অতিক্রম করেও তা পাঠকের চেতনায় অস্তিমান থাকে। বাঙালি জীবনের বাইরে কল্পনাকে প্রসারিত করা অসম্ভব হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের পক্ষে—পৃথিবীকে তিনি দেখেছেন বাঙালির চোখ দিয়ে। তাঁর কল্পনাকে বাস্তবভিত্তিক মনে হয়। প্রেম ও নারী কেন্দ্রিক কল্পনার বিস্তার যতই বিস্ময়কর হোক, জীবনানন্দ বাস্তব থেকে বিচ্যুত হননি কখনো। রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী অথবা লীলাসঙ্গিনী কিংবা 'পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়া'-কে বনলতা সেনের পাশে মধ্যযুগীয় মনে হয়। তবে মধ্যযুগের মানুষের মনেও সৌন্দর্যবোধ ছিল, অনেকের সুন্দর সৃষ্টি ছিল। বনলতা সেনের 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'—এই উক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথমা প্রিয়ার 'হে বন্ধু, আছ তো ভালো?'—এই উক্তি মনে আসে। কোনো প্রকার তুলনার জটিলতায় না গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' (দূরে বহুদূরে/স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে) কবিতাটি পড়লে তাতেও অন্তরে প্রেমের অপরূপ সুন্দর অনুভূতির স্পর্শ লাভ করা যায়। প্রেম ও নারী জীবনানন্দের অনুভবের ও চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয়। নারী, প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর চেতনাকে নিবিড় অনুরাগে শক্ত বেষ্টনীতে ঘিরে রেখেছে।

জীবনানন্দের রচনাবলী কামগন্ধমুক্ত নয়। তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা শরীর-সচেতন। তাঁর কবিতাতেও যৌনচেতনার প্রকাশ অস্পষ্ট নয়। মনে হয়, যৌনচেতনাকে সজ্ঞানে জীবনের এক অমোঘ সত্য এবং চালিকাশক্তি রূপে অনুভব করতেন জীবনানন্দ। প্রকৃতির সৌন্দর্যও তিনি বর্ণনা করেছেন নারী-অঙ্গের উপমায়। স্তন, যোনী, জরায়ু ইত্যাদি শব্দ তিনি অবলীলায় পুন পুন ব্যবহার করেছেন । 'জীবনানন্দ ও তাঁর গল্প-উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তী চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন (দ্র. সুব্রত রুদ্র সম্পা., *জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি*, কলকাতা, ১৯৯৯) যে, জীবনানন্দের জীবনে ভোগের বাসনা প্রবল ছিল, যা কখনো পরিতৃপ্ত হয়নি। অর্থ, কীর্তি কিংবা সচ্ছলতার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বিশেষ বিচলিত করেনি ; "শান্ত অবসর, ভিড়বর্জিত প্রিয়সঙ্গ, প্রকৃতির ইন্দ্রিয়স্পর্শী নৈকট্য এবং সব রকম শরীরী অনুভবের রম্যতার জন্য তৃষ্ণার্ত ছিলেন তিনি।" "মানুষ ও মানুষীর প্রধান যে সম্পর্কটি তাঁর উপন্যাসগুলোতে নির্ণীত হয়েছে তা তীব্র এক শরীর ভোগের সম্পর্ক। যৌন সুখ ছাড়াও তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ সুখ—রুচিকর খাওয়া, তৃপ্তিকর ঘুম, শীতে উষ্ণতা, গরমে শীতলতার একান্ত শরীর উপভোগ্যতা। তাঁর উপন্যাসে যৌনতার দিকে মানুষের দুর্মর প্রবণতা, যৌন সুখের আকাঙ্ক্ষা ও তৃপ্তি সবকিছুর উপরে। যৌন চরিতার্থতার বোধ সাধারণ মানুষকে দিচ্ছে একটি প্রশান্ত পূর্ণতার জ্যোতি। এই চরিতার্থতার অভাবে সূক্ষ্মরুচির বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ব্যর্থ ও নিষ্ফলঅস্তিত্ব হয়ে যাচ্ছে। তাঁর উপন্যাসগুলির ভাষায় ও ভাবনায় প্রবল, অনাবরণ, অ-মধুর, জান্তব যৌনচেতনার অভিঘাত পাঠককে প্রায় বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত করে ফেলে। এ জাতীয় লেখার পেছনে যদি অসম্ভব একটি জোর, আমূলমথিত একটি আত্মিক যন্ত্রণা অনুভব না-করা যেত, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর উপন্যাসগুলিকে বলতে পারতাম অশ্লীল।" বাস্তবের সকল দাবির পীড়নের মধ্যেও জীবনানন্দের ছিল "এই পৃথিবীকে শরীরের প্রতিটি কোষ—মনের প্রতিটি বিন্দু দিয়ে ভোগ করবার সাধ।" সেই অপূর্ণ, ব্যর্থ, অবদমিত, বিকারপ্রাপ্ত ভোগের বাসনায় পীড়িত জীবন তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। তবে উচ্চতর মূল্যবোধের আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় ও রাবীন্দ্রিক আবহে তৈরি বাঙালি-মনে জীবনানন্দের অনেক বর্ণনা অভিনব কিন্তু ছন্দ পতনের মতো। হয়তো আধুনিকতাবাদের প্রভাবেই তিনি যৌন প্রসঙ্গে বেশি এগিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা কেউ কেউ তাঁর নিজের এবং তাঁর স্ত্রীর আদলে সৃষ্ট, সন্দেহ নেই : নায়িকা পরিপাটি সাংসারিকতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, কর্তৃত্বের সুযোগ, গতানুগতিক ভোগ-সুখ, স্বামীর বিত্ত-বেসাত ইত্যাদির অনুরাগী, কিন্তু এসবের অভাবে অতৃপ্ত ও অসন্তুষ্ট ; আর নায়ক নিশ্চেষ্ট, নিরীহ, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে অসমর্থ, অর্থ উপার্জনে ও পারিবারিক দায়িত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালনে নিরুৎসাহ, কর্মকুণ্ঠ, আত্মমগ্ন, সৌন্দর্য প্রেম ও উচ্চতর মূল্যবোধের অভিলাষী, স্পর্শকাতর, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালনে অপারগ হয়ে অপরাধবোধে পীড়িত, স্ত্রীর চাপে বিপর্যস্ত—স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অসুখী। গল্প-উপন্যাসে জীবনানন্দ কোথাও কোথাও নিতান্তই আত্মজৈবনিক।

বুদ্ধদেব বসু প্রচারিত সাহিত্যাদর্শের, আধুনিকতাবাদের—modernism-এর, বলয়ের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর সাহিত্যজীবন অতিবাহিত করেছেন। তবে বুদ্ধদেবের সঙ্গে জীবনানন্দের কোনো ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা কার সঙ্গেই-বা তাঁর গড়ে উঠেছিল? বুদ্ধদেব জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা লিখে, তাঁর গ্রন্থের সমালোচনা লিখে তাঁকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। নিজের মতাদর্শ বাস্তবায়নের কাজে জীবনানন্দের প্রতিভাকে কাজে লাগাবার প্রয়াস ছিল তাঁর। জীবনানন্দের যে ব্যক্তিত্ব, তাতে বুদ্ধদেবের এই ভূমিকা ছাড়া তিনি সাহিত্যজগতে জীবনকালে যতটা এগিয়েছিলেন ততটাও এগোতে পারতেন কি-না সন্দেহ। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, বুদ্ধদেব বসুর কবিতার বইয়ের সমালোচনা লিখতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ হিসেব করেই কথা বলেছেন—বিশেষ উদার হওয়ার চেষ্টা করেননি। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেবও সন্তুষ্ট থাকেননি জীবনানন্দের সাহিত্য-প্রবণতা নিয়ে।

জীবনানন্দ স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন এই কারণে যে, আধুনিকতাবাদের ধারায় চলে থাকলেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন আর সাহিত্য-সাধনায় ছিলেন সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক*-এর কবিতাগুলোতে আধুনিকতাবাদের কোনো লক্ষণ বা প্রভাব বা পরিচয় নেই। তবে এ গ্রন্থে উৎকৃষ্ট কবিতাও প্রায় নেই বললে ভুল বলা হয় না। এতে স্মরণযোগ্য পঙ্‌ক্তিও দুর্লভ। রূপগত দিক দিয়ে, মনে হয়, কবিতাগুলো উত্তীর্ণ—যদিও অন্তর্গত অনুভূতি ও ভাব বিশেষত্বহীন। এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সনে। তখন তাঁর বয়স ২৮ বছর। পরে তাঁর জীবনকালে এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেরই অন্তত অর্ধেক কবিতা উৎকৃষ্ট, কোনো কোনোটি একবার পড়লে সারা জীবন মনে থাকে—বার বার পড়তে এবং মনে রাখতে ইচ্ছা করে। তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতাগুলোতে আধুনিকতাবাদের চেয়ে আন্তরিকতার পরিচয়ই উজ্জ্বল। যদিও কবিতায় দুরূহ শব্দ জীবনানন্দ কমই ব্যবহার করেছেন, কবিতার ভাষা—সাধু ভাষার ক্রিয়া পদের ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও—কথ্য ঢঙের—শ্লথ, এলায়িত ছন্দের গতি, তবু তাঁর কবিতার অর্থ-যে সহজে বোঝা যায় তা নয়। তবে তাঁর শব্দাবলী ও বর্ণনা থেকে অনুভব করবার মতো গভীর ব্যঞ্জনা লাভ করা যায়। তাঁর কবিতা পাঠকের জীবনেরও ক্লান্তি, অবসাদ, ব্যর্থতাবোধ, পরাজয়ের গ্লানি ও দুঃখের চেতনাকেই স্পর্শ করে এবং পাঠককে আত্মমগ্ন করে তোলে।

জীবনকালে নিজের রচিত প্রায় অর্ধেক কবিতা তিনি পাণ্ডুলিপি-আকারে গ্রন্থিত করতে পেরেছিলেন এবং অর্ধেকের বেশি অগ্রন্থিতরূপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, সম্প্রতি গ্রন্থিত হয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অর্ধেক তিনি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, বাকি অর্ধেক তাঁর মৃত্যুর পরে অন্যদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও তিনি যত্নে সাজিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এযাবত প্রাপ্ত ও প্রকাশিত দুটি অসমাপ্ত উপন্যাসসহ তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দ এবং ছোটগল্পের সংখ্যা অন্তত একশ বারো। *ঝরা পালক* গ্রন্থের পরে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত কবিতাসমূহের প্রায় অর্ধেকই নিখুঁত ও উৎকৃষ্ট। আমাদের প্রশ্ন জীবনানন্দের শৈল্পিক উৎকর্ষ নিয়ে নয়—তাঁর জীবনবোধ ও জীবন-জগতদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য নিয়ে। অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা আর ছন্দ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলঙ্কার ও শব্দগুণ বিচারে জীবনানন্দের প্রায় প্রতিটি কবিতাই তুলনামূলকভাবে সহজ-সরল ও উৎকৃষ্ট—কোনো কোনোটি অতি উৎকৃষ্ট। প্রকৃতির অনেক তুচ্ছ ও অতি সামান্য উপাদানকে তিনি তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধি ব্যক্ত করার অবলম্বন হিসেবে অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তবে মর্মার্থের দিক দিয়ে তাঁর অধিকাংশ কবিতাই দুর্বোধ্য—খুব কম কবিতা সহজবোধ্য।

বলাই বাহুল্য যে, কালজয়ী কবি-প্রতিভার অধিকারী জীবনানন্দ আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে—নিজের বিবেকের কাছে নিজে পরিষ্কার থেকে—প্রাণপণে কলম চালিয়েছেন, স্বকীয়তা বিসর্জন দেননি। প্রবল সামাজিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হলেও আত্মবিক্রয়ের পথে পা বাড়াবার মতো মানসিকতা তাঁর হয়নি, নিজের অন্তরের নির্দেশ অমান্য করে মতবাদের অনুসরণে কিংবা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কাজ করেননি তিনি। লেখার বেলায়, মনে হয়, কখনো কখনো তিনি নিজের অজান্তেই নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আধুনিকতাবাদের স্রোতে ভেসেছেন। প্রশ্ন জাগে মনে : সাহিত্যজীবনে কেন তিনি এই সঙ্কীর্ণ গলিপথ ধরে চলেছিলেন? তাঁর *কবিতার কথা* এবং সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলো পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, তাঁর স্বকীয় সাহিত্যদৃষ্টি ছিল এবং তিনি বুদ্ধদেব বসুদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে একমত হননি। প্রশ্ন হল, জীবনানন্দকে আমরা কি সরাসরি দুঃখবাদী কিংবা নৈরাশ্যবাদী বলব? বলা উচিত হবে? মনে তো হয় যে, শেষ পর্যন্ত তিনি হৃদয়ে আশাকেই লালন করতে চেয়েছেন এবং আশা নিয়েই বাঁচতে চেয়েছেন। নৈরাশ্যবাদীরাও কি জীবনে বাঁচার আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করতে পারে? কদাচিত কেউ আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার রহস্য ভিন্ন বিবেচনার বিষয়। Modernism নামক যে মতবাদ দিয়ে ক্রমাগত জীবনানন্দের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়কে হাতুড়িপেটা করা হয়েছে, উৎসাহিত ও প্ররোচিত করা হয়েছে, তার কতটা প্রভাব তাঁর স্নায়ুমণ্ডলিতে পড়েছে? কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে তিনি যে ক্লান্তি ও বিষণ্নতাবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন—সমাজবিমুখ, জনবিমুখ, বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন, বিকারপ্রাপ্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার উৎস কোথায়? জীবনের বাইরে কোনো কিছুতে? কিসের প্রভাবে তাঁর জীবনে এমনটি ঘটল? দুই বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত আর দুঃখবাদ দিয়ে আধুনিকতাবাদীরা যেভাবে তৎকালীন শিল্প-সাহিত্যের ও মানবেতিহাসের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে থাকেন, তা মোটেই ঠিক হয় না। তাঁরা কেবল এক দিক দেখেন, অন্যদিকে তাকাতেই চান না। জীবনে তাঁরা কেবল ভোগ করতে চান, অর্জন করতে কিংবা দায়িত্ব নিতে চান না। জীবন ও জীবনপরিস্থিতির যে ব্যাখ্যা তাঁরা দেন তাকে social fatalism বলে অভিহিত করলে মোটেই ভুল হবে না। Social fatalism কোনো গ্রহণযোগ্য জীবন-জগতদৃষ্টি নয়। মানুষ নিতান্তই প্রাকৃতিক নিয়মের, সামাজিক প্রথা-পদ্ধতির ও রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানের শৃঙ্খলে বাঁধা অবস্থার দাস নয়, নিতান্ত প্রবৃত্তির দাসও সে নয়। ১৯৭১ সনেও আমাদের দেশে আমরা একটা যুদ্ধ অতিক্রম করেছি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা তা আমাদের জীবনকে অনেক বেশি স্পর্শ করেছে, আঘাত করেছে, আহত ও বিক্ষত করেছে—জান-মাল ধ্বংস করেছে। যুদ্ধকালে দেশের ভেতরে কে বাঁচবে, কে মরবে—কিছুরই কোনো নিশ্চয়তা ছিলনা। বাস্তুত্যাগী হয়ে যারা দেশের বাইরে গিয়েছিল তাদেরও নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা ছিল। কই, হতাশার কালো পতাকা উড়িয়ে নৈরাশ্যবাদী কোনো সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কেউ তো তখন আত্মপ্রকাশ করেননি! বিশ্বযুদ্ধ যদি ইউরোপের যুদ্ধলিপ্ত দেশগুলোতে দুঃখবাদের কিংবা নৈরাশ্যবাদের জন্ম দিয়ে থাকে তাহলে তার অনুকরণে কিংবা অনুসরণে বাংলা ভাষার লেখকদের দুঃখবাদচর্চা কি স্বাভাবিক ছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের আবহে জনমনে যখন শক্তিশালী আবেগ ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রত্যয় জেগেছিল, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই—এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত নজরুল প্রমুখের বিস্ময়কর রকম সুন্দর সব দেশাত্মবোধক সঙ্গীত মানুষকে ভেতর থেকে আশাদীপ্ত করে তুলেছিল, মানুষ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তি নিয়ে জেগে উঠেছিল, গণজাগরণের সেই ঐতিহাসিক পর্যায়ে—হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার অপঘাতের মধ্যেও—সমস্ত দুঃখ-বেদনা অতিক্রম করে বাংলা ভাষার শিল্পী, কবি ও ভাবুকদের পক্ষে আশায় উদ্দীপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। যখন দেশব্যাপী মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল জাগরণমূলক সব গান, যেমন :

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ান, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ?
কোটি কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?
কোটি কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।

তখন দেখা গেল, সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু আত্মপ্রকাশ করলেন নৈরাশ্যের নবী হিসেবে, আর জীবনানন্দের মতো কালজয়ী প্রতিভাকে নৈরাশ্যে অপচিত করতে চাইলেন। সাহিত্যে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে অসুস্থতা ও অস্বাভাবিকতার এবং বিকার-বিকৃতির রূপায়নকে করা হল মহিমান্বিত। কেন এমন করা হল? কালো-কিছুর প্রতি ভালো করে তাকাতে পারলেন না কেন তাঁরা? অত্যন্ত জটিল ও কঠিন প্রশ্ন। তবু এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান আজ বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবাংলায় প্রগতির অপরিহার্য দাবি। দল-মত নির্বিশেষে তখনকার সকল সৃজনপ্রয়াসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, গান ও শিল্পকলাকে একত্রে বিবেচনায় ধরে তুলনামূলকভাবে বিচার করতে হবে আধুনিকতা-বাদীদের উৎকর্ষ। তাহলে বোঝা যাবে, কোন্ দিক দিয়ে কাদের কর্ম কতখানি উৎকৃষ্ট। মনে হয়, গণজাগরণ ও স্বাধীনতাসংগ্রামের সেই উত্তাপের মধ্যে স্বাধীনতাবিমুখ, সমাজবিমুখ, গণবিমুখ, বিযুক্তিমূলক, বিচ্ছিন্নতামূলক, নেতিবাচক, দুঃখবাদী ভূমিকা নিয়ে বুদ্ধদেব বসুরা ক্লীবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। জীবনদায়িনী শক্তির জীবন্ত সংস্পর্শ ত্যাগ করে তাঁরা সঙ্গ নিয়েছেন এক জীবনবিনাশী নিষ্প্রাণ সত্তার। *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে আবু সয়ীদ আইয়ুব আধুনিকতাবাদীদের ('আধুনিক কবিদের') দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কীর্ণতা ও ত্রুটির দিকসমূহকে সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। তবে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু তিনি বিবেচনায় ধরেননি—ধরতে চাননি।

বিচারমূলক ও বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টি নিয়ে জীবনানন্দের কবিতাবলী পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে যেতে থাকলে নৈরাশ্যবাদের নিশ্চিত পরিচয় তাঁর কিছু কবিতাতে অবশ্যই পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ কবিতা পড়েই মনে হয়, বৈরী পরিবেশে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি হতাশার অন্ধকারে আশার আলো খুঁজেছেন। ইতিহাসচেতনা, সময়চেতনা ও জন্মান্তরের-সংস্কার তাঁর মধ্যে একসঙ্গে কাজ করেছে, তবে তিনি বাস্তবকে অবলম্বন করে ইতিহাসের দিক দিয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করার তাগিদ কমই বোধ করেছেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত সুপরিচিত প্রাচীন সভ্যতাগুলোর নানা বিষয় তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন, তবে এতে কোনো প্রকার সৃষ্টিশীল ইতিহাসচেতনার কিংবা তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসদৃষ্টির পরিচয় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরান সভ্যতা থেকে উপমা এসেছে অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাসের অনুষঙ্গে। জন্মান্তরের ধারণা তাঁর মধ্যে কাজ করেছে ধর্মীয়ভাবে নয়, ইতিহাসচেতনার অনুষঙ্গে : এজন্মে হল না, হয়তো পরজন্ম আছে, হয়তো পরজন্মে হবে—এই রকম অনুভব। খুব বেশি বিমূর্ত তাঁর অধিকাংশ ধারণা ; আর ধারণা ও অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে প্রায়শ তিনি গ্রহণ করেছেন প্রতীকের আশ্রয়। তবে এমন পঙক্তিও আছে তাঁর কবিতায় :

এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়। ...
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে। ...
সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
এ বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;—
প্রায় ততদূর ভালো মানবসমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

আমাদের বুঝতে হবে যে, কোনো কবির কিংবা লেখকের রচনায় দুঃখ ও বিপর্যয়ের বর্ণনা প্রাধান্য পেলেই সেই কবি কিংবা লেখককে দুঃখবাদী বলা সমীচীন নয়। দুঃখ এবং বিপর্যয়ের বর্ণনার মর্মেও আশা ও সাহসের অভীষ্ট ও উৎস থাকতে পারে। সাহিত্যতাত্ত্বিকরা সর্বত্র বলেছেন যে, সার্থক ট্রাজেডি পাঠকের মনে আশা ও বাঁচার আকাঙ্ক্ষাকে সুদৃঢ় করে। কুৎসিত ও অন্যায়ের এমন চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলতে পারেন যা দেখে পাঠক কুৎসিত ও অন্যায় থেকে দূরে থাকতে এবং সুন্দর ও ন্যায়কে সন্ধান করতে উৎসাহী হয়ে উঠতে পারেন। যে লেখক তাঁর লেখার মাধ্যমে সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞাতসারে মানুষকে দুঃখবাদী সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেন, তিনিই দুঃখবাদী। আশা এবং সঙ্কল্পের ছদ্মাবরণেও মানুষকে নৈরাশ্য ও অদৃষ্টনির্ভরতার দিকে ঠেলে দেয়া যায়। আমি দেখেছি : জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাটিকেও দুঃখবাদের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু আসলেই কি এই কবিতা দুঃখবাদী জীবন-জগতদৃষ্টির অভিব্যক্তি? কবিতাটি পড়ে দেখা যাক :

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহত সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

ঢাকায় ১৯৬০-এর দশকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'-র আতঙ্ককালে—উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঠিক আগে—আমি এই কবিতাটিকে নিজের লেখায় বার বার উদ্ধৃত করে ও নানা জায়গায় পুনর্মুদ্রণ করে জনমনে সংগ্রামী স্পৃহা জাগাতে চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি, এই কবিতা পড়ে মানুষ অত্যাচারী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি' কবিতায় নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির নির্মম বর্ণনা দিয়ে সেদিন আল মাহমুদ যখন লিখেছিলেন :

> এ কেমন অন্ধকার, বঙ্গদেশ উথান রহিত
> নৈশব্দের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না
> নদীগুলো দুঃখময়, নির্পতগ মাটিতে জন্মায়
> কেবল ব্যাঙের ছাতা অন্য কোনো শ্যামলতা নেই।
>
> বুঝিনা রবীন্দ্রনাথ কি ভেবে যে বাংলাদেশে ফের
> বৃক্ষ হয়ে জন্মাবার অসম্ভব বাসনা রাখতেন।
> গাছ নেই নদী নেই অপুষ্পক সময় বইছে
> পুনর্জন্ম নেই আর জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।
>
> শুনুন রবীন্দ্রনাথ, আপনার সমস্ত কবিতা
> আমি যদি পুতে রেখে দিনরাত পানি ঢালতে থাকি,
> নিশ্চিত বিশ্বাস এই, একটিও উদ্ভিদ হবে না।
> আপনার বাংলাদেশ এ রকম নিষ্ফলা ঠাকুর।

তখন এই কবিতা পড়েও মানুষ সৃষ্টিবৈরী পরিবেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ার তাগিদ অনুভব করেছে। অথচ ওই সময়টাতেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পরিচালিত কণ্ঠস্বর গোষ্ঠী এবং সেই সঙ্গে রফিক আজাদ পরিচালিত THE SAD GENERATION যখন বুদ্ধদেব বসুর ভাবাদর্শের অনুকরণে কিংবা অনুসরণে নৈরাশ্যবাদ, যৌন অস্থিরতা ও self-destruction-এর সঙ্কল্প ঘোষণায় তৎপর হয়েছিল, তখন ওই কার্যক্রম রাতারাতি চমক সৃষ্টিতে সমর্থ হলেও বৃহত্তর সাহিত্যসমাজ কর্তৃক প্রশংসিত হয়নি।

'অদ্ভুত আঁধার এক' কিংবা 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় কুৎসিত, কদর্য, বীভৎস, দুঃসহ, মনুষ্যত্ববৈরী শ্বাসরুদ্ধকর বাস্তবের এক বিস্ময়কর রকম সুন্দর সংক্ষিপ্ত চিত্ররূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি, এবং যতবার আমি এসব কবিতা পড়েছি ততবারই আমার মনে অপশক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ ঘনীভূত হয়েছে—আমার অন্তর্গত চেতনা সুপ্তি থেকে জেগে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করেছে। ষাটের দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনের কালে, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকালে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরেও—আমি এইসব কবিতা সংগ্রামরত রাজনৈতিক সংগঠনের প্রচারপত্রে কিংবা বিভিন্ন মুখপত্রে বার বার উদ্ধৃত করে দিয়েছি এবং লক্ষ্য করেছি, এসব কবিতার ভাব মানুষের চেতনায় গিয়ে সংগ্রামের বাস্তব শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সেই শক্তি অন্যান্য শক্তির সঙ্গে মিলে বাস্তবকে পরিবর্তিতও করেছে। বাংলাদেশে পরিবর্তন প্রগতিতে রূপ নেয়নি কেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ভিন্ন বিবেচনার বিষয়। *রূপসী বাংলা*-র কবিতাগুলোও দেশাত্মবোধক কবিতা রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। তবে এগুলোতে দেশাত্মবোধের চেয়ে প্রকৃতিপ্রীতিই মুখ্য, দেশাত্মবোধে দেশের মানুষের উপস্থিতিও বাঞ্ছনীয়। দেশ কেবল গাছপালা, নদীনালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ও আকাশবাতাস নিয়ে নয়, মানুষ নিয়েও।

'অদ্ভুত আঁধার এক'-এর মতোই আরো কোনো কোনো কবিতা চিহ্নিত হয়ে থাকে নৈরাশ্যবাদের নিদর্শন রূপে যা অবশ্যই ঠিক নয়।

জীবনানন্দকে নৈরাশ্যবাদী বলতে আমার দ্বিধা হয়েছে, আজো হয়। চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে তাঁকে প্রগতিশীল বলবার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাই না। রক্ষণশীল চেতনার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের বিকার-বিকৃতির ও অবক্ষয়ের রূপকার তিনি। আমি আমাদের দেশের অবক্ষয়ক্লিষ্ট অবস্থার অবসানে একটি সুস্থ স্বাভাবিক ঋদ্ধিমান সুন্দর উন্নততর অবস্থার স্বপ্ন দেখি। তবু গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে জীবনানন্দের কিছু কবিতার অনুরাগী পাঠক আমি। দুই বাংলায় রণেশ দাশগুপ্তই প্রথম ব্যক্তি যিনি, কবি না হয়েও এবং একটি কমিউনিস্ট গ্রুপের সক্রিয় সদস্য হয়েও *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার* প্রকাশ করে সমগ্র জীবনানন্দের প্রতি পাঠকদের কৌতূহলী ও সন্ধিৎসু করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। আবদুল মান্নান সৈয়দও জীবনানন্দচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। গত দুই দশকের মধ্যে জীবনানন্দের বহু রচনা—কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ এবং তাঁর সম্পর্কে অন্যদের লেখা—বিস্মৃতির গহ্বর থেকে বাংলাদেশের এবং পশ্চিম বাংলার কেউ কেউ উদ্ধার করেছেন। জীবনানন্দ নিজেও তাঁর অনেক পাণ্ডুলিপি নীরবে যত্নে সাজিয়ে রেখে গিয়েছিলেন হয়তো কোনো দিন প্রকাশিত হবে এই আশায়। জীবনানন্দচর্চার পেছনে কোনো প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দরকার হয়নি। এই দুর্দিনে এই চর্চা বাঙালি-মনীষার মহত্ত্বই প্রমাণ করে। যদি আজ বাঙালি-মনীষা বহুমুখী আগ্রহ নিয়ে বিকশিত হয়, তাহলে বাঙালি জাতি অবশ্যই বড় হবে। কবিতায় জীবনানন্দের ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর গল্প ও উপন্যাস তাঁর সেই পরিচয়কেই আরো স্পষ্ট ও নিশ্চিত করে। এগুলো নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা-সমালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ হলে আমরা স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছাতে পারব। মনে হয়, তাঁর গল্প-উপন্যাসেও অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাসই আরো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। দুই বিশ্বযুদ্ধ আর হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও দাঙ্গা তাঁকে যন্ত্রণায় কাতর করেছে। যে কোনো কারণেই হোক, উপন্যাসে জীবনানন্দ নিজেকে—নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভবগুলোকে—উন্মোচিতই করতে চেয়েছেন, লুকাতে কম চেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাবাদের পরিসীমা অতিক্রম করে সৃষ্টির পথে এগোতে হলে জীবনানন্দচর্চাকে অবশ্যই পূর্ণতায় পৌঁছাতে হবে।

রূপসী বাংলা-র কবিতাগুলোতে দেখা যায়, জীবনানন্দ এক অনাস্বাদিতপূর্ব বিস্ময় আর প্রশান্ত কৌতূহল ও বেদনামিশ্রিত আনন্দ অনুভব করেছেন বরিশাল জেলার নদীতীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যে। এজন্মে দেখা শেষ হল না, হয়তো পরজন্মে আবার দেখার সুযোগ হবে—এ-কে যদি ইতিহাসবোধ বলে, তাহলে এই রকম বোধ নিয়ে এ কাব্যে জীবনানন্দ যেন কবিতা নয়—নিজের জন্যই এক একটি সমাধিলিপি লিখে রেখে গেছেন। তাঁর কবিতায় আধুনিকতাবাদীদের প্রচারের অনুকূল বিষণ্ণতার ছাপ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ কবিতার মর্মে পার্থিব কামনা-বাসনা, জীবনতৃষ্ণা ও মর্তপ্রীতিরই অভিব্যক্তি আছে। তবে অনেক জায়গাতেই তাঁর অবদমিত বাসনা ও জীবনবোধ স্বাভাবিক নয়—বিকারপ্রাপ্ত।

'বনলতা সেন' ও অন্যান্য প্রেমের কবিতায় আশা ও আনন্দের আর্তি আছে আর অপরিমেয় শৈল্পিক সৌন্দর্য আছে। জীবনানন্দের জনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতাগুলো কামগন্ধমুক্ত। তবে তাঁর অন্য বিষয়ের অনেক কবিতার উপমা-রূপক তিনি সংগ্রহ করেছেন নারীদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। প্রেমের বেলায় বাংলা গানে ও কবিতায় চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কাল থেকেই বিরহ ও বর্ষা প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। জীবনানন্দে হয়তো কখনো কখনো বিরহের স্থলে বিস্ময়, ভয়, কিংবা ব্যর্থতাবোধ আর বর্ষার স্থলে হেমন্ত, এমনকি শীত ঋতু প্রাধান্য পেয়েছে। নিজের অস্তিত্বকে তিনি অনুভব করতে চেয়েছেন মহাকালের অনাদ্যন্ত প্রবাহে—যদিও বাস্তবে তিনি ছিলেন স্থবিরতাপ্রিয়—জড়ভরত বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে,—জীবনের অস্থায়িত্বকে তিনি পুষিয়ে নিতে চেয়েছেন পুনর্জন্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভব দিয়ে যা তিনি পেয়েছেন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে—যদিও ধর্মবিশ্বাস তিনি কোথাও ব্যক্ত করেননি। তাঁর রচনাবলীতে ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ' প্রবন্ধে (দ্র. সুব্রত রুদ্র সম্পা., *পূর্বোক্ত*) লিখেছেন : "জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি মানো? ভেবেছিলাম হয়তো বলবে, ঈশ্বর মানি। মৃদু হেসে বললে, মানুষের নীতিবোধ মানি।" ইন্দ্র মিত্র (দ্র. *ঐ*) লিখেছেন, একদিন আলাপকালে জীবনানন্দ বলেছিলেন : "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। আমি মানুষের নীতিবোধে বিশ্বাস করি।" খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এটা। মানুষের নীতিবোধের উৎস মানুষ ও তার পরিবেশ—তার বাইরে কিছু নয়, অলৌকিক কোনো কিছুর স্থান নেই তাতে। আরো কোনো কোনো সূত্র থেকে জানা যায় যে, জীবনানন্দ ঈশ্বরের প্রতি নয়, মানুষের নীতিবোধের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন সমাজবিমুখ। কেন? আমরা জানি, মানুষ সম্পর্কে মেকিয়াভেলি এবং হব্‌স্‌-এর ধারণাও অত্যন্ত খারাপ ছিল। তবে মনে হয়, মানুষের নীতিবোধে তাঁরাও বিশ্বাস করতেন যে কারণে তাঁরা ধর্মের বাইরে অবস্থান নিয়ে রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বই লিখেছিলেন মানুষকে এবং মানুষের পরিবেশকে উন্নত করার মানসে। আজো অনেকে পড়ে থাকেন তাঁদের বই। জীবনানন্দও কি তাই করেছেন? আধুনিকতাবাদে অবশ্য লেখকের সামাজিক দায়িত্বের স্বীকৃতি নেই। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, জীবনানন্দের মন তাঁর সমকালীন ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যের—বিশেষ করে modernistদের ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত সংবেদনশীল অনুভূতিঋদ্ধ কল্পনাপুষ্ট এক বাঙালি-মন। সাহিত্যচিন্তায়, বিশেষ করে কবিতার আলোচনায়, imagination বা কল্পনা-প্রতিভাকে তিনি খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। Imagination-অর্থে কল্পনা-প্রতিভা কথাটিও তিনিই প্রয়োগ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর অবক্ষয়চেতনাপুষ্ট ইউরোপীয় সাহিত্য আর বুদ্ধদেব বসুদের আধুনিকতাবাদ তাঁর বাঙালি বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু বদলাতে পারেনি। তাঁর বিশেষ ধরনের ব্যর্থতাবোধ ও দুঃখপ্রবণতার কারণ একান্তভাবে তাঁর নিজের জীবন ও প্রত্যক্ষ পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যাবে। সে রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তাঁর জীবনের প্রাপ্ত তথ্যাদি অবলম্বনে ফ্রয়েডীয় psycho-analysis হয়তো সবচেয়ে সহায়ক হবে।

মৃত্যু, মনে হয়, জীবনানন্দের দুশ্চিন্তার অন্যতম প্রধান বিষয়। জীবন-জগতের প্রতি গভীর ভালোবাসাই এই রকম মৃত্যুচিন্তার কারণ হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ কিংবা টলস্টয়ের মৃত্যুচিন্তার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। জীবন-জগতবিমুখ স্থূল-অনুভূতির লোকেরা এভাবে মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করেন না, উদ্বিগ্নও হন না। মৃত্যুর অনুষঙ্গেও জীবনানন্দের কবিতায় পুনর্জন্মের কথা এসেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনর্জন্মবাদ তাঁর ইতিহাসচেতনাকে ও সময়বোধকে এক বিশেষ খাতে প্রবাহিত করেছে। অনাদ্যন্ত মহাকাল ও মহাশূন্য জীবনানন্দের চেতনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। মহাশূন্যের বোধই তাঁকে তাড়িত করেছে বার বার নক্ষত্রের দিকে তাকাতে। জীবনানন্দ জীবনকে অনুভব করেছেন মহাকাল ও মহাশূন্যের অনাদ্যন্ত বিস্তারের মধ্যে। তার পরেও কোন্ রহস্যজনক কারণে তাঁর বোধ এমন দুঃখজনকভাবে সমাজবিমুখ— individualistic ও egocentric?

জীবনানন্দ কি আত্মহত্যা করেছিলেন? ঔদাসীন্যের কারণে কিংবা অসুস্থতার ফলে কি তিনি ট্রামের ধাক্কা খেয়ে মরেছিলেন? ব্যাপারটা রহস্যময়। আমরা লক্ষ্য করি যে, নৈরাশ্যবাদীরাও বাঁচতে চায়—মৃত্যুকে ভয় পায়, সুখ চায়—দুঃখ-কষ্ট থেকে দূরে থাকতে চায়। আত্মহত্যার রহস্য ভিন্ন বিবেচনার বিষয়। আশাভঙ্গ, পরাজয়ের গ্লানি, অভিমান, প্রতিশোধস্পৃহা বা প্রতিহিংসা চরিতার্থতায় ব্যর্থতা ইত্যাদি নানা কিছু মানুষকে আত্মহত্যায় ঠেলে দিতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু কবিতায় এবং অনেক কবিতার কোনো কোনো চরণে গভীর ব্যক্তিগত নৈরাশ্যের উপস্থিতি জীবনানন্দের কবিতায় আছে এবং সেগুলো নিয়ে আধুনিকতাবাদীরা দীর্ঘ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে লিপ্ত আছেন। আমার মনে পড়ে, ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পরেই আমি টমাস হার্ডির (১৮৪০-১৯২৮) TESS OF THE D'URBERVILLS (১৮৯১) উপন্যাসটি পড়ে ওই গ্রন্থের দ্বারা বিরাটভাবে প্রভাবিত হই। বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পাঠ্য ছিল। ক্লাসে পড়া আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেই আমি নিজে নিজে যথাসম্ভব মনোযোগ দিয়ে সেই মোটা বইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলেছিলাম। তাতে নিয়তিবাদী হার্ডির প্রভাবে অন্তত দু-তিন বছর মানুষ মাত্রকেই আমার কাছে নিতান্ত অসহায় মনে হয়েছে। প্রতিটি নরনারীর চোখেমুখে আমি তখন কেবল বিষণ্নতার ছাপ দেখেছি। মনে হয়েছে আমার যে, পৃথিবীতে নরনারী মাত্রই এক অদৃশ্য দুর্দৈবের হাতের অসহায় ক্রীড়ানক। নায়িকা ডারভাবভিল পরিবারের টেস, যাকে হার্ডি অভিহিত করেছেন a pure woman বলে, তার পরিবেশ-নির্ভর ব্যক্তিত্ব ও দুর্ভোগ এবং নিষ্পাপ সুন্দর চেহারা ও অনেক উক্তি এখনো আমার মনে পড়ে। উপন্যাসের নায়ক এনজেল ক্লেয়ার যখন টেসের প্রেমে পড়ে তার প্রতি আকৃষ্ট বিষণ্ন টেসকে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের বই পড়ে মন প্রফুল্ল করার পরামর্শ দিয়েছিল, তখন পূর্ববর্তী এক দুর্ঘটনার শিকার পুরাতন মূল্যবোধে পিষ্ট অসহায় টেস নিজের জীবনের অসহায়ত্বের কথা ভেবে যে উক্তি করেছিল তার একটি কথা আজো আমার মনে গেঁথে আছে : I wou'nt mind learning why, why the sun do shine on the just and unjust alike. But that's what books will not tell me. এক বিশেষ জটিল পরিস্থিতিতে একান্ত নিজের দুঃখের অভিজ্ঞতাটাকে টেস অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন করে উচ্চারণ করেছে যে তা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন, বিশ্বজনীন, শাশ্বত। ন্যায়-অন্যায় সংক্রান্ত প্রশ্ন : অন্যায়কারী এবং অন্যায়ের-শিকার, বঞ্চনাকারী ও বঞ্চিত, নির্যাতনকারী ও নির্যাতিত, ধর্ষণকারী ও ধর্ষিতা—উভয়ের উপর সূর্য সমভাবে আলো দেয় কেন? আমার জীবনে হার্ডির ওই বইয়ের প্রভাব সম্পর্কে ভাবতে গেলে মনে হয়, আমার সেই অপরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাজাত দুঃখগুলোকে, আমার অন্তর্গত দুঃখের সম্ভাবনাগুলোকে হার্ডি আমার জীবনের নিয়ামক করে তুলেছিলেন—তখন মনে হত যে, দুঃখবোধই আমার চালিকাশক্তি। তখন মনে হত যে, মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, অপশক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত মানুষের পরাজয় অবধারিত। পরে নানা ঘটনার ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনেও বই পালন করেছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। হার্ডির মতো করে পাঠককে নৈরাশ্যবাদী কিংবা অদৃষ্টবাদী উপলব্ধিতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার মতো কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক কি একটিও বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে? লিখেছেন বাংলা ভাষার কোনো আধুনিকতাবাদী? গোটা পৃথিবীর কোনো আধুনিকতাবাদী? শরৎচন্দ্রের দেবদাসকেও আমার কাছে অসাধারণ বই বলে মনে হয়। কোনো পাঠক সারা জীবন ভুলতে পারেন ওই গ্রন্থে বর্ণিত মানবজীবনের ট্রাজেডির কথা? শরৎচন্দ্র অবশ্য মানুষকে নৈরাশ্যের দিকে ঠেলে দেন না, মহত ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য আছে দেবদাস-এ। হার্ডিও হয়তো পাঠককে নৈরাশ্যে নিপতিত করতে চাননি। তবে তাঁর উপন্যাসে নায়ক-নায়িকা হয়ে পড়েছে পরিবেশের ও পুরতান সংস্কার-বিশ্বাসের অসহায় দাসদাসী। জাঁ পল সার্তের (১৯০৫-১৯৮০) চিন্তা—existentialism—মানুষকে অদৃষ্টবাদের হাত থেকে উদ্ধার করে—রক্ষা করে। তাঁর একটি উক্তি : The opposite of freedom is not necessity, but fatalism. অনিবার্যতাকে (necessity) মানুষ অতিক্রম করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে—একলা না হলে সম্মিলিত প্রয়াসে, এক প্রজন্মে না হলে প্রজন্মের পর প্রজন্মের চেষ্টা দ্বারা। জীবনানন্দের চিন্তা ও উপলব্ধি সার্তের ধারায় অগ্রসর হয়নি। তবে জীবনানন্দ নিরীশ্বর ছিলেন, সার্ত ছিলেন প্রবলভাবে নিরীশ্বর। প্রবলভাবে আশাবাদীও ছিলেন সার্ত যা জীবনানন্দ ছিলেন না।

জীবনানন্দের রচনাবলীতে বিধৃত সমাজবিমুখতা, জনবিমুখতা, দুঃখবোধ, ক্লান্তি ও স্থবিরতা তাঁর অনুরাগী পাঠককে ধীরে ধীরে অবসন্ন ও নিস্তেজ করে। আধুনিকতাবাদীদের প্রচারিত নৈরাশ্যের দ্বারা সংক্রমিত হলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া—আরোগ্য লাভ করা কঠিন। জীবনানন্দের দুঃখবোধ আধুনিকতাবাদ থেকে প্রাপ্ত কৃত্রিম দুঃখবোধ নয়, তা থেকে ভিন্ন কিছু—অন্য কিছু; উল্লেখ করেছি যে, তার উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে ও তাঁর নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ পরিবেশের মধ্যে—কেবল বিংশ শতাব্দীর সামান্যীকৃত (generalized) মানবপরিস্থিতিতে নয়। জীবনানন্দে অবশ্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও আয়রনিও আছে যা কখনো কখনো মানুষকে পরিবেশের প্রতি ক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে। তবে সেগুলো সহজবোধ্য নয়; খুব বেশি প্রতীকনির্ভর ও বিমূর্ত তাঁর প্রকাশরীতি—অত্যন্ত জটিল তাঁর উপলব্ধি, অনুভূতি ও চিন্তা। জীবনানন্দ সাররিয়েলিস্ট বা পরাবাস্তববাদী অবশ্যই। পরাবাস্তববাদ কোনো উৎকৃষ্ট শিল্পারীতি নয়। এই রীতির প্রকাশসামর্থ্য স্বল্প। রোমান্টিক কথাটা বাংলা ভাষার সাহিত্য-সমালোচনায় যেভাবে ব্যবহৃত হয় তাতে তা কোনো স্পষ্ট অর্থ দেয় না—নানা জনের কাছে তার অর্থ নানা রকম। বস্তু, বিষয়, ঘটনা জীবনানন্দের কবিতায় ও গল্প-উপন্যাসে আছে, তবে তার চেয়ে বেশি আছে চেতনাপ্রবাহ—stream of consciousness. সেই চেতনাপ্রবাহের প্রকৃতি বুঝতে গেলেই মনে হয় তিনি নৈরাশ্যবাদী। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বন করে বলতে গেলে অবশ্যই বলতে হবে যে, জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ছিল না, তা ছিল বিকারপ্রাপ্ত। প্রশ্ন হল, কেন এই বিকার।

আমার মনে হয়, জীবনানন্দ হার্ডির TESS পড়েছিলেন। *প্রেতিনীর রূপকথা*-য় এ বইয়ের উল্লেখ আছে। তাতে দেখা যায়, হার্ডির সঙ্গে জীবনানন্দ একাত্মতা অনুভব করেন। হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বই তাঁর পাঠ্য ছিল। হয়তো এ বইয়ের প্রভাব জীবনানন্দ নিজের জীবনে কোনো দিন কাটাতে পারেননি। হয়তো হার্ডির অন্যান্য উপন্যাসও তিনি পড়েছিলেন। হয়তো জীবনানন্দের অন্তর্মুখি অনুভূতিপ্রবণ আত্মনিগ্রহপ্রবণ স্বভাবের গভীরে অনেক দুঃখ ছিল। হয়তো তাঁর জীবনে পরিবেশের এমন কিছু পীড়ন ছিল যার সংবাদ আজো আমরা পাইনি। হয়তো অদৃষ্টবাদী হার্ডির উপন্যাস দুঃখবোধ ও অদৃষ্টকে (fate) তাঁর জীবনের নিয়ামকে পরিণত করে দিয়েছিল। বলা হয়, বই মানুষকে ভেঙে গড়তে পারে। হয়তো হার্ডির বই জীবনানন্দকে ভেঙে গড়েছিল। জীবনানন্দের জীবনে বৈষ্ণব পদাবলী, রবীন্দ্র সঙ্গীত, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস—এ সবেরও গভীর প্রভাব ছিল। এসবের প্রভাবে মানুষের চেতনা নম্র, কোমল, স্পর্শকাতর, অহিংস, স্নেহপ্রবণ ও প্রেমময় হয়। এক সময়ে বলা হত যে, শ্রীচৈতন্য আর রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ভাবাদর্শ দিয়ে বাঙালি জাতটাকে নিস্তেজ করে ফেলেছেন। জীবনানন্দ বাঙালি-সমাজে শ্রীচৈতন্য আর রবীন্দ্রনাথের কোনো স্বাভাবিক যৌক্তিক অগ্রগতি কিংবা পরিণতি নন। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে গিয়ে আত্মঘাতী পথেই এগিয়েছেন জীবনানন্দ। মানুষের হিংস্রতার জয়জয়কারের মধ্যে বুদ্ধ-যিশু-গান্ধীর অহিংসার আদর্শও কি তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুসারীদেরকে নিস্তেজ প্রাণীতে পরিণত করে না? 'মহাত্মা গান্ধী' শীর্ষক কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

> মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
> যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে
> আস্থা করা যায় বলে ;
> হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয় ;
> হয়তো-বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে ;
> একজন স্থবির মানুষ দেখ অগ্রসর হয়ে যায়
> পথ থেকে পথান্তরে—সময়ের কিনারার থেকে সময়ের
> দূরতর অন্তঃস্থলে ;—সত্য আছে, আলো আছে ; তবুও সত্যের আবিষ্কারে।

গান্ধী সম্পর্কে এই রকম উক্তি করা সত্ত্বেও জীবনানন্দ বুদ্ধ, যিশু কিংবা গান্ধীর মতো জনমুখি-সমাজমুখি না-হয়ে জনসমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিঃসঙ্গ থেকেছেন। কেন?

জীবনানন্দের অনুরাগী পাঠকেরা এসব কিছুই যথাযথ উপলব্ধি করবেন, ধারণা করি। আমার বক্তব্যে ত্রুটি থাকতে পারে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমি ব্যক্ত করছি আমার উপলব্ধি। অবশ্যই তথ্যসন্ধানের, চিন্তা-ভাবনার ও বিচার-বিবেচনার দরকার আছে। কোনো কথাই শেষ কথা নয়। আমাদের মূল প্রশ্ন : জীবনানন্দ কি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন? তাঁর কবিতার অনেক চরণ উদ্ধৃত করে দেখানো যাবে যে, তিনি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন ; আবার অনেক উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে কেউ দেখাতে পারেন যে, তিনি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। আসলে নৈরাশ্যবাদী বলতে আমরা কি বুঝি তার উপর সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। জীবনানন্দ সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদের প্রশ্ন-যে আলোচিত হয়ে আসছে, এটাই আমাদের কাছে সত্য। তাঁর কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে প্রকাশ, তাতে বিষণ্ণতার ও আত্মঘাতী বোধের উপস্থিতি অবশ্যই আছে—একমাত্র *ঝরা পালক* গ্রন্থের কবিতাগুলোতে ছাড়া। *রূপসী বাংলা*-ও দুঃখবোধের ও বিষণ্ণতার ছাপমুক্ত নয়। নৈরাশ্যবাদী হলেই মানুষ মৃত্যু কামনা করে, আত্মহত্যা করতে চায়, আনন্দ পরিহার করতে চায়—এমন নয়। নৈরাশ্যবাদী মানসিকতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্যমহীনতা এবং প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার ব্যাপারে নিশ্চেষ্টতা। সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়েও জীবনানন্দ কখনো কখনো কবিতা লিখেছেন যা রাজনীতির প্রতি তাঁর কৌতূহল প্রমাণ করে। কবিতা হিসেবে সেগুলো নিষ্প্রভ নয়। তাঁর *বাসমতীর উপখ্যান* ও *জলপাইহাটি* উপন্যাস দুটিতেও রাজনৈতিক বিষয় ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রসঙ্গ আছে। এগুলোতেও নায়ক-চরিত্রে লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ অনুভূত হয়। তাছাড়া বহু মনীষীর ও ধর্মপ্রবর্তকের মহত্ত্বের কথা জীবনানন্দ কোনো কোনো কবিতায় উল্লেখ করেছেন। তবু তিনি জনবিমুখ সমাজবিমুখ থেকেছেন। জীবনানন্দের মন অবক্ষয়ের বোধে পীড়িত এক অবক্ষয়ক্লিষ্ট মন। তাঁর অবক্ষয়ক্লিষ্টতার কারণ কেবল পারিপার্শ্বিক বা আর্থ-সামাজিক নয়, ব্যক্তিগতও। ব্যক্তিগত কারণই মূল। ব্যক্তিগত কারণকে অবলম্বন করেই পরিবেশগত কারণ কাজ করে।

বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতের কথা বলে যে 'আধুনিকতা'-কে যৌক্তিকতা দেওয়া হয়, তার গুরুত্ব জীবনানন্দের জীবনে কতটুকু? বুদ্ধদেব বসুরা তাঁর মনোজীবনকে কতখানি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন? নিরাসক্ত, অনাচ্ছন্ন, মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে এসব প্রশ্নের পুনর্বিচার দরকার। এত কাল কেবল কবিতা দিয়েই জীবনানন্দকে বিচার করা হয়েছে। পুনর্বিচারকালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার সঙ্গে তাঁর গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ এবং ব্যক্তিগত জীবন ও দেশ-কালকেও সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় ধরতে হবে।

জীবনানন্দের অনেক কবিতাই কাব্যানুরাগীদের মুখে মুখে উঠেছে এবং আলোচিত হয়েছে। তবে জীবনানন্দ-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে *মহাপৃথিবী* গ্রন্থের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি। অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে কবিতাটির মর্মার্থ উদ্ধারের চেষ্টা নানাভাবে করা হয়েছে। এই কবিতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সমালোচনা ইত্যাদি সঙ্কলন করে, সেই সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে এ বিষয়ে সাম্প্রতিক কিছু নতুন লেখা যোগ করে ফয়জুল লতিফ চৌধুরী *জীবনানন্দ দাশের আট বছর আগের একদিন* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থে Humayun Azad, Clinton B. Selly এবং Faizul Latif Chodhury কৃত তিনটি ইংরেজি অনুবাদও দেয়া হয়েছে অর্থোদ্ধারের মানসেই। কবিতাটির গদ্য রূপও এতে সংযোজন করা যেত একই উদ্দেশ্যে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতাটিতে জীবনানন্দের আত্মঘাতী ক্লান্তির প্রকাশ আছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। এই মন্তব্যে তাঁর আত্মবোধে আঘাত লেগেছিল, তাই তিনি বাধ্য হয়েছিলেন আত্মঘাতী ক্লান্তির দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে। জীবনানন্দের ওই বক্তব্যে পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়নি। তাই আলোচনা থেমে থাকেনি—বরং আরো বেশি আলোচনা হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, এত কালের এত জনের এত চেষ্টার পরেও কবিতাটির রহস্য কেউ ভেদ করতে পারেননি ; কারণ জীবনানন্দ নিজেই পাঠকদের ঔৎসুক্যের বিষয়টি সম্পর্কে কবিতাটিতে কিছু বলেননি—হয়তো পাঠকদের অনুসন্ধানের বিষয়টিকে তিনি সতর্কতার সঙ্গেই লুকাতে চেয়েছেন। নীরেন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ করতে গিয়েও হয়তো তিনি একই কাজ করেছেন। হয়তো এটাই সত্য যে, নীরেন্দ্রনাথ কথিত 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' আর 'জীবনের অর্থহীনতা'-র বা হতাশার উপলব্ধিই এই কবিতায় অত্যন্ত বিমূর্ত ও প্রতীকী কথা দ্বারা ব্যক্ত করেতে চেয়েছেন জীবনানন্দ। হয়তো একান্ত আত্মগত বোধই তিনি ব্যক্ত করেছেন কবিতাটিতে। কেন এই আত্মঘাতী ক্লান্তি? কেনই-বা জীবনের এই অর্থহীনতার কিংবা হতাশার উপলব্ধি? কবিতাটিতে কি আছে? একটি লোক আত্মহত্যা করেছে, তার লাশ মর্গে স্থানান্তর করা হয়েছে। তার কথাই বর্ণনা করেছেন কবি :

কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'ল তার সাধ।

বধূ শুয়েছিল পাশে—শিশুটিও ছিল ;
প্রেম ছিল, আশা ছিল—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

...   .

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প ;—কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাশ কাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

এই লোকটি কেন আত্মহত্যা করল? আত্মহত্যার কোনো কারণ তো পাওয়া যায় না। এই আত্মহত্যার প্রতি জীবনানন্দের মনোভাব কি? এটিই পাঠকদের ঔৎসুক্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং কবিতাটির অন্তঃস্থিত রহস্য। তিন পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত কবিতাটিতে নানা প্রতীকে অনেক কথা বলেছেন জীবনানন্দ। ভাষায়, বর্ণনায় অস্পষ্টতা নেই কোথাও। অভিধানে পাওয়া যায় না—এমন কোনো শব্দও এতে নেই। আত্মহত্যার এমন কোনো কারণ কবিতাটি থেকে বের করা যায় না যা বিশ্বাসযোগ্য—যা কাণ্ডজ্ঞানের অনুকূল। উপরের উদ্ধৃতিতে 'তাই' শব্দটি আত্মহত্যার কারণজ্ঞাপক। যে কারণ এতে পাওয়া যায় তা তো গ্রহণযোগ্য নয়। যদি ব্যাজ্ঞার্থে এই কারণ উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তাহলে তো জীবনের অর্থহীনতার বোধ এবং অর্থহীন জীবন যাপনের ক্লান্তিই লোকটির আত্মহত্যার কারণ। জীবনের এই অর্থহীনতার বোধ লোকটির মনে কেন জাগল? জানি, সাহিত্যের বাস্তব আর জীবনের বাস্তব এক নয় ; তবে একথা তো ঠিক যে, আধুনিক যুগে সাহিত্যের বাস্তবকেও হতে হয় বিশ্বাসযোগ্য—রাক্ষস-খোক্কস, জ্বিন-পরি, ভূত-প্রেত, দেও-দানব কিংবা ধর্মগ্রন্থের অলৌকিক উপাদান আধুনিক যুগে সাহিত্যে বাস্তবের স্বীকৃতি পায় না। আধুনিক যুগ বলতে আমি আধুনিকতাবাদীদের সময় বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি মানব-ইতিহাসের আধুনিক যুগ—ইউরোপে যার সূচনা কনস্টান্টিনিপলের পতন থেকে অর্থাৎ ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে, আর বাংলায় যার সূচনা রামমোহনের স্থায়ীভাবে কলকাতা বাসের সময় থেকে অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে। জানি বিংশ শতাব্দীর দুই বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী মানুষকে বিচলিত, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত, আতঙ্কিত ও অস্থির করেছিল। কিন্তু সেই ঘটনা 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার আত্মহত্যাকারী নায়কের মতো কোনো ব্যক্তিকে আত্মহত্যায় ঠেলে দেবে, তাও কি স্বাভাবিক? *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র 'বোধ' কবিতায় বর্ণিত বোধ-এর মতো কোনো কিছু কি লোকটিকে আত্মহত্যায় নিয়ে গেছে? বোধ-এর স্বরূপও তো জীবনানন্দ স্পষ্ট করেননি, মনে হয় লুকাতে চেয়েছেন কিছু । ওই বোধ কি স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভর, স্বরাট কোনো সত্তা? স্বেচ্ছাচারী শক্তির অধিকারী কিছু? তা কি করে হয়? বাহ্য জগতের বা পরিবেশের প্রভাব ছাড়া কি কারো মধ্যে কোনো বোধ জন্ম নিতে পারে? 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় জীবনানন্দ অবশ্য প্যাঁচা, স্থবির ব্যাঙ, মশা, মাছি, উড়ন্ত কীট, ফরিঙ, দোয়েল, জোনাকি, থ্যাঁতা ইঁদুর ইত্যাদির জীবনতৃষ্ণা বা বাঁচার আকুলতার কথা উল্লেখ করেছেন কবিতাটিতে। কিন্তু মানুষের বেলায় তিনি নীরব। লোকটার আত্মহত্যার সাধ কেন হল? লোকটা মরল কেন? জীবনানন্দ লিখেছেন :

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাশ কাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।

কি বলতে চেয়েছেন জীবনানন্দ? কেন এই আত্মঘাতী অবসাদ যার জন্য জীবনের কাম্য সবকিছু থাকা সত্ত্বেও লোকটার মরবার সাধ হল? আত্মহত্যা করে মরল? বোঝা যায় না, কারণ কবিতাটিতে এই বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেননি। নারী, প্রেম, বিবাহিত জীবন, গৃহ, শিশু, খাওয়া-পরার সুবিধা ইত্যাদি কথা বেশ উজ্জ্বলভাবেই বিবৃত হয়েছে ; অর্থ, কীর্তি, সচ্ছলতা ইত্যাদির কথাও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এসেছে ; তার পরেও লোকটার আত্মঘাতী ক্লান্তি—আত্মহত্যা। এক বিপন্ন বিস্ময়ের (শুধু 'বিস্ময়' নয়, 'বিপন্ন বিস্ময়') কথা বলেছেন জীবনানন্দ। কেন সেই বিপন্নতা আর কি সেই বিস্ময় তা তিনি বলেননি। এখানেও কারণ-জ্ঞাপক 'তাই' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। লোকটার এই আত্মঘাতী ক্লান্তি কি আধুনিকতা-বাদীদের প্রচারিত মতবাদ থেকে প্রাপ্ত কিছু? যদি জীবনানন্দ modernist-দের অথবা বুদ্ধদেব বসুদের প্রচারিত তত্ত্ব অনুযায়ী এই কবিতা লিখে থাকেন, অথবা সত্যসত্যই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিবেশের পীড়নে তাড়িত হয়ে আপন অন্তরের বোধ থেকে এই কবিতা লিখে থাকেন, তাহলে জীবনানন্দকে যদি আমরা social fatalist বলে অভিহিত করি তবে তো ভুল হওয়ার কথা নয়। Social fatalist-রা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অনতিক্রমনীয় দুর্দৈব জ্ঞান করেন যার জন্য মানুষের পক্ষে সফল কিংবা সুখি হওয়াকে তাঁরা অসম্ভব মনে করতে পারেন। মানুষকে তাঁরা দেখে থাকেন পরিবেশের দাস রূপে, অবস্থার দাস রূপে, প্রবৃত্তির দাস রূপে। জীবনানন্দ অবশ্য 'বোধ' এবং 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রিক পরিবেশের পীড়নের কথা কিংবা বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেননি। "আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে/ খেলা করে" বলে জীবনানন্দ কিসের কথা বলেছেন? বলেছেন কি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, ধর্মপ্রবর্তক, মতবাদ-প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের সৃষ্টিসামর্থ্য ও সৃষ্টির অন্তর্গত-তাগিদের কথা? কিন্তু সৃষ্টিশক্তি ও সৃষ্টির তাগিদ তো মানুষকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয় না, মানুষকে উদ্যোগী উদ্যমী ও পরিশ্রমী করে—যদিও আমরা জানি ভার্জিনিয়া ওলফ, আর্নেস্ট হেমিঙওয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন, টলস্টয় একাধিকবার আত্মহত্যায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইভ একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। আপন জীবনে চরম নৈরাশ্যের মধ্যেই এঁরা আত্মহত্যা করেছিলেন কিংবা আত্মহত্যায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল এঁদের প্রত্যেকের জীবনে। হয়তো অমরত্বও সন্ধান করেছিলেন তাঁরা। সেই অনুসন্ধানে ও প্রয়াসে ব্যর্থতার বোধ হয়তো তাঁদের পীড়িত করেছিল। যদি জীবনানন্দ আপন অন্তরে ওই ধরনের আত্মহত্যার বোধ নিয়ে লিখে থাকেন 'আট বছর আগের একদিন' তাহলেও তো তাঁকে নৈরাশ্যবাদী না বলে উপায় থাকে না। কারণ জীবনানন্দের নৈরাশ্যবোধ আকস্মিক নয় ; প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারা জীবন ধরে তিনি ওই ধরনের নৈরাশ্যবোধে পীড়িত থেকেছেন ; পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা অবশ্য জীবনব্যাপী নৈরাশ্যের শিকার ছিলেন না। বুদ্ধদেব বসু এই কবিতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, জীবনানন্দ নিজেও, নীরেন্দ্রনাথের উক্তিতে আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে, এই কবিতা সম্পর্কে সে কথাই বলেছেন। তার তো কোনো বাস্তবসম্মত যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি পাওয়া যায় না। জীবনানন্দ লিখেছেন : "কবিতাটি subjective নয়, একটা dramatic representation মাত্র।" তা সত্ত্বেও সন্ধিৎসু পাঠকেরা এতে কবির আত্মজৈবনিক ভিত্তিই অনুসন্ধান করে আসছেন। জীবনানন্দ লিখেছেন "কবিতাটিকে আমার সমগ্র কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ representative হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। ওই কবিতাটির নিকষে আমার সমস্ত কাব্য অধ্যয়ন করতে যাওয়া ভুল।" কবির এই উক্তি সত্ত্বেও কোনো কোনো পাঠক মনে করেছেন যে, কবি যেন এখানে দরকারি কিছু কথা বলতে চাইছেন না। জীবনানন্দ অবশ্য পরে কবিতাটিকে তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থে সঙ্কলিত করতে ভুল করেননি। আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে কবিতাটি অত্যন্ত সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। জীবনের যে পর্যায়ে তিনি এই কবিতাটি রচনা করেছেন সেই পর্যায়েই রচনা করেছেন *নিরুপম যাত্রা*, *কারু বাসনা*, *জীবন প্রণালী* ও *প্রেতিনীর রূপকথা* নামক উপন্যাস আর 'পূর্ণিমা' শীর্ষক দীর্ঘ গল্প। এ-সবই ব্যর্থ মানুষের নিদারুণ হতাশার কাহিনী। এগুলোতে শুভকামী নায়কেরা উন্নত রুচি, পছন্দ ও মূল্যবোধ নিয়ে জীবনযাত্রায় ক্লান্ত, অবসন্ন, স্থবিরতাপ্রিয়, জীবনের দায়দায়িত্ব থেকে পলায়নপর, হতাশ—তাদের কেউ কেউ আত্মহত্যার কথাও ভাবে। বুদ্ধদেব বসু 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার শেষ কয় পঙ্‌ক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "মৃত্যু পার হয়ে বেজে উঠল জীবনের জয়ধ্বনি আর সেই সঙ্গে নির্বোধ ও পাশবিক জীবনের প্রতি চৈতন্যের বিদ্রূপ।" বুদ্ধদেব বসুর এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পরবর্তীকালে প্রায় সকলে করেছেন ; নীরেন্দ্রনাথের মন্তব্যের পরে জীবনানন্দ নিজেও এই রকম মন্তব্যই করেছিলেন। কিন্তু কবিতাটি অভ্যন্তরে কোথাও এই মন্তব্যের সঙ্গত ভিত্তি পাওয়া যায় না। আসলে কি-উপলব্ধি নিয়ে জীবনানন্দ লিখেছেন এই কবিতা? আত্মহত্যাকারী লোকটির প্রতি কি তাঁর মনোভাব?

দার্শনিক কান্ট নিজের চিন্তাধারার মোড় পরিবর্তন সম্পর্কে ডেভিড হিউমের প্রভাবে dogmatic slumber থেকে তাঁর জেগে ওঠার কথা বলেছিলেন, আধুনিকতাবাদীদের নিরন্তর প্রচারের আবহে এবং ইউরোপের modernist-দের নিয়ে তাঁর চর্চার ফলে জীবনানন্দ কি কোনো প্রকার dogmatic slumber-এ নিপতিত হয়েছিলেন *ঝরা পালক*-এর কবিতাগুলো রচনার পরে? সেই মোহনিদ্রায় থেকেই কি তিনি রচনা করেছিলেন 'আট বছর আগের একদিন', 'ক্যাম্পে', 'অন্ধকার' ইত্যাদি কবিতা? মনোবিজ্ঞানে suggestion কিংবা hypnotism বলে যেসব ধারণা পাওয়া যায় সে রকম কোনো কিছু কি জীবনানন্দের জীবনে ঘটে গিয়েছিল বুদ্ধদেব বসুদের নিরন্তর প্রচারের প্রভাবে কিংবা অন্য কোনো কারণে? যাক, এসব নিছক অনুমানের কথা। তবে মনে হয় জীবনানন্দের জীবনের গভীরে সত্যসত্যই দুঃখ ছিল। তা না হলে তিনি কবিতায়, গল্পে ও উপন্যাসে এ রকম জীবনবোধের প্রকাশ ঘটাতে পারতেন না। এসব নিছক কাল্পনিক নয়, অবশ্যই এগুলোতে জীবনানন্দের আত্মজৈবনিক ভিত্তি আছে। আমরা তাঁর জীবনের দুঃখের সংবাদ জানি না। কোনো দিন জানতে পারব কি? আধুনিকতাবাদীদের নিছক দুঃখবাদী কিংবা বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমাদের পরিতৃপ্ত করে না।

জীবনানন্দের মৃত্যুর ঠিক পরে 'কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধে বিমলচন্দ্র ঘোষ (দ্র. সুব্রত রুদ্র সম্পা., *পূর্বোক্ত*) লিখেছেন : "জীবনানন্দের জীবনচেতনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্তি ছিল না, আনন্দও ছিল না। সর্বদা তিনি মরা নক্ষত্রের বরফঢাকা শীতলতার মধ্যে ডুবে থাকতেই ভালোবাসতেন।” “নৈরাশ্য যেন কবির অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে ছিল।” “মানব-সভ্যতার এই গৌরবময় যন্ত্রযুগে জন্মগ্রহণ করেও জীবনানন্দ ক্রমাগত মৃত্যু কামনা করে গেছেন তাঁর অগণিত বিষণ্নমন্থর কাব্যের মাধ্যমে। এ এক প্রকার অদ্ভুত মানসিক ব্যাধি। ‘মরা নক্ষত্রে’-র সঙ্গে যেন তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। অগ্রহায়ণ মাসের হৈমন্তী কুয়াশা জীবনানন্দের কবিমনের আকাশে যেন সর্বদা শিশির ঝরাতো। কবি ‘শিশিরের সুর’ শুনে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। ... তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে শিশিরের কি অজস্রতা ! আর সেই শিশিরঢাকা রহস্যলোকে মৃত্যুর যদি কোনো রস থাকে তবে জীবনানন্দ পাগলের মতো সেই দুর্জ্ঞেয় রসাস্বাদনে তন্ময় হয়ে পড়তেন।” ধূসর পাণ্ডুলিপিতে যার শুরু সেই “মৃত্যুধর্মী ধূসর আত্মকেন্দ্রিকতার হাত থেকে কবি জীবনানন্দ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুক্তি পাননি।” “সুস্থ মানসিকতার অভাবে এত বড় একজন কবি নিজেকে নিজেই সর্বস্বান্ত করেছিলেন। আর তাঁর সর্বনাশ করেছিল একালের পণ্ডিতম্মন্য ভক্তদের অত্যুৎকট প্রশংসা, আধুনিক বাংলা কাব্যে যাঁরা আঙ্গিকসর্বস্বতা, অভিনবত্ববিলাস, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুর্বোধ্যতা আর অবচেতনিক উন্মত্ততার পরিচয় পেলে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে হৈ হৈ করে বেড়ান।” “আঙ্গিক ও জীবনদর্শনের জটিলতার জন্য জীবনানন্দের কাব্যধারা ছিল সুস্থতম আধুনিক জীবনবিজ্ঞানের বিরোধী। তথাপি তাঁর কিছু কবিতা কাব্যরসপিপাসু মনকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনবোধের অতীত স্তরে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক রহস্যময়তার মায়াজাল সৃষ্টিতে জীবনানন্দের অধিকাংশ রচনাই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। এই মারাত্মক দুর্বোধ্যতার প্রভাব সমসাময়িক বহু তরুণ কবির মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপ থেকে আমদানি এই দুর্বোধ্যতা ও প্রজ্ঞাসর্বস্বতার প্রভাব বাংলাদেশে জীবনানন্দের মতো বহু শক্তিশালী কবিই অতিক্রম করতে পারেননি।” “এই নির্জনতাপ্রিয়, নির্বিরোধ ও স্বল্পবাক কবি বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি ও মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখেও তাঁর কাব্যের মূল সুরটিকে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করে তুলতে পারেননি। অথচ কি অসামান্য শক্তি নিয়েই না তিনি জন্মেছিলেন ! ... যেখানেই তিনি তাঁর অসুস্থ মানসিকতার অনর্গল উচ্ছ্বাসে সাধারণ মানুষের কাছে চিরদুর্বোধ্য জীবনদর্শনের অবতারণা করতে চেয়েছেন, সেখানেই তিনি আমাদের আতঙ্কিত করেছেন। ... জীবনানন্দের জীবনদর্শন একাকিত্বের তমসাচ্ছন্ন নৈরাশ্যে অন্তর্মুখীন—যে অন্তরের দ্বার, জানালা, গবাক্ষ, বাতায়ন মনুষ্যময়ী পৃথিবীকে এড়িয়ে চলার অত্যদ্ভুত অহঙ্কারে অবরুদ্ধ।” “জীবনানন্দকে অনুকরণ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। কারণ জীবনানন্দের যে মন ও বুদ্ধি কাব্য রচনা করত সে মন ও বুদ্ধি আধুনিক জীবনসংগ্রামের পরিবেশে জন্মাতে পারে না। অতীতের কাব্যজগতেও জন্মানো সম্ভব ছিল না। এ মন ও বুদ্ধি প্রথম ইউরোপীয় উত্তর-সামরিক সংস্কৃতিবিকারের ভয়াবহ উন্মত্ততার মধ্যে জন্মেছিল।” “গত কয়েক বৎসর থেকে তিনি কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন। দেখা হলে যখন জিজ্ঞাসা করতাম, ‘মানুষের সঙ্গে মেশেন না কেন?’ তার একটিমাত্র উত্তর শোনা যেত, ‘ভালো লাগে না!’ মানুষের সঙ্গ তাঁর অসহ্য লাগত। সাহিত্যিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে অন্যেরা যদি হাজার কথা বলতেন, জীবনানন্দের মুখ থেকে বেরুত দু-একটি নিঃস্পৃহ মন্তব্য। নিজের মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল এই নৈঃসঙ্গপ্রিয় কবির স্বধর্ম, তাই রবীন্দ্রনাথের পরে অদ্বিতীয় কাব্যপ্রতিভার অধিকারী হয়েও জীবনানন্দ একাকিত্বের নির্মম অহঙ্কারে এই প্রাণবন্ত প্রগতিশীল যুগ-বিভূতির গৌরব টিকা ললাটে ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি।” “এই অদ্ভুত প্রকৃতির কবি সারা জীবন ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেইসব গ্রন্থ সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনা করতেন যেগুলির মধ্যে মানুষের সমাজ, দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতির অত্যাধুনিক সমস্যাবলীর নামগন্ধও থাকত না। সামাজিক চেতনা ও জাগতিক অভিজ্ঞতার অভাবে-যে মহত কাব্য সৃষ্টি করা যায় না, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না।" "পাঠকের রসপিপাসু মনকে বিষণ্ন করে তোলা ছাড়া জীবনানন্দের সমগ্র জীবনদর্শনের আর কোনো দায়িত্ব নেই।" বিমলচন্দ্র ঘোষ লিখিত উক্ত প্রবন্ধ থেকে চয়িত এই উক্তিসমূহ থেকে জীবনানন্দ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, মনে হয়, তেমন ধারণা তাঁর মৃত্যুর পূর্ববর্তী দশ-পনের বছর বাংলা ভাষার অনেক সাহিত্যানুরাগীই তাঁর সম্পর্কে পোষণ করতেন। তাঁরা আধুনিকতাবাদীদের বাইরে কিংবা বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছেন। আধুনিকতাবাদীদের প্রতি বৃহত্তর পাঠকসমাজের মনোভাবও প্রতিকূল ছিল।

মানুষ সম্পর্কে জীবনানন্দ হয়তো ভালো ধারণা পোষণ করতেন না। মানুষ সম্পর্কে মেকিয়াভেলি, হব্‌স্‌ ও আরও কোনো কোনো মনীষীর ধারণা অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং তা তাঁরা লিখে প্রকাশও করেছেন। তবু তাঁরা মানববিদ্বেষী বলে অভিহিত হননি। কারণ মানবচরিত্রকে তাঁরা শোধনীয় মনে করেছেন—মানুষকে অনন্ত সম্ভাবনার ভাণ্ডার মনে করেছেন। জীবনানন্দও কখনো কখনো মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও স্বেচ্ছানির্বাসনের নিদারুণ দুঃখজনক একটি পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করে জীবনানন্দ কেন তাঁর সাহিত্যজীবন (জীবনও) অতিবাহিত করলেন, তা গুরুতর অনুসন্ধানের বিষয়। জীবন-জগতের সকল দিকে তিনি তাঁর দৃষ্টিকে ভালো করে প্রসারিত করতে চাইলেন না কেন? জীবনানন্দের প্রতিভার প্রতি গভীর সহমর্মিতা নিয়ে সবিস্ময়ে তাকিয়েও আমরা এই প্রশ্নে কৌতূহলী হই। বিমলচন্দ্র ঘোষ তাঁর প্রবন্ধটিতে 'বনলতা সেন' ও 'হাওয়ার রাত' কবিতা দুটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবেগের সঙ্গে বলেছেন : "হায় জীবনানন্দ, তুমি যে কি অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলে সেকথা হয়তো তুমি নিজেও জানতে না, আর কোনোদিন তোমার কোনো শুভানুধ্যায়ী তোমাকে মনে করিয়েও দেননি। তাই তোমার কলম থেকে 'হাওয়ার রাত' আর 'বনলতা সেন'-এর মতো কবিতা আর বেরুল না! তুমি চলে গেলে এক সুদুর্জ্ঞেয় রিক্ততার বোঝা বুকে নিয়ে মৃত্যুর হিমশীতল অন্ধকারে।" যাঁরা আধুনিকতাবদের বাইরে কিংবা বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছেন, এই উপলব্ধির সঙ্গে তাঁরা হয়তো একাত্মতা অনুভব করেছেন। জীবনানন্দকে তাঁরা ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করেননি, আর জীবনানন্দও তাঁর আত্মপরিচয় তাঁদের কাছে উন্মোচন করবার চেষ্টা করেননি। কেন? কিসের অভিমানে?

বাঙালির উনিশ শতকের জাগরণের ধারায় বিশ শতকে দেখা দেয় গণজাগরণ। স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১১) ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০) সমগ্র ভারতবর্ষ অসাধারণ বিক্রমে জেগে ওঠে এবং ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা-আন্দোলন দ্রুত বিকশিত হয়ে চলে, আর ব্রিটিশ-শাসনের দেশীয় ভিত্তি জমিদারতন্ত্র দুর্বল হয়ে চলে। রুশ-বিপ্লব (১৯১৭), চীন-বিপ্লব (১৯৪৯) এবং সারা পৃথিবীর উপনিবেশ দেশসমূহের স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙালির মনেও নতুন উদ্দীপনা ও আশার জোয়ার সৃষ্টি করে। বাংলার এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম কলঙ্কিত হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের Divide and Rule Policy-র সাফল্যে, জাতি বা nation সম্পর্কে তৎকালীন নেতাদের ভুল ও অস্পষ্ট ধারণা আর সুবিধাবাদী প্রবণতার কারণে এবং হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা দ্বারা। তা সত্ত্বেও, মনে হয়, জীবনানন্দের জীবনকালে বাংলার সামাজিক কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশে এমন কিছু ছিল না যাতে তাঁর পক্ষে পরিবেশগত কারণে নৈরাশ্যবাদী হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কেবল বিশ্বযুদ্ধের ও পাশ্চাত্যের অবক্ষয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে ভুল করা হয়; পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, রুশ-বিপ্লব, চীন-বিপ্লব, স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, জমিদারতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লব প্রয়াস, গান্ধী-নেহেরু-জিন্নার কর্মকৌশল আর জীবনানন্দের পারিবারিক ঐতিহ্য ইত্যাদির দিকেও দৃষ্টি প্রসারিত রাখা কর্তব্য। অবক্ষয় ও ধ্বংসলীলার মধ্যেও আশা ছিল, উজ্জ্বল উদ্ধারের জন্য অদম্য অপরাজেয় সংগ্রাম ছিল, মানুষের অপরিসীম মনোবল ছিল। জীবনানন্দের আত্মক্ষয়ী দুঃখ-বোধের কারণ অবশ্যই অন্য কোথাও ছিল যা আজো অনাবিষ্কৃত। এ প্রশ্নে কাব্যরস-পিপাসুদের সন্ধিৎসার পরিসর সঙ্কীর্ণ হতে পারে, কিন্তু জীবনরহস্য-সন্ধিৎসুদের কৌতূহল বহুব্যাপ্ত।

জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং তাঁর নিজের ও তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের অসামঞ্জস্যের মধ্যে অসুখের উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু তার মাত্রা জানা যায় না। তাঁর লিখিত গল্প-উপন্যাস অবলম্বনে এ সম্পর্কে অনেক কিছু অনুমান করা যায়। জীবনানন্দ-যে কোথাও খাপ খাইয়ে চলতে পারতেন না, তিনি-যে alienated বা estranged মানুষ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর স্ত্রীর অনেক উক্তিও এর অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়। এতে বোধ হয় সন্দেহের সুযোগ নেই যে, জীবনানন্দকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী সুখী ছিলেন না আর জীবনানন্দও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সুখী ছিলেন না। তাঁদের অসুখের ও কষ্টের মাত্রা বোঝা সহজ নয়। এ সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন, নিশ্চয়ই তাঁরা অনেক রেখে ঢেকে স্বামী ও স্ত্রী—কবি ও কবিপত্নী—উভয়ের প্রতি যথাসম্ভব সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে লিখেছেন। অনুরাগীরা জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে জীবনানন্দের স্ত্রী এক সাক্ষাতকারে বলেন : "ঐ ছবিতে আমি যেন আমার অচেনা ব্যক্তিত্বহীন একজন সাজানো সৌখিন কবির তৈরি-করা ছবি দেখতে পাই।" তিনি নিজেও হয়তো নিজের মনের মতো করে সাজিয়েই প্রয়াত স্বামীর পরিচয় দিয়েছেন। 'জীবনানন্দ এবং আরো কয়েকজন' শীর্ষক প্রবন্ধে অরবিন্দ গুহ লিখেছেন (*বিভাব*, জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪০৫) : "জীবনানন্দের মুখে মুখে শুনে তাঁর পারিবারিক অনেক ঘটনাই সঞ্জয় ভট্টাচার্য জেনেছেন। সেসব ঘটনা খুব সুখের নয়। স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন জীবনানন্দের একটা দ্বন্দ্বের কথা সঞ্জয় ভট্টাচার্য অকপটে ব্যক্ত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়েছেন যে জীবনানন্দ তার থেকে মুক্তি খুঁজছিলেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন : 'আমার মনে হয় জীবনানন্দ ঠিক ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা যাননি। যদিও এই কথাটাই সর্বত্র বলা হয়ে থাকে এবং আমরা দেখেছি, তথাপি আমার ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন।' "

কর্মজীবনেও জীবনানন্দ কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেননি। ১৯২১ সনে এম. এ. পাশ করার পর (তাঁর পরীক্ষার ফল ভালো ছিল : ম্যাট্রিকুলেশন প্রথম বিভাগ, আই. এ. প্রথম বিভাগ, বি. এ. (অনার্স) দ্বিতীয় বিভাগ, এম. এ. দ্বিতীয় বিভাগ) কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা-জীবন আরম্ভ করেন এবং প্রায় ছয় বছর পরে ওই কলেজ থেকে তিনি চাকুরিচ্যুত হন। তারপর মাস তিনেক অধ্যাপনা করেন খুলনা বাগের হাট কলেজে। ১৯৩০ সনে কয়েক মাস অধ্যাপনা করেন দিল্লির রামজস কলেজে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রায় বারো বছর তিনি বরিশাল বি. এম. কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৬ সনে তিনি কলকাতা চলে যান। ১৯৪৭ সনে কিছুদিন দৈনিক *স্বরাজ* পত্রিকায় রবিবারের সাহিত্য পাতার সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর কিছু আগে জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কল্যাণে উক্ত কলেজে সরাসরি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান রূপে নিয়োগ লাভ করেন। বিয়ের পর বছর পাঁচেক তিনি বেকার ছিলেন। তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়াও মাঝে মাঝে তিনি বেকার হয়ে পড়েছেন। এক সময়ে ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। অধ্যাপনায় ও অন্যান্য কাজে সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেননি। কেউ কেউ এমনও উল্লেখ করেছেন যে, ক্লাসে যাওয়ার সময়ে তিনি বিচলিত হতেন। বিয়ের পর থেকেই আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত থেকেছেন। জীবনানন্দ ছিলেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণে অসমর্থ এক অসহায় গৃহস্বামী। অনেকেই উল্লেখ করেছেন, মাঝে মাঝে তিনি খুব জোরে হেসে উঠতেন। কেন তাঁর জীবনটা এমন হয়েছে? সচ্ছল জীবনযাত্রার সামর্থ্য তাঁর হয়নি কেন? প্রথম জীবনে তাঁর সিটি কলেজ থেকে চাকুরিচ্যুত হওয়ার ঘটনাও তীব্র মানসিক আঘাতের কারণ ও ব্যক্তিত্বের পক্ষে বিপর্যয়কর হয়ে থাকতে পারে। এ ঘটনায়ও সারা জীবনের জন্য তাঁর ব্যক্তিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে। জীবনানন্দ চাকুরিচ্যুত হয়েছিলেন কেন? বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—অশ্লীল কবিতা লেখার অভিযোগে ; গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন—হিন্দু-ব্রাহ্ম বিরোধ ও কলেজের আকস্মিক আর্থিক দুরবস্থার কারণে গৃহীত ব্যবস্থার ফলে। কোন্‌টা ঠিক?

ইউরোপীয় ঐতিহ্যে দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিকদের সাধারণত আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী দেখা যায়। ইউরোপীয় জীবন-জগতদৃষ্টিই সাধারণভাবে আশাবাদী। এক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে বিরল ব্যতিক্রম জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) ও ফরাসি কবি বোদলেয়ার (১৮২১-৬৭)। বোদলেয়ারে আছে তীব্র নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনবিমুখতা—যার কথা বুদ্ধদেব বসুর কল্যাণে আমরা ভালোভাবেই জেনেছি। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাহিত্যাতত্ত্বে বোদলেয়ারের জীবন-জগতদৃষ্টিকে প্রবল উৎসাহে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাষায় যথাসাধ্য মহিমান্বিত করেছেন। কিন্তু কেন? কবিতার প্রয়োজনে? কবিতার প্রয়োজন কি জীবনের প্রয়োজনের চেয়ে ভিন্ন কিছু—বড় কিছু? বুদ্ধদেব বসু অবশ্য বলেছেন, 'সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়।' একথা মানতে আমাদের আপত্তি নেই। তবে, বুদ্ধদেব বসু নির্দেশিত 'সাহিত্যের বিধান' কি আমাদের গ্রহণ করা ও মেনে চলা উচিত? শোপেনহাওয়ারের THE WORLD AS WILL AND IDEA গ্রন্থের কেন্দ্রীয় ধারণাকে মোহিতলাল মজুমদার অভিহিত করেছেন 'ভবতৃষ্ণা' বলে। রবীন্দ্রনাথের মর্তপ্রীতি থেকে এই ভবতৃষ্ণা ভিন্ন। শোপেনহাওয়ার ভারতীয় হিন্দু ধর্মের এবং বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মনে হয় তিনি নিরীশ্বর ছিলেন। খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাঁর মন বিরূপ ছিল। তিনি হেগেলের বিরুদ্ধ-পক্ষের লোক ছিলেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে হেগেলের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মোহিতলাল-কথিত ভবতৃষ্ণা বা the will to live-ই নিরাশ হওয়ার এবং দুঃখবাদী হওয়ার নিশ্চিত কারণ। জীবনের উপর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার পীড়নের বিস্ময়কর বর্ণনা তিনি দিয়েছেন THE WORLD AS WILL AND IDEA গ্রন্থে। মহাবিশ্বের মর্মে তিনি অনুভব করেছেন এক বিবেকহীন, যুক্তিহীন, অকল্যাণকর, অন্ধ চালিকাশক্তি। তাঁর মতে, ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকেন যিনি দয়ালু, কল্যাণকর, মহানুভব, তাহলে এমন হতেই পারে না। হয় ঈশ্বর নেই, নাহয় ঈশ্বর সদাসক্রিয় মূর্তিমান দুর্দৈব—সকল প্রকার অকল্যাণের ও অশুভ শক্তির সম্মিলিত ঘণীভূত রূপ। মানবজীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা-পরাজয়-গ্লানি-ঈর্ষা-বিদ্বেষ আর শক্তির-মত্ততা শোষণ-পীড়ন-প্রতারণা এবং অপ্রেম ও নিষ্ঠুরতা তাঁর চিত্তকে নাড়া দিয়েছে, তবে তিনি ছিলেন জনবিমুখ, সমাজবিমুখ, আন্দোলনবিমুখ, সংগ্রামবিমুখ, জীবনের মহত সম্ভাবনা তাঁর মনে অল্পই আশা জাগিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' কবিতায় শোপেনহাওয়ারের চিন্তার প্রভাব থাকতে পারে। বোদলেয়ার এবং শোপেনহাওয়ার সম্পর্কে উৎসাহী ইউরোপের অনুসন্ধানকারীরা দেখিয়েছেন যে, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং পারিবারিক পরিমণ্ডলে দুঃখবাদী হওয়ার কারণ নিহিত ছিল। জীবনানন্দের জীবনে তেমন কিছু আজো কেউ গুরুত্ব দিয়ে নির্দেশ করেননি। তাহলে জীবনানন্দে কেবল দুঃখ নয়, দুঃখবাদ দেখা দিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরসন্ধানে যদি কেউ আগ্রহী হন, তাহলে তাঁকে জীবনানন্দের জীবনের ঘটনাগুলো ভালো করে—পরিপূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে—অনুসন্ধান করে, বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। অধিকন্তু দেখতে হবে বাংলাভাষী ভাবুক মহলে modernism বা আধুনিকতাবাদের প্রকাশরূপ ও মর্মবস্তু—ইংরেজিতে যাকে বলে appearance and essence. এক্ষেত্রে pshycho-analysis-এর পদ্ধতি অবলম্বন করে জীবনানন্দের জীবনচেতনা ও ব্যক্তিত্বকে বুঝবার চেষ্টা দরকার। এটা সাহিত্যের জন্য যতখানি দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার জীবনের জন্য। জীবনানন্দের বাহ্যজীবন ঘটনাবিরল হলেও তাঁর মনোজীবন ছিল অত্যন্ত সক্রিয় ও ঘটনাবহুল। তাঁর অনুভবে ও চিন্তায় সূক্ষ্মতা ও গভীরতা দুইই আছে। তাঁর জীবন তাঁর কবিতা-গল্প-উপন্যাসের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক কিংবা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর জীবন সম্পর্কে তথ্যও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু সেগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে তলিয়ে দেখা হয়নি। ভালো করে সন্ধান করলে হয়তো আরো তথ্য পাওয়া যাবে। গত সত্তর বছর ধরেই জীবনানন্দকে আধুনিকতাবাদী তত্ত্বের আশ্রয়ে কেবল একটি ছক-বাঁধা ধারায় বিচার করা হয়েছে। জীবনানন্দকে বোঝার ক্ষেত্রে এটা যতটা সহায়ক ততটাই বিভ্রান্তিকর।

বুদ্ধদেব বসুর সামর্থ্য, সৃষ্টিশক্তি, সাহিত্য বিষয়ে তাঁর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা—ইত্যাদি নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই। বিস্ময়কর রকম সুন্দর, আকর্ষণীয় ও মোহকর তাঁর প্রবন্ধের গদ্য। বাংলায় সুন্দর চিত্তাকর্ষক মনোমুগ্ধকর রমনীয় গদ্য রচনায় আর কেউই তাঁর সমকক্ষ নেই। কবিতায় ও কথাসাহিত্যে তাঁর সৃজন-উদ্যোগও মনোযোগ দাবি করে। আমাদের অভিযোগ তাঁর বিশ্বদৃষ্টি ও সংগঠিত কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য নিয়ে—তাঁর প্রচারবাহুল্য আর হৈ চৈ সৃষ্টি করে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবণতা নিয়ে। তাঁর বিশ্বদৃষ্টিকে সমর্থন করবার কোনো কারণ কি পাওয়া যায়?

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি উপনিবেশেকারী দেশে নানা নামে modernism-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। এই মতাদর্শের মর্মে আছে নৈরাশ্যবাদ, নেতিবাদ, শূন্যবাদ। মানুষ মাত্রেরই জীবনে দুঃখ আছে। কোনো মানুষের জীবনে দুঃখের মাত্রা এবং দুঃখের কারণ খুব বেশি হলে এবং সুখের সম্ভাবনা কমে গেলে বা তিরোহিত হলে তিনি দুঃখবাদী হয়ে পড়তে পারেন। তবু সকল মানুষই দুঃখকে অতিক্রম করে সুখ সন্ধান করেন এবং বেঁচে থাকতে চান—শক্তিমানেরা অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন। নৈরাশ্যবাদীরা, দুঃখবাদীরা ও অদৃষ্টবাদীরা বাঁচতে-যে চান না, তা নয়। তাঁদের জীবনে কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা-যে থাকে না, তাও নয়। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকে দুর্বল ও বিকারপ্রাপ্ত বলা যেতে পারে। নৈরাশ্যবাদীদের জীবন-জগতদৃষ্টির ও জীবনতৃষ্ণার প্রকৃতি অন্যদের থেকে ভিন্ন। তাছাড়া, কায়েমি-স্বার্থবাদীরা, হীন-স্বার্থান্বেষীরা, আপিত্যবাদী ও প্রভুত্ববাদীরা, প্রতারক ও প্রবঞ্চকেরা নিজেদের হীন স্বার্থ বজায় রাখার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কর্তৃত্ব দখল করে প্রচারকার্যের দ্বারা সমাজে নৈরাশ্যবাদ ও অদৃষ্টবাদ ছড়াতে পারে। নিজেরা নৈরাশ্যবাদী ও অদৃষ্টবাদী না হয়েও কায়েমি-স্বার্থবাদীরা প্রতিপক্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনে নৈরাশ্যবাদ প্রচার করতে পারে। বিংশ শতাব্দীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিকতাবাদ বা modernism-এর বেলায় আন্তরিক প্রয়াসের সঙ্গে এ ধরনের হীন প্রয়াসও যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। অনেক কিছুই দৃশ্যের অন্তরালে ঘটে। তাই এসব বিষয় প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয়। কোনো কিছুরই appearance এবং essence এক রকম হয় না। যাঁদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সজাগ এবং অন্তরেন্দ্রিয় শক্তিশালী, তাঁরা সক্রিয় হলে অনেক কিছু শুনতে, দেখতে এবং বুঝতে পারেন। বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যপরিস্থিতি ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে বুঝবার চেষ্টা করলেও অতীতের অনেক রহস্য বোঝা সহজসাধ্য হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে উপনিবেশকারী শক্তিসমূহের দরকার ছিল নৈরাশ্যবাদ ও অদৃষ্টবাদ প্রচারের, কারণ তখন উপনিবেশ-দেশগুলোতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রকাশ্য রূপ লাভ করেছে। পুলিশ, মিলিটারি, জেল, জুলুম, ফাঁসিকাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা যেমন দমন করা হয়েছে উপনিবেশ দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে, তেমনি সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় নানাভাবে মানুষের মগজ ধোলাই করেও স্বাধীনতা-আন্দোলনকে দমন করার আয়োজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপনিবেশবাদীদের কার্যক্রমের কিছু প্রমাণ অবশ্যই দেওয়া যাবে। তবে, বর্তমান প্রবন্ধে, এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপনের খুব কি দরকার আছে? যাঁদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, আস্বাদনশক্তি, অনুভবশক্তি ও চিন্তাশক্তি বিকারপ্রাপ্ত, যাঁরা মানবিক গুণাবলীর প্রতি নির্দয় ও নৃশংস এবং আত্মস্বার্থের অন্ধ অনুসারী ও পশুশক্তির পূজারী, জাতীয় স্বাধীনতার বোধ যাঁদের অন্তরে নেই, আমার এ লেখা তাঁদের পড়ার জন্য নয়।

যুদ্ধ সভ্যতার সঙ্কটের প্রকাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্ব থেকেই পাশ্চাত্য উপনিবেশকারী দেশসমূহের লেখক-শিল্পীদের একাংশে দেখা দেয় পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্কটের উপলব্ধি ও নৈরাশ্য, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেতে থাকে নৈরাশ্যমূলক উপলব্ধি। পাশাপাশি দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের নতুন আশার সন্ধানও চলতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) আর রুশবিপ্লব (১৯১৭) একই সময়ের ঘটনা, আর এরই মধ্যে সূচিত হয় উপনিবেশ দেশসমূহের প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রাম। ইউরোপের ওই সময়ের নৈরাশ্যবাদ-আশ্রিত বিভিন্ন শিল্পতত্ত্বই এক পর্যায়ে modernism নাম গ্রহণ করে বিকশিত হতে থাকে। উপনিবেশকারী শক্তিসমূহ দৃশ্যের অন্তরালে থেকে, এমনকি প্রকাশ্যভাবে, এর সুযোগ গ্রহণ করে উপনিবেশ দেশসমূহে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মহলে নৈরাশ্যবাদ প্রচারে মদদ জোগাতে থাকে। তারা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স, কংগ্রেস, গবেষণা-প্রকল্প, স্কলারশিপ ইত্যাদির আয়োজন করে অবক্ষয়চেতনা, নৈরাশ্যবাদ, অদৃষ্টবাদ, নেতিবাদ, শূন্যবাদ ইত্যাদির প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতা ও প্ররোচনা দিতে থাকে। উপনিবেশ-দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন ও কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে দুর্বল করা, বিপথগামী করা, সম্ভব হলে ধ্বংস করা ইত্যাদি ছিল উপনিবেশবাদীদের উদ্দেশ্য। Congress for Cultural Freedom, PEN প্রভৃতি সংগঠনের উদ্ভব, বিকাশ, কার্যক্রম ও অন্তর্গত ব্যাপারগুলো পর্যালোচনা করলে এবং modernism-এর উদ্ভব ও বিকাশ লক্ষ্য করলে অন্তত কিছু রহস্য বোঝা যায়। তবে দৃশ্যমান ঘটনাবলীর অন্তরালে অনেক কিছুই অদৃশ্য রয়েছে। বিঘোষিত বক্তব্যের অন্তরালে অঘোষিতও অনেক কিছু রাখা হয়। Appearance ও essence-এর পার্থক্য মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ। এই ব্যাপারটিকে নানা শক্তি নানাভাবে কাজে লাগায়। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষকে appearance ভেদ করে essence সন্ধান করতে হয়। মায়া ও বাস্তব, appearance and reality, appearance and essence ইত্যাদি বিষয়কে কোনোভাবেই যাঁরা উপলব্ধি করেন না, করতে চান না, যাঁরা কেবল প্রত্যক্ষ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁদের সঙ্গে তর্ক চলে না।

সুনির্দিষ্টভাবে এক বুদ্ধদেব বসুর আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং দেশে-বিদেশে তিনি যেসব সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কংগ্রেস, কনফারেন্স ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন সেগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক চরিত্র, ঘোষিত ও অঘোষিত আদর্শ-উদ্দেশ্য এবং উদ্ভব ও বিকাশের কারণ-কার্যসূত্র অনুসন্ধান করে দেখলে অনেক কিছু বোঝা যায়। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের একটি শক্তিশালী ধারায় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী বুদ্ধদেব বসুর রাজত্ব চলেছে—সে রাজত্বের অবসান আজো হয়নি। জীবনানন্দ দাশ হয়তো বুদ্ধদেব বসুর এসব ব্যাপার সম্পর্কে না জেনেই, কিংবা সামান্য জেনে, তাঁর প্রভাব-বলয়ে আবর্তিত হয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর অজান্তেই হয়তো তাঁর মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু প্রচারিত তত্ত্বের ও ইউরোপীয় modernism-এর অন্তত কিছু উপাদান। আর নৈরাশ্যবাদের বাস্তব ভিত্তি তো মানুষের জীবনে এবং পরিবেশে থাকেই। তবে সেই বাস্তব ভিত্তির মধ্যে আশাবাদের বিস্তৃত পরিসরও একই সঙ্গে বিরাজ করে। উপনিবেশবাদীরা এবং তাদের স্থানীয় সহযোগীরা আধুনিকতাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন নৈরাশ্যবাদকে জয়ী করে মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে বহাল রাখার অন্যতম কর্মনীতিরূপে। অনেকে অজ্ঞাতসারেও এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। যদিও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দে উৎসাহী থাকতে পারেননি এবং জীবনানন্দও বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যাদর্শকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেননি তবু জীবনানন্দ কলকাতার আধুনিকতাবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত কিংবা বিভ্রান্ত হননি—এমন কথা কি নিঃসংশয়ে বলা যাবে? আইনস্টাইন মর্মজ্বালায় ভুগেছিলেন যখন দেখেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তাঁরই কাছ থেকে তাঁর আবিষ্কারের ফল নিয়ে নাগাসাকি ও হিরোসিমাতে আণবিক বোমা ফেলে অতি সহজে স্বল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল এবং দুটি শহরের সমুদয় সম্পদ ধ্বংস করেছিল। প্রতিভাবানেরাও বোকামি করতে পারেন, বিভ্রান্তিতে পড়তে পারেন, অন্যদের দুরভিসন্ধির শিকার হতে পারেন।

বর্তমানে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ গত দুইশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসময় অতিক্রম করছে। বর্তমান বলতে আমি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী উনত্রিশ বছরের কথা বলছি। নানা রকম তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে জনগণের মধ্যে সব কিছুর প্রতিই যে নিদারুণ নিঃস্পৃহ ও বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে এতকালের নিয়মে এ সমাজে ভালো যা-কিছু কার্যকর হত, তার কিছুই আর কার্যকর হচ্ছে না। বর্তমানে প্রচারিত post-modernism—বাংলা করা হয়েছে 'উত্তরাধুনিকতা', অথচ এর বাংলা হওয়া উচিত 'উত্তরাধুনিকতাবাদ'—পূর্ববর্তী modernism-এর বা আধুনিকতাবাদেরই substitute বা প্রতিকল্প রূপে বিকশিত হচ্ছে। Modernism-এর এখন আর কোনো আবেদন নেই। তাই নতুন কিছু সন্ধান করতে হচ্ছে। এখন ওয়াশিংটন-কেন্দ্রিক Globalization-নীতিরই এক শাখা হয়ে দাঁড়িয়েছে post-modernism. বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টির ধারাকে বিকশিত করার প্রয়োজনে দুটো মতাদর্শকেই বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার আছে। আধুনিকতাবাদী ধারার প্রধান কবি ও উপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশের জীবন ও সৃষ্টিকে পূর্বধারণামুক্ত বিশ্লেষণ-মূলক ও বিচারমূলক দৃষ্টি নিয়ে নতুন করে পড়ে দেখতে হবে।

যত তথ্য-বিবরণই সঙ্কলিত হয়ে থাকুক না কেন, আজ পর্যন্ত জীবনানন্দ সম্পর্কিত কার্যকর প্রায় সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই বুদ্ধদেব বসু ও দীপ্তি ত্রিপাঠির উক্তিসমূহের পুনরুক্তি মাত্র। দীপ্তি ত্রিপাঠীও বুদ্ধদেব বসুরই প্রতিধ্বনি। চিন্তার এই আবর্ত থেকে মুক্তি দরকার। গত প্রায় দুই দশকের মধ্যে জীবনানন্দের অপ্রকাশিত অনেক লেখা, পূর্বপ্রকাশিত অথচ বিস্মৃত অনেক লেখা, এবং তাঁর জীবন-সম্পর্কিত অনেক তথ্য আমাদের সামনে এসেছে। তা ছাড়া আধুনিকতাবাদীদের প্রতিপক্ষের বক্তব্য সমূহকেও সামনে আনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় জীবনানন্দের জীবন, দেশকাল ও সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্বধারণামুক্ত তথ্যনিষ্ঠ সত্যসন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন আলোচনার সূত্রপাত হলে বলা যাবে যে, তাঁর সম্পর্কে যথার্থ বিচার-বিবেচনার ও উপলব্ধির সূত্রপাত হয়েছে। আর তা যদি ঘটে, তাহলে আশা করা যায়, বাংলা ভাষার সাহিত্যও বর্তমান ক্লান্তিকর আবর্ত থেকে মুক্তি পাবে এবং তার সামনে সৃষ্টির নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হবে।

বাইরের জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে চলবে না, বাঙালিত্বের মধ্যেই আমাদেরকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে হবে ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও দর্শনকে। শিল্প-সাহিত্যকেও। গ্রহণ করে আমাদেরকে হতে হবে আরো সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও উন্নত বাঙালি। সাহিত্যাদর্শের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, মোহিতলাল, এস. ওয়াজেদ আলি, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কাজী আবদুল ওদুদ, নজরুল ইসলাম, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ মনীষী আজো আমাদেরকে বাঙালিত্বে আত্মস্থ থাকতে এবং বাইরের জগত থেকে গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হতে অনেক বেশি সহায়তা করতে পারেন। ইউরোপ-আমেরিকার উত্তেজনাপূর্ণ সাময়িক আন্দোলনের অস্থিরতাজাত কিংবা প্রতারণামূলক বক্তব্য নয়, কালজয়ী লেখকদের মহত বক্তব্য সহায়তা করবে আমাদেরকে বড় হতে। আধুনিকতাবাদী কিংবা উত্তরাধুনিকতাবাদী সাহিত্যের পাশাপাশি আমাদের মনোযোগী হওয়া দরকার কালজয়ী মহত লেখকদের রচনাবলীর প্রতি। কালজয়ী মহত সাহিত্য আজকের দিনেও রচিত হচ্ছে। সেগুলোর সন্ধান আজকের প্রচারমাধ্যম ও প্রতিপত্তিশালী বুদ্ধিজীবীরা মানুষকে দিতে চান না ; কষ্টসাধ্য অনুসন্ধান-অনুশীলনের মাধ্যমে সেগুলোকে জানতে ও আত্মস্থ করতে হবে। ইউরোপের কালজয়ী মহত লেখকদের সঙ্গে বাংলা ভাষার কালজয়ী মহত লেখকদের তুলনা করলে দুইপক্ষের মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়। বাঙালি মানসে নেতিপ্রবণতা এবং বাঙালির জীবনধারায় নেতিবাদী আন্দোলনের প্রভাব খুব বেশি পড়েছে এবং তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে। দরকার ইতিপ্রবণতা ও ইতিবাদী আন্দোলন। দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে বাঙালি anti-thesis অবলম্বন করে এগোতে খুব উৎসাহ বোধ করে এবং thesis কিংবা synthesis-এর প্রতি অনীহ থাকে। দরকার thesis কিংবা synthisis অবলম্বন করে এগোনো। অভ্যাসের দাসত্বে মুক্তি নেই।

আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে জীবনানন্দ অনেক বড়—আধুনিকতাবাদের কারণে নয়, তাঁর স্বকীয় প্রতিভার কারণে। বাংলা ভাষার আধুনিকতাবাদীদের জমজমাট বলয়ের মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, নির্জন, সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁর লেখা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত—তাতে আধুনিকতাবাদের ছাপ পড়ে থাকলেও তিনি স্বতন্ত্রই। তাঁর অনেক কবিতা আমাদের প্রিয়। তাঁর কবিতার যে প্রভাবকে আমরা—পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারস্থ না হয়েও—অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছি, বাঙালিজীবনে তার প্রভাব শুভকর। জীবনানন্দের কবিতা বোঝার জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিতের পাদটিকা-কণ্টকিত, পাণ্ডিত্য-ভারাক্রান্ত, কষ্টকল্পিত ভাষ্যের দরকার হয় না, তার জন্য সহজ সাহিত্যবোধ ও তত্ত্বের জটাজালমুক্ত সরল সাহিত্যজ্ঞানই যথেষ্ট। জীবনানন্দের সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি সত্ত্বেও তাঁর যেসব কবিতার মর্মার্থ বোঝা যায় না, সেগুলোর অর্থ কি কোনোদিন স্পষ্ট হবে? মনে হয় রহস্য থেকেই যাবে। তাঁর উপন্যাস এবং গল্প পাঠের দিকেও আজ পরিপূর্ণ মনোযোগ দরকার। তবে জীবনানন্দের জীবন ও দেশ-কালকে তাঁর কবিতা-গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে যথাসম্ভব বুঝবার দরকার আছে বাংলা সাহিত্যের উন্নতর নতুন ভবিষ্যতের প্রয়োজনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের গল্প ও গল্পের জীবনানন্দ

সুব্রত বড়ুয়া

কবি জীবনানন্দ দাশের গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে শুরুটা এই রকম হতে পারে যে, জীবনানন্দ গল্পও লিখেছেন, শুধু কবিতা নয় কিংবা 'কবিতার কথা' নামে প্রবন্ধগ্রন্থও নয়। কবির গল্প রচনা কোনো অভিনব বিষয় নয়। কিন্তু জীবনানন্দের গল্প ও উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বিস্ময় (সেই বিস্ময় যা জীবনানন্দের কবিতায় বার বার ফিরে এসেছে) এই যে, অধিকাংশ সম্পর্কে জানা গেল বহু পরে, তাঁর মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর। আধুনিক বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ সারথি জীবনানন্দের কবিতায়, কিংবা বলা প্রয়োজন অধিকাংশ কবিতায়, গল্পের একটি আভাস অবশ্য সব সময় উপস্থিত থেকেছে, যদিও সে গল্প আদ্যন্ত কোনো কাহিনী বা উপাখ্যান নয়। গল্পের শরীর নিশ্চয়ই একটি উপাখ্যান যেখানে কাল ও পাত্র-পাত্রীর অবস্থান চিহ্নিত হয় এবং ঘটনার ঘনঘটা না থাকলেও ঘটনাক্রমের নিরন্তরতার প্রেক্ষাপটে গল্পোপাখ্যান একটি পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু পরিণতিই যে গল্পের বিশেষভাবে কাম্যবস্তু তা নয়। জীবনানন্দের গল্পপাঠের অভিজ্ঞতা এমন যে, তা বাংলা গল্পের কাহিনীর অবলম্বনভিত্তিক বহিরঙ্গ এবং গল্পের নাটকীয় সমাপ্তির অবকাঠামোগত রচনারূপকে তীব্রভাবে সমর্থন করে না। এমনকি নাটকীয়তার সম্ভাবনা গল্প সূচনায় লক্ষিত হলেও সেই নাটকীয়তা ঘটনার পরিণতিতে নাটকীয় হয়ে ওঠে না, যতটা তা হয়ে ওঠে সেই চরিত্র বা চরিত্রগুলোর ব্যক্তিজীবনের অন্তর্লীন বিষাদলগ্নতায়, জীবনের অর্থহীনতায় কিংবা মানুষের একান্ত নিঃসঙ্গতায়। এ বক্তব্যের সমর্থন উপস্থাপন করা যায় বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর কয়েকটি গল্প থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে।

'হেমন্তের দিনগুলি' গল্পে কলকাতায় বসবাসের জন্য আগত অসিতের পরিচয় পেয়ে যাই আমরা খুব অল্প কথায় :

> যুদ্ধের শেষের দিকে এসব ঘটনা ঘটেছিল। অসিত মফস্বলে কাজ করত। দুতিন বছর আগে একবার কলকাতায় সে এসেছিল সপরিবারে—বেড়াতে ঠিক নয়, চাকরি বা ব্যবসা করতেও নয়—কিন্তু, কেমন একটা অদ্ভুত প্রাণসরিৎসাগরের উচ্ছলতা অনুভব করে—কলকাতা-জীবনের গতিবিরতি ও ভাবপ্রতিভায় নিজেকে মথিত ক'রে নেবার একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণ অনুভব করে।

কলকাতার অদ্ভুত প্রাণসরিৎসাগরের উচ্ছলতায় মথিত হবার আনন্দ যখন প্রায় নৈরাশ্যক্লিষ্ট অবসাদে এসে পৌঁছে তখন আমরা এই 'হেমন্তের দিনগুলো'য় অসিতের মুখোমুখি হই।

> মফস্বলের চাকরিতে অসিত জমাতে পারেনি কিছু—দেনা হয়েছিল। এবার মাস ছ সাত আগে—কলকাতায় এসে সে প্রথমে অন্য কারু গলগ্রহ হয়ে কাটাচ্ছিল—সুবিধা পাচ্ছিল না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মফস্বলে ফিরে যেতে হবে ভেবে নিরাশ হয়ে পড়েছিল—এমন সময় শুনতে পেল রমেশের বাড়িটা খালি প'ড়ে আছে। রমেশের কাছে প্রস্তাব করতেই বাড়িটা পাওয়া গেল। তারপর এই কয়েক মাস ধ'রে রমেশের বাড়িতে সে আছে। প্রভিডেন্ট ফণ্ডের সব টাকাই প্রায় খরচ হয়ে গেছে অসিতের। প্রথম ছ'মাস পুরো মাইনেতে ছুটি পেয়েছিল—তারপর মাইনে অর্দ্ধেক ও সিকি হয়ে গেল—এখন সে মাইনে পায় না আর। মফস্বলের অফিসের কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়েছে যে বিনা বেতনেও তাকে আর ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে না। সে ফিরে এসে চাকরিতে যোগ দিতে চায় কিনা আগামী মাসের পনেরো তারিখের ভিতরেই জানাতে হবে।

এই হচ্ছে গল্পের নায়ক অসিত। তার একটি চাকরি প্রয়োজন কলকাতায় থাকতে হলে, থাকতে হবেই, মফস্বলের চাকরি যেন অস্তিত্বহীন তার কাছে। আমরা ক্রমেই বুঝতে পারি—অসিত তার স্ত্রী সীতার কাছে মিথ্যে বলেছে যে, সে চাকরি করে কলকাতায়। সাত মাসের কলকাতা বাসে স্ত্রী সীতার সাথে একটা দূরত্বও তৈরি হয়—যা কেবল দৈনন্দিনতার নানা জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও মনের মধ্যে তৈরি হয়ে ওঠা অবসাদের কারণেই জটিল হয়ে উঠতে থাকে। গল্পের জটিলতা তৈরি হয় রসিক মিত্তিরের ছেলে মনোহরকে নিয়ে যে কিনা 'মিলিটারি কনট্রাক্ট্ নিয়ে—কালো বাজার ক'রে ছেলেটা কত জায়গায় ঘুরেছে—কত লাখ টাকা ক'রেছে—কত মেয়ে চষেছে নিজেই অসিতের কাছে সে সব গল্প অনেক বার ক'রে গেছে সে।' আমরা এও জানতে পারি—অসিতের হাতে যখন টাকা ছিল তখন মনোহর প্রশ্রয় পেত না, কিন্তু টাকার প্রয়োজন যখন অসিতের হল তখন মনোহরকে মেনে না নিয়ে পারা গেল না। মনোহর সীতাকে সিনেমায় নামানোর প্রস্তাব দেয়, অসিত নিজেও তাই করতে চায়—এবং সেই মফস্বলের মোটামুটি চলে-যাওয়া জীবন থেকে কল্লোলিনী কলকাতার জীবনে মথিত হতে আসা অসিত কেবলই নেমে যায়। এই নেমে যাওয়া কেবল বাইরের ব্যাপার হলেও অসিত অন্য আর দশজনের মতো থাকতে পারত ; কিন্তু তা তার নিজের জন্যও কষ্টের হয়ে দাঁড়ায়। তারপর—

> সীতা মারা গেল তিন মাসে মেয়ে প্রসব করে—খোকন মারা গেল পাঁচদিনের জ্বরে। এক অন্ধকার রাতে লেকের জলে পা ডুবিয়ে বসে ছিল অসিত—নক্ষত্রের আলোয় ডানে বাঁয়ে কাছে অতি দূরে জলের ব্রহ্মস্পর্শে তার মৃত্যু হ'ল না। কেমন একটা সমাধির ভিতর অস্পষ্ট হয়ে পড়ল সে। অনেক রাতে চাঁদ উঠতে দেখে সেই স্বর্গীয় খোকন-পাখি, সীতা-পক্ষিণী, রামচরণ গিরেবাজটাকে ভালো লাগল তার—জলের না কি বিল্বাঘাসের মঞ্জরীকে বাতাসের আঘাতের মত ঝঙ্কার চারিদিকে—কিন্তু তবুও গভীরতর পরিচ্ছন্নতায়—শ্বাস রোধ হয়ে যায় মধ্যহ্রদের জলের ভিতর। বুঝতে পারল না সে ডাঙ্গায় রয়েছে—না জলের ভিতরে?

অসহায় অসিত কেন মদনগঞ্জ ছেড়ে কলকাতায় মথিত হতে এসেছিল তার উত্তর তেমন স্পষ্টভাবে গল্পের কোথাও নেই, যদিও অসিতের এই চলে আসা উদ্দেশ্যহীন ছিল না। শেষ পর্যন্ত অসিত রমেশের বাড়িতে ভাড়া বসায় রমেশকে না জানিয়ে কিংবা রমেশের অনুমতি না নিয়েই, একটি চাকরি নেয় ৭৫ টাকা বেতনের এবং অবধারিতভাবেই জৈবিক জীবনধারণের তুচ্ছ ও গ্লানিময় দৈনন্দিনতায় আত্মসমর্পিত হয়। মানুষকে হয়তো এই রকমই হতে হয়, কেননা সে বেঁচে থাকে এবং বেঁচে থাকার সচলতার মধ্যেও মালিন্য মানুষকে কখনো ছেড়ে যায় না।

এই গল্পটির সমান্তরালে রেখে পড়া যেতে পারে আরও একটি গল্প 'বিলাস' যেখানে শান্তিশেখর এইভাবে প্রথম থেকেই আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়—

> রোজই যে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে কাটে তা নয়,—সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বাচ্ছন্দ্যও নেই। তবুও কলকাতা ছেড়ে কোথায় আর চলে যেতে পারে শান্তিশেখর। যেতে যে ইচ্ছা নেই, তা-ও নয় ; কিন্তু ইচ্ছা কার কবে কতদূর পূর্ণ হয়েছে এই পৃথিবীতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> কলকাতায় থাকতেও তার অনিচ্ছা যে খুব বেশি তা নয়,—কিন্তু যে-রকম ঘর-দোর পারিপার্শ্বিক টাকাকড়ির স্বাধীন সচ্ছলতা সে চেয়েছিল, কোথায় সে-সব? এ-সব অনেকেই চায়; কিন্তু কজন পায়? অবিশ্যি মনই স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে—শরীর উপস্থাপয়িতা নয় কি শুধু! শরীর ব্যথা পায়, গ্লানি বোধ করে, লাঞ্ছিত হয়, মনে হয় যেন মন লাঞ্ছিত হচ্ছে, কিন্তু তবুও মনে কোনোরকম কালিমাপাতই হয় না যেন—এমন লোকও থাকে। এ-রকম লোক শান্তিশেখর দেখেছে বটে। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে সে নিজেও যদি ঠিক সেই রকম হত, তাহলে ভালোই হত। কিন্তু এখনো হয়ে উঠতে পারে নি।

শান্তিশেখর একটি আমেরিকান অফিসের প্রুফরিডার, ঘোষসাহেবের অধস্তন, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক রাত পর্যন্ত প্রুফ দেখতে হয়—জীবনে তার কোনো আনন্দ কিংবা বৈচিত্র্য নেই। এই মানুষকে নিয়েও গল্প হয়, কেননা শান্তিশেখর তার স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নবিলাসের মধ্যে অন্য এক অতীত জগতে পৌঁছে যায়—বাস্তব ও অবাস্তব যেখানে তাকে আলোড়িত করে। শান্তিশেখরের ভাবনার মধ্যে, চিন্তার মধ্যে এইভাবে অন্য এক শান্তিশেখর বেঁচে থাকে। আর শান্তিশেখর যখন মারা যায়—

> অফিসের কাজ সেরে শান্তিশেখর বাড়ি ফিরল; কিন্তু সেই রাতেই নিজের বিছানায়—শীতের রাতের গভীরতার ভিতর কী করে যে তার মৃত্যু হল, ডাক্তার কোনো পরিষ্কার হিসেব দিতে পারল না, তিন ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা কেউই কোনো অনির্বচনীয় কারণ খুঁজে পেল না।

আর শান্তিশেখরের মৃত্যুতেও কারো কোনো শোক কিংবা ভাবান্তর হয় না। না হওয়াই স্বাভাবিক। জীবনানন্দ এই রকমই দেখেন। কেন দেখেন? গল্পকাহিনীতে কতোরকম কাকতালীয় ঘটনাই তো ঘটে, যে মেয়েটি শান্তিশেখরের একাকীত্বকে কিছুটা হলেও সঙ্গ দিয়ে দূর করতে চেষ্টা করে সে-ও শেষ পর্যন্ত দূরের মানুষ হয়েই থাকে।

এ দুটি গল্পের বিপরীতে দেখা যেতে পারে 'মেয়েমানুষ' কিংবা 'বাসর ও বিচ্ছেদ' এবং 'শাড়ি' ইত্যাদি গল্প। মানুষের বেঁচে থাকার মধ্যে, প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে, জীবন ধারণের তুচ্ছ নানা আবশ্যিকতার মধ্যে যে মানুষগুলোকে তিনি তুলে আনেন তাঁর গল্পে তারা সফল-অসফল নির্বিশেষে নিঃসঙ্গ মানুষ, এমনকি তারা তাদের জীবন ধারণের অপূর্ণতার জন্য কাউকে দোষারোপও করে না, বাইরে ও ভেতরে অন্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকে কিংবা বেঁচে থাকার জন্যই কেবল বেঁচে থাকে। আর এই মানুষগুলোর গল্পের মধ্যে নানা কথা-উপকথা এসে যায়—সংলাপের মধ্যে, বর্ণনার মধ্যে পড়তে পড়তে মনে হয় এতো ভাবনা-বিচিত্রতা, মানবচরিত্রের এইরকম পূর্ণতা-অপূর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, দায়বদ্ধতা—এ-সব জীবনানন্দের কল্পনাভুবনের মধ্যে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল আর জীবনানন্দ তাঁর গদ্যবিন্যাসে এইসব ধরে রেখেছিলেন—সবিস্তারে, খুব ছোট-খাটো বিষয় বর্ণনার সূক্ষ্ম কারুকাজে, যেমনটি তাঁর দীর্ঘ কবিতায়ও।

'বাসর ও বিচ্ছেদ' গল্পটির প্রসঙ্গ আলোচনায় খুব অবাক হয়ে যেতে হয় এজন্য যে, বউভাতের একটি শাড়ি বাছাই নিয়ে গল্পটি শুরু হয় বটে, কিন্তু সমাপ্তিতে তা একেবারে ভিন্ন এক মেরুতে পৌঁছে যায়। অমলা, গল্পের শুরু থেকেই টের পাওয়া যায়, আত্মমুখী উন্নাসিক এক নবোঢ়া নারী। শাড়ি তার উপলক্ষ্য এবং এই শাড়ি বাছাইকে কেন্দ্র করেই গল্পটি ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। কাহিনী তাতে সংযুক্ত হয় না, কেবল সংলাপের মধ্য দিয়ে অমলার স্বার্থপরতা ও আত্মসর্বস্বতা গল্পটিকে গ্রাস করে। স্বামী প্রসাদের প্রতিও তার কোনো আকর্ষণ বা অনুভূতি নেই। বউভাতের সামাজিকতা, লোকজন, ঘরসংসার—সবই অমলার কাছে তুচ্ছ বাহুল্য মাত্র। আর শেষ পর্যন্ত প্রসাদ যখন রাতে ঘুমোতে আসে তখন যা ঘটে তা হল:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমলা বললে, 'আমার একটুও ভালো লাগল না।'

প্রসাদ বললে, 'কেন?'

—এই সব লোকজনের ভিড় হইচই—ফেলা-ছড়া—পয়সা নষ্ট—আমার দুচোখে সহ্য হয় না।

প্রসাদ বললে, 'কী চাও তুমি?'

অমলা বললে, 'একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া করতে পার তুমি? সেখানে তুমি ছাড়া আর অতিরিক্ত কেউ থাকবে না—তোমার মা—খুড়িমা কেউ না, বুঝলে?

প্রসাদ চুপ করেছিল।

অমলা বললে, 'আর বললে না চারশ টাকা দামের জর্জেটের শাড়ি—এমন একটা বেশি দাম কী আর? বললে না?

প্রসাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না।

—আমাকে কাল একটা কিনে দেবে?

প্রসাদ বিব্রত হয়ে বললে, 'কালই?'

—হ্যাঁ, তোমার কিনতে হবে না, আমি নিজে গিয়ে কিনে আনব। টাকাটা শুধু আমার হাতে দেবে।'

খুব গভীর পরিতৃপ্তি বোধ করে এইবার অমলা খাটের উপর উঠে বসল। তারপর আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে গিয়ে সুইচটা নিবিয়ে দিয়ে চলে আসে।

প্রসাদ বলল, 'আলো নিবিয়ে দিলে যে?'

অমলা বললে, 'এতক্ষণ ঘুম পাচ্ছিল না বলে জ্বালিয়ে রেখেছিলাম, এখন বড্ড ঘুম পাচ্ছে। দেয়ালে করছিলাম এতক্ষণ। জান পেত্নিরাই অন্ধকারে জেগে বেড়ায়। যক্ষিণীরা পড়ে ঘুমিয়ে।'

ফোঁস ফোঁস করে হেসে অমলা চোখ বুঝল।

—'ঘুমোচ্ছ? ঘুমোও।'

—'কথা বোলো না—, তুমি ছাদে শোও গে যাও।'

—'ছাদে? কেন?'

—'একটা ইঁদুরের হাঁচিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বুড়ো খোকার দেয়ালা আমার ভালো লাগে না। একটু নিরিবিলি ঘুমতে চাই আমি।' বলে দ্বিরুক্তি না করে A দেয়ালের দিকে শুল। কিন্তু প্রসাদ ছাদে গেল কি গেল না সেটুকু ভ্রূক্ষেপ করারও অবকাশ ছিল না অমলার। সত্যিই সে অচেতনের মতন ঘুমতে লাগল। কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ জেগে উঠে প্রসাদকে দেখে সে যদি অস্বস্তি বোধ করে এই ভাবনায় সঙ্কুচিত হয়ে ধীরে ছাদের দিকে চলে গেল যুবকটি।

জীবনানন্দের গদ্যের প্রধান যে আকর্ষণ সেই গতিময় বর্ণনাবিন্যাসের বিপরীতে এ গল্পটিতে (এবং অন্য আরও কয়েকটি গল্পে) মূলত সংলাপই গল্পটিকে ধরে রাখে এবং আপাতনিরীহ এই সংলাপ ধীরে ধীরে গল্পটিকে ভয়াবহ এক পরিণতির দিকে নিয়ে চলে। শেষ অনুচ্ছেদটির মাত্র কয়েকটি লাইন কেবল বর্ণনায় সমর্পিত যেখানে অমলার নামটির পরিবর্তে লেখক A অক্ষরটি ব্যবহার করেন এবং প্রসাদের নাম উল্লেখ না করে বলেন যুবকটি। শাড়ি কেনার টাকার কথাটি বলে ফেলার পর অমলা যে 'খুব গভীর পরিতৃপ্তি বোধ করে' সেই অনুষঙ্গটি যেমন নববধূ অমলার চারিত্রিক আত্মকেন্দ্রিকতা একেবারে প্রত্যক্ষ করে তোলে, তেমনি অমলা নামের ইংরেজি আদ্যক্ষরটিও কী জীবনানন্দ খুব সচেতনভাবে ব্যবহার করেন না? প্রসাদ যখন একটি নাম থেকে কেবল 'যুবকটি' হয়ে যায় তখন প্রসাদ-চরিত্রের ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্যের অনস্তিত্বই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একটি জর্জেট শাড়িই এ গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়। কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না যে, শাড়িটির মূল্য ও অনুষ্ঠানোচিত রুচির অনুপযোগিতার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমলার অন্তঃসারশূন্যতার কোনো প্রভেদ থাকে না এবং অমলাও যেন শেষ পর্যন্ত একটি অজ্গবাসের মতোই বাইরের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়—অন্তত প্রসাদের কাছে, রক্তমাংসের কোনো মানবী নয়। আত্মিক, মানবিক ও সহমর্মিতামূলক সম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষ মানুষের কাছে এসে পৌঁছে, হৃদয়ের উষ্ণতার স্পর্শ অনুভব করে। এই সম্পর্ক যেখানে থাকে না সেখানে মানব-মানবীর বন্ধনের অচ্ছেদ্য সম্পর্কও নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো। এই বোধ ও অনুভূতি এতোই সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল যে সামান্য ইঙ্গিতেও তা অনুভবগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ গল্পে এই অনুভবগ্রাহ্যতার কথা বলেন গভীরতার ব্যঞ্জনার নিরন্তর সন্ধানে। কাহিনী তাঁর গল্পে তাই কাঠামোগতভাবে অন্তর্লীন থাকে,—কখনো কখনো একেবারেই অনুপস্থিত।

জীবনানন্দের গল্পের মানুষগুলো বহিরঙ্গে নানা রূপ এবং আদলে-ব্যসনে-ভূষণে ও অর্থবিত্তে ভিন্নরকম হলেও বস্তুত কোনো-না-কোনো ভাবে অন্তর্বাস্তবতায় খুব কাছাকাছি কিংবা অভিন্ন অবস্থানের বলে মনে হয়। এই মানুষগুলোর কাহিনীতে অতীতের জীবন পুনর্বিন্যস্ত হয় এমনভাবে যেন সেগুলো নতুন এক সম্পর্কের দিকে পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। সব মানুষই জীবন ধারণের মধ্য দিয়ে জীবনের কথিত সাফল্য বা প্রাপ্তি কিংবা মানুষ হিসেবে দু'দণ্ড শান্তির অন্বেষণ করে বলে মনে হয়, যেন মানুষ ঠিক এই রকম সংজ্ঞানির্দেশিত জীবনের মধ্যেই বসবাস করে এবং একদিন জীবন থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু জীবনানন্দের গল্পে মানুষের এই রকম সরল জীবন যাপন কখনো বর্ণিত হয় না, পক্ষান্তরে চরিত্রগুলোর আপাতসারল্যের অন্তরালে জীবন ও জীবনযাপন এবং মানুষের পৃথিবীবাস নিয়ে গভীর জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু সে জিজ্ঞাসা কিংবা প্রশ্নও বস্তুত সংজ্ঞারূপ ধারণ করে না এবং অবয়বী আত্মপ্রকাশ-সর্বস্বতায় আবদ্ধ থাকে না।

জীবনানন্দের কবিমানসে যে নিসর্গচেতনা, সময়-সংক্রান্তি, বাইরের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিমানুষের অসহায়তা ও সীমাবদ্ধতা, জীবনের গভীর-গভীরতর ব্যঞ্জনা নিরন্তর ক্রিয়াশীল ছিল গল্পেও তার প্রতিফলন সমুজ্জ্বল। যে গল্পের কাঠামোয় একটি সরল কাহিনী বিধৃত কিংবা মানুষের একরৈখিক জীবনচিত্র প্রতিফলিত সে গল্পে কাহিনীই প্রধান হয়ে ওঠে—শব্দগত অর্থেই তা গল্প। অবশ্যই জীবনানন্দের গল্পের ভুবন এইরকম কাহিনীচিত্র দ্বারা পরিশোভিত নয়, যদিও কাহিনী তাতে থেকে যায় অন্তর্গতভাবে। কিন্তু কাহিনী নয়, মানুষই তাতে প্রধান থেকে যায়—তার অন্তহীন সত্তাবৈচিত্র্য ও জীবন-বাস্তবতার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলোড়ন তুলে ধরে। এই মানুষের মানসভুবনের মধ্যে আমরা মানুষের সামাজিক জীবনের চেয়েও বরং গভীরভাবে খুঁজে পাই তার অন্তর্জীবনের চিত্র—তার সুখ-দুঃখানুভূতি, আনন্দ-কষ্ট-বেদনা, সাফল্য-অসাফল্য, সার্থকতা-ব্যর্থতা এবং অবশ্যই এক মৌলিক নিঃসঙ্গতা। মানুষ যে মৌলিকভাবে নিঃসঙ্গ ও অসহায়, সীমাবদ্ধ—এ কথাটিই যেন জীবনানন্দ নানাভাবে উপস্থাপিত করেন তাঁর গল্পে ; সেই গল্প যার মধ্যে বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে, অন্তর্লীন হয়ে থাকে—বাইরের ও ভেতরের গভীর-গভীরতর অসুখ ও অ-সুখের মধ্যে যে মানুষ বেঁচে থাকে কিংবা বেঁচে থাকার পর মরে যায়। এইসব গল্প পড়তে পড়তে চারপাশের জীবনবাস্তবতা ও সমাজবাস্তবতা ইত্যাদির চালচিত্রের মধ্যে থেকেও নির্মোহ সত্যের মুখোমুখি হয়ে পড়ি, নানা জটিলতাকে অতিক্রম করে বোধ ও অনুভবের মধ্যে নতুন, নতুনতর মাত্রা স্পর্শ করি। জীবনানন্দ ঠিক এইরকমই—কবি অথবা গল্পকার যে জীবনানন্দের কথাই বলি না কেন !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে--এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়--হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;

শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাপৃথিবী'র নায়ক : আট বছর আগের একদিন

মাহবুব সাদিক

জীবনানন্দ দাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'আট বছর আগের একদিন'। আমাদের কালের অনেকের মতোই এই কবিতা আমারও প্রিয়। এর বিষয় ও নির্মাণকলা অসাধারণ। জীবনানন্দ দাশ এ-কবিতায় তাঁর চিন্তার স্তর-পরম্পরা এবং দার্শনিক প্রত্যয় আবেগ ও মননের সমীকরণে শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছেন।

একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুতথ্য উপস্থাপন করে কবি শুরু করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'। প্রথম দুটি বাঙালি পাঠকের ললিত কাব্যরুচি আহত-আলোড়িত হয়। লাশকাটা ঘরের রূপকল্পের সজোর অভিঘাতে পাঠক জেগে ওঠে :

> শোনা গেলো লাশকাটা ঘরে
> নিয়ে গেছে তারে ;
> কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
> যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
> মরিবার হ'ল তার সাধ।

জীবনানন্দ দাশ এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কাল ও পারিপার্শ্বিক বিশদভাবে উপস্থাপন করেছেন। শুক্লাপঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেলে 'ফাল্গুনের রাতের আঁধারে' কবিতার নায়কের মৃত্যুসাধ জেগে উঠলো এবং একগাছা দড়িতে সে ঝুলে পড়লো অশ্বত্থের ডাল থেকে। এই মৃত্যুতথ্য উপস্থাপনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'ফাল্গুনের রাতের আঁধারে'র মধ্যে সূচিত হয়েছে চমৎকার বৈপরীত্য। বিপ্রতীপ দৃশ্যকল্পের অনিবার্য আবেগ আমাদের অনিবার্যভাবে টেনে নিয়ে এলো এই অসাধারণ কবিতার কাছে এবং রুদ্ধশ্বাসে কবিতা পড়ে শেষ করার আগে কোথাও থামতেই দিলো না।

কবিতার প্রথম দিকের বিপ্রতীপ দৃশ্যকল্পের দিকে আগে মন দেয়া যাক। 'ফাল্গুন' শব্দের মধ্যে ইতোমধ্যে আমাদের সার্থক কবিরা যে-সব অর্থের আভাস ভরে দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে জীবনের জয়, যৌবনের উত্থান এবং পূর্ণতার স্পর্শ। 'ফাল্গুন' জীবন ও যৌবনের পূর্ণতারই প্রতীক। কিন্তু আমরা কে না জানি জ্যোৎস্নাঘন ফাল্গুন রাতের মধ্যেও থাকে কালরাত্রি—থাকে অন্ধকার, থাকে চৈতন্য ও সৃষ্টি অবলোপকারী মৃত্যুর রাত। 'ফাল্গুনের রাতের আঁধার'—সেই বৈপরীত্যেরই দ্যোতক। পঞ্চমীর চাঁদসহ ফাল্গুন রাত এবং চাঁদ ডোবার ফাল্গুন রাতের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে জীবন ও মৃত্যুর রূপকল্প।

আমি প্রথমেই এই বৈপরীত্য বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারণ 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় একের পর এক এই বিপ্রতীপের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ দাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভাসিত করে তুলেছেন জীবনের ঔজ্জ্বল্য ও অন্ধকারকে, রহস্য ও বিস্ময়কে, প্রাকৃত ও পরিশীলিতকে এবং জীবন ও মৃত্যুকে। তবে এর কোনটাই তিনি স্থূলভাবে রূপায়িত করেননি। একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি দেখেছেন মানুষের অন্তর্গত বিষাদ ও বিস্ময় কী করে অলক্ষে তার অস্তিত্বের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে। মানুষের অন্তর্ভুবন আসলে গভীর রহস্যজালে ঢাকা— যে রহস্য কখনো পুরোপুরি উন্মোচিত হবে না। তবে জীবন বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্বেরই নামান্তর। শুক্লাপঞ্চমীর রাতে যখন চাঁদ ডুবে গেছে তখন অকস্মাৎ 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার নায়কের হৃদয়ে আত্মহননের ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠলো এবং সে আত্মহত্যা করলো। কবিতার দ্বিতীয় স্তবক থেকেই জীবনানন্দ দাশ এই মৃত্যুর বাস্তবসত্য আবিষ্কারের জন্য কিছু সন্ধানী আলো ফেলেছেন। এই আলো পড়েছে নায়কের বাস্তব জীবন ও সংসারের ওপর। বাস্তব জীবনে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই নারী ও শিশু, প্রেম ও আশার হাতছানির মধ্যে মোটামুটি তুষ্ট জীবনযাপন করে। মননশীল ও পরিশীলিত স্বল্পসংখ্যকই এ-সব বাস্তব জীবন ও জাগতিক সম্পর্কের সীমা অতিক্রম করে যায়। বর্তমান কবিতার নায়ক সেই স্বল্পদেরই অন্যতম। এবং তারাই সমস্ত জাগতিক প্রাপ্তির পরেও জীবনের অন্য কোনো রহস্যের দিকে অবিরাম ছুটতে থাকে। প্রেম ও আশা-র হাতছানি সত্ত্বেও তারাই জ্যোৎস্নায় ভূত দেখে, বিপন্ন বিস্ময়ে তাড়িত হয়। আমরা লক্ষ্য করবো 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার নায়ক বাস্তব সংসার ও জীবনের কোনো অপ্রাপ্তি বা ব্যর্থতাবোধ থেকে আত্মহত্যা করেনি :

> বধূ শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
> প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
> কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
> অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।
>
> এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি!
> রক্তফেনা-মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
> আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার ;
> কোনোদিন জাগিবে না আর।

উপর্যুক্ত অংশটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো আত্মহননকারী মানুষটির সাংসারিক জীবনে এমন কোন ব্যর্থতাবোধ নেই যা তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাহলে কী সেই অমোঘ কারণ যা, তাকে 'রক্তফেনা-মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি আঁধার ঘুঁজির বুকে' অনন্ত ঘুমে বাধ্য করলো? অন্য একটি দিকে কবি এবার সন্ধানী আলো ফেলেছেন, সেটিও জাগতিক সংসারের বাইরের নয়। যদি সাংসারিক টানাপোড়েন নেই, তবে কি রয়েছে জাগতিক সংসার বিষয়ে কোনো জ্ঞান—যা তাকে ইঙ্গিত দিয়েছিলো কোনো অসঙ্গতির, কোনো অনিবার্য বেদনার, কোনো দুর্নিবার দুঃখের? এবং এই বেদনা-অসঙ্গতি-দুঃখ কি ছিলো চিকিৎসার অতীত কিছু? কবি লিখেছেন—

> 'কোনোদিন জাগিবে না আর
> জানিবার গাঢ় বেদনার
> অবিরাম—অবিরাম ভার
> সহিবে না আর—'
> এই কথা বলেছিলো তারে
> চাঁদ ডুবে চলে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
> যেন তার জানালার ধারে
> উটের গ্রীবার মতো কোন-এক নিস্তব্ধতা এসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞান কখনো বেদনার জন্ম দিতে পারে। মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গ ও অসঙ্গতি সম্পর্কে চেতনা বেদনা বহন করে আনতে পারে। হয়তো নিজেরই জীবনের কোনো দুশ্চিকিৎস্য বেদনার ঘটনা নায়কের জানা হয়ে গিয়েছিলো—যা তাকে গভীর বেদনায় নিমজ্জিত করেছে এবং সেই জ্ঞানই তাকে তীব্র দহনের মধ্য দিয়ে প্ররোচিত করেছে আত্মবিসর্জনে। মৃত্যুই মানুষের জ্ঞানের বেদনা মুছে দিতে পারে—হয়তো এ-জন্যেই অনিবার্য হয়ে উঠেছে মৃত্যু। আমরা, পাঠকেরা এরপর তালিকা করতে বসি কী সেই জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং ভার যা একজনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে? নারীর প্রেমে ব্যর্থতা, নাকি তার বিশ্বাসঘাতকতা অথবা বিশ্বস্ততার অভাব? নাকি নিজেরই জীবনের কোন ব্যর্থতার অনিবার্য বোধ? আমরা প্রায় কিছুই স্থির করতে পারি না। আমাদের নায়কের মৃত্যুর কারণ সন্ধানের জন্য জীবনানন্দ দাশ সংক্ষিপ্ত কয়েকটি রচনা করে শুধু কয়েকটি ইঙ্গিত দিয়েছেন আমাদের। এইসব প্রতীক-ইঙ্গিত অবলম্বন করে আমরা কেবল কার্যকারণ সন্ধান করতে পারি—কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছার সামান্য সম্ভাবনাও আমাদের থাকে না। আর সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি না বলেই অবিরাম কারণ সন্ধানে ব্যাপৃত থাকি। কেবলি এক রহস্যময় অচেনা জগত আমাদের চোখের সামনে বাস্তবের যবনিকা প্রায় তুলি-তুলি করে। কিন্তু কখনোই সেই রহস্য অপসারিত হয় না বলেই এ-ধরনের কবিতা আমদের ক্রমাগত আকর্ষণ করে যায়।

'আট বছর আগের একদিন' কবিতার তৃতীয় পঙ্‌ক্তির বৈপরীত্য ও বিপ্রতীপের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান আলোচনা শুরু করেছিলাম। বস্তুত বিপ্রতীপই ঝলসে উঠেছে এখানে 'তবু' শব্দের প্রয়োগে। মৃত্যু তার অমোঘ গ্রীবা বাড়িয়ে দিয়ে কবিতার নায়ককে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া-মাত্র লোকটি একগাছা দড়ি-হাতে অশ্বত্থের কাছে গিয়েছিলো। তারপর ঘটেছে আত্মহত্যা। কিন্তু এই অনিবার্য আত্মবিসর্জন ঘটে যাবার পরের স্তবকেই উজ্জ্বল রঙে জীবনানন্দ দাশ চিত্রিত করলেন এক বিপরীত বিশ্বলোক—আসলে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বিপ্রতীপ ; উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আশা ও আকাঙ্ক্ষাঘন জীবন—যার জন্য হাজার বছর বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা জাগে আমাদের। কবি লিখেছেন :

> তবুও তো প্যাঁচা জাগে ;
> গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
> আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।
>
> টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
> চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
> মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

মৃত্যু এবং অন্ধকার—এ কবিতায় প্রায় সমার্থক শব্দ হিসেবে উপস্থিত। একটি মৃত্যুর পটভূমিতে জীবনানন্দ দাশ নতুন এক প্রাকৃত ভুবনে টেনে নিয়ে এলেন আমাদের। এই ভুবন মূলত জায়মান প্রকৃতি। এই প্রকৃতিও অন্ধকারে পরিকীর্ণ—কেননা, ইতোমধ্যে চাঁদ ডুবে গেছে, অদ্ভুত আঁধার হয়েছে আরো ঘনিষ্ঠ। এই অন্ধকারে স্থবিরতার পরিবর্তে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে প্রাকৃত জীবন। চাঁদ ডুবে যাবার পর মৃত্যু উটের গ্রীবার মতো স্তব্ধতার কিম্ভূত গলা বাড়িয়ে আমাদের নায়ককে তার গহন ফাঁদে টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু একই পারিপার্শ্বিকে জেগে উঠেছে প্রাকৃত জীবন। প্যাঁচা জেগে উঠেছে ঘনিষ্ঠ আঁধারে—মেলে দিয়েছে তার করাল শিকারী চোখ। ক্ষুধার্ত শিকারী প্যাঁচার এই 'জেগে উঠা' মূলত প্রাকৃত-জীবনেরই জাগরণ। এরপর জীবনানন্দ দাশ একের পর এক চারপাশে পরিকীর্ণ প্রাকৃত জীবনের ঘনিষ্ঠ বর্ণনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছেন। ব্যাং স্বপ্ন দেখছে আরো একটি প্রভাতের, গভীর অন্ধকারে মশারির চারপাশে ঝাঁক ঝাঁক মশা খাদ্যের আকাঙ্ক্ষায় নিরত হয় শিকারকর্মে।

একটি মৃত্যুর প্রতিপক্ষে এগুলো সবই জাগ্রত প্রাকৃত জীবনের চিত্রকল্প। পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলোব্যাপী জীবনানন্দ দাশ প্রাকৃতজীবনের গতিশীল চিত্র এঁকেছেন। এ-জীবন গতিশীল কিন্তু নিশ্চেতন জীবনের রূপকল্প রচনা করেছে :

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অধিকার করে আছে ইহাদের মন ;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা ;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

রক্ত ক্লেদ থেকে মাছি ফের উড়ে যায় রোদে অর্থাৎ উদ্ভাসিত জীবনের দিকে। রোদের মধ্যে গতিশীল কীটের ওড়াউড়ির রূপকল্প রচনার মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ দাশ আকাশের তলে প্রকৃতির মধ্যে বিকীর্ণ-বিশদ জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন। নিশ্চেতন এই প্রাকৃত জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে কবিতার নায়কের আত্মহত্যার প্রতিপক্ষে। এগুলোই দাশ-কবির বিপ্রতীপ দৃশ্যকল্প রচনার উদাহরণ। দুরন্ত শিশুর হাতে বন্দি ফড়িঙের ঝাপটানো ডানার শিহরণের রূপকল্প রচনা করে কবি বলতে চান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অস্তিত্বরক্ষার জন্য অবিরাম সংগ্রামই জীবনজগতের সামান্য ধর্ম। কিন্তু 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার নায়ক জীবের এই সামান্যধর্ম অতিক্রম করে গেছে এবং বেছে নিয়েছে 'ইচ্ছামৃত্যু'। 'ইচ্ছামৃত্যু' শব্দটি সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি এখানে। কারণ কবিতার নায়ক জীবজগতের অই সামান্যধর্ম প্রত্যক্ষ করেছে—সে-ও জেনে গেছে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সবাই বেঁচে থাকতে চায়। 'এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা'—এই পঙ্‌ক্তির 'তবু' শব্দের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দ ব্যবহারের ফলেই আমরা জেনে যাই যে কবিতার নায়ক জৈবধর্ম জেনেও স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিয়েছে এবং এই সচেতন কর্মটি কেবল চেতনাসম্পন্ন জীব মানুষের পক্ষেই সম্ভব। জীবনানন্দ দাশ উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তি কটির শেষ দুটিতে প্রায় একই মন্তব্য করেন। মানুষ এবং ফড়িঙ-দোয়েলের জীবন যে পৃথক তাই তিনি বলেছেন এখানে। যে জাগর চৈতন্য মানুষকে অন্যসব প্রাণী ও পতঙ্গ থেকে পৃথক করেছে তা ফড়িঙ-দোয়েলের নেই। চৈতন্যহীন পতঙ্গ বা প্রাণীর পক্ষে তাই আত্মহত্যা বা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করা সম্ভব নয়—তা পারে কেবল সচেতন পরিশীলিত মহিমামণ্ডিত প্রাণী মানুষ।

এ-কবিতার পরবর্তী কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে উচ্চারিত হয়েছে কয়েকটি প্রশ্ন—এবং এ-সব প্রশ্নের উত্তর সদর্থক। আত্মহত্যার আগের কটি মুহূর্তের জীবন্ত প্রাকৃতচিত্র এগুলো :

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা এসে
বলেনি কি : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার !—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার !'
জানায়নি প্যাঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'ল ; —

মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্ত-মাখা ঠোঁটে !

আত্মহত্যার আগে অশ্বত্থের শাখার প্রতীকী প্রতিবাদ এবং থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচার শিকার ধরার চিত্র কবিতার নায়কের কাছে অস্তিত্বকামী জীবনের সুস্পষ্ট রূপকল্পই উপস্থিত করেছে। এই বোধ অর্জন করেও হেমন্ত বিকেলের পূর্ণতার আনন্দ নায়কের কাছে অসহ্য মনে হয়েছে এবং চারপাশের পরিকীর্ণ জীবন ও বেঁচে থাকার জান্তব উদাহরণ অতিক্রম করে সে অশ্বত্থের শাখায় দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে মৃত্যুর অতল পাতালে নেমে পড়েছে। এ-সবই ঘটেছে সচেতনভাবে। মানুষই সেই সচেতন প্রাণী যে বিষাদ ও বেদনাময় বিপন্ন-বিস্ময়-মাখা জীবনের অস্তিত্ব থেকে এক মুহূর্তে মৃত্যুর গভীরে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে। জীবনের প্রতি এই সুগভীর নিরাসক্তি কেন জন্ম নেয় মানুষের মনে? জীবনানন্দ দাশ এই গভীর দার্শনিক প্রশ্নটিকে আবেগের বাহন করে তুলেছিলো এবং স্বেচ্ছামৃত্যুর কার্যকারণতত্ত্ব সন্ধান করেছেন এভাবে :

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প ; —কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

উপর্যুক্ত পঙ্ক্তিগুলোতে কবি সুস্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন যে জাগতিক কোনো বাস্তব কারণে কবিতার নায়ক আত্মহত্যা করেনি। মানুষ তার ভেতরজীবনের কোনো রহস্যময় অনির্দেশ্য বিপন্ন-বিস্ময় দ্বারা তাড়িত হয়। কী সেই বিস্ময় এ-বিষয়ে তার কোন ধারণা নেই। মানুষের আত্মপরিচয়হীন এই অসহায় বোধ ও রক্তের ভেতরকার বিপন্ন অসহায়ত্ব দার্শনিকরা কখনো কখনো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। নিট্‌শে লিখেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

The sad truth is that we remain
necessarily strangers to ourselves,
we don't understand our own substance,
we must mistake ourselves ; the axiom,
'Each man is farthest from himself',
will hold for us to all eternity. Of
ourselves we are not 'knowers'.

[ভূমিকা : The Genealogy of Morals']

দার্শনিক এবং কাব্য-ব্যাখ্যাতা যাই বলুন না কেন—মানব মনোবিশ্বের একটি অংশ প্রায় পুরোপুরি রহস্যের অন্ধকারে ঢাকা। সেই দুর্জ্ঞেয় প্রদেশে কখনো আলো ফেলা যায় মাত্র। জীবনানন্দ দাশও তাই ফেলেছেন। কিন্তু সেই আলোটুকু রহস্যকে আরো ঘনীভূত করেছে। এই রহস্যই কবিতাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে—পাঠকের মননে আরো বেশি সন্ধানী আলো জ্বালায়। আসলে কবিতার জন্যই প্রয়োজন এই রহস্য। নইলে গোয়েন্দা উপন্যাসে মতো রহস্যভেদ হওয়ামাত্র পৃথিবীর সব কবিতা পরিত্যক্ত হতো।

এ-কবিতার পরবর্তী অংশে আমরা পাই সেই অজানা রহস্যলোকের গল্প। কবিতার নায়ক শুধু নয়—পৃথিবীর কোনো মননশীল মানুষের হৃদয় নারী-শিশু-গৃহ-প্রেম-অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতা-আনন্দ-বেদনা দ্বারা পূর্ণতা অর্জন করে না। জাগতিক স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার সবকিছু পূরণ হলেও মানুষের মনে জীবনের আরো কত আজানা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। সেইসব অপূর্ণ স্বপ্নসাধ মানুষ এমনকি চিহ্নিতও করতে পারে না। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ সেই ক্ষেত্রটিকে চিহ্নিত করেছেন এ-ভাবে :

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

মানুষের অন্তর্গত রক্তের ভেতরকার সেই 'বিপন্ন বিস্ময়'ই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার নায়ককে ক্লান্ত করে। অনিবার্য এই জীবনক্লান্তি—প্রতিটি মানুষ এই ক্লান্তিতে ভোগে। সেই বিপন্ন বিস্ময় কি অপূর্ণ সব স্বপ্নসাধ ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার অন্য নাম? নাকি জাগতিক সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে, মানুষের সব কামনার সমাপ্তি ঘটলে সেই বিপন্ন বিস্ময় দেখা দেয়? আমরা জানি না—মানুষ কিছু জানে না, কিছু স্থির করতে পারে না বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবজীবনের ক্লান্তি–ক্ষুধা–স্বপ্ন–আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সেই ব্যাপক বিষাদমাখা বিপন্ন বিস্ময়ের কথা ভাবতে ভাবতে আলোড়িত হতে থাকে।

'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় একটি স্বেচ্ছামৃত্যুর প্রতিপক্ষে জীবনানন্দ দাশ আমাদের চারপাশে বিকীর্ণ প্রাকৃতজীবনের উদ্ভাসকে উপস্থাপন করেছেন। তীক্ষ্ণ গভীর চোখে তিনি অবলোকন করেছেন প্রতিকূল প্রতিবেশেও প্রাকৃত জগতের প্রাণসত্তার অস্তিত্ব। এ–কবিতা তাই জীবনেরই জয় ঘোষণা করছে। কিন্তু প্রাকৃতজীবনের জয় ঘোষণার মধ্যদিয়েই এটি শেষ হয়নি—প্রকৃতপক্ষে তা আত্মহননকারী মানুষটির জীবনে অনুভূত রহস্যময় বিষাদ ও চৈতন্যেরই জয় ঘোষণা করেছে। তবে সে–ই আলোচনায় প্রবেশ করার আগে কবিতার শেষ স্তবকটির দিকে মনোযোগ দেয়া যাক :

> তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
> থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
> চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
> চমৎকার!
> ধারা যাক দু–একটা ইঁদুর এবার—'
>
> হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
> আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি
> ক'রে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার;
> আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

কবিতার সর্বশেষ স্তবকে কবি থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচাকে 'প্রগাঢ় পিতামহী' সম্বোধন করে তার সঙ্গে জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূণ্য করে দেবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। প্রাকৃত–জীবনের প্রাণী ও পতঙ্গেরা তাই করে। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে কবি প্রাকৃতজীবনের সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও মিথষ্ক্রিয়ার রূপকল্প রচনা করেছেন। জীবনানন্দ দাশ এ–সত্য উপলব্ধি করেন যে পরিশীলিত ও সজ্ঞান–সচেতন মানব পৃথিবীতে স্বল্পই। পৃথিবী ভরে গেছে কোটি কোটি শূয়োরের আর্তনাদে। কবি নিজে স্বল্পসংখ্যক পরিশীলিত মানুষের মতো সবকিছু উপলব্ধি করেও জীবনধারণের প্রতি অনিবার্য আকর্ষণ বোধ করেন। জীবনের প্রতি তীব্রতম আকর্ষণের প্রকাশ ঘটেছে এখানেই। মহৎ এই কবিতা, অনন্যসাধারণ ; জীবনবাদী কবিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এটি।

'আট বছর আগের একদিন' কবিতার প্রধান বিষয় নিশ্চেতন জান্তব প্রকৃতি ও মানবচৈতন্যের বিরোধ। জীবনানন্দ দাশ এখানে প্রকৃতির নিশ্চেতন জীবনের প্রতিপক্ষে মানবচৈতন্যের জয় ঘোষণা করেছেন। এ–কবিতার মাছি–ফড়িং–ব্যাঙ এবং থুরতুরে অন্ধ প্যাঁচা নিশ্চেতন প্রকৃতির প্রতীক। কেবল পরিশীলিত, চৈতন্যসাধক, বুদ্ধি ও মননসমৃদ্ধ জটিল ও রহস্যময় প্রাণী মানুষই চারপাশের এই বিকীর্ণ জীবন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কবিতার নায়কও তা করেছিলো। অশ্বত্থের শাখা, জোনাকির ভিড় এবং অন্ধ প্যাঁচার শিকারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ—চারপাশের এই জান্তব প্রকৃতিকে এক মুহূর্তে অনুভব করেও কবিতার নায়ক নিজের বিপন্ন বিস্ময়ের অভিঘাতে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছে। কবি কিন্তু এই বিপন্ন বিস্ময় উপলব্ধি করার পরও বেঁচে থাকতে চান। জীবনের প্রতি এই তীব্র আকর্ষণই রূপায়িত হয়েছে এ–কবিতায়। কবিতার মূল বক্তব্যও এটাই। এই ঘনিষ্ঠ জীবনবাদিতাই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাকে মহত্তম কবিতা করে তুলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে অন্য একটি কবিতায় [অন্ধকার, ‘বনলতা সেন’] জীবনানন্দ দাশ ফড়িং-দোয়েল-প্যাঁচার মতো শুধু অস্তিত্বকামী নিশ্চেতন প্রাকৃত মানুষের কথাও বলেছেন—যারা কোটি কোটি শূয়োরের আর্তনাদে পৃথিবীতে তাদের উৎসব রাষ্ট্র করে দেয়। এরা শুধু ফড়িং-দোয়েলেরই মতো জন্মায়, জীবনধারণ করে, প্রাকৃত জীবনের মতোই পরস্পর সংঘাত ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীকে প্রাণে পূর্ণ রাখে। এ-সব মানুষই পৃথিবীর অপরিহার্য অংশ। তুমুলভাবে বেঁচে থেকে এরাই পৃথিবীকে প্রাণের কোলাহলে পূর্ণ রাখে। এদের সঙ্গেই একই সমতলে বেঁচে থেকে কবি জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শেষ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতায়।

অবিস্মরণীয় জীবনবাদী কবিতা এটি। চিন্তার জটিল বিন্যাসই শুধু নয়—আধুনিক মানসের স্তরবহুল বহুমাত্রিক ভাবনা এখানে শিল্পের দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ-কবিতার প্রকরণকলাও অসাধারণ। কয়েকটি অবিস্মরণীয় উপমা ও চিত্রকল্প একে সমৃদ্ধ করেছে। ‘উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা’—এই উপমার ‘নিস্তব্ধতা’ শব্দটি এখানে মৃত্যুর প্রতীক। এই উপমার উপমেয় ও উপমান পরস্পর সুদূর—এদের একটি মূর্ত ‘উটের গ্রীবা’, অন্যটি বিমূর্ত ‘নিস্তব্ধতা’। ‘ফাল্গুনের রাতের আঁধারে’ কিম্ভূত, ভয়াবহ ও রহস্যসঞ্চারী ; মূর্ত উপমান উটের গ্রীবা মৃত্যুর প্রতীক বিমূর্ত উপমেয় নিস্তব্ধতার প্রান্ত ছুঁয়ে পাঠকচৈতন্যে এক রহস্যের আলো জ্বেলে দেয়।

সম্পূর্ণ কবিতার মধ্যে রয়েছে অসাধারণ অথচ অনায়াস দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্র ও চিত্রকল্প।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন ইতিহাসমনস্ক কবি : জীবনানন্দ দাশ

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

ইতিহাস যাঁদের বিচরণক্ষেত্র তাঁদের নেই কবির মতো কল্পনার স্বাধীনতা, দার্শনিকের মতো বিশ্বজনীন তত্ত্ব নির্মাণের অধিকার, শিল্পীর মতো অপরূপকে মূর্ত বা বিমূর্ত রূপ দেয়ার প্রণোদনা ও দক্ষতা, বিজ্ঞানীর মতো প্রাকৃতিক বিধান আবিষ্কার ও প্রয়োগের অভীপ্সা। তবে এমন সরলীকরণের বাইরেও কথা আছে। ইতিহাসও কল্পনাশ্রয়ী ; তথ্য-উপাত্ত ইতিহাসের কারিগরের হাতে কল্পনার মিথস্ক্রিয়া নির্ভর করেই কংক্রিট ইতিহাস হয়ে ওঠে। রামায়ণ রচনা প্রসঙ্গে নারদ মুনি বাল্মিকীকে যেভাবে বলেছিলেন—সেও ইতিহাস সৃষ্টির পূর্বাভাস। রবীন্দ্রনাথের কথায় :

> ঘটে যা তার সব সত্য নয়
> তা-ই সত্য যা রচিবে তুমি
> কবি তব মনোভূমি রামের জনম-স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

নন্দিত মার্কিন ইতিহাসবিদ বারবারা টুখম্যানও তা-ই মনে করেন। তাঁর সঙ্গে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কারণ ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে কল্পনার মিশেল দিয়ে টলস্টয় এঁকেছেন অবিস্মরণীয় নেপোলিয়ন চরিত্র। শিল্পীর নৈপুণ্য আর সাহিত্যের বাস্তবতার মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার (Interection) ফলে যে নেপোলিয়ন, তা যেন তুলনারহিত। স্বয়ং এলিয়ট তাঁর "Tradition and the Individual Talent" প্রবন্ধে কবি-সাহিত্যিকের জন্য ইতিহাসচেতনার প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। এলিয়ট ও ইয়েট্‌স্ প্রভাবিত কবি জীবনানন্দ দাশ-ও তাই উচ্চারণ করেন, "কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান"। অবশ্য স্মর্তব্য, ইতিহাসচেতনার অন্যতম পূর্বশর্ত কালজ্ঞান। ইতিহাসচেতনা না থাকলে কি দান্তে লিখতে পারতেন 'ডিভিনা কমেডিয়া'? বা শেক্‌সপীয়র ও ব্রেশট তাঁদের ঐতিহাসিক নাট্যাবলী? তবে সাহিত্যিকের ইতিহাসনির্ভর কল্পনা আর ইতিহাসবিদের পদ্ধতি-প্রাসঙ্গিক কল্পনার মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। মনে হয় জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতাই কালোত্তীর্ণ হয়েছে এই প্রগাঢ় ইতিহাসচেতনার কারণে। এই ইতিহাসচেতনার পটভূমিতে যার-ই অবদান থাকুক না কেন তার ভিত্তিতে জীবনানন্দ দাশের যে সৃষ্টি তা অনন্য। এ জন্যেই আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, "কিন্তু তাঁর আপন সজ্ঞাই ঐ ইতিহাসচেতনাকে বাংলা কাব্যের এক অজ্ঞাত লুক্কায়িত-অনাবিষ্কৃত জায়গায় নিয়ে গেছে—যেখানে ইতিহাস কেবল বর্তমানে এসে মেলেনি ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে।

বেশ কিছুদিন আগে জানুয়ারির এক বৃষ্টিভেজা সকালে—লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলির অদূরে রোমক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ লেপ্‌তিস ম্যাগনা আর সাব্রাতায় দাঁড়িয়ে ইতিহাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র আমার চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। কারণ ছিল। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ইতিহাসের ছায়া যতটা প্রগাঢ় ততটা অন্য কোনও বাঙালি কবির কবিতায় নয়। ইতিহাস ও কবিতার আন্তর্বয়ন [Inter textural] নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে ; বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশকে নিয়েই। কেন তিনি কবিতায় শব্দচয়নে, বাক্যবিন্যাসে ইতিহাসনির্ভর? কারণ এই যে, তিনি ইতিহাসের টেকস্টকে কবিতায় গেঁথে দিয়ে দুই সময়কে একই সমান্তরালে নির্মাণ করেছেন। ইতিহাস বলতে তিনি কী বুঝতেন? ইতিহাস কি তাঁর জন্য অতীত ঘটনার রোমন্থন মাত্র? না-কি বর্তমানে দাঁড়িয়ে শেকড়সন্ধানী অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অতীতে ফিরে যাওয়া আর বর্তমানকে আলোকিত করা? প্রশ্নগুলোর উত্তর এবং তা জীবনানন্দকে বোঝার জন্যই প্রয়োজন। হয়তো অন্য কেউ করবেন এই কাজটি। সীমিত অনুভব আর সামর্থ্যনির্ভর করে জীবনানন্দ দাশের ইতিহাসচেতনা নিয়ে আমার সামান্য বক্তব্য উপস্থাপন করছি মাত্র। জীবনানন্দ দাশ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইতিহাস ও কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। তাঁর ভাষ্য :

> সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি ; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।

তাঁর আরও একটি বক্তব্য ছিল ২৬.১২.৪৬ ইং তারিখে এক অনুরাগীকে লেখা চিঠিতে :

> আমার কাব্যপ্রেরণার উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনার ভিতর রয়েছে বলেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়েই যে 'ধূসর' তা' হয়তো নয়।

জীবনানন্দের এই স্বীকারোক্তিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা সহসাই ইতিহাসচেতনা ও কাব্যপ্ররোচনার সুষম ও ন্যায়সঙ্গত পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করি।

মানুষ কোনোমতেই তাৎক্ষণিকতাসৃত প্রাণী নয়--স্বয়ম্ভু তো সে নয়-ই। মানুষের আছে এক সুবিস্তৃত পাটাতন--পরিপ্রেক্ষিত--অভিজ্ঞান ও অনুভূতির ক্রমবিবর্তমান পশ্চাৎবাস্তবতা। সত্যি কথা বলতে কি, এর নামই ইতিহাসচেতনা। হাজার হাজার বছর ধরে সে বহমান মানুষের শরীরে, কল্পনায় ও মননে। এজন্যই মানুষ হাজার বছর ধরে পথ হাঁটে--সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর এসব কিছুর মগ্নচিত্র মানুষের অস্তিত্বকে প্রণোদিত করে।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের সদা বিরাজমান অস্তিত্বকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখেছেন মানবের প্রবহমানতার মধ্যে। এজন্যই তিনি বলেছেন, 'আমারে তুমি অশেষ করেছো এমনি লীলা তব'। আর জীবনানন্দ বলেছেন :

> তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে
> মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন
> সেই মুখ আর আমি রবো স্বপ্নের ভিতরে।

কিংবা —

> পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
> উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

ইতিহাস যাকে বলে 'বহমান বাস্তবতা' কবি হয়তো বলেন স্বপ্নময়তা—ধারাবাহিকতা সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তি। বস্তুত কল্পনা বিশেষত সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষের কল্পপ্রজ্ঞা বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পপ্রণোদনারই অন্য নাম ইতিহাসচৈতন্য। জীবনানন্দের কাব্যভূমগুলে আমরা ইতিহাস-চৈতন্যের সরব উপস্থিত সব সময়ই লক্ষ্য করি।

পৃথিবীর হারানো সভ্যতাই শুধু ইতিহাসের খনি হিসাবে জীবনানন্দের কবিতায় ওঠে আসেনি, তার কবিতায় চলমান জীবন-ইতিহাস ও নিকট ইতিহাস অবলীলায় ঢুকে পড়েছে। সেগুলোও যে ইতিহাসের টুকরো টাকরা থেকেই নেয়া, সেটা হয়তো আমরা মনে রাখিনা। ধূসর পাণ্ডুলিপির 'অবসরের গান' কবিতায় আছে যেন সেই যাপিত ইতিহাসের যাতনা, যা সে সময়কার রাজনীতির, সাম্রাজ্যের বিবিক্তি হয়ে উৎসারিত হয়েছে।

রোধ—অবরোধ—ক্লেশ—কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়,—
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোনখানে,—
কোথায় নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয় !
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের রং
দামামা থামায়ে ফেল,—পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক রাজ্য
আর সাম্রাজ্যের সঙ !

কিংবা —

কেবলই উত্তরপাড়া ব্যাণ্ডেল কাশীপুর বেহালা খুরুট
ঘুরে যায় স্টালিন, নেহেরু, ব্লক অথবা রায়ের বোঝা ব'য়ে,
ত্রিপাদ ভূমির পরে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদয়ে ?
[অনুপম ত্রিবেদী]

এ দুটি কবিতায় চলমান ইতিহাসের কিছু টুকরো পাওয়া যায় যা জীবনানন্দকে তার সমকালীন ইতিহাস চেতনা দান করেছে। আমরা যদি প্রয়াস চালাই, তাহলে তাঁর অধিকাংশ কবিতা থেকেই তাঁর সময় ও ইতিহাসের বীজগুলো খুটে তুলে আনতে পারবো এবং প্রমাণ করা যাবে—জীবনানন্দ দাশ কেবল 'মহাপৃথিবীর' লুপ্ত সভ্যতা আর সাংস্কৃতিক বয়ানকেই তাঁর কবিতায় তুলে আনেননি, তাঁর জীবন-প্রতিবেশের ইতিহাসও এসেছে অবলীলায়—বিপুল সম্ভার নিয়ে। এ কবিতাটি তাঁর বইগুলোতে নেই—কিন্তু আছে 'অন্যান্য কবিতা'র মিছিল।

দিগন্তে কি ধর্মঘট ?—চিম্‌নি ... পাখির মতন অনায়াসে
নীলিমায় ছড়ায়েছে। এখানে নদীর স্থির কাকচক্ষু জলে
ঘুরুনো সিঁড়ির মতো আকাশ পর্যন্ত মেঘ সব
উঠে গেছে।—অনুভব করে প্রকৃতির সাথে মিলিত হতেই,
অমিলনে সূর্যরোলে জ্যোতির্ময় এলুমিনিয়ম অনুভব
ক'রে আমি দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি এরোপ্লেন গুনে
নীলিমা দেখার ছলে শতাব্দীর প্রেতাত্মাকে দেখেছি অরুণে।
[ভোর ও ছয়টি বমার : ১৯৪২]

সাল চিহ্নটি না থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিত্রপটটি অনাবিস্কৃত থাকতো না হয়তো, তবু—জীবনানন্দ দাশ যখন দেখেন 'অরুণে' প্রেতাত্মাকে তখন বোঝা যায়, তাঁর চৈতন্যে সময় ও সমকালীন ইতিহাস-বাস্তবতা কতোটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছিলো তাঁর মানস্ক্রিয়ায়।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ 'কাব্যসংগ্রহ'-এর ভূমিকায় 'এপ্রিল ১৯৩৬ থেকে মে ১৯৪৫ পর্যন্ত লেখা নিয়ে 'সাতটি তারার তিমিরে'র রচনাকাল, কিন্তু তার কেন্দ্রীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসারটুকু, পড়ে মনে হয় দ্বিতীয় বিশ্বের পরিস্থিতি অনুসরণ করে, এ দেশে তার সংক্রান্ত লক্ষ্য করে লেখা। বাণিজ্য বায়ুর গল্পে শতাব্দী থেকে একদিন যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে মেতে ওঠে। দেশ আর বিদেশের পুরুষদের যে সংঘর্ষ-অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার, সেই পূর্বসূত্র থেকে শুরু। তারপর নদীসমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কনভয়, আর রাত্রি ভরা নক্ষত্রের পরিমাপ করতে বসেছেন কবি, তার ভিতরে দেখেছেন 'চারিদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন নেশন', 'ভিন্ন ভিন্ন নেশনের নিঃসহায় প্রতিভূ'দের। ... দেখেছেন, 'কামানের স্থবির গর্জন/ বিনষ্ট হতেছে সাংহাই'—প্রাক যুদ্ধ পর্ব থেকেই দেখেছেন তার দিগন্তে 'নরকের নির্বচন মেঘ'।

কবিতায়, এই যে চলমান ইতিহাসের 'টেকস্ট' জীবনানন্দ দাশের কবিসত্তার মনোবিশ্বে তোলপাড় তুলেছিলো, তার প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর সাংস্কৃতিক বয়ান চেতনা। জীবনের সকল কিছুই কবিতার বিষয়—যেমন ইতিহাস-ঐতিহ্য তেমনি খড়কুটো, পচা শসা, ডিমের খোসা ইত্যাদি। কবিতার মর্মে ইতিহাস চেতনা এমন ধ্যানীর মতন বাস করেন যে মনেই হয় না কবির চেতনায় ঐ জাগতিক সংক্রম তীব্রভাবে রয়েছে।

জীবনানন্দের কবিতায় ইতিহাস-ব্যবহার নিয়ে আরো বহু, ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে—যা আমার কর্তব্য নয়—তা মূলত কোনো জীবনানন্দ গবেষকের।
কবি যখন বলেন,

এই পৃথিবীর পথে
আড়াই হাজার বছর বয়সী আমি,

কিংবা — বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি
আমি রাতের ভিতর কেন যেন,
আজো আমি জানিনাকো হাজার-হাজার
ব্যস্ত বছরের পর

জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত ইংরেজি কবিতায়ও রয়েছে ইতিহাসলগ্নতার স্পর্শ। যেমন Chorus শীর্ষক কবিতার শুরুতেই আছে :

They Have long been on this earth
But they have not been able to make
much of life.
And now Death is, at hand.
once they held that Doom Was far away,
And graced ther hearts with ease,
But now a shadow, not the sun
hails on them.
It has come home to stay,

একই কবিতার শেষাংশে আছে যথার্থ ইতিহাসচেতনার প্রমাণ। কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, বরং মানব সম্প্রদায়ের ওপর তার আস্থা :

Man seeks love and wisdom?
He has hoodwinked? or, moralised his moments
Out of blood, lechery, vandalism, lie and terror?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Has the will been awakened?
Do we see the common people today
as singing masters of
Time and Times.

জীবনানন্দ মানসে ইতিহাস হলো আসলেই মানুষের ইতিহাস। সে কারণেই তিনি বলেন :

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।

আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে কবি কেন বারবার 'হাজার হাজার বছরের' বা Time and Times-এর রেফারেন্স দিচ্ছেন? কবি 'হাজার বছরের' রেফারেন্স দান করছেন সম্ভবত একটি বিশেষ সময়ে। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট সময়ের ধারকই নন কেবল—তিনি সময়ের সমান বয়সী। ইতিহাসচৈতন্যকে কল্পপ্রজ্ঞা ও মোহনীয় সজ্জার সম্মিলনে যে কবি অর্জন করতে সমর্থ তিনিই হন হাজার বছরের কাব্য পরিব্রাজক। এখানেই মনে হয় জীবনানন্দ দাশ ইতিহাসচেতনাকে ধারণ করেছেন মার্ক ব্লখের মতো করে! মার্ক ব্লখ ইতিহাসকে অনুভব করেন Science of men in time হিসেবে।

মূর্ত ও বিমূর্ত এই দুই প্রকার শিল্পের কথা আমরা জানি। আমার কেন জানি মনে হয় ইতিহাস হচ্ছে তথ্যের মূর্ত প্রকাশ আর কবিতা বা অন্যান্য শিল্প হচ্ছে ইতিহাসের শৈল্পিক বিমূর্তায়ন। ইন্দ্রিয়জাত অনুভবের শৈল্পিক অভিপ্রকাশই কবিতা। ইতিহাসের সত্য ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। ইতিহাসবিদ ও কবি দু'জনেই যেহেতু মানুষ সেহেতু জগৎ জীবনগত সংকেতকে তাঁরা গ্রহণ করেন ইন্দ্রিয়গত মাধ্যমে। ইতিহাসবিদদের মনে কাজ করে সত্যনির্ভর যৌক্তিক বিন্যাস। তিনি তথ্যকে যাচাই-বাছাই করেন পদ্ধতির আলোকে। কিন্তু কবি প্রথমেই অস্বীকার করেন প্রচলিত পদ্ধতিকে। স্বরচিত যৌক্তিক প্রক্রিয়ার হাত ধরে কবি এগিয়ে যান। একটি জায়গায় কবি ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য পরিদৃশ্যমান। কিন্তু চেতনাবিন্দুর সম্পৃক্তায়নে কবি ও ইতিাসবিদের মধ্যে সুগভীর আত্মীয়তা লক্ষ্য করি। অতএব নির্দ্বিধায় বলতে পারি কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন ইতিহাস-চৈতন্যের শৈল্পিক ভাষ্যকার ; রচনা করেছেন কবিতা আর ইতিহাসের শিল্পসুষমাসমৃদ্ধ মেলবন্ধন। আর এটাও নিঃসংকোচে বলা যায়, তাঁর কবিতা ইতিহাসের অনিবার্য বাতাবরণের ভেতরে এক শিল্পের ভাঁড়ার, যার গতি অব্যাহত এবং যার বয়ন ক্রিয়া অনন্ত ও অশেষ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিক ও দৈশিক : জীবনানন্দের শিক্ষা ভাবনা

মাহবুবুল হক

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারায় জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪) কবি হিসেবে বর্তমানে ব্যাপক আলোচিত ও সমাদৃত এবং তাঁর জীবন ও কর্মের বৈচিত্র্যময় দিক ক্রমেই বাঙালির চোখে নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। তাঁর গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের সঙ্গে যিনিই পরিচিত হয়েছেন তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, জীবনানন্দ কেবল প্রকৃতি–সচেতন কবি ছিলেন না, ছিলেন সমাজমনস্ক ও সমকাল–সচেতন। সমকালীন সামাজিক–সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। তা নিয়ে তিনি কম–বেশি চিন্তা–ভাবনাও করতেন। এসবের বিশেষ পরিচয় বিধৃত রয়েছে তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলিতে।[১]

জীবনানন্দের সমাজ–ভাবনার দিগন্তে একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা নিয়েছে তাঁর শিক্ষা–ভাবনা। তাতে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা পরিস্থিতি, শিক্ষকের অবস্থা, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার গতি–প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে তাঁর চিন্তা, অভিমত, মূল্যায়ন ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষা সংক্রান্ত তাঁর আলোচনা হয়ত বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তবে তার তাৎপর্যও খুব কম নয়।

জীবনানন্দ শিক্ষাবিদ বা শিক্ষা–গবেষক ছিলেন না। তবু তাঁর শিক্ষা ভাবনার ব্যাপারে অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ হবে। তার কারণ, কর্মজীবনে বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতাই ছিল তাঁর জীবিকার প্রধান অবলম্বন। সুদীর্ঘ ৩২ বছরের কর্মজীবনে তাঁর ছিল ২৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। তাঁর শিক্ষকতার জীবন সম্পর্কে জানা যায়, ক্লিন্টন বি. সিলি–র লেখা জীবনানন্দের প্রামাণিক জীবনী–গ্রন্থ থেকে।[২]

১৯২২ সালে এম. এ. পাস করে জীবনানন্দ কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতা সিটি কলেজে ইংরেজি বিভাগের টিউটর হিসেবে। ১৯২৮ সালের মাঝামাঝি তিনি যখন এ কলেজ থেকে চাকরিচ্যুত হন তখন তাঁর পদমর্যাদা ছিল জুনিয়র লেকচারার। ১৯২৯–এ তিনি মাস তিনেকের জন্য খুলনা বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৯–এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৩০–এর মার্চ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন দিল্লির রামযশ কলেজে। মাঝে কয়েক বছর ভিন্নতর একাধিক পেশা অবলম্বন করলেও[৩] ১৯৩৫–এ আবার অধ্যাপনার পেশায় ফিরে আসেন এবং বরিশাল বি. এম. কলেজের ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। এরপর আর সেখানে যান নি। ১৯৫০–এ তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত (১৯৪৯) খড়গপুর কলেজে যোগ দেন এবং ১৯৫১–র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেখানে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫২–য় তিনি কলকাতার অদূরে বড়িশা কলেজে চাকরি করেন। ১৯৫৩–য় যোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেন হাওড়া গার্লস কলেজে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত (অক্টোবর ১৯৫৪) তিনি ঐ কলেজে অধ্যাপনা করেন।

তবে প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পেশা হিসেবে কর্ম জীবনের প্রারম্ভে অধ্যাপনাকে বেছে নিলেও এ পেশাকে তিনি সানন্দে গ্রহণ করতে পারেন নি। এ পেশা যে তাঁর খুব-একটা পছন্দের ছিল না সে কথাও বলেছেন অকুণ্ঠভাবে। ১৯৪২-এ তিনি লিখেছেন : 'অধ্যাপনা জিনিসটা কোনোদিনই আমার তেমন ভালো লাগে নি। যে সব জিনিস যাদের কাছে যে রকম ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাতে আমার বিশেষ আস্থা নেই।[৪] ১৯৪৬ সালেও ব্যক্ত হয়েছে অনুরূপ মনোভাব : 'এখনও অধ্যাপনাই করতে হচ্ছে। কিন্তু মনে হয় এ পথে আর বেশি দিন থাকা ভালো না। যে জিনিস যাদের যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সবই অসাড়তার নামান্তর নয় কি?'[৫] ১৯৪৮ সালে লেখা প্রবন্ধেও পাওয়া যায় একই রকম ভাষ্য : "খুব ভালবেসে যে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছিলাম একদিন তা বলতে পারব না ; শিক্ষকতায় লিপ্ত হয়ে থাকতে যে খুব ভালো লেগেছিল তাও নয়...।"[৬] আসলে বিরাজমান শিক্ষা পরিস্থিতি ও শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে না পারাটাই জীবনানন্দের এই মনোভাবের কারণ। পেশা হিসেবে শিক্ষকতা যে তাঁর একেবারে অপছন্দের ছিল তা নির্বিচারে মেনে নেওয়া মুশকিল। তাই যদি হত তবে মাঝে-মধ্যে শিক্ষকতার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়লেও তিনি বোধ হয় আমৃত্যু শিক্ষকতার পেশাকেই মূল পেশা হিসেবে ধরে রাখতেন না।

নিজের শিক্ষক-জীবনের .....অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনানন্দের শিক্ষা-বিষয়ক অভিমত ও চিন্তা বিধৃত হয়েছে মূলত চারটি প্রবন্ধে।[৭] তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্যে এগুলি জারিত। প্রবন্ধ গুলি হচ্ছে :

১. 'শিক্ষা-দীক্ষা—শিক্ষকতা', *মাসিক বসুমতী*, কার্তিক ১৩৫৫ ;
২. 'শিক্ষার কথা', *দেশ*, ১৪ ভাদ্র ১৩৫৯ ;
৩. 'শিক্ষা দীক্ষা', *দেশ*, ২১ ভাদ্র ১৩৫৯ ;
৪. 'শিক্ষা ও ইংরেজী', দৈনিক *বসুমতী*, শারদীয় সংখ্যা ১৩৬০।

জীবনানন্দের শিক্ষা ভাবনায় নিজস্ব সমস্যা উঠে এসেছে ব্যাপক দেশপ্রেক্ষিতে।[৮] জীবনানন্দ বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। ফলে তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক লেখার একটা বড়ো অংশ জুড়ে আলোচিত হয়েছে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থার প্রসঙ্গ। বেসরকারি কলেজে শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া হয় না ; তাদের চাকুরিবিধি নেই, চাকুরির গ্রেড নেই, নিশ্চয়তা নেই ; কোনো নির্দিষ্ট ও সম্মানজনক বেতন স্কেল নেই—এ নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল জীবনানন্দের। তাই নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি লিখেছেন :

> ইস্কুলের মাস্টাররা তো নিশ্চয়ই—বাংলাদেশের অধিকাংশ বেসরকারি কলেজের শিক্ষকেরা মোটামুটি গভর্নমেন্ট অফিসের লোয়ার ডিভিশনের কেরানিদের মত মাইনে পায় কিংবা তার চেয়েও কম। তবে গভর্নমেন্টের কেরানিদের মাইনের একটা গ্রেড বা হার ঠিক করা আছে, প্রোমোশনের পথ আছে, চাকরির নিশ্চয়তা আছে, পেনশন আছে ; প্রায় কোনো প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদেরই এ-সব কোনো সুবিধা নেই। ... প্রাইভেট ইস্কুলের মাস্টারদের দশা প্রফেসরদের চেয়েও খারাপ—উপরোক্ত কেরানিদের চেয়ে বেশি খারাপ।
>
> ... গভর্নমেন্টের ও ধনিক অফিসগুলোর ওপরের—এমন কি মাঝামাঝি দিকের কেরানিরা যে ধরনের মাইনে, বোনাস ও অন্য দু'চার রকম সুবিধে পায়, বাঁধা-ধরা পথে তাদের ভবিষ্যৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্থিক উন্নতির যত বেশি সহজ সুযোগ ও সুবিধে রয়ে গেছে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের তা নেই।

(শিক্ষা–দীক্ষা : শিক্ষকতা)

বেসরকারি কলেজের অধ্যাপকরা যে কলেজগুলোর সূচনালগ্ন থেকেই উপযুক্ত বেতনের দিক থেকে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়েছেন তার জন্যে জীবনানন্দ প্রথমত বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকে দায়ী করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি দায়ী করেছেন ব্রিটিশ রাজের সহযোগী দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে। তাঁর ভাষায় —

> যে কারণেই হোক না কেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোনদিনও প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের দিকে ফিরে তাকায় নি। ... এ নিয়ে (যারা মাস্টার নয়) দেশের সব শিক্ষিত ও সচ্ছল সাধারণ মাথা ঘামাবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেছিলেন বলে জানা নেই। ... তাঁরা গভর্নমেন্টের সবরকম প্রতিষ্ঠানে বড় বড় কাজ করেছেন—ব্রিটিশের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করেছেন ... কিন্তু ইস্কুলের মাস্টারদের হয়ে তাঁরা কোনোদিন আপ্রাণ লড়েছেন বলে জানি না। প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের সাংসারিক অসচ্ছলতার নমুনা অহরহ চোখে পড়েছে তাঁদের। টাকা–কড়ির অভাবে কলেজের শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদাও যেখানে–সেখানে ক্ষয়িত খণ্ডিত হতে দেখেছেন তাঁরা। কিন্তু দেশের প্রাইভেট কলেজগুলোকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সে সব কলেজের শিক্ষকদের বেতন একটা সুমাত্রায় উত্তীর্ণ ক'রে দেওয়ার একান্ত চেষ্টা কোনোদিনই তাঁরা করেন নি।

(শিক্ষা–দীক্ষা : শিক্ষকতা')

দেশ স্বাধীন হবার পরও এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন তাঁর চোখে পড়ে নি। তাই অত্যন্ত দুঃখ, অভিমান ও ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> আমাদের সে সব করিতকর্মা শুভার্থী দেশবাসীরা অনেকেই আজ মৃত, কিন্তু তাঁদের উত্তরবর্তীদের হাতে তাঁদের সেই ঐতিহ্য তো আজও চলছে দেখছি। ইংরেজরা এদেশে থাকতে সত্তর আশি টাকা থেকে শুরু করে উচ্চতম দেড়শো–দুশোর ভেতরে প্রাইভেট কলেজের এক–একজন প্রফেসরের প্রাপ্য নির্ধারিত হয়েছে, উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা গভর্নমেন্টের বা ভালো কমার্শ্যাল ফার্মের অফিসারদের সঙ্গে প্রফেসরের বেতনের কোনো তুলনা চলে নি, চলেছে কেরানিদের সঙ্গে —লোয়ার ডিভিশনের কিংবা সাদাসিদে মার্কেনটাইল ফার্মের। তুলনায় সরকারি লোয়ার ডিভিশনের কেরানিরা জিতেছে।

(শিক্ষা–দীক্ষা : শিক্ষকতা)

উপযুক্ত সম্মানীর অভাবে শিক্ষক যে উপযুক্ত সম্মান থেকে বঞ্চিত হন সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন জীবনানন্দ :

> অধ্যাপক হিসেবে সমাজের কাছে কোনো উল্লেখযোগ্য সম্মান আমাদের দেশের প্রাইভেট কলেজের বেশির ভাগ প্রফেসরই কোনোদিন পান নি। এ সমাজে টাকার গৌরবের কাছে অন্য কোনো কিছুর উজ্জ্বলতা দাঁড়াতে পারে না। প্রফেসর তাঁর শূন্য পকেট নিয়ে কি জ্ঞানের প্রমাণ দিতে পারবেন? সে শূন্য কুম্ভের ঠনঠনানি দেশ শুনতে যাবে কেন?

(শিক্ষা–দীক্ষা : শিক্ষকতা)

বৃহৎ শিক্ষাযন্ত্রের অসহায় ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে এক ভুক্তভোগী শিক্ষকের 'যে বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে তাতে গাঢ় প্রত্যক্ষ হয়েছে' জীবনানন্দের এই লেখা।[৯]

জ্ঞান, মূল্যবোধ, কর্মদক্ষতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাজ শিক্ষককে দেখতে চায় অনুকরণীয় নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অথচ শিক্ষকের জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে সমাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদাসীন থাকবে—এটা জীবনানন্দ মেনে নিতে পারেন নি। তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন, শিক্ষককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ মনোভাবের ফলে অনেক শিক্ষক প্রকৃত শিক্ষকের গুণাবলি ও দায়বদ্ধতার চেতনা হারাতে বসেছেন। জ্ঞান-সাধনায় সমাহিত সৎ অধ্যাপক কিছুতেই টাকার লোভে অধ্যাপনা ছেড়ে অন্য চাকরিতে যান না—এ কথা যেমন সত্য তেমনি এটাও লক্ষণীয় যে, যাঁরা তথাকথিত শিক্ষক তাঁরা সুযোগ পেলেই চলে যাচ্ছেন অর্থকরী অন্য পেশায়। জীবনানন্দ স্পষ্টতই লক্ষ করেছেন : এক সময় দেশব্রতী শিক্ষক টাকার তোয়াক্কা করেন নি, কিন্তু সম্মান পেয়েছেন। তখন বাংলাদেশে সৎ শিক্ষকের সুসমাবেশ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে না টাকা, না-সম্মান—এর কোনোটাই না-থাকার ফলে বাংলাদেশে দিনের পর দিন সৎ শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

স্বাধীন ভারতে সৎ শিক্ষকদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন জীবনানন্দ ; নির্দ্বিধায় সমালোচনা করতে ছাড়েন নি সরকার ও আমলাতন্ত্রকে :

> যে রকমভাবে বড় ব্যবসাকে আরো স্ফীত হতে দেওয়া হচ্ছে, সওদাগর ও সরকারের সুধী অফিসারেরা নাম-ডাকে মৃগয়ায় আরো দোর্দণ্ড সুধী হয়ে উঠছে, যে রকমভাবে প্রাইভেট স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা ভাতে-কাপড়ে নিকেশ হতে চলেছে, তাতে মনে হয়, এই সব শিক্ষকদের দিয়ে রাষ্ট্রের সত্যিই কোনো হিত হয় বিবেচিত হ'লে খুব সম্ভব এ রকম গ্লানি সম্ভব হত না।

জীবনানন্দ যে কেবল শিক্ষকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে ভেবেছিলেন তা নয়। তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা করা হলে তা হবে খণ্ডিত ও আংশিকতাদুষ্ট। শিক্ষা-সম্পর্কিত হাতে গোনা স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধ কটিতে সুশৃঙ্খল সুসংহত আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে উপযুক্ত শিক্ষার অনিবার্য ভূমিকা সম্পর্কেও জীবনানন্দের মনোভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশ ও জাতির সামগ্রিক স্বার্থে সরকারের অর্থ প্রথম ও সবচেয়ে বেশি শিক্ষাখাতে ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেছেন। জাতি-বিদ্বেষের কারণে সরকারের অর্থ বরাদ্দের সিংহ ভাগ প্রতিরক্ষা খাতে চলে যাচ্ছে এই অজুহাতে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারের তহবিল-শূন্যতা দেখানোর যুক্তি তিনি মেনে নিতে পারেন নি। এ অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন দাবি করে তিনি 'শিক্ষা-দীক্ষা' প্রবন্ধে লিখেছেন, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে "শিক্ষায় ছাত্রদের অরুচি এলে, শিক্ষকদের মন না টিকলে, শিক্ষার ফলাফল খারাপ হতে থাকলে, দেশের পক্ষে অশিক্ষিত ও আধো শিক্ষিত হ'য়ে পড়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না ; ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের নানা রকম গুরুতর দায়িত্বের জায়গায় অনেক কাঁচা লোকের ভিড় এসে পড়ে ; সেটা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদের জিনিস।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার উদ্দেশ্যকে তিনি কেবল ব্যক্তির চারিত্রিক ও নৈতিক উৎকর্ষের মধ্যে সীমিত করে দেখেন নি, তার সঙ্গে রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও বিকাশের দিকটাকেও যুক্ত করে দেখেছেন। সে দিক থেকে জীবনানন্দ সমাজে সুনাগরিক গড়ে তোলাকেও যে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে গণ্য করেছিলেন, তা স্পষ্ট হয়।

জীবনানন্দ তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক লেখায় নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩—এই কালপর্বে শিক্ষাজগতের অবস্থার ওপরও মোটামুটি আলোকপাতে প্রয়াসী হয়েছেন। ব্রিটিশ ভারতে পরাধীন পরিবেশে শিক্ষার যে অবস্থা বা সীমাবদ্ধতা ছিল স্বাধীন দেশে সে ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটবে—এমন প্রত্যাশা জীবনানন্দের ছিল। কিন্তু দুঃখভরে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবলোকন করেছেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো উত্তরণ ঘটে নি বরং শিক্ষার মানের লক্ষণীয় অবনতি ঘটেছে। এর জন্য তিনি জাতীয় জীবনে সনিষ্ঠ প্রচেষ্টার অভাবকেই দায়ী করেছেন :

> খারাপ দেশে প্রকৃত জ্ঞান ও গুণ ও ভালো শিক্ষা ফলানো কঠিন। আমাদের দেশ এখনও যথেষ্ট খারাপ ; স্বাধীনতা পেয়েও টাকাকড়ি ঠিক মতন খরচ হচ্ছে না, রাজ্য চালাবার সত্য ও পরিষ্কার কোনো সূত্র নেই। গভর্নমেন্ট হয় তো বললেন ব্রিটিশ যা দিয়ে গেছে তা রাতারাতি ভালো করা যায় না। সত্য কথা। কিন্তু এ পাঁচ বছরে ভালো ক'রে তোলবার আগ্রহ সত্য হলে কাজ বেশি কিছু না হলেও একটা নতুন আবহ বোধ করা যেত। কিন্তু সেটা হয় নি।
>
> (শিক্ষার কথা)

স্বাধীনতার পর দেশে শিক্ষার নিম্নমান, লেখাপড়ায় ছাত্রদের অনীহা, মূল পাঠ্য বইয়ের বদলে নোট বই পড়ার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ইত্যাদিকে জীবনানন্দ শিক্ষার সংকট হিসেবে দেখেছেন। এর জন্য ছাত্রদের তিনি খুব একটা দায়ী করেন নি, বরং দায়ী করেছেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে। তাঁর মতে, শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল বা বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন আনা হয় নি বলে সংকট ঘনীভূত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যায়ন : কয়েকটি শিক্ষা কমিশন ও কোনো কোনো শিক্ষা নায়কের চেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষার "বিষয় ও পদ্ধতিতে কোথাও কোথাও অল্পস্বল্প পরিবর্তন হলেও পঞ্চাশ বছরের শিক্ষার চেহারা মোটামুটি একই থেকে গেছে।"

শিক্ষার নিম্নমানের জন্য জীবনানন্দ একাধিক সুনির্দিষ্ট কারণ নির্দেশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুখ্যভাবে তিনি দায়ী করেছেন দীর্ঘকাল ধরে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিদেশী ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু রাখাকে। শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রধান ত্রুটি, তাঁর মতে, ক্লাস-নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে নোট-নির্ভর শিক্ষার প্রবণতা। তিনি মনে করেন, স্কুল-কলেজের শিক্ষায় ইংরেজির ব্যবহার পরোক্ষভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নোটবই অভিমুখী করেছে :

> ইংরেজি ভাষা শেখার দিকে বেশি মন দিতে হয় ব'লে জ্ঞানের নানা বিভাগের সঙ্গে পরিচয় মাস্টারের বা বাজারের নোট বইয়ের সাহায্যে সেরে ফেলতে হয়। ...ক্লাসের নোটের চেয়ে বাজারের নোটই বেশি দরকারি মনে হয় তাদের কাছে এবং ক্লাসের পাঠন বা লেকচারের চেয়ে শিক্ষা ও পরীক্ষায় দরকারে বাজারের নোটের ভাষাই ঢের বেশি চলে। ফলে—মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা আজকাল এইসব নোটের সঙ্গেই বেশি জড়িয়ে পড়েছে।
>
> (শিক্ষা-দীক্ষা)

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জীবনানন্দ বিশদ কোনো আলোচনা করেন নি। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি যে সন্তুষ্ট ছিলেন না তার ইঙ্গিত তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে যে যথাযথভাবে মেধা যাচাই হয় না সে বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল দৃঢ়মূল :

> ফার্স্ট ক্লাস এম-এ হলেই যে সেকেন্ড ক্লাসের চেয়ে বেশি বিদ্বান বা কুশলী শিক্ষক হতে পারে আমি তা' বিশ্বাস করি না। ... সেকেন্ড ক্লাস ডিগ্রির ভালো শিক্ষকরা ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রিওলা ভালো শিক্ষকদের চেয়ে কোনো অংশেই খারাপ নন— ...। ইউনিভার্সিটিতে যে ধরনের পরীক্ষা প্রচলিত আছে এবং পরীক্ষকেরা যে নিয়মে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস ধার্য করেন তাতে স্মৃতিশক্তি—ফলিত স্মৃতিশক্তির ওপরই জোর দেওয়া হয় বেশি—শুদ্ধ চেতনা ও সৃজনী শক্তিকে কোণঠাসা করে।
>
> (শিক্ষা-দীক্ষা : শিক্ষকতা)

জীবনানন্দ নিজে ভালো ছাত্র ছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পান নি, পেয়েছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণী। ফলে কর্মজীবনে যোগ্যতম স্থান ও মর্যাদা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বঞ্চিত হয়ে থাকবেন। বিশেষত অধ্যাপনার জগতে তিনি দেখেছেন প্রচলিত পন্থায় যে শ্রেণী–নির্ণয় হয় তা সবসময় প্রকৃত মেধার পরিচয়বহ হয় না। ফলে অনেক মেধাবী ছাত্রও পরীক্ষা–পদ্ধতির কবলে পড়ে সারাজীবন ভোগান্তির শিকার হয়। তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন :

> ইউনিভার্সিটি নিজে ঠিক করে দিয়েছে কে কোন্ ক্লাস। সেটা তাদের কুড়ি–বাইশ বছর বয়সে ঠিক হয়ে গেছে। এরপর সমস্ত জীবন ভরে আর কোনো ক্রমবিকাশ নেই?
>
> (শিক্ষা–দীক্ষা : শিক্ষকতা)

অবশ্য উল্লেখ করতে হয়, প্রচলিত প্রথা তাঁর কাছে অবৈজ্ঞানিক মনে হলেও কোনো বিকল্প পদ্ধতি তিনি নির্দেশ করেন নি।

শিক্ষার অধোগতির লক্ষণ হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'শিক্ষার ওপর ছাত্রদের অরুচি'ও 'ঠিকভাবে শিক্ষিত হওয়ার শক্তির' হ্রাসকে। এর আপাতদৃষ্ট প্রাসঙ্গিক কারণ হিসেবে তিনি শিক্ষকদের পাঠন এবং পাঠ্য বই ও লাইব্রেরির বইপত্রের ওপর নির্ভরতা হ্রাসকেই মূলত দায়ী করেন। কিন্তু গভীর তলে আরও যে সব কারণ বিদ্যমান সেগুলোও তিনি নির্দেশ করতে চেয়েছেন :

> অনেকদিন ধ'রে আমাদের দেশের আর্থিক দুরবস্থা, রাষ্ট্র চালাবার ব্যাপারে নানা রকম দুর্বলতা ও দোষ, শিক্ষার প্রতি সাধারণের উপেক্ষা, দেশের নেতাদের কঠিন অমনোযোগ, শিক্ষিতদের চাকরির অভাব, অশিক্ষিত আধো–শিক্ষিত মিস্ত্রি–মজুরদের তুলনায় শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ঢের বেশি বেকার থাকার সম্ভাবনা, দরিদ্র শিক্ষিত সমাজের জীবন্মৃত অবস্থা।
>
> (শিক্ষা–দীক্ষা)

উদ্দেশ্যের দিক থেকে শিক্ষা যে ক্রমেই জীবিকার উপায় অভিমুখী বৈশিষ্ট্য নিচ্ছে তাও জীবনানন্দের দৃষ্টি এড়ায় নি :

> পেট যাতে ভরে সেইটিই আজকালকার প্রধান সমস্যা। কী জ্ঞান লাভ হ'ল, কী রকম শিক্ষা পাওয়া গেল, শিক্ষা আদতেই পাওয়া গেল কি না এই নিয়ে চিন্তা করবার ইচ্ছে অবসর মানুষের প্রাণে ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছে মনে হয়। প্রায় ছেলেই চাকরি করতে হবে বলে শিক্ষার স্মরণ নেয়। কিন্তু শিক্ষা–দীক্ষা পেয়েও চাকরি পাওয়ার আশা বাড়বার বদলে কমেই যাচ্ছে দিনের পর দিন।
>
> (শিক্ষা–দীক্ষা)

দেশের শিক্ষা পরিস্থিতির দুঃখজনক অবনতিতে ভাবিত জীবনানন্দ সংকট নিরসনে ব্যাপক চিন্তাভাবনা ও আশু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে লিখেছেন :

> এ দেশের শিক্ষা ইস্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির আগাগোড়া শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্র–শিক্ষকদের অবস্থা ও পরিণাম সম্বন্ধে ভালো করে ভেবে দেখে তাড়াতাড়ি কাজে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত দরকার বলে বোধ হচ্ছে।
>
> (শিক্ষা–দীক্ষা)

পরাধীন অবস্থায় দেশে শিক্ষার দিকটা প্রয়োজনীয় ও যথাযথ গুরুত্ব না পেলেও স্বাধীনতার পরও যে দেশে শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পায় নি—এ নিয়ে জীবনানন্দ খেদ ও ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে নিজের সুস্পষ্ট নীতি–অবস্থান ব্যক্ত করে তিনি লিখেছেন :

> ব্রিটিশ আমলে এ দেশে শিক্ষাকে রাষ্ট্রে কোনো উঁচু স্থান দেওয়া হয় নি ; পুলিশ দেশশাসন বিচার ইত্যাদির তুলনায় তো বটেই, সরকারের প্রায় যে কোনো ব্যাপারের চেয়ে শিক্ষার দাবি নিচুতে ছিল। ... দেশের শিক্ষার প্রতিও আমাদের স্বাধীন দেশের কর্তৃপক্ষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবগতিক বিশেষ স্পষ্ট নয় ; মোটামুটি ধরে নিতে হবে যে তাঁদের খুব সম্ভব কোনো মনোভাব নেই ; শিক্ষা নিয়ে তাঁরা দরকারি চিন্তা বা কাজ করতে চান না। ... আমাদের দেশের শিক্ষার এই খারাপ সময়টার কথা উল্লেখ ক'রে আজকের শাসকদের মুখের দিকে তাকালে তাঁরাও ব্রিটিশদের মতো বলেন যে টাকা নেই, কিছু করতে পারা যাচ্ছে না। ... বুঝতে পারা যায়, শিক্ষা ... আজকের স্বাধীন দেশের চোখেও ব্রিটিশ আমলের শিক্ষার মত তুচ্ছ ও চিন্তার অযোগ্য রয়ে গেছে।

(শিক্ষা–দীক্ষা)

কেবল সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না জীবনানন্দ তা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করতেন। তাই জাতীয় জীবনে শিক্ষার ঈপ্সিত অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে তিনি শিক্ষা–সংশ্লিষ্ট সব মহলের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় :

খুব ভালো ও করিতকর্ম গভর্নমেন্টও শিক্ষা–দীক্ষা বা কোনো ব্যাপারেই একাই সব কিছু করে উঠতে পারে না, তাকে সেটা করতে দেওয়াও উচিত না। শিক্ষা ছাত্রদের, শিক্ষকদের, শিক্ষা–বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের ও লোকসাধারণের জিনিস। কী রকম দেশ ও সময়ের সঙ্গে ঠিকভাবে যোগ রেখে কী ক'রে শিক্ষার উন্নতি হয় সেটা স্থির করবার কাজ এঁদের—গভর্নমেন্টের ঠিক নয়।

(শিক্ষা–দীক্ষা)

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বনাম ইংরেজি—এ নিয়ে যে বিতর্ক চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে জীবনানন্দ এ নিয়েও তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন একাধিক প্রবন্ধে।

শিক্ষাবিদ ও ব্রিটিশ রাজকর্মকর্তা টমাস ব্যারিংটন মেকলে (Macaulay, ১৮০০–১৮৫৯) ব্রিটিশ শাসনের গাঁথুনির কাজে এ দেশীয়দের জুড়ে দিতে চেয়ে এবং এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রথম ইংরেজি চালু করেন। রামমোহন রায় (১৭৭২–১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১) ও অন্যান্য মনীষী ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে বাঙালির পরিচিত হবার সুযোগের সার্থকতা দেখতে পেয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির গুরুত্বকে মেনে নিয়েছিলেন। এদিকটা জীবনানন্দও অস্বীকার করেন না। তাঁর ধারণা, "পশ্চিমি শিক্ষায় চেতনাবান হওয়ার ফলে" "দেশী ঐতিহ্যের সত্য ও অসত্যের দিক সম্বন্ধে ভারতবাসীর বোধ আগের চেয়ে বেশি পরিষ্কার।" কিন্তু একই সঙ্গে জীবনানন্দের ধারণা, বাঙালি অনেক সময় ইংরেজির প্রতি অতিরিক্ত আতিশয্য দেখিয়েছে। ফলে, "ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে নানা দিক দিয়েই ঠিক মতন ভারসাম্য বজায় রেখে সব সময়ই অগ্রসর হতে পারে নি।"(শিক্ষা ও ইংরেজি)

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, পরাধীন দেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি প্রচলিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১), আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪–১৯২৪), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১–১৯৪৪) প্রমুখ মনীষী ইংরেজির পাশাপাশি মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষা ও চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এমনকি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকেও রাখতে চেয়েছিলেন সমান্তরালভাবে।[১০]

জীবনানন্দ এ দিকটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই মনে হয়। তিনি লক্ষ করেছিলেন, ইংরেজির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণে অনেক বাঙালিই দেশী ভাষার গুরুত্বকে খাটো করে দেখেছিলেন। ইউরোপীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত টানে তখন দেশীয় সভ্যতা অনেকের কাছে অসার মনে হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশাপাশি জীবনানন্দ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিদেশী ভাষার নেতিবাচক আরও একটি দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সার্বিক বিচারে ইংরেজি ভাষায় কেউ কেউ পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হলেও সাধারণভাবে সব বাঙালি ছাত্রের পক্ষে ইংরেজি আয়ত্ত করা সহজসাধ্য হয় নি। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য :

> মেকলের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের ইস্কুল-কলেজে কোনো সরল বুনিয়াদি (basic) ইংরেজির চলন না থাকায় এবং শিক্ষকেরা নিখুঁত ব্যাকরণ ও 'খাঁটি' ইংরেজির ওপর বেশি জোর দেওয়ায় আমাদের দেশের এই একশো-সোয়াশো বছরের শিক্ষা এ দেশের প্রায় শতকরা নব্বই জন ছাত্রের পক্ষেই ইংরেজি ভাষা শেখার বিষম চেষ্টায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ... যাঁরা অনেক দূর পর্যন্ত পেরেছে তাদের মধ্যেও অনেকে ডিগ্রি পেয়েও ভারতীয় আবহে শুদ্ধ ইংরেজি ও (একে বোধ হয় 'ইণ্ডিয়ান ইংলিশ' বলা হয়, 'কিংস ইংলি'শের চেয়ে ভিন্ন) রপ্ত করতে পারে নি ...। ...ইংরেজিতে কাঁচা থাকায় ইংরেজির মারফতে এরা ইস্কুল-কলেজে যা-কিছু শিখেছে সেটা খুব ভালো অধিগত হয়েছে বলে মনে হয় না।
>
> (শিক্ষা ও ইংরেজি)

ফলে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত অধিকাংশ ছাত্রই জ্ঞানের কোনো শাখাতেই ধারণার স্বচ্ছতা পায় না, এমনকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লাভ করা সত্ত্বেও।

এসব সীমাবদ্ধতার কথা জীবনানন্দ উল্লেখ করেছেন নানা ব্যাখ্যা ও উদাহরণ সমেত। কিন্তু তাই বলে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্বকে তিনি খাটো করে দেখেন নি। তিনি যখন এ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন তখন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করেছে। তিনি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার গুরুত্ব নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঢের অগ্রসর হলেও ইংরেজির বিকল্প হিসেবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর জ্ঞানচর্চার বাহন হওয়ার ক্ষেত্রে তা ইংরেজির তুলনায় বেশ পিছিয়ে। তাই তিনি মনে করেন, "ইংরেজিকে উৎখাত না করে শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক দিন পর্যন্ত তার জন্যে বিশেষ দরকারি স্থান রেখে দেওয়া দরকার"। ('শিক্ষা ও ইংরেজি')।

ইংরেজির অধ্যাপক জীবনানন্দ ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে পরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মনে করেন, "ইস্কুল-কলেজের সমস্ত ছেলের জন্যেই ইংরেজি সাহিত্যের ওপর যে অপ্রাসঙ্গিক জোর দেওয়া হয় আজকের দিনে তা অবাস্তব"। ('শিক্ষা ও ইংরেজি') ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আরও আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি লিখেছেন : "ইস্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যে পাঠ্য ও পদ্ধতি চলে আসছে তার অনেকখানি বদলে ফেলে ইংরেজি ভাষা শেখাটাকে ছেলেদের কাছে সুস্থ আধুনিক ও রুচিকর করে তোলা দরকার"। ('শিক্ষা ও ইংরেজি') নোটবই-নির্ভর 'কুশৃঙ্খল' আধখেচড়া ইংরেজি শিক্ষার সংকট মোচনের লক্ষ্যে তিনি 'বুনিয়াদি ইংরেজি' শিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। যা-কিনা 'ইংলিশ ল্যাগুয়েজ টিচিং'এর ইতিহাসে ব্যবহারিক সূত্র হিসেবে গণ্য।[১১] একই সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলা শেখার দিকটিও যে যথাযথ নিষ্ঠা ও গুরুত্বের সঙ্গে ছাত্ররা নিচ্ছে না সে দিকেও জীবনানন্দ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট :

> ছেলেদের আরো ভালো করে ভাষা (ইংরেজি—এমন কি বাংলাও) শেখা উচিত ; তাহলে যা শিক্ষকের ভাষা, তাদের কাছে তা আর তেমন 'পণ্ডিতী' বলে মনে হবে না। পড়াবার আড়ষ্টতা ঘুচিয়ে ছেলেদের কাছে নিজেকে যতদূর সম্ভব সহজ করে তোলা উচিত শিক্ষকের।
>
> (শিক্ষা ও ইংরেজি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষকের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের লক্ষণীয় উপেক্ষা সত্ত্বেও শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দিকটা জীবনানন্দের কাছে স্পষ্ট ছিল। তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক লেখায় সার্থক শিক্ষকের পেশাগত স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কেও তাই তিনি লিখতে ভোলেন নি। তাঁর মতে "শিক্ষকতাই একমাত্র কাজ— ... আজকের পৃথিবীর সবরকম কাজের ভেতরে যা সব চেয়ে অচল ও স্থির ধীর মনের অভিনিবেশ দাবি করে"। ('শিক্ষা-দীক্ষা—শিক্ষকতা') যে সব শিক্ষক শিক্ষা-দীক্ষাকে জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন তাঁরা তাঁর ভাষায় একটা 'আশ্চর্য আত্মসমাহিত ভুবনের' অধিবাসী। সেই ভুবনে "যে কোন নিজের কাজে তৃপ্ত অধ্যাপককে বই, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদির জন্যে কৌতূহলী হয়ে থাকতে হয়, পৃথিবীর পুরোনো বইগুলোর মর্ম সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হয়, নতুন বইয়ের খোঁজ রাখতে হয়—যতদূর সম্ভব শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়ে দেখতে হয়--কেউ তাকে কাছে টানছে বলে নয়--ভালোবাসার .তাগিদে"। ('শিক্ষা-দীক্ষা—শিক্ষকতা')

জীবনানন্দ মনে করেন, সৎ শিক্ষক কখনো অর্থ-বিত্তের প্রতি লালায়িত হতে পারেন না। "টাকাকড়ি বা বিদ্যা কোনো কিছুর জন্যেই কোনো রকম বরাহূত সম্মান প্রফেসরের কাম্যও নয়।" বরং "পৃথিবীর টাকা-কড়ির ব্যাপারে উত্তেজিত হওয়া যাদের স্বভাব, তাদের পক্ষে আত্মদান করে শিক্ষকতা করা সম্ভব নয়"। ('শিক্ষা-দীক্ষা—শিক্ষকতা')

শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রভূমিতে শিক্ষকের ভূমিকা ও মূল্যবত্তা সম্পর্কে জীবনানন্দের যে ভাবনা তাতে বাস্তববোধ ও আদর্শ চেতনার একটা সমন্বয়ধর্মী মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের তিনি দেখেছেন, 'শিক্ষার সৎ সংগঠন ও বিস্তারের' ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রের অতি প্রয়োজনীয় কর্মী' হিসেবে। আর শিক্ষকদের সম্পর্কে তাঁর মনে যে আদর্শ ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল, বিভিন্ন প্রসঙ্গে যার কিছু কিছু দিক তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে।

পঞ্চাশ বছরেরও আগে জীবনানন্দ বাংলার শিক্ষা জগতের এক 'খারাপ সময়ের' চালচিত্র এঁকেছিলেন নিজের মতো করে। তা একাধারে ব্যক্তিক ও দৈশিক। তিনি যে 'কুশৃঙ্খলা' দেখে হতাশার মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, আজ পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের বাংলাদেশেও সে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। বরং নৈরাজ্য আগের চেয়ে বেড়েছে। ফলে জীবনানন্দের লেখা আমাদের ভাবনায় সাড়া জাগায়। এ দিক থেকে সমকালেও তাঁর শিক্ষাভাবনা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না।

তথ্যনির্দেশ

১. জীবনানন্দের গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধের জন্য দ্র: ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পা.), *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র*, ঢাকা, ১৯৯৫ ; ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, (সম্পা.) *জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত প্রবন্ধাবলী*, ঢাকা ১৯৯৯ ; আবদুল মান্নান সৈয়দ (সংকলিত ও সম্পাদিত), *শ্রেষ্ঠ জীবনানন্দ*, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ৫৩৩-৬৩৬

২. দ্র. Clinton B. Seely, *A Poet A part,* Calcutta 1999 [First Ed. 1990]

৩. এই সময় কিছুদিন তিনি ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন ; কিছুদিন ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে ব্যবসা করেছেন। দ্র. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮২

৪. ১৯৪২ সালের ৩১ অক্টোবর বরিশাল থেকে শ্রীমতী নলিনী দাশকে লেখা চিঠি। দ্র. জগদীশ মণ্ডল ও সমর চক্রবর্তী (সম্পা.) *ময়ূখ*, জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ২৩৩ ; দীপেনকুমার রায় (সংক.), *জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী*, কলকাতা ১৯৭৮, পৃ. ১৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. ১৯৪৬ সালের ২ জুলাই বরিশাল থেকে লেখা জীবনানন্দের চিঠি। প্রাপকের নাম অজ্ঞাত. দ্র. জগদীন্দ্র মণ্ডল ও সমর চক্রবর্তী (সম্পা.), পূর্বোক্ত ; দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *জীবনানন্দ : বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, কলকাতা ১৯৮৬, পৃ. ২৪৮
৬. দ্র. জীবনানন্দ দাশ, 'শিক্ষা-দীক্ষা—শিক্ষকতা', মাসিক *বসুমতী*, কার্তিক ১৩৫৫ ; ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পা.), *জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত প্রবন্ধাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮ ; আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭২
৭. 'শিক্ষা সাহিত্যে ইংরেজি' শিরোনামে জীবনানন্দের একটি অসম্পূর্ণ রচনা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। দ্র. ফয়জুল লতিফ (সম্পা.), *জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত প্রবন্ধাবলী*, পৃ. ১৭৯–১৮৩। ১৯৪৮–এ রচিত একটি উপন্যাসেও জীবনানন্দ সমকালীন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটি 'জলপাইহাটি' নামে শিলাদিত্য পত্রিকায় জুলাই ১৯৮১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৮২ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্র. সুমিতা চক্রবর্তী, 'জীবনানন্দ দাশ : এক ক্ষুব্ধ শিক্ষক', *জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল*, কলকাতা ১৯৮৭, পৃ. ১১৫।
৮. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৪
১০. সুমিতা চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।
১১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপসী বাংলা'র ভূমিরেখা
সেলিম আল দীন

জীবনানন্দ দাশের মনোভূমিকে 'নির্জনতম' বলা হয়েছিল একদা এবং এই মুদ্রাঙ্কনের পর থেকে এই কবির প্রকৃতি বিচার এতটা সুলভরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে যে এর ফলে পাঠকের পক্ষে স্বেচ্ছাধীন জীবনানন্দ বিচার দুরূহ হয়ে পড়েছে। এমনকি ১৯৪৩ সালে এই কবিকে 'স্বভাব-লাজুক' 'মফস্বলবাসী' (কবিতা আশ্বিন ১৩৪৯) এই সব নন্দনবহির্ভূত ভাষায় চিহ্নিত করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল কবির কবিতা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার।

অথচ এই কবির ভেতরে চিরায়ত ও সমকালীন বিশ্ববেদনা পরিস্ফুটিত হলো যখন, নিঃসঙ্গচারী কথপোকথনের জগত থেকে বেরিয়ে এলেন যখন 'নিঃসুর', 'নিঃস্বাদ' বলে মনে হয় কারু কারু কাছে। হয়তো নির্জনতার বেঁধে দেওয়া ছকে মেলানো যাচ্ছিল না বলে এই রুষ্টতা।

উপনিবেশজ মানসের একটি প্রধান প্রবণতা যে, তা বিশ্বমুখীনতার নামে নিজ দেশ, কাল বর্জিত এক অনুকরণ কৃতিকে আঁকড়ে ধরে। শিল্পভূমি অন্বেষণে নিজ দেশ, কাল ভূগোল বর্জনের মধ্য দিয়ে যে উৎকেন্দ্রিক যাত্রা তা শেষ পর্যন্ত শাসকের শিল্পরীতিতেই আশ্রয়প্রার্থী। কিন্তু সেখানে আসর জমে না, পংক্তি ভোজনে তা গ্রাহ্যও হয় না। ফলে বিশ্বমুখীনতা ও উৎকেন্দ্রিকতা শেষাবধি একার্থক হয়ে ওঠে। বিশ্বমুখীনতার নামে উন্মুলিত যাত্রা অন্তঃসারশূন্য খোলসজীবী সাহিত্যে পরিণত হয়। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় বহু বিচিত্র অভিগমন ঘটেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাশাপাশি বাংলা উপন্যাসের যে বিস্তার গভীরতা দেশ, কালজ্ঞান শিল্পসূক্ষ্মতায় ধৃত বাংলা কবিতায় কৃচিৎ তার দেখা মেলে। এর অর্থ একথা বলা নয় যে, বাংলা কবিতার নির্মাণ কৌশলে কোনো ত্রুটি ছিল বা তা উচ্চ মূল্যে অভিষিক্ত হবার যোগ্য নয়। বরং নির্মাণগত নীরিক্ষার প্রাবল্য বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে বাংলা কবিতা অগ্রগামী। এবং তার অন্বেষণ ক্ষেত্র কম বিস্তৃত নয়। কিন্তু রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতার বিষয়দৈন্য, ভাবাদৈন্য কম নয়। তবে যে কোনো অগ্রযাত্রায় ত্রুটিভ্রান্তি বা হতাশা থাকতে পারে। তাকে স্বীকার-পূর্বক যাত্রাকে অভিযাত্রায় উন্নীত করা যায়।

কিন্তু রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতার নান্দনিক শূন্যতা প্রকট, প্রাচ্য মানসিকতার বদলে পাশ্চাত্যের শিল্প যাত্রাই তাঁর কাছে পূজ্য প্রতিভাত হয়েছিল। যে দাঙ্গা, বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ একটি ভূখণ্ডের হৃদয়ক্ষত সৃজন করেছিল, আমাদের আধুনিক কবিতা কৃচিৎ তার বেদনার স্বাক্ষী। অবাক হবার বিষয় যে, ইংরেজদের শাসন, শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে বাঙালি মানসে যে ঘৃণা ও প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হবার কথা আমাদের চিত্তে তা ঘটেনি বরং শাসকদের সংস্কৃতির মধ্যে আমরা সভ্যতার শীর্ষবিন্দু দেখলাম এবং তাদের রচিত শিল্পরীতি আমাদের শিল্প বিবেচনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একান্ত জরুরি বিবেচিত হলো। সে ধারায় বিকশিত হবার এক নিঃস্ফল প্রয়াসে লিপ্ত হলাম আমরা।

জীবনানন্দ দাশের কালে বাংলা কবিতার অন্তর্গত ভাবলোকে এক ধরনের উপনিবেশিক মানসচ্ছায়া দেখতে পাই। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই তিন কবির কাব্যস্থিত বিচিত্র সমৃদ্ধি সামনে রেখেও একথা বলা যায়। অন্তত জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-র স্থান কাল সচেতনতা উপনিবেশিক মানসিকতার বিরুদ্ধাচারী, প্রচল-বিষমবাদী।

'রূপসী বাংলা' এই ঔপনিবেশিক মানসিকতার বিপরীতে এক কথা-কাব্যভূমি। আপাত স্নিগ্ধ, প্রসন্ন চিত্রকল্প বাঙালির সর্বপ্রাণবাদীতা, কথোকতার ভঙ্গি সব মিলিয়ে রূপসী বাংলা রবীন্দ্রোত্তর সমগ্র বাংলা কাব্য থেকে দূরবর্তী। নির্জনতা এর অবলম্বন কিন্তু এ কবি নিঃসঙ্গচারী নন বরং আত্মমগ্নতায় ঔপনিবেশিক মানসিকতার বিরুদ্ধে বাঙালির জন্য এক অনিবার্য চিত্র ও চিত্তকে খুঁজে নেন, যা এখনকার, তখনকার, সমকালীনতার আবার ইতিহাসেরও। এখনকার কথাটা এই জন্য বলা যে, কাব্যে বা শিল্পে কবি অতীত রচনা করেন না তিনি সবটাই বর্তমান করে নেন। রূপসী বাংলা যুদ্ধক্ষত মন্বন্তরের ভেতর টিকে থাকা এক নারী কল্প মানচিত্র যা তখনকার থেকে সমকালীনতায় উঠে আসে—অথচ তার এই অনুভূতি ইতিহাসের পূর্বরশ্মী ধরা। কাজেই এই কাব্য অতীতচারিতা নয়, বর্তমান। কিন্তু বর্তমান নিয়ে কাব্য হয় না যদি না তার টঙ্কার ধ্বনি ভবিষ্যতে গিয়ে না পৌঁছায়।

'রূপসী বাংলা'য় দেশকালের অতীত এক বাংলাকে পাই যা কবির ব্যক্তিগত আবিষ্কার কিন্তু এই আবিষ্কারের ভেতর আছে এক শাশ্বত ভূমি। যার ভূগোল ও জীবনধারার মধ্যে চিত্র, বোধ ও ভাবনার অনুষঙ্গগুলি নিস্তাপ স্পর্শকাতরতার দ্বারা ইন্দ্রিয়ধৃতি লাভ করেছে।

ঔপনিবেশ কাল ও উপনিবেশ পরবর্তী বাংলা কবিতা এক অদ্ভুত চারিত্র্যলক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের সকল শিল্পকর্মে উপনিবেশ বিরোধী এক গভীর শিল্পনন্দন ও মানবখণ্ড আবিষ্কারের তাগিদ ছিল। মধুসূদনের বিদ্রোহী চিত্ত, রবীন্দ্রনাথের আত্মচিত্তমুক্তি ও বিশ্ববীক্ষণের প্রাচ্যরূপ, এ কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, ইংরেজ শাসনের চূড়ান্ত বিকাশের কালেই বাঙালি মানস একে উপেক্ষা করেছিল ব্যক্তিস্ফূরণের তাগিদে, এমনকি বাহ্যত বহু স্থলে উপনিবেশিক পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা করেছিল। নজরুল ইসলাম তাঁর চারণিক রূপে কালোত্তীর্ণ আহ্বান জানিয়েছিলেন বিদ্রোহের এক রবীন্দ্র ভুবনের ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য অন্বেষণ করলেই দেখা যায়—তাঁর বিশাল সৃষ্টিকর্মের ধারায় কোথাও নান্দনিক দাস্য নেই—বরং উচ্চতম মানবীয় অনুভূতিসমূহকে সহস্ররূপে তিনি আবিষ্কার করেছেন। উপমা প্রতীক, চিত্র, অলঙ্করণ, ভাবলোক সর্বত্র তাঁর দৃষ্টি ও সৃষ্টি এত স্বতন্ত্র এতটা অনিবার্য যে, ইংরেজ উপনিবেশ কালের অপচ্ছায়ার চিহ্নমাত্র নেই সেখানে।

অথচ ইংরেজদের কালে, রবীন্দ্রের অন্তিম পর্বে, একদল কবি, যথার্থই প্রতিভাবান বাংলা কবিতায় মুক্তির পথটি খুঁজলেন পাশ্চাত্যের শিল্প পদ্ধতি ও নান্দনিক ভূমিতে। ফলে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র পরবর্তী নবতর মুক্তির সম্ভাবনার মধ্যে একটা উপনিবেশীয় প্রচ্ছায়া আপতিত হলো। ভারতে ইংরেজ শাসনের কালে বাঙালি মানসের যে দ্রোহ, স্বাতন্ত্র্য এবং শিল্প সংবেদন তা আশ্চর্যজনকভাবে প্রভুদেশগামী হয়ে উঠল। বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ শক্তির পতন থেকে আমাদের তখন বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে, ঐ ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক কাঠামো ও রাষ্ট্র শক্তির কাছ থেকে আমাদের গ্রহণের অনেক কিছু থাকলেও তার শিল্পরীতি ও জীবন ভাবনার একান্ত অনুগামিতা স্বাস্থ্যকর হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' সেই আত্মবিস্মৃত অনুকরণের কালে, দেশকাল সচেতন এক দীর্ঘ লিরিক—আত্ম আবিষ্কারের এক অনিবার্য তাগিদ। সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, দাঙ্গা, দেশ বিভাজনের অস্ফুট পদধ্বনির মুখে এক শান্ত সমাহিত ধ্যানমগ্ন চিত্রল-স্তোত্র, আত্মগত উপলব্ধির ভেতর বাংলা ভূমির চিরায়ত রূপ এবং তার সঙ্গে আত্মসম্পর্ক আবিষ্কারের এক যাদুকরী অনুভব।

'রূপসী বাংলা'কে দ্রোহের কাব্য বলি এজন্য যে, উপনিবেশীয় অপচ্ছায়ায় আমাদের ম্লান বসবাসকে জীবনানন্দ দাশ এক নতুন ভূমির আলোকে অপসৃত করেছেন। আমরা ভুলে যাইনি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে, 'রূপসী বাংলা' পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মউপলব্ধির এক প্রধান অবলম্বন ছিল। বাংলার মুখে যে শাশ্বত লাবণ্য তাকে জাতিগতভাবে বাঙালি খুঁজে নিতে চেয়েছিল ঐ কাব্যের মধ্যে। খুঁজে পেয়েছিলও বটে।

'রূপসী বাংলা'র ভেতরে উপনিবেশ বিরোধী উপলব্ধি প্রত্যক্ষভাবে খুঁজে পাওয়া শুরুতে কঠিন কিন্তু এর সামগ্রিক রূপটা শেষ পর্যন্ত উপনিবেশিক মানসিকতার বিরুদ্ধেই যায়। এমে সেজায়ার যে আত্ম আবিষ্কারের আবেগে দেশে ফেরার খাতায় মার্তিনিকের ইতিহাস ভূগোলকে এই ঝোড়ো উচ্চারণে উন্মিলিত করেন, 'রূপসী বাংলা' তেমন নয়। দু'কাব্যেরই লক্ষ্য স্বভূমিকে আবিষ্কার—কিন্তু জীবনানন্দের কবিকৃতি আরও সমাহিত, রসঘন। এই কাব্য আপাতশান্ত উপলব্ধির ভেতর এক আবিষ্কার—সাপেক্ষ দ্রোহ। যে পরাবাস্তবতা এমে সেজায়ারের অবলম্বন, জীবনানন্দ তাকেই এক আশ্চর্য শিল্প কৌশলে বাঙালির গীতিপ্রবণ কথকতারীতির কাছে নিয়ে আসেন। ফলে রূপসী বাংলার পরাবাস্তব উপাদানগুলি গৌণতায় ঢাকা পড়ে কবির ভূমি ভাবনাকে গণমানুষের ভাবনার সমীপবর্তী করে তুলে। সে ভাবনা এক চেনাভুবনের মধ্যে অচিহ্নিতকে খুঁজে নেয়।

সমগ্র রূপসী বাংলার কবিতাগুলি পরস্পর অন্বয়াবদ্ধ। ফলে এ সকল কবিতার শিরোনামের প্রয়োজন হয় না। শুরুর কবিতাটিতে যেখানে কবি বাংলার চিরায়ত রূপের নৈসর্গিকতাকে দেখেছেন অবিনশ্বররূপে—বিপরীতে এক আশ্চর্য সত্যকে আবিষ্কার করেন, প্রাচীন সভ্যতার নশ্বরতায়। সেখান থেকে মৃত্যুলীন ভাবনার শেষ পংক্তিটি পর্যন্ত—একই অনুভূতির অখণ্ড বিস্তার। 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলির পারম্পর্য এমনই যে, কোনো একটি কবিতা শুরু, শেষ বা মধ্য ও অন্ত্যের জন্য অনিবার্য নয়। আবার সব মিলিয়ে পরস্পর সম্পর্কে অনিবার্যও বটে। এই কাব্যের মুক্তাবলীর মালা তাঁর মৃত্তিকালীন শঙ্খমালার কণ্ঠের—এরকম চিত্রকল্প মনে আসতেও পারে।

শুরুর কবিতাটিতে কবি দ্রুত নিঃশেষিত হবেন এই ভাবনা দিয়ে শুরু। কিন্তু বাঙালি জীবনের চিরায়ত নিসর্গের প্রবাহ কবির অন্তর্ধানের অন্তে থেমে থাকবে না। থেমে থাকবে না ভাবনাটার একান্ত ব্যক্তিগত বেদনার বিষয় হয়ে থাকে না, যখন দেখি কবির বেদনা আরও বিশাল এক সত্যকে খুঁজে নিয়েছে —

> চারিদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব ;
> খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ;
> পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল ; —
> এশিরিয়া ধুলো আজ বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

এই পদটি এক শান্ত-বেদনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। কিন্তু বাংলার রূপের চিরবহমানতা অকস্মাৎ বিশ্ব অভিজ্ঞতায় ব্যাপ্ত বলে পাঠক এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের পদটি অবিরল ও গীতল চিত্রকল্পে পূর্ণ। কবি বাংলার নিসর্গের সাধারণ বিষয়গুলোকে এমন এক সংবেদনায় উপস্থাপন করেন যাতে ঐ অনুষঙ্গগুলি কবিদৃষ্টির আলোতে নতুনতর তাৎপর্য অর্জন করে। শীতের প্রারম্ভিক চিত্র—কাঁঠাল পাতা ঝরছে, শালিকের হলুদ পা, ঘন সন্ধ্যায় একটি মেয়েলি হাত, শঙ্খের চুড়ি পরা, সেখানে শঙ্খের আহবান। সে ডাকছে শাদা হাঁসটিকে। আর হাঁসটি রূপকথার দেশের। বাঙালির গল্প কথকতা হাঁসটির গায়ে লেগে আছে। তারপর উধাও হয় এই চিত্র। কিন্তু বাংলার কূলে এই লুপ্ত চিত্র থেকেই যায়। এই থাকাটাও আমাদের নিসর্গের অক্ষয় প্রবাহকে নির্দিষ্ট করে।

জীবনানন্দের দ্রোহ—শান্ত রসের মধ্যে সমাহিত। ঐ রসটুকু আস্বাদিত হবার পর—বাংলা ভূমি সম্পর্কে পাঠকের এক তীক্ষ্ণ বোধ জাগ্রত হয়। সেই বোধ সমকালের উপনিবেশিক শিল্পরীতির দৃষ্টিসঞ্জাত জীবনভূমিকে অগ্রাহ্য করতে শেখে। সেই বোধ খুঁজে নেয় বেহুলার পায়ের নূপুরের গুঞ্জরণে বাংলার নদী, মাঠ, ভাটফুলের কান্না, আকাশের নীল অপরাজিতার গাঢ়তর রঙে রাঙা।

রূপসী বাংলার পঞ্চম পদটি সমকালীন মন্বন্তরের ভেতর দিয়ে বাংলার চিরায়ত আত্মার অনুসন্ধান বিষয়ে।

একদা যে নদীর ঘাটে রূপসীরা আসত তারা মৃত। সেখানে স্থবির নদী পচা পাটের গন্ধে ঠাসা। সময় এক অনিবার্য চিতা সাজিয়ে রেখেছে অগ্নিদাহের নিমিত্ত—কিন্তু

> বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ
> চেয়ে রবে ; ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে
> শোনাবে লক্ষ্মীর গল্প—ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে ;
> চারিদিকে বাংলার ধানী শাড়ী–শাদা শাঁখা–বাংলার ঘাস
> আকন্দ বাসকলতা ঘেরা এক নীল মঠ—আপনার মনে
> ভাঙিতেছে ধীরে ধীরে ; চারিদিকে এই সব আশ্চর্য উচ্ছ্বাস—

রবীন্দ্রনাথের ভুবন দর্শনের এ এক লোকায়ত অথচ আধুনিক বিস্তার। যেখানে শূন্যকে পূর্ণ করে দেয় নিসর্গ নিজস্ব নিয়মে। কিন্তু এখানে সেই সকল অতীত বেদনার উপর বর্ষিত হবে শ্রাবণ ধারা। আকন্দ আর বাসকলতা পরিবেষ্টিত এক নীলবর্ণ—মঠ এই বাংলা।

'রূপসী বাংলা'য় ইতিহাস, পুরাণ, লোককথার নানা চরিত্র ও প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে। কেন আসে? জীবনানন্দের সমকালীন বাংলা কবিতা ভূমিসংলগ্ন প্রাকৃত প্রসঙ্গকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছে। তাঁর বিষয়, শব্দ, উপমা বাংলা ভাষীদের ভাবনালোকের বাইরে। উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের পাশ্চাত্যপুরাণ কিংবা অন্য প্রসঙ্গ যেভাবে এসেছে তা এক অর্থে উপনিবেশীয় প্রবণতা। তা না হলে সেখানে স্প্যানিশ বা মেসো—অ্যামেরিকান পুরাণ একেবারে অনুপস্থিত কেন। জীবনানন্দ দাশ 'রূপসী বাংলা'য় এসে তাঁর চিত্রমালা আবহ, প্রতীক, উপমা, রূপকতা, পুরাণ প্রায় সব কিছুই সংগ্রহ করলেন এই ভূমি থেকে। ভাষা ভঙ্গিতে পূর্বাঞ্চলের মান্যবাংলার আভাস—নাগরিক জীবন থেকে দূরে। কিন্তু প্রত্যক্ষণ, সমীকরণ—শৈলী চূড়ান্তরূপে আধুনিক। এতটা বোধ করি যে, সমকালে বিষ্ণু দে ব্যতীত অন্য কবির ক্ষেত্রে তা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

জীবনানন্দ দাশের কাব্য কৌশলের অভিজ্ঞতায় পৌছাবার চেষ্টা করলে দেখা যায় তিনি চিত্রকল্পের ঘনসন্ধিটুকু মাত্র স্পর্শ করেন এবং তার চূড়ান্তরূপটি অন্য একটি চিত্রকল্পে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যাস করে দেন, এর ফলে চিত্রকল্প—ঠিক চিত্রকল্পের স্থান থেকে মন্ত্রোচ্চারণের দিকে চলে যায়। এবং রূপসী বাংলা'র কোনো কোনো পদের অন্তিমে কবির বক্তব্য একটা অসমাপ্ত প্রবাহে মিশে গেছে। পদরচনার এই ভঙ্গি শুধু ভাবের দিক থেকে নয় তার প্রবহমানতা দিয়ে পরবর্তী পদকেও স্পর্শ করে।

এই কাব্যকে কাব্যকথকতা বলার একটা যুক্তিও এটা। জীবনানন্দ দাশের কাব্য কৌশলের সবটাই পাশ্চাত্যমুখী নয়, ইতিহাস সচেতন পাঠক এই পদগুলির গঠন কৌশলে চর্যাপদের শব্দ ও বাক্যের অস্পষ্টতাকে স্মরণে আনলে ঠকবেন না।

নবম সংখ্যক পদে দেখতে পাই কবির স্বভূগোল প্রীতি জীবন ও মৃত্যুকে চোখে রেখে বুকে তুলেছেন 'বাংলার ঘাস'। ইতিহাসের ক্ষুরধ্বনি শুনতে পান কবি, বাঙালি রূপকথার সুন্দরীদের দেহের সুগন্ধ পান মৃত্তিকার অভ্যন্তর থেকে। প্রকৃতির এক মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা আমাদের নিয়ে যায় অভাবিত দৃশ্যের জগতে —

> শাদা স্তন ঝরে
> করবীর : কোন এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল,
> তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে : নরম ব্যাকুল।

'রূপসী বাংলা'য় কবি আমিত্বকে মৃত্যুতে লীন করে দিয়ে বাংলা ভূমিকে দেখেন। ফলে এ কাব্যে বৌদ্ধ সহজিয়া শূন্য সাধন পদ্ধতির দর্শনজাত। অর্থাৎ কবির রূপকল্প দর্শনে ঈশ্বর ভাবনা নেই বরং প্রকৃতি সংলগ্নতা তাঁকে অ্যানিমিস্ট করে তোলে। রূপসী বাংলার রূপ দর্শন তাই বাঙালির দর্শনসঞ্জাত।

এ কাব্যের প্রায় সকল কবিতা কবির মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যু-উত্তর বাংলার রূপ দর্শনের আবেগ থেকে উৎসারিত। এই দেখার বিষয়টি শিল্প কৌশল হিসেবেও অভাবিত। কবি ঘাসে, মৃত্তিকায় লীন কিন্তু বাঙালি জীবনের সহজ অনুষঙ্গগুলি চির বহমান। মৃত্যুর ওপার থেকে তাঁর দেখার আনন্দ, বেদনা পাঠককে নিবিষ্ট করে ফেলে। রবীন্দ্রনাথে এই অনুভূতি আরও ব্যাপ্ত ও মহাজাগতিক হয়ে এসেছে। যেমন, সে গানটি, যেখানে কবি বিশ্বাধিপতির কাছে বর মাগছেন মৃত্যু-উত্তর জাগরণ যেন হয় সঙ্গীতের সুরে। জীবনানন্দ আরও ভূমিজ, ক্রোড়লগ্ন।

অ্যানিমিস্টের দৃষ্টি বাঙালির নিজস্ব ধারার দর্শন, রূপসী বাংলায় তা পূর্ণ মাত্রায় আছে। তা না হলে এ কাব্যে বাংলার প্রকৃতি এত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক স্পন্দনশীল অখণ্ডতা লাভ করলো কি ভাবে? মেঘ, নদী, গুল্ম, ঘাস, নীলাভ্র সব কিছুই যেন এ কাব্যে রসগন্ধময়। প্রাণের আবেগে এ সকল প্রসঙ্গ যেন সজীব, একত্রলীন।

রূপসী বাংলার দ্রোহ সূত্র আবিষ্কারে বাঙালির রূপান্তরবাদ ও সর্বপ্রাণবাদী ভাবনা খুঁজে দেখা উচিত। এজন্য যে, এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আমার বাংলা কাব্য ধারায় এই চিন্ময় কবিকে দেখতে পাব, যিনি শিল্পভূমি অন্বেষণে উপনিবেশীয় উচ্ছবৃত্তির পরিবর্তে বেছে নিয়েছিলেন বাঙালির ভূখণ্ড, বাঙালির নিজস্ব দর্শন।

'রূপসী বাংলা'র সকল পদ পর্যায়ক্রমে আলোচনার নিমিত্ত নয় বরং কয়েকটি নির্বিচার নির্বাচন থেকে এ কাব্যের কবি ও কাব্যপ্রকৃতি অন্বেষণ এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কাব্যের সর্বশেষ পদটি থেকে সর্বপ্রাণবাদ আর জন্মান্তরবাদের একটি আধুনিক আভাস পাওয়া যেতে পারে —

মৃত্যুর পর কবি ভাবছেন, পৃথিবীর পথে তিনি বেঁচে থাকলে, লক্ষ্মীপেঁচার মুখ দেখতে পেতেন, যাকে জীবৎকালে প্রখর দৃষ্টিতে কখনো দেখেননি। মৃত্যুর ওপার থেকেই প্রশ্ন—

সেই পেচাঁর ডানা কি কুয়াশার তরঙ্গে নেচে উঠে—

সপ্তর্ষি জেগে উঠলে অন্ধকারে গাবের ঘন শাখে নেমে আসে?—এবং সব শেষে কবির মৃত্যু পরবর্তী খোঁজ —

ধানের নরম শিষে—মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে আজো চায়?

আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে রবো কিছুকাল অন্ধকার বিছানার কোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি জীবনানন্দ দাশ : চিত্রশিল্পীর দৃষ্টিতে

কাজী মোজাম্মেল হোসেন

ত্রিশের দশকের বিপন্ন মানবাত্মার মুখচ্ছবি প্রথম ধরা পড়ে আধুনিক যুগের 'কবির কবি', 'মৌলিক কবি', 'শুদ্ধতম কবি', 'নির্জনতার কবি', 'প্রকৃতির কবি', 'চিত্রময়তার কবি', 'বর্ণবিভার কবি', 'ধ্বনি-শিল্পীর কবি'—জীবনানন্দের কবিতায়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ পূর্ণ হলো কবির জন্মোত্তর শতবর্ষ। একজন সৃজনশীল কবি যখন শতবর্ষ অতিক্রম করেন, পাঠক হৃদয়ে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁর সম্মান অবশ্যই প্রাপ্য হয়ে উঠে। ধ্বনি-শিল্পী, বর্ণশিল্পী জীবনানন্দ দাশ আজ তাঁর প্রাপ্য সম্মানে অধিষ্ঠিত। তিনি বাঙালি জাতির গৌরব, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন দিক-নির্দেশক কবি।

স্বকালে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) কবি হিসেবে সামান্য পরিচিতি লাভ করলেও খ্যাতি পাননি, পাননি যথাযোগ্য সম্মান। জীবনানন্দ কেবল কবিই নন, তিনি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, রোজনামচা, চিঠিপত্র লেখাসহ আত্মজীবনীও লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ বাইশ বছরের লেখা, যথাসময়ে আলোর মুখ না দেখার কারণে, জীবনানন্দ দাশ আমাদের কাছে ছিলেন এক অপরিচিত কবি-ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধদেব বসুই জীবনানন্দকে লোকচক্ষুর আড়াল থেকে টেনে এনে কবি হিসেবে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি ক্ষোভে উচ্চারণ করেন, "আধুনিক বাংলা কাব্য সম্বন্ধে কোন আলোচনাতেই জীবনানন্দের উল্লেখ এ পর্যন্ত দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব লোকচক্ষু থেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন, এছাড়া এই অন্যায়ের আর কোন কারণ আছে কিনা জানিনা।"

আশির দশক থেকে জীবনানন্দ দাশের নব উন্মেষ ঘটতে থাকে। বর্তমানে জীবনানন্দ দাশ আর শুধুমাত্র কবি নন। তাঁর সতীর্থ সহযোগী বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তসহ আরো অনেকের মতো তিনি আজ একই সঙ্গে কবি ও কথাশিল্পী এবং প্রাবন্ধিক। তাঁর কবিতা এবং কথকতা পরস্পর পরিপূরক। এ দু'য়ের সম্মিলন এবং সমীকরণে পাওয়া যাবে জীবনানন্দের সামগ্রিক মানসলোকের অবয়ব।

কবির সাহিত্যচর্চার সময়কাল যেমন একদিকে ছিল কল্লোল যুগের আবহলোকে তৈরি, তেমনি ছিল মার্কসীয় যুদ্ধস্পৃষ্ট প্রতিবেশ তাড়িত। এ দু'য়ের কোনো স্রোতেই জীবনানন্দ দাশ নিমজ্জিত হননি। কবিমননে এর সামান্য ছোঁয়াটুকুও লাগতে দেননি। তিনি নিমজ্জিত হয়েছেন মহানক্ষত্রলোকের ইশারায় এবং প্রয়োজনীয় ইতিহাস সন্ধানে। এখান থেকেই কবি তাঁর জীবন, জগত, সমাজ, সময়, সভ্যতা সম্পর্কে দিব্যজ্ঞান আহরণের চেষ্টা করেছেন। তৈরি করেছেন ইন্দ্রিয়নির্ভর, কল্পনাপ্রবণ, ভাবপ্রবণ, সংবেদনশীল কবিমানস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা সাহিত্যের পালাবদলে কবি জীবনানন্দের অবদান স্মরণযোগ্য। বাংলা কবিতার ধমনীতে নতুন রক্ত প্রবাহের একমাত্র কৃতিত্বের দাবিদারও জীবনানন্দ দাশ। উত্তর-রৈবীক যুগের অন্যতম কবি হিসেবেও তাঁর নাম আজ সর্বাগ্রে। আধুনিক বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্র প্রভাব থেকে স্বতন্ত্র গতিপথ খুঁজতে সাহায্য করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যারা প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন জীবনানন্দ দাশ তাদের অন্যতম কবি, 'সৎ কবি', 'শুদ্ধতম কবি'। বর্তমান কবিকুলে জীবনানন্দই একমাত্র মৃত্যুহীন পুরোধা, যার কবিতার 'ব্যঞ্জনার হীরক' সাত আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতার সুন্দর এক বিবরণ মেলে বুদ্ধদেব বসুর উচ্চারণে এভাবে, "সত্যেন্দ্র দত্তীয় ঝঙ্কার থেকে এ অনেক দূরে ; অতি পুরানো কল্পনা এখানে যেন একটি অপূর্বরূপ পেয়েছে। তার কারণ ছন্দের নবত্ব, ধ্বনির বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি লাইনে সম্পূর্ণ একটি ছবি পেলুম ; এ ছবি রচনায় যে কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়েছে, তা এই কবির নিজস্ব সৃষ্টি। বস্তুত, এখানে জীবনানন্দের মৌলিক সৃষ্টি প্রেরণারই পরিচয় পাওয়া যায়, পড়তে পড়তে মনে হয় একজন নতুন কবির বুঝি দেখা পেলাম" (কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু/জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি ; পৃ. ২৭)।

জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতিলোক থেকে উপকরণ নিয়ে যেমনি তাঁর ইন্দ্রিয় সংবেদনশীলতার, স্পর্শকাতরতার, শ্রুতিচেতনার স্বাদসহ শরীর চেতনার স্বাদকে রসঘন এবং আস্বাদযোগ্য করে আমাদের চোখের সামনে উপস্থাপন করে, তা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করাতে যেমনি সক্ষম হয়েছেন, তাতে প্রমাণিত হয় তিনি 'কবির কবি', 'সার্থক কবি'। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাইবা কেন, তাঁর অতি সাধারণ কবিতার মধ্যেও রয়েছে কবির আত্মপ্রতিচ্ছবি, আত্মপরিচয়, দৃঢ়সংকল্পসহ আতঙ্কের ছাপ, প্রেম-প্রকৃতির সম্ভোগ আস্বাদনসহ অসংখ্য কবিমানসের প্রতিচ্ছবি। তবে উল্লেখ্য, কবির কবিতার 'আমি' কখনোই 'ব্যক্তি আমি' নয়। তাঁর কবিতায় কবিকে ব্যক্তিগতভাবে ছোঁবার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বিশেষভাবে 'প্রতীকী যানের' কবি। তাঁর কবিতায় যেমনি রয়েছে বাস্তবতার ছবি, তেমনি রয়েছে 'প্রতীকী', 'সুরিয়ালিষ্টিক', 'সুপার রিয়ালিষ্টিকের' ছাপ। কবির ভাষায়, 'বস্তুর অন্তঃসারকে ছুঁতে পারলেই' 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়র মুকুরের ভিতর বাস্তবকে' ফলিয়ে দেখানো যায়, তখন 'বাস্তব বাস্তবই থেকে যায় না', প্রকৃতি তখন আর প্রকৃতির অনুলিপি নয়" (জীবনানন্দ জিজ্ঞাসা, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ১)।

জীবনানন্দের কবিমানস ছিল অত্যন্ত গহীন-জটিল, অতিসতর্ক, বিদগ্ধ পাঠকের কাছেও তিনি ছিলেন পলাতক। ফলে সমকালীন কবিদের তুলনায় তাঁর জনপ্রিয়তা তখন তেমন ছিল না বলা যায়। ভক্ত তৈরিতেও তিনি তখন ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর একমাত্র কারণ ছিল তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা। একথা সত্য, জীবনানন্দের ধূসর মনন, ব্যর্থ মানসিকতার গহীন, জটিল মানসে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিলেন 'নাটোরের বনলতা সেন'। তিনিই কবির কবিতায় গতির সঞ্চার করে 'ট্রাজিক কবিকে' প্রেমের কবিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করেন। কবির কবিতার বর্ণ-ছন্দ, রূপ-লাবণ্য, চিত্রকল্প, বর্ণসচেতনতা, সবকিছুর পেছনে যাঁর আকৃত্রিম অবদান, তিনি সেই 'নাটোরের বনলতা সেন'।

বিচারকার্যের দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে বিচারকের উপর। কবি-সাহিত্যিকদের গুণ-মান বিচারের দায়িত্ব কবি সমালোচকদের উপর। আমি এ থেকে অনেক দূরে, একজন চিত্রশিল্পী মাত্র। জীবনানন্দের কবিতা পাঠে আমার হৃদয়ে যেসব বর্ণবিভা, আবেগ, চিত্রকল্প আমাকে তাড়া দেয়, তার প্রকাশ ধৃষ্টতা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কাব্যে যত বিচিত্র বর্ণ-চিত্র রয়েছে, তাতে স্পষ্ট উচ্চারণ করা যায় তিনি একজন 'রঙ-রেখার চিত্রকর', 'শিল্পীর শিল্পী', 'সৎ শিল্পী' এবং 'শ্রেষ্ঠ শিল্পী'। কবিতার বিচিত্র চিত্রকল্পসহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় স্তরের রঙ মিশ্রণে হাজারো বর্ণবিভার অদ্ভুত এবং বিপুল সম্ভার, একমাত্র জীবনানন্দের কবিতা ব্যতীত অন্যকোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, জীবনানন্দই ছিলেন কবিকুলের একমাত্র বর্ণীল এবং বর্ণবিভার কবি।

কবিতা একটা শব্দময় দেহ, শব্দের ছন্দিত বিন্যাসই কবিতা। ছন্দবদ্ধ ধ্বনির মাধ্যমে কবি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ফুটিয়ে তুলে কবিতার জন্ম দেন। কবিতাকে শব্দহীন জীবন্ত ছবিও বলা যেতে পারে। কবি-শিল্পীর হৃদয়ের ভাষা এক, আপন ভাবকল্পনা প্রকাশ। উপকরণ ভিন্ন, শিল্পী রঙ-তুলির মাধ্যমে রঙ-রেখায় তার রূপলাবণ্য ফুটিয়ে তোলেন। একইভাবে, কবি তাঁর ভাব-ভাষা এবং ছন্দের মাধ্যমে কবিতার জন্ম দেয়। সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায় চিত্রকল্প সৃষ্টির সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় এভাবে, "রং-এর প্রয়োগ এবং রেখার কৌশলে একজন শিক্ষিত শিল্পী একটি সুনিশ্চিত গ্রাহ্যের মধ্যে একটি ছবিকে আনতে পারেন এবং একটি শিল্প-প্রশংসার অধিগম্যতায় তাকে পরিস্ফুট করতে পারেন" (শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্য : সৈয়দ আলী আহসান, পৃ. ১০৪)।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্প সৃষ্টির গূঢ় রহস্য উচ্চারণ করেছেন এভাবে, "বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান এই দুই ভাষার উত্থান-পতনের গতি ধরে চলছে মানুষের মনের সঙ্গে মানুষের মানস-কল্পনার প্রকাশগুলি। অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের মধ্যে ধরে দিচ্ছে মানুষ, অন্তরকে আনছে বাইরে, বাইরকে নিয়ে চলছে অন্তরে—এই হল শিল্প রচনার মূল কথা। শিল্প এলো সামনে, পিছনে লুকিয়ে রইল শিল্পী—এই হল শিল্পের সঠিক লক্ষণ।" (বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১০৪)।

বর্ণীল শিল্পী জীবনানন্দের শিল্পমানসে এ সত্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিয়মান। তাঁর কবিতা শুধু প্রকৃতি বর্ণনায় ভরপুর নয়, অক্ষরে অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণলিপি কবির অন্তরাত্মার সাথে অলীক বা অলৌকিক সেতু দিয়ে বেঁধে রেখেছে—কবিতার গাঁথুনিতে। জীবনানন্দের কাব্যরসে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দকে লেখা একপত্রে জানিয়েছেন, "তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় আছে রস, স্বকীয়তা এবং আছে তাকিয়ে দেখার আনন্দ।" (জীবনানন্দের পত্রাবলী, পত্র নং-২, পৃ. ১১৩, সংকলনে—দীপেন কুমার রায়)।

চিত্রকল্প সৃষ্টির অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। কবির কবিতার দেহই তৈরি হয়েছে ইন্দ্রিয় সংবেদনশীল চিত্রকল্প দিয়ে। 'পয়েটিক ইমেজ'-এর বাংলা রূপ 'বাণীচিত্র', বাংলা পরিভাষায় 'চিত্রকল্প' হিসেবে তা গ্রহণীয়। "ইংরেজি Image শব্দের প্রতিশব্দ 'চিত্রকল্প' শব্দটির উদ্ভাবক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ড. অমলেন্দু বসু 'বাক্‌প্রতিমা', ড. সুশীল কুমার গুপ্ত 'ভাবরূপচিত্র' এবং শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'মানসপ্রতিবিম্ব' অভিধায় Image-কে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন" (কবিতায় চিত্রকল্প কবি জীবনানন্দ দাশ, ড. শ্যামলকুমার ঘোষ, পৃ. ২)।

চিত্রকল্প কবিতার প্রাণ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। "চেতনার অনুসঙ্গে চিত্রকল্প জন্মলাভ করে, আবার চিত্রকল্পের প্রান্তরে চৈতন্য মূর্তিময় হয়" (কবিতায় চিত্রকল্প, ড. শ্যামলকুমার ঘোষ, লেখক নিবেদন)। কাব্যচেতনার সাথে চিত্রকল্পের থাকে আত্মিক যোগ। জীবনানন্দের কবিতার প্রতি দৃষ্টি দিলে সন্ধান মেলে হাজারো চিত্রকল্প, যেখানে খোঁজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলবে কবি এবং তাঁর বিচিত্র অনুভূতি। উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করানো যায়, "দুপুর রাতে ও কার আওয়াজ/গান কে গাহে,—গান না/কপোত বন্ধু ঘুমিয়ে আছে/নিঝুম ঝিঁঝির বুকের কাছে/অস্ত চাঁদের আলোর তলে/এ কার তবে কান্না", (ছায়াপ্রিয়া)। চিত্রকল্পের ছবিগুলো বস্তুর হুবহু 'পোট্রেট' রূপান্তরিত হওয়ায়, বস্তুর রূপ 'রঙ' ধ্বনি যথাযথ অনুকরণ করেই তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। বস্তুরূপের যে একটা নিজস্ব গৌরব আছে, তার কোনো ইঙ্গিত এ শব্দচিত্রে পাওয়া যায় না। বিপরীতে, বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের 'দুজন' কবিতায়, "চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে/হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালী ডানা হয়েছে খয়েরী ; ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে ; —চিলের সোনালী ডানা হয়েছে খয়েরী/হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে/ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে" উচ্চারণে, কবির শব্দচিত্রে রয়েছে জীবন-সত্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা। চিত্রকল্পে কবির ইন্দ্রিয়সংবেদন অভিজ্ঞতার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত ধরা পড়ে। চিত্রকল্পের এ আবেদন, অতি অল্প সময়ে পাঠকের ইন্দ্রিয়কে নাড়া না দিয়ে পারেনা। সুতরাং বিশুদ্ধ চিত্রকল্প আমরা তাকেই বলব, যা পাঠক-দর্শকের ইন্দ্রিয়কে নাড়া দিতে সক্ষম।

জীবনানন্দের কবিতায় রয়েছে অদ্ভুত বর্ণবিভার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। তাঁর কবিতা পাঠে আমাদের আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, রঙ দিয়ে তাঁর কবিমানসকে সাজিয়েছেন, না কবিমানসকে রঙের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর কাব্যভাবনা এবং বর্ণচেতনা পরস্পর পরিপূরক। তাঁর বর্ণরা বৈশিষ্ট্যময় এবং প্রতিভাময় যাকে বলা যায় নিস্পৃহ সুন্দর। সমাজ-সভ্যতা এবং সময়জাত বিবিধ সংকট থেকে মুক্তির উদ্দেশ্য, জীবনানন্দ প্রকৃতির আশ্রয়ে যে সকল দৃশ্যকল্প অঙ্কন করেছেন, সেখানে রঙের ভূমিকাই প্রধান। তাঁর রঙ যত না দৃশ্যগত, তারচেয়ে অনেক বেশি অনুভবগত। কবির উক্তি একটু ঘুরিয়ে প্রতিধ্বনিত করা যায়, "সকলেই শিল্পী নয়, কেউ কেউ 'শিল্পী', 'শুদ্ধতম শিল্পী', 'বিশুদ্ধতম শিল্পী', 'শিল্পীর শিল্পী'।" জীবনানন্দ একজন বিশুদ্ধতম শিল্পী, শিল্পীর শিল্পী।

জন্মশতবার্ষিকীতে অনেকেই আজ কবি জীবনানন্দ দাশকে নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। আমার দৃষ্টিতে আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ একমাত্র সার্থক বর্ণসচেতন কবি। কবিতায় রঙ ফলাতে তাঁর মতো সিদ্ধহস্ত শতবর্ষেও আবিষ্কৃত হয়নি। বিংশ শতকের সমান্তরাল চেতনা বিস্তারে স্বকীয় এবং আধুনিক মনবিশ্লেষণে জীবনানন্দ দাশ মাটি, পৃথিবী এবং মানব সংস্কারের ঘনিষ্ঠ এক সার্থক চিত্রকর। "হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভেতরে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা" নিয়ে কবি ইতিহাসের অভিনব বর্ণ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর বিশাল ক্যানভাসে তেল রঙের তুলির পরশে, প্রকৃতির নিখুঁত চিত্রকল্প, শ্রুতিচেতনা, স্পর্শচেতনা, স্বাদচেতনা, ঘ্রাণচেতনাসহ নির্জনতা, সুদৃঢ়তার সন্ধ্যাকালীন নীরবতা, আলো-অন্ধকারের বিচিত্র লীলাখেলা, প্রেমচেতনাসহ অসংখ্য চেতনাকে রঙ-রেখায় অমর করে ধরে রের্খেছেন। উদারহণ হিসেবে কবির 'ঘাস' কবিতার অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হলো, "কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয়/পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলায় ; কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস— তেমনি সুঘ্রাণ/হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।" কবি ঘাসকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে তার মধ্যে পুনর্জন্মের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, করেছেন জীবনভর তারুণ্যতা লাভের।

জীবনানন্দের কাব্যবিচারে অনেক সমালোচক তাকে অন্ধকারের কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত তিনি অন্ধকারের কবি নন। জীবনানন্দ নিজেও এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি "তিমির বিলাসী, তিমির বিনাশী নন।" কবি অন্ধকার-চেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, দেখিয়েছেন অন্ধকারের বিবিধ রূপ এবং উৎস—মানব সত্তার অন্ধকার, বিশ্ব রহস্যের অন্ধকার, অজ্ঞতার অন্ধকার, নির্জন মনের অন্ধকার, অন্ধ ইতিহাস শক্তির অন্ধকার, মানব সমাজের ধ্বংসাত্মক শক্তির অন্ধকার। আশার কথা, কবি এ অন্ধকার থেকে উত্তরণের কথাও বলেছেন তাঁর কবিতায়। আলোকমন্ত্র আবিষ্কারের প্রচেষ্টাও ছিল কবির লেখায়। সাফল্য তেমন আসেনি, আলোকের সুনিশ্চিত সন্ধান তিনি পাননি। আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব তাঁর চিত্রকল্পের সর্বত্রই দেখা যায়। শেষাধ্যায়ে কবির কবিতায় আলোক উত্তরণের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠলেও তিনি সে আলোর সুধা পান করে যেতে পারেননি। তিনি "আলোর চুম্বনে পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর কমিয়ে দিয়েছেন", "নীল আকাশের স্বাদ সচ্ছলতা এনে দিয়ে পৃথিবীর ক্ষুধিত গহ্বর ভরে দিয়েছেন" ঠিক, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সচ্ছলতা কখনো আসেনি।

দর্শন প্রক্রিয়ায় রঙ সবচেয়ে আবেগময় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। মানসিক অনুভূতি প্রকাশে রঙ একটি অসাধারণ প্রকাশক্ষম শিল্প উপকরণ হিসেবে চিত্রকলায় আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পীর আবেগ, অনুভূতি এবং ধারণাকে চিত্রগত, রসগত করে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে রঙ একটি প্রচণ্ড, তীক্ষ্ণ এবং শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। প্রকাশধর্মী চিত্রকলায় আঁকিয়েরা আজকাল কেবল রঙ ব্যবহার করে তাদের সবধরনের অনুভূতি প্রকাশ করছেন। জীবনানন্দের কবিতায় রঙ ব্যবহারে তাঁর সাধাররণ চিত্রকল্প কেন, রূপকাত্মক চিত্রকল্প, সাংকেতিক চিত্রকল্পও অপরূপ হয়ে আমাদের কাছে ধরা পড়ছে নতুন আঙ্গিকে। প্রকৃতি আশ্রয়ে তিনি যে সকল চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন, সেখানে রঙের ভূমিকাই প্রধান। কবিতায় ব্যবহৃত তাঁর রঙেরা যত না দৃশ্যগত, তারচেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল-অনুভবগত।

বস্তু-পৃথিবীর মুখোমুখী হওয়া, চতুর্দিকের দেশকাল-যুদ্ধ, বিভিষীকা, অবক্ষয়, বঞ্চনা, সংশয়, বিকৃতির সাথে সহঅবস্থানের অপরিহার্যতা, জীবনানন্দের চিত্তে এনে দিয়েছিল ক্লান্তি, গ্লানি, একথা সবার জানা। সমাজ-সভ্যতা এবং সময়জাত, ঐ বিবিধ সংকট থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে জীবনানন্দ প্রতীক এবং প্রকৃতির আশ্রয়ে যে সকল শিল্পকর্ম রচনা করেছেন, সেখানে রঙ অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। কবির চাতুর্যময় বর্ণপ্রলেপে তাঁর কবিতা হয়েছে আরও বেশি হৃদয়গ্রাহী এবং প্রাণবন্ত।

রঙ মনের কথা বলে। অর্থাৎ একজন বর্ণবিশারদ, বর্ণব্যবহার দেখেই ব্যবহারকারীর রুচি, মানসিকতা, পছন্দ-অপছন্দ সবই আঁচ করতে পারেন। একজন চিত্রকর তাঁর ক্যানভাসে, আপন পছন্দের রঙ ব্যবহারে তাঁর মানস-প্রক্রিয়ার স্পষ্ট ছাপ তুলে ধরতে পারেন, যদি তাঁর জানা থাকে কোন রঙ কিভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম।

জীবনানন্দের কবিতার রঙ খোঁজার প্রথমে চিত্রকলায় কোন্ রঙ কিভাবে প্রকাশ করে থাকে তার তালিকা এভাবে উপস্থাপন করা যায়। সাদা—সাধারণত পবিত্রতার রঙ। পূর্ণতা অথবা বার্ধক্যের ভাব প্রকাশেও সাদা রঙ ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; কালো—শোক, বিষাদ, বিষণ্ণতার ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয় । ধূসর—মলিনতা, দুশ্চিন্তা, বিষাদ, মৃত্যু ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া প্রকাশে ব্যবহৃত হয় । তেমনি লাল (রক্ত লাল)—উত্তেজনা, বিপ্লব, বিদ্রোহ ; সিঁদুরে লাল—ভালোবাসার প্রতীক ; কমলা—তাপ, গৌরব, শরতের প্রাচুর্য, আনন্দ ; বেগুণী—রাজচিহ্ন, অভিজাত্য ; উজ্জ্বল হলুদ—আনন্দ, উৎফুল্লতা ; মলিন হলুদ—বিষণ্ণতা, মৃত্যু, শোক ; হাল্কা সবুজ—তারুণ্য ; গাঢ় সবুজ—অহঙ্কার ; হাল্কা নীল—উদাস, প্রসন্নতা ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঢ় নীল—বিবাদ, অধৈর্য্যের ভাব প্রকাশ করে। প্রাথমিক রঙ লাল, নীল, হলুদ-এ রঙের উজ্জ্বলতা বেশি। বিপরীতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের রঙ যা একে অপরের সংমিশ্রণে তৈরি হয়। সেগুলো পরস্পর মিশ্রণের ফলে উজ্জ্বলতা হারায় বটে, তবে মিষ্টতা বাড়ে। বাড়ে রঙের মোহনীয় ক্ষমতা।

বর্ণসচেতন কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়লেই চোখে ধরা পড়বে বিচিত্র বর্ণ এবং তার আভা। আলো-অন্ধকারের সন্ধানী কবি হিসেবে জীবনানন্দ খ্যাত। কবির কবিতায় আলো-অন্ধকারের খেলা অপূর্ব। বহু কবিতায় কবি এ শব্দ দুটো ব্যবহার করে তাঁর কবিমানস তৃপ্ত করেছেন। তাঁর মতে, আলো-আঁধারের রচনার জন্য প্রয়োজন হয় 'মুডস'-এর। কবির ভাষায়, "আমার মনে হয় বিভিন্ন রকমের বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময় নানারকম 'মুডস' খেলা করে। সে 'মুড'গুলোর প্রভাবে মানুষ কখনো মৃত্যুকেই বন্ধু বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরেই মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভেতরেই বীণার-তার বাঁধবার ভরসা রাখে। যে জিনিস তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে অপরের চোখে হয়তো তা নিতান্তই নগণ্য। তবু তাতেই তার প্রাণে সুরের আগুন লাগে,—সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়" (রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দের পত্র-৩, পৌষ, ১৩৩৭[?])।

কবি তাঁর অসংখ্য কবিতায় কখনো উপমায়, কখনো প্রসঙ্গত, কখনো এমনিতে নানা রঙ বা বর্ণের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে—সাদা, ধবল, শঙ্খ, কড়ি, ক্ষীরের রঙসহ কালো, ছিটকালো, লাল, গোলাপি, আলতা, নীল, নীলাভ, হলুদ, মলিন হলুদ, পাণ্ডুর, সবুজ, জাফরানি, খয়েরি, বেগুণি, বাদামি, পাটকিলে, কমলা, মেরুন, সোনালী, রূপালী, ধূসর, ফ্যাকাশে ইত্যাদি রঙের ব্যবহার। প্রতীকী রঙের ব্যবহার জীবনানন্দের কবিতায় প্রচুর। 'ঘাস'কে কবি তাঁর বহু কাব্যে বহুবার, নানা মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। কবি বর্ণীল কবি হলেও, তাঁর বর্ণরা পাঠকের চোখে অতি সহজে ধরা দেয় না। তাঁর রঙেরা যত না দৃশ্যগত, তারচেয়ে বেশি অনুভবগত।

একইভাবে কবি 'ধূসর' এবং 'হেমন্ত' শব্দ দুটো বারবার তাঁর কবিতায় এনেছেন। জীবনানন্দের কবিতায় ধূসরের আধিক্য দেখে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগে' গ্রন্থে জীবনানন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "তীব্র আলো, স্পষ্ট বাক্য বা প্রখর রাগরঞ্জন—এসবের মধ্যে (জীবনানন্দ) নেই। সে ধূসরতার কবি, চিরপ্রদোষ দেশের এক বাসিন্দা।"

জীবনানন্দ, "ধূসরতার কবি' সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি আলোর দিশারী, রোমান্টিক কবি।" জীবনানন্দ দাশ মুখ্য ইন্দ্রিয়বোধক কবি, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক"। উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, "ঘুমন্ত রমণীর একটা রূপ ফুটে উঠতে দেখি—/শেষ রাতে পৃথিবীর অন্ধকারে শীতে/তোমার ক্ষীরের মতো মৃদু দেহ—ধূসর চিবুক, বাম হাত/চালতা গাছের পাশে খাড়া ঘরে স্নিগ্ধ হয়ে ঘুমায় নিভৃতে"।

কবির কাব্যে 'হেমন্ত'-এর আধিক্য থাকায় কেউ কেউ তাকে 'হেমন্তের কবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ছয়ঋতুর মধ্যে হেমন্ত ছিল কবির অত্যন্ত প্রিয়। হেমন্তকে কবি কখনো ফসল তোলার মাস হিসেবে লক্ষ্মীর আসনে বসিয়েছেন, আবার ক্ষেতের ধান কাটার ঋতু হিসেবে বিমর্ষ ভাব প্রকাশেও কবি হেমন্তকে ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন যুগে মাস গণনার প্রথম ঋতু ছিল হেমন্ত। সেদিক থেকে হেমন্তের কদর ছিল প্রচুর, বিপরীতে কবিপ্রিয় হেমন্ত "হিম-শিশিরের পাতাঝরার কাল হিসেবেও কবি হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। শস্যশূন্য রিক্ত ফসল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমন্তের ধূসর রূপেও কবি ব্যথিত হয়েছেন। হেমন্তের পাকা ধানের রঙ "ইয়েলো আকার যা বিবর্ণ হলুদ, পাণ্ডুর রঙ—এ" রঙের মধ্যে কবি আনন্দ উল্লাসের পরিবর্তে খুঁজে পেয়েছেন বিষাদ—অসুস্থতার আবেগ। এভাবে হেমন্ত কবিচিত্তকে নাড়া দিয়েছিল বিভিন্ন মাত্রা-লয়ে, বিভিন্ন বর্ণবিভায়।

বর্ণবিভার কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্যে, বর্ণ এবং তার উচ্চারণে অসংখ্য বাস্তব প্রতীকী এবং উপমার রঙ ব্যবহার করে কবিতাকে করেছেন বর্ণময়। রঙ দিয়ে কবিমানসকে প্রতিফলিত করতে গিয়ে, কবি কখন কোন রঙ এবং তার আভা কি ভাব প্রকাশে ব্যক্ত করেছেন তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো। সতর্ক পাঠক, কবির এ রঙগুলো উচ্চারণ মাত্রই আপন-মানসে রঙের যে বিক্রিয়া শুরু হবে, জীবনানন্দ দাশ সেদিকে লক্ষ রেখে জান্তে-অজান্তে এ' রঙগুলো ব্যবহার করে, কবির কবিতাকে করেছেন বর্ণময় এবং আবেগময়।

সাদা

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সাদা রঙের বহুল ব্যবহার রয়েছে। এ' রঙটি কবি কখনো তাঁর কবিতায় সরাসরি ব্যবহার করেছেন, কখনো উপমা আবার কখনো প্রতীকের মাধ্যমে ব্যবহার করেছেন।

চিত্রের ভাষায় 'সাদা' প্রকৃত কোনো রঙ নয়, নিরপেক্ষ রঙের তালিকায় এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। উজ্জ্বল আলোর প্রতিফলন 'সাদা'। চিত্রকরদের মতে, সব রঙের মিশ্রণে মূল রঙের উজ্জ্বলতা হারিয়ে মিশ্রিত রঙ ক্রমান্বয়ে হাল্কা হয়ে প্রায় সাদার কাছাকাছি চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে উজ্জ্বল সাদা কখনো কোনো রঙের মিশ্রণে তৈরি করা যায় না, এ' রঙ প্রকৃতিসৃষ্ট অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

মানসিক প্রক্রিয়ায় সাদা পূর্ণতা, পবিত্রতা, শান্তি, বার্ধক্যের ভাব প্রকাশের সহায়ক রঙ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, পৃথিবীর সকল সুস্থ এবং কল্যাণকামী মানুষ, একবাক্যে সাদা রঙকে যুদ্ধবিরোধী আকাঙ্ক্ষা অথবা শান্তির প্রতীক হিসেবে মেনে নিয়েছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে, শিল্পী 'পিকাসো' রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'শ্বেতকপোত'।

বর্ণিল কবি জীবনানন্দ দাশ, তাঁর কবিতায় 'সাদা' রঙকে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন আভায়, বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশে। তাঁর কবিতায় 'সাদা' যেমনি পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি বার্ধক্য, মৃত্যু,বিষাদ-বিষণ্ণতার প্রতীকী অর্থেও সাদা রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। কবির কবিতার সাদা রঙ বিপরীত ব্যঞ্জনায়, অর্থাৎ রোমান্টিক স্মৃতিচারণেও ব্যবহৃত হয়েছে বহুমাত্রায়।

পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে সাদাকে কবি তাঁর কবিতায় এভাবে ব্যবহার করেছেন, 'শাদা লঘু মেঘ বকের পাখার মতো', 'শাদা কথা', 'শাদা মাথা কড়ির মতো শাদা মুখ', 'শাদা পাখি', 'শাদা প্লেট', 'শাদা শাদা ছানা', 'বিকেল বেলা তার শান্ত শাদা পথ', 'শাদা-বালিরঙা ডানা' ইত্যাদি।

কবি পবিত্রতার ভাব প্রকাশে সাদা'র পরিবর্তে 'ধবল' ব্যবহার করেছেন বহুক্ষেত্রে। 'ধবল আকাশ', 'ধবল ফেনা', 'নরম ধবল তুলি' ইত্যাদি উপমায় ধবল শব্দ সাদা'র প্রতিনিধিত্ব করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণের যাদুকর জীবনানন্দ, পবিত্রতার রঙ সাদা'কে বিষাদ-বিষণ্নতার ভাব প্রকাশে, অত্যন্ত চতুরতার সাথে ব্যবহার করেছেন এভাবে, 'বক বধূটির মতো কুয়াশায় শাদা ডানা উড়ে যায় তার', 'চড়াইয়ের শাদা ডিম মাঠের ভিতর', 'শাদা ছেঁড়া পাল', 'শাদা মাটির কঙ্কাল', 'শাদা থাবা', 'আশেপাশে অহেতুক শাদা মেঘ', 'শাদা পাখিদেরও স্খলন আছে', 'শাদা শাদা ছিটকালো পায়রায়', 'শাদা শাদা যেন কড়ি শঙ্খের পাহাড়', 'সবুজ ঘাস হয়েছে শাদা', 'পাথরের মতো শাদা গায়ে', 'পাহাড়ের মতো শাদা হাত দুষ্টে', 'শাদা হাড়ের মতো', নষ্টশাদা শসা', 'শ্বোদা মরা শেফালী' ইত্যাদি।

রোমান্টিক ভাব প্রকাশে সাদা রঙ কখনো চিত্রিক ব্যবহার করেন না। অথচ জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় 'শাদা', 'ধবল', 'শঙ্খমালা', 'ক্ষীর', 'থোর', 'কড়ি', 'শ্বোদা' প্রভৃতি উপমা এবং প্রতীকী শব্দ ব্যবহারে, অদ্ভুত রোমান্টিক ভাব প্রকাশে পাঠককে নাড়া দিয়েছেন এভাবে, 'ক্ষীরের মতো দেহ', 'শাদা হাতে ধবধবে স্তন', 'শাদা শাদা ধূসর বাতাস', 'শঙ্খের মতো দুধে আর্দ্র', 'আতার হীম ক্ষীর', 'ফুল ফুটে থাকে হিম-শাদা রঙ তার', 'বাসমতি চালে ভেজা শাদা হাতখানি', 'শাদা স্তন ঝরে', 'শাদা শাদা ধূসর বাতাস'সহ অসংখ্য কবিতায় কবি সাদার নানা বর্ণাভা দিয়ে তাঁর রোমান্টিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রকাশেও কবি সাদা রঙ ব্যবহার করেছেন সার্থকতার সাথে এভাবে, 'শাদা তাল শাঁস', 'সমুদ্রের শাদা বকের মতো', 'ধবল কাশবন', 'ধবল ফেনা', 'থোরের মতো শাদা হাত তার', 'বরফের মতো শাদা ডানা দুটি', 'ম্লান শাদা চুল', 'হয়েছে আকাশ ধবল', 'শাদা শাদা ছোট ছোট ঘর নারকেল ক্ষেতের ভিতর', 'খইয়ের মতো মেঘের বৃষ্টি', 'পাথরের মতো শাদা গায়ে', 'হাতির দাঁতের গড়া মূর্তির মতন', 'কড়ির মতন শাদা তার মুখ', 'অরুণ শঙ্খের মতো ছবি', 'দ্রাক্ষা দুধ, ময়ূর শয্যা', পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী', 'শুভ্র মানবিকতার ভোর', 'তোমার পালক শাদা আরো শাদা হয়ে', 'শঙ্খমালার কাঁথা' ইত্যাদি উপমায় সাদাকে কবির ইন্দ্রিয়বেদিতার রঙ হিসেবে খুঁজে পাই।

কালো

চিত্রকলায় কালো কোনো মৌলিক রঙ নয়। আলোর অনুপস্থিতিতে সবকিছু কালো মনে হয়। চিত্রতত্ত্ব মতে কালো নিরপেক্ষ রঙ। প্রাকৃতিক উপাদান অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কালো রঙ তৈরি হয়ে থাকে।

শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি সাধারণত কালো রঙের ব্যবহারে বিষাদ, মলিন বা দুঃখবোধ, ভাবপ্রকাশ করে থাকেন। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর জীবনের শূন্যতাময় স্বপ্নিল অনুভবকে কালো এবং তার বিচিত্র আভা দিয়ে কবির কবিতাকে রাঙিয়ে তুলেছেন এভাবে, 'গভীর হাওয়ার রাত ছিল কালো', 'মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে', 'তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতর', 'কালো মেঘ জমিয়াছে মাঝের আকাশে', 'পরণে ঘাসের শাড়ি—কালো চুল ধান', 'আকন্দ ফুলের কালো ভীমরুল', 'আষাঢ়ের রাতে কালো মেঘ নিঙড়ায়, 'রাতের মেঘের কালো রেখা', 'পড়িতেছে কালো কালো শাখা', 'কালো ডানা মেলে পৃথিবীর দিকে', 'ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো', 'যতদূর চোখ যায় কালো আকাশ', 'মাছিরা কালো মাংস খায়', 'সমুদ্রের কালো আলোড়ন' ইত্যাদি উপমায়, কালো কবির স্বপ্নিল অনুভূতিই প্রকাশ করেছে। 'সরু সরু কালো-কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার', 'কালো পায়রার ওড়াউড়ি', 'কালো দাঁড় কাক' ইত্যাদি উপমায় কবি কালোকে শোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় অনেকক্ষেত্রে 'কালো' সরাসরি ব্যবহার না করে, তার প্রতিশব্দ 'অন্ধকার' ব্যবহার করে কবিমানসের বিষাদভাব বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সফলতার সাথে এভাবে, 'বুকের অন্ধকারের ফিঙ্গার পাখনার মতো', 'অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে', 'আসিয়াছে অন্ধকারে মৃত্যুর আহ্বান', 'নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরিয়াছি আমি' ইত্যাদি উপমায়।

ধূসর

চিত্রকলায় ধূসর নামের কোনো রঙ নেই। সাদা কালোর সংমিশ্রণে বিবর্ণ এক রঙের সৃষ্টি হয়, যাকে আমরা ধূসর নামে আখ্যায়িত করে থাকি। বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণ ও ধূসরতার জন্ম দেয়। ধূসর উদাসীনতা, দুঃখবোধ, মলিনতা ভাব প্রকাশের সহায়ক রঙ। বাস্তবধর্মীর চেয়ে প্রকাশধর্মী ভাবপ্রকাশে শিল্পী কবি, এ রঙ বেশি ব্যবহার করে থাকেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ধূসর রঙের ব্যবহারের আধিক্য রয়েছে। যার কারণে কবি 'ধূসর কবি', 'ধূসরতার কবি', 'ধূসর পাণ্ডুলিপির কবি' হিসেবে বেশি পরিচিত। প্রকৃত অর্থে কবি ধূসরতার কবি নন, তিনি একজন 'প্রেমের কবি', 'রোমান্টিক কবি', 'প্রকৃতির কবি'। 'ধূসর কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশের পর থেকেই জীবনানন্দ ধূসরতার কবি নামে পরিচিতি পান। বিশিষ্ট সাহিত্য, সমালোচক শ্রী সুকুমার সেন, কবিকে ধূসরতার কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এভাবে, "জীবনানন্দের কবিকল্পনার প্রধান রঙ ধূসরতা—জীবনের অচরিতার্থতার-ব্যর্থতার-ক্লান্তির-অবসন্নতার মৃত্যুর রঙ" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫)।

জীবনানন্দের কবিতায় ধূসর কোনো বর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, কবির কল্পনান্তরের একটি রঙ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। প্রচলিত সমাজ জীবনে অনভ্যস্ত কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর শূন্যতাময় অথচ স্বপ্নিল আবেগকে 'ধূসর' শব্দ দিয়ে পাঠক হৃদয়ে আপন অনুভূতি প্রতিবিম্বিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ধূসরের মাধ্যমে।

কবির কবিতায় ধূসরের প্রভাব প্রায়ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কবি ধূসরের মধ্যে বস্তুর অবস্থান ভুলে, আমাদেরকেও এক রোমান্টিক অনুভবের রাজ্যে বিচরণ করাচ্ছেন নিম্নোক্ত ছন্দ-ধ্বনির মাধ্যমে, 'ধূসর মৃত্যুর মুখ', 'পেঁচার ধূসর ডানা', 'ধূসর কড়ির মতো ডানা', 'বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর কবাট', 'ধূসর চিবুক', 'ধূসর বালিকার মুখ', 'আত্মার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তী', 'ধূসর প্রিয় মৃতদের সুখ', 'অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'ধূসর বাড়ী' 'শিশিরের মতো ধূসরতা' ইত্যাদি উপমায় কবি বিষণ্নতাকে অদ্ভুতরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রতীকী ভাববাদ ফুটাতে কবি ধূসরকে ব্যবহার করেছেন এভাবে, 'নদী আর মানুষের বিবর্ণ ধূসর হৃদয়', 'ধূসর আলো', 'ধূসর আকাশ', 'ধূসর স্বপ্নের দেশ', 'ধূসর সন্ধ্যা', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'অশোকের ধূসর হৃদয়' ইত্যাদি উপমায়।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিসত্তা এবং কবি প্রতিভার উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে ধূসর শব্দের আশ্রয় নিয়েছেন নানা কৌশলে নিম্নোক্ত উদাহরণে, 'চালের ধূসর গন্ধ', 'দেহে বিকালবেলার ধূসরতা', 'ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখ', 'চারিদিকে গণনাহীন ধূসর দেয়াল' ইত্যাদি উপমায়।

রোমান্টিক ভাবনায়ও কবি ধূসরকে ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত নৈপুণ্য এবং বৈচিত্র্যতার মাধ্যমে এভাবে, 'সন্ধ্যায় ধূসর সজল মৃদু হাত', 'নেউল ধূসর নদী', 'উষ্ণ ধূসর মরু', 'আছে ধূ-ধূ ধূসর দিগন্ত' ইত্যাদির মাধ্যমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্যে ধূসরের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন পোড়া, ম্লান, অসুস্থ, ফ্যাকাশে, পাণ্ডুর, বিবর্ণ, মলিন ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে।

উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করানো যায়, 'পোড়া জমি', 'পাণ্ডুর পাতা', 'মলিন পাখা', 'ম্লান চোখ', 'বিবর্ণ ইচ্ছা', 'পাণ্ডুর চাঁদ' প্রভৃতি প্রতিশব্দগুলো।

কাব্য সমালোচকরা কবি জীবনানন্দকে ধূসরতার কবি হিসেবে আখ্যায়িত করলেও তাদের মতে কবিকল্পনার প্রধান রঙ ধূসরতা ; এ' যুক্তি আংশিক সত্য : ধূসরতা জীবনানন্দের কবিকল্পনার একটি পর্ব মাত্র, সামগ্রিক নয়। মহাপৃথিবী পর্যন্ত কবির ধূসরময় পরিচিতি ছিল। এরপরেও দু'চারটি কবিতায় কবির ধূসর রঙের তুলির আঁচড় লক্ষ করা যায়। ধূসরতার তীব্রতা সেখানে নগণ্য। স্বয়ং কবির উচ্চারণও প্রায় একই রকম, "আমার কাব্যের উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতি চেতনার ভিতর রয়েছে বলেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সবসময়ই যে ধূসর তা হয়তো নয়" (রবীন্দ্র কবিতা ও চিত্রকল্প, ড. তুষার কান্তি মহাপাত্র, পৃ. ৪)।

ধূসরতার কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতায় রঙ ফলিয়ে পেয়েছেন শান্তি, হয়েছেন তৃপ্ত, আনন্দিত। তাঁর প্রতিটি বর্ণই অর্থময় ব্যঞ্জনায় বিধৃত। প্রকৃতির মূল রঙ লাল, নীল এবং হলুদ ও তার মিশ্রণে কবির কবিতা বর্ণময় হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে লাল রঙ কবির ক্ষোভ প্রকাশে বেশি সহয়তা করেছে। কবির কাব্যে ব্যবহৃত লাল রঙের বর্ণনার সামান্য তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো—

লাল

লাল প্রাথমিক রঙগুলোর অন্যতম রঙ। প্রাকৃতিক উপাদান এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে এ' রঙ পাওয়া সম্ভব। প্রকাশধর্মী শিল্পী লাল রঙ ব্যবহার করে উত্তেজনা, ক্ষোভ, বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করে থাকেন। চিত্রকলায় দু'রকম লাল ব্যবহৃত হয়, 'রক্ত লাল', 'কারমাইন' অথবা 'ক্রিমসন রেড' এবং 'সিঁদুরে লাল' বা 'ভারমিলিয়ন রেড'। উত্তেজনা, ক্ষোভ, বিদ্রোহ প্রকাশে ক্রিমসন অথবা কারমাইন রেড ভালো ফল দেয়। বিপরীতে সিঁদুরে লাল বা ভারমিলিয়ন রেড, প্রেমাভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

জীবনানন্দের কাব্যে, সমসাময়িক অথবা ঐতিহাসিক নিধন যজ্ঞের ক্ষেত্রে, দ্বন্দ্বময় মানস যন্ত্রণাসংকুল অবস্থায়, তীব্র ক্ষোভ প্রকাশে লাল রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার উজ্জ্বল রঙ হিসেবে লালকে ব্যবহার করা হয়েছে রোমান্টিক আকুলতার আকাঙ্ক্ষা, আভিজাত্যের প্রতীকী হিসেবে।

কবি তাঁর মানসযন্ত্রণা অথবা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশে লালের উচ্চারণ করেছেন এভাবে, 'আগুন জ্বললো আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংশ তৈরী হয়ে এলো', 'পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বাদ', 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ', 'মোরগ ফুলের লাল আগুন', 'এত রক্ত নদী', 'এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা', 'লাল লাল বটের ফলের ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা', 'ঘিয়ের সোনার দীপে লাল-নীল শিখা', 'লাল আলো-রৌদ্রের চুমুক', 'রাঙা মেঘ-সাপের আঁধার মুখ' ইত্যাদি উপমায়। 'লাল' রঙ-এর পরিবর্তে 'রাঙা', 'রৌদ্র' প্রভৃতি শব্দ দিয়েও কবি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেন নিম্নোক্ত উদাহরণে,

'সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেতে কোথায় অকূলে', 'যার ডাক শুনে রাঙা রৌদ্রেরা চিল আর শালিখের ভিড় একদিন ছেড়ে যাবে', 'মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ', 'রাঙা মেঘ-সাপের আঁধার মুখে', 'দুলিয়া উঠিছে রাঙা অশনির ফণা' ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমান্টিক চিন্তা-চেতনায় কবির লাল রঙের ব্যবহার আরও অদ্ভুত। লালের দীপ্তি কমিয়ে তার সাথে নানা 'শেড' জুড়ে দিয়ে কবি তাঁর রোমান্টিক আকুলতা প্রকাশ করেছেন এভাবে, 'ডালিম ফুলের মতো রক্তিম আবেশ', 'রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মতো লাল', 'লাল গাল', 'কিশোরীর লাল পা', 'কিশোরীর লাল পাড়', 'টমেটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়', 'ডালিমের মতো লাল গাল' প্রভৃতির উপমা দ্বারা।

গ্লানি, ক্ষোভ, উষ্ণতা প্রকাশে কবি লাল'কে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলেছেন তাঁর উপমায় এভাবে, 'রক্তে রক্তে লাল বুক', 'রক্তের মতন অশ্রু', 'লাল অশ্রু জল', 'থ্যাঁতো ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁট', 'রক্তাক্ত বাসনা', 'রক্তাক্ত হৃদয়', 'রক্তাক্ত নদীর কল্লোল', 'দেখেছি প্রথম জল নিতে প্রাণীর রক্তে লাল' ইত্যাদি।

লালের বিপরীতার্থে কবি কখনো 'হিঙুল', 'পিঙুল', 'লোহিত', 'কুমকুম', 'জাফরানী', শব্দ ব্যবহার করে কবিতার রঙে এনেছেন আরও জৌলুস নিম্নোক্ত উচ্চারণে, 'স্বপ্নের আবেশে','রাঙা আঁখি', 'জৌলিস রাঙা আঁখি', 'রাঙা নার্গিস', 'শরীর রাঙায় রাঙিয়ে ছিল আঁখি', 'রাঙা মেঘ', 'রাঙা আপেলের মতো লাল গাল', 'রাঙা অঙ্গার মালা', 'রাঙা উল্লাস', 'চাঁদের রাঙা কপোল', 'হিঙুল মেঘ', 'পিঙল আঁখী', 'লোহিত কপোল', 'পিঙুল আঁখি', 'হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্য' ইত্যাদি উদাহরণে।

নীল

বর্ণচক্রের অন্যতম প্রাথমিক রঙ নীল। প্রাথমিক রঙের কারণে, নীল প্রাকৃতিক অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করতে হয়। চিত্রকলার অতি প্রয়োজনীয় রঙ নীল। মানসিক প্রক্রিয়ায় গাঢ় নীল বিষাদের ভাব ফুটিয়ে তোলে। স্বপ্নময় ভাবপ্রকাশেও গাঢ় নীল ব্যবহৃত হয়। চিত্রকলার ভাষায় এর নাম 'পুরশিয়ান ব্লু'। একইভাবে 'কবাল্ট ব্লু' বা হাল্কা নীল দর্শন প্রক্রিয়ায় প্রসন্নতা, উদারতার ভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

জীবনানন্দের কাব্যে নীল রঙ ব্যবহারের আধিক্য দেখা যায়। এ রঙ কবিমানসকে কিভাবে উত্তেজিত করেছে তা তাঁর কাব্যের শব্দ উচ্চারণেই ধরা পড়বে। কবি নীল রঙ ব্যবহারে একটু বেশি আধুনিক মননের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এ বিশেষ রঙ ব্যবহার করে তাঁর মানসদ্বন্দ্বের, শুভ এবং কল্যাণবোধ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন চিত্রকল্পে।

বিষাদের ভাবপ্রকাশে কবি নীল এবং প্রতীকী নীলের উপমা এনেছেন এভাবে, 'গাঢ় নীল অমাবস্যা', 'কার্তিকের নীল কুয়াশা', 'কাকগুলো নীল মনে হয়', 'নীল মঠ', 'নীল ধোঁয়া', 'বাংলার নীল সন্ধ্যা', 'নক্ষত্রের নীল ফুল', 'নীলাম্বরী নীল ভোমরা', 'নীল মশার মৌন আকাঙ্খা', 'শিশুর মত বাঁকা নীল চাঁদ', 'সমুদ্রের নীল মরুভূমি', 'উলঙ্গ নীল তরঙ্গ', 'দুপুর বেলায় আকাশে নীল পাহাড়-নীলিমা', 'নীল বুকে আছে তাহাদের গঙ্গা ফড়িঙের নীড়', 'সবুজ নীল ডানার মতো' ইত্যাদি।

রোমান্টিক এবং ভয়াল উপমায় কবি নীলকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এভাবে, 'অপরাজিতার মতো নীল আকাশ', 'নীল কস্তুরির আভার চাঁদ', 'কেউটের মতো নীল', 'ভাঙ্গা মঠ নীল হয়ে আছে শ্যাওলায়', 'গোলপাতার ছাউনির বুকে চুমে নীল ধোঁয়া', 'মশার নীল শুককীট খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে' ইত্যাদি উপমায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়াবী অনুভবে কবি নীল রঙ ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত আবেগের সাথে এভাবে, 'ম্লান নীল রূপের কুয়াশা', 'বেগুনী-নীল প্রজাপতি কাঁচপোকা আবার নেমেছে মাঠে বনে', 'নীল হাওয়ার সমুদ্র শাদা বকের মতো উড়ছে', 'ময়ূরের নীল ডানা', 'মেঘ ম্লান নীল জ্যোস্নার আলো', 'সে এসে মনকে নীল রৌদ্রশীল শ্যামলে ছড়ালো কবে যেন' ইত্যাদি উপমায়।

স্বপ্নীল পটভূমিতে কবি নীলকে ব্যবহার করেছেন নীলাভ উচ্চারণে। যার মধ্যে পরাবাস্তববাদী অনুভবের প্রকাশ লক্ষ করা যায়, 'বাতাস নীলাভ হয়ে আসে প্রান্তরের ঘাসে', 'বিরাট নীলাভ হয়ে আসে প্রান্তরের ঘাসে', 'বিরাট নীলাভ খোঁপা', 'গভীর নীলাভতম ইচ্ছা', 'নীলাভ জলের রোদ', 'বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ', 'নীলাভ নোনার বুকে' ইত্যাদি উপমায় নীল আরও স্বপ্নময় হয়ে ফুটে উঠেছে কবির কবিতায়।

অতি সাধারণ অর্থে বস্তুগত অনুসঙ্গে জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় নীলকে ব্যবহার করেছেন এভাবে, 'নীল নিচোল', 'নীল জানালা', 'নীল বাতায়ন', 'নীল দরিয়া', 'নীল পৃথিবী', নীল আকাশের স্বাদ', 'নীল বক', 'উলঙ্গ নীল তরঙ্গ', 'নীল স্বপ্ন', 'নীল হাওয়ায় সমুদ্র', 'নীল স্বর্গীয় শিখা' ইত্যাদি।

জীবনানন্দের কবিতায় নীল খুঁজলে দেখা যাবে তার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার উপস্থিতি। তাঁর কবিতায় মলিন নীল ব্যবহার করা হয়েছে নিরুৎসাহ এবং বিষাদের ভাব ফুটিয়ে তুলতে। একইভাবে উজ্জ্বল নীল—সততা, ন্যায়পরায়নতা ; স্বচ্ছ নীল—প্রশান্তি, মোহনীয়তা, শীতলতা ; ময়ূরকণ্ঠী নীল—কোমলতা, স্পর্শকাতরতার ভাব ফুটিয়ে অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করে। কবি জীবনানন্দের পরশে বিষাদের নীলও কবির কবিতায় ধরা পড়েছে মোহনীয় রঙ হিসেবে।

হলুদ

হলুদ আনন্দের রঙ, উৎফুল্লতার রঙ। কবির কবিতায় হলুদের প্রভাব কম নয়। চিত্রকলায় হলুদ প্রাথমিক রঙ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রঙের অন্যতম। বাংলার রূপ আঁকতে হলে, হলুদ অবশ্যই লাগবে। চিত্রকলার ভাষায় হলুদ দু'রকম, 'লিমন ইয়েলো', 'হাল্কা হলুদ' এবং 'ইয়েলো অকার', 'মলিন হলুদ'। জীবনানন্দের কবিতায় হলুদের ব্যবহার প্রচুর, তবে লিমন ইয়েলোর ব্যবহার কবির কবিতায় নেই বললেই চলে। বিপরীতে কবির কবিতায় ইয়েলো অকার অর্থাৎ বিবর্ণ হলুদ বা মলিন হলুদের ব্যবহার প্রচুর পরিলক্ষিত হয়।

প্রফুল্লতা, উৎফুল্লতা, ত্যাগ, ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি প্রকাশে চিত্রকর এ' রঙ ব্যবহার করে থাকেন। একইভাবে ইয়েলো অকার বা মলিন হলুদ বিষাদ, মৃত্যুমুখ, বার্ধক্য, নিরানন্দ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উজ্জ্বল হলুদের সাথে সামান্য লাল বা ব্রাউন রঙ মেশালে হলুদ বিবর্ণ হলুদে পরিণত হয়ে ইয়েলো অকার রঙে পরিণত হয়।

হলুদ জীবনানন্দের প্রিয় রঙ—প্রাণের রঙ। এ' রঙে কবির বিহার ছিল স্বচ্ছন্দ, তবে কবির স্বচ্ছন্দ যত না ছিল লিমন ইয়েলোতে, তার বেশি ছিল 'ইয়েলো অকারের মধ্যে'। লিমন ইয়েলোর মধ্যে কবির বিচরণ ছিল আনন্দ, উৎফুল্লের। কবির উপমাই এর প্রমাণ, 'অঘ্রাণের ভরা খেত হয়েছে হলুদ', 'হিজল গাছে জামের বনে হলুদ পাখির মতো', 'হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের পর', 'দেখেছি কিশোরী এসে হলুদ কবরী/ছিঁড়ে নেয় লালপাড়ে ভিজে শাড়ি', 'করুণ শঙ্খের মতো ছবি ফুটাতেছে', 'হলুদ হলুদ জ্যোস্না' প্রভৃতি উদাহরণে বিবর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলুদ বা ইয়েলো অকার রঙ জীবনানন্দ দাশ এত অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করেছেন, যা ভাবা যায় না। তিনি এ' রঙের মধ্যে বার্ধক্য, মৃত্যু এবং মলিনতার আবেগ অত্যন্ত সচেতনতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরই উচ্চারণে এভাবে, 'যে পাতা সবুজ ছিল—তবুও হলুদ হতে হয়', 'হলুদ পাতার ভীড়ে', 'উঠানে ঝরিবে এই হলুদ বাদামী পাতাগুলো', 'হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়ের বন', 'কুয়াশায় হলুদ না হতে', 'হলুদ পাতার মিলন উঠানে খয়েরী পাতা', 'এখানে হলুদ ঘাসে', 'অন্ধকারে রয়েছে হলুদ', 'হলুদ বিচালি' ইত্যাদি বিষাদ চেতনার আবহ তৈরিতে হলুদ প্রাসঙ্গিকতার পরিচয় দিয়েছে। মৃত্যুচেতনায় লিমন ইয়েলোর ব্যবহার জীবনানন্দের কবিতায় অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে।

মৃত্যুচেতনা প্রকাশে কবির বিবর্ণ হলুদ ব্যবহৃত হয়েছে আরও অপূর্বরূপে রূপায়িত হয়ে এভাবে, 'হলুদ তৃণ ভরে গেছে', 'হলুদ পাতার ভীড়ে বসে', 'হলুদ নদীর সর' প্রভৃতি উপমায়। কবি হলুদকে আরও বেশি বিবর্ণ করার উদ্দেশ্যে 'পাণ্ডুর' শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতার উপমায় এভাবে—'পাণ্ডুর পাতার মতো', 'পাণ্ডুর পাতার রঙ লাগে', 'পাণ্ডুর চাঁদ', 'প্রিয়ার পাণ্ডুর আঁখি' ইত্যাদি। হলুদকে আরও বেশি বিষাদময় করে প্রকাশের উদ্দেশ্যে কবি উচ্চারণ করেছেন, 'ফ্যাকাশে পাতার পর', 'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ' উপমায়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং কল্পনাবোধ থেকে কবি হলুদ রঙ ব্যবহার করেছেন নিম্নোক্ত উদাহরণ, 'ধানের ক্ষেতে ধোঁয়াটে ধারালো কুয়াশা', 'পাকা ধানের গন্ধে চারিদিক ভরে', 'বনের পাতার মতো কুয়াশায় হলুদ না হতে' ইত্যাদি উপমায়।

সবুজ

সমপরিমাণ হলুদ-নীলের মিশ্রণে সবুজের জন্ম। দু'রঙের সংমিশ্রণের কারণে সবুজ দ্বিতীয় স্তরের রঙ হিসেবে সুপরিচিত। বর্ণসচেতন কবি সবুজ রঙের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন শান্তি, সান্ত্বনা। তাঁর কবিতায় আমরা 'স্যাপগ্রিন' বা কঁচিপাতার সবুজে খুঁজে পাই জ্যোতির্ময় স্মৃতি, সমসাময়িক বোধ এবং পুনর্জন্মকে সজীব করে তোলার মানসিকতা। কবির ক্লান্ত জীবনকে সবুজের মধ্যে ঢেকে রাখার বাসনাসহ ভালোবাসার প্রতীকী রঙ হিসেবেও কবিতার বহু স্থানে সবুজকে ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করানো যায়, 'সবুজ সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা', 'বাংলার সবুজ বনানী', 'জীবন সবুজ হয়ে ফলে', 'অধীর পাতর মতো পৃথিবীর মাঠের সবুজ', 'সেখানে সবুজ ডাঙ্গা ভরে আছে মধুকুপী ঘাসে', 'সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর', 'গভীর সবুজ ঘাস—ঘাসের ফড়িং', 'কাঁচ বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস তেমনি সুঘ্রাণ', 'সুরঞ্জনা তোমার হৃদয় আজ ঘাস' ইত্যাদি উপমায়।

তারুণ্য এবং বাংলার প্রকৃতির রূপ-রস আরও বেশি স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার জন্য সবুজ কবিকে গভীরভাবে সম্মোহিত করেছে। নিম্নোক্ত উচ্চারণ যার একমাত্র উদাহরণ, 'সবুজ সবুজ বনানী', 'দেখেছি সবুজ ঘাস যতদূর দেখা যেতে পারে', 'সবুজ ঘাসের দেশ', 'পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মত সবুজ', 'শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়', 'সবুজ পাতার উপর যখন নেমে আসে দুপুরের সূর্যের আঁচ', 'হাজার সবুজ পাতা লাল ফল বুকে লয়ে শাখায় ব্যঞ্জনে', 'রয়েছি সবুজ মাঠে-ঘাসে', 'সবুজ ধানের নিচে ইত্যাদি। সান্ত্বনা, সতেজতা এবং সম্ভাবনাময় ভাবপ্রকাশে কবি উপরোক্ত সবুজগুলো ব্যবহার করে তাঁর কবিতা সাজিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপরীতে মলিন সবুজ কবির কবিতায় ঈর্ষা-লোলুপতার ভাব প্রকাশের সহায়ক রঙ হিসেবে স্থান পেয়েছে। তাঁর কাব্যে সবুজ সমসাময়িক বোধসহ ক্লান্ত হৃদয়ের ছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সবুজ ঘাস ছিল কবির খুবই পছন্দ, সবুজের প্রসঙ্গ এলেই কবি প্রায়ই ঘাসের উপমা ব্যবহার করেছেন। এর কোমল দেহে কবি মাতৃত্বকে আবিষ্কার করেন। তিনি ঘাসের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভেরও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বারবার। ঘাসের কোমল দেহে জীবনানন্দ মাতৃত্ব এবং মাতৃভূমি আবিষ্কার করেছেন নিম্নোক্ত উচ্চারণে, 'ঘাস আমি দেখিয়াছি', 'জীবন সবুজ হয়ে ফলে', 'সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা', 'সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর', 'হরিণ রয়েছে বসে নিজের শিশুর পাশে বড় বড় চোখ মেলে সবুজ ঘাসের', 'পরে ছবির মতো স্থির যেন', 'একদিন এই ঘাস দেহ ঘাস থেকে ধানের অঘ্রাণ থেকে এই বাংলায় জেগেছিল', 'এ সবুজ দেশে, বাঁশপাতা, ঘাস', 'চাঁদ থেকে যখন ঝরে পড়েছে', 'বরফের ফোয়ারা সবুজ ঘাসে', 'কোথাও সবুজ ঘাস আমাদের রাখিবে ঢেকে'।

মাতৃত্বের প্রতীকী অর্থে কবি সবুজ ঘাসকে তাঁর কবিতায় ছন্দবদ্ধ করেছেন এভাবে, 'বাংলার ঘাসে', 'গভীর ঘাসের গুচ্ছে রয়েছি ঘুমায়ে আমি', 'কঁচি বাতাবির মত সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ', 'ঘাসের ভেতরে ঘাস হয়ে জন্মাই কোন নিবিড় ঘাস মাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে', 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস', 'ঘাসের আঁচলে ফড়িঙের মত আমি বেড়িয়েছি', 'ঘাসের বিছানা' ইত্যাদি উপমা দিয়ে।

একান্ত নিজস্ব রোমান্টিক চেতনা প্রকাশে কবি সবুজ ব্যবহার করেছেন, 'জীবন সবুজ হয়ে ফলে', 'রাজকন্যার পরণে ঘাসের শাড়ি', 'কোথাও সবুজ ঘাস আমাদের রাখিবে ঢেকে', 'পাতার মতো সবুজ আলোর পৃথিবী ভরে গিয়ে' ইত্যাদি অদ্ভুত উপমায়।

'ভেরিডিয়ান গ্রীন' বা 'মলিন সবুজ' বহুবার কবির কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সবুজ ঈর্ষা, লোলুপতা এবং প্রাচুর্যের প্রতীকী রঙ হিসেবে কবির কাব্যে অদ্ভুতরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মৃত্যুভাব প্রকাশে কবি মলিন এবং ফ্যাকাশে সবুজের ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যের নানা উপমায়। উদাহরণ হিসেবে, 'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ', 'যে পাতা সবুজ ছিল—তবুও হলুদ হতে হয়', 'সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা সব', 'সবুজ অন্ধকার', 'শালিক গুগলিগুলো পড়ে আছে শ্যাওলা মলিন সবুজে', 'হলদে সবুজ নীল রঙ তার বুকে' ইত্যাদি উপমায়। জীবনানন্দের কাব্যে সবুজের এক সুন্দর বিবর্তন লক্ষণীয়। তারুণ্যের সবুজ, কঁচিপাতার সবুজ (স্যাপগ্রীন) ক্রমান্বয়ে পরিপক্ক হয়ে গাঢ় সবুজে (ভেরিডিয়ান গ্রীন) রূপান্তরিত হয়ে হলুদ (বিবর্ণ হলুদ) বর্ণ ধারণ করে গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝরে পড়ে। অর্থাৎ তরুণ্য থেকে বার্ধক্যের মৃত্যুর এক অদ্ভুত চিত্রকল্প জীবনানন্দের সবুজ রঙের মধ্যে এমনভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, যা অন্য কোনো কবির উপমায় কখনোও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

জীবনানন্দের কবিতায় প্রাথমিক রঙ লাল, নীল এবং হলুদ ব্যতীত যেমনি রয়েছে সবুজের আধিক্য, তেমনি কমলা, বেগুনি রঙসহ রয়েছে সোনালী, রূপালী রঙের অপূর্ব মিশ্রণ এবং ব্যবহার। যা আজ কবিকে এক আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে, পরিণত করেছে বর্ণবিভার শ্রেষ্ঠতম কবি হিসেবে।

কমলা

কমলা রঙের ব্যবহার, কবি অতি সংযতভাবে তাঁর কবিতায় করেছেন। চিত্রকলার ভাষায় কমলা দ্বিতীয় স্তরের রঙ। লাল-হলুদের মিশ্রণে কমলার জন্ম। ভাবপ্রকাশে এ রঙ মানব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের উজ্জ্বলতা এবং প্রফুল্লতাকে কিছুটা দমিয়ে রাখে। কবির কবিতায় ব্যবহৃত কমলা রঙ পাঠক চিত্তে উজ্জ্বলতা—তীব্রতার সৃষ্টি না করে, সুন্দর মিষ্টি আমেজে পাঠক হৃদয় সম্মোহিত করেছে। কবির কাব্যে উচ্চারিত কমলা, 'আকাশে কমলা রঙ ফুটে ওঠে সন্ধ্যায়', 'অনেক কমলা রঙের রোদ', 'পাখিটির নীল কমলা রঙের ডানা', 'হিম কমলা লেবুর করুণ মাংস নিয়ে', 'মেঘের ক্ষেতের ভেতর প্রণয়ী চাষার মতো', 'কমলা রঙের পাখা ঝরে', 'অঘ্রাণের বিকেলের কমলা আলো' ইত্যাদি উপমায় ব্যবহৃত কমলা রঙ কবিমানসের রোমান্টিক ভাব ভাবনার প্রকাশ বটে, তবে সেভাব সংযতভাবেই উচ্চারিত হয়েছে কবির কমলা রঙের ভেতর।

বেগুনি

জীবনানন্দের কবিতায় এ' রঙের প্রভাব কম। দ্বিতীয় স্তরের এ রঙ লাল-নীলের মিশ্রণে তৈরি। প্রকাশধর্মী শিল্পী, বেগুনি রঙ ধৈর্য্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। কবির কবিতায় এ' রঙ 'বেগুনী নীল'সহ জামের রূপবর্ণনায় অত্যন্ত সচতুরতার সাথে ব্যবহার করেছেন। ক্ষোভ প্রকাশের রঙ হিসেবেও কবির কবিতায় বেগুনির সন্ধান পাওয়া যায়।

বাদামি-খয়েরি

মিশ্র, তৃতীয় স্তরের এ' রঙের মধ্যে কবি ধৈর্য্য এবং আবেগ খুঁজে পান। বাদামি, খয়েরি রঙের আভা হিসেবে চিত্রকলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ' রঙ দুটোর সার্থক প্রয়োগ, কবি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন এভাবে, 'শীতের রাতে বাদামী সোনালী লাল রোম', 'উঠানে ঝরিবে এই হলুদ বাদামী', 'বিবর্ণ বাদামী পাখী', 'বাদামী পাতার ঘ্রাণ', 'আবার খয়েরী চিলের সোনালী ডানা হয়েছে খয়েরী', 'দেখিব খয়েরী ডানা' প্রভৃতি উপমা কবির সার্থক বর্ণসচেতনতারই ফল। যার মধ্যে আমরা কবিচেতনার সার্থকরূপ খুঁজে পাই। খুঁজে পাই কবিমানসের প্রত্যক্ষ পরিচয়।

সোনালী

চিত্রকলায় সোনালী রঙ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ব্যতীত সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। সোনালী আনন্দ, ঐশ্বর্যের রঙ। কবি জীবনানন্দ, কবিতায় সোনালী রঙ ব্যবহার করেছেন কখনও তাঁর ম্লান স্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে, আবার কখনোও নিসর্গের রূপকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে এভাবে, 'সোনালী চিলের বুক', 'সূর্যের সোনার বর্ষা', 'সোনার মতো বর্ষা', 'সোনার ডিমের মতো ফাল্গুনের চাঁদ', 'সোনার মতো সন্ধ্যা', 'সোনালী উজ্জ্বল চোখ', 'মেঘের সোনালী চোখ', 'সোনালী মেঘের গল্প', 'সোনালী আগুন চুপে জলের শরীরে নড়িতেছে' ইত্যাদি উপমায় কবি সোনালী রঙ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধরে রেখেছেন।

রূপালী

সোনালীর চেয়ে কবির রূপালী রঙের ব্যবহারে একটু শান্ত ধীরস্থির ভাব ফুটে উঠেছে। স্বপ্নময় আবেগ ফুটাতে কবির ব্যবহৃত রূপালী একটা সার্থক বর্ণ। কবির উপমায় রয়েছে এর সত্যতা, 'রূপালী চাঁদের হাত', 'রূপালী শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম', 'রূপার ডিমের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা', 'ঘনিষ্ঠ চাঁদের নীচে চোখ আর চুলের সংকেত', 'রূপালী বৃষ্টির জল', 'রূপালী মাছের কণ্ঠে কামনার স্বর', 'আকাশে রূপালী শষ্য', 'রূপালী আগুন ভরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত', 'সে সব রূপালী মাছ জ্বলে ওঠে রোদে' ইত্যাদি উপমায় কবি রূপালীর রূপ আরও উজ্জ্বল, শান্তরূপে রূপায়িত করে তুলেছেন নানা কৌশলে।

কবি জীবনানন্দ দাশ আজ একজন সার্থক বর্ণসচেতন কবি হিসেবে সবার নৈকট্য লাভ করেছেন। তিনি তাঁর কবিতার প্রেম চেতনা, মৃত্যু চেতনা, সমাজ ও কাল চেতনার নানা অনুভূতি, নানা বর্ণ ও তার আভার মিশ্রণে আমাদের হৃদয়মাঝে অনুভবগ্রাহ্য করে তুলেছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে, রঙ-রেখা, তুলির সাহায্যে। তাঁর ফলিত রঙ, সরাসরি কথা বলতে সক্ষম হয়েছে, সক্ষম হয়েছে পাঠক হৃদয় জয় করতে। কাদম্বরীর কবি জীবনানন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি হলো, "রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ। যেন শ্রান্তি নাই তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ আছে। অর্থাৎ কোনো জিনিসের কী রঙ শুধু সেই, সেই বর্ণনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে।"

অজস্রমুখী বর্ণসচেতনতার বিকাশ আমরা কবি জীবনানন্দের কবিতার নানা অনুষঙ্গ, উপমা এবং প্রতীকের মধ্যে পেয়ে থাকি। আমাদের কবিদের কবিতার ভাষায়, হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি রঙ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষদৃষ্ট যে কোনো একটি রঙের ছায়া-প্রতিচ্ছায়াসহ নানা বর্ণাভা যদি ভাষার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হয়, তাহলে আমাদের ভাষায় উপযুক্ত পরিভাষা খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যদিওবা সামান্য কিছু থেকে থাকে, তা আঁকিয়ে শিল্পী মহলেই সীমাবদ্ধ। সাধারণের প্রবেশাধিকার সেখানে নেই বললেই চলে।

জীবনানন্দ দাশ সাধারণের এ' সীমা অতিক্রম করে, তাঁর কবিতায় প্রকৃতির নানা বর্ণ-উপমার বিশ্লেষণাত্মক ধ্বনি ব্যবহার করে, কবিতার শব্দ দৈন্যতা দূর করেছেন। কবির কবিতায় বর্ণ ব্যবহার দেখে তাকে দীক্ষিত-দক্ষ চিত্রশিল্পী বলতে কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগবেন না। কবিতার শব্দ প্রয়োগে একটি রঙ যে কত বিচিত্র আভা তৈরিতে সক্ষম, তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বর্ণবিভায়। বর্ণবিভার কবি জীবনানন্দ দাশ ধূসরতা থেকে যাত্রা করে অদ্ভুত সব বর্ণাভা দিয়ে তাঁর কবিতাকে রাঙিয়ে তুলে, কাব্যমানসকে করেছে উদ্ভাসিত। কবির কবিতার বর্ণবিভায় রয়েছে সুতীব্র অনুরাগ, জীবন্ত রঙের পরশসহ হাজারো বাস্তব, পরাবাস্ত, প্রকাশধর্মী রঙের ছোঁয়া। ফলে জীবনানন্দ আজও পাঠক হৃদয়ে কবির কবি, বর্ণিল কবি, চিত্রকল্পের কবি, বর্ণবিভার কবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধরা মাধুরী

শান্তনু কায়সার

কলকাতার সাহিতপত্র 'বিভাব' তাদের জীবনানন্দ 'জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা'য় কবির ১৯৩১-এর জুলাই-সেপ্টেম্বরে লেখা দিনলিপি প্রকাশ করেছে। 'Literary Notes' শিরোনামের এই দিনপঞ্জি মূলত ইংরেজিতে লেখা। এ প্রসঙ্গে ভূমেন্দ্র গুহ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, '... ইংরেজিতে কেন?' এই দিনলিপি যেহেতু তিনি একান্তই নিজের জন্যে 'নোট' হিসেবে লিখেছিলেন সেহেতু স্বভাবতই তার ভাষা হয়ে উঠেছিল 'সাঙ্কেতিক'। এই দিনপঞ্জি উদ্ধার প্রসঙ্গে ভূমেন্দ্র গুহ প্রমুখ জীবনানন্দ-কাকা অতুলানন্দ দাশের কন্যা জ্যোৎস্না দাশগুপ্তের সাক্ষাৎ পান, ঐ সময় যাঁর বয়স ছিল ৮৮। দিনপঞ্জিতে উল্লিখিত জনৈকা 'Y' সম্পর্কে কবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জেনে তিনি যেমন কটাক্ষ করে বলেছিলেন 'কোনো সাতে পাঁচে তো থাকতো না, পেটে পেটে এত ছিল!' তেমনি এ দিনলিপি অনেক অন্তর্গত সংবাদ দেয়। এরকম ক্ষেত্রে স্বভাবতই একটা আড়াল থাকে, জীবনানন্দের মতো অন্তর্মুখী কবির ক্ষেত্রে যা আবার আড়ালেরও আড়াল হয়ে ওঠে।

কিন্তু ব্যাপারটার আরো গভীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। ১৯২৫-এর উদ্ধারকৃত কবির একটি খাতা থেকে অনুমিত হয় যে, জীবনানন্দ সম্ভবত ইংরেজিতে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র অমিতানন্দ দাশের কাছ থেকে জানা যাচ্ছে, ইংরেজির ছাত্র থাকার সময়ই জীবনানন্দ ইংরেজিতে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তবে কি এ ছিল নেহাতই তারুণ্যের উদ্যোগ অথবা প্রয়াস কিংবা নিছকই literary exercise, প্রথম তারুণ্যের কৌতূহলী সাহিত্য-নিরীক্ষা? কিন্তু বাস্তব তথ্য ও সাক্ষ্য তাকে সমর্থন করে না। ১৯৩১-এর ১৮ অক্টোবরে লেখা এক চিঠিতে বিষ্ণু দে-কে লিখেছেন, 'আপনার চিঠি পেয়ে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হল : আমার ইংরেজি কবিতা পাঠের যোগ্য নয় এই জেনে, অনেক দিন আগে তা ছেড়েও দিয়েছি লিখতে ; অবশ্য ভবিষ্যতে কি করব জানি না।' ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে সিগনেট প্রেস থেকে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মডার্ন বেঙ্গলি পোয়েমস'-এ কবির নিজের করা অনুবাদ গৃহীত হয়নি। ঐ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তাঁর কবিতাগুলোর অনুবাদ করেছিলেন মার্টিন কার্কম্যান। কিন্তু আমরা দেখছি, 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এ অন্তর্ভুক্ত দুটি ভিন্ন কিন্তু মৌলিক চেতনায় অভিন্ন 'বিভিন্ন কোরাস' রচনার পরও তিনি 'Chorus' নামাঙ্কিত ইংরেজি কবিতা লিখেছেন। কারণ যাই হোক, এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই গভীরতর কোনো প্রেরণা ও চিন্তা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কিন্তু দিনপঞ্জিতে উল্লিখিত সুরেন দত্তের English vein-এর উল্লেখ করে বলা never speaking a Bengali word তাঁর সম্পর্কে কবির কটাক্ষকে স্পষ্ট করে তোলে। এমনকি এর একটি অংশে নিজের সম্পর্কেও যে লিখেছেন Sometimes think as if more familiar

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

with English (from their literature) than marwaris, Mohamedans, jats etc. তাতেও বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনাস্থাই প্রকাশিত হয়, এই বোধ ও ক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে যে, কেন তিনি স্বদেশী অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বেশি পরিচিত! তাহলে কেন তিনি ইংরেজি রচনা ও দিনপঞ্জিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন?

দিনপঞ্জির ব্যাপারটা অবশ্য এক দিক থেকে পরিষ্কার। নিজেকে আড়াল করবার জন্য যে রূঢ় সত্য ও বাস্তবতাকে তিনি নিজের কাছেও তুলে ধরতে নারাজ, অথচ ন্যূনতমভাবে তা না করেও তাঁর উপায় নেই তাকে সাংকেতিক করে তোলার জন্যে বিদেশী ভাষা নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পন্থা ও উপায়। কিন্তু শুধু সেকারণেই তিনি তা করেছেন বলে মনে হয় না। একে ভালোভাবে বোঝার জন্য যে পরিস্থিতিতে জীবনানন্দ এ দিনলিপি লিখেছেন তার প্রেক্ষাপটটি আগে বোঝা দরকার।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট লেখা দিনপঞ্জিতে তাঁর জনৈক পরিচিতর বাস্তব সাফল্যের বিপরীতে নিজের প্রসঙ্গে লিখেছেন, Never knew sufferings of my 3 years। এখানেই তিনি পিসিমার চিঠি ও নানা প্রসঙ্গে নিজের ক্রমাগত তলিয়ে যাওয়া, সে বিষয়ে বিরক্ত হওয়া (Vexing) এবং প্রত্যেকেই যে তাঁকে করুণা করছে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি স্ত্রী লাবণ্যর চিঠিকে 'stabbing' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মাত্র এক সপ্তাহ পরে এই সম্পর্ককে তিনি আরও তিক্ত হয়ে যেতে দেখেছেন। ততদিনে তিনি lovelessness of wife এবং Preposterousness of marriage-এর উপলব্ধিতে এসে পৌঁছেছেন। এ সমস্ত কিছুর মধ্যে শিশুকন্যা মঞ্জুশ্রীর (জন্ম ঐ বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে, ৩ ফাল্গুন, ১৩৩৮) ভবিষ্যৎ তাঁরা বিপন্ন করছেন বলে তাঁর মনে হয়েছিল। তবে সমস্ত হতাশার মধ্যেও মাসের শুরুতে কন্যা প্রসঙ্গে কবির মনে হয়েছিল only creature in ... world to embosom. এই ভালবাসা ও প্রত্যাশা থেকেই হয়তো 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণকে তিনি 'শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীকে—বাবার আশীর্বাদ' হিসেবে উৎসর্গ করেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ৮ আগস্টের দিনলিপিতে ঐ দিনের সবকিছুকে একসঙ্গে swelling tears of yesternight হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার তার এক মাস এক সপ্তাহ পরে ১৬ সেপ্টেম্বরে morning tragedy ঘটে, যাতে pushing aside her head & all that followed—। স্ত্রীর মাথা ঠুকে দেয়া বা ঘটে যাওয়ার এই বাস্তবতার পরিণতিতে a vacant, bitter & tearful morning-এর সৃষ্টি হয়। আগেও, ২৪ জুলাইর দিনপঞ্জিতে যা পাচ্ছি তাতে মনে হয় এরকম এবং আরও নানা ঘটনা ও বাস্তব পরিস্থিতি ঐদিনের whole noonকে listless, restless ও workless noon-এ পরিণত করে। ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর তাঁর মনে হয় : I wish I would be a bachelor again—Aghast when I think of the future of domestic life। এই দিনপঞ্জিতেই wife প্রসঙ্গে তিনি bleak future লক্ষ্য করেছেন, দেখেছেন, এ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। ১০ তারিখে তাঁর মনে হয়েছে, he walks best who travels alone. ভেবেছেন, had I been alone. ঐ দিনের দিনপঞ্জিতে দেখা যাচ্ছে পিতার উৎকণ্ঠা এবং মাতার উদ্বেগে তিনি বিরক্ত বোধ করছেন। এ বিষয়ে তিনি এতোটাই উত্যক্ত বোধ করছেন যে, ১৪ সেপ্টেম্বরে বিষয়টিকে 'Mother's ক্যাট্ ক্যাট্ খ্যাট্ খ্যাট্' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সমস্ত বিষয়টির পেছনে জীবনানন্দের তৎকালীন বেকার জীবন ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা একটা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ২৭ জুলাই লিখেছেন, Felt myself exceedingly small. অন্যত্র ... more disgraceful. পরের দিন লিখেছেন, To what social position & status have I arrived now? ... A PARIAH—A man

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

who can't incur debts. ... great disability—Like a bankrupt, moral & material—A nuisance. এদিন নিজের সম্পর্কে তাঁর আরও উপলব্ধি : moneyless like a dirty wallowing pig, bespattering me. অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে শেয়ালদা স্টেশনে নানারকম আম দেখে যখন তা কেনার কথা ভাবছেন তখন অত্যন্ত রূঢ়ভাবে মনে পড়েছে, পকেটে একটিও পয়সা নেই। ২৮ সেপ্টেম্বর দিনপঞ্জির শুরুতেই তিনি লিখেছেন No more than 3 pice এবং তার পরেই তাঁর জিজ্ঞাসা, What can 3 pice give you? পরের দিনের দিনপঞ্জিতে লিখেছেন, One rupee unexpectedly got. এটিকে যখন তিনি fund of Providence? হিসেবে চিহ্নিত করেন তখন পুরো ব্যাপারটি বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে ২৫ ও ৩১ আগস্টে বরিশালে লেখা দিনপঞ্জিতে যখন homelessness-এর সমস্যাযুক্ত হয়ে great wastages ও disorders-এর সৃষ্টি হয়েছে তখন পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে বোঝা যায়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি নাটক-সিনেমা ও খেলাধুলার মত বিনোদনে যাওয়া ও তা উপভোগ থেকে দূরেই শুধু ছিলেন না, আগস্টের একদিনের দিনপঞ্জিতে লিখেওছেন যে, চা ছেড়ে দেবেন ও সংবাদপত্র রাখা বন্ধ করে দেবেন বলে ভাবছেন। লিখেছেন, No ease of pleasure ... for me, many things gone out of my life. অতএব অস্বাভাবিক নয় যে আগস্টের ৭ তারিখের দিনপঞ্জিতে তিনি ভাববেন : One should die.

একারণে বেকার জীবনের অবসানের জন্যে কবি মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। ২৭ জুলাইর দিনপঞ্জিতে দেখা যায়, তিনি ছাতার ডাঁট, malacca cane-এর ব্যবসা করার কথাও ভেবেছিলেন। পরের মাসের ১৩ তারিখে ভেবেছেন, Had I been even an office-typist! ১৫ তারখে তাঁর ভাবনা : Could I be a reporter? ২০ তারিখে মনে হয়েছে : Had I a substantial permanent job in Calcutta! এদিন তিনি motor boat ও steamer-এর business-এর কথাও ভেবেছিলেন। এর আগে ৮ তারিখে অসহায়ভাবে এমনও ভেবেছেন : Even 1 post of any stenotypist wd (*would-এর সংক্ষিপ্ত রূপ*) be far better . ২৬ জুলাইর দিনলিপি থেকে জানা যায়, জনৈক শুভানুধ্যায়ী অর্থের জন্যে তাঁকে কবিতা অনুবাদেরও পরামর্শ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে মায়ের দিক থেকে আত্মীয় ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ের জনৈক ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার যেমন তাঁকে হতাশ করেছিলেন তেমনি মা কুসুমকুমারী দাশ যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে কিছুকাল থেকে বেথুন স্কুলে পড়েছিলেন এবং যিনি মায়ের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'কাব্যমুকুল' প্রকাশ করেছিলেন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়্যু'র সেই সুখ্যাত সম্পাদকও এ বিষয়ে জীবনানন্দকে কোনো প্রকৃত সাহায্য করেননি বা করতে পারেননি। কিছুকাল পরের মোটামুটি দীর্ঘ সময়ের শিক্ষামন্ত্রী (১৯৩৪-৩৮) আজিজুল হকও যে তাঁকে 'হতাশ' ('disappointment') করেছিলেন তা আগস্টের ৩ তারিখের দিনপঞ্জি থেকে বোঝা যায়। এই হতাশার সঙ্গে জীবনানন্দের মত সংবেদনশীল কবির পক্ষে ঐ পথটিকে খুব সহজ কিংবা স্বাভাবিক মনে হয়নি। কারণ এসব ক্ষেত্রে তিনি যেমন humiliations পেয়েছিলেন তেমনি insane ... idiot-দের throwing the door in my face-এর মত ঘটনাও ঘটেছে। এই সময়ে canvassing for college jobs-এর bitter experienceও তাঁর হয়েছিল। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতায় শুভানুধ্যায়ী ও স্বজনদের অতি-উৎসাহের প্রাবল্যে উত্যক্ত হয়ে ৯ আগস্টের দিনলিপিতে কবি লিখেছেন : On বসে থাকা—বেকার কখনও বসে থাকে না : they stand & run & throb & palpitate ; it is only well-placed who have eternal charm of the easy chair or cushions, sofas & beds for them ...

কিন্তু ব্যাপারটা এতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কবি নিজেই ১৬ আগস্টের দিনপঞ্জিতে উল্লেখ করেছেন, Great insult of injury both by city coll (*college-এর সংক্ষিপ্ত রূপ*) as

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি;

শিল্পী : সমরজিৎ রায় চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

well as literary body : what God I prayed? Who serves me! ... Nobody, nowhere & the corruption, bulging flesh & wasting away ... to die thus! এই মন্তব্য তিনি করেছেন রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত 'কাব্য দীপাবলি'র ১৯৩১-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে। এতে কবির ভাষায় '28 new poets' অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁর না থাকার বিয়য়টি কবির মনোবেদনার কারণ হয়েছিল। এর ফলে কবির আত্মবিশ্বাস চিড় খাওয়ায় এবং সম্পাদকদ্বয়ের তাঁকে এতটা 'অনুল্লেখযোগ্য' বিবেচনা করায় কবি স্বভাবতই দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু সম্পাদকদের বিশেষ ধরনের কবিতা নির্বাচনের ধরন ও নিজস্ব রুচিই হয়তো জীবনানন্দকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। এটি খুব অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু তাঁর জীবনের অন্যসব ঘটনা ও বাস্তবতা থেকে তিনি যেমন নিজেকে প্রত্যাখ্যাত ও বঞ্চিত ভাবছিলেন সেখানে ডুবন্ত মানুষের খড়কুটোকে আশ্রয় করার মতো যে সাহিত্য ছিল তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের প্রধান আশ্রয় সেখানেও 'প্রত্যাখ্যাত' হওয়ার বেদনা তাঁর মনে তীব্রভাবে বাজার ফলেই কবি এভাবে দিনপঞ্জিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু দুঃখ যেমন একা আসেনা তেমনি এ সমকালে Modern Bengali Poetry প্রবন্ধে তাঁর নাম বাদ যাওয়ায় কবির ঐ ক্ষত আরো গভীর হয়ে দেখা দেয়। ১৫ সেপ্টেম্বরের দিনপঞ্জিতে তিনি তা উল্লেখও করেন। পরের দিনের দিনপঞ্জিতে তাঁর মনোবেদনা এভাবে লিপিবদ্ধ হয় যাতে এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় : Everything old must be worn-out & second-hand about me : literature, library, catalogue—Even in poetry thrust back, my anthologies & cutting don't help me : oh, were I like Sudhin Dutta controlling even 1 newest French journal! ... There is some authority in newness simply because it is new—Genuineness & genius having no place : That fool of Budha everywhere, whereas I nowhere ... এই তিক্ততা তাঁর মধ্যে অনেকদিন থেকেই ছিল। সেজন্য দেখছি ২৫ জুলাই তিনি লিখেছেন, How literature suffers here : Penniless literati have nothing to fall back here—downed from pillar to post, from frying pan into fire ... ... Devoid from all sympathy, the world saying, 'Go hung'. অতপর গভীর তিক্ততায় তৃতীয় পুরুষে নিজেকে চিহ্নিত করে কবি লিখেছেন, His pen ... won't bring him anything here—No prize, no pension, no immunity for him ... How shall he manage? A terrible case for him.

সেজন্য তিনি কখনো কখনো অতি-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অন্যদের 'সাফল্য' তাঁর কাছে নিজের ব্যর্থতার মূল্যে কেনা বলে যেমন ভেবেছেন তেমনি একে খুব স্বচ্ছ বলেও তাঁর মনে হয়নি। সেটি যে খুব মিথ্যে ছিল তাও নয়। Genuineness-এর চেয়ে চমকের মূল্য যে বেশি ছিল তাও সত্য। কিন্তু তবু এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিক্রিয়া রোগে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিষ্ণু দে সম্পর্কে তিনি যে বলেছেন hankering or hunger for fame of Rabi or Pramatha even তা সত্য হলেও অস্বাভাবিক ছিল না। সে কারণে ১১ আগস্ট প্রেমেন মিত্র সম্পর্কে more genuine than Achin বলে তার দুদিন পরেই ১৩ তারিখে তাঁর সম্পর্কে Premen Mitra's ফাজলামি comes to nothing কিংবা 'Premen & others enjoing ছানা & রসগোল্লা' বলা কতটা যথার্থ যে প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু ঐদিনই "Rajani's ফাজলামি" প্রসঙ্গে তিনি যে লিখেছেন, Thus one knows ... world—Everyone for himself, because everyone against you, because everyone again is for himself—তা অত্যন্ত তিক্ত ও গভীর সত্য, জীবনানন্দ প্রসঙ্গে ও পরিপ্রেক্ষিতে ত অবশ্যই।

বস্তুজগৎ সম্পর্কে কবির একটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। বিঁদ্যালয় জীবনে তাঁর প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্র জীবনানন্দ বাস্তবে বসবাস করেও যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন সেটি তাঁর দেখার ও বোঝার দৃষ্টিকে একটি অন্য মাত্রা দিয়েছিল। সেকারণে তথাকথিত খুব ভাল ছাত্র হিসেবে শেষ ও সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী না পেলেও তাঁর সমকালে একটি উপযুক্ত চাকুরি পাওয়ার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন। তবুও যে তিনি তা পেলেননা কিংবা পেয়েও তাতে স্থিত হতে পারলেন না সেজন্যে জীবনানন্দের বিশেষ.প্রবণতা ও মানসিকতাই দায়ী। অধরা মাধুরীকে তিনি ছন্দোবন্ধনে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্যে পরিপার্শ্ব তখনও প্রস্তুত হয়নি। স্বপ্নের বীজ মাটিতে বোনাই যে যথেষ্ট নয়, তার অন্য আয়োজন ও শর্তেরও প্রয়োজন, কবির অস্থির সংবেদনশীলতা ঐ সময়ে তা মানতে তৈরি ছিল না। ফলে তিক্ততায় ভরে গিয়েছিল তার মন, যা নির্মোহ বিচারবোধকে কখনো কখনো লঙ্ঘন করেছে।

কিন্তু তবু কবির ঐ সংবেদনশীলতা তাঁর কাব্য, সাহিত্য ও জীবনের চাবি-সূত্র বলে তাকে উপযুক্ত মাত্রায় বুঝে নেয়া দরকার। তিন মাসের এই দিনপঞ্জিতে যে 'রজনী' প্রায় সবটা জুড়ে আছেন তিনি, রজনীকান্ত গুহ তা লেখার সমকালে ছিলেন কলকাতার সিটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। এক সময় তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেখানে থাকার সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং কখনো কখনো তার উপাসনাও পরিচালনা করেছেন। এই রজনী সম্পর্কে ২৪ জুলাইর দিনপঞ্জিতে জীবনানন্দ যে লিখেছেন Rajani's love for knowledge & no less for money তা থেকে ঐ বিষয়টি বোঝা যাবে। ধর্ম ও জিরাফে থাকার এই সুবিধাবাদী নীতিকে কবির সৃজনশীলতার পক্ষে অসহ্য মনে হয়েছিল। সেজন্যে ২৫ জুলাইর দিনপঞ্জিতে লিখেছেন,—at sweet will of pigmies like Hiren, Brajen, Rajani & all. এদের ও এদের ঘোষিত প্রাগ্রসর নীতির উল্টোযাত্রা দেখে জীবনানন্দের একসময় মনে হয়েছিল : These Hindus are far more generous Catholic and imaginative visioned than Brahmos ; আগস্টের ৮ তারিখে লিখেছেন, Rajani and Ananta etc ... terrible atmosphere of ব্রহ্ম and ব্রাহ্ম। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ২৩ জুলাইতেই তিনি লিখেছিলেন : Brahmoism etc has often sound to me no more than a senseless fleshless and soulless thing. এখানেই যে তিক্ততার সঙ্গে তিনি একে Truth apart, Truth apart—সত্যবিচ্যুত বলে চিহ্নিত করেছেন তাতে অবশ্যই কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সংবেদনশীলতা যুক্ত হয়েছিল। আগস্টের ১২ তারিখে তিনি যে the mood of total depression & final blank-এর কথা বলেন তাতেও যে দেখা যায় রজনীর উল্লেখ রয়েছে তাতে মনে হয়, ঐ অনুভূতি শুধু ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যক্তি-প্রতিক্রিয়া থেকে জাত নয়, বরং তার পেছনে স্রষ্টার এক সামগ্রিক বোধ কাজ করেছে। ফলে এম. এ. পাস করবার পরপর ১৯২২-এ কলকাতার ব্রাহ্ম এডুকেশন সোসাইটি পরিচালিত যে সিটি কলেজে ইংরেজির টিউটর পদে নিয়োগ লাভ করে পদচ্যুত হওয়ার আগে পর্যন্ত যেখানে তিনি পাঁচ-ছ বছর চাকরি করলেন সেখানে হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতী পূজা করার পেছনে অন্যদের সঙ্গে তাঁর হাত থাকায় ১৯২৮-এ তিনি চাকরিচ্যুত হন। এ প্রতিক্রিয়া যতটা না বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সমর্থনের কারণে ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল কবি স্বয়ং সংস্কারমুক্ত যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার বাস্তব আচরণে এর প্রতি তাঁর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে। সে কারণে দেখি হীরেন, রজনী প্রসঙ্গে তিনি যে satire লিখতে চেয়েছিলেন তাতে বলেছেন, এরা money-কে enjoy করে। এজন্যে ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি তাদের lip-professions. অর্থের প্রতি তাদের এই মোহকে তীব্রভাবে চিহ্নিত করে তিনি লিখেছেন, Even if their God comes down & asks them to soften, they will rather be atheist than lose a pice ... মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন The English established Church, e. g., will more readily

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

pardon an attack on 38 of its 39 articles than $\frac{1}{39}$ of its income. জীবনানন্দ মার্কসের এই মন্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর দিনপঞ্জিতে ঐ মন্তব্য করেছিলেন কিনা আমরা জানি না। যদি তিনি তা করে থাকেন তাহলে বলতে হয়, বাস্তবতাকে তিনি ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও দর্শনের আলোকে দেখতে চেয়েছিলেন। আর যদি না পড়েই ঐ মন্তব্য তিনি করে থাকেন তাহলেও বলতে হবে, মানসিক ঐ যন্ত্রণা ও অস্থিরতার সময়ও কবির সত্তা তাঁকে এতোটাই স্থিরপ্রাজ্ঞ রেখেছিল যে, স্বাধীনভাবে তিনি প্রকৃত সত্যকে দেখতে পেয়েছিলেন।

দিনপঞ্জির এই অংশে তারপরেও জীবনানন্দের শিল্পীসত্তা উপযুক্ত মাত্রায় কথা বলেছে। how much more liberal ... & deep and wide I am becoming day by day. Education with an open mind & sympathetic experience (wide) does it ... Narrow dogma inconceivable also to an artist ... I might unfold & reveal the irresistible appeal of many things horrible to the dogmatists ... তাঁর দিনপঞ্জি বলে, তিনি সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। প্রাগ্রসরতার কথা বলে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ যে কূপমণ্ডুকতার পরিচয় দিয়েছিল তিনি সেখানে তাঁর মন ও বিবেচনাকে উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। তিনি কতটা উদার, বিস্তৃত ও গভীর হতে পারেন ঐ বাস্তবতার সেটি ছিল তাঁর প্রয়াস ও প্রতিজ্ঞা। শিক্ষার জন্যে যে খোলা মন ও বিশাল বিবেচনা প্রয়োজন সেটি জীবনানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সিটি কলেজে নিজের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করেও তিনি ছাত্রদের স্বতস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে চাননি। ডগমার কাছে নয়, বরং তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যেই তিনি তা করেছিলেন। সেকারণে তাঁর প্রত্যয় ছিল : Narrow dogma (is) inconceivable ... to an artist বরং তাঁর মনে হয়েছে তিনি সেসব বিষয়ের উন্মোচনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা কূপমণ্ডুকতদের কাছে ভয়াবহ বলে বিবেচিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই দিনলিপি ছিল তাঁর একান্ত সংলাপ, নিজের সঙ্গে নিজের কথা, কেবল তোমার সঙ্গে কেবল তোমার। ফলে এর আন্তরিকতা ও সততা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। এখানে একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ থেকে ব্যাপারটিকে বোঝা যেতে পারে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে নজরুল যখন আশালতা সেনগুপ্তকে বিয়ে করেন তখন প্রতিক্রিয়াশীল অন্যান্যের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজও তীব্র ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল।

সকল পরিস্থিতিতে নিজের ভেতরে এই শিল্পীসত্তাকে লালন করেছিলেন বলে জীবনানন্দ ১০ আগস্টের যে দিনটিকে wasted and deeply suffered বলে উল্লেখ করেছেন সেখানেই আবার জানাচ্ছেন, Theodore Morrison-এর লেখা তাঁর কতোটা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সঙ্গত কারণে ও শিল্পসত্তার তাগিদে তাই প্রবল বৈরিতার মধ্যেও তিনি নিম্নোধৃত পঙ্‌ক্তিমালার সঙ্গে একাত্ম বোধ করেছেন :

> And add thy drop of sorrow to the sea,
> Having known grief, all will be well with thee,
> Ay, and thy second slumber will be deep ...

এ কারণে নানা দিক থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়া সত্ত্বেও তাঁকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে শিল্পসত্তার বিপন্ন হওয়ার দিকটি। I cornered from every point of view and suffering greatly materially spiritually & what pains me infinitely—artistically ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য হই যখন দেখি জীবনের এত তিক্ত বাস্তবতার মধ্যেও শিল্পের সূক্ষ্ম রজ্জুকে তিনি কী অবাক বিস্ময়ে ধরে রেখেছেন এবং কোনো অবস্থাতেই তাকে হাতছাড়া করতে চাননি। কবি যেন মহাভারতের সেই ব্যক্তি যে সিংহের তাড়া খেয়ে পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত কুয়োয় পড়তে গিয়ে পোকায় কেটে চলেছে তেমন লতাকে আঁকড়ে ধরে ঝুলে আছেন, যার নিচে ওঁৎ পেতে আছে বিষধর সর্প। কুয়োর মুখে সিংহ, নিচে সর্প, ঝুলে থাকা লতা কেটে চলেছে পোকারা আর ঐ অবস্থায় ঝুলে থাকা ব্যক্তির প্রাণ যে কোনো সময় বিপন্ন হওয়ার অবস্থায়ও তার বেঁচে থাকা ও জীবনকে ফলপ্রসূ করার যে অসম্ভব প্রয়াস ও সাধনা তাই কবির অন্বিষ্ট। সকল বৈরিতায় তাই তাঁর পক্ষেই ভাবা সম্ভব : All prosperity or well being or success or fame is mere unction & sumguess wh (*which*–*এর সংক্ষিপ্ত রূপ*) destroys the youthful earnestness of enquiry, suspicion, restlessness, revolt & idealism ... এই দিনলিপি লেখার সময় কবির বয়স মোটামুটি বত্রিশ। কিন্তু এখানে কবির মানসিক বয়স ও চেতনাই তাঁকে ঐ বোধে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সরল কিংবা নির্দ্বন্দ্ব ছিল না। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। জীবনানন্দ তাঁর দিনপঞ্জিতে বিশেষভাবে 'Y'-এর উল্লেখ করেছেন। এই 'Y' হচ্ছে তাঁর খুড়তুতো বোন কমলা দাশগুপ্ত, বুলুর বান্ধবী। জীবনানন্দ ও 'Y' বিশের দশকে বরিশালে ছিলেন, তিরিশের দশকের প্রথম দিকে কলকাতায়। মূলত শেষের ঐ সময়ে 'Y' জীবনানন্দের হৃদয়-মন মথিত করেছিলেন। তখন তিনি বিবাহিত এবং দিনপঞ্জি লেখার সময় কন্যা মঞ্জুশ্রীর জন্ম হয়েছে। দিনপঞ্জির নানা অংশে 'Y'–এর প্রবল উল্লেখ ও উপস্থিতি সত্ত্বেও এর প্রায় শুরুতেই কবি যা লিখেছেন সেটিই তাঁর চাবি–সত্য : A rural girl beloved who might flavour my life with love : Y wakes that but Y is far from that. She might be that, but she is not that ... Ah, where could one find it! ... If one could. ঐ সমকালে তাঁর একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে কবির স্বহস্তে লেখা রয়েছে : Y = শচী। এ নামে তাঁর একটি (অপ্রকাশিত?) উপন্যাসও রয়েছে। কবির 'গ্রাম ও শহরের গল্পে'র নায়িকাও শচী। গল্পের অন্তিমে জীবনের, এবং হয়তো কবির নিজেরও জটিলতা প্রকাশিত। "সোমেন বল্লে—তোমাকে নিয়ে সেই বকফুল বন–ধুধুল কলমীলতা বাঁশবনের ভিতর গেলে আমি তো আর ফিরে আসতে পারব না। কিন্তু কথা হচ্ছে—যা ছিলাম ... তা নেই আমরা। তোমার যখন একটু বেড়িয়ে আসবার সাধ—মানুষ যে লোভে তাজমহল দেখতে যায়—ঠিক তেমনি একটা ফরমাস মত ট্রিপে খানিকটা সময়োপযোগী ভাবপ্রবণ হয়ে, হয়তো চোখের জল ফেলবে, আমাকে জড়িয়ে ধরবে, চুমো দিতে দেবে—কাঁধে মাথা রেখে কাঁদবেও হয়তো—হয়তো আর ফিরে যেতেও চাবে না—হয়তো ব্যবহার করতে দেবে তোমাকে—কিন্তু সেসব একটা দুপুরের জন্য শচী, পাড়াগাঁর মাঠ জগদ্দলের আচ্ছন্ন দুপুর বড় মারাত্মক—কিংবা একটা সন্ধ্যা—একটা রাতের জন্য। পরদিন ভোরেই তুমি এক সাঁতারে বারো চোদ্দ বছরের ওপারে—চলে যাবে, কে তোমাকে ধরতে পারবে?'

একদিকে কবি rural beloved–এর সন্ধান করেন ভালোবাসা দিয়ে যে তার জীবনকে স্বাদু করে তুলতে পারতো— যে হয়তো বনলতা সেনের চেয়েও স্নিগ্ধ, তার চেয়েও innocent। 'Y' –এর প্রতি কবির মুগ্ধতা সত্ত্বেও তিনি চান সে ঐ গ্রামীণ মেয়েটি হয়ে উঠুক, যা আসলে তার পক্ষে কখনোই হওয়া সম্ভব নয়। সে কারণে তার প্রতিরূপ শচী গ্রামে গিয়ে বড় জোর একদিন টিকতে পারবে, আবার তাকে ফিরে আসতেই হবে শহরে, কিংবা গ্রামে থাকলেও সে আর ওখানকার কেউ হয়ে উঠতে পারবে না। এ জটিলতায় পড়ে 'Y'–কে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

romantic setting–এ kissing & kind–এর মধ্যে ভেবে মাত্র দু বছর আগেও যে তাঁর কাছে ছিল life & death তাকে আর সেভাবে ভাবতে পারেন না।

কিন্তু ঐ স্বপ্নটিকে জীবনানন্দ কখনো ত্যাগ করেননি, আর করেননি বলে কখনো বাংলাকে ছেড়ে যেতে চাননি। এ নিছক নিসর্গপ্রীতি কিংবা স্বদেশপ্রেম নয়, তাঁর সত্তার অতল জলের আহ্বান। বাংলাদেশে যখন জীবনানন্দর চাকরির কোনো সুযোগ হচ্ছিল না তখন সপরিবারে শিলং–গৌহাটিতে থাকা তাঁর কাকা অতুলানন্দ দাশ কবির জন্যে শিলং–এ একটি চাকরির ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে কাকা, বড় পিসিমা প্রমুখ তাঁকে অনুরোধ করেন ও তাগাদা দেন। কিন্তু আগস্টের ৯ তারিখে জীবনানন্দ লিখেছেন, ... City coll or non-Beng jobs never will ... ১৭ তারিখে পিতা ও Shillong job বিষয়ে যা লিখেছেন তাতেও ঐ অনীহা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই অন্তর্গত প্রেরণার কারণেই কৃষ্ণনগরে চাকরির চেষ্টা করে তাতে ব্যর্থ হয়ে ট্রেনে ফেরার পথে বাংলা ও তার তৎকালীন রাজধানী কলকাতাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন। ৩১ জুলাইর দিনপঞ্জি থেকে : Shadowy patches, refreshing breezes, rural vistas, dreams dreams—Bengal always—might be enervating & any damned thing but still she is mine as no other is in a thousand ways—her sons—her soul—her atmosphere, field sky, sun shade silence of reminiscences—

....

Moonlight—fleecy clouds—moondeluged fields & forests—জোনাকী silence—serenity—refreshing breezes ...

৫ আগস্টের দিনপঞ্জিতেও রয়েছে এর প্রকাশ : Charming autumn morning ; superb sky, earth water & light, reminding of old কিশোর boys with its hopes of dreams ... and I regret Bengal to leave? Never ... এই সেই গ্রামপথ—

তিনি একে irresistible charm of this soil বলেছেন। দেখেছেন countryside ('ধানসিড়ি') with cornfields, yellowing corn, autumn morning of noon.

কবির প্রিয় হেমন্ত ঋতুর মধ্যে তিনি শুধু তাঁর স্বদেশ ও নিসর্গকেই নয়, নিজের সত্তাকেও ছুঁয়ে গেছেন। দিনলিপিটি পড়ে ও এর দৃশ্য ও সঙ্গীতকে মিলিয়ে নিতে গিয়ে মনে হয় ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র জীবনানন্দের মনের কোথাও কীট্‌সও বুঝি এসে উপস্থিত হয়েছেন, বিশেষত হেমন্তের বর্ণনায়। 'Ode to Autumn'–এর নির্বাচিত অংশ পড়লে একে বাংলার প্রকৃতি হিসেবে চিনে নেওয়াও অসম্ভব নয়। কীট্‌স ও জীবনানন্দের এই যুগলবন্দী কবিতার অবিভাজ্য ভাষা ও ভাষ্যও বটে :

Sometimes whoever seeks abroad may find
Thee sitting careless on a granary floor,
Thy hair soft-lifted by the winnowing wind ;

ii

And sometimes like a gleaner thou dost keep
Steady thy laden head across a brook,
Or by a cider-press, with patient look,
Thou watchest the last oozings hours by hours.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Where are the songs of Spring? Ay, where are they?
Think not of them, thou hast thy music too,—
While barred clouds bloom the soft-dying day,
And touch the stubble-plains with rosy hue ;
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river swallows, born aloft
Or sinking as the light wind lives or dies,
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn ;
Hedge crickets sing ; and now with treble soft
The red-breast whistles from a garden-croft ;
And gathering swallows twitter in the skies.

কিন্তু হেমন্তের বর্ণনা জীবনানন্দের একটি গল্পে তার মাত্রা ও বিন্যাসকে বদলে দিয়েছে, প্রকৃতি হয়েও তা হয়ে উঠেছে প্রকৃতিত্তোর, তাঁর গল্পের ভাষা অনুসরণ করে এই মানুষকে বলা যায় উত্তরমানুষ : 'এই হেমন্তকাল আমি ভালবাসি। কত পাড়াগাঁয়ের হেমন্ত মনে পড়ছে আমার। অঘ্রাণের বিকেল বেলা—নদীর নিঝুম জল—মাঠে খড় পড়ে রয়েছে—বাঁয়ে তাকালে অনেক নৌকোর কমলা ধূসর ফিকে নীল ফিকে সবুজ পালে রোদ এসে পড়েছে দেখা যায়—রোদের ভিতর শাদা পালের অপরিসীম উজ্জ্বলতা মানুষের নয়—হৈমন্তী সূর্যের ; মাঝিদের ভিড়—এখানে সেখানে—বিকেল যেন ঘরানা প্রেতের মত, পেয়ে গেছে নিঃশব্দ নিঃস্পৃহ মানবীয় মাপ—হেমন্তের মাঠে বাজারে। আবার নদীর জল—আবার খড়ের মাঠ—বাছুরের সোনালি পশম খড়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে—চারিদিকে কৃষক—গোরুর কজ্জলশ্রী ভেদ করে এক মাধ্বী শাদা গাভী পূর্ণিমার মত—আকাশে হরিয়াল—উঁচু আকাশে রোদের ফাঁদের ভিতর চাতকের ডানা খেলা করছে—কয়েকটা চাতকের—সব সময়ই তাদের বিমুক্তি ধরা গেছে জেনে—নিকোনো রোদকে ধরে রাখতে চেয়ে—রোদকে নিভে যেতে দিয়ে—

'হেমন্তে নারীর দেখা পেয়েছি কি কোনোদিন?'

'পেয়েছি। কিন্তু যে ভালবাসে তাকে ভালবাসতে চেয়েছিলাম, অথচ হেমন্তলোক তাকে কোথায় রেখে দিয়েছে?'

'উত্তরমানুষ' এর একটি ব্যাখ্যাও খুঁজে নিতে চেয়েছে : 'এ জীবনে বহতা সৌন্দর্যকে ভালবেসেছি—প্রকৃতির—নারীর—মননের—এবং স্থিরতাকেও। সেটাকে সৌন্দর্য ঠিক বলে না ; বলা চলে চেতনা অভিনিবেশের ; এ আমারও আছে, আমি যাকে চাই তারও আছে ; পরস্পরকে একজন করে নেওয়া চাই।'

দুই

দিনপঞ্জিতে জীবনানন্দ লিখেছেন, Man in this world, as it is, is bound to live in exile, anguish, ignominy & misery ..... So there must be a dreamworld for him provided by ... poet in whosoever can do it. কৃষ্ণনগর থেকে হতাশ হয়ে তিনি যখন কলকাতা ফিরছিলেন তখন তাঁর শুশ্রূষা করেছিল প্রকৃতি। তিনি ভেবেছেন, God meant man to have leisure or mood enough to appreciate infinite varieties of nature. কিন্তু ঐ সময়েই তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি কলকাতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Mother Cal grand superb with her lights of imposing buses..... Mother take your weary son. Why I leave your breast mother like a stupid traunt so often? প্রকৃতির পরিবর্তে কিংবা প্রকৃতির সঙ্গে কলকাতাও যে কবির dreamworld হয়ে উঠলো কিংবা দিনপঞ্জির অন্যত্র উল্লিখিত Cal with theatre, cinema etc on one side of B.F.A games on other side and so on ... splendid Cal যে কবিকে নাগরিক সংবেদনশীলতা আবিষ্কার করতে অনুপ্রাণিত করলো তা থেকে মনে হয়, পাথর থেকেও তিনি রস ও অনুভূতি নিংড়ে নিতে চেয়েছেন। 'সুচেতনা'র কবি রূঢ় বাস্তবতার মধ্যেও পৃথিবীর 'ক্রমমুক্তি'কে খুঁজেছেন, 'না এলেই ভালো হত অনুভব করে' 'শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে' 'মানুষের যা হবার নয়' তা হতে প্রত্যক্ষ করেছেন। পৃথিবীর 'গভীর গভীরতর অসুখ' জেনে এবং 'অগণন মানুষের শব' দেখেও সেখান থেকে উৎসারিত 'স্বর্ণের বিস্ময়'কে আবিষ্কার করতেও তিনি ভোলেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কবির মনে হয়েছে, 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।'

এ নিয়ে কবির 'অভিনিবেশ' বোঝা যায় যখন দেখি The City রচনায় তিনি কলকাতাকে গাদ্যিক দৃষ্টিতে দেখেও তার কবিসত্তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, I have an idea, however, may be mistaken one, that Calcutta, with all its blemishes and bad names is, after all, even in its odd architeetural medley not so graceless as many strangers and Indians are disposed to think that it is. কবি স্বীকার করেছেন Calcutta has follies and sins, কিন্তু সেই সঙ্গে মনেও করিয়ে দিয়েছেন, Not more dreadful and diversified than they are usually in the other big cities of the world. তিনি স্বীকার করেন কলকাতার প্রতি অনেকেরই ভালবাসা বড় নগরের pleasure ও স্বার্থলাভের জন্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও Many—perhaps their number tends to increase have starved and died in Calcutta who with their family might conceivably have done much better outside. In the face of this tragedy too, it is surprising how people blindly repose their trust in the healing power of Calcutta and pathetically cling to it. কবি নিজেও তাই। কলকাতার প্রতি তাঁর এই প্রেম জীবনানন্দের কবিসত্তারই সম্প্রসারণ। সে জন্যে তিনি স্বপ্ন দেখেন, এই নগরী একদিন 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।' কিন্তু সেই সঙ্গে কবির বৌদ্ধিক সত্তা আত্মবিশ্বাসে ঋদ্ধ হয় যখন লেখাটির উপসংহারে তিনি এর সাংস্কৃতিক সত্তার বিস্তৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, Calcutta served as the unique link between India and the west drawing forth the best from both relationships for the regeneration of India as a whole. It has long given India lead in politics and, what is not often recognized, in culture. Its great political and even social and educational initiatives have passed to other parts of the country, but Calcutta probably still continues to have among the best of painters, novelists and poets in India.

জীবনানন্দের এই চেতনা আরো স্পষ্ট হয় যখন তিনি টমাস মানের উপন্যাস 'ডক্টর ফস্টাস'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে দেখান, তার নায়ক আড্রিয়ান লেফেরকুন কিভাবে জার্মানী ও পৃথিবীর 'ক্রমমুক্তি' চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের এই অংশটি উদ্ধারের পূর্বে কবি যে 'যুক্তির মাধুরী'র কথা বলেছেন তাতে মনে হয়, পেত্রার্ক যেন সনেটে তাঁর প্রেমকে সংহত ও ঘনবদ্ধ করছেন কিংবা জীবনানন্দ নারী ও মননের মধুকে অভিন্ন যুগলবন্দিতে বেঁধেছেন : We spoke of it as a problem, a paradoxical possibility : the recovery, I would

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

not say the reconstitution—and yet for the sake of exactness I will say it—of expressivism, of the highest and the profoundest claim of feeling to a stage of intellectuality and formal strictness, which must be arrived at in order that we may experience a reversal of this calculated coldness and its conversion into a voice expressive of the soul and a warmth and sincerity of creative confidence.

তিন

১৯৩১-এ-ই জীবনানন্দ বিষ্ণু দে-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, অনেকদিন আগেই তিনি ইংরেজি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে এটা জানাতেও ভোলেননি, 'ভবিষ্যতে কি করব জানি না।' ১৯৪৫-এর শেষে 'মডার্ন বেঙ্গলি পোয়েমস'-এ নিজের কবিতার স্বকৃত অনুবাদ গৃহীত না হওয়ায় কবি নিশ্চিতই হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু এই সমকালে অন্তত একটি কবিতার ইংরেজি ভার্সান আমাদের অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য করে। 'মহাপৃথিবী', অন্তর্ভুক্ত 'বিভিন্ন কোরাস' কলেবরে ছোট, 'সাতটি তারার তিমির'-এর একই শিরোনামাঙ্কিত কবিতা আরেকটু বিস্তৃত ও দীর্ঘ। এই সময়েই তিনি লিখেছিলেন ইংরেজি কবিতা, 'Chorus'. দৃশ্যত তিনটি রচনা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হলেও এদের গভীরতর সাদৃশ্য রয়েছে। প্রায় কাছাকাছি একটি সময়সীমার মধ্যে মূলত একই কবিতা যে তিনি অন্তত তিনবার লিখেছেন তাতে মনে হয়, কবি যা বলতে চান তা তিনি বলে উঠতে পারছেননা। না বক্তব্যে, না কাব্যভাষায়, না শৈলীতে। সেজন্যে সৃজনশীল এই রচনাকে তিনি একটি ভিন্ন ভাষায় লিখে নিজেকে ও তাঁর সমকালকে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় 'কোরাস'-এ তিনি ১৯৪২, তেতাল্লিশ ও চুয়াল্লিশের উল্লেখ করেছেন, 'Chorus'-এ শুধু ১৯৪৪-এর। কিন্তু তাতেও পূর্বের দুটি সাল অন্তর্ভুক্ত। এই সমকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তেতাল্লিশের (পঞ্চাশের) মন্বন্তর ঘটেছে বা ঘটে চলছে। কলোনীর প্রান্তবর্তী সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো তখন প্রস্তুতিহীনভাবে ব্রিটিশ-প্রদত্ত স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সময়ের এই অভিঘাত কবিতাত্রয়ের প্রধান বিবেচ্য হলেও এর অন্তর্মুখী চেতনা তাকে একটি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। কোরাস অথবা বিভিন্ন কোরাস নানাভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই দানা বাঁধছে না। প্রথম 'বিভিন্ন কোরাস'-এ আছে :

> আবার সবুজ হয়ে জুয়ায়ে নিয়েছে
> আমাদের সন্তানের—সন্তানের সন্তানের প্রয়োজনমতো।

কিংবা একটু পরেই :

> জেনে তবু মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সংগম এড়ায়ে
> স্থির হয়ে রবে নাকি সন্ততিরা, সন্ততির সন্ততিরা সব?

এই যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের বদ্ধতা তা 'Chorus'-এর শুরুতেই পাই :

> They have been long on this earth
> But they have not been able to make much of life
> And now Death is at hand

অতঃপর

> To their children life is a violent experience now.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, দীর্ঘদিন যাপিত জীবনের পরিণতি :

Matter of habit with them to sleep,
Rise & sleep as a matter of right.

প্রথম 'কোরাসে'র প্রায় শুরুতেই রয়েছে

সহধর্মিনীর সাথে ঢের দিন—আরো ঢের দিন
করেছি শান্তিতে বসবাস ;

অনুত্তেজিত 'শান্তি'র উল্লেখ অনেকটাই স্তব্ধতার প্রকাশ। জীবনানন্দীয় পরিভাষায় যাকে 'ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত' হতে দেখা যায়। দ্বিতীয় 'কোরাস'-এ একসময় তা উন্মোচিত হয়েও পড়ে :

একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।
আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চলে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে ;
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই—পথ নেই বলে—

এর আগে অবশ্য ভেতরের তাবৎ অশান্তিকে লুকিয়ে রেখে শান্ত ভঙ্গিতে কবি বলেন :

ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনতামতে।
গ্রন্থকে বিশ্বাস করে পড়ে গেছি ;

কী ভয়ংকর এই সত্য যখন তিনি তৃণমূলে গিয়ে তা দেখেন :

—গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,
যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধান
রুয়ে গেছি একদিন (এতদিন?) ;

একটি উদাহরণ থেকে দেখা যাবে বাইরের ও ভেতরের দাহ্য বাস্তবতাকে কবি কতটা হজম করতে চেয়েছেন। তাঁর দিনপঞ্জিতে আছে : God has given man too many seed & too much sex desire & therefore difficulty of maintaining family ... great strain & therefore tragedy of civilization & competition etc and between these two there is no room for what imaginative or spiritual man wants. 'Chorus'-এ কবি দ্বিতীয় 'কোরাস'-এর বাস্তবতার পুনরবৃত্তি করে ('They have worked, been paid for, and voted for people's man) বলেছেন : Have given rope enough to the sanctity of honest sex. দ্বিতীয় 'কোরাস'-এ-ও জানাচ্ছেন : 'তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা/হারাইনি।' তাহলে ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে : Matter of habit-এ, এলিয়টের চরিত্র যাকে বলেছে, I'm glad, it's over এও তাই।

এখানেই বোঝা যায় জীবনানন্দ বাংলা কবিতার পাশাপাশি কেন ইংরেজি 'Chorus' লিখেছেন। তাঁর আবেগ ও সংবেদনশীলতা সত্ত্বেও কবি facts-এর কাছাকাছি আসতে চান। সেটি ইংরেজিতে যতটা সম্ভব বাংলায় ততটা নয়। ইংরেজিতে লিখে কবি তাই নিজেকে প্রস্তুত করছেন যাতে বাংলায় concrete terms-এ সেকথা বলতে পারেন। হয়তো খসড়া, কিন্তু তবু 'Chorus'-এর এই ভাষা ঋজু ও factual :

These men have long been in our land,
Have seen how our heroes have given hostages to fortune,
And have been beaten by reality

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

In the darkness of our fields
The far year has no guts in it
Put the hearts of our cities
Are the men who have created nothing.
And don't know it.

বাস্তবতার এই ঋজুতাই কবিকে দিয়ে দ্বিতীয় 'কোরাস'-এ লিখিয়ে নিয়েছে :

ঢের দূরে নগরীর নাভির ভিতরে আজ ভোরে
যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অবিকার মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ করে,—রাত্রে ঘুমায়
পরিচিত স্মৃতির মতন।

একে 'Chorus'-এর 'matter of habit' দিয়ে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। আরও পরে কবিতায় এই বাস্তবতা আরো বেশি সংহত হয়েছে :

রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষা, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়।

দিনপঞ্জিতে কবি যে স্বাস্থ্যকর seed ও sex-এর কথা বলে সেইসঙ্গে তার উল্টোদিকে family maintain-এর সাধারণ বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিযোগী সভ্যতার তীব্র দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন কিংবা তার চেয়েও বড় ঐ বাস্তবতার কল্পনাপ্রবণ ও সৃষ্টিশীল মানুষের কী দশা হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন এর সবটাই ইংরেজি গদ্যে যত সহজে বলা যায় বাংলায়—তার ভাষা ও প্রবণতায় ততটাই অস্পষ্ট থাকে। সেজন্যে ইংরেজিতে দিনপঞ্জি ও কবিতা না লিখে তাঁর উপায় ছিল না। হয়তো ইংরেজি ঐ খসড়া থেকেই তিনি ফ্রয়েডিয় 'লিবিডো' ব্যবহারে উৎসাহিত হয়েছেন। দ্বিতীয় 'কোরাসে'র পুরো ঐ অংশটি পড়া যাক :

সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংসার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।
সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে ;
ঈশ্বরের চেয়ে স্পর্শময়
আক্ষেপে প্রস্তুত হয়ে অর্ধনারীশ্বর
তরাইয়ের থেকে লুব্ধ বঙ্গোপসাগরে
সুকুমার ছায়া ফেলে সূর্যিমামার
নাবিকের লিবিডোকে উদ্বোধিত করে।

'Chorus'-এ যে কবি বলেছেন ... these people have been taught by the time to save their pleasures তার সমর্থন 'The City' রচনায়ও পাওয়া যায় : ... all likely pleasures of the city purchaseable by money.

কিন্তু তবু কবির প্রত্যয়, 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।' এখানেই জীবনানন্দ কবি। ভিন্ন সংস্কৃতির ভাষায় খসড়া করে তাই তিনি ভাবেন :

Fresher than blades of grass is woman ;
And man, dead & unborn, nobler than rivers.

দ্বিতীয় 'কোরাস'-এ তার মর্মানুবাদ :

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস।
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে করে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত হয়ে উঠে নদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই চেতনা থেকে 'ঘাসের চেয়েও বেশি মেয়ে'কে কবি অনুভব করেন, কিংবা অন্তত করতে চান।

ইংরেজিতে লেখা হলেও বাংলার নিসর্গের মধ্য দিয়েই কবি নিজের সত্তাকে ছুঁতে চান, যেটি আবার শেষ পর্যন্ত তাকে ছাড়িয়েও যায়।

> The sunlit Horials, high above the nuzzies of cannons
> Hold the freedom of their will to quit the skyline of lost rhythms—
> And fare on to a great, noble blue.

'Chorus'–এর অন্তিমাংশের খসড়াটির সম্ভাবনা হয়তো পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রগানের 'অধরা মাধুরী' এখানেও 'বিদেশীনী'র মধ্য দিয়ে কবির 'অন্তরে'র 'ঝরা ফুলের গন্ধ' পেয়েছে। অভিজাত ফুলের পরিবর্তে ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন ড্যাফোডিলের বিনয়ের মধ্যেই তার সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন জীবনানন্দও তেমনি সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্বকে খুঁজে পেয়েছেন :

> The waters of joy pass away into image
> Of man's death, disease, dereliction and strain,—
> Hoping to rise refreshed from the waters of 1944.
>
> Man seeks love & wisdom?
> He has hoodwinked ?--or moralised his moments
> Out of blood, lechery, vandalism, lie & terror?
> Has the will been awakened?
> Do we see the common people today as singing
> masters of Time & times.

চার

ভবিষ্যতের অনুজ–জায়া নলিনী দাশকে ১৯৪২–এ জীবনানন্দ লিখেছেন,—'অধ্যাপনা জিনিসটা কোনোদিনই আমার তেমন ভালো লাগেনি। যেসব জিনিস যাদের যেরকমভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে আমার বিশেষ আস্থা নেই।' এর প্রায় চার বছর পরে ১৯৪৬–এ জনৈক অনুরাগীকে লিখেছেন, 'এখনও অধ্যাপনাই করতে হচ্ছে কিন্তু মনে হয় এ পথে আর বেশিদিন থাকা ভালো না। যে জিনিস যাদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সবই অসারতার নামান্তর নয় কি?' এমনকি নিজের প্রবন্ধ 'শিক্ষা দীক্ষা শিক্ষকতা'র শুরুতে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, 'খুব ভালবেসে যে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছিলাম একদিন তা বলতে পারব না, শিক্ষকতায় লিপ্ত হয়ে থাকতে যে খুব ভালো লেগেছিল তাও নয়।' তবে নলিনী দাশকে লেখা চিঠিতে যে তিনি তারপরই অধ্যাপনা প্রসঙ্গে লিখেছেন –'এ কাজে মন তেমন জাগে না, তবু সময়–বিশেষে অন্য কোনো প্রেরণার চেয়ে বেশী জাগে তা স্বীকার করি' তা থেকে মনে হয় সমস্ত বৈরিতার মধ্যেও ব্যাপারটাকে ফলপ্রসূ করবার চেষ্টাও তিনি করেছেন। অনুরাগীকে লেখা চিঠিতেও যে তিনি 'নতুন পটভূমি' নেমে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তাতেও মনে হয়, এর একটি পরিণতির জন্যেও তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

নিজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন বলেই নয়, তৎকালীন সামগ্রিক পটভূমিতেও ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে এর ভূমিকাকে তিনি অত্যন্ত নির্মোহভাবে যাচাই করে দেখতে চেয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শিক্ষার কথা' প্রবন্ধে জীবনানন্দ লিখেছেন, '... সাহিত্য হিসেবে না হোক, ভাষা হিসেবে অন্তত ইংরেজিকে এখনই এ দেশের শিক্ষা দীক্ষার ভেতর থেকে বিদায় দেওয়া চলে না। ... আরও কয়েক দশক, খুব সম্ভব এই শতকের শেষ অব্দি—এদেশের ছাত্রদের ইংরেজি জানা দরকার। তা না হলে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের চর্চা আধাখেঁচড়াভাবে চলবে, বেশি সার্থকতা পাওয়া যাবে না। ইংরেজি ভাষা এখন পৃথিবীর বিদ্যা ও জ্ঞানের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাহন। সে পর্যায়ে উঠতে (যদি ওঠা সম্ভব হয়) বাংলা ভাষার এখনও ঢের দেরি আছে ...।' এই প্রসঙ্গে খুব সহজ ধরনের ইংরেজি শেখানোর প্রসঙ্গের উল্লেখ করেই কবির মনে হয়েছে,—'কিন্তু বিদ্যা ও জ্ঞানবাহী ইংরেজি কোনো বুনিয়াদী বা উপাদান ভাষা মাত্র নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি বড়, ঢের বেশি সম্পূর্ণ ও সক্রিয়।' 'ইংরেজের অনেক দোষ' থাকলেও 'শুধু তাকে দোষ দেয়া চলে' বলে কবি মনে করেন না। বরং ভাষার ক্ষেত্রে ঐ ইংরেজির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা 'শিক্ষা দীক্ষা' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন : 'শিক্ষা যে ইংরেজির মারফতে চলে এসেছে সেটা না হয়ে কিছুতেই পারত না। আমল ইংরেজের ছিল, ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা ছিল, এইজন্যে ফার্সি বা বাঙলার আশ্রয়ে না হয়ে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা চলে আসছে। ভালোই হয়েছে। উনিশ শ সালের বাঙলার চেয়েও তার মহত্ব সাহিত্য ও ভাষার দিক দিয়ে বেশি, হয়তো ঢের বেশি। এ পঞ্চাশ বছরেই শুধু নয়—আরো কিছু কাল ইস্কুল কলেজে শিল্প, কলা বিশেষ করে বিজ্ঞানের উপযুক্ত শিক্ষার জন্যে ইংরেজিকে ধরে রাখতে হবে, না হলে শিক্ষায় দোষ ও তুচ্ছতা থেকে যাবে।' এই ভাষার মধ্য দিয়ে ইতিবাচক যে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছিল মুক্তকণ্ঠে কবি তাকেও স্বীকার করেছেন : 'এদেশের বেশির ভাগ (যদিও সব নয়) ছাত্রছাত্রীরা (অন্তত যতদিন ইস্কুল কলেজে থেকেছে তারা) ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আগমনের খারাপ দিকগুলো দেখে যত বেশি বিচলিত হয়েছে সেই তুলনায় সে যুগের ভালো দিক পরিষ্কার মনে স্বীকার করে নেবার তেমন সুযোগ পেয়েছে বলে মনে হয় না। এ দেশে ব্রিটিশের সময় অনেক ভালো জিনিসও পাওয়া গেছে; ব্রিটিশ যুগে বাঙালির মন নানা দিক দিয়ে সজাগ হয়ে উঠবার অবসর পেয়েছে; ফরাসি বিপ্লব ও পশ্চিমের সভ্যতার ফলাফল কম বেশি স্পষ্টতায় বুঝে দেখে জীবনে প্রয়োগ করবার সুযোগ পাওয়া গেছে, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিক স্বচ্ছন্দতার অর্থ বাঙালি আগের চেয়ে ভালো করে বুঝতে পেরেছে; সমাজ ও জীবনে যুক্তির ব্যবহার ফিরে পেয়ে, আমার মনে হয়, উপকার হয়েছে উনিশ ও এ শতকের বাংলার। এই সবের ষোল আনা বাহন হিসেবে ইংরেজি ভাষার মতো একটা বড় জিনিস প্রায় সোয়া শ বছর ধরে ভোগ করে আসছে বাঙালি, ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকেই যে ঢেলে সাজিয়ে বড় করে তুলতে পেরেছে তা নয়, পৃথিবীর চিন্তার সঙ্গে যোগ রাখতে পেরেছে, মানুষের জীবনে সত্য চিন্তা কত দরকারি তা বোধ করে আসছে।' ফলে তাঁর মনে না হয়ে পারেনি, 'ইংরেজি না জেনে বা কম শিখে পৃথিবীর জ্ঞান বিচারের সম্বন্ধ থেকে দূরে সরে থাকলে শিক্ষা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়বে।'

উল্টোদিকে 'ইংরেজির দিকে যে ঢিলেমি ও বিরাগ ছাত্রদের ভেতর এসে পড়েছে' তা তাঁর কাছে 'ইংরেজ বিদ্বেষে'র ফল বলে মনে হয়নি। বরং 'আর্থিক কারণে ও অন্য অনেক রকম নৈষ্ফল্যে জাতির জীবনে যে নানা পাপ, অরুচি কুড়েমি মৃত্যুচিন্তা এসে পড়েছে কষ্ট করে ইংরেজি ভাষা শেখার চেয়ে রেহাই পাওয়া তারই একটা লক্ষণ।' তিনি লক্ষ্য করেছেন, এর ফলে ছাত্ররা 'ভালো করে বাংলাও শিখছে না।' তিনি বলেছেন, 'ঠিকভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠবার শক্তিও কমে গেছে হয়তো।' '...নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া ইংরেজিও যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের শুদ্ধভাবে জানতে হবে সেটা ছেলেরা এতদিন পরে আর বরদাস্ত করতে পারছে না।' শিক্ষা হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক, ক্লিশে ও চর্বিতচর্বণের নামান্তর। অর্ধশতাব্দী আগে জীবনানন্দ যা দেখেছেন নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দে এসে তা আরও নাজুক হয়ে উঠেছে। ঐ রকম শিক্ষাদানের ব্যক্তিবর্গ এখন হাস্যকর ও কূপমণ্ডুক আত্মসন্তুষ্টিতে নিমজ্জিত। ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন—অগৌণে ইহা দোকানদারিতে পর্যবসিত হইবে—শতাব্দী পেরিয়ে তা ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে।

জীবনানন্দ যে অধ্যাপনা পছন্দ করেননি কিংবা সে চাকরিও তিনি ঠিকমত পাননি কিংবা পেলেও তাতে স্থিত হতে পারেননি তার পেছনের মর্মগত কারণটি ছিল, সকলে যেখানে ভাসাভাসাভাবে কাজ চালিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন কিংবা বিদ্যাগৃহের বাইরে থেকেই তাকে চালাকিতে পরিণত করছেন সেখানে এই কর্মে তিনি আন্তরিক হতে ও তার ভেতরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। সেজন্যে ইংরেজির ফাংশনাল বা কেজো দিক নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বিদ্যা ও জ্ঞানবাহী এই ভাষাকে ঢের বেশি জীবনমুখী, সম্পূর্ণ ও সক্রিয় করতে চেয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি থাকাকে তিনি এখন 'ভালোই হয়েছে' বলেন কিংবা ইংরেজি ত্যাগ করলে এখনও 'শিক্ষায় দোষ ও তুচ্ছতা থেকে যাবে' অথবা 'শিক্ষা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়বে' বলেন তখন তিনি এর অগ্রসর সংস্কৃতির ওপরই জোর দেন।

এজন্যে বাংলা কবিতায় একটি ইংরেজি ছায়া-শরীর খাড়া করেন, 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা'র অসামান্য পঙ্‌ক্তির রচনা কিংবা তার ব্যাখ্যার জন্যে 'The City'র মত নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচিত হয়। মাধুরী তার যুক্তি ও ভিত্তি খুঁজে পায়।

পাঁচ

জীবনানন্দ তাঁর দিনপঞ্জিতে নিজের সম্পর্কে লিখেছেন : An unsuccessful man, a failure, an unemployed, kicked. পরের দিন, ২৫ জুলাই আবার লিখেছেন : I stand estranged, stranded,—hounded ...

ঐ সমকালে লেখা তাঁর একটি কবিতায় আছে :

> চারিদিকে রিট্রেঞ্চমেন্ট—বিজিনেস ডিপ্রেসন
> আমি বেকার,
> অনেক বছর ধরে কোনো কাজ নেই
> কোথাও কাজ পাবার আশা নেই
> একটা পয়সা খুঁজে বার করবার জন্য আমার সমস্ত শক্তির হয়ে
> পড়েছে অবসান (?)
> পৃথিবী যেন বলছে : তোমার এই শক্তি, বরং কবিতা লিখুক গিয়ে
> আমি বলি, আমিও কবিতা লিখতে চাই
> কিন্তু পেটে কিছু পাব নাকি?

দিনপঞ্জিতে আছে বাস্তবতার আরো তিক্ত প্রতিফলন : ... no money, no position, no opening, no opportunity, no sympathy—কিন্তু এখানেই আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি একইসঙ্গে রূঢ় এই বাস্তবতার মধ্যে বাস করেও Fine clear breezy night অথবা fleecy clouds-কে প্রত্যক্ষ ও তার আনন্দ উপভোগ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়ে ওঠার এই আমলকির নামই জীবনানন্দ দাশ। তাঁর পক্ষেই অধরা মাধুরীকে ছন্দোবন্ধনে ধরা সম্ভব। বকুলবনের গানে তিনিই সাড়া দিতে পারেন। শেক্সপীয়রের ভাষায় he is made of such stuff as dreams are made on.

দিনপঞ্জির একটি গল্পের খসড়ায় জীবনানন্দ জানান : What to her wd be gold and to me is ashes : ওর কাছে যা হবে স্বর্ণ, আমার কাছে তাই ছাই ; ও স্বর্ণ, আমি ছাই।

কবির স্বপ্ন আর স্বর্ণ।

হ্রস্ব হতে হতে স্ব।

তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বটে, কিন্তু বেঁচে আছে তাঁর স্বপ্ন অথবা এর নির্যাস।

স্ব, স্ব, স্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে জীবনানন্দ-চর্চা

সৈকত আসগর

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (১৯৭১) একটি গান খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। গানটির প্রথম চরণ, "বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের-ই বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপের যে তার নাইকো শেষ।" এই প্রথম জীবনানন্দ দাশের নাম জনারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে তাঁর নাম বাংলাদেশে বহুল আলোচিত ছিল না। বাংলাদেশে জীবনানন্দ-চর্চাও তখন চোরাবালিতে পথ হারিয়েছিল। বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক কবি ভারত বিভাগের পূর্বে (১৯৪৭) চতুরঙ্গ, (চৈত্র ১৩৪৯) পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশের বনলতা সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশই প্রধান ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে আলোচনা সাহিত্যিক অ-সাহিত্যিক সব মহলেই সীমাবদ্ধ। মফস্বলবাসী এবং স্বভাবতই নিঃসঙ্গ বলেই তাঁর এই বদনসিব কি না জানিনা, মনে হয় আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান গতিপথ থেকে তাঁর অসঙ্কুচিত নিঃশব্দ পলায়নই এ অবহেলার মূলে। অথচ এই শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে যে নতুন কাব্যধারার প্রবর্তন এবং রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা, জীবনানন্দ তার একজন প্রধান, অক্লান্ত অথচ নির্জনকর্মী। তবু আজকালকার সমালোচকের মুখে তাঁর নাম আরো ঘন ঘন শুনি না তার কারণ জীবনানন্দ দাশের কবিতা একান্তরূপেই একটি বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গির প্রতীক, কোন নতুন ভাবধারা অথবা নবাবিষ্কৃত আঙ্গিকের বিদ্রোহী বাহন নয়। কিন্তু চরম ও পরম বিশ্লেষণে যে কোন সাহিত্য প্রচেষ্টা, বিশেষরূপে কবিতা-রচনা, একটি মানসিক ভঙ্গি ও ভাব সার্থক রূপায়ণ ছাড়া আর কি হতে পারে? এবং যে কবি একটি সম্পূর্ণ নতুন চেতনিক রাজ্যের ছত্রপতি তাঁর বিবক্ষার ও বক্তব্যের আঙ্গিক যে স্বতন্ত্র হবে সে তো স্বতঃসিদ্ধ।" এখানে জীবনানন্দ দাশকে নির্জনকর্মী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শুধু আবুল হোসেনই নয় আরো অনেক সমালোচক জীবনানন্দ দাশকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। কেউ বলেছেন 'নির্জনতম' কবি, কেউ বলেছেন শুদ্ধতম কবি, কেউ বলেছেন মহত্তম কবি, কেউ বলেছেন পরাবাস্তব কবি, কেউ বলেছেন মহাগোধূলির কবি—এমনি অনেক বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে তাঁকে। অর্থাৎ সকলের লেখাই তাঁকে কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবর্ষে তাঁকে শুধু কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। তাঁর সামগ্রিক পরিচয়কে এভাবে সনাক্ত করা যায়:

১. জীবনানন্দ দাশ কবি ; ২. জীবনানন্দ দাশ ছোটগল্পকার ; ৩. জীবনানন্দ দাশ ঔপন্যাসিক ; ৪. জীবনানন্দ দাশ প্রবন্ধকার এবং ৫. জীবনানন্দ দাশ পত্রসাহিত্যিক।

জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষে তাঁকে নিয়ে প্রণীত বই-এর সংখ্যা একশ' পেরিয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশে জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লেখা বই-এর সংখ্যা খুব বেশি নেই, যা আছে তাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদনামূলক, মূল আলোচনার সংখ্যা খুব বেশি নেই। সত্তর দশকের পূর্বে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল হাফিজ প্রমুখ ব্যক্তি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। ষাটের দশকে জীবনানন্দ-চর্চায় এগিয়ে আসেন একজন বিদেশী।

ক্লিনটন বি, সীলি আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে বাংলাদেশে অনেকদিন অবস্থান করেছিলেন এবং জীবনানন্দ দাশ এর উপর বিদেশ থেকে পি. এইচ. ডি ডিগ্রি করেছিলেন। সত্তর দশকের আগে জীবনানন্দ-চর্চা বাংলাদেশে কোনো স্পষ্ট রূপরেখা নির্মাণ করতে পারেননি।

জীবনানন্দ দাশ : কবি

সত্তর দশকের শুরুতেই জীবনানন্দ দাশ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন হুমায়ুন কবির (১৯৪৮–১৯৭২)। তিনি জীবনানন্দ বিষয়ে যা লিখেছিলেন তা ১৯৮৬ সালের আগে গ্রন্থভুক্ত হয়নি। মুহম্মদ নূরুল হুদা বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'হুমায়ুন কবির রচনাবলী'র ভূমিকায় লিখেছেন : "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রি লাভের পর হুমায়ূনের কর্মজীবন শুরু হয় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ১৯৭০ সালে জানুয়ারি মাসে তিনি কক্সবাজার কলেজের বাংলার অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। মাত্র ছ'মাস তিনি কক্সবাজার কলেজে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭০ সালের ৬-ই জুলাই তিনি বাংলা একাডেমীর বৃত্তি (প্রাপ্ত) গবেষক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন এবং যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর গবেষণা শুরু করেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে জীবনানন্দ সম্পর্কে জানা অজানা বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৯৭২ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলা একাডেমীতে গবেষণার কাজে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকেন। হুমায়ুন জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু সেগুলোকে প্রবন্ধকারে সাজিয়ে যাওয়ার সময় পাননি। কিছু তথ্য তিনি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ আকারে বাংলা একাডেমী গবেষণা বিভাগে উপস্থাপন করেন। এ ধরনের দশটি নিবন্ধ বর্তমান গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে।"

অকাল মৃত্যু হুমায়ূন কবিরের হাত থেকে জীবনানন্দ গবেষণার চাবিটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কাজেই জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর কাছে শেষকথা আমরা শুনতে পারিনি।

ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকেই আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দের প্রতি আগ্রহী ও আকৃষ্ট হন। তাঁর 'শুদ্ধতম কবি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। দীর্ঘকাল ধরে তিনি জীবনানন্দ গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। শুধু বাংলাদেশেরই নয় কিংবা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, বিশ্বের যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩) জীবনানন্দ গবেষণার একক কৃতিত্বের অধিকারী। যদি বলা হয়—তিনি জীবনানন্দ গবেষণায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন—বোধ করি তা অতিশয়োক্তি হবে না। তাঁর নিরলস গবেষণা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান।

জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত তাঁর এই 'সুদ্ধতম কবি' গ্রন্থটি প্রকাশের পর বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে সাড়া পড়ে যায়। বাংলাদেশ থেকে এ গ্রন্থ সম্পর্কে শামসুর রাহমান লেখেন : "এই গ্রন্থ প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে আমি মনে করি। যাঁরা জীবনানন্দ দাশের কবিতা ভালবাসেন তাঁদের তো বটেই, যাঁরা কাব্য চর্চায় উৎসাহী তাঁদেরও এই বই অবশ্য পাঠ্য। এবং যাঁরা ভবিষ্যতে জীবনানন্দ দাশ বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হবেন, তাঁরাও হাতের কাছে রাখতে চাইবেন 'শুদ্ধতম কবি' নামক গ্রন্থটি। আবদুল মান্নান সৈয়দকে অভিনন্দন জানাই—একটিমাত্র বই লিখেই তিনি আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালোচনার-সাহিত্যে তাঁর আসনটি পাকা করে নিলেন। (দৈনিক বাংলা', ২২ অক্টোবর ১৯৭২)।" ভারতের কলকাতায় থেকে প্রকাশিত 'দেশ' (৫ শ্রাবণ ১৩৮০) প্রকাশিত এক লেখায় 'শুদ্ধতম' কবি সম্পর্কে বলা হয় : "ঢাকার নলেজ হোম থেকে বেরিয়েছে এই বইটি জীবনানন্দ দাশের কবিতা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি আলোচনা গ্রন্থ, লিখেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। ইনি স্বয়ং একজন বিশুদ্ধ কবি এবং এঁর কবিতা বিষয়ে আলোচনা আগেও আমাদের কাছে দু একটি এসে পৌঁছেছে। এই বইটি খুব মন দিয়ে ও খেটে খুঁটে লেখা। এই বইয়ের প্রায় সর্বত্রই ভাষার গুরু-গাম্ভীর্য সত্ত্বেও তাঁর বিশ্লেষণ প্রকৃত কবিরই মতন, একটুও অধ্যাপক সুলভ নয়। প্রথা সম্মত সমালোচকরা এই প্রকৃতিতে আগে কখনো কবিতার আলোচনা করতেন না। আবদুল মান্নান সৈয়দ একটি নতুন পন্থা দেখিয়েছেন এবং তিনি নিশ্চিত কবিতা পাঠকদের ধন্যবাদভাজন হবেন।"

এখানে উল্লেখ্য, বাংলা একাডেমী আবদুল মান্নান সৈয়দের জীবনানন্দ দাশের জীবনী ভিত্তিক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। আবদুল মান্নান সৈয়দ 'শুদ্ধতম কবি' ছাড়াও জীবনানন্দ দাশের কবিতা (১৯৭৪), জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৬), প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ (১৯৯৪), প্রেমের কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ (১৯৯৬), বনলতা সেন : জীবনানন্দ দাশ (১৯৯৬), রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ দাশ (১৯৯৬), প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় রণেশ দাশগুপ্তের জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার। এই গ্রন্থে সম্পাদক ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯২৭), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বনলতা সেন (১৯৪৩), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৯), বেলা-অবেলা কালবেলা (১৯৬১), ঝরাপালক (১৯২৭), এছাড়াও অপ্রকাশিত কবিতা, পুনশ্চ, অন্যান্য কবিতা শিরোনামেও কিছু কবিতাকে স্থান দেন। বলাবাহুল্য, জীবনানন্দ দাশের সব কাব্যগ্রন্থ উল্লিখিত গ্রন্থে স্থান পায়নি। এই গ্রন্থের মুখবন্ধের কবি পরিচিতি কাব্য পরিচয় প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে, কাব্য নব বিচার ক. কাব্য পরিচয়, নব বিচার, খ. স্বাধীন বাংলাদেশে এইসব শিরোনাম স্থান পায়। গ্রন্থের শেষে দেওয়া হয় জীবনানন্দ দাশের জীবনীপঞ্জি। এই গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেন, "জীবনানন্দ দাশ যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছেন এটা তাঁর কাব্যের বিপ্লবাত্মক উপাদান হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে বিশেষভাবে-বিবেচিত হবে।" রণেশ দাশগুপ্তের গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় সিকি শতাব্দী পরে আমরা পাই আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ (তৃ-মু ১৯৯৮)। এ গ্রন্থে জীবনানন্দ দাশের কবিতার সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়ে যায়। এ গ্রন্থের সূচিপত্রের দিকে তাকালে দেখি ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, মহা পৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা, শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং অ-গ্রন্থিত কবিতা।

আহমদ রফিক (১৯২৯)-এর 'জীবনানন্দ সময় সমাজ ও প্রেম' গ্রন্থটি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এ গ্রন্থে ১১টি প্রবন্ধ রয়েছে। এই প্রবন্ধগুলো গত প্রায় দুই দশক ধরে লেখা।

জীবনানন্দ দাশ : কথাশিল্পী

বাংলাদেশে কবি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে যত লেখালেখি হয়েছে গদ্যকার জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে তত লেখালেখি হয়নি। জীবদ্দশায় তিনি গদ্যকার হিসেবে প্রায় অনাবিষ্কৃত ছিলেন। এবং ছোটগল্পকার কিংবা ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর কোনো পরিচয়ই ছিল না। ফলে তাঁকে নিয়ে বিশেষে করে তার গদ্য নিয়ে খুব একটা লেখালেখি হয়নি বাংলাদেশে। তবুও এ প্রসঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'টি গ্রন্থের নাম স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন, আহসানুল কবিরের 'জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য' (১৯৯৪) এবং শান্তনু কায়সার-এর 'গভীর গভীরতর অসুখ : গদ্যসত্তার জীবনানন্দ' (১৯৯৭)। আহসানুল কবিরের জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য গ্রন্থটি তেরো পর্বে বিভক্ত। তাঁর আলোচনা প্রাঞ্জল এবং ঝর ঝরে। তিনি তাঁর সাধ্যের সীমানায় থেকে কথাশিল্পী জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের সামগ্রিক উপস্থিতি তাঁর গ্রন্থে নেই। ভবিষ্যতে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হলে নিশ্চয় তিনি পূর্ণাঙ্গতার দিকে যাবেন। জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পের পরিমাণ এখন আর কম নয়, এর সংখ্যা প্রায় একশ ছুঁই ছুঁই করছে। কাজেই প্রায় একশ গল্প নিয়ে আলোচনা করা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর দুইটি ছোটগল্পের বই'র নাম পাওয়া যায় যার একটি সুকুমার ঘোষ ও অন্যটি সুবিনয় মুস্তাফির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' শিরোনামে। আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প' শিরোনামে ১৯৮৯ সালে। জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পের অসম্পূর্ণ তালিকার প্রতি উৎসাহী পাঠক চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। (দ্রষ্টব্য, শ্রেষ্ঠ জীবনানন্দ আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৬৯৭ ও ৬৯৯)।

শান্তনু কায়সারের 'গভীর গভীরতর অসুখ গদ্যসত্তার জীবনানন্দ' গ্রন্থে জীবনানন্দের এতগুলো উপন্যাসের পরিচয় নেই। তাঁর গ্রন্থটি ক্ষুদ্রায়তন, মাত্র ১০২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এই গ্রন্থের সূচিপত্র এ রকম : জীবনানন্দের গদ্য : বস্তুভিত্তি ও চরিত্র, স্নায়ুচাপ ও গদ্যভাবনা, গভীর গভীরতর অসুখ। তবে তাঁর আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ, জীবনমুখী, অহেতুক কথার আড়ম্বর মুক্ত। যেখানে জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিয়ে এত কিছু লেখালেখি হচ্ছে সেখানে আহসানুল কবিরের 'জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য' (১৯৯৪), শান্তনু কায়সারের 'গভীর গভীরতর অসুখ গদ্যসত্তার জীবনানন্দ' (১৯৯৭) বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তবে শান্তনু কায়সারের বইটির নাম 'গভীর গভীতর অসুখ গদ্যসত্তার জীবনানন্দ' না হয়ে 'পদ্য সত্তার জীবনানন্দ' হলেই ভালো হতো।

জীবনানন্দ দাশ বিষয়ক পত্র-পত্রিকা

জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে বাংলাদেশে কোনো পত্রিকার সংখ্যা কিংবা কোনো বই প্রকাশিত হয়নি ১৯৫৪ সালের দু'এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের সাতটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ এ ব্যাপারে নীরব থাকে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ নব্বই এর দশকে 'কিছুধ্বনি' পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আনওয়ার আহমদ, অতিথি সম্পাদক ছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। এই পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে প্রবন্ধ, নিবেদিত কবিতা, সাক্ষাৎকার, গ্রন্থ আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮ সালের 'কিছুধ্বনি'-র আর একটি জীবনানন্দ দাশ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যার পরিচয় এই রূপ : ৩৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা/নবপর্যায়, কিছুধ্বনি, কবিতাপত্র, কবি জীবনানন্দ দাশ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৯৮ পৌষ ১৪০৫, সম্পাদক আনওয়ার আহমদ। এ সংখ্যার সম্পাদক : চঞ্চল আশরাফ। সহযোগী সম্পাদক : মুনমুন প্রিয়া, প্রচ্ছদ : বীরেন সোম। অস্থায়ী কার্যালয়, রূপম প্রকাশনী ৩/৭ (চতুর্থ তলা) ব্লক-এ লালমাটিয়া, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা : রূপম প্রকাশনী, বাড়ি ৩১৮, সড়ক-৩৩ পুরনো ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা। অক্ষরবিন্যাস : মোঃ হেলালউদ্দিন ভূঁইয়া, দি সান কম্পিউটার ২৩৯/২৪০ বাকুশাহ মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মুদ্রণ : পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, নয়াপল্টন, ঢাকা। দাম : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র। বিজ্ঞাপন বাদে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০। 'কিছুধ্বনি'র জীবনানন্দ বিষয়ক এ দু'টি সংখ্যা প্রকাশ করে আনওয়ার আহমদ বাংলাদেশে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশ : সম্পাদনা

আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত 'শ্রেষ্ঠ জীবনানন্দ।' (জীবনানন্দ রচনাবলী প্রকাশিত–অপ্রকাশিত সংকলন) গ্রন্থে জীবনানন্দের বিচিত্রমুখী প্রতিভা ধরা পড়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯৮ সালে। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছে, "মহত্তম কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আমাদের এই আয়োজন। আমরা জীবনানন্দ দাশের নানামুখী প্রতিভার প্রকাশকে একটি অখণ্ড সংগ্রহের মধ্যে ধারণ করতে চেয়েছি। তাই এতে জীবনানন্দ–প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফলগুলিকে একটি ডালিতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকে শ্রেষ্ঠ ফলগুলি আহরণ ও একত্রিত করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য, পাঠকের সামনে জীবনানন্দের সমগ্র পরিচয়কে তুলে ধরা।" বৃহৎ কলেবরে ৮২৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে জীবনানন্দ দাশের ১৩৬টি কবিতা ১৪টি ছোটগল্প, তিনটি উপন্যাস, বাইশটি প্রবন্ধ, দুইটি ইংরেজি প্রবন্ধ, সাতটি গ্রন্থ–সমালোচনা, চিঠিপত্র সর্বশেষ সংযোজন 'কাল পুরুষের উক্তি'। এই কাল পুরুষের উক্তি সম্পর্কে প্রচ্ছদের দ্বিতীয় ফ্লাপে বলা হয়েছে– –'বর্তমান সংগ্রহে প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্ত হলো জীবনানন্দের একটি অজ্ঞাত রচনা 'কাল পুরুষের উক্তি'। লেখাটি 'ধূপ ছায়া' পত্রিকায় আশ্বিন ১৩৩৫ সালে অনামিতে প্রকাশিত হয়। লেখাটির কিছু অংশ আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশের আগে ১৯৮৬ সালে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল।

এখানে আর একজন সম্পাদকের নাম উল্লেখ করতে চাই। তিনি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর কার্য সম্পাদনা করেছেন। তাঁর নাম ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। তিনি জীবনানন্দ বিষয়ক অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থগুলির মধ্যে, 'জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। 'জীবনানন্দ দাশের আট বছর আগের একদিন', দিব্য প্রকাশ, ঢাকা। 'জীবনানন্দ দাশের গোধূলী সন্ধির নৃত্য', দিব্য প্রকাশ, ঢাকা। জীবনানন্দ দাশের 'মৃত্যুর আগে', দিব্য প্রকাশ, ঢাকা। 'প্রসঙ্গ জীবনানন্দ', দিব্য প্রকাশ, ঢাকা। 'সজনীকান্তের জীবনানন্দ', দেশ প্রকাশন, ঢাকা। I have seen the Bengal's face poems from Jibanananda Das, Creative Workshop, Dhaka. প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব একই কবিতা বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা–সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ।

তথ্যনির্দেশ

১. আধুনিক বাংলা কবিতার শিল্প বিচার, ড. সৈকত আসগর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩।

২. জীবনানন্দ রচনাবলী প্রকাশিত–অপ্রকাশিত সংকলন : 'শ্রেষ্ঠ জীবনানন্দ', অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ও সংকলিত।

৩. প্রকাশিত–অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র, জীবনানন্দ দাশ, আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত। তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪০৪/ফেব্রু ১৯৯৮।

৪. জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর আগে, সম্পাদনায় ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ : একুশেই বই মেলা, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৯।

৫. জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ঢাকা ১৯৮৬।

৬. 'জীবনানন্দ দাশ : টেষ্ট ও টেকনলজি, অষ্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯৯।

৭. জীবনানন্দ (জন্মশতবর্ষ স্মরণিকা ১৮৯৯–১৯৯৯) বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল্লা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরুপম যাত্রা'র ধ্বনি ও শব্দ

সেলিনা হোসেন

১.

'নিরুপম যাত্রা' কি উপন্যাস নাকি বড় গল্প? এটি প্রথম প্রশ্ন। ছাপার অক্ষরে এই রচনার পৃষ্ঠা সংখ্যা পঁচিশ। স্বভাবত আমরা যেভাবে উপন্যাসের আয়তন নির্ধারণ করি সে আয়তন এ রচনার নেই। তাহলে কি বলবো শুধু আয়তন দিয়ে উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারিত হবে? না, আমার মনে হয়, উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আয়তন একটি বিষয় হলেও, ক্যানভাসের বিশালত্ব এবং জীবনবোধের গভীরতাই উপন্যাসের অন্যতম শর্ত। এ রচনায় ছোট পরিসরে একটি বড় ক্যানভাসকে চিত্রিত করা হয়েছে। গ্রাম এবং শহরের দ্বৈত সম্মিলনে তৈরি হয়েছে ক্যানভাস, যার অর্ধেকের বেশিটা জুড়ে রয়েছে গ্রাম—গ্রামের প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনপ্রবাহে খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে এক অর্থবহ সামগ্রিকতা। একে শিল্পবোধে উত্তীর্ণ করেছেন লেখক। সে অর্থে এটি উপন্যাস।

উপন্যাসের শুরুর দিকে নায়কের দ্বৈত সত্তার মধ্যে প্রমূর্ত হয়েছে জীবনের ইতি ও নেতির দিক। একদিকে তিনি বলছেন, "একটা প্রজাপতি ধরে পাখনা ছিঁড়ে খোকার কী লাভ? তারচেয়ে এরা যদ্দিন শিশুটিকে মাঠে পথে ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে বেড়ায় বেশ হয়; খোকাকে ধরা দেবে না কখনো—তার মনের ভিতর নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা ও স্বপ্ন জাগিয়ে রাখবে; ভোরের থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে অনেক বহুরূপী রূপের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাবে..."। অন্যদিকে নায়কের উপলব্ধি এমন : "পৃথিবীর সাধারণ হাঁটা চলার পথ-তুচ্ছ খুঁটিনাটি যতদিন অনাবিষ্কারের বিস্ময়ে কুয়াশাভ হয়ে থাকে, ততদিনই খুব গভীরে লাভ—ধীরে ধীরে কল্পনা শুকিয়ে যায়—স্বপ্নগুলো যায় ভেঙে চুরে—বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি—তৃপ্তি পাই না, শান্তি পাই না, জীবনটা একটা দাঁড়কাকের বাসার মতো ছন্নছাড়া জিনিস হয়ে দাঁড়ায়; সকাল থেকে রাত্রি অব্দি একটা ক্ষুধিত কাকের মতো সমস্ত রকম কদর্যতা চিত্তপ্রসাদহীন লালসা ও গ্লানির ভিতর নিবৃত্তি খুঁজে মরি, জীবনকে বুঝি জীবনধারণ বলে।"

এ উপন্যাসের প্রবাহমানতা এভাবে ক্রমাগত একটি অন্তর্গত বোধের ভেতরে সচল থাকে। মনে হয় নায়ক বুঝি নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত এবং রূঢ় বাস্তবের সংঘর্ষে হতাশাগ্রস্ত। কিন্তু আসলে তা নয়। ক্রমাগত রূপান্তরের ভেতরে পরিবর্তিত হতে থাকে জীবনের অনুভব—এর ভেতর দিয়ে বয়ে যায় সম্পর্কের স্পন্দন, কাল্পিক স্পন্দন এবং প্রকৃতি ও মানব-সম্পর্কের আবহমানকালের সেই গূঢ় বোধ যা টিকেয়ে রাখে সভ্যতা। এ উপন্যাসের আঙ্গিকে চেতনাপ্রবাহ রীতি ব্যবহৃত হওয়ার ফলে উপন্যাসটি একটি ভিন্নতর শিল্পবোধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজাজে উন্নীত হয়েছে। যেখানে উপন্যাস শেষ হয়েছে, মনে হয় সেটাই শুরু, যেন একটি নতুন অন্বেষায় যাত্রা করার এখনই সময়।

উপন্যাসের শুরু হয়েছে এভাবে : "বছর চারেক পরে কলকাতা থেকে দেশে ফিরছে।" বাক্যটি এমনভাবে তৈরি যেন এই ফেরাটা অনিবার্য, অর্থাৎ ফেরার যাত্রা শুরু হয়েছে। কিন্তু যা এমন একটি বাক্যের পরেও উপন্যাসের নায়ক প্রভাতকে দেশে ফেরান না উপন্যাসিক। এই ফেরাটা উপলব্ধির, বাস্তবের নয়। এই ফেরার কথা বলে তিনি নায়ককে তার ফেলে আসা দিনগুলোর মুখোমুখি করান—অর্থাৎ মানুষটি ফিরছে, কিন্তু ফিরছে তার স্মৃতির চৈতন্যে। শুরুটা এমনই। যেভাবে শেষ হয়েছে সেটাও ফিরে যাওয়া। প্রত্যেক মানুষকে ফিরে যেতে হয় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা অন্ধকার জগতে। এই অন্ধকার জগতেরই রহস্য আমাদের জানা নেই। এই ঘোরাফেরার ভেতরেই জীবনের আবর্ত। এই আবর্তের ভেতর আমরা সত্যকে খুঁজি, বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজি। সফলতা-ব্যর্থতার হিসাব-নিকাশ করি। এবং যা কিছু গম্য তার সংজ্ঞা বের করারও চেষ্টা করি। প্রত্যেকের জীবনে এসব কিছু আপেক্ষিক সত্য। উপন্যাসের নায়ক প্রভাত নিজের জীবনকে দেখেছে এভাবে : "কেরোসিন কাঠের টেবিলে ডিটামারের লণ্ঠনটা নিভিয়ে অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে প্রতিদিন রাতের বেলা মনে হয়েছে, এই অন্ধকারের যেন শেষ না হয় আর, এ বিছানার থেকে কোনোদিন যেন আর তাকে উঠতে না হয়।" প্রভাত যা চেয়েছে সেটাই সত্যি হয়েছে। প্রভাতকে উঠতে হয়নি আর। মৃত্যু তার সচলতা স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু মানুষের জীবনের অলৌকিক পারাপার আছে। সে নিজে এক বস্তু নিয়ে থেকে আর এক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যে শক্তি সচল রাখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে। যেন এ সত্য নায়কের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয় এ উপন্যাসে। এই অর্থে উপন্যাসের নাম 'নিরুপম যাত্রা' বিভিন্ন যাত্রায় অভিহিত হয়। যাত্রাগুলো মনে হয় আপাত সরল, কিন্তু আসলে গভীর অর্থবহ।

২.

এই উপন্যাসে জীবনানন্দ দাশ কবি ও কথাশিল্পী। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের কবি এই উপন্যাসে প্রবলভাবে উপস্থিত। আবার স্ট্রিম অব কসাসনেস তত্ত্বকে আঙ্গিকে ব্যবহার করে তিনি কথাশিল্পীর অস্তিত্বকে বাঙ্ময় করেছেন এ উপন্যাসে। রূপসী বাংলার প্রকৃতি এই উপন্যাসের একটি অন্যতম দিক। খোকার আচরণ কল্পনা করে প্রভাতের ভাবনার প্রকৃতি এভাবে উঠে এসেছে : "ঘুরেফিরে এই প্রজাপতি আর ফড়িংগুলো কানসোনার শিষে, দ্রোণ ফুলের ঝাড়ে, টিকি লতায়, আকন্দ ফুলে, ভেরেণ্ডাবনে এসে বসে, কিংবা লাউয়ের ডগায়, কিংবা বাঁশের মাচার একটা কঞ্চির উপরে ! খোকা হয়তো এইসব দেখে হয়রান—

"একটা ফড়িংও ধরতে পারে না সে, তবুও হয়তো বর্ণচ্ছটাময় অজস্র প্রজাপতির জগৎ তার কাছে একটা সুন্দর সুদূর স্বপ্ন—সাম্পানচড়া মলয় নাবিকের চোখে দূর সমুদ্রের স্বপ্নের মতো তাকে এড়িয়ে চলে, দিন-রাত এড়িয়ে-এড়িয়ে চলে—তারপর বিকেলের পড়ন্ত রোদের ভিতর দিয়ে—সন্ধ্যার আবছায়া নেমে আসবার আগে কোনো পরীর রাজ্যে বিলীন হয়ে যায় সে।"

এমন অজস্র কাব্যিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে উপন্যাস এগোয়। তার মাঝেও রূঢ় বাস্তবের চিত্রগুলো ছোট ছোট পঙ্‌ক্তির ভেতর দিয়ে এঁকে যান ঔপন্যাসিক। সেখানে কবির সঙ্গে ঔপন্যাসিকের কোনো সংঘর্ষ নেই। আছে সখ্য, যার ভেতর দিয়ে দুই ভিন্ন শিল্পীসত্তা একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় এসে জীবনের কথা বলে। যে জীবনের চিত্র রূপায়ণের জন্য আমাদের এমন নানামুখী আয়োজন। শুরুতে প্রভাত ন্যূনতম বেঁচে থাকার ভেতরেই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চায়। সে কারণে চাকরি খুঁজতে কলকাতায় আসে। কিন্তু চাকরি হয় না। কুড়ি-পঁচিশ দিন পরপর গ্রাম থেকে স্ত্রী কমলার চিঠি আসে। চাকরির কতদূর কি হলো জানতে চায়। প্রভাত যদি চিঠিতে জানতে চায়, 'খোকা কত বড় হল?' কমলা তার উত্তর দেয় না। লেখা, "কুন্দর চিঠি পেলাম আজ ; তার স্বামী তো কলকাতায় গিয়ে ছমাসের মধ্যেই রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে কত বড় চাকরি জোগাড় করে নিল আর তুমি কিছু পারলে না।" এই ছোট চিঠির লাইনের মধ্যে আমরা সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিষয়টি বুঝে যাই। এখানেই উপন্যাসিকের কারুকাজ। তিনি একটু একটু করে এগিয়েছেন। বলেছেন প্রভাত জীবনযুদ্ধে পেরে উঠছে না। দেশে যাবো বললেই তার যাওয়া হয় না। তার যাত্রা আটকাতে থাকে। দাড়ি কামাতে কিংবা দেশলাই বা পেন্সিল ব্যবহার করতে যে পয়সা লাগে সে পয়সাও তার নেই। তিন টাকা সোয়া ন'আনা দিয়ে কিছু হয় না। উপন্যাসে এভাবে শুরু হয় প্রভাতের জীবন। একসময় প্রভাত স্কুলে পড়ানোর কাজ পায়। আপাতত অস্থায়ী কাজ। একথা কমলাকে লিখলে কমলা খুব খুশি হয়। উপার্জনের ভিতটা মজবুত হলেইতো সংসারটা স্বস্তির হয়, কিংবা নিদেনপক্ষে টিকে যাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়। কিন্তু কমলার খুশি প্রভাতকে খুশি করে না। ওর যন্ত্রণা প্রবল হয়। ভাবে, "জীবনে ব্যবসাবোধ মেয়েমানুষের কি ভয়াবহ।" পাশাপাশি সমীর যখন প্রভাতকে জিজ্ঞেস করে, "আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বেশ শান্তির তো?" তখন প্রভাত উত্তর দেয়, 'যেমন সচরাচর হয়।' ব্যক্তির এই বৈপরীত্য বোধ উপন্যাসের বোধ। ঔপন্যাসিক নায়কের বিভিন্ন উপলব্ধি, ধারণা কিংবা দ্বন্দ্বের মধ্যে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন তাই প্রতিটি মানুষকে আলাদা প্রকৃতির করে তোলে। যে কারণে প্রভাতের কাছে প্রেমের সংজ্ঞা অন্য রকম। সে সমীরকে বলে, "প্রেম বলতে তোমরা নরনারীর নানা রকম সম্পর্ক বোঝ—কি বল সমীর? কিন্তু আমি ঢের জিনিস বুঝি—স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধেই শুধু নয় ; দেশের মাঠ, পথ, সেই ইস্কুলের বাড়ি, অশ্বত্থ গাছটা, খোকা বা কেতু।" অর্থাৎ জীবনের সামগ্রিকতায় প্রভাতের আকাঙ্ক্ষা, নর-নারীর সম্পর্কের একটি দিকই শুধু তার চেতনায় স্থায়ী নয়। এখানেই প্রভাত অন্য থেকে আলাদা।

সে বন্ধু তারাপদর কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার করে আনে দেশে যাবে বলে। ধার করার আগে ওর কাছে তিন টাকা সোয়া ন 'আনা ছিলো। কুড়ি টাকা দিয়ে কি করে প্রভাত? মেসের ম্যানেজারকে আট টাকা দেয়, ট্রেনের থার্ড ক্লাসের একটা টিকিটের জন্য সাড়ে চার টাকা রেখে বাকি টাকা দিয়ে মায়ের জন্য থান কাপড়, সুতির শাড়ি কমলার জন্য এবং খোকার জন্য লাটিম, বেলুন, ছবির বই কিনে ফেলে। জীবনের কাছে প্রভাতের প্রত্যাশা ন্যূনতম। সেজন্যই বলতে পারে "এই সিগারেটের ছাইয়ের মতোই অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে থাকি।" কতো অনায়াসে উপেক্ষা করে জীবনের বড় বড় চাওয়া-পাওয়া। সেজন্য তাঁর আক্ষেপ এমন : "চার বছর আমি কাউকে দেখিনি কার্তিক, মাকে না, খোকাকে না, খোকার মাকে না।...কেতু বলে একটা কুকুর আছে—সেটা হয়তো চনমন করে সারাদুপুর ঘুরে বেড়ায়। আমাকে খোঁজে। কে জানে খেতে পায় কিনা। ...কেতু বেঁচে আছে কিনা সে খবরও আমাকে কেউ দেয় না—নিজের স্বার্থের বাইরে মানুষ এত উদাসীন।" এই হলো প্রভাত—কেতুর বেঁচে থাকার খবরের জন্য উদগ্রীব থাকে। কিন্তু পাশাপাশি মানুষের স্বার্থপরতা ওকে যন্ত্রণা দেয়। এই যন্ত্রণা নিয়েই ওর দিনকাল কাটে। এভাবেই মানুষ কখনো নিজের স্বার্থের প্রয়োজন থেকে বেরিয়ে আসে। এমন মানুষ সহজ নয়। এই নির্বিরোধ উদাসীনতা জীবনের পরম ধর্ম নয়, কিন্তু এও একটি দিক। জীবনকে কদর্যতা, কুশ্রীতা, দীনতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার শক্তি দেয়। এই শক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জন মানুষের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন। তাই এমন মানুষকেই খুঁজে বেড়ায় ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি। শিল্পের বোধ মানুষকে মানুষেরই কাছে নিয়ে যায়।

প্রভাত ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেছে। কিন্তু যে স্কুলে শিক্ষকতা করে সেখানে তাকে পড়াতে হয় ইতিহাস, ভূগোল ও জ্যামিতি। কারণ যার পরিবর্তে সে এখানে শিক্ষকতা করছে সে ওই বিষয়গুলো পড়াতো। এভাবে নিজস্ব বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে প্রভাত জীবিকার ক্ষেত্রে সেটা আর কাজে লাগাতে পারে না। কোনো কোনো মানুষ এভাবে অকারণে মিসফিট হয়ে যায়। সে স্কুলে ইংরেজি পড়াতে চাইলে হেডমাস্টার পরিষ্কার বলে দেন, 'তা হয় না।' ফলে 'এক-এক ক্লাসে ভূগোল ও ইতিহাসের নানারকম খুঁটিনাটি ভুল নিজেই সে করে ফেলে ; ছেলেরা বড় একটা ধরতে পারে না। কিন্তু নিজের মনের কাছে বড় লজ্জা পায় সে। জীবনানন্দ দাশ এভাবে তার উপন্যাসের নায়কের গ্লানিবোধ প্রখর করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্গত বিষাদকেও ব্যাপ্ত করেন। বড় মায়া লোকটির জন্য। জীবিকার ক্ষেত্রে অযোগ্য হয়ে যাবার ব্যাপারটি শুধু নয়, এই ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি পড়ানোর আর একটি নেতিবাচক দিকও আছে। কেননা "ইতিহাস ও ভূগোলের অসংখ্য রাশিরাশি ব্যাপার ও বিষয়ের সমাবেশ বিচার-বিশ্লষণের অপেক্ষা করে না, কল্পনার না, কবিত্বের না, স্মরণশক্তির ওপর জুলুম করে শুধু।" এই যে বিষয়গুলো একজনের ভালো না লাগা তাকেও তীক্ষ্ন করে দেখিয়েছেন তিনি 'জুলুম' শব্দটি ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক প্রভাতের মনোজগতের আর একটি দিককে পাঠকের সামনে ছেড়ে দেন। পাঠক গভীর মমতা নিয়ে প্রভাত নামক মানুষটির জীবনযুদ্ধের ব্যর্থতা অবলোকন করে। এখানেই চরিত্র-চিত্রণ সার্থক।

যাকে কেন্দ্র করে পুরো উপন্যাসটি আবর্তিত হয়, সেই প্রভাত, তার সফলতা-ব্যর্থতার ভেতর দিয়ে এক ব্যক্তি ছাড়িয়ে অনেক হয়ে ওঠে। সে একজন নয়, যেন, তার মধ্যে বহুর কণ্ঠস্বর আছে। প্রত্যেক পাঠক তাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করবে সেভাবেই সে তেমন মানুষ হবে। প্রভাত নামেরই অনেক মানুষ। এই প্রভাতই জীবনানন্দ দাশের ছোট উপন্যাসের বড় চরিত্র।

তার বুকের ভেতর জীবনকে মেলে দেখার স্বপ্ন। সেজন্য তার কল্পনায় ভেসে ওঠে ফেলে আসা সময়ের অবিনাশী চিত্র। ওর ভাবনায় ফুটে ওঠে : "মাঠ প্রান্তরের কুয়াশার বিস্তৃতি, কাঁচপোকানীল কাজলস্নিগ্ধ বট, অসংখ্য ডালপালা গুঁড়ি অজগরের মতো সহস্রধারা লতা, মৃদু বেগুনি ফুল, লাল বটফলের দিকে সশস্র শালিখ কোকিলের কৌমার্যভার, আনন্দ ; বিশাল অশ্বথ, পাকুড়, হিজল, জামের ডালপালার ফাঁকে রাত্রির তারা, জ্যোৎস্নার চাঁদ দিনের অপরিমেয় আকাশের গন্ধ, চট বাবলার জঙ্গল ও ঝিঁঝির ডাকের ভিতর মানুষ হয়েছিল যারা সেইসব ছেলেদের কথা মনে পড়ে। এদের মুখের দিকে তাকালে তাদের কথা মনে পড়ে কেবল ; তারা কত অন্যরকম। দেশের বাড়ির সেই ইস্কুলটা চোখের সামনে জেগে ওঠে ; সেই কুড়ি বছর আগের অমূল্য, বিজন, অবিনাস—"। প্রভাত যাদের ফেলে এসেছে তারা ছিল একরকম, এখনকার ছেলেরা অন্যরকম। প্রভাতের এইসব অন্তর্গত ভাবনা পাঠককে অবিনাশী রূপান্তরের ভেতর দিয়ে চলে যেতে দেয়, যেখানে থেমে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, সামনে আর একটি নতুন শুরু হাত বাড়িয়ে রাখে।

৩.

বলেছি উপন্যাসটি আয়তনে ছোট, কিন্তু ক্যানভাসটি বড়। উপন্যাসের দু'টি অংশ। একটি অতীত। অন্যটি বর্তমান। একটি পটভূমি গ্রাম, অন্যটি কলকাতা শহর। একটি স্মৃতি রোমন্থনের রোমান্টিকতা, অন্যটি জীবন সংগ্রামের বাস্তবতা। এ দুয়ের যোগসূত্র প্রভাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট আয়তনের এ উপন্যাসে অনেক চরিত্র আছে। তারা কেউ উপন্যাসের প্রথাগত ধারণার চরিত্র হয়ে ওঠা নয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের কোনো ধারাবাহিকতা নেই, তারা প্রভাতের জীবনের আসা-যাওয়ার পথের ধারের মানুষ। এর মধ্যেই উঠেছে তাদের বৈশিষ্ট্য টুকু বোঝা যায় তারা কেমন মানুষ, কি তাদের চরিত্রের ধরন।

এ উপন্যাসের চরিত্র শুধু মানুষই নয়, প্রাণী এবং গাছও আছে। উপন্যাসিক এসব কিছুর ওপর এমন ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন যার ফলে মনে হয় তারা উপন্যাসের একটি চরিত্র। এরা না থাকলে এ উপন্যাসের ক্যানভাসে রঙের বিন্যাস ঠিকমতো হতো না। কোনো একটা অপূর্ণতা পূর্ণ করেছে তারা নায়কের জীবনের পরিপূরকের ভূমিকাও পালন করেছে। নায়কের ভালোমন্দের ভিড়ের মধ্যে তারা একটি অংশ। প্রভাত উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। তাকে কেন্দ্র করে যেসব মানুষ আসা-যাওয়া করেছে তারা উপন্যাসের ক্যানভাসকে বড় করেছে এবং বিচিত্র করেছে।

উপন্যাসের শুরু থেকে এসব মানুষকে আমরা একে একে দেখতে পারি। প্রথমেই প্রভাতের মা। মাঝে মাঝে ছেলেকে চিঠি লেখে : "অনেক দিন তোমাকে দেখি না, মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছা হয়—সময় করে একবার আসতে পার না?" মায়ের দ্বিতীয় চিঠিতে প্রভাত জানতে পারে উষা দেশে এসেছে। প্রভাতের পাশের বাড়ির মেয়ে। উষার দেশে আসা প্রভাতের কাছে একটি খবর। মা ওকে সেই খবরটি দেয়। মায়ের পরের চিঠি থেকে প্রভাত জানতে পারে যে খোকা বেশ গান গাইতে পারে। মায়ের চিঠি থেকে প্রভাত জানতে পারে হেমন্ত দেশে ফিরেছে। হেমন্ত তার স্কুলের বন্ধু। একদিন এইসব খবর দেওয়া নিজের হাতে লেখা মায়ের চিঠি আর আসে না। কারণ মা তিনমাস হলো বিছানা নিয়েছে। দেশে ফেরার ভাবনায় প্রভাত অনুভব করে দেশে ফিরে দেখতে পাবে মা আর বিছানা থেকে নামতে পারছে না। এভাবে মায়ের চরিত্র একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় চলে যায়।

এরপর প্রভাতের স্ত্রী কমলা। প্রভাতের বর্ণনায় "কমলার তো বিশেষ কোনো ব্যাকুলতা নেই মনে—সে কেমন বিমুখ উদাসীন গোছের মেয়েমানুষ—"। কমলার চিঠি আসে অভিযোগ নিয়ে। লেখে, "কিছু সুবিধা হল? এতদিনেও তুমি যে কিছু করে উঠতে পারলে না এই ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই।" চিঠিতে আরো থাকে এই অবস্থায় প্রভাত বিয়ে করেছে কেন, ছেলেই বা হলো কেন? কি দিয়ে কি হয়, কে কোথায় দাঁড়ায় ইত্যাদি। এই চিঠি পোস্টকার্ডে লেখা হয়েছে বলে প্রভাত ক্ষুব্ধ হয়। কেননা পিয়ন ঢাকনা-খোলা বাক্সে চিঠি ফেলে যায়। খোলা পোস্টকার্ড অন্য কেউ পড়তে পারে। এটা প্রভাতের জন্য সম্মানজনক নয়। সুতরাং দোষ কমলারই। কুকুর কেতুর কথা জানতে চেয়ে চিঠি লিখলে কমলা সে প্রশ্নের জবাব দেয় না। প্রভাতের ভাষায় "কুকুর-বিড়ালকে সে জীবনের গ্রাহ্য জিনিসের মধ্যেই ধরে না।" এটাও কমলার দোষ। একদিন প্রভাত দেশে ফিরে দেখে "কমলার একটা কার্ড এসেছে।" ওর মনে হয় "বৌয়ের চিঠির সুর লড়াইবাজ রক্তাক্ত চিলবধূর মতো যেন—নিজেকেও সে ছিঁড়ে খেতে পারলে বাঁচে।" কমলার পরবর্তী চিঠি প্রভাতের স্কুলে চাকরি পাবার পর। কমলা লিখেছে "কেতু মরে গেছে, খোকার হুপিং কাশ, রক্ত-আমাশয়। কিন্তু ইস্কুলে প্রভাত মাস্টারি পেয়েছে শুনে কমলা খুব খুশি।" খুশিটাও কমলার দোষ। কারণ প্রভাত মনে করে এর পেছনে মেয়েমানুষের ব্যবসাবোধ কাজ করে। এর পরের চিঠিতে কমলা প্রভাতকে জানায় "খোকা পড়াশুনা করে না কিছু, ঘরে থাকে না মোটে, সারাদিন কামারপাড়ায় টইটই করে বেড়ায়। নচ্ছার ছেলেদের সঙ্গে মেশে ; রোজই পাড়ার ছেলেদের লাথি কানমলা খেয়ে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটার যেন মা-বাবা নেই। সেদিন পায়ে একটা মাদার কাঁটা ফুটিয়ে আনল—"। প্রভাতের কাছে এ অভিযোগ কমলার একার, পিতা হিসেবে তার দায়িত্বের মধ্যে এ অভিযোগ পড়ে না। অতএব কমলার দোষ। প্রভাতের কাছে কমলার লেখা ওটাই শেষ চিঠি। প্রভাত তেমন পুরুষ যে নারীকে ঠিকমতো দেখতে শেখেনি। স্ত্রীর প্রতি সে নিজে শ্রদ্ধাশীল নয়। কমলার চিঠি পেয়ে অনবরত দোষ ধরেছে, কিন্তু নিজে কখনো প্রেমপত্র লেখেনি, নিদেনপক্ষে সহানুভূতির কোনো চিঠিও না। কেতুর একাকিত্বকে সে অনুভব করেছে এভাবে "বাস্তবিক একটা কুকুর যখন একা সাথীহীন হয়ে পড়ে তখন নিঃসঙ্গ মানুষের চেয়েও ঢের বেশি কষ্ট তার।" কুকুরের নিঃসঙ্গতা প্রভাতকে পীড়া দেয়, কিন্তু কমলার নিঃসঙ্গতার জন্য প্রভাতের কোনো মমতা নেই। মৃত্যুর আগে কমলাকে নিয়ে খানিকটা ভাবতে প্রভাতকে দেখা যায়। বলে, "কমলার সামনের মাড়ির কয়েকটা দাঁত পড়ে গেছে। বাহ্ কেমন দেখায় তাকে। ...জীবন যেন তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করে দিতে চায় নিজেকে। প্রভাতের বুকের ভেতর কেমন যেন শূন্য বোধ হয়, বড্ড কষ্ট লাগে কমলার জন্য।" পুরো উপন্যাস জুড়ে এইটুকু সহানুভূতি মাত্র কমলা প্রভাতের কাছ থেকে পেয়েছে। বাকি সময় তাকে নানাভাবে ছোট করেই দেখেছে প্রভাত। কমলা যখন প্রভাতের একটি চাকরির স্বপ্নে দিন গুনেছে, খানিকটুকু নিষ্প্রিয়তা, খানিকটুকু স্বপ্ন নিয়ে, সেটাও বাঁকা চোখে দেখেছে প্রভাত। বলেছে, 'মেয়েমানুষের ব্যবসাবোধ'! যে মানুষটি ইংরেজি সাহিত্যে পড়েছে—পড়েছে হাক্সলি, হারবার্ট স্পেন্সার, হিউগো, ডুমা, ফ্লবেয়ার, টলস্টয়, চেখভ, তুর্গেনিভ প্রমুখের লেখা, তার এই নীচ ভাবনা অবশ্যই পীড়িত করবে পাঠককে। ঔপন্যাসিক প্রভাত চরিত্রটিকে এভাবেই তৈরি করেছেন যে নারী সংক্রান্ত ভাবনায় প্রচলিত ধারণার বাইরে যেতে পারেনি। প্রভাতের বড় ব্যর্থতা এখানেই।

উপন্যাসের পরবর্তী চরিত্র খোকা। প্রভাতের ছেলে, যাকে ছয় মাসের রেখে প্রভাত কলকাতা শহরে চাকরি খুঁজতে আসে। তারপর কলকাতা শহরে তার চার বছর কেটে যায়। প্রভাতের ভাবনা, কমলার চিঠি এবং মায়ের চিঠির মধ্যে খোকা চরিত্রটির নানা আচরণের কথা জানা যায়। জানা যায় কিভাবে সে বাবাহীন পরিস্থিতিতে বড় হয়ে উঠছে। তার বড় হয়ে ওঠা উপন্যাসের একটি বড় ঘটনা। খোকা সম্পর্কে প্রভাতের ভাবনা এমন : "আজ তার বয়স প্রায় পাঁচ বছরের কাছকাছি। হাঁটতে পার—দৌড়ুতে পার—এমন কথা নেই যা সে না বলতে পারে। দেখতে কেমন হয়েছে? তার নিজের মতো—না কমলার মতো? খোকা হয়তো কারো কথাই শোনে না; সকালে ঘুমের থেকে উঠে একটা বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে নেয় নিশ্চয়। তারপর?" তারপর খোকার অনেক কাজ থাকে। কঞ্চি দিয়ে কুকুর, বিড়াল, শালিক, কাক তাড়িয়ে বেড়ায়। প্রজাপতির পেছনে ছোটে, ফড়িং ধরতে পারে না। খোকার ভেতর নিজের শৈশব দেখে প্রভাত। সে নিজে যেমন করতো তেমন ভাবনাই খোকাকে নিয়ে ভাবে : "একটা পাতিলেবুর সবুজ পাতার উপর কমলা রঙের একটা প্রজাপতি—আজ এই দুপুরেই হয়তো খোকার কাছে তা জামশিদের মিনারের রাজ্যের চেয়ে ঢের বড় জিনিস।" ইতিহাসের উপমা ব্যবহার করে পুরো চিত্রকল্পটির এক অসাধারণ ব্যঞ্জনা তৈরি করেন লেখক। জীবনের আবহমানতা অবিনশ্বর আলোয় স্নাত হয়। খোকা আর খোকা থাকে না—জীবনের চিত্রকল্প হয়ে যায়।

উপন্যাসে এর পরে যে চরিত্রটি পাওয়া যায় তার নাম তারাপদ। প্রভাতের কলেজ জীবনের বন্ধু। তারা এক সময় এক মেসে ছিল। "কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী-সন্তান-চাকরি-বাকরি ও ভাড়াটে ফ্ল্যাট নিয়ে সে আজ সফল মানুষ—প্রভাতের জীবন থেকে সে ঢের দূরে চলে গিয়েছে।" এই তারাপদ তাকে বিশ টাকা দিয়েছিল, যে টাকা নিয়ে প্রভাত দেশে ফেরার বাজেট করেছিল। ট্রেনের টিকিট, বৌয়ের-মায়ের শাড়ি ছেলের খেলনা ইত্যাদি। এবং এসবের বাইরে সে এক কাপ চা খেয়েছিল এই টাকা থেকে। এবং "চা খেতে খেতে অনেকক্ষণ ফ্যানের নিচে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থেকে এই বিরাট পৃথিবীর জীবন-ব্যাপারে চরিতার্থ একজন সার্থক জীব বলে মনে হতে লাগল নিজেকে।" তারাপদ প্রভাতকে এই উপলব্ধি হতে সহায়তা করে। এবং তারাপদই টাকা দিয়ে তার বাড়ি ফেরার স্বপ্নটুকু সফল করে দিয়েছিল।

এর পরে যে মানুষটির দেখা পাওয়া যায় তিনি বিশ্বম্ভর বাবু। প্রভাত যখন গ্রাম থেকে আসে তখন তার সাদা গোঁফজোড়া কাচপোকার মতো নীল ছিল। অসুরের মতো শক্তি ছিল গায়ে। "এখন তিনি চোখে দেবেন না, লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে হয়, সেদিন একটা ভেড়ার ঢুঁ খেয়ে রাস্তায় গেলেন পড়ে—"। এ তথ্য প্রভাত কিভাবে পেলো তার কোনো উল্লেখ নেই উপন্যাসে। তবে চরিত্রটির শারীরিক পরিবর্তনের চিত্রের মধ্যে একজন মানুষের অসুরের শক্তি থেকে ঢুঁ খেয়ে পড়ে যাওয়া বাস্তব সত্য। এমন ঘটনা একজন মানুষের জীবনে ঘটতেই পারে।

কালিম আর একটি চরিত্র। সে ঝিলকান্দি রোডের আস্তাবলের গাড়োয়ান। ঘোড়ার গাড়ি আছে তার। প্রভাতকে 'মহারাজ-হুজুর' বলে সম্বোধন করে। প্রভাত তার গাড়িতে করে আগে বাড়ি ফিরতো। কিন্তু এবার বাড়ি গেলে প্রভাত ওর গাড়িতে করে ফিরতে পারবে না। তার হাতে পয়সা বড্ড কম। ফলে কালিমকে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

নিরঞ্জন ধোপা একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। ছোটবেলা থেকে সে একটি বোহেমিয়ান চরিত্র। পালিয়ে গিয়ে যাত্রার দলে ঢুকেছিল, ভালো গান গাইতে পারতো। তারপর তার গানের গলা দুই-তিন বছরের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেল। "যাত্রার দল থেকে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল তারপর নিরঞ্জন অন্য এক অধিকারীর দলে জল টেনে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, পান বানিয়ে, তামাক সেজে, ফোঁপরদালালি করে বেড়াত।" তারপর একদিন ফিরে এলো কলকাতা থেকে। এরপর ধোপা হিসেবে তার জীবিকার শুরু। প্রভাতের সঙ্গে সখ্যের সম্পর্ক। প্রভাত নিরঞ্জনকে ভীষণ 'সরস মানুষ' হিসেবে দেখে।

প্রভাতের মনে হয় দ্বিজেনবাবু কি বেঁচে আছেন? দ্বিজেনবাবু প্রভাতের স্কুলের ড্রিল মাস্টার ছিল। দ্বিজেনবাবু বেশ ইন্টারেস্টিং চরিত্র। নানা কৌশলে ছেলেদের ড্রিল করাতেন। বেত হাতে নিয়ে ঘুরতেন। ধোপা ছেলেদের আলতো করে বেতের বাড়ি দিতেন। তাতে গায়ের চামড়া জ্বলতো না। ড্রিলের সময় মাঝে মাঝে হল্ট বলে চিৎকার করে উঠতেন। "প্রভাত মনে মনে ভাবত ভবিষ্যৎ জীবনে সে এমনি আওয়াজ করবে—কাঁধে বন্দুক ফেলে মার্চ করে চলবে—সৈন্য হবে—কে জানে হয়তো নেপোলিয়ন হবে কিংবা মার্শাল নে—"

পরের চরিত্র নবীন মজুমদার। "মজুমদারের মস্ত বাড়ি ; টাকা-কড়ির স্বচ্ছলতা তাদের খুব—বাড়ির বুড়োরা সারাদিন শতরঞ্জ খেলে। আর ছোকড়াদের ব্রিজের আড্ডা বার মাস লেগে রয়েছে।" এ বাড়িতে ব্রিজ খেলতে যায় প্রভাত। কিন্তু প্রতিদিন ব্রিজ খেলা তার ভালো লাগে না।

প্রভাতের বাবা এ উপন্যাসে একটি অদৃশ্য চরিত্র। কারণ তিনি মৃত, কিন্তু প্রভাতের চেতনায় ভীষণ জীবন্ত। বাবা তাকে নানারকম ইংরেজি বই পড়তে দিয়েছিল। বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিকেন্সের সম্পূর্ণ সেট থাকা সত্ত্বেও ডিকেন্স পড়া হয়নি প্রভাতের। প্রভাতের দেশে ফেরার অন্যতম কারণ 'শ্মশানে বাবার ইশারা।'

সমীর কলকাতার ছেলে। প্রভাতের কাছে আসে তাকে প্রাইভেট পড়ানোর অনুরোধ নিয়ে। প্রভাত বাড়ি যাবে বলে সমীরকে পড়াতে রাজি হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্ধু কার্তিকের অনুরোধে সে সমীরকে পড়াতে রাজি হয়। সমীর প্রবন্ধ লেখে। পুরুষ মহিলার সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করে। প্রভাতের মনে হয় "আজকালকার ছেলেরা আমাদের চেয়ে ঢের প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এই বয়সে আমরা তেঁতুলবিচি নিয়ে খেলা করতাম—"

কার্তিক প্রভাতের বন্ধু। প্রফেসর। আবার টিউশনিও করে। গরমের সময় তিন মাস ছুটি কাটাতে দেশে যায়। সে প্রভাতকে ইডিয়ট বলে গাল দেয়। ত্রিশ টাকার টিউশনি করে কলকাতায় থাকতে বলে। প্রভাত এভাবে থাকতে রাজি না হলে বলে, "চাকরির যা বাজার তাতে এইটুকুওতো ছোটখাটো একটি যজ্ঞ ফল ; পিতৃপুণ্য ছাড়া জোটে না।"

পরের চরিত্র ঊষা। অক্ষয়বাবুর মেয়ে। প্রতিবেশী হলেও মুখের আলাপ ছিল না প্রভাতের। এমনই লাজুক ছিল সে। প্রভাতের চোখে মেয়েটি "নম্র, স্নিগ্ধ, বিচক্ষণ, নিঃশব্দ।" এই মেয়েটিকে প্রভাতের ভালো লাগতো। অন্ধকার রাতে কাঁঠাল হিজলের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকতে যেমন ভালো লাগতো, তেমন ভালো লাগা। ঊষা রোজ রাতে গান গাইতো। প্রভাতের মনে হতো "কেমন গভীর আত্মনিবেদন আত্মসমর্পণের গান—নারীর সজীব সাধক হৃদয়ের থেকে উচ্ছ্বিত হয়ে উঠেছে। তাই এমন নিবিড়ভাবে সরস।"

এর পরের চরিত্র সৈরভী। সে মেসের ঝি। গভীর রাতে মেসে সৈরভীর গলা খনখন করে ওঠে। "ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া বা ইয়ার্কি" তা ঠিক বুঝতে পারে না প্রভাত। তবে চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য এই যে তার কণ্ঠ অনেক রাত পর্যন্ত শোনা যায়। মেসের ম্যানেজার একটি অদৃশ্য চরিত্র। কখনো কোনো কাজে বা কথায় প্রভাতের সামনাসামনি দেখা যায় না। কেবল উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র। প্রভাতের মৃত্যুর পর তার দাহ নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, তখন অন্যদের যেমন প্রভাতকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় হয় না, তেমনি ম্যানেজারও বলে, "আমিই বা মেস ছেড়ে যাই কি করে?" সে মৃত প্রভাতের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে গালাগাল করে এবং প্রভাতের কামরায় তালা আটকে দেয়।

স্কুলের হেডমাস্টার আর একটি চরিত্র, যিনি প্রভাতকে তার বিষয় ইংরেজি পড়াতে দেয় না স্কুলে। প্রভাত এ বিষয়টি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে প্রভাতের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না। তিনি "কেমন একটা রাশভারি চাল বজায় রাখেন, ও পড়াবার কাজের থেকে অফিসের কাজই তাঁর বেশি ; অনেকটা সময় বসে নিজের কী একটা কম্পোজিশনের বইয়ের প্রুফ দেখেন, নতুন ম্যানুয়াল লেখেন। লম্বা কালো দাঁড়ি, সোনার চশমা, পরণে সাদা পেন্টালুন, গলাবন্ধ তসরের কোট, বুকপকেট থেকে সোনার চেন ঝুলছে।"

পরের চরিত্র হেমন্ত। প্রভাতের ছেলেবেলার বন্ধু। প্রভাতের মাকে মা বলে ডাকতো। কলেজে উঠে সে টলস্টয় পড়তো—তার উপন্যাস নয়, অন্য বইগুলো "কদমফুলের মতো চুল ছাঁটত— বিছানার চাদর গায়ে দিত—বিস্তর নিরস নিষ্ঠুর বই পড়ত সে—কিন্তু নিজে খুব হাসি-তামাশা মজলিশের লোক ছিল। একদিন কলেজে তাকে আর দেখা গেল না—সেই থেকে সন্ন্যাসী—" সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া হেমন্তকে নিয়ে প্রভাত এমন সিদ্ধান্তে আসে, "হেমন্তর জীবন একটা শ্মশানের খালের কিনারে রহস্যময় ফণিমনসা জঙ্গলের মতো গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যাড়া হয়ে, নিস্তব্ধ হয়ে।" মেসের সঙ্গী যারা তারা হলো রামপদ, শ্রীপতি, হরিদাস, বিষ্ণুপদ, ... ঠাকুর-চাকরেরা। কারোই প্রভাতকে দাহ করার জন্য নিমতলায় নিয়ে যাওয়ার সময় নেই। রামপদর অফিস নাই, কিন্তু তাকে পনের হাজার টাকার বীমার পলিসির জন্য ভোরবেলা না খেয়েই যেতে হচ্ছে।

শ্রীপতি বেকার। কিন্তু এই সকালে তাকে কর্পোরেশনে বস্তি-ইন্সপেক্টরের শূন্য পদের জন্য কাউন্সিলরদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হচ্ছে। হরিদাসের সেখানে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু সে তো একা যেতে পারে না। বিষ্ণুপদ শ্মশানে যেতে পারে, কিন্তু অন্যরা বেরিয়ে গেল বলে তার আর যাওয়া হয় না।

এছাড়া আছে প্রভাতের পনেরো বছর আগের স্কুলের বন্ধুরা অবিনাশ, অমূল্য, রমেশ, ইয়ুসুফ, রুক্মিনী, বিজন—এখনকার স্কুলের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে প্রভাত তীব্রভাবে ওদের কথা মনে করে। এইসব নতুন মুখের ভেতর থেকে "প্রভাত তার পনের বছর আগের জীবনটাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য খুব তীব্রভাবে উদ্ধার করে নিতে পারবে।"

কৃষ্ণচূড়া গাছ একটি চরিত্র বলে মনে হয়। দু'জায়গায় এ গাছটির উপস্থিতি অত্যন্ত প্রবল। একটি গাছ দেশের স্টিমার ঘাটের কাছে। "স্টেশনে নেমেই সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা চোখে পড়ে—ফাল্গুন মাসেই সেটা ফুলে ভরে যায়—"। অন্য গাছটি কলকাতা শহরে। প্রভাত যে স্কুলে চাকরি করে তার পাঁচিলের কাছে। "ইস্কুলের পাঁচিলের কাছে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ—সমস্ত ইস্কুলটার ভিতর এই যেন একটু জীবন।" 'জীবন' শব্দটি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে গাছের মধ্যে যেন মানুষের স্বপ্ন সঞ্চারিত হয়। সেটা একটা অন্যরকম মানুষ হয়ে ওঠে।

দিঘির পাড়ে একটি অশ্বত্থ গাছ আছে। কলকাতায় বসে প্রভাত জানতে পারে "সেই অশ্বত্থ গাছটায় পর-পর দুজন লোক গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে বলে সেই গাছটাকেই নাকি কেটে ফেলা হয়েছে—অপরাধ হল গাছের? এমন সবুজ ফলন্ত গাছকে কেউ কাটে? এবার গিয়ে ভালো দেখে আবার একটা অশ্বত্থের চারা লাগাতে হবে, কিন্তু কত দিনে বাড়বে বিধাতা জানেন—বড় আস্তে বাড়ে।" কিন্তু দেশে ফিরে অশ্বত্থের গাছ আর লাগানো হয়নি প্রভাতের। সেই গাছের মতোই মৃত্যুর মহাসড়কে সে নিজেও চলে গেছে। কলকাতার কলেজ স্কয়ারের বেঞ্চিতে বসে সে অনুভব করেছিল "অশ্বত্থের ভিতর দিয়ে ল্যাজঝোলা পাখির মতো হু-হু করে দক্ষিণের বাতাস উড়ে যায়।" একটি গাছের মধ্যদিয়ে প্রভাত তার স্বপ্নগুলোকে এভাবে অনুভব করেছে। অশ্বত্থ এখানে প্রভাতের অন্যান্য বন্ধুদের মতো একজন।

উপন্যাসে একটি বুড়ো শিমুল গাছ আছে। সেই বনের ধারে সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রভাত ছোটবেলা থেকেই এ গাছটিকে দেখে এসেছে। দেখেছে দাঁড়কাক সেই বনের গাছের ফুল ঠুকরে ছিড়তো। ও আরো দেখেছে ফুল পাকতে এবং ফল শুকনো হয়ে ফেটে যেতে। শুকনো ফল তুলো ছড়িয়ে দিতো আকাশে-বাতাসে। এবং শেষে এই গাছের সঙ্গে খোড়া হয়েছে মানুষের সম্পর্ক—অর্থাৎ "একদল ছেলেমেয়ের হাসি ঝগড়া-কলরব এই ফুল ও ফুলের সঙ্গে কতদিন এসে মিশেছে যে!" এই শিমুল গাছের কথা ভাবলে প্রভাতের চোখের সামনে জেগে ওঠে কৈশোরের পৃথিবী, যে পৃথিবী আর নেই। কারণ "সেই বালক-বালিকার ভিড় আজ নরনারীতে পর্যবসিত পৃথিবীর চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছে—শিমুলের ফুল ও তুলো আজ তাদের কাছে সবচেয়ে উপেক্ষার জিনিস।" এভাবে সময়ের প্রবহমানতা গাছের ভেতর দিয়ে মানুষের জীবনে এক হয়েছে। একটি তেঁতুল গাছ আছে প্রভাতের পৃথিবীতে। মাঠের ধারে মস্ত বড় তেঁতুল গাছ। মিষ্টি ছিল সে গাছের তেঁতুল। স্কুলের বন্ধুরা মিলে টিফিনের সময় সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছের তেঁতুল ছিঁড়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসতো। কলকাতায় বসে প্রভাতের ভাবনা 'সেই তেঁতুল গাছটা আছে আজ?'

এভাবে আরো অসংখ্য গাছ ঝোপ, বুনো ফুল, আগাছার উল্লেখ আছে উপন্যাসের পুরো ক্যানভাস জুড়ে। এসব প্রাকৃতিক চরিত্র উপন্যাসের ক্যানভাসকে ব্যাপক এবং গভীর করেছে। তাদের ভেতর দিয়ে নানা অর্থ বেরিয়ে আসে জগত এবং জীবন সম্পর্কে।

৪.

উপন্যাসের অনেক ঘটনার মধ্যে দুটি ঘটনা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। একটি খোকার শিশুত্ব হারানো। দ্বিতীয়টি কেতুর মৃত্যু। এই দুটি ঘটনা প্রভাতের জীবনকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। এদের নিয়ে প্রভাতের ভাবনা ছিল নানামুখী। উপন্যাসে খোকাকে আমরা সরাসরি দেখি না। সে আছে প্রভাতের চৈতন্যের অনুভবে, আছে ঠাকুরমা ও মায়ের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং মমতার মধ্যে। এভাবেই খোকা এ উপন্যাসের একটি আশ্চর্য জীবন্ত চরিত্র। উপন্যাসের শুরুতে খোকার নিজস্ব কোনো কার্যকলাপের পরিচয় দেখা যায় না। যেটা দেখা যায় সেটা প্রভাতের ভাবনা। খোকাকে ছয় মাসের রেখে কলকাতায় আসার পর প্রভাত তাকে আর দেখেনি। এখন ওর বয়স পাঁচ বছরের কাছাকাছি। এই বয়সে কি করতে পারে খোকা প্রভাতের সে ভাবনা দিয়ে এই উপন্যাসে খোকার উপস্থিতির সূচনা। এরও আগে অবশ্য নিজের স্বল্প উপার্জনের উল্লেখে প্রভাত আক্ষেপ করেছে যে এই উপার্জনে চলে না! কারণ "নিজে একা মানুষও নয় সে; স্ত্রী আছে—একটি ছেলেও রয়েছে।"

এই ছেলের কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে প্রভাত নিজের শৈশবকে কল্পনা করেছে। এক চৈতন্যের ভেতর থেকে অন্য চৈতন্যে প্রবেশ—রূপান্তরিত সময়ের ধারাবাহিকতার এক জীবন থেকে অন্য জীবনে নিয়ে যায়। খোকা ফড়িং-প্রজাপতির পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়। ধরতে পারে না সে। প্রভাতের মনে হয় ধরতে না পারাই ভালো। ধরতে না পারলে এরা খোকার "মনের ভিতর নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা ও স্বপ্ন জাগিয়ে রাখবে; ভোরের থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে অনেক বহুরূপী রূপের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাবে—"। এই কল্পনা ও স্বপ্নের ভেতর দিয়ে প্রভাত তার জীবন কাটিয়েছে। খোকাকে নিয়ে ভাবনার মধ্যদিয়ে সে নিজের চেতনাকে প্রবহমান রেখেছে। কমলার চিঠি থেকে যখন সে জানতে পারে যে খোকা মাদার কাঁটা ফুটিয়ে বাড়ি ফিরেছে তখন তার মনে হয় "সেই ছয় মাসের নিঃসহায় শিশু ক্রমে ক্রমে মানুষ হয়ে উঠেছে। ..প্রায় পাঁচ বছর আগে যে ছোট্ট টুকটুকে পা দুটো দেখে এসেছিল সে, আজ তা কাঁটা ফুটিয়ে নেবার মতো উপযুক্ত হয়ে উঠল।" প্রভাতের কাছে খোকার এই বড় হয়ে ওঠা এক দারুণ অভিজ্ঞতা। দেশে ফিরে খোকার সেই তুলতুলে পা আর হাত দেখতে পারবে না—ওকে কোলে নিয়ে আদর করা যাবে না—আদর করতে গেলে ছুটে পালিয়ে যাবে—কথায় কথায় কোলে তুলতে গেলে সেটা ভীষণ বাজে ব্যাপার হবে—এইসব চিন্তার মাঝে প্রভাত অনুভব করে "সেই খোকা যার শিশুত্ব গেল নষ্ট হয়ে"; এখন তাঁর সামনে এক ভয়ঙ্কর জীবন-যুদ্ধ।

এই অনুভবের পরই প্রভাত প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। ঘরে কেউ নেই। সে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায়। তার খিদে পায়। বাড়ি যাবার প্রস্তুতিকালে খোকার জন্য কেনা বিস্কুট ও লজেনচুষের প্যাকেটটা বের করে সে খেতে থাকে। লজেনচুষ খেয়ে মোড়কটা হাতের ভেতর রেখে দেয়। যখন সে মারা যায় তখন "লজেনচুষের মোড়কটা হাতের থেকে খসে পড়ে যায়—লাল-নীল লজেনচুষগুলো বিছানায় গড়াগড়ি খেতে থাকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইভাবেই খোকার শিশুত্ব হারানোর ভেতর দিয়ে জীবন-যুদ্ধে পরাজিত আর এক শিশু প্রভাতের হাতের মুঠি থেকে খসে পড়ে শৈশবের আনন্দ লজেনচুষের মোড়ক।

কেতু একটি কুকুর। পুরো উপন্যাসজুড়ে এই কেতু প্রভাতের মনোজগতে অত্যন্ত সচল ছিল। প্রভাত তার কলকাতার প্রবাস জীবনে কেতুর কথা যতো ভেবেছে স্ত্রী কমলার কথা তত ভাবেনি। জীবনানন্দ দাশ একটি প্রাণীর ভেতর দিয়ে সর্বপ্রাণের বোধ সঞ্চারিত করেছেন মানবজীবনে। কেতু অত্যন্ত আদরণীয়, প্রিয়—কেতু প্রভাতের জীবনের অদৃশ্য ভুবন। যেন কেতুর ভেতরে তার একটি অন্যরকম আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। যে কারণে প্রেম তার কাছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বাইরেও নানা কিছু, হতে পারে তা মাঠ, স্কুল, পথঘাট, অশ্বত্থ গাছ, খোকা কিংবা কেতু। প্রভাত বলেছে কমলা 'মর্জির মানুষ'। কমলার সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্কের টানাপোড়েন আছে সেটা উপন্যাসে পরিষ্কার নয়। নারী-পুরুষের প্রেম গভীর মর্যাদায় প্রভাতের কাছে প্রতিষ্ঠিত নয়। এটা প্রভাতের চরিত্রের অন্যতম দিক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কঠোর প্রতিনিধি হিসেবে প্রভাত উপন্যাসের সর্বত্র বিরাজমান। অথচ কেতুর জন্য তার উৎকণ্ঠার শেষ নেই। কলকাতায় বসে প্রায়ই ভেবেছে কেতু বেঁচে আছে তো? কেতুর দু'মাস বয়সে একদিন রাতে প্রবল চিৎকার করতে থাকলে প্রভাত তাকে উঠোনে ছুড়ে মারে। সেই থেকে ওর একটা পা ল্যাংড়া হয়ে যায়। ভাবে, এবার বাড়ি গিয়ে কুকুরটার ল্যাংড়া পায়ের ব্যবস্থা করবে, ওকে নিয়মিত কাঁটা, দুধ-ভাত খেতে দেবে। প্রভাতের মনে হয় কেতু যেন মাঝে মাঝে এ মেসের কামরার ভিতর থেকেও প্রভাতকে টানে—কী যেন বোবার কথা জানাতে আসে' এই সূত্র ধরে প্রভাতের ভাবনা আরো বিস্তৃত হয়—ভাবতে থাকে কেতুর হয়তো আজকাল ভাত জুটছে না, হয়তো তিন-চার দিন না খেয়ে থাকে কিংবা খিদের যন্ত্রণায় মরা বিড়ালের মাংস খায়, কিংবা ভাগাড়ের চারদিকে ঘোরাঘুরি করে, গরুর ঠ্যাং কুড়িয়ে এনে বাঁশবাগানের ছায়ায় বসে চিবোতে থাকে। তারপর এক সময় ওর চিবানো বন্ধ হয়ে যায়, ও প্রভাতের কথা ভাবে : "কোথায় সে গেলো? এই চার বছর ধরেই তাঁকে খুঁজছি, তবুও দেখা পাই না কেন? কোথায়?" এরপর প্রভাত ভাবে "ধীরে ধীরে চোখ বোঁজে হয়তো কেতু; ঘুমায় না; মাটির ওপর শুয়ে জিভ বের করে ভাবতে থাকে হয়তো এতদিন মানুষের কাছ থেকে সে যত অকল্যাণ ও গ্লানি পেল প্রভাত এলে সমস্ত জানাবে তাকে সে—" এরপর কেতুকে নিয়ে প্রভাতের একটি লম্বা ভাবনা আছে এবং "কেতুর কথা ভাবতে গিয়ে চুরুতে আর টান দেয়নি প্রভাত; চুরুটটা নিভে গেছে।" কেতুকে নিয়ে এমন নিমগ্ন ভাবনা প্রভাতের চরিত্রের আর একটি দিক। এভাবে এ উপন্যাসে একটি অন্যতম দিক। বোবা প্রাণীর চেতনা প্রবাহ আরোপিত হয় শব্দে এবং তা প্রবাহিত হতে থাকে উপন্যাসজুড়ে। প্রভাতের দেশে ফেরার কথার কথা মনে হলে অন্যদের উপস্থিতির কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় 'কেতু কুকুরটা আছে।' কেতুর একাকিত্বর কথা ভেবে কষ্ট পায় প্রভাত। ওর মনে হয় নিঃসঙ্গ মানুষের চেয়েও বেশি কষ্ট কেতুর। পরক্ষণে ভাবে, 'কে জানে কেতু বেঁচে-ই বা আছে কিনা?' প্রেমের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রভাত অনেক কিছুর সঙ্গে কেতুর কথাও বলে। মৃত্যুর আগে কমলার চিঠিতে জানতে পারে প্রভাত যে কেতু মরে গেছে। এই চিঠি পাওয়ার পর থেকে প্রভাতের 'এমন অবসাদ বোধ হয়' যে প্রভাত অসুস্থ হয়ে পরে কেতুর মৃত্যু প্রভাতের মৃত্যুর কারণ এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ও প্রভাতের চেতনায় আশ্চর্য জীবন্ত ছিল এবং কেতুকে কেন্দ্র করে প্রভাতের এই বাঙ্ময় অনুভব উপন্যাসের ক্যানভাসকে তাৎপর্যময় করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫.

পরিশেষে প্রভাতের মৃত্যু। অন্যলোকে সে যাত্রা করেছে। উপন্যাসের পাঁচ পৃষ্ঠাতে দেখা যায় মৃত্যু সম্পর্কে প্রভাতের অবচেতনে এক গভীর ছায়া আছে। এই মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়, এ মৃত্যু স্বপ্নের ভেতর দিয়ে যাত্রা। একসময়ের ট্রেনের যাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে প্রভাত ভাবছে : "তারপর রাত্রি নেমে আসে—অবসন্ন ঝিঁঝির ডাক, কোকিলের গান ও ব্যাঙের কলরবের ভিতর দিয়ে মাঠ-প্রান্তরের সীমানায় জোনাকিমাখা বাতাসের ভিতরে ট্রেন এসে থামে। তারপর স্টিমার—এ এক নিরুপম বিচিত্র যাত্রা—মাঠ আছে, তেপান্তর আছে ; সমস্ত রাত বিচিত্র সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে নদী যেন তিমিরাবৃত শীতল পাতাল দেশের দিকে চলেছে—

চুরুট নিবে গেল বুঝি?
কিন্তু জ্বালান না আর প্রভাত—"

মৃত্যুর এই অবচেতন অবস্থা থেকে চুরুট জ্বালানোর সময় আর প্রভাতের জীবনে ফিরে আসে না। লেখক এখানেই উপন্যাসের পরিণতির ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে তা মনে হবে না, এটা বোঝার জন্য ফিরে আসতে হবে আবার এইসব পঙ্‌ক্তির ভেতর। মৃত্যু নামক প্রবল স্রোত ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে যায়। আশ্চর্য মানুষ প্রভাত, মৃত্যু নিয়েও তার বৈজ্ঞানিক ভাবনা আছে। যেমন : "মাঠটার সেই সবুজ কটা ঘাসের গন্ধ ধূসর ঘড়ির মতো মাটির ঘ্রাণ—শুকনো ফুল ও নিমপাতার স্তূপ—লাল বটফলের গন্ধ—সেদিন এসব বড় একটি গ্রাহ্যের জিনিস ছিল না। কিন্তু আজ এই সবের কিনারে বসে ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও ভালোলাগে।

এরচেয়ে নিবিড় সুন্দর সফল পরিসমাপ্তি কোথাও নিয়ে যেতে পারে না আর।"

মৃত্যুকে এমন সফল পরিসমাপ্তি হিসেবে আলিঙ্গনের জন্য যে ধীর-প্রশান্ত স্থিতী প্রয়োজন প্রভাত যেন তারই প্রস্তুতি নিয়েছে। সেজন্যই ঘুরেফিরে সেইসব জিনিসের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেগুলো আপাত নির্বাক, কিন্তু প্রবল সচলতায় প্রাণবন্ত করে রেখেছে প্রভাতকে। এখানেই জীবন-মৃত্যুর দ্বৈরথে প্রভাতের 'বিচিত্র নিরুপম যাত্রা'। লেখক উপন্যাসের নাম রেখেছেন 'নিরুপম যাত্রা', এ যাত্রা স্বপ্নের, বাস্তবের নয়। এ যাত্রায় রাতের ট্রেন নদীর ভেতর দিয়ে পাতালের দিকে চলে যায়। মৃত্যু এ পর্যন্ত স্বপ্ন হয়ে থাকে।

কিন্তু মৃত্যুর দিকে বাস্তবের যে যাত্রা তা অত্যন্ত নির্মম, কদর্য এবং হৃদয়হীন। উপন্যাসের শেষে মেসের একা ঘরে প্রভাতের মৃত্যু হয়। জ্বরে বেহুশ হয়ে খিদার যন্ত্রণায় ছটফট করলেও পাশে কেউ থাকে না। ও এক মুহূর্তে ওর মা, স্ত্রী, খোকা, কেতু, বাবা, অশ্বত্থ গাছসহ আরো অনেকের কথা ভেবে নেয় এবং এইসব কথা ভাবতে ওর শরীর অবশ হয়ে আসে। বড় নিঃসঙ্গ যাত্রা। কিন্তু নিরুপম যাত্রা কি? "নিজের মৃত্যু অব্দি প্রভাত নিজের সমস্ত কাজ নিজেই সাঙ্গ করল। কিন্তু এখন থেকে সে অন্যের বোঝা।" যে মৃত্যু ধীরে ধীরে আলিঙ্গন করার বিষয়টি তার ভালোলাগা ছিল সে মৃত্যুর উপলব্ধি তার হয়নি। তার কাঙ্ক্ষিত নিরুপম যাত্রা তাকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়নি। এখানেই লেখকের শিল্পের কুশলী ব্যবহার। উপন্যাসজুড়ে নানা রোমান্টিকতায় তার যাত্রা দেখিয়ে তাকে নিদারুণ রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি করিয়ে দিলেন। মৃত্যুর পরবর্তী অংশটি আরো নির্মম। অর্থাৎ দাহের কি হবে?

সকালে দাহ করার জন্য কয়েকজনকে একসঙ্গে করা গেল না। প্রত্যেকে ব্যস্ত যার যার কাজে। কে সময় দিতে পারবে তার একার পক্ষে শ্মশানে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং—ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো রাতে দাহ হবে। অতএব প্রভাতের ঘরে মেসের ম্যানেজার তালা লাগিয়ে দেয়। সারাদিন ধরে মেসের ঠাকুর-চাকররা এক একবার এসে মড়া দেখে যায়। বারান্দায় থুতু ফেলে। মেসের ম্যানেজার দোতলা-তিনতলায় ওঠানামা করে আর মরার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে গাল দেয়। কলতলায় চাকর ঝিয়েরা জটলা করে। আস্তে আস্তে দুপুরের নির্জনতা বাড়ে। রান্নাঘরে চাকরেরা নাক ডেকে ঘুমোয়। বড়রা কেউ নেই মেসে। আছে দুটি ছেলেমেয়ে। তারা এক একবার পা টিপেটিপে এসে মড়ার ঘরে উঁকি দেয়—তারপর 'ভূত-ভূত' বলে পালিয়ে যায়। ওরা আবার আসে, আবার পালায়। এভাবে "ঘন্টার পর ঘন্টা সমস্ত দুপুর—তাদের এই চিত্তাকর্ষক খেলা চলে।"

উপন্যাস শেষ হয় এভাবে "প্রভাতের রুদ্ধ ঘরে মাছির ভনভনানি, অসহ্য গুমোট ও সময় এক এক সময় মৃতের পক্ষেও যেন অসহ্য হয়ে ওঠে—

পৃথিবীর বাজপাখির নয়—চড়ুই পাখি, শালিখ পাখি, এই উদাসী, করুণ, সংসারের কর্তব্য সংগ্রাম নিষ্পেষিত বঞ্চনাত্মা যুবক কোনোদিন তার প্রমত্ততম কল্পনায়ও মনে করেনি যে এই মেসে সে মরবে—তার মৃত্যুর পর মেসের একটা দিন এই রকম কেটে যাবে—এই মেসের কয়েকটি বাবু সিগারেট আর পানের ডিবে নিয়ে রাতে নিমতলায় তাকে পোড়াতে যাবে—"

প্রভাতের অবচেতনে সুন্দর মৃত্যুর জন্য স্বপ্ন ছিল, কিন্তু এমন মৃত্যু নয়, যার পরে বড়রা বারান্দায় থুতু ফেলবে আর ছোটদের কাছে সে ভূত হয়ে যাবে।

এভাবে একজন মানুষের জীবনের কল্পনার নিরুপম যাত্রা বাস্তবে অবাস্তব হয়ে ওঠে। জীবনের সঙ্গে এখানেই শিল্পের বন্ধন—যে বন্ধন এক আশ্চর্য সম্মিলনে পূর্ণ করে পাঠকের পিপাসা। জীবনানন্দ দাশ কবি এবং কথাশিল্পী—দুই শিল্প মাধ্যমে তার দেখার কোনো ফাঁক নেই, যে দেখা একজন শিল্পীর সবচেয়ে বড় ক্ষমতা। তিনি তাঁর উপন্যাসকে এই বড় ক্ষমতা দিয়ে অসাধারণ করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থিরচিত্রে কবি জীবনানন্দ দাশ-এর

কবিতার রূপায়ণ

নওয়াজেশ আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনলতা সেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারে দু'দন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটরের বনলতা সেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটরের বনলতা সেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;

পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব পাখি ঘরে আসে---সব নদী---ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পৃথিবীতে এক

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে---সবচেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে গাছের নাম : অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে,---সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর---
শঙ্খমালা নাম তার : এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশ : একটি ব্যক্তিগত পর্যালোচনা

আনিসুজ্জামান

জীবনানন্দ দাশের কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়টা ঠিকমতো হয়নি। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, যখন আই.এ. ক্লাসে পড়ি, তখনো জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি জেনে পাড়ার দিলীপ দত্ত এনে দিলেন তখন পর্যন্ত কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমির'। আমি এখনো মনে করি, এই বই দিয়ে জীবনানন্দ দাশের কাব্যপাঠের সূচনা করা সঙ্গত নয়। এ কাব্য আমার বোধগম্য হয়নি, দু-একটি কবিতা এবং কিছু চিত্রকল্প ও ধ্বনিবিন্যাসের বাইরে এ কাব্য আমার ভালো লাগেনি। 'সাতটি তারার তিমির' পড়ছি শুনে আমাদের কৌতুকপ্রিয় বন্ধু বদরুল হাসান বললেন : "'সমারূঢ়' কবিতাটা পড়েছ? যত অক্ষম কবি এখন পার পেয়ে যাচ্ছে 'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা' বলে। আমার জবাব কী, শুনবে? ডিম পাড়তে পারি না বলে কি ডিম খেতেও জানি না?"

তবু 'সাতটি তারার তিমির' আমাকে ভাবিয়েছিল। ক্রিয়াপদ ও সর্বনামে সাধু-চলতির সেই পুরোনো মিশ্রণ, 'পানে' 'তরে' প্রভৃতি পদ্যগন্ধী শব্দপ্রয়োগ-এর মধ্যে আধুনিকতা কোথায়? আবার 'একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে'—এ পঙ্ক্তি কি কবিতার? অন্যদিকে 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস/ বাতাসের ওপারে বাতাস—/ আকাশের ওপারে আকাশ।'—এসব চরণের দ্যোতনার মধ্যে একটা অনিবার্য মোহময়তা আছে। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলাম, জীবনানন্দকে বুঝতে হলে আমাকে আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

অনতিকাল পরে ভাগ্যিস হাতে এসেছিল বুদ্ধদেব বসুর 'কালের পুতুল'। তাতে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'বনলতা সেন'-এর সমালোচনা পড়ে সংকল্প করতে হলো, আর দেরি না করে এই বই দুটি পড়তে হবে। একটু চেষ্টা করতে হলো। বুদ্ধদেব বসুর যত্নকৃত 'এক পয়সার একটি' সিরিজে পাওয়া গেল 'বনলতা সেন' আর বাস্তবিকই ধূসর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র গোড়ায় 'নির্জন স্বাক্ষর' নামে কবিতা দেখে চমকে উঠেছিলাম, কারণ ওই নামে বুদ্ধদেব বসুর একটি উপন্যাস পড়া তখন সদ্য শেষ করেছি। বইয়ের নামকরণে বুদ্ধদেব বহু ক্ষেত্রে সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার করেছিলেন, তা জানতাম। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ তাঁকে কতটা মুগ্ধ করেছিলেন, তার নবতর প্রমাণ পেয়ে বিস্মিত হলাম।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'বনলতা সেন' বারবার পড়েছি (পরেরটির সিগনেট-সংস্করণ—সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ নিয়ে—যখন বের হলো, তখন তা অবশ্যই আমার সংগ্রহে যুক্ত হয়)। তাঁর সেই দৃপ্ত ঘোষণা :

> কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
> আমি বহে আনি;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন শুনেছ যে-সুর—
ফুরায়েছে,—পুরোনো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ !

—এই অহংকৃত সুস্পষ্ট দাবি—কতটা সত্য, তা বোঝার চেষ্টা করেছি। সে-চেষ্টা করতে গিয়ে সবটা না হলেও তাঁকে অনেকখানি বুঝতে পেরেছি এবং তাঁর সব কবিতা না হলেও অধিকাংশ কবিতাই আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে। দিনেশ দাসের 'এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে' ছিল আমাদের প্রিয় লাইন। অবাক হয়ে দেখলাম, জীবনানন্দ লিখেছেন 'কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ'। 'বোধ' বা '১৩৩৩', 'বনলতা সেন', 'হায় চিল' বা 'আট বছর আগের একদিন'-এর মতো কবিতার বেশ খানিকটা ততদিনে মুখস্থ হয়ে গেছে এবং কবির সঙ্গে আমিও ঢেউয়ে, শিশিরে, বাতাসে গানের শব্দ শুনতে এবং নরম জলের বা ফেনার গন্ধ পেতে শুরু করেছি, হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ বা চিলের ডানায় রৌদ্রের গন্ধ ভেসে এসেছে আমার নাকে।

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে :

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে :
তবুও সাধনা ছিলো একদিন—এই ভালোবাসা ;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি ; যে-নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি ;
তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা।

এখানে কিছুই অস্পষ্ট নয়, ভাব-ভাষা-ছন্দ সবই পরিচিত—তাতে এক ধরনের স্বস্তি পেয়েছি, এবং সবটা মিলে রোমাঞ্চিত হয়েছি।

ঠিক সেই সময়টায় অপঘাতে মৃত্যু হলো জীবনানন্দ দাশের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা [বিভাগের] সমিতির উদ্‌যোগে আমরা শোকসভা করলাম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে সভাপতি করে। আলোচনা করতে আমন্ত্রণ করে আনলাম কবির দুজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি কবি আবুল হোসেন ও কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালামকে। দুই প্রধান আলোচকের মধ্যে বিতর্ক লেগে গেল জীবনানন্দ নির্জনতার কবি কি না, তা নিয়ে। জীবনানন্দকে 'নির্জনতম কবি' আখ্যা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু এবং সিগনেট-সংস্করণ 'বনলতা সেন'-এর শেষ প্রচ্ছদে, আমার যতদূর মনে পড়ে, সে-কথাটাই বড় বড় করে ছাপা হয়েছিল বুদ্ধদেবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখ না করেই। 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় কবি যদিও বলেছিলেন যে, একথা তাঁর কিছু কবিতা সম্পর্কে সত্য হলেও সকল কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে সত্য নয়, তবু ওই অভিধা চালু হয়ে গিয়েছিল। আমাদের শোকসভায় কথাটা অনিবার্যভাবেই উঠল। একপক্ষ কবির নিসর্গপ্রীতি ও আত্মভাবমগ্নতার উল্লেখ করে এই বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। অন্যপক্ষ বললেন, জীবনানন্দ প্রকৃতই নাগরিক কবি এবং নাগরিক কবি নির্জনতার কবি হতে পারেন না। পূর্বপক্ষ বললেন, তাঁর মৃত্যুর ঘটনাই যন্ত্রবিদ্ধ নগর ও কৃত্রিম নাগরিক জীবনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদবিশেষ। উত্তরপক্ষ বললেন, তাহলে মনে করতে হবে, যাকে আমরা দুর্ঘটনা বলছি, তা ইচ্ছামৃত্যু। এই সময়ে সভাপতি উভয়পক্ষকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা শোকসভা, ডিবেটিং ক্লাব নয়'। সভাপতির ভাষণে ড. শহীদুল্লাহ্ বললেন, জীবনানন্দ দাশের কাছ থেকেই তিনি জেনেছেন যে, কবি ছিলেন তাঁর ছাত্র। তবে কবে এবং কোথায়, সে-সম্পর্কে কিছু বললেন না। আমরাও জীবনানন্দের জীবন সম্পর্কে যতটুকু জানতাম, তার সঙ্গে সভাপতির কথা ঠিক মেলাতে পারলাম না। 'মহাপৃথিবী' পড়েছিলাম কবির জীবদ্দশায় (সিগনেট-সংস্করণ কি তখন বেরিয়েছিল?), 'বেলা অবেলা কালবেলা' তো প্রকাশিতই হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। প্রথমটি, মনে হয়েছিল, 'বনলতা সেন'-এর সংলগ্ন, আর দ্বিতীয়টিতে সন-তারিখের বহুল উল্লেখ দেখে মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তবে কি তাঁর ইতিহাস-চেতনা সম্পর্কে সমালোচকদের উক্তির তিনি প্রমাণ রেখে দিতে চেয়েছিলেন? আবার 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'বোধ' কবিতার অংশবিশেষের সঙ্গে সাদৃশ্য সত্ত্বেও 'বিস্ময়'-এর মতো কবিতা লেগেছিল খুব ভিন্নধর্মী :

> কখনো বা মৃত জনমানবের দেশে
> দেখা যাবে বসেছে কৃষাণ :
> মৃত্তিকা-ধূসর মাথা
> আপ্ত বিশ্বাসে চক্ষুষ্মান।
>
> *　　*　　*
>
> তুমি কি প্রভাতে জাগো?
> সন্ধ্যায় ফিরে যাও ঘরে?
> আস্তীর্ণ শতাব্দী ব'হে যায়নি কি
> তোমার মৃত্তিকাঘন মাথার উপরে?
>
> কী তারা গিয়েছে দিয়ে—
> নষ্ট ধান? উজ্জীবিত ধান? ...

সচরাচর সমাজচেতনা বলতে আমরা যা বুঝি, এ তার চেয়ে ভিন্ন।

কবির মৃত্যুর অল্পকাল পরে যখন 'রূপসী বাংলা' বের হলো, তখন আমাদের সকলের চমকে যাওয়ার পালা। আমরা যখন জানতে পারি, এসব কবিতা লেখা হয়েছিল তিরিশের দশকে এবং প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তা প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল, তখন খালি জানতে ইচ্ছে করে, কী বিবেচনা করে এই সনেটগুচ্ছকে পাঠকের দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছিলেন তিনি? এতে তাঁর কবিতার বেশির ভাগ বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে—নিসর্গপ্রীতি, ইন্দ্রিয়জাত অভিব্যক্তি, ইতিহাসচেতনা, এমন কি নামের ব্যবহার—নদনদীর নাম, গাছগাছালি-পশুপাখির নাম, ইতিহাসে খ্যাত ও রূপকথার কথিত ব্যক্তির নাম—সবই আছে। পুনরাবৃত্তি হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ভাবের, কিন্তু কাঠামোর নেই এতটুকু শিথিলতা। জীবনানন্দ দাশ এখানে রোমান্টিক ; বাংলার প্রকৃতি ও বাঙালির মন এখানে পরস্পর যুক্ত হয়েছে। প্রবাসী মানুষটি যেন বহুকাল পরে ফিরে এসেছেন নিজের গৃহকোণে। মৃত্যুর পরে বাংলার ঘাসের গুচ্ছে ঘুমিয়ে রইবেন তিনি, জামকাঁঠালের ছায়া পড়বে তাঁর বুকে, মুখের ওপর ঝরে পড়বে অশত্থপাতা, বঁইচি-শেয়ালকাঁটা নিবিড় হবে তাঁর দেহের সঙ্গে, বাসকের গন্ধ পাবেন, শুনবেন গুবরে পোকার গুমরানি, জানবে এরা তাঁকে ভালোবাসে—এই তাঁর শেষ ইচ্ছে।

আমাদের এই বাংলাদেশে ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারাটা যত প্রবল হয়েছে, আশ্চর্য নয় যে, 'রূপসী বাংলা' এখানে হয়েছে ততই জনপ্রিয়। আমার ধারণা, এ কাব্য পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বাংলাদেশে বেশি আদৃত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনা আমি অন্যত্র বলেছি, এখানে সংক্ষেপে তার পুনরাবৃত্তি করি।

আমাদের এক ভারতীয় বন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়ে একবার জানতে চেয়েছিলেন, পরেরবার যখন আসবেন, তখন কী নিয়ে আসবেন তাদের জন্যে? তারা বহু দ্বিধার পরে উত্তর দিয়েছিল। জামাকাপড় নয়, খাদ্যদ্রব্য নয়,—'রূপসী বাংলা'র একটি কপি। হয়তো এ-বিচার নন্দনতাত্ত্বিক নয়, তবে একজন কবির পক্ষে এর চেয়ে বড় পাওয়া কী হতে পারে, আমার তা জানা নেই।*

---

* ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পা. 'জীবনানন্দ বিবেচনা' [২০০০] থেকে গৃহীত। প্রকাশক : অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাগেরহাটের চিত্রপটে জীবনানন্দ দাশ

আবুবকর সিদ্দিক

বাগেরহাটের অবিশ্বাস্য সুন্দর সবুজ নিসর্গপটে, কার সাধ্য তার আগ্রাসী মোহপাশের মুখে এসে নির্লিপ্ত ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসে থাকে? সে চক্ষু অন্ধ, সে কর্ণ বধির, সে হৃদয় পাথর। নিবিড় ঘন বৃক্ষপল্লবের পুঞ্জ পুঞ্জ সবুজ, বলকে বলকে সেই কৃষ্ণাভ শ্যামল অন্ধকার, আর আদিগন্ত প্রান্তরশায়ী শিশুসুলভ প্রগলভ সবুজ, যেন দুধের ঢলক দেওয়া কাঁচা প্লাবন, আর বুকে বাঁধা যৌবনের গাঢ় ফোঁপানি নিয়ে গুমরে গুমরে বয়ে যাওয়া নিরন্তর নদী দড়াটানা, দু'তীরে ক্ষমাশীল সহিষ্ণু সবুজ, পায়ে পায়ে শত বনলতার নেশাজাল ; কোন উন্মাদ অপ্রেমীর সাধ্য ফেরায় তার 'বিলাসের সম্ভাষণ'? এই বনজ স্বর্গভূমি বাগেরহাট রূপার্তকে করে প্রেমিক, মরমীকে করে সাধক আর সংবেদীকে অবধারিতভাবে করে কবি।

আমার জন্ম, আমার বেড়ে ওঠা, চাকরি–বাকরি, আনন্দ–যন্ত্রণা, ভালোবাসা, প্রেম, গান, অভিনয়, কবিতা সব কিছুর পাপড়ি মেলা এই বাগেরহাটের অপত্য আঁচলে। অথচ কোনো দিন জানতেই পারিনি এখানেই কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনের ভবঘুরে পর্বের কয়েকটি গোপন মাস তপোলীন ব্রতীর মতো নিঃশব্দে কেটে গেছে। বাগেরহাট (অধুনা সরকারি) পি. সি. কলেজে ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে আমার জীবনের সতেরোটি বছর যাপিত। কী আশ্চর্য! একজন বিদেশীর মুখেই প্রথম জানতে পাই, এই কলেজে জীবনানন্দ দাশ কিছুদিন অধ্যাপনা করে গেছেন। প্রথম শুনেই খবরটা উড়িয়ে দেবার কথা। আমার বাবা এখানে পড়েছেন। আমি পড়েছি ও পড়াচ্ছি তখনো। এত মেলামেশা বালক–বৃদ্ধ–নির্বিশেষে! এত অহরহ কাব্যচর্চা ভক্ত–অনুরাগী সমাজ নিয়ে। কোনো দিন জনশ্রুতিও জানতে দেয়নি, জীবনানন্দ দাশ এই কলেজের কামরায় চেয়ার পেতে বসে বসে (শুনেছি, টেবিলে বসে পা ঝুলিয়ে) ইংরেজি পড়াতেন। পড়াতে পড়াতে আত্মগত ভাবে বলে উঠতেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আবদুল কুদ্দুস হাওলাদারের মুখে শোনা), "ওয়েল মাই ডিয়ার ইয়ং মেন!"

খবরটা অলীক সম্ভবত। কিন্তু খবরবাহক বিদেশী ব্যক্তিটি ও যাঁর হাতের লেখা চিঠি নিয়ে তাঁর এই দূর মফঃস্বল শহরে ছুটে আসা, তাঁদের তো ফেলনা বলে উড়িয়ে দেবার জো নেই। বিদেশী অতিথিটি শিকাগো ইউনিভার্সিটির একজন মার্কিন গবেষক আর তাঁর পরিচিতিপত্রখানি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বড় কবি বিষ্ণু দে নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন।.

বাগেরহাটে জীবনানন্দ দাশ আবিষ্কৃত হবার সঠিক তারিখটি ভুলে বসে আছি। তবে জলজ্যান্ত মনে আছে সেই দিনটির কথা—মেঘ থমথম দুপুরে পাংশু মুখের চেহারাখানি। মাসের নাম ভুলতে পারিনি কারণ সে আমার জন্মমাস—ভাদ্র ; আগস্ট ১৯৬৭ সাল। তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাগেরহাট পি.সি. কলেজে বাংলা পড়াই আমি। এখানে ছ'বছর চাকরি করার পর ১৯৬৫-তে দু'বছরের জন্যে কুষ্টিয়া কলেজে চলে যাই। তারপর ১৯৬৭-তে আবার এখানেই ফিরে এসেছি। কলেজ রোডে বাসা।

বেলা আড়াইটের দিকে ক্লাস নিয়ে বাসায় ফিরছি। আনু গালে হাত দিয়ে থম ধরে বসে আছে। "এত কিসের ধ্যান?" আমার জিজ্ঞাসায় না চমকে উঠে না ঘাড় ঘুরিয়ে নির্লিপ্ত উত্তর দেয়, "ঘরে বিদেশী লোক বসে আছে কিছু খায়নি।" "কী দিয়েছিলে?" আমার প্রশ্নের উত্তরে আনু জানায়, "ডিমরুটি ফেরৎ দিছে। খালি চাডুক খাইছে।" "বিদেশী লোক কে এই বাগেরহাটে? কলকাতার কবিটবি?" আনু মাথা নাড়িয়ে বলে, "শাদা সায়েব। ইংরেজি কয়, বাংলাও কয়। কবি বিষ্ণু দে পাঠাইছেন।" বিষ্ণু দের নাম শুনে আমি সিরিয়াস হই। ১৯৬৩ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্য সম্পর্ক। কলকাতায় গেলে দেখাসাক্ষাৎ, দেশে এলে চিঠিপত্তর। আমার এই দূর মফঃস্বলের বাসাবাড়িতে তাঁর সূত্র ধরে বিদেশী অতিথিদের আগমনের এটা সূত্রপাত কেবল।

ড্রয়িং রুমে ছোট একটা গোল টেবিলে আমি লিখি। তার উপর কনুই পাতিয়ে জোড়ামুঠোয় থুতনি নামিয়ে নিমগ্ন বসে আছে সে। আমার সাড়া পেয়ে চকিতে উঠে দাঁড়ায়। বেশ কসরৎ করে দু'হাত জোড় বেঁধে নাকের কাছে তুলে ধরে নিষ্পাপ হাসি দিয়ে বলল, "নোমোস্কার!" খাস বাংলা শব্দ। শুনেই চমৎকৃত আমি! নাম জিজ্ঞেস করলে জবাব দিল, "আমার নাম ক্লিনটন বুথ সিলি। আপনি আমাকে 'ক্লিন্ট' বলবেন। 'সিলি' বলেও ডাকতে পারেন।" বলতে বলতে পকেট থেকে কবি বিষ্ণু দে'র লেখা চিঠি বের করে দিল। জানা গেল, এই আমেরিকান যুবকটি শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ নিয়ে কবি জীবনানন্দ দাশের উপর পি-এইচ.ডি. পর্যায়ে গবেষণা করছেন। তাঁকে সাধ্যমত সহযোগিতা করার অনুরোধ। তখনো অর্থাৎ সেই '৬৭ সাল অবদি কেউ জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে ডক্টরেট লেভেলে কাজ করছেন বলে আমার জানা ছিল না। বাঙালি নয়, একজন বিদেশী বিদেশের মাটিতে বসে বিদেশী ভাষায় জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে এই মহৎ কাজটি করছেন, বিস্ময় ও আনন্দ আমাকে অভিভূত করে ফেলে। কিন্তু বরিশালের কবি জীবনানন্দ দাশের ডাটা খুঁজতে বাগেরহাটে কেন? বিষ্ণু দে কি বরিশালে—বাগেরহাটে গুলিয়ে একাকার করে ফেললেন? মনে হয় আমার বেপথু মনোধন্ধ আঁচ করতে পেরেই শুভ্র হাসির মেশালে সেই অবিশ্বাস্য ঐতিহাসিক বিস্ফোরণটি ঘটালেন সিলি: "পোয়েট জীবনানন্দ দাশ বাগেরহাট পি. সি. কলেজে ইংলিশের টিচার ছিলেন।" কী করে বিশ্বাস করা যাবে এমন একটা আনকোরা খবর? সেই ছাত্রজীবন থেকে যে কবির কবিতা, তাঁর শব্দধ্বনি, উপমা, ছন্দ প্রায় প্রতিটি অনুকণা ঠোঁটে, কণ্ঠে, হৃদয়ে জপস্তব আমার, এই বাগেরহাটে বাস করে আমি টের পাইনি তিনি আমাদের এই পুরনো প্রিয় কলেজটিতে চাকরি করে গেছেন! এই শহরেই তিনি কোথাও না কোথাও বাস করতেন! ভীষণ বিশৃঙ্খলা বয়ে যায় আমার স্নায়ুমণ্ডলীতে।

আমি সিলিকে নিয়ে সরাসরি কলেজের অফিসরুমে চলে আসি। হেডক্লার্ক ইয়াকুব আলী সাহেবকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। শুনেই প্রথমটায় হেসে দেন তিনি। কেননা এ সব আধুনিক কবিতাটবিতা তাঁদের কাছে পাগলামো বৈ আর কিছু নয়। "ফর্টিসেভেনের পরে ও সব রেকর্ডটেকর্ড আছে নাকি টিকে এখনো? তার পরেও তো কতো সাইক্লোন… কতো …"

…বলতে বলতে নিজের কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়ান তিনি। কলেজের অ্যাকাউন্ট্যান্ট আজাদ (খলিলুর রহমান আজাদ) সাহেব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ব্যালকনিতে উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলেন তর তর করে। আমাকেও তুলে নেন হাত বাড়িয়ে। সে এক প্রত্নপৌরাণিক দপ্তরশালা। কতকালের মৃত সব ধূলিরাশি, শুকনো ছত্রাক, কীটপতংগের দেহখণ্ড, বিস্মৃতপ্রায় গন্ধাবশেষ আর পেল্লায় সাইজের ওজনঅলা সব মান্ধাতা আমলের চামড়াবাঁধাই খাতা মিশরের মমীর শরীরের মত নিবর্ণ ওঁচা সে চামড়া ... ! হাতে উঠে আসে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের সার্ভিস রেকর্ডের খাতা। পুরোটাই ইংরেজিতে লেখা। যে তথ্য উদ্ধার হয়, তা রোমাঞ্চকর এবং অজ্ঞাতপূর্ব। ইংরেজি বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপক এম. কর ওরফে মনোরঞ্জন কর বাগেরহাট পি.সি. কলেজ থেকে ছুটিতে যান (আসলে কলকাতার বংগবাসী কলেজে জয়েন করেন)। তাঁর লীভভ্যাকান্সিতে জীবনানন্দ দাশ অস্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে জয়েন করেন। খুঁজে পেতে স্যালারি বিলের খাতাটিও সামনে হাজির করে দেন আজাদ সাহেব। তাতে সাক্ষ্য মেলে, মাত্র দু'মাস বিশ দিনের মাইনে ড্র করেছেন তিনি। তারপর আর নামগন্ধ নেই।

গাইড হিসেবে আমি কতখানি অকিঞ্চন, মনে হয় সিলি টের পেয়ে গেছে ততক্ষণে। আসলে আমিও তো সেই দুপুর থেকে ভেবে মরছি, এই বাগেরহাট শহরেই কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত অনিকেত জীবনের কয়েকটি দিনরাত কাটিয়ে গেছেন। কোথায় কোন্ পাড়ায় কোন্ সে রাস্তার ধারে ছিল তাঁর বাসাটি? এখানে কোনো এক বাড়ির কামরায় অথবা বারান্দার একটেরে চেয়ার–টেবিলে মাথা গুঁজে বসে জীবনানন্দ দাশ কবিতা লিখছেন, এ দৃশ্য কল্পনা করতেও শিহরণ বয়ে যায় শরীরের সারা শিরায়। বড় জানতে ইচ্ছে করে, ক্লান্তপ্রাণ কবি ! তোমাকে কি দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল আমাদের এই নদী গাছ, আকাশ প্লাবিত পাড়াগেঁয়ে সুন্দরী বাগেরহাট? কবির ইংরেজিতে লেখা 'লিটারারি নোট্‌সে'র পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে সম্প্রতি, যার সূচনা ১৯১৬ সাল থেকে। ১৯২৯ সালের ঐ নোটে কি লেখা আছে, জানতে কৌতূহল হয়।

তবে সিলির উত্তরোত্তর গবেষণাকর্মে আমরা কোনো স্বচ্ছতর আলোর সংকেত পাই না। তিনি একটি রাতই ছিলেন বাগেরহাটে আমার কাছে। এখান থেকে শিকাগোয় ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর থিসিস পুরো করেছেন। ইংরেজি ভাষায় লেখা সেই ডক্টর‍্যাল থিসিস বই আকারে ছেপে বেরও হয়েছে। এবং বাংলা ভাষায়ও কিছু কিছু অনুপূরক গদ্যরচনা বেরিয়েছে তাঁর। মূল অভিসন্দর্ভ গ্রন্থে যথার্থই উল্লেখ করেছেন তিনি বাগেরহাট পি. সি. কলেজে জীবনানন্দ দাশের স্বল্পকালীন চাক্‌রিবৃত্তির কথা। বস্তুত, বাগেরহাটে জীবনানন্দ–আবিষ্কারের মূল হোতা ক্লিনটন বি. সিলি। পরবর্তীকালে তাঁরই উৎসপ্রাণিত অধমর্ণগণ এ তথ্যটি তাঁদের লেখালেখিতে পুনর্ব্যক্ত করে সম্প্রতি একটা বাজারচালু বুলিতে এনে দাঁড় করাতে পেরেছেন। ফলে যে ফাঁকটা সিলি রেখে দিয়েছেন তাঁর স্বভাববশে, তা আর পূরণ করা সম্ভব হয়নি কারো পক্ষে। বাগেরহাট পি. সি. কলেজে জীবনানন্দ দাশের দুই মাস বিশ দিন অবস্থানের স্বপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট দিন–ক্ষণ তারিখ এবং চাকরিটি যে অধ্যাপক এম. করের লীভ–ভ্যাকান্সিতে অস্থায়ী–ভিত্তিক নিয়োগ ছিল, সিলির লেখায় কোথাও তার উল্লেখমাত্র নেই। (ক্লিনটন বি. সিলি. 'এ পোয়েট অ্যাপার্ট', ইউনির্ভাসিটি অব ডিল্যায়ার, নিউইয়র্ক, ১৯৯০)। আর তাঁর উত্তরসূরিগণ এই সূত্রই মান্য করে আসছেন বিশ্বস্তভাবে (সুব্রত রুদ্র (সঃ), 'জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি', নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৯৪১। প্রভাতকুমার দাস, 'জীবনানন্দ দাশ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদমি, ১৯৯৯, পৃ. ১২৭। গোপালচন্দ্র রায়, 'জীবনানন্দ', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ২৭। সুচরিতা দাশ, 'দাশপরিবার ও জীবনানন্দ', 'দেশ', কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ. ৩৮)। গোপালচন্দ্র রায় এই চাকরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"টেম্পরারি ছিল কিনা", সে বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতা জানিয়েছেন। এহ বাহ্য ; অশোকানন্দ দাশ, সুচরিতা দাশ প্রমুখ বাগেরহাট পি. সি. কলেজের চাকরি ত্যাগের কারণ স্বরূপ জীবনানন্দের 'ভাল না লাগা'র উল্লেখ করেছেন। এটা যে আগবাড়ানো আন্দাজি বিশ্লেষণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ মাত্র তিন মাসের লীভ–ভ্যাকান্সির ওই অস্থায়ী মেয়াদি চাকরিতে ফুরসৎ ছিল কি ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগাকে প্রাধান্য দেবার?

আরেকটি বিচিত্র ব্যাপার। সিলি তাঁর বইয়ে বাগেরহাটের দড়াটানা নদীতে ভাসমান ডিঙি নৌকো প্রসঙ্গে বলেছেন, সম্ভবত এই নৌকোদৃশ্য দেখে কবি জীবনানন্দ দাশ অভিভূত (অনুপ্রাণিত) হয়েছেন। অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না, আসলে জীবনানন্দ দাশ নন, অবাঙালি তথা খাস মার্কিনী ক্লিন্ট সিলি নামক সাহেব–দ্রষ্টা মেঘলা আকাশের নিচে সাদা নদীর উপর সুবৃহৎ সব জীবন্ত পতঙ্গসদৃশ কালো কালো দীঘল ডিঙি নৌকোর জলকেলি দেখে চমৎকৃত হন। এ নদীর তীর ধরে বহমান আশ্চর্য শ্যামলিমা নয়, নয় শারদাকাশের সমলিন মহিমা অথবা শস্পসবুজ প্রান্তরের মুক্তি কিংবা মোহন ঠামে অগ্রসরমান অনূঢ়া পথের দু'ধারে পুঞ্জিভূত বৃক্ষস্তবকের ঘনতামসী চাপ ; এ সব অপার্থিব যাদুবাস্তবতা আদৌ কোনো নান্দনিক আবেদন তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে তাঁর বস্তুসর্বস্ব দু'টি চর্মচক্ষুর কাছে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য, বরিশালের তুলনায় বাগেরহাটে জলপ্রাধান্য তুলনামূলকভাবে কম। ফলে সবুজ কুহকের প্রসাদ বরিশালের তুলনায় বাগেরহাটের নিসর্গপটে সমৃদ্ধতরই হবার কথা।

জন্মমাটির প্রতি প্রেম ও শৈশব–কৈশোরের লীলাভূমির জন্যে নষ্ট্যালজিক টান হেতু জীবনানন্দের কবিতার সিংহভাগ বরিশালের মায়াক্রান্ত কিন্তু তাই বলে তাঁর অতিমানবিক ইন্দ্রিয়জাগর 'বোধে'র তন্ত্রীতে বাগেরহাটের অঢেল রূপরাশি একটি স্পন্দনও তুলবে না, নিছক নৌকাবিলাসেই তুষ্ট থাকবে সেই আগ্রাসী সৌন্দর্যপায়ী বোধ, এ হাইপোথিসিস মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। শুধু কৌতূহল, দৈনন্দিন যত ধূলিধূসরতা তার ঊর্ধ্বে কোনো আত্মলীন নিবিড় নিমগ্নতার লগ্নে রূপবতী বাগেরহাট কি এক বা একাধিক কবিতা, চাই কি কোনো গল্প বা উপন্যাসের একটি দু'টি পাতা আদায় করে নেয়নি তাঁর কলমের কাছ থেকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের গল্প
হায়াৎ মামুদ

এই গল্প কার কাহিনী দিয়ে শেষ হবে তা আমি এখনো জানি না। গল্প তো একজনের নয়, দু'জনের। আবার সবটুকু তাও না, আসবে নানা ছুটকো-ছাটকা কথা, আসবে সেই সময় সেই কালের কিছু মানুষের কথাও। আজকে এখন যে-সময়টায় দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে বছর পঞ্চাশেক উজিয়ে পিছন পানে তাকালে তো সঙ্গতভাবেই মনে হতে পারে বড়ো আলোভরা দিন আর নিত্যজ্যোছনায় ভাসন্ত ছিল সেই কাল।

'কী যে বলেন ! দুও, দুও ! বড়ো ডাক্তার ! না, আমি কখনো বিদেশ যাইনি। বরিশালের স্বরূপকাঠির ছেলে আমি। হ্যাঁ, ভারতের এদিক ওদিক যেতে হয়েছে, থেকেছি ঠিকই। তবে, ভারতবর্ষের বাইরে কখনো পা দিইনি।'

আমি চুপ করে থাকি। হৃদ্‌রোগবিশারদ ও শল্যচিকিৎসক এমন প্রথিতযশা মানুষটির মুখে এমন কথা শুনে একটু থতমত খেয়ে যাই। কালাপানি পার না হলে এ সমাজে কেউ কল্কে পায় নাকি ? হয়তো-বা চোখেমুখে বিস্ময় ফুটেছিল আমার। তাই অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবটা তিনি দিয়ে দিলেন।

'যেতে পারতাম। সুযোগ এসেছিল। না, না, ছাত্র আহামরি কিছু ছিলাম না, কম্পিটিশন তো আজকের মতো ছিল না, বুঝলেন না !' বিনয়ের অবতার ভূমেনদা বললেন। 'বৃত্তি পেয়েছিলুম। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে গেলুম। বাবা বললেন—মন গেলে যাও, তবে কী লাভ ?' বাবার মনের কথা খোলসা হয় না। বাবা ব্যাখ্যা করেন—ফিরে এসে খুব ফ্রাস্টেটেড হবে, যন্তরপাতি নেই, ওষুধপত্র নেই, হাসপাতালগুলো নোংরা, যে-পরিবেশে কাজ করে আসবে তার কিচ্ছুটি এখানে পাবে না, মন ভেঙে যাবে, অথচ এটাই তোমার দেশ ; এখানে থেকে এই অবস্থার মধ্যেই থেকে গিয়ে যা পারা যায় যতটুকু পারা যায় সে-চেষ্টা করাই তো ভালো, আর বাইরে থেকে গেলে সে অন্য কথা। ব্যস্ আর বাইরে গেলুম না। কিন্তু বুঝলেন হায়াৎ, কোনো ক্ষতি হয়নি তো, বিদেশের কত বিখ্যাত জার্নালে আমার লেখা ছাপা হয়েছে।'

হওয়ার কথাই। যে-মানুষটি ভারতে প্রথম ওপন্ হার্ট্ সার্জারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার মেধা ও কৃতি সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় ছিল না। বাংলাদেশের কত রোগীকে যে তিনি পেস-মেকার বসিয়েছেন সে বিষয়েও ধারণা ছিল আমার।

পুরোনো কথার খেই ধরেন গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে, 'তা ছাড়া, আমার মেজাজটা গবেষণার দিকেই তো ছিল, পয়সা কামাবার জন্যে ডাক্তার হতে হবে এমন ধান্দা ঠিক ভেতর থেকে কখনো জাগেনি। দেখছেন না, গরিবগুর্বোই তো থেকে গেলুম দেশের আর সবাই যেমন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বুঝলেন, ঐ একটা মানুষ কী ক্ষতি যে আমার করেছে, একেবারে ধসিয়ে দিয়ে গেছে।' গলায় কিন্তু ক্ষোভ বা বিতৃষ্ণা কিছু ফুটল না।

বলি, 'কে?'

'আর কে! কেন, জীবনানন্দ।' পরম মমতায়, আবেগে, শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করলেন।

ঘটনাটি বিস্ময়কর বটে। কবিতাপাগল কিছু তরুণ, তাও আবার সাহিত্যের ছাত্র নয়, ডাক্তারি পড়ছে, তারা আবিষ্কার করেছিল এক জীবনানন্দ দাশকে। 'ময়ূখ' নামে একটি দ্বিমাসিক কবিতাপত্র ছিল এঁদের, বেরুত ইচ্ছামাফিকভাবে, সঙ্গতি হত যখন বের করবার মতো তখন ভূমেনদার স্মৃতিচারণিক লেখায় এও অধিগত ছিল আমার "কাগজটি যাঁদের হাতে ১৯৫২-তে প্রথম বেরোয়, তাঁদের অধিকাংশ ডাক্তারির ছাত্র ছিলেন, এঁদের অনেকের আগ্রহ অল্প কয়েক মাসের ভিতরেই স্বাভাবিক কারণে মরে যায়; এবং শেষ পর্যন্ত কাগজটি যাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তাঁরাও কেউ সাহিত্যের লোক ছিলেন না, এবং সৌভাগ্যবশত হয়ে উঠতেও পারেননি। ফলত যা হবার তা হয়েছিল, কাগজটি কোনো বিশেষ গুণপনার দাবিদার হয়ে উঠতে পারেনি; জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর 'জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখ' নামে বিশেষ সংখ্যাটি যদি না বেরুত, তা হলে কাগজটিকে নির্বিশেষ ভুলে যেতে বাংলা কবিতা-পাঠকের কোনোই অসুবিধে হত না। তা হলেও, এই পত্রিকাটির মধ্যস্থতায় 'ময়ূখ' কাগজ যাঁরা ঘটিয়ে তুলেছিলেন, সেই তৎকালীন একটি নব্যযুব গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে জীবনানন্দের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল; সেই যুব গোষ্ঠীর আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলুম। জীবিত জীবনানন্দের সঙ্গে এই পরিচয় দু'বছরের। তিনি বাইশে অক্টোবর ১৯৫৪-তে পরলোকগত হন।"

"আচ্ছা, জীবনানন্দ তখন তো বেশ বিখ্যাত, তাই না?' আমি উস্‌কে দিই।

'কখন? আমাদের সঙ্গে যখন চেনা-পরিচয় হয়? না-না, মোটেই না। ক'জন তাঁকে চিনত? কে তাঁকে বুঝত? তখন তো খ্যাতি অন্যদের—বুদ্ধদেব, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, মায় সমর সেন পর্যন্ত। কারো কারো আবার মোসাহেব দল ছিল।' তাঁর ধূসর-হয়ে যাওয়া যৌবনের স্বপ্নের দিনগুলোকে মনে করার চেষ্টা করেন ভূমেনদা। 'কী-যে ধ্যানস্থ ছিলেন মানুষটা। চুপচাপ, নিরিবিলি, কোনো হৈ-হট্টগোলের ভিতরেই নেই। একেবারে সাধারণ, সাধারণের চেয়েও সাধারণ। জানেন, একদিন হঠাৎ গিয়ে পড়েছি। ঐ তো এক চিল্‌তে ঘর, এক চিল্‌তে উঠোন। হয়তো স্নানে যাবেন, গামছা পরে আছেন, ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলেন, শেষ করে আমার সামনেই ঘরটা মুছলেন।' বলে চুপ করেন, যেন কষ্ট হয়: জীবনানন্দের মতো কবি সকলকে নিয়ে যিনি খেলা করেন, কী ধূলিমলিন তাঁর এই দিনানুদিন যাতনা ভোগ।

আমার নিজস্ব স্মৃতিতে ভেসে ওঠে একটি দিন। তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কলকাতা গেছি। ২০২ রাসবিহারী এভেনিউয়ে হাজির হই ঠিক দুক্ষুর বেলা। তা হবে, দেড়টা/দুটো বৈকি। দোতলায় উঠে দেখি ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই আছে। সামনে ছোট ঘরটিতে জটলা করছে, চেঁচিয়ে নয়, ফিসফিসিয়ে, কিছু তরুণ-অনতিতরুণ। বুদ্ধদেব বসুর কথা বলতেই আঙুল দিয়ে সম্ভ্রমে ভিতরের ঘরটি দেখিয়ে দেন। স্বল্পালোকিত ঘরটি বড়ো, সোফা আছে, দেয়ালে গা-লাগানো আলমারিতে বই ঠাসা। আর ও-দিকের জানালার ধারে, বাইরের উজ্জ্বল ফাঁকা রাজপথে কৃষ্ণচূড়ার পানে তাকিয়ে-থাকা জানালা, তার পাশেই ছোট একটি টেবিলে কী-যেন লেখায় ব্যস্ত বু.ব.—পরে জেনেছি ভক্তমহলে এই ছিল তাঁকে উল্লেখের সম্বোধন, বুদ্ধদেব নয়, বুদ্ধদেব বসু নয়, বু. ব.—পরনে ফিন্‌ফিনে ধুতি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, সামনে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা, তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই কাঁচা বয়সে নিজের সৌভাগ্যের আনন্দে বুক যেন ফেটে গিয়েছিল, প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাতে যেমন হয়ে থাকে অপাপবিদ্ধ কুমারের। কবিও তবে কত রকমের হয়ে থাকেন, যাপিত জীবনের ভিন্নতায়। বুদ্ধদেবও তো সারা জীবন কিছু করলেন না এক লেখা ছাড়া, ঘর-সংসার সব সামাল দিলেন প্রতিভা বসু। জীবনানন্দের গার্হস্থ্য ভূমিকায় ভাবা যায় বুদ্ধদেবকে? অসম্ভব, অকল্পনীয়, ভাল্‌গার, ভাবা যায় না! অথচ জীবনানন্দকে কী দারুণ সঙ্গতিতে মানিয়ে যায়। আচ্ছা, ওর স্ত্রী তখন কী করছিলেন? নাকি গৃহকর্ম উদ্‌যাপনের দায়ভার তিনি ন্যস্ত করেছিলেন জাগতিক সর্ববিষয়ে অক্ষম এই স্বামীটির ওপরে?

প্রশ্নটি, অশোভন জেনেও, না-করে পারি না : 'যেমন শুনতে পাই, ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি খুব খারাপ ছিল?'

সে-প্রশ্ন এড়িয়ে যান ভূমেনদা। বলেন, 'বেচারা বৌয়ের কোনো দোষ নেই। স্বামীকে বোঝেননি, চিনতে পারেননি। সে আর ক-জনই বা বোঝে উনি নিতান্তই সাধারণ মানুষ ছিলেন আর দশটা স্ত্রী যেমন হয় সে-রকমই আর কি।'

কাকে আড়াল করলেন ভূমেনদা তিনিই জানেন। আমার মনে পড়ে যায় ওঁরই এদিক-ওদিকে লেখা : 'জীবনানন্দের স্ত্রীকে দেখেছি, ব্যস্ত মানুষ, দেখা হতেই সামনে থেকে সরে গেছেন; তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দর মৃত্যুর আগে কোনো দিন কথা বলা হয়নি।' আশ্চর্য তো! ঐ বাড়িতে সংকোচে হোক অসংকোচে হোক, ভূমেন্দ্র গুহরায় নামে মেডিকেল পড়ুয়া তরুণ ছেলেটি তো কম যায়নি, আর ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে-কুলবধূ লাবণ্য দাশ তো অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন না। হাসপাতালে কবির মৃত্যুশয্যার দৃশ্যটিও ভূমেনদারই জবানিতে আমাদের জানা : [হাসপাতালে] 'যাঁরা থেকে যাচ্ছেন, তাঁরা হাসপাতালের ডাক্তার বাবুদের সঙ্গে গিয়ে কথাবার্তা বলছেন, নানা রকম আর্থিক দায় একে-ওকে মেটাচ্ছেন, তাঁরা কয়েকজন মাত্র : অশোকানন্দ দাশ, তাঁর স্ত্রী নলিনী দাশ, দিদি [জীবনানন্দ-অশোকানন্দের ছোটবোন সুচরিতা দাশ] এবং আরও তিন-চারজন মহিলা, যাঁদের চিনি না বা অত্যন্তই আবছাভাবে চিনি। পুরুষ আত্মীয়স্বজন আরও কেউ-কেউ ছিলেন কি? হয়তো ছিলেন, কিন্তু তেমন লক্ষণীয়ভাবে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁদের মুখ এত দিন পরেও মনে পড়ত। মনে হয়, সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত অনেক সময়েই থাকতেন। জীবনানন্দের খুড়তুতো বোন জ্যোৎস্না দাশগুপ্তর কাছে শুনেছি, তিনিও মাঝে মাঝে এসেছেন, কিন্তু তাঁর কেউই যা পারেননি, তা হল জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দাশকে বেশিক্ষণের জন্য হাসপাতালে ধরে রাখতে; বস্তুত জীবনানন্দ যেদিন মারা যান, তার কয়েক দিন আগে থেকে তিনি হাসপাতালে আসা পুরো বন্ধ করে দেন। এবং মৃত্যুর সময়ে তিনি হাসপাতালে ছিলেন না।' কবি জীবনানন্দ দাশের কলম দিয়ে প্রবাহিত অজস্র গল্প-উপন্যাসের একক থিম্—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আততি (tension) ও মাত্রাভেদ—তা হলে ছেঁকে নেওয়া নিজেদের অ-সুখ থেকে কি? 'মাল্যবান' ছাপতে দিতে ঘোর আপত্তি ছিল কবি-জায়ার। জীবনানন্দ নিজেও তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে অবোধ্য রকমের সংকুচিত ও নিভৃতচারী ছিলেন কি? এ-জন্যে নিজেদের জীবনকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা ভঙ্গিমায় পর্যবেক্ষণ রয়ে গেছে ঐ সব লেখায়। ঔপন্যাসিক লিয়েফ তলস্তোয় তাঁর 'শয়তান' উপন্যাস তাঁর স্ত্রীকে কখনো দেখাননি, লুকিয়ে রেখেছিলেন গদি আঁটা কৌচের ভিতরে, যে-স্ত্রী 'যুদ্ধ ও শান্তি' কি 'আন্না কারেনিনা'র মতো বিশালায়তন ও আক্ষরিক অর্থে গুরুভার উপন্যাস স্বামীর পাণ্ডুলিপি থেকে একাধিক বার কপি করেছেন তাঁর কাছে থেকে লুকিয়ে না-রেখে উপায় ছিল না, কারণ প্রথম যৌবনের দুরন্ত আক্সিনিয়া অন্য নামে হাজির ছিল সেখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গান্তরে চলে যান তিনি। পুরোনো কথার সুতো ধরেন : 'এমনিতে চুপচাপ অমায়িক, নিরভিমান। কিন্তু লেখা নিয়ে প্রচণ্ড অহঙ্কারী ছিলেন বলে মনে হয়। একবার হল কী, বলি। বামপন্থীরা তো কড়া সমালোচক ছিল জীবনানন্দের। সুভাষ মুখোপাধ্যায় খুব বাজে একটা লেখা লেখেন তাঁকে নিয়ে। আমরা বন্ধুরা সবাই খুব আহত ও ভয়ানক ক্ষিপ্ত হই। সবাই খেটেখুটে দীর্ঘ একটা লেখা লিখে ফেলি ঐ রচনাকে কাটান্ দিয়ে। ছাপতে দেব, এমন সময় মনে হল যাঁকে বাঁচাবার জন্যে লেখাটা তাঁকে একবার দেখানো উচিত, নইলে অভব্যতা হয়। নিয়ে গেলুম লেখা, পড়লেন, খুশি একটুও হলেন না। গভীর অবসাদে বললেন — 'কী হবে? ছাপিও না। ভালো যদি লিখে থাকি এক দিন না এক দিন সবাই পড়বে।' নিজের লেখাপত্রের ব্যাপারে বুঝলেন, গভীর প্রত্যয় ছিল তাঁর।'

মনে মনে বলি, নিশ্চয়ই, থাকতে-ই হবে, না-থেকে পারেই না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এমন ছিলেন। যে যত দুরছাই করুক, রাগতেন না, মন দিয়ে শুনতেন আর মিটিমিটি হাসতেন। নিজের লেখার ওজন নিয়ে ঐ গাছপাগ্‌লা মানুষটির ভিতরেও কোনো সংশয় ছিল না। আচ্ছা, প্রকৃতিই কি এই সংস্থান যোগায়? এ দুজনের মনের গড়নে সাধর্ম্য তো ঐ একটি জায়গাতেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে আবার অন্য রকম! বিরূপ সমালোচনায় ভিতরে চটে যেতেন।

'কিন্তু তার কবিত্ব নিয়ে সংশয় ছিল তো অনেকেরই, তাই না? সজনীকান্ত দাশ বাদ দিচ্ছি না-হয়, কিন্তু সুধীন দত্ত? শুনেছি, সুধীন্দ্রনাথ নাকি ঘরোয়া আলাপচারিতায় এমন কথা অনেক বলেছেন, কথাটা সত্যি নাকি!' জিজ্ঞেস করি।

'সত্যি। সঞ্চয় ভট্টাচার্যকে বলেছেন, বুদ্ধদেবকে বলতেন। ওঁর ধারণা ছিল জীবনানন্দ স্বভাবকবি, আর স্বভাবকবিরা কখনো ভালো কবিতা লেখে না, কেননা মনে যা এসে গেল তাই লিখে ফেললুম আর কবিতা হয়ে গেল—ব্যাপারটা এত সোজা নয়, কবিতা নির্মাণ করতে হয়, গেঁথে তুলতে হয়। কিন্তু সুধীন বাবু তাঁর ধারণা পাল্টালেন শেষ দিকে, যখন জীবনানন্দের একটি পাণ্ডুলিপি-খাতা তাঁর চোখে পড়ে। কত কাটাকুটি, কত পুনর্লিখন, কত পরিমার্জনা, তিনি খুব ইম্প্রেস্‌ড হন। প্রথম দিকের বিরূপতা তাঁর চলে যায়, তিনি শ্রদ্ধা করতে শুরু করলেন।'

আমরা, বিস্ময়াভিভূত, কথা শুনে যাচ্ছি ভূমেনদার। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন। বলতে লাগলেন, 'তাঁর সাক্ষী আমি নিজে। হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে আসা হয়েছে গভীর রাত্রে। অশোকানন্দ দাশের ত্রিকোণ পার্কের বাড়ির দোতলায় ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছে। প্রথম যিনি দেখতে এসেছিলেন তিনি সুধীন্দ্রনাথ। সকালবেলার স্টেটস্‌ম্যানেই সম্ভবত খবরটা দেখে থাকবেন ; সেকালে খুব ভোরেই দোরে-দোরে কাগজ পৌঁছে যেত। দেখলাম স্লিপিং গাউনেই চলে এসেছেন, স্যাণ্ডেল পায়ে। গাড়ি থেকে নামলেন। নিচে আমরা শোকাহত বন্ধুরা তো জটলা করছি। দেখিয়ে নিয়ে গেলুম। একতলাতেই চটি খুলে রাখলেন, খালি পায়ে দোতলায় উঠে মৃত কবির বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, হাতে রজনীগন্ধা ছিল, মাথার কাছে রেখে দিয়ে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর, না ঘুরে দাঁড়লেন না, এক পা এক পা করে পিছিয়ে যেতে লাগলেন, দরজা পর্যন্ত গিয়ে তারপর ফিরে তরতর করে নেমে গেলেন। চটি পরে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেননি। এমনটি আর দেখিনি, দেখবও না। কি সম্মানবোধ কী সৌজন্যজ্ঞান—মৃত্যুর প্রতি, মৃতের প্রতি। রিয়্যাল অ্যারিস্টোক্র্যাট যাকে বলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মুখে কথা নেই। হ্যাঁচকা টানে কোন এক পরীর রাজ্যে যেন আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন ভূমেনদা। একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন। 'তো, এই হল ব্যাপার। জীবনানন্দ তো আমাকে ছাড়ছেন না। বুড়ো বয়সে এখন ডায়রির পাঠোদ্ধার নিয়ে আছি।'

হেসে বলি, 'আপনার ডাক্তারি নেই, ভূমেনদা?'

'না, এখন অবসর। থির থাকতে দেয় না, মিনিমাম কিছু রোগী দেখতে বাধ্য করে সবাই, ডেকে-ডুকে নিয়ে যায়। আমিও ফাঁকি দিই। মিছিমিছি বলে দিই ফোনে—আজ আর যেতে পারব না, শরীরটা খুব খারাপ। তখন কিন্তু হয় আপনাদের মতো কারো সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আড্ডা দিচ্ছি, নইলে জীবনানন্দের সঙ্গে। কখন টুক্ করে চলে যাব। এখনো নিজের মুখোমুখি একটু বসতে পাব না!' আত্মসমাহিতভাবেই বলেন।

তাকিয়ে থাকি মানুষটির পানে। আমার মতোই এলেবেলে ধরন। কাপড় নিয়ে খুঁতখুঁতি নেই, চালচালিয়াতি নেই, বিদ্যার গরিমা নেই। ডাক্তারি শাস্ত্রে, নিজের খ্যাতি বিষয়ে একেবারেই নিস্পৃহ। এক অসুস্থ রোগী প্রসঙ্গে কথা বলতে-বলতে করুণায় কণ্ঠস্বর বদলে গেল, চিক্ চিক্ করে উঠল চোখে অশ্রুকণা।

কবিতা তো বটেই, কে জানে—আমার বিশ্বাস, মানুষ জীবনানন্দ নিয়ে চলতে-চলতেই সম্পন্ন 'মানুষ' হয়েছেন ভূমেনদা, 'তবুও মানব মানব থেকে যায়'— এ স্থিতধী আলোই তো জ্বলতে দেখলাম সামনের মানুষটির ভিতরে। জীবনানন্দেও জ্বলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি কুসুমকুমারী দাশের স্বপ্নপুত্র জীবনানন্দ দাশ
নির্মলেন্দু গুণ

১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর এক নির্জন সন্ধ্যায় কলকাতার বালিগঞ্জ একালায় একটি চলন্ত ট্রামের চাকার তলে পিষ্ট হওয়ার পর কবি জীবনানন্দ দাশ আরও সপ্তাহকাল বেঁচে ছিলেন। এক সপ্তাহ কাল ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর তিনি ২২ অক্টোবর রাত ১১-৩৫ মি. মৃত্যুলাভ করেন। 'মৃত্যুবরণ' কথাটার পরিবর্তে 'মৃত্যুলাভ' কথাটা ব্যবহার করলাম এজন্য যে, আমার সন্দেহ জীবনানন্দ দাশ জীবনের ভার বইবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। জীবনের যে সব মোহ একজন মানুষকে তাঁর দেহগত প্রাণ রক্ষা করার সংগ্রামে সতর্ক সহায়তা বা প্রয়োজনীয় সিগন্যাল প্রদান করে, ৫৬ বছর বয়সে পৌঁছানোর পর তিনি এমন কোনো বোধ দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন, যেখানে নিজের ভিতর থেকে আত্মরক্ষায় প্রয়োজনীয় সিগন্যাল তিনি আর পাননি। ফলে ট্রামের মতো একটি খুবই অল্পগতির যানের চাকার আগ্রাসন থেকেও তিনি নিজেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হন। তিনি ঠিক যে জায়গাটায় ট্রামের চাকার নিচে পিষ্ট হয়েছিলেন, তা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। অন্যমনস্কতার যে স্তরে পৌঁছুলে খুবই অল্পগতির একটি ট্রামের উপর্যুপরি ঘন্টির শব্দ পথচারীর কর্ণে প্রবেশ করে না, মানসিকতার ঐ স্তরটিকে আত্মহননকারী না বললেও, আত্মরক্ষাকারী বলে মানা যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, বাংলাদেশের প্রখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের মৃত্যুর ঘটনাটির সংগে জীবনানন্দের মৃত্যুর ঘটনাটির যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রফেসর আবদুল হাই সকালের দিকে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া রেল গাড়ির চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন। অনেকের সন্দেহ হাই সাহেব আত্মহত্যা করেছিলেন। তা না হলে প্রাতঃভ্রমণের জন্য তিনি ঐ রেলপথের ধারটিকেই বেছে নেবেন কেন? আমার কেন জানি মনে হয়, হাই সাহেব জীবনানন্দের অপঘাত মৃত্যুর ঐ ঘটনাটি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। হাই সাহেব কবি ছিলেন না—কিন্তু খুবই স্পর্শকাতর চিত্তের অধিকারী এবং আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। এঁরা উভয়েই ছিলেন বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ মানুষ। আত্মহননের প্রতি সমর্থন না থাকলে, অপঘাত মৃত্যু হিসেবে ঐ দু'টি মৃত্যুকে বর্ণনা করতে হলে ঐ দু'জনকে নির্বোধ হিসেবে মানতে হয়—যা ঐ দু'জনের কারও বেলাতেই সত্য ছিল না।—তাই জীবনানন্দ দাশ এবং প্রফেসর আবদুল হাই সাহেবের মৃত্যু একটি রহস্যের আবরণে ঢাকা হয়ে রইল। কবিতা রচনা করতেন না বলে অধ্যাপক হাই সাহেবের রচনাকে ঘিরে তাঁর মৃত্যুর রহস্যের ছায়াপাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব একটা ঘটেনি। কিন্তু জীবনানন্দের বেলায়, আমার তো খুবই মনে হয়, জীবনানন্দের ঐ অপঘাত মৃত্যুর ঘটনাটি তাঁর কবিতার ওপর একটা অনাবশ্যক রহস্যের আবরণ যুক্ত করে দিয়েছে। ঐ রহস্যের আবরণ থেকে তাঁর কবিতাকে আমরা কিছুতেই যেন আর বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পাই না। তাঁর মৃত্যু তাঁর কবিতার জগতের মধ্যে কোথায় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

তাঁর কবিতা পাঠ করে একজন বিশিষ্ট পাঠক নাকি জীবনানন্দকে এই বলে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, ধর্মের শরণ নেন। তাতে যে দুঃখময় জীবনের অগ্নিতে তিনি দগ্ধ হচ্ছেন, সেই যাতনা থেকে তিনি পরিত্রাণ লাভ করবেন। কিন্তু ঐ সুপরামর্শ তিনি গ্রহণ করেননি। 'শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়' এই কবিতায় বর্ণিত 'তাদের' বলতে তিনি যে মুষ্টিমেয় মানুষের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি নিজেই ছিলেন তাদের শীর্ষে। ফলে, নাটোরের বনলতা সেনের অনুপস্থিতিতে, সামান্য শান্তির সন্ধানে, তাঁর পক্ষে লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমানোর চিন্তায় মগ্ন হওয়া ছাড়া আর কোনো সহজ বিকল্প অবশিষ্ট ছিল বলে আমার মনে হয় না।

তাই, কলকাতার ট্রামের সাহায্যে, জীবনের এক পর্যায়ে তিনি নিজেকে তাঁর রূপসী বাংলা বা বরিশাল ত্যাগের শাস্তি দিয়েছিলেন বলেই আমার মনে হয়েছে। তাঁর ঐরকমের করুণ মৃত্যুর ঘটনাটি তাঁর রচনার প্রতি নিষ্ঠুর বাঙালি কবিতা-পাঠকের শুভদৃষ্টি ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হয়েছিল বলেই মনে করি। ২১ বছরে সুকান্তের মরে যাওয়া, ৪১ বছরে নজরুলের মৌন হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলোও কল্লোলিনী কলকাতার কোলাহল থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে জীবনানন্দকে প্রভাবিত করে থাকবে। রুশ কবি পুশকিন এবং মায়াকোভস্কি তো রয়েছেনই। তাঁর কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিস্পৃহতাও তাঁর মর্মপীড়ার আরেকটি বড় কারণ ছিল। শুধুই 'চিত্ররূপময়' বা 'চোখে দেখার আনন্দ' আছে এইরূপ সামান্য কথায় জীবনানন্দের মতো বড় এবং তাঁর সমকক্ষ মহৎ কবির সুখী হওয়ার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না। কবিতার জন্য পুরস্কারসহ আর্থিক স্বচ্ছলতা না পাওয়া এবং তাঁর কবিতার যথাযথ মূল্যায়নের বেলায় তৎকালীন বাঙালি সমালোচকদের কার্পণ্যও জীবনানন্দকে খুবই আহত করেছিল। শুধুই বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা সেখানে যথেষ্ট ছিল না।

জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন একজন কবি। তাঁর বিখ্যাত একটি কবিতার দু'টি পঙক্তি সকল বাঙালির মুখে মুখে।—

> আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
> কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

আমরা, আমি আর কবি শামসুর রাহমান একবার ঝালকাঠি গিয়েছিলাম একটি সাহিত্যানুষ্ঠানে। ওখানে গিয়ে জানি, কাছেই রয়েছে জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দাশের বাড়ি এবং ধানসিঁড়ি নদী। ঐ ধানসিঁড়ি নদী এবং কুসুমকুমারী দাশের টানে আমরা জীবনানন্দের মাতুলালয়ের পবিত্র মাটি স্পর্শ করতে গিয়েছিলাম। আগে শুনেছিলাম ধানসিঁড়ি হচ্ছে জীবনানন্দের কল্পনার নদী। কিন্তু ধানসিঁড়ি নদীটিকে নিজের চোখে দেখার পর ঐ ধারণাটির চির অবসান ঘটলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট্ট ধানসিঁড়ি নদী পাড়ি দিয়ে নদীর ওপারে কুসুমকুমারী দাশের বাড়িতে গিয়ে ঐ কবিতার কথা আমাদের সবারই মনে পড়েছিল। জীবনানন্দ দাশ যেন মায়ের ঐ কবিতাটিকে সত্য প্রমাণ করার জন্য তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জীবনানন্দ কম কথা বলতেন, কাজ করতেন বেশি। জীবদ্দশায় মাত্র সাতটি বই প্রকাশিত হলেও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত রচনার পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। দেখা যাচ্ছে, প্রধানত কবি হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সফল সব্যসাচী লেখক। গদ্যে–পদ্যে সমান পারদর্শী। একথা এখন আর রচনা লিখে প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না যে, কুসুমকুমারী দাশের বহু প্রত্যাশিত কাজে বড় হওয়া বঙ্গসন্তানটি আসলে আর কেউ নয়, ছিলেন তাঁর পুত্র জীবনানন্দ দাশ নিজেই।

সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বড় হলেও, শুধুই কবি হিসেবে ভবিষ্যতের বাঙালি কবিতা পাঠকরা যদি জীবনানন্দকেই আধুনিক বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় কবি হিসেবে বেছে নেন, তাহলে আমি অন্তত অবাক হবো না।

বাংলা কবিতার পাঠক, সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত অন্ধকারে জীবনানন্দকে খুঁজে মরি

ময়ুখ চৌধুরী

দুইয়ের পাশে দুই,
ট্রাম-লাইনের ওপর থেকে
আসলি ফিরে তুই!

ছদ্মবেশী রক্তজবা গেছিস শ্মশানঘাটে;
কেউ জানে না— চোখের আড়াল
শঙ্খশালিক হাঁটে।
(২২ শে অক্টোবর)

১.

মা বাবা কখনও যে আমার জন্মদিন পালন করেননি, সে জন্যে একটা সময় পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে মেঘলা কষ্ট অনুভব করতাম। নাবালকতা পেরিয়ে একটা সময় এলো ; তখন বুঝতে পারলাম—জন্মদিন পালন না-করে বিরাট এক লজ্জা থেকে তাঁরা আমাকে নিস্তার দিয়ে গেছেন।

১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর। ঐ দিন আমাদের ঘরে জন্মোৎসবের আনন্দ জমে উঠতে পারতো। ভাগ্যিস তা হয়নি। কেননা, ঐ দিনটিতে আনন্দের চেয়ে বিষাদের মহিমা ছিলো অনেক অনেক বেশি।

সেদিন , আমার জন্মের মতো অনেক তুচ্ছ ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেছে। কিন্তু ২২শে অক্টোবর বললে আমার মন কেমন যেন করে ওঠে। সকালে ঘুম ভাঙতেই একচোখে জন্ম দেখি তো আর একচোখে মৃত্যু। আলো আর অন্ধকারের সমীকরণে ধোঁয়াচ্ছন্ন একটা দিন আমাকে দখল করে রাখে। সেই ধোঁয়ায় টের পাই ধূপের গন্ধ,—মৃত্যুরও। এ কেমন জন্মদিন প্রভু!

২.

দুই যুগেরও পরে। আবারও সেই বিষণ্ন জন্মদিন এলো—প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে, নির্মম নিঃসঙ্গতা নিয়ে। সারাদিন একা একা কোলকাতার এখানে সেখানে ঘুরলাম। সূর্যাস্তের আগে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে পৌছুলাম। রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে ট্রাম-লাইনটির পাশে আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। অনেকক্ষণ। অনেক গাড়ি এদিক-ওদিক ছুটে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি শুধু ট্রাম দেখি , ট্রাম। নরম ঘন্টা বাজিয়ে একজোড়া বিষাক্ত সাপের পিঠে ভর দিয়ে কিছুক্ষণ পরপর এক-একটা ট্রাম আসে আর যায়।

তাদের নির্বিকার আসা-যাওয়া দেখে আমি কেমন যেমন বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠি। মনে মনে একলাফে ট্রাম-লাইন আগলে চিৎকার করে উঠি—'থামাও। ২২শে অক্টোবর জন্ম নিয়ে যে বেয়াদবি আমি করেছি, তার যা চেয়েও বেশি বেয়াদবি করে যাচ্ছো তোমরা। থামাও এই ট্রাম, যেমন থেমেছিলো ২৫ বছর আগে।'

আমার ভাবনাগুলো ডানা মেলবার আগেই সাপের মতো বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় ট্রাম। অসহায় ক্রোধ কুণ্ডলিত চাকার মতো ঘুরতে থাকে।

আহা, এমন কি ক্ষতি হতো !—জীবনানন্দের প্রতি মমতাবশত প্রতিটি ট্রাম ঠিক ঐ জায়গায় এসে—দু'দণ্ড না হোক, একপলকের জন্যে যদি থেমে যেতো ! কিন্তু আমি কি করতে পারি ! আমি মুখ্যমন্ত্রী নই, যোগাযোগমন্ত্রী নই, নগরপালও নই ;—নগণ্য একজন কবিতাপাঠক মাত্র।

ইচ্ছে হয় ১৮৪ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে সেই পঙক্তিটি নিয়ে এসে টাঙিয়ে দিই এই মোড়ে ; যাত্রীরা পড়ুক—"জন্ম যদি তব বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল।" কিন্তু সাড়ে পাঁচ বছর ধরে লোয়ার সার্কুলার দিয়ে চলাফেরা করে বুঝেছি—খুব একটা লাভ হতো না। কেননা, বাঙালি কষ্ট পায়, কিন্তু কষ্ট বোঝে না।

অসহায় অথচ প্রতীকী প্রতিবাদে হঠাৎ হাত তুলি। থেমে যায় ট্রাম। প্রায় অকারণেই উঠে পড়ি। তারপর চলে যাই গড়িয়াহাটায় ; জলপাইহাটি আর যাওয়া হয় না। আর দারুচিনি দ্বীপ? সেখানে তো দু'জনের বেশি জায়গা হবে না !

৩.

কিটিং-কিটিং শব্দে আবার রাগ ধরে যায়। রাগটা এবার ছুটে যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দিকে। জীবনানন্দের মৃত্যুর ১৫ বছর আগে লেখা শুরু করলেন যিনি, তিনি 'কলকাতার যীশু'কে রাস্তায় নামাতে এতো দেরি করলেন কেনো?—

'লাল বাতির নিষেধ ছিল না,
তবুও ঝড়ের-বেগে ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল ;
ভয়ঙ্করভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাকসি ও প্রাইভেট, টেম্‌পো, বাঘমার্কা ডবলডেকার।
টালমাটাল পায়ে
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়
ভিখারী-মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।'

(কলকাতার যীশু, ১৩৭৬)

চৌরঙ্গীপাড়ায় আবির্ভূত ঐ দেবশিশু যদি ১৫ বছর আগে (১৪.১০.১৯৫৪) রাসবিহারীতে এপার-ওপার করতো, তা হলে হয় তো জীবনানন্দ বিষণ্ণ একটি জন্মদিন আমাকে উপহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে পারতেন না। কিন্তু নিয়তির সে অভিপ্রায় ছিলো না। তাই সেদিন বাংলা কবিতার যীশু স্বয়ং জীবনানন্দ দাশই নেমে এসেছিলেন রাস্তায়।

রক্তাঞ্জলি দিয়ে ভাবীকালের বাংলা কবিতাকে রক্তশূন্যতা থেকে বাঁচাবার দিন ছিলো সেটি। বাঙালি কবিদের চৈতন্যের শিকড়ে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজন ছিলো সেই অমর বোধটিকে—"অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়, আরও এক বিপন্ন বিস্ময়"। এই উপলব্ধির মহত্ব ও মাহাত্ম্যকে আত্মস্থ করবার জন্যে বাংলা কবিতাকে হাজার বছরের পথের ক্লান্তি সঞ্চয় করতে হয়েছে। অমূল্য সেই ক্লান্তির বিশ্রাম-গ্রহণের দিন ছিলো সেটি। অতঃপর বাংলা কবিতাকে লাশকাটা ঘরে নিয়ে গিয়ে সমালোচকেরা একদিন দেখতে পাবেন "সেই ক্লান্তি নাই আর"।

কিন্তু রূপসী বাংলার যীশু গেলেন কোথায় ? মৃত্যুর মতো শীতল ও কঠিন ইস্পাতি রাস্তা ধরে তিনি কি পৌঁছে গেছেন দু'দণ্ডের দারুচিনি দ্বীপে ?—যেখানে প্রতীক্ষার নামে অমরত্ব বসবাস করে ?

৪

কোনো কোনো দিন আসে কিছু দিতে। কোনো কোনো দিন আসে কিছু নিতে। সেদিন অনন্ত-বিশ্রাম এসে নিয়ে গেছে জীবনানন্দকে। আর তিনি মৃত্যুর পরিভাষায় অনুবাদ করে গেছেন জীবনের আনন্দকে।

"পার হবো তোর রংমহলের দ্বার"—এই জাতীয় চটুল উক্তি দিয়ে মৃত্যুর মহিমাকীর্তনের ছলাকলা জীবনানন্দ জানতেন না। একই অস্তিত্বে জীবন আর মৃত্যুকে দ্রবীভূত করতে শিখে নিয়েছিলেন তিনি। তাই তাঁর কবিতায় মৃত্যুর নেশা জীবনের আনন্দকেও ছাড়িয়ে যায়।—যা অর্ধমৃত পাঠকেরা বোঝেন নি।

৫.

অনেকক্ষণ হয় ফিরে এসেছি। হোস্টেলের একটি কক্ষে আমি আর আমার ছায়া। টেবিলে দণ্ডায়মান অর্ধবিগলিত মোমবাতি। লোডশেডিংবশত যে-কোনো মুহূর্তে জ্বলে ওঠার জন্যে প্রস্তুত। এই নিঃসঙ্গ জন্মরাতে হঠাৎ মনে হলো বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে মোমবাতি জ্বালাই। যথারীতি লাইটার আগুনের জিহ্বা বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু না, মোমবাতি নয়, জ্বলে উঠলো সিগারেট। নিকোটিনের শাদা পরী সারা ঘরে ঘুরে ঘুরে নাচছে। মনে পড়ছে, এমনই একটা দিনে জন্ম নিয়েছিলো জীবনানন্দ দাশের একজন পাঠক, যে আজ ধূসর মনস্তত্ত্বের শিকার।

শুনেছি, আমি নাকি মৃতবৎ জন্ম নিয়েছিলাম। আমাকে মৃত ভেবে কেউ কেউ কিছুক্ষণ কেঁদেছিলেন। অনেকক্ষণ বাদে, আমার হঠাৎ কান্নায় অনেকে চমকে উঠলেন। যাঁরা কাঁদছিলেন তাঁদের সকল চোখে হাসির দ্যুতি। আমি সেই কান্নার জলকে বৃথা যেতে দেবো না। আমার সেই অভাবীয় অর্জন আমি প্রিয় কবির নামে উৎসর্গ করলাম।

টেবিল থেকে সরে এসে চিৎহয়ে বিছানায় শুয়ে। বুকের ওপর তুলে ধরলাম জীবনানন্দের কবিতা। জানি, একটু পরে বাতিটা নিভিয়ে দেবো। নেমে আসবে অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে নেমে আসবে নির্লজ্জ ঘুম। যেহেতু অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠবার ক্ষমতা আমাদের নেই, সেহেতু মুখোমুখি বসবার মতো অবকাশ কোথায়? তাই, আমরা ঘুমোতেই জানি, মরতে জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬.

হাজার বছরের অশান্ত অন্বেষণের শেষে দু'দণ্ড শান্তি পেয়েছিলেন জীবনানন্দ। তা-ও অন্ধকারে। জীবনের সমস্ত অন্ধকার পান করে আমাদের দিয়ে গেলেন অন্যরকম আলোর জগৎ, অন্যরকম আনন্দের আলো। রচনা করলেন অন্যরকম 'মহাপৃথিবী'। বইয়ের নাম রাখলেন 'সাতটি তারার তিমির'। অন্ধকারের চোখ দিয়ে আমরা দেখলাম আলোর চেয়েও বেশি কিছু। সেই তাৎপর্যের স্বীকৃতিদানের জন্যেই কি বুদ্ধদেব বসু তাঁর বইয়ের নাম রেখেছিলেন 'যে আঁধার আলোর অধিক'? কবি ও কবিতার অনন্য বন্ধু বুদ্ধদেবের পক্ষে তা অস্বাভাবিক নয়।

সাতজন আলোকিত ঋষির বিপরীতে জীবনানন্দ একাই সাতজনমের তমসাকে অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই তমসা, সেই অন্ধকার,—তাঁকে শান্তি দিয়েছিলো, ক্লান্তিহীন বিশ্রাম দিয়েছিলো ;—জীবদ্দশায় 'বনলতা সেন'-এ, মৃত্যুর পর সম্ভাব্য লাশকাটা ঘরে,—আগামরচিত এপিটাফতুল্য কবিতা 'আট বছর আগে একদিন'-এ।

৭.

একটিমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমে তিলে তিলে সঞ্চিত অনেকগুলো মৃত্যুকে অনুবাদ করে গেলেন জীবনানন্দ। অনুবাদ করলেন নিজেকেও। ট্রামলাইনের ওপর সেই মৃত্যুউপহার কার উদ্দেশে নিবেদিত?—তাকে আমরা চিনেও চিনি না।

আবার, দারুচিনি দ্বীপের অমর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা পাখির নীড়ের মতো চোখ দুটি কার?—তাকে আমরা না চিনেও যেন চিনি। কেননা, সে অন্তরঙ্গ দ্বীপের অধিবাসিনী, যে অপেক্ষা করতে জানে। তা না হলে, হাজার বছরের সমুদ্রসমান পর্যটনের ক্লান্তি শিশিরস্নিগ্ধ সন্ধ্যার নম্রতা দিয়ে মুছে দিতে পারতো না সে।

কতো দীর্ঘ! কতো নির্যাতনখচিত মানসপর্যটন! সিংহলসমুদ্র-মালয়সাগর, দূরাতীত বিদিশা, বিম্বিসা, বিদর্ভ আরও কতো মানচিত্র উজিয়ে মানসচিত্রের প্রতিফলন খুঁজে পেলেন অ-পূর্বখ্যাত অনার্যভূমি নাটোরে! কিন্তু নাটোরে তো কোনো দ্বীপ নেই, কোথায় সে-দারুচিনি দ্বীপ!

অনাগরিক রূপসীবাংলার সবুজ অন্ধকারে শ্রাবস্তীর কারুকার্যময় স্থিরযৌবনা বনলতা সেনটি কে? হাজার বছরের শ্রুতিময় তৃষ্ণা একটিমাত্র বাক্য দিয়ে কি করে মিটাতে পারলো!—তা-ও প্রশ্নবোধক বাক্যে—'এতোদিন কোথায় ছিলেন?' এরপর আর কোনো সংলাপ নেই ;—নেমে আসে নিরুত্তর অন্ধকার। অনন্ড অন্ধকারে মুখোমুখি বসে থাকে কবি আর কবিতা। নাকি মৃত্যু আর জীবন?

৮.

ওদের দু'জনকে অন্ধকারে বসিয়ে রেখে আমি চলে আসি ঘোমটা-দেয়া আলোর টেবিলে। আর পড়া নয়,—লেখা। জীবনানন্দ বাংলাকবিতাকে দিয়ে গেছেন অন্ধকারের চোখ ;—সেটাকেই পুঁজি করি। কালো অক্ষরের সঙ্গে কালো অক্ষর জুড়ে কালো রাস্তা বানাই ; সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকি, হাঁটতে হাঁটতে তমসাসুন্দরীকে খুঁজতে থাকি, খোঁজার শেষ নেই।

সোনার তরীতে চেপে মানসসুন্দরীকে আমরা আর খুঁজি না, নিরুদ্দেশযাত্রাও আর রচনা করি না। আমরা এখন হাঁটতে শিখেছি, আমরা হাঁটি ; আমরা এখন বুক ঘষে ঘষে কবিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে যেতে চাই। আমরা এখনও কান পেতে আছি। পথের শেষে, একটিমাত্র প্রশ্নের জন্যে—'এতোদিন কোথায় ছিলেন?'

৯.

উপহাসের উপকরণ হতে পারে,—এই ভয়ে, সদ্যযৌবনে দেখা হাল্কা একটি স্বপ্নের কথা আমি কাউকে বলতে পারি নি। সেই স্বপ্নের কথা বলে আজ হাল্কা হতে চাই। ঘুমের অন্ধকারে স্বয়ং বনলতা সেনকে আমি দেখেছি, সম্ভ্রমবশত নিরুপম উপমাশোভিত চোখের দিকে তাকাই নি ; তাকিয়েছিলাম শিশির-দ্যুতিময় ঠোঁটের দিকে,—সন্ধ্যার মতো অস্পষ্ট হাসি। কী আশ্চর্য! সেই একই প্রশ্ন—'এতোদিন কোথায় ছিলেন'? অপরিণত বয়স ও রুচি নিয়ে অনুগতের ছাত্রের মতোই জবাব দিয়ে বসলাম—'স্যরি, পাঠ্যকবিতার চাপে দেরি করে ফেলেছি।'

এ-রকম অর্থব উত্তরের পর 'মুখোমুখি বসিবার' মতো অন্ধকারের অবকাশ কোথায়! অতএব সকাল হয়ে যায় ; সকালের শাদারোদের কাফন আমার স্বপ্নের লাশ গিলে খায়।

১০.

মহৎকবিদের কবিতার অভিঘাতে বারবার প্রমাণিত হয়েছে—সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক। জীবনানন্দের কবিতা এই নির্মম সত্যের সাক্ষী। বুদ্ধদেব বসুর মতো দু'একজন প্রাজ্ঞ পাঠক যদি সেদিন না-থাকতেন, তা হলে আমাদের কি দশা হতো! তখন অবশ্য বিরূপ সমালোচকও বিরল ছিলো না। যে কারণে নিরহংকার একজন মানুষকে কঠিন কথা বলতে হয়েছিলো—"বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা"।

আজও, এই অনুজ্ঞার প্রায়োগিক গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমে নি। বরঞ্চ বেড়েছে। আগে, সমালোচকরা কলম হাতে নিতো ; এখন নেয় মাইক্রোফোন। মঞ্চ পেলেই তারা বক্তা হয়ে যায়, সমালোচক হয়ে যায় ; ক্যামেরা দেখলেই তাদের চোখ চকচক করে। সেই চোখে কবিতার কোনো দ্যুতি নেই ; আছে খ্যাতির লিপ্সা। তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তির জ্যোতি নেই ; আছে সিঁড়ি পেরুনোর কৃষ্ণ পন্থা, আছে কবিতা সম্পর্কে কথাবলার ভয়হীন মূর্খতা,—শিকড়বিহীন তর্কবিতর্কের ধূম্রজাল। এইসব ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উৎপাত, মিডিয়ার বদান্যতায় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এরা তেলাপিয়া মাছের মতো একসঙ্গে ঘোরাফেরা করে, আত্মমগ্ন মানুষদের 'অসামাজিক' আখ্যা দিয়ে ওয়াজ-নসিহত করে। দিকে দিকে কবিদের কাজ বেড়ে যায়, কবিতার কাজ কিছুই হয় না।

যখন টেবিলে বসি, এইসব ভেবে মন খুব খারাপ হয়ে যায়। হঠাৎ খোলা বইয়ের ওপর জীবনানন্দের দীর্ঘ ছায়া এসে পড়ে। বাতাস পৃষ্ঠা ওল্টায়। আমি স্পষ্ট শুনতে পাই—"কি কথা তাহার সাথে, তার সাথে!" অতঃপর নির্জন নীরবতা। দু'দণ্ড শান্তির পক্ষে কবিতা নিজেই তখন কথা বলতে শুরু করে।

কবিতা দিয়ে কথা সবাই বলতে পারে না, কেউ কেউ পারে। কবিতার উপহার সবাই গ্রহণ করতে পারে, কবিতাকে উপহার দিতে সবাই পারে না। আর, সেই উপহারের নাম যদি হয় জীবন, তা হলে সেটা একমাত্র জীবনানন্দই দিতে পেরেছিলেন। আর সে জন্যেই, মৃত্যুর পরে এতো বেশি বেঁচে উঠতে পেরেছেন সেই কবি। সে জন্যেই কি তিনি বলেছিলেন—"সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি"?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি সাক্ষাৎকার

কবিতা থেকে গান : রূপান্তরের উৎস সন্ধান

অজিত রায় ❒ সাজ্জাদ আরেফিন

'জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে গানের মাধ্যমে জনগণের আরো কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব'

[অজিত রায় আমাদের দেশের একজন বরেণ্য শিল্পী, সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক। তিনিই প্রথম জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুরারোপ করেন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সুরারোপিত ও তাঁর কণ্ঠে গীত 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হলে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। বর্তমান সাক্ষাৎকারটিতে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুরারোপের প্রেক্ষাপট, তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।—নি.স.]

অজিত রায় গত চার দশক ধরে এদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তিনি কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার। এদেশের কবিদের কবিতায় তিনি সুরারোপ করেছেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুরারোপের ক্ষেত্রে অজিত রায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।

আমরা ষাটের দশকের ঢাকার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুরারোপের পটভূমি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিল্পী অজিত রায়ের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করি। এই সাক্ষাৎকারে যে সব বিষয় আলোচিত হয় তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

❒ আমাদের জানা মতে, আপনিই প্রথম কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুরারোপ করেছিলেন। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলুন।

অ.রা. হ্যাঁ, যতদূর জানি, আমিই প্রথম কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার সঙ্গীতরূপ দিয়েছি এবং গেয়েছি। জীবনে গান শুনেছি প্রচুর, যা গেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি শুনেছি। কবিতায় সুরারোপের ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথ থেকেই শুরু। রবীন্দ্রনাথের বহু গান কবিতার গান। আর একজনের নাম বিশেষভাবে বলতেই হবে—তিনি সলিল চৌধুরী। তিনি বাংলা গানের চরিত্রই পালটে দিয়েছেন। কবিতায় সুরারোপের ক্ষেত্রে আমি এঁদের কাছ থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

❒ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুরারোপের বিষয়টি আপনার চিন্তায় কেমন করে এলো?

অ.রা. '৫২-র ভাষা-আন্দোলন এদেশের মানুষকে একটি প্রবল ধাক্কা দিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রে তার অবস্থানের স্থানটিও নির্দেশ করে দিয়েছিল। ফলে এদেশের মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা চালাতে থাকে। ’৬২–র পর থেকে প্রতি একুশে ফেব্রুয়ারিতে একটি করে নতুন গান করার প্রস্তুতি আমরা নিতাম। আবৃত্তিকার আশরাফুল আলম জীবনানন্দ দাশের ‘রূপসী বাংলা’ থেকে কবিতায় সুরারোপ করার জন্য প্রায়ই তাগিদ দিতেন। আমিও ভাবছিলাম ‘রূপসী বাংলা’র কোনো কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করতে পারলে একটা অসাধারণ ব্যাপার হবে। শুরু করলাম। এক লাইন দু’লাইন করে করতে করতেই হয়ে গেলো। ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ কবিতাটির দুটি অংশের প্রথম অংশটিতে প্রথম সুরারোপ করি।

❐ এটা কোন সময়ের কথা?

অ.রা. তখন ’৭১–এর ফেব্রুয়ারি মাস। গানটি প্রথম গাই প্রেস ক্লাবে। ২০শে ফেব্রুয়ারির রাতে শহীদ মিনারে যাবার আগে প্রেস ক্লাবে সঙ্গীতের আসর বসতো। এই অনুষ্ঠান শেষ করেই আমরা সাড়ে এগারটার দিকে শহীদ মিনারের দিকে যাত্রা করতাম। ’৭১ সালের ঐ রকম অনুষ্ঠানেই প্রথম ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ গানটি করি।

❐ বাংলাদেশের আন্দোলন–সংগ্রামে সঙ্গীতানুষ্ঠানের ভূমিকা কেমন ছিল?

অ.রা. সে সময় সঙ্গীতানুষ্ঠানের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিলো। রাজনৈতিক দলের আন্দোলন বলেন আর ছাত্র আন্দোলন বলেন সবকিছুতেই সঙ্গীতানুষ্ঠান একটা ফ্যাক্টর ছিলো। ঐসব সঙ্গীতানুষ্ঠানে মূলত গণমানুষের গান, প্রতিবাদের গানই গাওয়া হতো। গানের মাধ্যমে জনমত তৈরির একটা ব্যাপার ছিলো।

❐ জীবনানন্দ দাশের কবিতাতে তো প্রতিবাদ–প্রতিরোধের বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে আসেনি।

অ.রা. সবচেয়ে বড় কথা হলো দেশপ্রেম। তাঁর কবিতায় দেশপ্রেমের ব্যাপারটি আছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাংলাদেশের মাটি আর প্রকৃতির কথা আছে। তাঁর কবিতার প্রকৃতি, বাংলার জীবন, নিসর্গ, নদী—সমস্ত কিছুর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা যায়। এ কারণেই জীবনানন্দ দাশকে বেছে নিয়েছিলাম। মনে হয়েছিলো তিনি যে বাণীগুলি আমাদের জন্য রেখে গেছেন সেটা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

❐ ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ থেকেও ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি” গানটি প্রচারিত হয়েছিলো—সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

অ.রা. ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ গানটির পুরোটাই আমার কণ্ঠে রেকর্ড করা হলো। আমার কিছুটা সংশয় ছিল মুক্তিযুদ্ধে এ গানের আবেদন কতটা সাড়া জাগাবে তা নিয়ে। সবাই বললো, এ গান অনুপ্রেরণা, স্পর্শ করবে মানুষকে। পরের ঘটনাতো সবারই জানা।

❐ জীবনানন্দ দাশের কবিতা ছাড়া আপনি আর কারো কবিতায় সুরারোপ করেছেন কি?

অ.রা. ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে’ যোগ দিয়েই কবি সুকান্তের ‘এদেশ বিপন্ন’ কবিতাটিতে সুরারোপ করি। এ গানটিও মানুষ গ্রহণ করেছিলো। এছাড়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুফিয়া কামাল, সিকান্দার আবু জাফর, শামসুর রাহমান ও মহাদেব সাহার কবিতায় সুর সংযোজন করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

❐ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আপনার গান (বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি) প্রচারের পর গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার অনুপ্রাণিত হয়ে 'বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা' গানটি রচনা করেন। এ গানে 'জীবনানন্দের রূপসী বাংলা'র উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি?

অ.রা. বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলতে গেলে জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলার উল্লেখ না করে কোনো উপায় নেই। গৌরীদার গানটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের 'জয় বাংলার লোক' বলা হতো, গানটি প্রচারের পর আরেকটি বিশেষণ যুক্ত হয়—'রূপসী বাংলার লোক'। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার কলকাতার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান HMV-তে আমার কণ্ঠে আমার সুরারোপিত জীবনানন্দের গানটি রেকর্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

❐ আপনি তো জীবনানন্দের দুটি কবিতার সঙ্গীতরূপ দিয়েছিলেন, গেয়েছেন। আপনার কি আর কোনো কবিতায় সুর করার ইচ্ছা আছে বা করছেন?

অ.রা. এখন করছি না। তবে আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা করা দরকার। জীবনানন্দের কবিতার সুরারোপ করার কাজটি বেশ কঠিন। প্রথমে যখন তাঁর কবিতায় সুর দেই—তখন অন্য রকম দেশ—পরাধীন দেশ—মুক্তির নেশায় পাগল। এক ধরনের উন্মাদনাও ছিল এবং অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। আমার মনে আছে এখান থেকে কলকাতায় গিয়েই প্রথমে গান রেকর্ড করলাম স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্য। তারপর সুকান্তের কবিতা। এখন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ছাড়া এ জাতীয় কাজ করা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে গানের মাধ্যমে জনগণের আরো কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

❐ কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশকে আপনার কেমন লাগে।

অ.রা. জীবনানন্দ দাশ বাংলার কবি—বাঙালির কবি। তিনি তাঁর কবিতায় বাংলার সুর ও স্বরকে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা বিস্ময়কর। তাঁর কবিতা আবহমান কাল ধরে এদেশের মানুষকে দেশকে ভালোবাসার অনুপ্রেরণা যোগাবে। আর ঐ যে বললাম, কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর রূপসী বাংলাকে নানাভাবে দেখেছিলেন—তাঁর সেই চিরায়ত বাণীকে সুরের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব এখন শিল্পী সমাজের। সকলের সহযোগিতায় সবই সম্ভব।

❐ আপনি কষ্ট করে এসে সাক্ষাৎকার প্রদানের মাধ্যমে যে সব তথ্য প্রদান করলেন, আমরা আশা করি অনেকেই এতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন—এবং শিল্পীসমাজ আপনার প্রচেষ্টায় যুক্ত হবে। আপনার সাফল্য ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবন কামনা করি। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের তিনটি ছত্র
হুমায়ুন কবির

এক॥ "যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের"

সময়ের দিক থেকে আমরা যতই এগোচ্ছি ততই যন্ত্রজীবনের ক্ষয় ও অপচয় আমাদের ব্যক্তিত্বকে বহুবিখণ্ডিত করছে। প্রচণ্ড গতি ও অভিঘাতময় সময় ও সমাজে প্রায়ই জন্মাচ্ছে না কোনো প্রতিভার মহোবোধিবৃন্দ। আজকের কবি চৈতন্য খণ্ডিত ও সীমিত। ক্লাসিক সংহতি অনুপস্থিত যে কোনো শিল্পীর সত্তায়। আধুনিক সময়ের (অভিধাটি যতই বিস্তৃত অর্থেই ধরা হোক না কেন) যে কোনো কবির বোধ ও ব্যাপ্তির সীমাবদ্ধতার জন্যে তার কাব্যস্বভাবকে কয়েকটি মাত্র চিহ্নে চিহ্নিত করা সম্ভব। কবির এই ক্ষীণ ভুবনের সমস্ত প্রখরতাকেও প্রায়ই একটি মাত্র মহৎ কবিতার অন্তর বাহিরে লাভ করা যায়। সমস্ত কবিতায় কবির যে বৈশিষ্ট্য ইতস্তত হয়ে থাকে তা সংহত হয় একটি কবিতায়। প্রতিভার বহুবর্ণ কিরণ সন্নিপাতে সেই কীর্তি বহুদিন কবিকে ধারণ করে রাখে। প্রতিপাদ্যটির সপক্ষে প্রমাণ— গ্রে'র কথা বলতেই মনে পড়বে তাঁর Elegy, অস্কার ওয়াইল্ড স্মরণ করিয়ে দেন The Ballad of Reading Goal, নজরুলও তাঁর 'বিদ্রোহী', সুকান্তও তাঁর 'রানার', অমিয় চক্রবর্তীও 'চেতন স্যাকরা'।

আমার মনে হয়েছে, জীবনানন্দ দাশের সবচেয়ে গভীর কবিতা 'আট বছর আগের এক দিন'। বিভিন্ন ক্ষীণতর বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে জীবনানন্দের কবিতা উচ্চারণেই আমরা যে রহস্যমধুর ভুবনের আস্বাদ পাই তার সর্ব পরিমণ্ডল 'মহাপৃথিবী'র এই স্তরবহুল ও দীর্ঘ কবিতাটিতে ব্যঞ্জিত। সে ভুবন ব্যাপকাংশে অবচেতনার অভিজ্ঞান—অবচেতনার সূত্র ধরেই কখনো গ্রটেস্ক, তার বিষয় ও বোধ মৃত্যুতমসায় থেকে থেকে জেগে ওঠা জীবনের ক্ষীণালোক দীপ। জীবনের সমান্তরালে প্রবল মৃত্যুর যে ইতিহাস ও লোকালোক ব্যাপ্ত শরীরী-অশরীরী রূপ জীবনানন্দের কবিতার সারনির্যাস—মৃত্যুময় এই চেতন প্রবাহই 'আট বছর আগের একদিন'। কবিতাটির শুরুতেই একটি নিষ্ঠুর সংবাদ পরিবেশিত হলো—

> 'শোনা গেল লাশকাটা ঘরে
> নিয়ে গেছে তারে ;

এই নাটকীয় ঘোষণার পর ক্রমশ আমরা জানতে পারি কোনো এক পুরুষ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে। পার্থিব কোনো উপকরণের অভাব তার ছিল না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বধূ শুয়েছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল
কোন ভূত?'

সুখী সংসারী এই মানুষটি অদ্ভুত আঁধারে শুনল মৃত্যুর আহ্বান। উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা তাকে ডাক দিল সর্বনাশের দিকে। চারদিকে তখন প্রাকৃত—জীবন প্রেরণা—

'তবুওত পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আর একটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

এবং

'রক্তক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে উড়ে যায় মাছি ;

কিন্তু অশ্বত্থের প্রধান আঁধার যাকে ডাক দিয়েছে তার সমস্ত লিপ্সার কেন্দ্রীভূত নাম—মৃত্যু।

তাই— 'এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা ;
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা
এই জেনে।'

আঁধারের এ অশুভ ডাক সে কেন শুনল? মৃত্যুতে কেন খুঁজল জীবনের সমীকরণ? প্রফেসীর মতো শোনায় জীবনানন্দের স্বর—

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন-বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত-ক্লান্ত করে ;

"মৃত্যু আমাদের অন্তর্ভুক্ত এক বীজ, যাকে আমরা অনবরত লালন করে ফুলিয়ে তুলছি, এবং যা সুপক্ক হলে আমাদের বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসবে" (বুদ্ধদেব বসু)। এই অতল নামহীন লিপ্সাটি জীবনানন্দ দাশের আত্মঘাতী যুবকটি অনুভব করে গেছে। তার সমস্ত স্বাক্ষর আমরা পেয়েছি এই ভীতিপ্রদ অথচ মোহিনী আশ্চর্য কাব্যময় উচ্চারণে।

জীবনানন্দ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় লিখেছেন—"কেউ বলেছেন এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ চেতনার, অন্যমতে নিশ্চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার ; সুররিয়ালিস্ট।" প্রথম সিদ্ধান্তটি বাদ দিলে অন্যগুলো সবই Identical এবং তাঁর মগ্নমানস বিচ্ছুরিত করে যে অনুভব তার অনুধাবনে মন্তব্য করা সম্ভব "মূলতঃ জীবনানন্দ মৃত্যুঞ্জয়ী" (তরুণ সান্যাল, প্রবন্ধ পত্রিকা, শরৎ ১৯৫৮)। তাঁর সমস্ত সিম্বল ও ইমেজ যাত্রা করেছে একটি তুঙ্গতার দিকে—যার নাম মৃত্যু। এ মৃত্যুবোধ সার্বিকভাবে ও ব্যাপ্তিতে 'আট বছর আগের একদিন' এর সেই অদ্ভুত মানুষটি যার সর্বনাশের প্রতি দুর্মদ আকর্ষণ। আমরা দেখেছি জীবনানন্দের প্রকৃতিও মৃত্যুম্লান। যেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শস্যহীন মাঠে বরফের মতো চাঁদ আলো দেয়, বাবলা হোগলার পাশে লাল–নীল মাছের ঘরে ভাসে মৃণালিনী ঘোষালের শব। তাঁর ঋতু হেমন্ত–শীত এসে তাকে নষ্ট করে দিয়ে যাবে। আর তাঁর কবিতার সমাজ সময়-ক্রান্তির নৈরাজ্যে বিক্ষত—সেখানেও আবিল অন্ধকার। বলা যেতে পারে, জীবনানন্দের ইতিহাসবোধ হাজার হাজার বছরে প্রলম্বিত মৃত্যুর সুবিশাল উত্থান প্রত্যক্ষ করার ভূমিকায় বিধৃত। একটি কবিতা উদ্ধৃত করা সম্ভব—

> হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
> চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ ;
> বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
> বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরীয়—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
> শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;
> 'মনে আছে?' শুধালো সে—শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন।'

জীবনানন্দের কবিতায় এই 'বিপন্ন বিস্ময়'কে বহুবার পাই ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মবেশে। রক্তগত এই ভূত, এই চিরস্থায়ী মরবিডিটির তাড়নায় কবি নিঃসঙ্গ, যন্ত্রণার্ত।

> স্বপ্ন নয়,—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
> হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ;
> (বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

তাই স্বগতোক্তি—"আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা?"

আত্মঘাতী যুবকের জনক জীবনানন্দ পূর্ববর্তী পর্যায়ে 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর' মিশে থাকতে চেয়েছেন, তাঁর জাতক, এই বিনষ্ট যুবা ; এখন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্ধকারে সমর্পিত।

> রক্ত ফেনা মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
> আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার ;
> কোনোদিন জাগিবে না আর।

জীবনানন্দ দাশের এই আত্মহন্তারককে বলা যেতে পারে একজন Outsider (কলিন উইলসনের পারিভাষিক অর্থেই)। সব কিছুর মধ্যে থেকেই সে কোনো কিছুর মধ্যে নেই। আপতঃ সৌষম্যের অন্তরালে তার Introvert চরিত্র সৃজন করেছে এক স্বগতভুবন। এ জাতীয় মানুষদের আর একজন সাহিত্য বিধৃত প্রতিনিধি কাম্যুর মোরসল্ট মায়ের মৃত্যুর দিন সে মনে রাখতে পারে না। মায়ের কফিনের পাশে সম্ভাব্য শোকাবেগের পরিবর্তে সে নিদ্রালু হয়ে পড়ে। যুবকটি আপতঃ নজরে আর দশনের মতো জীবন কাটাচ্ছে। সে চাকরি করছে, প্রণয়লীলায়ও অপটু নয়। কিন্তু আসলে এই আপাতরম্য জীবন একই খবরের কাগজ রোজ পড়ার মতো একঘেয়ে (বইয়ের শেষে কাম্যু যে ইঙ্গিত করেছেন)। বৈচিত্র্যহীন জীবনের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে নিজের অস্তিত্ব আস্বাদন করতে চেয়ে খুন করল এই যুবক। এবং আত্মহত্যা করল আলোচ্য কবিতার বধূ শিশু আশাসহ অন্য আর একজনে।

সংসার ও সুখ যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হলে ভিন্নতর স্বাদের দিকে প্রবাহিত হয় প্রবৃত্তি। বার্নাড শ'র Back to Methuselah-তে দেখেছি স্বর্গ ছেড়ে পুণ্যবানরা কেউ নরকে নামছেন, অসহ্য স্বর্গের বিরতিবিহীন সুখ, চাইছেন কোন পালাবদল। এই পালাবদলই আমাদের সময়ের প্রয়োজন। জীবনানন্দ আধুনা অতিদ্রুত মানুষের সবকিছু। স্থূল হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহৃত হয়ে ... ব্যবহৃত ... ব্যবহৃত .. ব্যবহৃত হয়ে .. শুয়ারের মাংস হয়ে যায়। জীবনের মসৃণ অভ্যস্ততা এক কঠোর নিয়ম শাসন। অন্তর্গত রক্তের ভিতরে তাই 'বিপন্ন বিস্ময়' জেগে ওঠে আমাদের ক্লান্ত করে লাশকাটা ঘরের মানুষটির মতোই যে জীবন—

... ... কোন
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই
বিবাহিত জীবনের স্বাদ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,

সে জীবনেও অনুসন্ধিৎসা উটের গ্রীবার মতো জেগে ওঠে এবং বেঁচে থাকার ক্লান্তি অবসিত হয়, মৃত্যুতে 'লাশ-কাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নেই।' মানুষের এমন এক একটি মুহূর্ত আসে যখন জীবন ও মৃত্যুর ভেদরেখা সংকুচিত হয়ে যায়। সে জীবনকে ছুঁয়ে দেখতে গিয়ে মৃত্যুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। মৃত্যুর ভেতর দিয়েই একবার জীবনকে পান করে নেয়। টি.ই. লরেন্স অথবা ভ্যান গগ মাতালের মতো কি প্রচণ্ডতায় মৃত্যুর দিকে গিয়েছেন। দ্রুততম মোটর বাইক ক্র্যাশে বিচূর্ণিত লরেন্স অথবা বুকের ওপর পিস্তল ফাঁকা করে কোট চাপিয়ে চলে আসা ভ্যান গগের চৈতন্য জানি শেষবারের মতো মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে একটা অর্থ দেবার প্রয়াস ছিল। সে প্রয়াস গতানুগতিকতার ঝুল সরিয়ে আদিম জান্তব জীবনকে ছোঁয়ার ইচ্ছা যে জীবনের 'দুর্দান্ত নীল মত্ততা'কে জীবনানন্দ দাশ দেখেছেন আলোচ্য কবিতাটিতে— 'মশা তার অন্ধকার শঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালবাসে' অথবা 'দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ'।

এ কথা সত্য এই মৃত্যুবোধ আধুনিকতার তথা প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ের ব্যাপক ফসল। এই সময়ে পৃথিবীতে ঘটেছে মানুষের বৃহত্তম ক্ষতি 'Loss of Self' (উইল ডুরান্ট)। এই Self অন্বেষণ প্রয়াস ও মৃত্যু লিপ্সা একাকার। আজকের অবক্ষয়ী ধনতন্ত্রের যুগে একদল মানুষ জীবনকে পাবার জন্য হাতিয়ার তুলে জোট বাঁধে। অন্য কেউ কেউ জীবনের নামে মৃত্যুকে আজীবন সাথী জেনে মৃত্যুর ভেতর দিয়েই পৌঁছুতে চায় জীবন প্রয়াণে। উভয়েরই অন্বেষণের বিন্দু একটি—শতধা-খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের সংহতি তথা জীবন নামক এক বহু সম্ভাবনাপূর্ণ দ্যুতিময় অস্তিত্বের সাক্ষাৎ। তাই কবি বলেন—'জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ' (জীবন/ধূসর পাণ্ডুলিপি)।

'আট বছর আগের একদিন'-এ সময় স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ না হলেও আমরা এর ভাব পরিমণ্ডলে শুনে নিতে পারি সময়সন্ধির নৈরাজ্য কোলাহলময় সন্নিপাত। 'মহাপৃথিবী'র প্রকাশকাল ১৯৪৪। স্বতঃই কবিতাগুলো তার কাছাকাছি সময়ে রচিত। শতকের শুরু থেকে ১৯৪৪—মানবজীবন তার বৃহত্তর ব্যর্থতা দেখেছে। দেখেছে 'চারিদিকে ঘরবাড়ি পোড়ো সাঁকো সমাধির ভিড়।' (একটি নক্ষত্র আসে/মহাপৃথিবী)। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ধ্বংস এবং তারো চেয়ে গুরুতর নৈতিক নৈরাজ্য (Moral anarchy)—'বোন ভাইকে' খুন করে সেই রক্ত দ্যাখে, করাল কালের এই আবহে জারিত হয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। বিদেশী কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত, ব্রাহ্ম পরিবারে জাত নিসর্গ পৃথিবীর নিঃসঙ্গ সৌন্দর্যমুগ্ধ কোমল মানস কবি সময়স্রোতে প্রবিষ্ট হয়েছেন ব্যস্ততর, বিবর্ণ ভুবনে—যা তাকে বিক্ষত করেছে। সেই আঘাত প্রসূন—(আট বছর আগের একদিন)। ১৯৪৪-এর পৃথিবীতে ওয়ার পোয়েটসদের মতো উচ্চকণ্ঠে অভিযোগ করা যেত—'Was it for this that the clay grew tall?' অথবা 'What passing bells for those who die in battle?' কিন্তু জীবনানন্দ এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাজুক প্রতিভা, স্পর্শকাতর ও স্বভাবনির্জন। এই বন্ধ্যাভূঁয়ে তাঁর সুখী সচ্ছল যুবকটি ক্লান্ত হয়েছে। একগাছা দড়ি ও অশ্বত্থের শাখার সহযোগিতায় এ জীবনের প্রতি সে জানিয়েছে প্রতিবাদ। যেন ঘোষণা করেছে—'যে জীবন ফরিঙের দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা'। ১৯৪৪-এর পৃথিবীময় হত্যাযজ্ঞ। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক তাণ্ডব ও দুর্ভিক্ষের প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করেনি এই যুবক, করেননি জীবনানন্দ। তবুও তাঁরা মানুষের পাপের দায় ভাগী। জীবনানন্দের কথায়—'মানুষ মেরেছি আমি নিহত ভায়ের রক্তে ভরে গেছে আমার শরীর।'

ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠী 'কবিতাটির বুনোনির ফাঁকে ফাঁকে জীবনের প্রতি আগ্রহ' লক্ষ্য করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর একে মনে হয়েছে 'সবচেয়ে প্রাণতপ্ত'। আসলে কি তাই? জানি, যুবকের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানিয়েছিল অশ্বত্থের শাখা, জোনাকীর ভিড়, থুর থুরে অন্ধ পেঁচা দু'একটা ইঁদুর ধরার প্রস্তাবে জীবনের 'গাঢ় সমাচার' জানিয়েছিল। কবি সেই প্রগাঢ় পিতামহীর সঙ্গে জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূন্য করার সংকল্পে উদ্বেলিত হয়েছেন। কিন্তু এ জীবনত প্রকৃত, ঘৃণ্য, অনাকর্ষণীয়। এ জীবনের অধিকারী গলিত স্থবির ব্যাং, থুর থুরে অন্ধ পেঁচা, রক্তক্লেদ বসা মাছি ও উড়ন্ত কীট। তাই কবি আত্মহন্তারককে বললেন—

> এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা ;
> যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা
> এই জেনে।

দুই।। "হাজার বছর ধরে শুধু খেলা করে"

প্রথম পর্ব

কালকে আমরা ধারণা করতে পারি না। বালিয়াড়ির মতো ঝির ঝির করে ঝরে যায় সময় আমাদের চৈতন্যের ফুটো পাত্র দিয়ে। যে মুহূর্তে আমাদের অবস্থান চেতন প্রবাহের ভয়াবহ ঘূর্ণি তাকেই সত্য জেনেছে। লোকশ্রুত জয়েস ও তদাশ্রয়ী শোভাযাত্রা ক্ষণপ্রবাহের এই ক্ষণপ্রভাই পেয়ে যান জীবনের সকল ডাইমেনশন এবং সৃষ্টি করতে পারেন অত্যুজ্জ্বল উপন্যাসাবলী অর্থাৎ উপন্যাস তার সবল শৈশবে যে নাম পেয়েছিল Testament of Life চেতন প্রবাহপন্থী এইসব সাহিত্য ধুরন্ধররা সৃষ্টি করেছেন সেই জীবনবেদ। শুনছি—

> Things fall apart ; the
> centre can not hold ;
> Mere anarchy is loosed
> upon the world,
> (W. B. Yeats)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে কফির চামচে অপচয়িত হয়েছে জীবন। তাই এলিয়ট ও য়েটস, কিংসলি এমিস ও ডম মরেস, সুধীন দত্ত ও সমর সেন, শামসুর রাহমান ও বিনয় মজুমদার সম্ভাব্য নাশকতায় বিপন্ন দাঁড়িয়ে থাকেন এবং মুহূর্তগুলো অভিজ্ঞতার সীলমোহরে আবদ্ধ করেন। গলে যাওয়া সময়ের যেটুকু ধারণ করেছেন রুগ্ন আঙ্গুলে সেটুকুকেই শিশুদের আহলাদী লজেন্সের মতো বিবিধ স্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
উদ্দাম উধাও?

প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শুভঙ্কর দৃষ্টি ও শ্রুতির পর কালের যাত্রার ধ্বনি কেউ কি শুনেছে? শুনেছে কিন্তু লোকালোকময় অশ্বের বেগবান খুরের শব্দই তাদের সন্তুষ্ট করেছে। কিন্তু অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের জটিল ছায়াকে কেউ আত্মস্থ করতে পারলেন না—রাজহংস রূপ জুপিটারকে যেমন বরণ করেছিল লীডার শুভ্র বুক। ইতিহাস ও বাইবেল এলিয়টে প্রেতছায়া যেন কেরানীর মেয়েটির প্রেমে হৃতসর্বস্বতা সপ্রমাণ করতে, STILL CENTRE-এর নির্বাণ The Single Rose is Now The Garden (Ash Wednesday) এই স্বরেই উচ্চকিত। আর তাঁর ভবিষ্যৎ—ক্যাথলিকবাদ ও রাজতন্ত্রের কারুকার্যময় মহান খিলানসমূহ মিউজিয়ামে বড় সুন্দর দেখায়।

পাঠক, আসুন অন্ধ অথচ দিব্যদৃষ্টিবান হোমারের পাদদেশে। কেমন অর্ফিয়ুস এই বৃদ্ধ যার অনায়াস বাঁশী সময়কে ধারণ করে সময়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। ওডেসিউস সে সাইরেনের গান শুনেছিলাম, পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় পেয়েছিলাম মৃণালভূকের সান্নিধ্য—সেই সাইরেন ডেকে গেল ১৭৮৬-র রোম্যান্টিক পঞ্চজনকে। মৃণালভোজী স্বপ্নগ্রস্থতার উদ্বোধন ঘটেছে মার্কুইস দ্য যাদের জগতে, মমার্তের আড্ডায় (স্মর্তব্য, ক্লাইভবেলের Old friends স্মৃতিগ্রস্থ), রাইমার্স ক্লাব, কৃত্তিবাস গোষ্ঠিতে, আরও স্মরণ করা যায় আলফ্রেড টেনিসনের অবহেলিত কবিতা The Lotus Eaters, কি যে রেডিয়াম দিয়েছেন হোমার যার বিভায় রচিত নিকস কাজান্‌জাকিসের নব ওডেসী। এখনি আমি খুললাম ইলিয়টের শেষ অনুচ্ছেদ হেক্টরের শেষকৃত্যের বর্ণনা "Down came once more lighting the east with rosy hands..." দিয়ে শুরু হয়ে কয়েক লাইনে শেষ হয়েছে হেক্টরের শেষকৃত্য, শেষ পঙ্‌ক্তি "Such were the funerel rites of Hector, Tamer of Horses." মহাকবিতার এই সনেট-শোভন পদবিন্যাস কী মোহময়ী এখনো।

"শব্দই ব্রহ্ম" অথবা "কাব্যের ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস" ইত্যাকার বাক্যাবলীর সারনির্যাস যে গ্রহণীয় নয় সে ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ—"শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন ভোলায় না চোখ"। রবীন্দ্রনাথদের রাজর্ষিবাণীর পর সত্যেন্দ্রনাথেরা ছন্দের ঝুমঝুমি সাগ্রহে বাজালেও কেউ যাবে না। বিষয়বস্তুর মহত্ব ছাড়া সাহিত্য ন্যূনমূল্যের না হলে নগ্ন নিরাভরণ হুইটম্যান তার মেঘমন্দ্র উচ্চারণ শতাব্দীকে অবলীলায় অতিক্রম করেছে কি করে। কেউ কি স্মরণ রেখেছে একই কালের মেলভিলও কবিতা লিখেছেন, ছিলেন গিলবার্ট? এমিলি ডিকিনসনের নিটোল লিরিকগুচ্ছের কথাও কি সর্বদা মনে পড়ে? ধরা যাক জীবনানন্দ দাশ যার 'হায় চিল' কিংবা 'রূপসী বাংলা'র সনেটমালা ভাল কবিতা একটি স্ফুলিঙ্গের তারা উজ্জ্বল নিটোল—সম্পূর্ণ। কিন্তু মহৎ কবিতা 'আট বছর আগের একদিন', 'বোধ', অবয়ব সংস্থান যাদের শিথিল, অন্যমনস্ক। তবুও তারাই অন্তর্গত রক্তের ভেতরে ক্রিয়া করে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তব্যময়তার জন্য। কিংবদন্তীর কোকিল বড় সুখপ্রদ 'কুহু' করে আর কাক ও চিলাদি তাদের সুর বর্জিত ডাকে বাজায় প্রতীকী করতাল। পাঠক স্মরণ করতে পারবেন 'Ode to a Nightingle' বা 'To the Cuckoo'র পাশাপাশি প্রেমন্দ্রে মিত্রের 'কাক' কিংবা অ্যালেন পো'র 'The Raven'–এর তীব্র তীক্ষ্ণতা।

সুতরাং আবারও বলি বিষয়বস্তুতেই শিল্পের মহত্ত্ব। শিল্পী যেন টাইরেসিয়স প্রবাহিত হচ্ছেন সময়ের মসৃণ ও বিপদাপদের প্রবাহের মধ্য দিয়ে ; বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীত ভবিষ্যৎ নামক দুই বাহু প্রসারিত করে দেন, সে হাতে বক্তব্য হয়ে উঠে আসে সেই দুর্লভ রত্নরাজি সময় যাকে প্রতীকে পরিণত করেছে অথবা সেই আসলে কালপ্রতীক। কবি নামক কালপুরুষের অধিষ্ঠান যেন এক সুউচ্চ মিনারে, নিচে সময়ের উঁচু নিচু অবস্থান একাকার। তার মধ্যেই ঋজুগ্রীব কবির বিষয়েরা গর্বিত ঘাড় তুলে আছে কাব্যে সমর্পিত হয়ে দ্বিতীয় রূপে আবার সময়ের মত্ত সাগর পাড়ি দেবে বলে। কর্ণকুন্তীর কাহিনী পুরান ইতিহাস নৃ ও সমাজতত্ত্বের প্রচ্ছদে সময় সাঁতার দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কূল পেয়ে আবার 'কাহিনী'র কর্ণকুন্তী সংবাদ নামে দ্বিতীয় রূপে আকুল সাঁতার দিয়েছে ; তেমন 'গান্ধারীর আবেদন' তেমন য়ুরোপের মধ্যযুগের রিচার্ড ও সালাদীনের মহত্ব বীরত্বের গল্প গাথা।

দ্বিতীয় পর্ব

বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের পর যে কাল চেতনাবান পুরুষের স্পর্শ–ধন্য তিনি জীবনানন্দ দাশ। মৃত্যুই তাঁর চেতনার মহারাজাধিরাজ। হাজার বছর প্রলম্বিত মৃত্যুর মহাউত্থানের প্রেক্ষিতেই তাঁর কবিতা। এসিরিয়া ব্যবিলোনের পর মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের বঙ্গ—"সব রাঙা কামনার শিয়রে সে দেয়ালের মত এসে জাগে ধূসর মৃত্যুর মুখ।" জীবনানন্দের মৃত্যুবোধ ও ইতিহাসচেতনা আজ উপকথার সামগ্রী। কিন্তু আজ অবধি দেখা হয়নি এই দুই চেতনার অন্তর্গত সংযোগসূত্র কতটুকু। এবং কেন জীবনানন্দ রবীন্দ্রোত্তর যুগে সর্বাপেক্ষা জটিল ও মহাকবি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে কালে দাবী করেছেন—"আমি বিংশ শতাব্দির সমান বয়সী" সেই বিধ্বস্তকালে যখন 'পৃথিবী নিঝুম ক্রমে হয়ে যায় ঘুমে' (জীবনানন্দ) সে কালের আর এক প্রতিনিধি জীবনানন্দ দাশ। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো মধ্য ভিক্টোরীয় অটুট মূল্যবোধ, গভীর পরমার্থিকতা, ঔপনিবেশিক রেনেসাঁর উজ্জ্বল প্রতিবেশ এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অস্তিবাদীসূত্রসমূহ আয়ত্ত করেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্লাসিক আলোক যে সময়কে ধারণ করেছিলেন তার শিরাতন্তু উত্তরাধিকারী ও স্বগত এই উপাদানসমূহ। জীবনানন্দের অভিজ্ঞতায় কোন ক্লাসিক বিশালতা নেই। তিনি সেই জাতের প্রতিভা যারা লক্ষকোটি শক্তির স্পট লাইট ফেলেন বিশেষ একটি বিন্দুতে। একটিই তাঁদের দর্শনের ভাজ, একটিই বিশ্বাসের (কিংবা অবিশ্বাসের) সূত্র। সেই সীমিত পরিমণ্ডল, 'জলের রেখার মত ঘুরে ঘুরে একাকী একই কথা কওয়া'র দলের একজন তিনি। চৈতন্যে রাবীন্দ্রিক ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী তিনি নন, তবুও আশ্চর্য তাঁর কালচেতনা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও গভীর। সময়ের সুবিশাল ঘড়ি যেন তাঁর রক্তস্রোত সতত স্পন্দমান। অস্তিবাদ থেকে কালজ্ঞান উত্থিত হওয়া সম্ভব (যেমন শেক্‌সপীয়র, হোমার, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়) শুভঙ্কর সিদ্ধান্তসমূহ বলয়িত হতে পারে একটি মানুষের কিংবা ঘটনাবৃত্তে, যারা মহাকালপ্রতীক মানুষের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলের শুভ উত্থান চলে যুগান্তরে। কিন্তু এ কথা আজ ইতিহাস সিদ্ধ যে জীবনানন্দ দাশের জগৎ মৃত্যুর কুহকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরা। মায়াবী মৃত্যু, প্রকৃতি নারী ও প্রেমের পেশাকে নিরন্তর হাতছানি দিয়েছে তার গবাক্ষে গবাক্ষে। আমি বলতে চাই, জীবনানন্দ দাশের চেতনায় মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস মৃত্যু নামক "সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মত জ্বলে" (সূর্য তামসী)।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তথা ইতিহাস জীবনানন্দের মুঠোয় শিশুর বলের মতো সাবলীল ছিল। দৃষ্টিক্ষেপমাত্র হাজার বছরের কাল ব্যবধান সঙ্কুচিত হয়ে যেত। সবারই মনে পড়বে সেই পাঠকরঞ্জক কবিতা 'বনলতা সেন'। যেখানে নাটোরের বনলতা সেন যেন মুহূর্ত প্রসারিত হয়েছে শ্রাবস্তি ও বিদিশায়, প্রসারিত হয়েছে ভবিষ্যৎময় অন্ধকার ও শূন্যতার কাননে। এখানে জীবনানন্দ দাশের অগোচর ব্যক্তিজীবনের অন্ধকার ও শূন্যতার কাননে। এখানে জীবনানন্দ দাশের অগোচর ব্যক্তিজীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ এবংবিধ প্রসঙ্গের উপর নতুন আলোকপাত করবে বলে বিশ্বাস। সলিল কুমার বিশ্বাস দৈনিক কবিতায় জীবনানন্দ দাশ সংখ্যায় ছাত্র জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—স্বভাব লাজুক কবি একদিন পড়াতে পড়াতে Universe শব্দটিকে পেলেন, পড়া থামিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—"তোমরা কেউ Universe শব্দটির অর্থ জানো?" তারপর নিজেই বললেন—Universe হচেছ ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড শব্দটি তার কাছে যে কতটা প্রতীক ছিল তা তিনি সেদিন গোপন রাখেননি, স্বভাবকে অতিক্রম করে তিনি ক্লাসে ব্রহ্মাণ্ড শব্দটি নিয়ে খেলছিলেন এবং নানাবিধ মুদ্রা তৈরি করছিলেন হাতে যেন ব্রহ্মাণ্ডকে করতলগত করতে চাইছিলেন এবং হাসছিলেন এক অদ্ভুত হাসি।

এই আপাতসামান্য ঘটনাটি জীবনানন্দ মানুষের এক বিরাট বিস্তৃত অকম্পিত প্রেক্ষিতের ইঙ্গিত করে। তিনি হিমশৈলের মতো নিমজ্জিত, সুবিশাল কিন্তু গোপন। তাঁর সুপ্ত ব্যক্তি জীবনের যেটুকু ইঙ্গিত আমরা পাই তা থেকেই বুঝে নিতে হবে অন্তঃস্বভাবের স্বরূপ, কবির ব্যক্তিজীবন কবিতার রহস্য উন্মোচনের একটি অমল দরোজা। তাহলে এখানেও তাঁর সমস্ত অনুভবে উচ্চারণে দেখেছি (কিংবা বুঝতে পারছি) জীবনানন্দ ব্রহ্মাণ্ডে সমর্পিত কিংবা ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে গভীর মিস্টিক চেতনায় উদ্বোধিত। এবং ব্রহ্মাণ্ড ভাবনা ও কালজ্ঞান প্রায় সর্বক্ষেত্রেই Identical (লক্ষণীয় তাঁর ব্রহ্মাণ্ডভাবনা রবীন্দ্রনাথের মতো ব্রহ্মভাবনার অঙ্গীভূত নয়, বরং জীবনানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানী কখনোই হননি এমন কথা বলা যেতে পারে) তাঁর যে কোনো দীর্ঘশ্বাস সভ্যতার জন্য যে কোনো আক্ষেপ, মহাবিশ্বের শরীরে বিস্তৃত। যেমন—

তুমি কি গ্রীস পোল্যান্ড চেক প্যারিস মিউনিক
টোকিও রোম ন্যুইয়র্ক ক্রেমলিন আটলান্টিক
লন্ডন চীন দিল্লি মিশর করাচি প্যালেস্টাইন?

(অনন্দা)

হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন উরের আরশি থেকে ফেঁসে

অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও—দুপুর বেলায়
বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেকজান্দ্রিয়ায়
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে প'ড়ে অমায়িক সংকতের মতো;

(নাবিক)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসে যখন তিনি হৃদয় রাখছেন তখন ইতিহাস কোনো খণ্ড বোধে আলোড়িত নয়। তাঁর কাছে ইতিহাস এক বিশাল, মহান সর্বময় সংহতিতে পরিব্যাপ্ত। (আশ্চর্য, সর্বহারা আন্তর্জাতিকবাদ, রাসেলের বিশ্ব মহারাষ্ট্র কোন সংকল্পেই তিনি যুক্ত ছিলেন না। খোঁজ জানতেন না। তবুও তাঁর ইতিহাস মহা ইতিহাস, জগৎ মহাজগৎ)।

প্রতিপাদ্যটি জটিল রূপ নিচ্ছে। সরলীকরণের সূত্রটি এই, জীবনানন্দের ব্রহ্মাণ্ড ভাবনা গভীর এবং সেই ভাবনার সংশ্লেষের ইঙ্গিত ইতিহাস চেতনা ও কালজ্ঞান—যারা আসলে একটি বিষয়ের দুটি Dimension.

জীবনানন্দে যেটি লক্ষ করবার ভঙ্গী সেটি হলো তিনি কেমন সাবলীল অপসারিত হন বর্তমান থেকে অতীতে এবং আভাষিত করেন ভবিষ্যৎ এবং তার কবিতার মধ্যে ঝোলানো যেন একটি যাদুকরী পর্দা যাকে টেনে দিলেই আমাদের অবস্থানে কোলকাতা, বিদিশা, দ্বারকা ও আলেকজান্দ্রিয়া একাকার হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টি পৃথিবীর সময়কে এক অনন্তপ্রান্তর হয়ে যেতে দেখে। প্রায় সমস্ত উচ্চারণে বিস্তৃত সেই প্রান্তরের অনন্ত বিস্তার। প্রান্তরে যেমন কোনো খণ্ডাংশের বিশেষ পরিচয় বা মর্যাদা নেই, জীবনানন্দের ইতিহাস ও বিশ্ববোধেই তাই কোলকাতা বা প্যালেস্টাইনে কোনো ব্যবধান নেই। ব্যবধান নেই সময়ের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ের মধ্যে।

> উনিশশো বেয়াল্লিশ ব'লে মনে হয়
> তবুও কি উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল।

'খেতে প্রান্তরে' কবিতায় এক বিকেলে সমস্ত গাছের দীর্ঘছায়া বাংলার প্রান্তরে যখন পড়েছে মনে হয় সেই বিকেল থেমে গেল। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের সেই বিকাল শুধু উনিশ শ' বিয়াল্লিশেই আবদ্ধ রইল না।

প্রাত্যহিক জীবনের পুনরুক্তি ও যান্ত্রিক আকারের অসহনীয়তা ব্যক্তি ও তার দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সৃষ্টি করে এক বিচ্ছেদ যার অন্য নাম অসঙ্গতি (Adversity)। তার বিপরীত বিন্দুতে অধিষ্ঠিত মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা। দৈহিক উল্লাস ও অবশ্য মৃত্যু এই দুইয়ের সংঘাতের পরিণাম অসঙ্গতিবোধ। অসঙ্গতির অখণ্ড অংশ সরলতা। জীবনানন্দ মানবভাগ্য ও মানব ইতিহাসের পরিণাম প্রবাহ অবলোকনের দিব্য সচ্ছতা লাভ করেছিলেন তাই সময়ের অতিবিস্তার তাঁর কাব্যে সরল শৈশব হয়ে আছে যেন। যদিও তাঁর কাব্যে জটিল, ইতস্তত দুর্ভেদ্য অতচ নিঃসীম সময় অপাপবিদ্ধতায় সেখানে সমর্পিত। কামনা যে ট্র্যাজিডির জন্ম দেয় তার সুদৃঢ় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় এই সংগতির স্বীকৃতি। সঙ্গে সঙ্গেই আসে আলোচ্য কুম্ভীপাক থেকে উত্থানের আশা। যদিও জীবনানন্দ মৃত্যুজ্ঞানী মৃত্যু-জ্ঞান পুনরুত্থানের বিশ্বাসে গভীর। নিসর্গ, ব্রহ্মাণ্ড এবং কাল-পুরুষরাই পুনরুত্থানের দরোজা। পূর্বে উক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাল-চেতনা অস্তিবোধ থেকে উৎসারিত এবং বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে নেতিময় জীবনানন্দ ব্রহ্মাণ্ডকে করতলে আমলকিবৎ কি করে ধারণ করলেন। বিস্ময়ের মোচন ঘটবে এখন, জীবনানন্দকে দেখেছি ফসলের আদিম অতিকথার অংশীদার-রূপে—যেখানে মৃত্যুতে পরাভবই জীবনের নতুন অঙ্গীকার। তিনি বলেছেন, "অবিশ্বাস বা বিশ্বাসের অন্তিম যে বিশৃঙ্খলা আনে তা নিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তৈরি হওয়া কঠিন।" আরো বলেছেন, "আনুসঙ্গিক অনাস্থার অতীত কি বিশেষ অবস্থা রয়েছে সেটা একজন ব্যক্তির নয়--কবির নিজের ব্যক্তিকতার নয়—সমস্ত দেশ কাল সন্ততির পরিচয় হিসেবে স্থিতি করতে পেরেছে" (কবিতার কথা)। দেশকাল সন্ততির পক্ষ থেকে কবি বলেছেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধন 'আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র রাত্রি সিন্ধু-রীতি মানুষের বিষয় হৃদয়
জয় অস্তসূর্য জয়, অলখ অরুণোদয় জয়—
আমার এ জীবনের মৃত অরণ্যেরা বুঝি বলে
কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে

... ...

মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
আমি তবু বলি ;
যে কটা দিন বেঁচে
আছি সূর্যে সূর্যে চলি

ধাতব সভ্যতা ও মাংসের কামনার প্রহার যখন আবহমান কাল ধরে ক্লান্ত করেছে মানুষকে এবং সেই মানুষের ঘোষক কবিকে কল্পনায় তখন এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করতে হবে। "পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়—তাহলে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধূলো সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারে কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য"(কবিতার কথা)।

সময় স্রোত ও ইতিহাস নামক অনন্ত গতিশীল প্রতুল শোভাযাত্রার ভেতরের মিলটা কোথায়। দুই-ই অবিনশ্বরতার হিরন্ময় উৎপাদন। সাম্প্রতিক সময়ের সুস্পষ্ট নানা ঘটনা ও সংগঠনে কালের বিচিত্র জ্যামিতিকে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন মনে হলেও যখন অতীতের, সুদূর অতীতের ধবল মিনারে আরোহী হওয়া যায় তখন ঘটনা ও ঘটমান মুহূর্তটি একাকার হয়ে যায়। দুইয়ের মিলে এক বিমূর্ত সংগুপ্ত উর্বর ও উজ্জ্বল প্রবাহ দুশো চারশো পাঁচশো কিংবা সহস্র বছর আগে যা ঘটেছে সেই ঘটনার রোমন্থনের অনুষঙ্গ ঘটনার কাল। এবং সেই ঘটনার কাল উচ্চারণের অবশ্য অনুষঙ্গ সেই ঘটনাটি। চরম সত্যান্বেষী হলে এই পর্যন্তও বলা যায় যে ঘটনার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ যে ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে লোকশ্রুত। ঘটনা হচ্ছে অজস্র ক্ষুদ্র ক্রিয়া পরম্পরায় উত্থিত এক মহাতরঙ্গ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়াসমূহের অবস্থান মহামানব জাতির ইচ্ছায় এবং সেই ইচ্ছা প্রতিটি মুহূর্তের সমান্তরালে বিকশিত। অপর কথায় মুহূর্তেই ক্রিয়ার ক্ষণপ্রভা, ক্রিয়াই মুহূর্তের ক্ষণপ্রভা। টলস্টয় এই যোগাযোগকে মহাবিশ্বের এক বিধান বলেছেন—

> Why does a war or a revolution come to pass? We do not know—we only know that to bring either result to pass, men from themselve into a certain combination in which all take part ; and we say that this is so because it is unthinkable otherwise ; because it is a law." (War and Peace ; I, Epilogue)

জীবনানন্দকে বলা যায় ইম্প্রেসনিস্ট, সেটা তাঁর রঙের সংবিত লক্ষ করে। আমরা বলতে পারি ইতিহাস ও সময়ের দিকেও ছিল তাঁর এই ব্যক্তি দৃষ্টি ঘটনা ও সময়ের প্রতিভা তাঁর কাছে এক। দুয়ে মিলে জন্ম হয় একটি বিন্দুর। একটি শাশ্বত নির্দেশের—

উর ময় চীন ভারতের গল্প বহিঃপৃথিবীর শীতে হ'য়ে গেছে শেষ ;
জীবনের রূপ আর রক্তের নির্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর কাম আর বিচ্ছেদের ভূমা—মনে হয়—এক তিলের সমান ;
কিন্তু এই চেয়ে থাকা, স্থিতি, রাত্রি, শান্তি—অফুরান।
(আছে)

হাজার বছরের খেলা মানুষকে উপহার দেয় অসংখ্য ধ্বংসের কীট, তবুও যে কীট ধ্বংস করার জন্য রয়েছে ইতিহাসের গভীর শক্তি ও প্রেম, মৃত ম্লান বিচূর্ণতার দেহে যেমন জেগে থাকে বনলতা সেনের মুখ।

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ ;
বালির উপরে জোৎস্না—খেজুর ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মত : এশিরিয়—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেন দেন ;
'মনে আছে?' শুধালো সে—শুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন'।

তিন।। "আমি এই বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর"

বলা হয়ে থাকে আধুনিক কবিতার মর্মমজ্জায় গ্রথিত নগর-চেতনা। সভ্যতার দ্রুতধাবীরথ যে বর্তমানে অধিষ্ঠিত করেছে আমাদের কবিদের সেকালের হৃৎপিণ্ডে স্পন্দমান মহাকায় নগরসমূহ। একজন কবি তাঁর চেতনার স্বর্গে আশ্রয়ী হতে পারেন যে কোনো দর্শন, ধর্ম বা সত্যের ; কিন্তু সময়ের বোধিসত্ত্ব তাঁকে আর ফিরিয়ে দেয় না বহুশত বৎসরের কবি প্রসিদ্ধ নিসর্গ-নিবিড় পল্লীবিতান। কবিতার (masterful images) জন্ম হচ্ছে শহরের বাদামি কুয়াশা জঞ্জালের স্তূপ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের শ্লথপদ মহিলাদের ভীড় থেকে। কবিতা যেন ডিলান টমাসের কুব্জ লোকটি ওয়েলনা অন্তর্গত সোয়ানসীর চিত্তহারী প্রকৃতির বুক থেকে যে চলে গেল কুকুরের কোলাহল ও অন্ধকারময় পার্কের কন্দরে। জীবনানন্দ, যিনি কবিতায়ই নিবেদিত 'কমিটি মিটিং ভেঙে আকাশে তাকালে' যার মনে পড়ে কবিতার সমারোহ। নিরন্তর তিনি স্নাত কবিতার আধুনিক সেইন্সারে। রবীন্দ্র অতিক্রমী আধুনিক স্বভাব তাঁর প্রায় স্বতোৎসারী—আশ্চর্য হয়ে আমরা দেখি তাঁর প্রাকৃত স্বভাব, বিজয়গুপ্তের বঙ্গদেশের ক্রমলীনতা তাঁর অবচেতনায়—'পথের পাঁচালী'র মতো গড়নের তিনি পল্লী বাংলার আর একটি স্নিগ্ধ 'পথের পাঁচালী' কথাবস্তু বলেই তার অবয়ব কাল চিহ্নিত। রূপসী বাংলার মর্মরিত কালাতীত শাশ্বতবঙ্গ। বিজরগুপ্ত কিংবা মুকুন্দরাম যদি পাঁচশ বছরের নিদ্রাভঙ্গে জেগে ওঠেন—'রূপসী বাংলা'র আধুনিক বাক্য বিন্যাস আর অন্বয়ের জটলা ভেদ করে চিনতে পারবেন ধানবনে অস্পষ্ট শাখায় কোকিলের ডাক, 'পাড়াগাঁর মেঠো পথে কাক আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোকিলের শরীরের ধূল', শুক্লাদ্বাদশীর জ্যোৎস্নায় গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে ভেসে যাবে চিরদিনের বেহুলা।

তিনি বাংলা কবিতায় আধুনিক মন্ত্রের অন্যতম উদ্‌গাতা। তিনিই কবিতার ভূগোলকে বিস্তার দিয়েছেন বিশ্বময়। বেবিলন, রোম, নিউ ইয়র্ক, টোকিও, কলকাতা, করাচি বিভিন্ন নয়, একই সম্ভাব্যের দ্যোতক তাঁর কবিতায় অথচ 'রূপসী বাংলা'য় কবিতার ভূগোল খণ্ডিত, একটি নিঃসঙ্গ ফুলের মতো উজ্জ্বল বঙ্গভরা এর সনেটগুচ্ছ। বিশ্ব ইতিহাসের অনায়াস পারাপার যে ধ্যানীর তাঁর এই গ্রন্থের প্রারম্ভ কবিতায়ই শুনি—

চারিদিকে শান্তি বাতি
ভিজে গন্ধ মৃদু কলরব
খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে
চরের খুব কাছে,
পৃথিবীর এইসব গল্প
বেঁচে রবে চিরকাল ;
এশিরিয়া ধূলো আজ বেবিলন
ছাই হয়ে আছে।

সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে যার পদপাত, বোম্বায়ের সমুদ্রজাহাজ দেখে যার শকুন তিনি বাসা নিয়েছেন নিসর্গের হৃদয়ে—মেটাফিজিক্যাল কবিদের দেওয়া নামে আধুনিকরা যাকে ডাকেন 'সব্জীর জগত' বলে। তিনি সন্তুষ্টি পেয়েছেন বাংলার সরল সংসারে—

কোনখানে আকাশের গায়ে রূঢ়
মনুমেন্ট উঠিতেছে জেগে
কোথায় মাস্তুল তুলে আকাশের
ভিড় সব লেগে আছে মেঘে,
জানি নাকো, আমি এই বাংলার
পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর।

বিষ্ণু দে তাঁর সমাজ মনস্কতায় অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছেন গ্রামবাংলার রূপকথা—ছড়ায় লুকানো লোকায়ত জীবনের শিল্পীত মুখ। বাংলার সাথে, পুনরুজ্জীবিত করছেন ছত্রিশগড়ী গান। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের দামিনীতে আরোপ করেছেন রূপক। কিন্তু নগরের সান্ধ্য ভাষা তাঁর হৃদয়ের মর্মমূলে। "বর্তমান চেতনা, যার প্রতীক আধুনিক কালের মহাকায় নগরসমূহ, তা ঐ সমস্ত কবিতায় কখনো অনুপস্থিত নয়" (অশ্রুকুমার শিকদার)। 'পল্লী' উচ্চারণের প্রবলতম অনুষঙ্গ প্রকৃতি। জীবনানন্দই পল্লী আর প্রকৃতিকে ওতপ্রোত ধারণ করলেন কবিতায়। পল্লী প্রকৃতির এমন নিশঙ্ক বলশালী অবস্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হাজার বছরের বাংলা কবিতার প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থেকেও এই সনেটগুচ্ছ পল্লী প্রকৃতির যে নিরবচ্ছিন্ন ও একক চিত্রশাখা বানিয়েছে তাতে জীবনানন্দ বিচ্ছিন্ন দীপের মতো প্রভাময়। চিরস্থায়ী প্রকৃতির আশীষ লাভই জীবনানন্দের জিত, তাই তিনি বঙ্গের আবিষ্কারে অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে'কে পিছনে ফেলে আসতে পারলেন। কদমের ডালে লক্ষ্মীপেঁচার গান, 'সন্ধ্যার যে দাঁড় কাক উড়ে যায় তালবনে মুখে দুটো খড়'। গোলপাতার ছাউনির বুক চুমে উড়ে যাওয়া নীল ধোঁয়া, 'মরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজাপতির পাখার নরম রেণু'—এইসব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ভঙ্গুর দৃশ্যে মোহমগ্ন হতে পেরেছেন যিনি বুঝতে পারি, তিনি সেই সন্ত, আবহমান বাঙলা ও বাঙালির ধ্যান থেকে বিচ্ছিন্ন নন।

যন্ত্রমুখী জগতে কোন মণিময় উৎস পেয়েছিলেন জীবনানন্দ, যার হাত ধরে আলফ্রেড প্রুফক ও রাকেশলোভনদের নগর ছেড়ে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন শাশ্বত বাংলায়। কতিপয় সূত্র যোজনা করার প্রয়াস পাওয়া সম্ভব। এ কথা মনঃস্তত্বের দৌলতে অবিদিত নেই যে বাল্য কৈশোরে মানুষ পরিপার্শ্বের অভিঘাতে যে চিন্ময় ভুবন গড়ে তোলে তাই উত্তর জীবনের খরায় তার অবলম্বন। জীবনানন্দ হিরন্ময় বাল্য-কৈশোর যৌবন এবং স্বপ্নহর বয়সও কাটিয়েছেন নিসর্গ নিবিড় বরিশালে। তাঁর আত্মীয়, সম্প্রতি প্রকাশিত 'জীবনানন্দ কাব্যসম্ভার' সম্পাদক, রণেশ দাশগুপ্ত গ্রন্থটির ভূমিকায় জানিয়েছেন—"শহর হলেও জীবনানন্দ রূপসী বাংলার আঁচল ধরেই যেন বড় হয়ে ওঠেন। নারিকেল আর সুপারি গাছের কুঞ্জ দিয়ে ঘেরা ভিটায় মাছের চোখের মতো ঝকঝকে ছোট একটা পুকুর আর পরিচ্ছন্ন একটি আঙ্গিনাকে নিয়ে আধা শহরে আধা গ্রামীণ ধরনের কয়েকটি ছোট বড়ো ঘর।

এমন একটি ঘরেই জীবনানন্দ দাশের শৈশব, কৈশোর যৌবন এবং সাংসারিক জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছিল।" প্রকৃতিলীন তাঁর বাস্তুভিটার পরিবর্তন হলেও সে প্রকৃতি এখনো সর্বাংশে ম্লান হয়নি। তাঁর কবিতায় বহু উল্লেখিত অদূরের অশ্বত্থ গাছটি এখনও সবুজে উজ্জ্বল। শ্রান্তিহর এই প্রকৃতির আবেষ্টনই যে রূপসী বাংলার জনক এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। ছেলেবেলায় মার কাছে যে তিনি প্রকৃতির পাঠ নিয়েছিলেন এবং পাঠ শুনতেন রামায়ণ-মহাভারতের, পাঁচালীর এমন সাক্ষ্যও তাঁর অগোচর জীবন থেকেও পাওয়া গেছে। কালিদাস ও কৃত্তিবাস বাঙালির চিরকালীন সরোবর অবগাহন যাতে যুগে যুগে বাঙালির চিত্ত চিরদিন রস টেনেছে এই ঐতিহ্যের। দুর্দান্ত সাহেব মাইকেলকেও উদ্বোধিত করেছিলেন কৃত্তিবাস। কবি হৃদয়ই স্পর্শকাতর। স্পর্শকাতর চিত্তে আবহমান ঐতিহ্যের আলোক সম্পাত যে চিরস্থায়ী হয়েছিল, এ কথায় বিশ্বাসী হওয়া চলে। জীবনের সোনালী সঞ্চয় পরবর্তীকালে পাশাপাশি সময়ের পরিসরে একই আবেগের স্বাক্ষরে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে রূপসী বাংলার কবিতাবলী।

একটি কবিতাকে জীবনানন্দ দাশই তাঁর স্মৃতি সম্পদের অভ্রান্ত সাক্ষী হিসেবে রেখে গেছেন। বয়মন্দির প্রেমের অনুষজ্গ ভরাতুর "১৩২৬-এর কতকগুলো দিনের স্মরণে" চিহ্নিত সনেটটি। উল্লেখিত ফুটনোটটি দিয়ে জীবনানন্দ দাশ তার পাঠকদের ভূমিলগ্ন রাখলেন। ১৩২৬-এ কবির বয়স ছিল উনিশ। যৌবনসন্ধির পরম আনন্দলগ্নগুলো উত্তরকালে স্মরিত হয়েছে বেদনা-বিধুর অনুষজ্গে। কবিতাটার প্রথমাংশ 'অশ্বত্থ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী, ছড়ায়েছি খই-ধান বহুদিন উঠানের শালিখের তরে ; সন্ধ্যায় পুকুর থেকে হাঁসটিরে নিয়ে আমি তোমাদের ঘরে গিয়েছি অনকে দিন। দেখেছি ধূপ জ্বালো, ধরো সন্ধ্যাবাতি থোড়ের মতন শাদা ভিজা হাতে—এখুনি আসবে কিনা, রাতি বিনুনি বেঁধেছ তাই—কাঁচপোকা টিপ তুমি কপালের পরে পরেছ তারপর ঘুমায়েছ ... ... পাঠক নিশ্চিন্ত প্রশ্ন করতে পারেন 'নোনার মতন এই নম্র' শরীরের এই কিশোরীটি শুধু স্বপ্নসম্ভব? 'সর্বানন্দ ভবনে'র বয়ঃসন্ধির স্বভাব-লাজুক একটি কিশোরকে কি ১৩২৬-এ আলোড়িত করেছিল কোন অস্ফুট তরুণ আবেগ? কবি যদি রুশো কি রাসেলের মতন একখানা সত্যবদ্ধ আত্মজীবনী রেখে যেতেন তাহলে অবশ্যই উন্মুক্ত হতো অনেক দুর্বোধ্যতার চরণচক্র। উপরি উদ্ধৃত কবিতাটির শেষ লাইনগুলোতে মর্মরিত হয়ে উঠেছে এক অভিমানী হৃদয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ আমি ক্লান্ত চোখে ব্যবহৃত
জীবনের ধূলোর কাঁটায়
চলে গেছি বহুদূরে ;
দ্যাখোনিকো, বুঝিনিকো,
করনিকো মানা ... ...
রূপসী শঙ্খের কৌটো তুমি
যেন প্রাণহীন—পানের বোঁটায়।

লক্ষ করুণ, অবিকল একই বেদনা আর একটি সনেটের শেষে—

তুমি যে কড়ির মালা
দিয়েছিলে—
সে হায় ফিরিয়ে দিয়ে দিতে
যখন এক ছায়া এসেছিল ...
দরজায় করেনি আঘাত।

আর একটি কবিতার শেষাংশে—

তবু সখি, চলে গেলে
দূরে তবু ; হৃদয়ের
গভীর বিশ্বাসের অশ্বত্থের শাখা
ওই দুলিতেছে ... ...
অন্য একটির মাঝখানে—
বহুদিন আগে আমি করেছি
কি ভুল
পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন
গাঢ় রূপসীর মুখ ভালোবেসে ... ...

এমনি আরো বহু উক্তি ছড়ানো সমগ্র গ্রন্থে যা ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতিচারণে বেদনা উন্মথিত। আমাদের কল্পনা করে নিতে ইচ্ছে করে এসব উচ্চারণের অন্তরালে একটি কিশোরীর মুখ। তা'হলেই জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা—যাদের অধিকাংশই অভিমানী কিংবা ব্যর্থ প্রেমিকের নিঃশ্বাসে তপ্ত—আমাদের চেতনা স্বাদুতর হয়। এবং 'সুরঞ্জনা, ঐখানে যেও নাকো তুমি'র মতো উক্তি গভীরতর হয় ব্যঞ্জনায়। এ কথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণে সাতিশয় গুণান্বিত নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শরীরী ও মর্তনিষ্ঠার একমাত্র জীবনানন্দই সর্বাংশে প্রিরাফেলাইটদের সহযাত্রী বিশেযত রূপসী বাংলার মতো বইতে যেখানে চালতা ফুলে শিশিরের শব্দও শ্রুতিগ্রাহ্য। সুতরাং যে কবিতাবলী আবেদনে ও ভঙ্গীতে অ্যাবস্ট্রাক্ট নয় তার অনুপ্রেরণার উৎস মূলত বাস্তব এমন আশ্বাস আমরা হয়তো নিতে পারি।

সম্ভবত পূর্বের উক্তি পরম্পরায় অনুধাবিত হতে পারে যে, রূপসী বাংলায় জীবনানন্দ দাশ বাংলা কাব্যধারা থেকে বিশেষ অর্থে পৃথক একটি স্তবক দিয়েছেন এবং তা তার স্বকীয় কবিধর্ম হতেও ভিন্নতর। তা সত্ত্বেও এ কথা মেনে নিতে হবে যে, একই মনীষার ফসল হিসেবে যে কোনো দুটো শিল্পকর্মে একটি সাধারণ অভিজ্ঞান থেকে যায়। যে কারণে চিনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেওয়া যায় Man and Superman নামক তত্ত্বজিজ্ঞাসু নাটক থেকে প্রমোদ নাটক Beast Duty অবধি একই পরিহাস চতুর ও বিশ্লেষণী বার্নার্ড শ'কে। অনরূপ 'রূপসী বাংলা'ও জীবনানন্দ বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল।

তিনি সেই নিপুণ চিত্রকর, কোনো ক্লাসিক স্থাপত্য স্থাপনের চাইতে ঝর্ণার পুঙ্খানু-পুঙ্খতাই যাঁর দক্ষতা। পর্যবেক্ষণে তার ফাঁক নেই কোনো, তাই অনায়াসে ধারণ করতে পেরেছেন বর্ণনায়েনর ক্ষুদ্রতম ডিটেলস্। মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দন, বিকেলের মেঘে লেগে থাকা শিরীষের ডালপালা, চোরকাঁটা বেঁধা হলুদ রঙের শাড়ি প্রকৃতি ও পৃথিবীর ইতস্তত সকল অবস্থান তিনি ধারণ করেছেন। রূপসী বাংলাও এই লোভন চিত্রধর্মে সজ্জিত। সুসজ্জার সেই মহিমা পাড়াগাঁর প্রতিটি বেতের ঝাড় বইচি ঝোপ, শালিখ, পায়রা আর ক্ষীয়মান স্মৃতিতে শয়ন।

'খড়কুটো' উল্টায়ে ফিরিতেছে দু'একটি বিষণ্ন চড়াই, 'চিল একা নদীর পাশে। জারুল গাছের ডালে বসে বসে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে', 'পুকুরের লাল সর ক্ষীণ ঢেউয়ে বারবার চায় যে জড়াতে কবরীর কচি ডাল'—এইসব এবং আরো অনেক পঙ্‌ক্তির চারু বিন্যাস জানায় দৃষ্টির এই মোহন শায়ক তাঁরই চিরায়ত বঙ্গদেশ যার রক্তস্রোতে স্পন্দমান।

বিনষ্ট সময়ের লোকশ্রুত চিত্রকর তিনি। সঙ্কট সময়কে ধারণ করেছেন তাঁর গহন অনুভবে। সমগ্র রূপসী বাংলায় মৃত্যুম্লানতা তাঁর কবিতায় ওতপ্রোত। গ্রাম বাংলার দু'খানি Testament–ই 'রূপসী বাংলা' ও 'পথের পাঁচালী', চিত্রিত করেছে বাংলার বিষণ্ন করুণ ক্ষয়। জীবনানন্দর ধ্বংসচিত্র অধিকতর গভীর কারণ জানি, তাঁর বোধিবৃত্তে জাগ্রত ছিল মানব সভ্যতার অযুত বছরের সমান্তরালে প্রলম্বিত মৃত্যুর মহাউত্থান (একটি কবিতার সাক্ষ্যই যথেষ্ট—হাজার বছর শুধু খেলা করে)। হতে পারে, 'পথের পাঁচালী'র অপু ও 'রূপসী বাংলা'র কবি নবতর অর্থনৈতিক কাঠামোর অভিঘাতে জীর্ণ গ্রামজীবনের আবহমান প্যাটার্ন খুঁজে পাননি। পক্ষান্তরে পঙ্গু উপনিবেশিক ধনতন্ত্রও এমন কোনো বলিষ্ঠ বিষণ্ন দেয়নি যাতে বিশ্বাস রাখা চলে। তাই নিশ্চিন্দিপুরের অপু ও বরিশালের জীবনানন্দ একই বেদনায় বিধুর। আরো যোগ করা যেতে পারে, প্রবাসী কবির চৈতন্যে হয়তো আপাত উদ্দীপক হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়েছে, হয়েছে বাল্য–কৈশোরের স্বপ্নমন্দির স্মৃতি—যাইহোক কবি জানেন 'তারাবনে পড়ে আছে বিচূর্ণ দেউল বিশুষ্ক পদ্মের দীঘি' 'ভাঙা ঘাটলায় এই আজ আর কেউ এসে চাল ধোয়া হাতে বিনুনি খসায় নাকো, রাজ বল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা।'

বিস্ময়কর এই গ্রন্থ। বিদেশী সাহিত্য ও ঐতিহ্যের স্বচ্ছ রসে যিনি নিষিক্ত কি আশ্চর্য তার রক্তে মুহূর্তে কল্লোলিত হয়ে উঠে উপকথা,যাত্রা, পাঁচালীর লোকায়ত স্মৃতি। চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরামের নরনারী, তাদের আশা—আনন্দ, হৃদয়ের সোনালী উদ্বেগ রেখাকে তিনি একই সংবেদনে ধারণ করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক ইয়ুং বলেছেন 'যৌথ স্মৃতি' সামাজিক অবচেতনার কথা। সমগ্র বাংলার প্রাণ প্রবাহের তলাশ্রয়ী সেই শুক্তিমালা, সেই বিশাল স্মৃতিপুঞ্জ এমন অনায়াসে আত্মস্থ করেছেন তিনি যে এক একটি পঙ্‌ক্তির উচ্চারণের কথা কয়ে উঠে হাজার বছরের ঐতিহ্য।

মেঠো পথে মিশে আছে কাক
আর কোকিলের শরীরের ধুল
কবেকার কোকিলের জানো কি
তা? যখন মুকুন্দরাম ছায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখিতেছিলেন বসে দু-পহরে
সাধের চণ্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা
তার তাঁর বাধা পায়—
থেমে যায়

অথবা,

বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুরের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে ধানক্ষেতে, আম বনে অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল।

লোকস্মৃতি ও বিশ্বাসের এমন সংক্ষিপ্ত দেদীপ্যমান প্রতীক। উপস্থিত বর্তমান সময়ে ইয়েট্‌স্ ছাড়া কারো কাব্যে দুর্লভ।

দেশপ্রেমের কতিপয় প্রদীপ হয় চিন্ময়, উৎসাহে নম্রমৃদু। করুণ মধুর ভালোবাসা দিয়েছেন তিনি বাংলাকে। জানতেন, ধ্বংসের কীর্তিনাশা গ্রাস করে সকল সান্ত্বনা, সকল আরাধনা ব্যর্থ হবে—রাঙা রাজকন্যা আর প্রাণময়ী হবে না। Things Fall apart center cannot hold (Yeats)—সময়ের এই কেন্দ্রহীনতায় তিনিও জাগর রাখতে চেয়েছেন একটি বিশ্বাস। পাঁকের ঢেউয়ের নিচ থেকে তুলে ধরেছেন একটিই অনন্য পদ্ম—রূপসী বাংলা—"জানি সে আমার কাছে আছে আজো—আজো সে আমার কাছে আছে"।*

* প্রবন্ধ তিনটি লেখকের গবেষণা কর্মের অংশ। লেখকের অকাল প্রয়াণের (১৯৪৮-১৯৭২) পর বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'হুমায়ুন কবির রচনাবলী' থেকে গৃহীত। উল্লেখ্য, তিনটি ছত্র নিয়ে যে তিনটি প্রবন্ধ রচিত হয়েছে—তার প্রথমটির নামকরণ নতুনভাবে করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখিদের আমি সবচেয়ে বড়ো ক্যাপিট্যাল মনে করি;

শিল্পী : হাশেম খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের তিন প্রবন্ধ
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

জীবনানন্দ দাশের তিনটি প্রবন্ধ, 'শরৎচন্দ্র', 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' এবং 'নজরুল ইসলাম' তিন ভিন্ন মূল্যায়ন ও সাহিত্যবিচার পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে। 'শরৎচন্দ্র' অনেকটা অবিচ্যুয়ারি বা লেখকের মৃত্যুপরবর্তী মূল্যায়ন শ্রেণীর লেখা—সে লেখায় কড়া সমালোচনা থাকার কথা নয়—বরং যথেষ্ট সহানুভূতি থাকার কথা প্রয়াত সাহিত্যিক সম্পর্কে। এবং জীবনানন্দের কাছে যেহেতু শরৎচন্দ্র ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পর, বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় বৃহৎ স্তম্ভ, সেহেতু ওই লেখায় সহানুভূতির পরিবর্তে এক অনাবিল মুগ্ধতা ফুটে উঠেছে। সেই তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথ নিয়ে লেখাটিতে অনেক সমালোচনা আছে এবং কেন তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সমালোচনা করছেন, তার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়েছে। এটি সেই শ্রেণীর লেখা, যেখানে ম্যাথু আর্নল্ড কথিত টাচস্টোন বা কষ্টিপাথর পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী ও সমকালীন কবিদের সঙ্গে তুলনা করে একজন কবির শক্তি ও দুর্বলতা (প্রধানত দুর্বলতা) সমূহ তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। আর নজরুল ইসলাম সম্পর্কিত নিবন্ধটি, অন্য দুটি নিবন্ধ থেকে যা দীর্ঘতর এবং অনেক বেশি হিসেবী, একটি পরিশীলিত ও চিন্তাশীল কাজ, যদিও সমকালীন কবিতা সম্পর্কে নিজস্ব একটি ধারণা থেকে নজরুলকে তিনি প্রধানত একটি মূল্যবিচারের মানদণ্ডে স্থাপন করেই তাঁর কবিতার বিশ্লেষণ করেছেন। বলেছেন, 'নজরুলের কবিতা চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়'; কিন্তু বলেননি মানোত্তীর্ণ—অথবা মান-বলতে তিনি কী বোঝাচ্ছেন। চমৎকার হয়েও যদি মানোত্তীর্ণ হয় না কোনো কবিতা, তাহলে সেই চমৎকারিত্বের সংজ্ঞা কি, সেই মান-এর সংজ্ঞাই বা কি, তা পরিষ্কার হয় না। আমাদের বুঝতে অবশ্য অসুবিধা হয় না, কোন কোন দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতার জন্য নজরুলের কবিতাকে 'মহৎ' কবিতার মূল্য দিতে নারাজ জীবনানন্দ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা একমত হই তাঁর মতে। কিন্তু বিমূর্ত মূল্যবিচারের পরিভাষা যখন তিনি ব্যবহার করেন—মহৎ, মান ইত্যাদি—তখন ধন্দে পড়তে হয় আমাদের। কবিতাকে একটা মার্গীয় অবস্থানে যাওয়ার জন্য, অথবা কবিতাকে শুধু চমৎকারিত্বের অসম্পূর্ণ অঞ্চল থেকে আরো ওপরে ওঠার জন্য কোনো সর্বজনস্বীকৃত পথ কি আছে, নাকি কবিতার ইসথেটিকস, কবিতার শৈলী, ফর্ম ইত্যাদি ছাড়াও তার সঙ্গে ইতিহাস সমাজতত্ত্ব, কালচেতনা ও জীবনাভিজ্ঞতার যে প্রসঙ্গগুলি অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে যায়, সেগুলোর কিছু শর্তও আরোপিত হয়ে যায় কবিতার বিচারে, এই ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট অভিজ্ঞান বা চিন্তা জীবনানন্দ দাশের এই প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যায় না। তবুও, জীবনানন্দ দাশ যে সমালোচনা পদ্ধতিতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন, যাকে ইনটুইটিভ ফর্মালিস্ট, অথবা প্রজ্ঞাধর্মী কাঠামোবাদী বললে অনেকটাই প্রকৃত বর্ণনা হয়, 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধটি তার একটি যথাযথ প্রতিফলন।

উজী : ৩০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর সম্পাদিত *সমালোচনা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* (ঢাকা : রূপম, ১৯৮৬) গ্রন্থে জানিয়েছেন, "শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (১৯৫৪) 'কবিতা পাঠ : দু'জন কবি' নামে জীবনানন্দ আলোচনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ইসলামকে নিয়ে।" (পৃ. ৮) আর শরৎচন্দ্র প্রবন্ধটি জীবনানন্দ পড়েছিলেন ১৯৩৭ সালে বরিশালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মেলনে।

শরৎচন্দ্র কবি ছিলেন না, তাই জীবনানন্দ দাশ 'কবিতার আলোচনা' প্রবন্ধে যে বলেছিলেন, "কবিতার স্পষ্ট, কুশল, যথাসম্ভব নির্ভয়ে চিন্তনীয় আলোচনা সেই যুগের কবিদেরই করা উচিৎ" (*সমালোচনা সমগ্র*, ১০৪) সে ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত আলোচনায় থাকে না। সমালোচকদের সম্পর্কে জীবনানন্দের ধারণা কখনো খুব উঁচু ছিল না, সমালোচকের একটা তৈরি ভাষায় কিছু নির্দিষ্ট বিষয় নিয়েই আলোচনা করেন এবং গণ্ডীবদ্ধ ও অস্পষ্ট হয়ে পড়েন ক্রমাগত—এরকম একটি ধারণা বরং তাঁর ছিল। কিন্তু 'শরৎচন্দ্র' কোনো বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য সমালোচনা নয়, এটি উঁচুদরের উচ্ছ্বাস প্রকাশমাত্র। তারপরও এটি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, এ লেখায় শরৎসাহিত্যের যেসব উল্লেখযোগ্য দিক তিনি তুলে ধরেছেন, সেগুলো তাঁর নিজের গল্প উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু হিসেবে ঘুরে ফিরে এসেছে। কথাসাহিত্যিক হিসেবে জীবনানন্দের পরিচিতিটা তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনা এবং তাঁর গল্পের আঙ্গিকগত মৌলিকত্ব ও বিষয়বৈচিত্র্য তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের মূল ধারায়—যে ধারায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে স্থাপন করেছিলেন—একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। তাঁর নিজের ভাষা ধার করে বলা যায়, তিনি আধুনিক কথাসাহিত্যের এক বড় স্তম্ভ, তাঁকে আলাদা করে বিবেচনা করতেই হয়। এ প্রসঙ্গে শান্তনু কায়সারের লেখা *গভীর গভীরতর অসুখ : গদ্যসত্তার জীবনানন্দ* (১৯৯৭) কথা উল্লেখ করা যায়। এই বইটি বাংলা কথাসাহিত্যের এক প্রধান লেখককে নিয়ে, কোনো প্রান্তবাসী খণ্ডকালীন গদ্যলেখককে নিয়ে নয়। জীবনানন্দের গদ্য নিয়ে আরো লেখা হবে কিন্তু জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের জগতে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের জগৎ কোনো ছায়া ফেলেছে কিনা, সে সম্পর্কে কিছু ধারণা ও সংক্ষিপ্ত অবিচ্যুতি লেখা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে জীবনানন্দের মূল বক্তব্যগুলি হল, তিনি "বিদেশী গল্পের অনুবাদের ধার ধারেননি," তিনি বাংলার জনজীবনের একান্ত নিজস্ব কিছু চিত্রকে গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন ; তার লেখায় বাংলার "নিতান্ত হেয় অবজ্ঞেয় নর-নারী" নিজেদের সেই রূপটি দেখতে পায়, যেরূপ আগে তারা কখনো দেখেনি, অথবা দেখলেও পরিষ্কার কোনো ধারণায় পৌঁছাতে পারেনি তা থেকে ; তার ফিকশনে প্রেম এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সে প্রেমকে নরনারী "সাংসারিক উপায়ে না পেলেও চিত্রের চমৎকারিত্বের ভিতর" পেয়েছে ; তিনি মানুষকে সমাজের ঘুণে ধরা মাপকাঠি দিয়ে মাপেননি, মেপেছেন বিবেক দিয়ে ; তাঁর লেখায় ইতিহাস নেই, আছে ইতিহাসে অবজ্ঞেয় সাবঅল্টার্ন মানুষজন এবং পরিশেষে, শরৎসাহিত্যে সেই হাস্যরস আছে, যা রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যে আছে, যা তাঁর "ব্যক্তিত্বের দরদে অভিষিক্ত।" জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও একান্ত দেশজ আবহ ও পরিমণ্ডলের কথা আসে, সংবেদনশীলতার প্রসঙ্গ আসে, প্রেমের নিগূঢ় ও গণ্ডীবহির্ভূত প্রকাশের কথা আসে, সময় ও দেশ, মানুষ ও মানুষের অনির্দিষ্ট, অপরিমিত জীবনের উল্লেখ চলে আসে। শরৎচন্দ্র জীবনানন্দের কাছে ছিলেন অনুপ্রেরণার এক উৎস ; কিন্তু তার গদ্যসত্তার, ফিকশন চিন্তার পরোক্ষে শরৎচন্দ্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মাণকুশলতা, মৃত্তিকাঘনিষ্ঠতা এবং সর্বোপরি সামান্য মানুষের অসামান্য জীবনের রূপায়ণ একটি সক্রিয় প্রভাব রেখেছে। জীবনানন্দ অবশ্য একান্ত নিজস্ব একটি স্টাইল নির্মাণ করেছিলেন, তার জীবনদর্শনও ছিল অনেক পৃথক, তবুও যৌবনের শরৎমুগ্ধতা তাকে পরিণত হতে সাহায্য করেছে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, "জীবনানন্দের অভ্যাস ছিলো পূর্বজদের কাব্যসমালোচনা করতেন তিনি সমসাময়িকদের তুলনায়নে।"(১০) এ অভ্যাসটির উপযুক্ত প্রয়োগ তিনি করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে আলোচনায়। কিন্তু 'শরৎচন্দ্র'—এবং অন্যান্য দুয়ের লেখায়—তিনি বিদেশী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের তুলনা টেনেছেন অসংখ্যবার। এক্ষেত্রে ফরাসি সাহিত্যই প্রধান রেফারেন্ট। জীবনানন্দ যে সমালোচনা ধারায় পুরুষ্ট হয়েছেন, তাতে এই তুলনামূলক পদ্ধতিটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ, অনেক সময় মোক্ষম, কারণে এবং অকারণে বিদেশী সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গ টানাটা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এর যথেষ্ট চর্চা করেছেন। কিন্তু ভিন্ন দেশের ভিন্ন সংস্কৃতি ইতিহাস ও সমাজনীতির অধীন একজন লেখকের সঙ্গে এরকম তুলনা স্থাপন একাধিক অর্থেই একটি অপ্রয়োজনীয় চর্চা। ডিকেন্সের পৃথিবী এবং শরৎচন্দ্রের পৃথিবী—দরিদ্র বা শিশুশ্রমের মতো অভিন্ন বিষয় সত্ত্বেও—দুই আলাদা পৃথিবীই। তবুও তুলনা টানা হয় জীবনানন্দ টেনেছেন, কারণ জীবনানন্দ অনুসৃত ফর্মালিস্ট ও ওল্ড নিউ-ক্রিটিক পদ্ধতিতে শিল্পবস্তুর চরিত্রটি ছিল স্বয়ম্ভু দেশ, কাল বা ইতিহাসের অধীনস্থ তা ছিল না। এক্ষেত্রে নির্মাণশৈলী, স্টাইলিস্টিকস্, প্রকাশ কুশলতা, কবিতা বা গল্পের কাঠামো, ফিগারস অফ স্পীচ—এসবই ছিল গৌণ। যে ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেছেন জীবনানন্দ, যার প্রকাশ, বা যায় ওপর নির্ভরশীল চরিত্রের উপস্থিতি, তিনি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে না দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, সেই ইতিহাসের কথাই ধরা যাক। ফর্মালিস্টদের বিবেচনায় এই ইতিহাস বহিঃস্থ শিল্পবস্তু তৈরিতে—এর হয়ে ওঠায়—এই ইতিহাসের কোনো উপস্থিতি নেই। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসও ঘটনা ও কুলপঞ্জি নির্ভর। এই ইতিহাস ডাইনাস্টিক, ক্রমপরম্পরায় প্রবাহিত। কাজেই সাহিত্যে সেটি ব্যবহৃত হলে একটি এলিট আবহে তা বিকশিত হয়। তাতে সাধারণ মানুষজন, শরৎচন্দ্রের পাত্রপাত্রী—উপেক্ষিত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের *পল্লীসমাজ, পথের দাবী, শ্রীকান্ত*—এসবে কি ইতিহাস নেই? এই ইতিহাস নিম্নবর্গীয়দের, তাই 'ইতিহাস' নয়; অর্থাৎ ইতিহাসের মুখ্যতা, গুরুত্ব এবং অমোঘতা এই ইতিহাসে নেই। কিন্তু সাবঅল্টার্নদের ইতিহাস জাতীয়তাবাদী, এলিটনির্ভর ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা এবং কেন্দ্রিকতাকে কাটিয়ে উঠে একটি বিকল্প পাঠ দেয় ইতিহাসের—যে বিকল্পটি জনজীবনের দীর্ঘ জীবনযাপনে একটি নির্বিকল্প পাঠ হয়ে দাঁড়ায়, একটি ইতিহাস-ডিসকোর্সের স্থানে নিজেকে স্থাপন করে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস নেই, যেমন আছে বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথেও; কিন্তু তাঁর সাবঅল্টার্ন ইতিহাস লিখন তাঁকে এক বিকল্প ইতিহাস লেখকের মর্যাদা দিয়েছে। শরৎচন্দ্র ফিকশন লিখেছেন, কিন্তু তাঁর লেখায় ইতিহাস বাঙ্ময় হয়েছে, যে ইতিহাস দারিদ্রের, বঞ্চনার, নারীর অন্তিম সাবঅল্টার্ন অস্তিত্বের।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে জীবনানন্দের উচ্ছ্বাস তীব্র, কিন্তু মূল্যায়নটি সারসমৃদ্ধ। শুধু অসংখ্য ফরাসি লেখকের প্রসঙ্গটি ক্লান্তিকর। বালজাক, স্তাদাঁল, জেরার্দ দ্য নের্ভাল, জোলা, জর্জ সাঁদ—কত নামের সমাহার। শরৎচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিক লেখক নন, এটি বোঝাতে গিয়ে জীবনানন্দ জোলার প্রসঙ্গ টেনে আনেন—অকারণে বলেন, জোলার মতো তো ননই। হঠাৎ জোলা কেন? জোলার বস্তুতন্ত্র উৎপাদন করেছিল যে পশ্চিমা উত্তর—শিল্পযুগের সমাজ, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে কল্পনাপ্রসূত কোনো মিল থাকার তো কথা নয় শরৎচন্দ্রের আধা সামন্তবাদী, আধা মধ্যযুগীয়, কৃষিনির্ভর পল্লীসমাজের। আর শরৎচন্দ্র যদি বস্তুতান্ত্রিক হতেনও, তাকি জোলার বস্তুতন্ত্রের চরিত্রের হতো। একইভাবে নিতান্ত নামসর্বস্ব তুলনা মনে হয়েছে জর্জ সাঁদ এর আদর্শবাদী উপন্যাসের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মানবতাবাদী উপন্যাসের। সাঁদের লেখালেখির তিনটি পর্যায় ছিল। কেবল দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখা, বিশেষ করে *কনসুয়েলা* (১৮৪২) ও *লে মেউনিয়ে দ' অঞ্জিবোত* (১৮৪৫) মানবতাবাদী ধ্যানধারণাপুষ্ট। তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলোকে প্রেমের মুক্ত প্রকাশকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, তাতে শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজপতিরা শুধু নয়, তিনি নিজেও একটা অবস্থান নিতেন এর বিপক্ষে। তবে এর চেয়েও অনাবশ্যক তুলনা তিনি করেছেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এইচ. জি. ওয়েলস-এর। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ভিতর "গভীর ও ব্যাপকভাবে কোনো সমাজ-ও-জাতি-সংগঠনী শক্তির বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য "তিনি দেখতে পান না, এরকম কথা বলার পর লিখেছেন, ওয়েলস ওর গ্রন্থে সেরকমটি তিনি পান। ওয়েলস-এর জাতিগঠন চিন্তাটি তার অনেকগুলি চিন্তার সম্মিলিত ফল, যাতে আছে সমাজতন্ত্র, নারীবাদ, বিবর্তনবাদ, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানবিশ্বাস এবং ইতিহাসচেতনা। ওয়েলস-এর শুরুর দিকের দুটি সমাজতত্ত্বনির্ভর বই, *এ্যান্টিসিপেশনস* (১৯০১) এবং *ম্যানকাইন্ড ইন দ্য মেইকিং* প্রচলিত রক্ষণশীল চিন্তার বিপরীতে প্রগতিবাদী বিবর্তনতত্ত্বের একটি বর্ণনা দেয়, যা তার জাতিগঠনতত্ত্বের অন্যতম মূল ভিত্তি। শরৎচন্দ্রের মানবতাবাদ, সমাজসংস্কার চিন্তা এবং প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি প্রগতিশীল বিবর্তনবাদে নিশ্চয় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতেন না। তার লেখায় অন্তত তার কোনো প্রমাণ নেই। বরং রবীন্দ্রনাথ কথিত depth of intimacy বিষয়টিকে জীবনানন্দ কেন্দ্রীয়ভাবে সক্রিয় হতে দেখেছেন শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে। যদি এটিই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে জাতিগঠনের কঠোর এবং বিবর্তনবাদী (ডারউইনীয় না হলেও, শুধুই পালাবদল ও পরিবর্তন অর্থে হলেও) শর্তগুলি এখানে কিভাবে আরোপ করা যায়? বিশেষ করে ওয়েলস-এর মতো করে?

২

'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' প্রবন্ধে তুলনামূলক তত্ত্বের বেশ প্রয়োগ করেছেন জীবনানন্দ। এ লেখাটি শুরু হয়েছে একটি যথাযথ আক্ষেপ দিয়ে—কবিতার সৎপাঠকের সংখ্যা কেন কম, এবং অসাহিত্য-কুসাহিত্যের পাঠক একদল লোক কেন রয়ে গেছে, এই প্রশ্নটি তাঁকে ভাবায়। দারিদ্র কবিতাপাঠক সৃষ্টির অন্তরায়, একথা মানতে তিনি রাজি নন। এই আক্ষেপটি তাঁর শেষ হয় একটি প্রার্থনা দিয়ে : "বড় সাহিত্য, ভালো সাহিত্য এবং নিজেদের রুচি সম্বন্ধে এরা [অর্থাৎ সাহিত্যের পাঠক] আরো অবহিত হয়ে উঠুক ...।" অতঃপর বড় সাহিত্যের একটা উদাহরণ-নির্ভর টীকা দেন তিনি, "বড় সাহিত্য অবিশ্যি ভালো সাহিত্যের উত্তমর্ণ—মহৎ সাহিত্য ; যেমন মহাভারতের, দান্তের, রবীন্দ্রনাথের, রুশ উপন্যাস পরিমণ্ডলের, শেক্সপিয়রের।" লক্ষ্যণীয় ফরাসি লেখকেরা এই তালিকায় নেই। জীবনানন্দ এ প্রবন্ধে ফরাসিদের উল্লেখ করেননি। এই মহৎ-বড়ো সাহিত্য শ্রেণীকরণের মধ্য দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে তাঁর critique -এর একটি যথার্থতা তিনি তৈরি করেছেন, কারণ পরের বাক্যেই তিনি লিখেছেন, "দেবেন সেন বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা "কোনো অর্থেই বড় সাহিত্য নয়, বিভিন্ন অর্থে হৃদয়গ্রাহী পদ্য।" সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরকম মন্তব্য নির্মম শোনালেও জীবনানন্দ দাশের মূল্যায়ন অনেক ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টাকে প্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে প্রজ্ঞানির্ভর-কাঠামোবাদী সমালোচনা চর্চার কথা এ প্রবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে, তার একটি বড় পরিচয়, কোনো ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে না গিয়ে তা প্রজ্ঞাময় বা intuitive সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, "অনেক দিনের ক্ষয়ে যাওয়া ঘষা মোটা শাদা সত্যগুলোকে তিনি আধুনিক অর্থনৈতিক বা মনোবিকলনী দর্শনের সাহায্যে নতুন মূল্যে নির্ণয় না করে তাদের পুরাতন মূল্য এমনই বড় গলায় প্রচার করে গেছেন যে, সেটা কিশোরকণ্ঠের আওয়াজ বলে ভ্রম হয়।" আরো লিখেছেন, "সত্য কী? সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে কোথাও সে প্রশ্ন তুলতে যাননি।" জীবনানন্দ দাশ সত্যেন্দ্রনাথের সনাতন-দর্শন এবং বিষয়গত পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গটিই প্রধান হয়ে ওঠে। একইভাবে, নজরুল সম্পর্কে তাঁর আপত্তি এই যে, এই কবিতা "বৈদেহী পবিত্রতায় নিজের ধ্রুবলোকে পৌঁছেছে" এমন কথা বলা যায় না, অথচ "সমাজ, স্বদেশ ও নরনারী সম্পর্কে অনেক কিছুই যথাশক্তি স্পষ্টবাদিতায় বলতে চেয়েছে, নজরুলের সেই কাব্য সম্পর্কে কথা-নিরপেক্ষ, প্রায় নির্বিকল্প—সুরবিশুদ্ধতার দাবি অসঙ্গত।" অর্থাৎ ঘুরে ফিরে ইসথেটিকস্ এবং স্টাইলিস্টিকস্ এর কথাটিই এসে যায়। সমাজ ও স্বদেশ নিয়ে বললেও সেগুলো একান্তভাবে per se কবিতার ভালত্ব-মন্দত্ব নিরূপণ করে না ; বরং তা করে কবিতার নির্মাণ বিশিষ্টতা, যাতে প্রতিফলিত হবে সমকালের 'প্রাণবস্তু', *কবিতার কথা* (কলকাতা : সিগনেট, ১৩৬২) গ্রন্থে জীবনানন্দ লেখেন : "আজকের যুগের বিশেষ কতকগুলো লক্ষণ এ কালের কবিতায় থাকে ; দেশকাল সন্ততি ... যে কোনো যুগের প্রাণবস্তু বলে পরিগণিত হবার সুযোগ যে-কাব্যে লাভ করেছে সে-কবিতা আধুনিক" (১১৯)। লক্ষ্যণীয়, *কবিতার কথা*-য় 'প্রাণবস্তু' কথাটার কোনো ব্যাখ্যা জীবনানন্দ দাশ দেন না, এটিও প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞতার অঞ্চল থেকে আসা একটি চিন্তা, এটি বোঝা যাবে চিন্তার সঙ্গে বোধের মিলন ঘটালে। কাজেই সত্যেন্দ্রনাথ যে তাঁর অতুলনীয় ছন্দজ্ঞান সত্ত্বেও বড় কবি হয়ে উঠতে পারেননি, কিশোর কবিই রয়ে গেলেন, তার কারণ তার কবিতা যুগের প্রাণবস্তুকে ধারণ করতে পারেনি। সেই প্রাণবস্তু হচ্ছে যুগাত্মা, zeitgeistকে, এবং তার বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীকে ধরতে পারেনি। আমার এ রকম মনে হয়েছে যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে "ক্ষয়ে যাওয়া শাদা সত্যকে" তুলে ধরেছেন, তা ক্ষয়ে যাওয়া এবং শাদা মনে হয়েছে ও বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীর অনুপস্থিতির জন্যই। সত্যেন্দ্রনাথের একজন metris বা ছন্দকুশলী হিসেবে বর্ণনা করেছেন জীবনানন্দ। তাঁর ছন্দ যে আবহ সৃষ্টি করেছে তা কুড়ি শতকীয় নয়, সমকালীন নয় ; উনিশ বা অষ্টাদশ শতকীয়। কাজেই সত্যগুলোও সেই সময়কালে পিছিয়ে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। তা না হলে মানুষের সমতা "পতিতা ও বিধবাদের যে সর্বনাশ করছে সমাজ, জাতির পাঁতি যে খারাপ" ইত্যাদি, এগুলো ক্ষয়ে যাওয়া সত্য হবে কেন? জীবনানন্দ নিজেও তো এসব বিষয়কে—কোনো কোনোটাকে যাহোক—এনেছেন তাঁর কবিতায়, তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্য প্রকাশভঙ্গীতে, দেখাবার ভিন্নতায়। দেখার ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত ভিন্নতা এসে যায়। ছন্দের বন্ধনে নিবিষ্ট হয়ে গেলে দৃষ্টিসীমাটি সংকীর্ণ হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।

নজরুলের ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত এরকম একটি বিচার এসে যায়। নজরুলও সাম্য, নারীর অধিকার, জাত পাঁত, দারিদ্র, শ্রমের মাহাত্ম—এসব অনেক বিষয় নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন। বস্তুত উত্তর-উপনিবেশী বিবেচনায় নজরুল ছিলেন অনেক বেশি শক্তিশালী (তিরিশের কবিদের কবিতা পড়ে কী জানা যায়, বোঝা যায় এক পরাধীন দেশে এক ঘোরতর পরাধীন পরিবেশে তারা কবিতা লিখছিলেন, যে যখন সতেরো বছরের কিশোর স্বদেশ মুক্তির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের গুলি নিচ্ছে বুকে, তখন তিরিশের কবির যুবক দুপুরে কাঁচা ডিম খেয়ে ঘুমিয়ে এক অনিরাময়যোগ্য নাগরিক পারক্যবোধের বিষয়টি তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরছিল)—তিরিশের কবিদের চাইতেও, কিন্তু তাঁর কবিতার ফর্ম, প্রকাশভঙ্গী, তার কবিতার কলকব্জা আধুনিক ছিল না। বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ প্রায় অভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন নজরুল সম্পর্কে—নজরুলের কবিতা মানোত্তীর্ণ হয়নি, কারণ যে "মননপ্রতিজ্ঞা ও অনুশীলিত সুস্থিরতার প্রয়োজন" নজরুলের তা ছিল না। তবে জীবনানন্দের মূল্যায়ন অনেক বেশি সংবেদনশীল। ব্যক্তি নজরুলের নানান সীমাবদ্ধতা, ইতিহাস ও সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা এবং নজরুলের কবিতার নানা দুর্বলতাকে তিনি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। যেগুলো উল্লেখ করেছেন, আবার তাঁর শক্তি ও সাফল্য সম্পর্কেও অকুণ্ঠ বলেছেন। ফলে একটা ভারসাম্য আছে তাঁর মূল্যায়নে, যা বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নে নেই। বুদ্ধদেব বসু নজরুলের কবিতায় ওই কিশোরকণ্ঠের আওয়াজটা শুনেছেন, কিন্তু ইতিহাসের ও সমাজের প্রতি—বিশেষ করে অনগ্রসর মুসলমান সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতার জন্য কবিতার শুদ্ধ ইসথেটিকস্-কে অনেক সময় তাঁকে যে বিসর্জন দিতে হয়েছে, একথাটি ভাবেননি। তিরিশের আধুনিকতাটি অনেক ক্ষেত্রে এডওয়ার্ড সাঈদ কথিত প্রাচ্যবাদী মানসিকতার পর্যায়েই যে পড়ে গিয়েছিল, তিরিশের কবিরা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। সাঈদ বলেছেন (বস্তুত একটি পরিচিত চিন্তাকে নতুন তত্ত্বের একটি আবরণ দিয়েছেন তিনি), প্রাচ্যকে পশ্চিম নিজের আদলেই গড়ে নেয়। প্রাচ্যের আধুনিকতার চিন্তাটিও পশ্চিম-উদ্ভূত। আধুনিক কবিতার সংজ্ঞার অনেক উপাদানও পশ্চিম থেকে আসা। সেজন্য, ভয়ানক পরাধীনতার আমলে এলিয়টিও নৈর্ব্যক্তিকতায়, খণ্ডিত চিত্রকল্পে, ইন্টেরিওর মনোলগে, ব্যঞ্জনাধর্মী ব্যাখ্যা/বর্ণনায় কোলকাতার রাস্তায় উটের সারি আর ক্যাকটাস আর নির্জনতা প্রার্থনা/পারক্যবোধ/বিচ্ছিন্নতার বর্ণনা আধুনিকতার সংজ্ঞাসহ হলেও জাত-পাঁত নিয়ে লেখা, উপনিবেশ বিরোধী অনুভূতির প্রকাশ ঘটানো অথবা কবিতায় প্রতিবাদের শক্তি ছড়িয়ে দেওয়া আধুনিকতার পর্যায়ে বিবেচিত হয় না। যেহেতু এলিয়ট-পাউন্ডে তা নেই। জীবনানন্দ দাশ শুরুতে নজরুলকে যথেষ্ট অনুকরণ করেছেন, *ঝরা পালক*-এর অনেক কবিতায় নজরুল সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সাড়ম্বরে উপস্থিত। কিন্তু দ্রুত তিনি এক নিজস্ব ভাষা, নিসর্গ এবং ভূগোল নির্মাণ করেছেন, একেবারে দেশজ আবহে অসাধারণ—নানাভাবের, মিস্টিক্যাল চিন্তা ও প্রখর মননশীলতা, পরাবাস্তব ও প্রকৃতিচিন্তা, সমকালীন জীবনবোধ এবং ইতিহাস ও কাল-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর পক্ষে নজরুলের স্বকীয়তা চিহ্নিত করা তাই কঠিন হয়নি।

নজরুল সম্পর্কে জীবনানন্দ অকপট বলেছেন, একই বয়সী ছিলেন তাঁরা, যদিও এ বিষয়টি জীবনানন্দের চিন্তায় কোনো রেখাপাত করেছে কিনা, তা স্পষ্ট নয় তাঁর প্রবন্ধে। কিন্তু একই সময়ে তাঁরা যে বেড়ে উঠছিলেন, তাতে জীবনানন্দের পক্ষে নজরুলের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে পা রাখার বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হয়েছে। জীবনানন্দ কুড়ির দশকের শুরুর বছরগুলোকে তাঁদের 'সময়রূপের' সমাপ্তিকাল বলে চিহ্নিত করেছেন এবং একই সঙ্গে নতুন একটি সময়পর্ব 'ইতিহাসোথ' কয়েকটি কারণে তাকে উদ্বুদ্ধ করছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এই সময়পর্ব বা সময়কাল একদিকে কবিতার পালাবদলের সময়। রবীন্দ্রযুগের পরিসমাপ্তি এবং 'আধুনিক' যুগের (যাকে কিছু পরে 'কল্লোলের যুগ' বলেও নির্দিষ্ট করেছেন সাহিত্য ইতিহাসবেত্তারা)। "নিভে যাবার আগে বাংলার সমপর্যায় তখন বিশেষভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল বলে" নজরুল, জীবনানন্দের ভাষায় লিখনে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। ওই পালাবদলের, ক্রান্তিকালের, মোড় ফেরার সময়টা নিশ্চয় ছিল আলোড়নের এবং তখন যারা লিখতে বসেছেন, তাদেরকে নিশ্চয় প্রখর মননশীলতা আর সুস্থিরতা প্রয়োজন ছিল। মননশীলতা—কারণ, রোমান্টিকতা, আবেগধর্মিতা এবং নানা প্রথা-প্রচলের নিগড় থেকে কবিতাকে বুদ্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে, জীবনানুভূতি দিয়ে শানিত করার জন্য মননশীলতার একান্ত প্রয়োজন। আবার সুস্থিরতাও, কেননা কবিতা আবেগ নয়, স্থিতধী চিন্তার, রিফ্লেকশনের, পরীক্ষা-নিরীক্ষার, পঠন-পাঠনের। নজরুলের মধ্যে এদুয়ের অভাব ছিল, সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু জীবনানন্দের কাছে তার সমকালীন 'সময়পর্ব'কে কবিতার পালাবদলজনিত কারণেই শুধু অস্থির/উদ্বেল বলে বিবেচনা করেছেন, সমাজের রাজনীতির পালাবদলকে তিনি গণ্য করেননি। লক্ষ্যণীয় নজরুলের *অগ্নিবীণা* যে নিষিদ্ধ হল, তিনি কারাবাস করলেন, তাঁর বিদ্রোহ (শুধু এক জায়গায় নিরপেক্ষভাবে জীবনানন্দ লিখেছেন, তাঁকে ওই সময় 'বিদ্রোহী' কবি বলা হত) তাকে মানুষের আশা-ভরসার ভারকেন্দ্রে নিয়ে গেল—অর্থাৎ নজরুলের উপনিবেশ-বিরোধী, চূড়ান্তভাবে স্বদেশী আন্দোলনের কারণে সৃষ্ট আলোড়ন ও অস্থিরতাকে (এবং সার্বিক অর্থে ওই সময়কালের আলোড়ন অস্থিরতাকে) জীবনানন্দ এড়িয়ে গেছেন। অথচ মানুষ যে নজরুলের কবিতা আগ্রহভরে পাঠ করছিল, সেকথা লিখেছেন। জনগণ 'চমৎকার কবিতা চাচ্ছিল' যদিও 'জনগণ তখন আজকের মতো ঈষৎ উন্নীত—কিংবা রূপান্তরিত?—ছিল না," একথা বলেছেন। কিন্তু জনগণ চমৎকার চাচ্ছিল নজরুল থেকে, যেহেতু নিজেদের জীবন, পরাধীনতা, স্বাধীনতার প্রত্যাশা এবং বিশেষ করে মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে—নিজস্ব একটি পরিচিতি ও অস্তিত্ব নির্ণয়ের দাবি এসব প্রসঙ্গ নজরুলের কবিতাতে ছিল। বলাবাহুল্য, এইসব দাবি পূরণ করতে গিয়ে নজরুল একটি ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন এই কারণে—সেসব কবিতা সেই মানে পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছে, যে মান জীবনানন্দ এবং তিরিশের কবিরা সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন—যাকে আধুনিকতার উপাদনপুষ্ট, একই সঙ্গে সমসাময়িক, আন্তর্জাতিক এবং দেশজ বলা যায়। জীবনানন্দ হয়তো এই মানকেই একটা সূচক ধরেছেন, যা উত্তীর্ণ হওয়া না হওয়ার ওপর নির্ভর করে কবিতা ভালো হওয়া না হওয়া। তিনি নজরুলের কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করেছেন, যা প্রকৃত বলেছেন, "নজরুলের কবিতায় অর্থসারল্য আছে, ওজস্‌ও রয়েছে এক হিসেবে, কিন্তু অর্থগভীরতায় এসব কবিতা আধুনিককালের প্রাজ্ঞ আত্মজিজ্ঞাসু মনকে ক্বচিৎ তৃপ্ত করে।" কিন্তু একই সঙ্গে তিনি যখন বলেন, "কোটি মানুষের আত্মোপকার [উপকার?] প্রতিভাই তাকে নির্মাতার উপরের ভূমিকায় ওঠাতে সাহায্য করে, কবিতাকে তার অন্তিম সঙ্গতির পথে নিয়ে যায়। এই স্বভাবে সৃষ্ট কবিতা ব্যাপ্ত ও গভীর হয়ে উঠতে পারে। নজরুলের প্রথম ও শেষ কবিতা এরই অভাবে একই সূচনায় বিচ্ছিন্ন হয়ে এতদূর স্থান হারিয়ে ফেলেছে," তখন তাঁর বক্তব্যটি খুব প্রাঞ্জল হয় না, 'কোটি মানুষের আত্মোপকার প্রতিভা' বলতে তিনি কি বোঝান? আধুনিক বাংলা কবিতায়, তাঁর নিজের কবিতায় কি এই রকম একটি জিনিস ছিল?

তবুও, নজরুলের কবিতা নিয়ে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে যারা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সংবেদনশীল, প্রাজ্ঞ এবং নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ করেছেন জীবনানন্দ। এজন্য এ প্রবন্ধটি পাঠকের চিন্তার অজস্র খোরাক দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের কবিতা : পটভূমির
সিদ্দিকা মাহমুদা

পটভূমির ভিতরে গিয়ে কবে তোমায় দেখেছিলাম আমি
দশ-পনের বছর আগে ; সময় তখন তোমার চুলে কালো
মেঘের ভিতর লুকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ জ্বালালো
তোমার নিশিত নারীমুখের :—জানো তো অন্তর্যামী।
তোমার মুখ : চারিদিকে অন্ধকারে জলের কোলাহল,
কোথাও কোনো বেলাভূমির নিয়ন্তা নেই,—গভীর বাতাসে
তবুও সব রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিক ফিরে আসে ;

তারা যুবা, তারা মৃত ; মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল।
সময় কোথাও নিবারিত হয় না, তবু, তোমার মুখের পথে
আজো তাকে থামিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছ, নারি,—
হয়তো ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারি
নিদর্শনের সূর্যবলয় আজকের এই অন্ধ জগতে।
চারিদিকে অলীক সাগর—জ্যাসন ওডিসিয়ুস ফিনিশিয়
সার্থবাহের অধীর আলো,—ধর্মাশোকের নিজের তো নয়, আপতিত কাল
আমরা আজো বহন ক'রে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
লুটে তোমার চোখের বিষাদ ভর্ৎসনা...প্রেম নিভিয়ে দিলাম, প্রিয়।

(পটভূমির : বেলা অবেলা কালবেলা)

পটভূমির ভেতরে গিয়ে দশ-পনের বছর আগে কবি দেখেছিলেন তাকে। এই পটভূমি বহির্বাস্তবতার। বহির্বাস্তবের ভেতরমূলে অন্তর্বাস্তবে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। দেখেছিলেন একটি নারীমুখ। তার কালো চুলে লুকিয়ে থাকা সময় জ্বালিয়ে দিয়েছিল বিদ্যুৎ। মহাবিশ্বলোকের ইশারা থেকে উদ্ভূত এবং জীবনানন্দের কাব্যে অপরিহার্য সংগতিসাধক সত্যের মতো বিদ্যমান এই সময়। স্মৃতির সেই উদ্ভাসনে কার মুখ দেখেছিলেন কবি? পরবর্তী কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিয়ে এসেছে অন্ধকারে জলের কল্লোলধ্বনি এবং ক্লান্ত নাবিকের প্রত্যাবর্তন সংবাদ। সুতরাং এই মুখ বনলতা সেনের। হিসেবেও তাই দাঁড়ায়। 'বনলতা সেন' নামের কবিতাটি আশ্বিন, ১৩৪২/১৯৩৫-এর 'কবিতা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এই পর্বের কবিতা থেকে মোটামুটি এক দশক আগে। তবে নাটোরে হলেও বনলতা সেন বিশেষ কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীর মুখ নয়, কবিহৃদয়ের সৃজন প্রতিভার সঙ্গে একাত্ম প্রেরণাদাত্রী সেই মুখচ্ছবি কবিহৃদয়ে প্রোথিত ছিল আরও আগের থেকে এবং যেখানে ক্রমান্বয়ে মিশে গেছে সুরঞ্জনা, সুচেতনা, শ্যামলীর মুখ।

কবির বর্ণনানুযায়ী পটভূমির ভেতরে গিয়ে দেখা মুখটি নিশিত, অর্থাৎ ধারালো ; মগ্নচৈতন্যে ভাসমান ধূসর আতার ক্ষীরের মত নয়, তীক্ষ্ণ, সন্দীপ্ত অর্থাৎ যে-মুখ চেতনার উদ্বোধক—যে মুখ শ্রাবস্তীর কারুকার্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এরপর কবি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন সেই প্রাচীন নৌযাত্রার যুগে যখন নারীমুখের আকর্ষণে ছুটে গিয়েছে রণতরী, কত যুবক মৃত্যুবরণ করেছে যে-মৃত্যু সহজাগত ছিল না, তার পশ্চাতে ছিল শ্রমস্বীকার, বেদনা ও যন্ত্রণার অলিখিত অধ্যায়। কবিতার প্রথম আট লাইনে ইতিহাস-পুরাণবোধসম্পন্ন কবি এভাব অতীতের প্রচ্ছদে খুঁজেছেন সেই মুখ। স্বাভাবিকভাবে পাঠক প্রশ্নবিদ্ধ হয়—এই মুখ কি তবে গ্রীক পুরাণের হেলেনের মতো কোনো মোহিনী সুন্দরীর যাকে পাওয়ার জন্য দীর্ঘ দশ বছর অপেক্ষারত ছিল যুদ্ধজাহাজ ? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'বনলতা সেন' গ্রন্থভুক্ত 'শ্যামলী' শীর্ষনামের কবিতায় এমনিভাবে মধ্যযুগীয় যুবকেরা দ্রাক্ষা-দুধ-ময়ূরশয্যার প্রলোভন ত্যাগ করে রূঢ় রৌদ্রে অকূল সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়েছিল স্বর্ণ আহরণের জন্য যে ধাতু মহিলার প্রতিভায় উজ্জ্বলতাপ্রাপ্ত হয়। সেখানেও শ্যামলীর মুখে কবি দেখেছিলেন সেই শক্তির উদ্ভাস যা যুবাদলকে প্রাণিত করে অনির্দেশ্য যাত্রায়।

নবম পঙ্‌ক্তিতে পুনরায় সময়প্রবাহের সঞ্চরণ। যে-সময় কোথাও থেমে থাকে না এই 'নারি' তা থামিয়ে একা দণ্ডায়মান। তার অর্থ কি এই নয় যে, নারীমুখটি একটি বিশেষ সময়ের পর আর কবির দৃষ্টিগোচর হয়নি ? তবে কি সে তাঁর মৃত কোনো নায়িকা ? অথবা তা পরিণত হয়েছে আর্কেটাইপে ? এবার কবি ফিরে এসেছেন বর্তমানে—সমাগত কালবেলায়। তাঁর কণ্ঠ থেকে ক্ষরিত হয়েছে বিষাদ—'হয়ত ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম' ; অর্থাৎ আজ আমরা আর মানুষ নেই। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা হারিয়েছি মনুষ্যত্ব । সেই বেলা বাড়ার চিহ্ন ধারণ করে আছে এই অন্ধ জগতের সূর্যবলয়। লক্ষণীয় 'আমি' থেকে 'আমরা'-য় উত্তীর্ণ কবি। কেবল নিজের ভেতরে অবচেতনের জলস্রোতে নিমগ্ন নন, বহুজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনি। ত্রয়োদশ পঙ্‌ক্তিতে আকাশ ও মৃত্তিকার বিপরীতে আবার এসেছে সমুদ্র-প্রসঙ্গ। এই সমুদ্র অশ্রান্ত কল্লোল বা দিকচিহ্নহীনতার কথা শোনায়নি। তার অলীকত্বের কথা শুনিয়েছে। কিন্তু সাগর কি অলীক হতে পারে ? 'অলীক' শব্দটির মাধ্যমে কবি মূলত চারদিকের অসততা-মিথ্যাচারের কথা বলেছেন। অন্যায়-অসত্য-মিথ্যাপূর্ণ এই সমুদ্রে জ্বলছে জেসন, অডিসিউস,ফিনিশিয় নাবিকের অধীর আলো। গ্রীক বীর জেসন সমুদ্রচারী হয়েছিল সোনালি পশমের সন্ধানে, অডিসিউসের সামনে ছিল স্ত্রী পেনেলোপির মুখ, সুদূর ফিনল্যান্ড থেকে বাণিজ্যযাত্রা করেছিল নাবিকদল। চলার পথের সহস্র প্রলোভন ও মৃত্যু উপেক্ষা করে লক্ষ্যে পৌছানোর সাধনায় অবিচল ছিল তারা। 'অধীর' শব্দটি সেই আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা নির্দেশক। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কবিতাটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"১৬ লাইনের এই তাৎপর্যময় প্রথম পর্বের মূল পাঠ ছিল 'বিরাট অন্বেষণের দিবস'।" কিন্তু অন্বেষা যত আন্তরিক এবং গভীরই হোক এই অভিযাত্রিকেরা বিদেশী। ধর্মাশোকের নিজের আলো জ্বলেনি অথচ এই আপতিত সময়ের দায়ভার সবাইকে বহন করে যেতে হচ্ছে। জ্ঞান-মানবিকতা-শিল্প-সভ্যতায় প্রাগ্রসর অশোক যুগের ভারতবর্ষের বিপরীতে অন্ধকারলাঞ্ছিত সমকালকে উপস্থাপিত করেছেন কবি। পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে কঠিন সমুদ্রে প্রবাল লুণ্ঠনের বার্তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যায়নীতিহীন প্রবল অর্থগৃধ্নুতার দুঃসময় এখন। তাই কোনো দারুচিনি দ্বীপের অনুষঙ্গ নয়, আসেনি পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে তাকানোর কথা বরং কবিতার শেষে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অন্তর্লগ্ন কবির বেদনার্ত সংলাপ—'তোমার চোখের বিষাদ ভর্ৎসনা ... প্রেম নিভিয়ে দিলাম, প্রিয়।' বিষাদ সহমর্মিতার, ভর্ৎসনায় ছিল প্রেরণার বীজ ; প্রেম? সে তো মৌল উৎস। কিন্তু সবকিছুকেই নির্বাপিত করতে হচ্ছে কবির। যোল পঙ্ক্তির কবিতাটিতে ভাবের উত্থান-পতনবহ দুটি অষ্টক। 'নারি' এবং 'তারি'-র বানান-সামীপ্য এর আগেও কবি রক্ষা করেছেন। কিন্তু শেষ বাক্যটির মাঝখানে ডট চিহ্ন কেন? আরও কি কিছু ছিল সেই চোখে? কি ছিল? সে ভাবনার ভার কি কবি ছেড়ে দিলেন পাঠকের হাতে? নাকি গভীর বেদনায় কণ্ঠ বুজে এলো তাঁর? কোনও রকমে কবিতা শেষ করলেন তিনি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কবিতার নামভেদ-পাঠভেদের কথা বলেছেন :

> এই কবিতা, অশোকানন্দ দাশের কাছে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির অন্তঃসাক্ষ্য সমর্থন করে বলা যায়, প্রভূত সংশোধন ও পাঠভেদের ফল। ঐ পাণ্ডুলিপির দশনম্বর কবিতা এটি, নাম : 'আকাশলেখাকে'। ঐ 'আকাশলেখা'ও ক্রমে এই সব নামের পরম্পরা পার হয়ে এসেছে : 'পত্রলেখা', 'আলোকলেখা', 'জ্যোৎস্নালেখা', 'চিত্রাসেনী' এবং উপান্ত্য মুঘল নাম 'জাহান্-আরা'। সাময়িকীতে প্রকাশকাল প্রথম লাইনের শুরুতে সম্ভবত ছিল 'স্বাতী তারা' ('পটভূমির ভিতরে গিয়ে'র জায়গায়) এবং প্রান্তবর্তী 'আমি'র প্রাক্-শব্দ ছিল 'কলকাতাতে'।

'স্বাতীতারা' শিরোনামের কবিতাটি আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র'-এর 'অগ্রন্থিত কবিতা' অংশে পাওয়া যায়। শারদীয় ১৩৫৬ অর্থাৎ ১৯৪৯-এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তা প্রকাশিত হয়েছিল। কবি যেন কোনোভাবেই প্রেরণার আধার হিসেবে হৃদয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে মুদ্রিত সেই নিশিত নারীমুখটিকে প্রতিস্থাপিত করতে পারছিলেন না। তাই বারবার তাঁকে অনুভবের সপক্ষে শব্দ খুঁজতে হচ্ছিল। কিন্তু 'নিশিত' শব্দটি সেই চাবিকাঠি যা নিছক কোনো রূপসীর পরিবর্তে এক প্রজ্ঞাময় নারীর দিকে কবির ভাবনা নির্দেশিত করে। লক্ষণীয়, উপর্যুক্ত সংস্কৃতগন্ধী বা সেমেটিক নামসমূহ বিশেষভাবে সৌন্দর্যজ্ঞাপক নয়, এক ধরনের স্মৃতিশায়ী দূরবর্তিতা, রহস্য ও লাবণ্য সঞ্চারক মাত্র। মুঘল সম্রাটদুহিতা 'জাহান্-আরা' নামটিও নারীর মননশীলতার কথা স্মরণগোচর করে। আবার বৌদ্ধমতে প্রজ্ঞাপারমিতা জ্ঞানের দেবীবিশেষ। যে সমুদ্র-অভিযান, যুবকদলের পরিশ্রম ও মৃত্যুর কথা বারবার উঠে এসেছে তা যেন জ্ঞানমার্গের সেই দুরূহ পথ ও প্রযত্নের, সাধ ও সাধনার বার্তাবহ। পূর্ববর্তী 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবির মননমুখিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মতো স্মৃতিশায়ী এই নারীপ্রতিমা কি কবিকে চালিয়ে নিয়েছে সারাজীবন? এগিয়ে দিয়েছে তাঁর সাধনার পথে? আজকের এই অমাচিহ্নিত প্রহরে সেই তীব্র চেতনাই কি কবি নিভিয়ে দিলেন?

১৯৪৫ সালে একটি পত্রে জীবনানন্দ লিখেছিলেন—"ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয় ; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ ক'রে তুলতে সময় লাগে। কোনো কোনো সময় কাঠামোটি, এমন কি প্রায় সম্পূর্ণ কবিতাটিও খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপর—প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট ভাবে—চারদিককার প্রতিবেশচেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায় : পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে। এ রকম অঙ্গাঙ্গি-যোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে।" কিন্তু এ-ধরনের ঐকান্তিক কবিতা তিনি বেশি লিখতে পারেননি, কারণ 'ভাবপ্রতিভা, তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলয়িত ক'রে নেবার অবসর ও শক্তি, এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টির উপযুক্ত প্রভাব কোনো-না-কোনো কারণে কিছু শিথিল হয়ে গিয়েছিল।' কবির এই মানসিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে 'পটভূমির' নামের কবিতাটির নির্মাণ-প্রক্রিয়া, প্রতিবেশচেতনা, ইতিহাস ও সময়-অনুধ্যান এবং পরিবেশের ব্যর্থতাবোধ। বৈরী পরিবেশে কবি তাঁর ভাবপ্রতিভার অপমৃত্যুর কথা শোনালেন। 'কবিতা সম্পর্কে' প্রবন্ধটির শেষেও জীবনানন্দ অনুরূপ পরিপ্রেক্ষিতের কাঠিন্যের কথা উচ্চারণ করেছেন। তবে 'বেলা অবেলা কালবেলা' গ্রন্থের 'একটি কবিতা' পাশাপাশি পাঠ করলে দেখা যায় সময়ের নির্মম আঘাতে আকাশ কালো হতে চাইলেও 'মন সচেতন' কবি সেখানে জ্ঞান, আলো, গান, মহিলাকে ভালোবেসে সকালের ঔজ্জ্বল্য ও প্রাণ আহরণ করেছেন। মহাযুদ্ধোত্তর তমসাচ্ছন্ন প্রহরে কবিহৃদয়ের যন্ত্রণাক্ত ক্ষরণ যেমন প্রথম কবিতার মিতভাষণে নির্গলিত, দ্বিতীয় কবিতাটিতে তা কাটিয়ে ওঠার অভিপ্রায় তেমনি নিবিড়। সময়সমুদ্রে তরঙ্গিত যুগপৎ মন ও মননির্ভর জীবনানন্দকে এভাবে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর অনেকরকম কবিতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক অচেনা রাত্রি : কবির বিভ্রান্তি ও বেদনা

শিহাব সরকার

কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি ; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে ;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হয়ে চলে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে ;

সারা রাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো করে জ্বলে।
কেউ ভুল করে নাকো—ইট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।

একা একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব ;
তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে ;—মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব

আর কিছু দেখেছি কি : একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট ভরা কলকাতা ?
চোখ নিচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক ধুলো খড় ;
চোখ বুজে একপাশে সরে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা

উড়ে গেছে ; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন ; আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

(পথহাঁটা : বনলতা সেন)

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থেই জীবনানন্দের মৌলিক কবিতা-চারিত্র এক ধরনের স্থায়ী রূপ পেয়ে গেছে। 'ঝরা পালক'-এর অনেক/কবিতায় তার পরিষ্কার আভাস ছিলো, যেখানে সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের পরিব্যাপ্ত, শীতল আবহ ভেদ ক'রে জীবনানন্দের অনাস্বাদিত বাকভঙ্গি বেজে উঠেছে মাঝে মাঝে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে আমরা জীবনানন্দকে চিনে ফেলি আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান পুরুষ হিসেবে। 'বনলতা সেন'-এ এসে এ পরিচয় আরো সংহত হলো। কারণ এখানে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'রূপসী বাংলা'র (মৃত্যুর পর (১৯৫৭-তে প্রকাশিত) নিসর্গ-মগ্নতা এবং 'চিত্র রূপময়' ইন্দ্রিয়ঘন আবহ সামান্য ফিকে হয়ে এসেছে, পাঠক ইঙ্গিত পাচ্ছেন ইতিহাস এবং কাল-চেতনার প্রতি কবির প্রবল ঝোঁক বিষয়ে। 'বনলতা সেন' কবির প্রকৃতি লগ্নতা, রোমান্টিক মৃত্যুচিন্তা, স্মৃতি এবং দীর্ঘশ্বাস থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোপুরি মুক্ত নয়, কোনো কোনো কবিতাকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে স্থান দেয়া যেতো এবং মূলত এ বইয়ের কবিতার প্রধান বিষয় প্রেম এবং 'তুলনাহীনা' নারীদের নিয়ে এক আকুল প্রেমিকের অন্তরক্ষরণ। এসব ছাপিয়েও কবির অতীতচারিতা এক মুখ্য বিষয় হিসেবে এখানে উপস্থিত। জীবনানন্দ এ বইয়ে 'প্রেমে'র জন্য বেছে নিয়েছেন সম্পূর্ণ নতুন এক প্রেক্ষিত—ইতিহাস, মানবকীর্তি এবং সভ্যতা। প্রেমের এই ভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং নারীর এই রূপ বাংলা কবিতায় আমরা আগে পাইনি।

'বনলতা সেন'-এ দীর্ঘশ্বাস পীড়িত নারীস্তব ও ভালোবাসার আবহ এবং এর অন্তর্লীন কালমনস্কতার মাঝামাঝি আমাদের প্রায় অলক্ষে জীবনানন্দ কাব্যের আরেকটি বাঁকের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতার এই মোড় কবির নাগরিকতাবোধ। এই নতুন বিষয়টি কবির ইতিহাস এর-কালচেতনার সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর পরবর্তী তিনটি বই-এ আরেক ভিন্ন মেজাজ তৈরি করে। এসবের এক স্পষ্ট ইঙ্গিত ধরে আছে 'বনলতা সেন'-এর শেষ কবিতা 'পথহাঁটা'। শুরু থেকে বইটি পড়তে পড়তে এ কবিতায় পৌঁছে আমরা একটা ধাক্কা খাই, পুরো বই-এর প্রকৃতিলগ্নতা এবং আর্ত প্রেমিকের গভীর উপলব্ধির জায়গায় হঠাৎ 'ইঁট-কংক্রিটের নৈশ কলকাতাকে আমরা মেলাতে পারি না। 'পথহাঁটা' কবিতাটিকে এ জন্য অনেক সময় মনে হয় কবির অসতর্কতায় 'বনলতা সেন'-এ ভুল করে ঢুকে গেছে। আসলে হয়তো তা নয়, জীবনানন্দ সচেতনাভাবেই তাঁর কবিতার পরবর্তী উত্তরণ সম্পর্কে পাঠককে আগাম খবর দেয়ার জন্য 'পথহাঁটা'কে এ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অবশ্য এরকম 'বেমানান' কবিতা 'বনলতা সেন'-এ আছে আরেকটি—'শিকার', 'নগর-সভ্যতার' নির্মমতা যেখানে সৌম্য, সমাহিত প্রকৃতির পটভূমিকে তছনছ করে ফেলে, এখানেও আমরা চমকে উঠি। কিন্তু 'শিকার'-এ পুরোপুরি আছে জীবনানন্দের স্বভাব ... নিসর্গপ্রেম কিছুটা নাটকীয়তাও। দুটো বৈশিষ্ট্যের কোনোটাই 'পথহাঁটা' কবিতায় নেই।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'রূপসী বাংলা'য় দেখা আবহমান পল্লীবাংলার পেলব-স্নিগ্ধ রূপ আমাদের চেতনায় জড়িয়ে থাকে। নাগরিক কোলাহল থেকে যোজন যোজন দূরে গ্রামীণ বাংলার নৈসর্গিক খুঁটিনাটির এক অন্তরঙ্গ, মেদুর জগৎ কবি তুলে আনেন এই দুই বইয়ের কবিতায়। 'পথহাঁটা'র কবিকে আমরা আবিষ্কার করি বিশাল এক নগরীর মাঝখানে। গ্রামীণ প্রকৃতির সজল-সমন চিত্ররূপ এবং অনুষঙ্গাদির জায়গায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চৌদ্দ লাইনের এ কবিতায় ছড়িয়ে আছে নাগরিক জীবনের সবগুলো স্বাভাবিক ইমেজ। কবি রাতে বেড়াতে বেরিয়েছেন—আমরা বুঝে নিই এটা মধ্যরাত, শহর প্রায় জনহীন, কবির কথায় এ সময় ...ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব। চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।' এটা পরিষ্কার যে, জীবিকা অথবা বাস্তব জীবনের অন্য কোনো তাগিদে কবি এমন নগরবাসী। এ জায়গায় তিনি স্বচ্ছন্দ নন। হয়তো এ জন্য পল্লীঘনিষ্ঠ হয়ে থাকার সময় তাঁর চোখে যে মায়াময় ঘোর লেগে ছিলো, তা পুরোপুরি তাঁকে ছেড়ে যায়নি। কবিতার প্রথম দিকে নগর-জীবনের দুঃসহ এলিয়েনেশান এবং অবসাদ তাঁকে গ্রাস করেনি পুরোপুরি। যেন শহরকে ভালোবাসবেন কী না, কবি বুঝতে পারছেন না। কবিতাটি নগর-জীবনের এক টুকরো-চিত্র হলেও, শুরু হয়েছে কবির সহজাত রোমান্টিক বেদনাকে (agony) আশ্রয় ক'রে—'কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা একা শহরের পথ থেকে পথে/ অনেক হেঁটেছি আমি'। এর রেশ ধরেই যেন, ঠিক একই আচ্ছন্নতার ভেতর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন, 'অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে'। তারপর শহরের আসল রূপটি আমরা পেয়ে যাই চতুর্থ পংক্তিতে—"সারা রাত গ্যাস লাইট আপনার কাজ ভুলে ভালো করে জ্বলে।" প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তবকের কোনো এক রহস্যময় তাড়নায় পথচলার অনুভূতি দ্বিতীয় স্তবকের বাস্তবতায় ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে।

জীবনানন্দ 'পথহাঁটা'য় তাঁর ভবিষ্যৎ মালাবদলের ভূমিকা তৈরি করেছেন। পরবর্তী বই 'মহাপৃথিবী' থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর, অর্থাৎ কবিতার বিষয়, যথেষ্টরকম পাল্টে যাবে। 'বনলতা সেন' পর্যন্ত কবিকে বলা যায় এক নিবিড় এবং অন্তরঙ্গ পরিমণ্ডলে স্বেচ্ছাবন্দী, মাঝে মাঝে কালচেতনার হাতছানিতে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তাঁর বাচনভঙ্গি আমাদের কাছে অচেনা মনে হয়—এর পরেও নিভৃতির আমেজটি আমাদের পরিপ্লুত রাখে। 'পথহাঁটা'য় জীবনানন্দ তাঁর পরিচিত আবহ থেকে বেরিয়ে এসে এক ভিন্ন ভুবনে পা রাখলেন। এ কবিতার পর থেকে তিনি কথা বলেন ভিন্ন সুরে, তাঁর কল্পনা ও উপলব্ধির ধরন পাল্টে যায়, বলা যেতে পারে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'রূপসী বাংলা'র কবি জন্মভূমির আবেশ-জাল ছিন্ন করে এক বিশাল পৃথিবীর প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। এখন থেকে আমরা তাঁর কবিতায় পাই ক্রমশ সৃষ্ট হয়ে আসা ইতিহাসচেতনা এবং বিশ্বচিত্র, কালাতীত অধরা নারীদের—এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুচিন্তা। সমসাময়িক পৃথিবীর রূঢ়তা, দুঃস্বপ্ন এবং মানুষের হিংস্র চেহারা দেখে এ সময় থেকে কবি রক্তাক্তও হতে থাকেন। মূলত 'বনলতা সেন' পরবর্তী জীবনানন্দ দাশ বিশ্ব এবং মহাবিশ্বের কবি, যিনি কোনো কোনো মুহূর্তে দর্শনের মানচিত্রও অবলীলায় ঘুরে আসেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'রূপসী বাংলা'র pantheism, যাকে বলা যায় দৃশ্যমান সর্ববস্তুর ঈশ্বরতা, 'সাতটি তারার তিমির' পেরিয়ে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় (মৃত্যুর পর প্রকাশিত) এসে এক অনন্য জীবনানন্দীয় দর্শনে পরিণতি পায়। এ দর্শনে আছে বিস্তর সংশয়, অন্ধকার ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সুদূরের জন্য অবিরাম অনুসন্ধান—এবং এসবের মাঝে মাঝেই আমরা পেয়ে যাই বিশ্বাস এবং আরোগ্যের আভা।

'পথহাঁটা'য় জীবনানন্দের সার্বিক পালাবদলের ইঙ্গিত আছে। নগর-জীবন সম্পর্কে তাঁর বিভ্রান্তি এবং তিক্ততাবোধ নিয়ে ভবিষ্যতে তিনি যেসব কবিতা লিখবেন তার বীজ পোতা হয়ে গেছে এ কবিতায়। কবিতার পুরো অবয়বে তাঁর মনোবিশ্বের ক্রমঃবিবর্তনের চেহারা পাওয়া যায়। আগেই বলেছি, নগর বিষয়ে তাঁর বিবমিষা সংহত হতে সময় লেগেছে। কবিতার শুরুর দিকে তাঁর চোখে ঘোর লেগে আছে, প্রথম তিন স্তবকে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর ইতিহাস-ভাবনা এবং সমাহিত, বিমুগ্ধ সত্তাটির রেশ পাই আমরা, বোঝা যায় নগরে তিনি নতুন। তাঁর চারদিকে ছড়ানো ট্রাম-বাস গ্যাস লাইট, ইঁট-বাড়ি-সাইনবোর্ড, জানালা-কপাট-ছাদ ইত্যাদির কঠিন এক নগর-চিত্র। পল্লী এবং প্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিবেশ ছেড়ে কবি শহরে এসেছেন, তাঁর চেতনা ও কল্পনা জড়িয়ে আছে ফেলে-আসা জীবনের নানা অনুষঙ্গ—তাই তিনি কলকাতার টুকরো টুকরো দৃশ্য দেখে বলেন, "একা একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব ...।" সৌন্দর্য-পিপাসু, মায়াময় তাঁর দৃষ্টি, তাঁর চোখ কঠিন নগরেও সুন্দরকে খুঁজে বেড়ায়। অন্যরা হয়তো দেখে না কিন্তু তিনি ঠিকই, লক্ষ করেন, "তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা/নির্জনে ঘিরেছে এসে ;"। তাঁর সামনে "একরাশ তারা-আর মনুমেন্ট ভরা কলকাতা", আত্মমগ্ন জীবনানন্দ ছাড়া আর কে বলবেন যে, এই দৃশ্যের চেয়ে "সহজ সম্ভব" আর কিছু তিনি কোনোদিন দেখেননি? কিন্তু এই মুগ্ধতা ভেঙে যেতে সময় লাগে না।

চতুর্থ স্তবকের তৃতীয় লাইনে এসে নাগরিক রাত্রির শান্ত পরিমণ্ডলে আমরা হঠাৎ রূঢ়তার আভাস পাই, বুঝতে পারি ইঁট-পাথরের এই সৌম্য প্রশান্তির নিচে জমে রয়েছে ক্লেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ক্লান্তির স্তর। বিভ্রান্ত জীবনানন্দ আর্তস্বরে বলেন, "চোখ নিচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে— বাতাসে অনেক ধুলো খড় ;"। এবং সঙ্গে সঙ্গে কবির কণ্ঠে শুনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য কবিতায় আধুনিকতার যে সংশয়-দীর্ণ, একাকিত্বের সুরটি তুলেছিলেন এলিয়ট, পাউন্ড প্রমুখেরা, ঠিক তারই প্রতিষ্ঠান। মাত্র পাঁচটি শব্দে জীবনানন্দ আমাদের বুঝিয়ে দেন নগর-সভ্যতা মূলত নির্মম ও নিরাত্মা, এর গ্রাস থেকে, দৈহিক অথবা মানসিকভাবে, পালানো ছাড়া সংবেদনশীল মানুষের কোনো পথ নেই—"চোখ বুজে একপাশে সরে যাই—।" কলকাতার যন্ত্রশাসিত এবং রুদ্ধশ্বাস গতির চাপে দুঃসহ জীবনের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর অসহায়ত্ব এবং এসকেপিজমের আর্তধ্বনি আমরা শুনি জীবনানন্দের পরবর্তী আরো বেশ কিছু কবিতায়, 'পথহাঁটা' দিয়ে যার সূচনা।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রবল স্রোতের মুখ খুলে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। অর্থে মাইকেলের মতো তিনিও 'বিদ্রোহী'। কিন্তু তাঁর আধুনিকতা, নিজস্ব ডিকশন বা বাকভঙ্গী বাদে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বইয়ে বিশদভাবে পরিস্ফুটিত হয়নি—অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাব রোমান্টিকতার আড়ালে তা চাপা পড়ে ছিলো। বিশেষ করে 'বনলতা সেন' পর্যন্ত। এ বইয়ে 'পথহাঁটা' একটি ব্যতিক্রম কারণ বইয়ের মূল সুর থেকে তা ভিন্ন। অপর দিকে এ কবিতারও শেষ দুই পংক্তিতে ইতিহাস ও ধূসর অতীতের হাতছানি কবিকে উন্মনা করে তোলে। মধ্যরাত্রির কলকাতায় বাতাসের ধুলো খড় এবং নীরবে-জ্বালা চুরুটের তীব্র গন্ধের ভেতর কবির স্বগতোক্তি, "বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর। কেন যেন ; আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।" জীবনানন্দ ইতিহাস এবং কালচেতনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি। আধুনিক বাংলা কবিতার রাজপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও রোমান্টিক কবিদের ধরনে অতীতচারিতা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতার গঠন প্রক্রিয়ায় ইতিহাসচেতনার যে বিশাল ভূমিকা রয়েছে, তা একান্তই জীবনানন্দীয়, জগৎটি কবির নিজের।

জীবনানন্দের পথচলার মূলে আমরা দেখি রোমান্টিক আর্তি, তার সঙ্গে অস্থিরতা। নির্দিষ্ট কারণ নেই এর। কবির ইতিহাসচেতনায় এই রহস্যময়তা এক ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। তবে নিরন্তর পর্যটনের শেষ আছে—'বনলতা সেন' কবিতায় ভ্রমণ-ক্লান্ত কবি ফিরে আসেন ছায়ানিবিড় মফস্বল নাটোরে, বাসনার অন্তরঙ্গ নারীর কাছে। আর 'পথহাঁটা' কবিতায় বাস্তবক্লিষ্টতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভ্রমণের স্মৃতিতে ভাবাতুর হয়ে পড়েন—তাঁর চেতনা জুড়ে থাকে বেবিলনে একা একা হাঁটার ছবি। এখানে তাঁর যাত্রার ধরন অনেকটা উল্টো। দুঃস্বপ্ন-তাড়িত তাঁর বন্দিদশায় আমরা পেয়ে যাই এক প্রকার মুক্তির ইঙ্গিত।

এর পরেও বলি, নগর-কেন্দ্রিক আধুনিকতায় জীবনানন্দের উত্তরণের নিরিখে এবং তাঁর সার্বিক বিবর্তনের বিচারে 'পথহাঁটা' একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। এ কবিতা থেকে পাঠক বুঝে নিলেন, জীবনানন্দ নগর-বাস্তবতা এবং আরবান এলিয়েনেশনেরও কবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ : সত্তার কল্পকথক

বেগম আকতার কামাল

জীবনানন্দ বোধের রূপকার, তাঁর সৃষ্টিমানস এই বোধকে আহরণ করেছে মানবজ্ঞানের বিচিত্র উৎস-উপকরণ থেকে। জ্ঞান কর্ষণের বৌদ্ধিক প্রণালী আর শিল্পিসত্তার ব্যক্তিক প্রতিন্যাস সম্মিলিতভাবে গড়ে তুলেছে ওই বোধ ; বহুত্ববাদী ভাবকল্পের রূপময়-প্রকাশে তা হয়ে উঠেছে নান্দনিক। এইসব জ্ঞান অনেকান্ত, অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত, আবার পরস্পর-বিরুদ্ধও ; কিন্তু সবই বিন্দুসংহত হয়েছে স্রষ্টার বোধকেন্দ্রে। অধিবিদ্যা, পরাজগৎ, অন্তর্জ্ঞান, সমাজ-ইতিহাস-বিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি মানবজ্ঞান দূরাতীত থেকেই সুবিদিত ও বহুচর্চিত, নিত্যনতুন তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে অস্থির। বস্তু ও চেতনার বিকাশধারায়, অগ্রসর-দৃষ্টির আসঞ্জনে প্রতিনিয়ত বর্ণান্তরিত হচ্ছে অতীতের জ্ঞান, তাই এর কোনো চূড়ান্ত সীমান্ত নেই। অনিশ্চয়তাযুক্ত ও শেষ উত্তরহীন জ্ঞানপ্রতর্ক অবশ্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কিছু অংশে স্থিতিশীল ও নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত, কিন্তু সংবেদনশীল শিল্পীমনের বেলায় তা নয়। শিল্পীর থাকে প্রতিভাসঞ্জাত বিজ্ঞানদৃষ্টি ও 'অন্যরূপী মানস'[১]-বৈশিষ্ট্য, যা জ্ঞানকে করে পরিশুদ্ধ ও রূপশরীরী। নিজের সৃষ্টিকাজের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর কালের ইতিহাসজ্ঞান ও বিজ্ঞানশুদ্ধ দৃষ্টিদীপের আলোকে অন্তর্দীপ্ত করেছেন সত্তাকে।

বোধ অর্থ নিছক অনুভূতিলব্ধ প্রজ্ঞা নয়, অভিজ্ঞতার সারসত্তাও নয়, এর পরিধি জ্ঞানবাচক ও মনস্তত্ত্বের এলাকায় প্রসারিত। এতে আছে ইন্দ্রিয়বীক্ষা, যুক্তি-বুদ্ধির ক্ষমতা, প্রত্যয়-প্রতীতি, মুড-সংবিৎ-কল্পনাশক্তির সুচারু সূক্ষ্মতা, অন্তর্দৃষ্টির উদ্ভাসশক্তি, সর্বোপরি স্মৃতির প্রত্যভিজ্ঞা, [recognition] ইত্যাদি। বোধ অর্জনের পদ্ধতি সহজ বা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তা মানবমস্তিষ্কের দুর্জ্ঞেয়-অন্তর্লীন জটিলতাতাড়িত অন্তহীন ক্রিয়ার ও প্রকাশের যুগ্মক। একে প্রতিমুহূর্তে সক্রিয় রাখা ও অনুভব করাই হচ্ছে বোধ। জীবনানন্দের কবিতায়-কথাসাহিত্যে ছড়িয়ে আছে ওই ক্রিয়া ও অনুভবের অদৃশ্য ইন্দ্রজাল। বিশেষত, তাঁর প্রকরণকৌশলে রয়েছে বোধের গূঢ় ক্রিয়াকলাপ, আন্তরজটিল রহস্যময়তা। বোধক্রিয়া, তজ্জাত উৎস-উপকরণে বীর্যবন্ত হয়েছে তাঁর লেখক-সত্তার স্বকীয়ত্ব।

অনুপুঙ্খ ইন্দ্রিয়সংবেদী দৃষ্টি ও ভিন্নতর পর্যবেক্ষণশক্তিই বোধের মূল শিরা ; জীবনানন্দে এই দেখার শিরাটি অন্তর্বাহী, অন্তশ্চালিতও বটে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ'। পর্যবেক্ষণসঞ্জাত নিবিড় অনুভবকে তিনি জড়ো করেছেন স্মৃতিতে, স্মৃতি তার প্রত্যভিজ্ঞা-ক্ষমতা দিয়ে সেসবকে যুক্ত করেছে নির্জ্ঞানের প্রত্নস্মৃতি আর বহির্জগতের নিসর্গের সঙ্গে। অনুভাবিত এইসব অজ্ঞাত-আচ্ছন্ন-অস্পষ্ট সামূহিক নির্জ্ঞানস্থিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতিপুঞ্জই হয়ে উঠেছে তাঁর রূপবর্ণিল নিসর্গের উপমান। জীবনানন্দ তাঁর নিজস্ব জ্ঞানবৃত্তি দিয়ে নির্জ্ঞানকে উন্মোচন করেছেন বলেই এখানে বোধের গোপন ক্রিয়াশীলতা তীব্র হয়েছে। সর্বাংশে এই বোধ 'সৃষ্টি সম্পর্কে ব্যথিত সমস্যা'য় অন্তর্পীড়িত ; সমকালীন সভ্যতা-সংস্কৃতির কূটত্ব, জ্ঞানজিজ্ঞাসাসঙ্কুল জীবনোৎকণ্ঠা আর মানবসম্পর্কের নানা কৌণিক রূপ নিয়ে তাঁর যে 'সূর্য ও তপতী'র[২] অন্তর্ধ্যান, তা ব্যক্তির নয়—একজন অতৃপ্ত, জীবন-এষণায় ক্লান্ত শিল্পযাত্রীর। শিল্পসৃষ্টির অমোঘ তাড়না, তজ্জনিত অগ্নিদাহ ও দণ্ডভোগের বেদনাই ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যে ; বিশেষত নিভৃতে রচিত সমকালে অপ্রকাশিত উপন্যাসগুলোতে শিল্পীর এইসব অন্তর্বিষয় ও অভিজ্ঞতাই হয়েছে বিন্যাসিত ।

জীবনানন্দ উপনিবেশ-ইতিহাসের সময়ে জন্মপ্রাপ্ত, ব্রাহ্ম মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের উদারনৈতিক হৃদয়বত্তা ও রুচিময়তায় শীলিত, গ্রামবাংলার ঐতিহ্যিক ভিতে ও প্রাকৃত আবেষ্টনীতে লালিত। চৈতন্যগত সূত্রে তিনি বিশ শতকীয় যুদ্ধবিক্ষত অরোমান্টিক সময়-সংক্রান্তিতে নিপতিত। ব্যক্তিজীবনের অস্বচ্ছলতা ও প্রতিষ্ঠাহীনতা, অন্তর্মুখী স্বভাবরূপ, সমকালীন রাজনীতি-সামাজিক আন্দোলন সংস্পর্শ থেকে দূরত্ব তাঁকে করেছে অনুধ্যানী, নির্মোহ অন্তর্জ্ঞানী, বিষাদাত্মক ও গভীরভাবে শিল্পপ্রাণিত। কথাশিল্পী হিসেবে তিনি অন্তঃচারী হয়ে গদ্য-পরিকল্পে নিজ আত্মসামগ্র্যকেই [subjectivity] বিভাজিত করেছেন। উপন্যাসের গল্পশরীরে, মতাদর্শে, চরিত্রকায়ায়, পরিপ্রেক্ষিত চিত্রণে ও জীবনদর্শনে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর অন্তস্বর, স্বভাববৈশিষ্ট্য, এমনকি তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীর নিবিড় জটিলতা। সব উপন্যাসেই জীবন ও সময়পটে রচয়িতার আত্মবিম্ব কোনো-না-কোনোভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কবিস্বভাবী জীবনানন্দের আত্মবর্ণীকরণ-প্রণালীটি স্বতন্ত্র। তিনি উপন্যাসের চরিত্রপ্রতিমায় আরোপ করেছেন নিজের চেতনার অনাবিষ্কৃত পরিসর, তাঁর ইন্দ্রিয়সংবেদনলব্ধ বোধের স্বকীয় রূপবর্ণগন্ধ। জীবনাভিজ্ঞতার মহাকথার চেয়ে তাই সত্তার কল্পকথাই হয়েছে তাঁর আধেয়। ঘটনাবহুল বহির্জগতের ক্রিয়ামঞ্চকে তিনি নিরপেক্ষ দ্রষ্টার মতো প্রত্যক্ষ বা ব্যাখ্যা করেন না, তাতে স্বয়ং অন্তর্প্রবিষ্ট হন। এই স্বয়ং-প্রবেশে মূর্ত হয় শিল্পীর কল্পনাপ্রতিভা, রূপ থেকে রূপান্তরে চলাচলের দৈবক্ষমতা ও আবেগের তীব্র নৈতিকতা। তাই ক্রিয়া নয়—প্রতিক্রিয়ার অনুরণন, ঘটনাবস্তু নয়—অনুধ্যানের কণাতরঙ্গ, আদিমধ্যঅন্ত্যযুক্ত দৃঢ় কাঠামো নয়—উন্মুক্ত, অসমাপ্ত গতিবিভঙ্গ রচনা করাই তাঁর সৃষ্টিক্রিয়ার অভিপ্রেত। সে-অর্থে জীবনানন্দ অন্তর্বৃত রূপশিল্পী, অন্তত উপন্যাসে তিনি হয়েছেন সত্তার কল্পকথক [fictionalist of the self]। এখানে তিনি আত্মসত্তাকে আবৃত করেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রচ্ছদে ; নিজেই এই প্রচ্ছদটিকে আবার বস্তুপরিপার্শ্বে, জাগতিক নিয়মনিগড়ের বদ্ধতায় এবং ব্যর্থতার মধ্যে অবলোকন করেছেন এবং একসময় সত্তাকে দর্পহীন ও অহঙ্কার-পরিত্যাগী করে দিতে চেয়েছেন ঘুম ও মৃত্যুর নির্বাণ পরিকল্প।

কবিতা লেখার সঙ্গে তাঁর ঔপন্যাসিকতার সম্পর্ক দ্বিমুখী বৈপরীত্যময়—একই সঙ্গে পৃথক ও প্রতিসম। কবিতায় তিনি যে বোধতাড়িত, সৃষ্টিবেদনায় অবসাদগ্রস্ত, সভ্যতাদ্বন্দ্বে পীড়িত মননমূর্তি প্রতীকায়িত করেছেন, তার আলম্বন হচ্ছে আলোর নিস্যন্দ সত্ত্বেও চেতনাবলয়ের কৃষ্ণপক্ষ সূর্য, নির্জ্ঞান অন্ধকারের নক্ষত্রলোক ও অবচেতন বাসনামূর্তির চন্দ্রপ্রতিমা। কথনমূলক ও বর্ণনাধর্মী উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে ওইসব কবিতার করণকৌশল চর্চার নেপথ্য জগৎ [অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় কবিতারই খসড়া], বোধ পরিচর্যার ইতিকথা, শিল্পীর অন্তর্জৈবনিকতা, ব্যক্তিরূপে তাঁর ব্যর্থতা ও পরাভব। কাব্যলোকে জীবনানন্দ নৈর্ব্যক্তিক, নাট্যায়িত এবং মননদীপে উজ্জ্বলিত প্রতিভা, কিন্তু উপন্যাসে তাঁর ভূমিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তর্ব্যক্তিময়। শিল্প ও সমাজজিজ্ঞাসার তর্কে ঘূর্ণিত হলেও এর পরিসরে ছড়িয়ে আছে তাঁর ব্যক্তি স্বভাবের প্রসঙ্গ ও প্রতিচ্ছায়া, জঙ্গম সত্তার টুকরো অংশ, তাঁর প্রত্যক্ষণে ও অনুভবে দৃষ্ট-জীবন, শিল্পের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন—বিশেষত শিল্পসৃষ্টির তাড়নাবিদ্ধ ব্যক্তির ট্র্যাজিক প্রতিবেদন। ১৯৩৩-পর্বে সৃষ্ট উপন্যাসে কবিতার প্রভাব ও প্রতিসমতা তুলনামূলকভাবে বেশি, কাব্যব্যঞ্জনার আন্তঃসঞ্চারণ ও সংবেদ সৃষ্টির গোপন ক্রিয়াশীলতার মতো এখানে অভিজ্ঞতা-বোধ বয়নে প্রযুক্ত হয়েছে ভাবরূপের দ্যোতনা ও মানস-উপস্থিতির [virtual presence] সম্মার্গ।

১৯৩৩ ও ১৯৪৮—দুই পর্যায়ে রচিত উপন্যাসগুলোর বিশেষত্ব একরকম নয়—ভাব ও রূপগত ক্ষেত্রে বিচিত্র। ব্যক্তিক বোধপুঞ্জ, প্রত্যক্ষণ, স্বগতকথনরীতি ও টানা বর্ণনাপ্রবাহ থেকে তিনি পরিবর্তিত হয়েছেন ‘দেশকালস্পৃষ্ট আবছায়া’য়[৩]—মানবসমাজের সংবর্তে, চরিত্রসত্তায়, মননপ্রতর্কে। প্রথম দিকে ছিল মুক্ত নিসর্গ ও নিরবয়ব সময়চক্ষু দিয়ে অন্তর্জীবনের পর্যবেক্ষণস্পৃহা, ক্রমে প্রখর হয়েছে বহির্সময় তথা ভগ্ন ও ছায়াচ্ছন্ন খণ্ডকাল, চরিত্রসমূহের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। বয়স্ক অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে তিনি নিরীক্ষণ করেছেন বৃত্ত সময়কে, জীবনযাত্রীদের অস্তিত্বশঙ্কা ও নিরাশ্রয়ের মহাকথাকে। তবে উভয় ক্ষেত্রে নিসর্গই হচ্ছে প্রতিরূপক ; সভ্যতার অমাচ্ছন্ন প্রহরে, সময় অপসৃতির দ্রুততায় জীবন চিহ্নহীন হয়ে পড়লেও ওই নিসর্গ দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায় না ; তাঁর বিষণ্নলোকী সত্তার আদি অদিতিরূপে থাকে অস্তিত্বশীল। ‘কারুবাসনা’ [১৯৩৩] থেকে ‘বাসমতীর উপাখ্যান’ [১৯৪৮] পর্যন্ত তাঁর ওই আদিঅদিতিই হয়ে উঠেছে স্থানকালচ্যুত, সংশয়াপন্ন, সন্ত্রস্ত ও নিরাশ্রয়ী অস্তিত্বের শুশ্রূষাকারী, তাঁর কল্পনাসত্তার জন্মদাত্রী। নানা স্তরে ও নারী নামের প্রতীকী বর্ণমালায় তারই সত্তান্তর ঘটেছে। সত্তাপ্রতিমার এরকম পরিকল্পতত্ত্ব [paradigm] রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নয়—কাব্যশিল্পে রূপময় হয়েছিল কসমিক ব্যঞ্জনার্থে, আত্মপ্রতিমাকে নিসর্গের অসীম পরিসরে সঞ্চারণের লক্ষ্যে। জীবনানন্দের গদ্যকথায় অদিতি-সন্ধিৎসা একটি ভিন্ন মননগত পরিচর্যা ; এটি স্বতন্ত্র সময়চারিত্র্যের অভিঘাতে সামূহিক অস্তিত্বধারা থেকে বিচ্যুত নিরবলম্ব ব্যক্তির বৌদ্ধিক-নান্দনিক সত্তার আদি মাতৃএষণা, যা এক অর্থে ওই সত্তার আত্মবিচ্ছেদ অতিক্রমের মনস্তাত্ত্বিক উৎক্রমণ। জীবনানন্দ এ-পন্থায় ব্যক্তিকে দিয়েছেন স্বপ্নস্পর্শ ও ‘সময়ের দূর অন্তস্তলের’ দিকে গতিময়তার অভিমুখ।

দুই

উপন্যাসগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট ছক, আপাতদৃষ্টিতে তা শিথিল ও পরিকল্পনাহীন। কিন্তু সত্তার কল্পকথা হিসেবে ছকটি বহুস্তরিক, অন্তর্লীন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নকশায় জটিল। পরিবারকেন্দ্রিক পরিসরে কাহিনীকাঠামো গড়ে তুলে তিনি ব্যক্তিকে বা সত্তাকে দিতে চেয়েছেন স্থানকালের বদ্ধতা, এক ধরনের অনুত্তোরণের নিষেধাজ্ঞা। পিতাপুত্র, স্ত্রী-কন্যা পরিবেষ্টিত গৃহতল, বেকার যুবকের মেসজীবন ও কলকাতা-বিচরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—এইসব ছোট-বড় আয়তনে তিনি অস্তিত্ব-সংকটবিদ্ধ ব্যক্তিদের পারস্পরিক ধূসরিম, সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পর্কজট উন্মোচন করেছেন। কিন্তু তা সম্পন্ন হয়েছে ওই সত্তার মনোজগতে, তার ভাবনাবর্তে, কল্পনার ধরনে। জীবনানন্দ বস্তুধর্মী উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ ও জীবনদৃশ্যের অনিবার্য শর্ত পূরণ করেছেন ভাবনালোকে বাষ্পায়িত প্লাজমাতুল্য অস্তিত্ববস্তুকে ব্যবহার করে। অনেক সময় এই নিরবয়ব অস্তিত্ব ত্রিমাত্রিক জগতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্বশীল বা মূর্ত থাকে নি, শিল্পসৃষ্টির ও চেতন-অবচেতন-নির্জ্ঞানের পরিসরে প্রসারিত ও সঞ্চরণশীল হয়েছে। সৃজনমুহূর্তে কোন মন্ময়ানুভূতি কী প্রণালীতে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, রূপকে রূপান্তরে ছড়িয়ে দেয়, কীভাবে বস্তুঅভিজ্ঞতাকে-পরিবেশকে শিল্পের বস্তুতে স্থানান্তরিত করা যায় আর তাতেই স্পন্দিত ও ব্যঞ্জনায়িত হয়ে ওঠে ভাষাজগৎ, কথা ও ইঙ্গিতের দুলর্ভ স্বল্পতার ভিতর দিয়ে কীভাবে ঘটে মানসের সত্তান্তর, সেইসব অত্যদ্ভুত নান্দনিক অভিজ্ঞতা দিয়েই গড়া হয়েছে উপন্যাসের চরিত্র-ভাষা-প্রকরণ। দ্রষ্টাচক্ষু আর সৃষ্টিক্রিয়ার গোপন মস্তিষ্ককেন্দ্রটি প্রায় উপন্যাসে পর্যবসিত হয়েছে বিষয়বস্তুতে। জীবনানন্দ তাঁর প্রবন্ধ-কথায় এই অভিজ্ঞতা ও পন্থাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন :

> সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়—কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল ; এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে, আরও অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত, কোথাও যেন রয়ে যাবে ; এই সবের অপরূপ উদ্‌গীরণের ভিতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়, নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর ; এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয় ... ।[৪]

সৃষ্টিলোকে অন্তর্নিহিত বর্ণঘ্রাণধ্বনিস্বাদ আর সভ্যতার অমেয় রৌদ্রালোকে উদ্‌গীত কিছু চিরায়ত স্থিরবেদনার মুহূর্ত [বেদনাই সভ্যতার অর্জন, আমরা বেদনার সন্তান—এটি জীবনানন্দীয় বীক্ষা] দিয়ে তিনি বর্ণাচ্ছাদিত করেন মানবহৃদয়ের আঘাত-আলোড়ন-অমানবীয় সংঘাতকে, যা অবশ্য ব্যক্তিসম্বন্ধ-পরিবার-সমাজ-ইতিহাস দ্বারা সৃষ্ট। এ-জাতীয় মানসিক অন্তর্দেশই তাঁর উপন্যাসের পরিসর, এসবের স্বকীয় অস্তিত্ব তাঁরই মনোদেশের সঙ্গে সুসঙ্গত। শিল্পের উৎস হিসেবে সৃষ্টিজগৎ এবং সৃজনক্রিয়া হিসেবে মনোলোককে ব্যবহার করে জীবনানন্দ তাঁর বস্তুজগৎকে তথা সমাজ-ইতিহাস-সমকাল চেতনাকে দেন বস্তুপ্রচ্ছদ নয়—সত্তার মুখচ্ছদ। শিল্পসাহিত্যে ধৃত দেশকাল-অভিজ্ঞতার রূপায়ণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও অভিমত ছিল নিজস্ব নন্দনবীক্ষাজাত অর্থাৎ ইমপ্রেশনিস্টিক, অনেকাংশে কাব্যদৃষ্টিযুক্ত। একটি ব্যাখ্যা :

> জীবন ছাড়িয়ে কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা থাকা কি সম্ভব? ... এই জীবনের পদ্ধতি যে-কোনো সমাজ ও সমবায়-পদ্ধতির চেয়ে বড়। এরই ভিতরে মানুষের সমবায়-ব্যবস্থা বার বার ভেঙে যাচ্ছে ও নতুনভাবে গড়ে উঠছে। আমাদের এই গ্রহের জীবনসাক্ষ্যের সবচেয়ে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত মানুষ ; কোনো বিস্ময়কর প্রমত্ততার মুহূর্তেও নিজেকে অন্যরূপ কল্পনা করা তার পক্ষে কঠিন ; তার কল্পনাপ্রতিভার চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানবজীবন সম্পর্কে সব চেয়ে মূল্যবান কথা আবিষ্কার করবার কিম্বা নতুনভাবে প্রচার করবার সুযোগ সে পায়। এই সব সময়ই হচ্ছে কাব্য বা শিল্পসৃষ্টির সময়।[৫]

নতুন চিন্তাশৈলী আর কল্পনাপ্রেরণার চমৎকারিত্ব নিয়ে তাঁর মন্ময় শিল্পবাসনা বর্জন করেছে প্রথাগত বাংলা উপন্যাসের বিষয়জগৎকে। নরনারীর জীবনগল্প আর বহির্দ্বন্দ্ব-অন্তর্দ্বন্দ্বপীড়িত হৃদয়-ছবির প্যাটার্ন বাদ দিয়ে তিনি তাকালেন অন্যতর অনুভূতিদেশের দিকে, মনোসময়ের দর্পণে প্রতিবিম্বিত করলেন বোধের ক্ষণমুহূর্তগুলোর উপজননকে। এর সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন শিল্পসৃষ্টির দিব্য, দুর্লভ ক্ষণকে এবং সেই ক্ষণ হারিয়ে ফেলার অমোঘ নিয়তিকেও। ব্যক্তির বোধলিপি আর শিল্পিসত্তার সংবেদন ও অন্তর্দৃষ্টির আবেদনস্পৃষ্ট ওইসব কথারূপের বিষয় একান্তই ব্যক্তিচেতনার অভিনিবেশে বিমথিত। তাই প্রথানুগ নায়ক নয়—তিনি সৃষ্টি করেছেন একটি প্রতিভূসত্তা। প্রায় সময় সত্তাটি একজন শিল্পীর ; তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বভাবমৌল, পরিপার্শ্বের সঙ্গে আন্তঃদ্বন্দ্ব নিয়েই উপন্যাসের বুনটটি বিগঠিত। অন্যান্য ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় স্ব-স্ব জীবনাদর্শ, আইডিয়া অথবা অভিজ্ঞতার পরিকীর্তন, সেক্ষেত্রে তিনি স্বকীয়তাকেই রূপান্বিত করেন, সময়স্পৃষ্ট আত্ম-অবয়বের পোর্ট্রেট আঁকেন।

'সূর্য ও তপতী'র অনুধ্যানী জীবনানন্দ খুঁজেছেন তাঁর নিজের সৃষ্টিগর্ভকে—অ্যানিমাসত্তাকে। প্রতিটি মানুষের দ্বৈতসত্তার একটি অংশরূপী এই অ্যানিমাসত্তা হচ্ছে নারীপ্রতিমা। সে সৃষ্টিশীলা, উপজনন-উর্বরা, দৈবপ্রতিভায় প্রাকৃতিক—প্রায় আদ্যাশক্তিতুল্য, রূপরচনার করণকৌশলে সুচারু, কিন্তু নিরাশ্রিতা। জীবনানন্দের সমগ্র সৃষ্টিকাজে এই নিরাশ্রয়ী অ্যানিমা হতে চেয়েছে পুরুষার্থ ও মনীষাদীপ্তির সংস্পর্শে রূপাশ্রয়ী। তাঁর বিচিত্র নামের বিষণ্ণ, লাবণ্যময়ী নারীপ্রতিমারা এই অ্যানিমাসত্তারই এক-একটি দ্যোতক। উপন্যাসের গ্রন্থনায় প্রতিমাটির বিন্যাস ঘটেছে দ্বিমুখী যুগ্মতায় ; একদিকে সে সৃষ্টিক্ষম বৃত্তি হিসেবে প্রার্থিতসত্তা [মানুষের সৌন্দর্য ও শিল্প-এষণার অর্থে]—যে কখনো বনলতা, কখনোবা সুরঞ্জনা-বিনতা-বনচ্ছবি—বিভা। এই সত্তার রূপশরীর গড়ে ওঠে রোমান্টিক সৌন্দর্যসত্তার ইমেজে, কল্পনাপ্রবণ পুরুষসত্তার বাসনা-সংরাগে ও কল্পকথা-মিথপ্রতিমা-আর্কটাইপের ছাঁচে ও প্রতিরূপকে। আরেক মাত্রায় চিত্রায়িত নারীটি হচ্ছে বিপরীতধর্মী, না-বাচক মানবী ; সে বস্তুময়ী, মনোহীন, দৈনন্দিনতায় অভ্যাসবদ্ধ, জীবনযাপনে মলিন ও বোধরহিত। এই নারী প্রায়ক্ষেত্রে ওই শিল্পীর স্ত্রী, উপন্যাসে এর নানা নাম—মালতী-কল্যাণী-প্রতিমা-উৎপলা। এই মানবী শিল্পীর সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞ, হৃদয়বৃত্তি ও আবেগবাসনার প্রতি বীতস্পৃহ ; সে প্রত্যাখান করে স্বামীকে, এক অর্থে দৈবিক শিল্পক্রিয়াকে। নিজের অ্যানিমাসত্তাকেই সামাজিক বলয়ে ও দাম্পত্য সম্বন্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে, হৃদয়ের অন্ধতায়-স্থূলতায়, আর্থসংস্কৃতির বিষমপটে তিনি নিরীক্ষণ করেন—ওইসব বোধহীন নারীর অবয়বে। তাঁর আখ্যান সে-অর্থে আত্মসত্তার পরীক্ষণাগার—শিল্পীজৈবনিকতার বীক্ষণ। 'কবিমানসের কাছে সমাজ ও কালের রূপ যেভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভূ-সত্তা'-রূপী এই শিল্পিমানুষ নিজেকেই অবলোকনের বিষয়ে (object) পরিণত করে ; উপন্যাসগুলো আরেক মাত্রায় তাই diversified autobiography[৬]—রূপবিচিত্র আত্মজৈবনিকতা।

তিন

ঔপন্যাসিকরূপে জীবনক্ষেত্র চারণায় জীবনানন্দের অবস্থান ও প্রেক্ষণবিন্দু নিবদ্ধ ছিল জীবনের বৃত্তকেন্দ্রের দিকে নয়—পরিধি জুড়ে। সমাজ-শ্রেণী-ইতিহাস-প্রতিষ্ঠান-পরিবারের কেন্দ্রে তাঁর একটি নিঃশব্দ প্রত্যাঘাত আছে—বৈপ্লবিক সক্রিয়তায় নয়, অন্তর্ঘাতকের বেশে, নিষ্ক্রিয় অসহযোগিতায়, অনীহ দাম্পত্যজীবনাচরণে। 'সৃষ্টির নাড়ির পরে হাত রেখে' তিনি অনুভব করেন মানুষের অন্তর্পীড়া, বিপন্ন-বিষণ্ণতায় অবগাঢ় হন 'অসম্ভব বেদনামিশ্র' সূক্ষ্ম বোধের গহনে। আবার স্যাটায়ার ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে তিনিই দেখেন ওইসব অন্তর্পীড়নগ্রস্ত মানুষের 'অমোঘ আমোদমত্ত' আরেক রূপ, সুবিধাভোগী চেহারা, ভোগলিপ্সা, স্বার্থপরতা। বিপন্নতা আর স্যাটায়ার—দুইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে থাকে বহুরৈখিক ও অনুভূমিক বাস্তবতা—সমাজ-শ্রেণী-ইতিহাসের ভাঙনরেখা, পতনশব্দ, সংবেদনঋদ্ধ বোধতাড়িত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাহীনতা, তার অণুসদৃশ সমাজ অস্তিত্ব, অবশেষে পরাভব ও বিলয়। সবকিছু ঝরে পড়ার রূপবন্ধ হিসেবে বিমূঢ় সৃষ্টির বৈনাশিক প্রাকৃতিকতা তাঁর উপন্যাসের ভাষাকল্পকেও একভাবে করে বিপর্যস্ত। এইসব বহির্বৃত, ব্যাপ্ত বিষয়ভাবনার রূপায়ণে থাকে না ঘটনাক্ষুব্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগৎ বা ব্যক্তি ও সমাজ-ইতিহাসের সংঘর্ষশীল-দ্বন্দ্বরত জীবনভূমি, পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় অন্তর্মুখী ব্যক্তিসত্তার নানাপ্রান্তিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ও বোধকণিকা। উপন্যাসের প্রথাগত ফর্মে তিনি সূচিত করেছেন অনুভূতির কথোপকথন, বর্ণনা ও কাব্যব্যঞ্জনার আন্তর সম্মিলন, উপমা-প্রতীকের ভাষা। সংলাপ-অনুসংলাপ-স্বগতকথনকে ব্যবহার করা হয়েছে স্থানকালঘটনার বিকল্পে। সত্তার আখ্যায়করূপে তাঁর ভূমিকা তাই মন্ময় কথকের, কতকাংশে কবিতাকারের। এই ভূমিকাটি অবশ্য একজন স্বতন্ত্র গদ্যশিল্পীর, একে কখনো বলা যাবে না কবিতার পরিবর্ত বা পরিপূরকতা।

ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রথম পর্বের উপন্যাসের পটভূমি রচনায় নিসর্গ ও অনুভূতির পরস্পরিতা ছিল সুনিবিড়। এই পটে রয়েছে আকাশ, দিগন্ত, প্রান্তর, বৃক্ষলতাবেষ্টিত প্রতিবেশ অর্থাৎ গ্রাম। প্রতিবেশের মধ্যে মানবচরিত্র, নিশ্চেতন অবপ্রাণী ও নিসর্গজগতের অবস্থান আদি পুরাকথার মতোই অন্যোন্যনির্ভর, একে অন্যের পরিপূরক ও পরস্পর-যুক্ত। এসময় তিনি ছিলেন অনেক বেশি রূপবর্ণআলোর রূপচিত্রী—ইমপ্রেশনিস্ট, পল্লীর স্থানবর্ণিমা আর সময়বর্ণের দ্বারা প্রবুদ্ধ। ১৯৪৮-এর দিকে তাঁর দৃষ্টিলোক ও জীবনক্ষেত্র হয়েছে প্রসারিত ও পরিবর্তিত, তিনি হয়ে উঠেছেন অভিজ্ঞতাপুষ্ট, স্থানকালের বিশ্লেষক, ঘটনা-চরিত্র রূপাঙ্কণে এক্সপ্রেশনিস্ট। প্রথমভাগে তাঁর নায়কব্যক্তিটি ছিল উপার্জনহীন, ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ., পিতার আয়ের উপর নির্ভরশীল, এক সন্তানের জনক। পরবর্তী-পর্যায়ে চরিত্রটি অধ্যাপনায় নিযুক্ত অথবা ছোটখাটো চাকরিরত, সংসার প্রতিপালনে পর্যুদস্ত, দু'তিনটি সন্তানের পিতা, সন্তানগুলোও সুনাগরিক হয়নি—কখনো বা তারা পথভ্রান্ত ও অসুস্থ। ফলে, রচনারূপ হয়ে উঠেছে কাব্যব্যঞ্জনার লিরিসিজমের চেয়ে প্রতীকাত্মক ও দ্ব্যর্থক বাক্যবন্ধে তির্যক।

'কারুবাসনা', 'প্রেতিনীর রূপকথা', 'বিভা', 'জীবনপ্রণালী' [১৯৩৩] ইত্যাদি উপন্যাসে গৃহ ও কলকাতার মেসের অভিজ্ঞতা-পরিসরে উপস্থাপিত হয়েছে মনোজীবনের বৃহৎ ও অসীম পরিমণ্ডল, এখানে ঘটনাক্ষুব্ধ দেশকাল প্রচ্ছন্ন, কখনো পশ্চাৎপট মাত্র। 'মাল্যবান', 'সুতীর্থ', 'জলপাইহাটী', 'বাসমতীর উপাখ্যান' [১৯৪৮] প্রভৃতি উপন্যাসের মূল আধেয় হচ্ছে নগর ও মফস্বলের প্রতিবেশ, শিক্ষা-রাজনীতি-সংস্কৃতির চলচ্ছবি ও মানবচরিত্রের বিশ্লেষণ। প্রথম দিকের জীবনানন্দ এথনিক—নিসর্গবেষ্টিত জীবনের প্রার্থী, পরবর্তী-পর্যায়ে নগরসভ্যতা সম্পর্কে আন্তঃজটিল ও প্রশ্নমনস্ক। তবে উভয়ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিন্যাস বিন্দুবদ্ধ হয়েছে দাম্পত্যসম্বন্ধের কেন্দ্রে। তিনি দুই স্তরেই ব্যবহার করেছেন ঘেরায়তনিক পরিমণ্ডল, আত্মচেতনার অভিনিবেশ ও তাঁর অনুধ্যানকে অভিব্যক্ত করার যা-কিছু স্বকীয় ও অব্যর্থ রূপরীতি। তাই একই মোটিফ ও রূপবন্ধ পুনরাবর্তিত হয়েছে, যেমন ঘর, জানালা, গোলদিঘি, ফুটপাথ, স্টিমার যাত্রা, ট্রেন, স্টেশন, একাকী পথহাঁটা ইত্যাদি ; সময়মাত্রা হিসেবে লক্ষণীয় বর্ষা, হেমন্ত-শীত, দুপুর, অপরাহ্ণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাত্রি। চরিত্রের রূপায়ণ-পদ্ধতিতে প্রযুক্ত হয়েছে প্রতীক-সংকেত, যেমন সাপ, কাক, বিড়াল, কীটপতঙ্গ, লতা-পুষ্প। এছাড়াও, ইতিহাস, জীবন ও মনোজগৎ চিত্রণে তাঁর নান্দনিক রূপকল্প হচ্ছে চাঁদ-নক্ষত্র, ছায়া, পাখি, সিগারেট, সংবাদপত্র ইত্যাদি। এগুলোর মনস্তাত্ত্বিক অর্থব্যঞ্জনা যতটা অন্তর্গভীর, ততটাই শিল্পিত প্রচেষ্টা হিসেবে অভিনব—অন্তত উপন্যাসের গদ্যে এই অভিনবত্ব ছিল ওই সময়ের মানবচিন্তায় অপ্রকাশিত, নতুন শব্দরূপের জন্য অপেক্ষমাণ।

নির্মাণরীতিতে দুটি ভিন্ন কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে, এক. চরিত্রসত্তার আন্তর্বৈপরীত্যমূলক অস্তিত্ব, দুই. মানস-উপস্থিতির কুহক। এই শৈল্পিক আয়ুধ দু'টি প্রকটিত করে মনোজীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও তথাকথিত মানব সম্বন্ধের বহুখণ্ডায়ণকে। জীবনানন্দ গভীর অসদ্ভাব গড়ে তোলেন উপনিবেশের ধনবাদী ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত সভ্যতার সঙ্গে ; দুই বা তিনটি চরিত্রের ছকে, তাদের আচরণে, মানসিক বৈপরীত্যের টানাপড়েনে ওই দ্বৈধতা ও অসদ্ভাব স্ফুট হয়, এর ফলে উপন্যাসোচিত ঘটনাবস্তু হয়ে পড়ে অবস্তক ও অন্তর্বৃত। আবার, একটি মূল চরিত্রের মনোলগ, চেতনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে অপর চরিত্রের কথাকে, বিষয়প্রসঙ্গ এমনকি মুডও অনুরঞ্জিত হয় ওই মনোলগের ভাষারূপে। তিনি কথক চরিত্রকে অপর ব্যক্তি বা গল্পাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে দেন নিরাসক্ত জীবনদ্রষ্টার ভূমিকা, কখনো মহাসময়ের ব্যথালীন–নিরীক্ষকের অভিধা। সর্বদাই, বাইরের কাহিনী ও প্রসঙ্গ অন্য কোনো অনুভব–বোধ–বীক্ষাকে অন্তঃস্থিত করে রাখে, যা ঘটছে বা ব্যক্ত হচ্ছে তার অন্তরালে দ্যোতিত হতে থাকে ভিন্ন উচ্চারণ—গল্পের আড়ালে জেগে থাকে ওই নিরীক্ষকের প্রেক্ষণবিন্দুরূপে মহাসময়ের দৃষ্টি—অনিদ্র চৈতন্য। আবার, কোনো আগন্তুক ব্যক্তি দূরপ্রবাসের আবহ নিয়ে কাহিনীমঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান করে, মূল বোধের সঙ্গে বৈপরীত্যবহ হয় বা অন্য বার্তা বহন করে, সত্তাধারী ব্যক্তিবর্গ তাদের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে—বহুবর্ণিল ব্যক্তি মানুষ হয়ে ওঠে না। এইসব আত্মধর্মী [subjective] প্রসঙ্গ ও রচনারূপ থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসের মনোদর্শন—বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব।

মানুষগুলো স্ব–স্ব বোধ দিয়ে জগৎকে অর্থহীন, বিভেদপূর্ণ একটি জীবনমঞ্চ হিসেবে গ্রহণ ও প্রত্যক্ষ করে, তাতে যে–যার ভূমিকায় অভ্যাসবদ্ধ অভিনয় করে যায়। কিন্তু কেউই পূর্ব তাৎপর্যভ্রষ্ট হয়েও বিরোধপূর্ণ জগতের মুখোমুখি দাঁড়ায় না ; অস্তিত্বের বা সমাজের দায়িত্বভারের তীব্রতায় আক্রান্ত হয় না, নিজেকে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সংঘাতবিদ্ধ করে না বা হয়ে–ওঠার সংগ্রামীবোধে ক্রিয়াশীল হয় না। মার্কসীয় শ্রমবিচ্ছিন্নতা ও সত্তাবিচ্ছেদের সূত্র [জীবনানন্দের প্রায় নায়কই কর্মহীন, বেকার, দরিদ্র, সামাজিকভাবে অপ্রতিষ্ঠ] এখানে গভীর বিশ্লেষণের প্রসঙ্গ হলেও তিনি সমস্যাটিকে রূপান্বিত করেছেন মর্মজ্ঞ জীবনরূপকার হিসেবে। সেক্ষেত্রে কাফকা–সদৃশ মনোবাস্তব ও অস্তিত্বশূন্যতার প্রতীকায়ন জীবনানন্দে নির্লক্ষ্য নয়। তিনি সমস্যার প্রতিচ্ছায়া ও ছদ্মবেশী রূপটিকেই বিম্বিত করেন—কাফকার মতোই মনোবাস্তবে ও অস্তিত্বশূন্যতায়। কাফকার ধনবাদী কর্মধ্বস্ত গ্রেগরের অস্তিত্ববিচ্ছিন্নতা ও জান্তবতায় পর্যাবসান আর জীবনানন্দের বেকার, নান্দনিক তাড়নাবিদ্ধ, কর্মহীন ; বিবাহিত ব্যক্তির [কখনো সন্তানের পিতাও] অস্তিত্ব–সমস্যা সমরূপী না হলেও তাৎপর্যসূত্রে একাংশে অভিন্ন। জীবনানন্দের ব্যক্তিটি অনুভূমিক পরিপার্শ্বে বা বৃত্তে চক্রবদ্ধ হয়েও অন্যতর অনুসন্ধিৎসায় মগ্ন থাকে। যদিও সে কাফকার জান্তব–পরিণামের ভয়াবহ শিকারে পর্যবসিত হয় না, কিন্তু কাফকার মতোই তার জন্যও নেই কোনো উত্তরণের জগৎ। নিজেকে পতঙ্গসদৃশ ভাবা ও মৃত্যুকামনার প্রকাশ থাকলেও [উভয়ের পরিকল্পতত্ত্বে রয়েছে মানুষের বিমানবিকতায় রূপান্তরের বাস্তবতা ও আন্তর্চাপ] এই ব্যক্তি গভীর আবেগ ও নির্জ্ঞান–সত্যে সমূহের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেই চেয়েছে। সে অনেক বেশি আন্তর অনুসন্ধিৎসু ও মগ্নচেতন, এরই মনস্তাত্ত্বিক উন্মোচন হচ্ছে অবপ্রাণী—বিশেষত পাখির প্রতীকতায় ব্যক্তির আবেশঘন আত্মরূপান্তরের ঈপ্সা। আদিকথার মতো উপকারী ও আবেগস্পর্শী এই পাখিপ্রতিমা—যে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পথনির্দেশনা দিত, তারই ক্ষুদ্র, স্বাধীন, নির্ভার অস্তিত্বরূপের দিকে তাকিয়ে যেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। তবু, প্রায় উপন্যাসে অস্তিত্বনাশের আদিভীতিবশত অথবা বাহ্যিক অবস্থান থেকে নিজেকে প্রত্যাহারের স্বভাববৈশিষ্ট্য সূত্রে ওই রূপান্তর–অভীপ্সু ব্যক্তি রচনা করে নৈঃসঙ্গ্যের গুহা—সে নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুদ্রাদোষেই আলাদা ও একা। স্বভাবের এই অন্ধ প্রাকৃতিকতা সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন জীবনানন্দ, সমাজ-ধর্ম-ইতিহাস-জ্ঞানতত্ত্ব দিয়ে যার পরিবর্তন ঘটানো বা দুর্জ্ঞেয় রূপটি অনুধাবন করা যায় না। তবে, মানবজ্ঞানের বৌদ্ধিক পরিচর্যাসূত্রে পরিপ্রেক্ষিত যত কঠিন ও আবছায়াময় হয়েছে, ব্যক্তি ততই আত্মস্বরূপকে আবিষ্কার করেছে। এই স্বরূপটি রক্তাপ্লুত, ব্যথাসক্ত ও পরাভূত ; একটি প্রাসঙ্গিক সংলাপ :

> যারা বড় বড় বই লেখে তাদের পারিবারিক জীবন প্রায়ই থাকে না, কিংবা থেকেও থাকে না। ... মানুষের মন গতিবান বলেই আমাদের জীবনের বাস্তবতা নদীর মতো নয়। নদী তৈরি করতে চেষ্টা করে আমরা প্রায়ই রক্তের নদী তৈরি করেছি। [বাসমতীর উপাখ্যান]

পরিবার-জীবনের নিশ্চলতা আর মনোনদীর জঙ্গমতা আন্তর্বৈপরীত্যময়, একই সঙ্গে কেন্দ্রাভিগ ও বিকেন্দ্রিক। প্রাচ্য জীবনাদর্শানুগ নিসর্গবেষ্টিত গৃহজীবনের প্রার্থনায় তাঁর উপন্যাসগুলো প্রতিধ্বনিময়। 'কারুবাসনা', 'প্রেতিনীর রূপকথা', 'মাল্যবান', 'বাসমতীর উপাখ্যান' প্রভৃতি রচনায় এই আর্তি উচ্চারিত হয়েছে মূল শিকড়চ্যুত, নিঃসহায় ও নিরাশ্রয়ী অস্তিত্ববেদনার গহ্বর থেকে। কিন্তু, ভিন্ন সূত্রে তিনি আধুনিক মেধা ও চৈতন্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন ওই গৃহজীবনের সরল মহিমা, নিশ্চিন্ত পরিবেশ ও মাধুর্য থেকে, অন্তঃগূঢ় সংযোগ থেকেও। তাঁর কল্পনা-প্রতিভা আর মননরুচির স্বাতন্ত্র্যই সূচিত করেছে আরো বেশি পরম্পরাভঙ্গ আত্মবিচ্ছেদ। লিবিডো ও দাম্পত্য-জীবনপটে এই বিচ্ছেদ রূপটিই হয়েছে যথাযথভাবে উন্মোচিত ও প্রতীকায়িত। পরিবার, অন্যান্য বন্ধুজন, এমনকি পিতা-মাতার সঙ্গেও ওই একাকী আধুনিক মানুষটির সংযোগ দূরতর ও বিচ্ছেদটি অমোচনীয়। জীবনানন্দের আত্মজীবনের প্যাটার্ন থেকেই সঞ্জাত হয়েছে এইসব পরিকীর্ণ অসমন্বয়ের বোধ ; তাঁর মস্তিষ্ককোষের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে আছে রেনেসাঁস-রোমান্টিসিজম-মডার্নিজমের যে সত্তাসার, তারই প্রতিফলস্বরূপ তিনি নিজেও ছিলেন মূলকেন্দ্র থেকে ছিন্নতায় যন্ত্রণাদীর্ণ, মেধাবী চেতনায় সংসার-বিচ্ছিন্ন। এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, তাঁর মূল চরিত্রটি সর্বদাই গ্রন্থপ্রেমিক, পাঠের আনন্দকে স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ রাখতে চায়। কিন্তু উপনিবেশপটে গ্রন্থকে ক্ষমতার আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করে সে কখনো হতে পারে না আত্মবিস্তারী ও আত্মকর্তৃত্বকামী। 'কারুবাসনা'য় হৈমর গ্রন্থ কীটের আহার্যে পর্যবসিত হয়। এটি মোটিফ হিসেবে কাহিনী-কাঠামোতে ব্যবহৃত হয়েছে শ্রেণী-ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের সংকেতায়নে। তদুপরি, স্ব-স্বভাবের দিক থেকেও মননশীল কারুজীবী জীবনানন্দ ছিলেন সমকালে উল্লম্ব ও প্রাতিস্বিক ; নিজ শ্রেণীঅস্তিত্ব বা সত্তাপ্রহেলিকা সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিকোণ ছিল তীক্ষ্ণচেতন ও অগতানুগতিক। উপন্যাসের নকশায় ফুটে উঠেছে এইসব ভিন্নতর আন্তঃজটিল প্রসঙ্গের বহুলতা, আত্মপ্রতর্কের বুনট ; অপর পিঠের বুননে রয়েছে মানুষের জীবন-গল্পের আনুভূমিক ক্ষতচিহ্নগুলো। রচয়িতার আত্মসামগ্র্যই উক্ত বহুরূপতার জনয়িতা—কাহিনী বিন্যাস বা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিলোক থেকে সে-সবের উৎসারণ ঘটেনি।

চেতনার নানা স্তরে নিজসত্তার সঞ্চারণ ও বিভাজনের আন্তর্অভিজ্ঞতাকে তিনি করেছেন জীবনাভিজ্ঞতার পরিবর্ত। তাঁর প্রকৌশলে তাই চরিত্র হয় প্রতীকী, ব্যক্তিসত্তা ছড়িয়ে পড়ে সমষ্টির নির্জ্ঞানস্তূপে, জাতিক সংস্কৃতিতে এবং অবশ্যই আবহমান নিসর্গে ; এ পন্থায় তিনি সেতুবন্ধ গড়েন উল্লম্ব, প্রাতিস্বিক ব্যক্তির ঊর্ধ্বগতির [sublimation] সঙ্গে অনুভূমিক পরিপার্শ্বের, নিশ্চলতার সঙ্গে বহমানতার, বন্দি ছকের সঙ্গে উন্মুক্ত পরিসীমার। ব্যক্তি তার স্থান-সময়ের বদ্ধতা থেকে বেরোতে না-পারলেও সত্তাকে অগ্রসর, মুক্ত সত্যার্থে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণ করে তোলে। সত্তা এখানে সম্মুখগামী ও অনিশ্চয়তাময় অভিক্ষেপে আবর্তিত হলেও গভীর চক্ষু নিয়ে সৃষ্টির শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে—সৃষ্টির কৌশল, অন্ধতা ও নিরুপায় গতিবিভঙ্গকে বুঝতে চেষ্টা করে। এ জাতীয় বোধচক্ষু উপন্যাসের দ্রষ্টাদৃষ্টি হয়ে ওঠে বলেই তাঁর আঙ্গিক ও জীবন-পরিণতি থাকে উন্মুক্ত, ঠিক যেমন অধুনা বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্বে লক্ষ করা যায় বস্তুর অনিশ্চয়তাধর্ম ও সম্প্রসারণশীল অভিমুখিতা কিংবা বস্তুসত্তা পরীক্ষণে দ্রষ্টার চেতনাসম্পাত। ফলে কাহিনীর শুরু ও শেষ একই বিন্দুতে বদ্ধ থাকলেও সত্তার পরিবর্তন ও উর্ধ্বায়ন ঘটে যেতে থাকে প্রতি মুহূর্তে—বোধ থেকে বোধান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে। অন্তর্সত্তার অনিশ্চিত চলচ্ছবিটিই জীবনানন্দ সংগোপনে অঙ্কন করতে চেয়েছিলেন গদ্যআঙ্গিকে।

চার

চৈতন্যপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির বস্তুজাগতিকতা ও আইডিয়ার অবতলে থাকে অবচেতন ও পুঞ্জীভূত বাসনার অপরিতৃপ্ত জগৎ। জীবনানন্দ স্বপ্নপ্রতিমা ও পুরাণকল্পের প্রয়োগে ওই জগৎকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন : বিশেষত নিসর্গে আকীর্ণ অনুষঙ্গের উৎকলনে আর পরাচেতনার ভাষা বিনির্মাণে স্বপ্নপ্রতীকই হয়ে উঠেছে তাঁর বিশিষ্ট মোটিফ—কবিতায়-উপন্যাসে সর্বত্র। এর সহযোগী রূপবন্ধ হচ্ছে নৈঃশব্দ্য ও ক্রিয়াপদ-বিশেষণের অন্যমাত্রিক প্রযুক্তি। যেহেতু তাঁর কথাশিল্পের একটি প্রসঙ্গ হচ্ছে বিশ শতকের প্রথমার্ধের জ্ঞানশুদ্ধতা ও প্রাজ্ঞচিত্তের সঙ্গে প্রাচ্যজীবন বাসনার বিবাদকথা, ব্যক্তির ভাবুক চিত্তপট ও অন্তর্জীবনকে আশ্রয় করে গড়ে-ওঠা উপাখ্যানে তাই উক্ত স্বপ্নপ্রতীকযান, নৈঃসঙ্গ্য ও পদবন্ধের ব্যবহার ছিল অনিবার্য।

স্বপ্নপ্রতীক দিয়ে তিনি সংযোগ গড়েছেন স্বাভাবিক অনুভূমিক বাস্তবতার সঙ্গে অস্বভাবী মনস্তত্ত্বের, নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধের, চেতনার সঙ্গে অবচেতনের সূড়ঙ্গলালিত সম্বন্ধের। এই সংযোগ সৃষ্টির প্রকল্প এক ধরনের বিচ্ছেদ-অতিক্রমের নান্দনিক প্রয়াস, আবার বিসংবাদী-বস্তুর সঙ্গে সংবাদী-চেতনার পার্থক্য নিশ্চিহ্ন করারও প্রতিশ্রুতি। বস্তু ও মানসকে দ্বান্দ্বিক গতিতে নিরীক্ষণের চেয়ে তিনি বস্তুর আদ্যতনী সংস্কার ও স্মৃতির আকরকেই বেশি জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। প্রক্রিয়াটি প্রতীচ্যের সাররিয়ালিজমের স্বয়ংক্রিয়, যুক্তি-পরম্পরাহীন, অনর্গল প্রকাশরীতির অনুরূপ নয়, অন্তত তাঁর উপন্যাসে স্বপ্নযানের ব্যবহার সুচিন্তিত ও পরিকল্পনানুগ। নিসর্গের পটে অপসৃয়মাণ সময় আর অতীত স্থানকালে মানস-উপস্থিতির বাতাবরণ তৈরির জন্যই তিনি ব্যবহার করেছেন পরাবাস্তব প্রকরণ। সে-অর্থে স্বপ্নপ্রতীক শুধুই য়ুং-কথিত টেনশন মুক্তির আকল্প নয় বা বাস্তবের ছদ্মবেশীরূপও নয়, তা বৃত্তাবদ্ধ জীবনকে, অসমন্বয়কে, বিচ্ছেদকে বিকেন্দ্রিক আয়তনে প্রসৃত করার আঙ্গিক ; যদিও টেনশনমুক্তি ও পরিবর্ত-পরিসর সন্ধানের জন্য তিনি তৎকালীন প্রাগসর কোনো তত্ত্বপন্থা গ্রহণ করেন না, শুধু ত্রস্ত নীলিমার বস্তুবিভাবকে ইন্দ্রিয়বিপর্যাসে ও বর্ণপটে বিচ্ছুরিত করেন।

তাঁর অভিজ্ঞতায় রয়েছে কীভাবে তিরিশের অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে বিপর্যস্ত হয়েছিল শিক্ষাভিমানী বেকার যুবকের জীবন ও দাম্পত্য। আরেক মাত্রায় জীবনানন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন বাস্তবের পতনশীল বাংলার ভূচিত্রের বিদারণ, ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্তের কাঠামো-ভগ্নতা, শিকড় থেকে উচ্ছেদের ইতিহাস। এই বাস্তবতায় তিনি যন্ত্রণার্ত, তাঁর প্রতিক্রিয়াটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তঃসলিলা হয়ে প্রতিটি উপন্যাসের অবতলে বহমান থেকেছে। আর শিল্পী হিসেবে তাঁর প্রতিরোধের আয়ুধ হচ্ছে আজকের ভেঙে-পড়া স্থান ও অমাচ্ছন্ন প্রহরের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ, ওই চিত্ররূপময় আবহমান নিসর্গে পুনর্নব হয়ে-ওঠা, স্বপ্নে-স্মৃতিতে-মিথকথায় কল্পনা ও প্রতীতির বস্তুসঙ্গতি সন্ধান করা। এ-লক্ষ্যে কাব্যকলায় বিনির্মাণের তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে মিথের প্রতিমা, নিসর্গের রূপরঙ-আলোধ্বনি। উপন্যাসের সংলাপ ও বর্ণনারীতির বড় ক্যানভাসে ওইসব দ্যোতকের সৃষ্টিগর্ভ ও বীজতলাটি হয়ে আছে সংরক্ষিত। অন্তত, তাঁর অ্যানিমাসত্তা ও অর্ফিয়ুস-স্বভাবটি [মৃত্যুলোক] অভিসারী ও ছন্দসুরবাণীর স্রষ্টাশিল্পীর প্রতীক] উপন্যাসের কেন্দ্র চরিত্রে প্রমূর্ত হয়েছে, বাস্তব পটভূমি পেয়েছে এবং স্থানকালের মাত্রাযুক্ত হয়ে বস্তুবিভাব তৈরি করেছে। এভাবে জীবনানন্দ গদ্যকথায় তাঁর আত্ম-ঈপ্সাবর্ণিল অন্বীক্ষার গোপন সাধনাকে ন্যস্ত করেছেন আর্থ-সমাজ-পরিবারের যূপকাষ্ঠে, কালের বিলীয়মান গতিবিভঙ্গে।

কবিতার এক পর্যায়ে ছিল যে রণরক্তসফলতা, বাণিজ্যবায়ু, শূকর-শূকরীর প্রসবনাদ ও আমোদমত্ত মানুষের উচ্চণ্ড শব্দরোল, তার বৈপরীত্যে প্রতিরোধের রূপবন্ধ হিসেবে উপন্যাসে রচিত হয়েছে নিঃশব্দতার আনন্ত্য। কথোপকথনের মধ্যে অনুচ্চারিত অনুসংলাপ, শব্দার্থের প্রচলরূপ বর্জন ও পরিবর্তে ভিন্ন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি, কোমল ধ্বনির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ গড়েছেন এই নৈঃশব্দ্যের অস্তিত্ব।' অনিত্য, ধ্বংসশীল শব্দসুর আর অনুভূতিকে নিসর্গ ও ইন্দ্রিয়বিপর্যাসের দ্বারা বিমণ্ডিত করে দ্যোতিত হতে থাকে অনশ্বর সময়, সৃষ্টি জগতের নিত্যতা। বাক্যের দীর্ঘপ্রবাহ ও অন্তর্জৈবনিক নির্জ্ঞানসংকেত ওই নিত্যতার প্রতিস্বরটিকে অবশেষে নিয়ে যায় চিরায়তে, শব্দহীনতায়, ছায়াচ্ছন্ন মনের অজ্ঞাত অঞ্চলে এবং শেষে মহাজাগতিকতায়। ফলে, বস্তুজগৎ, প্রত্যহের জীবনকণা ও অভিজ্ঞতার ছোট-ছোট ঘূর্ণি কোনোরকম হওয়া-থাকা-করা-চলা ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে না, ব্যক্তির বিস্ময়ধ্যানে হয়ে ওঠে মূর্ত, স্পর্শকল্পময় সত্তার মতোই তাতে আভাসিত হয় স্মৃতিস্পৃষ্ট এক অবিনশ্বর সত্যার্থ—'চিরপদার্থ'। এইসব অনুভূত বোধগুলো যেন দূরাতীত থেকে অনাগত প্রহর পর্যন্ত থেকে যাবে কোথাও—অজ্ঞাত-অস্পষ্টতায় অপরিবর্তনীয়তায়, দৃশ্যহীনরূপে। কর্তাবিহীন ক্রিয়াশীল জগৎকে চিত্রিত করে জীবনানন্দ ওই অস্পষ্টতাকে আরো বেশি নিঃশব্দময় ও গোপন করেন। এর ফলে দৃশ্যময় প্রত্যক্ষণের মধ্য থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তির বিরোধপূর্ণ জগৎটি যুক্ত হয়ে পড়ে নৈসর্গিক মহানাট্যের আরেক কল্পকথায়। তাঁর উপন্যাসে নির্জ্ঞানপ্রতীক, নিসর্গ ও কর্তাহীন মহাসময়পটে ব্যক্তির জীবন-সময়টিকে নিষ্ক্রিয়তায় প্রতীকায়নের দৃষ্টান্ত অজস্র, একটি উদাহরণ :

> সেও এমনি শ্রাবণ মাস—গিরিমাটির মত অজস্র মেঘে আকাশ ছিল ভরে—কতগুলো ধুমসো কালো মেঘ পঙ্গপালের মত ইতস্তত ওড়াওড়ি করছিল ; দিনের আলো যাচ্ছিল নিভে, দাঁড়কাকগুলো আকাশের গায়ে ইতস্তত মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঘোলা সরবতের মত মেঘের এক খণ্ডে বরফের দানার মত সপ্তমীর চাঁদ বিকেল শেষ না হতেই হাজির—তার নীচে আসন্ন সন্ধ্যার অজস্র কালো বাদুড়ের দল। [কারুবাসনা]

আখ্যানে বর্ণনাটি প্রকৃতির নিরপেক্ষ দৃশ্যচিত্রমাত্র নয়—চরিত্রের জীবনরূপ ও মনোলোকের প্রতিরূপক এবং নির্জ্ঞান-সৃষ্টিমানসের প্রতীকধর্মযুক্ত। দাঁড়কাক দূরব্যঞ্জনাবহ, বাংলার নবান্ন উৎসবের অনুষঙ্গ-সংস্কার হচ্ছে কাক—যা জীবনানন্দের কবিতাবিশ্বেরও বিশিষ্ট মোটিফ। এখানে প্রযুক্ত হয়েছে অপসৃয়মাণ সময়ের তাৎপর্যে, নগর প্রতিবেশে ব্যক্তির কর্মহীন উদভ্রান্ত অবস্থার চিত্রণে। এই ব্যক্তি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে অস্তিত্বের স্বাচ্ছন্দ্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষি–সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও উৎসবের আনন্দ—তাঁর রচনায় তাই দাঁড়কাক সর্বদাই কুয়াশায় উড়ে যায়। ঘোলা সরবত ও সপ্তমীর চাঁদ বিবর্ণ ধূসরপ্রতিম জীবনের সঙ্কর অবস্থা আর যৌবনবিদ্ধ ব্যক্তির অবদমিত বাসনার প্রতীক ; পঙ্গপাল–বাদুড় অদৃশ্য ধ্বংসকারী ক্ষমতার প্রতিরূপক, আরেক অর্থে ব্যক্তির তমসাচ্ছন্ন দুশ্চিন্তার প্রতিমান। এভাবেই তাঁর উপন্যাসে মানুষ ও নিসর্গ একটি দৃশ্যকল্পের কুশীলব হয়ে যায়।

কথোপকথনের পরম্পরা গ্রন্থনায় দ্রুতির পরিবর্তে থাকে নিশ্চলতা, প্রায় সময় প্রশ্ন–বিশেষ্য–ক্রিয়াবাক্য হয়ে ওঠে নিছক মুড ও বোধের বিশেষণ। কর্মমুখর, দ্রুতগতিসম্পন্ন, উদ্‌ভ্রান্ত জগতের সঙ্গে সত্তালোকের বিচ্ছিন্নতার সূচকরূপে ক্রিয়াপদগুলো পালন করে বিশেষ ভূমিকা। বস্তুত, ভূমিকাটি প্রতিপালিত হয় মূল কথকসত্তার ভাবুকতা, চেতনা–প্রবাহকে অবলম্বন করে। প্রযুক্তিটির মন্ময়ধর্মী ব্যবহার লক্ষণীয় ১৯৩১–৩৬–এর সময়ে রচিত ছোটগল্পে–উপন্যাসে ; ১৯৪৮–এর পর্যায়ে, বিশেষত 'মাল্যবান' উপন্যাসে ওই ব্যবহার হয়ে উঠেছে সম্প্রকাশধর্মী, চিত্রকল্পাত্মক মনোকথনে তীক্ষ্ণ দ্যুতিময়। মাল্যবানের ব্যর্থ দাম্পত্য, তজ্জনিত অন্তর্ব্যথা, গৃহসুখবঞ্চনা, জীবনতটে মনোনদীর অবিরাম তরঙ্গাঘাত, অবদমন–পীড়িত অবসাদ কখনো ঝড়ের মতো সক্রিয় ও শব্দমুখর নয়—তুষারপাতের মতো নিঃশব্দ, শিশির–পতনের মতো ধ্বনিহীন, অশ্রুপাতের মতো অবিরল। স্বগতকথন ও দীর্ঘ বাক্যপ্রবাহ দিয়ে জীবনানন্দ চরিত্রের অবসাদ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদকে দেন বোধের অনিঃশেষ গতি উপন্যাসের সূক্ষ্মস্তরে নিহিত জীবনদ্বন্দ্ব, মানুষ ও নিসর্গের সম্বন্ধ–অনুপাতকে সংকেতিত করে তিনি অবশেষে অভিজ্ঞানের মধ্যে প্রশমিত করেন তার নিঃশব্দ অন্তর্দাহ আর পৌরুষকে। এটাই জীবনানন্দীয় অন্তর্বীক্ষার উত্তরণপন্থা। ক্রোধকে বেদনাশ্রুতে দ্রবীভূত করা নয়, অন্য এক অনাবিষ্কৃত বোধস্তরে কবিতা–সংবেদনের দীপ্তিগুণে উন্মোচিত হতে থাকে অভিজ্ঞান, গল্পের অন্তরাল থেকে উঁকি দেয় চৈতন্যের উপজনন :

> বাড়ির দিকে হাঁটতে–হাঁটতে বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে পড়ে মাল্যবান বলছিল, কাকে যেন বলছিল : 'কী গো গোলামরা সব চলে গেছে—রঙের গোলামও বল ! বিশটা বছর হস্‌কে গেছে চোখ না পাঁজলাতেই। মনু শ্বশুরবাড়ি, আর আমাদের বাড়ি উম–উম, কুসুম–কুসুম, শীতরাত আর শেষ নেই বলো !' দুপুর–রাতে ঠাণ্ডা নদীর পারে শামকলের মাথাটা যেন ঢেঁকির পাড়ের মত উঠছিল, পড়ছিল, যখন 'বলো–বলো' ! বলছিল মাল্যবান। ...
>
> পুড়তে পুড়তে সকালবেলা মাল্যবান জাগ্রত চেতনার জন্য আরেক রকম আগুনের ভেতর জেগে ওঠল। এখানে 'বলো–বলো'র চালাকি চলবে না শামকল শালার ; প্রতিটি সেকেন্ড–মিনিট গুণে অগ্নিকৃকলাসকে রূপকের মিথ্যে বলে বিদায় দিয়ে আগুনকে সত্যিই আগুন বলে গ্রাহ্য করে পদে–পদেই এগিয়ে যেতে হবে। [মাল্যবান]

আগুনকে 'আগুন বলে' স্বীকার করার মধ্যে আভাসিত হয়েছে জীবনানন্দের দর্শনচিন্তার বীজাঙ্কুর ; এছাড়াও নির্বাণের প্রাচ্যদেশীয় অনুষঙ্গটি জড়িয়ে রয়েছে অভিজ্ঞতাকে বোধজগতে রূপান্তরের ঘটনায়—ফাল্গুনের পঞ্চমীর চাঁদের আহ্বানেই ঘটেছিল অশ্বত্থবৃক্ষে [বোধিবৃক্ষ] উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার ঘটনা তথা প্রজ্ঞাচক্ষুর উন্মীলন—প্রতীচ্য ও প্রাচ্য জীবন–সংস্কৃতির আন্তঃদ্বন্দ্ব–তাড়িত চেতনার প্রমুক্তি, দ্রষ্টব্য 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা। জীবনবাসনায় নিপাতিত চিত্ত আত্মতানাশের মধ্য দিয়ে অর্জন করে এক ধরনের স্থিতপ্রজ্ঞ জীবনবোধ, এক্ষেত্রে নিসর্গই ছিল তাঁর আদিঅদিতি। ১৯৪৮–এ রচিত 'বাসমতীর উপাখ্যান' পর্যন্ত নিসর্গপরমতার বর্ণপটটি সুরক্ষিত, এর জন্য ইতিহাসচেতন জীবনানন্দের শৈল্পিক আর্তিটিও প্রতিধ্বনিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু, তাঁর দৃষ্টির অন্বেষণ–লক্ষ্যে ছিল জঙ্গমতা ও নিরুত্তর প্রশ্ন সত্ত্বেও স্থিরতার প্রার্থনা—'অন্য কোনো নতুন আলো'র রূপভাস। অস্থির, অনির্দেশ্য সময়–গতির [arrow-lessness of time] মধ্যে তিনি নিরীক্ষণ করেছেন ওই আলোর ছায়া—এটিই তপতীধ্যান। উপন্যাসের বস্তুঘটনা অঙ্কনেও জীবনানন্দ সময়–গতির অনির্দেশ্য গতিটিকে ব্যবহার করেন ; প্রথমে একটি ছোট্ট ঘটনাগ্রন্থিতে প্রতিক্রিয়ার তন্তুগুলো দিয়ে চিন্তার জট পাকিয়ে তোলেন এবং সেগুলোকে বিভিন্ন দিশায়, চরিত্রদের অনেকান্ত–বিক্ষিপ্ত সংলাপ ও ভাবনা–কণিকায় ছড়িয়ে দেন। গল্পাংশের বিচ্ছুরিত ভাবনাগুলো ঘিরে রচিত হতে থাকে শব্দহীনতার এক–একটি বার্তা, উপমার আবেগঘন দ্যুতি। এই রূপকল্পটি সংলাপবুননের ক্ষেত্রে বেশি লক্ষ্যযোগ্য। ওইসব দিশাহীন বার্তাগুলো একসময় সময়তরঙ্গে তলিয়েও যায়, শুধু রয়ে যায় বোধের স্ফটিকায়িত সত্তাখণ্ড। তাঁর আখ্যানের চরিত্ররা [এক অর্থে তাঁর শিল্পসত্তা] কোনো অসংলগ্ন চেতনা প্রবাহকে সময়বিভঙ্গে বহমান করে না, তারা নিজ–নিজ জীবনসমস্যা ও মনস্তত্ত্বকে চৈতন্যের সর্বোচ্চ মাত্রায় অন্বেষণ করে, নিজেকে যুক্তিজালে বাঁধে এবং সর্বদাই প্রত্যাখান করে অপর চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার গোপন কলা ও প্রচেষ্টাকে। ক্রমে তারা অস্বীকার করে সবরকম সাযুজ্য রক্ষার মানবিক বা সামাজিক অন্ধিসন্ধি, দৃশ্যজগৎ থেকে অবলুপ্তি কামনার প্রার্থনায় তারা হয়ে ওঠে অস্তিত্ববিনাশী। প্রায় উপন্যাসের পরিণামে নিরন্ধ্র অন্ধকারের বলয়ে চিহ্নহীন হয়ে যেতে চায় চরিত্ররা। বাংলা উপন্যাসে আত্মতার এই জাতীয় বিলয়বাসনার আকুলধ্বনি অপরিচিত। সমকালে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় [১৯৩৫] লক্ষণীয় ভিন্ন তাৎপর্যবহ আত্মিক মৃত্যুর আধুনিক গাথা।

তবে এই রকম বিন্যাসের মধ্যে নেই জটিল গঠনকলা বা অজস্র রূপরীতির মিশ্রণ , বরং অসংখ্য সরলতার জটিল রেখাঙ্কন রয়েছে। তিনি সরল কিছু রূপবন্ধকেই দূরবগাহ রেখারূপ দিয়েছেন ; এইসব সরল রূপবন্ধ উচ্ছ্রিত হয়েছে জীবনযাপনের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাকে ভিন্ন দৃষ্টিবিন্দুতে নিরীক্ষণজাত বোধ ও ভাষা থেকে, মানবসম্বন্ধের অবোধ্য, অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ থেকে। অর্থাৎ জীবনানন্দীয় মনন ও ভাষাব্যঞ্জনার গভীরতাই ওই রূপবন্ধগুলোকে দুর্জ্ঞেয় করেছে, তাঁর চিন্তাকল্পের অভিঘাতেই সরল গদ্যপ্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতীকাত্মক। সর্বত্রই জীবনানন্দের এই বোধসম্পৃক্ত আমি অর্থাৎ উপন্যাসের কথকসত্তা সরলতা ও অপরতাকে কম্বুরেখায় নিজের দিকে আকর্ষণ করে, মানসদর্পণে তাদের সত্তা ও ভাষাকে প্রতিবিম্বিত করে এবং নিজের স্বভাবসত্যে ও মননঋদ্ধ চেতনাভূমে তাদের একমাত্রিক সরল অস্তিত্বকে এমনভাবে বিস্ফোরিত করে, যে ওইসব চূর্ণ অণুব্যক্তিরা আর স্ব–স্ব ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে স্থিতিশীল থাকে না, খণ্ড–বিখণ্ড রূপে [কখনো টাইপ, কখনো–বা প্রতিমা] ছিটকে পড়ে বিভিন্ন প্রান্তে—কথকের নিঃসঙ্গ জীবনগতিপথ থেকে বহু দূরে ; অর্থাৎ উপন্যাসের কথকসত্তা অন্যচরিত্রকে বিচূর্ণ করে। তাঁর উপন্যাসে তাই বহু মানুষের অবস্থান ও ভাষা আছে, কিন্তু সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা নেই। দিশাহীন সময়কে, ব্যক্তির ভগ্ন ও মগ্ন আত্মস্বরূপকে চিত্রায়ণের জন্য এটাই ছিল তাঁর যথাযথ প্রকৌশল। তিনি আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী চরিত্রকায়াকে বিপর্যস্ত করেছেন, নায়কত্ব মাতৃত্ব–স্ত্রীত্ব ইত্যাদি প্রথানুগ সংস্কারকে উপেক্ষা করেছেন। এটিও মানব–সম্বন্ধ হারিয়ে ফেলার প্রতি তাঁর নঞর্থক প্রতিবাদ।

ঘটনা থেকে মনোসময়ের বিদিগ মাত্রায় স্থানান্তরের মুহূর্তটি রূপায়ণ–পদ্ধতিতে তিনি ব্যবহার করেন ছায়া-প্রযুক্তি ও বর্ণপ্রচ্ছদ—চিত্রকলার মতোই। বিশেষত, ছায়ার ভেতরে ব্যক্তি ও সময়াত্মার বস্তুকায়া ও রূপবর্ণগন্ধকে পরিস্ফুট করা হয় কথাশিল্পের ওই অত্যাশ্চর্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করণকৌশলের সহযোগে। প্রতিবেশ ও ঘটনাবস্তু থেকে মানস–ভাবনার মায়াপ্রহরে ও 'অন্য আলোর' প্রত্যক্ষণ–লক্ষ্যে, বস্তুভার থেকে ভাবময় হৃদয়বত্তায়, সর্বোপরি সামাজিক অপ্রতিষ্ঠা ও অপ্রাপ্তি থেকে কল্পনাসত্যের জগতে অভিগমনের প্রান্তসীমা হচ্ছে এই ছায়া ও বর্ণপ্রচ্ছদ। অনেকক্ষেত্রে ছায়া–কাঠামোটি হয়ে ওঠে চরিত্রের নির্জ্ঞান ব্যক্তিত্বের প্রতীকীয়তা, একই সঙ্গে তা আবার জীবনানন্দীয় নন্দনতত্ত্বের সজ্ঞান–সৃষ্ট অনুকল্পও বটে ; তাঁর প্রাসঙ্গিক ভাষ্যটি এখানে স্মর্তব্য :

> বেদান্তের দেশে জন্মেও ছায়াকে কায়া বলা তো দূরের কথা, বরং ছায়ার ভেতরেই আমি কায়াকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি।[৮]

তদুপরি, পদ্ধতিটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পূর্বে কথিত ইচ্ছাপূরণের মানসিক ক্রিয়া ও আর্কটাইপ্যাল ছাঁচ তথা বাস্তব থেকে স্পর্শকল্পে ও রূপান্তরে অবাধ বিচরণের বিদ্যুৎগতিবহ আদ্যতনী মন। আধুনিক নন্দনচিন্তায় এটিই হচ্ছে 'মেটামরফোসিস' তত্ত্ব। এই প্রকল্পের অজস্র ব্যবহার থেকে একটি দৃষ্টান্ত সন্ধান করা যেতে পারে 'কারুবাসনা'র হেমর চরিত্রে। শিল্পী হেম তার অন্তঃস্থিত ক্ষমতাস্পৃহাকে শিল্পরচনায় সার্থক করতে পারে না, সে নিজের ক্ষমতালিপ্সা ও যৌনতাড়নার ছায়ামূর্তি তৈরি করে মেঝকাকা ও যদুবাবুর চরিত্রে—নিজেকেই বিপ্রতীপভাবে প্রতিবিম্বিত করে। কিন্তু আবেগ–প্রবণতা আর অনুভূতিসবর্স্বতার কারণে হেমর [নেতিবাচক বুদ্ধিজীবীও বটে] এইসব ছায়া হয়ে ওঠে না–অর্থক চিন্তার মূর্তি। কিন্তু, বিবেচ্য হলো তার ছায়াপ্রচ্ছদের আধারে কীভাবে আত্মসত্তা বিনির্মাণ করে নেয় জীবনের বা শিল্পের বর্ণপ্রচ্ছদ ! হেম প্রায় সময় মানসপটে জাগিয়ে তোলে কৈশোরক স্মৃতিনায়িকা বনলতাকে, বর্ণনায়–ব্যঞ্জনায় মূর্ত করে তার বিগত অস্তিত্বকে। এই জাগরণে বিদেহী আত্মার প্রতিচ্ছবি নয়—মূর্ত হয় দেহী নারী, অ্যানিমাসত্তার প্রতিরূপক হিসেবে। যে বিশেষ রূপচ্ছবিতে বনলতা প্রস্ফুটিত হয়, তাতে থাকে বিষণ্ণতা–করুণার বিভা, নিরাশ্রয়ের সুর আর সৃষ্টির অন্ধ প্রাকৃতিকতা ও সময়ের অপসৃতির বিরুদ্ধে হেমর প্রত্যাঘাত এবং মানস–উপস্থিতির ইন্দ্রজাল :

> অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল ; মনপবনের নৌকায় চড়ে, নীলাম্বরী শাড়ি পরে, চিকন চুল ঝাড়তে–ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে ; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা—। [কারুবাসনা]

অথবা, 'প্রেতিনীর রূপকথা'য় বিনতার চিত্রাঙ্কনে রঙ, আলোছায়া আর চলচ্ছবির মিশ্র রূপ গড়ে ওঠে :

> এইসব দিগন্ত নিশুতির বুকের ভেতরেই সে যেন শরীরী হয়ে ওঠে ; মাঠের যঠি ফুলের মত ফিকে সোনালি মুখখানা তার, হৃদয়ে তেমনি নরম নিভৃত গন্ধ, সোঁদা ঘাস মাড়িয়ে চলেছে সে, সাপের গর্ত এড়িয়ে, শাদা শাড়ি চোর–কাঁটায় ভরে যাচ্ছে, আঁচলের বাতাসে কাশ দুলছে, একটা বিষণ্ন হলুদ কলাপাতার পিছনে গ্রামের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

অপর চরিত্রের সঙ্গে কথালাপের মুহূর্তে এই রকম মনোবিহার ও ভাবুকতার চালচিত্র সৃষ্টির অন্তর্সূত্রে রয়েছে জীবনের নিরাশ্রয়িতা ও অন্তর্নিঃসহায়তার বাস্তবতা। প্রেম বা দাম্পত্য, রাজনীতি বা হৃদয়নীতি—সব প্রসঙ্গকথাই ওই পরিবর্তিত সময়গত বাস্তবতার দ্যোতক হয়ে উপন্যাসগুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তাঁর গদ্যরূপ অন্তর্বয়নের আরেকটি প্রণালী হচ্ছে উপমা–প্রতীকে গল্পবস্তুর বৃত্তান্তকে আবৃত করা, মানব–সম্পর্ক ও আকাঙ্ক্ষা–বিরাগকে সন্ধ্যাভাষে লুকিয়ে রাখা, যা বিশ্লেষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে চরিত্রের রূপান্তরকামী মনস্তত্ত্ব যেমন উন্মোচিত হয়, তেমনি স্পষ্ট হয় গদ্যরচয়িতার প্রাকরণিক অভিনবত্ব। এরকম একটি দৃষ্টান্ত :

> আকাশে চাঁদ এসেছে, খুব সম্ভব কৃষ্ণা দশমীর ঝাউ সিসুর ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন একটা ভাঙা ধোঁয়াটে চিমনির ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে আলোকখণ্ড অথচ আলোর পয়জারে মানুষ ও সৃষ্টির কেমন যেন একটা সম্ভাব্য অন্ধকারে প্রতীক বলে মনে হয় ; লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রেখে অদ্ভুত নিঃশব্দে চাঁদখণ্ডের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল রমা। ...
>
> একটা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের পেছনে আকাশে মিশরের দেবীর আধুনিক রেডক্রস সংস্করণের মত চাঁদ, মেহেদি বন, উঁচু সিসু আর ঝাউগাছগুলো এদিকে। [বাসমতীর উপাখ্যান]

বর্ণনাংশে রমা হচ্ছে চাঁদ—সিদ্ধার্থের কামনাসংরাগ ও চৈতন্যের প্রার্থিত প্রতিমা। বৃক্ষ, আকাশ ও অন্ধকার হচ্ছে তার অবদমিত বাসনার সঙ্গে ওই চৈতন্যের অর্থাৎ প্রজ্ঞার দ্বৈরথ—যে প্রজ্ঞাপারমিতাকে সে লাবণ্যময়ী অথচ ব্যক্তিত্বশীলা রমার মধ্যে আরোপ করে। জীবনানন্দ অনেক উপন্যাসেই ক্ল্যাসিক-রোমান্টিক চিত্রকলার প্রতিমা, নন্দনতত্ত্ব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞামিশ্র সৌন্দর্যরূপের পুনরুজ্জীবন প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর এথনিক সংস্কৃতির অন্তর্বেদিতে ঘটেছিল এথিনার দূর-সম্ভব আবাহন, যদিও তা নারীপ্রতিমার প্রাচ্যদেশীয় আর্কটাইপের সঙ্গে প্রতীচ্য-আলোকস্নাত চেতনার সেতুবন্ধ গড়তে গিয়ে ব্যর্থই হয়েছে। শেষ পর্যন্ত, বনলতার সঙ্গে অন্ধকারে—স্পর্শকল্পের জগতে শুধু দু'দণ্ড সময় অতিবাহিত করাই তাঁর একমাত্র প্রাপ্তি। দুইয়ের মিথস্ক্রিয়ায় জীবন-গল্পের পাণ্ডুলিপি রচনার আয়োজন-লক্ষ্যেই জীবনানন্দ ছায়াশ্রয়ী ও রূপতান্ত্রিক হয়েছেন।

পাঁচ

বাংলা উপন্যাসে স্রষ্টার প্রথম আত্মচ্ছায়া ও শ্রেণীস্বভাবের বীজসংকেত লক্ষণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসে [১৮৭৭]। উনিশ শতকীয় উপনিবেশিত মধ্যবিত্তের ব্যক্তিত্বহীনতা, নিষ্ফল ক্রিয়াশূন্যতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশরূপ [অমরনাথ চরিত্রটি] উপন্যাসটিকে করেছে আদর্শবাদী বঙ্কিমের মুখোশহীন ; শৈল্পিক অন্তর্সত্তার তাৎপর্যধৃত। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' [১৯১৬] ও 'ঘরে বাইরে' [১৯১৬] উপন্যাসে ওই অন্তর্বৃত ঔপন্যাসিকতার সূত্রটি ব্যক্তিত্বপটে নান্দনিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষণে আরো বেশি প্রসারিত। তিনি অবশ্য নিজেকে নয়—চরিত্রবক্তির অন্তর্স্বরূপকে পরীক্ষণের বিষয় করেছেন, তাঁর চরিত্রগুলো ছিল তৎকালীন দেশকাল-পরিপ্রেক্ষিতের বিনির্মাণ। তিনি স্বীয় দর্শনদৃষ্টি, শৈল্পিক ন্যায় ও মানবসত্তার অর্থসাপেক্ষে তাদের করেছেন বিবর্তনধর্মী উত্তরণ-অভীপ্সু।

জীবনানন্দের আত্মধর্মী ব্যক্তিতা ও বোধ রূপান্বিত হয়েছে যতটা সমকালের চালচিত্রে, তারও বেশি স্রষ্টার ঈপ্সিত চিন্তারূপের দুর্বোধ্য বলয়ে। রবীন্দ্রনাথের সত্তাবৃত্তিতে ছিল যে সাবিত্রীবন্দনা, আলো-আঁধারের আপাত সংঘাতপটে মানব জীবনের অমৃততৃষ্ণা, তা ব্যর্থতা বা অপূর্ণতাকে দিয়েছে কসমিক সত্তাগামিতা, জীবন সেখানে আশা ও অস্তিবাদে পরম ও ভাস্বর। কিন্তু জীবনানন্দে নেই অনুরূপ সূর্যাবর্ত ; পরিবর্তে, তিনি তমসায় অবগাঢ়। রেনেসাঁস-এনলাইটেনমেন্ট-রোমান্টিসিজমের উজ্জ্বল রশ্মি ও শক্তিমত্তাকে ব্যক্তিত্বসবল রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন আধুনিক নিঃসঙ্গ অথচ কর্মোদ্যগী চরিত্রসত্তার মধ্যে। সেক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জীবনানন্দের নিমগ্নচেতন আবির্ভাব, অরোমান্টিক প্রহরে, উপনিবেশের দীর্ঘস্থায়ী শোষণ-ক্ষয়ের বিনাশপটে ; তাই তাঁর ক্ষেত্রে রাবীন্দ্রিক সূর্যচেতনা [ঔপনিষদিক প্রতীতিও বটে], জীবনের উত্তরণ ও অমৃত-অভীপ্সার জন্য কসমিক সত্তার অস্তিত্ব-আলোক অনুপস্থিত, তাঁর নেই মধ্যবিত্তের বলিষ্ঠ, স্বনির্ভর কর্মচাঞ্চল্যের প্রতিবেশও। বরং তিনি অনেক বেশি সুসমঞ্জস্য রবীন্দ্র-চিত্রকলার বর্ণতলের সঙ্গে, যেখানে আছে চেতনের অচেনা ভূমি, অবচেতনের দুর্জ্ঞেয় স্তর, গূঢ় স্বভাবক্রিয়া ও নির্জ্ঞানের উন্মোচন। চিত্রকলার রবীন্দ্রনাথ নারীপ্রতিমা ও প্রাণিপ্রতীক গ্রহণে মনস্তত্ত্বস্পৃষ্ট। জীবনানন্দেও লক্ষণীয় অনুরূপ আদ্যতনী প্রতিমাগুলোর অন্তর্বুননক্রিয়া, অভিনব দ্যোতনা সৃষ্টি ও অন্তর্বৃত মননশীলতা। তাঁর ভাষায় সঞ্চারিত হয়েছে বিজ্ঞান-শিল্প-মনস্তত্ত্বের নির্যাস ও জঙ্গম প্রতিচ্ছদ, আঙ্গিকে বিসর্জিত হয়েছে গল্পবয়নের ঋজু কাঠামো। তুলনায়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষা সযত্নচর্চিত, যুক্তিঋদ্ধ ও পারমিত। তিনি ইতিহাস-শ্রেণীর পটেও খুঁজেছেন ব্যক্তিচৈতন্যের পরমতা—যেমন 'যোগাযোগ' [১৯২৯]-এর নারীর প্রতীকতায় ও তিন প্রজন্মের ছকে। জীবনানন্দে এই তিন প্রজন্মের বা নারীর ছকটি তামসিক ও নিঃসঙ্গ আত্মসত্তার প্রতিন্যাস হিসেবে ব্যবহৃত।

তিনি ছকটিকে ব্যবহারও করেন বৈপরীত্যের তাৎপর্যে—যা অনেক সময় শুধু ভাবনা ও কথার উচ্চারণে পর্যবসিত, রাবীন্দ্রিক গদ্যকথার শৃঙ্খলা ও বিতর্কবুননের শক্তিবত্তা থেকেও এই আলাপচারিতা পৃথক। জীবনানন্দ বিতর্করিক্ত, শুধুই মনোকথনবিদ্ধ অর্থাৎ আত্মীয়জন, বন্ধু, এমনকি মানসপ্রতিমা থেকে নির্বাসিত। উপন্যাসে ঔপনিষদিক পিতার জ্ঞান ও বিশ্বাস, নিঃস্বার্থ কর্তব্যবোধ, সরল জীবনযাপন, পুত্রের [যে কথকসত্তা] আধুনিক সময়জাত নৈরাশ্য-নিরীশ্বরবাদ, উদ্যমহীন-কার্যবিতৃষ্ণা, দায়িত্বভারের ক্লান্তি, অমেয় কল্পনামনীষা ও হৃদয়নীতি এবং অসুস্থ ক্ষীণপ্রাণ শিশুকন্যার অণুসত্তা ও ক্রমবিলীয়মান প্রাণশক্তি চিত্রায়ণ করে তিনি ক্ষয়িত সময়পরম্পরাকেই ধারণ করেছেন। এই হচ্ছে সেই সময় যখন দেশকালের ভাঙন ও মানববিচ্ছেদ বিন্দুটি ক্রমশ হয়ে উঠছিল বড় একটি গহ্বর, আর তাতে নিপতিত হতে যাচ্ছে তিন প্রজন্মের মানুষেরা। আরো একটি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ তাঁর গদ্যকায়ায় প্রকটিত, তা হলো আধুনিক নন্দনরীতি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা ও প্রতিরোধকল্প-নির্মাণ প্রসঙ্গ। নিঃসঙ্গ, অতুচ্চ চেতনার ছদ্মবেশী সম্প্রকাশ তথা রূপকল্পের মধ্যে পরোক্ষধর্ম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা, মুখোশী নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশেষণ-অন্যাসক্ত অলঙ্কারমণ্ডিত বাক্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীবনানন্দ অবলীলায় ব্যবহার করেছেন গ্রামীণ উচ্চারণলয় ও শব্দরূপ, দেশজ আলাপচারিতার লোকায়তিক বাগ্‌ধর্ম, অবিন্যস্ত-এলায়িত গড়ন। পরমতার ঐক্য নির্মাণ বা ব্যক্তির অহংবাদের পরিবর্তে তাঁর আধেয় ছিল উত্তর মানবসত্তার মুখচ্ছবি চিত্রায়ণ। তাঁর নন্দনরীতিতে এই আধুনিকতা ও দেশজতার দ্বৈধতায় কারণ হিসেবে রয়েছে দুই গোলার্ধের মধ্যে সৃষ্ট ও ক্রমবর্ধিত সভ্যতার বিকাশ-অসমতা, মানবিক সম্পর্কে-বিষময়তা এ-সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি—অন্তর্গূঢ় দেশজ হয়েও বৈশ্বিক সংকটাক্রান্ত।

তবে রবীন্দ্রচেতনায় বৈশ্বিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিল যে দেশকাল, তা শেষ পর্যন্ত হয়েছে স্থানকাল অতিক্রমী। কিন্তু জীবনানন্দে স্থানগত বদ্ধতাই নিয়তি, কালের পটে এই স্থানজগৎ হয়ে গেছে ত্রস্ত। তিনি কালোর্ধ্ব আলোকভিসারী নন—শত শতাব্দীর শত মনীষার আবির্ভাব-কামনা সত্ত্বেও। তাই স্থানবর্ণিমার চিত্ররূপকার কবি জীবনানন্দ তাঁর কথাশিল্পে হয়েছেন সময়বর্ণমালার লিপিকর। এই সময়সত্তার ব্যাকরণটি অবশ্য কোনো নন্দিত দেশনায়ক বা চরিত্রসবল ব্যক্তিনায়কের নয়—শিল্পতৃষ্ণ মানুষের অর্থাৎ অর্ফিয়ুসসত্তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পরচনার তাড়নাবিদ্ধ জীবনস্পর্শী এই গভীর অন্তর্বেদনাসক্ত উপন্যাসকার মানবের হৃদয়মৃত্যু আর মননছিন্নতার [অর্ফিয়ুসের মস্তক ছিন্নতার মতো] পরিকথাই ব্যক্ত করেছেন।

এইসব অন্তর্মুখী উপন্যাস রচনার নেপথ্যে কী ছিল নিজেরই ধীপ্রতিভার নানা প্রান্ত বিশ্লেষণ ও বোধের উন্মোচন-লক্ষ্য ! অথবা, জীবনানন্দ কী সন্ধান করছিলেন টলস্টয়ের মতোই জীবনাভিজ্ঞতার রক্তপাত ও পরিণত-অপরিণত মনঃসংঘাতপটে হৃদয়নীতির সত্যার্থ উৎকীর্ণ করার অনুভূমিক গদ্যশিলা ! উপন্যাস প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত পর্যবেক্ষণ করলে এটাই প্রতিভাত হয় যে, ওই সময়গর্ভে সুপ্ত ভবিষ্যৎ উপন্যাসরূপের সংকেত যেন তাঁর রূপাজ্গিকে অধারিত হচ্ছিল। অন্তত, নিজ শিল্পসত্তার কথক ভূমিকায় আত্মগোপনকারী হয়েও জীবনানন্দ যে রীতিতে আবিষ্কার করেছেন মানুষের গুহায়িত স্বপ্ন, অস্তিত্ববহনের ব্যথা ও তার স্বতন্ত্র প্রকাশভা যা, পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে এই রীতির অন্তর্গূঢ় পরিচর্যার ও আত্মভাষার বর্ণিল প্রকাশ হয়েছে আরো সম্প্রসারিত—বিশেষত কবিদের উপন্যাস রচনায়।

তথ্যনির্দেশ

১ জীবনানন্দ দাশের উক্তি, দ্রষ্টব্য, 'জীবনানন্দ দাশ, বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত', দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৫৪

২ 'আমার সৃষ্টিপন্থাও সূর্য ও তপতীকে আশ্রয় করে ; হয়তো তপতীকেই অবলম্বন ক'রেছি বেশি—কোনো এক ভবিষ্যতে বিশেষ ক'রে সূর্যাশ্রয়ী হবার জন্য।'—জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩

৩ পরিপ্রেক্ষিতের আবছায়া অর্থে তিনি বুঝিয়েছেন মানব সমাজের বিপ্রতীপ সময় ও পটভূমি, যা ক্রমশ অস্তিত্ব রক্ষায় কঠিন ও মূল্যবোধের অস্পষ্টতায় আক্রান্ত। দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১

৪ জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১-২২

৬ আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে জীবনানন্দের ভাষ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, Bengali Novel Today, প্রবন্ধ [১৯৫০], পুনর্মুদ্রণ 'বিভাব', জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৬

৭ তাঁর কবিতায় নৈঃশব্দ্যের ব্যবহার একই সঙ্গে মনোজাগতিক ও মহাজাগতিক। একদিকে সৌন্দর্য ও অন্তর্বেদনার নিশ্চল, কালনিপতিত অবস্থার প্রতীকায়নে, অন্যদিকে বোধের অনাবিষ্কৃত, অব্যক্ত অঞ্চল রূপায়ণে তিনি নৈঃশব্দ্যকেই প্রকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

৮ জীবনানন্দের উক্তির জন্য দ্রষ্টব্য, 'জীবনানন্দ, বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত পত্রাবলি এবং প্রসঙ্গত

আবুল আহসান চৌধুরী

স্বভাবত তিনি অনুচ্চ কণ্ঠ, মৃদুভাষী, আত্মমগ্ন, নির্লিপ্ত, নিঃসঙ্গতা-প্রিয়, নির্জনতাকামী—জীবনানন্দ দাশের [১৮৯৯-১৯৫৪] এইরকম একটা ছবি আঁকা হয়ে থাকে। চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, পাশাপাশি আবার একধরনের রহস্যের জন্মও। কিন্তু বহিরঙ্গে একটা সৌম্য-শান্ত-কুণ্ঠিত রূপ থাকলেও, ভেতরে ভেতরে খুবই সক্রিয় ছিলেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে। তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয় ছ'টি কবিতার বই। অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত থেকে যায় প্রচুর রচনা। মৃত্যুর পরে প্রকাশ পেয়েছে বেশ কয়েকটি কবিতার সংকলন, প্রবন্ধের বই, গল্প ও উপন্যাস। এর বাইরেও অনেক রচনাই থেকে গেছে অপ্রকাশিত অবস্থায়। ক্রমশ আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রকাশের আলোক বঞ্চিত সেই লেখাগুলো—তাঁর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ—এবং তাঁর চিঠিপত্র।

২.

এ-পর্যন্ত জীবনানন্দের চিঠিপত্রের সামান্য অংশই প্রকাশিত হয়েছে। দীপেনকুমার রায়-সংকলিত 'জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী' [১৯৭৮]-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ২৫টি পত্র। আবদুল মান্নান সৈয়দের উদ্‌যোগে প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলি' [১৩৮৪]-র পত্র-সংখ্যা ৪৮। একজন গবেষক জানিয়েছেন, "বঙ্গাব্দ ১৪০০ পর্যন্ত জীবনানন্দ-র প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পত্রের সংখ্যা ছিল পঁচাশিটির মতো। পরবর্তী দু-তিন বছরে সেই সংখ্যা বর্ধিত হয়ে ইতিমধ্যে একশ' অতিক্রম করেছে।"[১] এ-কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, পঞ্চান্ন বছরের জীবনে তিনি মাত্র একশো চিঠি লিখেছেন। আশার কথা, জীবনানন্দের চিঠিপত্র দিনে দিনে আবিষ্কৃত-সংগৃহীত-প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি বুদ্ধদেব বসু [১৯০৮-১৯৭৪]-কে লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির হদিশ মিলেছে।[২] কিন্তু কোনও প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত [১৯০১—১৯৬০], অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১—১৯৮৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র [১৯০৪-১৯৮৮], অজিত দত্ত [১৯০৭—১৯৭৯], কিংবা অগ্রজ কোনও কবি, কিংবা কল্লোল-কালি-কলম-গোষ্ঠীর কারও সঙ্গে কী তাঁর পত্রালাপ হয়নি? স্ত্রী লাবণ্য দাশ [১৯০৯—১৯৭৪]-কেও কী তিনি কখনও চিঠি লেখেননি? বিলুপ্ত-বিনষ্টির আশঙ্কা সত্ত্বেও এ-কথা বলা যায় যে, জীবনানন্দের অজানা চিঠির সন্ধান লাভের সম্ভাবনা যথেষ্টই উজ্জ্বল। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় [১৮৯৪-১৯৬৫]-কে লেখা দুটি চিঠি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের এই মত আরও দৃঢ় হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩.

জীবনানন্দের চিঠির প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায়, এর অনেকগুলিই পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্বজন-পরিজনকে লেখা ঘরোয়া প্রসঙ্গের চিঠি। এর বাইরে কোনও কোনও চিঠি প্রয়োজনের, কখনও নিছক সৌজন্যসূচক। আবার পাশাপাশি এমন চিঠিও আছে যাতে শিল্প-ভাবনা কিংবা সাহিত্য-সংক্রান্ত মত প্রকাশ পেয়েছে। এ-সব চিঠিতে খুঁজে পাওয়া যায় অন্তরঙ্গ জীবনানন্দকে। কৌতুক-রঙ্গ কিংবা আড্ডার মৌতাত কিংবা একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ;—এ-সব বিষয় আপাতদৃষ্টিতে জীবনানন্দের স্বভাববিরুদ্ধ মনে হলেও এর পরিচয়ও মিলবে তাঁর পত্রগুচ্ছে। বুদ্ধদেব বসু একবার জীবনানন্দ সম্পর্কে বল্‌তে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "জীবনানন্দ স্বভাবে একটি দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো"—এই মনোভাবেরই অনুষঙ্গী ছিলো তাঁর পত্রাবলি,—"চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব সংকোচ।"[৩] অপরপক্ষে সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯) উল্লেখ করেছেন, "চিঠিতে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ কবি ছিলেন তিনি।"[৪] তবে অন্য ক্ষেত্রে যাই হোক, অন্তত চিঠিপত্রের প্রেক্ষাপটে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মন্তব্যই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

৪.

এখানে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা জীবনানন্দ দাশের দুটি অপ্রকাশিত চিঠি সংকলিত হলো। সাবিত্রীপ্রসন্ন একালে প্রায়-বিস্মৃত একটি নাম হলেও, একসময় সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি-পরিচিতি-প্রতিষ্ঠা ছিলো। মূলত কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর জীবন রাজনীতি-সাহিত্য-সাংবাদিকতা-শিক্ষকতা নানা ধারায় প্রবাহিত। নিবেদিতপ্রাণ দেশকর্মী হিসেবে ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। এই সূত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস [১৮৭০--১৯২৫] ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু [১৮৯৭-১৯৪৫ ?]-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের এক পর্যায়ে কারাদণ্ডও ভোগ করেন। পেশাগত জীবনে কখনও সাংবাদিকতা, কখনও বীমা কোম্পানির প্রচার সচিব, আবার কখনও বা জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাকতার কাজ করেছেন। সাময়িকপত্র-সম্পাদনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 'উপাসনা' [মাসিক], 'বিজলী' [সাপ্তাহিক], 'স্বায়ত্তশাসন' [পাক্ষিক], 'অভ্যুদয়' [মাসিক] তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা।

বাংলা কবিতার ইতিহাসে সাবিত্রীপ্রসন্ন 'রবীন্দ্রানুসারী কবি' হিসেবে চিহ্নিত।[৫] ন'টি কাব্যগ্রন্থ এবং অগ্রন্থিত কবিতার অনুসরণে তাঁর কাব্যসাধনার তিনটি ধারা নির্দেশ করা যায় : ক. বাংলার গ্রামীণ জীবনের রূপায়ণ, খ. প্রেমজ রোমান্টিক উপলব্ধির প্রকাশ, গ. স্বদেশপ্রীতি ও সমাজচেতনার স্বাক্ষর। প্রথম পর্যায়ের শিল্পচেতনা প্রকাশিত হয়েছে মূলত 'পল্লীব্যথা' [১৯২০] কাব্যগ্রন্থকে অবলম্বন করে। প্রেমচেতনার উপজীব্য 'মধুমালতী' [১৯২৪], 'মনোমুকুর' [১৯৩৬] ও 'অনুরাধা' [১৯৪৪] এই কাব্যত্রয়ী। উদ্দীপনা ও স্বদেশ-উপলব্ধির পরিচয় আছে 'রক্তরেখা' [১৯২৪], 'আহিতাগ্নি' [১৯৩২] ও 'জ্বলন্ত তলোয়ার' [১৯৫০] গ্রন্থে। এর মধ্যে 'রক্তরেখা' প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরকার বইটি বাজেয়াফ্‌ত করেন। স্বদেশানুরাগের আরও পরিচয় মিলবে তাঁর সম্পাদিত 'বন্দনা' [১৯৪৭] ও 'আমার দেশ' [১৯৬৩] শীর্ষক সংকলনের ভেতরেও। তাঁর নগরচেতনা ও সমাজ-বাস্তবতাবোধের আর-এক দৃষ্টান্ত 'মডার্ন কবিতা' [১৯৪১]। তাঁর গদ্যরচনার একদিকে রয়েছে জীবনীগ্রন্থ—'খ্রীস্টানুসরণ' [১৯৩২], 'মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র' [১৯৩২] এবং 'সুভাষ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' [১৯৪৬], অপরদিকে আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধ–আলোচনা। 'কাব্য–সাহিত্যের ধারা' [১৯৬০] তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ–গ্রন্থ। কয়েকটি শিশুতোষ গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। তাঁর অগ্রন্থিত–অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যাও কম নয়। তিনি ছিলেন বন্ধু–বৎসল ও মজলিশ–প্রিয় মানুষ। মূলত কাব্যচর্চা ও সাময়িকপত্র–সম্পাদনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[৬]

৫.

জীবনানন্দ সাবিত্রীপ্রসন্নকে প্রথম চিঠিটি লিখেছিলেন তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ঝরাপালক' সম্পর্কে অভিমত চেয়ে। জীবনানন্দ যে একেবারে নিস্পৃহ–নির্লিপ্ত–লাজুক–প্রচারকুণ্ঠ ছিলেন না, তার পরিচয় বহন করে এই চিঠি। অগ্রজ কবির কাছে বই পাঠিয়ে তিনি 'তৃপ্তি বোধ' করেন এবং মতামত পেলে 'আনন্দিত' হবেন বলে জানান। দ্বিতীয় চিঠিটি তারই অনুষঙ্গী। অভিমত পেয়ে যে কেবল 'আনন্দিত'ই হয়েছেন তা নয়, হয়তো অনুকূল মন্তব্যের কারণে সাবিত্রীপ্রসন্নের প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞও। "আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করতে পারলে খুবই আহলাদিত হ'তাম", "দেখা হোলো না—বড়ই পরিতাপের বিষয়", কিংবা "আপনার মত কবিকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে ক'রছি", "আপনার পত্রের আশায় থাকব"—এইসব উক্তি থেকে জীবনানন্দের বিনয় ও সৌজন্য একদিকে যেমন প্রকাশিত, অপরদিকে পূর্বসূরীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগও প্রতিফলিত হয়েছে।

সাবিত্রীপ্রসন্নের সঙ্গে জীবনানন্দের কোনো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রচিত হয়েছিল কী না, বা পত্র–যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিলো কী না, সে ইতিহাস আমাদের অজানা। তবে আরো পরে, জীবনানন্দের মৃত্যুতে সাবিত্রীপ্রসন্ন 'তরুণের স্বপ্ন' (৭ বর্ষ ৭ সংখ্যা ; পৃ. ৪৯৫–৯৬) পত্রিকায় 'অমিতাভ' ছদ্মনামে 'কবি জীবনানন্দ দাশ' শীর্ষক সাহিত্য–সংবাদ–নিবন্ধ রচনা করেন।

জীবনানন্দ দাশের চিঠি দুটি পরম যত্নে রক্ষা করেন সাবিত্রীপ্রসন্নের পুত্র দীপ্তিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আন্তরিক সৌজন্য ও সহযোগিতার ফলেই চিঠি দুটি প্রকাশিত হতে পারলো। দীপ্তিপ্রসন্নকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। এ–প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক–গবেষক অধ্যাপক আবদুল মোহিতের সহায়তার কথাও স্মরণ করি। এই অপ্রকাশিত পত্র প্রকাশের ভেতর দিয়ে জীবনানন্দ দাশের প্রতি জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

পত্র : এক

সাবিত্রীপ্রসন্নচট্টোপাধ্যায়–কে

২৩ শে অগ্রহায়ণ [১৩৩৪][১]
66 Harrison Road
Calcutta

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কিছুদিন হইল একটি কবিতার বই প্রকাশিত করিয়াছি।[২] সুপ্রতিষ্ঠিত কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আপনি একজন। আমার প্রকাশিত এই বইখানা আপনার নিকট পাঠাইতে তৃপ্তি বোধ করিতেছি। এই বই সম্বন্ধে আপনার মতামত আমাকে জানাইলে আনন্দিত হইব।[৩]

আশা করি কুশলে আছেন। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন।

ভবদীয় শ্রী–জীবনানন্দ দাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Recd. [illegible]/12/27

২৩ শে অগ্রহায়ণ -
66 Harrison Road
Calcutta.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কিছুদিন হইল একটি কবিতার বই প্রকাশিত করিয়াছি। সুপ্রতিষ্ঠিত কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আপনি একজন। আমার প্রকাশিত, এই বইখানা আপনার নিকট পাঠাতে ইচ্ছা বোধ করিয়াছি। বই এর সম্বন্ধে আপনার মতামত আমাকে জানাইলে আনন্দিত হইব।

আশাকরি কুশলে আছেন। আপনি আমার শ্রদ্ধা নমস্কার গ্রহণ করুন।

ভবদীয় শ্রী জীবনানন্দ দাশ

পত্র : দুই

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়-কে

৩ রা পৌষ [১৩৩৪][1]
66 Harrison Road
Calcutta

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কিছুদিন হোলো আপনার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছি। অনেককাল থেকে আপনার কবিতা [পড়ে] তৃপ্তি পেয়ে এসেছি। আমার বই[2] আপনাকে [পাঠিয়ে] খানিকটা কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পেলাম। আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ ক'রতে পারলে খুবই আহলাদিত হ'তাম। আমি কিছুকাল ধরে City College এ অধ্যাপনা ক'রছি।[3] আপনি কলকাতায় ছিলেন জানতে পারলাম। দেখা হোলো না—বড়ই পরিতাপের বিষয়। ভবিষ্যতে আলাপ-পরিচয়ের আশায় রইলাম। আপনি মুর্শিদাবাদে কি ক'রছেন? আপনার মত কবিকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে ক'রছি। মাঝে মাঝে খবর জানালে আনন্দিত হব। আপনার পত্রের আশায় থাকব। আশাকরি ভালো আছেন। আপনি আমার প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি।

ভবদীয় শ্রী জীবনানন্দ দাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

66 Harrison Road
Calcutta

পত্র–পরিচিতি

পত্র : এক

১. জীবনানন্দ দাশ '২৩শে অগ্রহায়ণ'–চিহ্নিত এই পত্রের তারিখে সালের উল্লেখ করেননি। পত্র–প্রাপক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় চিঠির পাশে জবাব–দানের তারিখ লিখে রেখেছেন—১২.১২.২৭। এ–থেকে স্পষ্টই ধারণা করা যায়, চিঠিতে অনুল্লিখিত সালটি হবে—১৩৩৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. 'একটি কবিতার এই প্রকাশিত করিয়াছি'—জীবনানন্দের প্রথম কবিতার বই 'ঝরা পালক'। "সম্পূর্ণ নিজের ব্যয়ে মুদ্রিত হলেও, প্রকাশক হিসাবে শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার-এর [১৮৯২-১৯৬৮] নাম ঘোষিত হয়" [প্রভাতকুমার দাস, 'জীবনানন্দ দাশ'। কলকাতা, ফাল্গুন ১৪০৫ ; পৃ. ২২] । বইটির প্রকাশকাল ১৩৩৪। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে রচিত ৩৫টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এই বইটি উৎসর্গিত হয় জীবনানন্দের পিতৃব্য-কন্যা শোভনা-কে।

৩. 'এই বই সম্বন্ধে আপনার মতামত আমাকে জানাইলে আনন্দিত হইব'—সাবিত্রীপ্রসন্ন চিঠিতেই এই বইটি ['ঝরা পালক'] সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন। পত্র-পত্রিকায় হয়তো তিনি এই বই নিয়ে আলোচনা করেন নি।

পত্র : দুই

১. এই চিঠিতেও পূর্বের মতো অসম্পূর্ণ তারিখ, সালের উল্লেখ নেই। প্রথম চিঠির দশ দিন পর এই চিঠি লেখা হয়। এই চিঠিরও সাল হবে—১৩৩৪।

২. 'আমার বই'—'ঝরা পালক', পূর্বোক্ত।

৩. 'কিছুকাল ধরে City College এ অধ্যাপনা করছি'—জীবনানন্দ ১৯২২-২৮ পর্যন্ত কলকাতার সিটি কলেজে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। "জীবনানন্দ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা স্থাপিত ও ব্রাহ্ম এডুকেশন সোসাইটি পরিচালিত প্রাচীন সিটি কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পেয়েছিলেন ব্রাহ্ম আত্মীয়দের সহযোগিতায়" [প্রভাতকুমার দাস, 'জীবনানন্দ দাশ', পূর্বোক্ত ; পৃ. ২৭]। কলেজের আর্থিক সংকটের কারণে জীবনানন্দসহ এগারোজন অধ্যাপককে কর্মচ্যুত করা হয় ১৯২৮-এর মাঝামাঝি। এরপর "প্রায় দেড় বছর বেকার জীবন কাটিয়ে তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে যোগ দেন" ১৯২৯-এর শেষদিকে [প্রভাতকুমার দাস, পূর্বোক্ত ; পৃ. ২৯]।

তথ্য-সূত্র

১. প্রভাতকুমার দাস, "জীবনানন্দের পত্র : কবি ও ব্যক্তিজীবনের দর্পণ"। 'রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা', সপ্তদশ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০০ ; পৃ. ২১১।

২. প্রভাতকুমার দাস, 'জীবনানন্দ দাশ'। কলকাতা, ফাল্গুন ১৪০৫ ; পৃ. ৪০।

৩. বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল'। কলকাতা, ১৯৪৬ ; পৃ. ৪৭।

৪. 'ময়ূখ', পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২ ; পৃ. ১৮।

৫. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, 'কাব্যসঞ্চয়'। কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬৫। 'ভূমিকা', অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ; পৃ. (তিন)।

৬. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, 'রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলি'। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০ ; পৃ. ৫০-৫৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলার ঐতিহ্য-অনুসন্ধানী কবি জীবনানন্দ দাশ

বিমল গুহ

ঐতিহ্য অনুসন্ধান মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি মূলত তার শিকড়ের সন্ধানে যাওয়া। সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ যেভাবে বেড়ে উঠেছে তার স্বভাবজাত আচরণ শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায়। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলোতে যেমন লোক-ঐতিহ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তেমনি সমকালের সাহিত্যেও এর ব্যবহার হয়েছে প্রচুর। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তের মানুষ সেই পুরনো দিনের ঐতিহ্যকে সামাজিক প্রয়োজনে, কিংবা ধর্মীয় তাগিদে ; আবার কখনো কখনো মনের আনন্দে সত্তায় ধারণ করে রেখেছে। আজও হাজার প্রতিকূলতার মাঝেও সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হচ্ছে নানা ধরনের লোককথা। প্রাচীন কাহিনী কিংবা ঐতিহ্য-অনুসন্ধানী গল্প শুনে মানুষ আনন্দ পায়। প্রাচীনকালের নানা লোককথা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত। ক্রমে ক্রমে এসব লোককাহিনী সাহিত্যের অংশ হয়ে যায়।

মানুষের মনের গভীরে যে অনুভূতি ক্রিয়াশীল, বিচিত্র শিল্প মাধ্যমে তার প্রকাশ। জীবনের কোনো নিগূঢ় প্রয়োজনে এসবের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে মানুষ তার অনুভূতি নানা মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এসবের ঐতিহাসিক এবং শিল্পগত মূল্য অবশ্যই রয়েছে। মানুষের প্রথম চেতনা যেহেতু লোকজীবনকে ঘিরে, সেহেতু লোকজ উপাদানগুলি তার সত্তায় জাগ্রত। লোক-ঐতিহ্যের ধারক এই উপাদানগুলির ব্যবহার আছে এবং থাকবে। এগুলি প্রথমত সামাজিক উপযোগিতা হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত নান্দনিক আনন্দের উৎস হয়ে বেঁচে আছে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনে। "বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্ভার মহাকাব্যগুলোতে লোক-উপাদানের উপস্থিতি নির্ভুলভাবে আমাদের চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে সহজেই স্মর্তব্য প্রাচীন গ্রিসের ইলিয়াড ও অডিসি, প্রাচীন রোমের ঈনিড, প্রাচীন ভারতের রামায়ণ ও মহাভারত, পারস্যের শাহনামা, প্রাচীন জার্মানির নিবেলুঙ্গেনলিয়েড, মধ্যযুগের ইতালির দি ডিভাইন কমেডি এবং আধুনিক যুগের ইংরেজ মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট ও বাঙালি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাধবধ কাব্যের কথা।"[১]

আধুনিক জীবনযাত্রা যেমন জটিল, তার যন্ত্রণাও বহুবিধ। যে কবিতা একদিন নান্দনিক আনন্দের জন্য সৃষ্টি হতো, তা হয়ে উঠলো মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতার ফসল। কবিরাও হয়ে উঠলেন প্রকৃত জীবনমুখী। তাঁরা বৃহত্তর লোকসমাজ ও ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। কবিতায় স্থান পেলো ঐতিহ্যের বিষয়-আসয়। যুগের দাবিকে প্রকাশের তাগিদে আধুনিক কবিতায় এলো ব্যাপক পরিবর্তন। কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে যুক্ত হলো নতুন মাত্রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিরা সুন্দরের একনিষ্ঠ সাধনায় নিবিষ্ট না থেকে যুগের সত্যকে ও যুগের প্রাণধর্মকে আবিষ্কারে ব্রতী হলেন। তা সত্ত্বেও ঐতিহ্যবিস্মৃত হননি তাঁরা।

তিরিশের দশকে এসে বাংলা কবিতার পালাবদল ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয়, যুদ্ধোত্তর সামাজিক অবক্ষয় ও যুদ্ধের পরিণাম সমাজমনস্ক চৈতন্যকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। যুদ্ধের প্রভাবে মূল্যবোধের পরিবর্তন, যুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত পৃথিবীর বিমর্ষতার রূপ সমকালের কবি-চৈতন্যে এনে দেয় ব্যাপক পরিবর্তন। তখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা কাব্যাঙ্গনের একচ্ছত্র নায়ক। তাঁর রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনার জগত থেকে একদল সমকালীন তরুণ কবি সমবেতভাবে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির বিপক্ষে সোচ্চার হলেন। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচেতনা ও অতীন্দ্রিয় প্রেমানুভূতির রূপে ও আকর্ষণে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। "রুশ বিপ্লব, ঊনত্রিশ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, শক্তি ও ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান, সেই পশুবাদের বিরুদ্ধে স্পেনের গৃহযুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমবেত যোগদান ও পরাজয়ের গ্লানিবহন—এই সমস্ত ঘটনায় অনুভূতিসম্পন্ন কবি সম্প্রদায়ের উদাসীন থাকার সম্ভাবনা ছিল না"।[২] সচেতন মানুষ হিসেবে কবিদের চিন্তা ও মনীষার জগতে দেখা দিয়েছিল ব্যাপক পরিবর্তন। এই পরিবর্তিত কাব্যচিন্তায় যাঁরা সোচ্চার ছিলেন, জীবনানন্দ দাশ তাঁদের অন্যতম। এই সময়ে আবির্ভূত কবিদের মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাসের মিল থাকলেও চেতনালোকে তাঁদের স্বভাব প্রবণতার ভিন্নতা ছিল। জীবনানন্দ দাশ তাঁর অন্তর্মানসে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন সমকালকে ও মানুষের ঐতিহ্যভিত্তিক আবহমান জীবনধারাকে।

জীবনানন্দ দাশ নিজের আবেগ ও স্বপ্নকল্পনার মধ্যে শাশ্বত জীবনের শৈল্পিক সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর কবিতায় রয়েছে ধূসর অস্পষ্ট জগত, যেখানে পাঠক প্রবেশ করতে পারেন শুধু স্বকীয় কল্পনাবোধ ও মননের মাধ্যমে। জীবনানন্দ ছিলেন ইতিহাস-সচেতন আধুনিক মননের মানুষ। ইউরোপীয় সাহিত্যে এলিয়টের কবিতায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিয়েছিল—এলিয়টের নিজের বিবেচনায় তা ছিল ইতিহাস-চেতনা। এলিয়টের এই ইতিহাস-চেতনা বাংলা কবিতায় তিরিশের কবিদেরকে প্রভাবিত করেছিল, জীবনানন্দের মতো অন্তর্মুখী কবিকেও। "এলিয়ট-অনুপ্রাণিত এই বিশ্ব সংস্কৃতির বহুকালের যাত্রায় নাবিক জীবনানন্দ পাড়ি দেন বহু পথ। 'হাজার বছর ধরে', 'তিনশ বছর ধরে', 'পাঁচশ বছর', 'সাতশ বছর' ইত্যাদি উল্লেখের মধ্যে বহমান জীবনের সামগ্রিক ধারাকে তিনি চিনে নেন। এই জীবনপ্রবাহ রাবীন্দ্রিক 'অনন্ত' চিহ্নিত নয়, নয় তা কল্যাণাভিসারী। বরং যে প্রেক্ষাপটে এই যাত্রা শুরু সেখানে প্রকৃতিতে নেই ফসলের সম্ভাবনা ; বিশ্বপ্রকৃতি পোড়োজমি বা ওয়েস্টল্যান্ড-এ রূপান্তরিত। তাই জীবনানন্দের মনে হয় মানুষের প্রাণ হাজার বছর পথ পরিক্রমায় ক্লান্ত এবং সম্ভাবনাহীন"।[৩]

মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যেখানে জাগতিক বিশ্বের সবকিছু বিপর্যস্ত, মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে যেখানে নিরন্তর বিবাদ ও দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে পর্যুদস্ত মানবিকবোধ ; সেই সময়ে স্বাভাবিকভাবেই এই জাগতিক বিকার কবিদের প্রভাবিত করেছিল, বেদনাক্রান্ত করেছিল। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তার প্রতিফলন দৃশ্যমান।

১. আকাশকে নিরালম্ব করে দিয়ে বোমারু বিমান উড়ে যায়—...

(বৃক্ষ : অগ্রন্থিত কবিতা-কবিতা সমগ্র)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. …তাই মানুষের ইতিহাস বিবর্ণ হৃদয়
নগরে নগরে গ্রামে নিষ্প্রদীপ হয়।

(রাত্রির কোরাস : সাতটি তারার তিমির)

জীবনানন্দের সমস্ত কাব্য জুড়ে এক ধরনের বিষণ্ণতা ছায়া ফেলে আছে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও অনেকটা নির্জন ছিলেন। জীবনে স্থিতিশীলতার অভাব ছিল তাঁর। স্বাভাবিকভাবেই কাব্যে এই অনিশ্চয়তার প্রতিফলন হয়েছে। স্বকাল বিষয়ে অতি সচেতন এই কবি ইতিহাস-ঐতিহ্য বিস্মৃত নন। তিনি বিশ্বাস করতেন—মানুষের দীর্ঘদিনের জীবনযাপনের বহমান ধারা এসে মিশে বর্তমানের সাথে। কবিতায় স্বতন্ত্র বাণীভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে লোক-ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গ। বাংলার গভীর-গোপন রূপটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায়, বিশেষ করে 'রূপসী বাংলা'য়। আবহমানকালের বাংলাদেশ তাঁর কাব্যচিন্তায় পুনর্জাগরিত হয়েছে। বাংলার রূপের প্রতি মোহমুগ্ধ এই কবি পৃথিবীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যে অবগাহন করেছেন, নতুন মাত্রায় সমৃদ্ধ করেছেন দেশীয় সংস্কৃতিকে।

"ঐতিহ্য ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়। দীর্ঘদিনের জীবনচর্চার নিয়ম ও জীবনচর্চার ফসল একত্রে সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে তোলে। সংস্কৃতি ঐতিহ্যবাহী কিন্তু ঐতিহ্যনিষ্ঠ নয়। ঐতিহ্যের অনেক উপকরণ সংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চরমান, কিন্তু সব উপাদান বিরাজমান নয়"।[৪] কবির কাজ ইতিহাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা। এ কাজ করেছেন যুগে যুগে প্রতিভাবান কবিরা ; জীবনানন্দ দাশও এঁদের একজন। তাঁর 'রূপসী বাংলা'য় রূপায়িত হয়েছে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের পৌরাণিক ও ঐতিহ্যগত পটভূমি। "পৃথিবীর সকল সভ্যতা ও লিখিত সাহিত্যের পশ্চাতে আছে এক সুদূরপ্রসারী লোক-ঐতিহ্য"।[৫] দীর্ঘদিনের গ্রহণ-বর্জনের ভিত্তিতে লোকজীবনে ঐতিহ্যের স্থান স্থায়ী হয়ে আছে। লোকসংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্যক্রমে মানুষের মধ্যে টিকে আছে। মানুষের অতীতের আচার-আচরণ লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির অংশ হয়ে গড়ে উঠেছে বাংলার লোক-ঐতিহ্য। তিরিশের কবিতায় বৃহত্তর বাংলার ঐতিহ্য ব্যবহৃত হয়েছে সচেতনভাবে, বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়।

প্রাচীন লোকসমাজের নানা অভিব্যক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন লৌকিক গল্প-কাহিনীতেও। 'রূপকথা' এর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। পৃথিবীর সবদেশে নানা ধরনের লোককথার প্রচলন আছে। এই কাহিনীগুলো কাল্পনিক ও অবাস্তব হয়ে থাকে এবং কাহিনীগুলো সাধারণত রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ থাকে। এ জাতীয় কাহিনীর মধ্যে আরব্য রজনীর গল্প-উপন্যাসের নানা চরিত্র উঠে এসেছে জীবনানন্দের কবিতায়—

ক. ভুলে গেলে ভীরু হৃদয়ের ভিক্ষা, আতুরের লজ্জা অবসাদ,
অগাধের সাধ
তোমারে সাজায়ে দেছে ঘরছাড়া ক্ষ্যাপা সিন্দবাদ !

(নাবিক : ঝরাপালক)

খ. আধো আঁধারের দেশে
বার বার আসে ভেসে
কার সুর !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন্ সুদূরের তরে হৃদয়ের প্রেতপুরে ডাকিনীর মতো মোর
কেঁদে মরে মন !
(একদিন খুঁজেছিনু যারে : ঝরাপালক)

গ. ...পৃথিবীতে আমি বহুদিন
কাটায়েছি ; বনে বনে ডালপালা উড়িতেছে যেন পরী জিন্
কথা কয় ;...।
(পৃথিবীর পথে আমি : রূপসী বাংলা)

জীবনানন্দ দাশ বৃহত্তর লোকজীবনকে কোনোভাবেই পাশ কাটিয়ে যেতে চান নি। তাঁর কবিতায় রূপকথার অনুষঙ্গ এসেছে। নাবিক-এর প্রসঙ্গে এসেছে 'সিন্দবাদ'-এর কথা, কল্পকাহিনীর জিন্পরীর কথা ইত্যাদি। এছাড়াও লোক-প্রবাদের প্রয়োগ তাঁর কবিতাকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। প্রবাদগুলো কখনো কখনো ভেঙে নিজের মতো করেও উপস্থাপন করেছেন কবি। মূলত সামাজিক মানুষ প্রাত্যহিক জীবনাচরণের ভেতর দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ হচ্ছে—প্রবাদ। কবিতায় লোক-প্রবাদের ব্যবহার তাই কবির ঐতিহ্যপ্রিয় মানসিক আস্থারই প্রকাশ।

ক. '...রবে তবু একদিন ? হে কালপুরুষ,
ধ্রুব, স্বাতী, শতভিষা,
উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের মতো যারা তাহাদের দিশা
স্থির করে কর্ণধার ? ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা,
(পরিচায়ক : মহাপৃথিবী)

খ. 'যে মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, যেই দীপ প্যারাফিন,
বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে,
সম্রাটের সৈনিকের যে-সব লাবণি, লবণ রাশি খাবে জেগে উঠে,
অমায়িক কুটুম্বিনী জানে ;
(একটি কবিতা : সাতটি তারার তিমির)

গ. 'ভাসুর পীড়িত হয়ে অতএব ভাদ্র বৌকে দেখে বকে ;
চোখ মেলে, চোখ বুজে দেখেছি অনেকবার সে রকম রুগন দুর্ভিক্ষকে ;
(নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান : আলোপৃথিবী)

ঘ. 'কুইসলিং বানানো কি নিজ নাম-হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল ;
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল'
(সৃষ্টির তীরে : সাতটি তারার তিমির)

জীবনানন্দ প্রচলিত প্রবাদকে কখনো কখনো ভেঙে নিজের বাণীভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন, প্রবাদের গূঢ় অর্থকে ঠিক রেখে। আবার কোথাও কোথাও অর্থের ব্যাপ্তিকে সম্প্রসারিতও করেছেন। 'ভাসুর ভাদ্র বৌ'-এর পরস্পরের অচ্ছুত সম্পর্ক হলেও কবিতায় দৃঢ়তা প্রকাশের অর্থে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যত্র এর ব্যবহারে মনোপীড়ার অহেতুক বহিঃপ্রকাশও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটেছে। আবার 'সাত ঘাটের কানাকড়ি' প্রবাদে ইতিহাস চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ইতিহাস-চেতনার তাৎপর্য হলো বিনাশী ও অবিনাশী ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান। অতীত, বর্তমানের স্রোত প্রবাহে ফল্গুধারার মতো প্রবহমান। অতীতের অবিনাশী অস্তিত্বই ঐতিহ্য। জীবনানন্দ ঘুরে ফিরে তাকিয়েছেন অতীত-ঐতিহ্যের দিকে। "মানব ইতিহাসের বহমানতার ধারণা থেকেই জীবনানন্দ দাশ বিশ্বমানবিক ঐতিহ্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার উত্তরাধিকার দাবী করেছেন। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, পাউণ্ড ও এলিয়টের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনিও সন্ধান করেছেন নিজস্ব প্রাসঙ্গিকতা"।[৬] অতীত ইতিহাসের যা কিছু শাশ্বত তা যুগ যুগ বেঁচে আছে মানুষের জীবনের আশ্রয়ে। প্রবাদে সঞ্চিত হয়ে আছে বৃহত্তর লোকসমাজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। এছাড়াও কবিতায় লোকছড়া, ধাঁধা বা হেঁয়ালী, লোকসঙ্গীত এমনকি লোকনাট্যের উল্লেখও পাওয়া যায় কোথাও কোথাও।

বৃহত্তর লোকজীবন কিছু কিছু সংস্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ। জীবন থেকে একে আলাদা করে দেখা যায় না। এই সংস্কারগুলো মানুষের আদি ঐতিহ্য হিসেবে জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে। লোকসংস্কার আর লোকবিশ্বাসের দূরত্ব খুব বেশি নয়। প্রসঙ্গক্রমে Animatism-এর কথা এসে যায়। মানুষ নিজের সমস্ত চেতনাকে জড় বিশ্বের উপর আরোপ করে। এই চেতনা রূপলাভ করেছে Animism-এ। নৃ-বিজ্ঞানী Edward Burnett Tylor-এর মতে 'সর্বপ্রাণবাদ'-এর ধারণা থেকে ধর্ম বিশ্বাসের উদ্ভব। তাঁর মত "Animism is the attribution of a soul or spirit to living things and inanimate objects. In full-blown animism nothing is really inanimate; everything is alive with spirit, active or not."।[৭]

Animatism ও Animism-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এর মধ্যে প্রথমটি প্রথমে স্বীকৃতি পায়, পরে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে Animism-এর ধারণা আসে। এভাবেই সর্বপ্রাণবাদের বিকাশের ফলে দেবদেবী বিশ্বাস, পূজা, মন্দির ইত্যাদি সমাজে স্থায়ী রূপ পেতে থাকে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এইসব অনুষঙ্গ প্রতিস্থাপিত হয়েছে—

১. 'মানবের মাঝে যে দেবতা আছে আমরা তাহারে বরি,
মোদের প্রাণের পূজার দেউলে তাহার প্রতিমা গড়ি।'

(নব জীবনের লাগি : ঝরা পালক)

২. 'হারিয়ে গেলাম ত্রিশূল মূলে, শিবের দেউল দ্বারে ;
কাঁদছে স্মৃতি—কে দেবে গো—মুক্তি দেবে তারে !'

(স্মৃতি : ঝরাপালক)

আবার কিছু কিছু বিশ্বাস দীর্ঘদিন লোকসমাজে প্রচলিত থাকার ফলে আচারে পরিণত হয় এবং লোকসংস্কারে রূপ লাভ করে টিকে থাকে। যেমন : তাবিজ, দোয়া, ভূত-প্রেত, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি। 'ঝরাপালক' গ্রন্থে আছে—

অনাদি কালের থেকে ;
মরণ শিয়রে মাথা পেতে তার দুস্তর যাই দেখে !
হেরিলাম দূরে বালুকার পরে রূপার তাবিজ প্রায়
জীবনের নদী কলরোলে বয়ে যায়।'

(জীবন-মরণ দুয়ারে আমার : ঝরাপালক)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ছাড়াও বিভিন্ন লোকউৎসবের উল্লেখ আছে বেশ কিছু কবিতায়। এর মধ্যে রয়েছে — পোষলা উৎসব, চড়ক পূজা, ভাদু পূজা, নবান্ন উৎসব, বারুণী প্রভৃতি। আবহমান বাংলার লোকজীবনের অনুষঙ্গ জীবনানন্দের কবিমানসকে করেছে সমৃদ্ধ এবং শিকড় অভিমুখী। কবিতায় ধর্মীয় সংস্কারের ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অভিব্যক্তিও প্রকাশ পেয়েছে।

মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘন্টা মিশেছে হরষে নমাজের সুরে সুরে!

(হিন্দু-মুসলমান : ঝরাপালক)

এই কবিতায় ধর্মীয় সংস্কার—পূজা, নামাজ, মুয়াজ্জিনের আজান, তসবি, ফকির, পূজারী, মন্দির, মসজিদ, বেদবাণী, কোরানের প্রসঙ্গের ব্যবহার সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর লোকজীবনের সার্বিক প্রতিফলন ঘটেছে। এছাড়াও লোকশিল্পকলার অনুষঙ্গ—চুড়ি, কাঁকন, নূপুর, কড়ির মালা, ঝিনুকের ফুল ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে জীবনানন্দ দাশ লোক-ঐতিহ্যের সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতায়। এছাড়া লোকবাংলার চিত্র—নৌকা, ডিঙা, ভেলা, খেয়া ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায় বহু জায়গায়। সাংসারিক উপকরণের মধ্যে লাঙল, কাস্তে, দড়ি, বালতি, ঢেঁকি, বল্লম, হাঁড়ি এবং হাতুড়ির উল্লেখও রয়েছে।

মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যা কিছু ব্যবহার করে—তা তার প্রয়োজনমাফিক পছন্দমতো তৈরি করার প্রয়াস পায়। এভাবে সৃষ্টি হয় শিল্পবোধ। "মানুষের বাইরে এক লীলা চলছে নানা ব্যবহারিক কাজের মধ্যে তার প্রকাশ ; তার মনের গহনে আর এক লীলা চলছে বিচিত্র শিল্পে তার প্রকাশ"।[৮] মানুষ তার নিত্য ব্যবহার্য জিনিস যেমন : শাড়ির নকশা, ময়ূরপঙ্খি, কাঁথা বুনন, পানের বাটা, হাঁড়িমাচা, আলপনা ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে মনের শিল্প-সত্তাকে। লোকজীবন মানসের এইসব অনুষঙ্গই ব্যবহার করেছেন জীবনানন্দ দাশ। যেমন :

১. ...যেই খানে শঙ্খমালা কাঁথা বুনিয়াছে
সে কতো শতাব্দী আগে, মাছরাঙা ঝিলমিল
কড়ি খেলাঘর ;

(কোথাও মাঠের কাছে : রূপসী বাংলা)

২. আজ আমি ক্লান্ত চোখে ব্যবহৃত জীবনের ধুলোর কাঁটায়
চলে গেছি বহু দূরে ; দ্যাখোনিকো, বোঝোনিকো, করোনিকো মানা ;
রূপসী শঙ্খের কৌটা তুমি যে গো প্রাণহীন পানের বাটায়।

(অশ্বথ বটের পথে : রূপসী বাংলা)

লোকবাংলার এই শিল্প-ঐতিহ্য বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে। আধুনিক কবি ফিরে তাকিয়েছেন আদি শিল্পচিন্তনের দিকে। এর মধ্যে লোক-কৌশল কিংবা লোকবিজ্ঞানের অনুযঙ্গও মূর্ত হয়েছে। যেমন : থালাবাটি, বাসন-কোসন, খাট-পালঙ্ক, বেড়া-চালা, পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদি। গ্রামজীবনে ব্যবহৃত 'সলিতা' বা কুপি বাতির উল্লেখ আছে কোনো কোনো কবিতায়—

'আমি চোখ বুজিবার আগে তারা গেল চোখ বুজে,
ক্ষীণ হয়ে নিভে গেল সলিতার আলোর স্পষ্টতা'

(অনেক আকাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যত্র গ্রাম বাংলার লোকজীবন বলতে কামার, কুমার তাঁতি, বেদে, চাষা, মাঝি, সাপুড়ে প্রভৃতির উল্লেখ এসে পড়ে। জীবনানন্দ কবিতার ছত্রে ছত্রে এঁদের জীবনাচরণের চিত্র তুলে ধরেছেন ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে।

'সারাদিন ধানের বা কাস্তের শব্দ শোনা যায়
ধীর পদবিক্ষেপে কৃষকেরা হাঁটে।
তাদের ছায়ার মতো শরীরের ফুঁয়ে
শতাব্দীর ঘোর কাটে কাটে।'

(বিভিন্ন কোরাস-তিন : মহাপৃথিবী)

আবহমান বাংলার গ্রামীণ মানুষের সামগ্রিক জীবনাচরণ জীবনানন্দের কবিমানসের অন্তর্গত উপকরণ হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি কবিতার ছত্রে ছত্রে লোকভাষা কিংবা কথ্যভাষাকেও স্থান করে দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে খুদ, উম, ঠ্যাং, ঠেস, গুঁজি, গাড়ল, বলদ, টেরচা, ছ্যাঁদা, থ্যাতা, ফোকর, নাড়া প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। রূপসী বাংলার কবি বলে খ্যাত জীবনানন্দ দাশ চিন্তায় ও মননে আবহমান লোকজীবনেরই কবি-প্রতিনিধি। লোকজীবন-ঐতিহ্য তাঁর চেতনায় ফেলেছে গভীর প্রভাব। "তখন কবিতা পাঠকেরা জীবনানন্দকে 'আমাদের কবি' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন, তার একমাত্র কারণ এই জীবনানন্দ যুগের মানসিকতার যোগ্য ভাষা দিতে পেরেছিলেন"।[৯] লোকজীবন-ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মূর্ত হয়েছে পরম মমতায়—যা আবহমান বাংলার লোক-ঐতিহ্যের প্রতি কবির আকর্ষণের সাক্ষ্য বহন করে।

তথ্যনির্দেশ

১. কবীর চৌধুরী, বিশ্বসাহিত্যে লোক-উপাদান, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, পৃ. ৯৫।
২. অশ্রুকুমার সিকদার, চতুর্থ দশক (প্রবন্ধ), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, বাকসাহিত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পৃ. ৮১।
৩. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃ. ৩১।
৪. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪,, পৃ. ৬।
৫. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোক-সাহিত্য*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩, পৃ. ৩১।
৬. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১।
৭. The New Encyclopaedia Britannica, vol. 1, Encyclopaedia Britannica, Inc. 15th Ed. 1994, p.421.
৮. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
৯. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *কবি জীবনানন্দ দাশ*, ভারবি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৪, পৃ. ৯-১০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মহাযুদ্ধের প্রতিফলন

মাহমুদ উল আলম

যুদ্ধ–বিগ্রহ মানবজাতির আবহমানকালের অন্তর্জাত প্রবণতা। যূথবদ্ধ জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় মানবসমাজ প্রথমত জীবিকা ও প্রতিরোধ বা প্রতিরক্ষা এবং কালক্রমে বীরত্ব ও ক্ষমতার জন্য নিয়ত যুধ্যমান। এজন্যেই মানুষের ইতিহাসে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্রের বাইরে যুদ্ধবিষয়ক উপাত্তই সুপ্রাচীন–এই সিদ্ধান্ত নৃতাত্ত্বিকদের। নৃতত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড টেইলরের ভাষায়, 'After the quest for food, men's next great need is to defend himself' [Tylor 1888 : 221]। তাই বলা যায়, মানবসমাজের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যুদ্ধপ্রবণতা সর্বজনীন, জটিল ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। মানবসমাজে যুদ্ধ ও সভ্যতা সমান্তরাল ; কারো কারো ভাষার–'Seamese Twins'[Dyer 1985 : 4] এবং কালক্রমে বিবর্তিত। উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের নিরিখে সভ্যতার উষাকালে মেসোপোটেমিয় রাষ্ট্র আর আধুনিক কালের রাষ্ট্রের যুদ্ধবিগ্রহে মৌলিক প্রভেদ নেই। বিবর্তন ঘটছে। কেবল ধরন ও প্রকরণে। তাই কুড়ুল থেকে কামান, তীর থেকে বুলেট, বারুদ থেকে আণবিক বোমা কালান্তরেরই বিকাশ ও বিবর্তন।

ক্রমবিবর্তনের ধারায় যুদ্ধবিগ্রহ আবশ্যিকভাবে মানবসমাজে শুভ–অশুভ উভয়তই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধের স্থায়িত্ব পরিধি, উদ্দেশ্য, সম্পৃক্তি, ব্যাপ্তি এবং ধ্বংসের ব্যাপকতার ওপরও এ প্রভাবের তারতম্য নির্ভর করে। সামাজিক এই অভিঘাত ও প্রভাব মানবমনের ওপর অনিবার্যভাবেই ক্রিয়াশীল। এ প্রেক্ষাপটেই সচেতন মানুষের মনে ঘটে প্রতিক্রিয়া, সৃষ্টি হয় ইতিবাচক ও নেতিবাচক মনোভাব। যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে ওঠে অন্যতম সাহিত্যিক উপজীব্য। বিশ্বসাহিত্যের পূর্বাপর ইতিবৃত্তে এর পরিচয় নিহিত। তাই সমাজমানসের উক্ত প্রভাবের পরিচয় মেলে সমকালীন লেখক, চিন্তাবিদ, মনীষীদের রচনায়। গড়ে ওঠে যুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে আন্দোলন ; যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে লেখক–শিল্পীদের প্রতিরোধমূলক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিলো ফ্যাসিবাদী বিরোধী সংঘ। সে মঞ্চ থেকে রচিত হয় প্রচুর যুদ্ধবিরোধী সাহিত্য। পাশাপাশি যুদ্ধকে আবাহন করেও কবিতা রচনা করেছেন কবিরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশে হাওয়া বদলের সাথে সাথে কাব্যে সুর বদলের অনিবার্যতা স্বীকার করতেন। এই হাওয়া বদলের অর্থ জাগতিক, সামাজিক ও পরিবেশের পরিবর্তন। এর পেছনে কার্যকর অনেক কারণের মধ্যে সামাজিক উপপ্লব তথা বিদ্রোহ–বিপ্লব ও যুদ্ধবিগ্রহও অন্যতম। সমাজজীবন মুখ্যত অর্থনীতিনির্ভর হলেও পরিবর্তন শুধু অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং জীবনযাত্রাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না ; তা ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বত্র—যূথবদ্ধ মানুষের সামাজিক পরিবেশে, চিন্তা-চেতনায়, সাংস্কৃতিক জগতে। সাহিত্য পরিক্রমাতে সুর বদলের নেপথ্যে এটিও সম্পৃক্ত, সক্রিয় এবং অপ্রতিরোধ্য।

বাংলা সাহিত্যেও এ শতকের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ দশকে হাওয়া বদলের পরিবেশ রচিত হয়েছিলো প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। ফলে বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ পায় জনজীবনে যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিচয়, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর বিপর্যয় চিত্র, যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। প্রথম মহাযুদ্ধ, তৎপরবর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা এবং তজ্জনিত এবং সৃষ্ট সংকটপ্রসূত উপলব্ধিই আলোচ্য পরিবর্তনের নেপথ্য উপাদান। এই আগ্রাসী, সর্বভূক, অপ্রতিরোধ্য যুদ্ধ সাহিত্যিক চেতনায় শঙ্কা, উদ্বেগ ও সংকটের ছায়াকে ঘনীভূত করে-বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ফলে শিল্পী-সাহিত্যিকরা এ যুদ্ধকে প্রধানত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেই গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ ও বাঙালির সামাজিক পটভূমিকা ও সার্বিক জীবনবৃত্তের যেভাবে প্রকৃত পরিবর্তন সূচিত হয় প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও এর অভিঘাত সে পরিবর্তনকে যেভাবে আরো প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করে তার স্বরূপ সন্ধান আবশ্যিক। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শোষণে প্রায় রক্তহীন জাতীয় জীবনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভিন্নধর্মী আঘাত হানে। সে আঘাতের প্রথম ধাক্কা বহন করতে হয় বাঙালি মধ্যবিত্তকে। অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো পরোক্ষ। ভারতবর্ষকে যোগাতে হয়েছিলো মিত্রশক্তির জন্যে অস্ত্র এবং সেনাবল ছাড়াও অঢেল রশদ-শিল্প-কৃষিজাত দ্রব্য। এর পাশাপাশি 'India also made financial contributions to her utmost capacity'[উদ্ধৃত : রামেশ্বর শ' ১৯৮২ : ৫৪]। অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর এই প্রচণ্ড চাপ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফলে সামাজিক ও নৈতিক দুরবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে। কল্লোলের কালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জীবেন্দ্র সিংহরায় এ বিষয়টিকে বিবৃত করেছেন এভাবে,

> আমরা ভারতবাসীরা সেই যুদ্ধের (প্রথম মহাযুদ্ধের) প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলাম না, ইংরেজের প্রাদেশিক প্রজা হিসেবে তার সঙ্গে কতকটা জড়িয়ে পড়েছিলাম মাত্র।...সেই চার বৎসরব্যাপী যুদ্ধ ব্যাপারটির সঙ্গে আমাদের 'নাড়ীর' যোগ না থাক 'তারের' যোগ ছিলোই। তাই যুদ্ধের আগুনের আঁচ পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির গায়ে লাগবে, আমরাও বাদ যাবো না—এ জ্ঞান প্রমথ চৌধুরীর মতো কোন কোন চিন্তাশীলের ছিলো।...দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরণ, যুদ্ধভাণ্ডারে দেড়শো কোটি টাকা দান, দেশবাসীর ওপর (যুদ্ধের খরচের জন্য) চাপানো কর-ভার, যুদ্ধকালে শিল্পবাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা, নতুন কর্মোদ্যোগের অভাব-সব মিলিয়ে একটা অর্থনৈতিক অরাজকতা তখন চলেছে। ...এর অনিবার্য পরিণামে দেশে, বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে, দেখা দিলো অবসাদ, শূন্যতাবোধ ও বিষাদাত্মকতা [জীবেন্দ্র সিংহরায় ১৯৮৭ : ১১২-২১] ।

পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চাকুরি ত্যাগের হিড়িকে শহরে নগরে শিক্ষিত বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা দেয় পারিবারিক বিন্যাসের পরিবর্তন, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজে নারীদের স্থান বিষয়ে ভাবনাজাত নতুন মূল্যবোধ। বাঙালি পল্টনের সুবাদে তরুণ চিত্তে বিদ্রোহ, বলিষ্ঠতা এবং বিজয়ী হবার বাসনা দুর্মর হয়ে ওঠে। সর্বোপরি, রাজনৈতিক সচেতনতা, তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং গোপন সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদিও সমাজদেহে আন্দোলন তোলে। এভাবে সমকালের প্রবীণ-নবীন সাহিত্যিকগণের ভাবজগত তৈরি হয়েছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালের এই সমাজমানস পরিবেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিলো। ভারতবর্ষ এবার প্রায় প্রত্যক্ষভাবে এ যুদ্ধে জড়িত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিটিশশাসিত ভারতের সকল সহায়-সম্পদ নির্বিচারে নির্দ্বিধায় ব্যবহৃত হয় এ যুদ্ধে। যুদ্ধের উত্তাপ যতো ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী হতে থাকে ততই অন্ন—বস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তে ভারত শোষিত হতে থাকে। এমনকি ভারত থেকে প্রচুর সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধসামগ্রী পাঠানো হয় আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে। পাশাপাশি স্বদেশে দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ও সংগ্রাম করতে হয় ভারত তথা বাংলাকে। ফলে পুনরায় বেকার সমস্যা, শিল্প সমস্যা, বিনিয়োগ সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে বাংলাদেশের মানুষ জর্জরিত হতে থাকে। অন্নবস্ত্র-অর্থ-জ্বালানি-স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় সীমাহীন দুর্ভোগ। ফলে বাংলাদেশে জনগণের ওপর নেমে আসে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়। এমন পরিস্থিতিতে এটিই স্বাভাবিক। সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহেইমের ভাষায় এ ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এরকম,

> When the rationalized mechanism of social life collapses in time of crisis the individual cannot repair it by his own insight. Instead own impotence reduces him to a stage of terrified helplessness.

(উদ্ধৃত : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৮৮ : ৯৩)

এই পরিস্থিতিতেই সমকালীন সাহিত্যিকগণ বেড়ে উঠেছিলেন। এই পরিবর্তমান অবস্থাকে তাঁরা এড়িয়ে চলতে পারেননি। তা সম্ভবও নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায়, 'প্রথম চোখ খোলার সঙ্গেই তাঁরা বহ্নিবলয় বেষ্টিত বিক্ষুব্ধ দিগন্ত দেখেছেন..' [প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৩৬০ : কৈফিয়ত : প্রথম পৃষ্ঠা]। সেই দ্বন্দ্বমুখর, বিপর্যয়ক্লিষ্ট, অস্থির সময়ের পরিচয় মেলে সমকালের অনেক সাহিত্যিকের রচনায়। সন্তোষকুমার ঘোষের স্মৃতিচারণা এখানে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য—

> ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসও—সেইসব দুঃস্বপ্নের দিন, নিষ্প্রদীপ, পণ্যমূল্যের উল্লম্ফন, মন্বন্তর, পাষাণ-পথে নিরন্নের শব। দলে দলে পুরুষভিখারী, দলে দলে নারীর পেছনে নিছক লোভাতুর শরীরশিকারী। বাংলা তখন আপনাকে বাঁচাতে পারছে না। প্রাণ রাখতে গিয়ে আত্মা বিকিয়ে যাচ্ছে। মনুষ্যত্ব আর টাকার দাম পড়ছিলো হু হু করে, পাল্লা দিয়ে, সেই সঙ্গে যতেক মূল্যবোধ...।
>
> তখন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাশ্চাত্য শক্তির সমরোদ্যমের বড়ো ঘাঁটি কলকাতা। এখানে ব্ল্যাকআউট, এখানে বোমা। এখান থেকেই বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এই শহরের রাস্তার পাঁজর সাঁজোয়া গাড়ির ঘর্ষণে অষ্টপ্রহর কেঁপে কেঁপে উঠছে—ফৌজী ছাউনি যত্রযত্র, এবং তারই আনুষঙ্গিক জীবন, নিষ্পেষণ এবং প্রলোভন। এত কাছ থেকে সত্যকার লড়াইয়ের চেহারা এদেশ দীর্ঘকাল দেখেনি।...এই দেশের অন্যত্র যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিক বিচারে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে লড়াই-এর পাপ আর ছাপ তার উপরেই পড়েছিল সবচেয়ে বেশি। আর সেই পূর্বাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতাসহ গোটা বাংলা।...
>
> মহাযুদ্ধের দুর্যোগের রাত্রির পরে উঠে দেখি বিধ্বস্ত জীবন, ঝরা আর মরা পাতার স্তূপ, সেই জ্বরজ্বর সকালে স্বাধীনতার সূর্যালোকও যেন ভালো করে ফুটল না। [সন্তোষকুমার ঘোষ ১৩৭৮ : ১৫৭-৫৮]।

সেই সময়ের বৈশিষ্ট্যই ছিলো মানুষের সর্বাত্মক বিকৃতি, ক্ষয়িষ্ণু, ধর্ম, সংস্কার ও পারিবারিক জীবনবোধে ফাটল ও বদল, পুঞ্জীভূত গ্লানি, দুর্ভিক্ষজনিত অসুস্থ পরিবেশ, কালো-বাজারির করাল থাবা, সাইরেন, যুদ্ধবিমান, বোমা, জীবনের জন্যে পলায়ন আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইভাকুয়েশনের সংমিশ্রণে এক শঙ্কাতাড়িত ভয়াল পরিস্থিতি। সেই পরিবেশ–পরিস্থিতিতে 'জীবনাতিরিক্ত কোন নিরঞ্জন সত্যের সন্ধান সাহিত্যিক পাননি' [নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তা.বি:৪]; বরং 'ভিতরে বাইরে এই অসহ্য যন্ত্রণার চাবুকে জর্জরিত হয়ে উঠে সেদিন বাঙালি লেখকরা কলমের মুখে ক্ষিপ্ত বেদনার বজ্রদ্যুতি সঞ্চার করেছিলেন' [প্রাগুক্ত ১৩৬৪ : ৫১]। এজন্যেই প্রথম মহাযুদ্ধ বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ও পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধ–বিগ্রহের বিশদ প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিবৃত্তের বিবর্তনের স্বরূপ–সন্ধানেও উপর্যুক্ত পটভূমি অনিবার্যভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমাদের আলোচ্য কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতাসমগ্রেও তাই যুদ্ধবিগ্রহের প্রতিফলন প্রাপ্য। একথা সত্য যে কোন সাহিত্যিকই যুগ–প্রবাহ, পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং এসবের প্রভাব থেকে দূরে থাকতে পারেননি। সমকাল ও সমাজ এবং প্রাসঙ্গিক জীবনযাত্রা কবির চেতনা–বিকাশের উৎস ও প্রেরণা। মনে রাখা প্রয়োজন,

> The first and the most significant reason for the relationship between society and literature is the fact that man creates the literature and he is a social animal [Biswas 1974 : 1] ।

'নির্জনচারী' অভিধাপ্রাপ্ত কবি জীবনানন্দ দাশও সামাজিক ; সমকালের এবং যুগ–পরিবেশের মানুষ। বস্তুত শিল্পের জগত জারিত হয়ে থাকে সমূহ জীবন, সকল অনুভূতি, সর্ববিধ পর্যবেক্ষণ—সংক্ষেপে সমগ্র অভিজ্ঞতার নির্যাসে। জাগতিক ঘটনাবলিই এই নির্যাস প্রাপ্তির মৌল উৎস। কবিরাও জাগতিক ঘটনাপুঞ্জ থেকে দূরে থাকতে পারেন না ; বরং এর সাথে সচেতন সম্পৃক্তিই তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ নিরিখেই 'জীবননান্দ দাশের কবিতায় মহাযুদ্ধের প্রতিফলন' বিষয়টির স্বরূপ অনুসন্ধানযোগ্য।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রতিচিত্রিত মহাযুদ্ধের স্বরূপ বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য। সকল সময়েই সে প্রতিচিত্রণ শুধু প্রত্যক্ষ উপাদানসঞ্জাত না হলেও রূপকে–প্রতীকেও অভিব্যক্ত। সেখানে ফুটে উঠেছে যুদ্ধদিনের কথা, যুদ্ধকালীন প্রতিবেশ বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক নানা প্রতিক্রিয়া। তাঁর কবিতাবলি অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণে মহাযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রভাব সঙ্কট, বিপর্যয় ইত্যাদির চিত্রায়ণকে সূত্রবদ্ধ করা যায় এভাবে—

ক. যুদ্ধকালীন প্রতিবেশ ;
খ. যুদ্ধের কারণ ও উৎস সম্পর্কিত মনোভাব ও ধারণা ;
গ. মহাযুদ্ধের ফলাফল এবং প্রাসঙ্গিক প্রভাব–প্রতিক্রিয়া ;
ঘ. যুদ্ধ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব ;
ঙ. শান্তি কামনা এবং ইতিবাচক প্রত্যাশা ;
চ. সংশয়চিত্ততা ; এবং
ছ. যুদ্ধসম্পৃক্ত শব্দ ও উপমার ব্যবহার।

এভাবেই জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আবিষ্কৃত হয় মহাযুদ্ধতাড়িত, পীড়িত এবং বিধ্বস্ত বাংলাদেশ ও পৃথিবীর কথকতা। এ তাঁর সমাজ চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। বলা যায়, তাঁর অন্তর্গত ইতিহাসচেতনারই অন্য এক রূপ সমাজচেতনা। এ চেতনা প্রথম দানা বাঁধে তাঁর ধূসর পাণ্ডুলিপি (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬)—কাব্যে। কারণ, 'সাম্রাজ্যবাদ অথবা যান্ত্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগের হৃদয়হীনতা কবিকে বিক্ষুব্ধ করেছিলো' [দীপ্তি ত্রিপাঠী ১৯৭৪ : ১৮১]। সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাসিবাদের প্রত্যক্ষরূপ যুদ্ধ তথা মহাযুদ্ধকে কবি বিভিন্নরূপে উপলব্ধি করেছেন। সেই বোধেরই প্রকাশ রয়েছে তাঁর কবিতাসমগ্রতে।

যুদ্ধকালীন প্রতিবেশ

রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে যুদ্ধবিগ্রহের এক অন্যতম দিক হলো যুদ্ধ-প্রতিবেশের বিদ্যমানতা। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ও পরিবেশের মধ্যেই সে সময়ের কবিসাহিত্যিকরা বেড়ে উঠেছিলেন এবং সৃষ্টিশীল ছিলেন। এঁদের রচনায় ফুটে উঠেছে সমকালীন যুদ্ধজীবনের সুস্পষ্ট পরিবেশ। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ স্পর্শে এবং অভিজ্ঞতায় তাঁরা স্পন্দিত ও আলোড়িত হয়েছিলেন বেশি। রমাপদ চৌধুরীর ভাষায়—

> সেসব দিনের কথা ভোলা যায় না। তখনকার জীবনতো গল্পের মত ছিল না,...। খবরের কাগজে তখন বড় বড় হরফে যুদ্ধের খবর, বোমা, ইভাকুয়েশন, বিয়াল্লিশ, মন্বন্তর ; একটার পর একটা। সারা কলকাতার বুকে মার্কিন সৈনিকের বঙ্কিম উল্লাস, ব্রিটিশ টমিদের হটকারিতা [রমাপদ চৌধুরী ১৩৮২ : ১৬১]।

প্রকৃতই সে সময় তাঁরা দেখেছেন ও জেনেছেন এই ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর পশ্চাদপসারণে ভারতের পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে বাংলাদেশে মিত্রশক্তির ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির স্বরূপ। এই প্রস্তুতির উদ্দেশ্য, পূর্বদিক তথা বাংলাদেশের দিক থেকে সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণ প্রতিহত এবং স্বীয় অগ্রাভিযান পরিচালনা করা। এজন্যে দেশ জুড়ে চলেছিলো সামরিক কনভয়ের ও সৈন্য-সামন্তের চলাচল, সামরিক স্থাপনা ও বিমানঘাঁটি নির্মাণ, আকাশে শত্রু ও মিত্রপক্ষের জঙ্গি বিমানের ওড়াউড়ি, এমনকি কলকাতাসহ বাংলাদেশের এখানে সেখানে বিমান হামলা ও বোমাবর্ষণ। এসব অভিজ্ঞতা ও পরিবেশঋদ্ধ ছিলেন এ সময়ের কবিগণ। ক্লিন্টন বি. সিলি আখ্যায়িত 'অসাধারণ নির্জনতম কবি' জীবনানন্দ দাশও এই পরিবেশ ও অভিজ্ঞতাবিমুক্ত ছিলেন না। তাই তাঁর কবিতাতেও যুদ্ধ-প্রতিবেশ প্রাপ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের মানুষদের অভিজ্ঞতায় যুক্ত হয়েছিলো যুদ্ধবিমানের উড্ডয়ন, সঞ্চরণ এবং আক্রমণের দৃশ্য ও ঘটনাবলি। ১৯৪২ এর ৮ মে অপরাহ্নে জাপানিরা প্রথম চট্টগ্রামে বোমা ফেলে। পরদিন সকালবেলাতেও বিমান হানা দেয়। এর মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে ফেনী ও ডিব্রুগড়ে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ২০ ডিসেম্বর রাতে কলকাতায় প্রথম বিমান হামলা ঘটে। একই দিন চট্টগ্রামেও আবার বোমা পড়ে। এরপর ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা, ফেনী ও চট্টগ্রামে বেশ কয়েকবার বিমান আক্রমণ সংঘটিত হয়। ১৯৪৩ সালের শুরু থেকে কয়েকদিন পর পর কলকাতায় বোমা হামলা হয়। তারপর দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ৫ ডিসেম্বর, রোববার দিনেরবেলায় কলকাতার খিদিরপুর ডকইয়ার্ডে জাপানি বিমান হামলা ঘটে। জীবনানন্দ দাশ এই বিষম সময়েই বেড়ে উঠেছিলেন। তাই দেখা যায়, জীবনানন্দ দাশের কবিতায়ও যুদ্ধবিমান, বোমা, সাইরেন, নিষ্প্রদীপ ইত্যাদি বিষয় প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ হয়েছে। সেগুলো এসেছে কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো উপমা হিসেবে, কখনোবা প্রতীকে-রূপকে। তাঁর কবিতায় যুদ্ধ প্রতিবেশের এসব চিত্রায়ণ বাস্তবতাসঞ্জাত একথা বলা অত্যুক্তি হবে না। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত হলো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. মাঝে–মাঝে দু–চারটে প্লেন চ'লে যায়।
(বিভিন্ন কোরাস : মহাপৃথিবী)

খ. কোথাও নবীন আশা র'য়ে গেছে ভেবে
নীলিমার অনুকল্পে আজ যারা সয়েছে বিমান,—
(প্রতীতি : সাতটি তারার তিমির)

গ. এছাড়া, দিনের কোন সুর ;
নেই,
বসন্তের অন্য সাড়া নেই
প্লেন আছে
অগণন প্লেন
অগণ্য এয়োরোড্রাম
র'য়ে গেছে।
(উত্তর প্রবেশ : প্রাগুক্ত)

ঘ. অমিলনে সূর্যরোলে জ্যোতির্ময় এলুমিনিয়ম অনুভব
ক'রে আমি দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি এরোপ্লেন গুনে
নীলিমা দেখার ছলে শতাব্দীর প্রেতাত্মাকে দেখেছি অরুণে।
(ভোর ও ছয়টি বমার : ১৯৪২ : প্রাগুক্ত)

ঙ. আকাশকে নিরালম্ব ক'রে দিয়ে বোমারু বিমান
উড়ে যায়—
(বৃক্ষ : প্রাগুক্ত)

চ. কেঁপে ওঠে বমারের কলরবে সারাদিন সমুদ্রের পারে বংশাল।
(মানুষ চারিয়ে : প্রাগুক্ত)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ এই প্রতীতি জন্মায় জীবনানন্দ দাশ সমসময়ের যুদ্ধ–প্রতিবেশের অন্যতম উপাদান যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার, বমার, যুদ্ধ–প্রয়োজনে নির্মিত অসংখ্য এরোড্রাম ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন এবং সেগুলোকে তাঁর কবিতায় সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন। আরো লক্ষণীয়, বিমান আক্রমণের এবং এ ব্যাপারে সতর্কীকরণ ব্যবস্থার অন্যতম অনুষঙ্গ সাইরেন, নিষ্প্রদীপতা, বোমার স্প্লিন্টার ইত্যাদিও তাঁর কবিতায় সুপ্রযুক্ত। কয়েকটি উদাহরণ :

ক. সাইরেনের কথা স্থির ;
(বিস্ময় : সাতটি তারার তিমির)

খ. ... তাই মানুষের ইতিহাসবিবর্ণ হৃদয়
নগরে–নগরে গ্রামে নিষ্প্রদীপ হয়।
(রাত্রির কোরাস : প্রাগুক্ত)

গ. ...সর্বদাই মরণের অতীব প্রসার,
জেনে কেউ অভ্যাসবশত তবু দু'–চারটে জীবনের কথা
ব্যবহার ক'রে নিতে গিয়ে দেখে অলক্লীয়ারেরও চেয়ে বেশি
প্রত্যাশায় ব্যাপ্তিকাল ভোলেনি প্রাণের একাগ্রতা।
(প্রিয়দের প্রাণে : বেলা অবেলা কালবেলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. ...অপ্রদীপ রাত্রি রীতি অহেতুক উৎসারিত জিনিস হৃদয়ে
(কবের সে রাত্রি আজ ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

ঙ. ... ডুবে গেলে মানুষের আজকের চিন্তার উদ্যম
'অল ক্লিয়ারের' মতো অস্পস্ট আবেগে
তিমির রাত্রির ক্রেংকার।
(আলো সাগরের গান : প্রাগুক্ত)

এছাড়া যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সমগ্র বাংলাদেশ ও কলকাতার পরিবেশও হয়ে ওঠে ক্লিন্ন ; জীবনানন্দের ভাষায়, 'অন্ধকার অজন্মা প্রান্তর, মৃত অর্ধমৃত নগর বন্দর' [এক অন্ধকার থেকে : অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র], যেখানে 'বসন্তের অন্য সাড়া' [উত্তর প্রবেশ : সাতটি তারার তিমির] পাওয়া যায় না। শোনা যায় শুধু 'নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ' [সময়ের কাছে : প্রাগুক্ত] । দেখা যায় শুধু, 'রক্তের সমুদ্র চারিদিকে' [দীপ্তি : প্রাগুক্ত]। কারণ, আজ এ পৃথিবীতে যুদ্ধের 'দুন্দুভি বেজে ওঠে' এবং যা কবির কাছে 'শতাব্দীর অন্ধকার'-এই অন্য নাম [অবরোধ : বেলা অবেলা কালবেলা]। আর এভাবেই পৃথিবী হয়ে ওঠে এক 'মোহিনী নরক' [চারিদিকে প্রকৃতির : প্রাগুক্ত]। কবি একে বিশ্লেষণ করেন 'অনন্তের জ্ঞানপাপ' হিসেবে [সূর্য নক্ষত্র নারী : প্রাগুক্ত]। ফলে, এই যুদ্ধধ্বস্ত পৃথিবীতে এখন অনেক লোক—

ঘুমের ভিতরে গিয়ে ছুটি চায়।
* * * *
কোনো ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুর নামান্তর।
অনেকেরই ঘুম
জেগে থাকা।
(রাত্রির কোরাস : সাতটি তারার তিমির)

কারণ,

কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস র'য়ে গেছে ;
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
র'য়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কনভয়,—
(প্রাগুক্ত)

এমনকি, শতাব্দীর প্রেতাত্মারূপে আকাশে উড্ডীন বোমারু বিমানের আক্রমণের বিপরীতে কবি লক্ষ করেন :

অগণন অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট গান, সার্চলাইট ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখা যায়।
(শ্রুতি-স্মৃতি ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

শুধু তাই নয়, কলকাতার রাজপথেও দেখা যায় বিদেশী সৈন্যের-নাবিকের প্রাচুর্য। বুদ্ধদেব বসু সমকালে সৈন্য সামন্তের অবাধ সঞ্চরণকে বলেছেন 'খাকির অফুরন্ত ভিড়'-যার ফলে জনসাধারণকে 'পা টিপে টিপে হাঁটতে হয়।' [বুদ্ধদেব বসু ১৩৬২ : ৮৩] জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও সেই প্রতিচিত্র বিদ্যমান। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল :

ক. ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

(রাত্রি ; সাতটি তারার তিমির)

খ. লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী...

(মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প : বেলা অবেলা কালবেলা)

গ. মাঝে-মাঝে এন্বুলেন্স গাড়ির ভিতরে
রণক্লান্ত নাবিকেরা ঘরে
ফিরে আসে

(এই সব দিনরাত্রি।। অন্যান্য কবিতা : কাব্যসম্ভার)

ঘ. চারিদিকে সৈন্য বণিক কর্মী সুধী নটীর মিছিলঘোরে ;

(পটভূমি।। অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

ঙ. ...সে সব পথে তোমার কাছে গিয়ে
পরিহাসের রসিকতায় উৎসারিত হয়ে
সৈন্য, নটী, দালাল, ভাঁড় ব্রাত্য, সার্থবাহের ঘরে
সচ্ছলতা আশা আপোশ কাড়াকাড়ি বিলাস ব্যর্থতায়
দেখেছিলাম কল্কী ও তার ঘোড়া রগড় করে।

(যদিও আজ তোমার চোখে : প্রাগুক্ত)

যুদ্ধদিনের এমন অবস্থায় সাধারণ মানুষ ত্রস্ত হয়। তারা তখন জীবন বাঁচাতেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত, অব্যবস্থচিত্ত এবং নিরাপত্তাবোধহীন মানুষজন হয়ে ওঠে পলায়নপর ; নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বিশেষ করে তারা গ্রামকেই বেছে নেয়। বুদ্ধদেব বসু এই ঘটনাকে সমকালে কলকাতার বাবুদের 'Back to village'প্রবণতা বলে পরিহাস করেছিলেন [বুদ্ধদেব বসু ১৯৫২:১৭-১৮]। তবুও ব্যাপারটি জৈবিক ধর্ম। কারণ, প্রাণিমাত্রেই জীবনের জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ দাশও এ বিষয়টি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর কবিতাতেও পলায়নপর মানুষের এই অবস্থার এবং এর ফলে সমকালের কলকাতার চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে—

আবার একটি দিন আমাদের মৃগতৃষ্ণার মতো পৃথিবীতে
শেষ হয়ে গেল তবে ;-শহরের ট্রাম
উত্তেজিত হয়ে উঠে সহজেই ভবিতব্যতার
যাত্রীদের বুকে নিয়ে কোন্ এক নিরুদ্দেশ কুড়োতে চলেছে।

*　　*　　*

এই দুই দিগন্তের থেকে সময়ের
তাড়া খেয়ে পলাতক অনেক পুরুষ-নারী পথে
ফুটপাতে মাঠে জীপে ব্যারাকে...

(উত্তর সামরিকী : বেলা অবেলা কালবেলা)

কারণ,

ভূপৃষ্ঠের অই দিকে-জানি আমি-আবার নতুন ব্যাবিলন
উঠেছে অনেক দূর ;-শোনা যায় কর্নিশে সিংহের গর্জন।
হয়তো -বা ধুলোসাৎ হ'য়ে গেছে এত রাতে ময়ূরবাহন।

(পরিচায়ক : মহাপৃথিবী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেজন্যেই তিনি জানেন, এ সময়ে—

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।

(বিভিন্ন কোরাস : সাতটি তারার তিমির)

এতে কবিচিত্তে ভীতির সঞ্চার হয় ; সৃষ্টি হয় পলায়নী মনোভাব। তাই কবি বলেন—

...সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে-ভয় পাই-গুহায় লুকাই ;
লীন হতে চাই-লীন-ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
চাই।

(ইতিহাসযান : প্রাগুক্ত)

ফলে, কলকাতা বিরান হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে বিমান হামলার প্রেক্ষিতে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের সর্বস্ব ফেলে পলায়নের তথ্য ইতিহাসসম্মত। সমকালের পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রচুর সংবাদ-প্রতিবেদন প্রাপ্য। কবিও বলেন,

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ ;
চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো-সাঁকো সমাধির ভিড়।

(একটি নক্ষত্র আসে॥ অন্যান্য কবিতা : কাব্যসম্ভার)

শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নয় ; সকলকালেই এমন ঘটে। এমনকি নিকট অতীতে একাত্তুরে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এরকম ঘটেছিলো। বাস্তবিক, 'আমাদের দুহাজার বছরের জ্ঞান এ-রকম'ই (ইতিহাসযান : সাতটি তারার তিমির)।

উপরোক্ত যুদ্ধকালীন প্রত্যক্ষ প্রতিবেশ ছাড়াও জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যুদ্ধসম্পৃক্ত অস্ত্রাদি এবং সমরনায়কের উল্লেখও রয়েছে। এসব নাম-শব্দ যেভাবেই প্রযুক্ত হোকনা কেন কবির অভিজ্ঞতায় সেসব আহৃত হয়েছে সমসময়ের জীবন, পরিবেশ ও তথ্যপ্রবাহ থেকে। এগুলোও যুদ্ধ-প্রতিবেশের সাক্ষ্য। যেমন—

ক. কামানের ঊর্দ্ধে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
ভারত সাগর ছেড়ে উড়ে যায়...

(বিভিন্ন কোরাস : সাতটি তারার তিমির)

খ. কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হ'য়ে
আজ রাতে ঢের মেঘ হিম হ'য়ে আছে দিকে-দিকে !

(রিস্টওয়াচ : প্রাগুক্ত)

গ. তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

(গোধূলি সন্ধির নৃত্য : প্রাগুক্ত)

ঘ. কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ নিরীহ, নিরাশ্রয়।

(ক্ষেতে প্রান্তরে : প্রাগুক্ত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঙ. না হ'লে কিছুই নেই লবেজান লড়ায়ে জাহাজে।
(প্রতীতি : প্রাগুক্ত)

চ. ...—হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হ'য়ে গেল লাল :
(সৃষ্টির তীরে : প্রাগুক্ত)

ছ. ফ্যাক্টরীর সিটি এসে ডাকে যদি,
ব্রেন কামানের শব্দ হয়,
(মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প : বেলা অবেলা কালবেলা)

জ. নিচে হতাহত সৈন্যদের ভিড় পেরিয়ে,
* * * *
কোথায় শিবিরে গিয়ে পৌছলাম আমি।
সেখানে মাতাল সেনানায়কেরা
মদকে নারীর মতো ব্যবহার করছে,
নারীকে জলের মতো ;
(সময়ের তীরে : প্রাগুক্ত)

জীবনানন্দ দাশের কবিতাবলি থেকে উদ্ধৃত ও বিশ্লেষিত বিবিধ উদাহরণ পাঠকমনে সমসময়ের যুদ্ধকালীন প্রতিবেশের এক বিশ্বস্ত চিত্র ফুটিয়ে তোলে। বিদেশী সৈন্য, নাবিক, যুদ্ধবাহন, যুদ্ধবিমান, জাহাজ, বমার ও বোমা, বোমার স্প্লিন্টার, শেল, সাইরেন, ছাউনি, মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অ্যান্টিএয়ার ক্রাফট্ গান, কনভয়, এরোড্রোম, বিমান হামলা সংশ্লিষ্ট অলক্লিয়ার, নিষ্প্রদীপতা এবং সর্বোপরি যুদ্ধভীত পলায়নপর মানুষ ইত্যাদি তথ্য ও চিত্রের ব্যবহার ও অঙ্কনের মধ্য দিয়ে একটি সমকালীন সুস্পষ্ট যুদ্ধ-প্রতিবেশ তাঁর কবিতায় প্রতিচিত্রিত হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে এসবের মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমসময়ের কলকাতাকেই প্রত্যক্ষ করি। এই যুদ্ধ প্রতিবেশ বাস্তব, ইতিহাসসম্মত এবং জীবনানন্দ দাশের সমকাল-চেতনার স্পষ্ট সাক্ষ্য।

খ. যুদ্ধের কারণ এবং উৎস সম্পর্কে মনোভাব ও ধারণা

মানুষ স্বভাবতই যুদ্ধপ্রবণ এবং যুদ্ধ উন্মুখ। পৃথিবীর সকল সভ্যতার সূচনাতেই 'established and dominant instiutton' হিসেবে যুদ্ধবিগ্রহের বিদ্যমানতা একটি ঐতিহাসিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত [Toyenbee 1951 : viii] । এ প্রেক্ষিতেই যুদ্ধ ও সভ্যতা 'Siamese twins' [Dyer 1985 : 4] হিসেবেও আখ্যায়িত। মানবীয় এই প্রবণতা এবং সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য যে কোন অনুকূল সুযোগেই দাবাগ্নির মতো জ্বলে ওঠে। এটি যুদ্ধবিজ্ঞানের ভাষায় 'triggering occasion'বলে পরিচিত। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ শুরুর সকল কার্যকারণকে মুহূর্তে দাবানলে পরিণত করে পাশাখেলা ও তাতে হারজিতের প্রসঙ্গটি। রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধাবস্থাকে ভীষণতর করে তোলে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের ঘটনাটি। কারবালার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের নেপথ্যে এজিদ ও হাসান-হোসেনের মধ্যে রাজনৈতিক ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব কারণ হলেও এতে বিস্ফোরণের ইন্ধন যুগিয়েছে এজিদের জয়নাবকে কামনার এবং প্রাপ্তির বাসনার তীব্রতা। আর তাতে ঘৃতাহুতি দেয় হাসান ও জয়নাবের বিবাহের ঘটনা। প্রথম মহাযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গটি ছিলো আততায়ী কর্তৃক অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনান্ডের নিহত হওয়া। তবে এসব ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা প্রকৃত যুদ্ধ শুরুর উপলক্ষ হলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধের নেপথ্যে বিরাজমান ও বিকাশমান বহুবিধ কারণও গণ্য। এই অন্তর্জাত কারণসমূহ আবার কালান্তরে ক্রমবিবর্তনশীল। সেজন্যেই প্রাগৈতিহাসিক কালের বা মধ্যযুগের আলোচ্য কারণ আধুনিককালে এক নয়—সকলকালে যুদ্ধের মৌল প্রবণতা এক হলেও। সভ্যতা ও সমাজজীবনের এ বিষয়টির জীবনানন্দ দাশ অবহিত ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহের বিবিধ কারণ তাই তাঁর কবিতাবলিতে প্রাপণীয়। দেখা গেছে, মহাযুদ্ধ ও সমসময়ের বিশ্ব এবং বাংলাদেশের এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে এর কারণসমূহ তিনি বিবৃত করেছেন বিভিন্ন কবিতায়।

জীবনানন্দ দাশ সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে যুদ্ধবিগ্রহকে বিশ্লেষণ এবং উল্লেখ করেছেন । তিনি মনে করেন যুদ্ধবিগ্রহ মানবীয় প্রকৃতিজাত এবং একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য । সমাজবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মানুষের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির গভীরেই যুদ্ধপ্রবণতা প্রোথিত। এটি প্রেম ও ঈর্ষার মতোই জৈবিক, আদিম ও অপ্রতিরোধ্য। যুগক্রমে এ প্রবণতা চারিত্র্যধর্মে বিবর্তনশীল হলেও মৌলিক। জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও সে তত্ত্ব প্রতিধ্বনিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বৈশ্বিক পটভূমিতে তিনি 'কর্নিশে সিংহের গর্জন' শুনে বুঝতে পারেন যুদ্ধ এবং ধ্বংস বাংলাদেশেও সমাগত। কারণ,

মানুষ এখনও নীল, আদিম সাপুড়ে:

(পরিচায়ক : মহাপৃথিবী)

তাই,

রক্ত আর মৃত্যু ছাড়া কিছু পায়নাকো তারা খনিজ, অমূল্য মাটি খুঁড়ে।

(প্রাগুক্ত)

ফলে এতে পৃথিবীতে ঘটে,

...নরকের আগুনের মতো অহরহ রক্তপাত ;

(প্রাগুক্ত)

আসলে মানুষেরাই চিরকাল—

শাণিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।

(প্রাগুক্ত)

মানুষের আদিম হিংস্র এই প্রবৃত্তি এমন এক বৈশিষ্ট্য যা বর্তমান শতাব্দীতেও স্তিমিত নয় ; বরং প্রজ্বলিত করে 'ভাস্বর আগুন'। যুদ্ধরূপ সে আগুন 'জীবনকে টিটকারি দিয়ে যায়' ক্রমাগত। মানবীয় কল্যাণ প্রবণতাও অন্তর্জাত হিংসা প্রবৃত্তির কাছে হার মেনে যায়। মানুষের সকল শুভ ইচ্ছা—

...অবাধ হিংসার
রিরংসা-পাকে ঘুরে ঘুরে ঘুরে শূন্য হয়ে যায়—

(যেন তা কল্যাণ সত্য চায়॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

রক্তাক্ত হওয়া এবং রক্ত পিপাসা যুদ্ধপ্রবণ মানুষেরই। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এর ব্যতিক্রম কিংবা সমাপ্তি নেই। কবি বলেন—

ক. হয়তো-বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা ;
হয়তো-বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক—
মানুষও রক্তাক্ত হতে চায় ;—

(মহাত্মা গান্ধী : বেলা অবেলা কালবেলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. অনেক রক্তাক্ত সোনা লুফে নিয়ে চ'লে গেছে নগরীর পানে
মানুষেরা রক্তের সন্ধানে।

(সোনালি অগ্নির মতো ।। অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতা সমগ্র)

সেজন্যেই কবি অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ভাবেন—

হয়তো চেঙ্গিস আজো বাহিরে ঘুরিতে আছে করুণ রক্তের অভিযানে।

(মনোসরণি : সাতটি তারার তিমির)

এরকম অসংখ্য চেঙ্গিস খানের রক্তাভিযানের ফলেই দেখা যায়—

রক্তের সমুদ্র চারিদিকে ;
কলকাতা থেকে দূরে
গ্রীসের অলিভ-বন
অন্ধকার।
অগণন লোক ম'রে যায় ;

(দীপ্তি : প্রাগুক্ত)

এমনকি,

নিসর্গের কাছ থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুষের
মূঢ় রক্তে ভ'রে যায় ;

(এইখানে সূর্যের ।। অন্যান্য কবিতা : কাব্যসম্ভার)

কবি বোঝেন, মানুষের এই প্রবৃত্তির ফলেই যুদ্ধ সবসময়েই চারপাশে নিঃশ্বাস ফেলে প্রেতের মতো। তিনি অনুভব করেন—

পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ ;
পুবদিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা ;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা ;

(রাত্রির কোরাস : সাতটি তারার তিমির)

মানবীয় যুদ্ধপ্রবৃত্তির ফলে ঘটেছে ধ্বংসকর মহাযুদ্ধ। সমাজবিজ্ঞানীরা এই যুদ্ধপ্রবণতাকে প্রাণীদের 'মাংসভূক প্রবণতা' (Carnivorous psychology) বলে অভিহিত করেছেন। [Nelson 1980 : 22]। জীবনানন্দ দাশও সমকালের যুদ্ধউন্মত্ত পৃথিবীকে এবং যুদ্ধরত মানুষকে জঙ্গল ও জন্তুরূপে অভিহিত করেছেন এভাবে—

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পড়ে লজ্জাবশত।

(রাত্রি : প্রাগুক্ত)

এই ঘৃণামিশ্রিত তীব্র কটাক্ষ মহাযুদ্ধে জড়িত জাতি ও মানুষদের প্রতি কবির ধিক্কারের প্রকাশ। মানুষের এই জান্তব প্রবণতার জন্যেই মানুষ—কবির ভাষায়—

আলোর চেয়েও তার সহোদরা আঁধারের পথে বারবার জন্ম নিয়ে
যোদ্ধা জয়ী অবক্ষয়ী কলঙ্কী হয়েছি।

(শ্রুতি-স্মৃতি ।। অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এভাবেই এই পৃথিবীর মানুষের হন্তারকের ভূমিকায় নিয়ত ব্যাপৃত। কবি বলেন—

ভাই-বোন-স্মৃতি-শান্তি হননের ঘোরে উদ্বেলিত
বহতা নদীর মতো আজো এই পৃথিবী চলেছে।
(পৃথিবী ও সময়॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

এমন অবস্থায় কবি নিজেকেও সেই ঘাতকের মতো একজন বলে ভাবেন। তাই মানুষকে ভালোবাসা দিতে গিয়েও কবি শঙ্কিতচিত্তে লক্ষ করেন—

...আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে;
(সুচেতনা : বনলতা সেন)

মানুষ স্বভাবতই যুদ্ধপ্রবণ এবং যুদ্ধ-উন্মুখ-জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় এ সত্যকে প্রতিভাত করেছেন। উপর্যুক্ত আলোচনায় তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রবণতার ফলেই সমাজ-সভ্যতায় এটি এক চিরন্তন এবং বহমান বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধবিগ্রহের কারণ হিসেবে কবি তাও লক্ষ করেছেন। তাই তিনি উপলব্ধি করেন চিরপুরাতন এই পৃথিবী 'মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান'। [বিভিন্নকোরাস : সাতটি তারার তিমির]। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তিনি পৃথিবীতে 'ভীতি শব্দ, রক্ত শব্দ' ইত্যাদি শুনলেও বস্তুত প্রত্যক্ষ করেন 'প্রকৃতি নিজের মনোভাব নিয়ে অতীব প্রবীণ ;' [প্রতীতী : প্রাগুক্ত]। কবি এই বহমান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো বলেন—

সে অনেক রাজনীতি রুগ্ননীতি মারী
মন্বন্তর যুদ্ধ ঋণ সময়ের থেকে
উঠে এসে এই পৃথিবীর পথে আড়াই হাজার
বছর বয়সী আমি ;
(তবু ॥ অন্যান্য কবিতা : কাব্য সম্ভার)

আড়াই হাজার বৎসরের পুরোনো সভ্যতায় এই বৈশিষ্ট্য পথ-পরিক্রমারত। ফলে মানুষ 'শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতরে দাঁড়িয়ে [এইসব দিনরাত্রি : প্রাগুক্ত] কেবল যুদ্ধকেই অনুভব করে। শোনে 'বিরাট শ্বেতপক্ষিসূর্যের/ ডানার উড্ডীন কলরোল', এবং প্রত্যক্ষ করে যুদ্ধের 'আগুনের মহান পরিধি গান ক'রে উঠেছে।' [সময়ের তীরে : বেলা অবেলা কালবেলা]। তাই কবি লক্ষ করেন চারিদিকে বেজে ওঠে 'তম্বুরার' পরিবর্তে 'দুন্দভি'। [অবরোধ : প্রাগুক্ত]। কবিচিত্ত জিজ্ঞাসাকাতর হয়ে ভাবে 'সভ্যতার এই অপার আত্মরতি' কি শুধু এ সময়ে? কেবল মহাযুদ্ধজনিত? তবে ইতিহাসবিদগ্ধ কবির চিন্তায় 'এ-সুর শুরু হয়েছিলো কুরুবর্ষে— ব্যাবিলনে ট্রয়ে' [অনন্দা॥ বিভিন্ন কবিতা : কাব্যসম্ভার]। ইতিহাস থেকেও আমরা জানি, মহাভারতের যুগের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের কাহিনী। খ্রিস্টপূর্ব আঠারো শতকের সামরিক শাসক হাম্বুরাবি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুরো মেসোপোটেমিয়া জুড়ে একীভূত ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের যুদ্ধে যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া এবং নারী হেলেনকে কেন্দ্র করে ট্রয়-যুদ্ধের কথকতা। কবি জীবনানন্দ দাশ সেই ইতিহাসসূত্রের দিকেই আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন আধুনিককালের ভয়াবহতম যুদ্ধের প্রেক্ষিতে। তাঁর মতে 'পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল' ; যদিও তিনি জানেন, 'এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হ'য়ে আছে।' [সেইদিন এই মাঠ : রূপসী বাংলা] এবং 'পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে/ ঢের দূর ভূমিকার পর' [একটি কবিতা : সাতটি তারার তিমির]। কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তেই পৃথিবীকে এবং এর মানুষদের শঙ্কিত করে। কারণ, ঘুমন্ত সে সব সৈনিক রাজারই ইঙ্গিতে আবার জেগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠতে পারে। ফিরে আসতে পারে হাম্বুরাবি, সারগন, চেঙ্গিস কিংবা হিটলার। বেজে উঠতে পারে আবার যুদ্ধের দামামা। জীবনানন্দ দাশও গভীর শঙ্কাভরে—

মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে
আবার যুদ্ধের ছায়া ;
(এইখানে সূর্যের ॥ অন্যান্য কবিতা : কাব্যসম্ভার)

অথবা শোনেন,

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ;
(এইসব দিনরাত্রি : প্রাগুক্ত)

সুতরাং বহমান সমাজে, সভ্যতায়, পৃথিবীতে যুদ্ধও ক্রমবহমান—এমনকি কবির কালেও। প্রথম মহাযুদ্ধের পরোক্ষ ধাক্কা এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে কবির চিত্তও মহাযুদ্ধ সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়েছে। দীপ্তি ত্রিপাঠী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে কবির ভাবনাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন, কবির—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে কখনো মনে হয়েছে 'কালরাত্রি' (বিভিন্ন কোরাস), কখনো 'অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন' (সবিতা), কখনো 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ' [দীপ্তি ত্রিপাঠী ১৯৭৪ : ১৮২]।

পৃথিবীর এই গভীরতর অসুখের অন্য কারণও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। সভ্যতার ক্রমোৎকর্ষের পাশাপাশি যুদ্ধবিগ্রহেরও ক্রমোন্নতি ঘটেছে—ইতিহাসধারার এ বিষয়টিও কবি অনুধাবন করেছেন। বাস্তবিক, সভ্যতার বিকাশের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল উপাদান ছিলো মানুষের মেধা আর মনন। প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার ও বন্য জীবনযাপন থেকে বুদ্ধিবলেই মানুষ আজ একুশ শতকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চরমোৎকর্ষের অঙ্গনে উপনীত। এই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাধনার দ্বারাই আজ মনুষ্যজাতি পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী। সামরিক শক্তির এই প্রসারে যুদ্ধবিগ্রহ বিধ্বংসী ক্ষমতা অর্জন করেছে। সে ক্ষমতা প্রতিনিয়তই ক্রমবর্ধমান। কিন্তু পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ বা বিজ্ঞানসম্পৃক্ত প্রযুক্তির কোন বিকল্প বর্তমানে নেই। সমরবিদদের নিকট আজ তাই বিজ্ঞানীর মূল্য অনেক। বলা যায়, পৃথিবীর সামরিকত্ব এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রতিভা সমান্তরালভাবে পথ-পরিক্রমারত। জীবনানন্দ দাশ এ বিষয়গুলোকে তাঁর কবিতায় প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ করেছেন। তাই তিনি বলেন, 'আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর' 'কোথাও সান্ত্বনা নেই', 'বহুদিন থেকে শান্তি নেই' [জনান্তিকে : সাতটি তারার তিমির]। বস্তুত এ পৃথিবী 'মানবপ্রতিভার/রূঢ়তা ও বিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে' [তোমাকে : বেলা অবেলা কালবেলা] আজ নিমজ্জিত। 'অনন্তের জ্ঞানপাপ' এই 'ধ্বংসমত্ত অন্ধকার' সৃষ্টির জন্য দায়ী [সূর্য নক্ষত্র নারী : প্রাগুক্ত]। তাই 'মানুষও রক্তাক্ত হতে চায় ;—'। কবি মনে করেন, যুদ্ধপ্রবণ মানুষেরই মেধা ও মননের এবং বিজ্ঞানের অগ্রসরতার ফলেই,

চারিদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে-মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে ;
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা ক'রেই ক্ষমতাশালী...
(মহাত্মা গান্ধী : প্রাগুক্ত)

মানুষের 'জ্ঞানপাপ এখন গভীরতর ব'লে' এই পৃথিবীতে 'প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল'। কারণ, 'জ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের প্রশ্রয় ঢের বেড়ে গিয়েছিল।' [প্রাগুক্ত] । ফলে,

রেলের লাইনের মতো পাতা জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তহীন কার্যকারিতায়
সুখ আছে, সৃষ্টি নেই। অনেক প্রসাদ আছে, প্রেম নেই ;
(এইখানে সূর্যের ॥ অন্যান্য কবিতা : কাব্যসম্ভার)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে 'নীলিমা' আটকে যায় 'ইঁদুরের কলে'। তাতে কবিমন হয়ে ওঠে প্রশ্নকাতর—

> সূর্য ভারত চীন মিশরের ক্যালডিয়ার আদিম ভোরের
> প্রাথমিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে?
>
> (প্রাগুক্ত)

কবি উপলব্ধি করেন, 'হিংসা' ও 'রিরংসা' মত্ত মানুষেরা—

> আলোর ভেতর থেকে আঁধারের দিকে
> জ্ঞানের ভেতর থেকে শোকাবহ আশ্চর্য অজ্ঞানে
> বারবার আসা-যাওয়া করে শেষ করে ফেলে।
>
> (যেন তা কল্যাণ সত্য চায় ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

ফলে বিশ্ব হয়ে ওঠে ভয়াবহ পরিস্থিতি ও পরিণতির শিকার। তাই কবি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন সুদূরতম 'নক্ষত্রেরা অন্ধকারের পটভূমির থেকে' 'মৃতপ্রায় মানবতার অনাথ চোখের দিকে' তাকিয়ে থাকে। তিনি জানেন, মারণাস্ত্রই সেই মানবতার প্রকৃত হন্তারক। আর তা মনুষ্য-মেধারই ফসল। 'কালক্রমে মানুষ' হওয়া 'ম্যামথ ম্যামাল'রা এভাবেই যুগে যুগে ধ্বংসলীলার কুশীলব। তাই দূর অন্ধকারের পটভূমি থেকে নক্ষত্ররাও দেখে—

> নিনেভে রোম হিরোশিমায় পৌঁছে অ্যাটমের
> হাতে মানুষ, মানব-ফসিল, ক্রমোন্নতির আলো।
>
> (নক্ষত্রেরা অন্ধকারের পটভূমির থেকে ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

কবি এ্যাটমের মতো মারণাস্ত্রের প্রসার এবং হিরোশিমায় এর ধ্বংসযজ্ঞের স্বরূপকে মানবসভ্যতায় 'ক্রমোন্নতির আলো' বলে পরিহাস করেছেন। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ অস্ত্রের উদ্ভাবনাকে গতিময় করে তোলে। এতে সভ্যতায় সূচিত হয় অস্ত্রের প্রতিযোগিতা এবং ব্যবহারের ইতিহাস। এর ক্রমবর্ধমানতা সাম্প্রতিক সময়ে কি রকম ভয়াবহতা অর্জন করেছে তা বোঝা যাবে নিচের উদ্ধৃতি থেকে—

> Since 1945 the most obvious change has been in the devastation of war. The 'kill ratio' of weapons has been estimated to have increased half-a-million times from the V-2warhead of the Second World War to even 25-megaton nuclear warhead today [Mann 1988 : 153] ।

কবি জীবনানন্দ দাশও 'নিউক্লিয়ার বোমীয় ক্ষমতা' বৃদ্ধির এই সত্য বিষয়কে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং হয়েছেন শঙ্কিত ও সংশয়িতচিত্ত। তিনি বুঝতে পারছেন, বিজ্ঞান এখন সমাজদেহে ব্যথাদায়ী কীটসর্বস্ব একটি বিষয়। ফলে মানবপ্রতিভার গুণ আজ দোষে পর্যবসিত। তাঁর কাছে এসব 'জ্ঞানের পরিণাম' মাত্র। *যদিও আজ তোমার চোখে* কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করবে। কবি বলেছেন,

> ভেবেছিলাম মানুষ ইতিহাসের হাতে ক্রমেই বড়ো হবে
> মেশিনকে বশ করে খেলার চেয়ে
> হয়ে পড়ে অন্য সফলতায় প্রবীণ ; তবুও মানুষ খেয়ে
> মেশিন ক্রমেই আজ পৃথিবীর একক শক্তি হ'ল
> প্রেমের ছেদ হয়ে তার নিউক্লিয়ার বোমীয় ক্ষমতা
> বেড়েই গেল—জ্ঞানের পরিণামের মানে হ'ল
> এই ধরণের পৃথক করার কথা?
>
> (যদিও আজ তোমার চোখে ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির এজন্যেই মনে হয়–অথবা তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত এরকম—

হয়তো–বা শুভ পৃথিবীর কয়েকটি ভালোভাবে লালিত জাতির
কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা–সুখে থাকা–রিরংসারক্তিম হয়ে থাকা ;
হয়তো–বা বিজ্ঞানের অগ্রসর, অগ্রসৃতির মানে এই শুধু, ; এই !
(মহাত্মাগান্ধী : বেলা অবেলা কালবেলা)

তাই জীবনানন্দ দাশের শ্লেষযুক্ত অভিব্যক্তি, 'রাষ্ট্রনীতি কামনাকেলির চুক্তি' মাত্র। কারণ, তাঁর মতে, 'এসব দেশ জাতি অধিনায়কের প্রাণে/ কোথাও প্রেরণা নেই–দীপ্তি নেই ;' ফলে পৃথিবী হয়ে ওঠে এক 'বিমূঢ় হিরোশিমা।' [আকাশে রাত ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র]। জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিস্তারের পাশাপাশি যুদ্ধবিদ্যা ও কলাকৌশলের অব্যাহত উৎকর্ষে কবি শঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলেও তাঁর মনে হয়েছে এই মহাযুদ্ধের প্রভাব–তিমির পৃথিবীকে, মানুষ ও সমাজকে আচ্ছন্ন করে আছে। ফলে, এ সময়ে শুভ আলোকধারাকে খুঁজে পেতে এবং অনুভব করে নিতে হয়। যুদ্ধ শেষ করার জন্য যতই চুক্তি করা হোক না কেন, এর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত শুকোবার নয়। জ্ঞানের পাপে পৃথিবীর সবুজ আজ রক্তবর্ণ, নেমে আসে সমাজ– সংসারে অনিবার্য বিবিক্তি আর চারদিকে, সমাজে ও জীবনে শূন্যতার অঙ্গার। *মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে* কবিতায় উপর্যুক্ত অভিব্যক্তি পরিস্ফুট—

মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে :
তবুও রয়েছে মহাসমরের তিমির
আমাদের আকাশ আলো সমাজ আত্মা আচ্ছন্ন করে।
প্রতিনিয়তই অনুভব করে নিতে হয় আলো ; অন্ধকার
আকাশ : শূন্যতা, সমাজ : অঙ্গার,
জীবন : মৃত্যু, প্রেম : রক্তঋর্ণা ;–জ্ঞান
এইসবের অপরিমেয় শববাহন শুধু, নিজেকেও বহন করছে।
(মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

সাম্রাজ্যলোভমদমত্ততা আবহমান পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে যুদ্ধের এক অবশ্যম্ভাবী কারণ। এর নেপথ্যে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান ক্ষমতার সুতীব্র লোভ। এককালে যা ছিলো সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব আজ তা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সুপ্রাচীনকালের আক্কাদীয় সারগন আর আধুনিককালের হিটলারের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য এক এবং অভিন্ন। ক্ষমতাভোগের জন্যে তা কুক্ষিগত করা এবং অনুষঙ্গ হিসেবে পররাজ্যলোভ বা রাজ্যবিস্তারই আলোচ্য সামরিক নেতৃত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে সঙ্গে যুক্ত থাকে পররাজ্যের সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রেরণা। তার পাশাপাশি জাত্যাভিমান এবং যুদ্ধ–বাণিজ্যও যুদ্ধবিগ্রহের কারণ হিসেবে গণ্য। কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এসব প্রসঙ্গও উচ্চারিত।

সাম্রাজ্যলোভ প্রসঙ্গটি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে *সাতটি তারার তিমির* কাব্যগ্রন্থের *জনান্তিকে* কবিতায়। কবি দেখেন পৃথিবীব্যাপী বহুদিন থেকে অশান্তি বিদ্যমান। মানুষের জীবন 'অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার' অধিগত। ফলে চারদিকে মৃত্যুর ছায়া আর প্রগাঢ় স্তব্ধতা ঘনীভূত। মহাযুদ্ধকালীন এই পরিস্থিতিতে 'নির্মল কোনো জননীতি নেই', বরং ব্যক্তির ইচ্ছায় এবং পেশিশক্তির জোরে সাম্রাজ্যবাদ প্রকট হয়ে ওঠে। কবি বলেন,

দিনের আলোর দিকে তাকাইলে দেখা যায় লোক
কেবলি আহত হ'য়ে মৃত হ'য়ে স্তব্ধ হয় ;
এ ছাড়া নির্মল কোন জননীতি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-মানুষ-যেই দেশ টিকে থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয়-রাজ্য গড়ে-সাম্রাজ্যের মতো কোনো ভূমা
চায়। ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলি ভেঙে গিয়ে
তারই পিপাসায়
গড়ে ও'ঠে।

(জনান্তিকে : সাতটি তারার তিমির)

কবি জানেন, এই অনির্মল নীতির পরিবর্তে 'অমল কোনো রাজনীতি' খুঁজলে বর্তমান শতাব্দীতে তা পাওয়া যাবে না। যুদ্ধমথিত এই পৃথিবীকে তাই কবি 'ধৃষ্ট পৃথিবী' বলে অভিহিত করেছেন।

এইসব দিনরাত্রি কবিতায় এই প্রসঙ্গটিই আরো স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। মানুষ জীবনকে ভালোবাসে। কিন্তু নিয়ত যুধ্যমান এই পৃথিবীতে 'সেই শুভরাষ্ট্র ঢের দূরে'। কারণ, অন্তহীন যতিহীন যুদ্ধে পৃথিবী কম্পমান। কেননা,

মানুষের লালসার শেষ নেই ;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।
কেবলি আসন থেকে বড়ো, নবতর
সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো।

(এইসব দিনরাত্রি ।। অন্যান্য কবিতা : কাব্যসম্ভার)

এই বৈশিষ্ট্যজাত মানুষেরাই কবির কাছে বর্তমান বিশ্বের 'সোনালি সিংহ'। সেই সিংহের গল্প বলতে গিয়ে তিনি বলেন,

তাহাদের খুঁজে পাই ছিমছাম,-কনুয়ের ভরে
বসে আছে প্রদেশের দূর বিসারিত সব ক্ষমতার লোভে।

(সোনালি সিংহের গল্প : সাতটি তারার তিমির)

পৃথিবীর ইতিহাসের আধুনিককালে উপর্যুক্ত বিষয়টিই ক্ষমতার রাজনীতি বা Power Politics-রূপে পরিগণিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশ বা জাতিগত আত্মরম্ভিতা। সে সঙ্গে জ্ঞানপাপতো রয়েছেই। ফলে পারস্পরিক বিরোধিতা তথা যুদ্ধ প্রকট হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ দাশ বলেন,

পরস্পরের থেকে দূরে থেকে ; ছিন্ন হয়ে ; বিরোধিতা করেছে
সকলের আগে নিজে-অথবা নিজের দেশ-নিজের নেশন
সবের উপরে সত্য মনে করে জ্ঞানপাপে অস্পষ্ট আবেগ।

(এইখানে সূর্যের : অন্যান্য কবিতা : কাব্যসম্ভার)

বোঝাই যায় কবি এই শতাব্দীর জাতিগত দ্বন্দ্বসঙ্কুল, Power Politics-এ বুঁদ হয়ে থাকা দেশ-জাতির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বুঝতে পেয়েছেন যে এর পেছনে সাম্রাজ্য-মদমত্ততা এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ক্ষমতার অভীপ্সা সক্রিয়-যাদেরকে তিনি 'সোনালি সিংহ' 'আফ্রিকার সিংহ' ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

অবশ্যম্ভাবী এবং অপ্রতিরোধ্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত পৃথিবীতে শান্তিপ্রিয় সচেতন মানুষের এই কামনা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। সেসব মানুষের অভিব্যক্তিই এই উদ্ধৃতিতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত এবং তাদের মনোভাব প্রতিভাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ সংগঠনের নেপথ্যে সক্রিয় থাকে সূক্ষ্ম বাণিজ্যিক কৌশল। জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিণামে ক্রমবিকশিত যুদ্ধবিগ্রহ প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অস্ত্রের উদ্ভাবনাকে উদ্দীপিত করেছে। এতে ঘটে অস্ত্র প্রতিযোগিতা। সে প্রতিযোগিতার পেছনে আবার কাজ করে গোপন মদদ। উদ্দেশ্য, অস্ত্র–বাণিজ্য। ফলে, একদেশ যুদ্ধপ্রস্তুতি নিচ্ছে দেখলে অন্যদেশও তৈরি হতে শুরু করে। এই তৈরি হওয়া বা প্রস্তুতির উন্মাদনা সৃষ্টিতে কাজ অস্ত্র উদ্ভাবক ও প্রস্তুতকারক শক্তির প্ররোচনা। তারা এমন চতুর ব্যবসাদার যে উদ্ভাবিত এবং প্রস্তুত অস্ত্রের বিক্রির সুবিধার জন্যে প্রয়োজনে পরস্পরকে উস্কে দেয়, ভয় দেখায় কিংবা ক্ষমতাধর করে দেওয়ার লোভকে সংক্রমিত করে। যুদ্ধ–বাজারের এই বাণিজ্য সুবিধাভোগীদের জীবনানন্দ দাশও চিহ্নিত করেছেন এভাবে—

> তবুও নগরে যুদ্ধে বাজারে বন্দরে
> জেনে গেছি কারা ধন্য,
> কারা স্বর্ণ প্রাধান্যের সূত্রপাত করে।
>
> (মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প : বেলা অবেলা কালবেলা)

এ ধরনের ব্যবসা–মনোবৃত্তির সাথে যুদ্ধের সম্পৃক্তি এবং বিজ্ঞানের প্রণোদনা যুক্ত হলে যে কী ভয়াবহতা, কী শোকবহ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে তার অভিব্যক্তি প্রকাশিত নিচের উদ্ধৃতিতে—

> ব্যবসা–বাণিজ্য যুদ্ধে বারবার বিজ্ঞান বিষম
> হলে তা বিশুদ্ধ জ্ঞান ভয়াবহ ব্রাহ্মাণ্ডের ;
>
> (যেন তা কল্যাণ সত্য চায় ।। অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

গ. মহাযুদ্ধের ফলাফল এবং প্রাসঙ্গিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

শিল্পী মাত্রেরই রয়েছে সমাজসচেতন সত্তা। শিল্পীর মানস রূপান্তরের নেপথ্যে সমাজ, সময় ও সভ্যতার বিচিত্র জটিল অভিঘাতই সক্রিয়। সে রূপান্তরের ফল–ই সাহিত্যে উপজীব্যের বৈচিত্র্য ও বর্ণাঢ্যতা। যুদ্ধবিগ্রহ সে রকম এক উপজীব্য। শিল্পীচৈতন্যে যে কোন অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ আশঙ্কার ছায়াপাত করে। যুদ্ধদিনের অভিজ্ঞতা এবং এর রুদ্ররূপ সে আশঙ্কাকে বাস্তব করে তোলে। শিল্পীচিত্তে গেঁথে যায় যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধোত্তর সমাজজীবনের বিপর্যয় ও সঙ্কট। তাঁর মনন ও কল্পনাও সঙ্কট–সংশয়ে আপতিত হয়। এরই প্রকাশ ঘটে রচিত সাহিত্যে–কবিতায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মহাযুদ্ধজনিত বিপর্যয় ও সঙ্কট, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতুল। যুদ্ধবিগ্রহজনিত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এ প্রবন্ধের অনুচ্ছেদ–৩–এ বর্ণিত প্রতিবেশে প্রতিচিত্রিত হয়েছে। তবে তা প্রধানত যুদ্ধকালীন। এ অনুচ্ছেদে এর পাশাপাশি যুদ্ধোত্তর প্রভাব–প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গও আলোচিত হবে। সে আলোচনায় উপস্থাপিত হবে যুদ্ধদিনের কথা ; সামাজিক ভাঙন, ক্ষয়, অনবরত মৃত্যু ; যুদ্ধসৃষ্ট মন্বন্তর, ধ্বংস, অমানবিকতা, হৃদয়হীনতা, ভাতৃহত্যা, হতাশা, নৈরাজ্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়। সে পরিচয় বাস্তব বর্ণনা কিংবা প্রতীকে–রূপকেও তাঁর কবিতায় প্রকাশিত।

শাসকের ইশারায় সৈনিকরা সচল হয়ে ওঠে—এটি এক চিরন্তন সত্য। সে সচলতার সুবাদে ঘটে ধ্বংসযজ্ঞ। জীবনানন্দ দাশ একে 'মানুষেরই হাতে' মানুষের 'নাজেহাল' হওয়া বলে বিবেচনা করেন [সৃষ্টির তীরে : সাতটি তারার তিমির]। কারণ, আগেই দেখেছি, 'যুদ্ধের অবিস্মরণীয় প্রতিভা' প্রকৃতপক্ষে 'ভাইবোনকে নিঃশেষ করে দেবার জন্য' পৃথিবীতে কালান্তরে বহমান [সবার ওপর : অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র]। সেই আত্মঘাতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্রাতৃহন্তারক যুদ্ধের ফলে সৃষ্টি হয় বিপর্যয়। বাংলাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ছিলো মন্বন্তর। এই মন্বন্তর সমকালে এক বিপর্যয়কর এবং সর্বব্যাপী ধ্বংসকারী সামাজিক সমস্যারূপে উদ্ভূত হয়েছিলো। এতে অসংখ্য অসহায় মানুষকে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিলো। জীবনানন্দ দাশ সেই মন্বন্তরের প্রতিচিত্র তাঁর কবিতায় এঁকেছেন।

...তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে ;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে...

(বিভিন্নকোরাস : সাতটি তারার তিমির)

তিমির হননের গান কবিতাতেও সমকালের মন্বন্তরজনিত অবস্থা বর্ণিত :

স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে দ্যাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।

(তিমির হননের গান : প্রাগুক্ত)

এমনি যুদ্ধ, মন্বন্তর ও তজ্জনিত মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি আছে আরো কিছু কবিতায়। কয়েকটি উদাহরণ :

ক. অন্ন নেই। হৃদয়বিহীনভাবে আজ
মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর।
*   *   *   *
অগণন লোক ম'রে যায় ;
এম্পিডোক্লেসের মৃত্যু নয় ;—
সেই মৃত্যু ব্যসনের মতো মনে হয়।

(দীপ্তি : প্রাগুক্ত)

খ. বটতলা মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো-আরো ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে
যারা ফুটপাত ধরে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলছে
তাদের আকাশ কোনদিকে ?
জানু ভেঙে পড়ে গেলে হাড় কিছুক্ষণ আশাশীল
হয়ে কিছু চায়-কিছু খোঁজে ;
এ ছাড়া আকাশ আর নেই
তাদের আকাশ
সর্বদাই ফুটপাতে ;

(এইসব দিনরাত্রি : শ্রেষ্ঠকবিতা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. দেখা হ'ল অনেক রক্ত রৌদ্র কোলাহল ;
চারিদিকে অধোমুখে মানুষের শব বহন করে ;
আজকে শতাব্দীতে মৃত্যু প্রথম কথা,
(জীবন ভালোবেসে।। অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

যুদ্ধকালে সামাজিক বিপর্যয়ের অন্যতম শিকার নারীজাতি। পৃথিবীর যুদ্ধেতিহাসে এর সাক্ষ্য প্রচুর। বিশ্বযুদ্ধের এক বিষময় ফল নারী-পাচার প্রকোপ বৃদ্ধি এবং দেহব্যবসায়ের প্রসার। এর নেপথ্য কার্যকারণসূত্র মূলত বিশ্বযুদ্ধজনিত আর্থিক সঙ্কট এবং দুর্ভিক্ষ। *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের* ইতিহাস, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*-এ জাতীয় বিভিন্নগ্রন্থের এবং সমকালীন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এর বিশদ বর্ণনা, সংবাদ ও বিবৃতির মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের কবি দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

ক. চেয়ে দ্যাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা ;
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা
পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আধারের খাত বেয়ে ;
ঘাসের চেয়েও বেশি মেয়ে ;
নদীর চেয়েও বেশি উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ উৎক্রান্ত পুরুষের হাল ;
(বিভিন্ন কোরাস : সাতটি তারার তিমির)

খ. এই দুই দিগন্তের থেকে সময়ের
তাড়া খেয়ে পলাতক অনেক পুরুষ-নারী পথে
ফুটপাতে মাঠে জীপে ব্যারাকে হোটেলে অলিগলির উত্তেজে
কমিটি-মিটিঙে ক্লাবে অন্ধকারে অনর্গল ইচ্ছার ঔরসে
সঞ্চারিত উৎসবের খোঁজে আজো সূর্যের বদলে
দ্বিতীয় সূর্যকে বুঝি শুধু অন্ন, শক্তি, অর্থ, শুধু মানবীর
মাংসের নিকটে এসে ভিক্ষা করে। সারাদিন-অনেক গভীর
রাত্রের নক্ষত্র ক্লান্ত হয়ে থাকে তাদের বিলোল কাকলীতে।
(উত্তর সামরিকী : বেলা অবেলা কালবেলা)

গ. ওরা যদি কালোবাজারের মোহে মাতে
নারীমূল্যে অন্ন বিক্রি করে,
মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা,
(মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প : প্রাগুক্ত)

যুদ্ধ নানা সামাজিক পরিবর্তনের কারণ। যুদ্ধের অভিঘাতে সুস্থ ও স্বস্থ জীবনে উদ্ভূত হয় শঙ্কা, বিস্ময়, অস্থিরতা, অভাব, দুশ্চিন্তা, টানাপোড়েন ইত্যাদি অন্তর্গত আলোড়ন। এই প্রতিক্রিয়ার আবর্তে ও সংঘাতে সামাজিক রীতিনীতি, বন্ধন, অন্তরের সম্পদ, মহৎ মূল্যবোধ, আদর্শায়ত চিন্তা-চেতনা ইত্যাদিতেও ভাঙন ধরে। অবক্ষয়িত হয় চিত্তবৃত্তি। সার্বিকভাবে সমাজ ও জীবনে নেমে আসে সংকট ও বিপর্যয়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যুদ্ধজাত এই ঘাত-প্রতিঘাত-প্রতিক্রিয়ার প্রক্ষেপ ঘটেছে । বাস্তবিকই 'যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু প্রভৃতি অকল্যাণ কবিকে আরো এক কঠিন জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করেছে' [দীপ্তি ত্রিপাঠী ১৯৭৪ : ১৮২]। এজন্যেই তিনি বর্তমান 'ব্যাঘ্র যুগে' যুদ্ধরূপ 'আফ্রিকার সিংহ'কে মানবসভ্যতার ওপর 'লাফিয়ে পড়তে' দেখেন। শোনেন 'গুলির শব্দ'। হারিয়ে ফেলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর

শিল্পী : রফিকুন নবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শোচনীয় কালের বিপাকে' সকল 'সান্দ্র বিশ্বাস' [বিভিন্ন কোরাস : সাতটি তারার তিমির]। তিনি প্রত্যক্ষ করেন,

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে ;
বড়ো বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা ;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সঙ্কল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল স্পষ্টতা।

(মিতভাষণ : বনলতা সেন)

কারণ, এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে ;
কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন !

(সবিতা : প্রাগুক্ত)

কিন্তু সে আগুন ও আলো যুদ্ধধ্বস্ত পৃথিবীর ; জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উৎকর্ষমণ্ডিত মানুষের এবং তার অবিস্মরণীয় প্রতিভার ক্লেদাক্ত পরিণাম। এ আলো নয়—আঁধার। অপ্রতিহত সামরিকত্বের প্রতি এ তাঁর তীব্র ব্যঙ্গ। এই চিন্তা-চেতনার স্বরূপ অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে এভাবে—

এখন এ পৃথিবীতে ভালো আলো নেই—
ভাষায় বেগের বিহ্বলতার শেষ ক'রে অন্ধকার
মাঝে মাঝে জীবনের পথে আসে
আজকে সততা সত্য সুধা নেই,—কিন্তু পৃথিবীর পথে রূঢ়
রক্তাক্ত অন্যায় আলো বেনামদারের মতো জেগে
নিজেকে প্রাণের সূর্য ব'লে যদি এখনো প্রচার করে তবে
সে আলোর প্রতিবাদে আজকের পৃথিবীতে অন্য আলো নেই
অন্ধকার র'য়ে গেছে।

(এখন এ পৃথিবীতে ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

সেজন্যেই তাঁর

মনে হয় সমাবৃত হ'য় আছি কোন্ এক অন্ধকার ঘরে ;

(মনোসরণি : সাতটি তারার তিমির)

যুদ্ধদগ্ধ এই পৃথিবীর সর্বত্র তিনি দেখেন জীবনের ক্ষয়, ভাঙন, ধ্বংস ও অসংগতি। একে তিনি মানুষের 'পঙ্কিল সময়স্রোতে' 'ভেসে' চলা বলে বিবেচনা করেছেন [কবিতা : প্রাগুক্ত]। গভীর হতাশায় তিনি বলেন,

প্রেম নেই-প্রেমব্যসনেরও দিন শেষ হ'য়ে গেছে ;
একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে ;
উঠে ভেঙে গেছে।
কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।

(রাত্রির কোরাস : প্রাগুক্ত)

মহতী পরিবেশের, উপাদানের ও উপজীব্যের পরিবর্তে চারদিকে যুদ্ধ, যুদ্ধাস্ত্র, কনভয় ইত্যাদিতে সমকালে মানবিকতার ক্ষয় পরিদৃষ্ট। তাই মানুষের ইতিহাস বিবর্ণ হৃদয় দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল ভাঙন। প্রাচ্যে, প্রতীচ্যে–সর্বত্রই এর ঘনঘটা। এমন অবস্থায় সমাজ ও মানুষের মনের কাঠামোতে অবক্ষয় নেমে আসে ; আসে নৈরাশ্য এবং গভীর বিবিক্তিবোধ । কবি বলেন—

প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো—
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব–সাগরে।

(তোমাকে : বেলা অবেলা কলবেলা)

তাঁর কাছে সে অন্ধকার 'অধম' এবং তা 'মানব প্রতিভার রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার' পরিণামমাত্র [প্রাগুক্ত]। তাই তিনি গভীর উদ্বেগে প্রশ্নকাতর এবং মানব পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন–এ পৃথিবীর 'যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে'—

কোথায় সমাজ, অর্থনীতি? স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো—
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হয়ে কি আজ চারিদিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার দ্বৈপসাগর দখল ক'রে !

(যতিহীন : প্রাগুক্ত)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এ পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়েছে, এমনকি স্বপ্নের কোন পৃথিবীও সেখানে অনুপস্থিত। কবির ভাষায়—

একটি বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে নিভে গেছে প্রায়।
আমাদের আধো–চেনা কোন–এক পুরানো পৃথিবী
নেই আর। আমাদের মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবী
আসে নি তো।

(উত্তর সামরিকী ; প্রাগুক্ত)

মহাযুদ্ধ শেষ হলেও 'মহাসমরের তিমির' বরং ঘনীভূত হয়ে চারদিকে ছেয়ে দেয়। সে আঁধার 'আমাদের আকাশ আলো সমাজ আত্মা আচ্ছন্ন করে' দেয়। তখন আলোকে 'প্রতিনিয়তই অনুভব করে নিতে হয়' [মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে : অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র]। এইরকম সময়ে মানুষেরা 'হৃদয়ের গভীর অসুখে' আক্রান্ত। ফলে আলোর সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েও তারা ব্যর্থ ও নিরাশ। এটিই বর্তমানের 'ব্যাঘ্র যুগ'–এর বৈশিষ্ট্য। কবির ভাষায়—

আজ অন্ধ শতাব্দীর শতচ্ছিদ্রতার
ভিতরে আলোর খোঁজে যদি চলে যায়
তবুও শাশ্বত হয়ে থাকে অন্ধকার।

(ওইখানে সারাদিন ঝাউবন খেলা করে।। অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

তাই কবি জীবনানন্দ দাশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্বের এবং পরের অবস্থা তুলনা করে বলেন :

উনিশতিরিশ থেকে উনিশচল্লিশ সাল তবু ভালো ছিল ;
আজ একচল্লিশে পৌষমাসে কেমন অসাধ যেন।

(নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান : প্রাগুক্ত)

মহাযুদ্ধজনিত ক্ষয়, ভাঙন, বিপর্যয় ইত্যাদির স্বরূপ তিনি এভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. যুদ্ধ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব

যুদ্ধের জরা প্রত্যক্ষ করে এবং এর পরিণামের স্বরূপ উপলব্ধি করে বিরক্ত, বিদ্দিষ্ট এবং তীব্র শঙ্কাতাড়িত কবিচিত্তে যুদ্ধ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় এ বিষয়ের প্রকাশও যথেষ্ট। *ধূসর পাণ্ডুলিপিতে* এই নেতিবাচক মনোভাব প্রথম প্রত্যক্ষ করা যায়। *'অবসরের গান'* কবিতার নিচের উদ্ধৃতাংশে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব।

জানিতে চাইনা আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোনখানে,
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয় !
আমার চোখের পাশে আনিয়োনা সৈন্যদের মশালের আগুনের রং,
দামামা থামায়ে ফেল,–পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক রাজ্য
আর সাম্রাজ্যের সং !

(অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এখানে তাঁর যুদ্ধ–বীতরাগ সুস্পষ্ট। তিনি সভ্যতা ধ্বংসকারী যুদ্ধোন্মাদ সম্রাটকে 'ভাঁড়' বিবেচনা করে পরিষ্কার কণ্ঠে রণবাদ্য থামাতে আহ্বান জানাচ্ছেন। সে স্বরে বিরাগ মোটেও প্রচ্ছন্ন নেই। ফলে কবি সমসময়ের শোচনীয় কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চিত্তের যুগপরম্পরাগত সকল অন্তর্গত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। কবি দেখেন চারপাশে সম্রাটের 'যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে' [গোধূলি সন্ধির নৃত্য : সাতটি তারার তিমির] হোলি খেলায় মত্ত। তাই সে 'সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো সৈনিক' হয়ে। [সৃষ্টির তীরে : প্রাগুক্ত] 'নরকের আগুনের মতো অহরহ রক্তপাত' [পরিচায়ক : মহাপৃথিবী] ঘটায়। এই পরিবেশ অসুস্থ ও ক্ষয়িষ্ণু মানবিকতারই পরিচায়ক। এতে গ্রহণের পৃথিবীতে অশান্তিরই ছায়া–প্রচ্ছায়া আপতিত হয়। তাই কবি দেখেন,

ক. কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখিরো মতন কোনো হৃদয়ের তরে।

(জনান্তিকে : সাতটি তারার তিমির)

খ. কোথাও মিনারে তুমি নেই আজ আর
জানালার সোনালি নীল কমলা সবুজ কাচের দিগন্তে ;
কোথাও বনচ্ছবির ভিতরে নেই ;
শাদা সাধারণ নিঃসঙ্কোচ রৌদ্রের ভিতরে তুমি নেই আজ।
* * * *
যার মানে পবিত্রতা শান্তি শক্তি শুভ্রতা–সকলের জন্য !

(সময়ের তীরে : প্রাগুক্ত)

কারণ, চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।

(জনান্তিকে : প্রাগুক্ত)

এসব কারণে এবং 'বসন্তের সাড়া'র বদলে 'অগণন প্লেন' আর 'অগণন এয়োরোড্রাম' সমৃদ্ধ এবং রক্ত আর মৃত্যুতে পরিপূর্ণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিবেশে কবি বোধ করেন ভীষণ ক্লান্তি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেইখানে ক্লান্তি তবু
ক্লান্তি–ক্লান্তি ;
(উত্তর প্রবেশ : প্রাগুক্ত)

শুধু তাই নয় ; এর মধ্যে হৃদয়হীনতার অনুভূতিও এসে কবি–মনকে আঘাত করে। তিনি দেখেন—

পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে–বেজে ওঠে ; সুর তান লয়
গান আছে পৃথিবীতে জানি, তবু গানের হৃদয় নেই।
(অবরোধ : বেলা অবেলা কালবেলা)

এই পরিবেশে মনুষ্যত্ব বিলীনপ্রায়। বাকিটুকু ধ্বংসের জন্য ধেয়ে আসে করাল শক্তি—

শুধু বাতাস উড়ে আসছে :
স্খলিত নিহত মনুষ্যত্বের শেষ সীমানাকে
সময়সেতুলোকে বিলীন ক'রে দেবার জন্যে,
উচ্ছ্রিত শববাহকের মূর্তিতে। (সময়ের তীরে : প্রাগুক্ত)

আধুনিককালের যুদ্ধ ভয়ঙ্কর ও বিধ্বংসীরূপে পরিচিত। অন্তত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিমান, বোমা এবং আণবিক বোমার ব্যবহার আর হিরোশিমা–নাগাসাকি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া দেখে কবির মন বিস্ময়ে, শঙ্কায় এবং বিরক্তিতে ভরে ওঠে। কবি বলেন—

দেখেছি রজনীগন্ধা নারীর শরীর অন্ন মুখে দিতে গিয়ে
আমরা অঙ্গার রক্ত : শতাব্দীর অন্তহীণ আগুনের ভিতর দাঁড়িয়ে।

আর তার পরপরই কবি তীব্রকণ্ঠে প্রশ্ন করেন—

এ–আগুনে এ'তো রক্ত মধ্যযুগ দেখেছে কখনো ?
(এইসব দিনরাত্রি ॥ অন্যান্য কবিতা : কাব্যসম্ভার)

কবি 'অপূর্ব অপ্রীতি'ময় [এইখানে সূর্যের : প্রাগুক্ত] 'মানুষের ভয়াবহ লৌকিক পৃথিবী' ব্যাপী [মহাত্মা গান্ধী : বেলা অবেলা কালবেলা] প্রত্যক্ষ করেন 'আঁধার আরো গভীরতর করে' ফেলা 'সভ্যতার এই অপার আত্মরতি'র ফলে মানুষেরই হাতে আসে 'নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি' [অনন্দা : অন্যান্য কবিতা : কাব্য সম্ভার]। এতে এ শতাব্দীর পৃথিবী যুদ্ধদগ্ধ, পীড়িত আর শোণিতসিক্ত হয়ে ওঠে। সেখানে জমে ওঠে 'কঙ্কাল অঙ্গার কালি' [যাত্রী : প্রাগুক্ত]। তাই কবির অভিমত, 'চারিদিকে রক্তের ভিতরে'–

মৃত্যু আর জীবনের কালো আর শাদা
হৃদয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ
এসেছে এ পৃথিবীর দেশে ; (প্রাগুক্ত)

মহাযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক স্বরূপ প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করার প্রেক্ষিতে এই নেতিবাচক অভিব্যক্তি যথার্থ।

৬. শান্তিকামনা এবং ইতিবাচক প্রত্যাশা

কবি কর্তৃক 'আবহমানের ভাঁড়' হিসেবে [উন্মেষ : সাতটি তারার তিমির] আখ্যায়িত মহাযুদ্ধ এর বিধ্বংসী শক্তি দিয়ে নগর, সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী এবং জনজীবনকে ওলটপালট করে দিলেও ; –আর তাতে কবিচিত্ত বিবিক্ত ও বিবমিষু হলেও—মানবীয় অন্তর্জাত শুভশক্তির কারণে তিনিও জীবনবিশ্বাসী। তাই তিনিই মহাযুদ্ধের তিমিরকে বিনাশ, ও বিদূরিত করতে রচনা করেন *'তিমির হননের গান'* । ফলে দেখা যায়, জীবনানন্দ দাশ সমসময়ের ক্লিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ভয়ঙ্কর অসুন্দর পরিবেশে বিরক্ত হয়ে হতাশাক্রান্ত হতে গিয়েও গভীরভাবে প্রত্যয়দীপ্ত ও জীবনবাদী। তাই তিনি ঘোষণা করেন, নিজে তথা সচেতন মানুষেরা আজ 'তিমিরবিনাশী'–'তিমির বিলাসী' নয় [তিমির হননের গান : প্রাগুক্ত] কারণ তিনি জানেন 'যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন' [গোধূলি সন্ধির নৃত্যু : প্রাগুক্ত] একদিন শেষ হয়ে যাবে। এ সবের কুশীলবতো মানুষেরাই। সুতরাং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির অবসান হবে জীবনবিশ্বাসী মানুষেরই হাতে। কবি বলেন,

ইতিহাসে মাঝে–মাঝে এরকম শীত অসারতা
নেমে আসে ;–চারিদিকে জীবনের শুভ্র অর্থ র'য়ে গেছে তবু,

(পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে : বেলা অবেলা কালবেলা)

এই প্রত্যয়বোধের কারণেই তিনি যুদ্ধজনিত ক্ষয়িষ্ণু সমাজেও শান্তিকামী–– শান্তিপ্রত্যাশী। তাই তিনি বর্তমান 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ' সত্ত্বেও বলেন,

এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।

(সুচেতনা : বনলতা সেন)

সেজন্যেই তিনি জানেন, 'দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা' এই ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীর 'চূর্ণ ভূখণ্ডে' যুদ্ধোন্মাদনায় 'আর উঠিবেনা মেতে' [গোধূলি সন্ধির নৃত্য : সাতটি তারার তিমির]। মানুষ মাত্রেই 'অমৃতস্য পুত্রা'–এই সুপ্রাচীন উক্তিতে তিনিও গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাই তিনি মনে করেন, মানুষই পারে সমকালের এই করুণ মানবতাবিধ্বংসী পরিবেশ থেকে উত্তরিত হতে ; অমৃতের সন্ধান করতে—

আমরা মানুষ ঢের ক্রূরতর অন্ধকূপ থেকে
অধিক আয়ত চোখে তবু ঐ অমৃতের বিশ্বকে দেখেছি ;
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে উদ্বেলিত হয়ে অনুভব ক'রে গেছি
প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই
চোখ বুজে নীরবে থেমেছি।

(মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প : বেলা অবেলা কালবেলা)

কারণ তিনি জানেন, 'সে বিনাশ দূরে আছে,' 'যদিও সমসময়ের প্রেক্ষিতে তিনি এও বোঝেন, মানব–প্রতিভাজাত যুদ্ধের বিপদ 'ক্রমেই কাছে–ঘনিয়ে আসে কাছে,'। তবুও তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস উচ্চারণ করেন শতাব্দীর মানবের উদ্দেশে—

যেটুকু সময় রয়েছে তার ফাঁকে
এ দানবীয় অপপ্রতিভাকে
মানুষ ছাড়া ঘোচাবে কে আর এসে।

(শতাব্দীর মানবকে ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

সেক্ষেত্রে তিনি কৃষকের 'করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়' কাস্তেকেই যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীতে কামানের আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র জিগীষু শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন—সেটিই তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতিময় এক পরিত্রাতা—

কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।

(ক্ষেতে প্রান্তরে : সাতটি তারার তিমির)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাগ্রসরতাই মানবধর্ম। পেছুতে পেছুতে তবু মানুষই সামনে অগ্রসর হয়-শুভ্র, সুন্দর, কল্যাণী আনন্দের দিকে। '...মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে অগ্রসর হতে চায়-অগ্রসর হয়ে যেতে পারে' [পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে : প্রাগুক্ত] -এই বিশ্বাস, আশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে যুদ্ধদষ্ট পৃথিবীতে কবি ঋজু-প্রত্যয়ে বেঁচে আছেন। তাই কবি আহ্বান জানান শান্তিকে-জেগে উঠতে বলেন জীবনবোধকে—

হে জীবন, এইসব ভীষণতা অনুভব করে
সূর্য নক্ষত্র কল্যাণে উৎসারিত জলস্ফুলিঙ্গ হয়ে ওঠো তুমি ;
ওপরের সেতু হও
সেতুলোকে মানব ;—
সাহস, আলোক, প্রেমপ্রতিভা, প্রাণ।

(মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

শান্তিকামনার প্রেক্ষিতে কবির ভাবনাকাতর প্রত্যাশা—

... তবু আরো কিছু চাই আজ পৃথিবীর দুঃসহ ভার
বইবার প্রয়োজনে ; তবুও মানবজাতি রক্তস্রোতে বারবার শক্তিশালী নদী
না হয়ে এ স্নিগ্ধ রাত্রি—শান্তি পথ হয়ে যেত যদি।

(লক্ষ্য : প্রাগুক্ত)

লক্ষণীয়, অন্ধকার ছাপিয়ে, রক্তপাত এড়িয়ে আলোয় প্রত্যাশাও কবির সারা মন অধিগত করে রেখেছে—

এরিয়েলের মতন আলোর কালোর কিনার দিয়ে
কেবলি আশা—গভীর আশার বার্তা জাগিয়ে
নতুন আলো নতুন আকাশ ভাষা
মহাইতিহাসের ভালোবাসা
আনবেনা তার রক্তক্ষয়ের শেষে ?

(শতাব্দীর মানবকে ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

সেজন্যে তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের অন্তর্গত যুদ্ধপ্রবণতার 'দাহ' আর 'তাপ' থেকে উত্তরণ পেতে হলে চাই প্রাণ, প্রেম এবং স্নিগ্ধতার স্পর্শ। কবির ভাষায়—

প্রাণের প্রেমের স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে তাকে ঢেকে দিতে হবে
দিতে হবে ক্রমেই স্নিগ্ধতা

(আকাশে রাত : প্রাগুক্ত)

এতেই প্রশমিত হবে যুদ্ধের অনির্বাণ আগুন। কারণ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রত্যাশাই 'শান্তি'। কবি জীবনানন্দ দাশও সমকালীন পৃথিবীতে যুদ্ধজনিত রক্তস্রোতের নদী দেখেও উপর্যুক্ত গভীর প্রত্যাশায় ছিলেন উজ্জীবিত।

চ. সংশয়চিত্ততা

এতদসত্ত্বেও কবিচিত্তের শঙ্কা বিদূরিত নয়। বরং তাঁর কাব্যে লক্ষ করা যায় তিনি এক গভীরতর সংশয়ে বিমূঢ়, চিন্তিত এবং উদ্বেগাকুল। তিনি যুদ্ধের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তারে-বেতারে-সংবাদে ভেসে আসা বৈশ্বিক যুদ্ধের যে স্বরূপ তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছে বারংবার, তাতে তাঁর শান্তি-প্রত্যাশাও সংশয়-জীবাণুতে আক্রান্ত হয়েছে। তাই মানুষের হাতেই যুদ্ধবিভীষিকা দূরীভূত হবে এই প্রত্যয় এবং মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' হিসেবে বিবেচনা করা সত্ত্বেও তিনি কখনো সংশয়িতচিত্ত। সে সংশয়ও তাঁর পূর্বোক্ত ইতিবাচকতার পাশাপাশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথার্থভাবে কবিতায় প্রকাশিত। যুগ যুগ কেটে গেলেও মানুষের মধ্যে স্থিরতা পরিলক্ষিত হয় না। ক্ষমতামদমত্ত মানুষের জন্যেই পৃথিবীতে 'এতো রক্ত নদী' বহমান [শ্যামলী : বনলতা সেন]। ফলে মেধাবী মানুষের মননের ফলজাত যুদ্ধবিগ্রহের দূরীভূত হওয়া সম্পর্কে কখনো গভীর সংশয় তাঁর চিন্তায় অনুরণিত হয়। জাগে অনেক প্রশ্ন যদিও মানুষের সচেতনসত্তা বারবার জেগে ওঠে :

দেশের জাতির ব্যর্থ পৃথিবীর তীরে ;
ফেনিল অস্ত্র পাবে আশা ?
যেতেছে নিঃশেষ হয়ে সব ?
কী তবে থাকবে ?
আঁধার ও মননের আজকের এ নিষ্ফল রীতি
মুছে ফেলে আবার সচেষ্ট হয়ে উঠবে প্রকৃতি ?

(যতদিন পৃথিবীতে : বেলা অবেলা কালবেলা)

অথবা,

ঢের যুগ নিষ্ফল হয়েছে ;
এরকম কেবলি কি হবে ?
ইতিহাস কেবলি কি অন্ধপরীক্ষার
অন্ধকারের অনুভবে ?

*   *   *   *

শাদা আর কালো রঙে মাখা পৃথিবীর
কোলে আজ মানুষের স্থান
পুড়ে কি ছাইয়ের মতো কালিমা হয়েছে ?

(মন বিহঙ্গম ॥ অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

কারণ,

ইতিহাস ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে
হয়তো-বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চ'লে যাওয়া ; –গোলকধাঁধার
ভুলের ভিতর থেকে আরো বেশি ভুলে ;

(প্রাগুক্ত)

সামরিক ইতিহাসেতো বটেই সমকালের ইতিবৃত্তেও যুদ্ধবিরতি বা অনাক্রমণ চুক্তি যুদ্ধবাজ নেতা বা যুদ্ধমান জাতির মধ্যে স্বাক্ষরিত হওয়ার ঘটনা সুপ্রচুর। 'শান্তি'ই-এর নেপথ্য লক্ষ্য। কারণ, যুধ্যমান মানুষই আবার শান্তিসন্ধানী যদিও যুদ্ধপ্রবৃত্তির অগ্নির প্রজ্বলন তাতে প্রশমিত হয়নি কখনো। পৃথিবীতে সুপ্রাচীন কাল থেকে যত যুদ্ধবিরতি সন্ধি ও অনাক্রমণ চুক্তি রচিত ও স্বাক্ষরিত হয়েছে দেখা গেছে সবগুলোই যুদ্ধ নিবারণে ছিলো সমানভাবে ব্যর্থ। এক্ষেত্রে এক প্রাচীন রুশ প্রবাদ স্মরণীয়–'শান্তি কেবল আসছে বছর পর্যন্তই স্থায়ী'। সেজন্যেই ইতালিয় ঐতিহাসিক লুইজি ডা পোর্তো যুদ্ধকে 'dangerous merry-go-round' [Cited in Blainey 1988 : 87] হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অধ্যাপক আর্নল্ড জে. টয়েনবি তাঁর Study of History–গ্রন্থে যুদ্ধ ও শান্তিকে একটি 'আবর্ত' হিসেবে বিবেচনা করেছেন [Toyenbee 1954 : 326] । যুদ্ধবিগ্রহের এই বিষয়টির প্রতিও কবির দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। সমকালের আটলান্টিক চার্টার, মিউনিখ প্যাক্ট ইত্যাদির প্রেক্ষিতে কবি ভাবেন 'ঈর্ষা ও রক্ত'ময় পৃথিবীতে কখনো কি শান্তি আসবে ? গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ লাভের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি সব শেষ হয়ে গেছে ! সুতরাং চার্টার স্বাক্ষর, কমিশন গঠন, প্ল্যান প্রণয়ন বা ইউ এন ও প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে কি এই ভয়ঙ্কর, জটিল মনুষ্য-প্রবণতা বিমোচিত হবে ? কবি মনে করেন আসলে এসব ব্যর্থ প্রয়াস। কবির ভাষায়—

কোথায় চার্টার প্যাক্ট কমিশন প্ল্যান ক্ষয় হয় ;
কেন হিংসা ঈর্ষা গ্লানি ক্লান্তি ভয় রক্ত কলরব :
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে যেই তন্বী ভিক্ষুণীকে এই প্রশ্ন আমার হৃদয়
ক'রে চুপ হয়েছিল আজও সময়ের কাছে তেমনই নীরব।

(মহাগোধূলি : বেলা অবেলা কালবেলা)

ইতিহাসের স্বাক্ষ্যও তাই। সেজন্যে কবিরও কাছে মনে হয়—

...সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
চারদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়-অলীক প্রয়াণ।

(এইসব দিনরাত্রি ।। অন্যান্য কবিতা : কাব্যসম্ভার)

কবি পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতবাণী করেন,

...বিজ্ঞানের মর্মে মর্মে কীট আর ব্যথা
নিরন্তর দোষে পরিণত হবে মানবের প্রতিভার গুণ
সব আলো হয়ে যাবে ক্ষমাহীন নিয়মে আগুন।

(আকাশে রাত ।। অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহাসিক সত্য এই-যুদ্ধ বারবার ফিরে আসে। এই মহাযুদ্ধই শেষ নয়। আবারও তা আসতে পারে। বস্তুত, চারদিকে যে যুদ্ধের ডামাডোল, 'কর্ণিশে সিংহের হুঙ্কার', সাংহাইয়ের বিনষ্ট হওয়া, হিরোশিমা-নাগাসাকির আণবিক ক্ষমতা দ্বারা বিধ্বংস হওয়া, ঈর্ষা, রক্তপাত ইত্যাদিতে মনুষ্যচরিত্র ক্লেদাক্ত হওয়া-ইত্যকার প্রেক্ষিতে কবির মনে জাগে সংশয়িত প্রশ্ন—

মাটি সহজ হয়
ইতিহাসের ক্ষমতাতীত রক্ত খরচ ক'রে ?

(নক্ষত্রমঙ্গল (১৯৪২-৪৭) ।। অগ্রন্থিত কবিতা : কবিতাসমগ্র)

একই প্রশ্নের দ্যোতনা অন্যত্রও পাওয়া যায়। যেমন—

কার লাশ ? কেটেছিলো কারা ?
সারা পৃথিবীতে আজ রক্ত ঝরে কেন ?

(দোয়েল : মহাপৃথিবী)

এই প্রশ্ন এবং এই সংশয় সত্ত্বেও সত্য এই-মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে রক্তপাতই পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, পৌনঃপুনিকতা এবং অনিবার্যতা । শান্তির অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়েও মানুষের ইতিহাস রক্তক্ষরণে সিক্ত হতে থাকে অবিরল। কেন এই রক্ত ঝরার ইতিহাস ?-এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া কখনোও যায়নি। ইতিহাস ও সমাজ সচেতন কবি জীবনানন্দ দাশও তা পাননি।

ছ. যুদ্ধসম্পৃক্ত শব্দ ও উপমার ব্যবহার

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে যুদ্ধবিগ্রহ বিবিধ পন্থায় দেশের সমাজ ও ব্যক্তি এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অধ্যয়ন এবং যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত অবিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট ধারণাও অধিগত হয়। ফলে দেখা গেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যিকগণও তাঁদের রচনায় বিভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপনে কিংবা উপমা প্রয়োগে সমরবাচক শব্দাবলি ব্যবহার করেন। এ ধরনের ব্যবহার ও প্রয়োগ ব্যাপক না হলেও জীবনানন্দ দাশের কবিতাতে তা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তাঁর কবিতাবলি থেকে উদাহরণ দিলে আলোচ্য বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হবে। সে সঙ্গে প্রতীয়মান হবে এই ব্যবহার তাঁর সমকালীন বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং তাঁর ইতিহাস অধ্যয়নের ফসল।

জীবনযুদ্ধে শক্তিমানের ভূমিকাই প্রবল। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের মূলকথাও এটি –পৃথিবীতে অস্তিত্বের সংগ্রামে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে কেবল যোগ্যতমেরই। লক্ষণীয়, জীবনানন্দ দাশও *'অগ্নি'* কবিতায় অভুক্ত, জরাক্লান্ত মানুষদের সংগ্রামশীলতার ক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয় অর্জনের লক্ষ্যে 'যোদ্ধা'র মতো সাহসে ও তেজে তরবারি ধারণের ওপরই জোর দিয়েছেন। অথচ তিনি দেখেন, এসব মানুষ 'নকল সৈন্যের' মতো 'কলরবে' ব্যস্ত। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন—

জরা খাদ্য চায় ; তবুও অভুক্ত পেটে তরবার হাতে নেবে
যোদ্ধার মতন নয় ; নকল সৈন্যের যত কলরবে পাঁচালির দেশে।

(অগ্নি : মহাপৃথিবী)

তাঁর কবিতায় 'কামান' শব্দটি অনেকবার ব্যবহৃত। পূর্বে বিভিন্ন বিষয় আলোচনাকালে এর প্রচুর উদ্ধৃতি প্রদত্ত। তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হলো না। ইতিহাসের তথ্য এই, চতুর্দশ শতকে কামান ও গোলাবারুদের আবিষ্কার মানুষের সামরিক ইতিহাসে এক বিপ্লবাত্মক অধ্যায়ের সূচনা করে এবং এতে যুদ্ধবিগ্রহের গুণগত উত্তরণ ঘটে। যুদ্ধাস্ত্র হয়ে ওঠে মারণাস্ত্র [Wright 1971 : 606]। আধুনিক যুগের যুদ্ধে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এর ব্যবহার ছিলো ব্যাপক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে সমর প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে এ যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে মানুষদের ধারণাও হয়েছিলো পর্যাপ্ত। জীবনানন্দ দাশেরও তা অবিদিত ছিলো না। তাই তিনি উপমা, রূপকে ও প্রতীকে অসংখ্যবার 'কামান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এমনকি 'এ্যান্টি এয়ার ক্রাফ্ট গান' বা বিমান বিধ্বংসী কামানও তাঁর অবিজ্ঞতাজাত এবং কবিতায় সচেতনভাবে ব্যবহৃত।

বিমান, হেলিকপ্টার, বোমারু বিমান এবং এর ভূমিকা, প্লিন্টার এরোড্রাম, সার্চলাইট, সাইরেন, অলক্লিয়ার নিষ্প্রদীপতা ইত্যাদি আকাশযুদ্ধসম্পৃক্ত শব্দও তাঁর কবিতায় সুপ্রচুর এবং সুপ্রযুক্ত। এ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে। তেমনি যোদ্ধা, সৈনিক, সৈন্য, সেনানায়ক, নাবিক ইত্যাদি শব্দেরও কিছু ব্যবহার তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অ্যাটম ও নিউক্লিয়ার বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি সমসময়ের মারণাস্ত্রের নাম-শব্দও তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত। কনভয়, লরি, জীপ, ব্যারাক, শিবির, রণক্লান্ত নাবিকদের বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদির প্রাপ্যতাও অনুল্লেখ্য নয়। শিরস্ত্রাণ, প্যারাসুট, বর্শা, শেল ইত্যাদি যুদ্ধে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের নামও তিনি ব্যবহার করেছেন। তুলনা হিসেবে প্রাচীন সভ্যতার সামরিক সাম্রাজ্য এবং সবসংগঠিত সৈন্য যেমন এশিরীয় ও হূণ সৈন্যের কথা তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত। যুদ্ধ বিরতির বিবিধ চুক্তি যেমন আটলান্টিক চার্টার, মিউনিখ প্যাক্ট ইত্যাদির প্রসঙ্গও সমভাবে প্রাপ্য। তেমনি হিটলার, চেঙ্গিস খান প্রমুখ দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাজ সামরিক শাসক-সেনানায়কদের নামও পাওয়া যায়। এছাড়া, যুদ্ধবিগ্রহসম্পৃক্ত রক্তপাত, হতাহত হওয়া, অভিযান, বিপ্লব, জয়-পরাজয় ইত্যাদিও বিবিধ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

সার্বিকভাবে, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এই প্রতীয়মান হয়-উপর্যুক্ত শব্দাবলির ব্যবহার, কখনো পৌনঃপুনিক ব্যবহার তাঁর যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। ১ থেকে ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমকালের পটভূমির প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে তা-ই স্বাভাবিক, বাস্তবিক যুদ্ধসম্পৃক্ত শব্দ তিনি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী ও নারীবাদ এবং জীবনানন্দের সপ্রশ্ন বিচাররীতি

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনানন্দ দাশ প্রবল এবং প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলোকে কিরূপ বিভিন্নমুখী প্রশ্নের চোখে দেখেছিলেন, দ্রুতই তেমন সপ্রশ্ন একটি মনোভাব তৈরি হয়ে কিরূপ অব্যাহত ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর মধ্যে—আমরা অনেকে তা জানি, অনেকে জানি না। তাই দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রথমেই স্মরণ করা যাক তাঁর সেই বহুল-উদ্ধৃত বক্তব্য : 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি।' দ্বিতীয়ত উদ্ধৃত করি 'সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা' প্রবন্ধ থেকে, ঐ প্রবন্ধে জীবনানন্দ বিপ্লব কিংবা পরিবর্তন সম্পর্কে দুর্লভ স্পষ্টতায় অনেক মন্তব্য করেছেন, যা যুগপৎ তাঁর সাধারণ সপ্রশ্ন মনোভাব এবং বিচারভঙ্গিকে উপস্থিত করে :

> গত তিন-চার হাজার বছর মানুষের সভ্যতায় দর্শন কাজ করে গেছে ; এইবারে বিজ্ঞান কাজ করবে বলে মনে হয়। কাজেই রাষ্ট্রে ও সমাজে পর পর কয়েকটি বিপ্লব দেখা দেবার কথা। বিপ্লব যে রক্তাক্ত হবে ও দুর্ধর্ষভাবে নিষ্ঠুর, এমন কথা আমি বলছি না।... বড় বিপ্লব দিয়েই শুরু হতে পারে—ততটা শান্তভাবে নয়—বেশি মানবীয় সময় খরচ করে নয়। যে সভ্যতা দর্শনের আঁধার খননে আবছা হয়েছিল এত কাল, তাকে যুক্তির পথে চালিয়ে নিয়ে ক্রমেই আলোকিত করে তোলবার জন্যে—পৃথিবীর সকলেরই নিঃশ্রেয়সের জন্যে বিপ্লব। অনেকেই এই রকম কথা বলছে। কিন্তু বিপ্লব আসেনি এখনো। আমরা যে সময়ে বাস করছি দু-দুটো যুদ্ধে ও নানা রকম বড় অনর্থে অত্যাচারে তা ভেঙে ধ্বসে যেতে থাকলেও জীবনের সব কাজই যুক্তিসফলতায় দাঁড় করাতে হলে যে ধরনের সমাজ নমনীয়তার প্রয়োজন—সৎ শক্তির শান্ত বা অশান্ত প্রয়োগে সে রকম বিপ্লব পৃথিবীর কোনো কোনো জায়গায় এক আধটা ঘটে থাকলেও তারা খুব ভালো করে শেষ রক্ষা করতে পারেনি ; পৃথিবীর বাকি বড় জায়গাটায় কোথাও তেমন কোনো বিপ্লব হয়নি। আমরা এখনো কোনো বিপ্লবের যুগে বাস করছি না, আমাদের সন্ততিরা করবে বলে মনে করছি। স্পষ্টতর সত্যকে গ্রহণ করবার কথা উঠলে আমাদের দেশ-কাল, দেখছি তো, এখনো পিছিয়ে থেকে পরিচিত অস্বচ্ছ অভ্যাসে শান্তি পাচ্ছে। মানুষের জীবন সম্পর্কে কতকগুলো নিশ্চিত সিদ্ধান্তের চলাচলে সমাজ অনেকখানি আড়ষ্ট হয়ে আছে এখনো। সেসব সিদ্ধান্তে বিশ্বাস অবশ্যি ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ছে। পুরোনো মতে ও মীমাংসায় আস্থা সয়ে যেতে সময় নেয় ; নতুন সত্যে মানে, সত্যের নির্মলতর মর্মে বিশ্বাসও খুব ধীরে ধীরে আসে জীবনে। বিপ্লব সমাজকে ধাতুপদার্থের মতো খানিকটা গালিয়ে ফেলে বটে, কিন্তু নতুন প্রকৃতিতে গঠিত হবার আগে সে ধাতু কঠিন হয়ে তার পুরোনো মাতৃ আকৃতির সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকতে পারে আবার ; থাকতেই চায় যেন। এ জিনিস রাশিয়ায় দেখা যাচ্ছে বলে আমার ধারণা ; আগে ফ্রান্সে দেখা গেছে বিপ্লব মানে শুভার্থে বিপ্লব ধরে নিয়েছি আমি। বেশ ঘন সন্নিপাতের দরকার—বিপ্লবের, সমাজকে অনেকখানি পরিবর্তিত করে কল্যাণের বেশি আলো দান করতে হলে. (পৃ. ৮৩-৮৪, কবিতার কথা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই 'সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা' প্রবন্ধের শেষদিকে জীবনানন্দ দাশ আরো বেশি প্রণিধানযোগ্য কিছু কথা বলেন, বিশ্লেষণ করে চলেন নিম্নরূপ :

এ-প্রবন্ধের আর এক জায়গায় আমি বলেছি যে আমাদের সময়ে না হলেও খুব বেশি দেরিতে নয়—বিপ্লব আসবে ; দীর্ঘকাল ধরে সক্রিয় থাকবে বলে মনে হয়, স্বৈরী দর্শনকে অনেকখানি সরিয়ে দিয়ে (সব সময়ের জন্যে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেয়া সম্ভব নয় অবশ্যি—মানুষের ভাবনা-চেতনার দেশে বিজ্ঞানকে স্থাপন করবার জন্যে—যাতে যুক্তিপ্রাণ হয়ে উঠতে পারে সমাজ-- সকলের মঙ্গলও সম্ভব হয়। এছাড়া অন্য কোনো ধরনের বিপ্লবের বিশেষ কোনো অর্থ হয় না আজকাল আর। মানুষ অবশ্যি কোনো রকম পরিপ্রেক্ষিতের দাস ঠিক নয় ; তার সম্বন্ধে যা আশা করা যাচ্ছে সেটা উৎসন্ন করে দেবার শক্তি মানুষের যে নেই তা নয়। মানুষ উৎসন্নও হয়ে যেতে পারে—খুব বিশৃঙ্খল বিপ্লবে। কিন্তু বিশেষ ভালো প্রেরণায়ও নির্ভর করে বিপ্লব যদি আসে তাহলে তখনকার সাহিত্য, কাব্য কি আগেকার চেয়ে সফল, সপ্রতিভ হয়ে উঠবে, বেশি মহান হবে? গত এক হাজার বছরের দর্শন ও সাধনসংকল্পে অবিশ্বাস, নতুন বিজ্ঞান ও সংকল্পের ভূমিতে বিশ্বাস—কবিদের চেতনার দেশে এই দু'রকম টানের মর্মান্তিক উপলব্ধি হবে বিপ্লবের দান ও কবিতার প্রেরণা। পুরোনো সত্যে ও মর্মে অতটা অবিশ্বাস ঠিক হবে না, নতুন সত্যেও বিশ্বাসের আতিশয্য বিপ্লবের তাপে বেড়ে উঠে অর্ধ-সত্যের চেয়ে বেশি কিছু হতে পারবে না। প্রায়ই তা যে হতে পারে না ফরাসী বিপ্লবের সময় দেখা গেছে—পরে রুশ বিপ্লবের সময়। আজকাল 'বিপ্লবমাতৃক' সোভিয়েট একটা নতুন বিশ্বাসের সূর্য্যজ্বালায় এত বেশি আলোকিত যে ঠিক সেই বলয়ের বাইরে আর সমস্ত সাহিত্যকেই দুর্বোধ্য সান্ধ্যভাষা মনে হয় তার ; 'যদি হায়নারা আর নেকড়েরা কলম নিয়ে লিখতে পারত' মনে হয়। এরকম অত্যুচ্ছ্বাস বড় জোর সুসাহিত্যিক দল বেঁধে তৈরী হতে পারে, কিন্তু বৃহৎ মহান সাহিত্য তৈরী হওয়া কঠিন। নিজেদের প্রণালী ও সিদ্ধান্তে সোভিয়েটের অতি-বেশি জোর বিশ্বাসের পাল্টা অবিশ্বাসের অসীম ঝাঁঝ, আমার মনে হয় পশ্চিম ইউরোপে এখনো দেখা দেয়নি। দেখা দেবে কি শিগগিরই? চিত্তের বিমর্ষতা ও অনেকটা স্থিরতা আছে এখনো সেখানে। কিন্তু বিশ্বাসের আশ্চর্য কৃতবিদ্যতায় রাশিয়া আজ যে রকম দীপ্ত তাতে উচ্ছ্বাস কমিয়ে ফেলে ধীরভাবে চেতনার গভীর অন্তর্যামী আলোয় জীবনকে চিনে নেয়ার সাহিত্য-পদ্ধতিকে বুর্জোয়ার ভূতের বেগার বলে মনে হচ্ছে তার। কিন্তু এরকম বেগার দান্তে খেটে গেছেন— টলস্টয়ও। আধুনিক সোভিয়েটেও যেখানে যা কিছু ভালো সাহিত্য হচ্ছে সেটা স্থিরতা, ইতিহাসে যা হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, যা হয়নি সে সব দুঃসাধ্য স্বর্গ রচিত হতে পারে স্বীকার করেও বিশ্বাসের মাত্রারক্ষা ও অভিনিবেশের ফলেই হচ্ছে। (কবিতার কথা, পৃ. ৯১-৯২)

বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের একটি ভারসাম্য কিংবা সন্ধির গুরুত্বের এই যে সব কথা, একেই আমি বলতে চেয়েছি জীবনানন্দের সপ্রশ্ন মনোভাব, এখানে 'বিশ্বাসের মাত্রারক্ষার' কথাও তিনি বলেছেন :

অবিশ্বাস বা বিশ্বাসের অন্তিম আলোড়ন যে বিশৃঙ্খলা আনে তা নিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তৈরি হওয়া কঠিন। প্রথমটির থেকে নানা রকম আচ্ছন্ন, কৃশ লেখার জন্ম হয়—দ্বিতীয়টি তিল ধারণের স্থানে ব্রহ্মাণ্ডকে ফোটবার প্রতিভা পায়নি, কিন্তু তেমনি একটা আগ্রহের চলাচলে ও উৎসাহের অতিরিক্ততায় সাহিত্যের সাধারণ সব স্তরে মাত্র সফল। (কবিতার কথা, পৃ. ৯২-৯৩)

কিন্তু, জীবনানন্দের এ কি শুধুই সাহিত্যের মঙ্গলের জন্যে চিন্তা, তেমনই কিছু আংশিক শঙ্কা এবং উদ্বেগ? তিনি যখন বলেন, "বিশ্বাস বা তাঁর অভাবের পরিমিত প্রসার ও গভীরতা নিয়ে কবির কাজ ; তার বাইরে সে বিশেষ প্রতিভার শুভক্ষণের উপর নির্ভর না করে প্রয়াণ করতে পারে না। অতি অবিশ্বাসে অনেক আধুনিক সাহিত্যের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়েও খারাপ হবার সম্ভাবনা বিশ্বাসের বেশি সাচ্ছল্যে," তখন তাঁর এই বিচারবোধ-শ্রেয়বোধকে কি বাস্তব মানব জীবন কিংবা সমাজব্যবস্থার জন্যে অপ্রযোজ্য ভাবতে হবে? ভাবতে কি হবে যে বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে তিনি 'অতিরিক্ততায়' কিংবা আদর্শবাদ (idealism)-এ বিশ্বাস করতেন? 'রূপসী বাংলা' বা 'বনলতা সেন' জাতীয় রচনাকে ঘিরে জীবনানন্দের পরিচিতি কিন্তু আদর্শ দেশপ্রেমিক এবং মত্ত প্রেমিকের। স্বদেশ কিংবা নারীকে সেখানে কোনো দ্বিধা বা সংশয়ের মধ্যে দেখা হচ্ছে না। পৃথিবীতে মানুষের জন্যে এমন স্বদেশ বা নারীর ধারণা-কল্পনার অন্যতর প্রয়োজনও হয়তো রয়েছে। বৃটিশ ভারতের যে রাজনৈতিক-সাহিত্যিক পরিবেশে জীবনানন্দ দাশের জন্ম এবং জীবনযাপন, তাতে অবিচিত্র দেশপ্রেম এবং রোমান্টিকতা, যা রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের রচনায় অনেক বেশি প্রাপ্তব্য, জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যেও তা সর্বস্ব কিংবা মূলধারা হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু 'ঝরা পালক' এবং 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের বাইরে জীবনানন্দের কখনোই আর কোনো সরল এবং অখণ্ড কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। সরল এবং অগভীর ইতিকে খুঁজে জীবনানন্দ দাশের কাছে আর যাওয়া যায় না, যাওয়া যায় অনুভূতির বর্ণিলতা এবং সূক্ষ্মতাকে খুঁজে, যা হয়তো দূরতর ভবিষ্যতের অধিকতর মূল্যবান কোনো 'বিপ্লব'-এর পক্ষে ফলপ্রসূ হবে, যে-বিপ্লব 'দীর্ঘকাল ধরে সক্রিয় থাকবে বলে মনে হয়'। 'স্বৈরী দর্শনকে' যে-বিপ্লব দেবে "অনেকখানি সরিয়ে (সব সময়ের জন্যে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় অবশ্যি)—মানুষের ভাবনা-চেতনার দেশে বিজ্ঞানকে স্থাপন করবার জন্যে—যাতে যুক্তিপ্রাণ হয়ে উঠতে পারে সমাজ—সকলের মঙ্গলও সম্ভব হয়।" (কবিতার কথা, পৃ. ৯১) স্বল্পসংখ্যক বলেই সমাজ-রাজনীতি বিষয়ে জীবনানন্দ দাশের এই কথাগুলোর প্রতিটিই বিশেষ সত্যতায় ও অর্থে পূর্ণ।

আমার বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনাম তথা বিষয়বস্তুর জন্যে এখানে আমার এ-যাবৎ বলা কথাগুলোর প্রাসঙ্গিকতা আমি দ্রুতই নির্দেশ করতে চাই। সমাজতন্ত্র কিংবা বিপ্লববাদের একরূপসঙ্কটের বর্তমান সময়ে পৃথিবী ব্যাপীই অত্যন্ত প্রবল এবং অন্য-একরূপ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে নারীবাদ এবং নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা। বিপ্লব এবং সামাজতন্ত্রের মতো বিষয় সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অনুপাত ও সত্যতা এখানে আমাদের-দেয়া উদ্ধৃতি থেকে এবং অন্য নানা সূত্রে পাঠকের হয়তো জানা রয়েছে। জীবনানন্দের সাধারণ বিচারধারা এবং ভাবনাভঙ্গি সম্পর্কেও আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছি, সাহিত্য এবং সমাজ ব্যবস্থার কল্যাণের বোধ এই গুরুত্বপূর্ণ কবির কি ছিল, তাও। তারই আলোকে-ভিত্তিতে বর্তমানের নারীবাদকে কি চোখে দেখা সম্ভব, তার কি মূল্য দেখা, এ-প্রবন্ধে সেই প্রশ্নটি শুধু উত্থাপন করতে চাই। নিশ্চয় এ-ব্যাপারে আমার নিজের কিছু প্রশ্ন রয়েছে, তাই-ই জীবনানন্দের সূত্রে-সাহায্যেও প্রশ্ন তোলা। আশা করি, পাঠক এবারে আমার প্রবন্ধের শিরোনাম এবং তার শুরুর মধ্যকার সম্পর্কটি দেখতে পাচ্ছেন।

উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় এবং সঙ্কট—অনতি অতীতের এসব ঘটনায় পৃথিবীময় যতো বেশি একদেশদর্শিতা, কতকগুলো 'অপর'-এর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ, সামগ্রিকতায় না দেখা, ইত্যাদি ঘটেছে, ঘটেছে যতো বেশি শুধু সামষ্টিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ, তাতে খানিক ক্লান্ত বোধ করার সময় কি আসেনি? আসেনি কি ব্যক্তিক এবং আত্মবিশ্লেষণের দীর্ঘকাল বাকি থাকা কর্তব্য সম্পাদনের একটি পর্যায়। ইতিহাসের সকল দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে ভারসাম্য রাখা এবং সামগ্রিকতায় দেখার ব্যর্থতা যেমন আজ সর্বাধিক চোখে পড়ে, চোখে পড়ে অহংবোধপ্রসূত এবং ক্ষমতা দখল ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপব্যাবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতিও। তার অর্থ, দ্রষ্টাগণও কৃচিৎ মানবঅকল্যাণের এই মোক্ষম কারণগুলো নির্দেশ করতে পেরেছিলেন। আমার ধারণা, দ্বন্দ্বরত পক্ষগুলোর মধ্যে ভারসাম্যহীনতা এবং আত্মোপলব্ধির ব্যাপক ও অশেষ অভাবের এক বিরল উপলব্ধিতে পৌঁছেই এককালের উচ্চকণ্ঠ এবং নজরুলতুল্য জীবনানন্দ দাশ পরবর্তীতে অর্জন করেছিলেন এক সমাহিত ও নিম্ন কণ্ঠস্বর, তাতে উচ্চারিত হয়েছে এক গভীরতর দর্শন, এবং সে-দর্শনে আবার অনুপস্থিত সহজ কোনো সমাধান কিংবা পথনির্দেশ। গোষ্ঠী, শ্রেণী বা লিঙ্গ-নির্বিশেষে মানুষের যে-সকল প্রজাতিক প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য জীবনানন্দ দাশ ইতিহাসব্যাপীই দেখতে পেয়েছিলেন, তাতে নানারূপ ক্ষমতার বোধকে তাঁর যুগপৎ ব্যাপক ও অশেষ বোধ হয়েছে। যারই চাপে বিপ্লব হয়ে পড়ে ক্ষণস্থায়ী, পুনরায় ঘনিয়ে আসে 'স্বৈরীদর্শন', 'যুক্তি' লোপ পায় এবং কখনোই সম্ভব হয় না 'সকলের মঙ্গল', এমনকি বৃহত্তর সংখ্যকেরও। আমি আবারও উদ্ধৃত করছি, এখানে জীবনানন্দ দাশ যেন যুগপৎ পথনির্দেশও প্রার্থনা করছেন,

> আমাদের সময়ে না হলেও—খুব বেশি দেরিতে নয়—বিপ্লব আসবে ; দীর্ঘকাল ধরে সক্রিয় থাকবে বলে মনে হয়, স্বৈরীদর্শনকে অনেকটাই সরিয়ে দিয়ে (সব সময়ের জন্যে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় অবশ্যি)—মানুষের ভাবনা-চেতনার দেশে বিজ্ঞানকে স্থাপন করবার জন্যে—যাতে যুক্তিপ্রাণ হয়ে উঠতে পারে সমাজ—সকলের মঙ্গলও সম্ভব হয়। (কবিতার কথা, পৃ. ৯১)

২.

এ-প্রবন্ধের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নারীকে জীবনানন্দ দাশ নিশ্চয় বিচিত্ররূপ ও মূল্যে দেখেছিলেন। তাঁর কিছু সংখ্যক রোমান্টিক কবিতা থেকে তাঁর সম্পর্কে অপার ও অনন্য এক রোমান্টিকতার একটি ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। 'বনলতা সেন'-এর মতো কবিতা পড়ে অনেক পাঠকই ভাবতে পারেন, জীবনানন্দ দাশ নারীকে পরম কাম্য ভেবেছেন। ক্লান্ত-অসহায় ব্যক্তিমানুষ এভাবে ঈশ্বরকে, লাশকাটা ঘরকে, নারীকে এবং নিশ্চয় পুরুষকেও আশ্রয়স্থল ভেবে আত্মিক-মানসিক শান্তি খুঁজতে পারে। জীবনানন্দের নিজের কবিতায় এবং গদ্যরচনায়ই কিন্তু আবার অত্যন্ত উদ্ধৃতিযোগ্য, আবৃত্তিযোগ্য ভাষায় অমন রোমান্টিকতার সুনির্দিষ্ট পটভূমিব্যাখ্যা উপস্থিত। তাঁর অত্যন্ত পরিশীলিত এবং জীবনগভীর সব রচনার সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অর্থ বর্তমানে বিশ্বাসযোগ্য সুনির্দিষ্টতায় নির্ণীত হয়ে চলেছে। অতএব, জীবনানন্দের রোমান্টিকতা কোনো বিচারেই নারীকে আদর্শায়িত করার ব্যাপার নয়, বাস্তব ও চিরন্তন মানবজীবন ও নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে প্রেমের পাত্র নারীর সঙ্গে তা তার অত্যন্ত ঋদ্ধ ও বহুস্তর-অর্থপূর্ণ সংলাপ। এবং তা ঐ একইভাবে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে রেখে দেখা। ইতোপূর্বে যে...'স্বৈরীদর্শন'-এর ধারণা জীবনানন্দ দাশকে পোষণ করতে দেখেছি আমরা, নারী তথা নারীর কর্তৃত্বকেও নিশ্চয় তার ব্যতিক্রম ভাবেননি তিনি। বোঝা যায় যে 'যুক্তি' এবং 'সকলের মঙ্গল' হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বব্যাপ্ত 'স্বৈরীদর্শন'কেই অন্যতম বাধা ভেবেছিলেন তিনি। জীবনানন্দের বিখ্যাত 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতায় 'কয়েকটি নারী' সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তা তো স্পষ্ট 'স্বৈরিণী'র :

> কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো :
> পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁপার ভিতরে চুলে : নরকের নবজাত মেঘ
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।
...   .
বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক–কর্কট–তুলা–মীন।
(জীবনানন্দের দাশের কাব্যগ্রন্থ, পৃ. ১১)

প্রাণীমাত্রে, মনুষ্যমাত্রে ক্ষমতার যে জৈবিক বোধ এবং আকাঙ্ক্ষা, নারীকে তা থেকে মুক্ত এবং সে–অর্থে পবিত্র ভাবার অবকাশ জীবনানন্দের মতো পর্যবেক্ষণশীল, সংবেদনশীল কারো পক্ষে হওয়াটা অসম্ভব ; সেই বোধ এবং আকাঙ্ক্ষা যে সকল বাস্তব পরিস্থিতিতেই, সকলের মধ্যেই পাখা মেলে, বিচিত্র রূপ পায়, মানব জাতির মহৎ সকল প্রকল্প মাটি হয়ে যায়, তাও ছিল তাঁর সহজ বোধগম্য। পুরুষমাত্রই আকাঙ্ক্ষা এবং সম্ভাবনায় সম্রাট, নারীমাত্র সেক্ষেত্রে সম্রাজ্ঞী। বাস্তব পরিস্থিতিতে বাস্তব ক্ষমতার যে বৈষম্য ও ব্যবধান—নারী ও পুরুষে—বিচিত্র–জটিল সব প্রক্রিয়ায় তাকেও ঘোচানোর চেষ্টা হয়,—এবং একরূপ অন্ধরাই তা না দেখে চলে যেতে পারে। একটি কবিতায় জীবনানন্দ নিশ্চয় এরূপ ক্ষমতাবতী এক সম্রাজ্ঞীর কথাই বলেন, আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি, আশা করি পাঠকও গোটা কবিতাটি পড়ে আমার পাঠের সঠিকতা যাচাই করবেন :

সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বৃষের ’পরে ছুটে সারাদিন
হয়ে গেছে এখন পাথর ;
যে–সব যুবারা সিংহীগর্ভে জ’ন্মে পেয়েছিলো কৌটিল্যের সংযম
তারাও মরেছে—আপামর।
যেন সব নিশিডাকে চলে গেছে নগরীকে শূন্য ক’রে দিয়ে—
সব ক্বাথ বাথরুমে ফেলে ;
...   .
তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের হেয়ালিকে
আঘাত করিবে কোন্‌খানে ?
হয়তো নিসর্গ এসে একদিন ব’লে দেবে কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে
জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে।
(জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, পৃ. ১৪)

‘সাতটি তারার তিমির’—মানুষের এযাবৎ অর্জিত জ্ঞান/সাফল্য সম্পর্কে স্পষ্ট প্রশ্নে পূর্ণ একটি নামের কাব্যগ্রন্থে এর পরের কবিতার নারীও কিন্তু ক্ষমতাবতীই ; ‘অভিভাবিকা’ নামের এই কবিতায় অভিভাবিকার পরিচয় স্পষ্ট, সে–নারী আমাদের সন্তানের জন্মদাতা। জীবনানন্দ এই নারীর সহজ ক্ষমতা এবং সম্ভবত তার পুরুষসঙ্গীর আশাভঙ্গের এক গল্প তবুও শুধু এক অদ্ভুত সান্ধ্যভাষায় শুনিয়েছেন :

অনেক প্রতীক্ষা মোরা ক’রে গেছি পৃথিবীতে
চোয়ালের মাংস ক্রমে ক্ষীণ ক’রে
কোনো এক বিশীর্ণ কাকের অক্ষিগোলকের সাথে
আঁখি–তারকার সব সমাহার এক দেখে ;
তবু লঘু হাস্যে—সন্তানের জন্ম দিয়ে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা আমাদের মতো হবে—সেই কথা জেনে—ভুলে গিয়ে—
লোল হাস্যে জলের তরঙ্গে মোরা শুনে গেছি আমাদের প্রাণের ভিতর,
নব শিকড়ের স্বাদ অনুভব করে গেছি—ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে।
(অভিভাবিকা)

নারীর কাছে পুরুষের প্রত্যাশা তো জীবনানন্দের আলোচ্য এখানে, কিন্তু তা পূরণ না হওয়ার সঙ্গে যুক্ত দেখি নীলিমার 'প্রিয় অভিভাবিকা'র ভূমিকা, নীলিমার পক্ষে সন্তানের জন্মদান 'কোনো এক ক্রীড়া—ক্রীড়া' মাত্র, মৃত্যুর সঙ্গেও তার তুলনা সম্ভব।

অনেক গন্ধর্ব, নাগ, কুকুর, কিন্নর, পঙ্গপাল
বহুবিধ জন্তুর কপাল
উন্মোচিত হ'য়ে বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে থাকে পথ-পথান্তরে ;
তবু ওই নীলিমাকে প্রিয় অভিভাবিকার মতো মনে হয় ;
হাতে তার তুলাদণ্ড ;
শান্ত—স্থির ;
মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।
যেন তার কাছে জীবনের অভ্যুদয়
মধ্য সমুদ্রের 'পরে অনুকূল বাতাসের প্ররোচনাময়
কোনো এক ক্রীড়া—ক্রীড়া ;
বেরিলমনির মতো তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু।
স্থির—শুভ্র—নৈসর্গিক কথা বলিবার অবসর।
(অভিভাবিকা)

হিসেবী এবং নিরাবেগ এই নারী কি তার প্রচণ্ড স্নায়ুশক্তি নিয়ে সন্তান উৎপাদনকে মৃত্যু বিবেচনা করে, তা কি তার "স্থির-শুভ্র-নৈসর্গিক কথা বলিবার অবসর?" সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাব কিন্তু এরূপ অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষমতার বোধ দ্বারাও পূর্ণ হওয়া সম্ভব। প্রকৃতির কাছ থেকে সহজ প্রাপ্তির বিপরীতেও এরূপ মনোভাবের উদ্ভব বিকাশ সম্ভব। আমার এমন জীবনানন্দ পাঠ যে উদ্ভট-আজগুবী কিছু নয়, তাঁর গল্প-উপন্যাসের পঠন-পাঠনে তা অধিক পরিষ্কার হতে পারে। 'গভীর গভীরতর অসুখ গদ্যসত্তার জীবনানন্দ' বইয়ে শান্তনু কায়সারও বলেছেন জীবনানন্দ দাশের জীবনের একটি পর্বে যে আর "প্রকৃতি, নারী বা জল আর সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য বা শুদ্ধতার প্রতীক নয়" সে-সম্পর্কে। শান্তনু কায়সার উদ্ধৃতি দিয়েছেন জীবনানন্দের নারী-বিষয়ক ধারণা কিরূপ পাল্টে গেছে, তা দেখাতে :

সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চ'লে গেছে।
ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।
(প্রেম ও অপ্রেমের কবিতা : মহাপৃথিবী)

এক পর্যায়ে যে 'রূপসী বাংলা'ও পরিবর্তিত ও প্রশ্নযোগ্য হয়ে ওঠে, প্রবন্ধের শুরুতে আমরা তা বলেছিলাম। শান্তনু কায়সার বুঝি আমাদেরই হয়ে তার প্রমাণ দিতে উদ্ধৃতি দেন,

বাংলা রূপকে সবসময় সবচেয়ে গভীর ও সুখের বলে মনে হয় না।
(জীবনপ্রণালী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্তনু কায়সারের মতাবস্থান আমাদের খুব নিকটেই। গদ্যরচনাগুলোর প্রকাশে জীবনানন্দ দাশের অনীহা এবং বিলম্বকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি, গদ্যরচনাগুলোয় অত্যন্ত ব্যাপক-উপস্থিত বিষয় হিসেবে দাম্পত্য সঙ্কটকে উল্লেখ করেছেন, এবং তারপরে আরো তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রশ্ন রেখেছেন, "জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের চরিত্রদের মূল সংকট কি দাম্পত্য সংকট এবং তার সব উপাদানই কি আত্মজৈবনিক?" (পৃ. ৮) শান্তনু কায়সারের উত্তর : "জীবনানন্দের রচনায় দাম্পত্য-সমস্যা তাতেই স্থিত কিংবা সীমাবদ্ধ নয়, সামগ্রিক সংকটের সে এক চেহারা মাত্র"। (পৃ. ৮) জীবনানন্দ দাশের 'নিরুপম যাত্রা'র প্রভাত তার গৃহছাত্র সমীরকে প্রেম সম্পর্কে যে বৃহত্তর এক বিষয় বোঝাতে চেয়েছিল, "প্রেম বলতে তোমরা নর-নারীর নানারকম সম্পর্ক বোঝ—কী বলো সমীর? কিন্তু আমি ঢের জিনিস বুঝি—স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধই শুধু নয়, দেশের মাঠ, পথ, সেই ইস্কুলের বাড়ি, অশ্বত্থ গাছটা, খোকা বা কেতু।" শান্তনু কায়সার তাও উদ্ধৃত করেন। 'কবিতার কথা'র অন্তর্ভুক্ত 'কবিতার আলোচনা'র প্রাসঙ্গিক একটি অংশকে 'স্পষ্টতর প্রমাণ' হিসেবে উদ্ধৃত করে শান্তনু কায়সার মন্তব্য করেন যে জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে "অচরিতার্থ দাম্পত্য জীবন শুধু তারই কথা বলে না, বরং তার গভীরতর সামগ্রিক সংকটকে চিহ্নিত করে।" (পৃ. ৯) সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক—গদ্য, নাটক, ইত্যাদিতে জীবনানন্দ দাশ কেন কতটুকু কাজ করেছেন কিংবা করেননি, অতঃপর শান্তনু কায়সার সেই আলোচনায় যান, এবং যখন বলেন যে 'দ্বন্দ্ব'কে এড়াতে চেয়েই জীবনানন্দ দাশ নাটক লেখেননি, "গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু সে সবকে আলোর মুখ দেখতে দেননি"', তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের উচ্চারণই তিনি করেন। শান্তনু কায়সারের এসব বক্তব্যের যাথার্থ্য বিবেচনায় আমরা যাবো না, তবে আমাদের প্রবন্ধের জন্যে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলবো যে আঙ্গিক-নির্বাচনের দ্বিধা-সংকোচকে অতিক্রম করে জীবনানন্দ দাশ বিষয়বস্তুর অনেক গভীরতর-সত্যতর দ্বান্দ্বিককে দেখতে পেয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সততা নিয়ে সেগুলোকে প্রকাশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে এক অংশে অস্পষ্টতা ও রহস্যময়তা হয়তো এসেছে জীবনানন্দের স্বভাব থেকে, বাকি অংশ বাস্তব ও দ্বন্দ্বের নিজস্ব জটিলতা। নারী-বিষয়ক প্রবল প্রত্যাশা, প্রেম-বিষয়ক আদর্শবাদ, ইত্যাদি ভঙ্গের স্বাভাবিক গতিতে-পরিণতিতে একটি পরিমাণ আঘাত, তিক্ততা (shock, bitterness) ঘটে গিয়ে থাকবে, কিন্তু সত্যের পক্ষভুক্ত বিভিন্ন জন তো বিভিন্ন ধরনেই সত্যকে গ্রহণ করবেন, উপস্থিত করবেন। শান্তনু কায়সার লিখছেন নিম্নরূপ :

> নারীকে জীবনানন্দ প্রশান্তির জল হিসেবে পেতে চাইলেও সে হয়ে ওঠে ভোঁতা, 'বধির নিশ্চল/সোনার পিত্তল মূর্তি (ইহাদেরি কামে, মহাপৃথিবী)। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'বোধ' কবিতার এই চিত্র তিক্ততায় পর্যবসিত :
>
> ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
> অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
> ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
>
> 'ক্যাম্পে' কবিতায় তিনি যখন তাকে উল্লেখ করেন 'নোনা মেয়েমানুষ' হিসেবে তখন তা হয় তিক্ততর। কিন্তু 'প্রণয়-প্রণয়িনী' গল্পে রমেশ যখন বিরজাকে বলে "সাত বছর ধরে রাতের পর রাত একটা সত্তর বছরের বুড়োর সঙ্গে সন্তান জন্মবার ব্যর্থ চেষ্টা আছে শুধু" তখন তা হয়ে ওঠে তিক্ততম। (পৃ. ১৭, প্রাগুক্ত)

'অনুষ্টুপ' জীবনানন্দ সংখ্যায় অতিন্দ্রীয় পাঠকের জীবনানন্দের গল্পে 'প্রেম ও নারী' প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। অতিন্দ্রীয় পাঠক তাতে জীবনানন্দের গল্পের ব্যর্থ দাম্পত্যগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্লেষণে জীবনানন্দ-ব্যবহৃত কতিপয় 'সূত্র' সম্পর্কে বলেছেন। তার আগে অবশ্য আমরা লক্ষ করতে পারি যে প্রবন্ধকার বলছেন, জীবনানন্দের "সাহিত্যের এই দিকটি, সাফল্য বা অসাফল্য যাই তার থাক, গভীর অনুভবের কাছে দীক্ষিত বলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেখানে ভানের কোনো অবকাশ নেই।" গল্পগুলোতে জীবনানন্দের অবস্থান খুব সচেতন তো বটেই, প্রবন্ধকারের চোখে পড়েছে 'দ্রুততাও', "আরো বোঝা যায়, খুবই দ্রুততা অনুভব করেছিলেন তিনি, লেখায় তা ধরা পড়েছে, যেন সৃষ্টি নয় শুধু, কিছু প্রতিপন্ন করতেও চেয়েছিলেন তার গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে।" (পৃ. ৩৩৭, *অনুষ্টুপ*,জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৯) বোধ করি এখানে ইঙ্গিত এই যে গল্পগুলো এভাবেই জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবন এবং শান্তনু কায়সার কথিত এক "গভীরতর সামগ্রিক সংকটে"-এর সঙ্গে জড়িত। অতিন্দ্রীয় পাঠকও নারী-প্রশ্নে জীবনানন্দের ধারণার একটি দ্বান্দ্বিক বিন্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যখন লিখেছেন, "যে সমস্ত গল্পে প্রেম ভালবাসার তত্ত্বই মূল বিষয়, মূল ভাবটি সেখানে এই রকম—প্রেম অতি উৎকর্ষের জিনিস, ভালবাসা দিয়ে একটি নারীকে সৃষ্টি করা যায়, তার ফসল না পেলেও সৃষ্টিতে সার্থকতা থাকে। একই সঙ্গে তা বেদনারও।" এ হচ্ছে নারীকে তার শক্তিতে ও দুর্বলতায় দেখার পরিচয়, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে দেখার প্রমাণ। অতিন্দ্রীয় পাঠক উল্লেখ করেন যে জীবনানন্দ "কবিতার কোথাও কোথাও এবং কথাসাহিত্যে প্রায় সর্বত্র স্ত্রীজাতিকে...দুভাগে ভাগ করেছেন।—নারী ও মেয়েমানুষ।" (পৃ. ৩৩৭, প্রাগুক্ত) জীবনানন্দের পর্যবেক্ষণকে কেউ অগভীর বা মূল্যহীন বলতে আসবেন না, আশা করি। সত্য, সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতার জন্যে তাঁর নারী-বিষয়ক বা অন্য যে কোনো উচ্চারণের-মতাবস্থানের যে বিশাল তাৎপর্য রয়েছে, তাকেই বরং যতোটা সম্ভব পরিষ্কারভাবে বুঝে নেয়ার প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে নারীবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে, সমাজ ব্যবস্থার এক দুঃখজনক ভারসাম্যহীনতার, শোষণ ও বৈষম্যের পটভূমিতে তা খুবই জরুরি এবং সদর্থক এক ঘটনা। কিন্তু, তা যে বিপরীত এক ভারসাম্যহীনতা, আংশিকের আর এক সর্বস্বে পরিণত হওয়ায় পর্যবসিত হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা একেবারেই নেই। মানবেতিহাসের বহু অতিরেক কিংবা 'অতিরিক্ততা'র দৃষ্টান্ত, যাবতীয় ন্যায় আদর্শের অন্যায়কারীদের পুঁজিতে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত, এবং নারীবাদী অবস্থানেরও বহু অন্ধত্ব ও সুবিধেবাদ বরং জরুরি তাগিদ দেয় পরিচিত সব বিপজ্জনক প্রবণতাকে এবং ভ্রান্তিকে পরিহার করার। নারী-বিষয়টিকে সপ্রশ্নভাবে এবং জটিলতায় দেখার যে বিশাল আয়োজন-অবকাশ জীবনানন্দের রচনা দিতে পারে, তাকে গ্রহণ করার আহ্বান আমার এই প্রবন্ধ। জীবনানন্দের বিখ্যাত রোমান্টিকতা তিক্ত নারীভাবনায় পৌছনোর কারণ খুঁজে দেখার আহ্বান নারীবাদী এবং অন্যসব পাঠককেও। রবীন্দ্রনাথ-কথিত পূর্ণতার সাধনা কার কতটুকু বাকি আছে, তার খোঁজ করা যেমন জরুরি, কোনো বৈষম্য বা 'অক্ষমতা' দ্রুতই এবং অপরিচিত কোনো ভয়াবহ ক্ষমতা-নৃশংসতায় পৌছে যায় কি-না, জীবনানন্দের রচনা নারী-পুরুষ সব পাঠককেই তার উত্তর দিতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা যদি জীবনানন্দ পাঠে, সবলতা-দুর্বলতা, স্নিগ্ধতা-হিংস্রতার ধারণায় শিক্ষিত না হয়, জীবনানন্দের জন্মশতবর্ষ কিংবা নারীমুক্তির অভিযাত্রা তা হলে অত্যন্ত বড়ভাবেই ব্যর্থ হবে। আমার এই নিরতিবিস্তৃত এবং প্রক্ষিপ্ত তাগিদকে আমিও দ্রুতই আরো বিপদভাবে উপস্থিত করতে চাই। এর আপাত-সংক্ষিপ্ততার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের স্বদেশ বাংলাদেশ

আহসানুল কবির

বাঙালি, বাংলাদেশ এবং প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসায় যে কবির কাব্য জগৎ নির্মিত তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর এই জগৎ তৈরিতে কোনো পরিকল্পনা ছিল না—ছিল 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র প্রভাব। অর্থাৎ প্রকৃতির বিকাশ প্রক্রিয়ায় কবি শৈশব থেকে ছিলেন মুগ্ধ। স্রষ্টার নির্বাচনকে মেনে কবি বরিশালের প্রকৃতিকেই আঁকড়ে ধরে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। "যখনই কোন প্রসঙ্গে বরিশালের কথা উঠেছে তার প্রশস্তিতে তার যেন আর মুখে কথা ধরে না। শেষের দিকটাতে অবস্থা এমনই হয়েছিল যে ভাল থাকা মানে বরিশালে যেমন ছিলাম তেমন থাকা" (রূপসী বাংলার দুই কবি : পূর্ণেন্দুপত্রী)। তাই জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্র বোধকরি বাংলাদেশই। এই বাংলাকেই কবি রূপসী বাংলা বলে আখ্যায়িত করেছেন। পূর্ব এবং পশ্চিমের ভেদরেখাকে স্পষ্ট না করে তিনি অখণ্ড বাংলাকেই ভালোবেসেছেন। তারপরও জন্মের ঋণ এবং মাটির টানের প্রতি দুর্বলতা কবির আমৃত্যু ছিল। ৬ ফাল্গুন ১৩০৫ ইংরেজি ১৮৯৯ সালে জীবনানন্দ দাশ বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষদের বসতি ছিল ঢাকার বিক্রমপুরের গাউপাড়া গ্রামে। গ্রামটি নদীর ভাঙ্গনে পড়ায় তাঁর ঠাকুর দাদা বরিশালে বগুড়া রোডের পাশে ৫/৬ বিঘা জমির ওপর বসতি পাতেন। বরিশালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রথম থেকেই পরিবারটিকে শিল্পবোধে টেনে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে পরিবারটি সত্যানন্দ দাশ, কুসম কুমারী দাশ ও জীবনানন্দের মতো প্রতিভাকে ধারণ করেছে। "সৌম্য মূর্তি সত্যানন্দ একজন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অপার অসীম।" (মানুষ জীবনানন্দ : লাবণ্য দাশ)। জ্ঞানান্বেষী সাহিত্যমোদী সত্যানন্দের বৈবাহিক জীবনও ছিল অত্যন্ত মধুর। তাঁর স্ত্রী কুসুম কুমারী দাশ। এই কুসুম কুমারী দাশের একটি ছড়া আজও বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে—"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।" আমাদের দেশ কথাটির মধ্যে দেশের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং ভালোবাসা প্রত্যয় আন্তরিকভাবে উচ্চারিত। শিক্ষাব্রতী সত্যানন্দ দাশ ও কবি স্বভাবের কুসুম কুমারী দাশের দাম্পত্য জীবনের উৎকৃষ্ট সন্তান শিশু জীবনানন্দ দাশ।

শৈশব থেকেই জীবনানন্দ দাশ বেশ চঞ্চল স্বভাবের ছিলেন। বাড়ির জমির আম, কাঁঠাল, আনারস পেড়ে খাওয়া থেকে শুরু করে ঠাকুরমার আচারের বৈয়াম চুরি তার নিত্য কর্ম ছিল। কিন্তু এই দুরন্তপনা তার বেশি দিন ছিল না। ১৯০৭ সালে ব্রজমোহন স্কুলে ভর্তি হবার কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি লেখাপড়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন। প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দের বিনয়ী স্বভাব এবং তাঁর লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে খুশি হন। ১৯১৫ সালে কৃতিত্বের সাথে (১ম বিভাগে) ম্যাট্রিক পাস করে তিনি ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হন। ১৯১৭ সালে আবার কৃতিত্বের সাথে (১ম বর্ষে) আই এ পাস করে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। আঠার বছর বরিশালের মাটিতে থাকার পর তিনি কলকাতার নাগরিক জীবনের সাথে যুক্ত হন। তখন শহর বলতে কলকাতাকেই বুঝানো হতো। ১৯২১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। এই চার (১৯১৭–১৯২১) বছর কলকাতার জীবনে লেখাপড়া করলেও জীবনানন্দ বিভিন্ন সময় সুযোগ বুঝে বন্ধে বাড়ি অর্থাৎ বরিশালে ছুটে আসতেন। তাঁর কর্মজীবন ১৯২২ সালে কলকাতার সিটি কলেজের অধ্যাপনা দিয়েই শুরু হয়। ১৯২৯ সালে খুলনায় বাগেরহাট কলেজেও তিনি অধ্যাপনা করেন। ১৯৩০ সালে তিনি ঢাকার ইডেনের ছাত্রী লাবণ্য গুপ্তকে (পরে দাশ) বিয়ে করেন। শৈশব, কৈশোর, যৌবনের স্মৃতি, বাড়ির পরিবেশ, মা–বাবা, দাম্পত্য জীবন, সর্বোপরি বরিশাল কবিকে আবার টেনে আনে। ১৯৩৫ সালে তিনি ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কবি ব্রজমোহন কলেজেই চাকরিরত থেকেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখাসমূহের অভিজ্ঞতা এই সময়ের মধ্যেই হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগ কবিকে খুব পীড়া দেয়। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা অর্থাৎ দেশ ভাগের উত্তাপ এবং উত্তেজনায় কবি নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। ফলে পরের বছরই তিনি কলকাতাতে চলে যান। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ মাত্র সাত বছর কবি কলকাতাতে জীবিত ছিলেন। এ সময়ের অভিজ্ঞতা কবির খুব একটা সুখকর ছিল না। নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ কলকাতাকে কবি কখনো আপন করে মন থেকে ভালোবাসতে পারেননি।

"কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে/তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।" (সুচেতনা : জীবনানন্দ দাশ)। এখানে তোমার বলতে কবি স্বদেশ প্রকৃতি এবং বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাকেই বুঝিয়েছেন। ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। এই ক্ষুদ্র পরিসরে কবির জীবনী আলোচনা করে দেখা গেল তার চৌদ্দ বছরের ছাত্র জীবনের দশ বছরই কেটেছে বরিশালে। কর্মজীবনে তেরটি বছর বরিশালের। সুতরাং এ জীবন দোয়েল এবং শালিখের তো নয়ই তা বাংলাদেশের একজন বাঙালি কবির। যার অভিজ্ঞতার জিওগ্রাফী বাংলাদেশের মাটি, মানুষ, প্রকৃতি এবং আকাশের ওপারের আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। শিল্পীমনের প্রসার 'সম্ভোগে' কথাটির জোর গুরুত্ব দিয়েছেন ড. শিবনারায়ণ রায় (গ্রন্থ : কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা)। সম্ভোগজাত সৃষ্টিকে কেউ কেউ আবার অভিজ্ঞতা পুষ্ট বলেছেন। একজন শিল্পী কতটুকু সৎ এবং সম্ভোগী হতে পারেন তার বড় প্রমাণ জীবনানন্দ দাশ। "তিনি সৌন্দর্যতত্ত্ব আবিষ্কারে নিজেকে প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে ছিলেন। তার সেই প্রকৃতি নারিকেল, সুপারি, দেবদারু গাছ, সবুজ ঘাস, ধানসিঁড়ি নদী, ডাহুক আর শামুকে ঘেরা জন্মস্থান বরিশালের।" (জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য : আহসানুল কবির)। অর্থাৎ এই বরিশাল ছিল কবির কাছে আয়নার মতো যার মধ্যে দিয়েই তিনি দেখতে পেয়েছেন সমগ্র বাংলাকে। 'ঝরা পালক' (১৯২৮) তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থ। এখানে কবির প্রথম যৌবনের আবেগ এবং ভাষাগত দুর্বলতা থাকলেও কবির ভেতর সেই জীবন প্রকৃতির সমন্বয় সাধনের ব্যাপারটি এসেছে।

বাংলার মাঠ ঘাটে ফিরে ছিনু বেণু হাতে একা
গঙ্গার তীরে কবে তার সাথে হয়েছিল দেখা।
ফুলটি ফুটিলে চাঁদিনী উঠিলে এমনি রূপালি রাতে
কদমতলায় দাঁড়াতাম গিয়ে বাঁশের বাঁশিটি হাতে।

(অস্তচাঁদ : ঝরা পালক)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঝরা পালকে'র বিভিন্ন কবিতায় ব্যবহৃত বাংলাদেশের পরিচিত শব্দের কয়েকটি উদাহরণ : নদী, বালু, ধোঁয়া, তারা, সাঁঝ, গোধূলি, বাতাস, আলো বর্শা, সবুজ ঘাস, ঝড়, চুড়ি, শশী, পাখি, শিশির, চাতক, শকুন, হিম মাঠে, কবর ইত্যাদি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থেও আমরা দেখেছি কবির প্রকৃতি মনস্কতা।

> প্রথম ফসল গেছে ঘরে
> হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে
> শুধু শিশিরের জল
> আঘ্রাণের নদীটির শ্বাসে
> হিম হয়ে আসে
> বাঁশপাতা–মরা ঘাস–আকাশের তারা
> বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা...।
>
> (পেঁচা : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এই কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত কিছু শব্দের উদাহরণ : মাঠ, বাঁশপাতা, খড়, নাড়া, লাঙল, ফসল, শস্য, কুয়াশা, শসা, ডিম, খুদ, চাষা, জল, ঢেউ, ভূতড়ে, পদ্মা, পরী, জটা, মেঘনা, জোনাকি, বন, রূপকথা ইত্যাদি। এছাড়া 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে তো কবি বাংলার প্রকৃতির এক কাব্যিক ধারাভাষ্য দিয়েছেন। প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ কবি নিসর্গের যে চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন তা বাংলা এবং বাঙালির জীবনকে ধন্য করে রেখেছে।

> কোথাও দেখিনি আহা এমন বিজন ঘাস—প্রান্তরের পারে
> নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে—নীল বুকে আছে তাহাদের
> গঙ্গা ফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা ঢের
> হিজলের ক্লান্ত পাতা—বটের অজস্র ফল ঝরে বারে বারে...।
>
> (কোথাও দেখিনি আহা : রূপসী বাংলা)

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাইনা আর :...।" (বাংলার মুখ আমি, রূপসী বাংলা)। দেশপ্রেমের এই অকপট কাব্যিক স্বীকারোক্তি আর কোনো কবির কাব্যে আছে বলে মনে হয় না। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতার ভেতর কবি বাঙালির ব্যবহৃত নানারকমের শব্দ প্রয়োগ করেছেন তার কিছু উদাহরণ :

কাঁঠালপাতা, হিজল গাছ, ফণীমনসা, কালীদহ, খয়েরি হলুদ, ধূসর, সবুজ, শালিখ, হাঁস, খইরঙা, ছাতা, ঝোপ, তমাল, ভাঁটফুল, ঘুঙুর, ধান, খঞ্জনা প্রভৃতি শব্দ। প্রকৃতির এসব ভাবনা এবং বস্তুর নিবিড়তা কবি মনকে করেছে বিভোর। বাংলার এই প্রকৃতিই কবির কাছে বিশ্ব প্রকৃতি রূপে ধরা দিয়েছে। জীবনের সাথে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতাকে তিনি মেনে নিয়েছেন। প্রকৃতির সুস্থতার ওপরই জীবনের সুস্থতা নির্ভরশীল। তাই তার প্রতিটি কবিতার জিওগ্রাফী বাংলাদেশ। রূপান্তরবাদে বিশ্বাসী কবি মৃত্যুর পরেও আবার ফিরে আসতে চেয়েছেন এই বাংলায়।

"আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়।" (রূপসী বাংলা)। কবির দেশপ্রেমের বড় প্রমাণ এখানেই। এই দেশপ্রেমের মধ্যেই তার নাগরিকত্ব এবং অমরত্বের অধিকার। মুক্তিসংগ্রামে (১৯৭১) কবির কবিতা গান হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছে। অজয় রায়ের দরাজ গলার সেই গান এখনও আমাদের কানে বাজে। "মানুষের মৃত্যু হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও মানব বেঁচে থাকে” (মানুষের মৃত্যু হলে)। এ বিশ্বাসে বলীয়ান কবি জীবনানন্দ দাশ বাঁচবার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কবিতাচর্চা করেছেন। কবিতার মধ্যেই কবি বেঁচে আছেন। মানুষের জন্ম মৃত্যু সত্য এবং সাধারণ। জন্ম মৃত্যুর মাঝের সময়টুকুই মানুষের কর্মকাল। এই কর্মকালের ভেতর জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলবার ইচ্ছে থাকে প্রতিভাধর মানুষের। “এ জীবন লইয়া কী করিব?” (বঙ্কিমচন্দ্র)। বঙ্কিমচন্দ্রের এ যন্ত্রণা শিল্পীর যন্ত্রণা যা থেকে জীবনানন্দ দাশ মুক্ত হতে পারেন নি।”

২

আমার পায়ের শব্দ শোনো—
নতুন এ-আর সব হারানো পুরোনো।

রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের আবির্ভাব এভাবেই। আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে জীবনানন্দের অবদান অনস্বীকার্য। জীবনানন্দ দাশকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-উত্তর যুগকে কল্পনা করা যায় না। গ্রাম এবং নগর জীবনের মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবনানন্দ দাশ সৃষ্টি করেছেন তাঁর কবিতা, গল্প এবং উপন্যাস। যুগ-যন্ত্রণা জর্জর জীবন হাজার বছর ধরে অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকেই বড় বেশি সুবিধা প্রত্যাশী। এই প্রত্যাশা নিয়েই মানুষের ব্যস্ততা। তবে এই ব্যস্ততার মধ্যে মানুষ কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে, পাচ্ছে না সুখ এবং শান্তি। শান্তির জন্যে কবির নির্বাচন ‘বনলতা সেন’।

‘বনলতা সেন’ বাংলার প্রকৃতির মানবীরূপ। যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে শান্তি অন্বেষী মানুষের শান্তি বিছানো রয়েছে। পৃথিবী যেমন কবিকে টানে না—টানে বাংলার রূপ, ঠিক তেমনি পৃথিবীর কোনো স্থানের চেয়ে কবির কাছে নাটোরই শ্রেয়।

আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।
(বনলতা সেন)।

এই নামের সাথে নারী এবং প্রকৃতির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। বনলতা হচ্ছে প্রকৃতি আর সেন হচ্ছে নারী (মানবী)। অর্থাৎ প্রকৃতিকে নারীর রূপ এবং গুণ দিয়ে মানুষের কাছে এর প্রয়োজন এবং গুরুত্বকে বাড়ানো হয়েছে। আকৃতিগত রূপ ধরেই প্রকৃতিগত রূপের কাছে পৌছানো সম্ভব।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা...।
(বনলতা সেন)।

অনুপ্রাসের সাহায্যে চুলের দীর্ঘতা বুঝানো যেমন আকৃতিগত ব্যাপার তেমনি লম্বা চুল ধরে সময়ের দীর্ঘতা বুঝানো প্রকৃতিগত ব্যাপার।

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য...।
(বনলতা সেন)

আকৃতিগতরূপ নিয়ে বাংলার প্রকৃতি যুগ যুগ ধরে বহমান।

“পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।” অর্থাৎ যে চোখে আশ্রয় পাওয়া যায়। ক্লান্ত পাখি যেমন নীড়ে এসে আশ্রয় খুঁজে তেমনি ক্লান্ত পথিক প্রকৃতির কাছে অনায়াসে আশ্রয় পেতে পারে। আর সেই আশ্রয়ের বোধ থেকেই কবির ভেতর দেশপ্রেমের জন্ম হয়েছে। কবিতায় কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ এবং বিশ্বস্ত। এক্ষেত্রে কবি ভোগীও বটে। তাই কবি দ্বিপাক্ষিকভাবে প্রকৃতির নির্জন রূপকে নীরবে মন্থন করেছেন। কবি এখানে পুরুষ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্তা, নারী–সত্তা প্রকৃতি। এই সত্তার কোনো ক্ষয় নেই আছে শুধু পরিবর্তন আর আকর্ষণ। যে আকর্ষণ আর উদারতাকে পুঁজি করে বাংলার প্রকৃতি বহমান। এই বহমানতা যেন বাঙালি জীবনের অধিকারকে নিশ্চিত করেছে। এ সব ক্ষেত্রে কবি মনে কোনো বিভাজন নেই—নেই দ্বিতীয় চিন্তার অবসর। তাই কবিতায় কবির দেশপ্রেমের আনন্দানুভূতির গুরুত্ব অপার। তবে ত্রিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত কবি মনে রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার কারণে বাঙালি জাতীয়তাবোধ আন্তরিকভাবে কাজ করে। ঠিক এ সময় থেকেই কবির ভেতর সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ, জীবনের নানা ভাবনা .... তাঁকে গদ্যের দিকে নিয়ে যায়।

এক্ষেত্রে তিনি হয়ে ওঠেন কথাকার। তাঁর কথাসাহিত্যের ভেতর বাঙালির জীবন, দেশ এবং প্রকৃতির কথা বিস্তৃতভাবে এসেছে। কবিতার শিল্পীত জমিনে যে ভাবনা মাপে বড় হয়ে ওঠে তা মন খুলে তুলে ধরার উপলব্ধি থেকেই তাঁর কথাসাহিত্যের সৃষ্টি। জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের মধ্যে আমরা দেশভাগ এবং দাঙ্গার কষ্ট অনুভব করতে পারি।

“কি আশ্চর্য অবর্ণন সমৃদ্ধি আছে এই পদ্মা–মেঘনার দেশে মানুষ যদি আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে একটু সুস্থিরভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করত। কলকাতায় বাড়ি নেই, চাকরি নেই, খাদ্য নেই। মৃত্যু আছে তবুও পেঁচোয় পাওয়া বাচ্চাদের মত মুখ থুবড়ে পড়ছে গিয়ে কলকাতার অলিতে গলিতে ফুটপাতে।” (জলপাইহাটি : জীবনানন্দ দাশ)।

“জলপাইহাটি প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপন্যাস। এ কারণে উপন্যাসটি রাজনৈতিকও বটে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা’ আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ব–পশ্চিমের মতো একই অন্তরে লেখা জলপাইহাটি।” (জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য : আহসানুল কবির)। এই উপন্যাসে হিন্দু–মুসলমানের সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উপন্যাসে উল্লেখিত কাঁচড়াপাড়া, জলপাইহাটি, মেহেরপুর, লালপুর বাংলাদেশেরই স্থানের নাম। “এই মাঠ ঘাট আকাশ বাতাস আর দেখব না এখানে চল্লিশ বছর ছিলাম” (জলপাইহাটি)। দেশ ছাড়ার আক্ষেপ উপন্যাসে প্রকাশিত। “কোনো রকম কম্যুনাল কথা বলবেন না হরিলাল বাবু...।” (জলপাইহাটি)। “কলকাতার দাঙ্গা জলপাইহাটিতে ছিটকে পড়েনি তো ; কেউ শোনেনি।” অসাম্প্রদায়িক চেতনার ঐক্য এবং দাঙ্গামুক্ত স্থান হিসেবে জলপাইহাটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কোথায় জলপাইহাটি?
পদ্মার ওপারে
পাকিস্তানে?
হ্যাঁ।
(জলপাইহাটি)

এ ছাড়া উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামীণ সমাজ, নদ–নদী, গাছপালা, মানুষ সবই বাংলাদেশের মাটির সাথে সংযুক্ত। এই যুক্ত অবস্থা বন্ধনের মতো, এই বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। তাই ‘কারুবাসনা’ উপন্যাসের নায়ক তো কলকাতার জীবনে থেকেই উচ্চারণ করেছে : “ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোন এক বিস্তৃত প্রান্তরে আমার বাংলো তৈরি করব চারদিকে বাবলা গাছের ঘন নিবিড় বেড়া দিয়ে মাঠটাকে রাখব ঘিরে। কিংবা বুনো কাঠ দিয়ে ছোটখাট নানা ঝুমকোলতা কুঞ্চলতা ও অপরাজিতার আলিঙ্গনে আলো–বাতাস কাক–শালিখ ও পাখ পাখালির সাড়া শব্দে নিতান্তই বাঙালির ঘরোয়া জিনিস।” (কারুবাসনা : জীবনানন্দ দাশ)। জীবনানন্দ দাশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাসাহিত্যের নায়করা প্রায়ই নগর জীবন ফেরত, বেকার। তাদের লেখাপড়া নগরে হলেও তাদের কর্ম নগরে হয়নি। নগরে মানুষের জীবন বিপন্ন বিস্ময়ের মধ্যে রয়েছে এটুকু পোড় খাওয়াবার জন্যে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা কাহিনী নগর পর্যন্ত গড়িয়েছে। তথাপি কাহিনীর মূল উপজীব্য বিষয় কিন্তু গ্রাম এবং প্রকৃতি। "দেশকে ভাল লাগত এই অন্ধকার শিশির জোনাকি ও পেঁচা, কুমড়ো, শশার লতা, ক্ষীর গাছ একটা একাকিত্ব নিস্তব্ধতা পায়ের নিচে 'ঘাসের' পোকাগুলো যে কোন তুচ্ছ জিনিসই জীবনের স্থিরতাকে এমন বুঝেছে এমন শান্তভাবে অপেক্ষা করতে পারে প্রতীক্ষাকে এমন প্রয়াসহীনতা ও কল্পনার শান্তিতে ভরে রাখতে পারে।" (সাতকোলের পথ : জীবনানন্দ দাশ)। 'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাসের নায়ক সুকুমার নিয়তি তাড়িত হয়ে শেষ পর্যন্ত সুখ এবং শান্তির প্রত্যাশায় বলে উঠেছে : "কোন ভবিষ্যৎ জন্ম থাকে, এই নক্ষত্রেই ফিরে আসতে যদি হয়, আবার ইছামতির পারে কোন একটি নিশুতি বটগাছের পাশে গেরুয়া রঙের ইঁটের একখানা বাড়ির ভিতর বিভাকে নিয়ে আমাকে একটা জীবন কাটিয়ে দিতে দিও বিধাতা।" (প্রেতিনীর রূপকথা : জীবনানন্দ দাশ)। 'বাসমতীর উপাখ্যান' উপন্যাসেও আমরা দেখেছি জীবনানন্দ দাশের বাংলাদেশ প্রীতি। এই উপন্যাসের বিস্তৃত কাহিনীর পটভূমি এবং অসংখ্য চরিত্রের জীবনযাপনের নানা অভ্যাসের ভেতর বাংলার প্রকৃতি ও বাঙালির আটপৌরে জীবনের উদাহরণ শব্দে শব্দে চিত্রিত। হোগলার বেড়া, দরমার বেড়া, খলকার বেড়া, গোবরজল নিকানো, কামিন, ছুঁচো, মাছি, চিল, বক, টিয়া, শালিখ, লালকার, বালিহাঁস, নীলকণ্ঠ, ফিঙ্গা, পায়রা, হরিয়াল, মাছরাঙা, বউকথাকও, কোকিল, হাড়িচাচা, বাজকুডুল, দেবদারু, জারুল, জামরুল, সিমু, রেনট্রি, শিরিস, আম, মহানিম, ঝাউ, মানকচু, বাঁশ, ধর্মপুর, খুলনা, নিশিন্দা, মাদারিপুর, চাঁদপাশা, লেমুখালি, মুকিবপুর, গোয়ালন্দ, মির্জাপুর, বাসমতী, শিমুলতলা, কক্স বাজার, শালিখডাঙ্গা, ঝাউডাঙ্গা, জলজিরানি, জিরানডাঙ্গা প্রভৃতি ব্যবহৃত জিনিস গাছপালা, পাখি এবং গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে নানা প্রমাণ তুলে ধরতে গেলে দেখা যাবে যে, জীবনানন্দ দাশ তাঁর কথাসহিত্যের মধ্যে যে বাংলার ছবি তুলে ধরেছেন তা যেন এক শিল্পীর হাতে আঁকা। এই হাতের ছোঁয়ার মধ্যে নেই কোনো জাতপাতের ব্যবধান। 'সুতীর্থ' উপন্যাসেও আমরা দেখেছি নায়কের গ্রামীণ জীবনে ফিরে আসার বাসনা। এই বাসনা জীবনানন্দ দাশ দ্বারা প্রভাবিত। জীবনানন্দের নায়করা প্রায় সবাই প্রকৃতি প্রেমিক। মূলত জীবনানন্দের গ্রাম আর প্রকৃতি প্রিয়তার প্রবণতা ধরে এরা আক্রান্ত। জীবনানন্দের এই প্রবণতা স্বভাবজাত। তাই তার কবিতা, গল্প ও উপন্যাসে গ্রাম কখনো শান্তিদায়িনী সত্তা কখনো বা সুন্দর সাম্য উদার ও শক্তির উৎস হিসেবে ধরা দিয়েছে। এই সত্যে জীবন প্রকৃতির সমন্বয় এবং মূলসূত্র বিচারে জীবনানন্দ দাশ যে বাঙালি এবং তাঁর স্বদেশ যে বাংলাদেশ তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের অন্ধকার : অন্ধকারের আলো
মাহবুব হাসান

জীবনানন্দের জগৎ কেমন ? হরিৎপত্রশোভিত নিসর্গপ্রকৃতির, ধূসর বর্ণময় নাকি অন্ধকারাচ্ছন্ন ? সমস্বরে না হলেও একে একে সবাই বলতে চাইবেন জীবনানন্দ অন্ধকারাচ্ছন্ন নয় ; বরং তাঁর কবিতার পরিসর ডুবে আছে মানুষ আর নিসর্গপ্রকৃতিতে। কেউ বলবেন, যখন প্রকৃতি ও নিসর্গ ধূসর হয়ে ওঠে, জীবনানন্দ যেন প্রাণময় সেখানে। তাঁর কবিতা আলোকময় সবুজ এবং মানুষ-মানুষীর চর্যায় ভরপুর। কথাটা অবিশ্বাস্য নয়, আবার পুরোপুরি বিশ্বাস যেন স্থির হতে চায় না।

আমি লক্ষ করেছি, জীবনানন্দ দাশের যে কটি কবিতা বহুল পঠিত, উচ্চারিত, বিশ্লেষিত, সে সব কবিতায় ধূসর, আঁধার, বিবর্ণ প্রকৃতি, অন্ধকার, আর রূঢ় বস্তুময় দৃশ্যকল্প শব্দে নির্মিত হয়েছে। সন্দেহ নেই তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতাটি তাঁর নামের মতই জনপ্রিয় করে তুলেছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ যেমন রবীন্দ্রনাথকে সোনারতরীর কবিতে স্থির করে ফেলেছে, কাজী নজরুল ইসলামকে যেমন বিদ্রোহী'তে তালা মেরে দিয়ে রেখেছে, জীবনানন্দ দাশ রূপসী বাংলার কবি হলেও তাকে পাখির নীড়ের মতো চোখ তোলে 'বনলতা সেন'-এর কবিতে পরিণত করেছে। 'বনলতা সেন' এই মানুষী নামের সঙ্গে কবিতা কিন্তু অতোটা বাস্তব নয় বা বস্তুময় দৃশ্যময় নয়। এই বনলতা সেন কোনো এক মানুষী, হাজার বছর ধরে পৃথিবীর এক নারী, হতে পারে প্রেমিকা কারো কিংবা জীবনানন্দ দাশেরই মানসসুন্দরী কিংবা কাঙ্ক্ষিতা তাঁর—তাঁকে জীবনানন্দ নির্মাণ করেছেন ভাষায়, চিত্রে, চিত্রকল্পে, উপমায়, উৎপ্রেক্ষায় সাজিয়ে তুলেছেন ; হাজার বছরি স্মৃতিসত্তাময় প্রতীকিত, রূপকায়িত মানুষীরূপ।

শুধু এ কবিতায় নয়, জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য ঘেঁটে দেখা মিলবে এমন কিছু আত্মিক শব্দমালা যা আপাতত নেতির প্রতীক বা অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের রূপক হতে পারে এবং আমার ধারণা জীবনানন্দীয় মানস-প্যাটার্নে এমন একটি হতাশাজনক মনন খেলা করেছে নিয়ত যে, তিনি সেই অবধারিত চিন্তার আধার থেকে বেরুতে পারেননি। কিংবা বলা উচিত তিনি বেরোননি। কেননা, তিনি দেশ ও সমাজ বাস্তবতার বাইরে যেমন ছিলেন না তেমনি তাঁর ধূসর জগৎটি কেবল চারপাশেই বিদ্যমান নয়, তাঁর মানস গঠনেও তা ছিলো শক্তপোক্ত-ভাবেই। এ কারণে দেখা যায় জীবনানন্দ দাশের অধিকাংশ কবিতায় অন্ধকার, ধূসর, ছায়াচ্ছন্ন প্রাকৃত পরিবেশ এবং রাত ব্যাপকভাবে ঘুরেফিরে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ব্যবহার শুধু শব্দজাতই নয়, ধ্বনিময় এবং চিত্রময় ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। শুধু শব্দ যতটুকু তার অর্থ দ্যোতনা সৃষ্টি করে, তার নির্দিষ্ট অর্থ-জ্যোতি ছড়ায় বা চিত্র নির্মাণ করে, কবিতায় ব্যবহার গুণে সেই শব্দ নতুন অর্থদ্যুতি সৃষ্টি করতে পারে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তার বহু উজ্জ্বল উদাহরণ রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কবিতায় অন্ধকার শব্দবন্ধটি নানা মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো সে শব্দ নিছক অন্ধকারকেই রূপায়িত করেছে, কখনো সে শব্দ মহাকালের খাঁড়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে : কখনো মানবজীবনের হতাশার রূপক হিসেবে, আবার কখনো অন্ধকার সভ্যতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। রাত বলতেই যেন আমরা এক সময়-পরিসরকে মানসচক্ষে দেখি—অন্ধকারময় ; আবার সেই রাতই আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্লাবিত জ্যোৎস্নায়। কিংবা খা খা জ্যোৎস্না কবির নয়নে ধূসর, আবছায়া আর রহস্যময়ও হয়ে উঠতে পারে। কেননা, বাস্তব হচ্ছে, জ্যোৎস্নায় মানুষকে খুব কাছে থেকেও চেনা যায় বটে কিন্তু তার মুখের বলিরেখা দেখা যায় না। অর্থাৎ মানুষের অভিব্যক্তি সেখানে অদর্শিতই থেকে যায়। এ কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশে জ্যোৎস্না যেমন ধূসর, তেমনি রহস্যময়ও। জীবনানন্দ দাশের চৈতন্যে ধূসরতা প্রাকৃতিক উপাদান রূপে এসেছে। এবং প্রাকৃতিক পশু-পাখিগুলিও সেই ধূসরতারই রূপ নিয়ে উপস্থিত। ধূসর শব্দের সঙ্গে পেঁচাকে এমনভাবে জড়ানো হয়েছে যে, পেঁচার চিত্রিত চকচকে শরীর মুছে গিয়ে কেবল অশুভ ধূসর চিত্রময়তা আমাদের মানসে ভাসতে থাকে। আমাদের ফেলে আসা জীবনের ছবিকেও ধূসর মনে হয়। মনে হয় আবছা। মানুষ যেহেতু স্মৃতিসত্তাময় প্রাণী—তার যাপিত জীবনের পরিবেশ-প্রতিবেশ তুলে ধরলে, সে খুঁজে পায় তার অতীত জীবনের ছবি। রোমন্থন করে সে স্বাদ সে গ্রহণ করতে পারে এবং করেও। জীবনানন্দ দাশের জনপ্রিয় কবিতাগুলোর পরিবেশ-প্রতিবেশ সেই স্বাদ আমাদের চৈতন্যকে জাগরুক করে। আমরা সেই যাপিত জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন শুনতে পাই, মানসচক্ষে দেখতে পাই তার চারপাশ—নাড়া তোলা ধান ক্ষেত, ইঁদুরের গর্ত, ধানের মঞ্জুরি, বিশাল প্রান্তরে জ্যোৎস্নার আবছা চাদর, সুনসান চারপাশ আর হেমন্তের সকালে শিশিরের জল ঘাসে, দুর্বায় টলমল করে। ওই ফেলে আসা জীবনের জন্য পাঠকের মমত্ববোধ এতোটাই টনটনে হয়ে ওঠে যে, সে জিহ্বায় সেই স্বাদ পায়, ঘ্রাণ পায় ঘাসের, ধানের আর পাখপাখালির ডাক তাকে বিহ্বল করে।

এই পরিবেশ রচনা জীবনানন্দের কৃৎকৌশল। ওই ফেলে আসা স্মৃতিময় চিত্র ধূসর, কোথাও কোথাও অন্ধকারময়। ঘুরে ফিরে জীবনানন্দের এই অন্ধকারময় চিত্রে প্রত্যাবর্তনের বহুবিধ কারণ রয়েছে—সেটাই স্বাভাবিক। এখানে প্রথমে চয়ন করা যাক কিছু পঙ্‌ক্তি তাঁর বহুপঠিত, জনপ্রিয় কবিতা থেকে। বহু পঠিত, জনপ্রিয় কবিতাগুলোর একটা হ্রস্য তালিকাও করা যাক। 'ধূসর পাণ্ডুলিপির 'বোধ', 'অবসরের গান', 'পিপাসার গান' 'মৃত্যুর আগে', বনলতা সেন-এর 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'হাওয়ার রাত', 'শঙ্খমালা', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'শিকার', 'অন্ধকার', 'মহাপৃথিবীর' 'নিরালোক', 'আট বছর আগের একদিন', 'সাতটি তারার তিমিরের রাত্রি', শ্রেষ্ঠ কবিতায়—'এইসব দিনরাত্রি', ১৯৪৬-৪৭ প্রভৃতি কবিতা বহুল পঠিত এবং আলোচিতও। উল্লিখিত কবিতা থেকে কয়েক পংক্তি করে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যেখানে অন্ধকার, আঁধার শব্দবন্ধ রয়েছে।

ক. আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে !
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম হয় !
আমি তারে পারি না এড়াতে,

(বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. পুরোনো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের 'পরে;
সবুজ ধানের নিচে—মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চলে গেছে—আঁটির ভিতর থেকে চলে গেছে চাষা;
শস্যের ক্ষেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা!
(অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

গ. কোনো এক অন্ধকারে আমি
যখন যাইব চলে—আরবার আসিব কি নামি
অনেক পিপাসা লয়ে এ মাটির তীরে
তোমাদের ভিড়ে!
(পিপাসার গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

ঘ. আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে;
(মৃত্যুর আগে : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

ঙ. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।
(বনলতা সেন : বনলতা সেন)

চ. তখন হয়তো মাঠে হামা-গুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে—
বাবলার গলির অন্ধকারে
অশথের জানালার ফাঁকে
কোথায় লুকায় আপনাকে!
(কুড়ি বছর পরে : বনলতা সেন)

ছ. অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের
মতো ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা;
* * * * *
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়!
(হাওয়ার রাত : বনলতা সেন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ. দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা ;
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার সুর।

(শঙ্খমালা : বনলতা সেন)

ঝ. আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে :
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

(নগ্ন নির্জন হাত : বনলতা সেন)

ঞ. সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে
অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

(শিকার : বনলতা সেন)

ট. গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার ;

(অন্ধকার : বনলতা সেন)

ঠ. অথবা তাকায়ে দ্যাখো গোরুর গাড়িটি ধীরে চলে যায় অন্ধকারে
সোনালি খড়ের বোঝা বুকে ;
পিছে তার সাপের খোলস, নালা, খলখল অন্ধকার—শান্তি তার
রয়েছে সমুখে ;

(নিরালোক : মহাপৃথিবী)

ড. শোনা গেলো লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মারিবার হ'ল তার সাধ।

(আট বছর আগের একদিন : মহাপৃথিবী)

ঢ. হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

(রাত্রি : সাতটি তারার তিমির)

ন. মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো ।

(এই সব দিনরাত্রি : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প. ...আজকের এই সব গ্রাম্য সন্ততির
প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে—অন্ধকারে জমিদারদের
চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।
(১৯৪৬-৪৭ : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এভাবে উদ্ধৃতির সহযোগ বাড়ানো যায়। যেখানে দেখানো যায় জীবনানন্দীয় চেতনায় রাত, অন্ধকার, ধূসর পৃথিবী নানা সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ব্যক্তিক অনুষঙ্গে উন্মুখর হয়ে উঠেছে। কেননা, সেই নিম্নকণ্ঠ মুখরতার বাতাবরণ উন্মুক্ত করতে হলে ধীরে ধীরে জীবনানন্দের কবিতার বাক্যস্রোতের ভাঁজগুলো খুলে দেখতে হয়। সে কাজ খুবই দুরূহ। কাজটা 'সমারূহ'র অজর অক্ষয় অধ্যাপকদের যতো কীট বাছার কাজ। এবং এটা মানতেই হবে সৃজনশীল কবিদের কবিতার অন্তর্গত সত্য আবিষ্কার করবার প্রাণান্তকর প্রয়াস কিন্তু কোনোভাবেই সৃজনশীল নয়। কেননা, কবির সৃষ্টি প্রবণতা উদ্ধার করতে সৃষ্টিশীল গবেষকেরই প্রয়োজন। যেখানে নিরেট অধ্যাপক আর নিরেট কবির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

এবার আসা যাক উদ্ধৃত কবিতাংশের বিশ্লেষণ। এ বিশ্লেষণে 'অন্ধকার' শব্দের ব্যবহার ও তার অন্তর্নিহিত অর্থদ্যুতি ও অর্থব্যঞ্জনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। 'বোধ' কবিতার 'আলো অন্ধকারে যাই'কে মানুষের বোধের পরিপূরক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বোধ একবার সুবোধ্য, আবার দুর্বোধ্য—আলো-আঁধারির মতো। অকস্মাৎই একবার ঢোকে সে উপলব্ধির বর্ণোজ্জ্বল আলোতে দণ্ড-পল পরই বোধ ডুবে যায় গহীনঅন্ধকারে যেখানে কোনো কিছুই দৃষ্টিস্নাত নয়। তবে সেখানেও বোধ ক্রিয়াশীল—জীবনানন্দ দাশ এই ক্রিয়াশীল বোধের কথাই বর্ণনা করেছেন। বোধকে কখনো উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতার সঙ্গে মিলিয়েছেন।

পেঁচা, প্রকৃতির বর্ণময় পাখি। সমাজ নির্মাতারা নানা কারণে পেঁচাকে প্রতীকিত করেছে, 'অশুভ' চিহ্নে। তাই অশুভ পাখি রাত্রির অন্ধকার দেখে কোটর হতে বাইরে অন্ধকারে বেরিয়ে এসেছে। জীবনানন্দের মনে যে লোকজ বিশ্বাস ছিলো, লোকসমাজস্নাত সেই বিশ্বাসই কবিতায় তিনি ব্যবহার করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রাত্রি আর অন্ধকারকে তিনি প্রতীকিত ও রূপকায়িত করেছেন, অশুভর সঙ্গে। তিনি সেই চিত্রই নির্মাণ করেছেন, যা রোদের আলোকে ঝলমল নয়। তাঁর চৈতন্যের জগৎ আর কবিতার জগতের মধ্যে যে আলোআঁধারির খেলা চলেছে, তা দিন আর রাত্রির সমাজচৈতন্যের রিচুআল ধরে এগিয়েছে।

'পিপাসার গান'-এ তিনি চলে যাওয়ার কথা বলছেন। আর চলে যাবেন 'কোনো এক অন্ধকারে'। সে অন্ধকার কাকে প্রতীকিত করেছে? সে কি মৃত্যু? নাকি নিছক অন্ধকার! জন্মান্তর বিশ্বাসীদের মতো প্রত্যাবর্তন করবেন অনেক পিপাসা নিয়ে।

মৃত্যুর আগে কোনো মানুষ অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল-এ অজস্র জোনাকি জ্বলতে দ্যাখে কিনা, সে প্রশ্ন আপাতত স্থগিত রেখে দেখা যাক জীবনানন্দ কি ছবি চিত্রিত করেছেন। তার চিত্রময় সময় হচ্ছে রাত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে।' কেন ফসলের জন্যে সাধ নেই জীবনানন্দের কিংবা তার শিয়রে দাঁড়ানো চাঁদের? কেন ওঠে ওই চাঁদ চুপে এসে দাঁড়িয়েছে ফসলহীন মাঠের শিয়রে? এই রকম নিরেট মাঠে চাঁদের এই দাঁড়িয়ে থাকা বোধ জীবনানন্দের মানস প্যাটার্নকে শূন্যময় রাত করে তুলেছে। সর্বই তিনি রাত আর অন্ধকারের ব্যবহার করেছেন তাঁর লৌকিক উপকরণ উপাদানসহযোগে। যেমন কুয়াশা, সন্ধ্যা, জোনাকি, চাঁদ, জ্যোৎস্না প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বনলতা সেন'-এ কবি যে সব ঐতিহাসিক সময় ও সভ্যতার বিলীন হবার কথাই বলুন না কেন, শেষতক কবির মুখোমুখি এসে বসে অন্ধকার। কেননা, এখানে নামীয় বনলতা সেনও সেই অতীতেই নারীকল্পনা, যার চোখ আক্ষরিক অর্থে পাখির নীড়ের মতো নয়। ওই কুৎসিৎ নীড় সদৃশ চোখ দেখে অন্তত কবির মনে কোনো ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি হবার নয়। বরং পাখির বাসা যেমন ডালপালার ফাঁকে আলগোছে বসে থাকে, কবি সেই প্রাকৃত স্বাভাবিকতাকেই বিচিত্র করেছেন বলে মনে হয়। অন্ধকারে কবির কল্পনার মুখোমুখি বসে সেই নারী শুধায়েছে 'এতদিন কোথায় ছিলেন।' অর্থাৎ জীবনানন্দ এতোদিন ওই নিহিত আঁধারে ছিলেন না।

'কুড়ি বছর পরে' বাবলার গলির অন্ধকারকে জীবনানন্দ প্রাকৃত সম্পদের প্রাকৃত আঁধার হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার সময় ও সমাজ সভ্যতার চিহ্নগুলো প্রাকৃত গাছপালার মধ্যে আরোপ করেছেন। যেমন বাবলার গলি, অশ্বত্থের জানালা। গলি নগরস্নাত বা নগরজাত শব্দ আর জানালা লোকসভ্যতাজাত। প্রকৃতি থেকে মানুষ যখন নিজেদের আলাদা করে নিতে থাকে, তখন ঘরবাড়ি ইত্যাদির সঙ্গে জানালা কপাট, খিল ইত্যাদি শব্দ সৃষ্টি করে নেয়। মানুষের সেই সমাজ সৃষ্ট রূপ জীবনানন্দ এখানে আরোপ করেছেন তাঁর সামাজিক-বৌদ্ধিক চেতনাভিসার থেকে।

'হাওয়ার রাত' কবিতার ব্যবহৃত রাত এখানে কেবল অনুষঙ্গ সময় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে বর্ণগুলো সেই কালো পটভূমিতে উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়।

'শঙ্খমালা'র চার পংক্তির পুরো আবহ শূন্যতার অর্থাৎ অন্ধকারের। নীল এখানে শূন্যতারই সমার্থক শব্দ। সন্ধ্যার আঁধার যে চিত্রমাল্য দেয় আমাদের মনের পর্দায়, তাতো প্রাকৃতিক এবং নিত্যদিনের। শঙ্খমালাও ওই নিত্যদিনের একজন।

'নগ্ন নির্জন হাত' কার সেটা কেউ কি জানে? হয়তো সে হাত জীবনানন্দেরই। আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলে সেই অন্ধকার আলোর সহোদরা—এটা তো কবিই বলেছেন। বোঝা যায় এখানে অন্ধকার আর আলোর যে পিঠাপিঠি অবস্থান যা চক্রাকার, বলয়িত এবং অমোঘ—সেই প্রাকৃত সত্যই তিনি বার বার বহু কবিতায় বলেছেন।

অন্ধকারের নানানরূপ চিত্রিত হয়েছে তাঁর 'শিকার'-এ, অন্ধকার-এ, নিরালোক নামের কবিতায়। অন্ধকারে কোনো নিরালম্ব মানুষের মরবার সাধ জাগতে পারে। পারেই, যদি সে নগ্ন নির্জন অন্ধকারে তার দিনরাত্রিগুলো অর্থহীন মনে হয়। কৃষ্ণাদ্বাদশীর চাঁদ ডুবে গেলে এই জীবনানন্দীয় চৈতন্য কি গলায় দড়ি দিয়েছিল?

'এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে' কি? সাতটি তারার তিমির-এর রাত্রি এভাবেই নগররাত্রির নগ্ন রূপ নির্মাণ করে নিয়েছে। অন্ধকারের প্রাধান্য এখানেও।

মনে কেন হলো যে আলোকিত জীবন পরিসর পাশে সরিয়ে রেখে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো। এই বোধ কেন জীবনানন্দের অন্তরে জেগেছিল? অন্ধকার যদি হয় 'নেতি'র প্রতীক কিংবা 'ইতি' বা শেষ সম্বল বা আশ্রয়—যাকে সামাজিক ধার্মিক মানুষ মনে করে থাকে যে, ওইখানেই সব শেষ। জীবনানন্দ তুলনা করেছেন-সমাজ সংসার এই বিশ্বভূগোলের চেয়ে অন্ধকার ভালো?

আজকের সন্তানসন্ততিদের প্রপিতামহরা হেসে খেলে অন্ধকারে জমিদারদের চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়ক গাছে চড়িয়ে রেখেছে। অর্থাৎ বহু আগেই ওই ঐতিহাসিক অন্ধকার—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাখ্যাত হয়েছে জনগণ দ্বারা। জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য কোনো কিছুই বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারে না—অন্তত জীবনানন্দ দাশ সেকথাই মনে করতেন।

ক্রমে ক্রমে আমরা লক্ষ্য করি প্রাকৃতিক বা বাস্তব অন্ধকারকে ছাড়িয়ে জীবনানন্দ এক প্রতীকী অন্ধকারের কথা বলে চলেছেন। অন্ধকার কথাটার মধ্যে এনে ফেলেছেন এক গূঢ়ার্থ, এক নিহিত ব্যঞ্জনা। অন্ধকারের কথা বলতে বলতে জীবনানন্দ প্রকৃতিজগৎ থেকে চলে আসেন মানুষের সংসারে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতামূলক যন্ত্রসভ্যতার নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ ও নিরর্থকতাবোধে পীড়িত মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি অন্ধকারের প্রসঙ্গ আনেন। নিঃসঙ্গ, একাকী মানুষ—যে মানুষ অন্য মানুষ বা মানুষী বা শিশুর সঙ্গে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, সেই মানুষের অন্তরে পুঞ্জিভূত অন্ধকার। ... ব্যক্তি হৃদয়ের মধ্যে তিনি 'অদ্ভুত আঁধার' দেখেছেন। কারণ আধুনিক সভ্যতা মানুষের পক্ষে প্রতিকূল—মানুষের মানবিক বিকাশের পক্ষে তা বাধা। তাই ক্রমে ক্রমে ব্যক্তি হৃদয়ের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে কবি দেখেছেন সভ্যতাগত অন্ধকারকে। ...

> চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
> মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় মন্বন্তর ;
> যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ;
> মানুষের লালসার শেষ নেই ;
> উত্তেজনা ছাড়া কোনোদিন ঋতুক্ষয়
> অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ
> অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয়সাধ
> নেই এই সব দিনরাত্রি।

'নেই' কথাটাকে একটি চরণের মর্যাদা দিয়ে জীবনানন্দ জানাতে চেয়েছেন আধুনিক সভ্যতার সর্বব্যাপী নেতিময় চেহারা। মঙ্গল নেই, কল্যাণ নেই, কোনো মূল্যবোধ নেই—পৃথিবী বীভৎস 'গণিকালয় নরক শ্মশান'। 'বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেজ'—কেরোসিন নেই বলে শুধু অন্ধকার নয়, আনন্দ নেই বলে অন্ধকার, ব্রত নেই, আলপনা নেই, পটের ছবি নেই, নবান্ন উৎসব নেই। 'নিভে গেছে সব।' যারা ইতর শ্রেণীর দরিদ্র মানুষ, 'ছেঁড়া জুতো পায়ে/বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে'—তারাই দুই দলে বিভক্ত হয়ে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়। একদলে ইয়াসিন, মকবুল, করিম, আজিজ, অন্য দলে গগণ, বিপিন, শশী। এই দাঙ্গা-যুদ্ধ দেখে কবির মনে হয়, সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।' ...শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা দুনিয়ায় নেমে এসেছে অন্ধকার। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের সংকট এই মূল্য বিশৃঙ্খলার, এই অন্ধকারের জন্য দায়ী। 'জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে ; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।' আছে শুধু টাকা। এই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার টাকাই এখন উপাস্য দেবতা, আর 'এই দেবতাই ব্যাধি'।[১]

জীবনানন্দের অন্ধকার, হতাশাক্রান্ত, তিতিবিরক্ত জীবনেরই প্রতীকী উদ্ভাসন। আবার তাঁর ওই অন্ধকার আলোরও মাতৃগর্ভ। অন্ধকারেই নিহিত থাকে আলোর উৎস। অর্থাৎ অন্ধকার স্বয়ংসম্পূর্ণ ; আলোর প্রয়োজন অন্ধকার পটভূমি—না হলে আলো ফুটতে পারে না। আলোর চারপাশেই ঘন নিবিড় অন্ধকার, আর তাই আলো দৃশ্যমান। কিন্তু অন্ধকারকে দৃষ্টিগাহ্য করার জন্যে আলোর প্রয়োজন নেই। এই শাশ্বত সত্য উপলব্ধিতে আকর চৈতন্য নির্মাণ করেছে জীবনানন্দের। কিন্তু সমাজ চেতনা জাগতিকের অন্ধকারকে 'নেতি'র রূপকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থাপন আকারে। না দেখতে পাওয়াকেই নঞর্থবোধক চিহ্নে চিত্রিত করাটা শুভ-অশুভ বোধজাত। আর এই বোধের নির্মাতাও মানুষ। কিন্তু জীবনানন্দ নেতির ভেতর মহলের ওই অন্ধকার, রাত্রি, জ্যোৎস্নাময় রাত, ধূসর প্রকৃতি, পেঁচা, ইত্যাদি রাতময় রূপকের আড়ালে চলমান মানবজীবনের ক্ষুৎপিপাসার কথাই নির্মাণ করেছেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি অন্ধকারকে বিশেষণে, রাতকে বিশেষণে ভরিয়ে দিয়ে নতুন উপলব্ধির দোর খুলে দিয়েছেন। এই বিশেষণ বিষয়ে হুমায়ুন আজাদের উদ্ধৃতি নেয়া যাক।

'সোনালি', 'ধূসর', 'নীল', এ-তিনটি বর্ণের প্রতি কবির লোভও ছিলো দুর্বার, তাই বার বার এ-বিশেষণত্রয় ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য এরা অভাবিত প্রয়োগ নয়, অন্তরঙ্গ ব্যবহার ; কিন্তু তার বিশেষণের স্বাদ অভাবিত প্রয়োগের মধ্যেই অধিকতর লভ্য, তা আমাদের অনুভূতিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বহুমুখী করে তুলেছে। তিনি যখন লেখেন, 'গভীর হাওয়ার রাত' , 'বিস্তীর্ণ হাওয়া', 'ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখ', মৃত আকাশ, প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ', 'সুস্বাদু অন্ধকার', হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্না', 'বিশুদ্ধ হৃদয়', তখন অনুভূতিতে নতুন বাতাস লাগে। 'হাওয়া' শব্দের আগে 'গভীর' প্রয়োগে বাতাসের মধ্যে এসেছে সমুদ্রের স্বাদ, 'বিস্তীর্ণ' প্রয়োগেও সমুদ্রের চিত্রকল্প এসে যায়। 'মৃতদের মুখ'-এর আগে ধূসরপ্রিয় দুটি বিশেষণ হৃদয়লোকে আলোড়ন সৃষ্টি করে, আমরা পড়ার মুহূর্তেই এক অন্তরঙ্গ অতীতলোকে চলে যাই, সুখ এবং বেদনার মধ্যে কিছুক্ষণ বসবাস করি। মৃত আকাশ-এ আকাশ-এর পূর্বে এসেছে 'মৃত' বিশেষণ। আকাশ কি কখনো মরে? না। তাই এ-অংশ পাঠের সময়, আমরা, বিশাল আকাশের অনুভূতির সঙ্গে লাভ করতে চাই স্ব স্ব জীবনের এককালীন স্মৃতিময় হারিয়ে ফেলা সেই খণ্ডকে তাকে স্মরণে আনি, এবং সে-সময়েই বিচ্ছেদের হাহাকারটি তীব্র হয়ে ওঠে।'[২]

বেদনার এই হাহাকারই জীবনানন্দ-চৈতন্যের মূল সুর। যে কবিতায় একটি বারের জন্যেও অন্ধকার শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, অথচ পুরো কবিতায় হাহাকার যেন ব্যপ্ত হয়ে আছে। কেন আছে? কারণ তিনি যে চেতনা পরিবহন করেন তা পুরোপুরিই বেদনায় নীল, হতাশায় ত্যক্ত এবং বীতশোকে ঋদ্ধ।

> হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
> তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে।
> তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে !
> পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
> আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।
>
> হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
> তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে।

এ-কবিতার কোথাও অন্ধকার, ধূসর ইত্যাদি শব্দ নেই। বরং আছে উজ্জ্বলতর শব্দযোগ। সোনালি ডানার চিল, রাঙা রাজকন্যা ইত্যাদি উজ্জ্বলতর শব্দের ব্যবহার। কিন্তু তারপরও শুধুমাত্র 'হায় চিল' শব্দটি যে ব্যর্থ বেদনার দীর্ঘশ্বাসটিকে লম্বমান করে তুলেছে, যে বেদনার ধারা ম্লান চোখে প্রতিফলিত হয়েছে—তার সেই বেদনার স্বাদ চিরদিন লেপ্টে গেছে মানুষের জীবনের সঙ্গে। জলভারাতুর মেঘ-করা আকাশে ক্রন্দনরত চিলের চিৎকার, কান্নার যে দৃশ্য আমাদের হৃদয়ে এসে হানা দেয়, তাকে কেউ এড়াতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফুটপাথে'—কবিতায় দেখা যাক কলকাতা শহরের বেদনাবাসিত পটভূমি—

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরার মতো এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ অনুভব করে—
হাঁটছি আমি।

বিষাক্ত, বিস্বাদ কেন কলকাতার ট্রামের লাইন? সভ্যতার ওই চাকা যদি মানুষের কল্যাণ আর কর্মময় জীবনকে দু'দণ্ড শান্তি নাই দিতে পারে, তাহলে, সে নগরের, সে সভ্যতার কোনো মূল্য আছে কী? অন্তত জীবনানন্দের কাছে, তাঁর চেতনাভিসারের অথৈই নীল, তাঁকে তিক্ত করে তুলেছিল। জীবনের স্বভাবগতি জটিল ও কুটিল হয়ে পড়ায় চেতনার আয়োজনও 'নীল চাঁদ'-এ পরিণতি লাভ করে। নীতির কারুকলা থেকে আলোর ইশারা তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু যাপিত জীবনের ভেতর দিয়ে যে অভিজ্ঞতা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যে অভিজ্ঞান লাভ করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ, আমার ধারণা, তা ছিল বেদনায় ভরপুর, ধূসরতায় আচ্ছন্ন, আর সুকোমল অন্ধকারে জড়ানো মাতৃগর্ভের মতো মনোময়। এ কারণেই আঁধার, অন্ধকার, ধূসর ইত্যাদি নানা বিচিত্র ও অভাবিত বিশেষণের রূপ নিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

তথ্যনির্দেশ

১. অশ্রুকুমার সিকদার, 'কবির কথা কবিতার কথা' জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার', অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৯-৩১
২. হুমায়ুন আজাদ ; 'আধার ও আধেয়', 'শব্দের প্রকৌশল : বনলতা সেন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুরারোপ

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

বাংলা গানের জগতে কবিদের অবদান অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে শুরুতেই স্মরণ করতে পারি যাঁদের নাম, তাঁদের অন্যতম হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১–১৯৪১) ও কবি নজরুল (১৮৯৯–১৯৭৬)। বাংলা গানের দুই দিগন্ত প্রসারিত করেছেন প্রধানত এই কবিদ্বয়। বিষয়বৈচিত্র্য ও সুরবৈচিত্র্যে ঋদ্ধ করেছেন বাংলা সঙ্গীত। বাংলা গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব কথা ও সুরের যুগল মিলনে সৃষ্ট কাব্যধর্মিতা দুই কবির সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তা সার্থকতা লাভ করেছে। সেই সঙ্গে অবশ্য স্মরণীয় আরও তিনজন সঙ্গীতকার-গীতিকারের নাম, তাঁরা হলেন : ডি এল রায় (১৮৬৩–১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫–১৯১০), ও অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১–১৯৩৪)। বাংলা গানের জগৎ মূলত এই পঞ্চ প্রধান গীতিকবিদের সৃষ্টি ও সাধনার মধ্য দিয়ে বিকশিত ও বিভাসিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সর্বতোভাবে কবি, সেই সঙ্গে সার্থক সঙ্গীতকারও। দুজনেই গীতিকার ও সুরকার এবং নিজ নিজ সৃজনীশক্তিতে কবিতায়ও সুরারোপ করেছেন। বাংলা গানের জগতে তা অনন্য সংযোজন বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গীতিকার ও সুরকার তাঁর গানের। নজরুলও এক্ষেত্রে একই পথের পথিক হলেও কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। প্রকৃতপক্ষে, নজরুলে এসে আধুনিক বাংলা গান নতুন পথে বাঁক নিয়েছে দেখতে পাই। নজরুলের গানেই লক্ষ করা যায় গীতিকার একজন, সুরকার অন্যজন এবং গায়ক–গায়িকা অন্য আরেকজন। আধুনিক বাংলা গান কবিতায় সুরারোপ এখন পর্যন্ত এই ধারাতেই বিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে। রবীন্দ্র–নজরুলের বেশকিছু কবিতা গানে রূপান্তরিত হয়েছে। কয়েকটি কবিতার কথা উল্লেখ করতে পারি, যেমন — কৃষ্ণকলি, তুমি কি কেবলি ছবি, নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে, মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, কারার ঐ লৌহ কপাট, দুর্গম গিরি কান্তার মরু, শিকল পরা ছল, কামাল পাশা প্রভৃতি। কবিতায় সুরারোপ করে এখন সমধিক প্রচলিত হয়ে গেছে গান রূপে এমন অনেক দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্র–নজরুলের গানের ঝরণা তলায়। বাংলা কবিতা লিরিকধর্মী। কবিতায় গীতিধর্মিতার প্রাধান্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, কবিতা ও গান যেন সহোদর। কবিতায় ছন্দের যে কাজ গানের ক্ষেত্রেও তাই। সম্ভবত সে কারণেই বাংলা ভাষার কবিতায় সুরযোজনা করলে কথা ও সুরের সমন্বয়ে সুন্দর গীতি আবেদন জাগে এবং সার্থকভাবে তা গান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র–নজরুলের কবিতায় সার্থক গানের রূপান্তর থেকেই প্রেরণা লাভ করে, পরবর্তীকালেও আধুনিক কবিতায় সুরারোপ করেছেন সংগীতকাররা। যেমনটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬–১৯৪৭) কবিতায় সুরারোপ করেছেন সুরকার সলিল চৌধুরী। সুকান্তের 'রানার', 'কোন এক গাঁয়ের বঁধূ' কিংবা 'অবাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবী' কবিতার চেয়েও গানের আবেদনেই বাঙালি চিত্ত বিমোহিত এবং সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে গানের আবেদনেই। এ কথা নিশ্চয় অতিরঞ্জন নয়। চল্লিশ–পঞ্চাশ–ষাটের দশক থেকে অনেক কবির কবিতায় সুরারোপ করা হয়েছে। যেমন–শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের (১৯১১–১৯৭৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত কবিতার গানে রূপান্তর। গণ–সঙ্গীতশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস (জ. ১৯১২–?) কবিতায় সুরারোপ করেছেন। আবদুল গাফফার চৌধুরীর বিখ্যাত কবিতা 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো'তে সুর দিয়েছেন সুরকার আলতাফ মাহমুদ। তেমনিভাবে স্মরণ করতে পারি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য' কবিতায় সুরযোজনার কথা। এই গানগুলি একটা সময় বিশেষত বাংলাদেশে ৬৯–এর গণ অভ্যুত্থান ও গণজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই পটভূমিকায় রবীন্দ্র নজরুলের কবিতা ও গান যেমন স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির মুখে মুখে ফিরতো–শক্তি–যোগাতো—যেন বা হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল—তেমনি সুকান্ত ও কবি জীবনানন্দ দাশের পঙক্তিমালা সবিশেষ প্রেরণা যোগাতো। ১৯৬৮ সালে প্রথম শোনা গেল কবি জীবনানন্দের (১৮৯৯–১৯৫৪) 'রূপসী বাংলা'র কবিতা। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' সুরে রচিত হলো। এটি গানে রূপান্তরিত করেন শিল্পী অজিত রায়। তাঁর ভরাট কণ্ঠে 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' গানটি গেয়ে প্রেসক্লাব থেকে মিছিল করে সংগ্রামী ছাত্র–জনতা শহীদ মিনারে মিলিত হতেন ৬৮–৬৯ এর উত্তাল দিনগুলিতে। পরে, জীবনানন্দের কবিতাটিতে সুর দিয়ে শিল্পী অজিত রায় হিজ মাষ্টার ভয়েস থেকে রেকর্ড করেন ১৯৭১ সালে। 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটিতেও সুর দিয়েছেন শিল্পী অজিত রায় ১৯৭২ সালে। এই গানটি এখনো ষ্টুডিও রেকর্ডে ধারণ করা আছে। ষাট–সত্তরের দশকে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবেই জীবনানন্দের কবিতার চর্চা হতে থাকে। 'রূপসী বাংলা' ও 'বনলতা সেন' বিশেষত তরুণ প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই জাগরণকালে জীবনানন্দ বাংলাদেশের আপামর জনমানসের কাছে দেশপ্রেম, বাংলার নিসর্গচিত্র, সমাজ–জীবনকে আবেগাপ্লুত করে তোলেন, দেশের প্রকৃতিকে যেন নতুন করে চিনিয়ে দেয় তাঁর পঙক্তিমালা। ১৯৭০ এ গীতিকার গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার সেই সময়কার মর্মকথাটি জানিয়ে দেন :

বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা,
রূপের যে তার নেইকো শেষ,—বাংলাদেশ।

আমাদের স্মরণকালে এবং এই সাম্প্রতিককালেও আধুনিক কবিদের কবিতায় সুরারোপ করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। যেমন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, কবি শামসুর রাহমান এবং এখনকার কবি জয় গোস্বামীর কবিতা। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় সুরারোপের কথা বলেছি এবং কয়েকটি কবিতা সার্থকরূপ নিয়েছে গানে সুরকার সলিল চৌধুরীর সুরের ছোঁয়ায়। সুকান্ত অগ্রজ (বয়সের দিক দিয়ে প্রায় ২৭ বছর বড়ো) জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুরারোপ করেননি। প্রগতিশীল গণ নাট্যসংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সঙ্গীতকার সলিল চৌধুরী। কিশোর কবি সুকান্তও কম্যুনিজমের সরব সমর্থক ছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রায় অভিন্ন বলেই কি সুকান্তের কবিতায় সুরকার সলিল চৌধুরী আগ্রাহান্বিত হয়েছিলেন সুরযোজনায়? সুকান্তের কবিতার কাঠামো, বলিষ্ঠতা, দৃপ্ততা এবং স্লোগানধর্মিতা কি সলিল চৌধুরীকে অনুপ্রাণিত করেছিল? সলিল চৌধুরী কেবল সঙ্গীতকার নন, নিজেও একজন কবি। এমনটি ভাবা হয়তো সংগত নয় যে, কবি জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবতা ও যুক্তির দিক দিয়ে ধরে নেই যে, হয়তো কর্মব্যস্ততা কিংবা সময়াভাবের কারণে সলিল চৌধুরী জীবনানন্দের কবিতায় সুরারোপ করার চিন্তা-ভাবনা করেননি। তবু, আক্ষেপ থেকে যায়। কথাগুলি বলছি বা তুলছি এ জন্যে যে, বাংলা গানের জগতে বর্তমানে সার্থক সঙ্গীতকার-সুরকারের বড়ো অভাব, যেন বা আকাল পড়েছে. সুরকার সলিল চৌধুরীর সুরমূর্ছনায় জীবনানন্দ দাশের গীতিকবিতা আমাদের মোহিত করতো নিশ্চয়। যেমনটি সুকান্তের পঙক্তিমালায় সার্থক রূপদান করেছেন সলিল চৌধুরী।

'রূপসী বাংলা'র দুটি কবিতায় সুরারোপ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আরেকটি কবিতার কথা মনে পড়ে। 'বনলতা সেন' কাব্যের 'হায় চিল' কবিতাটিতেও সুর দেয়া হয়েছে। 'হায় চিল' গানটি গেয়েছেন শিল্পী অনুপ ঘোষাল (সম্ভবত সুরকার শিল্পী নিজেই)। তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে কবিতাটি গীতি আবেদন জাগিয়ে তোলে, ভালো লাগে কথা ও সুরের যুগল মিলনের স্পর্শে। কবি জীবনানন্দ দাশ জন্মশত বার্ষিকী স্মরণে—'বনলতা সেন' একক অডিও ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে মৃনাল সরকারের সম্পাদনা নির্দেশনায়। এবং 'বনলতা সেন' ক্যাসেটের শিল্পী ও সুরকার বাণী বসু। কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার গানে রূপান্তরিত উদ্যোগ এবং একসঙ্গে নয়টি কবিতায় সুরারোপ করে শিল্পী বানী বসু নিজে গেয়েছেন। এই কৃতিত্ব, গৌরব এবং সম্মান এককভাবে শিল্পী বাণী বসুরই প্রাপ্য। তিনি যে কাজটি প্রথম শুরু করলেন, আগামীতে তা থেকে অনেকে হয়তো অনুপ্রাণিত হবেন। শিল্পী বাণী বসু কবি জীবনানন্দের যে কয়টি কবিতায় সুরারোপ করেছেন, সেগুলি হলো : বনলতা সেন, আমি কবি সেই কবি, দক্ষিণা, ফুটপাথে, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, হায় চিল, বুনো হাঁস, ঘোড়া, আবার আসিব ফিরে। শিল্পীর সুরে নতুনত্ব আছে, যন্ত্রানুষঙ্গও ব্যবহার করেছেন পরিমিতভাবে। 'আমি কবি, সেই কবি' কবিতাটির সুর ভালো লেগেছে এবং শিল্পী গেয়েছেন সুন্দরভাবে। এই ক্যাসেটে তিনটি কবিতায় সুরযোজনা আগেই করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে সে কথা নিবেদনও করেছি। যেমন শিল্পী অজিত রায় 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' ও 'আবার আসিব ফিরে' গান দু'টিতে সুর দিয়ে শিল্পী নিজেই আগে রেকর্ড করেছেন। শিল্পী অনুপ ঘোষাল গেয়েছেন 'হায় চিল' গানটি। শিল্পী অজিত রায় সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীকার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রেরণায়, হৃদয়মথিত সুরে স্বকণ্ঠে গেয়েছেন 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' এই সুরটি যে মর্মস্পর্শী আবেদন জাগায় তা কিন্তু অনুপস্থিত শিল্পী বানী বসুর রচিত সুরে এবং স্বকণ্ঠে গীত 'বাংলার মুখ' কবিতায়। তেমনি, 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

বাঙালি চিরকালই কথা ও সুরের সম্মিলনে সৃষ্ট কাব্যধর্মিতার আবেদনকেই তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেছে,.স্থান দিয়েছে। কথার আবেদন ক্ষুণ্ণ হলে কিংবা সুরের সরব তানকর্তাব বা জটিলতা থাকলে তা গ্রহণ করতে সম্মত নয়। এখন যেমন 'জীবনধর্মী গান' নামে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে, দু'একটি গান জনপ্রিয়তা অর্জন করেও বটে, কিন্তু বাঙালির হৃদয়পটে তা ক্ষণস্থায়ী হয় মাত্র। অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার লাভ করে না। বাংলার অন্যতম রূপকার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুরারোপ করতে হলে যে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে মনে রাখা অতীব জরুরী যে জীবনানন্দ মূলত একজন গীতিকবি (Lyric poet)। তাঁর কবিতার ভাব যেন বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সুরযোজনা করা। যেনতেন প্রকারের সুর দেওয়া সম্ভব, যান্ত্রিক উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে সহায়তা-সহযোগিতার জন্যে। কিন্তু তা যেন কৃত্রিম না হয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র–নজরুলোত্তর শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশের 'প্রকাশিত–অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র' প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ থেকে অবসর প্রকাশনা সংস্থা। জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবর্ষ স্মরণে রেখে গ্রন্থটির সংকলন ও সম্পাদনকার্য সম্পন্ন করেছেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ। তারুণ্যে ও যৌবনে বিক্ষিপ্তভাবে কবি জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা', 'বনলতা সেন' কাব্য গ্রন্থ পাঠ করেছি। ১৯৬৯–এ জীবনানন্দকে যেন আবার ফিরে পেলাম। তাঁর একটি কবিতা 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' গানের সুরে গেয়ে উদ্দীপ্ত হতাম। যেন বা ফিরে দেখতাম জন্মভূমির রূপকেই। বেশকিছুদিন ধরে, জীবনানন্দের 'প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র' গ্রন্থটি পেয়ে সমগ্র কবিতাগুলি পাঠ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে সুর দিতে চেষ্টা করতাম, এটি অক্ষম প্রয়াস মাত্র কিন্তু ভালোলাগতো জনসাধারণ্যে সুর দিয়ে প্রকাশ করার জন্যে নয়, নিজের একান্ত ভালোলাগার জন্যে। বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য–বিশেষত্ব মনে রেখে, জীবনানন্দের প্রকাশিত–অপ্রকাশিত কবিতায় যেগুলিতে সুরযোজনা সম্ভব এবং তা ভালো লাগবে বলে মনে হয়েছে, সসংকোচে তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

ঝরা পালক : নব নবীনের লাগি, বেদিয়া, নাবিক, বনের চাতক—মনের চাতক, চলছি উধাও, একদিন খুঁজেছিনু যারে, আলেয়া, অস্তচাঁদে, ছায়া–প্রিয়, হিন্দু–মুসলমান, পিরামিড, যে কামনা নিয়ে, ওগো দরদিয়া, সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়। ধূসর পাণ্ডুলিপি— নির্জন স্বাক্ষর, মাঠের গল্প, পেঁচা, পঁচিশ বছর পরে, কার্তিক মাসের চাঁদ, সহজ, অনেক আকাশ, অবসরের গান, জীবন পিপাসার গান।

রূপসী বাংলা : তোমরা যেখানে সাধ, বাংলার মুখ আমি, যেদিন ঝরিয়া যাব, আবার আসিব ফিরে, মনে হয় একদিন, এই পৃথিবীতে এক, কত ভোরে দু'পহরে, এখানে ঘুঘুর ডাকে, শ্মশানের দেশে তুমি, কতদিন সন্ধ্যায়, এ–সব কবিতা আমি, এই জল ভালো লাগে, বাতাসে ধানের গন্ধ, সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে, একদিন কুয়াশার, ভেবে ভেবে ব্যথা পাব।

বনলতা সেন : হাজার বছর ধরে, হায় চিল, দুজন, আমাকে তুমি, সুরঞ্জনা, হাজার বছর শুধু খেলা করে, শিরীষের ডালপালা।

মহাপৃথিবী : ফিরে এসো, স্বপ্ন, সূর্য সাগর তীরে।

সাতটি তারার তিমির : আকাশ লীনা, সপ্তক, অনুসূর্যের গান, সূর্য তামসী, মকর সংক্রান্তির রাতে, দীপ্তি, হাঁস।

বেলা অবেলা কালবেলা : আমাকে একটি কথা দাও, সামান্য মানুষ, প্রিয়দের প্রাণে, সূর্যরাত্রি নক্ষত্র, নারী সবিতা, বিস্ময়, একটি কবিতা, যদিও দিন, আজকে রাতে, পৃথিবীর রৌদ্রে, মহাগোধূলি, হে হৃদয়।

শ্রেষ্ঠ কবিতা : তোমাকে, একটি নক্ষত্র আসে, পৃথিবীলোক, মনোকণিকা, পৃথিবীতে এই।

অগ্রন্থিত কবিতা : পাখি, তাই শান্তি, এই শান্তি, পৃথিবীতে থেকে, হে হৃদয়, দোয়েল, এই পথ দিয়ে, তোমায় আমি, এসো, তোমার আমার, জল, কে এসে যেন, আজ, তুমি আজ, ফসলের দিনে, এখন ওরা, তোমাকে, নিবেদন, কার্তিক–অঘ্রাণ ১৯৪৬, যাত্রী, তোমায় আমি, কারা কবে, জোনাকি, তুমি আলো, নির্জন হাঁসের ছবি, মনকে আমি নিজে, দুর্দিন, ডালপালা নড়ে বারবার, ছড়া, কবি, অনন্ত জীবন যদি, আকাশে চাঁদের আলো, কেমন বৃষ্টি ঝরে, বাইরে হিমের হাওয়া, অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয় করে, জীবন ভালোবেসে, এখানে, জীবনবেদ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমায় আমি, শতাব্দীর মানবকে, আঁধারের যাত্রী, ঝরা ফসলের গান, আদিম, তুমি এই রাতের বাতাস, নিজেকে নিয়মে ক্ষয়, মহা ইতিহাস, অন্য এক প্রেমিককে, বিপাশা, আজ বিকেলের ধূসর আলোয়, রাতের আঁধারে নীল, অন্ধকারের ঘুম সাগরের, আমরা যেন মেঘের, কাউকে ভালোবেসেছিলাম, ভোরের বেলায় তুমি আমি, একটি পুরোনো কবিতা, জানি না কোথায় তুমি, বর্ষ আবাহন, আমাকে যে, তোমায় আমি, অদ্ভুত আঁধার এক, দুদিকে ছড়িয়ে আছে।

স্বল্প সুরজ্ঞানে কবি জীবনানন্দের কাব্যসমগ্র (প্রকাশিত–অপ্রকাশিত) থেকে কবিতায় সুরারোপের জন্য একটি তালিকা নির্বাচন করেছি। তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে এমনটি দাবি করি না। কবিতার রূপকল্প, সহজগম্যতা, অন্তমিল, মধ্যমিল ও ছন্দের দিকে লক্ষ রেখে কবিতাগুলিকে সুরারোপের জন্য মনোনীত করেছি : যাতে করে কাব্যমাধুর্য ব্যাহত না হতে পারে। অর্থাৎ কবিতার আবেদন যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই এই নির্বাচন। কবির জন্মশতবর্ষে কবিকে নিয়ে যে পঠন–পাঠন এবং চর্চা হচ্ছে, সেই সঙ্গে সুরযোজনার শুভ উদ্যোগ নিয়েছেন শিল্পী অজিত রায় ও শিল্পী বাণীবসু। ক্রমে ক্রমে হয়তো আরও সঙ্গীতকার শিল্পীরা উৎসাহিত হবেন এবং কবির কবিতায় গীতিরস যুগিয়ে বাঙালি চিত্তকে বিমোহিত করবেন। সুরকার শিল্পী সলিল চৌধুরী যেমনটি কিশোর কবি সুকান্তের কবিতায় সুরারোপ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ও সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা গানের জগৎ, তেমনিভাবে রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দের কবিতায় সুরারোপ করবেন আগামী দিনের সঙ্গীতকার সুরকাররা এমন আশা জাগে।

রবীন্দ্র–নজরুল পরবর্তী বাংলার শ্রেষ্ঠকবি জীবনানন্দের কবিতায় গীতরসে সুরমূর্ছনায় আপ্লুত হবার জন্যে আমাদের এখনো আগামী দিনে যোগ্য ও সার্থক সঙ্গীতকার সুরকারের অপেক্ষাতেই থাকতে হবে !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কবিতার চিত্রকল্প

বিশ্বজিৎ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পর, বাংলা সাহিত্যে, জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) প্রকৃত অর্থেই শ্রেষ্ঠ কবি। বিষয়ভাবনা ও নির্মাণকলার দৃষ্টিকোণে তিনি বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপ্ত সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ বিচ্যুতি, মানবিক-সম্ভাবনায় অবিশ্বাস এবং 'পোড়োজমি'তে 'ফাঁপা মানুষের' বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিবেশে বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের দীপ্র আবির্ভাব। যুগধর্মের বৈনাশিকতায় তাঁর মানসপ্রান্তর হয়েছিল বৃত্তাবদ্ধ, জীবনসন্দিগ্ধ, শিকড় উন্মূলিত, বিশ্বাস-বিচ্যুত, কখনো-বা সত্তাবিচ্ছিন্ন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পৌনঃপুনিক-ভাবে চিত্রিত হয়েছে অনাশ্রয়ী পৃথিবীর ছবি, শিল্পিত হয়েছে তাঁর নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত বিপন্ন সত্তার বহুভুজ যন্ত্রণার কথা। 'নিখিল নাস্তি'ময় বিরূপ বিশ্বের অসহায় অধিবাসী জীবনানন্দ দাশ তাঁর সাহিত্যকর্মে অঙ্কন করেছেন দ্বন্দ্বপীড়িত মধ্যবিত্ত মানুষের বিচ্ছিন্নতার দুর্মর যন্ত্রণা, আত্মদহনের তীক্ষ্ণমুখ জ্বালা, নৈঃসঙ্গ্যের দুর্ভর বেদনা, এবং ইতিহাসচেতনা ও কালজ্ঞানের আলোয় কখনো-বা নিঃসঙ্গতামুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

বিষয়ের নতুনত্ব ও প্রগত চিন্তায় ইতিহাসলগ্নতা প্রধান আকর্ষণ হলেও, জীবনানন্দের কবিতায় নির্মাণকলাগত স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষযোগ্য। শব্দ-ব্যবহারে, উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প নির্মাণে এবং ছন্দ-সজ্জায় তাঁর প্রাতিস্বিকতা বাংলা কবিতার এক বিরল সম্পদ। প্রকরণগত অভিনবত্বের মধ্যে চিত্রকল্প নির্মাণে তাঁর স্বাতন্ত্র্যই সবিশেষ লক্ষণীয়। জীবনানন্দ মূলত চিত্রকল্পের কবি ; বোধ করি, এজন্যই রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে বলেছেন 'চিত্ররূপময়'। জীবনানন্দের কবিতার এই চিত্ররূপময়তা তথা চিত্রকল্প আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বিষয়। তবে, জীবনানন্দকাব্যে অনুপ্রবেশের পূর্বে কবিতায় চিত্রকল্প-ব্যবহারের তাৎপর্য ও চিত্রকল্পের স্বরূপধর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে আবশ্যক বিবেচনা করি।

২

কবি-চিত্তের সংবেদনার প্রতিবিম্ব, তাঁর ভাবচেতনার বাঙ্ময় চিত্রই হলো 'ইমেজ' বা চিত্রকল্প। বস্তুত, কবিচিত্তের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সংহত হবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই চিত্রকল্পের সৃষ্টি। আবেগ ও মেধার যৌথ-মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় চিত্রকল্প, যা বহির্জাগতিক বস্তুরূপে নবতর মাত্রা সংযোজনের মাধ্যমে দ্যোতনা করে ব্যঞ্জনা বা সাজেস্টিভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনিং। বহির্জাগতিক অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক ভাবসূত্র স্রষ্টা-হৃদয়ে সমাহিত স্মৃতি, কল্পনা, বাসনা, বুদ্ধি, আবেগ ও ইচ্ছার তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে অন্তিমে জন্ম নেয় যে শব্দচিত্র, তাকেই আমরা বলি চিত্রকল্প। চিত্রকল্পের মাধ্যমে ব্যঞ্জনা-সৃষ্টিতে কবি-হৃদয়ের আবেগ এবং সংরাগ পালন করে মুখ্য ভূমিকা। এ-প্রসঙ্গে Cecil Day Lewis-এর মন্তব্য উদ্ধরণযোগ্য—"A poetic Image is a word-picture charged with emotion and passion." চিত্রকল্পের সাহায্যে কবির ব্যক্তিক অনুভূতি ও হৃদয়াবেগ উপলব্ধি করা যায়। কবির বিমূর্ত অনুভূতি বা মানসিক ভাবরাজি চিত্রকল্পে হয়ে ওঠে মূর্ত। চিত্রকল্পকে বলা হয় কবিতার সেই মায়াবী মুকুর, যেখানে একই সঙ্গে বিম্বিত হয় স্রষ্টার চৈতন্য, সৃষ্টির লাবণ্য।

চিত্রকল্পের শরীরে ফুটে ওঠে একটি আবেগী চিত্র এবং দৃশ্যময়তা। তবে বহির্জাগতিক দৃশ্যের সরাসরি অনুকরণকে কোনো সূত্রেই চিত্রকল্পের মর্যাদা দেওয়া হয় না। উপমান চিত্রের আবেগী গুণ, কল্পনাপ্রসারী চারিত্র্য এবং উদ্ভাসন-ক্রিয়াজাত তৃতীয় মাত্রার ব্যঞ্জনা চিত্রকল্পের অনিবার্য শর্ত। সার্থক চিত্রকল্প রঙে-রেখায় শব্দে-বর্ণে একাত্ম হয়ে নির্মাণ করে কবিতার মূল সত্তা ও চারিত্র্যসৌন্দর্য—তার ঐশ্বর্য।

কবিতার প্রতিটি চিত্রকল্প বহন করে একটি বিশিষ্ট ভাব। চিত্রকল্প বা ইমেজ কবিকল্পনা-মনীষার সৌষম্যকলারই (Harmonious faculty of Imagination) স্বাক্ষরবাহী। প্রতিটি চিত্রকল্পেই থাকে দু'টো সত্তা—একটি বাইরের রূপ, অন্যটি চিত্তের কল্পনা। এই দুই সত্তার মধ্যে সংযমের বাঁধন এবং বাইরের রূপের সঙ্গে অন্তরস্থ ভাবের সাদৃশ্যে ব্যঞ্জনার রঙ মিশিয়ে কবি সৃষ্টি করেন সার্থক চিত্রকল্প। একটি সার্থক চিত্রকল্পের চারিত্র্যলক্ষণ নিম্নোক্ত চতুর্মাত্রিক সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব—

ক. শব্দচিত্র বা অবয়বত্ব সূত্র (principle of word-picture) ;
খ. রূপক তত্ত্ব (principle of figurativeness or principle of metaphor) ;
গ. ইন্দ্রিয়বেদ্যতা তত্ত্ব (principle of sence-stimuli) ; এবং
ঘ. সাদৃশ্যধর্মিতা তত্ত্ব (principle of comparison)।

কবিতার সকল 'বাক্‌চিত্র'-ই চিত্রকল্প নয়, কবি ত্রিবিধ গুণধর্ম—অপূর্বতা, প্রগাঢ়তা এবং আবেগ-কল্পনা সঞ্চার করে 'বাক্‌চিত্র'-কে রূপান্তরিত করেন চিত্রকল্পে। শব্দনির্মিত চিত্র ইমেজের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হলেও, চিত্রকল্প কেবল চিত্র-নির্মাণে সীমাবদ্ধ থাকে না। চিত্রশিল্প যেমন শুধু চোখকে তৃপ্ত করে না, উদ্বুদ্ধ করে কল্পনাকেও, জন্ম দেয় তৃতীয় মাত্রার—চিত্রকল্পও তেমনি তৃতীয় মাত্রার জনয়িতা। উপমান চিত্রের অপূর্বত্ব এবং কল্পনাপ্রসারী গুণ চিত্রকল্পের অনিবার্য শর্ত। উপমেয়-উপমানের ব্যঞ্জনাসম্ভব পটে চিত্রকল্প সৃষ্টি করে তৃতীয় মাত্রার আবেগ। প্রতিটি চিত্রকল্পের শরীরে ও সত্তায় থাকে নিম্নোক্ত চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য—

ক. প্রাণময়তা (freshness) ;
খ. আত্যন্তিকতার বেগ (intensity) ;
গ. উদ্দীপনশৈলী বা উদ্ভাসনক্রিয়া (evocativeness or illumination)।

কবি একটি উপমা, রূপক, সমাসোক্তি কি উৎপ্রেক্ষার আশ্রয়ে এমনভাবে কোনো চিত্র নির্মাণ করেন যে, তা পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে নতুন অভিজ্ঞতার আবরণ—এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে সজীবতা, প্রাণময়তা বা freshness. উপমান চিত্রের শরীরে যখন আরোপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হয় নবত্ব, চমৎকারিত্ব ও মাধুর্যগুণ, তখন চিত্রকল্পের মাঝে এসে যায় intensity বা আত্যন্তিকতার বেগ। উপমেয়-উপমানের বিপ্রতীপ চারিত্র্যের মধ্যে কল্পনার আলোকসম্পাত করে অভিনব সাদৃশ্য সৃষ্টির মাধ্যমে কবি যখন কোনো বস্তু বা বিষয়ের রূপান্তর সাধন করেন, তখন ভাব-ভাবনার উদ্দীপন বা উদ্ভাসনক্রিয়ায় পাঠকহৃদয়ে সৃষ্টি হয় মননদ্যোতক ব্যঞ্জনা।

ভাব বা বস্তুর মাত্রাগত রূপান্তরের আলোকে চিত্রকল্পকে বিন্যস্ত করা হয় তিনটি ভাগে—ক. সাধারণ চিত্রকল্প, খ. রূপকাত্মক চিত্রকল্প, গ. সাঙ্কেতিক বা প্রতীকধর্মী চিত্রকল্প। সাধারণ চিত্রকল্পে বস্তু বা ভাবের সত্তাগত গুরুত্ব ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এ-জাতীয় চিত্রকল্পে কবির হৃদয়াবেগের স্পর্শে সাধারণ দৃশ্যচিত্র রূপান্তরিত হয় চিত্রকল্পে। সাধারণ চিত্রকল্পের চিত্রমালায় থাকে হৃদয়াবেগ-সঞ্চারী গুণ। রূপকাত্মক চিত্রকল্পে চিত্রের মধ্যে থাকে ইন্দ্রিয়-সংবেদী কল্পনা, অনুভূতির দোলা। রূপকে যেমন বর্ণনীয় বিষয়ের ওপর অভিভাবার্থ (suggestive meaning) প্রাধান্য পায়, এখানেও তেমনি কবির ভাব ও ভাবনা একত্রিত হয়ে বস্তুর রূপ-অতিক্রান্ত রূপান্তরের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। সাঙ্কেতিক বা প্রতীকধর্মী চিত্রকল্পে বহু ধারণা, অনেক অভিজ্ঞান, প্রগাঢ় ইন্দ্রিয়-সংবেদনা ও আন্তরিক অনুভূতি কবির সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার স্পর্শে রূপলাভ করে শিল্পিত শব্দপ্রতিমায়। সাঙ্কেতিক চিত্রকল্পের শব্দচিত্র, বস্তুত, জীবনের কোনো গূঢ় ভাবের প্রতিকল্প, গভীরতর সত্যের শিল্পব্যঞ্জনা। চিত্রকল্পের এই স্তরে ভাষার আবেগ-সঞ্চারী গুণের সঙ্গে সংযুক্ত হয় মননদ্যোতক গুণ। অমলেন্দু বসুর ভাষায়—"সামান্য বাক্‌প্রতিমার সঙ্গে প্রতীকের মস্ত প্রভেদ এখানে। বাক্‌প্রতিমায় দ্বিস্তর আবেগসম্পূর্ণ প্রকাশভঙ্গী ; প্রতীকে ত্রিস্তর প্রকাশভঙ্গী, আবেগ ও মননের সাযুজ্যে সে সমৃদ্ধ, যে-আবেগ ও যে-মনন ঋজু ভাষার নিগড়ে ধরা দেয় না।" সাধারণ এবং রূপকধর্মী চিত্রকল্পে শব্দসৃজিত চিত্রগুলো ইন্দ্রিয়লোকের সীমানায় আবদ্ধ, কিন্তু প্রতীকধর্মী বা সাঙ্কেতিক চিত্রকল্পে তা ইন্দ্রিয়াতীতের ব্যঞ্জনা-সঞ্চারী।

চিত্রকল্পের রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে আরও একশ্রেণীর চিত্রকল্প আমরা লক্ষ করি। এগুলো মালা-চিত্রকল্প বা চিত্র-শৃঙ্খল (chain-imagery)। এ ধরনের চিত্রকল্পে একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়-সংবেদনা মুহূর্তের ব্যবধানে ভিন্নধর্মী এক সংবেদনায় রূপান্তরিত হয়, কখনো-বা একই সঙ্গে দুই বা ততধিক চিত্রকল্পের মাধ্যমে একাধিক ইন্দ্রিয়-সংবেদনার সমন্বয় ঘটে। এই ধরনের চিত্রকল্প রচনায় কবিরা সাধারণত ব্যবহার করেন মালা-উপমা বা মালা-রূপক। এ ক্ষেত্রে উপমা বা রূপক অলঙ্কার আপন সত্তার সীমানা অতিক্রম করে অনুভূতির শোভা নিয়ে রূপান্তরিত হয় চিত্রকল্পে। যেমন, জীবনানন্দের কবিতায়—

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।

(শ্যামলী : বনলতা সেন)

—এখানে উপমেয় হচ্ছে কবির প্রেয়সী শ্যামলীর মুখ। শ্যামলীর মুখের দিকে তাকালে কবির চিত্তলোকে যেসব ভাবনার উদয় হয়, উপর্যুক্ত কবিতাংশে তা-ই চিত্রকল্পের শৃঙ্খল নির্মাণ করে জন্ম দিয়েছে ব্যঞ্জনার আবেগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিটি চিত্রকল্প, বস্তুত, কবিতার মৌল-অন্বিষ্টের সংকেতবাহী। কাব্যচেতনার সঙ্গে চিত্রকল্পের যোগ আত্মিক। চেতনার অনুষঙ্গে চিত্রকল্প জন্মলাভ করে, আবার চিত্রকল্পের শরীরে চৈতন্য ধরা দেয় চিত্রলতায়। চিত্রকল্পের মাধ্যমে আমরা কবি-আত্মার পরিচয় লাভ করি, উপলব্ধি করি তাঁর কল্পনা-প্রবণতার চারিত্র্য। কবিতার প্রতিটি ইমেজ বা চিত্রকল্প কবির স্মৃতি-অভিজ্ঞতা-অনুভব-জীবনার্থেরই রূপান্তরিত শিল্পপ্রতিমা। অমলেন্দু বসুর মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"প্রতিটি ইমেজ যেন ইম্যাজিনেশনে পৌঁছবার রাস্তা। ... প্রাণোজ্জ্বল নিজস্ব বাক্‌প্রতিমায় (আধুনিক মনোবিদ্যা অনুসারে) কবির গূঢ়তম সত্তা মুকুরিত হয়।"

চিত্রকল্প বিষয়ে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার পর এবার আমরা বিবেচনা করবো জীবনানন্দের কবিতার চিত্রকল্পের মৌল চারিত্র্য, তার স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য।

৩

সূচনা-সূত্রেই বলা হয়েছে, জীবনানন্দ দাশ চিত্রকল্পের কবি, চিত্রকল্পের শরীরেই তিনি সঞ্চারিত করেছেন তাঁর কবি-আত্মার গোপন বাসনারাজি। জীবনানন্দের কবি-মানসের ক্রমবিকাশরেখা, তাঁর মৌল চেতনা চিত্রকল্পের শরীরে ও সত্তায় সুমুদ্রিত। চিত্রকল্প নির্মাণের জন্য জীবনানন্দ প্রথমেই নির্বাচন করে নেন কতিপয় মোটিফ। অতঃপর ঐ মোটিফের দেহে-মনে পড়ে শিল্পের আল্‌পনা—তৈরি হয় অসামান্য এক-একটি চিত্রকল্প। জীবনানন্দের চিত্রকল্পের প্রধান ছয়টি মোটিফ-উৎস হচ্ছে অন্ধকার, আলোক, ইতিহাস, সময়, প্রেম ও নিসর্গ-চেতনা। চিত্রকল্পের এইসব মোটিফ-উৎসের মধ্যে জীবনানন্দের কবি-মানসের মৌল প্রবণতাও অনুধাবন করা যায়।

৩.১

জীবনানন্দের কবিতায় তমসা আর অন্ধকারের বিচিত্র ভুবন শিল্পিত হয়েছে ; তাঁর কবিতায় অন্ধকারই হয়ে উঠেছে আপন সত্তা-প্রকাশের আশ্রয়। অন্ধকারই হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের শিল্প-জননী, তাঁর প্রেরণাদাত্রী শক্তি। অন্ধকার, কবি জীবনানন্দের কাছে, জীবন আর সৃষ্টির প্রতীক। তাই জীবনের কথা বলতে গিয়ে, মানবিক অভ্যুদয়ের কথা বলতে গিয়ে জীবনানন্দ পৌনঃপুনিকভাবে অন্ধকারের আশ্রয় নিয়েছেন, নির্মাণ করেছেন অন্ধকার-চেতনার চিত্রকল্প। জীবনানন্দ বিশ্বাস করেন, অন্ধকারই হচ্ছে সৃষ্টির আদি উৎস ; 'চণ্ডী'-তে যেমন আদ্যাশক্তি মহামায়ার বন্দনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—'আঁধারভূতা জগৎস্তমেকা মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি', তেমনি জীবনানন্দের কবিতায় সমস্ত সৃষ্টি ও শক্তির আদি-উৎস হিসেবে অন্ধকারকে বন্দনা করা হয়েছে। জীবনানন্দের কাছে অন্ধকার আলোর অধিক ; তাঁর এই অন্ধকার-চেতনার বহুমাত্রিক রূপ নিচের উদ্ধৃতিপুঞ্জে অভিব্যক্ত—

ক. সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে
দেখিবে জীবন তাঁর খুলে গেছে পাখির ডিমের মত ফুটে !

(অনেক আকাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

খ. ... বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধানক্ষেতে, আম বনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল।

(এখানে আকাশ নীল : রূপসী বাংলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. কখন সোনার রোদ নিভে গেছে—অবিরল সুপুরির সারি
আঁধারে যেতেছে ডুবে—প্রান্তরের পার থেকে গরম বাতাস
ক্ষুধিত চিলের মতো চৈত্রের এ-অন্ধকারে ফেলিতেছে শ্বাস ;
(কখন সোনার রোদ : রূপসী বাংলা)

—উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিত্রয়ে অন্ধকারের ত্রিমাত্রিক বাক্প্রতিমা নির্মিত হয়েছে। প্রথম উদ্ধৃতিতে অন্ধকার কবির কাছে পালয়িত্রী জননীরূপে চিত্রিত। পাখির ডিম ফোটার সঙ্গে জীবন-উন্মেষের সাদৃশ্য নির্মিত হয়েছে আলোচ্য চিত্রকল্পে। পাখির ডিমের মধ্যে যেমন অব্যক্ত অবস্থায় থাকে জীবন, তেমনি অব্যক্ত অবস্থা থেকে এক সময় জেগে ওঠে মানব-জীবন। অন্ধকারের মধ্যে নিহিত থাকে জীবনের আলোক-উৎস—অন্ধকারই হচ্ছে জীবনের আবির্ভাব-অঙ্কুর। এই ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে পাখির ডিম ফোটার উপমান-উৎস ব্যবহার করে জীবনানন্দ এখানে অপূর্বত্ব আর উদ্ভাসন ক্রিয়াজাত ব্যঞ্জনা নির্মাণ করেছেন, সৃষ্টি হয়েছে অসামান্য এক চিত্রকল্প। দ্বিতীয় চিত্রকল্পে বেহুলার সামূহিক বিপন্নতা কুয়াশার অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করে সৃষ্টি করা হয়েছে এক ব্যঞ্জনাময় কল্পছবি। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে সৃষ্টি হয়েছে চমৎকার এক চিত্রকল্প। সূর্য ডুবে গেলে সুপুরির সারি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। এ-সময় প্রান্তরের পার থেকে যে উষ্ণ বাতাস প্রবাহিত হয়, কবি তাকে চৈত্রের দাবদাহে ক্লান্ত, ক্ষুধিত চিলের নিঃশ্বাসের উষ্ণতার সঙ্গে সমীকৃত করেছেন। এ-চিত্রকল্পের মধ্যে জীবনানন্দের কবি-প্রতিভার প্রাতিস্বিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

অন্ধকার কেবল সৃষ্টি-উৎসই নয়, জীবনানন্দের কবিতায় তা কখনো মৃত্যুচেতনা, কখনো প্রেমচেতনা, কখনো-বা মানবিক সভ্যতার ধ্বংসাত্মক আঁধার-শক্তির ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। নিচের চিত্রকল্পসমূহে উপর্যুক্ত প্রবণতার শব্দছবি অনুধাবনীয়—

ক. দূর কুয়াশায়
চ'লে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে ;
(যেদিন সরিয়া যাব : রূপসী বাংলা)

খ. সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।
(বনলতা সেন : বনলতা সেন)

গ. এইসব শেষ হ'য়ে যাবে তবু একদিন ; —হয়তো বা ক্রান্ত ইতিহাস
শাণিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।
(পরিচায়ক : মহাপৃথিবী)

ঘ. সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে—
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে
ধানসিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।
(শঙ্খমালা : বনলতা সেন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিপুঞ্জের প্রথমটিতে অন্ধকারের চিত্রকল্পে প্রকাশিত হয়েছে কবির মৃত্যুচেতনা। মৃত্যু অন্ধকারের মধ্যে এসে কবির শরীর ভিক্ষা করে লয়ে যাবে—এই কল্পছবিটি এখানে সৃষ্টি করেছে চিত্রকল্পের অনিবার্য শর্ত কল্পনাপ্রসারী লাবণ্য ও মননদ্যোতক ব্যঞ্জনা। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ উদ্ধৃতিতে অন্ধকার-সম্ভব চিত্রকল্পের শরীরে বিম্বিত হয়েছে কবির সৌন্দর্যলক্ষ্মী মানসপ্রিয়ার অবয়ব। তৃতীয় চিত্রকল্পটিতে প্রকাশিত হয়েছে কালিক বিপন্নতায় বিমূঢ় কবি জীবনানন্দের অসহায় আর্তি।

অন্ধকার-আশ্রিত চিত্রকল্পের সহায়তায় জীবনানন্দ কখনো কখনো প্রকাশ করেছেন তাঁর ইতিহাস-চেতনা। অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকারই যে সকল সৃষ্টির আদি উৎস—এই প্রত্যয় জীবনানন্দের কবিতায় পৌনঃপুনিক উচ্চারিত। অন্ধকার থেকে সৃষ্টি-যাত্রার এই প্রত্যয় নিম্নের চিত্রকল্পটিতে সুপরিস্ফুট—

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।
বীজের ভিতর থেকে কী ক'রে অরণ্য জন্ম নেয়,—
জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর,
কী ক'রে এ প্রকৃতিতে—পৃথিবীতে, আহা
ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,
আমরা জেনেছি সব,—অনুভব করেছি সকলি।

(অন্ধকার থেকে : বেলা অবেলা কালবেলা)

—বীজ থেকে যেভাবে একদিন জন্ম নেয় বিশাল কোনো বৃক্ষ, কিংবা জলের কণা থেকে এক সমুদ্র—তেমনি অন্ধকার থেকে মানবজীবন। এখানে দু'টো উপমা অলঙ্কার আপন সত্তার সীমানা অতিক্রম করে অনুভূতির শোভা নিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে অসামান্য এক চিত্রকল্পে। ভাব-ভাবনার উদ্দীপন বা উদ্ভাসন-ক্রিয়ায়, উদ্ধৃত চিত্রকল্পটি, পাঠকহৃদয়ে সৃষ্টি করে মননদ্যোতক ব্যঞ্জনা।

৩.২

তিমির-বিলাসী জীবনানন্দ একই সঙ্গে তিমির-বিনাশীও বটে ; অন্ধকারের ভুবনে হাঁটার পাশাপাশি পৌনঃপুনিকভাবে তিনি গেয়েছেন অন্ধকার-হননের গান। জীবনানন্দের কবিতায় অন্ধকার আর আলোক পরস্পর পরিপূরক—কখনো-বা সমার্থক, একাত্ম। অন্ধকারের বুকে হেঁটে হেঁটে জীবনানন্দ অবিরল সন্ধান করেছেন আলোকের অবারিত উৎস—মুখ তুলে তাকিয়েছেন সূর্যের দিকে, চন্দ্রের দিকে, আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। জীবনানন্দের কবিতায় উত্তরণের শক্তি-উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আলোক-মোটিফ। সূর্য, চন্দ্র আর নক্ষত্রমণ্ডলীই তাঁর কবিতায় কেন্দ্রীয় আলোক-উৎস।

জীবনানন্দের কবিতায়, বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সূর্য-সৃজিত চিত্রকল্পের প্রাচুর্য। আলোক-উৎসে সৃষ্ট চিত্রকল্পে জীবনানন্দ প্রকাশ করেছেন তাঁর অস্তিচেতনা। সূর্যের সঙ্কেতে কবি যুগপৎ দেখেছেন মানুষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। তাই রৌদ্র, সমুজ্জ্বল ভোর আর অনন্ত সূর্যোদয়ের কল্পছবি পৌনঃপুনিক ভাবে নির্মিত হয় তাঁর কবিতায়—

ক. সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
... ...
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছি যা হ'ল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।
(সুচেতনা : বনলতা সেন)

খ. অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ ক'রে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন ব'লে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।
(উত্তরপ্রবেশ : সাতটি তারার তিমির)

জীবনানন্দ আলোকের উপাসক ; আবার একই সঙ্গে অন্ধকারেরও আরাধক। জীবনের আলোকিত প্রান্তরের কথা বলতে গিয়ে তিনি মেতে উঠেছেন সূর্য-বন্দনায় ; সূর্যের ইমেজে শিল্পিত করেছেন মানুষের আলোকিত ভবিষ্যৎ। কখনো-বা সূর্যের আলোক, তাঁর কবিতায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে অতিক্রম করে সংবেদনায় সিক্ত করে ব্যক্তির মনন-আকাশকে। এভাবে জীবনানন্দের কবিতায় সৃষ্টি হয় এক একটি উজ্জ্বল রূপকাত্মক চিত্রকল্প বা মেটাফরিক্যাল ইমেজ। যেমন, *বনলতা সেন* কাব্যের 'শিকার' কবিতায়—

এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।
(শিকার : বনলতা সেন)

—এখানে 'সূর্যের সোনার বর্শা' শব্দগুচ্ছ ইন্দ্রিয়ের সীমানা অতিক্রম করে পাঠককে পৌঁছে দেয় সংবেদনা-উদ্ভাসিত মননের ব্যঞ্জনঋদ্ধ ভুবনে এবং এভাবেই তৈরি হয় উজ্জ্বল এক রূপকাত্মক চিত্রকল্প।

সূর্যের পাশাপাশি চাঁদ আর নক্ষত্র-মোটিফ ব্যবহার করেও জীবনানন্দ প্রকাশ করেছেন তাঁর কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের কথা। চাঁদ আর নক্ষত্র-মোটিফ দিয়ে সৃষ্ট চিত্রকল্পসমূহেও অভিব্যঞ্জিত হয় তাঁর সূর্যকরোজ্জ্বল চেতনা। চাঁদ আর নক্ষত্র-ইমেজের অন্তরালে যেমন পাওয়া যায় জীবনানন্দের রোম্যান্টিক কবি-মানসের পরিচয়, তেমনি তাঁর সদর্থক জীবন-চেতনা। এ-সূত্রে নিম্নের উদ্ধৃতিদ্বয় অনুধাবনীয়—

ক. নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
পথ ভুলে বার বার পৃথিবীর ক্ষেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল!
(পিপাসার গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

খ. বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।
(শঙ্খমালা : বনলতা সেন)

—এখানে, প্রথম চিত্রকল্পে, পৃথিবীর ক্ষেতে কবির সবুজ ফসল হয়ে জন্মানোর কল্পছবিতে সৃষ্টি হয়েছে অপরূপ ব্যঞ্জনা। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে চাঁদকে শিঙের মতো বাঁকা করে কবি প্রকাশ করেছেন বৈশ্বিক বৈনাশিকতার ছবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩.৩

জীবনানন্দ দাশ বিনাশশীল কাল আর অবিনাশী ঐতিহ্য সম্পর্কে ছিলেন প্রাজ্ঞ ও সচেতন। ইতিহাসের স্বাভাবিক সঞ্চরণ–পথে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রবহমান মানব–অভিযাত্রা। ইতিহাসের গর্ভ আর সময়ের স্রোত থেকে জীবনানন্দ পৌনঃপুনিক সঞ্চয় করেছেন আশা আর আশ্বাসের অনন্ত উৎস। অতীতের অবিনাশী অস্তিত্বকে অঙ্গীকার করেই জীবনানন্দ পাড়ি দিতে চান বর্তমানের ধস–অর্ণব ; প্রবহমান সময়–স্রোত থেকেই তিনি নির্মাণ করতে চান মহাকালের মানব। তাই, তাঁর কবিতায়, চিত্রকল্পের উৎস হিসেবে, প্রায়শই ব্যবহৃত হয় ইতিহাস আর সময়–মোটিফ। নিম্নের উদ্ধৃতিগুচ্ছ অনুধাবনীয়—

ক. আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
কাচের গেলাসে জলে উজ্জ্বল শফরী ;
সমুদ্রের দিবারৌদ্রে আরক্তিম হাঙরের মতো ;
(আবহমান : শ্রেষ্ঠকবিতা)

খ. তবুও শ্মশান থেকে দেখেছি চকিত রৌদ্রে কেমন জেগেছে শালিধান ;
ইতিহাস–ধুলো–বিষ উৎসারিত ক'রে নব নবতর মানুষের প্রাণ
প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ ক'রে এক তিল বেশি
চেতনার আভা নিয়ে তবু—
(অন্ধকার থেকে : বেলা অবেলা কালবেলা)

—এখানে, প্রথম উদ্ধৃতিতে, 'সময়ের ঘড়ি', 'জলে উজ্জ্বল শফরী' এবং 'আরক্তিম হাঙরের মতো' বাক্যাংশের ব্যবহারে গড়ে উঠেছে প্রবহমান সময়ের ছবি। শব্দগুলোর পারস্পরিক সঙ্গতি এখানে চেতনার যে ঐক্যস্রোত নির্মাণ করে, নিঃসন্দেহে তা কবির স্বকীয় শিল্পচেতনার ফসল। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে, শ্মশান থেকে চকিত রৌদ্রে শালিধান জেগে ওঠায় জীবনানন্দের সদর্থক ইতিহাস–চেতনার উজ্জ্বল উদ্ভাসন ঘটে। শ্মশানের বিপ্রতীপে শালিধান জেগে ওঠার ছবিতে মানব–সভ্যতার প্রাগ্রসরতাই শিল্পিত হয়। একই সঙ্গে তা গতিশীলতা, সৃষ্টিময়তা এবং মানব–প্রবহমানতারও দ্যোতক এবং এ–কারণেই চিত্রকল্প হিসেবে এ–ছবি অসাধারণ।

৩.৪

জীবনানন্দের কবিতায় প্রেম আর অপ্রেম, জীবন আর মৃত্যু পরস্পরিত, পরিপূরক, একাত্ম। এক থেকে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করা, অনেক সময়েই, অসম্ভব। প্রেম আছে বলেই তাঁর কবিতায় পৌনঃপুনিকভাবে, ঘুরে ঘুরে আসে, মৃত্যু। মৃত্যুর আঁধারে তিনি, কিংবা বলি তাঁর নায়ক–নায়িকারা, সন্ধান করেন প্রেমের অধরা–মাধুরী। যেমন, ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যের 'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায়—

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ?—অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার !
(নির্জন স্বাক্ষর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের বনলতা, সুচেতনা, সুদর্শনা, সুরঞ্জনা, সবিতা, শ্যামলী, শঙ্খমালা—সবাই যেন এক-একটি আইডিয়ার প্রতীক। এদের সঙ্গে কবির কত কালের পরিচয়, তবু যেন তারা চির-অচেনা, যেন রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-র সেই অধরা প্রতিমা। ফলে, জীবনানন্দ কাব্য-জীবনের সূচনা থেকেই নিমগ্ন হয়েছেন নির্বেদ-নিঃসঙ্গতার দুর্মর আবর্তে, কোনো নারী এসে সেখান থেকে তাকে মুক্তির অমরাবতীতে নিয়ে যেতে পারেনি। তাই একাকিত্ব আর নৈঃসঙ্গ্যের বেদনায় দীর্ণ জীবনানন্দ প্রেমের অধরা রূপ ফুটিয়ে তোলেন একের পর এক চিত্রকল্পে, যেমন দেখি *বনলতা সেন* কাব্যের 'সবিতা' কবিতায়—

তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কত পৌত্তলিক খৃস্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন ;
কত কাছে—তবু কত দূর।

(সবিতা : বনলতা সেন)

কিংবা, 'শঙ্খমালা' কবিতায়—

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।

(শঙ্খমালা : বনলতা সেন)

উভয় চিত্রকল্পেই কবির প্রেমিকা দূর জগতের নারী, তাই অপ্রাপ্তির বেদনায় তিনি বিষণ্ন ও বিপন্ন এবং মৃত্যু-অভিসারী।

৩.৫

জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পের প্রাচুর্য সহজেই লক্ষযোগ্য। প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পে জীবনানন্দের কবি-চেতনার বিবর্তনরেখা নির্ভুলভাবে পরিস্ফুট। প্রকৃতির যে-সব উপাদান-উৎস তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প-সৃজনে ব্যবহৃত, তার মধ্যে আছে হেমন্ত, কুয়াশা, নদী, ঘাস, পাখি ইত্যাদি। প্রকৃতি-আশ্রিত নিম্নোক্ত চিত্রকল্পসমূহে জীবনানন্দের স্বকীয় কবিপ্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট—

ক. চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল !

(অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

খ. নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী ;

(শব : মহাপৃথিবী)

গ. তোমার জীবন নিয়ে তুমি
সূর্যের রশ্মির মতো অগণন চুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রৌদ্রের বেলার মতো শরীরের রঙে
খরতর নদী হ'য়ে গেলে
হ'য়ে যেতে।
(দীপ্তি : সাতটি তারার তিমির)

ঘ. মাঠ থেকে মাঠেমাঠে—সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে ; মানুষ দেখেছে হাট ঘাট বস্তি,—নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের ; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে—
(শকুন : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

—উদ্ধৃত কবিতাংশসমূহে 'ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের জল', 'বিরাট নীলাভ খোঁপা', 'সূর্যের রশ্মির মতো অগণন চুল', 'রৌদ্রের বেলার মতো শরীরের রঙ', 'মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ কল্পচিত্রের ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। লক্ষণীয়, কবিতাংশসমূহে ব্যবহৃত শব্দরাশি শুধুই প্রাত্যহিক নয় ; বিচ্ছিন্নভাবে তাদের প্রাত্যহিক পরিচয় থাকলেও সমন্বয়ের নিপুণতায় তারা সাঙ্গীতিক সুদূরতায় উত্তীর্ণ। একেই বলা হয় বাক্‌প্রতিমার তৃতীয় মাত্রার ব্যঞ্জনা। এইসব চিত্রকল্পে জীবনানন্দের কবি-মানসের মৌল বৈশিষ্ট্যও সুপরিস্ফুট।

৪

জীবনানন্দ দাশ, প্রকৃত প্রস্তাবেই, রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, চিত্রলতা আর চিত্রকল্পের কবি। চিত্রকল্পের শরীরে ও সত্তায় উৎকীর্ণ হয়ে আছে জীবনানন্দের কবি-আত্মার গোপন বাসনার কথা, উদ্ভাসিত হয়ে আছে তাঁর ইতিহাস-লালিত ও সময়সৃজিত ভবিষ্যৎ স্বপ্নযাত্রার কথা। বস্তুত, জীবনানন্দের চিত্রকল্প তাঁর কবিচৈতন্যের ক্রমবিকাশ রেখাকে যেন নির্ভুলভাবে ধারণ করে আছে। চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনা আর চিত্রলতার লাবণ্য যে জীবনানন্দের কবিতার শ্রেষ্ঠ আঙ্গিকগত স্বাতন্ত্র্য, তা অনস্বীকার্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বের অন্ধকার : প্রসঙ্গ গোধূলিসন্ধির নৃত্য

ফয়সাল শাহ্‌রিয়ার

দরদালানের ভিড়—পৃথিবীর শেষে
যেইখানে পড়ে আছে—শব্দহীন—ভাঙ্গা—
সেইখানে উঁচু—উঁচু হরিতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল—রাঙা—

* * *

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো :
পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন ;
খোঁপার ভিতরে চুলে : নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।

* * *

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই ; এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে—বরুণে

ক্রুর পথ নিয়ে যায় হরিতকী বনে—জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হয়ে গেছে সব ; বিনুনিতে নরকের নিবর্চন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।

(গোধূলিসন্ধির নৃত্য)

ত্রিশ দশকের প্রধান বাঙালি কবিরা সকলেই প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমের সন্তান। দীর্ঘকাল পূর্বে দীপ্তি ত্রিপাঠী অধ্যাপকসুলভ আত্মবিশ্বাসে এদের পৃথক পিতৃকূল নির্ধারণ করেছিলেন। সে বিচার এখনও প্রধানত অভ্রান্ত বলে মনে হয়। উক্ত কবিরা অষ্টাদশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যের মূলধারা থেকে মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমী (প্রধানত ব্রিটিশ) সাহিত্যের মনযোগী অনুশীলনে ব্যাপৃত হন। কারো কারো জন্য তা ক্ষোভের কারণ হলেও রবীন্দ্রোত্তর প্রধান কবিরা ছিলেন পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সচেতন ও অহঙ্কারী অধমর্ণ—অনেকে আক্ষরিক অর্থেই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋণের এই ধারা মোটামুটিভাবে মধুসূদন থেকে শুরু হলেও রবীন্দ্রনাথেই তা প্রথম প্রবল চিহ্ন রেখে যায়। রবীন্দ্রনাথ আজীবন অসঙ্কোচে পশ্চিমী সাহিত্য ও সংস্কৃতির কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করে গেছেন। কিন্তু পরিণত পর্যায়ে তিনি পশ্চিমের এই উত্তরাধিকারের, বিশেষত এর রাজনৈতিক ও সামরিক দিকের যথাযথ মূল্য সম্পর্কে গভীরভাবে সংশয়াক্রান্ত হন। মৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে লেখা 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে তিনি তাঁর দ্বিধার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। ততদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, ভারত বিভাগ আসন্ন।

কিন্তু ত্রিশ দশকের সকল বাঙালি কবি এই সংশয় দ্বারা সমভাবে আক্রান্ত হননি। চল্লিশের প্রবল ঘটনাবলী, বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা ও ভারতবিভাগ সকলকেই কমবেশি আন্দোলিত করলেও কেউ কেউ একে গত কয়েক শতাব্দীর বিশ্ব-ইতিহাসের পটভূমিকায় যথাযথভাবে স্থাপন করতে ব্যর্থ হন। ফলত তাঁদের কাছে তা দুঃখজনক হলেও বিচ্ছিন্ন কতিপয় ঘটনাবলীরূপে প্রতীয়মান হয় যাতে সাহিত্যের নির্যাস নিহিত নেই। এঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু সম্ভবত আমৃত্যু পশ্চিম দ্বারা তীব্রভাবে মোহগ্রস্ত ছিলেন। কবিতাকে ইতিহাস ও সমাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিলেন ; এঁরা চল্লিশ দশকের বিশ্বব্যাপী আলোড়ন থেকে অনেকটা সচেতনভাবেই তাঁদের রচনাবলীকে মুক্ত রাখেন। ত্রিশের প্রধান কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে স্থায়ীভাবে প্রবাসী হওয়ায় প্রায় মধ্যপর্যায় থেকেই তাঁর কবিতা এক আপাতঃমনোহারী অর্কিডসুলভ আন্তর্জাতিকতাবাদ দ্বারা আক্রান্ত হয় যা সম্ভবত পরবর্তীকালে তাঁর সতীর্থদের জন্যও গভীর বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমের ঐতিহ্য ও তার বিতর্কিত ফসল সম্পর্কে এই অদূরদৃষ্টতা ও সচেতন অজ্ঞানের পরিবেশে সমসাময়িকদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। 'ঝরা পালকের' কাল বাদ দিলে কবিজীবনের প্রায় প্রথম পর্যায় থেকেই তিনি ছিলেন তীব্রভাবে ইতিহাস সচেতন। কালের অখণ্ডতা প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত বোধ, যা তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ থেকে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, তাঁকে গত তিন হাজার বছর, কিংবা তারও বেশি সময় ধরে প্রাচ্যজীবনের ধারাবাহিকতা উপলব্ধিতে সক্ষম করে। জীবনানন্দ দাশ গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন যে অনুল্লেখ্য কিছু ছেদ ব্যতীত চার শতাব্দী পূর্ব পর্যন্ত প্রাচ্যদেশের একটি সাধারণ ঐতিহ্য রয়েছে যা কতিপয় সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট দ্বারা চিহ্নিত এবং যা প্রাচ্যসমাজের বর্তমান কাঠামোর পশ্চাতে অলক্ষ্যে হলেও ক্রিয়াশীল।

প্রাচ্যের উপরোক্ত ঐতিহাসিক ও সামাজিক ধারাবাহিকতা ভঙ্গের সূত্রপাত ঘটে বহু দূরের কিছু ঘটনাবলীতে। প্রধানত কতিপয় স্থানীয় কারণে, রেনেসাঁস-উত্তর পশ্চিম ইউরোপ দ্রুত বহির্মুখী হয়ে ওঠে এবং কল্পনাতীত স্বল্প সময়ে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সাময়িক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে। উনবিংশ শতাব্দী নাগাদ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্বে পশ্চিমের কোনো আপাতঃগ্রহণযোগ্য বিকল্প ছিল না। প্রাচ্যদেশ-সমূহের শাসকশ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই প্রায় প্রশ্ন ব্যতিরেকে পশ্চিমের সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করে। উক্ত আদর্শসমূহের সার অষ্টাদশ শতকীয় ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ তাঁর 'অদৃশ্য হাত' অর্থাৎ বাজার অর্থনীতির তত্ত্বে সার্থকভাবে প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীও সমগ্র প্রাচ্যব্যাপী এই গ্রহণের ধারায় ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু জনজীবনে পশ্চিমের প্রভাব ছিল প্রায় উপেক্ষণীয় ; অন্তত ভারতবর্ষে মধ্য-উনবিংশ শতাব্দী থেকেই পশ্চিমী শাসকশ্রেণী স্থানীয় সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলত ভারতের নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচ্ছন্নভাবে হলেও সজীব রয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব–পশ্চিমের দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক, সামাজিক ভারসাম্য বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ক্রমশ পরিবর্তিত হতে শুরু করে যার প্রথম লক্ষণ প্রকাশিত হয় রুশ–জাপান যুদ্ধে। এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধ একটি যুগান্ত নির্দেশ করে। উক্ত মহাযুদ্ধের ফলে বিগত এক শতাব্দীর ইউরোপীয় ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম কর্তৃক পূর্বের উপরে সামগ্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে ছিল উক্ত অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের উপরে নির্ভরশীল। প্রাচ্যবাসী বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের দেবত্বহানি অবলোকন করে। অক্টোবর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে তারা দেখতে পায় যে বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারকেন্দ্র নিশ্চিত গতিতে মধ্য ইউরোপ থেকে ক্রমশ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অপসৃত হচ্ছে। ফলত দুই যুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন সময়ে দীর্ঘকাল পরে প্রাচ্যের রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জন ও নিজস্ব অবিলুপ্ত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে প্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এর গুরুত্ব সুস্পষ্ট না হলেও উক্ত যুদ্ধে জাপানের যোগদানের, বিশেষত সিঙ্গাপুর ও মালয়ের পতনের পরে সকল সচেতন প্রাচ্যবাসীই উপলব্ধি করতে পারেন যে, প্রাচ্যের ইতিহাসে একটি যুগসন্ধিক্ষণ আসন্ন। অকল্পনীয় দ্রুততায় শতাব্দীকাল ধরে এশিয়ায় গড়ে তোলা ব্রিটিশ, ফরাসি ও ওলন্দাজ উপনিবেশসমূহের পতনের ফলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল নির্বিশেষে যুদ্ধোত্তর এশিয়ার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্র হবে ভিন্নতর। এই সময়ে দীর্ঘ চার শতাব্দী পরে পশ্চিম কর্তৃক আনীত ও আরোপিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা সমাধিস্থ প্রাচ্যের নিজস্ব জীবনধারার পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রচনা ও প্রকাশকালের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দ দাশের 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' উক্ত প্রেক্ষাপটেই বিচার্য।

রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবত নিজের অজান্তেই, মধ্য–ত্রিশের দশকে জীবনানন্দ দাশের কাব্যভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় "মৃত্যুর আগের" আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে আখ্যায়িত করেন 'চিত্ররূপময়' রূপে। ফলত জীবনানন্দ দাশ পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকাল ইন্দ্রিয়নির্ভরতার চিহ্ন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেননি। ঐ পরিচয় অবশ্যম্ভাবীরূপে পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' প্রতি। এ প্রবণতার ধারাবাহিকতায় কেউ কেউ 'বনলতা সেন'কে জীবনানন্দ দাশের পরিণত পর্যায়ের কবিতার সোপান নয়, বরঞ্চ 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' সন্তান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। 'গোধুলিসন্ধির নৃত্য' প্রসঙ্গেও উক্ত মানদণ্ড প্রয়োগের প্রচেষ্টা হয়েছে।

সাত স্তবকে বিন্যস্ত কবিতাটির প্রথমাংশ বিবেচনায় জীবনানন্দের পাঠক পরিচিত ভূমির সাক্ষাৎ লাভ করবেন। হেমন্তের দেখা মেলে প্রথম স্তবকেই, এবং হরিতকী গাছের। তবে দ্বিতীয় স্তবকে নিঃসঙ্গ প্যাঁচার উল্লেখ সোনার বলের মতো সূর্য আর রূপার ডিমের মতো চাঁদের সাক্ষাতের ভিন্ন মাত্রার সম্ভাবনা জাগ্রত করে। কিন্তু তৃতীয় স্তবকের শেষে মধুকূপী ঘাসের উল্লেখ পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে যায় 'জীবনানন্দীয় ইন্দ্রিয়ময়তার' দিকে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে 'গোধূলিসন্ধির নৃত্যে'র চতুর্থ স্তবকটি সিদ্ধান্তসম্ভব নরকের মেঘের উল্লেখ রয়েছে এখানে এবং পরবর্তী পঙ্ক্তিতেই হঙকঙের তৃণের। পঞ্চম স্তবকে জীবনানন্দ জানান "কামানের স্থবির গর্জনে বিনষ্ট হতেছে সাংহাই"। ভীড় করে আসে ত্রিশের দশকের অমঙ্গলময় স্মৃতি : ইউরোপে ফ্যাসীবাদের উত্থান, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে গণতন্ত্রের পরাজয় এবং সর্বোপরি জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ এবং পরবর্তী দশকব্যাপী চীন–জাপান যুদ্ধে অকল্পনীয় লোকক্ষয়। শেষ দুই স্তবকে জীবনানন্দ কবিতাটির মূল গতিপথ নির্ধারণে দ্বিধার অবকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখেননি। অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক বৃক্ষবন্দনা নয়, 'গোধূলিসন্ধির নৃত্যে' জীবনানন্দের লক্ষ্য ছিল ভিন্নতর। এতে তাঁর প্রবাদপ্রতিম ইতিহাস চেতনা এবং সর্বোপরি ইতিহাসের জঙ্গমতা প্রসঙ্গে তাঁর উপলব্ধির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। কবিতাটির রচনা ও প্রকাশকালের প্রসঙ্গও এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

একটি বিশেষ কালের লক্ষণ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত এক পৃথিবীর শেষ প্রান্তে দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে জ্ঞানী পেঁচা ঈর্ষনীয় দূরত্বে কালের কৌতুকপ্রবণ সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে গত চার শতাব্দীর বাণিজ্য-উদ্ভূত সভ্যতার অবশেষ। উপরোক্ত পরিবেশে জীবনানন্দ দাশ সম্ভবত সচেতনভাবেই রহস্যময়তার অনুষঙ্গের জন্য পুনরুত্থিত পূর্বকে যুথচারী নারীর বেশে উপস্থাপন করেছেন 'কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো' যাদের পায়ের ভঙ্গির নিচে হংকঙের তৃণ। অনতিদূরে 'কামানের স্থবির গর্জনে বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।' কবিতাটির ষষ্ঠ স্তবকে জীবনানন্দ দাশ উক্ত রহস্যময়ী নারীদের 'চোখ আর চুলের' উল্লেখে ইউরোপ কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে আনীত বিস্তারপ্রবণ বাণিজ্য এবং উক্ত বাণিজ্য-প্রসূত যুদ্ধের যুগের আসন্ন পরিসমাপ্তির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেন। এই আসন্ন অবসান রোধ পশ্চিমের অসাধ্য 'ক্রুর পথ নিয়ে যায় হরিতকী বনে জ্যোৎস্নায়'। কবিতাটির শেষ দুই পংক্তিতে তিনি দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের অক্ষয় জীবনীশক্তি প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন (বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ, পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক-কর্কট-তুলা-মীন)।

শ্বেতাঙ্গ দৃষ্টিতে প্রতিভাত প্রাচ্যের রহস্যকে নারীবেশে উপস্থাপনে উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব নেই। 'গোধূলিসন্ধির নৃত্যে'র প্রথম তিন স্তবকে জীবনানন্দ দাশ যে পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্বের আবহে গত চার শতাব্দীতে ইউরোপ কর্তৃক নির্মিত বিশেষ সভ্যতার অবলুপ্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার মধ্যেও অভিনবত্ব অনুপস্থিত। বরঞ্চ একটি বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণের সমগ্র সম্ভাবনা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধিতেই তাঁর কৃতিত্ব নিহিত। ত্রিশের বাঙালি কবিরা দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন অনিশ্চিত সময়ে পরিণতি অর্জন করলেও তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পশ্চিমের চিরস্থায়ী পরাক্রমে গভীরভাবে বিশ্বাসী। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবি-জীবনের প্রায় প্রারম্ভ থেকেই তাঁর গভীর কালচেতনার মাধ্যমে এশিয়ার আপাতঃলুপ্ত নিজস্ব জীবনধারা প্রসঙ্গে সচেতন হয়ে ওঠেন। চল্লিশ দশকের যুগান্তকারী ঘটনার মাধ্যমে উক্ত প্রচ্ছন্ন অথচ প্রবল প্রাণশক্তিময় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা সমসাময়িক বাঙালি কবিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সম্ভবত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' কবিতাটি উক্ত মানদণ্ডেই বিচার্য। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো জীবনানন্দ দাশ এ ক্ষেত্রেও একটি ব্যতিক্রম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী : কল্যাণ-অকল্যাণের টানাপোড়েন

সরদার আবদুস সাত্তার

'বনলতা সেন' নামের এক অপূর্ব মনোমোহিনী ও অবিস্মরণীয় নারীকে সৃষ্টি করেছেন জীবনানন্দ দাশ। স্রষ্টার মগ্নচৈতন্যে জন্ম নিয়ে কল্পনার আকাশপাড় অতিক্রম করে আসা এই নারী রোম্যান্টিক শহর নাটোরের ভৌগোলিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে, 'সেন' পদবীকে আপন অস্তিত্বের সঙ্গে একীভূত করে যুগ-যুগান্তের ক্লান্ত এবং পিপাসার্ত পুরুষকে যেভাবে সম্মোহিত করে রেখেছে, তার বুঝি কোনো তুলনা নেই। তবে জীবনানন্দ দাশ তাঁর কলমের ভাষায় শুধুমাত্র বনলতা সেন-কে সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি, সৃষ্টি করেছেন সুরঞ্জনা, শেফালিকা, অরুণিমা, শঙ্খমালা, অনুরাধা, রোহিনী ইত্যাদি আরও বেশ ক'টি কাব্য-নারীকে। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টির কামনা তৃপ্ত হলো না তাতেও। তাই সকলের অজ্ঞাতে এবং একেবারে নিঃশব্দে আবারো নিমগ্ন হলেন তিনি সৃষ্টির সাধনায় এবং বিস্ময়বিমুগ্ধ পাঠকের চেতনা ও দৃষ্টির সামনে মেলে ধরলেন আর এক স্বতন্ত্র নারীকে—যার নাম 'কল্যাণী'। তবে কবিতার সম্মোহিত পাঠকের মোহ-অঞ্জন হয়ে নয়, জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত এক ভিন্ন স্বাদের উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে একই সঙ্গে সংসারের অতি চেনা ও অচেনা নারী হয়ে যে বেড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে মেলে ধরে তাঁর সুরভিত ও যন্ত্রণাক্ত সত্তার সবটুকু পরিচয়। তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন হৃদ-পদ্মের মৃদু সৌরভ উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় থেকেই আমাদের মাঝে এসে লাগে এবং ক্রমশ যতই উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলো উল্টে যেতে থাকি—এই কল্যাণী তাঁর স্বপ্ন, কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, পাওয়া এবং না-পাওয়ার অনুভব দিয়ে জড়ানো হৃদয়গ্রাহী আখ্যানের জটাজাল খুলতে খুলতে আমাদেরকে কখনো বিমুগ্ধ, কখনো বিস্মিত আবার কখনো বা বেদনার্ত ও বিহ্বল করে ফেলে। আর এই সমূহ পারঙ্গমতা নিয়ে সেও হয়ে ওঠে আমাদের হৃদয়-রাজ্যের এক উজ্জ্বল মানবী—যাকে বিস্মৃত হবার সামর্থটুকু আমরা হারিয়ে ফেলি নিজের অজান্তেই।

কল্যাণীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটানোর জন্য জীবনানন্দ দাশ কলকাতা শহরের ডামাডোল ও দালানকোঠা থেকে তাকে বের করে নিয়ে এলেন শালিখবাড়ীতে। এই শালিখবাড়ীকে চিনে নিতে আমাদের কোনোই কষ্ট হয় না। কেননা 'রূপসী বাংলা'-র সনেটগুলিতে এই জনপদের ছায়া অনেকবার বিস্তৃত হতে দেখেছি আমরা। এখানে সারা বছর ঘুঘু ডাকে, নদীর ঘাটে স্টিমার ভেড়ে, বর্ষায় ইলিশ ধরার জাল নিয়ে অসংখ্য নৌকা নদীতে ঘুরে বেড়ায়, শঙ্খচিল ডানা ভাসায় আকাশে, বৃষ্টি নামলেই ন্যাওতার মাঠ ভরে যায় উলুঘাসে, ভিলুন্দির জঙ্গল আদিম অরণ্যের ছায়া ছড়ায়। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে ঋদ্ধ হয়ে ওঠা এই জনপদে ক্লাইভের আমলে আধা ইংরেজি আধা মুসলমানি কায়দার গড়ে ওঠা এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশাল জমিদারবাড়ীতে কল্যাণীকে আমরা প্রথম দেখতে পাই—যে সদ্য কলকাতা প্রত্যাগত। নদী আর নিবিড় জঙ্গলকে তো জীবনানন্দ দাশ প্রায়শই একাসনে বসিয়েছেন। কলকাতা ও শালিখবাড়ী তথা রাজধানী ও মফস্বলকেও এখানে বুঝি তিনি পরস্পরের হাত ধরাধরি করে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। অবশ্য এই দু'য়ের জীবন-ভাবনা ও বিন্যাসের মধ্যে যে বৈষম্য ও ব্যবধান বিরাজমান, সেটি ফুটিয়ে তোলাই এখানে তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বিশ শতকের এক মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারীর কন্যা হিসেবে এখানে তিনি কল্যাণীকে উপস্থাপন করেছেন। আঠারো শতকের শেষ এবং বিশেষ করে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই মফস্বলবাসী সেইসব ভূম্যধিকারী তথা জমিদাররা প্রায় সকলেই তাদের একটি পা বাড়িয়ে কলকাতার মাটিকে ছুঁয়ে থাকবার চেষ্টা করতেন। কল্যাণীর বাবা—বিশ শতকের পড়ন্ত জমিদার পঙ্কজ রায়চৌধুরীও তার ব্যতিক্রম নন। ছেলে কিশোর এবং মেয়ে কল্যাণীকে কলকাতার কলেজ-বোর্ডিংয়ে রেখে রাজধানী কলকাতার সঙ্গে সেই যোগসূত্রটা ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন। তবে যে সময়ের প্রেক্ষাপটে এইসব আপাতসুখী মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে, তা তাদের জন্য খুব একটা সুখ কিংবা আশাপ্রদ সময় নয়। কেননা জমিদারি তখন অনেকক্ষেত্রেই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নানাদিক থেকে তাতে ধস নামা শুরু হয়েছে। তাই মাঝেমধ্যেই রায়চৌধুরী মশায়কে তার জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে তুলে দেবার কথা ভাবতে হচ্ছে। অবশ্য জমিদার হলেও রায়চৌধুরী মশায় অনাচারী কিংবা অত্যাচারী নন। তার স্ত্রী গুণময়ী জানিয়েছেন, একমাত্র চুরুট খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো নেশা কিংবা মন্দ অভ্যাসের কাছে তিনি নিজেকে কখনও সমর্পণ করেননি। আজীবন মাথা উঁচু এবং মেরুদণ্ড সোজা করে চলবার মতো নৈতিক শক্তির কোনো ঘাটতি হয়নি তার। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি এবং সেখান থেকে বি.এ. পাশ করেছেন—সেই ১৯০১ সালে। কিন্তু পড়াশোনার অভ্যেসটিকে এখনও তিনি অটুট রেখেছেন। নিত্য-নতুন বই কেনার অভ্যেসটিকেও বাসি হয়ে যেতে দেননি। নিয়ম বেঁধে কখনও সন্ধ্যা আহ্নিক করেননি তিনি, কিন্তু ভগবানের উপর বিশ্বাস ও ভরসাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। লোভ বা হতাশার কাছে তিনি নতজানু নন। অন্যায়-অপকর্মের সঙ্গেও যুক্ত নন। তবুও জীবনের সব যোগফল মেলেনি তার। বড় ছেলে বিজলী বিলেতে গেছে অনেক বছর আগে, কিন্তু ফিরে আসার নামটিও করছে না। বাধ্য হয়েই প্রতি মাসে তাকে মোটা অঙ্কের টাকা পাঠাতে হচ্ছে জমিদারি আয়ের অনিশ্চয়তার মুখেও। মেঝ ছেলে প্রসাদের দিকে তাকিয়ে যদিও তিনি তৃপ্তি খুঁজবার চেষ্টা করেন, তবুও শেষ বিচারে সে এক নিছক আত্মস্বার্থসর্বস্ব জীব ছাড়া আর কিছু নয়। ছোট ছেলে কিশোর, কলকাতায় থাকে। লেখাপড়ার অজুহাতেই সে সেখানে থাকে, কিন্তু লেখাপড়া সে করে না। সেকালের জমিদারনন্দনরা কলকাতা শহরে যা যা করে বেড়াত, তার প্রায় সবগুলোতেই সে অভ্যস্ত। তবে পশ্চিমের শিল্প-সাহিত্যের আনন্দরসটুকু প্রাণ ভরে পান করবার আকাঙ্ক্ষাটি তার অকৃত্রিম। তিন ধরনের এই তিন পুত্রের বিপরীতে একটিই মাত্র কন্যা কল্যাণী। কলকাতা শহরের এক কেতাদুরস্ত কলেজের ছাত্রী সে। থাকে বোর্ডিংয়ে—যেখানে সৌন্দর্য, সুরুচি ও শৃঙ্খলাবোধের বাহ্যিক কোনো ত্রুটি কিংবা ঘাটতি নেই। কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত এবং সাগরপারের মানুষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও আবহমান স্নেহময় সজীব নিসর্গ এই ছাত্রীবাসটিকে যেন কোমল মায়ায় জড়িয়ে রেখেছে। শালিখবাড়ীর মতো এখানে দুপুরে কোনো ঘুঘুর ডাক শোনা যায় না ঠিকই, তবে কল্যাণীর ঘরের জানালা খুললেই অনন্ত নীল আকাশের মায়াবী বিস্তার চোখে পড়ে। আর চোখে পড়ে লতাপাতা ক্রোটন ঝুমকো, পাতাবাহারের ভিতরে অনেক চঞ্চল ফড়িং, বর্ণিল প্রজাপতি এবং ছটফটে চড়ুই টুনটুনির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওড়াউড়ি। এই লতাগুল্ম–বৃক্ষ–বিহঙ্গ শোভিত বোর্ডিংয়ে যারা কল্যাণীর সহপাঠী অথবা সতীর্থ, বয়সজনিত উচ্ছ্বাস, চাপল্য ও সৌন্দর্য নিয়ে তারা প্রায় প্রত্যেকেই আকর্ষণীয়। তবে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্যের একটা অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তাদের অনেকের মধ্যে বিদ্যমান। ফলে বয়স, শিক্ষা এবং আর্থ–সামাজিক অবস্থানের সূত্রে তারা একই বৃত্তের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও সদ্য বিকশিত অথবা বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্বের কারণে একে অপরের কাছ থেকে দূরত্বময় অবস্থানে আসীন। তবে তাদের মধ্যে রুচির স্বাতন্ত্র্য ও পছন্দের ভিন্নতা যা–ই থাক না কেন, কল্যাণীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তারা সকলেই মনে করে কল্যাণী তাদের মধ্যে সেরা সুন্দরী। কৌতূহলী বন্ধুরা কেউ কেউ আন্তরিকভাবেই জানতে চায়। কল্যাণী তার অমন টিকলো নাক, সুন্দর চোখ এবং থুৎনি কার কাছ থেকে পেয়েছে। এ সবই যে তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, আনন্দ ও গর্ব নিয়েই কল্যাণী তা সবাইকে জানায়। তাতে তার বান্ধবীদের কৌতূহল যদি বা তৃপ্ত হয়, কিন্তু শেষ হয় না তার মুখের মনোহর সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকবার সাধ। জীবনানন্দের নিজের কলম থেকে এ বিষয়ে যা লেখা হয়েছে, তা থেকে একটু উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

> কল্যাণীর মুখের অনুপম রূপ–সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইল সে। কল্যাণীর নিঃশ্বাসের থেকেও কেমন যেন মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে।
> মিনু বল্লে—কি খেয়েছিস রে?
> —কখন?
> —মুখের থেকে তোর কিসের গন্ধ আসে?
> —জানি না তো?
> —জানিস না? সব সময়ই আমি পাই।
> কল্যাণী বল্লে—কিসের গন্ধ–রে মিনু?
> মিনু কোন জবাব দিল না, সৌন্দর্যের রসের সঙ্গেই এ যেন এক ঘ্রাণ, পদ্মের রক্তমাংসের থেকে যেমন গভীর বিলাসের গন্ধ আসে তেমন, পদ্ম কি কিছু খায়?
> —একটা চুমো খাই কল্যাণী?
> চুমো সে খেল—
> এমন পরিতৃপ্তি মিনু কোনো দিনও পায়নি যেন।

কল্যাণীর এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্যই কি শেষ পর্যন্ত তার শত্রু হয়ে দাঁড়াল? অথবা ট্র্যাজেডির উৎস? 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'—হাজার বছরের পুরনো প্রবাদময় সেই পঙ্‌ক্তিটিই কি এক্ষেত্রে জীবনানন্দকে প্রভাবিত করেছিল কল্যাণীর জীবননাট্যের গতিপথ নির্ধারণে? প্রাথমিক বিচারে সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর ইতিবাচক বলে মনে হয়। কল্যাণী যখন অতুলনীয় হয়ে উঠেছে রূপে ও গুণে, হৃদয়ের ঐশ্বর্য ও রুচিবোধে ; ঠিক তখনই তার পাশে জীবনানন্দ প্রতিস্থাপন করলেন চন্দ্রমোহন নামের এক ধূর্ত, কামাতুর ও কুৎসিত দর্শন পুরুষকে। কল্যাণী যেমন আর দশটা সাধারণ মেয়ের চাইতে একটু বেশি সুন্দর শুভ্র এবং কোমল, চন্দ্রমোহনও যেন তার সঙ্গে পাল্লা রেখেই আর দশটি সাধারণ পুরুষের চাইতে অনেকখানি বেশি হতশ্রী, কুশলী এবং নির্বিবেক। মানবতার চেয়ে ইতরতার প্রতিই তার আগ্রহ অধিক এবং প্রথম দেখার দিন থেকেই সে কল্যাণীর প্রতি যতখানি প্রেম, তার চেয়ে অনেক বেশি কামুকতায় উদ্দীপ্ত। ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশ তাঁর উপন্যাসের শুরুতে যখন শালিখবাড়ীর বর্ণনা দিচ্ছিলেন, নদী, আকাশ, মেঘ, মাঠ, আলো, অন্ধকার, পাখি, তৃণ, অরণ্য, জেলে–ডিঙ্গি ইত্যাদি সবকিছু মিলেমিশে এক কাঙ্ক্ষিত ও মনোহর পৃথিবীর রূপাবরণই সেখানে উন্মোচিত হচ্ছিল। দৃষ্টির সম্মুখে একে একে ছড়িয়ে পড়ছিল রূপসী বাংলার মনোহর

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালচিত্র। শালিখবাড়ী থেকে স্টিমারে করে কল্যাণী যখন ফিরে যাচ্ছিল কলকাতায়, তখন নদী, নদীপথ, স্টিমার ও স্টিমারযাত্রীদের যে প্রাসঙ্গিক পরিচয়টুকু এ উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে—নদীমেখলা বাংলার প্রাত্যহিক জীবনকে দু'হাতে জড়িয়ে থাকা কোমল-কঠিন বাস্তবের রূপচিত্রটিই সেখানে ফুটে উঠেছে—ঔপন্যাসিকের পর্যবেক্ষণশক্তির সাক্ষ্য নিয়ে নদীর নরম-নিবিড় সম্পর্ককে পিছে ফেলে কল্যাণী যখন ইঁট কাঠ পাথর ও লোহায় মোড়া কলকাতা শহরে পা রেখেছে, সেই শহরকেও তখন কোনো 'পাষাণকায়া' বলে মনে হয়নি। বরং শালিখবাড়ীর মতো একই নীলাভ আকাশের নরম দ্যুতি সেখানেও দীপ্যমান। বৃক্ষের সবুজ কিংবা বিহঙ্গের কলগুঞ্জন—কোনোকিছু থেকেই সেই শহর বঞ্চিত নয়। বরং তার রয়েছে অঢেল বাড়তি উপকরণ—মন ও মননকে সুখদ অনুভূতিতে ভরিয়ে দিতে যার কোনো জুড়ি নেই। ব্রিটিশ অধিকৃত ও শাসিত সেই শহরে ইংরেজি সাহিত্য-সংস্কৃতির নানাবিধ নিদর্শন ও চর্চার পরিচয় ছড়ানো ছিটানো থাকবে—সেটি তো খুবই স্বাভাবিক। সঙ্গত কারণেই তাই বায়স্কোপ ও থিয়েটারের কথা এসেছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কথা এসেছে, এসেছে 'সোডা ফাউন্টেন' ও 'লাকী সেভেন' খেলার কথা। তবে তারই পাশাপাশি এসেছে ফরাসি সাহিত্য এবং জীবনদর্শনের হাতছানিতে চঞ্চল হয়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কথা। পঙ্কজবাবুর মতো বয়োবৃদ্ধ আচারনিষ্ঠের কাছে অবশ্য তা নিছক 'ভগবানহীন সংযমহীন নরমাংসের নারীমাংসের নরককুণ্ড' বলে মনে হলেও কল্যাণী কিংবা তার বান্ধবীদের কাছে মোটেই তা নয়। কেননা কলকাতা তাদের দৃষ্টির প্রসার ঘটিয়েছে, প্রসার ঘটিয়েছে রুচি ও মননেরও। কলকাতার প্রেক্ষাগৃহ, মধ্যরাতের নির্জন রাস্তা, গঙ্গার তীর—সবকিছুর মধ্যেই জীবনানন্দ দাশ ছড়ানো দেখিয়েছেন আকর্ষণ ও সৌন্দর্যের মনোহর অস্তিত্ব। কিন্তু পূজার ছুটি উপলক্ষে যখন তিনি কলকাতা থেকে কল্যাণীকে আবার শালিখবাড়ীতে নিয়ে এসেছেন, তখনই পাঠকের সামনে উপস্থাপন করলেন এক মূর্তিমান অসুন্দরকে—চন্দ্রমোহন যার নাম। 'বিয়োবার কালে' যে রমণীর রূপ ঝরে যায়, জীবনানন্দ দাশ তার ছবি অনেক আগেই এঁকেছেন। কিন্তু ভয়ংকরদর্শন কামুক ও ধূর্ত পুরুষের ছবি বুঝি এবারই তিনি প্রথম আঁকলেন। এই ছবির সামনে শুধু কল্যাণীর মতো সুরুচিসম্পন্না নারী নয়, যে কোনো পাঠকই হতচকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু মনে হয় এক ধরনের নির্মম নিরাসক্তির সঙ্গেই তিনি এই ছবিটি এঁকেছেন। "ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ"—কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে এ ধরনের একটা কথা বুদ্ধদেব বসু অনেক আগেই আমাদেরকে শুনিয়েছেন। তবে শুধু কবিতার ক্ষেত্রে নয়, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই পারঙ্গমতা যে তাঁর অনায়াসআয়ত্ত ছিল, 'কল্যাণী' উপন্যাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় তার স্বাক্ষর ছড়ানো আছে। তবে শুধু প্রতিনায়কোচিত একজন মানুষকে নায়কের আসনে বসিয়ে হলুদ রঙে ছোপানো তার সে ছবিটি একটু একটু করে তিনি পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে তোলেন, তার বুঝি কোনো জুড়ি নেই। শব্দের তুলিতে আঁকা জীবনানন্দের সেই অবিস্মরণীয় ছবিটি এরকম :

> বাড়ীতে পৌঁছে কল্যাণী দেখল, দোতলার হলে একটি অদ্ভুত মানুষ বসে রয়েছে, অদ্ভুত ঠিক নয়, অদ্ভুত বলা চলে না, কিন্তু তবুও কল্যাণীর বার বার মনে হতে লাগল কি অদ্ভুত, কি অদ্ভুত এই মানুষটি।
>
> লোকটি বেঁটেও নয়—লম্বাও নয় ; কুঁজো ; মাথার চুল পাৎলা হয়ে সামনের দিকে বেশ বড় টাক পড়ে গেছে ; মুখ হলদে—কেমন চীনেদের মত যেন ; মুখের ছাঁদও একেবারে চীনেদের মত। হঠাৎ দেখে কল্যাণী আঁৎকে উঠল—এমন খারাপ লাগল তার, কিন্তু তবুও ঠিক চীনে নয় যে—বাঙালী যে তা বোঝা যায়। মুখের ওপর পাঁচ ছয়টা আঁচিলের ভিতর থেকে লম্বা লম্বা চুল বেরিয়ে পড়েছে। লোকটা সেগুলো কাটেও না, ছাঁটেও না। একটা স্যুট পরে বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে সে। টাই ধরে নাড়ছিল। সামনে টেবিলের ওপর একখানা খবরের কাগজ মেলা। কল্যাণীকে দেখে খবরের কাগজ থেকে চোখ তুল্লে সে।

আর শিগগীর সে চোখ ফেরাল না।

এমন আবিষ্ট হয়ে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে রইল। কল্যাণী ভয় পেল। লোকটার ওপর কেমন অশ্রদ্ধায় ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠল তার। হলের থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ঘৃণায় ভয়ে ও বিরক্তিতে সেই হল থেকে বেরিয়ে যাবার অল্পক্ষণের মধ্যেই কল্যাণী লোকটাকে ভুলে যায়, কিন্তু পাঠকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না তাকে ভোলা। কেননা এ শুধু রঙ দিয়ে আঁকা কোনো ছবি নয়। এ যেন শক্ত নীরেট পাথরে খোদাই করা এক মূর্তি, বুঝিবা রেনেসাঁ যুগের কোনো ভাস্কর্য—সুন্দরের সর্বনাশ সাধন অথবা নির্বাসন ঘোষণা করাই যার একমাত্র কাজ ও আনন্দ।

কিন্তু কেন আঁকলেন জীবনানন্দ দাশ এমন একজন অকমনীয় ও অসহনীয় মানুষের মুখ? সুন্দরের পাশে অসুন্দরকে স্থাপন করে তিনি কি জীবনের সমগ্রতা সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন? নাকি বিপরীতের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির ভিন্নমাত্রিকতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন? অথবা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এমন একটি চরিত্র—ক্রমপ্রসারমান বিকলাঙ্গ সভ্যতা ও সমাজের যা প্রতীক? হতে পারে সবকিছুই। তবে 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে যেভাবে তিনি শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রের দিকে তাকিয়েছেন, তাতে 'কল্যাণী' উপন্যাসে সামন্ত ও বুর্জোয়া সমাজকে তিনি যদি ক্ষয় ও সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের প্রতীক হিসেবে চিত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন, তবে সে প্রয়াস পরম্পরাযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'কল্যাণী' উপন্যাসের শুরুতেই আমরা মুসলমান ও ক্লাইভ আমলের উল্লেখ পাই। ভারতবর্ষে কুশান রাজত্বে যে সামন্তযুগের গোড়াপত্তন ঘটেছিল, খানিকটা ক্ষয়ের চিহ্ন বুকে নিয়ে মুসলমান আমলে সেই সামন্তবাদী সমাজই অস্তিত্বশীল ছিল। ক্লাইভকে সামনে রেখে যে ইংরেজ আমলের সূচনা হলো, তা ঔপনিবেশিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটালেও সামন্তবাদের অবসান ঘোষণা করল না। বরং তার হাতে হাত রেখেই শুরু হলো তার পথচলা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে কর্নওয়ালিশ তাকে করে তুললেন আরও জোরালো। পঙ্কজবাবু সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই প্রসাদপুষ্ট মধ্যস্বত্বভোগী। তবে বিশের দশকের অনেকগুলো বছরকে পিছে ফেলে এ উপন্যাসের কাহিনী যেখান থেকে শুরু হয়েছে, জমিদারদের স্বর্ণযুগে সেখানে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। শ্রম ও উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্যতা, বেহিসেবী ভোগ-প্রবণতা, নায়েব-গোমস্তাদের ঔদ্ধত্য ও অসাধুতা, শরিকী ভাগ-বাটোয়ারা ও কোন্দল ইত্যাদি কারণে জমিদারি জৌলুস তখন নানাদিক থেকেই ম্রিয়মান। সেই প্রিয় ম্লান অপরাহ্নে দাঁড়িয়ে পঙ্কজবাবুকে তাই সঙ্গত কারণেই বারবার ভাবতে হচ্ছে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডসের' হাতে জমিদারি তুলে দেবার কথা। জমিদারি যে আর খুব বেশিদিন রক্ষা করা সম্ভব হবে না অথবা এই জমিদারি যে তাদের জীবন-জীবিকার সবটুকু দাবি মেটাতে সক্ষম হবে না—তা যেমন পঙ্কজবাবু বুঝেছেন, তেমনি তার সন্তানরাও তা বুঝে ফেলেছে। কিন্তু সমাজের ভাঙন আর নদীর ভাঙন তো অনেকটা একই ধারায় চলে। এক কূল ভাঙনে আরেকটি গড়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে সামন্তবাদী সমাজের পোষ্যপুত্র হিসেবেই জমিদারগোষ্ঠী লালিত-পালিত হয়ে আসছে। সমাজ বিবর্তনের কারণে তারা যদি হয় ক্ষয় ও ভাঙনের শিকার, তাহলে নতুন যুগ ও সমাজের বরপুত্র কারা? কি তাদের পরিচয়! তাদের সৌভাগ্যের উৎসটি কোথায়? তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির বুনিয়াদটিই বা কী? এই সমূহ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই জীবনানন্দ দাশ সৃষ্টি করেছেন এক নব্যতন্ত্রী মানুষকে—নিজেকে যে বাণিজ্য ও শিল্পনির্ভর বুর্জোয়া সমাজের

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। টাটা-বিড়লার নাম সে উচ্চারণ করেছে। নিজেকে তাদের সমগোত্রীয় বলে ঘোষণাও ছড়িয়েছে। কপট বিনয়ের আড়ালে বিত্তের অহংকারে সে নিজেকে আগাগোড়া মুড়ে রাখতে চেয়েছে। শিক্ষার সে বড়াই করেছে, করেছে সংস্কৃতিরই। কিন্তু ক্ষীয় এবং উদীয়মান এই দুই ভিন্ন সমাজব্যবস্থার প্রতিভূদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে জীবনানন্দ দেখিয়েছেন—সামন্ত সূর্যের গায়ে বিদায় বেলার লালিমা ছড়িয়ে পড়লেও কয়েক পুরুষ ধরে অর্জিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক বেগবান ধারা সেখানে নিয়তই প্রবাহমান। সেই স্রোতধারায় অবগাহনের সামর্থ্য যে চন্দ্রমোহনের নেই, পঙ্কজবাবুর পরিবারের সদস্যদের তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু তারপরেও চন্দ্রমোহনের গুরুত্ব সেখানে একটুও কমে না। কারণ বিশাল অঙ্কের অর্থের কথা প্রায়শই সে সকলকে শোনায়। আর তা শোনায় এমন একটা কৃত্রিম লঘু ভঙ্গিতে—যেন নিছক খোলামকুচি ছাড়া টাকাপয়সা তার কাছে আর কিছুই নয়। অথচ এই টাকাপয়সার যোগানটিই পঙ্কজবাবুর পরিবারে ক্রমশ কমে আসছে। অতএব কল্যাণীর প্রেমিক হবার, অথবা তাকে দাবি করবার সবটুকু অধিকার তার আছে—সেটা সে ধরেই নিয়েছিল।

অপরদিকে অবিনাশের অবস্থান এর ঠিক বিপরীত। তার মানস-প্রবণতা এবং চিন্তা-চেতনার ধরনও ভিন্ন। একজন জীবনবাদী শিল্পীর মন মেজাজ দৃষ্টি ও সৃজন নৈপুণ্যকে জন্মগতভাবে আয়ত্ত করে সে এই পৃথিবীতে এসেছিল এবং শিল্পের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিল্পী হওয়া তার হয়নি। এক সময় প্রাতিষ্ঠানিক সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে সে জীবনের পথে চলবার চেষ্টা করেছে। তখন সম্মান প্রতিষ্ঠা, জীবিকা সাধনা প্রতিভা কিংবা সংগ্রাম—কোনোকিছুকেই তার অর্থহীন মনে হয়েছে। এমনকি সাধারণ আনন্দ-আহ্লাদকেও সে একসময় অবজ্ঞা করেছে। তখন তার হৃদয়ের সবগুলো তন্ত্রীতে একটিমাত্র অনুভবের অনুরণন মাদকতার মূর্ছনা জাগিয়েছে—আর তা হলো ভালোবাসা। ভালোবাসা ছাড়া তখন তার জীবনে অন্য কোনো উপাস্য কিংবা লক্ষ্য ছিল না, ছিল না আনন্দ ও পূর্ণতার ভিন্নতর কোনো উৎস। সেই সময় কল্যাণীই তার বুকে জাগিয়ে তুলেছিল ভালোবাসার এই জোয়ার। কিন্তু খুব আকস্মিকভাবেই সেই জোয়ার-জাগা সমুদ্রে ভাটার টান শুরু হয়। আর তা শুরু হয় জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে অর্জিত কিছু পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে। যখন বয়স কম ছিল, এবং উপার্জনের প্রশ্নটি দেখা দেয়নি, তখন অবিনাশ নিজের রোজগারের মধ্যে যে সম্মান ও স্বাধীনতার তৃপ্তি আছে, তাকেও অবজ্ঞা করতে চেয়েছে। উপার্জন সম্পর্কে তার ধারণা তখন অনেকটাই ইউটোপীয় ছিল—এবং তা ছিল জীবন সম্পর্কেও। কিন্তু জীবিকার প্রশ্নটি যখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দিল, তীব্র বেদনার সঙ্গেই সে তখন জীবন-জীবিকার বাস্তব রূপটিকে প্রত্যক্ষ করল। সামান্য কিছু উপার্জনের প্রত্যাশা নিয়ে শালিখবাড়ী ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে জীবনের পথে পথে সে কেবলই হেঁটে বেড়াল। ফিরল দুয়ার থেকে দুয়ারে। কিন্তু জুটল না তেমন কিছুই। যে স্বপ্নময় সজীব প্রত্যাশাগুলো তখন তার চারপাশে ভীড় করেছিল, একে একে তার সবকটিকেই সে বিসর্জন দিতে বাধ্য হলো। অবশিষ্ট রইল মাত্র একটি। আর তা হলো সম্মান ও স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য সামান্য কিছু উপার্জন। কিন্তু এই একান্ত মৌলিক চাওয়াটিকেও সে কোনোভাবে পাওয়ায় রূপান্তরিত করতে পারল না, তাই কলকাতা থেকে আবার তাকে ফিরে আসতে হলো শালিখবাড়ীতে। স্বাধীন উপার্জনের সুখ ও আত্মসম্মানটুকু আয়ত্ত করবার সকল প্রয়াসের ব্যর্থতায় এখন সে তার মায়ের ওপর নির্ভরশীল। এই পরনির্ভরশীলতা তার সারা মনে যে বেদনা ও গ্লানি ছড়িয়ে দিয়েছে, তা ক্রমে ক্রমে তাকে জীবনবিমুখ করে তুলেছে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যায়ে তার ভালোবাসার অনুভবটিও পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে—একদিন যা ছিল বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতোই প্রবল। কল্যাণী তাই আজ তার জীবনে এক দূরকল্পনা কিংবা ধূসর স্মৃতিমাত্র। কিন্তু কল্যাণী তো তাকে জানে আগের মতোই সখা এবং সুবন্ধু। তাই চন্দ্রমোহনের কুশ্রী থাবা যখন কেবলই তার দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গত কারণেই তখন সে স্মরণ করলো অবিনাশকে। এক লক্ষ্মীপূজার অমল-ধবল জোছনা ছড়ানো রাতে সে এসে হাজির হলো অবিনাশের ঘরে। জীবিকার সন্ধানে ব্যর্থ ও পরাজিত অবিনাশের কাছে কল্যাণী তখন এক অসাধারণ রূপবতী জমিদারকন্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। কল্যাণীকে দেখে তাই সে যতটুকু আনন্দিত হয়, তার চেয়ে বেশি হয় বিস্মিত—এবং বেশ খানিকটা বিব্রতও। কেননা অমোচনীয় বেকারত্ব তখন তার হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোর ক্রমাগত পিস্ট করে চলেছে। প্রেমের অনুভব তাই তার হৃদয়তন্ত্রীতে উদ্দীপক রাগ হয়ে বেজে উঠে না। এমনকি প্রেমিকার শরীরী উপস্থিতিও তাকে চঞ্চল কিংবা আবেগবিহ্বল করে তোলে না। এক অপ্রতিরোধ্য ম্রিয়মানতার শিকার তখন সে। তবে তার এই মানসিক শৈত্য কোনো মনোধিকারের ফসল নয়, ব্রিটিশ আমলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পেষণ থেকেই তা সৃষ্ট। ইংরেজরা এদেশের স্বাধীনতা হরণ করে শুধু সিরাজউদ্দৌলার কোষাগার কিংবা অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া ধনসম্পদই লুণ্ঠন করেনি, এদেশের স্বয়ম্ভু কৃষি ও কুটিরশিল্পের বুনিয়াদটিকেও তারা ভেঙ্গে দিয়েছিল। জমিদারের হাতে জমির মালিকানা তুলে দিয়ে যে অলস জনবিচ্ছিন্ন মধ্যসত্ত্বভোগীদের জন্ম দিয়েছিল, এদেশের কৃষকদেরকে সর্বদিক থেকে তারা নিরালম্ব করে ছেড়েছিল। কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা খাজনায় সাময়িকভাবে তাদের আর্থিক মেদবৃদ্ধি ঘটলেও শেষাবধি নিজেদের পতনকেই তারা ঠেকাতে পারেনি—এ উপন্যাসে পঙ্কজবাবু যার উদাহরণ। তবে জমিদারি সূত্রে যে অর্থ তারা আয় করেছিল, তা দিয়ে গ্রামে ও শহরে কিছু দৃষ্টি মনোহর বাড়িঘর তারা তৈরি করেছিল। পাশাপাশি নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল, ফলে গোটা উনিশ শতক এবং বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বলয়ের উপর সবটুকু আধিপত্য বজায় রেখেছিল তারাই। ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে এদেশীয়দের জন্য যে সামান্য সুবিধাটুকু তখন বিদ্যমান ছিল, তাও ছিল তাদেরই মুঠোবন্দি। ফলে অবিনাশের মতো ভাবুক শিল্পী ও তরতাজা প্রাণের অধিকারী তরুণদের আনন্দ ও স্বপ্নহীন পৃথিবীর অধিবাসী হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। প্রশ্ন উঠতে পারে—প্রেম কি সেখানে কোনো উজ্জীবনী মন্ত্র ছড়াতে পারে না? হয়তো পারে। হয়তো পারে না। তা নির্ভর করে জীবনকে লেখক নিজে কিভাবে দেখেছেন এবং তাঁর পাঠককে কিভাবে দেখাতে চান—তারই উপর। জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, একটা দীর্ঘ সময় তাঁকে বেকারত্বের গ্লানি সইতে হয়েছে। চাকরিচ্যুতির বেদনা এবং অপমানকেও মাথা পেতে নিতে হয়েছে। নগর কলকাতা থেকে আবাস গুটিয়ে বরিশালের অভিযাত্রী হতে হয়েছে এবং জীবনের বেশ কটি মূল্যবান বছরকে সেই মাতৃভূমির ধূলিমাটিতেই রেখে আসতে হয়েছে। এই সময় যে চিঠিপত্রগুলো তিনি লিখেছিলেন কলকাতার কিছু বন্ধু ও স্বজনকে—তাতে আনন্দের উচ্ছ্বাস নেই, বেদনার গাঢ়তা আছে। তাহলে কি আমরা ধরে নেব, 'কল্যাণী'-র শালিখবাড়ী আমলে বরিশাল এবং অবিনাশের প্রতিকৃতি গড়ে উঠেছে জীবনানন্দ দাশেরই আত্মপ্রতিকৃতির আদলে? শিল্প ও সাহিত্যের কাছে আমরা যতই নৈর্ব্যক্তিকতা দাবি করি না কেন, রচয়িতার ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও অভিজ্ঞতার আলো-আঁধারিতেই তার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। তাই সাহিত্য-শিল্প এক অর্থে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচয়িতারই জীবনবেদ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একবার তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে যে বহুবিচিত্র চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন। স্বভাবে, বৈশিষ্ট্যে, বিশ্বাসে ও ব্যক্তিত্বে তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে আলাদা। কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে প্রায় প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে মিশে আছে তাদের স্রষ্টা স্বয়ং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই অবিনাশের মধ্যে যদি আমরা জীবনানন্দকে খুঁজবার চেষ্টা করি, সে চেষ্টা হয়তো বিফল নাও হতে পারে। তবে উপন্যাসের নান্দনিক সৌকর্যের আলোচনায় সেই অন্বেষণ মোটেই কোনো অত্যাবশ্যক কিংবা অপরিহার্য বিষয় নয়। তাই অবিনাশ চরিত্রটি জীবনানন্দ দাশের আত্মার অংশভাগ দিয়ে গড়া হলেও 'কল্যাণী'-র পাঠকের কাছে সে উপন্যাসের একটি চরিত্র বৈ অন্য কিছু নয়। নেতিবাদী দর্শন ও বিমর্ষতা ছড়িয়ে কিছুটা সময়ের জন্য পাঠককে সে অবশ্যই আবিষ্ট করে রাখে। তবে উপন্যাসের বিস্তৃত পটে তার পদচারণা ঘটেনি। মাত্র একটি ছোট্ট অধ্যায়ের মধ্যেই তার গতিসীমা আবদ্ধ। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে মুহূর্তেই তাকে একটি নিস্পৃহ, জীবনবিবিক্ত ও নিশ্চেষ্ট চরিত্র বলে মনে হতে পারে। গভীর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত এই চরিত্রটিকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য যতখানি পরিসরের প্রয়োজন ছিল, ঔপন্যাসিক তা কব্জা করেননি। এমনকি কল্যাণীর প্রতি তার উন্মাতাল আবেশের কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয়ও অবিনাশ তার পাঠকের সামনে মেলে ধরতে পারেনি। কল্যাণীর প্রতি তার ভালোবাসার যে পরিচয়টুকু আমরা পাই, তা সবই অতীত বর্ণনার সূত্র ধরে। ফলে অবিনাশের জীবনের যেটুকু উচ্ছলতায় ভরা কিংবা আনন্দে সিক্ত—ঔপন্যাসিক তার ওপর তেমন করে কোনো আলো ফেলতে চলেনি। কিন্তু তাতে অবিনাশের চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলো অস্পষ্টই থেকে গেল। পাঠক তার সম্পর্কে শুনল অনেককিছু, কিন্তু দেখল খুবই কম। পাঠকের সঙ্গে গাঢ় আত্মীয়তা গড়ে তুলতে তাই সে অসমর্থই থেকে গেল। তার বেদনা যেমন কল্যাণীকে ছোঁয় না, তেমনি গভীরভাবে আবিষ্ট করে না পাঠককেও—যদিও বৈরী পরিবেশ এবং বন্ধ্যা অর্থনীতির ক্ষতচিহ্নগুলো তার সর্বাঙ্গে ছড়ানো।

কিন্তু গাঢ় ও গভীর কবিসত্তার অধিকারী একজন ঔপন্যাসিকের হাতে সৃষ্ট কোনো প্রেমিক চরিত্রের সবটুকুই কি অটুট অস্পষ্টতার আবরণে ঢাকা থাকতে পারে? কিংবা পারে কি বোধের শীতলতার কারণে পাঠকের কাছে অনাকর্ষণীয় হয়ে পড়তে? সম্ভবত—না। তাই বিস্তর নেতিবাচকতার মধ্যে দাঁড়িয়েও অবিনাশ শুধু তার উপলব্ধির ইতিবাচকতা দিয়ে আপন সত্তার স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করে তুলতে বেশ খানিকটা সাফল্য অর্জন করে। জীবনানন্দ দাশ কোজাগরী পূর্ণিমার যে আকুল করা জোছনার আবেষ্টনীর মধ্যে অবিনাশ ও কল্যাণীকে মুখোমুখি করেছেন, তাতে জোছনা ঝরেছে কল্যাণীর আশ্চর্য মায়াবী মুখ থেকেও। না—শুধু মুখ থেকে নয়, ঝরেছে কল্যাণীর সমগ্র অবয়ব এবং হৃদয়ের স্ফুট এবং স্ফুটোন্মুখ অনুভূতিগুলো থেকেও। আর্থ-সামাজিক পরাজয়ের বিপন্নতা অবিনাশকে ক্রমশ এক নিষ্ক্রিয় মানুষে পরিণত করলেও তার বোধসমূহকে একেবারে স্থবির করে দিতে পারেনি। বিশেষত তার সৌন্দর্য অনুধ্যানের বোধকে। অবশ্য এ অনুধ্যানও কোনো জোরালো কিংবা বেগবান অনুধ্যান নয়। নদী মরে গেলেও তার ধারাটুকু যে সহজে শুকোয় না—এ যেন তারই প্রতিবিম্ব। অবশ্য এই বিম্বিত অনুভবটুকুই—যা তার সমগ্র বোধের এক বিচূর্ণ অংশ মাত্র—তা অবিনাশের মানব মহিমাকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে। নইলে তার সবটুকুই মলিন হয়ে থাকত নেতিবাচকতার বিবর্ণ স্পর্শে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে তামসিকতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক কৃষ্ণ গহ্বরের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েও আলোর প্রভাব থেকে তাকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে ফেলেনি। অবসাদের বৃত্তেও তাই দেখি উপভোগের বর্ণিল রেখা—যদিও তা বিদ্যুৎপ্রভার মতোই ক্ষণকালিক। 'বনলতা সেন' ক্লান্ত কবিকে বিলিয়েছিল দু'দণ্ডের শান্তি' জগতের সমুদয় মুখ ও আনন্দ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অবিনাশের স্থবিরপ্রায় অনুভূতিতেও কল্যাণী জাগাতে সক্ষম হয়েছিল 'ক্ষণিক মুহূর্তের' সৌন্দর্য উপভোগের অনির্বচনীয় আনন্দ। এই উপভোগ্য আনন্দের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন—"এই জ্যোৎস্নায় এই রূপসীকে—এবং এই রূপসীর এই ক্ষণিক প্রেমকে প্রেমিকের মত না হলেও শিল্পী আয়ুষ্কালের মত উপভোগ করতে লাগল সে ; মনে হল এ উপভোগ প্রেমিকের উপভোগের চেয়েও ঢের প্রবীণ—একটায় মানুষ মানুষের মত আত্মহারা হয়—আর একটায় বিধাতার মত সমাহিত হয়ে থাকে, ঢের প্রবীণ ঢের সুপরিসর এই উপভোগ।" আর এই উপভোগের ক্ষণকালিক চেতনাটুকুই নিষ্ক্রিয় এবং নির্জীবপ্রায় অবিনাশের চরিত্রে প্রাণের দ্যুতি ছড়িয়ে যায়। একরৈখিক চরিত্রের সমুদয় সীমাবদ্ধতা ও যান্ত্রিকতা থেকেও তাকে দিয়ে যায় কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। জীবনানন্দ দাশ যদি এই দৃশ্যটি আঁকতে অনিচ্ছুক থাকতেন, কিংবা হতেন অপারগ—তাহলে উপন্যাসের সমগ্র আয়োজনটিই থাকত জীবনবিমুখ বোধের কাছে বন্দি। সচেতন ভাবেই ঔপন্যাসিক বন্দাত্বই সেই বেড়া ডিঙ্গিয়েছেন।

অবিনাশ যেখানে বন্ধ্যা অর্থনীতির পীড়নে পিষ্ট, বেকারত্বে বিমূঢ় এবং ক্রমশ জীবনবিবাগী—কল্যাণীর মেজদাদা প্রসাদ সেখানে জীবন-জীবিকার ক্রমাগত সাফল্যে এক আত্মতুষ্ট পুরুষ। সামন্ত আভিজাত্য তাকে আত্মাভিমানী করেছে, আর ব্যবহারজীবীর পেশা তাকে করেছে কূটকৌশলী। সে সাফল্য ভালোবাসে, বিত্ত ভালোবাসে, আর ভালোবাসে নিজেকে। নিজের স্বার্থকে সে একটুও জলাঞ্জলি দিতে রাজি নয়। পাছে কল্যাণীর জন্য তাকে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে হয় কিংবা তার কোনো দায়িত্ব বহনে বাধ্য হতে হয়—এই আশঙ্কায় কল্যাণীকে সে চন্দ্রমোহনের থাবার মধ্যে পুরে দেয়। কল্যাণীর বাধা দেবার অথবা বিরুদ্ধাচরণ করবার সমস্ত শক্তিই সে নিপুণ কৌশলে গুঁড়িয়ে দেয়। ভয়, লোভ এবং কৃত্রিম হিতৈষণাকে এক্ষেত্রে সে তার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এবং পুরোপুরি সাফল্য লাভ করে। কোনো ব্যর্থতার সঙ্গেই তার যেন সম্পর্ক নেই—নেই মাঝ পথে থেমে যাওয়া কোনো কর্ম কিংবা অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও। ব্রিটিশ অধিকৃত পরাধীন দেশের যে হতাশামলিন বৃত্তে অবিনাশের বাস—প্রসাদ তার বিপরীত বৃত্তে বিচরণশীল এক ভিন্ন মানুষ। যদিও শালিখবাড়ীর একই আকাশের নিচে এবং একই মৃত্তিকার উপর দাঁড়িয়ে তাদের দু'জনের বেড়ে ওঠা, তবুও তাদের জীবনযাত্রা এবং অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী।

তবে প্রসাদকে নয়, অবিনাশের বিপরীত চরিত্র হিসেবে ঔপন্যাসিক এখানে দাঁড় করিয়েছেন চন্দ্রমোহনকে। চন্দ্রমোহন শালিখবাড়ীর কেউ নয়। অথচ শালিখবাড়ীর সবচেয়ে সুগন্ধী ফুলটিকে সে তার নোংরা লোমশ হাত বাড়িয়ে অবিশ্বাস্য চাতুর্যের সঙ্গে তাকে বৃন্তচ্যুত করে দলিত-মথিত করেছে। প্রতারক, লোভী, ধূর্ত ও কামাতুর পুরুষের সে এক আশ্চর্য নগ্ন প্রতিমূর্তি, তার চরিত্রের কোথাও কোনো স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য, সততা, নমনীয়তা কিংবা আন্তরিকতা নেই। জীবনানন্দ দাশ একবার তাঁর এক কবিতায় লিখেছিলেন—"যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই/পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া"—এই প্রেমপ্রীতিহীন মানুষের যথার্থ প্রতিনিধি করে তিনি এখানে চন্দ্রমোহনকে গড়েছেন। জীবনানন্দ দাশের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'মাল্যবান'-এ আমরা আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক নিষ্ঠুর স্বভাবের নারী চরিত্র দেখেছি। নতুন করে সেই চরিত্রেরই যেন সাক্ষাৎ মিললো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘কল্যাণী’-তে। তবে এখানে আর নারীরূপে নয়, পুরুষ হিসেবে। জীবনানন্দ দাশ একথা মনে রেখেছিলেন যে আমাদের সমাজ-পারিপার্শ্বিকতা বরাবরই প্রতারণা ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নারী অপেক্ষা পুরুষকে অধিক সুযোগ দিয়ে থাকে। চন্দ্রমোহনের প্রতারণা, যৌন লালসা ও পীড়নসুখপিপাসা তাই বিপুল বিস্তারে প্রসারিত হয়ে এই উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক অমঙ্গলবোধের অন্ধকার ছড়াতে থাকে।

এ উপন্যাসের প্রতিটি পুরুষ চরিত্র নানাবিধ দুর্বলতায় ন্যুব্জ, অসঙ্গতিতে ভরা। তাই শুভবোধসম্পন্ন পাঠকদের সম্মোহিত কিংবা পরিতুষ্ট করবার ক্ষমতা থেকেও তারা বঞ্চিত। কিন্তু উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কল্যাণীর অবস্থান এর বিপরীতে। কল্যাণের প্রতীক হয়েই সে যেন দেখা দিয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাস ব্যক্তি মানুষের কথাই বেশি করে বলে। কিন্তু সমাজ-সচেতন লেখকের সৃজন-নৈপুণ্যের কারণে সেই ব্যক্তিচরিত্রগুলোই হয়ে ওঠে দেশকালের প্রতিভূ। কিশোর, প্রসাদ, অবিনাশ, চন্দ্রমোহন এমনকি পঙ্কজবাবুর মধ্য দিয়েও সমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, তা সুন্দরও নয়, কোমলও নয়। আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, প্রতারণা, লোলুপতা, হতাশা, অবক্ষয় ও নিদারুণ অসহমর্মিতা তার সর্বত্র ছড়ানো আছে। কেউ সেখানে প্রাণবান নয়, শরীর-মনের অতুল ঐশ্বর্যে রূপবানও নয়। এই সমূহ নেতির মরুভূমিতে মরূদ্যানের ইশারা ছড়িয়ে গোটা পরিবেশকে এককভাবে সজীব করে তোলে কল্যাণী। সে কি ‘রক্তকরবী’র নন্দিনীর কোনো সহোদরা? না, মোটেই তা নয়। বরং ‘যোগাযোগ’-এর কুমুর সঙ্গে তার খানিকটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। পুরনো সামন্ত আর নব্য বুর্জোয়া ব্যবস্থার ধারক-বাহক দু'টি ভিন্নধর্মী পরিবারকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই উপন্যাসটিতে পরস্পরের কাছাকাছি এনেছিলেন। পরিবার দু'টির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ভিন্ন রুচি, মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সেই আত্মীয়তা অসহ অপমানে জর্জরিত হয়েছিল। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত রুচি ও আভিজাত্যের মধ্যে বড় হয়ে ওঠা কুমুদিনী বর্ধিষ্ণু বণিক পরিবারের স্পর্ধিত বৈভব আর স্থূল রুচির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। ফলে বেদনার বিষে জর্জরিত হয়ে উঠেছে তার সমগ্র জীবন। পড়ন্ত সূর্যের আলো গায়ে মেখে বিলাসের আশঙ্কায় সচকিত হয়ে ওঠা সামন্ত পরিবারে কল্যাণীর জন্ম। বাবার সংসারে আর্থিক বিপর্যয়ের একটি আশঙ্কাকে ঘোরাফেরা করতে দেখলেও দারিদ্র্যের সঙ্গে সেখানে তার কোনো পরিচয় ছিল না। জন্মেই সে দেখেছে পিতার প্রাসাদোপম বাড়ি এবং জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে বিলাসিতার পর্যাপ্ত উপকরণের ছড়াছড়ি। তবে এই বিলাস-বৈভব কোনোভাবেই তাকে উচ্ছৃঙ্খলতা শেখাননি। বরং দিয়েছে রুচি ও সৌন্দর্যবোধের দীক্ষা, সমুন্নত করেছে শুভ ও কল্যাণের বোধকে—এবং আলোকিত করেছে তার অন্তরসত্তাকে। সৌন্দর্যের প্রতিমা হয়েই সে জন্মেছে, এবং বড় হয়ে উঠেছে সেই সৌন্দর্য ও লাবণ্যকে মুঠোবন্দি করেই। আনন্দ এবং মাধুর্যকেও সে তার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলেছে। কলকাতার ছাত্রীবাসে অনায়াসেই সে তাই হয়ে উঠেছে সকলের মধ্যমণি। গোটা শালিখবাড়ীতেও সে অনন্যা। আর তার এই অনন্যতাই প্রচণ্ডভাবে লোভাতুর করে তুলেছে চন্দ্রমোহনকে। চন্দ্রমোহন ধূর্ত এবং হিসেবি। সেই সময়ের সামন্ত পরিবারগুলোর গৌরব ও অহঙ্কার কোথায়,—তা যেমন সে জানত, তেমনই জানত—কোথায় তাদের দুর্বলতা। সামন্ত সমাজের সমুদয় গৌরবকে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে পুঁজিবাদের আশীর্বাদপুষ্ট বুর্জোয়া সমাজ যে ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—চন্দ্রমোহন তা বুঝতে কোনো ভুল করেনি। তাই ক্লাইভের আমল থেকে বংশানুক্রমিকভাবে সামন্ত পরিবারের গৌরব বহন করে আসা রায়চৌধুরী পরিবারে বণিকবৃত্তির পোশাক পরেই সে আবির্ভূত হয় এবং সরাসরি ঢুকে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তঃপুরে। 'যোগাযোগ'-এর মধুসূদন যথার্থ বণিক সভ্যতা ও সম্প্রদায়ের প্রতিভূ ছিলেন। কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না সেখানে। কিন্তু চন্দ্রমোহনের সবটাই ফাঁকি এবং মেকি। রবীন্দ্রনাথ বণিক সভ্যতাকে দেখেছেন স্থূল বৈষয়িকতার বৃত্তে বন্দি। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ বোধহয় দেখেছিলেন আরও নির্মোহ দৃষ্টিতে। তাই তার সর্বত্র তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন অন্তঃসারশূন্যতা, আত্মস্বার্থপরতা, প্রতারণা ও অমিত ভোগাকাঙ্ক্ষা। এই চারটি বৈশিষ্ট্যকে আপন চরিত্রে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেই তাঁর চন্দ্রমোহন তাই এখানে বণিক ও বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

ব্যক্তি যখন তার আপন ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করবার বদলে কোনো শ্রেণী কিংবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে, তখন এক ধরনের যান্ত্রিকতা তাকে পেয়ে বসে। নিজের মতো করে বেড়ে না উঠে একটা ছাঁচে ঢালাই হয়ে তার গড়ে ওঠার আশঙ্কা জাগে। 'কল্যাণী' উপন্যাসের চন্দ্রমোহনের ক্ষেত্রেও তার খুব একটা ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই অজস্র নেতির ভারে সে নুয়ে পড়েছে। মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে প্রতারণা আর লালসার। তবে প্রতিভূ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যাবলীকে সে যতখানি যত্নের সঙ্গে আয়ত্ত করতে পেরেছে, ততখানি পারেনি রক্তমাংস কিংবা দোষগুণের সহজ সমন্বয়ে সজীব হয়ে উঠতে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে মানুষ বহু অনাচার এবং পাপ করে। কিন্তু তারপরেও মানুষ নরকের কীট নয়, সে মানুষই। কোথাও না কোথাও তার মনুষ্যত্ব কিংবা মানষিকতার প্রভা ঝলসে উঠবেই—তা সে যত সামান্য পরিমাণেই হোক না কেন, মানুষ তাই ঈশ্বরের করুণা থেকে সহজে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু চন্দ্রমোহন কি তার স্রষ্টার কাছ থেকে কোনো করুণার স্পর্শ পেয়েছে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, না—একটুও না। কিন্তু কল্যাণীর প্রেম ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে যখন আমরা দেখি চন্দ্রমোহনকে, তখন তার প্রতি বর্ষিত তার স্রষ্টার অপার করুণার ধারা আমাদেরকে বিস্ময়বিহ্বল করে ফেলে এবং আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকে না কতগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে। মনে প্রশ্ন জাগে এটা কি সত্যিই করুণা? নাকি নিছক নাটকীয়তা? অথবা নির্ভেজাল সহজ-স্বাভাবিকতা? এবং জীবনানন্দ দাশ—তাঁর পাঠকের সত্তার গভীরে এই জিজ্ঞাসাসমূহকে জাগ্রত করেই নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন একজন মননশীল ঔপন্যাসিকের আসনে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যিনি একই সঙ্গে কবিতা ও উপন্যাস দু'টোই লিখছেন, তাঁর উপন্যাসের মধ্যে কবিতার একটি স্নিগ্ধ আমেজ ছড়িয়ে থাকে। কখনো বর্ণনার ভাষাভঙ্গির মধ্য থেকে, এই কাব্যিক স্নিগ্ধতা উঁকি মারে। কখনো সংলাপের মধ্য থেকে আবার কখনো বা চরিত্রের অনুভব ও ব্যক্তিত্বের মধ্য থেকেও নানা বিভঙ্গে এই কাব্যিক ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়ে। জীবনানন্দ দাশ সেই কবি—যিনি সকল কবিতা-লেখককে কবি বলে মানতে নারাজ। "সকলেই কবি নয়—কেউ কেউ কবি"—তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত এই বাণীটিকে তো প্রিয় প্রবাদ বাক্যের মতো করে সাহিত্যপ্রেমীরা মুখস্থ করে রেখেছে। অতএব এই বিরল প্রতিভাধর কবির কলম থেকে যে উপন্যাস লেখা হবে—তাতে বহুদূর পর্যন্ত বিছানো থাকবে কবিতার নরম গালিচা, পাঠকের পক্ষে এই প্রত্যাশা লালন করা অবশ্যই কোনো অনুচিত কর্ম নয়। কিন্তু পাঠকের এই প্রত্যাশা যেমন পূরণ হয়নি তাঁর পূর্ব প্রকাশিত 'মাল্যবান' ও 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে, তেমনি তা অপূর্ণ থাকে 'কল্যাণী'-তে এসেও। যদিও 'কল্যাণী' উপন্যাসের শুরুতে শালিখবাড়ীর প্রকৃতি-পরিবেশের যে বর্ণনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে, কাব্যিক ছটার খানিকটা স্নিগ্ধ আভার পরিচয় সেখানে সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু ঐ একবারই। জীবনানন্দ দাশ অত্যন্ত সচেতনভাবেই তাঁর উপন্যাসকে কবিতার পরিধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। তাই বুদ্ধদেব বসু কিংবা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সমসাময়িক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সমগোত্রীয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের মতো করে উপন্যাস লেখেননি। কিংবা লেখেননি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ বয়সের লেখা উপন্যাসগুলোর মতো অজস্র চাকচিক্যময় ও সুকথার ফুলঝুড়ি সাজিয়ে। কবিতার জন্য আদরণীয় কোমল ও ব্যঞ্জনাময় শব্দের সন্ধানও তিনি এখানে করেননি। বরং রুক্ষ-কঠোর বাস্তবের প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে এমন কিছু শব্দের অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন যা পাঠকসত্তায় বেশ খানিকটা ঝাঁকুনীর সৃষ্টি করে, এবং করে খানিকটা বিব্রতবোধেরও। যেমন, অনায়াসেই তিনি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন 'গুখখুরি' শব্দটি। প্রসাদের মুখে বসিয়েছেন—"আমার বউ তখন তোমার ঘাড়ে হাগবে"-র মতো সংলাপ। এইসব শব্দ ও শব্দবেষ্টিত সংলাপ যে পরিবেশ ও প্রতিক্রিয়াকে অমোঘ করে তোলে, কবিতার শুভ্রতা, কিংবা পেলবতার সেখানে কোনো স্থান নেই। আমাদের দৃষ্টি ও অনুভবের চতুস্পার্শে তখন শুধু এক নিখাদ বাস্তবতা তার রাজ্যপাট গড়ে তুলতে থাকে। তবে সেই সঙ্গে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে। বাস্তবতার প্রতিচিত্র আঁকবার জন্য বাংলা ভাষার শালীন শব্দের ভাঁড়ার কি এতই অপর্যাপ্ত যে পাঠকরুচিকে পীড়িত করার মতো শব্দের দিকে হাত না বাড়িয়ে উপায় নেই? শোনা যায় কবিতায় অশালীন শব্দ ব্যবহারের দায় মেটাতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ তাঁর সিটি কলেজের চাকরিটি খুইয়েছিলেন। অকাঁড়া বাস্তবতা উপস্থাপনের নামে তিরিশের কবি ও গদ্যকাররা যা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা কোনোমতেই মেনে নিতে পারেননি। বাংলা সাহিত্যের পাঠকরাও তা গ্রহণ করেনি। ফলে শালীনবোধ ও রুচির প্রশ্নটি বাস্তবতার ক্লেদাক্ত অংকুশে বিদ্ধ হতে গিয়েও রক্ষা পেয়েছিল—এবং তার ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। জীবনানন্দ দাশ কি তাহলে বাস্তবতার রূঢ়, ক্লিন্ন ও দুর্গন্ধময় পরিচয়টিকেই জোরের সঙ্গে উপন্যাসে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন—যেমন চেয়েছিলেন তিরিশের অতিবাস্তববাদী কিছু লেখক? 'কল্যাণী' উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যায়—বাস্তবতা অবশ্যই তাঁর আরাধ্য ছিল। তবে তিনি শুধু বাস্তবতার বহিরাবরণকে ছুঁতে চাননি, চেয়েছেন তার অন্তরাশ্রিত রূপের কদর্যতাকে প্রস্ফুট করে তুলতে। চন্দ্রমোহনের বাহ্যিক অবয়বকে তিনি কদর্য করে এঁকেছেন। সেই কদর্য রূপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে উপন্যাসের শুরুতেই। কিন্তু যখন পৌঁছা যায় উপন্যাসের উপসংহারে, তখন এই প্রতীতিটিই গাঢ় হয় যে, চন্দ্রমোহনের শারীরিক কুশ্রিতা হার মানে তার অন্তরের কুশ্রিতার কাছে। প্রসাদের পারিবারিক দায়িত্ব পালনের দৃশ্যমান ভূমিকা ম্লান হয়ে যায় তার অন্তরের কুটির স্বার্থবোধের স্পর্শে। 'কল্যাণী' উপন্যাসের বাস্তবতা তাই যতখানি বহিঃপ্রকৃতি-নির্ভর, তার চেয়ে অনেক বেশি মনের হৃদয়ের গহন ও গোপন বৃত্ত-আশ্রয়ী। কবিতার পেলবতা কিংবা সুষমা সেখানে নেই। জীবনানন্দ এখানে বহির্বাস্তবের সিড়িগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়েই পৌঁছে গেছেন অন্তর-বাস্তবের প্রহেলিকাময় প্রান্তরে। লোভ আর বিকারকে সেখানে দেখেছেন ক্রমপ্রসারিত হতে। আর এই প্রসারণের চিত্রকেই তিনি প্রমূর্ত করে তুলেছেন কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। কবিতার আমেজ এবং কাব্যিক আবহ থেকে তাই তিনি তাঁর এই উপন্যাসটিকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন। কোনো কোনো দৃশ্যে সৃষ্টি হয়েছে বীভৎস এবং অদ্ভুত রসের। কিন্তু পরিণতিপর্বে প্রসার ঘটেছে শান্ত রসের। ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশ এখানে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে রেখেছেন কবি জীবনানন্দ দাশকে।

তবে জীবনানন্দ দাশ তাঁর উপন্যাসকে কবিতার নিকটাত্মীয় করে না তুললেও, নাটকীয় অভিঘাত থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। বরং অন্তিমপর্বে এসে সৃষ্টি করেছেন তীব্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাটকীয় ব্যঞ্জনা। উপন্যাসের প্রথম ও মধ্য পর্বে আমরা দেখি চন্দ্রমোহনের প্রতি কল্যাণীর প্রবল বিরাগ, ভীতি ও ঘৃণা। চন্দ্রমোহনের প্রসারিত থাবা যেন কিছুতেই তার নাগাল পেতে না পারে, তার জন্য সবকিছুই সে করেছে। বাবা-মার মুখের ওপর তীব্র ভাষায় অসম্মতি ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। চোখের জলে ভেসেছে। উপযাচিকা হয়ে অবিনাশের কাছে গেছে। প্রসাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে। চন্দ্রমোহনের পায়ের শব্দে মূর্ছাবৎ শীতলতায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু উপন্যাসের শেষাংশে এসে দেখা যায়, সেই চন্দ্রমোহনের সপক্ষেই কল্যাণী তার বাবা-মার কাছে নানান যুক্তিজাল বিস্তার করে চিঠি লিখছে। অথচ চন্দ্রমোহনের প্রতারক পরিচয়টি তখন আরও বেশি প্রকট। চন্দ্রমোহনের বাইরের অথবা ভেতরের কোনো পরিচয়েই কোনো শ্রী নেই, নেই সততা, কিংবা আন্তরিকতা। নিবিড় প্রশান্তির সঙ্গে সেই চন্দ্রমোহনকেই মেনে নিয়ে কল্যাণী তার সঙ্গে ঘরকন্না করবে—উপন্যাসের মধ্যপর্বে এসেও পাঠকমনে এই প্রতীতি কিছুতেই দানা বাঁধতে পারে না। কিন্তু উপন্যাসের অন্তিমপর্বে এসে জীবনানন্দ সেটিকেই বাস্তব করে তোলেন। আর তা করেন কোনোরকম পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি না করেই। ফলে সৃষ্টি হয় আকস্মিকতার। আর এই আকস্মিকতায় উছলে ওঠে নাটকীয় চমক। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এসে একটা বড় রকমের নাটকীয় আবর্তের মুখোমুখি হই আমরা। জীবনানন্দ দাশ সম্ভবত সচেতনভাবেই এই নাটকীয় আবর্ত সৃষ্টি করেছেন—তীব্র গতিতে কাহিনীর বাঁক ফেরানোর জন্য। তাতে আমাদের বিস্ময়বোধে বেশ জোরেসোরেই নাড়া লাগে। অনুভূতির শান্ত সমুদ্রে জাগে তরঙ্গের পর তরঙ্গ। কিন্তু সেই সঙ্গে জাগে কতকগুলো প্রশ্নও। উপন্যাসের জন্য নাটকীয় চমক কি অপরিহার্য? আকস্মিকতা কি আদৌ সেখানে কোনো বড় ধরনের গুণ? কল্যাণীর অনুভব ও আচরণের এই মেরুবদল কতখানি যুক্তিসিদ্ধ? সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রতিমারূপে যে চরিত্র নিজেকে বিকশিত করে, মূর্তিমান অসুন্দরের কাছে সে কেন আত্মসমর্পণ করবে? নাকি সুন্দর আর অসুন্দরের পাশাপাশি অবস্থানই প্রকৃত বাস্তবতা? উপন্যাসতাত্ত্বিকেরা এসব প্রশ্নের পক্ষে বিপক্ষে হয়তো নানান যুক্তি প্রদর্শন করতে পারবেন। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠাগুলোতে এসে কল্যাণীর জন্য অনুভূতিশীল পাঠকের হৃদয়ে যে বেদনা জেগে উঠবে—কোনো তত্ত্ব বা যুক্তি দিয়েই তার নিরসন করা যাবে না। আর সম্ভবত এখানেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা—তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের জয়-জয়ন্তী। জীবনানন্দ দাশ নেই। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট কল্যাণী আছে এবং থাকবে অনেকদিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজে তারে মরো মিছে : রূপসী বাংলা

শিল্পী : আবুল বার্ক আলভী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

...জাগে এক অ[illegible] পাখি ; [পেঁচা] শিল্পী : হাসি চক্রবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও--[রূপসী বাংলা]　　　　শিল্পী : মনসুর উল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল--লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

শিল্পী : আবুল মনসুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো--ধীরে--পউষের রাতে--
কোনদিন জাগবো না জেনে--কোনদিন জাগবো না আমি--কোনোদিন আর। [অন্ধকার]

শিল্পী : কে. এম. এ. কাইয়ুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে ঘুরিয়াছি; [বোধ] শিল্পী : ফরিদা জামান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ঘাসের শরীর...ঘাসের পাখনাই আমার পালক, [ঘাস]   শিল্পী : শওকাতুজ্জামান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সব পাখি

শিল্পী : মোহাম্মদ ইউনুস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী; [গোধূলিসন্ধির নৃত্য]

শিল্পী : জামাল আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পী : মামুন কায়সার

জানে সে যে বহুদিন আগে আমি করেছি কি ভুল
পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালবেসে,
পউষের শেষরাতে আজো আমি দেখি চেয়ে আবার সে আমাদের দেশে
ফিরে এলো; রং তার কেমন তা জানে ওই টসটসে ভিজে জামরুল,
[এইসব ভালো লাগে : রূপসী বাংলা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে [রূপসী বাংলা] শিল্পী : নাসরীন বেগম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহর নির্জন হয়ে পড়ে। . . . .
পাখিদের তখন পৃথিবীতে নামবার সময় [এইসব পাখি]

শিল্পী : মোহাম্মদ নজিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পী : ঢালী আল মামুন

আকাশে বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মত মুছে গিয়েছে কাল। [হাওয়ার রাত]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনান্তিকে : সাতটি তারার তিমির

শিল্পী : নিসার হোসেন

মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জেগেছিল অঘ্রানের রাতে--এই পাখি!

শিল্পী : অশোক কর্মকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব--[বুনোহাঁস]

শিল্পী : ধ্রুব এষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের কবিতা : ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ

খালেদ হোসাইন

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে আবহমান বাঙালি-সংস্কৃতির যে রূপ আমরা লক্ষ করি, তার মধ্যে একটা স্নিগ্ধ-সৌন্দর্যের অবধারিত অবলেপন পরিদৃষ্ট হয়। জীবনানন্দ দাশ এর প্রথম এবং একক আবিষ্কর্তা হয়তো নন, কিন্তু তিনিই এর সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার। অন্তরের প্রগাঢ় উপলব্ধি এবং তার সঙ্গে চিন্তা ও মনস্বিতার অবিচ্ছেদ্যতায় এই সৌন্দর্য বাঙ্ময় হয়েছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। বাঙলা ভূখণ্ডের প্রকৃতির সবুজ সুষমা, ইতিহাসের ধুমল-ধূসর অধ্যায়, রূপকথার মায়াবীলোক, পৌরাণিক অনুষঙ্গ, লোকজীবনের প্রাত্যহিকতার মহিমা, অতীতের কীর্তিমান পুরুষ প্রভৃতি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বিভিন্নভাবে সমাহৃত হয়েছে, বিচ্ছিন্ন বা অবিচ্ছিন্নভাবে, কখনো মিশ্র মাধ্যমের চিত্রকর্মের মতো, কখনো জলরঙের কোমল স্নিগ্ধতায়—সর্বত্রই তা পরিশীলিত পাঠকচিত্তে প্রত্যাশিত অভিঘাত সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। শুধু তাঁর প্রাতিস্বিক ঐতিহ্যচেতনা বা উপলব্ধির প্রগাঢ়তাই এর কারণ নয়, এসব বিষয়কে যুগোপযোগী কাব্য ভাষায় (Poetic Diction) বিধৃত করতে পেরেছেন বলেই, এ সিদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। আধুনিক কবির নিকট অবশ্যই মানুষ লাগামহীন কল্পনার ভাবালুতায় নির্মিত গোলাপী জগৎ প্রত্যাশা করে না, তার প্রত্যাশা ব্যাপক ও বিচিত্র এবং অনেক ক্ষেত্রে অনির্ণিত। তবে, আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মোপলব্ধির প্রতিচ্ছায়ার প্রাপ্যতা তার আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত। পাঠক বুঝতে চায় তার সমকালীন সামাজিক বাতাবরণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর অস্তিত্বের রহস্যময়তা পার্থিব প্রবৃত্তির পর্যাবৃত্ত, বিশ্বরাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত, এর উদ্দেশ্য ; এর মধ্য থেকে উপার্জন করতে চায় জীবনচর্যায় অনুপ্রাণিত করতে পারে এমন রস ও রসদ। কবি ত্রিকালজ্ঞ পৌরাণিক ঋষি নিশ্চয় নন, কিন্তু তিনি জ্ঞানী ; পাঠক-ভাবনায় একজন কবি প্রাজ্ঞ হিসেবেই বিবেচিত হন। ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক রহস্য উন্মোচনের জন্য—অন্তহীন আনন্দের অভীপ্সায় পাঠক কবির দ্বারস্থ হন। অন্তত, জীবনানন্দ দাশের কাব্য-পাঠকদের প্রত্যাশা এরকম। পাঠকচিত্তের এ প্রত্যাশারও নির্মাতা কবি স্বয়ং।

বর্তমান কালের প্রকৃত বাস্তবতা এবং অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বীজ উপ্ত থাকে অতীতের ক্রিয়াকান্ড ও ঘটনা-পরম্পরায়। যে-কোনো মহৎ কবির মধ্যেই তাই ঐতিহ্য-উপলব্ধির তীব্র আকুলতা লক্ষ করা যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পৃথিবী নামক গ্রহে প্রতিটি বস্তু ও প্রাণী মিলে যে-ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তার মর্ম অনুধাবনের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন ক্ষুদ্র পরিসরে পরিপার্শ্বগত ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করা। জিজ্ঞাসার অভ্যুদয় প্রথমত নিজেকে কেন্দ্র ক'রে এবং তার পরে তা ক্রমশ ব্যাপৃত হয় বিপুলতায়। জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভারেও আমরা এই প্রবণতা লক্ষ করি। নিজস্ব জৈবিক ও মানসিক অস্তিত্বকে বিজড়িত ক'রে আছে যে ভূ-খন্ড, তার প্রকৃতি, মানুষ প্রভৃতির সমবায়—তাকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্যন্তিক আন্তরিকতায়। আর এ কারণেই, তাঁর কাব্যে বাঙালি ঐতিহ্য বিশিষ্ট অবয়ব লাভ করেছে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য উপাত্ত বা তত্ত্বের আকারে নয়, কাব্যিক সুষমায় মণ্ডিত হয়ে। পরিশীলিত পাঠকের পরিস্রুত চিত্তে তা সঞ্চারিত হয়েছে কাঙ্ক্ষিত মর্যাদায়। জীবনানন্দ দাশের অনন্যতা এখানেই।

কবির কাজ কেবল সুললিত শব্দের সুখশ্রাব্য শব্দসজ্জা নয়, আভিধানিক শব্দকে অর্থ-সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়া এবং তার মধ্যে অন্যতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি তাঁর অন্বিষ্ট। আরাধ্য এ দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয় আত্মনির্মিতির, যে প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে সার্বক্ষণিক ও অনিঃশেষ। কারণ, কবি যেহেতু যে-কোনো মানুষের মতোই সমাজস্থিত একজন, তাই তাঁর জীবন-সংলগ্ন কাল-পরিসরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা উক্ত ব্যক্তির কাব্য-চৈতন্য নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তবে সংঘটিত অভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন ব্যক্তিকে সমভাবে আলোড়িত কিংবা প্রভাবিত করে না। কে কতোটা আলোড়িত হবে, তা নির্ভর করে ব্যক্তিস্বভাবের ওপর, যার কিছুটা বংশানুক্রমিক জৈবিক উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত, কিছুটা একান্তই ব্যক্তিস্বভাবে প্রায় অবিশ্লেষ্য রহস্যময়তায় আচ্ছাদিত, আর বাকিটা তারা বহিঃস্থ সামাজিক ঘটনাসমূহে সাড়া দেওয়ার অর্জিত সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। এ-কারণেই সমকালীন সামাজিক মানুষ থেকে যে-কোনো শিল্পী স্বতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত হন, কারণ, গড়-পড়তা মানুষের চেয়ে তাঁদের চিত্তের সংবেদনশীলতা বেশি এবং এই সুবেদী চিত্তের আলোড়নকে তাঁরা অভিব্যক্তি দান করতে পারেন। কিন্তু এ-কথাও সত্য, শিল্পী, কিংবা আরো নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায়, কবিদের সকলের মনের গড়ন কিংবা মানসিক বিকাশ একই রকম নয়—(শিল্প সাহিত্য সমাজ : সত্যেন্দ্রনাথ রায়)। একই ঘটনা রুচি, মেধা, বোধ, শিক্ষা, জ্ঞান, চিন্তাশীলতার পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন কবির নিকট বিভিন্ন স্তরের মর্যাদা লাভ করে। এর মধ্য থেকেই কবির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়, নির্ণিত হয় তার উৎকর্ষ-অপকর্ষের মাত্রা। প্রসঙ্গত, আমাদের মনে পড়ে জীবনানন্দ দাশের উক্তি :

> সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি ; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নবনব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না ; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয় ; নানা রকম চরাচরের সংস্পর্শে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করার অবকাশ পায়।
>
> (কবিতার কথা : জীবনানন্দ দাশ)

জীবনানন্দ দাশের হৃদয়ে 'কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা' ছিল বলে তাঁর ঐতিহ্যিক অনুসন্ধিৎসা তথা তাঁর কাব্যে আবহমান বাঙলা ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্থান জীবনানন্দ দাশের কাব্যবোধিগত সমুন্নতির পরিচয়বহ—এ-কথা নিঃসংশয়ে ব্যক্ত করা যায় বলে আমরা মনে করি। মহৎ কবি মাত্রই স্বীয় ঐতিহ্যের সম্প্রসারণ এবং তার সফল রূপকার। "যে সময়ে সে বাস করছে, এবং যে সময়ে বাস করেনি, যে সমাজে সে কাল কাটাচ্ছে, এবং যেখানে কাটায়নি যে ঐতিহ্যে সে আছে, এবং যেখানে সে নেই—এই সকলের কাছেই সে ঋণী।" (ঐ) সন্দেহ নেই, মহৎ কবির এ সাধারণ অধমর্ণতা অসাধারণ ও মাহাত্ম্যখচিত।

২

ঐতিহ্য-বিবিক্ত মহৎ কবির অস্তিত্ব অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে ঐতিহ্য-সচেতনতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সাহিত্য-ইতিহাসপ্রণেতাদের বিবেচনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক কালের যে সীমানা নির্ধারিত হয়েছে, সেই কাল-পরিসরের যে-কোনো বিশিষ্ট কবির ক্ষেত্রে আমরা এই ঐতিহ্যানুরাগ বিশেষভাবে লক্ষ করি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রধান কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) কাব্যসৃষ্টিতেই কেবল নয়, অতীত কালের বিস্মৃতপ্রায় কবিদের জীবন ও সৃষ্টিকর্ম সংরক্ষণের আন্তরিক ও আত্যন্তিক প্রয়াসে এর যে-পরিচয় পাওয়া যায়, সময়ের বিচারে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। বাংলা কাব্যের মুক্তির সাধনায় বিশ্বাভিসারিতায় চঞ্চল মধুসূদনও কখনো ঐতিহ্য-বিবিক্ত নন ; আঙ্গিক-অন্বেষণে পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সাহিত্যস্রষ্টাদের দ্বারস্থ হলেও বিষয়ানুসন্ধানে তিনি বরাবর দেশজ তথা ভারতীয় ঐতিহ্যাভিমুখী। বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) সারদা-সাধনা প্রাচ্য কাব্যভাবনার অনুবর্তী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অতুলনীয় কাব্যচৈতন্য নির্মিত হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যকে আত্তীকৃত ক'রেই। বাংলার-মতো আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যকৃতিকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ দেশজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সারাৎসারকে তাঁর কাব্যে সার্থকভাবে ধারণ করতে পেরেছিলেন বলেই। এ-কারণেই তাঁর অন্তর্গত উপলব্ধি ঐতিহ্যিক প্রাসঙ্গিকতায় উচ্চারিত হয় এভাবে :

> গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন-অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে ; তাহা বিশেষরূপে সঙ্কীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে-অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকাটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটা যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল-ফল ডালপালার সঙ্গে মাটির নীচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য এবং সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নয়। (লোকসাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল-কলকাতার নাগরিক ও অভিজাত পরিবেশে। তা-সত্ত্বেও তিনি বহুমাত্রিক জীবনাভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ পরিণত বয়সে দেশজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদান অনুষঙ্গ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্রতী হয়েছিলেন। আর জীবনানন্দ দাশ বেড়ে উঠেছিলেন দক্ষিণ বাংলার নাবাল ভূমি, এককালের চন্দ্রদ্বীপ বরিশালে। বরিশাল কেবল বাংলাদেশের শস্য-ভাণ্ডার নয়, লোকজসাহিত্য সমৃদ্ধ অঞ্চলও বটে। স্বভাবতই জীবনানন্দ দাশ লোকজসাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অর্জন করেছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাগ্রসরতা, পারিবারিক সারস্বত-সাধনার পরিবেশ তাঁর রুচি ও সাহিত্যবোধকে হয়তো পরিশীলিত ও পরিস্রুত করেছে কিন্তু মনসামঙ্গলের ভূমিখণ্ডের নিজস্ব বাতাবরণ তাকে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত ও প্রণোদিত করেছিল। তাঁর মগ্নচৈতন্যে উপ্ত হয়েছিল লোকজসাহিত্যের বৈচিত্র্যভাস্বর বিশ্বের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের সম্ভাবনাময় বীজ।

ঐতিহ্য-সম্পর্কিত প্রচলিত চিন্তায়, অন্তত সাহিত্যিক বিবেচনায়, প্রথম প্রবল আঘাত করেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সমালোচক টি. এস. এলিয়ট। তিনি বলেন, "[Tradition] cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour." কারণ, ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপাদানে আধুনিকতার মর্মবস্তু সঞ্চারিত করতে না পারলে তা পরিণত হতে পারে স্থূল ও অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তিতে। আমরা জানি, রবীন্দ্রোত্তর কাব্যস্রষ্টারা কমবেশি সকলেই এলিয়টের কাব্য-চৈতন্য ও কাব্য-চিন্তায় আকৃষ্ট ছিলেন। বিষ্ণু দে সচেতনভাবে এলিয়টের কাব্য-অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের ঐতিহ্য–ভাবনায় এলিয়টের প্রভাব থাকলেও আধিপত্য ছিল না। এলিয়ট ও জীবনানন্দের ঐতিহ্য–ভাবনার স্বাতন্ত্র্য নির্ণিত হয় সমালোচকের এমন মন্তব্যে :

> তিনি [জীবনানন্দ] এলিয়টের মত পৌরাণিকতাকে আধুনিকতার পাশে রেখে কবিতার আবেদনকে অযথা ভারাক্রান্ত করেননি, শুধু আপন অস্তিত্বকে অতীতের মানুষ-মানুষীদের অস্তিত্বের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন, আবার কখনো কোন সুদূর স্থানে নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন-- প্রত্যক্ষকে প্রচ্ছন্নের সাথে, বর্তমানকে অতীতের সাথে লীন করে দিতে চেয়েছেন, আর সৃষ্টি করেছেন পলিমাটি ভরা এক উজ্জ্বল সংযোগ-ভূমি।
>
> (জীবনানন্দ দাশ।। একটি ভূমিকা : আবদুল হাফিজ)

সার্বিক অনুভূতি রূপায়ণে এবং বিশ্বজনীন চেতনায় সাজুয্য থাকলেও “জীবনানন্দের কাব্যিক প্রেরণা মূলত বঙ্গজ (বা বাংলাদেশীয়), বাংলার নদী–মাতৃক শ্যামলিমা ও কোমল মাটির রূপ, রস, গন্ধ ও বেদনাবিধুর ম্লান আকাশের নিচে প্রকৃতি ও মানুষের যে যন্ত্রণামুগ্ধ সাহচর্য ও সহাবস্থান তাকে রূপকথার নির্লিপ্ততায় সম্মোহিত ক’রে রেখেছে, তার কাছেই কবির সহজাত প্রত্যাবর্তন, এবং সেখানেই তার চেতনার উন্মেষ–সাধন ঘটেছে।”

ঐতিহ্য–অন্বেষায় এলিয়টের চেয়ে জীবনানন্দের চিন্তার সাজুয্য অধিক লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটসের সঙ্গে। ইয়েটস যেমন বলেন :

> All sounds, all colours, all forms, either because of their pre-ordained energies or because of long associations, evoke in definable and yet pecise emotions or as I prefer to think, call down among us caertain disembodied to think, call down among us certain lisenodied powers, whorse foot-steps over our hearts we call emotions.

জীবনানন্দ দাশও তেমনই বলেন :

> সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়—কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল, এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে, আরো অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত, কোথাও যেন রয়ে যাবে ; এইসবের অপরূপ উদ্‌গীরণের ভিতর এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়, নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমননি বস্তু–সঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতরে...।

জীবনানন্দ দাশের বিবেচনায়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ঐতিহ্যকে অঙ্গীকৃত করতে না পারলে সত্যিকার অর্থে কবিই হওয়া যায় না। কারণ কল্পনাপ্রতিভাহীনতার কারণে তাদের ‘চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা’ থাকে না এবং ‘অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য–বিকীরণ তাদের সাহায্য’ করে না। তিনি মনে করেন, একজন কবি উত্তমর্ণ হয়ে উঠেন মূলত ঐতিহ্য থেকে গৃহীত ঋণকে সামর্থ্যসম্পন্ন সৃষ্টিশীলতার গুণে তাকে সম্বর্ধিত ও সমৃদ্ধ ক’রে। এবং এ কারণেই ঐতিহ্য থেকে গৃহীত উপাদান–উপকরণ বা ভাবানুষঙ্গ ‘ঋণও নয়, বরং উপায়।’

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ঐতিহ্যের যে গভীর ও মর্মস্পর্শী রূপায়ণ শিল্পিত অবয়বে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনের জন্যই এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব চিন্তার পরিচয় লাভ করা দরকার। কারণ সমালোচকদের প্রতি তাঁর বিরক্তি ও বিরূপতা কেবল ‘সমারূঢ়’ কবিতাতেই ঘোষিত হয়নি, তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধেও সমালোচকের দায়িত্ব, কর্তব্য, অভীষ্ট ও যোগ্যতা আলোচনার সূত্রে অভিন্ন মনোভঙ্গি অভিব্যক্ত হয়েছে। এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, "কবিতা সম্পর্কে বড়, সত্যার্থী আলোচনা কবিদেরই করা উচিত—সৎ কবিদেরই নিজেদের অনুভূতি ও চিন্তার কবিতাত্মক প্রয়োগ থেকে তাদের খুলে নিয়ে অন্য প্রয়োগে কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় মাঝে মাঝে নিয়োজিত করা দরকার"—(কবিতার আলোচনা : জীবনানন্দ দাশ)।

জীবনানন্দ দাশ কাব্যানুধাবনের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের চেয়ে জ্ঞানকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এ-কারণেই জীবনানন্দ দাশের কাব্যচৈতন্যের অনুষঙ্গী হিসেবে তাঁর প্রবন্ধসমূহ তাঁর কাব্য-অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। 'কবিতার কথা'র বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি ঐতিহ্য সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাতে তাঁর শিল্পচৈতন্যের প্রাতিস্বিকতা ভাস্বর হয়ে উঠেছে। যে জীবনানন্দ দাশ জানান, "মহাবিশ্বের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো", তিনিই এ প্রতীতি পোষণ করেন যে, "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতা-অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কাল জ্ঞান।" আর এ জন্যই তিনি মনে করেন,

> নিজের দেশের কবিতার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের ভিতর স্থিত হয়েও আজকের মুখ্য কবি পৃথিবীর, বিশেষত পশ্চিমের, শ্রেষ্ঠ কাব্য উপলব্ধি করতে পেরে বাংলা কবিতাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করাতে পেরেছেন যে তার ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রশ্ন বৈষ্ণব পদাবলী মঙ্গলকাব্য পূর্ববঙ্গ গীতিকা বা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সত্যের ভেতরেই শুধু আটকে নেই—কিন্তু যেখানেই মানুষ তাঁর স্বতন্ত্র আধুনিক চেতনাকে মহান কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছে সে-সবের সঙ্গেও যুক্ত। এ জিনিস মধুসূদন বুঝেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ আরো গভীরভাবে ; আধুনিক কালের আরো জটিল বিন্যাস কবির কাছ থেকে এ-বিষয়ে অপার সতর্কতা ও তেমনই অধ্যবসায় ও মননের ক্ষমতা দাবী করছে। সে দাবী মেটাবার শক্তি কবিদের যত বেশি—বর্তমানের কবিতা অর্থশালী হয়ে উঠবার তত বেশি সুযোগ পেতে পারে। আগাগোড়া বাংলা কাব্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধই সবচেয়ে আগে এবং সর্বদাই দরকারি।

শুধু বাংলা কবিতার সঙ্গে নয়, আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির বিপুলায়তন ঐতিহ্যের সঙ্গেই গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন জীবনানন্দ দাশ এবং তা তাঁর কাব্যে রূপায়ণের ক্ষেত্রেও তিনি বলিষ্ঠ সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা "বনলতা সেন" (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থের বহুলপঠিত ও পাঠকনন্দিত 'বনলতা সেন' কবিতাটিকে বিবেচনার অন্তর্গত করতে পারি। ভালো কবিতা সম্পর্কে এলিয়ট যেমন বলেছেন, অনুধাবনের পূর্বেই তা চিত্তে সঞ্চারিত হয়ে যায়, 'বনলতা সেন' সম্পর্কে সে-কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। খণ্ডিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিংবা তথ্য-অন্বেষণ ও আরোপণ মহৎ কবিতার অন্তর্লোকে প্রবেশের অন্তরায়। তা সত্ত্বেও সরলভাবে এ কবিতাটিকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এ কবিতার মহৎ ব্যঞ্জনা হয়তো এ আলোচনায় বিধৃত হবে না—তবে এই পাঠানুবৃতির মধ্য দিয়ে কবির ঐতিহ্য-চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

কবিতাটির প্রাথমিক পাঠ আমাদের এ-কথাই জানায় যে, হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথ-পরিক্রমণ শেষে, সমুদ্র-অভিযানের উপান্তে এসে ক্লান্ত কবিপ্রাণ খুঁজে পেয়েছেন তাঁর পরম আরাধ্য 'বনলতা সেন'কে। পথ-পরিমক্রমায় তিনি ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তরের ভৌগোলিক ও সামাজিক অনুষঙ্গ অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন। সন্দেহ নেই, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ কবিতাটিতে স্বতন্ত্র স্বাদ সঞ্চারিত করেছে।

জীবনানন্দ দাশ একটি কবিতায় বলেছেন, 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।' অর্থাৎ ব্যক্তি-মানুষের মৃত্যু হলেও মানবতার অগ্রাভিসারী মহাযাত্রা কখনো শেষ হয়ে যাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। 'বনলতা সেন' কবিতায় উত্তম-পুরুষে ব্যক্ত 'আমি' সর্বনামটি ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের অনন্ত প্রবাহের নামান্তর। হাজার বছর ধরে সভ্যতার বহুবিধ সোপান পেরিয়ে ঔপনিবেশিত নিজ দেশে জনসাধারণ 'ক্লান্তপ্রাণ'। অবসন্ন ও অবসাদগ্রস্ত ক্লান্তপ্রাণকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের 'বনলতা সেন'। বনলতা সেনের কাছ থেকে উপার্জিত 'দু'দণ্ড শান্তি' যে স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট বাক্যের ক্রিয়াপদটি লক্ষ করলেই বোঝা যায়।

এরপর কবি 'বনলতা সেন' তথা স্বদেশের সম্মোহক সৌন্দর্যের বর্ণনা দান করেছেন এবং ইতিহাসের অন্ধকার ক্রান্তিলগ্নের বিবরণ দিয়েছেন। এ অন্ধকার মৃত্যুর প্রতীক নয়, কারণ, তা 'জোনাকির রঙে ঝিলমিল'। অন্ধকার রাত্রি তো পরবর্তী প্রত্যুষের ইঙ্গিত বহন করে। বনলতা সেন তথা স্বদেশের নিবিড় ও গভীর সান্নিধ্য থেকে অনুপ্রেরণার রসদ সঞ্চয় ক'রে কবি, যিনি জনসাধারণের প্রতীক, পরবর্তী যাত্রা শুরু করেছিলেন। এ যাত্রা সম্ভবত স্বদেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে সূচিত হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে, জীবনানন্দ দাশ একটি প্রবন্ধে বলেছেন, বিগত শতাব্দী-পরম্পরা চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা না থাকলে কেউ কবি হতে পারেন না। তাই তাঁর কবিতায় ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ এসেছে 'শতাব্দী পরম্পরার চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তার নির্দেশক হয়েই।' প্রথম স্তবকে পথ-পরিক্রমার বর্ণনায় জীবনানন্দ দাশ হাজার বছরের পথ-যাত্রার কথা বলেছেন এবং সিংহল সমুদ্র থেকে মালয়সাগর পর্যন্ত নৌযাত্রার কথা বলেছেন। পূর্ব বাংলার দক্ষিণ বঙ্গ, যেখানে জীবনানন্দ দাশের জন্ম এবং আযৌবন বেড়ে ওঠা, মনসামঙ্গলের উর্বর ক্ষেত্র। এই মনসামঙ্গল গোত্রের কাব্য সাক্ষ্য দেয় যে, নৌ-বাণিজ্যে আমাদের ঐতিহ্য ছিল মহিমামণ্ডিত ; আমাদের সাংস্কৃতিক বাণিজ্যিক প্রসার এক সময় কাব্যে উল্লিখিত অঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত ছিল। মহাকালের গর্ভদেশে তলিয়ে যাওয়া ধূসর বিম্বিসার ও অশোকের জগতে অবস্থানের কথা জানিয়েছেন কবি। এঁরা আমাদের ইতিহাসের উজ্জ্বল নাম। কাব্য-সূত্রে ইতিহাসের বিস্মৃত-প্রায় অধ্যায় যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

আমরা জানি, এতদঞ্চলে বৈদিকদের আগমন ঘটে সর্বপ্রথম উত্তর ভারতে এবং ১০০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করতে সমর্থ হয়। বিস্তার লাভ করার পর সমগ্র ভারতকে ১৬টি মহাজনপদে ভাগ করা হয়, যা ইতিহাসে 'ষোড়শ মহাজনপদ' হিসেবে পরিচিত। এই জনপদগুলোর প্রত্যেকটিই ছিল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। 'ষোড়শ মহাজনপদে'র একটি ছিল 'মগধ রাজ্য'। এই মগধ রাজ্যের অন্যতম রাজা বিম্বিসার। রাজা বিম্বিসারের সময়ে অন্যান্য মহাজনপদের তুলনায় মগধ রাজ্য অধিক বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। পাটালিপুত্র বা পাটনায় বিম্বিসার একটি নগর স্থাপন করেন। তাঁর আমলে নগররাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে। এ-নগরে তিনি অসংখ্য-স্তম্ভের সমাহারে সম্মেলনকক্ষসহ রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন।

যে 'ষোড়শ মহাজনপদের' কথা বলা হয়েছে, এগুলো প্রায়শই পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হত। এ-রকম বিশৃঙ্খল ও অব্যবস্থিত অবস্থায় ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন এবং উত্তর-ভারতীয় নগররাষ্ট্রগুলো পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের ফলে পারস্পরিক সংঘর্ষের বৈনাশিক কুফল তীব্রভাবে অনুভব করতে পারে শাসকগণ। এই উপলব্ধি থেকেই ভারতীয় রাজনীতির চরিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয় : একাত্মবোধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগরণ ঘটে। আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর মৌর্য বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সর্ব-ভারতীয় ঐক্যবোধের চেতনা বিস্তারের ক্ষেত্রে নায়কোচিত ভূমিকা রাখেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের পুত্র খ্যাতকীর্তি অশোক (২৭৩—২২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) "ভারতের ইতিহাসে অশোক এক রহস্যজনক চরিত্র। ...উত্তরাধিকারসূত্রে অশোক এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।... কিন্তু স্থল ও জলপথে দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যে অবস্থিত স্বাধীন কলিঙ্গ রাজ্য। সুতরাং খৃস্টপূর্ব ২৬০ অব্দে অশোক কলিঙ্গের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালিয়ে রাজ্যটিকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।" (ইতিহাসকোষ : সরদার ফজলুল করিম, মুনতাসীর মামুন)।

কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) যুদ্ধের সময় অসংখ্য লোক নিহত হয় এবং এত রক্তক্ষয় ও প্রাণের অপচয় অশোকের মনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। তাঁর মানসিক পরিবর্তন সূচিত হয় এবং তিনি অহিংসার ধর্ম হিসেবে পরিচিত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। পাটালিপুত্র এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তিনি ব্যাপকভাবে বৌদ্ধবিহার ও স্তূপ নির্মাণ করেন। অশোকের রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেশী রাজ্য পারস্যের অনুকরণে তাঁর প্রাসাদ ও সভাকক্ষে যে স্থাপত্য-কৌশল ব্যবহৃত হয়, তা খুবই মসৃণ। এর ফলে ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতে এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটে।

আমরা লক্ষ করি, 'বনলতা সেন' কবিতার প্রথম স্তবকে পৃথিবী পরিক্রমার মধ্য দিয়ে স্বদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য পরিক্রমণ শেষে পরম আকাঙ্ক্ষিত বনলতা সেনের সান্নিধ্যলাভের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে বর্ণিত হয়েছে বনলতা সেনের রূপসৌন্দর্য। বনলতা সেনের রূপ-বর্ণনাতেও কবি ঐতিহ্যিক-অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। কবি বনলতা সেনের কেশরাজিকে প্রাচীন নগরী 'বিদিশা'র জমাট ঘন অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমরা জানি, শুঙ্গ যুগ থেকে বিদিশাকে কেন্দ্র ক'রে হিন্দু-চেতনার আলোকে বিভিন্ন মন্দির ও ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছিল। অতি প্রাচীন কাল থেকেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল হিসেবে 'বিদিশা' ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। বনলতা সেনের মুখাবয়বের সঙ্গে জীবনানন্দ দাশ শ্রাবস্তীর কারুকার্যের তুলনা ক'রে নিজেকে শুধু ঐতিহ্য-অনুরাগী কবি হিসেবে উপস্থাপিত করেননি, ঐতিহ্যবাদী কবি হিসেবেও অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শ্রাবস্তী প্রাচীন ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি নগর। এখানে বৌদ্ধ-কেন্দ্রিক ভাস্কর্যশিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। শ্রাবস্তীর পাথর ও পোড়ামাটির সূক্ষ্ম ও নন্দিত কারুকার্যময় ভাস্কর্যশিল্প প্রত্নতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালের লুম্বিনী গ্রামের নিকটবর্তী হওয়ায় শ্রাবস্তী বুদ্ধদেবেরও স্মৃতিবিজড়িত। জীবনানন্দ দাশ শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সঙ্গে 'বনলতা সেনে'র সুডোল মুখমণ্ডলের তুলনা করার সময় ভাস্কর্যশিল্পের সৌকর্য ছাড়াও এ নগরের মোহন-শোভন-সুস্থিত সংস্কৃতির অন্তর্গত সৌন্দর্যকে স্মরণ ক'রে থাকবেন।

এইভাবে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ঐতিহ্য একটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।

প্রাচ্যপুরাণের সঙ্গত ও সার্থক ব্যবহার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় লক্ষ করা যায়। সেইসব পুরাণানুষঙ্গের নিহিতার্থে তিনি আধুনিক জীবনচেতনার নির্যাসকে সঞ্চারিত করেন স্বাভাবিক কিন্তু বিস্ময়কর কুশলতায়। "মিথ-পুরাণের কাহিনী যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিকরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তিত এবং তাঁদের যুগ-চেতনায় বিবর্তিতভাবে তাঁদের রচনায় গ্রহণ করেন।" যদিও 'myth is essentially a religious term'—(Joseph T. Shipley ed.)। তবু পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিকতায় একথা বলা যেতে পারে যে, "আজকের বস্তু তান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক যুগে মিথের অন্তর্গত পূজাবিধি বা অলৌকিকতা আর গ্রাহ্য না হতে পারে—কিন্তু অন্য ধরনের গল্পের চাইতে ঐ মিথ কাহিনীগুলির আবেদন বিশ-শতকীয় অতিসচেতন কবি শিল্পীদের মনে যে এত ক্রিয়াশীল তার কারণ এই হতে পারে যে শুধু কাহিনীগুলোর গল্পরস নয়, ঐ গল্পরসের সঙ্গে জড়িত প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাস ও রিচুয়ালের স্মৃতিও আধুনিক শিল্পীমানসকে আলোড়িত করে তোলে এবং তাকে নবসৃষ্টির পথে উদ্বোধিত করে। আধুনিক কবির কাছে তাই মিথের প্রতীকী ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য।" (কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত)। এ জন্যই মিথ প্রাসঙ্গিক এরকম ভাষ্য প্রণীত হতে পারে যে, "Myths are often used to explain natural phenomena. Whether thay were originally mede up for this or whether the explanatory element is secondary has been much studied by folklorists." (Joseph T. Shipley ed.)। তবে, একথা সঙ্গত কারণেই আমাদের মনে পড়বে যে, শ্রেণীবিভক্ত, বর্ণবিভক্ত, গোত্রবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় ধাতস্থ ভারতে পুরাণ খুব স্বাভাবিকভাবেই কুক্ষিগত হয়ে পড়ে শিক্ষিত উচ্চবর্ণের। এবং "উচ্চবর্ণের ধর্মীয় সংস্কার তার সঙ্গে মিলেমিশে যাবার ফলে লোককথার জগৎ ও মানসিকতা থেকে তা কিছুটা দূরে সরে গেছে"—(বিষ্ণু দে'র কবিতা ও লোকজ উপাদান : সুমিতা চক্রবর্তী)। জীবনানন্দ দাশের ঐতিহ্য-চেতনায় শুধু পুরাণ নয়, লোকজ অনুষঙ্গও ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপকভাবে। লোকজ জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত ফসল লোকসাহিত্যের প্রতি জীবনানন্দ দাশের অনুরাগ লক্ষ করা যায় পূর্বাপর।

সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য আমাদের অন্যতম অহঙ্কৃত অলঙ্কার। লোকসাহিত্যের জগৎ বিশাল এবং বৈচিত্র্য অনিঃশেষ। লোকসাহিত্যের একটি প্রধান অংশ রচিত হয়েছে অবশ্য ছোটদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে অথবা তাদেরকে কেন্দ্র করে। এ কারণেই শৈশবেই লোকসাহিত্যের সঙ্গে মানবচিত্তের প্রচ্ছন্ন কিন্তু অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রচিত হয়। নানা উপকথা, রূপকথা, হেঁয়ালী বা ছড়ার মোহনীয় আকর্ষণে শিশুকিশোরচিত্ত একসময় উদ্বেল হয়ে উঠত। নিজেকে ভাবতে ভালোবাসত লালকুমার, নীলকুমার বা স্বপ্নিল ভুবনের অপরূপ রাজকন্যা। এই রূপকথাগুলোর প্রতীকী ও রূপকায়িত তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। রাজকন্যাকে পাওয়ার পথে প্রায়শ বিভিন্ন দৈত্য-দানো বা কোটালপুত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিত রাজকুমারের সামনে, বা বিপরীত প্রেক্ষাপটে রাজকন্যার সামনে এবং তারা আপন বুদ্ধি বলে সাহস ও বলিষ্ঠতায় তাকে পরাস্ত ক'রে উদ্ধার ক'রে আনত কাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনকে এবং সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। এসবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এ বাণী যে, পৃথিবীতে কোনো প্রত্যাশিত বস্তু বা বিষয়ই সহজলভ্য নয়। সততা, একাগ্রতা, বুদ্ধি, সাহস আর শৌর্যবীর্য দিয়ে তাকে জয় করতে হয়। উপকথা বা রূপকথার এই অন্তর্নিহিত বাণী ছোটদের মগ্নচৈতন্যে ছাপ ফেলত সহজেই। প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা কিংবা ছড়াগুলোও তেমনি। বহুমানুষের বহুকালীন মমতায় সৃষ্ট এই সকল ছড়ার প্রাথমিক অভীষ্ট ছিল শিশুচিত্তরঞ্জন। তাই বলে নিতান্ত শিশুতোষ বিষয়ই ছড়াগুলোতে বিধৃত হয়নি। এসবের মধ্যে উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁদের অভিজ্ঞতার রেখাচিত্র। যেভাবে সহজ-সরল মানুষ তাদের পরিবেশ-প্রতিপার্শ্বকে পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি করেছে, তাদের মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ, শ্রমক্লিষ্ট জীবনচর্যা নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে যেভাবে পরিপুষ্ট ক'রে তুলেছে ; উর্বর মৃত্তিকা, স্বর্ণাভ শস্যের শির-নোয়ানো কোমল হাওয়া, নিসর্গের সরল সৌন্দর্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং প্রাকৃতিক নানারকম বিপর্যায় তাদের যে দীক্ষা দান করেছে—লোকসাহিত্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার প্রতিফলন ঘটেছে। সামাজিক নানা টানাপড়েন, শ্রেণীবৈষম্যের মর্মদাহ—এমনকী রাজনীতির ক্লেদাক্ততা ও রাষ্ট্রীয় রূঢ়তাও প্রতিভাসিত হয়েছে লোক-সাহিত্যের নানাবিধ আঙ্গিকে। চাঁদের মতো মায়াময় দুষ্টু ছেলেকে ঘুম পাড়াতে মা কেবল ঘুম-পাড়ানী মাসিপিসিকে সুরেলা আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ছেলেরা বেঘোরে ঘুমিয়ে থাকলে যে বহিরাগত বর্গির দল নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠন করে সর্বস্বান্ত ক'রে দেয় দেশকে, সে-কথাও জানিয়ে দিয়েছে। ছড়ার সুরেলা ধ্বনিব্যঞ্জনায় গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেছে শিশু কিন্তু তার অবচেতন মনে গ্রন্থিত হয়ে গেছে রক্ত-সিক্ত ও বেদনা-বঞ্চনার মর্মান্তিক ইতিহাস। শিক্ষিত মানুষের অনুশীলিত পরিচর্যা নেই অপরিচয়ে অন্তরালে অন্তর্হিত মানুষজনের এইসব রচনায়, কিন্তু এগুলোর পরতে পরতে আছে দরদের স্বাভাবিক স্ফূর্তি। তাই তা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে অবলীলায়। লোকসাহিত্যের এই সৃষ্টিসম্ভার তাই কেবল শিশুদের সম্পদ নয়, সকলের অহংকার এবং তা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নান্দনিক দলিল। অতীতের এ সম্পদ নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আধুনিক কবিদের প্রতিভার স্পর্শে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাশের মধ্যে। তবে জীবনানন্দের জীবনদর্শনের স্বাতন্ত্র্যের কারণে তাঁর সামর্থ্য ও সাফল্য ব্যাপক ও সুদূরাভিসারী।

লোকসাহিত্যের এক স্বর্ণালী শস্য রূপকথা। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় রূপকথার বিভিন্ন অনুষঙ্গ গভীর তাৎপর্যে বিন্যস্ত হয়েছে প্রথমাবধি। প্রসঙ্গত, 'ঝরা পালকে'র 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কবিতাটির কথা মনে পড়তে পারে, যেখানে রোম্যান্টিক স্বপ্নচারিতা, সুদূরের প্রতি আকর্ষণ এবং প্রণয়ানুরাগ ঐতিহ্যাভিমুখিনতায় লীন হয়ে যায় :

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল
ডালিম ফুলের মত ঠোঁট যার—রাঙা আপেলের
মত লাল যার গান,
চুল যার শাঙনের মেঘ,—আর আঁখি গোধূলির মত
গোলাপী রঙিন্
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে, স্বপ্নে—কতদিন।

(ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল : ঝরা পালক)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, জীবনানন্দ দাশ অন্তরের আরাধ্য মানসীকে অন্বেষণের জন্য দ্বারস্থ হয়েছেন আবহমান বাংলা, পুরাণ ও রূপকথার জগতে।

সুকুমার সেন 'রূপকথা' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন, "এ শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। ...আমার ধারণা রূপকথা শব্দটি এসেছে 'অপরূপকথা' থেকে। তবে এ 'অপরূপ' সংস্কৃত থেকে আসেনি, এসেছে অপভ্রংশ থেকে।...'অপূর্ব সুন্দরী" প্রাকৃত ও অপভ্রংশ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলা কবিতায় অপরুপ সুন্দরী' > 'অপরুপ সুন্দরী' > 'অপরূপ সুন্দরী' হয়ে এসেছে কালক্রমে।" তবে সাধারণে রূপকথার গ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যাত হয়েছে এভাবে : "রূপকথার প্রতি আকর্ষণের কারণ হলো এর দ্বন্দ্বমধুর পরিবেশ, বাস্তব ও অবাস্তব মিলে অতিবাস্তবের প্রকাশ, সুরাশ্রয়ী ভাষা ও রূপসৃষ্টির বৈচিত্র্য। মাটির সঙ্গে দৃঢ় সংরক্তির ফলে এর সাহিত্যমূল্য অসাধারণ। ... রূপকথার কাহিনীতে রাজপুত্র ও রাজকন্যা প্রধান হলেও, ... মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগরপুত্র কাহিনীর মধ্যে মানবরস সঞ্চারিত করেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা আধুনিক কবিতায় রূপকথার চর্চা একে স্বতন্ত্র স্বাদবিশিষ্ট ক'রে তুলেছে। শুধু স্বতন্ত্র স্বাদের কারণেই নয়, আবহমান বাঙালি-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনার কারণেই এ বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যমণ্ডিত এবং এর ভূমিকা গভীর ও ব্যাপক।

'ঝরা পালক' থেকেই জীবনানন্দ রূপকথার কবি। কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো আভাসে তিনি জানিয়েছেন সেই রূপকথার মায়াবী কাহিনী। 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' পাঠ ক'রে বুদ্ধদেব বসু অনুভব করেছিলেন, 'বাংলা কাব্যে নতুন সুর এসেছে।' রবীন্দ্রনাথের পর কোনো বাঙালি কবি ধারাবাহিক, পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ কাব্যিক রূপকথা সৃষ্টি না করলেও, রূপকথার উপস্থিতি একেবারে অনুল্লেখযোগ্য হ'য়ে পড়েনি। (বাংলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা : মলয় বসু)। জীবনানন্দ দাশের সমসমিয়িক কবি অজিত দত্ত 'রূপকথার কবি' হিসেবেই সমাধিক পরিচিত। "জীবনানন্দ ও অজিত দত্ত দু'জনেই যুগজ্বরে আক্রান্ত। ফলে, রূপকাহিনীর জগৎ তাঁদের শান্তি ও সান্ত্বনা দেয়। একই বেদনার প্রশমন খুঁজতে তারা রূপকন্যাদের সাহচর্য চান।"(ঐ) অজিত দত্তের কবিতায় ব্যবহৃত রূপকথা আমাদের অতীতেই নিয়ে যায়, আধুনিক জীবনের ব্যঞ্জনা তার মধ্যে অনুরণন তোলে না, পক্ষান্তরে "জীবনানন্দ ... রূপকথাকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করেন—যা 'কল্পনার গল্প' হয়েও আরো অতিরিক্ত কিছু বলে। আমাদের অন্তর্গত রক্তের বিস্ময়কে বিপন্ন ও বিষণ্ণ করে তোলে।" (ঐ)

রূপকথা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের কথা মনে পড়ে। তবে, তাঁর জীবন-পরিসরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে ব্যবহৃত রূপকথা অনুষঙ্গ যে অনুল্লেখ্য নয়, সে কথা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। 'ঝরাপালকে'র 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার কুমার' শীর্ষক কবিতার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। "ধূসর পাণ্ডুলিপি"'র 'পরস্পর' কবিতায় কবি রূপকথার রাজকুমারকেই রূপকথা শোনান :

মনে প'ড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার
কহিলাম,—শোনো তবে,
শুনিতে লাগিল সবে,—
শুনিল কুমার ; ...

কবির রূপকথা শুনে, রাজকুমারও কবিকে রূপকথা শোনায় !

তারপর, কহিল কুমার,
আমিও দেখেছি তারে,—বসন্তসেনার
মতো সেইজন নয়,—কিংবা হবে তাই,—
ঘুমন্ত দেশের সেও, বসন্তসেনাই !...

এখানেই শেষ নয় :

কুমারের শেষ হলে পরে—
আর এক দেশের এক রূপকথা বলিল আর একজন।
...　　...　　...
সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা, সাদা, বরফের কুচির মতন !
তাহাদের মুখ চোখ ভিজে,—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল !
কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল
তাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে !

এ কবিতায় জীবনানন্দ এ আশ্বাস ব্যক্ত করেছেন :

এ রূপকথার এই রূপসীর ছবি
তুমিও দেখিবে এসে,—
তুমিও দেখিবে এসে কবি !

এই কবিতা পাঠে পাঠকচিত্তে এই বিশ্বাস প্রোথিত হতে পারে যে, "জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ঐতিহ্য, ইতিহাসচেতনা এবং পুরাণ প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।" (জীবনানন্দ দাশের কবিতা : প্রসঙ্গ পুরাণ—মাহবুব সাদিক)। কারণ, জীবনানন্দ দাশ, "নৈসর্গিক বর্ণনার পাশাপাশি, বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে বাংলার লৌকিক উত্তরাধিকারের উল্লেখ করতে ভোলেন না। কবিতাগুলির প্রসঙ্গ ও প্রকরণের, উক্তি ও উপলব্ধির বিস্ময়কর অদ্বৈত-সিদ্ধির ফলে আবহমান বাংলার চালচিত্র বর্ণনায় বাঙ্গালি যৌথ চেতনা, যৌথ স্মৃতি নাড়া খায়।"(প্রসঙ্গ জীবনানন্দ : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়)। প্রসঙ্গত, 'রূপসী বাংলা'র 'যেদিন সরিয়া যাব' কবিতাটি উল্লেখ করা যায় !

যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়
চ'লে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে—সেদিন দু'দণ্ড এই বাংলার তীর
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা-একা কি ভাবিব হায়,
সেদিন রবে না কোনো ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা প্রেমের ধূলায়
জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায় চারিদিকে বাঙালীর ভিড়
বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি ; কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের পথে
বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট ক্ষুভের মতন
কাটাই নি দিন মাস, বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে বিছায়ে দিয়েছি আমি মন
বাঙালী নারীর কাছে—চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত ; ধান-মাখা চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড় ; ডাঁসা আম কামরাঙা কুল !

'যতদিন বেঁচে আছি' কবিতায় দেখা যায়, কবি স্বদেশের নৈসর্গিক বর্ণনায়, জীবন উপভোগের গাঢ়তায় রূপকথাকে বিকল্পহীন প্রাসঙ্গিকতায় বিধৃত করেছেন :

পৃথিবীর পথ ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে
ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব ব'য়ে,
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প'রে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে—আমের শাখায় সুক ভুলে কয় কথা ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেইখানে সবচেয়ে বেশি রূপ—সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্নতা ;
যেখানে শুকায় পদ্ম—বহুদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব,
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনদিন বাজিবে কি আর !
(যতদিন বেঁচে আছি)

আরো একটি উদাহরণ :

মধুকুপি ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি—রায়গুণাকর
আসিবে না—দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার,
কালীদহে ক্লান্ত গাংশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়
আসিয়াছে চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার
শঙ্খমালা, চণ্ডমালা : মৃত শত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।
(অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া)

জীবনানন্দ দাশের কাব্যচৈতন্যে রূপকথার ভূমিকা কি বিশাল ও গভীর তার উদাহরণ হিসেবে রূপসী বাংলার ‘সোনার খাঁচার বুকে ‘কবিতার আংশিক উদ্ধৃতিই যথেষ্ট বিবেচনা করা যায়—

সোনার খাঁচার বুকে রহিব না আমি আর শুকের মতন ;
চন্দ্রমালা রাজকন্যা, মুখ তুলে চেয়ে দ্যাখো—শুধাই শুন লো,
কি গল্প শুনিতে চাও তোমরা আমার কাছে,—
কোন গান, বলো,
আমার সোনার খাঁচা খুলে দাও, আমি যে বনের হীরামণ,
রাজকন্যা শোনে নাকো—আজ ভোরে আবশীতে দেখে নাকো সুখ
কোথায় পাহাড় দূরে শাদা হয়ে আছে যেন কড়ির মতন ;
সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দিন ভোর কেটে যায় রূপসীর বুক ;
তবুও সে বোঝে না কি আমারো যে সাধ আছে—
আছে আগমন
আমারো যে—চন্দ্রমালা রাজকন্যা শোনো শোনো তোলো তো চিবুক।
হায় পাহাড়ের দিকে চেয়ে-চেয়ে হিম হয়ে গেছে তার স্তন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মিথের ব্যবহার প্রাতিস্বিক মহিমা অর্জন করেছে। আমরা জানি, যে-কোনো কবিরই প্রাথমিক ও প্রধান আয়ুধ শব্দ। শব্দকে ব্রহ্মতুল্য বিবেচনা করা হয় এ-কারণে যে, শব্দ কেবল কিছু ধ্বনির সমবায় নয়, তা একটি জাতির সংস্কৃতির প্রতিনিধি স্থানীয় সম্পদ। একটি শব্দের ভেতরে নিহিত থাকতে পারে ঘনীভূত ঘটনার সারাৎসার। ফলে শব্দ তা প্রতীকী মূল্যকে ছাপিয়ে রূপকায়িত মহিমাও অর্জন করে। আর যে-শব্দ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে মিথের সঙ্গে, তার তাৎপর্য স্বাভাবিকভাবেই আরো গুরুত্বপূর্ণ। কবি কেবল বাস্তব জীবন থেকেই তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন না, “A large part of any poet’s inspiration must come from his reading and his knowledge of history.“(T. S. Eliot)। এর মধ্যে তার ঐতিহ্যানুষঙ্গী পুরাণও অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং “শতাব্দীকাল সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে এবং কোনো একটি সভ্যতার মিথগুলিকে প্রাসঙ্গিক সভ্যতার বাস্তবিক অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ রূপভেদ বিবেচনা করতে হবে, ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনার চেয়ে তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।"—রামায়ণ ও মহাভারত আলোচনা-সূত্রে নীহাররঞ্জন রায় মিথ ও ইতিহাসের পারস্পরিকতা সম্পর্কে আরো বলেন, "এই মহৎ কাব্যযুগল দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের সামাজিক, আচরণগত, আবেগমূলক এবং ভাবগত-জীবনে মহৎ বাস্তবরূপে বিরাজমান। আমাদের সমাজ এখনও মূলগতভাবে যতখানি ঐতিহ্যাশ্রয়ী এই দুই মিথ ততখানিই স্বতঃগ্রাহ্য...। রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের জীবনে যে তাৎপর্যময় ভূমিকা স্মরণাগত অতীতে গ্রহণ করেছে কিংবা ঘটনমান বর্তমানেও পালন করেছে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ততকাল অবশ্য তার লিপিচিত্রণের দায়বদ্ধ। নয়তো ইতিহাস থাকবে অসম্পূর্ণ।" মিথচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী Bronislaw Malinowski বলেন :

> Studies alive, myth is not an explanation in satisfaction of a scientific interest but a narrative resurrection of primeval reality, told in satisfaction of deep relegious wants, moral cravings, social Submissions, assertions, even practical requirements. Myth fulfils in primitive culture and an indispensable function ; it expresses, enhence and codifies belief ; it safeguards and enforcbs morality. ...Myth is thus a vital ingredient of human civilization ; it is not an tale but a hard worked active force ; it is not an intelectual explanation or an artistic imagery but a pragmatic charter of primitive faith and moral wisdom."

অবশ্য এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, নৃবিজ্ঞানীর মিথ-চর্চা ও সৃষ্টিশীল লেখকের মিথ-চর্চা সর্বসম নয়। কারণ, উভয়ের ক্ষেত্র, লক্ষ ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা অবশ্য-স্বীকার্য। "সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকেরা তো গ্রন্থকীট গবেষক নন, তাই পুরাণের কোন অংশ মৌলিক আর কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত তা নিয়ে তাঁদের শিরঃপীড়া নেই। পুরাণের কোনো উপাখ্যানের মধ্যে সৃষ্টিবীজ যদি তাঁরা পেয়ে যান, যদি সেই কাহিনীর মধ্যে পেয়ে যান সম্প্রতিকালের একটা পূর্বাভাস তাহলেই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। পুরাণের প্রাচীন অনুষঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে থাকে গভীর কোন পুনরাবৃত্তি প্রাসঙ্গিকতা—সেই গূঢ় সারাংশকে নিষ্কাশিত করে নেন আধুনিক কবি এবং ব্যবহার করেন নিজের সময়ের দর্পণ রচনার কাজে (চারিদিকে নবীন যদুর বংশ : অশ্রুকুমার সিকদার)। যেমন, জীবনানন্দ যখন বর্ণনা করতে চান পরিচিত সভ্যতার পতন ও অবক্ষয়, নৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাঙন, তখন তিনি 'ক্ষয়োমুখ সভ্যতার প্রতিমান খুঁজে পান মহাভারতের মৌষলপর্বে :

> চারিদিকে নবীন যদুর বংশ ধ্বসে
> কেবলই পড়িতে আছে ; সংগীতের নতুনত্ব
> সংক্রামক ধুয়া
> নষ্ট করে দিয়ে যায় ;—
> স্মৃতির ভিতর থেকে জন্ম নেয় এই সব
> গভীর অসূয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশ : উত্তরপ্রজন্মের কবি

শাহাবুদ্দীন নাগরী

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—
তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার !

(কুড়ি বছর পরে : বনলতা সেন)

খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন তাঁকে বুদ্ধদেব বসু [১৯০৮–৭৪]। খুব ভালো লেগেছিলো তাঁর কবিতা। 'কল্লোল' [ফাল্গুন, ১৩৩২] পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো তাঁর একটি কবিতা— 'নীলিমা' ; পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন কিশোরোত্তীর্ণ বুদ্ধদেব। 'কবিতা' [১৯৩৫] পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হবার পর সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু কবির মোট ৯৩টি [কারো কারো মতে ১৪৪টি] কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। 'কবি' মানে জীবনানন্দ দাশ [১৮৯৯–১৯৫৪]। বাংলা কবিতার রবীন্দ্রোত্তর পাঁচ দ্রোহীর একজন। যদিও নিজে মোটেই দ্রোহী ছিলেন না, চলনে-বলনে একেবারে লাজুক, শান্ত ও স্বল্পবাক। পৌষ, ১৩৬১ সংখ্যার 'কবিতা'য় 'জীবনানন্দ দাশ' অংশে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

> ...জীবনানন্দের স্বভাবে একটি দূরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো—যে-অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতায়, তা-ই যেন মানুষটিকেও ঘিরে থাকতো সবসময়—তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।

(প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কাব্যসমগ্র : আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পা., অবসর, ১৯৯৮, পৃ ৬১৭)

হয়তো নির্জনতা পছন্দ করতেন জীবনানন্দ, আপন মনে হাঁটতেন-বেড়াতেন, বিকেলে পার্কে কারো সাথে দেখা হলে খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন। কিন্তু আসলেই কি এ নির্জনতাপ্রিয় মানুষটি ছিলেন সবার চেয়ে আলাদা? বোন সুচরিতা দাশ কিন্তু বলেন অন্য কথা—

> বাইরে থেকে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা তাঁকে গম্ভীর, নির্জন, স্বপ্নলোকবাসী বলেছেন ; বলেছেন সর্বক্ষণ একটা অদৃশ্য দূরত্বের বেষ্টনী তৈরি করে তাঁর নিজের চারিদিকে তিনি সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন। কিন্তু কতো সময় দেখেছি, স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসে হাসি পরিহাসে, কৌতুকে, গল্পে কেবলমাত্র আমাদের সঙ্গেই নয়, বাইরেরও যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে যেতে সংকোচ করেনি, তাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতেন। এত মজার কথা বলতে পারতেন যে হেসে কুটিপাটি হয়ে যেতে হতো।

(কাছের জীবনানন্দ : ময়ূখ, ১৩৬১–৬২ সংখ্যা)

তাঁর পরিজনদের মতে জীবনানন্দ ছিলেন রসিক, অন্তঃশীল আনন্দে উদ্বেলিত। পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দে মেতে থাকতেন। কিন্তু তবুও কোথায় জানি টল্‌মল্ করে নড়ে উঠতো জীবনানন্দের দুঃখবোধ। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কোনোদিনও হয়নি তাঁর। অধ্যাপনাকে পেশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে নিলেও কোনো কলেজেই তিনি একনাগাড়ে দীর্ঘসময় কাজ করতে পারেননি। তাঁর জীবনে সংকটের পর সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে মানসিকভাবেও তিনি ছিলেন বিড়ম্বিত। হয়তো তাই পালাতে চাইতেন পরিপার্শ্বের অপরিচিত–স্বল্পপরিচিত মানুষজন থেকে। শামুকের মতো গুটিয়ে থাকতেন সবসময়। জীবনের একেবারে শেষ দিকে এসে, যখন তিনি হাওড়া গার্লস কলেজে যোগদান করেন—তখন মানসিকভাবে কিছুটা তৃপ্তি পেলেও—ডায়বেটিস এবং রক্তচাপের মতো ব্যাধি গ্রাস করেছিলো তাঁর শরীর [তখন তো এসবের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিও জানা ছিলো না] আবদুল মান্নান সৈয়দ [১৯৪৩] তাঁর এ সময়টি বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> তার সঙ্গে ছিলো লেখক হিসাবে স্বীকৃতিহীনতা ও পারিবারিক অশান্তি। অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্য তাঁর ভাড়া বাড়িরই একটি ঘর সাব্-লেট দিয়েছিলেন এক মহিলাকে ; কিন্তু সে-মহিলা ছিলেন স্বচ্ছন্দচারিণী, তাঁর ঘরে বিচিত্র জটিল লোকসমাগম হ'তো। জীবনানন্দ, ধর্মে যাঁর বিশ্বাস ছিলো না কিন্তু নৈতিকতায় আস্থা ছিলো, তাঁর কাছে তা অসহ্য হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কিছুতেই তাকে বাড়ি থেকে উৎখাত করতে পারছিলেন না জীবনানন্দ—এটা প্রায় তাঁর অবসেশানের রূপ নেয়।
>
> (জীবনানন্দ দাশ : আবদুল মান্নান সৈয়দ)

এসব তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, শেষ দিকে জীবনানন্দ নিজের ভেতর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। জীবনাচরণে প্রকট হয়ে উঠেছিলো সূত্রহীন চলাফেরা আর সম্পৃক্তহীন প্রশ্ন। তাঁর নির্জনতা, মগ্নতা এবং একাকী জীবনের ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমি তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল একটি ঘোরের মধ্যে। ট্রামের নিচে পড়ে [১৪ অক্টোবর, ১৯৫৪] আহত হবার সময়ও তিনি যেন ঐ ঘোরের মধ্যেই ছিলেন, ট্রামচালকের জাগতিক ঘণ্টাধ্বনি তাঁকে ফেরাতে পারেনি। এই সত্যকে কি অস্বীকার করা যাবে ?

২.

অথচ কি নির্মম বাস্তব, তাঁর মৃত্যুর পরেই 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' [১৯৫৪] গ্রন্থটি ১৯৪৭–৫৪ সালের শ্রেষ্ঠতার বিচারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে। 'পূর্বাশা' [১৯৩৩] পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্য [১৯০৯–৬৯] তাঁর 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলেছেন :

> বিচারক ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের . . . . .। বাংলা কবিতা যাঁরা নিয়মিতভাবে পড়ে থাকেন, আশা করি তাঁরা এই বিচার ও বিবেচনায় খুশী হবেন। রবীন্দ্রনাথের পর বাঙালি কবিতা পাঠকের চিত্তে যদি কেউ প্রগাঢ় সাড়া এনে থাকেন তাহলে তিনি জীবনানন্দ দাশ।
>
> (সাপ্তাহিক 'দেশ', সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৮৪, কলকাতা, পৃ ১৭২)

যখন তাঁর এ স্বীকৃতি মেলে তখনও প্রকৃত জীবনানন্দ দাশ ছিলেন আমাদের অগোচরে। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিলো মাত্র সাতটি কবিতার বই : 'ঝরা পালক' [১৯২৭], ধূসর পাণ্ডুলিপি [১৯৩৬], 'বনলতা সেন' [১৯৪২, কবিতাভবন সংস্করণ], 'মহাপৃথিবী' [১৯৪৪], 'সাতটি তারার তিমির' [১৯৪৮], 'বনলতা সেন' [১৯৫২, সিগনেট প্রেস বর্ধিত সংস্করণ] এবং 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' [১৯৫৪]। এই সাতটি গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর মোট কবিতার সংখ্যা ছিলো মাত্র ১৬২টি এবং প্রকাশিত ও অগ্রন্থিত কবিতা ছিলো ২৬৯টি। অথচ বিপুলায়তন জীবনানন্দ ছিলেন আমাদের আড়ালে, বিচারের বাইরে। 'জীবনানন্দ অনুসন্ধান' শীর্ষক একটি নিবন্ধে কবি ও নাট্যকর্মী ফরিদ আহমদ দুলাল কিছু তথ্য উপহার দিয়েছেন, যা খুব দ্রুত জীবনানন্দের বিশাল সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। তিনি লিখেছেন :

> জীবনানন্দ পুনর্বার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন যখন মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর পর নতুন করে আবিষ্কৃত হয় তাঁর প্রায় তিনশো–সাড়ে তিনশোর মত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাতা। যার মধ্যে কবিতার খাতা ৭৫/৮০টি, উপন্যাস পাওয়া গেল পুর্বাপর ডজন খানেক- এর বেশি, জানা গেল গল্প লিখেছেন প্রায় শ'খানেক, এছাড়াও ছিলো অসংখ্য প্রবন্ধ— ইংরেজী কবিতা ইত্যাদি। স্বাভাবিক কারণেই কবি জীবনানন্দ'র পাশাপাশি আলোচনায় এসে গেলেন কথাসাহিত্যিক জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দ'র মৃত্যুর প্রায় চুয়াল্লিশ বছর পর আবার উদ্ধার করা গেল কবির প্রায় অর্ধশত অপ্রকাশিত কবিতা...। (দ্বিতীয় চিন্তা : জীবনানন্দ জন্মশতবার্ষিক স্মারক সংখ্যা, ১৯৯৯, ইফফাত আরা সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১১৮)

এই বিশাল জীবনানন্দকে বিচার করলে কী পাওয়া যায়? তিনি কি কবিতার গভীর ব্যঞ্জনার ভেতর দিয়ে নিজেকেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন? নির্জনতার কতো গভীরে তিনি ছিলেন? তাঁর বেদনা চিলের কান্নাধ্বনির মতো আমৃত্যু বহমান ছিলো হৃদয়ের স্রোতে? এসব কিছুই কি তাঁকে নিমগ্ন রেখেছিলো ঘোর আচ্ছন্নতায়? জীবন মানে যে ফুলেল আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর প্রতিদিনই পৃথিবীকে নতুন করে দেখা, এই অনুভূতি কি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন? সেজন্যেই কি তিনি বলেছিলেন—

> এখানে দিনের—জীবনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই;
> ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এখনো আসেনি।
> চারিদিকে ভোরের কি বিকেলের কাকজ্যোৎস্না ছায়ার ভিতরে
> আহত নগরীগুলো কোনো এক মৃত পৃথিবীর
> ভেতরের চিহ্ন ব'লে মনে হয়; তবু
> মৃত্যু এক শেষ শান্ত দীন পবিত্রতা;
> আমাদের আজকের পৃথিবীর মানুষ নগরগুলো সে-রকম
> আন্তরিকভাবে মৃত নয়।
>
> (এইখানে সূর্যের : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৩.

জীবনানন্দ তাঁর জীবদ্দশায় কবিখ্যাতি লাভ করেননি, যেই অর্থে জীবনানন্দ এখন আমাদের অনেকেরই প্রিয়। বামপন্থী কবিদের কাছে জীবনানন্দের কবিতা কোনো মূল্যই পায়নি কখনো। মার্ক্সিস্ট ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজতান্ত্রিক কাব্যভাষা ব্যবহার না করলে আর কবি কি?—এমনই একটা কবিতাভুবন তৈরি করেছিলেন কমিউনিস্ট কবিরা, যাঁরা নিজেদের ভাবতেন প্রগতিশীল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় [১৯১৯] বলেন—'...সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও যিনি কিছুর মধ্যেই নন, সেই ভাবান্তরহীন কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। সমস্ত কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন আর তারপর একের পর এক তাদের মুখগুলো ধূসর কুয়াশায় মুড়িয়ে দেন। নাম, সংখ্যা, আকৃতি-তাঁর কাব্যে কথার কথা মাত্র। প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতে, আকার থেকে নিরাকারে তাঁর যাত্রা। সময়ের কণ্ঠরোধ করে তিনি কথা বলেন, শব্দ তাঁর কাছে বস্তুবিরহিত সংকেত মাত্র। বিপরীত ভাব গায়ে গায়ে জুড়ে তিনি তাসের ঘর সাজান, তারপর নিজেই নিয়তি পুরুষ সেজে এক ফুঁয়ে সে ঘর উড়িয়ে দেন।' ['সাহিত্য মেলা' : বিভাগোত্তর পূর্ব-পশ্চিম বাংলার সাহিত্য, ১৩৫৪-১৩৫৯, ক্ষিতীষ রায় সম্পাদিত, শান্তিনিকেতন]। একইভাবে জীবনানন্দকে তির্যক আক্রমণ করেছিলেন ননী ভৌমিক, মৃগাঙ্ক রায় প্রমুখ। কিন্তু এ যে খুব বড় দাগে জীবনানন্দকে বিচার করা, সে কথা কে বলবেন? প্রগতিশীলতার অপর নামই কুসংস্কারহীন মানবকল্যাণ, মানবতা। কিন্তু জীবনানন্দকে তাঁর উত্তরাধুনিক সাহিত্য দিয়ে বিচার করা হলো না কেন? ২ মে ১৯৫৩ সালে কবি সমালোচক সুরজিৎ দাশগুপ্তকে জীবনানন্দ লিখেছিলেন : 'আমার কবিতা সম্বন্ধে চারিদিকে এত অস্পষ্ট ধারণা যে আমি নিজে এ বিষয়ে একটি বড় প্রবন্ধ লিখব ভাবছিলাম।' কবি শামসুর রাহমান বিষয়টিকে ব্যাখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন এভাবে—'মার্ক্সিস্ট সমালোচকদের অনেকেই জীবনানন্দ দাশকে প্রতিক্রিয়াশীল কবি হিসেবে চিহ্নিত করে খারিজ করে দিতে চেয়েছিলেন। কোনো কোনো উগ্র মার্ক্সবাদী সমালোচক প্রগতিশীল বিষ্ণু দে'র কবিতাকেও অগ্রাহ্য করেন সেকালে। আমার মতে, কবিতাকে প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করলে কবিতা এবং কবির প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। কবিতার নানা স্তর থাকে, প্রত্যেকটি সৃজনশীল শিল্পকর্মই মূল্যবান।' 'বস্তুতঃ জীবনানন্দ দাশের সত্যই ছিলো সর্বমানুষের কল্যাণ ও মুক্তি। মাহাত্মা গান্ধীকে তিনি রামমোহনের চেয়ে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, কেননা, তাঁর মতে, রামমোহনের আন্দোলন ছিলো ধর্মকেন্দ্রিক, অপরদিকে গান্ধীর চরমতম সাধনাই ছিলো মানবতার। মানবের সর্বাঙ্গীয় ও শাশ্বত একটি কল্যাণবোধ ও শ্রেয়তার প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ আস্থা থেকে মনে হয়, মানবধর্মে তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিলো। এই মানবধর্মই তাঁকে তাড়িত করেছে।...নন্দিত শব্দের প্রতি জীবনানন্দ অবহেলা দেখাননি এ যেমন সত্য কথা, তেমনি সত্য তাঁর কাব্যের নিসর্গতার ভেতর দিয়ে তিনি কামনা করেছেন মানবজাতির মঙ্গলের। এই মঙ্গলচিন্তাই পরিবর্তিত হয়ে জীবনানন্দের জীবনে মানবধর্ম এবং পরিশেষে ধর্মচিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪.

প্রকৃতপক্ষে যে কথাটি আমাদের সবচে' আগে বলা দরকার, তা হলো, উত্তররৈবিক কাব্যধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েও জীবনানন্দ দাশ তাঁর সফরসঙ্গী বুদ্ধদেব বসু বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের [১৯০১–৬০] ভাষাভঙ্গির উপর নির্ভর করেননি। তাকে বাহনও করেননি। একটি নতুন ভাষা, একটি নতুন ভাবনা এবং একটি নতুন জীবন চেতনা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কবিতায়। কোথাও কোথাও ছড়িয়েছিলো পরাবাস্তবতার ছোঁয়া। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত জীবনানন্দ তিরিশি যাতনাকে প্রলম্বিত করেননি, তিনি তা থেকে উদ্ধার করেছেন বাংলা কবিতাকে। প্রেম ও প্রকৃতির প্রতি মগ্ন হয়েছেন, মুগ্ধ করেছেন তাঁর কাব্যনারীকে, বলেছেন—

একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

(সুদর্শনা : বনলতা সেন)

আর তাই দেখা যায় জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হ'লে বুদ্ধদেব বসু'র 'কবিতা' পত্রিকায় লেখা হয়—'...বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব শক্তির আবির্ভাব হয়েছে।' সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' পত্রিকা একই সময়ে লেখে : '...জীবনানন্দকে 'আধুনিক কবিদের প্রথম শ্রেণীতে স্থান নির্দেশ করবে।' অথচ আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, তিনি লিখছেন–'জনশ্রুতিই বলব যে, জীবনানন্দের কবিতা সুধীন্দ্রনাথের অনুমোদন পায়নি। একথা যদি সত্যি হয়, তাহলেও বলব যে, সুধীন্দ্রনাথের মনে জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে অন্তত দ্বিধা ছিল।' আসলে জীবনানন্দ তাঁর সমকালীন কবি বন্ধুদের সহমর্মিতাও হারিয়েছেন কোনো কোনো সময়। এ হ'তে পারে, তিনি কলকাতাকেন্দ্রিক বৃত্তের বাইরে ছিলেন বলে, হ'তে পারে তাঁর হাতে 'প্রগতি', 'কবিতা' বা 'পরিচয়'–এর মতো কোনো ধারালো হাতিয়ার ছিলো না বলে। সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়' তাঁর ৮টি কবিতা ছেপেছিলো, অথচ সুধীন্দ্রনাথ–পরবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘পরিচয়’ সম্পাদকগণ জীবনানন্দকে প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন ‘স্বপ্নক্রান্ত কবি’ বলে। তবে সবচেয়ে যেটি বড় কথা, তা হলো, কখনো কখনো রূঢ় সমালোচনা করলেও বুদ্ধদেব বসুই ছিলেন জীবনানন্দের কবিতার প্রধান সমর্থক। তাঁর পূর্বে ‘এত যুক্তিযুক্তভাবে দেশজ ও বিদেশী শব্দ কেউ ব্যবহার কারেননি’ বলে বুদ্ধদেব স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি যে, ‘ওগুলো সেদিন আমাদের সাহস দিয়েছিল। তাতে আমরা নিজেদের লেখায় আরা সাহসী হয়ে উঠেছিলাম’ [‘কবিতা’, পৌষ ১৩৬১ সংখ্যা]।

৫.

আসলে আমরা জীবনানন্দকে আবিষ্কার করতে পারিনি তাঁর জীবদ্দশায়। তাঁর লেখালেখি যেটুকু পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়েছিলো তা থেকেই আমরা জীবনানন্দের বিচারে ব্রতী হয়েছিলাম, অনেক ক্ষেত্রে সে বিচারও ছিলো একদেশদর্শী। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতাটি পড়ে মন্তব্য করেছিলেন—‘জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে’—এমন করে আমরা ক’জন জীবনানন্দের কবিতার রূপময়তার সন্ধান করেছিলাম? [আবদুল মান্নান সৈয়দ ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতাটির প্রকাশকাল ‘কবিতা’ পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪২ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরই তথ্যানুযায়ী দেখা যায় ‘কবিতা’র আষাঢ়, ১৩৪২ সংখ্যায়, সম্ভবত এটিই ‘প্রথম সংখ্যা’, জীবনানন্দের দু’টি কবিতা ছাপা হয়—‘বুনোহাঁস’ ও ‘শঙ্খমালা’ এবং আশ্বিন, ১৩৪২ সংখ্যায় ছাপা হয় ‘মৃত্যুর আগে’, ‘বনলতা সেন’ ও ‘কুড়ি বছর পরে’।] বুদ্ধদেব গ্রুপের বাইরে তিনি তেমনভাবে আদৃত হলেন কোথায়? পছন্দ-অপছন্দ নিয়েই তৎকালীন সাময়িকপত্রগুলো জীবনানন্দের কবিতা ছেপেছিলো, কিন্তু আলোচনার ক্ষেত্রে সবাই ছিলেন বিরূপ-খড়গহস্ত। এর কারণ কি? অথচ নিজের কবিতা নিয়ে জীবনানন্দ ছিলেন ভীষণরকম সংবেদনশীল। অজস্র কাটাকাটি করেছেন কবিতায়, ডাকবাক্সে ফেলতে গিয়েও আবার ফেরৎ এনে কবিতার পরিমার্জনা করেছেন, এমন ভুরি ভুরি প্রমাণও আছে। তাঁর সাহিত্যের একটি বিশাল অংশকে তিনি অনাঘ্রাতাই রেখে দিয়েছিলেন। প্রশ্ন জাগতে পারে, তিনি কি দ্বিধায় ছিলেন? নাকি সে সব সঞ্চয়ে রেখেছিলেন তাঁর উত্তর-প্রজন্মের জন্যে? উত্তরপ্রজন্মের জন্যে যদি সঞ্চিতই রাখবেন তবে তা প্রকাশের ভার কারো হাতে তুলে দেননি কেন? আসলে কবি শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের বাইরে চলে গিয়েছিলেন, তিনি প্রত্যাখানের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। অথচ সত্য এটাই যে, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের পর বাংলা ভাষায় যে কবির নাম এখন সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়, আবেগে এবং ভালোবাসায়—তিনিই তো জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দে এটাই স্পষ্ট যে, তিনি কবিতার শরীরকে প্রিজমের মতো অবলোকন করেছিলেন, ফলে বিভিন্ন কৌণিক দৃষ্টিতে একই চেতনা পাল্টে পাল্টে বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে। একই শব্দ ও শব্দাবলী সৃষ্টি করেছে বহুরূপী ব্যঞ্জনা। কবিতা কাঠামোয় যুক্ত হয়েছে নতুন ইট-কাঠ-পাথর। হয়তো তাই মৃত্যুর প্রায় পাঁচ দশক পরেও জীবনানন্দের কবিতা আমাদের হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছে, তাঁর গভীর অথচ শুদ্ধতম অন্বেষাই তাঁর পুনরুত্থান-পুনর্জীবনকে সহজ করে দিয়েছে উত্তরপ্রজন্মের কাছে। মৃত্যুর পরই যেন শুরু হয়েছে তাঁর যাত্রা, যেমন তিনি বলেছেন—

মানুষের জীবনের ঢের গল্প শেষ
হ’য়ে গেলে র’য়ে যায় চারিদিকে ঘিরে এই দেশ;
নদী মাঠ পাখিদের ওড়াউড়ি গাছের শিয়রে
কমলা রঙের ঢেউয়ে এসে কিছুক্ষণ খেলা করে।

(যাত্রী : কবিতা, চৈত্র ১৩৫৯)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের দুটি উপন্যাসে

বেসরকারি কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ

মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীরি

মানুষেরি হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল ;
পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।
(সৃষ্টির তীরে : সাতটি তারার তিমির)

প্রসঙ্গ : তৎকালীন শিক্ষানীতি

ম্যাকলের শিক্ষানীতি (১৮৩৫) ব্রিটিশ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাথমিক যুগে এক যুগান্তকারী ঘটনা। লর্ড ম্যাকলের 'নিম্নগামী পরিস্রাবণ নীতি'র সমালোচনা করে তারপর উইলিয়াম অ্যাডাম দেশীয় শিক্ষাকে সমুন্নত রাখার প্রস্তাব দিয়ে প্রকাশ করেন তার রিপোর্ট (রচনা : ১৯৩৫–১৯৩৮)[১]। লর্ড অকল্যাণ্ডের সময় (গভর্নর জেনারেল : ১৮৩৬–১৮৪২) এই রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রতি জেলায় জেলা-স্কুল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গৃহীত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ছিল বেসরকারি মিশনারি ও সরকারি শিক্ষা-উদ্যোগের সুবর্ণকাল ; দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমাংশে বেসরকারি উদ্যোগে গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর, ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনামলে, চার্লস উডের ডেসপাচ (১৮৫৪) রূপায়ণকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭)। লর্ড রিপন (ভাইসরয় : ১৮৮০–১৮৮৪) স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষা সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ করে প্রথম শিক্ষা কমিশন (হান্টার কমিশন : ১৮৮২) গঠন করেন। সরকারি উদারনীতি এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির বিকাশের ফলে, মধ্যবিত্তের শৈক্ষিক-মুক্তির লক্ষ্যে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রদর্শিত নীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় বরিশাল জেলা স্কুল (১৮৫৩)। লর্ড রিপনের রাজত্বকালে, জাতীয়তাবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা সিটি কলেজ (১৮৮১) এবং অশ্বিনী কুমার দত্ত ব্রজমোহন ইনস্টিটিউট (১৮৮৪) ও ব্রজমোহন কলেজ (১৮৮৯)। জীবনানন্দ দাশের পিতা সত্যানন্দ দাশ যুগীয় প্রণোদনায় সরকারি চাকরি ত্যাগ করে বেসরকারি ব্রজমোহন ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। লর্ড কার্জনের ভাইস রিগ্যাল শাসনের (১৮৯৯–১৯০৫) সূচনা বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন কবি জীবনানন্দ দাশ। সত্যানন্দ দাশের সময়ের বেসরকারি শিক্ষা-ব্যবস্থা তার সৃজনশীলতা ও স্বদেশ-প্রেমী অভিব্যক্তি হারিয়ে ফেলে, লর্ড কার্জনের ভারত-বিদ্বেষী নীতির ফলে স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৩–১৯০৮) প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে জাতীয় বিদ্যালয় ; জীবনানন্দ দাশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ভর্তি হন ব্রজমোহন ইনস্টিটিউটে। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় শিক্ষার যুগে (১৮৯৮–১৯১৯) জীবনানন্দ দাশ ছিলেন ব্রজমোহন ইনস্টিটিউট (১৯০৮–১৯১৫), ব্রজমোহন কলেজ (১৯১৬–১৯১৭) এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের (১৯১৭–১৯১৯) ছাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়ে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪) শুরু করেন তাঁর কর্মজীবন। এই কলেজে কর্মরত থাকার সময় (১৯২২–১৯২৮) প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরাপালক* (১৯২৭)। সামাজিক বাস্তবতার পর্বে (১৯১৮–১৯২৬) জীবনানন্দ তৎকালীন রাজনীতি দ্বারা স্পষ্টতই প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসহযোগ আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী মধ্যপ্রাচ্যচেতনা দিয়ে আলোড়িত হয়ে জীবনানন্দ কবিতা রচনা করেন এসময়। বাঙালি জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখেন 'দেশবন্ধু', 'বিবেকানন্দ', 'হিন্দু–মুসলমান' কবিতা ; মধ্যপ্রাচ্যচেতনার ফসল : 'মিশর', 'পিরামিড', 'মরুবালু' প্রভৃতি কবিতা।

দিল্লীর রামযশ কলেজে অধ্যাপনার সময় (১৯২৯–১৯৩০) কবি ছুটিতে এসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন (৯ মে, ১৯৩০) লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে। ইডেন কলেজের ছাত্রী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের গোপনকর্মী লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে কবির বিবাহবাসর হয় ঢাকায়, ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে। বিশ্বব্যাপী আর্থনীতিক মহামন্দার সময়ে কবি শুরু করেন তাঁর বিবাহিত জীবন, বরিশালে পিতার একান্নবর্তী পরিবারে। একান্নবর্তী পরিবারে সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে জীবন যাপন করার কষ্টকর অভিজ্ঞতা বিবৃত হয়েছে তাঁর প্রাথমিক গল্প ও উপন্যাসসমূহে। এসময়ে রচিত *রূপসী বাংলায়* কবির বেদনাবোধ, বিস্ময়বোধ, বর্ণময়তা ও বিচিত্রধর্মিতা এক বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করে। ব্রজমোহন কলেজে যোগদান করেন অধ্যাপকরূপে ১৯৩৫ সালে ; এই কলেজে অধ্যাপনার পর্যায়ে জীবনানন্দ প্রকাশ করেন তাঁর প্রধান রচনাবলী : *বনলতা সেন* (১৯৪২), *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪) এবং *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮)। এখানে অধ্যাপনার স্মৃতি নিয়ে রচনা করেন তাঁন প্রধান দুটি উপন্যাস : *বাসমতীর উপাখ্যান* (১৯৪৮) ও *জলপাইহাটি* (১৯৪৮)।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের আগে জীবনানন্দ দাশ কলকাতায় চলে যান। সেখানে কয়েকমাস দৈনিক স্বরাজ–এর রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হিসাবে (জানুয়ারি ১৯৪৭–এর মাঝামাঝি) কাজ করা ছাড়া বাকি জীবন কাটান অধ্যাপনায়—প্রথমে খড়গপুর কলেজ (১৯৫০–১৯৫১), তারপর বরিষা কলেজ (১৯৫২–১৯৫৩) এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হাওড়া গার্লস কলেজে (১৯৫৩–১৯৫৪)। দীর্ঘ দুই যুগের অধ্যাপনা–জীবনের মধ্যে (দ্র. সারণি) সবচেয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন ব্রজমোহন কলেজে (১৯৩৫–১৯৪৬)। বেসরকারি কলেজ চেতনার অনেকাংশে ধরা পড়েছে এসময়ের স্মৃতিবাহী *বাসমতীর উপাখ্যান* ও *জলপাইহাটি* উপন্যাসে। জলপাইহাটি কলেজ ও বাসমতী কলেজ ব্রজমোহন কলেজের প্রতিচ্ছায়ায় রচিত আর ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের (১৯৪৩–১৯৪৯) ছায়া দেখি উপন্যাস দুটির অধ্যক্ষ চরিত্রে।

জীবনানন্দ দাশের অধ্যাপনা : সময়–কাল

বেসরকারি কলেজ	অবস্থানকাল	চাকুরিত্যাগ/অব্যাহতি	অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ
১. সিটিকলেজ, কলকাতা আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত : ১৮৮১	১৯২২-১৯২৮	১৯২৬ সালে সাম্প্রদায়িক কারণে হিন্দু ছাত্রদের কলেজ ত্যাগ ; ছাত্রসংকট ও অর্থসংকট : অব্যাহতি	হেরম্বচন্দ্র মৈত্র অধ্যক্ষ
২. প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ বাগেরহাট, খুলনা। প্রতিষ্ঠিত ১৯২৯	প্রতিষ্ঠাকালে মাস তিনেক	চাকুরিত্যাগ	
৩. রামযশ কলেজ, দিল্লী	ডিসেম্বর ১৯২৯-মার্চ ১৯৩০	বিবাহের ছুটি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত, আর ফিরে যাননি	সুকুমার দত্ত উপাধ্যক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেসরকারি কলেজ	অবস্থানকাল	চাকুরিত্যাগ/অব্যাহতি	অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ
৪. ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত : ১৮৮৯	১৯৩৫-১৯৪৬	কলেজ ত্যাগ ১৪.০৯.৪৬ ছুটি নিয়ে (অতঃপর কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য দেশত্যাগ)	শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ অধ্যক্ষ(১৯৩৮-১৯৪৩) সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত অধ্যক্ষ (১৯৪৩-১৯৪৯)
৫. খড়্গপুর কলেজ, মেদিনীপুর প্রতিষ্ঠিত : ১৯৪৯	সেপ্টেম্বর ১৯৫০- ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫১	চাকুরিত্যাগ (লাবণ্যদাশের অসুস্থতার কারণে)	
৬. বরিষা কলেজ দক্ষিণ কলকাতা	নভেম্বর ১৯৫২- ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩	অস্থায়ী	
৭. হাওড়া গার্লস কলেজ, কলকাতা প্রতিষ্ঠাতা : বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য	জুলাই ১৯৫৩- ১৯৫৪	(বিভাগীয় প্রধান) মৃত্যু	বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য অধ্যক্ষ

উৎস : ১. Clinton B. Seely, *A Poet Apart*, University of Delaware Press Newark, 1990 ; p. 40, 72-78, 196, 258, 260, 261 থেকে সারণিকৃত।

২. সিরাজউদ্দীন আহমেদ, *বরিশালের ইতিহাস*, প্রকাশক : আলহাজ্জ কাজী হারুনুর রশিদ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৪১০।

২. জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসে বেসরকারি কলেজ

২.১ বাসমতীর উপাখ্যান

বাসমতীর উপাখ্যান (১৯৪৮) জীবনানন্দ দাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। মহাযুদ্ধের হিড়িক, মহামারী ও দেশবিভাগের শঙ্কা–আনন্দ এ উপন্যাসের পটভূমি। বাসমতী কলেজের দার্শনিক–শিক্ষক সিদ্ধার্থ উপন্যাসের প্রধান কুশীলব। চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে আত্ম–জিজ্ঞাসা জাগে সিদ্ধার্থ সেনের মনে। প্রিন্সিপাল, গভর্নিং বডি, নানারকম লোকজনের মত নষ্টামি, ত্যাঁদরামি তাঁর জীবনে নেই বলে হাসপাতাল ও নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন সিদ্ধার্থ সেন। নীরেন যেমন বাসমতীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, সিদ্ধার্থ চাইছে জনসেবার মহান ব্রতকে অলবম্বন করে বেঁচে থাকতে।

জিরানডাঙার কলেরার রোগীদের সেবা করার জন্য তিন–চার মাসের ছুটি নেবার কথা ভাবে সিদ্ধার্থ কিন্তু বেশি লম্বা ছুটি দিতে প্রিন্সিপাল রাজি হলেন না, ছুটি দিলেন মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে। প্রার্থিত তিন মাসের জায়গায় তিন সপ্তাহ ছুটি মঞ্জুর করলেন প্রিন্সিপাল অথচ সত্যসুন্দর ঘোষকে চার মাসের ছুটি দিয়েছেন পুরো মাইনেতে। কোনো মেডিক্যাল সার্টিফিকেটও লাগেনি তাঁর। গতবারও সত্যসুন্দর ছুটি নিয়েছিলেন তিন–চার মাসের। চিরন্তন সান্যালকে আড়াই মাসের ছুটি দেওয়া হয় ; ত্রিদিব সরকারকে তিন মাসের পুরো মাইনেতে। ছুটির প্রাক্কালে পঞ্চাশ টাকা করে মাইনেও বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাঁদের। তাঁদের প্রতি এই পক্ষপাতের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ঔপন্যাসিক :

> যতদূর মনে হয় এরা উদ্যোগ করে এই প্রিন্সিপালকে এ কলেজে আনিয়েছিলেন বলে, এদের টাকা ও লোকবল আছে বলে, কলেজ ক্লাশে না হোক বাইরে দশ জায়গায় এরা বেশ কইয়ে–বলিয়ে লোক বলে। অথচ প্রফেসর সরিৎ মুখুজ্জের ছেলের টি–বি হয়েছে কলকাতায় কোন এক মেসে, ছেলেটাকে দেখবার কেউ নেই সেখানে, তাকে চিকিৎসা করতে হবে, তার জন্যে হাসপাতালের বেড ঠিক করতে হবে, বেড না পেলে কোথায় রাখা যাবে তাই নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনরাতের ধান্দায় ঘুরতে হবে বাপকে কিন্তু কিছুতেই প্রিন্সিপাল তাকে ছুটি দিতে চাচ্ছেন না। ... অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর দেড় মাসের ছুটি দিতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু হাফ-পেতে। কিন্তু হাফ-পেতে কিছুতেই ছুটি নিবেনা সরিৎ, কেন নেবে, পুরো মাইনেতে ছুটি পাওনা রয়েছে তার। গভর্নিং বডি বলেছে প্রিন্সিপালের নির্দেশের ওপর তাদের আর কিছু বলবার নেই।[২]

প্রিন্সিপাল মজুমদার নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গিয়ে যখন পঁচিশ-ত্রিশ দিন, পাবলিক ডিউটির নামে পনের-কুড়ি-পঁচিশ দিন কাটিয়ে আসেন তার বিষয়ে জানবার প্রয়োজন বোধ করেনা গভর্নিং বডি। কমিটির প্রেসিডেন্ট কালেক্টর সাহেব, ভাইস প্রেসিডেন্ট লোচন বাবু, কমিটির সদস্য অমিয় সেন, অরুণ সেন ও অধ্যাপক বিনয়তোষ দাঁড়িয়েছেন প্রিন্সিপালের পক্ষে। প্রিন্সিপাল উদ্যোগ করে কমিটির মিটিং ডাকলে কালেক্টর সাহেবের বাড়িতে সন্ধ্যার পর বসে 'প্রীতি সম্মেলন'। যেখানে প্রফেসরদের ভাগ্য নিয়ে কাটাছেঁড়ার খেলায়, 'অপারেশন টেবিলের প্রধান নার্স হিশেবে' প্রিন্সিপাল 'প্রিয় পাত্রীর মতন উপস্থিত'।

কলেজের প্রফেসরদের মধ্যে তিন-চারটা ক্লিকের সুযোগ নিয়ে, অন্য সদস্যদের পরামর্শে প্রিন্সিপাল চালাচ্ছেন স্বেচ্ছাচার। মনে মনে শিক্ষকদের কাউকেই বড় একটা শ্রদ্ধা করেন না প্রিন্সিপাল—তার কথাবার্তা মনোভঙ্গিতে অনেক সময়েই তা প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের ওপর বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা নেই তাঁর যদিও বাধ্য হয়ে এদের কাউকে বিশ্বাস করেন, বাইরের আচার-আচরণে 'কোনো-কোনো সিনিয়র প্রফেসরকে নিয়ে গোপনে-গোপনে দরজায় খিল এঁটে পরামর্শ করেন'।

এমন এক সময়ের পটভূমিতে উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক যখন ভাঙনের মহড়ার ভিতর সোরগোল চলছে চারদিকে। ইংরেজ চলে যাচ্ছে, স্বাধীনতা আসছে, পাকিস্তান হচ্ছে। পলিটিক্যাল প্রিজনার হিসাবে বন্দি তিনজন প্রফেসরকে[৩] ছেড়ে দিয়েছে সরকার—আসন্ন স্বাধীনতার কারণে। গভর্নিং বডির ভাইস প্রেসিডেন্ট লোচন বাবু সুপারিশ করেছেন বলে তাঁদের একজনকে কাজে বহাল করে অন্য দুজনকে চাকরিচ্যুত করে বিদায় করে দেন প্রিন্সিপাল।

এরকম অবস্থায় কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনাচারের বিরুদ্ধে, শিক্ষকদের পক্ষে তথা দারিদ্র্যের বিপক্ষে প্রতিভূ হয়েছেন সিদ্ধার্থ সেন। যদিও টাকাকড়ির একটা পাপচক্রের ভিতর পড়ে গেছেন সিদ্ধার্থ—একশ পঁচাত্তর টাকা যার মাইনে, পঁচিশ টাকা ডিএ ; নানাদিকে দেনা ও সুদে একশ দশ পনের টাকার বেশি কোনো মাসেই পান না ; প্রতি মাসেই পঞ্চাশ ষাট টাকা ধার করতে হয়, কলেজের কোনো না কোনো ফান্ড থেকে। প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা রয়েছে হাজার খানেক টাকা—এই ফান্ড থেকে যা ধার নিয়েছেন তার জন্য কিছু টাকা প্রতিমাসেই কেটে নেয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে সিদ্ধার্থ মারা গেলে তাঁর স্ত্রী সুনীতি সর্বসাকুল্যে তিন হাজার টাকা উঠাতে পারবেন। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় সুন্দরবন আর সমুদ্রের দিকে, মুসলমান আর নমঃশূদ্রের ছেলেদের কলেজে চাকরি নেয়ার চেষ্টা করেন। বাসমতী থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরবর্তী ঝাউডাঙার ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রিন্সিপালের চাকরিতে সিদ্ধার্থ সেন পেতে পারেন আড়াই 'শ টাকা মাইনে, পঁচিশ টাকা ডিএ। পাড়াগাঁর কলেজে বেশি বেতনেও যাওয়া হয়ে ওঠেনা শেষাবধি বরং আসন্ন দেশবিভাগের উদ্বাস্তু-চেতনা তাঁদের আকর্ষণ করে মানাসিকভাবে নিয়ে চলে কলকাতায়। দেশবিভাগের মতই দ্বৈমাতৃকচেতনা নিয়ে উদ্ভাসিত হয় নায়ক শেষাবধি :

> সিদ্ধার্থ চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'কিন্তু পরাধীন বা স্বাধীনদেশে কারো ব্যাপারের কোনো মীমাংসা হয়না। বাসমতী কলেজের দু-চারজন প্রফেসরের হয়ত সুবিধা হতে পারে, কিন্তু মোটামুটি মাষ্টারদের কোনো লাভ হবে না, আরো ক্ষতি হবে কি না বলতে পারছি না।[৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২.২ জলপাইহাটি

১৯৩৮–১৯৪৬ সালের সামাজিক পটভূমি বিবৃত হয়েছে *জলপাইহাটি* (১৯৪৮) উপন্যাসে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর ঔপন্যাসিক-জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে আত্মিক সংকটের রূপভাষ্য তৈরি করেছেন। *বিভা* (১৯৩৩), *প্রেতিনীর রূপকথা* (১৯৩৩), *কারুবাসনা* (১৯৩৩), *জীবন প্রণালী* (১৯৩৩), *মৃণাল* (১৯৩৩) প্রভৃতি উপন্যাসে অস্তিত্বগত সংকট বিশেষত তাঁর নিজস্ব দাম্পত্যগ্লানিকে রূপ দিয়েছেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধান হয়ে ওঠে সামাজিক বাস্তবতা : *জলপাইহাটি* তার সার্থক ফসল। সেখানে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শোষণ, অনাচার ও বৈষম্যের অমোঘচিত্র অঙ্কন করেছেন জীবনানন্দ দাশ। কলেজ পরিচালনা পরিষদে উঠতি ধনী ও সামন্তদের আধিপত্যের ভিতর অধ্যাপকদের করুণ অবস্থা চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। কলেজ কমিটিতে অধিকাংশ সদস্য এসেছেন আইনজীবী সম্প্রদায় থেকে এবং অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার ও জমিদার বংশের লোক। ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করছে, সরকার পরিচালনায় তাদের অদক্ষতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অগণতান্ত্রিক মনোভাব কলেজ পরিচালনার অনিয়মের মধ্যে রেখাপাত করেছে। হরিলাল বাবুদের স্বৈরাচার ও অগণতান্ত্রিক বৈষম্যচেতনা ব্রিটিশ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। উপন্যাসে পরাধীনচেতনার প্রতিভূ হয়েছে সেক্রেটারি হরিলাল বাবু, প্রিন্সিপাল কালীশঙ্কর, সদস্য হিমাংশু চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক কামাখ্যা ঘোষাল ও ধরণী মজুমদার। এই স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব থেকে মুক্তির প্রতীক হয়েছে কলেজ কমিটির সদস্য ব্রজমাধব এবং অধ্যাপক নিশীথ সেন। বেসরকারি কলেজে কুড়ি-বাইশ বৎসর যাবৎ[৫] ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন নিশীথ সেন, বেতন পাচ্ছেন দেড়শো টাকা। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ–ছেচল্লিশে যখন চালের মণ বত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকায় উঠানামা করছে—মধ্যবিত্তের আর্থিক জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। সোয়া দুশ–আড়াইশো টাকা মাইনে না দিলে কলেজে কাজ না করার সংকল্প নিয়ে এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করেন নিশীথ সেন। ছুটি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রিন্সিপাল ছিঁড়ে ফেলেন দরখাস্ত। এর বিরুদ্ধে ব্রজমাধব 'হেলদি অপজিশনের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অন্যদের দাবি উপেক্ষা করে সেক্রেটারি হরিলাল পেটোয়া প্রফেসরদের বেতন বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন চল্লিশ–পঞ্চাশ–ষাট টাকা করে। হরিলাল বাবুর জামাই কামাখ্যা ঘোষালকে ষাট টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল এক লাফে, এক ডাকে। হরিলালের কথায় হিমাংশু চক্রবর্তীর শালা ধরণী মজুমদারকে পঞ্চাশ টাকা বাড়ানো হলো। অথচ নিশীথ সেনকে জানানো হল আসন্ন চাকরিচ্যুতির সংবাদ।

কালীশঙ্কর বেতন পাচ্ছিলেন চারশো টাকা—মে মাসের গভর্নিং বডির বাসন্তী–নিদাঘ বৈঠকে বাড়িয়ে করা হবে সোয়া পাঁচশো টাকা। ব্রজমাধব প্রস্তাব করেন প্রিন্সিপালকে টাকা বেশি না দিয়ে নিচের দিকে যেসব প্রফেসররা কম টাকা পাচ্ছেন তাদের বেতন বাড়িয়ে দিতে। ভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে উপন্যাসে, ব্রজমাধব ও প্রিন্সিপাল কালীশঙ্করের আলাপচারিতার মধ্যে তার স্মারক :

> খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে ছেলেদের কাছে উপস্থিত হওয়া চাইতো। মনে একটা সুস্থিরতা থাকা চাই, না হলে কী করে ভালো করে পড়াবেন মাস্টারেরা? কী করে উপকার হবে কলেজের?

ব্রজমাধব বলেন :

> 'কলেজের কোনো অপকার হচ্ছেনা। স্টাফে যে-টিচারেরা আছে, তাঁরা ঠিকমতোই পড়াচ্ছেন', প্রিন্সিপাল কালীশঙ্কর বাবু বললেন, 'একশো–সোয়াশো টাকায় খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, কলেজ গুঁতোচ্ছেন, হাঁড়ি চাচা পাখির মতো চেঁচিয়ে। বেশ, বেশ আছেন। কেন মাইনে বাড়িয়ে আমড়াগাছি শিখিয়ে মাথা খারাপ করে দেবেন তাঁদের?'[৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুযোগ-সুবিধার ব্যবধানের মধ্যে ফুটে ওঠে প্রিন্সিপাল ও সাধারণ শিক্ষকদের জীবন-যাপনের আকাশ-পাতাল পার্থক্যের চিত্র। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় : প্রিন্সিপাল নিরালা কোয়ার্টার্স পাবেন নিম-ঝাউ-আমলকি-জামগাছের ছায়া-রোদের ভিতর। সুন্দর একটা কাঠের একতলা বাংলো বাড়ি পাবেন প্রিন্সিপাল—বাড়ির ছাদ অ্যাসবেসটসের, অনেক উঁচুতে মেঝের পাটাতন। চোঙের মত বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়—আশ্রম মন্দিরের মত যার স্থাপত্য।

বাসমতীর উপাখ্যান-এ অধ্যাপক সিদ্ধার্থ কলেরা-উপদ্রুত মুসলমান পাড়ায় সেবা করে হয়েছেন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রতীক। *জলপাইহাটি*-তে অধ্যাপকের ছেলে হারীত শুধু অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক হিসাবে নয়, আবির্ভূত হয়েছে বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে। কলকাতায় ঘুরে বেড়ায় যে বিপ্লবী চেতনা বুকে নিয়ে, জলপাইহাটিতে এসে অবতীর্ণ হয় সমাজসেবীর ভূমিকায়। নিরন্নের মুখে খাদ্য তুলে দেবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায় হারীত।

জলপাইহাটি কলেজের সমস্যাকে হারীত সাম্যবাদী আদর্শ দিয়ে বিশ্লেষণ করে :

> হরিলাল, কালীশঙ্কর, হিমাংশু চক্রবর্তী, এই নিয়েই তো দেশ। কলকাতায় গিয়ে এদের এড়াবেন? সেখানে তো আরো চেকনাই বেড়ে গেছে এদের। এদের বিশেষ কোনো দোষ নেই। অনেক সময়ই সজ্ঞানে পাপ করেনা এরা। অনেক দিনের বাসি রক্ত জমেছে এদের-চারদিকে এত দিন ধরে এত অসদ্ব্যবস্থা বলে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তাই। নাকে কাপড় দিয়ে সরে গেলে লাভ নেই ; বদ রক্তগুলো বের করে দিতে হয়।[৭]

জলপাইহাটি কলেজের ছাত্রী সুলেখার ওপর প্রভাব পড়ে প্রফেসর নিশীথ সেনের। হারীতের মত সুলেখা লেনিন, স্তালিন বা বুখারিনের মতবাদে বিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসী কংগ্রেসের শান্তি-সংহতি ও দেশগঠনের প্রক্রিয়ায়। কিন্তু শিক্ষকদের দুর্দশা তাঁকে পীড়িত করে। সুলেখা হারীতের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করে :

> কে পে-কমিশন বসাল? কেন বেসরকারি ইস্কুল-কলেজের মাস্টাররা পে-কমিশনের সুবিধে পাচ্ছেনা। কেন বেসরকারি ইস্কুল-কলেজ আজও টিকে আছে? সেগুলোকে হামান দিস্তায় ছেঁচে ফেলা হচ্ছেনা কেন? কেন সব ইস্কুল-কলেজ স্টেটের হাতে নেওয়া হচ্ছে না? গভর্নমেন্টের কেরানি তো ভালো, গভর্নমেন্টের পিওন-পেয়াদাদেরও আজ ধনে-মানে মাস্টারদের চেয়ে বড় করে দেওয়া হচ্ছে। কী প্রমাণ করা হচ্ছে? ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চলে যাবার পর এ কাজের [কাদের] হাতে রাজত্ব দেওয়া হয়েছে। ... সব ইস্কুল-কলেজ ভেঙে ফেলে পুলিশ হয়ে যাওয়া উচিত তোমার বাবাদের। সমস্ত ইউনিয়ন ভরে পুলিশ আর ছেপাইয়ের ছাউনি উঠুক, বরবাদ হয়ে যাক সমস্ত ইস্কুল-কলেজ।[৮]

উপন্যাসের শেষে দেখি নায়ক চব্বিশ বছর প্রাইভেট কলেজে চাকরি শেষে এসে পথে দাঁড়িয়েছে। কোনো সরকারি কলেজে কাজ করলে লম্বা ছুটি নিয়ে, তারপর পেনশন নিয়ে, কলকাতার টালিগঞ্জ, বেহালা, যাদবপুর সোনারপুর বা লক্ষ্মীকান্তপুরে একটা রুম অন্তত জোগাড় করে নিরিবিলিতে লিখতে পড়তে পারত। পাকিস্তান থেকে সুমনাকে নিয়ে আসতে পারত, মনের আলোর নির্দেশে নিয়োজিত হতে পারত দেশ-দশের কাজে। শিক্ষকদের প্রতি এই সরকারি-বেসরকারি বৈষম্য ইংরেজ আমলে হতে পারে কিন্তু একটা স্বাধীন দেশে হতে পারেনা—এরকমভাবে ভাবে জুলেখা। দেশত্যাগী একজন অধ্যাপককে ফিরিয়ে আনতে চায় জলপাইহাটির বিদ্বৎসমাজও। কলকাতা থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসেন নিশীথ সেন। থাইসিসে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় কলকাতায় মারা যায় ভানু, দেশে রক্তশূন্যতায় মৃত্যুবরণ করেছে নিশীথের স্ত্রী সুমনা। সুমনার মৃত্যু যেন পরিচিত দেশ-সময়-পৃথিবীরই রক্তশূন্যতাজনিত মৃত্যু। জীবনানন্দ দাশ মন্তব্য করেন :

> ... যেন চেনা সময়ের মৃত্যু হচ্ছে অন্ধকার পৃথিবীতে।[৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. উপসংহার

দ্বৈত শাসন আমলের ভারতীয় শিক্ষার যুগে (১৯১৯–১৯৪৭) জীবনানন্দ দাশ শুরু করেন বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনার জীবন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর, বাঙালি জাতীয়তাবাদের মৃত্যুর যুগে, শিক্ষা–ব্যবস্থায় যে নৈরাজ্য নেমে আসে তার ফলস্বরূপ, জীবনানন্দ দাশ থাকেন কার্যত বেকার। ভারত শাসন আইন জারির বছর (১৯৩৫) জীবনানন্দ দাশ যোগদান করেন বি. এম. কলেজে, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের যুগে (১৯৩৭–১৯৪৭) জীবনানন্দ যাপন করেন তাঁর কবি–জীবনের সর্বোত্তম সাফল্যের কাল। কিন্তু দ্বৈত শাসন–আমলের অনিশ্চিত, অব্যবস্থিত–চিত্ততার রেশ থেকে যায় এআমলেও—যে ব্যবস্থার করুণচিত্র বিধৃত উপন্যাস দুটির দৃশ্য–পরম্পরায়। বি. এম. কলেজে অধ্যাপনাকালে রচিত 'সৃষ্টির তীরে' (পত্রিকায় প্রকাশ : ১৯৪৩) কবিতায় পাই তারই রূপাভিব্যক্তি। ঔপনিবেশিক শিক্ষা–ব্যবস্থায় কবি দেখেছেন শিক্ষার করুণ রূপ। এই হতাশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময় : 'পৃথিবীতে নেই কোন বিশুদ্ধ চাকরি।' এখনো বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষা–ব্যবস্থায় অক্ষুণ্ণ দেখি ব্রিটিশ জলপাইহাটি কলেজ ও বাসমতী কলেজের ধ্রুবচিত্র। একে বলতে পারি জীবনানন্দ–সময়ের বেসরকারি শিক্ষা–ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। এতেই ধরা পড়ে উপন্যাস যুগলের কালাতিক্রমী গ্রহণযোগ্যতা।

তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার* উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯ ; পৃ. ৫৫

২. *বাসমতীর উপাখ্যান, জীবনানন্দ সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, দেবেশ রায় (সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৯৫ ; পৃ. ১৭২

৩. বি এম. স্কুল ও বিএম কলেজের শিক্ষক–ছাত্রদের রাজনীতিক ভূমিকার কথা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে চাকরিচ্যুত হন কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বি.এম স্কুলের শিক্ষক জ্ঞান চক্রবর্তী, শ্রীশচন্দ্র দাস ও রামচন্দ্র গুপ্ত। স্মরণীয় : বিএম কলেজের অধ্যাপিকা শান্তিসুধা ঘোষ এবং অধ্যাপক প্রফুল্ল রঞ্জন চক্রবর্তী ছাত্রদের নিয়ে বরিশালে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ইংরেজ সরকার শান্তি সুধা ঘোষ ও অধ্যাপক প্রফুল্ল রঞ্জন চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে। এসময়ে বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এফ ও বেল (১৯৪১–১৯৪৩)। (সিরাজউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০, ৪৮০)।

৪. *বাসমতীর উপাখ্যান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

৫. বাসমতীর উপাখ্যান এবং জলপাইহাটিকে বলা যায় আত্মজৈবনিক উপন্যাস। বেসরকারি কলেজে কুড়ি–বাইশ বছর চাকরি করেন ইংরেজির অধ্যাপক নিশীথ সেন—জীবনানন্দ দাশও এ সময়কালে পূর্ণ করেন চাকরির চব্বিশ বছর (সিটি কলেজে যোগদান ১৯২২–১৯৪৬ বিএম কলেজ থেকে চাকরিত্যাগ)। বাসমতীর উপাখ্যানে চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে সামাজিক জিজ্ঞাসা জাগে প্রফেসর সিদ্ধার্থ সেনের মনে। মহামারীর প্রাক্কালে (১৯৪৩) জীবনানন্দ দাশও (জন্ম ১৮৯৯) পৌঁছেন চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে।

৬. *জলপাইহাটি, জীবনানন্দ সমগ্র* প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সং., দেবেশ রায় (সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৭ ; পৃ. ৮৬।

৭. ৮ ও ৯ প্রাগুক্ত, যথাক্রমে পৃ. ২৪৫, ২৪১–২৪২ ও ২৮৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের 'জীবনযাপন' : প্রসঙ্গ থিয়েটার ভাবনা

লুৎফর রহমান

জীবনানন্দ দাশ শুদ্ধতম কবি। অনন্য সাধারণ স্রষ্টা। শিল্পী সত্তার উদ্বোধনে তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় রোমান্টিকতাবাদ জীবনানন্দের বিশ্বদর্শী মানসপ্রবণতার কেন্দ্রশক্তি। অতীত চারিতায় বিশ শতকের ইউরোপীয় কবিদের বয়নরীতির ধরন স্পষ্ট। অনেক সমালোচক তাঁর কবিতাকে স্বভাববাদী (Naturalist) ও পরাবাস্তববাদের ধারায় বিচার করতে উৎসাহী। অবশ্য তাঁর কবিতার 'অতীত' রূপকথার আদলে–আবরণে কার্যত ইতিহাসের এক বিবর্তনকেই চিত্রিত করে। মানুষ ও মানবিক সংঘাতের উৎস অনুসন্ধানী জীবনানন্দের পৃথিবীর মানুষগুলো ছিন্ন ভিন্ন বেদনায় বেতের ফলের মতো, নীলাভ তাদের চোখ অথচ তাঁর সৃষ্টির ভুবন বর্ণ–বৈভবে সমুজ্জ্বল বিচিত্র রঙের সমাহার। সেখানে Impressionist শিল্পীর তুলিতে অঙ্কিত ছবির পর ছবি, নয়ন মনের কার্ণিশে ঝোলে। কমলা, হলুদ, ধূসর, লাল, খয়েরি, সকরুণ সাদা, সবুজ, সোনালি, নীল, নানা রঙের উপাদানের উৎস সর্বসংহা প্রকৃতি। জীবনানন্দের মানস আশ্রয়–নিঃসঙ্গ মানুষের ভালোবাসার উৎস, পাত্র। প্রখর জীবনবাদী কবি স্বকালকে মূর্ত করেন তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে। হতাশা, ক্লান্তি, অসফলতার জন্য বেদনাবোধ, আপাত ব্যর্থতার মুহূর্তে অতীত মানুষের সফলতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ বস্তুত জীবনের প্রতি কবির অত্যধিক মমত্ববোধকেই প্রতিষ্ঠিত করে। জীবনের কাছে অসীম প্রত্যাশা, তার অর্থ অনুসন্ধান, বিশ্বরহস্য উদঘাটন প্রয়াস, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা Romantic কবি মানসের প্রকৃতি (Nature)। কালের ধ্বংস, অপচয়, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যকার সামাজিক উপসর্গ জীবনানন্দের কাব্যে উপস্থাপিত হয় জীবনকে আরও অধিকমাত্রায় উপলব্ধির জন্য, সৌন্দর্য ও শান্তির প্রত্যাশায়, প্রেম ও সফলতার কাঙ্ক্ষিত ভুবনে পৌঁছাবার জন্য। সে জন্যেই তিনি মজ্জমান বঙ্গোপসাগরের তীরবাসী পরাধীন এক বাঙালি হিসেবে প্রবল হতাশায় নাস্তিক্যকে বরণ করেন না সাগ্রহে। উপলব্ধির বিস্তৃত বিশ্বে তিনি বিচিত্র নানা উদ্ভিদ, প্রাণী, ফুল, ফল, চলমানতাকে যেমন চিত্রিত করেন তেমনি প্রকৃতির বিপরীতে মানুষের ক্ষুদ্রত্বকেও মূর্ত রূপ দেন। কবি জীবনানন্দ সমকালীন ইউরোপীয় কাব্যের গতি–প্রকৃতি এবং প্রতিটি বাঁক সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ অবহিত। অন্যদিকে ঐতিহ্য–সচেতন কবি হিসেবে তাঁর চেতনায় ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের কাব্য, নাটক, উপন্যাসের প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন রচনা পর্যালোচনায় সে সত্যের বাস্তবতা প্রমাণ করা সম্ভব।

জীবনানন্দের 'জীবনযাপন' নামক অসমাপ্ত উপন্যাস আমাদের আলোচ্য। সহৃদয় হৃদয় সংবেদী মাত্রেই নির্বাচিত গ্রন্থে ভিন্ন এক জীবনানন্দের সঙ্গে পরিচিত হবেন এরূপ বিবেচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৈয়ায়িক বলে মনে করি। 'জীবনযাপন' উপন্যাসে সমকালীন নাটক, মঞ্চ নাটক, ও নাট্যকারদের সারবত্তাশূন্য অসার জীবনের ফাঁকিটিকে গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে। অন্যদিকে Bengali novel today, The Novel in Bengali এবং Future of the Bengali Novel নামক প্রবন্ধে জীবনানন্দের সময় পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকদের সৃজনকৌশল ইত্যকার প্রসঙ্গ অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ তথ্যপ্রমাণসহ আলোচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার, সতীনাথ ভাদুড়ী, মতিনন্দী প্রমুখ কথাসাহিত্যিক এবং তাঁদের উত্তর পুরুষদের শিল্পকর্মের আলোকে বাংলা উপন্যাসের সমকালীন রূপ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণজাত অভিজ্ঞতা অভিব্যক্তি পেয়েছে।

একথা সত্য যে, জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য সম্পর্কিত বোধ তৈরিতে সাহায্য করেন বিশ্ব সাহিত্যের বিভিন্ন ভাষার ঔপন্যাসিকবৃন্দ। তন্মধ্যে Proust, James Joyce, D. H. Lawrence, Charles Dickens, Leo Tolstoy, Flaubert, Goethe, Henry James, Balzac, Thomas Mann, Henry Fielding, Virginia Woolf, Malraux, Koestler প্রমুখের রচনা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। সঙ্গতকারণেই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জীবনানন্দ দাশের গল্প-উপন্যাস রচনাপ্রয়াস শিল্পীর খেয়াল মাত্র নয়—নয় মাধ্যম বিশেষে স্বীয় ক্ষমতার প্রতিফলন ঘটাবার প্রচেষ্টা। কথাসাহিত্যে জীবনানন্দ দাশের অভিষেক ঘটে কাব্য-কথায় জীবনের যে রূপের প্রকাশ ঘটানো প্রায় অসম্ভব তারই অভিব্যক্তি দানের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কবিতার অপরিসর ক্ষেত্রে অব্যক্ত জীবনসত্যের প্রকাশ প্রত্যাশায় এবং বাংলা উপন্যাস, গল্পের একটি নতুন বুননরীতির আত্যন্তিক অন্বেষায়। প্রাসঙ্গিক কারণেই বলা যায়—জীবনানন্দ দাশের গল্পের জীবন কাব্যের ভুবন থেকে উদ্‌গত বাস্তব সমাজ সংসারের রক্তাক্ত অসফল অথচ জীবনপ্রেমী মানুষের কলরবে মুখর। গতানুগতিক সাংসারিক জীব তারা নয়—সংসারের বৃত্তে জীবনসংগ্রামের নানান টানাপোড়েনের মধ্যে অবস্থান করেও তারা গড়পরতা গৃহস্থদের থেকে আলাদা। তাদের ভালোবাসার রীতি স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র তাদের ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নের সাধ, জীবনের স্বাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত উৎস থেকে উদ্ভূত তাদের যন্ত্রণা। দৈনন্দিন জীবনে নির্লিপ্ত মানুষগুলো সামান্য শান্তির স্পর্শ লাভ করে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীব ও উদ্ভিদ জগতের গভীর সান্নিধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নীতিশিক্ষার সরলপথে চলা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'গোরা' এবং ছোটগল্পের অকুণ্ঠ প্রশংসা করা সত্ত্বেও সেই কনকপথের রেখায় পা ফেলেন নি। বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থিত জীবনদর্শন তাঁর ছিল না—নরনারীর মনোলোকের যে আঁধারে পূর্ববর্তী কোনো ঔপন্যাসিক আলোকসম্পাত করেন নি সেই অন্ধকারে অনুসন্ধানী টর্চের আলো ফেলেন জীবনানন্দ দাশ। জীবনের অজ্ঞাত, অলিখিত বিচিত্র রহস্য আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের নানামুখি টানাপোড়েন .বিশেষত শিক্ষিত বেকার যুবকের অসফল জীবনের ব্যর্থতা, স্ত্রীর অবহেলায় প্রেমহীন নিরর্থক নষ্ট শসা, লাউফুলের পরিণতি পায়। কেজো মানুষের পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সাফল্যই সামাজিক জীবনে ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি দান করে। প্রেমজ স্বচ্ছল তারও উৎস অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। জীবনানন্দ দাশ তাঁর গল্প, উপন্যাসের মানুষদের উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন। রক্তাক্ত, বাস্তব সমাজ সম্পর্কের সংঘাতে ক্ষতাক্ত মানুষগুলোর প্রখর জীবনবোধই খলনায়ক রূপে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক অজিত পূর্বোক্ত চরিত্রদেরই প্রতিনিধি। থিয়েটারের প্রতি তার অস্বাভাবিক প্রীতিই নিয়তি রূপে অজিতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে নিরত। সমাজ–সংসার–আত্মীয়–স্বজন এমনকি গর্ভধারিণী মা পর্যন্ত তাকে অস্বীকার করে। সমাজ গর্হিত নটবৃত্তি গ্রহণের অপরাধে অজিতকে শাস্তি বরণ করে প্রায় নির্বাসন জীবন যাপন করতে হয়। 'জীবন–যাপন' উপন্যাসে আমরা অজিতের সেই জীবনের পরিচয় লাভ করি, যেখানে বাংলা থিয়েটারের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত আছে—আছে বর্তমানকালের জিজ্ঞাসা এবং ভাবীকালের সম্ভাবনার ইঙ্গিত। অজিত একা নয় পূর্ণিমাও সেই ভূবনের এক প্রান্তে বসে স্মৃতি বিজড়িত জন্মভূমি হিজল ডাঙ্গার ছবি আঁকে মনে। বস্তুত অজিত–পূর্ণিমার জীবন ভাবনার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দ দাশের থিয়েটার ভাবনার এক স্বচ্ছরূপের প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্য অর্থকীর্তি, স্বচ্ছলতা, প্রেম, নারী, সন্তান এসব কিছুর প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও একজন মানুষ আত্মহত্যা করেছে। কবি সে সম্পর্কে বলেন—"আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/ আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/ খেলা করে; আমাদের ক্লান্ত করে ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ...।" তদুপরি এই ক্লান্ত মানবের আত্মহত্যা কবির সমর্থন লাভে হয়েছে ব্যর্থ। কবিতার অন্তে তিনি অসমর্থনসূচক নিম্নবর্ণিত যুক্তি উপস্থাপন করেন। অশত্থের সজীব ডাল প্রতিবাদ করেছে হয়তো, জোনাকিরা সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে মাখা–মাখি করেছে। চারপাশের জঙ্গম জীবন—ফড়িং, ব্যাঙ, ইঁদুর, দোয়েল, শিশু প্রভৃতি প্রকৃতি–রাজ্যের প্রাণীকূল জীবনের প্রতি তাদের নিজ নিজ মমত্ববোধের পরিচয়কে করেছে সমুন্নত। তাদের কণ্ঠে জীবনের ভাড়ার শূন্য করার অমোঘ ও দৃঢ় অঙ্গীকার বিঘোষিত।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পালটায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু–একটা ইঁদুর এবার—'
হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি
ক'রে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

এই যুক্তি অনস্বীকার্য, অনতিক্রম্য। জীবনের স্বাভাবিক ধর্মে সকলেই অভিন্ন—প্রতিটি জীবনের বেঁচে থাকার ইচ্ছে প্রেম, ভালোবাসা, প্রিয়ের জন্য ব্যাকুলতা দুঃখ প্রকাশের ভাষা অভিন্ন। সেক্ষেত্রে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। 'জীবন কবিতায়' ৩৪টি অনুচ্ছেদে বস্তুবিশ্বে জীবনের আবর্তন, বিবর্তনের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে, স্থান পেয়েছে সফলতা, বিফলতার নানান খতিয়ান। কিন্তু তীব্র সেখানে জীবন–মৃত্যুর দ্বন্দ্ব। বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার কলরব দীর্ঘ এই কবিতার চরণে চরণে জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে চিত্রিত করে—

এই রাত্রি—নক্ষত্র সমুদ্র লয়ে এমন বিশাল
আকাশের বুক থেকে পড়িত না যদি আর ক্ষয়ে।
রয়ে যেত,—যে গান শুনিনি আর তাহার স্মৃতির মত হয়ে [অনুচ্ছেদ–৩]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা অসম্ভব সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মের কাছে তাই—'যে পাতা সবুজ ছিল—তবুও হলুদ হতে হয় [৪]'। জীবনের প্রতি মমত্ববোধ প্রখর ও গভীর হয় এই সত্য উপলব্ধির ধারায় 'জীবন পুড়িয়া যায়—আমরাও ঝরে পড়ে যাই!' আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মতো শক্তি—তবু শক্তি চাই [১০]। কিন্তু এ চাওয়া সভ্যতার নব প্রত্যুষের স্বপ্ন দেখায়, একটি সুন্দর আগামীর জন্মদানের জন্য তাড়িত করে। তা সত্ত্বেও ক্ষয়, অপচয় জীবনকে ক্ষমা করে না—জীবনও থাকে না থেমে।

> ছাইয়ে যে আগুন ছিল সেই সবও হয়ে যায় ছাই!
> তবুও আরেকবার সব ভস্মে অন্তরের আগুন ধরাই [অনুচ্ছেদ-১২]।

এ আগুন জ্বলে, জ্বালায়—প্রাণের বিপুল শক্তিরূপে যখন সে জ্বলে তখন সৃষ্টির উন্মাদনায় জীবন হয়ে ওঠে অস্থির গতি চঞ্চল—যখন জ্বালায় দাহন দহনে সব পুড়িয়ে স্বাদ গন্ধহীন এক অদৃষ্টপূর্ব জগতে পৌঁছে দেয়। তখনকার উপলব্ধি—

> পৃথিবীর বন হয়ে—ঝড়ের গতির মত হয়ে,
> বিদ্যুতের মত হয়ে আকাশের মেঘে ইতস্তত;
> একবার মৃত্যু লয়ে—একবার জীবনের লয়ে
> ঘূর্ণির মতন বয়ে যে-বাতাস ছোঁড়ে,—তার মত গেছি বয়ে [অনুচ্ছেদ-১৩]।

উক্ত প্রবহমাণতার অন্তর্নিহিত যে-বেগ তা ভয়ঙ্করের স্পর্শধন্য বলেই তার ক্রিয়া মোটেও সুখপ্রদ নয়—নয় নপুংসকত্বে আকীর্ণ। এর ভাঁজে পরতে আছে তীব্র যন্ত্রণা, রক্তাক্ত হবার সুকঠিন অভিজ্ঞতা। একই সঙ্গে তা সৃজনক্ষমতার অমিত সম্ভাবনায় কনককান্তিময় জন্ম-মৃত্যুর এই খেয়াপারে দাঁড়িয়ে কবি জীবনকে প্রত্যক্ষ করেন অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে। মৃত্যু সে কারণেই জীবনানন্দীয় বিশ্বে মানুষকে আতঙ্কিত ও নিরুৎসাহিত করে না, মানব সেখানে কর্মবিমুখ নয় সে জন্যেই। কারণ ভারতীয় দর্শনে আস্থাশীল মানবচেতনায় মৃত্যু রূপান্তরের ধারাক্রম, পূনর্জন্মের পথ সৃজনকারী মৃত্যু জীবনের আর এক প্রারম্ভের সূচক। সে বোধ থেকেই কবি বলেন—

> তবুও ইশারা করে ফাল্গুন রাতের গন্ধ বয়ে
> মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে
> জীবন ডাকিতে আসে;—হয় নাই—গিয়েছে যা হয়ে,
> মৃত্যুরেও ডাক তুমি সেই ব্যথা আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা লয়ে [অনুচ্ছেদ-২৪]!

জীবনের এই অমিতশক্তি ও দুঃসাহস কখনও মৃত্যুভীতি থেকে উদ্ভূত হয় না—এর কেন্দ্রবিন্দু প্রেম। জাগতিক সত্য অত্যধিক ক্ষমতার বলেই মৃত্যুর সঙ্গে চলে জীবনের মিতালী। এর অভ্যন্তরে Romantic কবি আত্মার যে রূপ মূর্তিমান হয় তা পাঠক চিত্তে বিস্ময় উদ্রেক করে।

> মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো—প্রিয়ার মতন।
> চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকায়েছি মুখ [অনুচ্ছেদ-২৫]

মৃত্যু যেন জননী-জায়া-ভগ্নি রূপে আবির্ভূত হয় কবি চেতনায়। যেন সে আসে বন্ধুর সহৃদয় সৌহার্দ্য নিয়ে, প্রিয়ার অপরিমেয় প্রেম নিয়ে। জীবনানন্দের অগ্রজ কবির নিকট এই মৃত্যুই একদিন 'শ্যাম' রূপে ধরা দিয়েছিল। প্রেমিকের নিকট প্রেমাস্পদা নিশ্চিন্ত নিরাপদ—তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিত শক্তি অজেয়। জীবন এবং মৃত্যু দ্বৈতাদ্বৈতের রাখি-বন্ধনের মাধ্যমে জীবনকেই ফলবান করে।

মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন [অনুচ্ছেদ-৩৪]।

মড়ার কবর থেকে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসার অর্থ জীবনেই ফিরে আসা। জীবনের প্রতি এই সুগভীর মমত্ববোধ আত্মহত্যার বিয়োগরেখাকে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে দেয়। ইতিহাসের গতির অভ্যন্তরে তিনি জীবনের অনন্ত প্রবাহ প্রত্যক্ষ করেন। মানুষের সম্ভাবনার কল্পনায় আবেগ অনুপস্থিত, Romantic দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণসহ তাঁর অভিজ্ঞতায় স্থিত ঐতিহ্যস্নাত এক বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে—

কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;
... ...
সুচেতনা, এই পথ আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ

এই বাস্তবতা রূপময় যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে মানুষের সংগ্রামশীল জীবনচেতনার মধ্য দিয়ে। মিশর, বেবিলন, এশিরিয় সভ্যতা, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যাবতীয় স্থাপনা তাঁর কাব্যের নায়িকার দেহ-সৌষ্ঠবের উপমা। কবির প্রত্যক্ষণ তাঁকে এমন এক সৌন্দর্য চেতনার স্তরে পৌঁছে দেয় যেখানে Romanticism ও Realism অভেদাত্মক।

জীবনানন্দের কাব্যের নায়িকারা ইতিহাসের এক বাস্তব সমাজ পরিপ্রেক্ষিত থেকে কবির Romantic আবেগকে চরিতার্থতা দানের নিমিত্ত আসে বিচিত্র রূপে, নানা নামে রমনীয় তারা। কিন্তু সেই সব নারীর শারীরিক অবয়বে কামগন্ধ নেই, আছে প্রেমানুসন্ধান। আবেগতাড়িত সে প্রেমভাবনায় রয়েছে অগাধ সৌন্দর্যতৃষ্ণা। সৌন্দর্যতৃষ্ণা নিবারিত হচ্ছে রূপকথা ও পুরাণের বা লোকপুরাণের অদেখা স্বপ্নারীদের রূপের অসামান্যতায়। এই Romantic ভাবনা অতঃপর বাস্তব রূপ প্রাপ্ত হয়—প্রাচীন নগর স্থাপত্যের বিচিত্র কারুকাজের বস্তুগত দৃষ্টান্তের উপস্থিতিতে। বিদিশা, শ্রাবস্তী, উজ্জয়নীর নগর স্থাপত্যের সৌকর্য এবং তাদের অলঙ্করণে প্রথাগতভাবে নারীর দেহ-সৌষ্ঠবের প্রাধান্য ছিল সেই সব চিত্রে ধৃত নারীগণ জীবনানন্দ দাশের কাব্যসুন্দরীদের দৃষ্টান্ত। সুরঞ্জনা, সবিতা, বনলতা, বেহুলা, লহনা, শঙ্খমালা, মানিকমালাদের তাই বাস্তব সমাজের গৃহস্থ পাড়ায় এখনও প্রত্যক্ষ করা যায় তারা—

দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে : সন্ধ্যায় দাঁড়ালো সে পুকুরের ধারে,
খইরঙা হাসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনীর দেশে—
'পরণ কথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,

সুতরাং নিশ্চিতভাবেই একথা বলা যায় যে, জীবনানন্দের শিল্পী মানস গড়ে ওঠে ইউরোপীয় Romanticism ও Realism ভারতীয় অতীত-ঐতিহ্য এবং সমকালীন বাঙালি সমাজের প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সংমিশ্রণে। এ সত্যও অনস্বীকার্য যে, প্রচণ্ড জীবনবাদী কবির আত্মাভিমান কবিতার পঙক্তিমালায় কখনও কখনও এরূপ আবহ সৃজন করে যে, বিশ্বাস করতে সাধ জাগে তিনি জীবন-বিমুখ। প্রকৃত প্রস্তাবে না পাওয়ার ব্যর্থতারোধ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈপরীত্যই তাকে বিষণ্ন করেছে, করেছে সমাজের গড়পরতা শিল্পীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে আলাদা। জীবনভাবনা ও পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষণ উপলব্ধির স্তর বেয়ে সৃষ্টির ভুবনে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ঐ আলাদা হওয়ার কারণেই। সকলের ভিড়ে যেমন অনায়াসেই তাঁকে চেনা যায় মুখ দেখে তেমনি কবি ভাষা, বয়ন ও উপস্থাপন-কৌশল জীবনানন্দ দাশকে অনায়াসেই বাংলা কবিতার ভুবনে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখিয়ে দেয় স্বতন্ত্র একজন হিসেবে। সোচ্চার উচ্চারণে একথাও জানিয়ে দেন—কয়েকটি লাইন কবিতায় :

কেউ যাহা জানে নাই—কোন এক বাণী—
আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছ যে—সুর—
ফুরায়েছে—পুরানোতো—কোন এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন
তাই আমি আসিয়াছি—আমার মতন
আর নাই কেউ।

যে কবির কবিতায় পঙ্‌ক্তিমালায় নিজের প্রতি এহেন বিশ্বাস যে দাঢ্য ও পৌরুষকে মূর্তিমান করে সেই কবি আত্মহনন, মৃত্যু ও ধ্বংসকে নির্দ্বিধায় বরণ করবেন এ নিতান্তই বালখিল্য চিন্তা। কবিতা ও শিল্পী সম্পর্কিত তাঁর ধারণা একান্তই তাঁর নিজস্ব এবং সুচিন্তিত। জীবনানন্দ দাশ রচিত 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্বোক্ত বোধের এক বিশেষ দিক উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়—শাশ্বত রস, সাহিত্যিক কবি দান্তে, শেক্সপীয়র এবং Goethe প্রমুখের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন—"হয়তো তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর এবং ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের মানুষ বলে একটি তৃতীয় সূক্ষ্মানুভূতি ও সংবেদনশীলতা সব সময়েই তাঁর সাহিত্যে রয়েছে যা বিদেশের পূর্বগামী কবিদের ভিতরে নেই।" রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর এই উপলব্ধি যে অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতাপ্রসূত তার একটি বিস্তৃত পরিচয় আলোচ্য ক্ষেত্রে আবশ্যক। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন,—"এক সময়ে আমাদের বাংলাদেশের তথাকথিত সাহিত্য-সমালোচকের ভিতর আলোচনার একটা রেওয়াজ ছিল এই যে, রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতান্ত্রিক নয়। এ রকম অসৎ সমালোচনা রবীন্দ্রপ্রতিভা বিকাশের সেই মধ্যাহ্নের যুগে—যখন তিনি গল্পগুচ্ছ, উপন্যাস ও গভীর সমাজসচেতনাধর্মী আলোচনা ও প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, যখন বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ঋত্বিক কর্মী ছিলেন তিনি। তার নিজের আলোকসামান্য চেতনা ও শক্তি দিয়ে সেই আন্দোলন সঞ্জীবিত করে রেখেছিলেন, যখন অতীব বস্তুতান্ত্রিক মনীষার সাহায্যে বোলপুরের শূন্য ভূমিকায় একা নিতান্তই নিজের হাতে একটি গৌরবময় বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্কুরিত করে তুলেছিলেন—তখন রবীন্দ্রপ্রতিভা কেবলমাত্র আকাশচারী ও বস্তুতন্ত্রহীন, এই নিরর্থক সমালোচনা কি করে যে সম্ভব হয়েছিল আজ তা ভাবতে গিয়েও আমরা অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করি। বস্তুচেতনা ও সমাজচৈতন্যের অভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে কোনদিনই লক্ষণীয় জিনিয নয়।" পূর্বোক্ত বক্তব্যে Romantic জীবনানন্দ তাঁর বস্তুতান্ত্রিক বোধের পরিচয় প্রদানের সঙ্গে স্বকালের বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের অসারতা প্রমাণ করেন। বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে তখনও পর্যন্ত একটি সুস্পষ্ট নান্দনিক শৃঙ্খলা অনুসরণ করে নি। ফলে সৎসমালোচনার অভাবজনিত কারণে সাহিত্য সম্পর্কে পূর্বোক্ত শ্রেণীর অপব্যাখ্যা হয়েছে পর্যাপ্ত। জীবনানন্দ নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সংমিশ্রণে উল্লিখিত ব্যাখ্যা অস্বীকারপূর্বক রবীন্দ্র কবি-প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে কবিতা সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব ধারণার যৌক্তিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ ঘটান। "কবিতাই সমস্ত শিল্প ও জীবনদর্শনের জননী এবং রবীন্দ্রপ্রতিভা স্বভাবতই গিয়েছে সেই মূল উৎসের দিকে।" জীবনানন্দ কবি অর্থাৎ তিনি সমস্ত শিল্প ও জীবন-দর্শনের জননীরূপ কবিতার সাধনায় প্রাণপাত করেন। কবি চিত্তের পূর্বোক্ত উপলব্ধির উৎস প্রভূত অধ্যয়ন প্রসূত জ্ঞান। গান্ধী, মার্ক্স কিয়েকগার্ড বা অন্য কারো সিদ্ধান্ত বা যোগসূত্রের কথা তিনি অস্বীকারপূর্বক প্রতিপন্ন করেন যে, "প্রত্যেক সৎ সাহিত্যেরই নিজস্ব একটা জীবনদর্শন থাকে।" এ ক্ষেত্রেই জীবনানন্দের শিল্পচিন্তার মূল দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে পাঠকের। 'আমার এবং যাদের আমি জীবনের পরিজন মনে করি তাদের অস্বস্তি বিলোপ করে দিতে না পেরে জ্ঞানময় করবার প্রয়াস পাই এই কথাটি প্রচার করে যে, জীবন নিয়েই কবিতা যদি ভাবা যায় যে কবিতা মানুষের আধুনিক জীবনকে নিরন্তর ভবিষ্যতের শ্রেয়তর সামাজিক জীবনে পরিণত করে চলেছে তাহলে সে ধারণা ঠিক হবে না। কবিতার ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসে বুঝে নিতে পারা যায় যে, কবিতা মানুষের জীবনের কল্যাণ-মানসকে অপরোক্ষভাবে চরিতার্থ করবার সুযোগ না দিয়ে বরং জীবনের স্বর্গ ও আঘাটাসবেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকটে পরিস্ফুট করে; আমাদের হৃদয়ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সৎ কি অসৎ পরিণতির পথে কৃষ্ণপক্ষের সূর্যের মতো (ভেবে নেয়া যাক) উপস্থিত হয়; আমাদের ভাবনাকে সর্বমানবীয় পরিসর দেয়; অভিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদের ভিতর আত্মনাম ও সকলের সর্বনাম রয়েছে জানিয়ে দিয়ে তাকে মহত্তরভাবে গ্লানিহীন করে দিতে চায়; হৃদয়কে ক্রমশই বিশুদ্ধ করে। এই করে, এবং এই সমস্ত করে বলেই আমাদের গতি পরিণতির কাহিনী নিয়েই কবিতা; পরিণতিশীল জীবনকে পূর্বোক্ত উপায়ে সজাগ ও শালীন করে তুলবার ভার কবিতার উপর।" যুক্তি এসে জীবনশিল্পীকে আরও অধিকতর সূক্ষ্মবোধের স্তরে পৌঁছে দেয়। জীবনের সঙ্গে শিল্পকে অঙ্গীভূত করার তাগিদ থেকে আত্মাবিষ্কারের মুহূর্তে উপলব্ধি করেন কবিতার সত্যিকারের কোনো দায় নেই—দায় প্রকৃত অর্থে কবি-শিল্পীর। কারণ তিনি সামাজিক। সমাজ প্রক্রিয়ায় এক দ্বান্দ্বিক পরিবেশে তাঁরও বসবাস। তাঁর জীবনচিন্তা সমাজপ্রসূত—সমাজপ্রসূত বলেই তাঁর সৃজনকর্মে সামাজিক, মানবিক দায় অনিবার্য, অপরিহার্য। জীবনানন্দ সেই চেতনার প্রকাশ ঘটান নিম্নবর্ণিত বক্তব্যে—"কারু নির্দেশ পালন করবার রীতি নেই কবি মানসের ভিতর ; কিম্বা তাঁর সৃষ্ট কবিতায়। অথচ সৎ কবিতা খোলাখুলিভাবে নয়, কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দ সমগ্রতায় উৎকর্ষে শোষিত মানবজীবনের কবিতা; সেই জীবনের বিপ্লবের ও তৎপরবর্তী শ্রেষ্ঠতর সময়ের কবিতা। মহৎ কবির ভাবনা সূক্ষ্ম, হৃদয় আন্তরিক (আশা করা যেতে পারে) অভিজ্ঞতা সজাগ ও চেতনা, অবচেতনা ঐকান্তিকভাবে সক্রিয় থাকার দরুন ব্যবহারিক পৃথিবীতে এ রকম মানুষের কাছ থেকে জীবনের উন্নতিশীল ভাঙ্গাগড়ার কাজে শুভ ও সার্থক আত্মনিয়োগ দাবি করা যেতে পারে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কবিতা ও শিল্প সৃষ্টির ভিতরেই তিনি ঢের বেশি স্বাভাবিক ও স্মরণীয়—এমনকি অধিকতর মহৎ—বাস্তবক্ষেত্রে তেমন নন।"

'কেন লিখি' শীর্ষক প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশে জীবনানন্দ দাশের কবি মানস এবং কাব্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তারই প্রেক্ষাপটে কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সমকাল বা পরবর্তীকালের সমালোচকগণ যে, তাঁকে মগ্নচৈতন্যের কবি অভিধায় সনাক্ত করে নিজেদের আহাম্মক রূপে পরিচিত করেছেন তাতে সন্দেহ কী। বিষণ্নতা কিংবা আত্মমগ্নতা যদি তাঁর কবি স্বভাবের অংশরূপে প্রকাশ পেয়েই থাকে তবে তা মহৎ শিল্প সৃষ্টির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এবং তা বাস্তবায়ন প্রয়াসী সজাগ, সচেতন মানসিকতার জন্যই ঘটেছে। 'কবিতা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধে জীবনানন্দ অন্য এক মানুষ—তাঁর অন্তর্বিগলিত সত্যের উদ্ভাসন ঘটে এভাবে—"ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয়; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে। কোনো কোনো সময় কাঠামো এমন কি সম্পূর্ণ কবিতাটিও খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে প্রায়। কিন্তু তারপর প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে—চারিদিককার প্রতিবেশ-চেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রবর্তকের আবির্ভাবে কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায় : পুনরায় ভাব প্রতিভার আশ্রয়ে। এ রকম অঙ্গাঙ্গিযোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে।"

কবিতার পরিণতি বিষয়ক জীবনানন্দীয় ধারণা আমাদের বিস্মিত করে যখন তিনি নিজেই তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলেন—"মহা বিশ্বলোকের ইসরার থেকে উৎসারিত সময়-চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো : কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময়-চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে। আজ পর্যন্ত যে সব কবিতা আমি লিখেছি সে সবে মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকায় এক 'অনাদি' তৃতীয় বিশেষ হিসেবে স্বীকার করে কেবলমাত্র তারি ভিতর থেকে উৎস-নিরুক্তি খুঁজে পাই নি। নাট্যকবির পক্ষে এটা পাওয়া প্রয়োজন। প্রতিভাসিক কবি জগতের একাগ্রতা ভেঙে ফেলে তাকে নাট্যপ্রাণ বিশুদ্ধতা দেয় সেই কবি। কিন্তু তবুও তিন জগতেই বিচরণ করে সে-মানবসমাজকেই চিনে নেবার ও চিনিয়ে দেবার মুখ্যতম প্রয়োজনে আন্তরিক হয়ে উঠে। লিরিক কবি ও ত্রিভুবনচারী, কিন্তু তার বেলায় প্রকৃতি, সমাজ, ও সময়অনুধ্যান কেউ কাউকে প্রায় নির্বিশেষে ছাড়িয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে না; অন্ততঃ মানবসমাজের ঘনঘটায় প্রকৃতি ও সময়ভাবনা দূর দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে মিলিয়ে যাবার মতো নয়। কাজেই উপন্যাস ও নাটকের মতো মানুষমনকে সমূলে আক্রান্ত না ক'রেও কবিতা মানসের আমূল বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে—তাকে নির্মলতর ক'রে তুলবার জন্য—কথা ও ইঙ্গিতের দুর্লভ স্বল্পতার ভিতর দিয়ে।"

জীবনানন্দ দাশ শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক যেমন—গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কবিতার উদ্দেশ্যগত ও রূপগত পার্থক্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে আমাদের বক্তব্যের সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ মেলে। সচেতন পাঠক মাত্রেই প্রত্যক্ষ করবেন জীবনানন্দের কাব্যভাষা গল্পের বাস্তবভূমিতে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের বদলে ঘটায় বিষয়, চরিত্র এবং চরিত্রসমূহের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আবার উপন্যাসের সুবিস্তৃত পটভূমিতে জীবনের রূপ ভয়ঙ্কর জটিল—অমিত সম্ভাবনাসম্পন্ন মানব বাস্তব সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতিগত কারণে অসফল। অসফল মানুষের যন্ত্রণার উৎস ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তার ব্যর্থতা, কেজো পৃথিবীর অন্য সকলের স্থলে নিজের নড়বড়ে অবস্থান সামাজিকের অবজ্ঞা। সেখানে নর-নারীর উষ্ণতা আছে, উত্তাপ আছে দেহে কিন্তু তারা নির্লিপ্ত। নির্লিপ্ততার কারণেই তাদের দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ। প্রেমহীন সহস্র রজনীর জীবন চর্চায় কখনও তারা সংরগ সংশ্লিষ্ট হয় এমন দৃষ্টান্ত মেলে না। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে দুই অচেনা নরনারী পাশাপাশি অবস্থান করে। কাল কেটে যায়—হয়তো কোনো এক আবেগঘন মুহূর্তের আকস্মিক দেহ মিলনের ফসল হিসেবে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, অনাকাঙ্ক্ষিত হয়তো। তারপর জীবনহীন এক জীবন যাপনের পালাবদল চলে। সকল চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রায় অভিন্ন। আত্মহননের অভিপ্রায়ে আত্মনিগ্রহের সীমা লঙ্ঘন করে তারা অনায়াসেই। কবিতায় যে জীবন সমস্ত স্থানিক, কালিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক স্খলন-পতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিক্রমপূর্বক একটি সুন্দর আগামীর জন্য অধিকতর স্বপ্নময় জীবনচেতনায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে উপন্যাস সাহিত্যে তার বিপরীত রূপ প্রত্যক্ষ করি। কল্পনাবিলাসী, ভয়ঙ্কর ক্ষতাক্ত পুরুষের হৃদয়ক্ষরণের আড়ালেই তার অনাকাঙ্ক্ষিত অকাল মৃত্যু ওঁৎপেতে থাকে। তাকে প্ররোচিত করে যেন প্রেমশূন্য এক নারী। তার ক্রমাবহেলা, নির্লিপ্ততা, সফল পুরুষের তুলনায় স্বামীর ব্যর্থতা প্রত্যক্ষণপূর্বক প্রসঙ্গটিকে পুঁজি রূপে দাম্পত্য সম্পর্কের মধুরতার অন্তরায় করে তোলাই হয়ে দাঁড়ায় সেই নারীর কর্তব্য যেন। অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশ আধুনিক দাম্পত্য জীবনে নর-নারীর সম্পর্কের অপূর্ণতা, জটিলতা এবং তার ধ্বংসাত্মক রূপের পাশেই সেই জীবনের অনির্ণেয় রহস্যের ইঙ্গিত প্রদান করেন। সে ইঙ্গিত কবিতায় বিভিন্ন সময় এসেছে। যেমন, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র বোধ কবিতায় :

এই সব সাধ
জানিয়াছি একদিন,—অবাধ—অগাধ;
চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে ;—
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে ;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে ;

সত্যি বলতে আধুনিক মনোবিজ্ঞান আবিষ্কৃত মনস্তাত্ত্বিক জটিল জিজ্ঞাসা এবং ব্যবহারিক জীবনে তার প্রগাঢ় প্রভাব মানুষের অন্তর্জীবনকে কিভাবে ভস্মে পরিণত করে জীবনানন্দ তাঁর গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যে তারই সামাজিক রূপ চিত্রিত করেছেন। মাল্যবান, চারুবাসনা, নিরুপম যাত্রা, হেমন্তের দিনগুলি ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। চরিত্রসমূহের জীবনগাঁথায় যে কথার অনুরণন তা অগাধ জীবনের কথা, তাতে তলিয়ে যাওয়া চলে অবাধে এবং শেষাবধি তাদের রক্ষাবার্তাও কেউ নেই। স্বয়ং লেখক তাদের রক্ষা করতে নারাজ, ঈশ্বর বা আধিদৈবিক কোনো শক্তি ও স্রষ্টার নিখিলে রাজত্ব করে না প্রকৃতির সন্তান সংগ্রামশীল মানব তার স্বীয় বৌদ্ধিক ক্ষমতা বলে আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম না হলে পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দ দাশ কবি। কিন্তু কেবলমাত্র কবিতা সুন্দরীর অধরা রূপের আরাধনায় গলদঘর্ম হয়েছেন একথা বলা অনুচিত কর্ম বই কি ! প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যকার শিল্প-প্রকরণ সম্পর্কিত সূক্ষ্মবোধের পরিচয় স্পষ্টতা পেয়েছে তার বিভিন্ন রচনায়। 'কবিতা' প্রবন্ধে তাঁর নাট্যচিন্তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে নিম্নরূপে—

'মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকায় এক 'অনাদি তৃতীয়' বিশেষত্ব হিসেবে স্বীকার ক'রে কেবলমাত্র তারি ভিতর থেকে উৎস-'নিরুক্তি' খোঁজা নাট্যকবির জন্য আবশ্যকীয়। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "কবিতা জগতের একাগ্রতা ভেঙ্গে ফেলে তাকে নাট্যপ্রাণ বিশুদ্ধতা" দান নাট্যকারের দায়িত্ব। নাট্যকার "মানবসমাজকেই চিনে নেবার ও চিনিয়ে দেবার মুখ্যতম প্রয়োজনে আন্তরিক হয়ে উঠে" বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাট্যচিন্তার বিকশিত রূপ প্রত্যক্ষ করি তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস 'জীবনযাপনে'র (সম্পাদক কর্তৃক দেয় নাম) চরিত্রসমূহের কথোপকথনে। বলাবাহুল্য, অসমাপ্ত এই উপন্যাসটির ভাষা-বয়নকৌশল আমাদের চেতনায় এরূপ ধারণার জন্ম দেয় যে, জীবনানন্দ ক্রমাগত তাঁর নিজস্ব একটি গদ্যরীতি সৃজনে দক্ষ হয়ে উঠছেন। ভাষার আপাতজটিলতা, বাক্য ও শব্দজনিত দুর্বোধ্যতার স্থলে সাধারণ আটপৌরে আলাপচারিতার style উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের উচ্চারিত সংলাপে ধৃত। অত্যন্ত নাটকীয় প্রারম্ভ একে জীবনানন্দ দাশের অপরাপর গদ্য রচনা থেকে একটা স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। এর কাহিনীতে নাট্যগুণেরও প্রাধান্য লক্ষণীয়। নাটকের মতোই এর সংলাপ রচনার ধরন। গ্রন্থের বর্ণিত পরিচয়সূত্রে এক্ষণে আমরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় অগ্রসর হতে পারি। সদবংশজাত হিন্দু পরিবারের দীর্ঘদিনের আভিজাত্যের নিগড় ছিন্ন করে শিক্ষিত (এম. এ. পাশ) যুবক অজিত থিয়েটারে যোগদান করে। সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামী পশ্চাৎপদ সংস্কারপন্থী সামাজিক মানুষ তাঁর এই অংশগ্রহণকে অত্যন্ত অমর্যাদাপূর্ণ একটি কাজ বলে অভিহিত ও তাকে অধঃপতিত ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করে। তারকবাবু (রাঙা খুড়ো) এক পর্যায়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "অজিত, তুমি শেষ পর্যন্ত থিয়েটারে, নামলে?" কারণ তারকবাবুর চিত্তে এই বিস্মিত প্রশ্নের উদ্রেক হওয়ার কারণ অজিতের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে তার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ অধ্যুষিত সম্ভ্রমবোধ ও গোষ্ঠতন্ত্রের প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্য।

"তোমাদের পরিবারকে আমি চিরজীবন ধরে এমন শ্রদ্ধা করে এসেছি অজিত। এ পরিবার বামুন বা কায়েত বা কোনো সদ্বংশজাত হিন্দু পরিবার বলেই নয়—কিন্তু এর মনুষ্যত্বের জন্য। তোমার ঠাকুর্দা আমার বন্ধু ছিলেন—তামাকটি অব্দি ছুঁতেন না—কোনোদিন কোনো মজলিস মুজরোয় তাঁকে দেখি নি—সঙ্কীর্তন ছাড়া অন্য কোনো গান তাঁর অত্যন্ত উপেক্ষার জিনিস ছিল। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোনো রকম প্রেমই তিনি কোনোদিন স্বীকার করতেন না। মেয়ে মানুষের শরীরের কোনো রকম ব্যাখ্যাও কেউ কোনোদিন তাঁর কাছে করতে সাহস পেতেন না, পরস্ত্রীর দিকে তিনি ভুলেও কোনোদিন তাকাতে যেতেন না,—অথচ উদার-হৃদয়ের কত সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্যশালী মানুষ—তোমার বাবাও তো ঠিক তাঁরই মত—সব বিষয়েই তোমার ঠাকুর্দার মত।"

তারকবাবুর আলোচ্য বক্তব্য থেকে সমকালীন বাঙালি সমাজের puritan মহলের থিয়েটার বিষয়ক চিন্তার সংকীর্ণতা কুৎসিত কিছু ইঙ্গিতধর্মী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং কথা প্রসঙ্গে তারকবাবু অজিতকে এরূপ ইঙ্গিত প্রদান করে যে, থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিমাত্রই চরিত্রহীন, তার বক্তব্যে মনগড়া কিছু যুক্তি সামাজিক মানুষের অজুহাতে আত্মপ্রকাশ করে। "কেউ কেউ তোমাকে খুব ঘৃণাও করে অজিত।" তারকবাবুর একথার পর ধীর প্রশান্তচিত্তে অজিত প্রশ্ন করে—"রাণীদিও দুঃখ করে বুঝি?" এই রাণীদি অজিতের নিজস্ব ভুবনের এই দুর্বলতম স্থান। বিশ্ব-সংসার ঘৃণা করবে, অপবাদ দেবে তাতে অজিতের কিছুই এসে যায় না। কেবল রাণীদি তাকে মানুষ হিসেবে ছোট করে দেখবে এমন ভাবনাটিও অজিতের জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক। সে প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। এক সময় তারকবাবুকে জানায় যে, সে একদিন গিয়ে রাণীর সঙ্গে দেখা করবে। অজিতের এই উক্তির পর তারকবাবুর মিথ্যা ভাষণ স্পষ্টতা লাভ করে এবং পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অজিতের রাণীদি আসলে অজিতের সম্পর্কে নতুন কোনো ধারণাই পোষণ করেন না। অজিত আপন অন্তরের কোমলতায় যে নারীর মুখটি নির্মাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন সে অজিতকে তুচ্ছ ভাবুক বড় দুঃসহ। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, তারকবাবু রাণীদিকে অজিতের সঙ্গে দেখা করতে মানা করবে এমন হুমকি প্রদান করে। থিয়েটার অন্তপ্রাণ অজিত অতঃপর নিজের দুঃখবোধের ভিতর থেকে স্বপ্নময় এক ভবিষ্যতের কথা বলে।

"ভেবেছিলাম রাণীদির সঙ্গে একদিন দেখা করতে যাব—কিন্তু তা হবে না। আমি যদি খুব ভাল অভিনয় করতে পারি তাহলে হয়তো একদিন একদল আমাকে মাথায় তুলে নেবে; তাতে আমার খুব ভালো লাগবে কিনা বলতে পারি না—কিন্তু মা বা বাবা বা আপনি বা রাণীদি যে কোনো দিন আমাকে বুঝবেন না, এ আঘাত চিরদিনই আমার আঁতে লেগে থাকবে। জীবনের অত্যন্ত গৌরবের মুহূর্তেও এই কথা ভেবে আমাকে অনেক ঢোঁক গিলতে হবে।" এইভাবে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সংসারের কেজো মানুষ তারকবাবুর সঙ্গে অজিতের দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্যটি স্পষ্টতা পায়। অজিতের কোনো ফার্মে কেমিক্যাল এনালিস্ট পদে চাকরি পাওয়া, কলেজের শিক্ষকতার পদ ত্যাগ করা গুরুতর অন্যায়রূপে বিবেচিত হয় তারকবাবুর কাছে। তার উত্তরদান প্রসঙ্গে অজিতের থিয়েটারে আসার মৌল কারণটি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কবিতা লেখা অজিতের নেশা ছিল। কিন্তু খেয়ালি যুবক এক সময় তাও পরিত্যাগ করে। কারণ, সে অনুভব করে যে কবিতা লেখাও তাঁর কাজ নয়। অজিতের সরল উত্তর,—"কলম ছেড়ে দিয়ে ভাবতে লাগলাম কেন এসব খোঁচ এরকম গরমিল কেন সব লেখার ভিতর? বুঝতে পারলাম এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেও চায় না যেন মন—আমি অন্য কিছু চাই যেন—অন্য কিছু শেষ পর্য্যন্ত এই সব গোবরের পাকের ভিতর গড়াল।"

সৃজন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিভাবান যুবক অজিত আপন আত্মার গহনে লুক্কায়িত সত্য আবিষ্কার করে এক সময় নিজের মানস সত্যকে সে এভাবে ব্যক্ত করে—"পরের কবিতা আওড়ে যেন ভালো লাগত—ইংরেজী কবিতা। লিয়ার আবৃত্তি করে এমন ভালো লাগল আমার। অনেকেই মুগ্ধ হ'ত, নিজের জীবনের ভিতর আমিও এমন একটা আস্বাদ বোধ করতে লাগলাম কি বলব আপনাকে রাঙাখুড়ো।" অজিত বিশ শতকের শিক্ষিত যুবক, স্বাজত্যবোধে উজ্জীবিত তার চেতনা। ইংরেজি কবিতার বিজাতীয় শিল্পরস ধারায় সিক্ত হয়নি তার অন্তর। এর কারণ ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে সে বলেছে—"বাংলা গল্পের আমাদের বাঙালীর জীবনের কথাবার্তা নিজের মনের মত করে বলতে পারলাম এমনই মনের মত করে যে নিজেই অনেকসময় বিমুগ্ধ হয়ে বসে থাকতাম, ভাবতাম এই তো কথাবার্তা যা কত সময় আমরা শুনি—এই তো সব ভাব রস যা এমন কিছু গভীর ধোঁয়ার জিনিস নয়, কিন্তু তবুও এই সব উপকরণ ব্যবহার করেই যতক্ষণ না কবি তার বিধাতার মত হাত নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে একটা গল্প তৈরী করল ততক্ষণ এ সবের মর্যাদা আমরা বুঝতে পারলাম কৈ?—তারপর আমি এলাম আমি ও কবি, নট আমি—মানুষের জীবনের গল্পের আশা সাধ বিচ্ছেদ নিষ্ফলতার আমি এমন মর্যাদা দিলাম যে লোকে গল্পলেখককেও ভুলে গেল।"

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অজিতের পূর্বোক্ত বক্তব্যে একথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে : যিনি শিল্পী-কবি, লেখক, অভিনেতা তিনি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিচিত্র কথা, ভাব-রসকে উপকরণরূপে ব্যবহার করেই সর্ব মানবের জীবনের আশা-সাধ-বিচ্ছেদ, নিষ্ফলতার গন্ধ রচনা করেন। সৃজনের সেই বিশেষ লগ্নে শিল্পী ঈশ্বরের সমকক্ষ। এতদসংক্রান্ত নিজের উপলব্ধির ব্যাখ্যা দান মুহূর্তে জীবনানন্দ দাশ সমকালীন বাংলা থিয়েটার ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় যেমন—নাটক, অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনবোধ, শিল্পরুচি, থিয়েটারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি যুগমানুষের অবজ্ঞা এবং অন্যান্য শিল্পপ্রকরণের সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক এ মাধ্যমটির আভিজাত্য ইত্যাদি অত্যন্ত বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত সমেত উপস্থাপন করেন।

রঙ্গমঞ্চে একটি নাটক পাণ্ডুলিপির শিল্পগুণ এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী, নির্দেশকের শিল্পিত রুচি, চরিত্র উপস্থাপনার কলাকৌশলের আশ্রয়ে দর্শকনন্দিত হয়ে থাকে। কখনও কখনও এর বিপরীতটাও যে ঘটনা তা নয়। সেই বাস্তবতার চিত্র উদ্ভাসিত হয় অজিতের কণ্ঠে। তার ভাষায়—"একটা অত্যন্ত অবজ্ঞেয় বইয়ের সাহায্যেও আমরা মানুষের হৃদয়কে অধিকার করে রাখতে পারি। বাংলা স্টেজে এরকম বইই ঢের; সে সবের কোনই সাহিত্যিক মূল্য নেই—জীবন সম্বন্ধেও কোনো ধারণা নেই। থিয়েটারে যে নেমেছি রাঙাখুড়ো অনেক জিনিষই আমি চাই—যে সব বই জীবন সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ, যে সব কলম বিধাতার কল্পনা বিচার বুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, সফলতা ব্যর্থতার নাড়ীর খবর সব চেয়ে গভীর ভাবে রাখে সে সব লেখা দিয়েই স্টেজ জমাতে চেষ্টা করব এখন, শুধু হৈ রৈ বা অবাস্তবতা নিয়ে নয়। এই একটা জিনিষ রাঙা খুড়ো। আর একটা হচ্ছে এই—স্টেজের প্রতি লোকের বিরূপ বিরস ভাব আমি ঢের কমিয়ে আনতে চেষ্টা করব। আমি আস্তে আস্তে বোঝাব তাদের যে এই বইগুলো জীবনের পক্ষে যেমন মূল্যবান—এদের অভিনয়ও তেম্নি ; শুধু তাই নয়—অভিনয়েরই একটা মূল্য আছে—একটা ঐশ্বর্যভরা কবিতা বা গান বা ছবির যে মূল্য দাও তোমরা তত দূরই। আমি দেখছি অনেক বাড়ীতে বিশ্রী বিভৎস ছবি সব চিন্তাহীন কবিতা প্রবন্ধের এক একটা লাইব্রেরী নির্ব্বোধ গান সব গানের বই গানের খাতা—এইসব—সবই নির্ব্বিবাদে হজম করছে তারা কিন্তু ছেলেরা যে পাড়ায় স্টেজ বেঁধে হয়তো তাদের নিজেদের লেখা একটা বই কিংবা বাংলা সাহিত্যের কোনো সম্পদময় গল্প অভিনয় করতে চাচ্ছে এ তারা সহ্যই করতে পারে না।" এ বক্তব্যের অব্যবহিত পরেই তিনি অজিত এবং তারকবাবুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অভিনয়শিল্পীর আত্মার পবিত্রাত্মা ও চারিত্র্যধর্মের গূঢ় সত্যটি একটি তাত্ত্বিক ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রাচীনপন্থী সংস্কারাচ্ছন্ন তারকবাবু সমাজের সঘোষিত অভিভাবক। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষায় স্বীয় শ্রেণীর অন্য দশজনের মতোই তারকবাবু সদা সতর্ক—প্রচলন নীতি-রীতি, হিত-অহিত, মঙ্গল-অমঙ্গল চিন্তা তাকে মতিচ্ছন্ন করেছে। গোঁড়া সমাজ-হিতৈষী তারকবাবুর সঙ্গে অজিতের দ্বন্দ্ব প্রকৃত প্রস্তাবে দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিশীলের দ্বন্দ্ব। মুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পপ্রেমিক অজিত তার সূক্ষ্মরুচির পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন শিল্প-জীবন-সমাজ ও সংস্কারকে দেখার পক্ষপাতি। পক্ষান্তরে, তারকবাবুর সম্বল সনাতন বিশ্বাস—অজিত সে কারণেই তারকবাবুর আক্রমণ প্রতিহত করে অবলীলায় যুক্তির সূক্ষ্মতায়। কিন্তু তারকবাবু একা নন, সমাজে করুণাবাবুদেরও অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের সঙ্গে অজিতের মতো সমাজবাদী আদর্শপরায়ণ যুবকদের প্রতিনিয়ত চলে বিতর্ক—"মানুষের জীবনটা বুঝতে গিয়ে কোথাও ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই। এ সত্য প্রচেষ্টার ভিতর তবুও এমন একটা সংসত্য রয়ে গেছে যে অনেক দুঃখ অনেক গ্লানি বিচ্ছেদ ও নিষ্ফলতার এই জীবনটাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে না—এর গভীর মূল্যের কথা ভেবে আপনাদের অবাস্তব নিয়ে পড়ে থাকতে ভালো লাগে না আর মহাভারত পুরাণ রামায়ণ ইতিহাসের থেকে ঢের নেওয়া হয়ে গেছে—মহাভারতীয় নাটকটা আপনারা চালাচ্ছেন সেটা থামিয়ে দিন এখন।" জীবনানন্দ দাশ পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর স্থূল Shallow জীবনবোধসম্পন্ন নাট্যকাহিনীর পরিপন্থী। তৎপরিবর্তে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন গভীর ভাবরস এবং জীবনবোধ উদ্বোধনক্ষম নাটক মঞ্চায়নের পক্ষে ছিলেন। স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায় যে, জীবনানন্দ দাশের আলোচ্য উপন্যাস রচনা সেই কাল নির্দেশক যখন স্বদেশী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলনের ডামাডোলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদিনী প্রমুখ নাট্যকারদের ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাটক ও পৌরাণিক যাত্রাপালার প্রবল দৌরাত্ম্য বাংলার রঙ্গমঞ্চে অপ্রতিহত গতিতে অস্তিমান। ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জনের যে আন্দোলন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তাল করেছিল তাকে প্রেরণা যোগাতে ইতিহাস ও পুরাণাশ্রিত নাট্যকাহিনীর আবির্ভাব। পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করতে গিয়ে আমাদের নাট্যসাহিত্য ও থিয়েটার থেকে কালিক বাস্তব জীবনসমস্যা দূরে সরে যেতে থাকে। জীবনানন্দ একে সমর্থন জানাতে পারেননি। তিনি স্বকালের বাস্তব জীবনসমস্যার শিল্পিত রূপায়ণ মঞ্চে দেখার পক্ষপাতি। একই সঙ্গে থিয়েটারকে অপরাপর শিল্পাঙ্গিকের কৌলিণ্য দানও ছিল তাঁর উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। দলের অধিকারীর সঙ্গে অজিতের কথোপকথনকালে একথাও স্পষ্ট হয়েছে যে, থিয়েটার কোম্পানিগুলো ব্যবসায়িক অর্থে জীবনঘনিষ্ঠ নয় এমন তাৎপর্যহীন অথচ জনমনরঞ্জক নাটক নির্বাচনের প্রতি অতি উৎসাহী ছিল। করুণাবাবুর উক্তি সেক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে,—"স্টেজ একটা ব্যবসা। একটা নতুন বই নেবার আগে আমাদের ঢের ভাবতে হয়। আপনার যা ভালো লাগে সকলের তা ভালো লাগে না। এই মহাভারতের নাটকটাকে অনেকসময়ই মিথ্যা হৈ রৈ বলে আপনি আক্ষেপ করেছেন ; আজ যদি লঙ্কায় বা কুরুক্ষেত্রে আবার তেমনি সেইসব যুদ্ধ বাধে, দেবতারাও বিস্মিত হয়ে আকাশ থেকে তাকিয়ে দেখেন—কিন্তু তবুও আপনার হৃদয়কে সেসব বড় একটা স্পর্শ করে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোকদের তো সেই সবই ভালো লাগে মেয়েদেরও ; আমারও। দেবতাদেরও একদিন ভালো লেগেছিল—আজো লাগে। এর কি করবেন আপনি?" করুণাবাবুর উপর্যুক্ত বক্তব্যের উত্তরে অজিত বলেছে—"এ আমাদের অপরাধ ...। এতদিনেও আমরা মানুষের রুচি তৈরী করতে পারিনি।" এ বক্তব্যের সূত্র ধরে করুণাবাবু বাংলামঞ্চে বার্নার্ড'শ এর নাটকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। অজিত হয়ত বার্নার্ড'শ-এর মতো লেখকের নাটক মঞ্চায়নের প্রতি আগ্রহী হবেন এমন একটি ইঙ্গিত প্রদানের পর করুণাবাবুকে অজিত জানিয়ে দেন যে, বার্নার্ড'শকে তার ভালো লাগে না। কারণ—"জীবনটাকে বুঝতে গিয়ে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা তাঁর হয়তো নেই—কিন্তু সমস্তই কেমন একটা ভোজবাজীর ব্যাপার বলে মনে হয়। আমি যাকে ভালোবাসি সে মেয়ের শ'য়ের মত অনুভব করি না, কথা বলি না; পৃথিবীর খুব কম লোকই তেমনভাবে অনুভব করে—ওরকম ধরনের কথাবার্তাগুলোকেও একটা দায়িত্বের মত মনে করে শুধু। ও একটা প্রবন্ধকারের জন্য হয়তো কোনো ভবিষ্যৎ জীবন ঐ রকমই সজাগ সচকিত ও চতুর লোকে ভরে উঠবে কিন্তু আজকের জীবনের সংসত্যকে অন্ততঃ ওরকমইভাবে হারিয়ে ফেলতে উপদেশ দেই না আমি আপনাদের"। বার্নার্ড'শ সম্পর্কে জীবনানন্দের অনুরূপ ধারণা ছিল মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক ক্রিস্টোফার কডওয়েলের। জর্জ বার্নার্ড'শ "বুর্জোয়া অতিমানব সম্পর্কে একটি আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে কডওয়েলে বার্নার্ড'শ'র 'মেজর বারবারা', 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান', 'উইডোয়ার্স হাউসেস', 'মিসেস ওয়ারেনস প্রফেসন' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"এই নাটকগুলি নাটক নয়। একে শিল্প বলে না, এ হল নিছক বিতর্ক এবং তারই মত নিষ্পত্তিহীন, যাবতীয় বিতর্কেরই মত ট্র্যাজিক চূড়ান্ত-ধর্মিতা, কালিক অগ্রগতি বা শিল্পগত ঐক্যের অভাব তাতে বিদ্যমান"। এছাড়া "তাঁর নাটকগুলিতে সুচিন্তিতভাবে জোর করে মত পরিবর্তন, যথেষ্ট প্রত্যয় জাগায় না এমন সব নাটকীয় উদ্‌ঘাটন (Unconvincing denouements) এবং অলীক কল্পনা ও হাস্যরসের মাধ্যমে সাধারণভাবে বাস্তব থেকে পলায়ন দেখা যায়"। করুণাবাবু ব্যবসায়ী, তারকবাবু সমাজপতি, কিন্তু অজিত জন্মগতভাবেই শিল্পী। তার চৈতন্যে সংশিল্পীর সকল আন্তরিকতা এক ঘনীভূত রূপ লাভ করে। কিন্তু অজিত নিরূপায়, তার উপলব্ধিকে বাস্তবরূপ দান সামাজিক কারণেই অসম্ভব। শিল্পের আবেগমূল্য ছাড়াও যে বস্তুমূল্য বিদ্যমান সমাজ তা উদারচিত্তে স্বীকার করতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, সে সমাজে শিল্পের উৎকর্ষ সাধন প্রায় অসম্ভব। সেই বৈরী পরিবেশে শিল্পী শুধুমাত্র আত্মবিসর্জন দিতে পারেন—এতদ্ব্যতীত তাঁর আর করার কিছুই থাকে না। সেই সত্যের প্রমাণ মেলে নিম্নের বক্তব্যে—"আজ রাতেও কৃষ্ণের পাটই অভিনয় করতে হবে অজিতকে। যিনি এই নাটকখানা লিখেছেন অজিত দেখল কৃষ্ণচরিত্রের সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ কোন জ্ঞান বা উপলব্ধি নেই, ভাষাও নেই। প্রাণহীন অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়েছিল অজিত—চরিত্রের অবাস্তবতা তাকে ব্যথা দিচ্ছিল—কিছুই ভালো লাগছিল না"। পৌরাণিক কৃষ্ণচরিত্র রূপায়ণে নাট্যকারের ব্যর্থতার নানা দিক চিহ্নিত করে ঔপন্যাসিক একটি চিরন্তন সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কোনো চরিত্রকে শিল্পসফলতা দানের জন্য চরিত্রটিকে আর্থ-সামাজিক-শারীরিক-মানসিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে পর্যবেক্ষণ-প্রত্যক্ষণ ও রূপায়ণ আবশ্যক। চরিত্র রূপায়ণে ভাব-ভাষা ও বাস্তব- জ্ঞানের অভাব হলে যে কোনো শিল্পই চূড়ান্ত অর্থে সার্থকতা অর্জন করতে হয় ব্যর্থ। নাটকের চরিত্র যেহেতু মঞ্চে দর্শক সম্মুখে অভিনেয় চরিত্র সেইহেতু তার অভ্যন্তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার অবকাশ না থাকলে পুরো অভিনয় ক্রিয়াটি নিষ্ফল কর্মপ্রয়াস মাত্রে পর্যবসিত হয়। সচেতন ও সৃজনশীল অভিনয়-শিল্পী এরূপ চরিত্রের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারায় প্রাণবন্ত অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন সম্ভব হয় না। নিজেকে সর্বদিকের বিবেচনায় মনে হয় ব্যর্থ মানুষ।

উপন্যাসের নায়ক অজিত সেই ব্যর্থতার বেদনায় অস্থিরচিত্ত সম্ভাবনাময় যুবক। জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যে বর্ণিত অন্যান্য চরিত্রের মতো আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক অজিতের ব্যর্থতাবোধের উৎস অভিনেয় কোনো চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত নয়। একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আমাদের জাতীয় ব্যর্থতার সামগ্রিক চিত্র নায়ক চরিত্রের উপলব্ধিতে ভাস্বর। সমকালীন নাট্যসাহিত্যের বস্তুগত রসগত ও মঞ্চরূপায়ণের দুর্বলতা ও অসারতা উপন্যাসের কাহিনীর মৌল উপজীব্য।

নায়ক অজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্তির পর বস্তুগতভাবে বৈষয়িক কোনো সাফল্যের অনুগামী হয় নি। বরং সে সমকালীন বাংলা নাটকের সামগ্রিক দুর্বলতা দূর করে তাকে জনপ্রিয় ও সার্থক শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গিকারে দৃঢ়চিত্ত। কাহিনীর ধারাবাহিকতার অভাব নাটকের শৈলীগত সমস্যা, মঞ্চরূপায়ণের গতানুগতিকতা অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের অসচেতন অনুকরণপ্রবৃত্তি সেকালের বাংলা নাটককে যে অধঃপতিত অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিল তারই এক নিখুঁত চিত্র অজিতের বক্তব্যে পরিস্ফুটিত হয়। নাট্যাভিনয়ে পরিচালক—অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়াও দর্শকেরও যে একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে তা অজিতের বক্তব্যে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। উপন্যাসের এক পর্যায়ে পূর্ণিমা আসে অজিতের সহধর্মী চরিত্র হিসেবে। পূর্ণিমা শিক্ষিতা নারী, বি.এ. পাশ করে সে মঞ্চাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার জীবনেও রয়েছে শীলিভূত বেদনার স্তূপ। ধীরে ধীরে অজিতের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিজলডাঙ্গার ভদ্রঘরের মেয়ে পূর্ণিমা পড়ালেখা শিখতে কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হওয়া এবং অতঃপর থিয়েটারে আগমন। সুন্দর দেহসৌষ্ঠবের অধিকারিণী পূর্ণিমা তার সূক্ষ্মরুচিবোধ ও শিক্ষিত মানসিকতাপ্রসূত জীবনবোধের দ্বারা নির্ধারিত চরিত্র রূপায়ণ করে। রঙ্গমঞ্চে ইতোপূর্বে এমন অভিনেত্রীর অপ্রতুলতা বাংলা থিয়েটারের বিকাশের অন্তরায় ছিল। পূর্ণিমা আপন ব্যক্তিত্ব ও অভিনয়দক্ষতা দ্বারা সেই শূন্যতা পূরণ করেছে—করছে। অজিত নিজস্ব বিচারবুদ্ধি, শিল্পরসজ্ঞান, থিয়েটার সংক্রান্ত নিজস্ব উপলব্ধির আলোকে পূর্ণিমাকে মূল্যায়িত করে। আর কেউ তার মর্যাদা বোঝে না। অজিতের বক্তব্যে নিরাবেগ যুক্তি ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতটি স্বরূপে মূর্ত হয়। দর্শক হিসেবে অজিতের অভিজ্ঞতা "দেখতাম অ্যাকট্রেসদের সব হোঁৎকা চেহারা—কালো ঠোঁট চোখ বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে। শুধু ভালো অভিনয়বাগান করতে পারলেই হয় না—সে গ্রামোফোনে চলে রেডিওতে বেশ নিজের স্বামী বা স্ত্রী বা প্রেমিকের কাছেও তার মূল্য আছে। কিন্তু থিয়েটারে দেহের মর্যাদা কত যে মূল্যবান তা সেই গ্রীকরা জানত, আমাদের যাদের বস্তুচেতনা আছে তারা বোঝে"। অজিত ছেলেবেলা থেকেই থিয়েটারপ্রেমিক। নিঃসন্দেহে জীবনানন্দ দাশ নিজেও অনুরূপ প্রেম পোষণ করতেন। উল্লিখিত ক্ষেত্রে জীবনানন্দের দৃষ্টি মোটেও খণ্ডিত নয়। বাংলা থিয়েটারের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করেই তিনি থিয়েটারের সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যের দিকে গভীর মনোনিবেশ করেন। থিয়েটার বিষয়ক সেই ধ্যানধারণার বাস্তব প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করি সৃষ্ট চরিত্রের বক্তব্যে। সেই বক্তব্যের নির্গলিতার্থ প্রতিষ্ঠিত করে যে, থিয়েটারে দর্শকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান। সে ভূমিকাও কোনো অবস্থায়ই খাটো করে দেখার মতো নয়। কারণ দর্শকের চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যেই নির্মিত হয় একটি Theatre production। সেখানে সব কিছুতেই পরিমিতবোধের একটি সূক্ষ্ম হিসেব বিদ্যমান। অভিনেতার মানসিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি শারীরিক সৌন্দর্যও গুরুত্বের দাবিদার। গুরুত্বপূর্ণ অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যবিধান। কার্যত নাট্যকার রচিত চরিত্র নাট্যকারের মানসজাত কতিপয় idea বা ধারণার বিমূর্ত রূপ। অভিনেতা ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই বিমূর্ত ধারণাসমূহকে রঙ্গমঞ্চে জঙ্গম করে তোলেন। সেক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীর শারীরিক-মানসিক যোগ্যতা সহানুভূতির সঙ্গে বিচার্য। দর্শকের প্রত্যাশার প্রতি সহৃদয় দৃষ্টির অভাব হলে কী ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয় তার পরিচয় মেলে নিম্নধৃত দৃষ্টান্তে—"কিন্তু এতে তাদের বড্ড খারাপ লাগে যারা দেখতে আসে, তারা বড্ড পীড়াবোধ করে। তোমার চেহারা এযুগের একটা সৌভাগ্যের জিনিষ। আজকাল যারা কলেজে পড়ে, যাদের কিশোর বয়স—তোমার অভিনয় ও শরীরের রূপকুশলতা দেখে কাটাল তারা, রোজ রাতেই যে সার্থকতা নিয়ে ঘরে ফিরে যায় তাকে আমি ঈর্ষা করি—আমার কৈশোর যৌবনের সময় শত চেষ্টা করেও এ সার্থকতা আমি একটা থিয়েটার দেখেও পাই নি। কি যে নিষ্ফল নিরুপায় দিন গিয়েছে সে সময়ে। কিন্তু শৈবলিনীর পার্ট যদি শৈবলিনীর মত মেয়ে এসেই করে কিম্বা পার্ট মত যুবা তা'হলেও একটা মস্ত অভিযোগ কেটে যায়।"

পূর্ণিমা ও অজিত থিয়েটার অন্তপ্রাণ তাদের ভাবনা কেবল থিয়েটারের বর্তমান অসঙ্গতি ও অপূর্ণতার জন্যই নয়। ভবিষ্যতের বাংলা থিয়েটার, থিয়েটারকর্মীর সামাজিক মর্যাদা, উচ্চাঙ্গের শিল্পগুণ, সম্পূর্ণ নাটক রচনা ইত্যকার নানামুখী সম্ভাবনার বিচিত্র দিক নিয়ে তাদের ভাবনা আলোড়িত।

পূর্ণিমা ও অজিতের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের আলাপচারিতায় আমরা অন্য অনেক বিষয়ের মতো এই তথ্যটিও অবহিত হই যে, অজিত একদিন তার মাকে অভিনয়ার্জিত কিছু টাকা পাঠিয়ে দেয়। কদিন পরে টাকা ফেরৎ আসে এবং সঙ্গে একটি চিঠি মা লিখেছেন। "তোমার এ টাকা আমি রাখতে পারলাম না। তুমি আমাদের টাকা পাঠিও না। এর চেয়ে তুমি যদি মুদীর দোকান খুলে, গাড়োয়ানের কাজ করে, জুতা সেলাই করে আমাদের টাকা পাঠাতে তাও আমরা আদরে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমার অধঃপতন সে সবের চেয়ে ঢের বেশী হয়েছে। তোমার জন্য লজ্জায় ঘেন্নায় অনেকসময় মানুষের কাছে মুখ দেখানোও শক্ত হয়ে ওঠে।" তার পরবর্তী কথার সারমর্ম হচ্ছে মদ্যপান ও গণিকালয়ে গমন ও থিয়েটার কার্যক্রম অপেক্ষা শ্রেয়। একজন নটের প্রতি তার গর্ভধারিণী মায়ের পূর্বোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে রচয়িতা অভিনয়-শিল্পীদের প্রতি সর্বস্তরের মানুষের মনোভাবের চূড়ান্ত রূপটি ব্যক্ত করেন। প্রথমে একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজপতি, দ্বিতীয় স্তরে একজন অধিকারী এবং তৃতীয় স্তরে পরিবারে নট-নটীর মর্যাদার রূপরেখাটি এক নির্মম বাস্তব প্রেক্ষাপট সমেত উপস্থাপিত হয়েছে। গর্ভধারিণী মা তার আপন সন্তানকে পর্যন্ত অস্বীকার করেন থিয়েটারকর্মী হবার অপরাধে। থিয়েটারের প্রতি গণমানুষের এই ঘৃণা এক অনগ্রসর সমাজমানুষের আত্মিক দীনতার পরিচয় বই কি। কিন্তু এও সত্য যে, এ সমাজেই শত শত রাত ধরে আসরভর্তি দর্শকের সম্মুখে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় থিয়েটারে, যাত্রামঞ্চে। অজিত পূর্ণিমা এই বৃত্তাবদ্ধতা থেকে থিয়েটারের মুক্তি প্রত্যাশায় প্রহর গোনে। আশার বাণী ধ্বনিত হয় অজিত পূর্ণিমার কণ্ঠে—"না আমি স্টেজের অনেক দূর ভবিষ্যতের কথা বলছি—যখন আমিও মরে যাব—আমাদের দুজনের কেউই নেই—তা নিয়ে আক্ষেপ করে কি লাভ? সে আপনার প্রতিনিধিরা বুঝবে। আপনি যা পেয়েছেন তা নিয়েই তৃপ্ত থাকুন। তারপর—একজন মানুষই দু'চার বছরের মধ্যে কত মুখোশ বদলে ফেলতে পারে—একটা স্টেজ বা দেশের পরিবর্তনের কি আর সীমা আছে অজিতবাবু? আজ আপনার মা টাকা নিলেন না, একদিন হয়তো এ দেশেরই কত বড় ঘরের কত মা তাঁদের মেয়েদের গিয়ে সাধবেন—অভিনেত্রী হবার জন্য। যে জিনিষ বস্তুনিষ্ঠ সৌন্দর্যের এবং হয়তো বা সত্যের একদিন তা তার মূল্য পাবেই"।

জীবনানন্দের পূর্বোক্ত বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্য বর্তমান থিয়েটারজগত নটবৃত্তি ও সমাজবাস্তবতায় নৈমিত্তিক ঘটনা। সাম্প্রতিককালে অভিজাত ঘরের নারীগণই অভিনয় পেশার সঙ্গে অধিক সংখ্যক হারে যুক্ত।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ঘরের সন্তানগণ বরং প্রতিযোগিতায় পূর্বোক্ত শ্রেণীর নিকট পরাজিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইতিহাসের এই বিবর্তনচিন্তা জীবনানন্দের শিল্পীসত্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত। সমাজের অন্য সকল বিষয়বস্তু ও নিয়মের মতো নাটক, নটবৃত্তি ও থিয়েটার কার্যক্রমও যে কালপ্রবাহের অন্তর্গত সামাজিক চেতনাজাত ফসল জীবনানন্দ দাশ তা অনুপুঙ্খ অনুভব করতে সক্ষম। তাছাড়া শিল্পীর স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি কোনো ক্রমেই সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে যে কোনো সৃজনশীল শিল্পীই বস্তুগত অর্থে সামাজিক মানুষ—আর দশজন সাধারণ লোকের মতোই সমাজ ও গার্হস্থ্য রীতি-নীতি অনুসরণ শিল্পীরও কর্তব্য। সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন যে শিল্পীব্যক্তির আরাধ্য তাকেও প্রচলিত সমাজনীতির মধ্য থেকেই একটি পরিবর্তনের লক্ষ্যে লড়তে হয়। অর্থাৎ সমাজনীতিকে অস্বীকার করে ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষা সম্পূর্ণত অসম্ভব। সুতরাং যে সকল সৃজনশীল ব্যক্তি সমাজনীতিকে পরিহারপূর্বক প্রথাগত জীবন যাপনের পরিবর্তে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের নিমিত্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সানন্দে বরণ করে তারা ভ্রান্ত। জীবনানন্দ দাশ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—"তারা ভাবত এই যে, যখন তারা মিল দিয়ে কবিতা লিখতে শিখেছে তখন তাদের জাত বদলে গেছে, অন্যরা যেখানে একটি স্ত্রী নিয়ে রয়েছে সেখানে দশটি মেয়ে মানুষ নিয়ে তাদের থাকতে হয়, অন্যরা যেখানে জল চায় সেখানে তাদের মদ না হ'লে চলে না, অন্যরা যেখানে চুল ছাটে সেখানে তাদের বাবরি কাটা চাই—এই সব আর কি—। কবিত্বের সঙ্গে লম্বা চুল বা মদের কোনো সম্পর্ক নেই—দু'লাইন মিল দিয়ে মদ খাবার নিরঙ্কুশ অধিকার এক এক জনের জন্মায়—তার কবি প্রতিভাও সাব্যস্ত হয়ে যায়—কিন্তু গণিতের প্রতিভা নিয়ে যে লোকটা নব নব আবিষ্কারে মেতে আছে তার লম্বা চুল মানুষের উপহাসের জিনিষ—মদ খাওয়াটাও অত্যন্ত দুর্নীতি, অত্যন্ত অধঃপতন। কিন্তু সুবিধে এই, যে লোক আমাদের চেয়ে মাথা ঢের ঠিক রাখে—মদ খেতেও যায় না, চুলও ছাটে—একটি স্ত্রী নিয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিম্বা মেয়েমানুষবিহীন হয়েও প্রতিভার স্ফুরণে বিশেষ কিছু বাধে না তার—তার প্রতিভার কবিত্বের দিকটাও দু'লাইনের মিলের চেয়ে ঢের বেশী গভীর—কিম্বা আমাদের অনেক নটের চেয়েও খাঁটি নটরাজের তালে তালে ঢের বেশী সিদ্ধ হৃদয়ঘোরে চলেছে—অঙ্ক জ্যামিতি জ্যোতিষবিজ্ঞান মীমাংসার ন্যায় এই সব নিয়ে যাদের প্রতিভা ফুটে উঠেছে তারাও নটরাজের বন্ধু—তারাও কবি—কিন্তু মদ বা লম্বা চুলের প্রয়োজন তারা বোধ করে না—আমরাই বা কেন বোধ করব? আমাদের এই আনুষঙ্গিকগুলোর কি প্রয়োজন আছে? কবিতা লিখতে গিয়ে, গান গাইতে গিয়ে কিম্বা অভিনয় করবার সময়, ছবি আঁকবার সময় ব্রাণ্ডি, ঝাঁকড়া চুল বা উচ্ছৃঙ্খলতার কি প্রয়োজন? কিন্তু আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, একজন সত্যিকার কবি বা নটপ্রতিভাও এ জিনিষগুলোকে তাদের অন্তরের জীবনের পক্ষেও এমন দরকার মনে করে"। জীবনানন্দ দাশের অজিত commited নাট্যকর্মী, তার প্রতিজ্ঞা যে নটবৃত্তিকে একটি পবিত্র কাঠামো দানের মাধ্যমে প্রমাণ করবে যে, থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী, চিত্রকর, কবিসাহিত্যিক বা অপরাপর শিল্পীর মতোই শিল্পী। শ্রদ্ধাই তারা। অধপতিত নয়—চারিত্রিক স্খলন, পতন এড়িয়ে তারাও সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে সামাজিক মানুষকে জীবন-জগত সম্পর্কিত নবতর চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। করে প্রেরণাদীপ্ত। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত অজিতের এ প্রতিজ্ঞা সত্য রক্ষার নিমিত্ত মাতৃদেবীর চরণে তার শ্রদ্ধার্ঘ্য। "একদিন যদি তাঁকে বুঝিয়ে বলি যে, এ জিনিষ ছবি আঁকার মত, কবিতা লেখার মত নানা রকম মানুষের নানা রকম জীবনের নানা রকম প্রিয় একাগ্রতার নিবেদনের ঐকান্তিকতার জিনিষের মত তাহলে তিনি বুঝবেন সব; কিন্তু মদ খেয়ে তাঁকে আমি কি বলব?" অসম্পূর্ণ কিন্তু প্রায়সম্পূর্ণ আলোচ্যগ্রন্থে অতঃপর পূর্ণিমা অজিতের বিড়ম্বিত থিয়েটার জীবনে তৃতীয় সমাজ প্রতিনিধিরূপে আসে এক অভিজাত এটর্নি পরিবারের বি.এ. পাশ যুবক। তিন পুরুষের এটর্নি পেশা এবং অর্থবিত্ত, নারীপ্রেম ইত্যকার সংসারী মানুষের গতানুগতিক জীবনধারার প্রতি আসক্তি নেই। তার সমগ্র চৈতন্য জুড়ে জীবনের চরিতার্থতার জন্য ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতা একটি দার্শনিক প্রত্যয়ে পৌঁছাবার মুহূর্তে জাগ্রত কিছু জটিল জীবন জিজ্ঞাসায় সমাচ্ছন্ন। প্রকৃত অর্থে, জীবনের চরিতার্থতা কোথায়, কিসে এমন ধারার প্রশ্নের জবাব লেখকের নিজের কাছেও অজ্ঞাত। উপস্থিত চরিত্রটি অর্থ-আভিজাত্য, প্রেম কোনো কিছুতেই তার সন্ধান পায় নি। তার নিজের কথায়—"দেখুন নারীর সঙ্গে প্রেম নিয়ে জীবনটা কাটানো মন্দের ভালো। এর ভেতর ঢের মাধুর্য্য রয়েছে—তবুও বিচ্ছেদ ব্যথা ঈর্ষা একঘেয়েমিরও কি শেষ আছে? তারপর একটা ভালোবাসা যখন শেষ হয়ে যায় তখন মনে হয় কি কাদামাটি নিয়েই না ছিলাম ... মনে হয় জীবনটাকে নিয়ে এ খেলা করছি শুধু—। এর আরো তো ঢের ব্যবহার ছিল। ভালো আমি আরো ঢের বেসেছি যে রোজ হাঁপিয়ে উঠি। ঠিক যাকে ভালোবাসতে চাই তাকেও কিছুতেই তো পাওয়া যায় না। ... একটা ভালোবাসা হয় বটে—কিন্তু তাতে কোনো চরিতার্থতা নেই—অজিতবাবু ... জীবনটাকে মূল্যবান করতে চেয়েছিলে?—আমি বল্লাম, লেখ কিম্বা স্টেজ এ্যাক্টিং যদি পার—তাও কর—কিন্তু কিছুই যখন পার না তুমি তখন এই জিনিষটা কর—পূর্ণিমাকে ভালোবেসে অন্য কোনো রকম রস চরিতার্থতার কথা ভাবতে যেও না। সে একজন অভিনেত্রী, স্টেজে দাঁড়িয়ে মানুষের জীবনের অনেক নিহিত সৌন্দর্য্য ও সম্পদকে অনুভব করতে সে তোমাদের সাহায্য করে। তোমরা যদি অনুভব করতে পার তাহলে সে কৃতার্থ হয়। তেমনভাবে অনুভব করতে পেরেছ এবং সে অনুভবের মাধুর্য্য নিয়ে অনেক দুঃখ ও নিষ্ফলতার রাত একা একা মুগ্ধতায় কেটে যাবে তোমার এমন যদি বোধ কর তাহলে তোমার সমস্ত জীবনের এই সাধনাটুকুই পৃথিবীর কোনো অমূল্য জিনিষের চেয়েই কম মূল্যবান হবে না"। জীবনের চরিতার্থতা অনুসন্ধেয় বটে—কিন্তু এর সঠিক মানদণ্ড অনির্ণেয় এবং ব্যক্তিভেদে তার ভিন্নতাও অনস্বীকার্য। অবশ্য জীবনানন্দ দাশের জীবনদর্শন অনুযায়ী সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত। নশ্বর বিশ্বে যে মানুষের অস্তিত্ব সময়বৃত্ত অতিক্রমপূর্বক ইতিহাসের নক্ষত্র মণ্ডলে স্বীয় জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটায় আজও সে অবিনশ্বর তাদের সাফল্যের পুঞ্জীভূত রূপ মানব সভ্যতার নানান বাঁকে অর্জিত সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত। মহৎ কীর্তি দ্বারা সমকাল বা ভাবীকালের মানুষের কল্যাণ সাধনে যারা ব্যর্থ হয়েছেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে তারা পরিত্যক্ত—বিস্মৃত সেইসব কোটি কোটি মানুষের জীবনের চরিতার্থতা নেই। মহাকালের অনন্ত প্রবাহে তারা অস্তিত্বহীন। সম্ভবত জীবনানন্দ জীবনভর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে জীবনের এই চরিতার্থতাই অনুসন্ধান করেছেন। উপন্যাসের প্রাপ্ত অংশের অজিতের উপর্যুক্ত সংলাপে তার স্বরূপ বিধৃত।

'জীবন যাপন' [সম্পাদক কর্তৃক দেয় নাম] নামক উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি [বাঁধাইকৃত খাতা] রচনা আরম্ভের পূর্বে জীবনানন্দ দাশ স্বাক্ষর অন্তে তারিখ লিখেছেন ১৯৩২। অর্থাৎ এই উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৩২ হওয়াই সঙ্গত। সুতরাং যৌক্তিক কারণেই এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, তিনি ১৯৩২ সাল কিংবা তদপূর্ববর্তী বাংলা থিয়েটারের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত তাঁর Theatre বিষয়ক চিন্তার প্রতিফলন ঘটান। আমরা জানি, জীবনানন্দ দাশ ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে যে তিনি প্রভুত ব্যুৎপন্ন ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। প্রাচীন গ্রীসে নাট্যকলা ও থিয়েটারের বিকাশ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্যক অবহিত। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রীক মঞ্চের অভিনেতার শারীরিক সৌন্দর্য বিষয়ক প্রশংসা তার দৃষ্টান্ত। গ্রীক ট্রাজেডি পুরাণ ও প্রাচীন বীরত্ব গাঁথানির্ভর। প্রমিথিউস, আগামেমনন, ইডিপাস, ফিলোকটেটিস, ইলেক্ট্রা, এজাক্স, মিডিআ ইত্যকার চরিত্রের 'phychological realism'-কে মঞ্চে অজস্র দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপনের নিমিত্ত অভিনেতার physical structure নিঃসন্দেহে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সৌন্দর্যানুরাগী গ্রীক জাতি কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রের সমকক্ষ অভিনেতার অভিনয়নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করার পক্ষপাতি হবে এটাই সঙ্গত। বিশেষজ্ঞের অভিমত থেকেও অনুরূপ ধারণা লাভ করা যায় অনায়াসেই—"By incorporating patterns of movement and gesture drawn from contemporary ritual and religious practice, the tragedies incorporated important elements of life into the world of the mythic/heroic figures who inhabited their stage. The actors presented the spectators with a vision of the contemporary world writ large not simply a version of the mythic and heroic world write small." একথাও সত্য যে, Mythical/Heroic চরিত্রকে সমকালের জীবনের সঙ্গে অন্বিত করে উপস্থাপন আয়াসসাধ্য কর্ম। সেই ক্ষেত্রে অভিনেতার বলিষ্ঠ ব্যায়ামপুষ্ট শারীরিক সৌন্দর্য পূর্বোক্ত Mythical/Heroic চরিত্র হয়ে উঠার ক্ষেত্রে তার একমাত্র সহায়ক বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। কুথুরনুসে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী সুদর্শন অভিনেতার ব্যায়ামচর্চিত দেহ দর্শকের চিত্তে অনায়াসেই দেবোপম চরিত্রের শারীরিক অবয়বের মর্যাদা পাবে এরূপ চিন্তা অমূলক নয় বলেই মনে করি। কেননা, দর্শকের চেতনায় পূর্ব থেকেই পৌরাণিক চরিত্রের একটি Type বিমূর্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে মঞ্চের অভিনেতাকে তারা সেই কল্পিত Type-এর সঙ্গে অন্বিত করার পক্ষপাতি। বিশ শতকের ইউরোপীয় থিয়েটারের চরম বিকশিত অবস্থার যাবতীয় তথ্য জীবনানন্দ অবহিত ছিলেন। অজিতের সংলাপে উক্ত ইউরোপীয় থিয়েটারের তুলনায় বাংলা থিয়েটারের অনগ্রসরতা সংক্রান্ত ক্ষোভের মূলীভূত কারণ শৈল্পিক অসঙ্গতি কালগত অনৈক্য। ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে জীবনানন্দ দাশের সমকালীন বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপন এক্ষেত্রে অপরিহার্য বিবেচনা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকের মধ্যভাগে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যরীতির নাটকের মধ্যকার প্রকৃত পার্থক্যটি অনুধাবন" পূর্বক আধুনিক বাংলা নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন মধুসূদন দত্ত। অতঃপর শত শত হাত বদলের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতুল শিল্প-কুশলতা ও ঐতিহ্য সচেতনার অত্যাশ্চর্য মেলবন্ধনে উচ্চাঙ্গের 'শিল্প সফল' নাটক রচিত হয় বিশ শতকের গোড়াতেই। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত আধুনিক বাংলা থিয়েটার সুনির্দিষ্ট একটি প্রয়োগরীতি আত্মস্থ করতে সক্ষম হয় নি। উল্লিখিত কালপর্বে নেশানাল থিয়েটার গ্রেট নেশনাল থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, কোহিনুর থিয়েটার, মনোমোহন থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, অরোরা থিয়েটার' ইত্যাদি থিয়েটারের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও ইউরোপীয় থিয়েটারের চলমান স্রোতের সঙ্গতিপূর্ণ নাট্যিক কলাকৌশল ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসৃত হবার দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত। শিশির-অহীন্দ্র যুগ পূর্ববর্তী বাংলা থিয়েটারে আদর্শ হিসেবে অবলম্বন করা হতো ড্যাভিড গ্যারিক ও হেনরি আর্ভিং অনুসৃত পদ্ধতি। বাংলা থিয়েটারের এই কাল পর্বকে সম্ভবত ইউরোপীয় থিয়েটারের অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সঙ্গেই কেবল তুলনা করা চলে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারাক্রম অনুসরণপূর্বক ইউরোপীয় থিয়েটার উপস্থাপনা শৈলীতে নব নব নিরীক্ষান্তর অতিক্রম করছে অনায়াসে। রোমান্টিসিজম, রিয়ালিজম, নেচারিয়ালিজম, সিম্বলিজম, ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, সুরিয়ালিজম ইত্যাদি শৈল্পিক মতবাদ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক থেকে নাটক রচনা ও উপস্থাপনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরূপে গৃহীত হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে শিল্পের অপরাপর শাখা অপেক্ষা থিয়েটার অধিকতর জঙ্গম শিল্পে পরিণত হয় বিশ্ব বিশ্রুত কিছু নাট্য-নির্দেশকের কীর্তির বদৌলতে। অবশ্য তাঁদের অনন্য শিল্প প্রতিভাশ্রয়ী-কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত উনিশ শতকের মধ্যবর্তীকালে। তন্মধ্যে Constantin Stanislavsky, Andre Antoine, Nemirovich Danchenks, Vsevelod Meyerhold, Vakhtangov, Gordon Craig, Adolphe Appia, Copeau, Max Reinhardt, Erwin Piscator, Brecht প্রমুখের কীর্তি অবিস্মরণীয়। বস্তুত সামগ্রিক অর্থে ইউরোপীয় থিয়েটারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধপূর্ব কালেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইউরোপীয় সমাজ ও থিয়েটারের বিকাশের ইতিহাস সমান্তরাল গতিতে অগ্রসরমান। কিন্তু বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কারণেই তা সম্ভব হয় নি। স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত বাঙালি বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বীরত্বগাঁথা মঞ্চে উপস্থাপন করেছে জাতীয় ঐক্যসংগ্রামী চেতনা সমুন্নত রাখার নিমিত্ত। সুতরাং বাংলা থিয়েটারের পক্ষে সেকালে পাশ্চাত্য থিয়েটারের সমকক্ষতা অর্জন বস্তুগত কারণেই ছিল অসম্ভব। সমাজে অপাংক্তেয় বিনোদিনী দাসী, তিনকড়ি দাসী, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, সুশীলা, নীহারবালা প্রমুখ রমণীগণ বাংলা থিয়েটারের স্থূলদেহ, স্বল্পশিক্ষা, প্রায়সহজাত অভিনয় দক্ষতাকে সম্বল করে রাতের পর রাত বছরের পর বছর দর্শকের সম্মুখে চিত্ত সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে। সম্ভবত জীবনানন্দ দাশের অজিত চরিত্র পূর্বোক্ত অভিনেত্রীদের অভিনয় দর্শনপূর্বক প্রথম যৌবনের স্বপ্নভঙ্গের জন্য ব্যথিত হয়েছে। পূর্ণিমাকে উদ্দেশ্য করে অজিত তার করুণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয় নিম্নরূপ ভাষায়—"কলেজে পড়বার সময় আমার কিশোর মনও এম্নি ঢের বিক্ষুব্ধ হয়ে অনেক দিন ফিরে গেছে। শৈবলিনীর পার্ট নিয়ে যে এল সে যদি একজন হোঁৎকা বুড়ি হয়—ঠোঁটে তার তখনও তামাকের গন্ধ লেগে মস্ত বড় ভুঁড়ো পেট—হাতের মাংস, মুখের মাংস ঝুলছে কেমন লাগে তা হলে বলতো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় অভিনেত্রী তারাসুন্দরী তার চৌদ্দ বছর বয়সে ১৮৯৪ সালে প্রথম শৈবলিনী চরিত্র রূপায়ণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উপন্যাস 'চন্দ্রশেখরে'র নাট্যরূপ চন্দ্রশেখর মোট ৩ বার মঞ্চায়িত হয়, ১৮৯৪, ১৯১০ এবং সর্বশেষ ১৯২৬ সালে। ব্যক্তিগত জীবনে তারাসুন্দরী মোটেও সুদর্শনা ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ৪৬ বছরের অভিনেত্রী জীবনে নৃত্যগীত অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকচিত্ত জয় করেছেন এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। সম্ভবত শৈবলিনী চরিত্র রূপায়ণকারী অভিনেত্রীর প্রতি অজিতের যে ক্ষোভ তার উদ্দিষ্ট তারাসুন্দরীই হবেন। যা হোক জীবনানন্দ দাশের ইংরেজি সাহিত্যপড়া শিল্পী মানসে বাংলার যে সব পৌরাণিক নারী সৌন্দর্যের ছায়া-সম্পাত বিদ্যমান তারা সুন্দরী। তাদের সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্ট শিল্পীর পরতে পরতে চিত্রিত করেছেন তিনি—সেই রুচিবোধ থেকেই তিনি স্বকালের বাংলা থিয়েটারকে বিচার করায় আলোচ্য সঙ্কটের উদ্ভব। ইতিহাসের ধ্রুব সত্যে বিশ্বাসী সময়-চেতনার কবি জীবনানন্দ দাশের বাংলা থিয়েটার ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতি পূর্বোক্ত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া পাঠক-সাধারণকে বিস্মিত করে বই কি ! কিন্তু তাও হয় স্বল্পস্থায়ী। কারণ জীবনানন্দ দাশের থিয়েটার ভাবনার স্বরূপটি ততক্ষণেই পাঠকের চেতনায় একটি নির্দিষ্ট ছকে সংস্থিত নয়।

ক. জীবনধর্মী উচ্চাঙ্গের শিল্পগুণসম্পন্ন বাস্তব সমাজ-সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নাটক মঞ্চায়ন ও রচনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন।

খ. তিনি থিয়েটারকর্মীদের সাত্ত্বিক জীবন সাধনার পক্ষপাতি, কারণ সৎ শিল্পীর ব্রত হওয়া উচিত শিল্প সৃজন। শুধু তাই নয় থিয়েটারকর্মীদের সামাজিক মানুষের নিকট স্বীয় কর্ম ও স্বভাবকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা কর্তব্য।

গ. থিয়েটারকর্মীর দৈহিক সৌন্দর্যের আবশ্যকতাকে তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন। কারণ, অষ্টাদশীর দেহই রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীর একমাত্র শাস্ত্ররূপে স্বীকৃত। জীবনানন্দ দাশ থিয়েটারের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে সম্পৃক্ত না থেকেও উপরোক্ত সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন।

ঘ. থিয়েটারে দর্শকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিষয়েও আলোচ্য উপন্যাসে জীবনানন্দ দাশ তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন।

অজিতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গে সেই সত্যটি অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

ঙ. পূর্ণিমার মুখে উচ্চারিত ভাবীকালের থিয়েটার সম্পর্কিত জীবনানন্দ দাশের ভাবনাটি বর্তমান থিয়েটার জগতে নিশ্চয়ই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত সমেত উপস্থিত।

এতক্ষণকার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই একথা বলা যায় যে, জীবনানন্দ দাশের 'জীবন যাপন' খণ্ডিত উপন্যাস বটে কিন্তু উক্ত উপন্যাসে প্রাপ্ত জীবনানন্দ দাশের থিয়েটার বিষয়ক ভাবনা নিঃসন্দেহে পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রসূত ও যথাযথ। সম্ভব উপন্যাসে প্রকাশিত সত্যকে আরও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিম্নধৃত বক্তব্যে—"একবার কলকাতায় লাবণ্যদেবী একটি ক্লাব থেকে রঙমহলে 'ঘরে বাইরে' নাটকে মেজবৌ-এর ভূমিকায় অভিনয় করলে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল। 'তুমি কি শেষে তোমার বউকে স্টেজে নামাবে নাকি ?"—কেউ কেউ বিদ্রুপ করলে কবি তীব্র কণ্ঠে তার জবাব দিয়েছিলেন,—'আমার স্ত্রী কি করবেন না করবেন তা আমার উপর ছেড়ে দিলেই সুখী হব। আর এত সামান্য একটা ক্লাব থেকে থিয়েটার, যদি তাঁর ইচ্ছে থাকে সিনেমাতে এ্যাক্টিং করতে দিতেও আমার আপত্তি থাকবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

কবিতার অনুবাদ : প্রসঙ্গ বনলতা সেন

শিশির ভট্টাচার্য্য

অনুবাদ মানে বিশ্বাসঘাতকতা। কথাটি বলা হয়েছে একটি ইতালীয় প্রবাদে। ফরাসি একটি প্রবাদে অনুবাদকে নারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে : অনুবাদ যদি সুন্দর হয় তবে (মূল রচনার প্রতি) বিশ্বস্ত হয় না আর যদি বিশ্বস্ত হয় তবে এত কুৎসিৎ হয় যে তার দিকে তাকানো যায় না।

এসব কথাকে বিশ্বাস করলে বলতে হবে, অনুবাদ মানুষের অসাধ্য একটি কাজ। প্রতিটি ভাষা যেহেতু একটি অন্যটির চেয়ে আলাদা সেহেতু এক ভাষার রচনা অন্য ভাষায় অনুবাদ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ অনুবাদ করে আসছে। যখনই দু'টি মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে তখনই কমবেশি অনুবাদের প্রয়োজন হয়েছে এবং তা করাও হয়েছে। অনুবাদ না হলে মহাভারত, ইলিয়াড থেকে শুরু করে গার্সিয়া মার্কেজের লেখালেখি—এসব কিছুর সঙ্গেই পরিচিত হতে পারতো না মানব সমাজ। বিভাষী লেখকদের পক্ষে নোবেল পুরস্কার পাওয়া সম্ভব হতো না। থেমে যেতো জাতিসংঘ, ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসংঘ বা ইউনেস্কোর মতো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম।

কেমন করে অনুবাদ নামক 'আপাত অসম্ভব' কর্মটি সম্পাদিত হয় তা ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এ কাজে একমাত্র গবেষণা উপাত্ত (cropus) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি এবং এর একাধিক ইংরেজি অনুবাদ। যেহেতু কবিতা একটি বিশেষ ধরনের ভাষিক নির্মাণ সেহেতু অনুবাদের সাধারণ সমস্যাগুলোর পাশাপাশি কবিতার স্বরূপ এবং কবিতা অনুবাদের সমস্যাগুলো বিশেষভাবে আলোচনা করা হলো।

'বনলতা সেন' কবি জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা না হলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা। জীবনানন্দের জীবৎকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইংরেজি, ফরাসি, গুজরাতী, হিন্দিসহ বিভিন্ন ভাষায় কবিতাটি অনূদিত হয়েছে। কবিতাটির গুজরাতী অনুবাদ করেছেন শ্রী ভোলাভাই প্যাটেল (১৯৭৬ সালে) এবং হিন্দি অনুবাদ করেছেন শ্রী প্রয়াগ শুক্ল (১৯৭৭ সালে)। 'বনলতা সেন' কবিতার ফরাসি অনুবাদ করেছেন শ্রীমতি ফ্রঁস ভট্টাচার্য।

কবিতাটির অনেকগুলো ইংরেজি অনুবাদ হবার কথা জানা যায়, যার মধ্যে একটির অনুবাদক কবি স্বয়ং। ১৯৪৫ সালে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'Modern Bengali Poems' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এতে জীবনানন্দের চারটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয় যার মধ্যে বনলতা সেন কবিতাটিও ছিল। এই কবিতা চারটি অনুবাদ করেছিলেন Martin Kirkman। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকার শততম সংখ্যায় জীবনানন্দের আটটি কবিতার তর্জমা প্রকাশিত হয়। আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৯৪) সেই আটটি কবিতার মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাতটির নাম উল্লেখ করেছেন, অষ্টমটি 'বনলতা সেন' হলেও হতে পারে। রাইটার্স ওয়ার্কশপ প্রকাশিত Banalata Sen নামক কাব্যানুবাদ গ্রন্থে S.D. আদ্যক্ষরিত 'বনলতা সেন' কবিতার একটি অনুবাদের কথা (জানতে ইচ্ছা হতে পারে কে এই এস. ডি) উল্লেখ করছেন দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় (১৯৮৬)। সুজিত মুখোপাধ্যায় (১৯৮১) তাঁর রচনায় ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদকের করা 'বনলতা সেন' কবিতার ছয়টি ইংরেজি (?) অনুবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন বলে জানাচ্ছেন ফকরুল আলম। এ ছয় জন অনুবাদকের মধ্যে আছেন ইংরেজ মার্টিন কার্কম্যান ও মুকুল শর্মা। এছাড়া কবিতাটি অনুবাদ করেছেন চিদানন্দ দাশ গুপ্ত (১৯৭২), আমেরিকান ক্লিনটন বি. সিলি (১৯৯০), সুকান্ত চৌধুরী (১৯৯৮) এবং অতি সম্প্রতি ফকরুল আলম (১৯৯৯)।

এক॥ ভাষার কাঠামো : বিভিন্ন ভাষার মধ্যে পার্থক্য

মানব ভাষা একটি মুদ্রার মতো। এর দু'টি দিক রয়েছে : এক দিকে রয়েছে রূপ আর অন্যদিকে অর্থ। রূপের পোষাকী নাম 'দ্যোতক' আর অর্থ হচ্ছে 'দ্যোতিত'। উচ্চারিত বা লিখিত শব্দ 'কলম'–কে আমরা বলবো দ্যোতক (Signifier)। 'কলম' কথাটি উচ্চারিত হওয়া বা লিখিত হওয়ার প্রায় সাথে সাথে বাঙালী শ্রোতা বা দর্শকের মনে একটি লিখন যন্ত্রের ছবি ভেসে উঠে। মনে ভেসে ওঠা এই ছবিটি হচ্ছে দ্যোতিত (signified)।

বহির্জগতের বাস্তবতার সাথে দ্যোতক বা দ্যোতিতের কোন সম্পর্ক নেই। নিবযুক্ত যে বস্তুটি দিয়ে আমরা লিখি বাস্তবের সেই বস্তুটি হচ্ছে *নির্দেশিত* (referent)। নির্দেশিতের সাথে দ্যোতিতের সম্পর্কটি কোথায় তা জার্মান চিন্তাবিদ ফ্রেগো (Gottlob Frege, ১৮১৪৮–১৯২৫) সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের কাছে 'শুকতারা' আর 'সন্ধ্যাতারা' দু'টি আলাদা তারা। কিন্তু আমরা জানি, শুক্রগ্রহই ভোরের আকাশে শুকতারা আর সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা রূপে দেখা দেয়। সুতরাং 'শুকতারা' আর 'সন্ধ্যাতারা' এ দু'টি দ্যোতকের একটিই 'নির্দেশিত' এবং সেটি হচ্ছে শুক্রগ্রহ।

এক একটি শব্দের ডানে বা বাঁয়ে যুক্ত হয় আরও কিছু শব্দ। একাধিক শব্দ মিলে সৃষ্টি করে বিশেষ একটি শব্দবন্ধ যার নাম বর্গ (phrase)। যে শব্দটিকে কেন্দ্র করে বর্গ গড়ে উঠে সে শব্দটি বর্গের *শির* (head)। বর্গের শিরটি যদি নামপদ হয় তবে বর্গটি হবে একটি নামবর্গ (Noun Phrase)। 'জীবনানন্দের দীর্ঘ কবিতা' একটি নামবর্গ যেহেতু এই বর্গটির শির 'কবিতা' একটি নামপদ। বর্গের শিরটি যদি ক্রিয়াপদ হয়ে থাকে তবে বর্গটি ক্রিয়াবর্গ (Verb Phrase) বলে পরিচিত হবে। 'জীবনানন্দের দীর্ঘ কবিতা পড়ছে' ক্রিয়াবর্গ, কারণ এর শির একটি ক্রিয়াপদ (পড়ছে)।

শির ছাড়া বর্গের বাকি শব্দগুলো কোনোটি শিরের পূরক (complement) আর কোনোটি প্রসারক (modifier বা adjunct)। 'ঋক বাগানে জীবনানন্দের দীর্ঘ কবিতা পড়ছে' বাক্যে 'পড়ছে' ক্রিয়ার পূরক 'কবিতা' (কী পড়ছে? কবিতা)। 'দীর্ঘ' বিশেষণটি 'কবিতা' নামশব্দের প্রসারক। 'বাগানে' শব্দটিও 'পড়ছে' ক্রিয়ার প্রসারক, তবে স্থানগত বা অধিকরণ প্রসারক।

একাধিক বর্গ একত্রিত হয়ে গড়ে তুলে একটি প্রস্তাব (clause)। *গার্গী দেখলো যে ঋক বাগানে বসে বই পড়ছে* বাক্যে তিনটি প্রস্তাব রয়েছে ১. 'গার্গী দেখলো' এবং ২. 'ঋক বই পড়ছে' ৩. বাগানে বসে'। এখানে তিনটি প্রস্তাব বাক্যে গ্রন্থিত (embedded) হয়েছে। গ্রন্থিত প্রতিটি প্রস্তাবে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, কোনো একটি ক্রিয়াপদকে কেন্দ্র করেই প্রস্তাবটি গড়ে উঠেছে। এভাবে একাধিক প্রস্তাবের 'গ্রন্থনের' (embedding) পরিপ্রেক্ষিততে একটি বাক্য গড়ে উঠে। ভাষাবিশ্লেষণের সর্বশেষ সীমা হচ্ছে বাক্য। বাক্যের চেয়েও বৃহত্তর ভাষিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঠামো অবশ্য কল্পনা করা যেতে পারে। কাঠামোটি হচ্ছে রচনা (text)। রচনার বিশ্লেষণ শৈলীতত্ত্বের (stylistics) আওতাভুক্ত।

শির, পূরক আর প্রসারক এই তিনটি উপাদান কোনটি কোথায় বসবে তার উপর নির্ভর করে মানব ভাষাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি ডান প্রসারী এবং অন্যটি বাম প্রসারী। ডান প্রসারী ভাষায় পূরক থাকে শিরের ডানদিকে আর বাম প্রসারী ভাষায় পূরক থাকে শিরের বাম দিকে। বাংলায় বলা চলে 'ঋক বাগানে বই পড়ে' কিন্তু ইংরেজিতে বলতে হয় Rik reads a book in the garden। বাংলায় পূরক 'বই' বসেছে 'পড়ে' ক্রিয়ার বাম দিকে আর ইংরেজিতে পূরক a book বসেছে reads ক্রিয়াপদ এর ডানদিকে। এর পর আসে প্রসারকের প্রশ্ন : 'সুন্দর ফুল' নামবর্গে 'সুন্দর' বিশেষণটি নামশির 'ফুল' এর প্রসারক। এই প্রসারকটি বাংলা ও ইংরেজিতে (beautiful flower) সব সময় নামশিরের বামে বসে। কিন্তু ফরাসিতে প্রসারক কখনো বসে শিরের বামে আবার কখনো ডানে।

বর্গ একটি রুদ্ধ কাঠামো। বর্গস্থ কোনো উপাদান বর্গ থেকে বের হয়ে বাক্যে অন্য কোথাও গিয়ে বসতে পারে না। আবার অন্য কোনো অচেনা উপাদানও বর্গের ভিতরে ঢুকে যেতে পারে না। কিন্তু প্রস্তাব বা বাক্যের উজানে ও ভাটিতে বর্গগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ উপাদান নিয়ে যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পারে অনেক ভাষায়। বর্গের এই স্থানত্যাগ করে নতুন জায়গায় যাওয়ার নাম অভিবাসন (movement)। বাক্য বা প্রস্তাবের অভ্যন্তরে বর্গসমূহের অভিবাসনের স্বাধীনতা সব ভাষায় সমান নিরঙ্কুশ নয়।

বিভিন্ন ভাষার প্রস্তাব ও বর্গগুলোর আন্তর্গঠনেও পার্থক্য আছে। বাংলায় 'বই' একটি নামশির। এটি একাই নামবর্গ গঠন করেছে। কিন্তু ইংরেজিতে শুধু book বলা চলবে না, বলতে হবে a book। বাংলায় 'বাগানে' কথাটির ইংরেজি অনুবাদে রয়েছে তিনটি শব্দ : in the garden। 'ঋক বাগানে একটি বই পড়ে' বা Rik reads a book in the garden দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা দ্যোতক। কিন্তু এ দু'টি বাক্যের দ্যোতিত মোটামুটি এক। এর মানে কি এই যে দ্যোতক স্তরে ভাষাগুলোর কাঠামোর মধ্যে যত পার্থক্যই থাক, দ্যোতিত স্তরে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই?

না, পার্থক্য আছে আর্থ কাঠামোতেও। বাংলায় যে প্রাণীর নাম 'বাদুর' ফরাসিতে তার নাম 'শোভ সুরি' বা 'টেকো নেংটি ইঁদুর'। ফরাসিতে যেটা 'সুরি' বাংলায় সেটা আবার 'নেংটি ইঁদুর'। বাঙালির ভাষা মানসে 'নেংটি ইঁদুর' এক ধরনের ইঁদুর বই নয়। কিন্তু ফরাসি 'সুরি' শব্দে ইঁদুরের নামগন্ধ নেই। ইঁদুরের ফরাসি প্রতিশব্দ 'রা' (rat)। কোন এক অজ্ঞাত কারণে বাদুর প্রাণীটিকে ফরাসি ভাষামানস একটি টেকো নেংটি ইঁদুর মনে করেছে যেমন করে বাংলা ভাষামানস এক ধরনের 'সবুজ রঙের লাফিয়ে চলা পোকা'র নাম দিয়েছে 'সাপমাসী'। ফরাসি এই একই পোকার নাম 'সতরেল' অর্থাৎ যে লাফায়। বাংলা শব্দটিতে পোকাটির স্বভাবের কোনো প্রতিফলন নেই কিন্তু ফরাসি sauterelle শব্দে পোকাটির একটি বিশেষ স্বভাব প্রতিফলিত হয়েছে। ভাষাসৃষ্টিতে বহিঃপ্রকৃতি আর মানব মস্তিষ্কের মিথস্ক্রিয়ার একটি ভূমিকা রয়েছে। ফরাসি, বাঙালি বা ইংরেজ ভাষামানসের সাথে বহির্জগতের মিথস্ক্রিয়া এক রকম হয় না—এটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। ভাষায় ভাষায় পার্থক্য হওয়ার পিছনে মিথস্ক্রিয়ার পার্থক্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে।

দুই ॥ অনুবাদ কেন সম্ভব ?

অনুবাদ এক ধরনের ভাষাসংযোগ। যে ভাষার কথা অনুবাদ হচ্ছে সে ভাষাটিকে আমরা বলবো উৎস ভাষা (source language) আর যে ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে সেটিকে বলতে পারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা প্রান্ত ভাষা (target language)। অনুবাদক একজন দ্বিভাষিক ব্যক্তি। যদি কোনো ব্যক্তি একটি মাত্র ভাষা জানেন তবে তার মনে থাকে একটি দ্যোতক ও একটি দ্যোতিত। অনুবাদক যেহেতু দু'টি ভাষা জানেন সুতরাং তার মনে আছে দু'টি দ্যোতক : একটি ক-ভাষার ও অন্যটি খ-ভাষার। দ্যোতক দু'টি রূপ ও কাঠামোগত দিক থেকে আলাদা—এতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। এর প্রমাণ, দোভাষী ব্যক্তি অনেক সময় একটি দ্যোতকের কাঠামোতে অন্য দ্যোতকের উপাদান ঢুকিয়ে দিতে পারে (হতে পারে ক্লান্তি বা অন্য কোনো কারণে)। বাংলা বাক্যের আদলে অদ্ভুতশ্রবণ ইংরেজি বাক্য বা ইংরেজি বাক্যের আদলে শ্রবণকটু বাংলা বাক্য সঞ্জনন করে ফেলতে পারেন দোভাষী মনের অজান্তে। এ রকম ঘটনার নাম interference যাকে বাংলায় আমরা বলবো ব্যতিচার।

কিন্তু ক'টি দ্যোতিত আছে অনুবাদকের মনে? একটিই না দু'টি ভাষার জন্যে আলাদা আলাদা দু'টি? আমরা দেখেছি দু'টি ভাষার আর্থস্তরে পার্থক্য আছে । কিন্তু এ পার্থক্য সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় রূপতাত্ত্বিক স্তরে। উৎস ভাষার শব্দ প্রান্ত ভাষায় একেবারেই না পাওয়া যেতে পারে (যেমন 'ইন্টারফেরেন্স'-এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই বলে আমি বানিয়েছি 'ব্যতিচার')। কিন্তু এ রকম কখনই হয় না যে উৎস ভাষার একটি বাক্য প্রান্ত ভাষায় একেবারেই অনুবাদ করা গেল না। কি করে বাক্যের অনুবাদকে কোনোমতেই ঠেকানো যায় না?

মানব ভাষাগুলো দ্যোতক আর দ্যোতিত এই উভয় দিক থেকেই একটি অন্যটির চাইতে আলাদা হলেও এদের মধ্যে মিলও আছে অনেক। সঞ্জননী বৈয়াকরণরা বলছেন সব মানব ভাষার ব্যাকরণ এক। তারা এর নাম দিয়েছেন বিশ্বব্যাকরণ (universal grammar)। এই বিশ্বব্যাকরণ মানব মনের সহজাত একটি ক্ষমতা। বিশ্বব্যাকরণের দু'টি দিক রয়েছে ১. ধ্রুপদ (principle) আর ২. খেয়াল (parameter)। ব্যাকরণের ধ্রুপদ অংশটুকু সব ভাষার জন্যে এক। আর খেয়াল অংশটুকু ভাষাভেদে আলাদা। যেমন, কোনো ক্রিয়াশিরের পূরক থাকবে এটা সব ভাষার জন্যে সমান সত্য। সুতরাং এটা একটি 'ধ্রুপদ'। কিন্তু ক্রিয়ার পূরক ক্রিয়ার ডানদিকে না বামদিকে বসবে এটা নির্ভর করবে নির্দিষ্ট ভাষাটির ওপর। সুতরাং এটা বিশ্বব্যাকরণের একটি 'খেয়াল'।

এ রকম কল্পানুমান করা যেতে পারে যে বিশ্বব্যাকরণের মতো বিশ্বদ্যোতনা (universal significance) বলে একটি সহজাত ধ্রুপদ রয়েছে মানব মনে (সঞ্জননী বৈয়াকরণরা এভাবে বলেননি যদিও তবুও দ্যোতকের যদি ধ্রুপদ থাকতে পারে তবে দ্যোতিতেরও সে রকম কিছু থাকতেই পারে) এই ধ্রুপদের বদৌলতেই এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় অনুবাদ করলে সেটা কম-বেশি বোধগম্য হয়। বাক্যস্তরে এই বিশ্বদ্যোতনার ধ্রুপদ অংশ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয় আর শব্দস্তরে কার্যকরী হয় এর খেয়াল অংশটি। সুতরাং আমরা ধরে নেবো, অনুবাদকের মনে আছে একটি মাত্র আর্থ ধ্রুপদ। আর্থ স্তরের যে পার্থক্যগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ইতিপূর্বে সেগুলো এই আর্থ ধ্রুপদের খেয়াল মাত্র। আর্থ খেয়ালের কারণে অনুবাদ একটি জটিল কর্মে পরিণত হয় কিন্তু আর্থ ধ্রুপদের কারণেই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ সম্ভবপর হয়ে উঠে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে একটি দ্যোতকের দ্যোতনা অন্য একটি দ্যোতক ভাগ করে নিয়ে থাকে। একই ভাষার মধ্যেও এ রকমটি হতে পারে। প্রতিটি মানুষই অনুবাদক, এমনকি সে একভাষী হলেও। আমরা যখন কোনো কথা বুঝিয়ে বলি বা একই ভাষায় বিশেষ একটি শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করি তখন আমরা আসলে অনুবাদই করি। একই দ্যোতিতের জন্যে একাধিক দ্যোতক ব্যবহার করার নামই অনুবাদ। কিন্তু দু'টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দের অর্থ কখনই পুরোপুরি এক হয় না। দ্যোতনার এই অমিলটির জন্যে বিশ্বদ্যোতনার খেয়াল অংশ দায়ী। আর দু'টি দ্যোতনার মধ্যে অনেকখানি মিল যে হয় তার মূলে আছে বিশ্বদ্যোতনার ধ্রুপদ অংশটি। এ রকম বলা যেতে পারে যে অনুবাদের সাফল্যের মূলে আছে ভাষার ধ্রুপদ, ব্যর্থতার মূলে আছে ভাষার খেয়াল।

তিন॥ কবিতার স্বরূপ

আলোকচিত্রের সাথে বা ইম্প্রেশনিস্ট ছবির পার্থক্য কি? আলোকচিত্রে ব্যক্তির বাস্তব রূপ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। কিন্তু ইম্প্রেশনিস্ট ছবিতে চিত্রকর বাস্তবতা বা স্পষ্টতা যথাসাধ্য বর্জন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যক্তির ইম্প্রেশনিস্ট ছবি ব্যবহার করা চলে না। এটা আলোকচিত্রের কাজ। কিন্তু শিল্প হিসেবে ইম্প্রেশনিস্ট ছবির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে না।

কবিতা একটি রচনা বা text। কিন্তু ভাষার অন্য আর দশটি রচনার ভাষাকাঠামোর সাথে কবিতার ভাষাকাঠামোর পার্থক্য রয়েছে। আর দশটি ভাষিক রচনার মতো কবিতা মানুষের কোনো বাস্তব কাজে লাগে না। ইম্প্রেশনিস্ট ছবির মতোই কবিতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি শিল্প। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কবিতাকে দরকারি হতে হয় না, শিল্প হিসেবে উৎরে গেলেই চলে। শিল্পোত্তীর্ণ কোনো কবিতা যদি সমাজের অন্য কোনো কাজে লাগে 'বিদ্রোহী' বা 'ছাড়পত্র'-এর মতন, সেটা কবিতার কাছ থেকে মানুষের উপরি পাওনা।

ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী তার ছবিটিকে ইচ্ছে করে অস্পষ্ট করে দেন। ইম্প্রেশনিষ্ট ছবি আঁকার যুগ যখন শুরু হয় ঊনবিংশ শতকে (১৮৭২) তার বছর ত্রিশেক আগেই ইয়োরোপে ফটোগ্রাফীর চর্চা (১৮৪১) শুরু হয়ে গেছে। ফটোগ্রাফীতে মূর্ত শিল্পকর্মের মতোই ব্যক্তি বা বস্তুর নিখুঁত ছবি ফুটে উঠে। আলোকচিত্র একটি সুসম্পূর্ণ দ্যোতক, দেখামাত্র মানব মনে দ্যোতিত সৃষ্টি হয়ে নির্দেশিতকে চিনতে দেরি হয় না। ফটোগ্রাফী চালু হয়ে গেলে আঁকা ছবির আর চাহিদা থাকবে না এমত একটি সন্দেহ চালু হতে শুরু করে তৎকালীন ইয়োরোপীয় সমাজে। এ সন্দেহের মূলে সরাসরি আঘাত করে ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকর্ম। ছবি বা দ্যোতকটিকে তাঁরা অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ করে দিলেন (তবে শিল্পী কতটুকু সরে যেতে পারবেন দ্যোতিত থেকে তার একটা সীমা নিশ্চয়ই ছিল)। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা চাইলেন দর্শক নিজের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে পূর্ণ করুক দ্যোতককে এবং নিজেই খুঁজে বের করতে চেষ্টা করুক নির্দেশিতকে (যে মানসিক পরিশ্রম আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে দর্শককে করতে হয় না)। এভাবে শিল্প আর দর্শকের সক্রিয় যোগাযোগ ঘটিয়ে তাঁরা প্রমাণ করলেন মানুষের সৃজনশীলতার কাছে যন্ত্র হার মানতে বাধ্য।

'পাখি', 'নীড়' এবং 'চোখ' এই তিনটি দ্যোতকের ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতনা আছে আমাদের বাংলা ভাষা মানসে কিন্তু 'পাখির নীড়ের মতো' যে চোখ তার কোনো সুস্পষ্ট দ্যোতনা হয়তো নেই সেখানে। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' একটি ব্যাসবাক্য। এ ব্যাসবাক্যে পাখির নীড়ের সাথে চোখের তুলনা করা হচ্ছে। 'পাখির নীড়' চোখের উপমান, চোখ উপমিত (= উপমাকৃত?)। কোনো না কোনোভাবে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দু'টি জিনিসের মধ্যে তুলনা করাকে বলা যেতে পারে উপমা দেওয়া বা রূপক কল্পনা (metaphor)। সাধারণ কথাবার্তায়ও আমরা রূপক শব্দ ব্যবহার করে থাকি, তবে কবিতায় এর চূড়ান্ত ব্যবহার হয়।

কোনো রূপকেরই দ্যোতিত থাকে না। 'রূপক' আসলে শব্দ সৃষ্টির একটি উপায়। রূপক সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে তৈরি হয় একটি দ্যোতিত (মনমাঝি বা বিদ্যালয়) সেই দ্যোতিতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালমসলা নেওয়া হয় অন্য এক বা একাধিক দ্যোতিত থেকে (মন আর মাঝি, বিদ্যা আর আলয়)। মাল–মশলা হিসেবে ব্যবহৃত দ্যোতিতগুলোর অর্থ একটির সাথে অন্যটি গ্রন্থিত হয়ে (semantic embedding) গিয়ে নতুন একটি অর্থ সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু দ্যোতক স্তরের মিশ্রণ যত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয় (মন + মাঝি বা বিদ্যা + আলয়) দ্যোতিত স্তরের মিশ্রণ তত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয় না। দ্যোতনার সৃষ্টিপর্বের শুরু থেকে একেবারে শেষের একটু আগে পর্যন্ত যে অন্তবর্তীকালীন সময় সেটিতে দ্যোতিত স্তরে একটি আপাতশূন্যতা বা 'আর্থ ধোঁয়াশা' বিরাজ করে। বক্তা ও শ্রোতা যে যার মতো করে এই আপাতশূন্যতা পূরণ করতে বা ধোঁয়াশার ছাই সরিয়ে 'অর্থ' নামক অমূল্য রতন খুঁজতে চেষ্টা করেন।

কোনো দু'টি ভাষাতেই উপমা সৃষ্টি একভাবে হয় না। ভারতবর্ষে সুন্দরী নারীর মুখের সঙ্গে চাঁদের উপমা দেয়া হয়। এ উপমা ফরাসী সাহিত্যে পুরোপুরি অনুপস্থিত। সাধারণ বাঙালীর প্রেমপত্রে 'ময়নাপাখি' বা 'গোলাপ' প্রেমিকার উপমা, কিন্তু সাধারণ ফরাসী প্রেমিকা তার প্রেমিককে সম্বোধন করে 'ওগো আমার বাঁধাকপি' (mon chou) বা 'ওগো আমার হাঁস' (mon canard) বলে। বাংলা কবিতায় এ ধরনের উপমা ব্যবহার করা কোনো কবির পক্ষে সম্ভব নয়, তা যত মৌলিক আর আন্তরিকই তিনি হতে চান না কেন। সুতরাং উপমা সৃষ্টির ব্যাপারটিও ভাষার নিয়মের অধীন।

কবি তাঁর নিজের প্রয়োজনে রূপক সৃষ্টি করেন। কালক্রমে রূপক শব্দের দ্যোতনার ধোঁয়াশা সরে যায়। তখন শব্দটি সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে শুরু করে (যেমন বিদ্যালয় শব্দটি বহুল ব্যবহৃত)। সুদূর অতীতের কোনো কবি সম্ভবত এই প্রক্রিয়ার শিলান্যাস করে থাকবেন তার কবিতায়। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' যদি কখনও সমাসবদ্ধ হয়ে 'পাখিনীড়চোখ'–এ পরিণত হয় এবং নারীর চোখের প্রতিশব্দ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তবে তার গৌরব জীবনানন্দেরই প্রাপ্য হবে।

শব্দের যেমন দ্যোতনাগত আপাতশূন্যতা আছে তেমনি বাক্য বা পুরো একটি কবিতারও তা থাকতে পারে। সম্পূর্ণ একটি কবিতারও রূপক হতে বাধা নেই। সেক্ষেত্রে কবিতার সামগ্রিক দ্যোতনাক্ষেত্রে একটি ধোঁয়াশা থাকবে এবং কবি নিজে এবং বিভিন্ন পাঠক বিভিন্ন ভাবে এই ধোঁয়াশার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। আমার বক্তব্যের সমর্থনে জীবনানন্দকে উদ্ধৃত করছি : 'কোনো একটি অনশ্বর কবিতা প্রচুর অভিজ্ঞতা দাবি করে পাঠকের কাছ থেকে ; ভাসা ভাসা অর্থ পেরিয়ে উপলব্ধির আলোয় অর্থের অনমনীয় শিবত্বে পৌঁছনো দরকার। একবার পৌঁছুতে পারলে পাঠকের মনের নমনীয়তার আধেয় হিসাবে থাকবে সে। কবিতাটির ভিন্ন ভিন্ন মানে বেরুবে একজন ও বিভিন্ন পাঠকের অর্থকৃৎ মনের বিভিন্ন রকমের আলোকিত অবস্থায়। অর্থ অস্বচ্ছ বোধ হলে কবিতাটির ধ্বনিগুণ সম্পর্কে অন্ততঃ চেতনার স্পষ্টতায় পাঠকের সুবিধা হবে বলে মনে হয় ; কবিতাটির ইঙ্গিত ধরা পড়বে তাহলে ; অর্থ পরে বোঝা যেতে পারে' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৬)।

বুদ্ধদেব বসু মহৎ কবিতার দু'টি গুণ নির্দেশ করেছিলেন ১. আন্তরিকতা (sincerity), ২. মৌলিকতা originality)। আন্তরিকতা শুধু কবিতা কেন যে কোনো মহৎ সৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবিতা মৌলিক হয় উপমার অভিনবত্বে। জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন : 'উপমার এত ছড়াছড়ি আজকালকার কোনো কবিতেই নেই। তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দুরগন্ধবহ। এক একটি উপমাই এক–একটি ছোটো কবিতা হতে পারতো। তিনি যে জাতের কবি তাতে উপমাবিলাসী না হয়ে তাঁর উপায় নেই, অর্থাৎ উপমা তাঁর কাব্যের কারুকাজ মাত্র নয়, উপমাতেই তাঁর কাব্য। মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে জীবনানন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার কোনো এক পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'উপমাই কবিত্ব'। কথাটা তখন থেকেই আমার মনে বিঁধে আছে। উপমাই কবিত্ব—এ কথা হয়তো সত্য নয়, কিন্তু উপমাতেই কবিত্ব, এ কথা বললে কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মেনে নেয়া অসম্ভব হয় না' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৬)।

ইম্প্রেশনিস্ট ছবির মতোই দ্যোতনার ক্ষেত্রে মহৎ কবিতা পাঠক-শ্রোতার অংশগ্রহণ দাবি করে। কবি আর পাঠক এ দু'জনে মিলে অনন্তকাল ধরে নির্মাণ করে চলে মহৎ কবিতার দ্যোতিতটিকে। যে কবিতা যত বেশি মূর্ত সেটি তত কম মহৎ কবিতা। কিন্তু পুরোপুরি বিমূর্ত (যেমন অর্থহীন ছড়া 'আগডুম বাগডুম') হয়ে গেলে কি কোনো কবিতা 'মহৎ' বলে অভিহিত হবে? আমি মনে করি দ্যোতনাক্ষেত্রে ধোঁয়াশার একটা সীমা আছে। ভুলে গেলে চলবে না যে কবিতা একটি ভাষিক নির্মাণ এবং ভাষার দু'টি দিক—দ্যোতক এবং দ্যোতিতের কোনো একটিকে কোনো অজুহাতেই পুরোপুরি অস্তিত্বহীন করে দেওয়া যাবে না। যে কবিতা একশ ভাগ বিমূর্ত সেটি মহৎ হওয়া দূরে থাক, কোনো কবিতাই নয় আর।

চার ॥ কবিতা অনুবাদের সমস্যা

যে কোনো ধরনের রচনা (text) ভাষান্তরের ক্ষেত্রে ভাষার ধ্বনি, রূপ, বিন্যাস ও অর্থ এই প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়। তবে কবিতার সাথে অন্য যে কোনো রচনার পার্থক্য হচ্ছে কবিতা একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর অধিকারী এবং এই কাঠামোটি কবিতার অস্তিত্বের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো গদ্যরচনা এতটা কাঠামো নির্ভর নয়। গদ্যের ক্ষেত্রে শুধু রচনার দ্যোতিতটি প্রান্তভাষায় পুনর্নির্মাণ করলেই চলে কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে দ্যোতিতের পুর্ননির্মাণ করতেতো হয়ই এবং এরপর চেষ্টা করতে হয় দ্যোতক স্তরটিকেও যতটা সম্ভব মূলানুগ করার জন্যে। সুতরাং দ্যোতকস্তরগত সমস্যা অর্থাৎ ধ্বনিস্তরগত ও রূপবিন্যাসগত সমস্যা বেশি অনুভূত হয় কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রে।

ক. **দ্যোতিত স্তরের সমস্যা :** কোনো ভাষার ধ্বনি-রূপ-বিন্যাস তথা দ্যোতক স্তরটি সহজে বদলায় না। সংস্কৃত বামপ্রসারী ভাষা ছিল। সংস্কৃত থেকে বিকশিত সবগুলো ভাষা (হিন্দি, বাংলা, মারাঠী ইত্যাদি) বামপ্রসারী। এগুলো ভাষার খেয়ালের স্থির অংশ। কিন্তু ভাষার দ্যোতিত অংশ তুলনামূলকভাবে অনেক দ্রুত বদলে যায়। শব্দের অর্থ স্বতঃপরিবর্তনশীল। এগুলো ভাষার খেয়ালের অ-স্থির অংশ।

শব্দের অর্থ রঙের বর্ণালির মতো। একে 'অর্থসুষমা' বা 'অর্থচ্ছটা' বলা যায়। প্রতিটি শব্দের উদ্ভবের বিচিত্র ও জটিল ইতিহাস এই অর্থচ্ছটা সৃষ্টির জন্যে দায়ী। শব্দের অর্থ দুই ধরনের হতে পারে ১. মূর্ত (iconic) ও ২. বিমূর্ত (abstract)। 'পাখি' শব্দটি দ্যোতিত করে একটি আকাশচারী প্রাণীকে। এটি শব্দটির প্রাথমিক বা মূর্ত অর্থ। সংস্কৃত বৈয়াকরণরা শব্দের মূর্ত অর্থটির নাম দিয়েছেন অভিধা। কোনো ভাষা শিক্ষাকালীন শব্দ আর এর অভিধা একই সাথে অর্জিত হয়। তাছাড়া অভিধা অভিধানেও পাওয়া যায়। অভিধা ছাড়াও শব্দের আরও কিছু অর্থ থাকে। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' শব্দবন্ধে যে পাখির কথা বলা হচ্ছে সেটি ঠিক আকাশচারী পাখাওয়ালা পাখি নয়। সুতরাং 'পাখি' শব্দটি এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বিশেষ অর্থটির নাম লক্ষণা। পাশ্চাত্য ব্যাকরণে এর নাম metaphor। একে রূপকার্থও বলা হয়ে থাকে। একটি রূপক যদি বার বার ব্যবহৃত হয় ভাষায় তবে এটি নতুন একটি শব্দে পরিণত হয়।

আরও এক ধরনের লক্ষণা রয়েছে। 'দুই প্যাকেট নূরানী দিন' বললে বাংলাদেশের সব মুদি দোকানী নূরানী কোম্পানীর দুই প্যাকেট ময়দা বা আটা এগিয়ে দেবে। 'একটি পেন্টিয়াম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেনা হয়েছে' বললে বোঝাবে যে বিশেষ ক্ষমতার মাদার বোর্ডযুক্ত একটি কম্পিউটার কেনা হয়েছে। উপরে প্রথম উদাহরণে পণ্যের কোম্পানীর নাম পণ্যের নামে পরিণত হয়েছে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে একটি মেশিনের অংশবিশেষ সম্পূর্ণ পণ্যটিকে দ্যোতিত করছে। কোনো একটি শব্দের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত অন্য একটি শব্দ যদি সংশ্লিষ্ট শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তবে এই ব্যাপারটিকে আমরা 'মেটোনিমি' (বা বাংলায় 'মিতনামিতা') বলবো। মিতনামিতার ফলে রূপকের মতোই নতুন একটি শব্দ সৃষ্টি হয়।

আরও একটি অর্থ থাকতে পারে শব্দের। সেটি হচ্ছে 'ব্যঞ্জনা'। যেমন 'চাষা' আর 'কৃষক' এ দু'টি শব্দের অভিধা এক। কিন্তু এদের ব্যঞ্জনা এক নয়। 'কৃষকদের মিছিল' বলা চলে কিন্তু 'চাষাদের মিছিল' বলা চলে না। একটি শব্দের বহুবিধ ব্যঞ্জনা থাকতে পারে। 'রেজিস্টার'ও এক ধরনের ব্যঞ্জনার অধিকারী করে শব্দকে। রেজিস্টার হচ্ছে শব্দের 'প্রয়োগক্ষেত্র'। 'তাড়ানো' আর 'খেদানো'-র অভিধা একই। কিন্তু এ দু'টি শব্দ একই প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয় না। এ দু'টি শব্দের 'রেজিস্টার' আলাদা আলাদা যেমন আলাদা 'চাষা' আর কৃষক' শব্দের 'রেজিস্টার' বা প্রয়োগক্ষেত্র।

শব্দ প্রথমে থাকে মূর্ত কিন্তু ধীরে ধীরে এটি বিমূর্ততার দিকে এগোতে থাকে। অর্থচ্ছটার বিমূর্ত অংশ (লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা) স্বতঃপরিবর্তনশীল। বিমূর্ততা স্বল্পস্থায়ী হতে পারে, হতে পারে দীর্ঘস্থায়ীও। লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা একান্ত ব্যক্তিগতও হতে পারে। একজন লেখক বা কবির কাছে কোনো শব্দ বা শব্দবন্ধের বিশেষ একটি ব্যঞ্জনা থাকতে পারে। 'বনলতা সেন' কোনো এক নারীর নাম। এটি 'বনলতা সেন' কথাটির অভিধা। কিন্তু 'বনলতা সেন' কথাটির কি লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা ছিল জীবনানন্দের কাছে তা অনুবাদক বা কবিতা পাঠক কারও পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। গোপালচন্দ্র রায় (১৯৯৮) বনলতা সেনের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দের কাছে। কবি মৃদু হেসে উত্তরটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন।[১]

খ. দ্যোতক স্তরের সমস্যা : ধ্বনি, রূপ ও বিন্যাস—এই তিনটি স্তরে যে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয় সেগুলো একটি অন্যটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। অন্য যে কোনো রচনার তুলনায় কবিতায় ধ্বনি, রূপ ও বিন্যাসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক গভীর।

প্রতিটি ভাষার ধ্বনিকাঠামো আলাদা। বিশেষ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির সাথে জড়িয়ে থাকে মানুষের কিছু কিছু সহজাত বা অর্জিত অনুভূতি। সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে ধ্বনিগত ব্যঞ্জনাও কম গুরুত্ব বহন করে না। অনেক সময় শুধুমাত্র বিশেষ কোনো ধ্বনিগত ব্যঞ্জনার জন্যেই কবি কোনো শব্দ ব্যবহার করেন কবিতায়। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য—চরণ দু'টিতে একের পর এক আ-ধ্বনির অনুপ্রাস দূর অতীতে চলে যাবার অনুভূতি জাগাতে পারে বাঙালি পাঠকের মনে, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের নগরী বিদিশা ও শ্রাবস্তীর গৌরবময় অতীতের সাথে যদি সে পাঠকের পরিচয় থাকে।

মস্তিষ্কের নির্দেশে ভাষিক ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয় ফুসফুস নিসৃত বায়ু সহযোগে। এই বায়ু একটানা নিসৃত হয় না। এ কারণেই মানুষ কখনও একটানা কথা বলে না। ধ্বনি, শব্দ এবং বাক্য—মানব ভাষার এই তিন স্তরের প্রতিটিতেই 'চলা ও থামা' বা 'বেগ ও বিরতি'র ব্যাপার আছে। 'বেগ' এর পারিভষিক নাম 'প্রস্বন' (accent) আর বিরতির পারিভাষিক নাম 'যতি' (pause)। যতি দুই প্রকারের হয় : ভাব-যতি (sense-pause) ও ছন্দোযতি (breath-pause)। বাক্যে প্রতিটি বর্গের একটি স্বতন্ত্র ভাব বা দ্যোতনা এবং একটি স্বতন্ত্র ধ্বনি-কাঠামো আছে। তাই প্রতিটি বর্গ উচ্চারণের পর মানুষ এক বার দম নেয়। সুতরাং ভাবযতি ও ছন্দোযতি সাধারণত একই স্থানে হয়ে থাকে। (সুনীতিকুমার ১৯৩৯)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতি ও বিরতির ফলে সৃষ্ট এই স্বতসজ্জিত শব্দবন্ধের নাম পর্ব (measure বা bar)। প্রতিটি পর্বের শুরু হয় একটি শ্বাসাঘাত বা প্রস্বন দিয়ে এবং শ্বাসাঘাতের এই বেগ মিলিয়ে যতি এসে গেলেই শেষ হয় নির্দিষ্ট পর্বটি। প্রতিটি পর্বে দুই কি তিনটি শব্দ থাকে। এই শব্দগুলো পর্ব–মধ্যে আবার পর্বাঙ্গ (beat) রূপে বিভক্ত হয় (সুনীতিকুমার, ঐ)। প্রতিটি পর্বের শুরু হয় একটি শ্বাসাঘাত বা প্রস্বন দিয়ে এবং শ্বাসাঘাতের এই বেগ মিলিয়ে যতি এসে গেলেই শেষ হয় নির্দিষ্ট পর্বটি। এ বেগ ও বিরতি শব্দ ও বাক্যের 'একমুখী' (linear) গতিতে একটি ওঠানামা বা তরঙ্গের সুর আনে। এই তরঙ্গয়িত সুরের নামই ছন্দ।

মুখের ভাষার বা গদ্যের বাক্যে কয়টি পর্ব থাকবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। গদ্যছন্দ অনিয়মিত ও অপরিমিত পর্বের অধিকারী। কিন্তু কবিতার চরণে কয়টি পর্ব থাকবে তার সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। সুপরিমিত পর্বযোগে পদ্যছন্দ সৃষ্টি হয়। উৎস ভাষার ছন্দের পর্ব বিন্যাসের দাবি কবির শব্দ বাছাইকে প্রভাবিত করতে পারে। সাধারণ বাক্য সৃষ্টিতে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে শুধু একটি বিশেষ দ্যোতনা শ্রোতার মনে জাগানো। কবিতার ক্ষেত্রেও দ্যোতনার ব্যাপরটি আছে। কিন্তু এ ছাড়াও আছে ছন্দ ও শিল্পসৃষ্টির ইচ্ছা। নিচের উদাহরণে আমরা দেখছি, সাধারণ গদ্যবাক্যের উজানে আছে কর্তা নামবর্গ এবং ভাটিতে ক্রিয়াবর্গ এবং ক্রিয়াবর্গের বামপাশে পূরক নামবর্গ। এটাই বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক ক্রম যেহেতু বাংলা বামপ্রসারী ভাষা। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ এই স্বাভাবিক ক্রমকে উপেক্ষা করে বর্গ দু'টিকে আগে পরে নিয়ে এসেছেন।

পদ্যছন্দ : NP [ডানার রৌদ্রের গন্ধ] NP [চিল]

গদ্যছন্দ : NP [চিল] NP [মুছে ফেলে]

ছন্দ সৃষ্টির প্রয়োজনে কবি উৎস ভাষার কাঠামোকে কমবেশি পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু ইম্প্রেশনিষ্ট চিত্রকরের মতো কবিরও স্বাধীনতার সীমা আছে। বাক্যকাঠামোর যে কোনো ধরনের পরিবর্তন তিনি করতে পারেন না। ভাষার খেয়ালগুলো মেনেই কবিকে নিজের খেয়াল মেটাতে হয়। কোনো প্রকার প্রেরণা বা অজুহাতেই কবি 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ' না বলে ইংরেজি বর্গের আদলে 'গন্ধ রৌদ্রের ডানার' (the scent of sunlight from it's wings) বলতে পারেন না।

ছন্দ ভাষার একটি ধ্রুপদ। সব ভাষায় এই ছন্দের স্বরূপ এক রকম হয় না। বাংলায় যেখানে প্রস্বন হয় ইংরেজিতে সেখানে প্রস্বন হয় না বা ইংরেজিতে যেখানে যতি বাংলায় সেখানে যতি নয়, ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রতিটি ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়।' একই কথা বলেছেন ভাষাবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড সাপির একটু অন্য ভাবে। তাঁর মতে, কোনো ভাষায় কোনো কোনো ছন্দ ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বা ভবিষ্যতে কোনো কোনো ধরনের ছন্দের উদ্ভব হতে পারে তা ভাষাটির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বলে দেওয়া যেতে পারে।

দু'টি ভাষার ছন্দের পার্থক্যের ফলে কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রে দু'টি সমস্যার উদ্ভব হয়। ১. প্রান্ত ভাষা এবং উৎস ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা 'স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি' যেহেতু আলাদা সেহেতু এক ভাষার কবিতার ছন্দ অন্য ভাষায় চালিয়ে দেওয়া দুরূহ। ২. প্রান্তভাষার ছন্দ দাবি করতে পারে অন্য রকম পর্বযুক্ত শব্দ যার সঙ্গে হয়তো উৎস ভাষার দ্যোতিতের টায় টায় মিল হয় না। তখন অনুবাদকের 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা হয়। অর্থের মিল হলে ছন্দের মিল হয় না বা হতে পারে এর উল্টোটা। এই একই কারণে উৎস ভাষার সুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রান্ত ভাষায় অনূদিত গান গাওয়া হলে তা বিসদৃশ ঠেকে। কবিতা বা গান অনুবাদের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় সমস্যা।

পাঁচ॥ অনূদিত বনলতা

বহুদিন যাবৎ এক পরিব্রাজক পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে—এটাই বনলতা সেন কবিতার প্রথম চরণটির দ্যোতিত। প্রাচীন ভারতের বণিকেরা যে পথ বেয়ে দ্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য করতে যেতো সে পথ বেয়েই পৃথিবী পরিক্রমণে বের হয়েছেন এই কবিতার পরিব্রাজক, সম্ভবত বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সমগ্র পৃথিবীর কথা বলা হলেও এ কবিতার পৃথিবী আসলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সীমাবদ্ধ। দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা থেকে রওয়ানা হয়ে উত্তর-পূর্বে মালয়েশিয়া, খুব বেশি হলে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত গিয়েছেন এই পরিব্রাজক। মজার ব্যাপার হচ্ছে শুধু পায়ে হেঁটে এ জলপথ পাড়ি দেওয়া অসম্ভব, বিশেষত মধ্যপ্রদেশের ভূপালে অবস্থিত বিদর্ভ নগরে সমুদ্রপথে যাওয়া যায় না। কিন্তু এ কবিতারই পরবর্তী স্তবকে হাল ভেঙে যাওয়া কোনো জলযানের নাবিক, সফেন সমুদ্র এবং দারুচিনি দ্বীপের কথা রয়েছে।

বনলতা সেন কবিতার ছয় জন অনুবাদকের কেউই এ ব্যাপারটি খেয়াল করেন নি। ইংরেজিতে path শব্দটির অভিধা সবসময় পায়ে হাঁটা পথ না হলেও স্থল পথ : ১. way made for footpassangers, specially one merely made by walking, not specially constructed ২. Track laid for foot or cycle racing। সুতরাং Seely তাঁর অনুবাদে path শব্দে হাঁটাপথের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। way শব্দটি জল-স্থল-আকাশের যে কোনো পথ দ্যোতিত করলেও ফকরুল আলম walk ক্রিয়া ব্যবহার করাতে বোঝা যায় তিনি way দিয়ে হাঁটাপথ বোঝাতে চেয়েছেন। চিদানন্দ দাশগুপ্ত আর সুকান্ত চৌধুরী 'পথ'-এর অনুবাদ করেছেন road। 'পথ'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ road হতে পারে না সম্ভবত, যেরকম সড়কের ইংরেজি প্রতিশব্দ path নয়। জীবনানন্দ আর Kirkman 'পথ' কথাটিকে একেবারে বাদ দিয়েছেন তাদের অনুবাদে। 'পথ' আর 'পৃথিবীর পথ' দুইই জীবনানন্দের অনুবাদে this world এবং Kirkman-এর অনুবাদে this earth।

যদিও 'জলযানযোগে ঘুরে বেড়ানো' দ্যোতিত করার জন্যে বেশ কিছু প্রতিশব্দ আছে ইংরেজিতে[২] তবুও সবাই 'পায়ে চলা' অর্থেই নিয়েছেন 'পথ হাঁটা'কে। ক্রিয়াশির 'পথ হাঁটিতেছি' চিদানন্দ দাশগুপ্ত, Kirkman আর Seely'র অনুবাদে হয়েছে roamed, সুকান্ত চৌধুরী ও ফকরুল আলমের অনুবাদে হয়েছে walked।

হাজার বছর ধরে	আমি পথ হাঁটিতেছি	পৃথিবীর পথে
Long অনুবাদক : জীবনানন্দ দাশ	I have been a wanderer	of this world
A thousand years অনুবাদক : Martin Kirkman	I have wandered	upon this earth
For aeons অনুবাদক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত	have I roamed	the roads of the earth
for thousands of years অনুবাদক : Clinton B. Seely	I roamed	the paths of this earth
for a thousand years অনুবাদক : সুকান্ত চৌধুরী	I have walked	the roads across the earth's breast
For a thousand years অনুবাদক : Fakrul Alam	I have walked	the ways of the world

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বনলতা সেন' কবিতার প্রথম এই চরণটিতে মূল প্রস্তাব হচ্ছে : আমি হাঁটিতেছি। এখানে 'আমি' কর্তা নামবর্গ, 'হাঁটিতেছি' ক্রিয়াবর্গ। মান চলিত বাংলায় 'হাঁটা' ক্রিয়াটি অকর্মক। 'পথ চলা' বলা হয় কিন্তু 'পথ হাঁটা' বলা চলে না। 'হাঁটা' ও 'চলা' ক্রিয়ার উপপদীয় (subcategorical) বৈশিষ্ট্য আলাদা : 'চলা' ক্রিয়া পূরক গ্রহণ করতে পারে, 'হাঁটা' ক্রিয়া পারে না। 'আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' চলিত বাংলায় গ্রহণযোগ্য নয়। জীবনানন্দ স্পষ্টত 'হাঁটা' ক্রিয়ার এই উপপদীয় বৈশিষ্ট্যটিকে উপেক্ষা করেছেন। এর পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে : ১. তিনি এটা করেছেন অবচেতন ভাবে, 'চলা' ও 'হাঁটা' ক্রিয়ার interference বা ব্যাতিচারের কারণে ; ২. জীবনানন্দের মাতৃভাষা অর্থাৎ বরিশালের আঞ্চলিক বাংলার সাথে মান চলিত বাংলার ব্যতিচারের কারণে (বরিশালের বাংলায় কি 'পথ হাঁইটতাছি' বলা হয়?) ; ৩. ইচ্ছা করেও তিনি এটা করে থাকতে পারেন, 'হাঁটা' ক্রিয়াটির ওপর জোর দেবার জন্যে ; ৪. চরণটিতে অনুপ্রাস (হা-জার ... হাঁ-টিতেছি) সৃষ্টির প্রয়োজনেও তিনি এটা করে থাকতে পারেন।

মূল কবিতায় 'পথ' কথাটি একবার ব্যবহৃত হয়েছে 'হাঁটা' ক্রিয়ার কর্ম হিসেবে এবং আর এক বার 'পৃথিবীর পথ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে 'হাঁটা' ক্রিয়ার *প্রসারক* হিসেবে। 'পৃথিবীর পথ' কথাটিকে হাঁটা ক্রিয়ার পূরক হিসেবে ব্যবহার করেছেন Seely এবং ফকরুল আলম। ইংরেজিতে roam আর walk এ দু'টি ক্রিয়া সকর্মক ও অকর্মক দু'ভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং বাংলা ক্রিয়াপদের মতো উপপদীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়নি এখানে। Roam ক্রিয়ার পূরক হিসেবে Seely ব্যবহার করেছেন the paths of this earth এবং চিদানন্দ দাশগুপ্ত the roads of the earth। ফকরুল আলম the ways of the world শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন walk ক্রিয়ার *পূরক* হিসেবে।

সুকান্ত চৌধুরীর অনুবাদে walk ক্রিয়ার পূরক the roads across the earth's breast। এখানে সুকান্ত চৌধুরী সাধারণ একটি বাংলা অভিধা 'পথ'-এর ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে অকারণে একটি উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টি করেছেন। Earth's breast-এর বাংলা অনুবাদ হতে পারে 'পৃথিবীর স্তনে' (অভিধা) এবং পৃথিবীর বুকে (লক্ষণা)। উৎস ভাষার দ্যোতকের অভিধাকে প্রান্ত ভাষায় কোনো রূপক দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার অধিকার অনুবাদকের আছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। এতে করে প্রান্ত ভাষার পাঠক কি earth's breast-কে উৎস ভাষার উপমা বলে মনে করবেন না? জীবনানন্দ আর Kirkman-এর অনুবাদে 'পৃথিবীর পথ' হাঁটা ক্রিয়ার প্রসারক। দু'জনের কেউই 'পৃথিবীর পথ'-কে 'হাঁটা' ক্রিয়ার কর্ম হিসেবে ব্যবহার করেননি।

ইংরেজি *ডান প্রসারী* ভাষা বলে ফকরুল আলম আর Seely'র অনুবাদে 'পৃথিবীর পথ' হাঁটা ক্রিয়ার ডান দিকে বসেছে। এছাড়া তাঁদের বাক্য বিন্যাস বাংলার অনুরূপ। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁর অনুবাদে উৎস ভাষার বাক্যকাঠামোকে অগ্রাহ্য করেছেন। যেমন 'পথ হাঁটিতেছি' একটি তিঙন্ত ক্রিয়াপদ। অনুবাদকেরা সবাই তিঙন্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন তাদের অনুবাদে : have walked, have wadered, roamed। এখানেও জীবনানন্দ ব্যতিক্রম। পথ হাঁটাকে তিনি প্রতিস্থাপিত করেছেন নিছক 'পথ হাঁটিয়ে' বা ভ্রমণকারী a wanderer দিয়ে। ফলে মূল কবিতায় পথ হাঁটার যে ক্লান্তি তার চিহ্নমাত্র নেই জীবনানন্দের নিজের অনুবাদে।

এ চরণে দু'টি *প্রসারকবর্গ* রয়েছে ১. হাজার বছর ধরে এবং ২. পৃথিবীর পথে। দু'টিই ক্রিয়ার *প্রসারক* বা ক্রিয়াবিশেষণ। প্রথাগত ব্যাকরণে এ দু'টি বর্গ অধিকরণ কারক। 'হাজার বছর ধরে' কালাধিকরণ এবং 'পৃথিবীর পথে' স্থানাধিকরণ। বেশির ভাগ অনুবাদক কালগত প্রসারক 'হাজার বছর' দিয়ে চরণটি শুরু করেছেন। ব্যতিক্রম জীবনানন্দ ও সুকান্ত চৌধুরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুকান্ত চৌধুরীর অনুবাদে এই কালাধিকরণটি চলে গেছে চরণের শেষ প্রান্তে। এটা কি waters এবং years-এর মধ্যে অন্ত্যমিল দেবার জন্যে?

বাংলায় 'হাজার বছর' কথাটির অর্থ হতে পারে 'এক হাজার বছর' বা 'হাজার হাজার বছর'। ফকরুল আলম, সুকান্ত চৌধুরী ও Kirkman–এর অনুবাদে 'হাজার বছর' একান্তই এক হাজার বছর। স্পষ্টত তাঁরা 'হাজার বছর ধরে' কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে নিয়েছেন। কিন্তু Seely হাজার বছরের অনুবাদ করেছেন : thousands of years অর্থাৎ হাজার হাজার বছর। জীবনানন্দ তাঁর অনুবাদে হাজার বছরের মতো দীর্ঘ সময় দ্যোতিত করার জন্যে একটি মাত্র ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার করেছেন : Long। জীবনানন্দের ভাষামানসে 'হাজার বছর ধরে' নিছকই একটি 'অনির্দেশক সংখ্যা শব্দ' (সাজাহান মিয়া ১৯৯৯)। বাংলায় এ রকম সংখ্যাশব্দ প্রচুর ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ : 'দুই চার দিন থেকে যাও' বা 'আমার কথা জানে গাঁয়ের পাঁচ জনে।'

চিদানন্দ দাশগুপ্ত হাজার বছরকে প্রতিস্থাপিত করেছেন aeons শব্দটি দিয়ে। শব্দটি গ্রীক এবং এর অর্থ 'যুগ', সত্য–ত্রেতা–দ্বাপর–কলির মতো। চিদানন্দ দাশগুপ্তের ভাষামানসে হাজার বছর মোটেও হাজার বছর নয়, অনেক বেশি এর ব্যাপ্তি। বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য স্মরণযোগ্য এক্ষেত্রে : 'বনলতা সেন এবং তার চোখ, এ–সমস্তই যে কোনো সর্বদেশকাল ব্যাপী ভাবের উপমা মাত্র তা উপলব্ধি করে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৬)।

বনলতা সেনের পরিব্রাজক বহুদিন ধরে ভ্রমণ করছেন এবং তার ভ্রমণ এখনও শেষ হয়নি। বনলতা সেনের দেখা হওয়ার পর তার ভবঘুরে জীবনের পরিসমাপ্তি হলেও হতে পারে কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা আছি কবিতার প্রথম চরণে এবং এখানে সে রকম কোনো সম্ভাবনার কথা বলা হয়নি এখনও। যদি কোনো ক্রিয়া অনেক দিন আগে শুরু হয়ে থাকে এবং বর্তমানেও ঘটমান থাকে তবে ইংরেজিতে পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। Seely ছাড়া বাকী পাঁচ জন অনুবাদক 'পথ হাঁটিতেছি' অনুবাদ করতে গিয়ে Present Perfact tense ব্যবহার করেছেন। Seely এদিক থেকে ব্যতিক্রম। সম্ভবত পরবর্তী স্তবকে বনলতা সেনের সঙ্গে পরিব্রাজকের দেখা হওয়া এবং তার ভ্রমণের পরিসমাপ্তির কথা ভেবে তিনি ব্যবহার করেছেন Past Indefinite। কিন্তু 'বনলতা সেন' কবিতার ক্রিয়াপদগুলো দেখলে বোঝা যায় যে (পথ হাঁটিতেছি, দু–দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো) পরিব্রাজকের ভ্রমণ এখনও শেষ হয়নি। বনলতা সেনের সাথে পরিব্রাজকের দেখা হওয়া দূর অতীতের একটি ঘটনা। এরপর পরিব্রাজক অনেক ভ্রমণ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আরো ভ্রমণ করবেন।

সিংহল সমুদ্র থেকে	নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে	অনেক ঘুরেছি আমি
Many a night My route lay across the sea of Ceylon (অনুবাদক : জীবনানন্দ দাশ)		Somewhere winding to the sea of Malaya.
From the sea of Ceylon (অনুবাদক : Martin Kirkman)	to the midnight sea of Malay.	much have I wandered ;
From the seas of Ceylon (অনুবাদক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত)	to the straits of Malaya	I have journeyed, alone, in the enduring night
From waters round Ceylon (অনুবাদক :Clinton B. Seely)	in dead of night to Malayan seas.	Much have I wandered.
From Ceylon waters (অনুবাদক : সুকান্ত চৌধুরী)	to the Malaya Sea	I have ranged far
From Sinhala's Sea (অনুবাদক : ফকরুল আলম)	to Malaya's night's darkness,	far did I roam.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম চরণের মতো এখানেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি জীবনানন্দ ছাড়া বাকি সব ক'জন অনুবাদকই উৎস ভাষার বাক্যবিন্যাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 'নিশীথ' শব্দটি দিয়ে জীবনানন্দ 'রাত' দ্যোতিত করতে চেয়েছেন। তাঁর ইংরেজি অনুবাদেও শুধু রাতের কথাই আছে। রাতের গভীরতা সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেননি জীবনানন্দ। কিন্তু Kirkman নিশীথের অনুবাদ করেছেন midnight। এমন কি হতে পারে যে তিনি নিশীথকে 'নিশীথ বা নিশুতি রাত' (= গভীর রাত)–এর সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন? Kirkman, Seely এবং জীবনানন্দ এই তিন জনের কারো অনুবাদে 'অন্ধকার' কথাটি নেই। ফকরুল আলমের অনুবাদে রাতের কথা আছে, অন্ধকারের কথাও আছে কিন্তু সাগরের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত তিনি করেন নি।

'ঘুরেছি' ক্রিয়াপদের দু'টি *প্রসারক* রয়েছে এ চরণে ১. 'নিশীথের অন্ধকারে' ও ২. 'সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে'। একটি কালাধিকরণ, অন্যটি স্থানাধিকরণ। চিদানন্দ দাশগুপ্ত আর সুকান্ত চৌধুরী এ দু'টি প্রসারককে প্রতিস্থাপিত করেছেন মূলানুগভাবে। Kirkman ও ফকরুল আলম এ দু'টি প্রসারককে *গ্রন্থন* (embedding) করে তৈরি করেছেন নতুন প্রসারক এবং এর ফলে আমার মনে হয় ১. কিছুটা দুর্বোধ্যতারও সৃষ্টি হয়েছে ; ২. অনুবাদ মূল থেকে কিছুটা সরে গেছে। Kirkman-এর to the midnight sea of Malay শব্দবন্ধটিতে midnight শব্দটি sea–এর প্রসারক বা বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ কি? 'মধ্যরাত্রী কালীন মালয় সাগর' না আর কিছু? ফকরুল আলমের Malaya's night's darkness শব্দবন্ধে 'মালয়' হচ্ছে নামশব্দ 'রাত'–এর প্রসারক এবং 'রাত' হচ্ছে 'অন্ধকার'–এর প্রসারক। 'সাগর' এবং 'মালয় সাগর' পুরোপুরি অনুপস্থিত এ শব্দবন্ধে। অথচ মূল কবিতায় এবং অনুবাদে জীবনানন্দ মালয় সাগরের সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন (The sea of Malaya)। কোনো দ্যোতিতের উপযুক্ত দ্যোতক খুঁজে পাওয়া না গেলে কাছাকাছি কোনো দ্যোতক খুঁজে বের করার অধিকার অনুবাদকের অবশ্যই রয়েছে কিন্তু 'নিশীথের অন্ধকারে' এবং 'মালয় সাগরে' প্রসারকদ্বয়কে আলাদা আলাদা করে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা এমন কিছু কঠিন নয়।

Seely তা করেছেন তাঁর অনুবাদে কিন্তু 'অন্ধকার'–এর প্রতিশব্দ হিসেবে তিনি (সম্ভবত) ব্যবহার করেছেন dead শব্দটি (নিশীথের অন্ধকারে = dead of night)। Dead এখানে নামশব্দ এবং অক্সফোর্ড অভিধান dead–এর প্রধান অভিধা 'মৃত'। 'মৃত্যু' 'অন্ধকার'–এর *লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা* হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বটে কিন্তু আমার প্রশ্ন ১. যেখানে উপযুক্ত *অভিধা* ব্যবহার করা সম্ভব সেখানে *লক্ষণা বা ব্যঞ্জনাযুক্ত* শব্দ ব্যবহার করা কি যুক্তিযুক্ত? ২. 'অন্ধকার' শব্দটিকে জীবনানন্দ তাঁর মূল কবিতায় অনুরূপভাবে ব্যঞ্জনা ভারাক্রান্ত করেছেন কি? যদি তা না করে থাকেন তবে অনুবাদক কি করে তা করতে পারেন? এটা কি অনুবাদকের স্বাধীনতার অপব্যবহার নয়?

চিদানন্দ দাশগুপ্ত সাগরের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন : strait। শব্দটি অর্থ 'সাগর' নয়, 'প্রণালী'। প্রণালী হচ্ছে এমন কোনো জলপথ যা দু'টি বড় সাগরকে যুক্ত করে। মালয় সাগরটি কি কোনো প্রণালী? যদি প্রণালীই হয়ে থাকে তবে অনুবাদক কি করবেন? মূলে আছে 'সাগর' কিন্তু বাক্যিক প্রতিবেশ অনুসারে সাগর দ্যোতকটির নির্দেশিত হচ্ছে একটি প্রণালী। সাগর আর প্রণালীর যে পার্থক্য তা ভূগোলবিদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কবির জন্যে এই পার্থক্য একই গুরুত্ব বহন করে না। মালয় সাগর বাংলাদেশ থেকে এত দূরে যে সেটা সাগর না প্রণালী তা জানতে বাঙালিরা আগ্রহী নাও হতেও পারে। কিন্তু সাগর আর প্রণালীর পার্থক্য তো প্রান্তভাষাভাষী লোকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণও হতে পারে! এক্ষেত্রে অনুবাদকের দায়িত্ব কি হবে? অনুবাদক কি শুধু দ্যোতিতটিকে প্রতিস্থাপিত করে নিজের দায়িত্ব শেষ করবেন নাকি *নির্দেশিতের* প্রকৃত প্রতিশব্দটি ব্যবহার করবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিয়াপদ ব্যবহারে বিশ্বস্ত থেকেছেন Kirkman। তিনি পর পর দুই বার wandered ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেছেন। বোঝা যাচ্ছে 'পথ হাঁটা' এবং 'ঘোরা' তাঁর কাছে সমার্থক। Seely প্রথম চরণে ব্যবহার করেছেন roam এবং পরবর্তী চরণে wander। চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রথম চরণে ব্যবহার করেছেন roam কিন্তু পরবর্তী চরণে journeyed। ফকরুল আলম প্রথম চরণে ব্যবহার করেছেন walk এবং পরবর্তী চরণে roam। অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে roam–এর অভিধা হচ্ছে : walk or travel unsystematically over or through or about (country, seas) এবং wander-এর অভিধা হচ্ছে : go from country to country or from place to place without settled route or destination ; go aimlessly in, off, etc. সুতরাং অভিধার দিক থেকে এ দু'টি ক্রিয়াশব্দের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই তবে ব্যক্তিভাষার (idiolect) ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ব্যঞ্জনা থাকা অসম্ভব নয়।

সুকান্ত চৌধুরীর ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ range সমুদ্রযাত্রার সাথে সম্পর্কীত। প্রথম চরণে তিনি walk ক্রিয়াটি ব্যবহার করেছিলেন। দ্বিতীয় চরণে ক্রিয়া ব্যবহার করায় বোঝা গেল তিনি সম্ভবত খেয়াল করেছেন যে শুধু পায়ে হেঁটে এ পথ পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। Walk এবং range–এর সমন্বয় করে তিনি এই দ্যোতনাটি সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি।
I was in the dim world of Vimbisar and Ashoka,
(অনুবাদক : জীবনানন্দ দাশ)
In the grey lands of Vimbisar and Asoka-there have I been ;
(অনুবাদক : Martin Kirkman)
I have walked through mist of Bimbisara, Asoka
(অনুবাদক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত)
I was there in the grey world of Asoka and Bimbisara,
(অনুবাদক : Clinton B. Seely)
In Vimbisar and Ashok's grey world have I been,
(অনুবাদক : সুকান্ত চৌধুরী)
In Vimbisar and Ashok's ash-grey world was I present ;
(অনুবাদক : ফকরুল আলম)

Kirkman বাদে বাকি তিন জন 'জগৎ' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে বেছে নিয়েছেন world শব্দটি। পূর্ববর্তী চরণে হাঁটা এবং ঘোরার কথা আছে। মান বাংলায় কোনো 'জগতে' হাঁটাহাটি বা ঘোরাফেরা করা যায় কি? 'হুমায়ুন ফরিদী সিনেমা জগতে ঘুরছে' বাক্যটি কি গ্রহণযোগ্য? ইংরেজিতেও wander ক্রিয়ার অধিকরণ প্রসারক হতে পারে কি world শব্দটি? পাঠক বিচার করবেন। এটি হাঁটা, ঘোরা এবং wander–এর উপপদীয় বা subcategorical বৈশিষ্ট্যগত সমস্যা। এ সমস্যার মুখোমুখি হয়ে Kirkman সম্ভবত wander-এর অধিকরণ প্রসারক হিসেবে world–এর পরিবর্তে land শব্দটি বেছে নিয়েছেন।

রঙদ্যোতক 'ধূসর' শব্দটি 'জগত' শব্দের প্রসারক, বিশেষণ। প্রায় সবাই এ শব্দটিকে প্রতিস্থাপিত করেছেন grey শব্দটি দিয়ে। ফকরুল আলম রঙের সাথেও একটি *প্রসারক* যোগ করেছেন : ash-grey যার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়াবে 'ছাইরঙা'। কিন্তু 'ধূসর' আর 'ছাইরঙা' কি এক রঙ? এটি কি মূল থেকে এক ধরনের দূরে সরে যাওয়া নয়? কেন অশোক এবং তার পিতা বিম্বিসারের জগত ধূসররঙা হবে? ১. হিন্দুযুগ এবং তার পর দীর্ঘদিন তুর্ক–মোঙ্গল এবং ব্রিটিশ শাসনের পর বৌদ্ধযুগের স্মৃতি মানুষের মনে অনুজ্জ্বল বা ফিকে হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে বলেই কি? ২. সর্বত্রম্ খল্বিদম্ দুক্ষম্—বৌদ্ধধর্মের চারটি মহাসত্যের প্রথম সত্য এটি। বৌদ্ধ দর্শনের এই দুঃখময় জগতকেই কি জীবনানন্দ ধূষর জগত হিসেবে দেখাচ্ছেন?

জীবনানন্দ তাঁর অনুবাদে 'ধূষর'–এর প্রতিশব্দ হিসেবে বেছে নিয়েছেন dim, বাংলায় যার দ্যোতনা নিস্প্রভ, কম আলোকিত, ঝাপসা, অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল। সম্ভবত 'নিস্প্রভ' অর্থে জীবনানন্দ 'ধূষর' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন ছন্দসৃষ্টির প্রয়োজনে, একই *পর্বাঙ্গ* ও ধ্বনিব্যঞ্জনাযুক্ত অন্য কোনো উপযুক্ততর শব্দের অভাবে। চিদানন্দ দাশগুপ্ত 'ধূষর' শব্দটিকে প্রতিস্থাপিত করেছেন mist দিয়ে যার বাংলা অর্থ 'কুয়াশা'। কুয়াশার রঙ 'এক রকম ধূষর' হতে পারে কিন্তু 'ধূষর জগত' আর 'কুয়াশা' কি এক কথা? এ ধরনের *মিতনামিত* প্রয়োগ কি যুক্তিযুক্ত? জীবনানন্দও mist শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'অন্ধকার'–এর প্রতিশব্দ হিসেবে।

আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে
In the mistiness of Vidarbha.
(অনুবাদক : জীবনানন্দ দাশ)
to dark, distant town of Vidarbha
(অনুবাদক : Martin Kirkman)
through ... darker Vidarbha
(অনুবাদক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত)
pressed on through darkness to the city of Vidarbha
(অনুবাদক : Clinton B. Seely)
and still more distant darkness of Vidarbha.
(অনুবাদক : সুকান্ত চৌধুরী)
Farther off, in distant Vidarbha city's darkness ;
(অনুবাদক : ফকরুল আলম)

'আরো দূর অন্ধকারে' এবং 'বিদর্ভ নগরে' 'ছিলাম' ক্রিয়ার *অধিকরণ প্রসারক*। বিদর্ভ নগরী এই অন্ধকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। 'অন্ধকারে' এবং 'বিদর্ভ নগরে' কথা দু'টির মাঝে কোনো প্রকার যতি চিহ্ন নেই। জীবনানন্দ অবশ্য শব্দ বা বর্গের শেষে যতি চিহ্ন ব্যবহার করেন না খুব একটা এবং সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে যতি চিহ্ন ব্যবহারে তিনি একটু স্বেচ্ছাচারী। তিনি বাক্য পর্যন্ত শেষ করেন কমা (,) চিহ্ন দিয়ে (উদাহরণ : আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন)।

বিদর্ভ নগরীর অতীতের শানশওকতের সেই ঔজ্জ্বল্য নিভে গেছে। কিন্তু জীবনানন্দ সেই 'অন্ধকার'কে বিদর্ভ নগরীর বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেননি তার কবিতায়। তা যদি তিনি করতেন তবে লিখতেন 'অন্ধকার বিদর্ভ নগরে'। তাতে চরণের পর্ববিন্যাসে কিছুমাত্র অসুবিধা হতো না। বিদর্ভ নগরী অবশ্যই অন্ধকার কিন্তু ভারতবর্ষের উজ্জ্বল অতীতকে ঢেকে আছে যে সামগ্রিক অন্ধকার বিদর্ভ নগরী তার একটা খণ্ডিত অংশ মাত্র, বিদর্ভ অন্ধকারের শুরুও নয়, শেষও নয়। এই দ্যোতনাটি ধরতে পেরেছেন একমাত্র Seely। বাকি সবাই, এমনকি জীবনানন্দ নিজেও কোনোও না কোনো ভাবে বিদর্ভকেই অন্ধকারের আধার হিসেবে দেখিয়েছেন।

বনলতা সেন কবিতায় আমরা এ পর্যন্ত তিনটি সম্পূর্ণ অর্থযুক্ত বাক্য বা চরণ পেয়েছি। এই তিনটি বাক্যে তিনটি তিঙন্ত ক্রিয়া রয়েছে : হাঁটিতেছি, ঘুরেছি, ছিলাম। 'আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে' কোনো সম্পূর্ণ প্রস্তাব (clause) বা বাক্য নয়। তিঙন্ত বা প্রত্যায়ান্ত কোনো ক্রিয়াপদই নেই এ বাক্যখণ্ডটিতে। এটি একটি *ক্রিয়া প্রসারক* হতে পারে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ক্রিয়ার প্রসারক এটি? সম্ভবত 'ছিলাম' বা 'ঘুরেছি' ক্রিয়ার। কিন্তু এমনও হতে পারে যে এটি একটি প্রস্তাব যার ক্রিয়াপদটি কবি উহ্য রেখেছেন। এতই ক্লান্ত এই পরিব্রাজক যে বাক্যের ক্রিয়াবর্গটি সমাপ্ত করার ইচ্ছা বা শক্তি কোনোটাই তার নেই। এ ব্যাপারটিও একমাত্র Seely'র অনুবাদেই প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যরা 'সেখানে ছিলাম আমি' প্রস্তাবের 'ছিলাম' ক্রিয়াটি দিয়ে 'বিদর্ভ নগরে থাকা'র কাজ চালিয়ে দিয়েছেন সেখানে Seely উহ্য ক্রিয়াপদটিকে প্রতিস্থাপিত করেছেন pressed on ক্রিয়াটি দিয়ে। সংসদ অভিধান press ক্রিয়াটির অন্তত দু'টি অর্থ নির্দেশ করছে যেগুলো ভ্রমণের সাথে সম্পর্কীত : ১. প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হওয়া, ২. ভুলাইয়া লইয়া গিয়া (প্রধানত নাবিকের) কর্মে ভর্তি করান। দ্বিতীয় অর্থটি বনলতা সেন কবিতার প্রতিবেশে অবান্তর। কিন্তু প্রথম অর্থটির কথাই যদি ধরি, তবে জানতে ইচ্ছে করে, পরিব্রাজকের চলার মধ্যে প্রচণ্ড কোনো গতির ভাব আছে কি? রবীন্দ্রনাথের 'আজি এ প্রভাতে রবির কর' বা নজরুলের 'চল-চল-চল' এর মধ্যে যে গতি আছে তার চিহ্ন মাত্র আছে কি জীবনানন্দ রচিত কোনো কবিতায়? বুদ্ধদেব বসুকে উদ্ধৃত করি : 'জীবনানন্দের কবিতা যেন 'উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী—থেমে-থেমে, অজস্র ড্যাশ্ ও কমার বাঁধে ঠেকে-ঠেকে উদাস, অলস গতিতে বয়ে' চলেছে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৬)। এ দিকটা সম্ভবত Seely'র চোখ এড়িয়ে গেছে।

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
At moments when life was too much a sea of sounds,
(অনুবাদক : জীবনানন্দ দাশ)
Tired of this life, this foaming sea of life,
(অনুবাদক : Martin Kirkman)
Round my weary soul the angry waves still roar ;
(অনুবাদক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত)
I am a weary heart surrounded by life's forthy ocean.
(অনুবাদক : Clinton B. Seely)
A tired being am I, round me life's foaming seas.
(অনুবাদক : সুকান্ত চৌধুরী)
I, a tired soul, around me, life's turbulent, foaming ocean,
(অনুবাদক : ফকরুল আলম)

'সফেন' জীবনানন্দের নিজের তৈরি বিশেষণ। 'সফেন' বিশেষণটি জীবনানন্দ ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করেছেন কিনা জানি না। বিশেষণটি জীবনানন্দ তৈরি করেছেন সম্ভবত বনলতা সেনের সাথে মিল দেবার জন্যে। নাকি 'সফেন' বিশেষণটি জীবনানন্দের এত পছন্দ যে তার সাথে মিল দেবার প্রয়োজনে বনলতা সেনের আবির্ভাব? অবশ্য 'লেনদেন' শব্দটির সঙ্গেও 'সেন'-এর মিল আছে কিন্তু লেনদেন তো আর জীবনানন্দের সৃষ্টি নয়! সন্তানের প্রতি জনক-জননী যেমন, তেমনি নিজের তৈরি অভিনব কোনো শব্দের প্রতি কবিও বাৎসল্য বোধ করতে পারেন। তবে এ ধরনের পক্ষপাত যতটা শব্দের রূপের (from) প্রতি, ততটা এর অর্থের প্রতি নয়। এর প্রমাণ, ইংরেজি অনুবাদে জীবনানন্দ 'ফেনা'র ব্যাপারটি এড়িয়ে গেছেন পুরোপুরি। জীবনানন্দ 'জীবনের সফেন সমুদ্র'কে প্রতিস্থাপিত করছেন life was too much a sea of sounds দিয়ে? আমি মনে করি ফেনা এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ফেনা' জিনিসটাতে যতটা বুদবুদ, ততটা জল নেই, ফাঁপা একটি পদার্থ এই ফেনা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নাবিক বুঝতে পেরেছেন, জীবনকে যে sounds ঘিরে থাকে সেগুলো শুধুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ, কিছুমাত্র অর্থবহ নয়? সবটুকুই ফাঁকা বুলি, অর্থহীন প্রলাপ, সাগরের ফেনার মতো। সম্ভবত এ ব্যাপারটি খেয়াল করেই Seely সুকান্ত চৌধুরী বা ফকরুল আলমের মতো life's foaming sea বা ocean ব্যবহার না করে life's frothy ocean শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন। অক্সফোর্ড অভিধান জানাচ্ছে frothy কথাটার একটা অর্থ ফেনা বা গাঁজলা কিন্তু worthless matter, idle talk বা 'অর্থহীন বকবকানি' অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

উপমার দ্যোতিতের ক্ষেত্রে আমরা *ধোঁয়াশার* কথা বলেছিলাম। নাবিক-পরিব্রাজক ক্লান্ত কিন্তু তার চারপাশে জীবনের সফেন সমুদ্র। এখানে আদৌ কি কোনো সমুদ্রের কথা বলা হচ্ছে নাকি সমুদ্র এখানে ব্যবহৃত হয়েছে জীবনের উপমা হিসেবে? সফেন সমুদ্রের মতো যে জীবন কেমন হয় সেটা? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুবাদকেরা উপমার আর্থ ধোঁয়াশা সরিয়ে এর আসল দ্যোতনা উদ্ধারের চেষ্টা করেন না, উপমার আক্ষরিক অনুবাদ করেই সন্তুষ্ট থাকেন। তাই-ই করা হয়েছে বনলতা সেন কবিতার ক্ষেত্রে যদিও আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, *উৎস ভাষার উপমার আক্ষরিক অনুবাদ প্রান্ত ভাষায় গ্রহণযোগ্য হয় না সব সময়।*

> আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।
> I had Banalata Sen of Natore and her wisdom
> (অনুবাদক : জীবনানন্দ দাশ)
> I found peace for a while with Banalata Sen of Natore.
> (অনুবাদক : Martin Kirkman)
> My only peace I knew with Banalata Sen of Natore.
> (অনুবাদক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত)
> To me she gave a moment's peace—Banalata Sen of Natore.
> (অনুবাদক : Clinton B. Seely)
> Banalata Sen of Natore gave me a moment's peace.
> (অনুবাদক : সুকান্ত চৌধুরী)
> Finally found momentary bliss with Natore's Banalata Sen.
> (অনুবাদক : ফকরুল আলম)

দণ্ড সময়ের পরিমাপ, ২৪ মিনিটে এক দণ্ড হয়। দুই দণ্ডে ৪৮ মিনিট হওয়ার কথা। এটা দুই দণ্ডের অভিধা। কিন্তু এখানে 'দু-দণ্ড' কথাটির লক্ষণা অর্থকে গ্রহণ করতে হবে : 'দু'দণ্ড অপেক্ষা করো' মানে 'সামান্য ক্ষণ অপেক্ষা করো'। এটি একটি অনির্দেশক সংখ্যাশব্দ (মিয়া, ১৯৯৯)। অনুবাদকেরা প্রায় সবাই 'দু-দণ্ড' কথাটির এই লক্ষণা অর্থ সম্পর্কে সচেতন। 'দু'দণ্ড শান্তি' অনেক ভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে : peace for a while (= কিছুক্ষণ ব্যাপী শান্তি), a moment's peace (= মুহূর্তের বা মুহূর্তব্যাপী শান্তি), momentary bliss (= ক্ষণস্থায়ী সুখ, স্বর্গসুখ)। কিন্তু momentary আর moment's কি একই দ্যোতনার সৃষ্টি করে ইংরেজি ভাষাবোধে? যদি Kirkman বা Seely শব্দবন্ধটি ব্যবহার করতেন তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যেতো, কারণ এ দু'জন অনুবাদকের মাতৃভাষা ইংরেজি।

'শান্তি' শব্দটি বেশির ভাগ অনুবাদকের ভাষাবোধে peace কিন্তু ফকরুল আলম শব্দটিকে প্রতিস্থাপিত করেছেন bliss শব্দটি দিয়ে। সংসদ অভিধানে bliss শব্দের অভিধা 'পরম সুখ', স্বর্গসুখ। অক্সফোর্ড অভিধান-এর অভিধা : gladness, enjoyment, perfect joy or happiness, blessedness, being in heaven। স্পষ্টত 'সুখ' আর 'শান্তি'র যেমন পার্থক্য আছে বাংলায়, ইংরেজিতেও তেমনি peace আর bliss সমার্থক নয়। যথার্থ একটি দ্যোতক প্রান্ত ভাষায় থাকা সত্ত্বেও অন্য একটি 'কম যথার্থ' দ্যোতক বেছে নেবার কারণ কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকরুল আলমের অনুবাদের সর্বত্রই ঘৃষ্ট, দন্ত্য 'স' ধ্বনির বাহুল্য। এই অনুপ্রাসটি তাঁর পছন্দ। কিন্তু peace আর bliss দু'টি শব্দইতো দন্ত্য-স-অন্ত। সুতরাং অনুপ্রাস সৃষ্টির কারণে bliss শব্দটিকে চয়ন করা হয়নি। এর অন্য কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে। হতে পারে অনুবাদকের ভাষাবোধে সুখ আর শান্তি সমার্থক।

জীবনানন্দের অনুবাদে দু-দণ্ড শান্তি দূরে থাক, শান্তির পর্যন্ত উল্লেখ নেই। তার বদলে আছে বনলতা সেন নাম্নী নারীটির 'জ্ঞান'। বনলতা সেনের জ্ঞানের পরশই কি পরিব্রাজককে উৎস ভাষায় উল্লিখিত 'শান্তি' দিয়েছিল? চিদানন্দ দাশগুপ্ত শান্তির সময়সীমাকে এড়িয়ে গেছেন। বনলতা সেনের সাথে (বসে) তিনি পেয়েছেন 'এক মাত্র শান্তি'। স্পষ্টত চিদানন্দ দাশগুপ্ত মূল থেকে সরে গেছেন অনেকখানি এবং অকারণে।

'শান্তি' শব্দটি 'দেওয়া' ক্রিয়াশিরের *পূরক*। মূল কবিতায় বনলতা সেন চরণটির কর্তা নামপদ। 'শান্তি' Seely ও সুকান্ত চৌধুরীর অনুবাদে 'দেওয়া' ক্রিয়ার পূরক। Kirkman, চিদানন্দ দাশগুপ্ত ও ফকরুল আলমের অনুবাদে 'দেওয়া'র ব্যাপারটি নেই। সেখানে পরিব্রাজক নিজেই খুঁজে পাচ্ছেন 'দু-দণ্ড শান্তি'। দ্যোতিত এবং উৎস ভাষার দ্যোতকে পরিব্রাজক গ্রহীতা, বনলতা সেন দাতা। অনুবাদের দ্যোতিতেও তিনি গ্রহীতা (কারণ দ্যোতিতের পরিবর্তন হয় না অনুবাদে) কিন্তু দ্যোতক বাক্যে তিনি কর্তা। ক্রিয়াপদ found এবং know-এর তুলনায় give-এর উপপদীয় বৈশিষ্ট্য আলাদা। ক্রিয়াশির give-এর দু'টি পূরক থাকতে পারে : ১. দানের বস্তু, ২. দান গ্রহীতা। এটি একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া (bitransitive verb)। ক্রিয়াপদ found এবং know এককর্মক ক্রিয়া (monotransitive verb)। এ দু'টি ক্রিয়া কোনো দানের ভাব জাগায় না মনে। মনে হয়, ক্রিয়ার কর্তা নিজেই নিজের 'শান্তি'র ব্যবস্থা করেছে, বনলতা সেন উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং দ্যোতিতের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য না হলেও এটাকে মূল থেকে এক ধরনের সরে যাওয়া হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। কোনো এককর্মক ক্রিয়া কোনো দ্বিকর্মক ক্রিয়া-কে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না, অর্থগত দিক থেকে যতই দু'টি ক্রিয়া যতই সমার্থক হোক।

জীবনানন্দ আর চিদানন্দ দাশগুপ্ত ছাড়া বাকি অনুবাদকেরা বনলতা সেন কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের মূলানুগ অনুবাদ করেছেন। 'দারুচিনি দ্বীপ' এ দু'জনের অনুবাদে অদৃশ্য। সমুদ্র দূর নয় জীবনানন্দের অনুবাদে, বরং সমুদ্রটি হয়ে উঠেছে নীল। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে' বনলতা সেন নাবিকের দিকে তাকায় না, বরং পরিব্রাজকই তাকে দেখে ফেলে।

জীবনানন্দের বিখ্যাত উপমা 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ'। কোনো অনুবাদকই উপমাটিকে এড়িয়ে যাননি। সবাই এর আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। কিন্তু ইংরেজ পাঠকের মনে এই উপমাটির দ্যোতনা কি হবে? ব্রিটেন বা আমেরিকায় কি বাবুই পাখি আছে? সেখানকার বাবুই পাখির বাসা কি বাংলাদেশের বাবুই পাখির বাসার মতো? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন কিন্তু অনুবাদক প্রশ্নটির যৌক্তিকতা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তবে ইংরেজিভাষী অনুবাদকেরাও যেহেতু উপমাটি ব্যবহার করেছেন সেহেতু এর কিছুটা দ্যোতনা ইংরেজ মনে আছে—এটা ধরে নেয়া যেতে পারে।

জীবনানন্দ এই উপমাটিকে একেবারে এড়িয়ে গেছেন তার অনুবাদে। এড়িয়ে গেছেন 'শিশিরের শব্দের মতন' উপমাটিও। কিন্তু 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' বা 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' জাতীয় উপমাগুলোকে তিনি বহাল রেখেছেন তাঁর অনুবাদে। কিন্তু কেন? 'কারুকার্যের সাথে মুখের উপমা' এবং 'অন্ধকারের সাথে চুলের উপমা' কি 'পাখীর নীড়ের সাথে চোখের উপমা'র তুলনায় ইংরেজি ভাষায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল কবিতায় 'শিশিরের শব্দের মতন' সন্ধ্যা আসার প্রসারক এবং অনুবাদকেরা এর উপযুক্ত অনুবাদ করেছেন। কিন্তু জীবনানন্দের অনুবাদে no fall somewhere but of dews 'সন্ধ্যা আসা' ক্রিয়াপদের প্রসারক নয়। এর অর্থ 'এক শিশির ছাড়া কোথাও কোনো কিছু পতনের শব্দ নেই'। চিদানন্দ দাশগুপ্ত শব্দগুচ্ছটির অনুবাদে নতুন উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টি করেছেন : at the footfall of dew (শিশিরের পদপতনের সাথে?) যা ঠিক মূলানুগ নয়।

প্রসারক প্রস্তাব 'পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে' বিশ্বস্ত ভাবে অনুবাদ করেছেন অনুবাদকেরা। এখানেও ব্যতিক্রম জীবনানন্দ ও চিদানন্দ দাশগুপ্ত। জীবনানন্দের অনুবাদে তা হয়ে গেছে light is your wit now যার বাংলা অনুবাদ হতে পারে 'এখন তোমার জ্ঞানই (একমাত্র) আলো' যার সঙ্গে মূল কবিতার প্রসারক প্রস্তাবটির মিল খুবই কম। চিদানন্দ দাশগুপ্ত 'রঙ' কথাটিকে প্রতিস্থাপিত করেছেন একটি উৎপেক্ষা দিয়ে : the world's noises die যার অর্থ 'পৃথিবীর কর্কশ শব্দ মারা যায়'। স্পষ্টতই মূল থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত। অনুবাদকের স্বাধীনতার এ ধরনের অপব্যবহার চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রায়ই করেছেন বলে অভিযোগ করছেন ফকরুল আলম (১৯৯৯)। এ ব্যাপারে দাশগুপ্তের বক্তব্য হচ্ছে : কখনও কখনও আক্ষরিক অনুবাদ পরিহার করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা শব্দবন্ধকে ইংরেজিতে আংশিকভাবে সরলীকৃত করতে হয়েছে (দাশগুপ্ত, ১৯৭২)।

'পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন' কথাটির অর্থ কি? চিদানন্দ দাশগুপ্ত ও সুকান্ত চৌধুরীর অনুবাদ আক্ষরিক : manuscript। তারা বুঝতেও চেষ্টা করেননি 'পাণ্ডুলিপি' শব্দটির সত্যিকার দ্যোতনা কি। 'পাণ্ডুলিপি' কি আয়োজন করা ক্রিয়ার পূরক না কর্তা? যদি পূরক হয় তবে কে এই পাণ্ডুলিপির আয়োজন করে? আর যদি 'পাণ্ডুলিপি' নামপদটি 'আয়োজন করা' ক্রিয়ার কর্তা হয় তবে সেই পাণ্ডুলিপি কি বা কিসের আয়োজন করে? এই পর্বটির অনুবাদ প্রায় কেউই করেননি, এমনকি জীবনানন্দও না। ফকরুল আলমের অনুবাদে time to wrap up work কি 'পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন'-কে প্রতিস্থাপিত করছে? Seely এর অনুবাদ করেছেন : a pale design is sketched। তাঁর বাংলা ভাষাবোধে 'পাণ্ডুলিপি' হয়ে গেছে পাণ্ডুর (= ফ্যাকাশে) কোনো লিপি (= লেখা বা ছবি)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে 'পাণ্ডুলিপি' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ এটাই কিন্তু জীবনানন্দ ঠিক এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এটা মেনে নিতে মন সায় দেয় না। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ মনে করে আসছি 'পাণ্ডুলিপি' হচ্ছে অন্ধকারে চারদিকের ঝাপসা হয়ে আসা বিশ্বপ্রকৃতি। জীবনানন্দের ইংরেজি অনুবাদের the wide things around আমার এই ধারণাকে কিছুটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করায়। কিন্তু এটা পরিষ্কার হয় না যে বিশ্বপ্রকৃতি কিসের আয়োজন করে? 'আয়োজন করা' ক্রিয়ার পূরকটি কোথায় গেল? জীবনানন্দ যখন তাঁর অনুবাদে এ পর্বটিকে পুরোপুরি এড়িয়ে গেছেন তবে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এটি একটি দ্যোতনাহীন শব্দবন্ধ? চরণ পূর্ণ করাই কি এর একমাত্র কাজ?

> তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
> Fanning fireflies that pitch the wide things around
> (অনুবাদক : জীবনানন্দ দাশ)
> the fireflies weave a tapestry of brilliant stories,
> (অনুবাদক : Martin Kirkman)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

in the light of fireflies the manuscript
prepares to weave the fables of night ;
(অনুবাদক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত)
Than glimmering fireflies paint in the story.
(অনুবাদক : Clinton B. Seely)
the manuscript prepares
to tell its stories ; lit by firely gleams.
(অনুবাদক : সুকান্ত চৌধুরী)
Fireflies light up the world anew ;
(অনুবাদক : ফকরুল আলম)

ধরা যাক, 'আয়োজন করা' ক্রিয়ার পূরক হচ্ছে 'জোনাকির রঙে ঝিলমিল'। তখন গল্পের তরে পাণ্ডুলিপি জোনাকির রঙ (দিয়ে তৈরি) 'ঝিলিমিল' (এর) আয়োজন করে। কিন্তু কোনো ক্রিয়ার পূরক হতে হলে 'ঝিলমিল' শব্দটিকে অবশ্যই নামশব্দ হতে হবে। 'ঝিলমিল' ধ্বন্যাত্মক শব্দ বটে কিন্তু এটি কোনো নামশব্দ কি? লক্ষণীয় যে, এ চরণে 'জোনাকি' একটি সম্বন্ধ পদ মাত্র কিন্তু জীবনানন্দসহ সব অনুবাদক জোনাকিদেরকেই এ চরণের কর্তা হিসেবে দেখিয়েছেন। জোনাকিরা কোথাও চারপাশের চওড়া সব জিনিসে (জীবনানন্দ), কোথাও গল্পের গায়ে (Seely), রঙ লাগায় কোথাও উজ্জ্বল সব গল্পের ট্যাপিস্ট্রি বুনতে লেগে যায় (Martin Kirkman) কোথাও বা নতুন করে পৃথিবীটাকে আলোকিত করে (ফকরুল আলম)। স্পষ্টত 'তখন গল্পের তরে' এবং 'জোনাকির রঙে ঝিলমিলে' এই দু'টি প্রসারক অনুবাদকদের ভাষাবোধে গ্রন্থিত (embedded) হয়ে গেছে। চিদানন্দ দাশগুপ্ত অবশ্য ব্যতিক্রম। পাণ্ডুলিপিই তাঁর অনুবাদে গল্প বুনছে জোনাকির আলোতে। জোনাকির আলো এখানে বুনন ক্রিয়ার সহায়ক পূরক (Cincumstacid Complement)।

জীবনানন্দের অনুবাদে নাবিকটি তার গল্পের ঝুলি নিয়ে প্রস্তুত (অবশ্যই বনলতা সেনকে শোনানোর জন্যে)। Kirkman অনুবাদে নাবিকটি ভাবছে, বনলতা সেনের কাছে ফিরবার সময় হলো বলে। Seely'র অনুবাদে নাবিকটি বনলতা সেনের মুখোমুখি বসে আছে আর ফকরুল আলমের অনুবাদে বনলতা সেন বসে আছে নাবিকের মুখোমুখি। মূল কবিতার 'বসা' ক্রিয়াটি তিঙন্ত নয়, প্রত্যয়ান্ত। সুতরাং মূল কবিতার বাক্যবিন্যাস দেখে বোঝার উপায় নেই কে কার মুখোমুখি বসে আছে।

'বনলতা সেন' কবিতার শেষ স্তবকের শেষ চারটি চরণে জীবনানন্দ সবচেয়ে দুর্বোধ্য, বিন্যাসগত দিক থেকে এবং অর্থগত দিক থেকেও। এ দুর্বোধ্যতা কি ইচ্ছাকৃত? ছন্দসৃষ্টির প্রয়োজনে? চিদানন্দ দাশগুপ্ত (১৯৭২) মনে করেন, জীবনানন্দের বাক্যবিন্যাস জটিল এবং বাহ্যত আবিত্রিক (arbitrary)। অনুবাদকেরা যে যার মতো করে মূল কবিতার এ জটিলতা আর আবিত্রিকতার জট ছড়াতে চেষ্টা করেছেন এবং জীবনানন্দ নিজে তাঁর ইংরেজি অনুবাদে কোনো প্রকার দূর্বোধ্যতার লেশমাত্র রাখেননি।

পরিশেষ

এ কবিতার প্রায় সব ক'টি ক্রিয়াশির (ঘুরেছি, ছিলাম, দিয়েছিলো, দেখেছি ইত্যাদি) মান বাংলা থেকে নেয়া। কিন্তু প্রথম ক্রিয়াশির 'হাঁটিতেছি' মান চলিত বাংলার ক্রিয়ারূপ নয়। এটি সাধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলার ক্রিয়ারূপ। এছাড়া আরেকটি ক্রিয়াপদ 'হারায়েছে' জীবনানন্দের নিজস্ব সৃষ্টি। এটি কি বরিশালের উপভাষার ক্রিয়ারূপ 'হারাইছে'র জীবনানন্দীয় রূপান্তর? বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন, 'কবে আমরা মুখের ভাষায় কথা বলতে শিখবো? ... মৌখিক ভাষার ইডয়িম্‌গুলো ব্যবহার করে কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ করে তুলবো না কেন? (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৬)।

কোনো গদ্য রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার এ ধরনের মিশ্রণ বা আঞ্চলিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দৃষ্টি ও শ্রবণকটু বলে মনে হতে পারতো। তবে কবিতার শৈলীর অজুহাতে শক্তিশালী কবি এ ধরনের স্বাধীনতা প্রায়ই নিয়ে থাকেন (যেমন নিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত : উত্তরিলা, কহিলা ইত্যাদি) এবং এর ফলে সৃষ্টি হয় নতুন একটি কাব্যশৈলী। উৎস ভাষার এ ধরনের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য প্রান্তভাষায় সঞ্চারিত করা অসম্ভব।

১৯৪৫ সালে প্রকাশিত Kirkman-এর অনুবাদ দেখেছিলেন জীবনানন্দ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে জীবনানন্দ জানিয়েছিলেন, Kirkman-এর অনুবাদের birds-nest eyes খুব বেশি আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে গেছে। এর দশ বছর পর ১৯৫৪ সালে জীবনানন্দের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে চিদানন্দ দাশগুপ্ত জীবনানন্দের কয়েকটি কবিতার (যার মধ্যে বনলতা সেনও ছিল) ইংরেজি অনুবাদ করে জীবনানন্দকে দেখিয়েছিলেন এবং জীবনানন্দ সে অনুবাদগুলোর ব্যাপারে তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু চিদানন্দ দাশগুপ্তের অনুবাদেও bird's-nest eyes উপমাটি রয়েছে। তাহলে জীবনানন্দ কেমন করে চিদানন্দের 'আক্ষরিক অনুবাদ' খেয়াল করলেন না? এমনকি হতে পারে যে ১. চিদানন্দ দাশগুপ্ত bird's-nest eyes পরে যোগ করেছেন তাঁর অনুবাদে, ১৯৭২ সালে অনুবাদগুলো প্রকাশের কিছু আগে? ২. হয়তো ঐ দশ বছরে উপমার আক্ষরিক অনুবাদ সম্পর্কে জীবনানন্দের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসুর কাছে লেখা একটি পত্রে জীবনানন্দ জানাচ্ছেন যে তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদে বাংলা নামগুলোর আক্ষরিক অনুবাদ করা বা এড়িয়ে যাবার পক্ষপাতী তিনি নন। এর কারণ এই যে এই সব নামের বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে এবং ইংরেজিতে তা হারিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া যদি বাঙালি পাঠক ইংরেজি কবিতায় ব্যবহৃত Lethe (পাতালের নদী যার জল পান করলে মানুষ অতীত বিস্মৃত হয়) শব্দটির অর্থ কষ্ট করে খুঁজে নিতে পারে, ইংরেজ পাঠকেরা কেন 'বৈতরণী' কথাটির সাথে পরিচিত হবে না? জীবনানন্দ চান, বিদেশী পাঠকেরা জানুন, পৌষ আর মাঘ মাস মিলে বাংলাদেশে শীতকাল হয়। বাংলাদেশের নদী, ঋতু আর বিচিত্র সব জিনিসের নামের সাথে তাদের পরিচয় ঘটুক। এর জন্যে প্রয়োজন হলে কবিতার অনুবাদের নিচে ফুটনোট দেওয়া যেতে পারে। (Seely, ১৯৯০)

আমরা লক্ষ্য করি যে নিজের কবিতার অনুবাদের মান সম্পর্কে জীবনানন্দ সদাসতর্ক। কিন্তু সেটা অন্যের বেলায় অন্যরকম—যেমন, ফকরুল আলম (১৯৯৯) মনে করছেন অনুবাদক হিসেবে জীবনানন্দ প্রায়শই অতিসহজ পথটি বেছে নিয়েছেন এবং ইংরেজি অনুবাদ করার সময় তাঁর কবিতার চরণগুলোকে অতিসরল করে ফেলেছেন। জীবনানন্দের কবিতার ইঙ্গিতময়তা, অভিনয় সব তুলনা, বিশেষ ধ্বনিগত সংগঠন থেকে সৃষ্টি হওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনন্যসাধারণ সুর, কোমল ছন্দ, সহজ সরল উপমাবহুলতা সবই হারিয়ে গেছে তাঁর নিজের করা ইংরেজি অনুবাদে।

নিজের অনুবাদ সম্পর্কে জীবনানন্দের ধারণা কি ছিল তা আমরা জানতে পারি তাঁর লেখা একাধিক পত্রে। ১০ অক্টোবর ১৯৪২ সালে বরিশাল থেকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে জীবনানন্দ লিখেছেন : 'তাড়াহুড়ো করে তিন–চারটে কবিতার তর্জমা পাঠাচ্ছি : কিন্তু অত তাড়াতাড়ি কি ঠিক জিনিস হয়? উপযুক্ত সময় ছাড়া আমি অন্তত মনের মতন জিনিস গড়তে নিতান্তই অক্ষম। ইংরেজি লেখার অভ্যাস নেই। হয়তো নানারকম ত্রুটি রয়ে গেছে। আপনি একটু দেখে দিলে ভালো হবে। 'হাওয়ার রাত' ও কয়েকটি সাম্প্রতিক লিরিক আপনি যদি অনুবাদ করে দেন তাহলে খুব ভালো হয় ; চর্চা ও প্রতিভা আছে আপনার—আমার চেয়ে ঢের ভালো তর্জমা হবে।' (অংশবিশেষ) ১৯৪৪ সালের ২০শে মার্চ তারিখে লেখা আরেকটি পত্রে জীবনানন্দ লিখেছেন : 'বুদ্ধদেব বাবুর কাছে 'বনলতা সেন', 'বিড়াল' ও 'মনোবীজ'–এর যে ইংরেজি তর্জমা রয়েছে তাও খুব তাড়া খেয়ে লেখা ; ও তর্জমায় আমি খুশি নই। বেশি সময় পেয়ে স্থির হয়ে নিতে না পারলে এসব জিনিস মনের মতন হয় না।' (অংশবিশেষ)।

অনুবাদকদের অভিযোগ, অনুবাদে জীবনানন্দ মূলের প্রতি বিশ্বস্ত নন। জীবনানন্দ এর অজুহাত হিসেবে দেখাচ্ছেন যে কবিতাগুলো অনুবাদ করার জন্যে যথেষ্ট সময় তিনি পাননি। কিন্তু আমি মনে করি, পুরো সময় দেওয়া হলেও কবির অনুবাদ কখনও মূলানুগ হবে না। আর 'মূলানুগ' মানে কি? কবিতার দ্যোতকটিকে আমরা মূল ধরবো নাকি দ্যোতিতটিকে? কবিতার দ্যোতিতটি কি, তাতো শুধু কবি একাই জানেন। 'জানেন' বলাটাও ঠিক নয়। বলা উচিত 'জানতেন'। কোনো কবি যখন একটি কবিতা রচনা করেন তখন তাঁর মনে কবিতাটির একটি দ্যোতিতের সৃষ্টি হয়। কোনো পাঠক যখন কবির এই কবিতাটি পড়েন বা শুনেন তখন পাঠকটির মনেও একটি দ্যোতিত সৃষ্টি হয়। পাঠকের মনে সৃষ্ট দ্যোতনা আর কবির মনে সৃষ্ট দ্যোতনা পুরোপুরি এক নয়। আবার বিভিন্ন পাঠকের ভাষামানসেও কোনো কবিতার উপমাগুলো সমান দ্যোতিত সৃষ্টি করে না। এ কারণেই আমরা দেখেছি, কবিতার একই চরণ ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাষান্তর করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, একই কবিতা একজন অনুবাদক তার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নভাবে অনুবাদ করবেন।

মহৎ কবিতার শরীর গঠনে উপমা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা বলেছিলাম, উপমার দ্যোতিতটি নির্দিষ্ট নয়, উপমার দ্যোতিতক্ষেত্র এক ধরনের ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন। এমনও হতে পারে, কবির কবিমানসে তাঁর নিজের ব্যবহৃত সবগুলো উপমার দ্যোতনা সমান গুরুত্ব পায় না এবং এর প্রতিফলন ঘটে কবির নিজের করা অনুবাদে। কবির মনের দ্যোতিত আর পাঠকের মনের দ্যোতিত যে এক নয় তা বোঝা যায় কবি যখন তাঁর নিজের কবিতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করেন। কোনো উপমাকে তিনি আক্ষরিক বলে এড়িয়ে যান, নিজেই কোনোটির আক্ষরিক অনুবাদ করেন, আবার কোনোটিকে তিনি প্রান্ত ভাষায় প্রতিস্থাপিত করেন সম্পূর্ণ নতুন কোনো উপমা দিয়ে।

অনুবাদ করার সময় উৎস ভাষার কবি আর কবি থাকেন না, আর দশজন পাঠক–অনুবাদকের মতোই হয়ে যান তিনি। তখন নিজের লেখা কবিতা তাঁর ভাষামানসে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্যোতনার সৃষ্টি করে তা কবিতা লেখাকালীন সৃষ্ট দ্যোতনার চেয়ে আলাদা। উৎস ভাষার সাথে প্রান্ত ভাষার ধ্বনি, রূপ ও বিন্যাসগত পার্থক্যের কারণে মূলের সাথে অনুবাদের কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি হবে এটা মেনে নিয়েও বলা যায়, পাঠক যা বোঝে কবি সব সময় ঠিক তা বোঝাতে চান না।

টীকা

১. একদিন সকালে গেছি। গেলে ঘরে বসিয়ে বললেন—আমার 'বনলতা সেন' কবিতার বইটা সিগনেট প্রেস বার করেছে।—এই বলে তিনি আমার হাতে একখানা 'বনলতা সেন' দিয়ে বললেন—কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সবই ভাল, কিন্তু কভারের ছবিটা আমার আদৌ পছন্দ হয়নি।

   আমি বইটা খুলে দেখছি। সেই সময় তিনি আর একটা 'বনলতা সেন' নিয়ে তাতে আমার নাম লিখে আমার হাতে দিলেন।

   আমি বই হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—দাদা, বনলতা সেন কে? আপনিত লিখেছেন—নাটোরের বনলতা সেন। এই নামে সত্যিই আপনার পরিচিতা কেউ ছিল নাকি?

   আমার কথা শুনে মুচকি হাসতে লাগলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

২. Rojet's Thesaurus এ walk-এর ইংরেজি প্রতিশব্দগুলো হচ্ছে : **wander, roam,** rove, range (ঘুরে ঘুরে দেখা, হতে পারে জলযানে করে ঘুরে বেড়ানো), nomadize, gad about, wayfare, flit, traipse (আঞ্চলিক প্রয়োগ), gallivant, bat around or about (অশ্লিল), mooch (অশ্লিল), prowl, **drift** (হাল ছেড়ে দিয়ে স্রোতে ভেসে যাওয়া), **stray,** straggle, **meander, ramble,** stroll, saunter, jaunt, peregrinate, pererrate, divagate, go or run about, go the rounds, tramp, hobo, bum or go on the bum (অশ্লিল), vagabond, vagabondize, take to the road, travel the open road, beat one's way, hit the road or trail (বারোয়ারী বা informal), walk the tracks or count ties (দু'টোই বারোয়ারী)। এর মধ্যে **wander** ও **roam** (এবং অবশ্যই walk) পায়ে হাঁটার সাথে সম্পর্কীত এবং এদিক ওদিক (উদ্দেশ্যহীন ভাবে) 'ঘুরে বেড়ানো' অর্থে ব্যবহার করা যায়। বাকি সবগুলো প্রতিশব্দই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩. In translating these poems, my formost thought has been to make the English rendering enjoyable as poetry. At times, in doing so, a certain degree of sacrifice of the literal meaning has been unaboidable. Sometimes a statement, elaborate in Bengali, has been a little simplified ; at other times a simple statement hard to follow in English, has been slightly elaborated, to make it comprehensible in a foreign idiom. Effort has of course been made to see that the original's obliqueness or delibarate suppression of logical and syntactical links are not removed altogather. Sometimes Jibanananda's very complicated and apparently arbitrary syntax has been smoothed out to a clear flow. On occation a word, or even a line, has been dropped, and its intention incorporated somewhere just before or after. Names of trees, plants, or other elements incomprehensible in English have often been reduced or eliminated for the fear that they should become an unpleasant burden on the poem when read in translation.

   Jibanananda throughly approuved of this and gave his blessing readily to all the five translations which I had prepared a few months before his death in 1954. (Chidananda Das Gupta, 1972).

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধে আলোচিত 'বনলতা সেন' কবিতার ছয়টি অনুবাদ

Banalata Sen

Long I have been a wanderer of this world,
Many a night,
My route lay across the sea of Ceylon somewhere winding to
The seas of malaya.
I was in the dim world of Bimbisar and Ashok, and further off
In the mistiness of Vidarbha.
At moments when life was too much a sea of sounds,
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom.

I remember her hair dark as night at Vidisha,
Her face : image of Sravasti : the navigator,
Undone in the blue milieu of the sea,
Never twice saw the earth of grass before him,
I have also seen her, Banalata Sen of Natore.

When day is done, no fall somewhere but of dews
Dips into the dusk ; the smell of the sun is gone
Off the kestrel's wings. Light is your wit now,
Fanning fireflies that pitch the wide things around
I am ready with my stock of tales
For Banalata Sen of Natore.

Translated by : Jibanananda Das

[জীবনানন্দ দাশ 'বনলতা সেন' কবিতার যে ইংরেজি অনুবাদ করেন সেটি বিভিন্ন বইয়ে অন্তত দু'ভাবে ছাপা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে যে ইংরেজি অনুবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি ফয়জুল লতিফ চৌধুরীর (১৯৯০) বই থেকে নেয়া। এই অনুবাদটি এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৯৪) আর ক্লিন্টন বি. সিলি (১৯৯০)'র বইয়ে দেওয়া অনুবাদের মধ্যে তিন জায়গায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় : ১. প্রথম স্তবকের তৃতীয় চরণে somewhere-এর স্থলে আছে Somewhat। দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় চরণে রয়েছে Her face an image of Sravasti as the pilot এবং ৩. তৃতীয় স্তবকের ৫ম চরণ : I am ready with my stock of tales এর চিহ্নমাত্র নেই শেষোক্ত দু'জনের অনুবাদে।]

Banalata Sen

A thousand years I have wandered upon this earth
From the sea of Ceylon to the midnight sea of Malay.
Much have I wandered ; in the grey lands of Vimbisar and Asoka—
There have I been ; and to dark, distant town of Vidarva ;
Tired of this life, this foaming sea of life,
I found peace for a while with Banalata Sen of Natore.

Her hair is dark as the nights of far Vidisha
her face the architecture of Sravasti. As radarless pilot
Lost and drifting on a distant sea
Sees the island of cinnamon trees and green grass below,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

so have I seen her in darkness, who asked me : where have you been
So long away? This she asked raising her bird's-nest eyes,
Banalata sen of Natore.

At the day's ending evening falls with soft sound of dew ;
The kite shakes the smell of the sun from her wings,
And when earth's colours fade the fireless weave
a tapestry of brilliant stories.
Birds return to their nests—all the rivers flow home—the ledger of life is closed.
Only darkness remains, the time to return to Banalata Sen of Natore.

Translated by : Martin Kirkman

Banalata Sen of Natore

For aeons have I roamed the roads of the earth
From the seas of Ceylon to the straits of Malaya
I have journeyed, alone, in the enduring night,
And down the dark corridor of time I have walked
Through mist of Bimbisara, Asoka, darker Vidarbha.
Round my weary soul the angry waves still roar ;
My only peace I knew with Banalata Sen of Natore.

Her hair was dark as night in Vidisha ;
Her face the sculpture of Sravasti.
I saw her, as a sailor after the storm
Rudderless in the sea, spies of a sudden
The grass green heart of the leafy island.
"Where were you so long?" She asked, and more
With her bird's-nest eyes, Banalata Sen of Natore.
At the footfall of dew comes evening ;
The raven wipes the smell of warm sun
from its wings ; the world's noises die.
And in the light of fireflies the manuscript
Prepares to weave the fables of night ;
Every bird is home, every river reached the ocean.
Darkness reamins ; and time for Banalata Sen.

Translated by :Chidananda Das Gupta

Banalata Sen

For thousands of years I roamed the paths of this earth,
From waters round Ceylon in dead of night to Malayan seas.
Much have I wandered. I was there in the grey world of Ashoka
and Bimbisara, pressed on through darkness to the city of Vidarbha.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

I am a weary heart surrounded by life's forthy ocean.
To me she gave a moment's peace—Banalata Sen from Natore.

Her hair was like an ancient darkling night in Vidisa,
Her face, the craftsmanship of Sravasti. As the helmsman,
His rudder is broken, far out upon the sea adrift,
Sees the grass green land of a Cinnamon isle, just so
Through darkness I saw her. Said she, "Where have you been so long?"
And raised her bird's-nest-like eyes—Banalata Sen from Natore.

At days end, like the hush of dew
Comes evening. A hawk wipes the scent of sun light from its wings.
When earth's colour fade and some pala design is sketched,
Then glimmering fireflies paint in the story.
All birds come home, all rivers, all of the life's tasks finished.
Only darkness remains, as I sit there face to face with Banalata Sen.

Translated by : Clinton B. Seely

Bānalata Sen

I have walked the roads across the earth's breast for a thousand years.
In the darkness of night, I have ranged far—from Ceylon waters
To the Malay Sea ; in Vimbisar and Asok's grey world
Have I been, and the still more distant darkness of Vidarbha.
A tired being am I, round me life's foaming seas.
Banalata Sen of Natore gave me a moment's peace.
Her hair the dark night long ago in Vidisa,
Her face a Sravasti carving : beyond the farthest seas
As when a sailor, helm broken, his bearings lost,
A grassy green plain set in a cinnamon island sees,
I saw her through the darkness. She asked, 'Where were you so long?'
Raising her eyes like bird's nests, Banalata Sen of Natore.

At the end of all the days, dusk comes like the sound of dew ;
The kite wipes off the scent of sunlight from its wings.
The earth's colours all quenched, the manuscript prepares
To tell its stories ; lit by firely gleams.
All the birds come home, all the rivers—all life's trade ends.
Only the dark abides ; and, to sit face to face, Banalata Sen.

Translated by : Sukanta Chaudhuri

Banalata Sen

For a thousand years I have walked the ways of the world,
From Sinhala's Sea to Malaya's night's darkness,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Far did I roam. In Vimbisar and Ashok's ash-grey world
Was I present ; Farther off, In distant Vidharba city's darkness ;
I, a tired soul, around me, life's turbulent, foaming ocean,
Finally found momentary bliss with Natore's Banalata Sen.

Her hair was full of the darkness of a distant Vidisha night,
Her face was filigreed with Sravasti's artwork. As in a far-off sea,
The ship-wrecked mariner, lonely, and with no relief in sight,
Sees in a cinnamon isle signs of a lush grass-green valley,
Did I see her in darkness, said she, 'Where had you been?'
Raising her eyes, so bird's nest-like, Natore's Banalata Sen.

At the end of a long day, with the soft sound of dew,
Night falls ; the kite wipes the sun's smells from its wings ;
The world's colours fade ; fireflies light up the world anew ;
Time to wrap up work and get set for the telling of tales ;
All birds home—rivers too—life's transactions close again ;
What remains is darkness and facing me—Banalata Sen!

Translated by : Fakrul Alam

গ্রন্থপঞ্জি

১. Alam Fakrul (1999) *Jibanananda Das,* University Press Limited, Dhaka.
২. Gupta R. S. (1999) *Literary Translation,* Creative Books, New Delhi.
৩. চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার (১৯৩৯) *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ,* রূপা এ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা।
৪. Chowdhury Faizul Latif (ed.) (1995) *I have seen the Bengal's Face, Poems from Jibanananda Das,* Creative Workshop, Chittaong.
৫. চৌধুরী ফয়জুল লতিফ (১৯৯০) *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র,* দেশ প্রকাশন, ঢাকা।
৬. Chaudhuri Sukanta (ed.) (1999) *A Certain Sense, Poems by Jibanananda Das,* Sahitya Akademi.
৭. ত্রিবেদী রামসুন্দর (১৯১৭) শব্দকথা, রামেন্দ্র রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা।
৮. Dasgupta Chidananda (1972) *Jibanananda Das,* Sahitya Akademi, New Delhi, India.
৯. Frege Gottlob (1994) *Ecrits logiques et Philisophiques,* Editions du Seuil, Paris.
১০. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পা.) (১৯৮৬) *জীবনানন্দ, বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত,* ভারত বুক এজেন্সি, কলিকাতা।
১১. ভট্টাচার্য্য শিশির (১৯৯৮) *সঞ্জননী ব্যাকরণ,* চারু প্রকাশনী, ঢাকা।
১২. মিয়া সাজাহান (১৯৯৯) *বাংলা অনির্দেশক সংখ্যাশব্দ,* জ্যোতিপ্রকাশন, ঢাকা।
১৩. Mounin Georges (1963) *Les Problemes theoriques de la Traduction,* Gallimard, Paris.
১৪. সেন প্রবোধচন্দ্র (১৯৮৬) *নতুন ছন্দ পরিক্রমা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
১৫. সৈয়দ আবদুল মান্নান (সম্পা.) (১৯৯৪) *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত জীবনানন্দ,* অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
১৬. রায় গোপালচন্দ্র (১৯৯৮) *জীবনানন্দ, জীবন ও কবিতার আলোচনা,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা।
১৭. Seely C.B. (1990) *A Poet Apart,* Associated University Press Ltd. USA—A comprehensive literary biography of the poet Jibananda Das.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য : উপন্যাস-ভাবনা

আহমাদ মাযহার

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে জীবনানন্দ দাশের যখন জীবনাবসান ঘটে সেই সময়ে তাঁর নামটি উচ্চারিত হলে লাজুক-স্বভাব, স্বল্পবাক, অন্তর্মুখি, স্বল্পপ্রজ একজন কবির অবয়ব যে কোনও আধুনিকতা-মনস্ক বাঙালি কবিতাপ্রেমীর চোখের সামনে ভেসে উঠত। তখনও পর্যন্ত তাঁর কবিতা যথেষ্টভাবে বহুলপঠিত হয়ে ওঠেনি। সাহিত্য-সমালোচনা বা প্রবন্ধ জাতীয় দু-চারটি রচনা হয়তো কারও কারও নজরে এসে থাকতে পারে ; কিন্তু কথাসাহিত্যিক জীবনানন্দ দাশ তখনও সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরের প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর তাঁর সৃষ্টি সমগ্রের দিকে তাকালে তাঁকে আর স্বল্পপ্রজ বলা যাবে না। বরং এত বিপুল সৃষ্টি-সম্ভার তিনি কীভাবে অপ্রকাশিত এবং অন্তরালবর্তী করে রেখে দিয়েছিলেন তা ভেবে আমাদের মনে এখন বিস্ময় জাগে। তাঁর কথাসাহিত্যিক সত্তার পরিচয় আবিষ্কৃত হবার পর কেমন ছিল তাঁর গল্প-উপন্যাসের জগত তা নিয়ে স্বভাবতই অনেকের মনে কৌতূহল জন্মেছে। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখ কবি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে নবীন চেতনার বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন তার বিপ্রতীপে কথাসাহিত্যের ভুবন সৃষ্টি করেছিলেন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখ। কবি হিসাবে জীবনানন্দ দাশের কণ্ঠস্বরের স্বাতন্ত্র্য যতটা স্পষ্ট, অনুভূতিময় এবং সফলতার সঙ্গে কি তাঁর গল্প-উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য বা সাফল্য তুলনীয়? যাকে কখনওই কবি ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি এমন একজন সফল কবিকে কেনই বা গল্পকার বা ঔপন্যাসিকের ভূমিকায় এমন প্রবলভাবে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল? আর এত বিপুল পরিমাণে গল্প-উপন্যাস লেখা সত্ত্বেও কেনই বা সেগুলো প্রকাশে তিনি এতটা অনীহ ছিলেন? একি নিছকই প্রকাশের অনীহা নাকি এইসব সৃষ্টির সাফল্য সম্পর্কে তাঁর মনে কোনও সংশয় ক্রিয়া করছিল? কবিতার ক্ষেত্রে এমন উত্তুঙ্গ সাফল্যের কারণেই জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য পাঠ করতে গেলে এই প্রশ্ন আমাদের মনে না জেগে পারে না।

জীবনচিত্র রচনায় কথাসাহিত্যিকের অবলম্বন ভাষা। জীবনানন্দ দাশের গল্প-উপন্যাস পাঠ করতে গেলে আমরা তাঁর যে ভাষাভঙ্গির মুখোমুখি হই তা কিন্তু আমাদের বিস্মিত করে না। আরও পরিষ্কার করে হয়তো বলা যায় যে তাঁর ভাষাকে আগন্তুক বলে মনে হয় না। কারণ তাঁর কবিতা আমাদের চেতনাজগতকে আগেই অধিকার করে রেখেছে বলে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার ভাষাভঙ্গি আমাদের পরিচিত। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে যে জীবনকে তিনি চিত্রিত করেছেন তা কিন্তু আমাদের বিস্মিত করে এবং ভাবায়। এ কোন জীবনকে তুলে ধরেছেন জীবনানন্দ? নিঃসন্দেহে জীবনানন্দ তাঁর গল্প-উপন্যাসে যে পাত্র-পাত্রীদের উপস্থিতি ঘটেছে তারা সবাই তাঁরই সমকালের সূক্ষ্ম চেতনাসম্পন্ন ও অনুভূতিময় মানুষ! একটু মনোযোগের সঙ্গে তাঁর গল্প-উপন্যাস পাঠ করলে অনুভব করা যায় যে সেগুলো গভীরভাবে আত্মজৈবনিক। তা সত্ত্বেও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যতটা সাংকেতিক ততটাই আবার দৈনন্দিন জীবনানুষঙ্গেও স্পষ্ট। জীবনযাপনের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোকে তিনি যেভাবে তুলে এনেছেন তা কথাসাহিত্যিকসুলভ গুণ। সুতরাং কবির লেখা কথাসাহিত্য বলে যে জীবনানন্দীয় কথাসাহিত্যকে অনুকম্পা করে নম্বর দিতে হবে তা নয়। কথাসাহিত্যিকের কাছে স্বভাবতই যে-সব বৈশিষ্ট্য কাঙ্ক্ষিত তা আছে বলেই জীবনানন্দ দাশের গল্প-উপন্যাসকে আলাদা একটা মূল্য দিতে হবে। প্রসঙ্গত জীবনানন্দের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *মাল্যবান*-এর কথা এবং এ-যাবৎ প্রকাশিত শেষতম উপন্যাস *কল্যাণী*র দৃষ্টান্ত টানা যেতে পারে। *মাল্যবান* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাল্যবান একজন সূক্ষ্ম অনুভূতিময় মানুষ। তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে জীবনের অনেক ক্ষুদ্র, আপাতঃদৃষ্টিতে খুব সাদামাটা বিষয়ও এড়াতে পারে না। মাল্যবানের স্ত্রী উৎপলা আধুনিকতার বিকারে বিস্রস্ত এক নারী। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মাল্যবানের বিপরীতে তার অবস্থান। তিক্ততা ও বিরক্তি উৎপাদনকারী এই নারীর দ্বারা সূক্ষ্ম অনুভূতিময় মাল্যবান কেবল লাঞ্ছিত হয়। সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার প্রতিভূ সে। পক্ষান্তরে *কল্যাণী* উপন্যাসে একই ধরনের পুরুষ চরিত্র চন্দ্রমোহন। *মাল্যবান* উপন্যাসের পুরুষ চরিত্র মাল্যবান এবং *কল্যাণী* উপন্যাসের নারী চরিত্র কল্যাণীর অবস্থান একই সমতলে ; উভয়েই অনুভূতিময় মানুষ। মাল্যবান ও কল্যাণীর সঙ্গে উৎপলা ও চন্দ্রমোহনের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে জীবনের সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়ধর্মী চেতনা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কথাসাহিত্যের পরিমণ্ডলে এভাবেই জীবনকে দেখেন। এই রকম জীবনদৃষ্টিকে তো আধুনিক কথাসাহিত্যিকসুলভ জীবনদৃষ্টিই বলতে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত এবং বাংলা কথাসাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব। এই দুই উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ-কথা যেমন সত্য তেমনি তাঁর অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের বেলায়ও সত্য যে বাঙালি জীবনের দৈনন্দিনতা তাঁর কলমে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ধরা দেয়। জীবনানন্দ দাশের গল্প-উপন্যাসের চরিত্রেরা খুব স্পষ্টভাবেই তাদের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্পন্দমান। তবে তা স্বত্ত্বেও তারা যেন সম্পন্ন ও স্বতন্ত্র এক ভুবনের বাসিন্দা ; অর্থাৎ কবি জীবনানন্দ যেমন সতন্ত্র এক জগতের পরিমণ্ডলে স্পন্দিত তেমনিভাবে কথাসাহিত্যিক জীবনানন্দও এক নতুন অদ্ভুত পৃথিবীর স্রষ্টা। এই দিক থেকে তাঁর কবি ও কথাসাহিত্যিক সত্তার মধ্যে মিল রয়েছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আমরা যেমন রহস্যদ্যোতক বাক্যের হরহামেশা আবির্ভাব দেখি তেমনটা তাঁর উপন্যাসে বা ছোটগল্পেও রয়েছে প্রচুর। অর্থাৎ তাঁর কবিত্বের রঙ এইসব ক্ষেত্রে গদ্যের রঙকে অতিক্রম করে ভেসে ভেসে উঠেছে। তবে একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে অনুভব করা যাবে যে এইসব ক্ষেত্রেও তিনি গদ্যভাষায় যে উপলব্ধিকে উন্মোচিত করেন তা যথার্থই কথাসাহিত্যিকোচিত। কবি হিসাবে তিনি যেমন 'চিত্ররূপময়' কথাসাহিত্যিক হিসাবেও তিনি তাই। ব্যক্তির আত্মনিমজ্জমানতা কবির পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার ; গল্পকার বা ঔপন্যাসিকের কাছে ব্যক্তি অন্বিষ্ট হয় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে। কবিতায় মূর্ত হওয়া ব্যক্তির আত্মনিমজ্জমানতার মধ্যে তিনি যে এক সম্পন্ন ভুবনের স্রষ্টা সে-কথা আমরা আগেই বলেছি। আর সে-খবর জীবনানন্দ দাশের পাঠক মাত্রেই জানা আছে। কিন্তু তা-সত্ত্বেও কেন তিনি কথাসাহিত্য সৃষ্টিতে এমন গভীরভাবে নিমগ্ন হয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা যদি তাঁর কথাসাহিত্যের ভুবনে অন্বেষণ করি তাহলে দেখতে পাই যে কবিতার মধ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে তিনি যে জীবনভাষ্য আমাদের সামনে হাজির করেন তার মধ্যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণত প্রকাশ করতে পারছিলেন না বা প্রকাশ করে তৃপ্ত হতে পারছিলেন না বলেই কথাসাহিত্যের পথ তাঁকে খুঁজে নিতে হয়েছিল।

কথাসাহিত্য হিসাবে জীবনানন্দ দাশ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তা প্রচলিত অর্থে গল্প বা উপন্যাস হিসাবে কতদূর সার্থকতা অর্জন করেছে তা বিচার-সাপেক্ষ। কারণ গত দেড় দুইশত বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উপন্যাস বা ছোটগল্পের সম্পন্ন রূপ কী তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে-কারণে জীবনানন্দ দাশের লেখা ছোটগল্প বা উপন্যাসগুলোকে প্রচলিত একাডেমিক অর্থে ছোটগল্প বা উপন্যাস হিসাবে হয়তো খুব সহজে সাহিত্যের অধ্যাপকেরা স্বীকার করে নিতে চাইবেন না। অবশ্য সাহিত্য বা শিল্প পদবাচ্য কোনও সৃষ্টিকর্ম সর্বদাই নতুন স্বাদ পেলে তার পক্ষে-বিপক্ষে দীর্ঘ বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে নিষ্কাসিত হয়ে একাডেমিকদের কাছে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেয়েছে। সেই অর্থে জীবনানন্দ দাশও এক সময় হয়তো একাডেমিকদের কাছে গৃহীত হবেন ঔপন্যাসিক বা ছোটগল্পকার হিসাবে। কিন্তু তাকে সে স্থান হয়তো দেয়া হবে শেষ পর্যন্ত ব্যতিক্রম হিসাবেই।

কিন্তু আমরা যদি রক্ষণশীল অধ্যাপকীয় মানদণ্ডে জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যকে বিচার না করে মুক্ত দৃষ্টিতেও বিচার করি তাহলেও কি বলতে পারব যে জীবনানন্দ দাশ ঔপন্যাসিক বা ছোটগল্পকার হিসাবে তাঁর সমকালীন প্রধান আধুনিক লেখক যথা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-   ) প্রমুখদের সমতুল্য সফল লেখক? আমার ধারণা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বোক্ত লেখকদের কথাসাহিত্যের পাশাপাশি জীবনানন্দের কথাসাহিত্যকে রাখলে লক্ষ করা যাবে যে কথাসাহিত্যিক হিসাবে তাঁর মধ্যে অনেক স্বাতন্ত্র্য এবং গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও শৈল্পিক সিদ্ধির দিক থেকে তিনি পূর্বোক্ত সমকালীনদের সমতুল্য নন। তাছাড়া উপন্যাস সম্পর্কে দু তিনটি প্রবন্ধে জীবনানন্দ যে ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন সে আলোকেও তিনি কতটা সফল হয়েছিলো তাও বিবেচনা করে দেখা যায়। উপন্যাস সম্পর্কে একটি ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> Nor can a novel hope to become outstanding or even significant in proportion to the quantity of important human experience that it hooks in. It is not the extent of experience that will tend to make a novel great, but the requisite vision and intellect of the novelist even though his experience is almost restricted and the material at his commend scarcely anything more than diversified autobiography.

নিজের উপর্যুক্ত উপন্যাস বিবেচনার কতটুকু প্রতিফলন তিনি ঘটাতে পেরেছিলেন? আমরা যারা পঞ্চাশ বছর পরে তাঁর লেখা পড়ছি তারা নিঃসন্দেহে তাঁর সমকালীন সঞ্চারী আবহ থেকে মুক্ত। আমরাও কি বলতে পারছি যে জীবনানন্দের উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব উপন্যাস বিবেচনার সম্পন্ন প্রতিফলন ঘটেছে! আমার মনে হয় যে তাঁর নিজের মনেও এ নিয়ে গভীর সংশয় ছিল বলেই তিনি সেগুলো কখনও প্রকাশের জন্য দেন নি।

জীবনানন্দের উপন্যাসের উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েও বলতে হয় যে তিনি যদি নিজের উপন্যাস বিবেচনার অনুসারী রচনা হিসাবে তাঁর লেখা উপন্যাসগুলো সার্থক হয়েছে কি হয় নি এই বিচারের অপেক্ষায় থাকার কারণে বা কবিসুলভ কোনো রহস্যময় কারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেগুলোকে অপ্রকাশিত রেখে না দিতেন তাহলে হয়তো বাংলা উপন্যাসের ভূগোল খানিকটা বদলে যেত। কারণ পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিক থেকে জীবনানন্দ দাশ কবি হিসাবে যেমন পাঠকপ্রিয় হয়েছিলেন তেমনিভাবে কথাসাহিত্যিক হিসাবেও পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠতে পারতেন। হয়তো তাহলে তাঁর উপন্যাস বা ছোটগল্পের ধারায় তরুণতর লেখকেরা কেউ কেউ এগিয়ে আসতেন। বাংলা উপন্যাস বা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে হয়তো সংযোজিত হত requisite vision এবং intellect-এর একটি ভিন্ন ধারা। জীবনানন্দ দাশের উত্তরপ্রজন্মের লেখকদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ experience এর চেয়ে intellectকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলেই এই সম্ভাবনার কথা আমাদের মনে আসে। তাঁদের কারও কারও মধ্যে requisite vision বা কল্পনা-প্রতিভার পরিচয়ও পাওয়া যায়। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এই ধারাতেই রচিত হবে কোনো মহৎ উপন্যাস যার অপেক্ষায় ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। বর্তমান রচনায় জীবনানন্দের উপন্যাস ভাবনার আলোকেই তাঁর বা সমগ্র কথাসাহিত্যকে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ ছোটগল্প সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এর থেকে খুব ভিন্ন ছিল বলে মনে হয় না। অন্তত জীবনানন্দের এ যাবৎ প্রকাশিত ছোটগল্পগুলো পাঠ করলেই এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ : সমাজ ও শিক্ষাভাবনা

সরকার আবদুল মান্নান

জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'কবিতার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধগ্রন্থের পনেরটি প্রবন্ধে কবিতা বিষয়ক আলোচনার মধ্যে তাঁর ভাবনাকে কেন্দ্রীভূত রেখেছেন। এই সব প্রবন্ধে সমাজ, সময় ও সভ্যতা প্রসঙ্গক্রমেও আসে নি বললে চলে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রকাশিত 'পৃথিবী ও সময়' প্রবন্ধে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অবস্থা নিয়ে অতি সংক্ষেপে, মাত্র দেড় পাতার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়া ভারত ও বাংলা দেশ নিয়ে তিনি যথাক্রমে 'অর্থনৈতিক দিন' ও 'যুক্তি জিজ্ঞাসা ও বাঙালী' শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন । তবে সারা জীবন শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থাকার জন্যই হয়তো সমকালের শিক্ষাক্ষেত্রের অব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল এবং প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের করুণ অবস্থার পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন 'শিক্ষার কথা', 'শিক্ষা দীক্ষা', শিক্ষা–দীক্ষা–শিক্ষকতা 'শিক্ষা সাহিত্যে ইংরেজী' ইত্যাদি প্রবন্ধে।

'পৃথিবী ও সময়' জীবনানন্দ দাশের অবিভক্ত ও ঐক্যবদ্ধ বিশ্বভাবনা বিষয়ক একটি ছোট প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে কবি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুত্তোর পৃথিবীর সংকট ও সম্ভাবনার একটি কাব্যিক ও দার্শনিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভয়াবহতা থেকে বিশ্বনেতৃত্ব শান্তি ও ঐক্যের যে পথ অন্বেষণ করেন, জীবনানন্দ দাশ তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব লক্ষ করেছেন। জাতিসমূহের পৃথক সভ্যতা ও সংস্কৃতি মেনে নিয়ে এক অবিচ্ছিন্ন মানবসমাজের নিয়ত প্রবাহের মধ্যে আন্তর্লিন অথচ স্বাধীন হয়ে থাকার সে যুদ্ধোত্তর প্রচেষ্টা যতটা 'কূটনৈতিক ততটা বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পারে নি' বলে জীবনানন্দের বিশ্বাস এবং 'যেটুকু বা সংস্কারমুক্ত সত্যার্থী হতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয় তার চেয়ে ঢের কম অনুপাতে আন্তরিক হতে পেরেছে' বলে তাঁর ধারণা।[১] তিনি মনে করেন, আধুনিক বিশ্বের জাতিসমূহে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্ময়কর উন্নতির ফলে একে অন্যের একান্ত পরিচয়ের সীময় এসে উপনীত হয়েছে। এ অবস্থায় জীবনানন্দ দাশ মনে করেন :

> দেশে দ্বীপে এই নিকট যোগাযোগের ফলেই সুদূরগত জাতিকেও প্রায় মুখচেনা পড়শির মতো দেখবার বুঝবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে—মানসিক দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে দৃষ্টিরীতির বৈষম্যের মানে ও মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারা ক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠছে। এই সবেরই সঙ্গত সুফল আশা করতে পারা যেত ; সকলেই যখন কাছে, যে যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কেউ দূরের নয় বিচ্ছিন্ন নয়, তখন সকল জাতিকে নিয়ে যার যার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জাতিস্বকীয়তা সত্ত্বেও শান্তির ও মৈত্রীর হেতুভূমিকাতে এক অবিচ্ছিন্ন মানব পরিমণ্ডল গঠন করবার ইচ্ছা ও আয়োজন অসঙ্গত মনে করা যেতে পারত কি?[২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সৎ ও দার্শনিক মনের এই বিশ্ববিধান কার্যত কখনই ফলে ওঠে না, বরং মানবমৈত্রীর পরিবর্তে জাতিতে জাতিতে চলে বিদ্বেষ ও হিংসা, যুদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন রক্তপাত। লোভ, শঠতা, নিঃসহায়ের উপর অত্যাচার, শোকাবহ স্বৈরচার, মন্বন্তর, কালোবাজার ইত্যাদি অশুভ ভাবনা ও নিষ্ঠুরতায় আধুনিক ইতিহাসের পাতা প্রতিদিনই ক্লেদপঙ্কিল হয়ে ওঠছে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় এই বিমূঢ় বিশ্বের নগ্ন মূর্তি গভীর বেদনার সঙ্গে তুলে এনেছেন।

কিন্তু 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ' ও 'অদ্ভুত আধার'এর কথা তিনি যন্ত্রণা সঙ্গে যতই উচ্চারণ করুণ না কেন, কিংবা 'সময়ের নির্মম আঘাতে' পৃথিবীর আকাশ যতই কালো হোক না কেন, জীবনানন্দ দাশ শেষ পর্যন্ত জানেন 'মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে' এবং অনেক শতাব্দীর মনীষীগণ এই অবক্ষয়ের পথ ধরেই ক্রমমুক্তির সন্ধানে সিদ্ধি লাভ করবেন। অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশ আশাবাদের এক সুদূর প্রসারী আশ্রয় থেকে কখনই সরে দাঁড়ান নি। যে অর্থেই হোক, পাঠককে শুধু ঘরছাড়া করাই যেমন মহৎ সাহিত্যের লক্ষ নয়, তাকে একটি অনিবার্য আশ্রয়ে পৌঁছে দেয়াও শিল্পের লক্ষ হওয়া উচিত—এই রাবীন্দ্রিক কাব্যতত্ত্বে বরাবরই জীবনানন্দ দাশের গভীর আস্থা ছিল। ফলে 'পৃথিবী ও সময়' প্রবন্ধেও নৈরাশ্যের সকল আয়োজন শেষে তিনি ভুলে যান নি যে,

> এটা মানবসভ্যতার উষাকুয়াশা, গোটা ভবিষ্যৎ হয়তো মানুষের সম্মুখে—এ কথা ভেবেও মানুষের মানবতা মাঝে মাঝে স্তিমিত হওয়া সত্ত্বেও তা পুনরায় জ্যোতিষ্ক্রিয় এই সত্য মনে রেখে আমরা মানুষের প্রতি আস্থা না হারিয়ে তার প্রকৃত প্রতিভা—সঙ্গত বাস্তব মর্মের ভবিষ্যৎ লক্ষ করে অগ্রসর হতে থাকব।[৩]

জীবনানন্দ দাশ দেখেছেন, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জেনেভা কনভেনশনের চরম ব্যর্থতা : এবং ইউরোপ-আমেরিকা ও এশিয়া-আফ্রিকার নানা জাতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড নেশন কীভাবে যুদ্ধজয়ী শ্বেতপুরুষদের নিজেদেরই সুখসুবিধা ও শুভানুধ্যানের কাজে খাটছে। আর রাশিয়ার সঙ্গে অ্যামেরিকা-ব্রিটিশের স্নায়ুযুদ্ধের সম্পর্ক সত্ত্বেও চিন্তারশ্মির কোনো এক তির্যক্ সম্মেলন-লোকে জীবনানন্দ দাশ লক্ষ করেছেন এক গভীর সম্পর্ক। কবির এই ভবিষ্যদ্বানী শতাব্দীর শেষে এসে যে হুবহু ফলে গেছে, আজ আমরা তা চোখের সামনেই লক্ষ করছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ইংরেজদের প্ররোচনা ও ইন্দনে এদেশে যে সাম্প্রদায়িক রূঢ়তা ও মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছিল, জীবনানন্দ সে সম্পর্কে ছিলেন খুবই সচেতন। তিনি অনুভব করেছেন, ব্রিটেনে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে এ জাতীয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটলে তার জন্য দায়ী ছোট-বড় নেতাগণকে সরকার প্রধানগণ শাস্তি দিতে কসুর করতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে তারা শুধু ধনবরই নন—ক্ষমতায় টিকের থাকার কৌশল হিসেবে এই হৃদয়হীন, অসুস্থ ও অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ইন্দন দানকারী। সুতরাং জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, 'আমাদের কাজ আমাদের হাতে তুলে দেবার মতো আশ্চর্য অনাত্মসিদ্ধির দিন এসে পড়েছে তার, দেখছি তো। দায়িত্ব ঢের বেড়ে গেছে আমাদের।' শোষণহীন অর্থনৈতিক এবং বিজ্ঞানের নৈতিক ও আদর্শিক ব্যবহারের মাধ্যমে জাতিসমূহের চিৎবৃত্তির যে বিকাশ ও সমৃদ্ধি কাম্য ছিল, আজবধি কোথাও তা লক্ষ করা যায় নি। বিট্রিশ শাসিত ভারতবর্ষে এই দুই দিক থেকেই যে নীতিহীন ও অমানবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে মুক্তির জন্য অন্য কোনো জাতি বা জাতিসমূহের কৃপাদৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকার দিন শেষ হয়েছে। সুতরাং এ সব সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের পরামর্শ হল, 'আমাদের নিজেদেরই আরো বিহিত চেতনা এবং সেই চেতনালব্ধ কর্মশক্তির আরো সকল্যাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সক্রিয়তার প্রয়োজন।' এই শুদ্ধ জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রাসঙ্গিকতা শুধু এদেশের জন্যই নয়— প্রতিটি জাতিই তাঁর মতে 'নিজের ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিসত্তার অতীত সমাজ ও সময়ের নির্দেশে 'এই কঠিন নিরেস চোরাবালির পৃথিবী চেয়ে মানুষের প্রাণের অবৈকল্য ভালো সমাজের সূর্যালোকে অগ্রসর হয়ে পড়বার প্রয়োজন অনুভব করছে।' সুতরাং মানুষের সকল বৈকল্যের তলদেশে সম্ভাবনার যে অফুরন্ত অধ্যায় নিয়ত বর্তমান তার বিকাশ ও সিদ্ধি অস্বীকারের সময় নিশ্চয়ই শেষ হবে।

জীবনানন্দ দাশ 'স্বরাজ' পত্রিকার জন্য 'অর্থনৈতিক দিক' নামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই নিবন্ধটি শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের চরম অর্থনৈতিক দৈন্য ও তা থেকে মুক্তিলাভের অনুপ্রেরণাই এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু। জীবনানন্দ দাশ মনে করতেন, ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত, তা থেকে মুক্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রিয় স্বাধীনতা। পরাধীন ভারতবর্ষের নিম্নবিত্ত, দরিদ্র ও নগরের বস্তিবাসীদের খাদ্যাভাব ও জলকষ্টের এক করুণ অবস্থার পরিচয় তুলে ধরে তিনি বলেছেন যে, এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ছাড়া ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতিগত ঐক্য লাভ সম্ভব নয়। রাজনীতিকে প্রগতিশীল জনহিতৈষী ধনবিজ্ঞানের কল্যাণসত্তা দ্বারা বিশোধিত করে না-লইলে আজকালকার দিনে সুশাসন ও সুস্থ-সুন্দর সমাজের অভিব্যক্তি কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। তবে তিনি এও মনে করেন যে, ভারতের দুঃস্থ, নিগৃহীত ও স্বল্প প্রাধিকার প্রাপ্ত বিশাল জনগোষ্ঠীর শক্তির পূর্ণতর বিকাশ অনুপাতে মানুষের মতো জীবন ধারণ করার সুযোগ দান করার ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার উপরই নির্ভরশীল নয়—এর জন্য প্রয়োজন সৎ ও সুনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক অবকাঠামো। জীবনানন্দ দাশের এই সমাজ-ভাবনা প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে আজো সমান ভাবেই প্রাসঙ্গিক।

বাঙালি জীবনে জাতীয়তা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনন চর্চার হালচার নিয়ে জীবনানন্দ দাশ যে গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন 'যুক্তি জিজ্ঞাসা ও বাঙালী' শীর্ষক প্রবন্ধটি তারই প্রমাণ। উনবিংশ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাজা রামমোহন রায়বিদ্যাসাগর ও মহাত্মা গান্ধী-বিবেকানন্দ প্রমুখ ও আরো কয়েকজন মনীষীর নিরন্ত প্রচেষ্টায়-জ্ঞান-বিজ্ঞান, ন্যায়-নীতি ও মনন-চর্চার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, দেশ ও সর্বদেশীয় কল্যাণ ভাবনার যে উদার-উন্মুক্ত আহ্বানে মানুষের মনে সাড়া জেগেছিল, বিংশ শতকের মাঝামাঝি এসে জীবনানন্দ দাশ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছেন যে, মানুষ সেই আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসাকে তো এগিয়ে নেয়-ই নি বরং তার থেকে অনেক দূর পিটিয়ে এসেছে। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন : 'রামমোহন সমাজ সংসার ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদিতে যে নতুন ভারত বর্ষের ধারণা (ও স্থাপনা) করছিলেন তার পর সে কাজ খুব বেশি এগিয়েছে বলে মনে হয় না। আজকের ভারতবর্ষকে দেখার সুযোগ যদি তিনি পেতেন, তা হলে এর প্রায় কোনো চেহারাতেই হয়তো তৃপ্ত হতে পারতেন না ; আবার নতুন করে যুক্তি দিয়ে সংস্কার (রামমোহন সংস্কার করে যাবার পর আবার ঢের নতুন পুরোনো সংস্কার এসে জন্মেছে দেশে) ও সত্য কল্যাণের প্রয়োগে দুর্বলতা দূর করার প্রয়োজন বোধ করতেন।'

জীবনানন্দ দাশ লক্ষ করেছেন, বিংশ শতকের মাঝামাঝি এসে এদেশের মানুষের ভাবনায় যে উগ্র জাতীয়তাবাদ এসে স্থান করে নিয়েছে, তার পরিণাম জাতীয় জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সুফল বয়ে আনবে না বরং জ্ঞানার্জন থেকে শুরু করে উদার চিন্তা-ভাবনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসমুখকেই বন্ধ করে দেবে। রামমোহন রায় যে সর্ব মানবীয় মঙ্গল ভাবনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন গত শতকের গোড়ার দিকে, আজকের দিনের অযৌক্তিক জাতীয়বাবোধ আমাদেরকে রামমোহনের সেই শিক্ষা থেকেও অনেক দূর সরিয়ে নিয়ে এসেছে। তাঁর মতে সমস্ত পৃথিবীতেই এই জাতীয়তা ও প্রাদেশিকতার গোঁড়ামি চলছে। মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মভাবনা ও বিশ্বাসের মধ্যেও জাতীয়তাবাদের বিষ প্রবেশ করেছে, ধারণা জন্মেছে যে, ঈশ্বর কোনো বিশেষ ধর্ম ও জাতির জন্য। ফলে অনিবার্যভাবেই জাতিতে জাতিতে দেখা দিচ্ছে অনৈক্য আর অন্যায় আধিপত্য লাভের প্রতিযোগিতা ; বিশ্ব জুড়েই ধর্মের অর্থ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে নিজের জাতির উন্নতি, অন্যায় ও নীতিগর্হিতভাবেও সেই উন্নতি লাভের বাধা নেই। জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, 'ধর্ম ও ঈশ্বরকে যাঁরা সত্য বলে মনে করেন তাঁদের ভিতরেই এই রকম। কিন্তু পৃথিবীর অনেকের কাছেই আজ আর অধ্যাত্ম প্রশ্ন তোলবার মতো কিছু নয় ; সৎ পার্থিব প্রশ্নগুলোও নয় ; কিন্তু জাতীয়তাবাদ প্রাদেশিকতা সাম্প্রদায়িকতায় সত্য ও বাস্তবের স্বাদ রয়েছে।' তবুও বাঙালিকে এই উগ্র জাতীয়তাবাদের চাপ থেকে মুক্তি লাভ করে একটি উদার ও কল্যাণকর আবহে ফিরে আসতে হবে, তা হলেই সত্যিকার অর্থে দেশের মঙ্গল হবে।

জীবনানন্দ দাশ লক্ষ করেছেন, ভাষাকে কেন্দ্র করেও এই উগ্র জাতীয়তাবাদ জন্ম নিতে পারে। মানসিক শুদ্ধতা ও সুস্থিরতার অভাবে ভাষা ও সাহিত্যের মতো 'শুদ্ধ জিনিষ'ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। স্পষ্টতই 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' এবং 'যুক্তি জিজ্ঞাসা ও বাঙালী' এই প্রবন্ধ দুইটি লেখার বাংলা ভাষার সঙ্কটকাল অর্থাৎ ৫২'র ভাষা আন্দোলনের পটভূমি তাঁর সম্মুখে ছিল। হিন্দী ভাষার প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার পরিণতি এবং উর্দু-ভাষাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রিয় ভাষা করার প্রচেষ্টায় জীবনানন্দ দাশ বাংলা ভাষণ ও সাহিত্যের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে ওঠেছিলেন। এই দুইটি প্রবন্ধে তাঁর সেই উদ্বেগ ব্যক্ত হয়েছে, বিশেষ করে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের বাঙালীদের পক্ষে আজকের বাংলার এই বিশেষ বিপদের দিনে অন্য নানা বিষয়ের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে অনেক ভাববার ও করবার আছে, কিন্তু সম্ভব ও যুক্তিনাশ করে নয়। এতে ফল না পাওয়া গেলে উত্তেজনার পথে তবুও না যাওয়াই ঠিক।' তিনি মনে করেন, যুক্তি, নীতি ও ন্যায়ের মধ্যে থেকে সংগ্রাম চালিয়ে গেলে আসতে বাধ্য। যদি নাও আসে তবুও ইতিহাসের অন্ধ অধ্যায়ের মধ্যেই ক্রমে যে ব্যায় ও আলোকোজ্জ্বল অঙ্কুরের উদ্ভব ঘটে থাকে, তার পথ ধরেই একদিন সাফল্য লাভ সম্ভব হবে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভাষা, সাহিত্য, যুক্তি, ন্যায় ও সৌন্দর্যের যে চর্চা চলছিল, এখন প্রয়োজন সেই আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসাকে আমাদের জীবনে ফলিয়ে তোলা। তা হলেই জাতীয় জীবনের অনেক বন্ধ্যাত্ব ঘুচে যাবে, প্রাণপ্রবাহ ও গতিশীলতা দেখা দেবে জীবনের প্রতিটি মাত্রায়।

জীবনানন্দ দাশ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন ব'লে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি তাই থাকতেন, তা হলে সমকালের সমাজতন্ত্রীরা তাঁর পিছু লাগতেন না। কিন্তু তবুও পশ্চিমবঙ্গের জীবনে অবক্ষয়ের চরম সঙ্কটের দিনগুলিতে তিনি জাতীয় জীবনে রুশ বিপ্লবের প্রেরণা অনুভব করে আনন্দিত হয়েছেন। তবে ফরাসি বিপ্লবকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজ থেকে শুরু করে ইউরোপের শাদামাটা গদ্যপ্রাণ লোক যে চোখে দেখেছে সেভাবে না-দেখেও জীবনানন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাশ মনে করেন, রুশ বিপ্লবের মর্ম ও সমাজতন্ত্রবাদ তখনকার বাঙালী-মনের অনেকখানি অসংগতি দূর করে দিতে পেরেছিল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর বাঙালি-চৈতন্যে প্রাণপ্রবাহের যে শক্তি দান করে গিয়েছেন, মার্ক্সবাদ সেই প্রবাহকে অন্য এক মাত্রায় অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই ছিল কবির বিশ্বাস। কিন্তু সেই বোলশেভিক প্রভাব রাজনীতির ক্ষেত্রে বিস্তৃততর প্রভাব রাখলেও জীবন-বোধের মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটিয়েছে বলে মনে হয় না। তবুও জীবনানন্দ দাশ রাষ্ট্রিয় জীবনে আবেগের চেয়ে যৌক্তিকতাকেই বারবার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন, 'যুক্তিকে ক্ষুণ্ণ করলে সমস্যা বেড়ে যায়, ভালো ভাবে ব্যবহার করতে পারলে প্রায়ই কোনো রকম অন্ধশক্তির কাছেই ভীত ও নির্জিত হতে হয় না, স্পষ্টতা ও কল্যাণের মাত্রা বাড়তে থাকে।'

জীবনানন্দ দাশ আস্তিক কি নাস্তিক ছিলেন, তাঁর কবিতা ও কথাসাহিত্যে সে ধরনের কোনো মীমাংসা নেই। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন যে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোনো মন্তব্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তবে মানব জীবনের নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধের বিষয়গুলি যদি ধর্মের অভিধা পায় তা হলে তিনি তৃপ্তিবোধ করতেন। কিন্তু তিনি দেখেছেন, বিশ্বাসীগণ কেবলমাত্র নীতি ও যুক্তিকে ধর্ম বলে মনে করে না—এগুলিকে বাদ দিয়েও তাদের ধর্ম চলে এবং ধর্ম সাধনার জন্য বিবেক ও চেতনা-শক্তি আদৌ-প্রয়োজন আছে বলে কবির কখনই মনে হয়নি। শুধু অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষই যে জীবনের অসংখ্য জিজ্ঞাসা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ধর্মের অন্ধ আশ্রয়ে বসতি গেড়েছে তা নয়, অনেক সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকও ধর্মের এই প্রশ্নাতীত স্বরূপই মেনে নিয়েছেন। জীবনানন্দের মতে : 'ঈশ্বর আছেন কি না স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু খুব সম্ভব কারো নেহাৎই ভাবাবেগের ফলের ভেতর তিনি বা তাঁর শুদ্ধ স্বরূপের বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হয় না।' তবুও জীবনানন্দ মনে করেন, ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের বিচলিত মন নিয়ে নয়—রামমোহনের স্থির প্রাজ্ঞ মন নিয়ে ধর্মের ভালো-মন্দের বিচার করার সময় আবার এসেছে। জীবনকে বিজ্ঞানের ন্যায়সূত্রে বিচার করে দেখার মানসিকতা ও শক্তি যদি এদেশের মানুষ অর্জন করতে না-পারে তা হলে প্রাগ্রসর বিশ্ব থেকে যে আমরা পিছিয়ে পড়ব, জীবনানন্দ দাশের সেই আশঙ্কা অর্ধশতাব্দী পরে প্রায় বাস্তব হয়ে ওঠেছে।

জীবনানন্দ দাশের সমাজ-ভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সমকালের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর চিন্তা ও দুশ্চিন্তা। শিক্ষার মানের চরম বিপর্যয়, জ্ঞানার্জনের প্রতি ছাত্রদের নজিরবিহীন অনিচ্ছা, নোট বই-এর আতঙ্কজনক বিস্তার, শিক্ষা বিভাগের প্রতি দেশী-বিদেশী কর্তাব্যক্তিদের অনাগ্রহ এবং বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রতি প্রশাসনের লোকজনদের অমানবিক আচরণ ও বঞ্চনা ইত্যাদির এক মর্মন্তুদ বিবরণ পাওয়া যায় শিক্ষা বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে। তবে প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যেই জীবনানন্দ দাশ ইংরেজি ভাষা শেখার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি মনে করতেন, পৃথিবীর বিপুলায়তন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য এখনো ইংরেজি ভাষার বিকল্প কোনো ভাষা পরিচিতি লাভ করে নি। 'শিক্ষার কথা' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মূলত এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

'শিক্ষার কথা' প্রবন্ধটি ১৯৫২ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ হয়। বোঝা যায়, এই সময়েই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। এবং এই সময়ের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে তাঁর স্কুল-পাঠের সময়ের তুলনা করে তিনি শিক্ষার মানের এক বিপুল অধঃপাতের সঙ্গে আমাদের পরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়ে দেন। শতাব্দীর গোড়া থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষার অবকাঠামোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয় নি। উপরন্তু সেকালে-রামমোহন ইংরেজি শিক্ষার যে বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত করে দিয়ে গেছেন, পঞ্চাশ বৎসরের ব্যবধানে তা জীর্ণাবস্থা ও ধ্বংসাবশেষ নিয়ে টিকে আছে। শতাব্দীর প্রথম দশকে স্কুলগুলিতে পাঠ্য কবিতার তালিকায় ছিল হেরিকের 'ড্যাফোডিল্‌স্‌', ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'লুসি গ্রে', 'উই আর সেভেন', 'ড্যাফোডিল্‌স্‌', সাদির 'আফটার ব্লেনহেইম', ক্যাম্বেলের 'হোয়েন-লিণ্ডেন', টেনিসনের 'ব্রুক' ইত্যাদি। এছাড়া স্কুলের ছেলেদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো রকম বাঁধাধরা পাঠ্য বই ছিল না, তবে কয়েকটি বই পড়ার নির্দেশ থাকত। কিন্তু সেখানে কোনোরকম প্রশ্ন থাকত না, উত্তর প্রস্তুত থাকা নোট বই-এর তো প্রশ্নই ওঠে না। ছাত্ররা নিষ্ঠার সঙ্গেই সে সব বই পড়ে আত্মস্থ করে পরীক্ষায় ভালো করত। পঞ্চাশ বৎসর ব্যবধানে সে সব বই-ই আছে, কিন্তু ছাত্ররা টেক্সট না-পড়ে নোটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফলে জ্ঞান অর্জনের প্রতি ছাত্রদের যে নিষ্ঠা ও কৌতূহল ছিল ক্রমেই যেন তা শুধু সার্টিফিকেট অর্জনের মতো স্থূল লাভালাভের হিসাব-নিকাশের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। শুধু পরীক্ষায় পাশের জন্য নয়—নিজেকে যোগ্য ও সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জ্ঞানার্জনের প্রতি যে আন্তর প্রেরণা এক সময়কার শিক্ষার্থীকে সুস্থ-সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলত আজ তা দুষ্প্রাপ্য বিষয় হয়ে ওঠেছে।

অথচ আজকের দিনে শিক্ষা-কমিশন ঘন ঘনই হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক রীতি-নীতিও কম নেই, টাকা-কড়িও পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু বাড়ে নি শিক্ষার মান ও শিক্ষিত হয়ে জীবনকে উপলব্ধি করার অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি। এর জন্য প্রথমেই, জীবনানন্দের মতে 'ছেলেদের মন সুস্থ ক'রে তোলা দরকার।' কেননা 'অন্য পাঁচ রকম অভীষ্টের চেয়ে শিক্ষা ঢের বেশি দরকারী জাতির জীবনে।' জাতীয় জীবনে যতক্ষণ না এই বাস্তবতা উপলব্ধি করার মতো শুভ বুদ্ধির উদয় হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতির ভিতর থেকে গভীর ও সমগ্র উন্নয়নের কোনো আশা থাকবে না। জ্ঞান অর্জনের যে সব উপাদান একজন শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আদর্শিক মূল্যবোধগুলিকে সতেজ ও সক্রিয় রাখে শিক্ষা গ্রহণের দোষে যদি তা ব্যাহত হয় তা হলে তার মতো দুর্ভাগ্য আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এই অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য রাষ্ট্রের চালিকা শক্তির মধ্যেই আনা দরকার সততা ও ন্যায় নিষ্ঠা, অর্থকড়ি ব্যবহারে থাকা দরকার বাস্তব, যৌক্তিক ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি দেশপ্রেম।

সামরিক খাতে অঢেল অর্থ ব্যয়ের বর্বর প্রবণতার সঙ্গে জীবননান্দ দাশ পরিচিত ছিলেন। প্লেটোর গণতন্ত্রে এবং গান্ধীর আদর্শ অহিংসার পৃথিবীতে সরকারকে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি টাকা ও পরামর্শ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আজকের পৃথিবী গণতন্ত্রের সেই নিদোর্ষ বলয় ভাবনা থেকে অনেক দূর সরে এসেছে। প্রতিটি জাতিই যেন এখন আশু যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কায় সর্বদাই তটস্থ থাকে এবং জাতীয় আয়ের বেশির ভাগ টাকা অকাতরে ব্যয় করে আত্মরক্ষার জন্য। ফলে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী যেমন তেমনি স্বাধীন দেশের শাসকগণও শিক্ষা খাতে টাকা বরাদ্দের সময় কার্পণ্যের একশেষ করেন ; যেন এই খাতটিতে অকারণেই টাকা খরচ করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থা ক্রমেই ধ্বংসের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছছে। তাই জীবননান্দ দাশ যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তা হল :

> ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের নানা রকম গুরুতর দায়িত্বের জায়গায় অনেক কাঁচা লোকের ভিড় এসে পড়ে ; সেটা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদের জিনিস। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে গভর্নমেন্ট সেই বিপদকে ডেকে আনে এবং যে অজ্ঞতায় ও অন্ধকারে দেশ ছেয়ে ফেলে সেটা মনের ও বাইরের সভ্যতা ও স্বাধীনতা একেবারেই হারিয়ে ফেলবার মত খারাপ জিনিস হয়ে দাঁড়াতে পারে জাতির জন্য।[৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শিক্ষা দীক্ষা' প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ আর একটি অপ্রিয় সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের খুব কাছে থেকে তিনি লক্ষ করেছেন যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশী শাসক শ্রেণী সম্পর্কে যতটা বিরূপ ও উত্তেজিত সেই শাসন থেকে মুক্ত হয়ে কি করে উন্নততর দেশী শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা যায় সে-ব্যাপারে ততটা আগ্রহী ও মনোযোগী নয়। এরা ব্রিটিশ শাসনের খারাপ দিকগুলি দেখে যতটা অভ্যস্ত, তাদের শাসনের ও সান্নিধ্যের ভালো দিকগুলি সম্বন্ধে ততটাই অনভ্যস্ত ও বিরূপ। অর্থাৎ মনন-চিন্তনের যে সুস্থিপেক্ষ ও নির্মোহ দৃষ্টিতে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করার শক্তি যোগায়, ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশকগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা তা অর্জন করার সুযোগ পায় নি। ফলে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের বাঙালিরা যে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও উদার-উন্মুক্ত মানবিক মূল্যবোধ লাভের ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি জীবন-জিজ্ঞাসাকে বিশ্ব পরিসরে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে আনুকূল্য ও পরিবেশ লাভ করেছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের দিনগুলিতে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী সেই জীবন-জিজ্ঞাসা লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিশেষ করে, কষ্ট করে ইংরেজি ভাষা না শেখার কুঁড়েমির ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ্চাত্যের বিপুলায়তন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডারের সঙ্গে অপরিচিতই থেকে গেছে। সত্য, ন্যায় ও সৌন্দর্যের চর্চায় ইউরোপের অত্যন্তিক যে প্রচেষ্টা সভ্যতাকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করেছে, এদেশের শিক্ষার্থীরা সেই প্রাণপ্রবাহ থেকে নিজেদেরকে দীর্ঘ দিন বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত রেখেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিরাগ স্বাধীন ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে যে নানা রকম অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, জীবনানন্দ দাশ গভীরভাবে তা উপলব্ধি করেছেন।

'শিক্ষা সাহিত্য ইংরেজি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ এদেশের পাঠকদের সাহিত্যরুচি সম্পর্কে কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, 'পনেরো আনি মানুষের—খাঁটি সাহিত্য রুচি নেই—যদিও তাদের অনেকে উত্তেজক গল্প বা বই পছন্দ করেন।' এ সময়ের অনেক পাঠকই নিম্ন মানের সাহিত্য ও মহৎ সামিত্যের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে না। সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য চিন্তা, রুচি ও মননের ক্ষেত্রে যে পরিশুদ্ধি প্রয়োজন—শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত অধিকাংশ মানুষই সেই পরিশিলিত রুচি ও মার্জিত ভাবনা লাভ করতে পারে না। শুধু আমাদের দেশেই নয়, অপেক্ষাকৃত সভ্য দেশের মানুষের জীবনেও সাহিত্যের স্থান ক্রমেই সংকোচিত হয়ে আসছে। অথচ সাহিত্যের খাঁটি পাঠকদের সাহিত্য-চেতনায় পরিসিদ্ধ না-হলে চলে না। যে শিক্ষিত মন সাহিত্য-পাঠে আনন্দ ও সমৃদ্ধি লাভ করে, প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ফলে কদাচ তা লাভ করা সম্ভব। কিন্তু তবুও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইতঃপূর্বে সাহিত্য-পাঠের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, এখন ক্রমেই তা সংকোচিত হয়ে আসছে। টাকা কড়ি ও পদ-প্রতিপত্তির ওপর বেশি বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানের বাহ্য আড়ম্বরে সমাজ এত বেশি বদলে গিয়েছে যে চাকরি-বাকরি ইত্যাদির উন্নতি ও কৃতিত্বের বাইরেও শিক্ষা, নীতি ও সংস্কৃতির যে আলাদা মহত্তর স্বরূপ রয়েছে। সেটা আজ আর অনেকেই স্বীকার করতে চায় না। অথচ সাহিত্যের প্রতি গোটা সমাজের যদি মোটামোটি একটা আগ্রহ থাকে, তা হলে একটি দেশের সভ্যতার গুণ উপলব্ধি করা যায়। বাংলাদেশ যেন এই আত্মিক সমৃদ্ধির পথ থেকে অনেক পূর্বেই দূরে সরে গিয়েছে। এক সময় শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যেও এদেশে অনেক বোদ্ধাজনের প্রভূত ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য তো দূরের কথা, এখন বাংলা সাহিত্যের মহৎ ও সমৃদ্ধ অংশের সঙ্গেই অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের কোনো যোগাযোগ নেই। সাহিত্য-সম্পর্কে অধিকাংশ সচেতন মানুষের এই অনিহা জাতির ক্রমিক প্রগতির পথে যে বিপুল দৈন্য নিয়ে আসবে, জীবনানন্দ দাশ অনেক পূর্বেই তা উপলব্ধি করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শিক্ষা দীক্ষা শিক্ষকতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রতি সরকারি ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের অবহেলা ও নিষ্পেশন জীবনানন্দ দাশ গভীর অন্তর্জালার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত এই কয়টি বছরের বেকার জীবনে প্রাইভেট ট্যুশনি ও ইনসিয়োরেন্সের দালালির চাকরি করলেও এবং ছাতার ডাঁট তৈরি করার বেত আমদানি, স্টেনোটাইপিস্ট ও খবরের কাগজে রিপোর্টারের চাকরি এমন কি খবরের কাগজ ফেরি করার কথা ভাবলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজিতে সম্মানসহ এম.এ করা জীবনানন্দ দাশ বেসরকারি কলেজেই সারা জীবন শিক্ষকতা করেছেন। ফলে শিক্ষালাভের সিংহ ভাগ জুড়ে বিস্তৃত এই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিচয় তাঁর জানা ছিল। খুব ভালবেসে যে তিনি এই পেশা গ্রহণ করেছিলেন তা নয় কিংবা শিক্ষাকতায় লিপ্ত হয়ে থাকতে যে খুব ভাল লেগেছিল তাও নয়। তবুও এম.এ. পাশ করার পর তিনি কলকাতার কোনো একটি কলেজে সরকারি অফিসের দপ্তরীর চেয়েও কম বেতনে চাকরি নিয়েছিলেন। সেই থেকেই তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলে যে 'ইস্কুলের মাষ্টাররা তো নিশ্চই—বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ বেসরকারী কলেজের বেশিরভাগ অধ্যাপকেরাই যা মাইনে পায় তাতে মনে হয়, আমাদের দেশের পরিচালকের কোনো আস্থা ও শ্রদ্ধা নেই শিক্ষার ও শিক্ষকদের ওপর।'

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা, তথাকথিত ভদ্রসাধারণে ভেতর কেরানিরাই সবচেয়ে বেশি আর্থিক অবিচার সহ্য করে আসছে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ দেখেছেন, ব্যাপারটি পুরোপুরি সত্য নয়। তাঁর মতে, 'গভর্নমেন্টের ও ধনিক অফিসগুলোর ওপরের—এমন কি মাঝামাঝি দিকের কেরানীরা যে ধরনের মাইনে, বোনাস ও অন্যান্য দুচার রকম সুবিধে পায়, বাধাধরা পথে তাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নতির যত বেশি সহজ সুযোগ ও সুবিধে রয়েছ গেছে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের তা নেই।' সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বেতনের গ্রেড থাকে এবং গ্রেড প্রদানের নিয়ম-নীতি থাকে। কিন্তু বেসরকারি কলেজগুলিতে তেমন কোনো গ্রেড নেই, বেতনাদির ব্যাপারেও কোনো নিয়ম-নীতি নেই, পুরো ব্যাপারটি কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের ইচ্ছা ও মর্জির উপর নির্ভরশীল। ফলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিরাজ করে এক চরম অরাজকতা। এখনো জীবনানন্দ দাশের সময়ের এই বিপর্যস্ত অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।

জীবনানন্দ দাশ গভীরভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে সময়টা বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছে। 'টাকা ছাড়া এদেশে সম্মান পাওয়া যায় না।' বিদ্যার জন্যে যাদের কাছে অকৃত্রিম মর্যাদা পাওয়া যেত এক সময়, তারাও কৃত্রিম হয়ে উঠেছে।' জীবনানন্দ দাশের এই উপলব্ধি সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে অধিকত বাস্তব হয়ে ওঠেছে। অর্থের মূল্যে এখন যে মেধা ও বোধ-বুদ্ধি থেকে শুরু করে নৈতিক ও আদর্শিক মূল্যবোধগুলি অতি সমজেই বিকিয়ে যায় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শিক্ষকগণ কোনো কালেই অগাধ টাকা দাবি করেন নি। শুধু মানমর্যাদা বজায় রাখার জন্য এবং যতটা সম্ভব দিন যাপনের গ্লানি কমিয়ে আনার জন্য, যতটুকু আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রয়োজন, সেটুকুই তাদের চিরকালের দাবি। কেননা, 'পৃথিবীর টাকা-কড়ি কাড়াকাড়ির ব্যাপারে উত্তেজিত হওয়া যাদের স্বভার, তাদের পক্ষে আত্মদান ক'রে শিক্ষকতা করা সম্ভব নয়।' সুতরাং টাকার মাহাত্ম্যে মর্যাদা লাভের প্রবণতা শিক্ষাকদের থাকা উচিত নয়। জীবনানন্দ দাশ শেষ পর্যন্ত কম পক্ষে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই পরিশুদ্ধ জীবনই অপরিহার্য বলে মনে করেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে এখন যে দুর্বিনীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় যাচ্ছে ; মিথ্যা, শঠতা ও বাহ্য আড়ম্বরের যে প্রতিযোগিতায় মানুষ তার মানবিক স্বরূপ ও সমৃদ্ধি হারিয়ে ফেলার পথে পা রাখছে এবং 'টাকা ও রিরংসার পথে ক্রমেই বেশি ক'রে অগ্রসর হতে না পারলে কেউ কাউকে সভ্য ও সুখী করতে সত্যি দ্বিধাবোধ করে' তখন একমাত্র শিক্ষক শ্রেণীকেই আদর্শ ও নৈতিকতার প্রাণবায়ুটুকু টিকিয়ে রাখার নিরব সংগ্রামে ব্রতী থাকতে হবে।

জীবনানন্দ দাশ সমাজ ও শিক্ষা ভাবনা বিষয়ক এইসব প্রবন্ধ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লিখেছে। সেই সময় থেকে আমরা কম-বেশি অর্ধ শতাব্দী পথ অতিক্রম করে এসেছি। শিক্ষা-বিজ্ঞানও ইত্যেমধ্যে অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার যে হালচাল তা কোনো অবস্থাতেই জীবনানন্দ দাশের সময়ের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়, বরং নানা দিক থেকেই শিক্ষা যন্ত্রটি ভেঙ্গে পড়ার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সম্পূর্ণরূপে নোট নির্ভরতার সঙ্গে এখন যুদ্ধ হয়েছে নকল করার আত্মঘাতী প্রবণতা। শিক্ষা বিভাগ নিয়ে সরকারের মনোভাবেরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের মর্জির উপর দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, ছাত্র রাজনীতির নামে আইনসিদ্ধ একটি নীতির বলে দুর্নীতি অন্যায়, অসত্য ও সন্ত্রাসের মতো হাজারটি উপসর্গ শিক্ষা ক্ষেত্রটিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখনও সরকারি আয়ের সিংহভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয় না-করে সামরিক খাতেই ব্যয় করা হচ্ছে। সুতরাং আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে জীবনানন্দ দাশ সমাজ ও শিক্ষাভাবনায় যে সব ক্ষতকে চিহ্নিত করে উপসমের জন্য নানা রকমের সুপারিশ করেছিলেন, আজবধি তা সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক। কেননা জীবনানন্দ দাশের চিহ্নিত ক্ষতের কোনো উপসম তো হয়ই নি বরং সেই ক্ষত এখন অনেক বেশি গভীর ও বিস্তৃত ওয়ে ওঠেছে। তাই কবির শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এখন মূল্যায়নের নতুন প্রাসঙ্গিতা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তথ্য-নির্দেশ

১. 'বিভাব', জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা ১৯৯৮, পৃ. ১২৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ব-সমাজ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দের প্রেম ভাবনা

আসমা চৌধুরী

চেনা-অচেনার দ্বন্দ্বে যে অপার বিস্ময় মীমাংসায় যে অপার্থিব মুগ্ধতা জীবনানন্দ সেখানেই সার্থক। তাঁর শব্দ-কুশলতা, ঐতিহ্যবোধ, সংশয়, ভবিষ্যতের বিস্তার, মনস্তত্ত্ববোধ সবকিছুই নতুন, একেবারে ঘরোয়া এবং আলাদা। যাকে বলা যায় নিখুঁত ও নিখাদ কাঠামো। পূর্বসূরি কবিদের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেও যিনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস থেকে বলতে পেরেছেন ;—

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী
আমি বহে আনি ;
একদিন শুনেছ যে-সুর—
ফুরায়েছে, পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন ;
তাই আমি আসিয়াছি—আমার মতন
আর নাই কেউ !

তিরিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় একটা উচ্ছ্বাসের ঢেউ এসে লাগে। এই উচ্ছ্বাস নানারকম। প্রথমত, রবীন্দ্র বলয় ভেঙ্গে নতুন কাব্যধারা নির্মাণ, দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েডের অবচেতনা ও মার্কসের সমাজ-চেতনার পাশাপাশি পাশ্চাত্যকাব্যরীতি ও দর্শনের ব্যাপক ব্যবহার, তৃতীয়ত, দুই মহাযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পরিণতিস্বরূপ কর্কশ ও বিষণ্ন শব্দমালার সংযোজন, চতুর্থত, শহুরে সভ্যতার বাস্তবরূপ উন্মোচন।

জীবনানন্দ দাশের মগ্ন চৈতন্যে আরো বেশি রেখাপাত করে '৪৭-এর দেশবিভাগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার মতো রক্তক্ষয়ী ঘটনা। সমকালের জীবনধারাকে আ-কণ্ঠ উপলব্ধি করে আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের পরিণতিস্বরূপ কবি দেখেন অন্য সবকিছুর মতো মানুষের হৃদয় আজ 'শেয়াল-শকুনের' খাদ্য বিশেষ। তিরিশোত্তর অন্যান্য কবিদের মতো জীবনানন্দ দাশও প্রেমভাবনায় এনেছেন নতুনত্ব। তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রেম অসামান্য হলেও ক্ষণস্থায়ী। সমকালীন জীবন বাস্তবতা, ক্লান্ত ও হতশ্রী জীবনের প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রেমভাবনা অঙ্কিত বলে বেশি উদ্ভাসিত, বেশি ব্যঞ্জনাময় ও স্বাভাবিক। এখানেই তিনি সমকালীন সব কবিদের থেকে আলাদা এবং গতিশীল।

তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেনে'ও আমরা দেখতে পাই বিপর্যস্ত প্রেমিক, যিনি জীবনের কাছে প্রতারিত হয়ে 'হাল ভাঙ্গা নাবিকের' মতো, এক নারীর সম্মোহনের মুখে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সামান্য সময়ের জন্য শান্তি খুঁজেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটরের বনলতা সেন।' শান্তির সময়সীমা মাত্র দু'দণ্ড এবং যাকে দেখা গিয়েছিল স্বপ্নের ভেতর অথবা কল্পনায়। সেখানেও প্রত্যাখ্যান।

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেন-দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

'বনলতা সেন' এমনই একটি অসামান্য কবিতা যাকে শুধুমাত্র প্রেমের কবিতা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে অতীতের ঐতিহ্যের পাশাপাশি, যুগযন্ত্রণার নিরিখে প্রেম অন্বেষণের কবিতা বলা যায়। প্রেমহীনতার কথাও বলা যায়। কারণ দু'দণ্ড শান্তি চিরস্থায়ী কোনো সমাধান নয়। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সময়কে তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছেন বলেই এমন এক দুঃখময় সত্যকে কবিতার ভাষায় শিল্পীত করে চিত্রিত করতে পেরেছেন। সমস্ত সম্ভাবনার দরজাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে গেলে, "সব সুর থেমে গেলে আমরা ইতিহাস লিখতে বসি। জোনাকীর আলোর মতো মায়াময় জগৎ তৈরি করে অতীতের গল্পের ভেতরেই বেঁচে থাকি।"

পৃথিবীর সব রং মুছে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকীর রঙে ঝিলমিল ;

কী বেদনার কথা, চরম জীবনসত্যের কথা, জীবনের কঠিন বাস্তবতার কথা লিখে গেছেন কবি। এখানে চমৎকার একটি শব্দ আছে 'আয়োজন'। কবি জেনেছেন জীবনে আয়োজন যতটা স্পষ্ট, যতটা সত্য, ততটাই নির্জীব, ততটাই নিষ্ঠুর বেঁচে থাকার, বাঁচবার বৈশিষ্ট্য, মনুষ্যত্বের বিকাশ। তাই যা পাওয়া সম্ভব নয় তাই পেতে চায় প্রায় সকলেই আবেগী কল্পনায়। কেননা সেখানে সে একাই সম্রাট। জীবনের খেলা শেষ হয়—পৃথিবীর গল্প শেষ হয় না। চারপাশ ঘিরে অবিরাম অন্ধকার— ইতিবাচক অধ্যায়, শুভ সূচনার জন্ম হয় না। তাই আবারো বনলতা সেন আবারো স্বপ্ন নির্মাণ, স্বপ্ন স্বপ্ন খেলা।

'আকাশলীনা' কবিতায় পৌঢ় প্রেমিকের হৃদয় ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায় প্রেম হারানোর বেদনায়। সে চিৎকার করে অনুনয় করে 'বলো নাকো কথা ঐ যুবকের সাথে।' সময়ের সঙ্কটে বিভ্রান্ত হয়ে সে সুরঞ্জনাকে শুধানোর নামে নিজেকেই প্রশ্ন করে "কি কথা তাহার সাথে? তার সাথে?" সভ্যতার এই নতুন নিয়মের পৃথিবীতে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়, বিস্মিত হয় পারিপার্শ্বিকতায়।

তোমার হৃদয় আজ ঘাস, আকাশের আড়ালে আকাশ।

'কুড়ি বছর পরে' কবিতায় প্রেমিকের হৃদয় সন্দেহের দোলায় দোলাচল। সত্যিই কি 'কুড়ি বছর পরে' তার সাথে দেখা হবে? দেখা হওয়া অনিশ্চিত বলেই কবি লিখেছেন 'তার সাথে দেখা হয় যদি'—এখানে একটি 'যদি' শব্দ সমস্ত সম্ভাবনাকে ম্লান করে দিয়েছে। 'মুনিয়ার ঘরে রাত শীত আর শিশিরের জল' আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের টালমাটাল অবস্থায় কোনো কিছুরই নিশ্চয়তা অনিশ্চিত। 'কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে'—তাই গভীর আবেগ থেকে হৃদয় 'মন্থন করে উচ্চারিত হয় সেই চিরায়ত শোকবাণী—

সোনালি সোনালি চিল—শিশির শিকার ক'রে নিয়ে গেছে তারে—
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে !

কুড়ি বছর বড় দীর্ঘ সময়। স্বপ্নের মানসীরা এভাবেই 'হৃদয়ের রক্ত ঝরিয়ে ঠিকানা হারায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি যদি হতাম' কবিতায় সমকালের বিধ্বস্ত চেহারা আরো বেশি উদ্ভাসিত। আধুনিক যান্ত্রিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতায় ভালোবাসাবাসির কোনো উপযুক্ত পরিবেশ নেই। যাবতীয় সঙ্কট ও নিরাপত্তার অভাববোধ কবিকে পীড়িত করে তুলেছে। জীবনের নোংরা ঘাটে পাল ছেঁড়া তরী ভিড়বে কেমন করে? অসহ্য পঙ্কিলতার ভিড়ে কোথায় হারিয়ে যায় নরম হৃদয়। তাই প্রকৃতি সংলগ্ন জীবনের আকাঙ্ক্ষাতেই কবি হৃদয় বলে ওঠে 'আমি যদি হতাম বনহংস/বনহংসী হতে যদি তুমি।' গুলির শব্দকে উপেক্ষা করে যে হংসবলাকা যুগল জীবনের জয়গান গাইতে পারে, মানুষ তা পারে না। 'আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান।' আবার এই নারকীয় সভ্যতার অমানবিক আচরণের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আবারো গুলির শব্দকে অবলীলায় গ্রহণ করেছে। 'আমাদের স্তব্ধতা/আমাদের শান্তি।' পেছনে পড়ে থাকে তাদের গতিমান ভালোবাসার নিখাদ কাহিনী। দ্বন্দ্বহীন, সংঘাতহীন একই ধারায় প্রবাহিত পাখিদের জীবনের সুখ, আমাদের অহরহ ব্যর্থতার দুঃখের মতোই উজ্জ্বল ও তীব্র।

> আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না;
> থাকতো না আমাদের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার।

সেই সময়ের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রবল ক্ষতে প্রেম বাঁচিয়ে রাখাই ছিল দুষ্কর। যা আজকের সমাজ জীবনের নিরিখেও ধ্রুব সত্য। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও ক্লান্তি। বৈচিত্র্যের স্বাদ খুঁজতে বেরিয়ে আরো সর্বরিক্ত হয়ে সেই হৃদয়ই যেন বলে উঠেছে "কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।" কবির উপলব্ধির গাঢ়তায় এসেছে নানান মাত্রা।

> ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
> অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
> ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

সমকালের সাড়া জাগানো কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'শাশ্বতী' কবিতায় গভীর আবেগ থেকে যখন উচ্চারণ করেন "সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে/আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।" জীবনানন্দ দাশ তখন গভীর বিষাদে উচ্চারণ করেন "এ পৃথিবী একবার পায় তারে পায় নাকো আর।" কবি দেখেন প্রেম ও আশার পূর্ণতার মুহূর্তেও মানুষ বোধ করে বিপন্নতা ও বিস্ময়।

> বধূ শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো;
> প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়,
> তবু সে দেখিল
> কোন্ ভূত? ঘুম ভেঙ্গে গেলো তার?
> অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

কবির রূপসী বাংলা যেমন তাঁর স্বপ্ন ও স্মৃতির জগৎ তেমনি কবিতার 'বনলতা সেন', 'অরুনিমা সান্যাল', 'সুরঞ্জনা', 'সুচেতনা', বা 'শঙ্খমালা', সবাই উঠে এসেছে স্বপ্নময় প্রেমের উৎস থেকে। কোনো একজন 'অরুনিমা সান্যাল'-এর মুখে ফুটে উঠেছে সমস্ত নারীর চেহারা। সমসাময়িক সমস্যাসঙ্কুল বাস্তব সংসারে স্বপ্নের প্রেম খুঁজে পাওয়া অসম্ভব জেনে জীবনানন্দ নিজেকে বলেন "তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।" স্বপ্নের 'সুদর্শনা', 'সুরঞ্জনা', 'শ্যামলী', 'সুচেতনা', 'সবিতা', 'মৃণালিনী ঘোষাল'কে সাথে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতে চেয়েছেন চাঁদের আলোয় শিশির ভেজা ঘাসের পথে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকীর দেহ হতে—খুঁজেছি তোমাকে সেইখানে।

কবির কবিতায় হাঁস, বক, হরিণেরা শিকারে পরিণত হয়। যুগ-যন্ত্রণার এমন নিখুঁত ছবি যিনি আঁকতে পারেন তিনি বাস্তব বিমুখ তো নয়ই বরং অধিকতর বাস্তব সচেতন। জীবনানন্দের কবিতা, গল্প, উপন্যাসে আমরা দেখি মৃত্যুর চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে জীবনের ভার। সময়ের আগেই ফুরিয়ে যায় শেষ ভালোবাসার গল্পটিও। সমস্ত প্রেমের সম্ভাবনাকে, আশাকে মারিয়ে মানুষ আত্মহত্যা করে জীবনের ভারে ক্লান্ত হয়ে।

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে
তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু—একা একা
যে জীবন ফড়িংয়ের দোয়েলের—
মানুষের তার সাথে হয় নাকো দেখা।

কবি জীবনানন্দ দাশকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে কেমন ছিল তাঁর সময়টা। যে মানুষটি আজন্ম বরিশালের প্রকৃতির ভেতরে আকণ্ঠ বেড়ে উঠেছিলেন, যাঁর কাছে "ভালো থাকা মানেই বরিশালে যেমন ছিলেন তেমন থাকা" তাকে একদিন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো চলে যেতে হয় কোলকাতায়। কোলকাতার প্রকট শহুরে জীবন, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, দাম্পত্য সংকট সবকিছু মিলে-মিশে তাকে ভেতরে ভেতরে করে তোলে ভীষণ বিপর্যস্ত, ভীষণ 'একা'। কোলকাতায় বসবাসকালে তাঁর চেতনায় এসেছে যুদ্ধোত্তর বাংলা, যান্ত্রিক সভ্যতার যন্ত্রণা, মন্বন্তরের সর্বগ্রাসী চেহারা। পাশ্চাত্য দর্শনের সাথে, পাশ্চাত্য কাব্যরীতির সমন্বয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর ব্যতিক্রমী বার্তা।

মানুষের ধ্যানধারণায় একটা ধাক্কা, একটা নতুন বোধ সঞ্চারণে এই সময় যে সমস্ত কথাসাহিত্যিক শক্ত হাতে কাজ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত', 'বুদ্ধদেব বসু', 'প্রেমেন্দ্রমিত্র', জগদীশগুপ্ত', 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়' 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'জীবনানন্দ দাশ'। সমসাময়িক সকল শক্তিশালী লেখকদের পাশাপাশি জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে সত্যিকার অর্থে নতুনত্বের স্বাদ খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি জীবনকে ঘটনার মধ্যে লীন করে দিয়ে আরো বেশি জীবনঘেঁষা ও জীবন্ত করে রূপ দিয়েছেন। জীবনানন্দের কবিতার মতো কথাসাহিত্যেও প্রেমের গতি বাঁক ফিরিয়ে ধাবিত হয়েছে ভিন্‌পথে এবং এর মূলে কাজ করেছে একঘেয়েমী আক্রান্ত চলমান জীবনযাপন, অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততা ও সামাজিক ক্লান্তি। প্রায় প্রতিটি কাহিনীতেই দেখা যায় ত্রিভুজ আকারের প্রেম এবং দাম্পত্য ক্লান্তি।

জীবনানন্দ দাশের গল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অনবদ্য রচনা 'গ্রাম ও শহরের গল্প'। ত্রিভুজ আকৃতির কাহিনীতে তিন প্রধান চরিত্র প্রকাশ, শচী ও সোমেন। প্রকাশ শহর জীবনের বৈচিত্র্যের প্রতীক, সোমেন গ্রামীণ জীবনের সৌন্দর্যের প্রতীক। শচীর সাথে তার বিবাহপূর্ব জীবনের বন্ধু সোমেনের অনেকদিন পরে দেখা হলে শচী চায় পুরনো দিনের পাড়াগাঁয় ফিরে যেতে। তখন সোমেন বলে, "তোমাকে নিয়ে সেই বন ধুন্দুল, কলমীলতা, বাঁশবনের ভিতর গেলে আমি তো আর ফিরে আসতে পারবো না। কিন্তু কথা হচ্ছে যা ছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা, তা নেই আমরা—সে আমিও নেই তুমিও নেই।" সেই দূরের বকমোহনার গ্রাম ভ্রমণের প্রস্তাব করে শচী যেখানে রয়েছে তা তাদের ফেলে আসা স্মৃতি। কিন্তু সোমেনের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, এই শচী আর সেই শচী নেই। সে এখন প্রকাশের স্ত্রী। এই শচীকে ব্যবহার করা যায় ফুর্তির উপকরণ হিসেবে। কিন্তু তার ভেতরে কোথাও নেই বকমোহনা গ্রামের সেই শচীর হৃদয় স্পন্দন। এখানে দেখা যায় অবিস্মরণীয় ভোরবেলার গল্প ফুরাতে না ফুরাতেই বদলে যায় মানুষের মনের জগৎ।

জীবনানন্দ দাশের প্রেমের পিপাসা অনন্ত কিন্তু সেই প্রেমের ক্ষণস্থায়ী রূপ তাকে করে তুলেছে ব্যথিত। 'তাজের ছবি' গল্পের নায়ক বিজনের জন্য মাধবী কিংবা সন্ধ্যা কেউ শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকেনি। শিল্পী বিজন যখন উপলব্ধি করে জীবনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই বড় বেশি কিছু এবং এই শিক্ষা না থাকা তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার অহঙ্কার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তখন সেই সময়ের নিদারুণ কষ্টের মুখোমুখি হয়ে তার ভেতরে প্রবল হয়ে ওঠে বিয়ের ইচ্ছা। তাই সে তার একসময়ের প্রিয়জন মাধবীর কাছে যায়। কিন্তু মাধবী বিজনের অপেক্ষায় বেশি দিন থাকেনি। সে এখন দুই সন্তান নিয়ে শ্বশুর বাড়ি ব্যস্ত দিন কাটায়। বিজনের তখন মনে পড়ে আগ্রার 'সন্ধ্যার' কথা। চিঠি লিখে সে সন্ধ্যার কাছে। উত্তরে সন্ধ্যার বাবা কলকাতায় সন্ধ্যার শ্বশুর বাড়ির ঠিকানা পাঠায়। মাধবী এবং সন্ধ্যা দু'ই নারীই সময়ের তোড়ে হারিয়ে যায়। বিজন পরাস্ত হয়। বাস্তব পৃথিবীর কঠিন সত্য বিজনের কাছে কুৎসিত হয়ে দেখা দেয়।

'বিবাহিত জীবন' গল্পে পারিবারিক সম্মতির ভিত্তিতেই অজিত বিয়ে করে 'সুপ্রভা'কে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার এক ফাঁকে অন্য এক নারীর আবির্ভাব, সে অজিতের প্রেমিকা 'সতি'। 'সতি' অজিতের প্রেমিকা কিন্তু তার সাথে বিয়ে অসম্ভব। কারণ সমাজের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার কারণে তাদের বিয়ে অনুচিত। বিয়ের অনুষ্ঠানে সতিকে পেয়ে অজিতের হৃদয়ে তোলপাড় ওঠে। এক ফাঁকে পরস্পর মগ্ন হয়ে যায় আলাপচারিতায়। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ফাঁকে ফাঁকে, কষ্ট, অভিমান, রাগ, দুঃখবোধের পাশাপাশি মুখ্য হয়ে ওঠে পরস্পরকে হারাবার বেদনা। এতসব কিছুর আড়ালে 'সতি'র ভালোবাসায় ধন্য হয়ে ওঠে অজিতের অন্তর। সতিও মেনে নেয় সুপ্রভাকে। জীবনের নিয়মে জীবন এগিয়ে যায়। বহুদিন পরে সতির সাথে অজিতের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। অজিত আহত হয়, সতির ভেতরে পুরাতন প্রেম অন্বেষণ করে। এই সতি এখন একজন 'মা' একটি সংসারের গৃহিণী, তার ভেতরে সেই প্রেম এখন মৃত। বিবাহিত জীবনের প্রতিনিয়ত ঘরকন্যার তোড়ে একজীবনের উষ্ণ কাতরতা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। সেখানে এসে দুর্বার গতিতে স্থান করে নেয় বাস্তবতার ব্যস্ততা।

খুব অল্প কথায় জীবনের এপিঠ ওপিঠ তুলে ধরার অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে লেখনি ধারণ করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। সমকালীন সময়কে নিয়ে বিব্রত কবি তুলির সামান্য আঁচড়ের মতোই একের পরে এক ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজগতের গভীর গহন দৃশ্যাবলী। তিনি যখন লেখেন—'ভিখিরিকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর-ভাদ্র বৌ সকলেই নারাজ' তখন এক দুঃখময় সত্য চোখের সামনে তীব্র হয়ে ওঠে। 'একটি পয়সা' এই কথায় আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের মর্মান্তিক বর্ণনা পাই আমরা। খুব বেশি কথা তাকে বলতে হয় নি, সামান্য দু-চারটি লাইনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জন-জীবনের চিত্র। 'ক্যাম্পে' কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় ঐ মৃত মৃগদের মতো আমরা সবাই।'—এর ব্যঞ্জনার সাথে তার 'মাল্যবান' উপন্যাসের গভীর মিল। নিচতলায় পড়ে থাকা অন্ধকারের সাথে কথা বলা মাল্যবানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসঙ্গতা নিয়ে যে কাহিনী এগিয়ে গেছে সেখানে উৎপলা মাল্যবানকে শুধু নিচেই ছুঁড়ে দেয়নি সর্বত্রই ছড়িয়ে দিয়েছে এক সর্বগ্রাসী উপেক্ষা। তখনকার শতকরা নব্বইজন স্বামী-স্ত্রীর জীবনের এই প্রেমহীনতার চিত্ররূপ মাল্যবান উপন্যাস। স্বামী, স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে একটি ছোট্ট সংসার রচিত হলেও সেই সংসার, সত্যিকারের সংসার হয়ে ওঠেনি ভালোবাসা, সহমর্মিতার অভাবে।

'আমাদের যদি একটা ছোট্ট অস্টিন গাড়িও থাকত, তাহলে এই নালা, নর্দমা, পচা, কাদা আর মুতের গন্ধ কি আমাদের নাগাল পেত মনু?'—এ উক্তির মধ্যদিয়ে জীবনের কঠিন সত্যের আর এক সংবাদ লেখক আমাদের পৌঁছে দেন, তা হলো অর্থনৈতিক দুরবস্থা। আর এই পথ- রেখায় পথের দেখা পায়নি উৎপলা, মাল্যবান। স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারী মাল্যবান তার জীবনের বিপর্যয়কে ঠেকাতে পারেনি অসহ্য এই অদ্ভুত কারণে। জীবনানন্দ দাশ দেখেছিলেন 'হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল।' নগর সভ্যতার বিশ্রী ও কুশ্রী দিক, যেখানে সুন্দরের শরীর প্রতিনিয়ত খামচে দিচ্ছে বিভৎস থাবা, একধরনের ঘৃণা, বিবমিষা থেকে কবি তাই মানুষের চেহারাকে এঁকেছেন পশু প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে। কখনো তা কর্কশ কখনো বা কুৎসিত। মাল্যবান উপন্যাসে পাই 'এই বারোটা বছর উৎপলার অনিচ্ছা, অরুচির বঁইচি কাঁটা, চাঁদা-কাঁটা, বেত-কাঁটার, ঠাস বুনোনো জঙ্গলে নিজের কাজ-কামনাকে অন্ধ পাখির মতো নাকে দমে উড়িয়েছে মাল্যবান। কত যে সজারুর ধ্যাষ্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদরের কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির।' অসুস্থ, অশুভ, অত্যাচারী, হত্যাকারী সময়কে বোঝাবার জন্য জীবনানন্দের কবিতায় রক্ত এবং হত্যার সঙ্গে জুড়ে আছে অদ্ভুত অন্ধকার। বিচিত্র অন্ধকার, যেমন অদ্ভুত আঁধার, চারদিকে অন্ধকার, অন্ধকার বিদিশার নিশা, অঘ্রাণের অন্ধকারে, হৃদয়ের অন্ধকারে, ফাল্গুনের অন্ধকারে, পৃথিবীর অন্ধকারে, এইভাবে দীর্ঘপথ হেঁটেছেন তিনি আলোর সন্ধানে। আলোর জন্য অন্ধকারের এত আয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।" তবু সময়ের বিচারে দেখেছেন বসন্তের জ্যোৎস্নায় দেহ কাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক-একজন মনহীন মানুষ। তীরন্দাজ সময়ে শিকারীর অব্যর্থ বিষাক্ত তীর মেরে ফেলে তারুণ্যে ভরপুর উজ্জ্বল অগুণতি হরিণ। সমকালে প্রেম, ভবিষ্যৎ কোনো কিছুরই কোনো সম্ভাবনা কবি দেখতে পাননি। দেখেছেন জীবনের অপচয়, যুগের ক্ষয়িত রূপ, তাই অহরহ মৃত্যু।

> প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই
> ঘৃণা-মৃত্যু পাই
> পাই নাকি?

জীবনানন্দ সময়ের সান্নিধ্যে এসে নিজেকে দেখেছেন ক্লান্তপথিক রূপে ধ্বংসের চিতায়। জীবন যন্ত্রণার এই গভীর সত্যকে গভীরভাবে তুলে ধরাই তাঁর কাব্যদর্শন হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় কিংবা মার্কসীয় দর্শনের থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা ও নিজস্ব হয়ে উঠেছে তাঁর নির্মাণ। জীবনানন্দের সমগ্র সাহিত্যকর্মে যেমন সুর আছে, ছন্দ আছে, দ্বন্দ্ব আছে তেমনি আছে আকণ্ঠ পান করার মতো বেদনা। সেই বেদনাবোধ আরো তীব্র, আরো প্রকট হয়ে ওঠে যখন কবি স্পষ্টতই উচ্চারণ করেন 'দেহ ঝরে তার আগে আমাদের ঝরে যায় মন।' প্রেম সম্পর্কে কবির এই উচ্চারণ সমকালীন সময়ের বিচারে একান্ত সত্য ও স্বাভাবিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কাব্যচিন্তার কবিতাত্মক প্রয়োগ

সৌমিত্র শেখর

'কবিতা' কী?—কবিতা কি কোনো 'বিধি' প্রদত্ত শ্লোক না গ্রিকদের Ionic দৈববাণীর ফল? নাকি কবিতা কোনো নির্মাণ? ভাস্কর্যের যেমন থাকে কাঁচামালের আয়োজন, চিত্রকলায় রঙ-তুলির সমারোহ, নৃত্যে দেহভঙ্গিম কৌশল—কবিতাতেও কি তেমন কিছু আছে?—এ জিজ্ঞাসা বহু কালের। কেউ কেউ বলে থাকেন, কবিতা হচ্ছে ভাবের সম্মিলন, কারো কারো মতে কবিতা শব্দের শিল্প। ইংরেজ কবি Cole Ridge-এর একটি বিখ্যাত উক্তি আছে : 'Poetry is the best words in the best order.' তাঁর বক্তব্য অনুসারে শব্দই কবিতার প্রাণ। ফরাসি কবি Mallarme-ও বলেছেন প্রায় একই কথা। তাঁর বক্তব্য : 'Poetry is not written with ideas, it is written with words.' আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই ইংরেজি সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায় W.B.Yeats, Ezra Pound, T. S. Eliot প্রমুখ কবিতায় আধুনিক মনন ও অনুভূতির ভিত্তি স্থাপন করেন। ফরাসি শিল্পকলায় যে আন্দোলন ঘটেছিলো তার মধ্যে Imagist movement দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এঁদের কেউ কেউ। কবিতাও যে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে এবং তা মনের নিগূঢ়তম উৎস থেকে আনন্দের অভিব্যক্তি নিয়ে হতে পারে স্রোতস্বতী, তা এঁদের কাব্য সৃষ্টির আগে ইংরেজি কবিতায় ঠিক সেভাবে বোঝা যায়নি। Ezra Pound-এর প্রভাবে T. S. Eliot-এর কাব্যে আধুনিকতার সর্বোচ্চ প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায় ; Yeats কে Eliot প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। কিন্তু 'কবিতা' কী অথবা কিভাবে রচিত হতে পারে একটি সার্থক কবিতা—এ বিষয়ে কোনো যৌথ সিদ্ধান্ত নেই এঁদের ; যদিও ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিমত আছে।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিদেরও নিজস্ব কাব্যচিন্তা রয়েছে—বলা যায়, কবিতা সম্পর্কে তাঁদের ভাবনার অন্ত নেই। অবশ্য আধুনিক কবি বা কবিতা—এই প্রতীতিটি ব্যাখ্যা দাবি করে। বর্তমান আলোচনায় উনিশ শতকের তিরিশ দশকের কবিকুল—বিশেষত জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসুকেই এর উদ্‌গাতা হিসেবে স্মরণ করা হয়েছে। আমাদের নিশ্চিতভাবে মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উক্তি : '...আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।' (আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে)—এ কথা অস্বীকার করবে কে যে, মর্জির বিচারেও এ পঞ্চকবি সমকালে অন্যদের থেকে পৃথক এবং স্বমহিমায় স্বতন্ত্র? সাহিত্যরচনা বা কবিতাসৃষ্টি বিষয়ে এই কবিপুরুষদের বক্তব্যও পরস্পর থেকে ভিন্ন। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'মূল্যহীন সোনা হয় তব স্পর্শে হে শব্দ অপ্সরী।'—একটি অন্তর্প্রেরণা, একটি দেবী-ছোঁয়ার অনুরণন থেকেই যায় এখানে। বিষ্ণু দে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য মূল্য দেন অভিজ্ঞতাকে। তিনি ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা সমাজ ও শিল্পবোধের সঙ্গে জারিত করার পক্ষপাতী। বুদ্ধদেব বসু রুচি, বিচারবুদ্ধি, স্বোপার্জিত শিক্ষা, ভাষা ও কলাকৌশল প্রয়োগের দ্বারা 'ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি' বসাতে বলেছেন। (লেখার ইস্কুল, কালের পুতুল) তাঁর বক্তব্য হলো, কবিতা আপনাআপনি ধরা দেয় না কবির হাতে—কবিকে সারস্বত প্রদীপের তৈল ক্ষয় করে স্বেদবিন্দু ঝরাতে হয় গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ; তবেই কবি হওয়া যায়—কবিতা হয়। জীবনানন্দ দাশের বক্তব্য আছে কবিতা নিয়ে, তিনি ভেবেছেন কবি-প্রকৃতি বিষয়ে, এমন কি কবিতার পাঠক সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়। সমকালে উচ্চমূল্য না-পাওয়া, অনেকটা অনুদঘাটিত, কিছুটা অন্তর্মুখী এই কবি-প্রতিভার নানা প্রবন্ধে তাঁর এ-চিন্তা প্রকাশিত, নিজের রচিত কবিতার এই কাব্য-চিন্তন প্রযুক্ত।

জীবনানন্দ দাশ মনে করেন যে, রসই কবিতার প্রাণ। সংস্কৃত আলঙ্করিকদের রসাত্মক বাক্যই কবিতা—এই ধারণার সঙ্গে এখানে জীবনানন্দের বক্তব্যের সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ যে-কোনো রস-সৃষ্টিকেই কবিতা বলেননি। বিশুদ্ধ কল্পনা বা নিছক বুদ্ধির রসে কবিতা সৃষ্টি হয় না বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনাজাত রস হবে প্রকৃত কবিতার প্রাণ। এ-প্রসঙ্গে "ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ভূমিকা"য় তাঁর বক্তব্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে : 'কবিতা কী এ-জিজ্ঞাসার কোনো আবছা উত্তর দেয়ার আগে এটুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেক রকম। হোমারও কবিতা লিখেছেন, মালার্মে র‍্যাঁবো ও রিলকেও। শেকস্পীয়র বদ্‌লেয়র রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়টও কবিতা রচনা করে গেছেন। কেউ কেউ কবিকে সবার ওপরে সংস্কারকের ভূমিকায় দেখেন ; কারো-কারো ঝোঁক একান্তই রসের দিকে। কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।' (চৌধুরী : ১৯৯৫ ; পৃ. ১৭০)

কবিতায় এই অভিজ্ঞতা ও চেতনার প্রয়োগ বিষয়ে জীবনানন্দ দাশের বক্তব্য আছে একাধিক স্থানে। 'মাত্রাচেতনা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, সময় ও পৃথিবী থেকে আহরিত অভিজ্ঞতায় কবি অন্যকে পরিদীক্ষিত করবেন নিজের মূল্যজ্ঞানের চেতনায়। কেননা, নিজের অভিজ্ঞতাকে 'অপরের করে তুলতে পারা'ই হচ্ছে কবির কাজ। এই অভিজ্ঞতার চালচিত্রেই কবিতা প্রতিষ্ঠিত। জীবনানন্দ দাশ 'কবিতার আত্মা ও শরীর' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'যে কোনো সময়ের যে কোনো জগতের সত্য অভিজ্ঞতা কোনো এক বিশেষ আধারে অন্তঃপ্রবেশ লাভ করে যখন চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শিতায় ফুটে উঠতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে, সে আধার সক্রিয় কবিমন—কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ৪৭) এ-প্রসঙ্গে মনে করা যায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটির কথা। পরিচিত বস্তু—আমাদের অভিজ্ঞতায় ঘটে যাওয়া ঘটনা এখানে কিভাবে 'নরম নদীর নারী', 'শিশুর মুখের গন্ধ', 'ঘুমের ঘ্রাণ', 'নরম জলের গন্ধ' কিংবা 'দেহে তার বিকাল বেলার ধূসরতা'য় উত্তীর্ণ হয়ে কবিতায় পৌঁছে গেছে। বুদ্ধদেব বসু 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিকে 'বাংলার পল্লীপ্রকৃতির চিত্রশালা' বলে উল্লেখ করেছেন। (বসু : ১৯৮৪ ; পৃ. ৪৯) কিন্তু পল্লীপ্রকৃতির প্রাত্যহিক দৃশ্যাবলী কথার রঙ-রেখায় তুলে ধরার অতিরিক্ত যে স্বননটি এখানে ব্যঞ্জিত তা হলো :

> কি বুঝিতে চাই আর ; ... রৌদ্র নিভে গেলে পাখ-পাখালির ডাক
> শুনিনি কি ? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক !

অথবা 'স্বপ্নের হাতে' কবিতায় আকাশ ছায়ার ঢেউয়ে ঢেকে, পৃথিবীতে সব বিরোধ, ব্যথা কিংবা বাস্তবতার অভিঘাত তুচ্ছ করে কবি স্বপ্নকেই সত্য বলে ঘোষণা করলেন। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতায় 'মানুষেরো আয়ু শেষ হয়!' 'নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয়!'—এই অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে কবির ঘোষণা : 'কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ/চিরদিন রয়।' 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের 'উন্মেষ' কবিতার দ্বিতীয় স্তরে রাত্রি বা অন্ধকার শব্দ-প্রতিশব্দে তের বার এসেছে। মানুষ তার চারদিকের অন্ধকার বা রাত্রির ইশারাকে প্রায়শ দেখতে পায় না। সে দেখে দিনের পর যে রাত্রি আসে সেই অন্ধকারকে। প্রতিনিয়ত পালাক্রমে আসা দিনের পর রাত্রির সেই আঁধারকে অতিক্রম করেও মানুষ আরও অদৃশ্য অন্ধকারে পতিত হয়—জীবনানন্দের অভিজ্ঞতায় সেটাই সত্য। 'কোথাও মঙ্গল সংঘটন হয়ে যাবে অচিরাৎ' ভেবে কোনো 'নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে' বেরুলেও অমানিশা তাকে ক্ষমা করে না।—আসলে প্রতিটি মানুষকেই সেই গাঢ় অন্ধকারের মুখোমুখি হতে হয় প্রতিদিন ; যদিও সে প্রজ্ঞা আর আলোকের অভিমুখী। জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, অভিজ্ঞতার সঙ্গে অধ্যয়ন মিতব্যয়ীর হাতে সংহত হতে হয়। তিনি বলেন : 'কবিতা লেখবার সময় বোঝা যায় হৃদয় কেমন মিতব্যয়ী কবির—প্রয়োজনীয় ছাড়া বাকি সব উপকরণ বাতিল করেছে।' (দশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ৮৭) কিন্তু অভিজ্ঞতা, শিক্ষা আর জ্ঞানে পরিপক্বতা অর্জন করলেই কি কবি হওয়া যায়? জীবনানন্দ দাশের মতে, অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা, শিক্ষার বিস্তৃতি ও জ্ঞানের প্রসারতা অনেক সময় কবিতাকে গবেষণা-অভিসন্দর্ভে রূপান্তরিত করে। 'কবিতার আলোচনা' প্রবন্ধে তিনি এ-ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলেছেন : '...চেতনা আরো সজাগ ও শিক্ষা আরো বেশি বেড়ে যাওয়ায় কোনো কবির কবিতা তার আগেকার কাব্যের চেয়ে তবুও যদি ভালো না হয় এমন কি খারাপ হতে থাকে তাহলে কবিতার নামে প্রায়ই দর্শন সন্দর্ভ (সমাজ রাষ্ট্র বিজ্ঞান সব কিছু সম্বন্ধে) পাওয়া যাবে তার কবিতার ভিতরে, বুঝতে পারা যাবে ক্রমেই অনুশীলনের ফলে ভালো করে শিক্ষিত হয়েছে বটে মন ও অভিজ্ঞতা, কিন্তু কবিস্বভাব দুর্বল হয়ে পড়েছে।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ১০৭)

এই যে 'কবিস্বভাব'—এই বিশেষ অনুভূতি অথবা অর্জনটিই ছিলো জীবনানন্দ দাশের বিবেচনায় একজন কবির কবিতা রচনার মৌলসম্পদ। 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে তিনি কবিতাকে চিহ্নিত করেছেন 'অবিস্মরণীয় বাণী' বলে। প্রকৃত কবি যিনি, যিনি হবেন এই 'অবিস্মরণীয় বাণী'র স্রষ্টা—তিনি হতে পারেন না 'কবিস্বভাব' বিবর্জিত। কিন্তু এই 'কবিস্বভাব' অবশ্যই পরিশীলিত ও মার্জিত হতে হবে কবির শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা। জীবনানন্দ দাশ 'কবিস্বভাবের' কথা বলেছেন ঠিকই ; একই সঙ্গে এ-ও বলেছেন যে, নিবারণ পণ্ডিত বা গোবিন্দ দাসের মতো তা যদি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মিশ্রণ থেকে থাকে দূরত্বে তবে সেই বিশেষ অনুভূতি নির্দিষ্টতা অতিক্রম করতে পারে না। নিবারণ পণ্ডিত বা গোবিন্দ দাসের ক্ষেত্রে যা ঘটেনি ; রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেখানে জ্ঞান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দূরে থাকেনি—ঐক্যসূত্র গেঁথেছিলো। এ-কারণেই রবীন্দ্রনাথ মহান কবি হতে পারলেন। কবিস্বভাব, শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পারম্পর্য সম্বন্ধে জীবনানন্দ দাশের বক্তব্য এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে : '...পৃথিবীর ও নিজের জীবনের ক্রমিক অভিজ্ঞতায়, কোন অভিজ্ঞতার কি মূল্য সেই চেতনায়, বিজ্ঞান কি দিতে পারছে, পারবে, জ্ঞান কি দিল—এই সব অন্তঃসারের ভিতর দার্শনিকের মতো অতটা সচেতন ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নয়—কান্ট-এর মতো বা মার্কস্-এর মতো নয়—কিন্তু তবুও সহজ কবিগুণকে তিনি (একজন মহৎ কবি ; জীবনানন্দ দাশ অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়েছেন।) সজাগ ও তপঃশক্তিশীলভাবে শিক্ষিত ও অনুভূতিঘন ও সুস্পষ্ট করে' তোলেন। (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ১০৮) কাব্যরচনায় এই 'অভিজ্ঞতা'র গুরুত্বের উল্লেখ আছে তাঁর 'কবিতা ও কঙ্কাবতী' 'মাত্রাচেতনা' ইত্যাদি প্রবন্ধেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের বিবেচনায় একজন কবির মধ্যে অবশ্যই 'কবিস্বভাবে'র লালন থাকতে হবে। একে তিনি 'প্রতিভা' হিসেবেও অভিহিত করেছেন। তবে যখন 'প্রতিভা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তখন বোঝানো হয়েছে কবির এক প্রত্যয়সিদ্ধতা—যেখানে আত্মবিশ্বাসের প্রগাঢ়তা গভীর। শেক্সপিয়রের রচনায় 'সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল কাব্যের সমুদ্রবীজনের গভীরে গভীরে মুক্তোর মতো, কিংবা কাব্যের আকাশের ওপরে আকাশে স্বাদিত, অনাস্বাদিত নক্ষত্রের মতো সব খুঁজে পাওয়া গেল যেন।'—কিন্তু ; জীবনানন্দ বলছেন—শেক্সপিয়রকে কোন আসরে বা রাজনীতির মঞ্চে বক্তৃতা দিতে দিলে এই সত্য হয়তো প্রকাশিত হতো না ; রবীন্দ্রনাথেও পাওয়া যেতো না সেই পরম সত্য, যদি তিনি হতেন কোনো প্রচারক অথবা অন্য কোনো কবির মধ্যেও। কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে আপন প্রতিভার উপর ; এই প্রতিভার সঙ্গেই প্রত্যয়সিদ্ধতার সংযুক্তি। কবি রাজনীতিক হতে চাইবেন না, হতে চাইবেন না দার্শনিক বা লোকশিক্ষক। তবে কী হবেন তিনি? জীবনানন্দের কথায়—তিনি হৃদয়ের উত্থান ঘটাবেন, হৃদয়ের জাগরণে আর সব তুচ্ছ হয়ে যাবে : '...তার নিজের প্রতিভার কাছে তাকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে শুধু কতিপয়ের হাতে তার কবিতার দান অর্পণ করে ; যে কতিপয় হয়তো ক্রমে-ক্রমে বেড়েও যেতে পারে—মানুষের হৃদয় তার পুরোনো আপোষ-অবলেপের ভিতর আর থাকতে পারছে না বলে।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ১৭) এই যে 'হৃদয়'-এর কথা বলা হলো, এই হৃদয়কেই জীবনানন্দ দাশ গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। এ-কারণেই কি-না, তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে আসে হৃদয়ের কথা :

> হে হৃদয়
> নিস্তব্ধতা?
> চারিদিকে মৃত সব অরণ্যেরা বুঝি?
> মাথার ওপরে চাঁদ
> চলছে কেবলি মেঘ কেটে পথ খুঁজে—
>
> (হে হৃদয় : বেলা অবেলা কালবেলা)

জীবনানন্দের হৃদয়-চর্চায় নৈরাশ্য আছে, উচ্ছাশাও অব্যক্ত নয়। কখনো আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে কবি স্তব্ধ ; তবু জীবনানন্দ উচ্চারণ করেন 'হৃদয়', 'হৃদয়'—বারবার—

১. আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখে ভয়—চমকের কথা সব পিছু ফেলে রেখে
তোমাকে কি চাই নাই ধরা দিতে?
(ক্যাম্পে : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

২. ... ... কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
(হায় চিল : বনলতা সেন)

৩. ক. জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হলো ;—
মর্গে কি হৃদয় জুড়ালো
(আট বছর আগের একদিন : মহাপৃথিবী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ; (ঐ)

৪. ক. ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
(আকাশলীনা : সাতটি তারার তিমির)

খ. সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস : (ঐ)

এ-ভাবে অসংখ্যবার জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় হৃদয়ের উল্লেখ করে ছুঁতে চেয়েছেন পাঠক-হৃদয়। তবে কি যেখানে এর উল্লেখ নেই তা পাঠকের হৃদয়-বনের গহীনে প্রবেশ করতে ব্যর্থ? তা নয়। একটি বারও উল্লেখ নেই 'হৃদয়' শব্দের, তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতায়। কিন্তু পাঠকের হৃদয়-রাজ্যে নাটোর স্বর্গপুরী, বনলতা সেন তার মানস-সুন্দরী। এ-প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কবিতা, বিশেষ করে তাঁর 'বনলতা সেন' সম্পর্কে কবি শামসুর রাহমানের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে : 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা চিরকাল পড়ার মতো, ঘুরে ফিরে পড়ে পড়ে নিজের মধ্যে ধারণ করার মতো সম্পদ। তাঁর বহু কবিতা আমার প্রিয়। একটির কথা উল্লেখ করলে বাকিগুলোর প্রতি অবিচার করা হবে। তবু শেষ পর্যন্ত যদি জীবনানন্দের একটি কবিতাকেই প্রিয় বলে বেছে নিতে হয়, তাহলে আমি বনলতা সেনকেই পছন্দ করব। এই কবিতার প্রথম পঙ্ক্তি থেকে শেষ পঙ্ক্তি পর্যন্ত যে ব্যঞ্জনা রয়েছে তার আবেদন কখনও ফিকে হওয়ার সম্ভাবনা নেই।' (রাহমান : ভোরের কাগজ)—এই যে, 'আবেদন'-এর কথা বলা হলো—এই আবেদন নিশ্চয়ই কোথাও, কোন কিছুর কাছে!—এবং সেটাই হলো 'হৃদয়'।

জীবনানন্দ দাশ এ-কারণেই সবাইকে কবি বলেননি। কবি কে—এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার : 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি ; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ৭) জীবনানন্দ দাশ তাঁর এ সিদ্ধান্তে এতোটাই আস্থাবান ছিলেন যে, একই প্রবন্ধে (কবিতার কথা) তিনি এর পুনরুক্তি করেছেন উদ্ধৃতিচিহ্নে (পৃ. ১০)। একজন কবি কখনোই স্থাণু নন চিন্তায়। তিনি অস্তিত্ববান একটি সময়ে ঠিকই, কিন্তু অতিক্রান্তকাল ও ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তাঁর ঋদ্ধিপ্রাপ্তি জরুরি। ত্রিকালব্যাপী কবির চিন্তা, স্বকালে অর্জিত তাঁর অভিজ্ঞতা আর হৃদয়-প্রসূত কল্পনার অভিব্যক্তিতে উদ্বেলিত হবে একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। কিন্তু এর যে-কোন একটি যদি মারাত্মকভাবে চড়াও হয় কবি মনে তাহলে কবির হাতে হয়তো প্রকৃত কবিতা সৃষ্টি হবে না। শুধু আবেগ বা কবি-কল্পনা দিয়ে যেমন কবিতা হয় না, তেমনি কাব্য-ক্রিয়ায় এর আধিক্য ঘটলেও কবিতা ঋজুতা হারায়। কবিতায় যদি প্রাধান্য পায় সমাজ বা লোকশিক্ষার বার্তা—এ-রকম চিন্তাক্রান্ত মুহূর্তকে জীবনানন্দ দাশ বলছেন : '...সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানা রকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সব চেয়ে আগে এবং সব চেয়ে বেশি করে ... '। (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ৮) তাই বলে জীবনানন্দ দাশ কবিকে সময় ও সমাজনির্লিপ্ত ভাববিলাসী মনুষ্যপ্রজাতিতে আলাদা করার কথা বলেননি। শুধু কাল সচেতনতাই নয়, কবিকে সামাজিক পালাবদলগুলোকেও বুঝতে হবে নিজের মতো করে। জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে একটি আপ্ত-বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, তিনি নির্লিপ্ত কবি, তিনি বাস্তববিমুখতায় 'ধ্যানী। বোধ করি, বুদ্ধদেব বসুর সিদ্ধান্ত—'তিনি [জীবনানন্দ দাশ] আমাদের নির্জনতম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি' (বসু : ১৯৮৪ ; পৃ. ৩৮)—এবং পরবর্তীকালে গবেষক দীপ্তি ত্রিপাঠীর মন্তব্য—'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ' (ত্রিপাঠী : ১৯৭৪ ;পৃ. ১৩৮)—এই সিদ্ধান্ত-মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই সাধারণ্যে জীবনানন্দ দাশের ওই ধরনের একটি ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে। অথচ, কবি মোটেও বিভ্রান্ত ছিলেন না, তাঁর যুগটাও ছিলো না বিমূঢ়। যে-সময় ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে বললে, বাংলায় রাজনীতি-সমাজনীতিতে ঘটছে ইতিবাচক পালাবদল ; সাহিত্য-শিল্পে ঘটছে আধুনিকতায় উত্তরণ—সে যুগকে কোনোভাবেই কর্তব্যজ্ঞানহীনতা, মূর্খতা বা অজ্ঞানতায় পূর্ণ মনে করে 'বিমূঢ়' বলা যায় না। জীবনানন্দ দাশ ব্যক্তি বা কবি হিসেবেও বিভ্রান্ত ছিলেন বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ নেই। বুদ্ধদেব বসু কথিত 'নির্জন'-প্রিয়তা জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অনেকটা সত্য হলেও তাঁর কাব্য-জীবনের ক্ষেত্রে ঠিক সেভাবে কথাটি খাটে না। জীবনানন্দ দাশ বলেছেন : 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ৩৩) অন্যত্র তিনি বলেছেন : 'যে সময়ে সে [কবি] বাস করেছে, এবং যে সময়ে বাস করেনি, যে সমাজে সে কাল কাটাচ্ছে এবং যেখানে কাটায়নি, যে ঐতিহ্যে সে আছে, এবং যেখানে সে নেই—এই সকলের কাছেই সে ঋণী।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ৩৩) অতএব, ধারণা করা যেতে পারে, যে-কবি অন্য কবির কাল, সমাজ ও পারিপার্শ্ব চেতনা সম্পর্কে বক্তব্য উত্থাপন করেন, তিনি নিজে এ-সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন। কেননা, তিনি ইতঃপূর্বে স্পষ্টভাবে বলেছেন : '...সমাজ ও ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতা দোষে দুষ্ট হলেও কবিতা ও সাহিত্য তার ভিতরে লালিত হয়েও যদি তাকে প্রয়োগপ্রতিভার শেষ বৈচিত্র্যের কোনো-না-কোনো একরকম সঞ্চার, ইঙ্গিতের দিব্যতা, না দিতে পারে তাহলে তা শ্লেষ বা ধ্বংস বা গঠনাত্মক গুরুতর প্রবন্ধ বা প্রচারপত্র হতে পারে, কিন্তু তাকে কাব্যসৃষ্টি বলা যেতে পারে না।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ২৭) জীবনানন্দ দাশ জানতেন, একজন কবি কিভাবে প্রকাশ করবেন তাঁর সময় ও সমাজকে। নিশ্চিতভাবে প্রায় একই সময় লিখছিলেন বিষ্ণু দে, অল্প পরে প্রেমেন্দ্র মিত্র ;—সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সুকান্ত ভট্টাচার্যও লেখা শুরু করেছেন। বিশ্বসাহিত্যেও পল এলুয়ার, লুই আরগঁ, পাবলো নেরুদা, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রমুখ বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছেন।—এই নিরিখে বিচার করতে গেলে জীবনানন্দ দাশ হয়তো নির্জনতার কবি—বুদ্ধদেব বসু যেভাবে বলেছেন। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের উক্তি : 'দার্জিলিং-এ জনতা আছে, মানুষ নেই।' বলতে হয়—জীবনানন্দে হয়তো জনতা নেই সেভাবে (নির্জনতা আছে), কিন্তু মানুষ আছে। তাঁর মানুষ শুধুই রক্ত-মাংসের নয়—বস্তুতে তিনি কল্পনা করেছেন মানুষকে, অনুভবে তিনি তুলে এনেছেন মানুষের রূপ। ইংরেজিতে যাকে 'পার্সনিফিকেশন' বলে, তার যথাযথ উপস্থাপনা দেখা যায় জীবনানন্দের কবিতায় :

> শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
> অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে ;
> (অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এখানে 'ভোরের রোদ' শুধুই সূর্যের রশ্মির মধ্যে সীমিত নেই—জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে 'হেমন্ত রাতে' কবিতায় অগণিত নক্ষত্র মানুষের মতো জেগে ওঠে আমাদের সম্মুখে, আমাদের চেতনায়—

> এমনই অঘ্রাণ রাতে মনে পড়ে—কত সব ধূসর বাড়ির
> আমলকীপল্লবের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রের ভিড়
> পৃথিবীর তীরে-তীরে ধূসরিম মহিলার নিকটে সন্নত
> দাঁড়ায়ে রয়েছে কত মানবের বাষ্পাকুল প্রতীকের মতো—
> (হেমন্ত রাতে : বেলা অবেলা কালবেলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসংখ্য উদাহরণ মিলবে এ-রকম ; সীমাহীনভাবে করা যাবে উল্লেখ। একে 'নির্জনতা' ঠিক সেভাবে বলা যাবে না। কেননা, মানুষ যেখানে উঠে আসে সৃষ্টি ও শিল্পে তা নিঃস্পন্দ নয়—নির্জনও নয় ; যদিও প্রকৃতির প্রতিমার পরিমণ্ডলে এর লালন। জীবনানন্দ দাশ কবিদের ইতিহাস, সমাজ ও সময়সচেতন হবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তিনি নিজেও তাঁর কাব্যরচনায় এ-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অবশ্য তাঁর সচেতনতা এবং এর প্রকাশ প্রখরতায় মূর্ত নয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালকে'ই (১৯২৭) তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের কৃতি ও কীর্তিকে কবিতায় ('দেশবন্ধু') তুলে এনেছেন। 'হিন্দু মুসলমান' কবিতায়—ওই উত্তাল সময়ে এই প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বের মধ্যেও—জীবনানন্দ দাশ উচ্চারণ করেছেন ঐক্যের মহামন্ত্র :

> কাফের' 'যবন' টুটিয়া গিয়াছে—ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা,
> মোসলেম বিনা ভারত বিকল,—বিফল হিন্দু বিনা ;
> —মহামৈত্রীর গান
> বাজিছে আকাশে নব ভারতের গরিমায় গরীয়ান।
> (হিন্দু মুসলমান : ঝরাপালক)

তাঁর কবিতায় বাংলার মুখ দেখার কথা আছে ; পৃথিবীর আর কোন রূপ তিনি দেখতে চান না ঠিকই—কিন্তু 'রূপসী বাংলা'য় বাংলার যে রূপ তাতে ক্ষুধিত বাংলার চিত্রটিও উঠে এসেছে। বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব, অমানবিকতা জীবনানন্দ তুলে এনেছেন কবিতায়। তবে একটু অন্যভাবে। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের 'রাত্রির কোরাস' কবিতায় কবি যন্ত্র সভ্যতার বীভৎসতা
'ক্লান্ত সাঁকো'র মতো করে রূপায়িত করেছেন। যুদ্ধের উন্মাদনায় সারা পৃথিবীই যেন তাঁর কাছে অন্যরকম :

> পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ ;
> পূব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা ;
> আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা ;
> ইয়াঙ্কির লেন-দেন ডলারে প্রত্যয় ;—
> এই সব মৃত হাত তবে
> নব নব ইতিহাস—উন্মেষের না কি ?
> (রাত্রির কোরাস : সাতটি তারার তিমির)

সময়ের বাস্তবতা কবিতায় ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে জীবনানন্দ এখানে যে খুব-একটা প্রত্যক্ষ, তেমন বলা যাবে না। অন্যত্র এর চেয়েও অন্যরকম—অনেকটা অপ্রত্যক্ষভাবে জীবনানন্দ কবিতায় রূপ দিয়েছেন বাস্তবতাকে। এ-কারণে তাঁকে হয়তো বাস্তববিমুখ, পলায়নপর, নির্জনতার কবি বলে থাকেন অনেকে। কিন্তু জীবনানন্দের যেহেতু একটা সুনির্দিষ্ট কাব্যচিন্তা ছিলো—সেহেতু তিনি জানতেন সময়, সমাজ ও কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি কতটুকু ও কিভাবে পড়বে তাঁর কবিতায়। রণেশ দাশগুপ্ত এ-প্রসঙ্গে বলেছেন : 'কিন্তু এখানে আসল কথাটা এই যে, বাস্তবকে খুব বেশি গ্রহণ করেছেন বলেই জীবনানন্দ দাশ তাকে ঢাকবারও তাগিদ অনুভব করেছেন এত বেশি।' (দাশগুপ্ত : ১৩৯২ ; পৃ. ২৩-৪) প্রকৃতপক্ষে, নিরেট বাস্তবতার জমি চষেই জীবনানন্দের উত্থান, তবে সেটা একান্ত তাঁর মতো। কেননা, তিনি জানতেন : 'প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়—এমন একটা অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁর কবিতায়ই সম্ভব—অন্য কারু কবিতায় নয়।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ২০)

কবিতায় বিষয় ও শব্দনির্বাচন নিয়ে রবীন্দ্র-সমকালেই বেশ একটা তর্ক উঠেছিলো। 'কুক্কুট' কাব্যবিষয় হতে পারে কি-না এ-নিয়েও আলোচনা হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেন 'কাঁঠালের ভুতি', 'মাছের কান্‌কা'র মতো শব্দ। জীবনানন্দ দাশ কবিতা রচনায় বিষয়ের ছুঁৎমার্গে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর কাব্য-শিরোনামেই বোঝা যায়—'পেঁচা' বা 'ঘাস' অথবা 'ঘোড়া' কিংবা 'হাঁস'কে তিনি তুলে এনেছেন কবিতায়। সমকালে এ-কারণে যতো না নন্দিত ছিলেন, নিন্দিত বা সমালোচিত হয়েছিলেন এর চেয়ে ঢের বেশি। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় সজনীকান্ত দাস জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতায় অশ্লীলতা আবিষ্কার করেন। 'আকাশলীনা' কবিতা সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে লিখেন : 'প্রেয়সীকে এতকাল আমরা হৃদয়ে লইতাম—ভালোবাসিতাম। এইবার প্রেয়সীর হৃদয়ে চরিবার দিন আসিল। একসঙ্গে দেহের আহার ও মনের ওষুধ—এ সম্ভাবনার কথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল?' (চৌধুরী : ১৯৯৫ ; পৃ. ২০৫) এতদ্‌সত্ত্বেও জীবনানন্দ দাশ নিজস্ব কাব্যচিন্তনের বাইরে যাননি। সুন্দরী গাছ যেমন কবিতায় আসতে পারে, তেমনি হাঙ্গরের দাঁতও কাব্যরাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়, তাঁর বিবেচনায়। তবে তার প্রকাশটা হতে হবে কাব্যিক—যা সাধারণত মূর্ত হবে সম্মোহন সৃষ্টিকারী ভাষার কারুকার্যে। জীবনানন্দ লিখেছেন : 'কবিতা অভিজ্ঞতাজনিত। কবরী, এমনকি চুলের ওপর অনেক কবিতা লেখা হয়েছে। আমি মনে করি যে কোনো অধ্যাপকের টাকের ওপর কবিতা লেখা চলে যা কাব্যের ইতিহাসে ক্লাসিক হয়ে থাকতে পারে। অতএব প্রকৃত বিচিত্র কবির অন্তর রসায়ন ও তাকে মূর্ত করবার মত আশ্চর্য ভাষাসমূহের ওপর অধিকার কবিতা সৃষ্টি করে।' (চৌধুরী : ১৯৯৫ ; পৃ. ১২৩) কিন্তু তাই বলে কবি কি কোনো মতবাদের দাসত্ব করে কবিতায় সে তত্ত্ব প্রয়োগ ও প্রচার করবেন? এ ব্যাপারে নানা প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশের বক্তব্য প্রকাশিত। 'কবিতাপাঠ', 'সত্য বিশ্বাস ও কবিতা', 'কবিতা ও কঙ্কাবতী', 'Bengali Poetry Today' ইত্যাদি প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ বলেছেন যে, তত্ত্ব স্রষ্টার মধ্যে ভূতের মতো তাড়া করে, তাকে ক্রীতদাস করে ফেলে। কবিকে কবিই থাকতে হবে—সমাজসংস্কারক হলে চলবে না। তাই কাব্য বিষয়ে সমাজ সংস্কারের প্রবণতা ভর করলে তাতে না হবে কবিতা, না হবে সমাজসংস্কার। তিনি এ-কারণে 'বিপ্লবমাতৃক' সোভিয়েত সাহিত্য স্রষ্টাদের 'সুসাহিত্যিক' বললেও তাঁদের রচিত সাহিত্যকে 'বৃহৎ, মহান সাহিত্য' বলে আখ্যায়িত করেননি। 'Bengali Poetry Today' প্রবন্ধে জীবনানন্দ লিখেছেন : 'All that the Poet can do is to explore a creed, and to be enlighted by it if that is possible, but never to allow it to turn into mere philosophical arguments. His poems, which are to satisfy certain well known demands, which a creed, a scientific creed too, if permitted to usurp, can only injure.' (চৌধুরী : ১৯৯৫ ; পৃ. ১১৭) কবিতায় মতবাদের এই জবরদস্তিপনাকে বিষ্ণু দে-ও মেনে নেন নি। 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : '...রাজনৈতিক মতবাদের কুম্ভীরক বৃত্তিতে যে মুক্তি নেই, সেটা আবার স্মরণ করি। দার্শনিক চয়নিকা প্রয়োগে বামপন্থীর মনোবিকার যে ঘটে, তার প্রমাণ অডেন্‌-স্পেন্ডর-লুইসের দল।' (দে : ১৩৫৯ ; পৃ. ১১) বিষ্ণু দে'র এই বক্তব্যের সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের চিন্তার ঐক্য লক্ষ করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনানন্দ ভেবেছেন এর উপস্থাপনা নিয়ে ; বিশেষ করে কবিতার ভাষা, ছন্দ কিংবা লয়ের মাত্রাফের বিষয়ে। কবি কি আগেই সংকল্প করে নিয়ে কবিতা রচনা করতে প্রবৃত্ত হবেন যে, তাঁর কাব্য বিশেষ কারো মুখের ভাষায় অথবা বিশেষ কোন শ্রেণীর ভাষাতে হবে? জীবনানন্দ দাশ এ ধরনের সংকল্পের বিরোধী ছিলেন। কবিতার অর্থ জনসাধারণ যাতে সহজেই বুঝতে পারে এ কারণে সর্বজনবোধ্য মুখের ভাষায় কাব্যরচনা করতে হবে—এ প্রত্যয় জীবনানন্দের ছিলো না। কবিতা অবশ্যই 'মুখের ভাষাতে'ই রচিত হবে—কিন্তু তাতে থাকতে হবে বিশেষ বাগ্‌রীতি ও অর্থ এবং 'অপরকে দেখবার বা জানাবার আগে নিজের ব্যক্তিপুরুষকে চরিতার্থ করে নেবার' কার্যকারিতা। জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠ করলে তাঁর এই ভাষাচিন্তার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কয়েকটি কবিতা থেকে এ-পাঠ গ্রহণ করা যাক :

১. কে আমায় ব্যথা দেছে,—কে বা ভালোবাসে,—
সব ভুলে—শুধু মোর দেহের তালাসে
(পিপাসার গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

২. হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
(বনলতা সেন : বনলতা সেন)

৩. কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে!
(আকাশলীনা : সাতটি তারার তিমির)

উপরের উদ্ধৃতিতে 'দেছে', 'হাঁটিতেছি' এবং একই পঙ্‌ক্তিতে 'তাহার' ও 'তার' ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে। কিন্তু প্রণয়ীর দেয়া ব্যথার রূপতো দীর্ঘ হতে পারে না—আরও, যে পরক্ষণেই ভালোবাসে, সব ভুলে যায়। এই ব্যথার লঘুতা ও স্বল্পস্থায়িত্ব বুঝাতে ক্রিয়ারূপও অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হয়ে 'দেছে' কথ্যরূপ নিয়েছে। কিন্তু বনলতা সেনের পুরো কাব্যপরিমণ্ডল চলিতরীতিতে রচিত হলেও 'হাঁটিতেছি' ক্রিয়াপদ সাধুরীতিতে ব্যবহৃত। কারণ এ হাঁটা তো দীর্ঘ—হাজার বছর ধরে। 'আকাশলীনা' কবিতায় অপরিচিত যুবক যখন সুরঞ্জনার কাছে কথা বলার পাত্র হয়ে ওঠে তখন সর্বনাম পদটিও দূরত্ব সংকুচিত করে। শব্দ ব্যবহারের সচেতনতায় ভাষাকে জীবনানন্দ নতুন মাত্রা দিয়েছেন ঠিকই ; একই সঙ্গে বাক্যের বিচিত্র ব্যবহারও অর্থাভাষের নতুনত্ব প্রকাশ করে। যেমন : বোধ কবিতায় মানুষের সেই কাল্পনিক ত্রিকাল বোঝাতে জীবনানন্দ দাশ একটি বাক্যকে তিনবার ব্যবহার করেছেন এর একটি মাত্র শব্দ পরিবর্তন করে :

কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!
(বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এ-ধরনের বাক্য-ব্যঞ্জনা এ কবিতাতেই আছে, আরও। জীবনানন্দ দাশ কাব্যভাষার পাশাপাশি কাব্যছন্দ-বিষয়েও নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। 'কবিতার আত্মা ও শরীর' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, মিল্টন, শেক্সপিয়র এমন কি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুসৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছন্দচর্চায় আধুনিক কবিরা গলদঘর্ম হচ্ছেন—যদিও সেই উদ্দীপনায় 'আধুনিক কাব্যছন্দের পরিপূর্ণ সফলতা সম্ভব নয়'। স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দের অপূর্ব প্রাণশক্তির উপর তিনি আস্থাবান ছিলেন এবং এ-কারণে বলেছেন : '...স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দে যে বহু পরীক্ষা সম্ভব হয়, উত্তীর্ণ হওয়া যায় ঢের উত্তরণলোকে, আধুনিক বাঙালি কবির সেদিকে ততটা মন নেই।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ৫১) কিন্তু তিনি নিজেও যে এ-ব্যাপারে খুব-একটা বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী ছিলেন তেমন বলা যাবে না ; এই উদাহরণ সামান্যই। 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থে এর পরিচয় পাওয়া হয়তো যাবে কিছু, কিন্তু ক্রমেই তা ক্ষীণ হয়ে এসেছে ;—'বনের চাতক—মনের চাতক', 'চলছি উধাও' ইত্যাদি কবিতাকে মনে রেখেই এ-কথা বলা চলে। তবে পয়ারের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারকে তিনি সমর্থন করেছেন, মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দকেও পক্ষপাত দেখাননি, তেমন নয়। কবিতায় ছন্দ ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর কোন বিশেষ-নির্বাচন ছিলো না। এ-প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য : 'কবি যখন ভাবাক্রান্ত হন তখন চোখ তাঁর ছবি দেখে, কান শোনে ছন্দ এবং চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিদ্যুৎ ; কোন ছন্দে কবিতাটি রচিত হবে মুহূর্তের ভিতরেই নির্ণীত হয়ে যায় অনেক সময় ; কারণ যে কোনো আবেগ যে কোনো ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না, কবিপ্রেরণার তারতম্য অনুসারে ছন্দের জাতি-নির্ণয় হয়।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ. ৪৭) প্রকৃতপক্ষে কবিতার প্রকৃতি প্রবাহিত হবে প্রার্থিত ছন্দে—কবিতার ছন্দ কোন পূর্ব-পরিকল্পিত বস্তু নয় ; জীবনানন্দ দাশের বক্তব্য এ-ই।

সবাই যেমন কবি নয়, তেমনি কবিতাও সবার জন্যে নয়—বলেছেন জীবনানন্দ দাশ। তিনি কবিতার পাঠককে নির্দিষ্ট করেছেন। যদি শিল্প হয় কবিতা, তবে তো ন্যূনতম শিল্পবোদ্ধা হতে হবে এর অনুরাগীকে। ইতঃপূর্বে ভাষা প্রশ্নে তিনি কবিতাকে সর্বজনবোধ্য করার প্রয়াস হিসেবে যেমন-তেমন মুখের ভাষা ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। জীবনানন্দ দাশের বিবেচনায় কবিতাকে আগে কবিতা হয়ে উঠতে হবে, তারপর আর কিছু। কবিতা-শিল্পের অনুরাগী পাঠককেও তাই এই শিল্প মাধ্যমের মৌলসূত্রগুলো আগে করতে হবে আত্মস্থ। একেই জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, পাঠকের হৃদয়ের 'নতুন দিগ্‌বলয়'। পাঠক যদি নিজের মনকে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা পাঠের জন্যে প্রস্তুত না করেন তাহলে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্পসফল শ্রেষ্ঠ কবিতাও তার কাছে আবেদনহীন ঠেকবে। 'কবিতার সংক্রমণ' প্রবন্ধে গালিব আহসান খান দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, মানব জীবনের বাঁক ফেরা কবিতাকে কিভাবে পরিবর্তিত করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, জীবন এবং কবিতা সমান্তরাল বলে আগামীতে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবন যেহেতু উন্নততর হবে, সেহেতু কবিতার উন্নততর প্রকাশ ঘটবে। তাঁর ভাষায় : 'কবিতার পরিমাণগত দিক কমে যাবে, কিন্তু গুণগত মান বেড়ে যাবে।' (খান : দৈনিক প্রথম আলো) এই উন্নততর কবিতা বা কাব্যের গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে পাঠকমনকেও খাপ খাইয়ে নিতে হবে, নতুন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায়। যারা তা পারবেন না বা করতে ব্যর্থ হবেন—তাদের কাছে কবিতা আবেদনহীন মনে হতে পারে। এ-কারণে জীবনানন্দ দাশ বলেছেন : 'কবিতা সকলের জন্যে নয়, এবং যে পর্যন্ত জনসাধারণের হৃদয় নতুন দিগ্‌বলয় অধিকার না করবে সে পর্যন্ত কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর 'কবি'র স্থূল উদ্বোধন ছাড়া বাজারে ও বন্দরে—এবং মানব-সমাজ ও সভ্যতার সমগ্রতার ভিতর কোনো প্রথম শ্রেণীর কাব্যের প্রবেশের পথ থাকবে না ; এমন কি তা বিলাস, কল্পনাবিলাস পর্যন্ত বলে আখ্যাত হয় এবং হবে এই সব স্থূল উদগাতাদের কাছে— ... ...।' (দাশ : ১৩৯৭ : প. ১৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'সমারূঢ়' কবিতায় সমালোচকদের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করেছেন। যারা শুধু সমালোচনার জন্যে সমালোচনা করেন, তাদের উদ্দেশে ব্যক্ত সেই কবি-প্রতিক্রিয়া। বোঝা যায়, এই সমালোচক—প্রাথমিকভাবে, কাব্য-সমালোচক। জীবনানন্দ দাশ মনে করতেন, সবাই কবি নন-কবিতাও উন্মুক্তভাবে সবার জন্যে নয়—কাব্য-আলোচকও সবাই হতে পারেন না। তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, যাদের মন পাণ্ডিত্যে শুষ্ক হয়ে গেছে, যারা বুদ্ধি দিয়ে সব বিচার করেন তারা কবিতার সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। এ কারণে 'সমারূঢ়' কবিতার সমালোচক অধ্যাপকটি কবির 'ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক' প্রত্যাশা উপলব্ধি করতে পারেননি। জীবনানন্দের 'কবিতার আলোচনা' নামক একটি প্রবন্ধ আছে। সেখানে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, কবিদেরই কাব্য-আলোচনায় এগিয়ে আসা উচিত। তিনি বলেছেন : 'কিন্তু তবুও অনুভব করছি কবিতার স্পষ্ট, কুশল, যথাসম্ভব নির্ভরে চিন্তনীয় আলোচনা সেই যুগের কবিদেরই করা উচিত। যাদের মন কবিতা সৃষ্টির জন্যে তৈরি নয় কাব্য-আলোচনায় তারা পরিচ্ছন্নতা, পাণ্ডিত্য, ভালো অন্তঃপ্রবেশ দেখাতে পারলেও কবিতা সম্বন্ধে তাদের বোধ, আমার ভয় হচ্ছে, শেষ গভীরতা লাভ করতে গিয়ে প্রায়ই ব্যর্থ হয়, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ ১০৪) প্রকৃত প্রস্তাবে, কবির হাতে কাব্য-আলোচনা যে দিকসঞ্চারী হয়ে ওঠে—যিনি কবি নন, অন্তত যার মধ্যে কাব্যবোধ শূন্য তিনি ওই অনুদ্‌ঘাটিত সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। টি.এস. এলিয়টের আলোচনা ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকদের রচনাকে বুঝতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে ব্যাখ্যা মেলে ; কিংবা তাঁর সমকাল বা উত্তরকালীন কবিদের কাব্য সম্পর্কে যে রবীন্দ্র-ভাষ্য—তা নির্দ্বিধায়, যে-কোন পুথিকেন্দ্রিক পণ্ডিতের তুলনায় ভিন্নমাত্রা ও মূল্য দাবি করে। বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-আলোচনা অথবা আধুনিক কবিদের কাব্যালোচনার ফলে কবিতার অন্তর্গূঢ় যে সত্য প্রতিভাসিত হয়েছে যে-কোন কেতাবী সমালোচকের পক্ষেই হয়তো এই উদ্‌ঘাটন অসম্ভব ছিলো। জীবনানন্দ দাশ এ-কারণেই বলেছেন, কবিদেরই উচিত কবিতার আলোচনায় এগিয়ে আসা। কেননা, অভিজ্ঞতা, অর্জন ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে কবিরা যে জ্ঞান লাভ করেন তার নিরিখে বিচার হবে কবিতা—পাণ্ডিত্যের যূপকাষ্ঠে নয়। তাঁর বক্তব্য এ-প্রসঙ্গে : 'কিন্তু তবুও কবিতা সম্বন্ধে বড়, সত্যার্থী আলোচনা কবিদেরই করা উচিত—সৎ কবিদেরই নিজেদের অনুভূতি ও চিন্তার কবিতাত্মক প্রয়োগ থেকে তাদের খুলে নিয়ে অন্য প্রয়োগে—কবিতা সম্পর্কে আলোচনায়—মাঝে মাঝে নিয়োজিত করা দরকার। কোনো ভালো কবির কোনো একটি কবিতার বই কিংবা এদেশের আধুনিক কালের কবিতা অথবা এমনি মোটামুটি কাব্য সম্বন্ধে বড় কবিরা যদি সময় করে স্থিত, শুদ্ধ হয়ে, দল ও বন্ধুত্বের ব্যাস থেকে মুক্ত, যথাসম্ভব স্বচ্ছ ও ধ্যানসাধ্য প্রবন্ধ লেখেন তাহলে সেসব লেখায় আশা করা যায় পাণ্ডিত্যের চেয়ে জ্ঞান বেশি থাকবে। পাণ্ডিত্য অর্ধসত্য ঢের, জ্ঞান সত্যের বেশি নিকটে ; পাণ্ডিত্যের চেয়ে জ্ঞান পরিচ্ছন্ন। লাভ হবে কবিদের, কবিতার পাঠকদেরও।' (দাশ : ১৩৯৭ ; পৃ ১১২) কিন্তু বলতে হয়, জীবনানন্দ দাশ, এতদ্‌সত্ত্বেও নিজে খুব বেশি কবিতা-আলোচনা করেননি। নিজের দু-একটি কবিতার ব্যাখ্যা এবং দেশী-বিদেশী কয়েকটি কাব্যালোচনা ব্যতীত তাঁর কাব্যসমালোচনা তুলনায় নগণ্য। এর চেয়ে বরং কবিতার সংগঠন ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় তাঁর অধিক মনোযোগ লক্ষ করা যায়।

জীবনানন্দ দাশ এক সংবেদনশীল উষ্ণকবিপ্রাণ। এই উষ্ণতা কবির জন্যে, কবিতা পাঠকের জন্যে, কাব্য-সমালোচকের জন্যে। অনুভবের আওতামুক্ত নয় এই উষ্ণতা—জীবনানন্দ দাশের কবিতাও নিশ্চিত এই আধারে আবিষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলপাইহাটি : শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব

সৈয়দ আজিজুল হক

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) তাঁর জীবদ্দশায় নিজের উপন্যাসগুলি যে প্রকাশ করেননি সেটা স্পষ্টই এক দ্বিধার ফল। ইওরোপীয় ঔপন্যাসিকদের বিশ্বমানের উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে তিনি বাংলা উপন্যাসের সীমাবদ্ধতাগুলিকে অনুধাবন করেছিলেন। এই সীমাবদ্ধতার কথা তিনি Bengali Novel Today, The Novel in Bengal, The Future of the Novel প্রভৃতি প্রবন্ধে বিশ্লেষণও করেছেন। তাঁর সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষত তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রতি তাঁর পর্যবেক্ষণ-মূলক দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, বিশেষত 'গোরা' সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল খুবই উঁচু। জীবনানন্দ দাশ মনে করতেন, একটি মহৎ উপন্যাসের জন্য ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতার সারাৎসারই মুখ্য বিষয় নয়। তার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে তার আয়ত জীবনদৃষ্টি, সুগভীর জীবনদর্শন ও প্রগাঢ় বোধশক্তি। আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ যে সচেতন ছিলেন তা তাঁর উপন্যাস পাঠেই স্পষ্ট হয়। তবে যে-সীমাবদ্ধতা বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভূত হয়েছিল তা তিনি নিজে উপন্যাস লিখে কতটুকু দূর করতে সক্ষম হলেন, এ নিয়ে তাঁর মনে হয়তো স্বাভাবিকভাবেই অনিশ্চয়তা ছিল।

জীবনানন্দ দাশ দুই পর্বে (১৯৩২-৩৩ ও ১৯৪৮) তাঁর উপন্যাসগুলি লিখেছেন। এই উভয় পর্বেই তিনি বেকারত্বের জ্বালায় দগ্ধ ছিলেন। তবে পার্থক্য হলো, প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন বরিশালে, নিজ পিতৃগৃহে বা জন্মভূমিতে, যেখানে তাঁর বাল্য ও কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়েছে। মাত্র ৩/৪ বছরের দাম্পত্যজীবন তখন। বয়স তেত্রিশ/চৌত্রিশ। অন্যদিকে দ্বিতীয় পর্বে তিনি ছিলেন কলকাতায়, বরিশালের মতো মফস্বল শহরের তুলনায় তা এক মহানগরী। এই মহানগরীতে তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও চাকরিসূত্রে যুবাবয়সে এগার বছর (১৯১৭-২৮) বসবাস করলেও এটি তাঁর একান্ত নিজের শহর নয়। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ এক পরিবারের প্রধান তিনি তখন। বয়স উনপঞ্চাশ বছর। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেও ঘটে গেছে এক বড়ো পরিবর্তন। ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তির পাশাপাশি এ উপমহাদেশে জন্ম নিয়েছে দুটি রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। ভাগ হয়েছে বাংলা। স্বেচ্ছাকৃত হলেও তিনি জন্মভূমি থেকে উন্মূলিত। উপন্যাস কবিতার মতো একান্ত আবেগী জগৎ নয়। উপন্যাস-লেখকের কল্পনা সবসময় বাস্তবতার মাটি ঘেঁষে অগ্রসর হয়। সুতরাং উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তিজীবন ও সমকালের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের ছায়া স্পষ্ট হতে বাধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

আমরা 'জলপাইহাটি' উপন্যাসটি পাঠ করলে একথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারব। ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল থেকে ৯মে পর্যন্ত মাত্র একমাসে এই সুবৃহৎ উপন্যাসটি রচিত। এর মাত্র এক বছর আগে তিনি কলকাতায় যান। এবং ১৯৪৭-এর জুনে বিএম কলেজের অধ্যাপনা থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৪৭-এর আগস্টে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিশীথ সেন পূর্ববঙ্গের একটি কল্পিত শহর জলপাইহাটির একটি বেসরকারি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। বয়স আটচল্লিশ/উনপঞ্চাশ বছর। জীবনানন্দ দাশও বিএম কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। জীবনানন্দ দাশের মতো নিশীথ সেন তার নাম থেকে 'গুপ্ত' অংশ বাদ দিয়েছেন। এসব ব্যক্তিগত মিল ছাড়াও উপন্যাসের কাহিনীতে সমসময়ের ছাপ স্পষ্ট। ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। জলপাইহাটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত আর কোলকাতা ভারতের। রাজনৈতিক আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপস্থিত। দেশবিভাগের পরও বহুদিন দু'দেশের মধ্যে যাতায়াতে পাসপোর্টের প্রয়োজন ছিল না ; নিশীথের কলকাতা গমনে তাও পরিষ্কার। এর কিছুদিন আগে কলকাতায় ঘটে গেছে ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো এক অসহনীয় অমানবিক ঘটনাযজ্ঞ। জীবনানন্দ দাশ এই দাঙ্গার সময় কলকাতায় ছিলেন। উপন্যাসে বারবার এই দাঙ্গা প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। নিশীথ সেনের পুত্র হারীত ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে (মূলত কংগ্রেস পরিচালিত ভারতব্যাপী স্বাধীনতার এক দুর্বার আন্দোলন) সক্রিয় ছিল। স্বাধীনতার পরে সে কংগ্রেস ত্যাগ করে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুক্তির কথা ভাবে। এ উপন্যাসে দেশবিভাগ কিংবা পাকিস্তান নামক একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের জন্য কোনো মনঃবিক্ষোভের চিত্র পরিস্ফুটিত হয়নি। দেশবিভাগ নিয়ে কথা আছে, কিন্তু এ নিয়ে বা পাকিস্তানের প্রতি কোনো বিরূপতা নেই। এটা বিস্ময়কর। কেননা দেশবিভাগের কারণেই জীবনানন্দ দাশকে জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়। একই সূত্রে চাকরি ত্যাগ ও বেকারত্বের ঘটনাও ঘটে। অথচ উপন্যাসে এ নিয়ে ব্যক্ত হয়নি কোনো অসন্তোষ। এক্ষেত্রে লেখক শৈল্পিক নিরাসক্তি প্রদর্শনে পুরোপুরিভাবে সক্ষম হয়েছেন। এই নিরাসক্তি একজন ঔপন্যাসিকের জন্য প্রাথমিক পূর্বশর্ত।

রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বহিরাবরণ ভেদ করে তাঁর দৃষ্টি ছিল সমাজের আরও গভীরে নিহিত। তাঁর এই সুগভীর পর্যবেক্ষণ থেকেই তিনি যে সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফেরান তা হলো, এই স্বাধীনতা দু'দেশের কোথাও মানুষের প্রকৃত মুক্তি ঘটায়নি। অবসান ঘটেনি দারিদ্র্যের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ যুবক হারীত স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দারিদ্র্যমুক্তির জন্য বিপ্লব ঘটানোর কথা ভাবে। এ কারণেই দেখা যায়, এ উপন্যাসের মূল সমস্যা রাজনৈতিক নয়, মূল সমস্যা দারিদ্র্য। নিশীথ সেন যে কলকাতায় চাকরি খুঁজতে যায় তার মূলে কিন্তু পাকিস্তান কিংবা দেশবিভাগজনিত সমস্যা সক্রিয় নয়। এর মূলে সক্রিয় তার পেশাগত উন্নতির ক্ষেত্রে চরম হতাশাজনক পরিস্থিতি। ২৪/২৫ বছর অধ্যাপনা করার পরও তার মাসিক বেতন মাত্র দেড়শ টাকা। এ বেতনে সংসার চালানো কঠিন। যে-কারণে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও নিঃশেষিত। নিশীথ সেনের স্ত্রী সুমনা পারনিসাস এনিমিয়ার রোগী। তার কন্যা ভানু থাইসিসের রোগী। তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে কিন্তু অর্থের অভাবে চিকিৎসা হয়নি। নিশীথ সেন পঞ্চাশ টাকা বেতন বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছিল, কিন্তু তা মঞ্জুর হয়নি। ছুটির আবেদন করেছিল, তাও মঞ্জুর হয়নি উপযুক্ত কারণ দেখাতে না পারায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরন্তু ছুটি মঞ্জুরির অপেক্ষা না করে কলকাতা চলে যাওয়ায় তার চাকরিই বিপন্ন হয়ে পড়ে। চাকরির ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা, অমর্যাদা ও আর্থিক দৈন্য একজন অধ্যাপকের জীবনকেও কেমন বিপর্যস্ত করে তোলে সেটা দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। এখানে লেখকের ব্যক্তিজীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া হয়ত যায়, কিন্তু জীবনানন্দ দাশের জীবন-দৃষ্টির মূল সুরটিই এর মধ্য দিয়ে অনুধাবনীয়।

লেখক দেখাতে চেয়েছেন, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়তো ঘটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের দুর্দশা অব্যাহতই থাকে। বঞ্চনাক্লিষ্ট মানুষের বঞ্চনার অবসান ঘটে না। তবে কিছুসংখ্যক সুযোগসন্ধানী মানুষ এসব পরিবর্তন থেকে নিজেদের ভাগ্যের ঠিকই উন্নতি সাধন করে ফেলে। নিশীথ সেনের পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধির আবেদন মঞ্জুর হয় না, কিন্তু কলেজ অধ্যক্ষ আবেদন না জানাতেই কর্তৃপক্ষ তার বেতন পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেন। সুবিধাভোগী শ্রেণীর নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট লেনদেনের বিষয়টি এ ঘটনায় চমৎকারভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এটি শুধু জলপাইহাটি কলেজের ক্ষেত্রেই ঘটছে তা নয়, কলকাতার অভিজ্ঞতাও একইরকম। নিশীথ সেন চাকরি খুঁজতে কলকাতায় তিনজন অধ্যাপকের শরণাপন্ন হয়। তিনজনই তার পূর্ব-পরিচিত। একজন তার সতীর্থও। ছাত্রজীবনে তাদের আর্থিক অবস্থানে কোনো তারতম্য ছিল না। অথচ গত ২৪/২৫ বছরের চাকরিজীবনে এক্ষেত্রে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। তিনজন অধ্যাপকের একজন বর্তমানে একটি কলেজের অধ্যক্ষ, একজন উপাধ্যক্ষ, আরেকজন রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা আরও কোনো উচ্চ পদ লাভের জন্য সচেষ্ট। চাকরিসূত্রেই তারা বিপুল বিত্ত ও প্রতিপত্তির অধিকারী। এরা কলকাতায় ছিল বলেই অবস্থার এমন উন্নতি ঘটেছে তা নয়, তাদের বিষয়সচেতনতা এবং সুযোগসন্ধানী প্রবৃত্তিই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। লেখক বলতে চেয়েছেন, সমাজে বিত্ত ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য এ দুটি 'গুণ' থাকা অপরিহার্য।

২

এ উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের সূক্ষ্মতর জটিলতাগুলোকে তার বৈচিত্র্যসমেত তুলে ধরা হয়েছে। নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ, অনুরাগ বা প্রণয়ের যে নানা বৈচিত্র্য এবং তা যে বয়স কিংবা সমাজ-প্রচলিত সম্পর্কের সীমা সবসময় মান্য করে না তাও তুলে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে। তবে লেখক এও দেখিয়েছেন যে, সমাজের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পর্যায়ে এই সম্পর্কের রূপও ভিন্ন ভিন্ন। উচ্চবিত্ত স্তরে নরনারীর বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্কের যে অবাধ বিস্তার তাতে মানবীয় আবেগের বড় অভাব। বৈষয়িক স্বার্থ কিংবা ভোগস্পৃহাই সেখানে মুখ্য। অথচ নিম্নবিত্ত পর্যায়ে এক্ষেত্রে ভাবাবেগেরই প্রাধান্য আমরা লক্ষ করি। তাছাড়া উচ্চস্তরে একই সঙ্গে একাধিক জনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক নির্মাণের যে অনৈতিক মনোবৃত্তি বর্তমান, নিম্নস্তরে তাও নেই। তবে নিম্নস্তরে যে ভোগস্পৃহা বিদ্যমান তা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নয় বরং পুরুষের বা ক্ষমতাবানের জবরদস্তিতেই কার্যকর হয়।

সমাজের উচ্চস্তরের যৌনসম্পর্কের সিফিলিস-আক্রান্ত রূপটি নমিতা ও তার বাবা-মার জীবনচিত্রণসূত্রে স্পষ্ট হয়েছে। নমিতার পিতা সলিল মুখার্জি প্রথমে সিফিলিস-আক্রান্ত হন। চিকিৎসা না করায় সেই রোগ তার বার্মিজ স্ত্রী মা-থিন-এর দেহকে আশ্রয় করে। অতঃপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মসূত্রে নমিতাও এ রোগে আক্রান্ত হয়। নমিতার উক্তি : "বাবা তো রোগ স্বীকার করতেন না। মাও ব্যাধিটা পেলেন, আরো চার-পাঁচজনকে তো দিয়েছেনই, আট-দশজনও হতে পারে। ... আমার রক্তে তো জন্ম থেকেই বিষ।" (পৃ. ১৯৪)। নমিতার এ রোগ কতজনের মধ্যে ছড়িয়েছে বা ছড়াবে তা হিসাব করে বলা শক্ত। নিশীথ সেন-এর বন্ধু জিতেন দাশগুপ্ত তার স্বামী। অথচ তার সম্পর্ক রয়েছে ইয়ুসুফ, জুলফিকার, রবিশংকর প্রমুখের সঙ্গে। এসব সম্পর্ক কেবল বন্ধুত্বের নয়। নমিতার দেহগত বাসনার আগুন নিশীথ সেনকেও স্পর্শ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু নিশীথ সেনের নিস্পৃহতাই তাকে রক্ষা করে। নমিতা উচ্চবিত্ত নারীর এক যথার্থ প্রতিনিধি যেন। নমিতাদের জীবনদর্শন, জীবনানন্দের ভাষায় :

> নমিতা আর-এক পৃথিবীর। তার সফলতা কিংবা ব্যর্থতা অন্য রকম। ঘুম বা মৃত্যুর বাইরে সে এক অন্য কৈবল্যের স্তর। টাকা রয়েছে সেখানে—টাকাই সব ; মিলন রয়েছে সেখানে, মিলনই সব ; দেহ রয়েছে—নানা রকম সুধা, ফেনা, সৈন্ধবের স্বাদ উপলব্ধির ভিতরে পৃথিবীর মাটিকে নিকটতমের মত পায় শরীর। আকাশের নক্ষত্রলোকের ব্যক্তির ভিতরে কাম শরীরের মত আলোকিত হয়ে ফেরে মন। (পৃ. ৫৪)

নিশীথ সেন কলকাতায় অবস্থানকালে জিতেন দাশগুপ্তের গৃহ ছাড়া আরও যে তিন বাড়িতে যায় তার সর্বত্রই নরনারীর অনাকাঙ্ক্ষিত অনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে অবহিত হয়। প্রফেসর অভয়েন্দ্রমোহন ঘোষের স্ত্রী মোহিতার সঙ্গে প্রফেসরের ছাত্র নৃপেনের, উপাধ্যক্ষ কুলদাপ্রসাদের সঙ্গে তার শালী ললিতার এবং অধ্যক্ষ জয়নাথের সঙ্গে তার সেঝ শালীর যে-সম্পর্ক তা একান্তভাবে শারীরিক, কোনো হার্দ্য আবেগে উচ্চকিত নয়। এসবের বিপরীতে জলপাইহাটিতে নিশীথ সেনের সঙ্গে অর্চনার কিংবা হারীতের সঙ্গে সুলেখা, জুলেখা ও অর্চনার যে সম্পর্ক তাতে অনুরাগেরই প্রাবল্য। হৃদয়াবেগকে ছাপিয়ে সেখানে দেহগত বাসনা উদ্দীপ্ত হওয়ার সুযোগ পায় না।

নরনারীর সম্পর্কের রূপ চিত্রণের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই সমগোত্রীয়। সর্বাংশে না হলেও ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্বকে তিনি মান্য করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের গল্প-উপন্যাসগুলির মতো 'জলপাইহাটি'তেও আমরা নারী-পুরুষের যৌনস্পর্শী সম্পর্কের এক বিশদ রূপ লক্ষ করি। তবে মানিকের মতোই জীবনানন্দ দাশ কলুষতার চিত্র আঁকেন না বা কলুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ করেন না। সম্পর্কের অন্যতর মাত্রাটি সম্পর্কে তিনি তথ্য প্রদান করেন কিংবা ইঙ্গিতের মাধ্যমে পাঠককে বুঝিয়ে দেন। পুরো বিষয়টিই মনোলোকের উপলব্ধির স্তরে ঘুরপাক খায়।

৩

উপন্যাসটি ঘটনাবহুল নয়। ঘটনা এখানে অল্প। নিশীথ সেন কলেজে ছুটির দরখাস্ত করে তা মঞ্জুরির অপেক্ষা না করেই, এবং চাকরিচ্যুতির আশঙ্কা নিয়েই, কলকাতা যায় চাকরি খুঁজতে। সেখানে মাত্র দুদিনের উপস্থিতিতেই সে উপলব্ধি করে, চাকরি দুষ্প্রাপ্য। অতঃপর জলপাইহাটিতে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে কাহিনী শেষ। সমগ্র কাহিনীর সময়সীমা এক সপ্তাহও নয়। স্বল্প কালপরিসরে ঘটনাবাহুল্য এড়িয়ে প্লটের এরূপ বিন্যাসের মধ্যে লেখকের আধুনিক-মনস্কতা বা আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রায় চারশ পৃষ্ঠার এ উপন্যাসের পরিসর দীর্ঘ হয়েছে মূলত সংলাপধর্মী কতকগুলো দৃশ্য নির্মাণের ফলে। এই দৃশ্যগুলো গড়ে উঠেছে নিশীথ সেনের সঙ্গে অর্চনা, নমিতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহিতা, কুলদাপ্রসাদ, জয়নাথ ও রবিশংকরের, হরিলালবাবুর বাড়িতে কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যদের এবং হারীতের সঙ্গে অর্চনা, সুলেখা ও জুলেখার পারস্পরিক সুদীর্ঘ সংলাপমুখরতার মধ্য দিয়ে। সংলাপই এ উপন্যাসের প্রাণ। সংলাপ নির্মাণে লেখকের দক্ষতারও পরিচয় আছে। তবে কখনও কখনও এই সংলাপই আবার এ উপন্যাসের সাংগঠনিক শিথিলতারও কারণ হয়ে উঠেছে। কখনও কখনও মনে হয়, ঔপন্যাসিককে যেন কথার নেশায় পেয়ে বসেছে। আর সে-কারণে প্রায়শ কথা বলতে বলতে কথার খেই হারিয়ে ফেলছেন। লেখক নিজেই বলছেন, নমিতার মুখ দিয়ে : 'কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে ফেলেছি আমরা'। (পৃ. ২০২)। এভাবে সংলাপে এসেছে নানা অনাবশ্যক অর্থহীন কথা, অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ এবং পুনরাবৃত্তি-দোষ।

সংলাপধর্মী এসব দৃশ্যের প্রায় সবটাই গৃহকেন্দ্রিক। গৃহের চার দেয়ালের মধ্যবর্তী থেকে একাধিক চরিত্র (অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই চরিত্র) পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে নিমগ্ন থেকেছে। তবে চরিত্রের এসব একান্ত নিমগ্নতার মধ্যেও বাইরের প্রকৃতিজগৎকে পুরোপুরিভাবে মুছে ফেলা হয়নি। দুই চরিত্রের সংলাপের মধ্যে প্রকৃতির উপস্থিতি সর্বদা সজীব। আকাশ, মেঘ, রোদ কিংবা চাঁদ, পাখি, ফুল, বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমসময়ে বর্তমান অনুষঙ্গগুলো বারবার কথার মধ্যে এসে স্থান করে নিয়েছে। প্রকৃতি এভাবে চরিত্রের মনোভাব প্রকাশের প্রতীকী বাহন হয়েছে। কখনও কখনও তা দুই চরিত্রের পারস্পরিক অনুরাগকে দীপ্ত ও ব্যঞ্জনাধর্মী করেছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায়ও আমরা প্রকৃতির উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করি। প্রকৃতিসংলগ্নতা আসলে জীবনানন্দ দাশের জীবনদৃষ্টিরই এক নিয়ামক উপাদান।

উপন্যাসের ভাষায় সংলাপধর্মিতা ছাড়াও আছে নানা ধরনের ট্রিটমেন্ট। কখনও তা কাব্যিক, কখনও ইমপ্রেশনিস্টিক, আবার কখনও অতিবাস্তব চিত্রময়তায় উজ্জ্বল। উপমার ব্যবহারেও এ ভাষা অলংকৃত, যা পাঠকের চেতনাকে শাণিত করে। উপন্যাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জীবনানন্দ দাশের কবিতার নানা রূপ। অর্থাৎ তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা কবিসত্তা থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত হতে পারেনি। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ :

উপমা :

১. আগুনের মতন মেয়েদের কাছ থেকেও অনায়াসে কেটে পড়ে অনেক দূরে একটা নির্বিকার গাছের মত আকাশে বাতাসে স্বয়ম্ভূ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার আশ্চর্য সহজশক্তি ছিল। (পৃ. ৭)

২. সৈকতের কী এক বিচিত্র সাধনোচিত ধামে জমানো ফেনার মত স্নিগ্ধ হয়ে মিশে আছে জিতেন দাশগুপ্ত আর তার স্ত্রী; মিশে থাকবে চিরদিন। (পৃ. ২৩)

৩. মস্ত বড় দেওয়াল-ক্যালেন্ডার দুটো উল্টে-পাল্টে শিলাবৃষ্টির মত ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ছলাৎ-ছলাৎ করে দেওয়ালের উপর। বাইরে পটকা ফলের মত আলোর রং যেন—গাছ, পাখি, আকাশ ছুঁয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ছে; (পৃ. ৫৬-৫৭)

৪. ঘাস খেতে খেতে হঠাৎ চুনাপাথরের মত রঙের এক-একটা গাভী যেমন নাড়ীর টানে চোখ তুলে, মুখ তুলে, দাঁড়ায়, খুঁটোয় টান পড়ে, গলায় টান পড়ে দড়িটা একেবারে টান-টান হয়ে গেছে বলে, অর্চিতা তেমনি কেমন একটা নিস্তব্ধ অব্যক্তভাবে দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। (পৃ. ৭৪)

৫. অনেক ঝাঁকড়া চুলের উজ্জ্বল শিশুদের মত অনেকগুলো বাতাস ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। ... অনেকগুলো সাপের জিভের মত শকশকে চুল উড়ে-উড়ে অর্চনার কপাল চোখ কেমন বিষকালি করে দিয়ে যাচ্ছে। (পৃ. ১৫৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব উপমা চয়নে লেখকের শিল্পদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য অনুভব করা যায়। উপলব্ধি করা যায় লেখকের পর্যবেক্ষণ-শক্তির গভীরতা এবং কল্পনার বিস্তার। চরিত্রের মনোভূমিতে যে নানারূপ স্বপ্ন-চিন্তা-সুখ কিংবা বিষণ্ণতা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এসব উপমার মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কাব্যময়তা

১. কিন্তু নানা রকম কথা বলার অবক্ষয়ে যে-নিস্তব্ধতা এসে পড়ে মানুষের চোখে-মুখে—পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেরই অবসান যে-রকম নিস্তব্ধ (হয়তো নিষ্ফল) তেমনি নির্বাণচক্রের মতো তাকিয়েছিল যেন—কোনো জিনিসের দিকে নয়, অফুরন্ত সময়কণিকাগুলোর দিকে। (পৃ. ৫১-৫২)

২. কথা অনেক বলা হয়েছে ; কথা বলতে চাইবে না নারী আর, চাইবে না পুরুষ আর, একটু নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে চাইবে মানুষের যা প্রাপ্য নয় সেই নিঃসময়ের ভিতর, মানুষের যা প্রাপ্য সেই খণ্ড সময়কে অনুনয় করে সরে যেতে বলে। (পৃ. ১৮৮)

৩. বেশ, শান্তির সময় তো এসেছিল আজ সন্ধের সময়। জানা গেল সত্যি কী। তোমার সঙ্গে তো স্থির সম্বন্ধই পাতানো হল। তারপরেও এলোমেলো হয়ে থাকে কী করে আমার মন? (পৃ. ৩৬৩)

উপন্যাসের এসব অংশকে জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে আলাদা করা দুঃসাধ্য। কবিতায় তাঁর ভাব প্রকাশের ভঙ্গিটি উপন্যাসের এসব অংশকে পুরোপুরিভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে একটা নৈর্ব্যক্তিক রূপ দেওয়ার প্রয়াস লক্ষণীয়।

অতিবাস্তব চিত্রময়তা

১. যে সব গাই গোরুর মুখ হরিণীর মত, অর্চিতা অনেকটা সেই রকম। তাকিয়ে দেখছিল নিশীথ, একটা হরিণী সেমিজ পরে মহিষের শরীরের ভিতর দিয়ে, দেওয়ালের ভিতর দিয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেল যেন কোথায়। না, অদৃশ্য হয়নি তো, ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে ; হরিণীর শরীরের ভিতর দিয়ে ছল-ছল করে উঠছে জল, নদীর, রাত্রির, যেখানে সূর্য নেই, শুদ্ধ দেশের রাত্রির জল ছল-ছল করে উঠছে—তারার ফাঁকে ফাঁকে যে-অন্ধকার আছে সেগুলোকে জলোচ্ছ্বাসিত করে—কত শত তারার শরীর, কত শত অন্ধকার নদীর এলোপাথাড়ির ভিতর জল শুধু এখন, রাত্রি শুধু—শাশ্বত রাত্রি। (পৃ. ৯২-৯৩)

২. একটা সাদা বেড়াল চলে গেল ; সজনে গাছে, আমলকী গাছে বেশ দেখাচ্ছে বাইরের জোৎস্না ; আমলকীর ডালে সাদা বেড়ালটা যেন বসে আছে, না ওটা তো চাঁদ ; বেশ ভারী, খুব বড়, ওটার চাপ বোধ করতে পারা যায় যেন, সাদা স্নিগ্ধ ওর রোঁয়ার হৃদয়ে চোখ বুজে ঘষে সাদা কাবলি বেড়ালের অনাদি প্রতীকের মত ওর উজ্জ্বল সত্তাকে বেশ ভাল লাগে। (পৃ. ১২৩)

উপন্যাসের এসব অংশেও কবি জীবনানন্দ দাশের উজ্জ্বল উপস্থিতির স্বাক্ষর বর্তমান। বাস্তবতার সঙ্গে অবচেতন মনের স্বপ্ন-কল্পনার প্রবহমাণতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলে তা থেকে বিভ্রমের যে দ্বৈরথ সৃষ্টি হয় সেটাই বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাময় এক অতিবাস্তব চিত্রকল্পের উৎস হয়ে ওঠে। মানবমনের জটিলতা ব্যাখ্যায় ফ্রয়েড চেতন-অবচেতন ও অচেতনের যে ত্রিমাত্রিক রূপের কথা বলেছেন তা সাহিত্যজগতকেও দারুণভাবে প্রভাবিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। অবচেতন ও অচেতন মনের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তা সচেতন মনের স্বাভাবিক গতিকে সাধারণত অনুসরণ করে না। চিন্তার ক্ষেত্রে স্বভাবতই সেখানে পারম্পর্য রক্ষিত হয় না। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিভিন্ন মনস্তত্ত্ববিদ মানবমনের গভীরতম প্রদেশের রহস্যময় আচরণের যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকেই উপন্যাসে জন্ম নিয়েছে চৈতন্যপ্রবাহ রীতির। মনের চেতন–অবচেতন স্তরের গতিপ্রকৃতিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে এই রীতির বৈশিষ্ট্য। যেখানে সময়, ঘটনা কিংবা চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। জীবনানন্দ দাশ এ উপন্যাসেও আধুনিক এই রীতিই সফলভাবে অনুসরণ করেছেন।

এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি উত্তর–আধুনিক মনোভঙ্গির প্রকাশও তাঁর উপন্যাসে আমরা লক্ষ করি। ব্যক্তিমানুষের জীবন সর্বদা ফরমাল বা সিরিয়াস নয়। দিনের অনেকটা সময়ই তার কাটে ঘরোয়া বা ইনফরমাল পরিস্থিতির মধ্যে, অনেকটা অসংহত বিস্রস্ত অবস্থায়। উত্তর–আধুনিক দৃষ্টিকোণ হলো, সাহিত্যে কেবল ব্যক্তিমানুষের ফরমাল রূপটিই অঙ্কিত হবে না, সেখানে মানুষের অসংহত ইনফরমাল জীবনও চিত্রিত হবে। এ উপন্যাসে ইংরেজির অধ্যাপক নিশীথ সেন, বাইরে যিনি একজন গভীর বুদ্ধিবৃত্তির মানুষ, তিনিই গৃহাভ্যন্তরে স্ত্রীর সামনে হারানো মেয়ের ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নৃত্য করেন। এই রূপ চিত্রণের মধ্যে লেখকের উত্তর–আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুটিত হয়েছে।

উপন্যাসের সমাপ্তি–অংশ অতিমাত্রায় নাটকীয়তায় আচ্ছন্ন। অবশ্য এ উপন্যাসের শুরুই হয়েছে নাটকীয়তার মাধ্যমে : দীর্ঘকাল পরে জিতেন দাশগুপ্তের কলকাতার বাড়িতে এক গভীর রাতে আকস্মিকভাবে নিশীথ সেন গিয়ে উপস্থিত হয়। এছাড়াও উপন্যাসের অভ্যন্তরে আরও কিছু নাটকীয় আকস্মিকতার মুহূর্ত আমরা পাই। যেমন, দীর্ঘকাল যে-পুত্র গৃহছাড়া, কোথায় আছে তার সঠিক কোনো তথ্যও নেই বাবা–মার কাছে, সেই পুত্র হারীত হঠাৎ একদিন গৃহে এসে উপস্থিত হয়, ঠিক যেদিন তার পিতা নিশীথ সেন গৃহত্যাগ করে কলকাতা যায়। কিংবা জিতেন দাশগুপ্তের বাড়িতে গিয়ে নিশীথ সেনের সঙ্গে দেখা করে সম্পূর্ণ অপরিচিত ডা. সুবল মুখার্জি। নিশীথ সেনের কন্যা ভানুর থাইসিসের চিকিৎসা করতে গিয়ে তাকে ভালো লাগে ওই ডাক্তারের। আর সে-কারণে তাকে ওই অবস্থায় গৃহে নিয়ে চিকিৎসা করার অনুমতি চাইতে ডা. সুবলের এমন আকস্মিক আগমন। তবে এসব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে উপন্যাসের উপসংহার–অংশের নাট্যিক সংবেদনা। উপন্যাসের শেষাংশে হারীত ও জুলেখা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া নিয়ে গভীর আলাপে নিমগ্ন ছিল ; নিশীথ সেনের জলপাইহাটির বাড়ির বাইরের ঘরে। সেখানে আকস্মিকভাবে কলকাতা থেকে নিশীথ সেন এসে উপস্থিত হয়। প্রথমেই সে তার কন্যা ভানুর মৃত্যুসংবাদ দেয়। একই সময়ে নিশীথ সেনের স্ত্রী সুমনার মৃত্যু ঘটে, যে-সংবাদটি ভেতর–ঘর থেকে এসে ঠিক ওই মুহূর্তেই জানায় অর্চনা ঘোষাল। একই সময়ে রঙ্গমঞ্চে এসে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় সুলেখা ও ওয়াজেদ আলি। তারা পাঠককে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে দিয়ে পরস্পরকে বিয়ে করার কথা জানায়। এভাবে নানা আকস্মিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাসের শেষাংশের পরিবেশ এক জমজমাট নাটকীয়তায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

৪

একটি বিশেষ কালকে বা ওই কালের দ্বন্দ্ব ও সংবেদনাকে আশ্রয় করে বিন্যস্ত হয়েছে এ উপন্যাসের প্লট। এই কালের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে ১৯৪৭–এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। তার পেছনে রয়েছে ১৯৪৬–এ কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সামনে রয়েছে স্বাধীনতাউত্তর অপ্রাপ্তি ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। ঔপন্যাসিকের সার্থকতা এখানে যে, তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালের এই নৈরাশ্যকে বাস্তবোচিতভাবে চিত্রিত করেন ঠিকই, কিন্তু পাঠককে শুধু ওই হতাশার মধ্যেই নিমজ্জিত করেন না। তাই বলে তিনি আবার মিথ্যা আশার কুহকও সৃষ্টি করেননি। তিনি শুধু পাঠককে এই উপলব্ধিতে পৌঁছে দেন যে, মহাকালের পটভূমিতে মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসের কাছে এটি একটি ক্ষুদ্র সময় মাত্র। এই ক্ষুদ্র সময়ের যন্ত্রণা দিয়ে বৃহত্তর ইতিহাসকে পরিমাপ করা যায় না। লেখকের মতে, ব্যক্তির দৃষ্টি যখন বৃহত্তর কালপরিসর থেকে সরে যায়, নিবদ্ধ হয় স্বকালের টানাপোড়েনের দিকে তখন স্বকল্যাণই একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে। যেমন :

> একজন মানুষ, একটা দল, একটা দেশ, বা মহাদেশ কী করে সুনিয়ন্ত্রিত করার শক্তি পাবে পৃথিবীকে। মানুষের মন উন্নত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু দু-পাঁচ দুশ-পাঁচশ বছরের মধ্যে তো নয়ই, কত সময় লাগবে কে জানে—কিন্তু সে সফলতা নাও লাভ করা যেতে পারে—মানুষের পৃথিবীতে কোনো দিনই। আজকের পৃথিবীর এরকম ভয়ঙ্কর বিস্রস্ত.প্রস্থানের ভিতর ব্যক্তি নিজের শুভার্থ ছাড়া আর কী কামনা করতে পারে—কী মানে আছে অন্য কোনো কামনার? (পৃ. ১৯)

কিন্তু সমগ্র মানুষের কল্যাণ যদি কাম্য হয় তাহলে সময়ের হাতেই দিতে হবে তার ভার :

> আপনি তো বলছেন এক হাজার বছরও লেগে যেতে পারে মানুষের ভাল হতে—
>
> এক হাজার—দু হাজার—মিশরের ফ্যারাওদের সময় যে-লোকগুলো কষ্ট পাচ্ছিল তারা আজকের উনিশশ আটচল্লিশের পৃথিবীটাকে দেখবার সুযোগ পেলে ভাবত না কি! হাজার হাজার বছর পরেও এরকম। কী হবে তবে মানুষের, কবে হবে?
>
> ... হবে-হবে আজই হবে এই কথাই ভাবে মানুষ, এই কথা ভেবেই জোর পেয়ে কাজ করে'। (পৃ. ২৬৬)

লেখকের এই বোধ গভীর ইতিহাসচেতনার ফল। কাল তো নিরবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবহমাণ। সেখানে বর্তমান ক্ষণিকের জন্যও স্থির নয়। বর্তমান প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে অতীতে রূপ নিচ্ছে। ভবিষ্যৎ বর্তমানের মধ্য দিয়ে ক্রমাগতভাবে বিলীন হচ্ছে অতীতের গর্ভে। হারীতের মুখে কালচেতনার এক অন্তর্নিহিত উপলব্ধি :

> সময় নেই জেনেই সময়টাকে ভাল লাগে। শেষ পর্যন্ত সময় নেই তো সুলেখা, সময় নেই কোথাও—এই বাড়িতে এ রকম দুপুরের নিঃশব্দতায় এসে বুঝতে পারি যে বহতা সময়ের বয়ে যাবার চেয়ে তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদেরে পরিসর কত বেশি, আস্বাদ কত বেশি উজ্জ্বল। তবুও যতটা দিন বেঁচে আছে মানুষ, প্রতি মুহূর্তে সময় আছে, আছে, ছুটে চলেছে এরকম একটা উদ্বেগে অতিষ্ঠ হয়ে ভয়াবহভাবে ধ্বংস করে ফেলছে সময়কে, নিজেকেও। (পৃ. ৩২২)

সময়ের এই নীরব ও নিরবচ্ছিন্ন পথ-চলাকে প্রগাঢ় অনুভবের মধ্যে স্থান দিতে পারলে সুনির্দিষ্ট কালের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্ব থেকে মানুষের মুক্তি ঘটতে পারে। আর ওই রূপ অনুভবের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত স্বস্তি ও শান্তি।

> আমাদের পৃথিবীতে অনেক দিন আগে, অনেক সাগর ঘুরে তার পর সমুদ্র প্রবাসীদের জাহাজ অন্ধকারে ধর্মাশোকের নির্জন চক্রস্নিগ্ধ সৈকতে—ঢের দূরে প্যালেস্টাইনের পাশে স্বাতী পুনর্বসু নক্ষত্রের নীচে এসে থামত। রাতের বাতাসের ভেতর বসে থেকে তেমনি একটা আশ্চর্য শান্তি অনুভব করছিল হারীত। (পৃ. ৩৯৩)

মহাবিশ্বের পটভূমিতে ব্যক্তিমানুষকে উপস্থাপন করে শান্তি উপলব্ধির এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। জীবনানন্দ দাশের কবিসত্তাও বারবার কালের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য মহাকালের অসীমতায় শান্তি খুঁজেছে। এইরূপ আয়ত দৃষ্টির কারণেই জীবনানন্দ দাশ দৈনন্দিন রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে মনোযোগী হননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের কাঠামোর মধ্যে নিজেকে সংযুক্ত করেননি। কিন্তু তাই বলে তিনি রাজনীতির ব্যাপারে অসচেতন বা অসতর্ক ছিলেন তা মোটেই নয়। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিশীথ সেনের মধ্যেও আমরা জীবনানন্দ দাশের রাজনৈতিক মনোভঙ্গির এই ছায়া লক্ষ করি। নিশীথের রাজনৈতিক অভিরুচি সম্পর্কে লেখক বলছেন :

> পলিটিকসে তার কৌতূহল আছে বটে, কিন্তু রোজকার পলিটিকস নিয়ে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে মাথা ঘামাতে পারে না সে ; যারা ঘামায় তাদের কথাবার্তা শুনে বমি আসে তার। (পৃ. ২৮২)

এ কারণেই লেখকের দৃষ্টি সমাজ ও কালের অনেক গভীরে অনেক সুদূরে নিহিত। যে-দৃষ্টি বর্তমানের বিক্ষুব্ধ চঞ্চলতায়, আন্দোলন-আলোড়নে অস্বচ্ছ হয় না। সে-দৃষ্টিতে কল্যাণের পথ অনেক দীর্ঘ আর সে কারণেই মনে হতে পারে তা হতাশামিশ্রিত। কিন্তু এ উপলব্ধি কোনো নেতির ফল নয়, বরং এর পেছনে নিহিত রয়েছে সমাজ ও ইতিহাসের মর্ম অনুভবের এক সুগভীর প্রয়াস। নিশীথ বলে :

> 'যারা সত্যিই পৃথিবীর ভাল হবে মেনে নিয়ে ভেবেচিন্তে কাজ করে আমার ঝোঁক তাদের দিকে। কিন্তু পৃথিবী কোনোদিন শুদ্ধ হবে না আমি জানি। যে-কোনো বিপ্লব শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে গিয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎ মানবের ভাল করতে গিয়ে সমসাময়িক মানুষকে শেষ করে দিয়ে যায়। কিন্তু তবুও ভবিষ্যৎ মানুষের ভাল হয় না। তিন হাজার বছর ধরে এই তো চলছে। আরো তিন-চার হাজার বছর এই রকমই চলবে'। (পৃ. ১৯৭)

মানবকল্যাণের লক্ষ্যে যে-বিপ্লব প্রত্যাশিত সে-বিপ্লবও যে মানবেরই একাংশকে ধ্বংস করে দেয় এই উপলব্ধির মধ্যে লেখকের কোনো দ্বিধা প্রকাশিত হয়নি। বরং সত্য প্রকাশের বা সত্যোপলব্ধির এক তাৎপর্যময় দিক এটি। লেখকের শ্রেয়োচেতনাকেও এর মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। কোনো মিথ্যা মায়ার জালে লেখক নিজেকে জড়াতে চান না। সুগভীর বাস্তবতাবোধই লেখককে এমন সত্য উচ্চারণে নির্দ্বিধ করেছে। ঔপন্যাসিক হিসেবে জীবনানন্দ দাশের সার্থকতা হলো, এই হতাশাজনক বাস্তবতার উপলব্ধি সত্ত্বেও তিনি মানবকল্যাণ বা মানবজাতির জন্য শুভবোধের এক উজ্জ্বল দীপশিখাকে পাঠকের সামনে সবসময় জ্বালিয়ে রাখেন।

এ উপন্যাসে তিনি নিশীথ চরিত্র ও তার বিপরীতে জলপাইহাটি কলেজের অধ্যক্ষ ও গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ এবং কলকাতার তিন অধ্যাপক অভয়েন্দ্রমোহন ঘোষ, কুলদাপ্রসাদ ও জয়নাথ প্রমুখ চরিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে একটি সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এর মধ্যে নিশীথই একমাত্র দরিদ্র, বঞ্চিত ও অপ্রতিষ্ঠিত। তার জীবন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে প্রবহমাণ। বিপরীতে, অন্য সকল চরিত্র বিত্ত ও প্রতিপত্তি নিয়ে সমাজে যেমন প্রতিষ্ঠিত তেমনি তাদের ভবিষ্যতও সুনিশ্চিত। কিন্তু লেখক চরিত্রগুলিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, পাঠকের সকল সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত হয় ওই সৎ দরিদ্র অধ্যাপকের প্রতিই। উপন্যাসেও নিশীথের প্রতিই সাধারণের শ্রদ্ধা ব্যক্ত হতে দেখি। এখানে সূক্ষ্মভাবে মানবজাতির এক চিরকালীন দ্বন্দ্বকে লেখক পরিস্ফুট করেছেন। সে-দ্বন্দ্ব শুভ ও অশুভের মধ্যে, কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে, সৎ ও অসতের মধ্যে। লেখকের সকল পক্ষপাত শুভ ও কল্যাণের প্রতি। এখানেই উপন্যাসটির সার্থকতা।

তথ্যসূত্র

১. এ প্রবন্ধের উদ্ধৃতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে জীবনানন্দ সমগ্র প্রথম খণ্ড (সম্পাদক : দেবেশ রায়, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৯২) থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ চৌধুরী

পৃথিবীর এই গল্প বেঁচে রবে চিরকাল

অমীমাংসিত গল্প জমে ওঠে
শিশিরের শব্দে–ভেজা নদীর দু'পারে,
ফের বিরান প্রান্তরে,
কাহিনীর গাঢ় শিল্পে জং ধরে কালের আবর্তে,
মাঝে–মধ্যে দুমড়ে যায়, মুচড়ে যায়।
নাটোরের যে মেয়েটি
একটি জীবনে শুধু দু'দণ্ডের শান্তি দিয়েছিল
তারই গল্প টিকে যায় শাশ্বতের তেল, নুন, লঙ্কার ভাঁড়ারে।
রূঢ় ও কর্কশ প্রহরের রক্ত–পুঁজ–পুঁজি–ক্লেদ
ঝরা পালকের স্মৃতি, নিবিড় তমস
নিত্যসঙ্গী হ'য়ে ওঠে ...

মাথায় কুয়াশা–পাগড়ি, রঙ্ প্রায়–শাদা,
মুকুন্দদাসের প্রহার–চিহ্নেরা দেখি
সোনার মেডেল হ'য়ে ঝল্‌কে ওঠে বুকে
ধানসিঁড়ি আজো ব'য়ে যায়
বগুড়া রোডের মোড়ে জমে থাকে নিষিদ্ধ আঁধার ...

ছিল সহজ সরল চেনা পথ
কেন যে অরণ্যে, দ্বীপে, মালয় সাগরে
বিম্বিসার, বিদর্ভ নগরে,
অপ্রেমে, ঘৃণায় আল্পনা এঁকে যাওয়া,
শিরার ভিতরে সর্বনাশ ছুঁয়ে যাওয়া
পরাণ কথায় খুঁজে–মরা ডানার শিকড়
শিরার ভিতরে আর স্নায়ুর জঠরে বিস্ময়ের তৃপ্তি নয়,
শুধু এক বিপন্নতা নিয়ে শাদা কাগজের 'পরে
কাটাকুটি, আঁকিবুকি, শুধু লেখাজোখা
আর অবিরাম শব্দ গেঁথে যাওয়া ...
মানুষের চেয়ে সম্প্রদায় নোংরা করে কীর্তি, অমরতা—
বাস্তুভিটা চেয়ে থাকে, পথ–হারা অদম্য পথিক
ছায়া রাখে ইন্দ্রপ্রস্থে, ফুলে ওঠা সূতানটি
ধ'রে রাখে শেষ ছায়া ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বিরোধ নিরিবিলি ট্রাম,
ইঁদুরেরা খেলা করে অন্ধকারে ঘাতক বগির সাথে
হাসপাতাল ... উৎকণ্ঠা ... খা-খা ... শূন্য ...
ভূমেন্দ্র জানেন কিছু তাঁর রক্তক্ষরণের গল্প,
রণেশদা যা বলার ছিল ব'লে গিয়েছেন ...
শুরুতে সঞ্জয় আর বুদ্ধদেব বসু ...
শনি ছিল, শনিতো থাকেই রবি সোমে পড়া যায় চিঠি
তারপরে আবদুল মান্নান সৈয়দ
অলোক, শঙ্খ, পূর্ণেন্দু, অরুণেষ ঘোষ, ক্লিন্টন বি. সিলি ...
আর আছে? আছে। ঢের ঢের র'য়ে গেছে বাকি ...

দুঃখের সোনালি জমি জরিপের শেষে
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে ঘাম, স্বেদবিন্দু ...
বনেদী সমাজে জমে থাকা অবিচার, আস্ফালন হৃদয়হীনের,
পৃথিবীর এই গল্প বেঁচে রবে চিরকাল।
পৃথিবীর এই গল্প বেঁচে রবে চিরকাল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাদেব সাহা
মন বলে

সেই মুখ মনে পড়ে, সেই গান, সেই সন্ধ্যাতারা
এখন নেমেছে মেঘ, এখন বর্ষার জলধারা ;
মনে হয় ফিরে যাই সেই নদী আকাশের কাছে
হয়তো এখনো কেউ গান গায়, কেউ বসে আছে।

কী যেন সে তার নাম, সেও তা হয়েছে কতোকাল
জীবনানন্দের বাড়ি, মন বলে যাই বরিশাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ হায়দার
নিভৃতে জীবনানন্দ দাশ

সব পথ হাঁটা মানুষের ধুলো মাখা পদশব্দ
নির্জন প্রান্তর হ'তে হাট–বাজারের কোলাহলে
মাছ ধরা পাখিদের ঠোঁটে বড্ড ঋণী হ'য়ে আছে ;
ঋণী ঝরা পাতাটিরও কাছে—উল্টো বাতাসের মাঝে

চিলের ডানায় জ্যৈষ্ঠ–দুপুরের গাঢ় অনুতাপ
অনুতাপ সারা জীবনের সব সকাল–সন্ধ্যার
আকাশ চায়নি মেঘে ছেয়ে থাক রৌদ্রের বাগান
বাতাস পায়নি খোঁজ এই ঝাউ পাতা কোথাকার !

কোন্ ঘন বনের পিপাসা একটি উদয়পদ্ম
পুরু সাদা পাপড়ির মতো খুব ইচ্ছে হয়েছিলো
প্রাচীন মাটির প্রেম, চেনা–পরিচয় বহু আগে
কার কাছে শুনেছিলাম হিজল বন ভালোবাসে
ঘুরে–ঘিরে আসে এক ঝাঁক ফিঙে তেলরঙ মেখে
নিভৃতে জীবনানন্দ দাশ ঘাসে ঢাকা ; মনে হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্জনা সাহা
জীবনানন্দ : তোমার অস্তিত্ব

আকাশের বুকে অবিমিশ্র চাঁদ ডুবে গেলে
পৃথিবীর গভীর অন্ধকারে চঞ্চু ডুবিয়ে
এখনও তীক্ষ্নস্বরে ডেকে ওঠে প্যাঁচা।
তার কণ্ঠনিঃসৃত শব্দ চকিত বিদ্যুতের মতো যেন
দ্বিখণ্ডিত করে দেয় পিরামিডের ত্রিভুজ শরীর ;
কেঁপে ওঠে মিশরীয় মমিদের সারিবদ্ধ প্রাচীন ফসিল।

তোমার ধূসর জগৎ থেকে উড়ে আসে একঝাঁক বুনোহাঁস,
তাদের ডানার ঘ্রাণ মিশে থাকে
আজকের সন্ধ্যার উদাস বাতাসে ;
তবু বাতাসে বারুদের গন্ধ, তাজা প্রাণে মন্বন্তরের মড়ক,
আর শটিবনে শুয়োরের আর্তনাদ।

তোমারই মতোন এ হৃদয়ে জমে ওঠে সুগভীর ক্ষত,
জমে থাকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ।
এইসব বিষণ্ন সময় থেকে ছুটি চায় মন
গভীর ঘুমের ভেতরে তাই সাজায় সে আপন বাসর।

এই রাত্রি–দু'পহর বেলায় অধোমুখ নববধূর মতোন
তোমার রূপসী বাংলার অপরূপ ছবি ধরা দেয় দৃষ্টির ফাঁদে,
সবুজ ইজেলে গাঁথা তার আল্‌তো শরীর
অনায়াসে ঢুকে যায় হৃৎপিণ্ডে আমার
আমি তাকে পরিতৃপ্তির রসে ভিজিয়ে আস্বাদন করি ;
তোমার অস্তিত্ব আমার অনুভবের তন্ত্রী ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহাঙ্গীর ফিরোজ

আকন্দ ধুন্দুলের বনে জ্বলে উঠছে বাতি

অন্ধকার থেকে অন্ধকার বেয়ে বেয়ে ল্যান্সডাউনের মোড়ে চলে আসি
ট্রাম লাইনের পাশে জীবনানন্দের রক্তাক্ত দেহ, বাংলা কবিতা
আকন্দ ধুন্দুলের বনে তীব্র জ্বলে উঠছে বাতি

কবিতার চৌচির আর্শিতে আমাদের মুখ ; এক চোখ
আর একটি চোখ থেকে পারম্পর্যহীন দূরে
দ্বিখণ্ডিত কপালের ভাঁজ থেকে মনন ও মেধা
থেঁতলানো ইঁদুরের ঠোঁট বেয়ে পড়ছে টুপটাপ।

আর কত খোঁড়া যায়। অবিরাম আত্মখনন ;
বুকের ভেতর থেকে ইদানীং শ্লেষ্মা, কফ, নিকোটিন
ধানকাটি, দেশীমদ—হুল্লোড় মাতালের গান উঠে আসছে,
আরো খুঁড়ে যাবো ? আর একটু খুঁড়লেই লাভাময় আগ্নেয়শিলা
অথচ গাঁইতির হাতলে আমার হাত আরো কঠিন বসে যাচ্ছে ;
ক্লান্ত ভীতুর ডিম তোমরা পালাও
আমি কেন্দ্রবিন্দু অব্দি খুঁড়ে যাবো
আগুন ও লাভায় হবে আমাদের আর একটি প্রভাত।

সাম্প্রতিক কবিতা আমার
তুমি এখনো কানুপা'র গান শুনছো
ডোম্বি ছিনালি তোমাকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে
সাম্প্রতিক কবিতা আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহিদ হায়দার
যদি তাঁর পোস্টমর্টেম হতো

তাহলে ঐ নির্জন বুক
আর নিসর্গভরা মাথা কেটে কি পাওয়া যেত?

অবচেতনের রূপ।
ঝিমিয়ে পড়া স্বপ্নের পোশাক?
রক্তের জীবনবাহী ঘর?
সেই বোধ যার চোখের চেহারা
নীরবে ডাকছে আমাদের?

প্রশ্নগুলির ভেতর জায়মান আমাদের রূপান্তর।

যদি সত্যিই পোস্টমর্টেম হতো?
এক কালচে রক্তধারা বয়ে যায় জীবনের গ্রীবায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহন রায়হান
মেঘলা পাখির গান

মাঝে মাঝে ভ্রমণে যাওয়া ভাল
যেমন পাখিরা বহুদূরে উড়ে যায়।

সমুদ্র পাহাড় নদী বনভূমি
মিউজিয়াম জ্যু আর্ট গ্যালারি মার্কেট
ঐতিহাসিক সুকীর্তি
আধুনিক বিবিধ বিস্ময় কতকিছু দেখবার আছে।

গরীব দেশের মানুষও ভ্রমণ পিয়াসী
ভ্রমণে না গেলে দেখাশেখা হয় না কিছুই
মন ও হৃদয় সবুজ সতেজ
ভালবাসায় যায় না রাঙিয়ে তোলা।

তুমিও ভ্রমণে গেছ দূরে বহুদূরে কোথাও
প্রজাপতির রঙিন ডানায় ফুরফুরে নির্মল আনন্দে
ভরে নিচ্ছো বহুদিনের গুমোট মন
নতুন বিস্ময়ে চোখ মেলছো বর্ণিল চতুর্দিকে।

জ্যোৎস্নার মায়াবি চিত্রকলা ফুটে ওঠে
কোনো হ্রদের স্ফটিক জলে পাহাড়ের
বুক চিরে নেমে আসছে উচ্ছল ঝর্ণা স্রোত
বিকেলের কমলা রং রোদ যখন
উছলে পড়ে সাগর সৈকতে
সহসা তোমার মনে কি পড়ে না সেই মুখ?

তোমার যে কোনো নীরবতা নিঃসংবাদে
শরবিদ্ধ পাখির মতন যন্ত্রণায় ঘুমুতে পারে না
দূরে কিংবা কাছে যে কোনো ভ্রমণে যাওয়ার আগে
তোমাকে জানিয়ে যায়—কতদূরে যাবে ...

সেই তাকে না জানিয়ে তুমি কবে কোথায় উধাও হলে
কোন্ আকাশের ঠিকানায় কোন্ মেঘের আড়ালে?
একবারও কি তাঁর স্মৃতি বেজে ওঠে না ঢেউয়ের বুকে
দূর কোনো নক্ষত্রই কি বলে না তাঁর কথা
কোনো পাখির শিসেই কি নেই সেই চেনা স্বর;

না বলে কোথাও যাওয়া ভাল নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুল আমিন
জীবনানন্দ দাশ

বোধের অমৃত ঘ্রাণ চেতনার নির্যাস তুমি, হে কবি
সমস্ত অন্তর-আত্মা ইন্দ্রিয় আবহে বিমূর্ত বাঙলায়
ঢেলেছো তুমি আকাশে, আকাশের সোনালি রৌদ্রের মতো ;

খুলে যায় নির্জনতম কপাট অযুত সুন্দরীর দেহ—
হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে আনাগোনা এক বিজন পাখির
যে পাখির গানে আর গন্ধে ভরে ওঠে আমার অন্তর ;

অসংখ্য নক্ষত্রে তখন রাতের আকাশ ভরে উঠেছে
সজিনার ফুল মনিয়ার চুল আর পেঁচকের চোখ
আমাকে টেনে নিয়ে গেছে তোমার অবিমিশ্র সে ভুবনে ;

বাঙলার শাশ্বত রূপ শুধু নিশ্চুপ তোমার বেদনায়
কালের কালি নও ধ্বনিও নও মহাকালের বাঙলার
চেতনার—শুধু চেতনার আদিগন্তে আছ তুমি আছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফারুক নওয়াজ

জীবনানন্দের প্রতি

ধানসিঁড়ি মরে গেছে, যেন সে অবহতা একখণ্ড জলের ফিতে
ওপরে ধূসর মেঘ, দেখিনা শংখচিল কোনো ;
খুঁজি চিল অথবা শালিখ,
জীবনানন্দ তুমি যদি হঠাৎ আসো তারপর আসো যদি শালিকের বেশে
'শংখচিল, শালিখ সেজে।
অরণ্য ফাঁকা হয়ে গেছে, আসবুজ ঝোপঝাড় আছে
হঠাৎ ডাকলো কোনো লক্ষ্মী পেঁচা উদাস দুপুরে
মনে হয়, তুমি বুঝি এসে গেছো,
মনে হয়, তুমি বুঝি জেনে গেছো
তোমার জন্মভূমির সবুজহীনতা।
জীবনানন্দ তুমি এলে কর্ষ পারে
বেদনায় নীল হবে তোমার দু'চোখ ;
হরিৎ শস্যের গান,
ঢেঁকিহীন ঢেঁকিশাল।
গোয়ালের কালো গাই পাবে না কোথাও
জীবনানন্দ তুমি এসো না এখানে ;
এখানে নামহীন, অরণ্যহীন, প্রেমহীন
আদিগন্ত বিরহ মেলে তাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেজাউদ্দিন স্টালিন
জীবনানন্দের উদ্‌বর্তন

দৃশ্যটি ছিলো হরিদ্রাভ। পত্রশূন্য বৃক্ষদের প্রেতনৃত্যে
পালিয়ে যাচ্ছিলো পাখিরা। তাদের উটপাখির মতো ডিমে
তা দিচ্ছিলো শূন্যতা। নিরবচ্ছিন্ন ঝিঁঝিদের আর্তস্বরে
ঘন হয়ে উঠছিলো নীরবতা। এইমাত্র ডিমগুলো ফুটে
বেরিয়ে আসবে মৃত্যু। হাওয়ারা ঘূর্ণি তুলে এগুচ্ছিলো সামনে :
রোমশ হিংস্র দীর্ঘ নখেরা খুঁজে ফিরছে স্পন্দন।
কাকে স্বস্তি দেবে এই ভয়াবহ ; কে ধরা দেবে অন্ধ অন্বেষণের হাতে?
সমর্পনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যে প্রাণ একমাত্র সেই কি
শূন্যতার সহোদর? সে কি তার উৎসে প্রত্যাবর্তনশীল, যেখানে
বীজের মধ্যে প্রবেশ করছে বৃক্ষ
মৃত্যু প্রবেশ করছে প্রাণে
এবং সমুদ্র পাথরে।

রাত্রি নয়
দিন নয়
আলো কিংবা অন্ধকার নয়, এই দৃশ্যে পৌঁছুতে কত আলোকবর্ষ
প্রয়োজন? সে কি নক্ষত্রের জ্বলনক্ষমতাহীন কালো গহ্বর,
যেখানে ভর ও আকার হারিয়েছে তার সীমারেখা।
সেখানে বিলীন হবে অসীম জীবন,
তুচ্ছ ক্ষুদ্র দোয়েল আর ফড়িঙের মতো।
শেষবার তার স্বপ্নেরা স্বর্গবাহনে উঠবে–ট্রামলাইনের
সাজানো সিঁড়ির বাক ঘুরে, দেখবে সম্মুখে ধাবমান অগনন
হরিৎ দৃশ্য। ঈশ্বরের সাধ্য নেই তাকে প্রতিরোধ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহেদ রহমান

রূপসী বাংলার তুমি

তোমার রূপালি দেহ যখন তোমার বন্ধুগণ
শশ্মানের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন শোকাভূত,
এমন পাশব শ্লেষ কারা যেন
উল্লাসে নিক্ষেপ করেছিলো
শক্রুর তীরের মতো আকাশে বাতাসে গাছের শাখায়।

কারা ছিল এই সব কাপুরুষ, মূর্খ, কারা ?
তাদের অজানা নাম আমরা জানিনা,
যা জানার অনাগ্রহ
আমাদের আছে প্রচুর ঘৃণায়।

বিলম্বে হলেও কবি, আমরা জেনেছি শুধু,
রূপসী বাংলার তুমি
তুমি যার সূর্যমুখী আত্মা,
তুমি তার বটবৃক্ষ, দেবদারু দারুচিনি গাছ
যার ছায়াতলে নাটরের বনলতা সেন,
এখনো অপেক্ষা করে,
অপেক্ষা করছে কবিকুল
তোমার স্বর্ণালী দু'পা
গঙ্গাজলে ধোয়ার আশায়,
তোমাকে করতে আলিঙ্গন ফুলে ফুলে চন্দন সুবাসে।

তোমার রূপসী বাংলা থেকে একাত্তুরে
দিয়েছি তাড়িয়ে সংখ্যাহীন
কুটিল শকুন, দিগন্তের ঠিকানায় অন্ধকারে।

বাংলার মতন সুরঞ্জনা আজও তোমাকে
মনে করে, করবেও যুগ যুগ ধরে
যতদিন আকাশে আকাশে
দেখা যাবে গ্রহতারা।

নক্ষত্র ব্যতীত বিশ্বে তোমার নামের সমতুল্য
আর কী বা আছে !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহবুবুল আলম গোরা
অমৃত জীবনানন্দ

ঠিকানা না জেনে ভালোই হয়েছে
স্মৃতিরা জেগেছে বুকে
ভুবনেশ্বরের নিজের ভুবনে
সুজাতা থাকুক সুখে।

অমিতা কী আজো মিহিজামে আছে!
থাক নিয়ে বিস্মৃতি—
আমি ভুলব না কোনদিন সেই
পূর্ণ-চন্দ্র তিথি।

নিভৃত গোপনে নীল শাদা ফুল
ফোটে হেমন্তরাগে,
মরীচিকা জয়ী প্রৌঢ় হৃদয়ে
মৃগতৃষ্ণিকা জাগে।

ভালোবাসি নাকি ভালোবাসতাম
নেই আজ তাতে দ্বন্দ্ব—
বিরহ আমার বুকে আনে সুখ
অমৃত জীবনানন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজুল ইসলাম

জীবনানন্দ ও কবিতা

রাসবিহারীর ট্রাম নিয়ে গেছে কবিকে
কোথায় নিয়ে গেছে কেন নিয়ে গেছে কেউ জানে না—
তবে যাবার সময় ভাবিত চোখে কবি একবার
তাকিয়ে দেখেছিলেন চৌদিক
কী দেখেছিলেন কবি?
প্রত্যক্ষদর্শীর একজন জানালেন, কবি নাকি রাসবিহারীতে
একটি নদী ও একজন নারীকে খুঁজছিলেন সেই সময়

কেন? কী নাম সেই নদীটার? কে-ইবা সেই নারী?
মৃত্যু পথযাত্রী কবি নদী ও নারীর কাছে কী চান?

চলল অনুসন্ধান, রক্তের দাগ বেয়ে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে ...
ট্রাম লাইন ধরে সোজা যাওয়া হল হাসপাতাল
ঢুকতেই বিশাল ফটকের পাশে লালসালু কাপড়ে শাদা রঙে লেখা
'নিভিছে দিনের আলো,
—জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, কারে যে বাসিব ভালো
একা একা তাই ভাবিয়া মরিছে মন।'
ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে ওষুধের নাম নেই—শুধুই কবিতা
ওষুধ ও পথ্য খাওয়ার নিয়মবালাই কিছুই লেখা নেই
শুধুই কবিতা
রোগীর বেড চার্টে তাপ ও চাপের কোনোও গ্রাফিক চিত্র নেই
শুধুই কবিতা, কবিতার লাইন
রক্ত ও প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষার ল্যাবরেটরি রিপোর্টে
কোনোও ডাক্তারি তথ্য নেই মন্তব্য নেই শুধুই কবিতা
কবি শুয়ে আছেন শাদা বিছানা চাদরে শরীর বিছিয়ে
বালিশে মাথা রেখে কবিতার পঙক্তি খচিত
রোগীর কেবিন থেকে নার্সের টেবিল থেকে বাথরুমের ভেতর থেকে
ডেটল-স্যাভলন বা ওষুধের কোনও গন্ধ আসে না
আসে কবিতার সুরভি—
কবিতাগুলো একদিন পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে গেল বাতাসে
দেখা গেল সেখানে রয়ে যাচ্ছে একটি নদী, নাম তার জীবনানন্দ
দাঁড়িয়ে একজন নারী, সে কি কবিতা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনুর রহমান সুলতান
জীবনানন্দের জলপাইহাটি

জলপাইহাটি থেকে কলকাতার বিচিত্র মানুষ
দেখেছো তোমার বোধের আলোয়
মনের তিমিরে ডুবসাঁতার কেটে
জেনেছো তমসাবৃত কামনার সুখ কিভাবে নমিতা
কিংবা অর্চনার মতো, রমণীর মনোলোকে খেলা করে
খেলায় নিশীথ কিংবা হারীতের মতো যারা
মানুষের মুক্তি খুঁজে খুঁজে হয়ে ওঠে মুক্তিদূত।

বাইরের চোখে স্পষ্ট চেনা সময়ের মৃত্যু দেখে দেখে
ক্লান্ত পাখির বিধ্বস্ত নীড়ে ফেরা দেখেছো, দেখেছো
গোপন যন্ত্রণা তাঁকে তবুও তাড়িয়ে নিয়েছে
বিধ্বস্ত নীড়ের মাঝঘরে দাঁড়িয়ে খুঁজেছে সে নতুন আকাশ।

হারীতের নীড়ে ফেরা, ফেরা নয়
তাকে তুমি জাগিয়েছো, ফুটিয়েছো অন্ধকারের বুকে
রাত শেষে তার চোখ দেখবে মানুষের চোখে
ফুটে আছে কী নির্মল ভোরের আকাশ।

মানুষ পায় কী খুঁজে তিমিরবিনাশী ভোরের দেখা !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিমুল মাহমুদ

জীবনানন্দের কাব্যে প্রেম

ফিরে এসে কথা হবে—
তারপর ফিরে নাই আর।
কি কথা বলার ছিল
এতদিন পর !
ফিরে এসে কথা হবে বলে
কেটে গেল দশটি বছর।
রোদের রঙিন রঙ লেগে আছে
দেয়ালের গায়ে। গাছের পাখির রঙ
বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজিতেছে একা।
জলপাই পাহাড়ের বাঁকে
সাদা ঘোড়া হেঁটে যায় শব্দ তুলে।
তোমাকে বলতাম কিছু কথা
আজ আর হলো না বলা
তারপর কেটে গেল কতটা সময়।
সময় রাখেনা হিসাব নিজের দেহের
হিসাবতো আমার মতো ক্ষয়ে যাওয়া
দেহের জন্য এক ক্লান্ত শরীরের ভেতর
নিরিবিলি হাঁটিতেছে পথ।
ফিরে এসে কথা হবে বলেছিলে
আর একদিন ভুলে গিয়েছিলে সময়ের হিসাব।
এই ক্লান্ত শরীরে আবার যদি ফিরে আসে সে
কি কথা হবে তখন ওর সাথে এই অতি সামান্য সময়ে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার আমিন
মীন

বসে আছি ধানসিঁড়ি নদী তীরে, আমি মাছ–বিক্রেতা
নদীজলে কত সোনালী মাছ
উনুনে জ্বলছে অবিক্রিত লোভ
জীবন থেকে আনন্দ তবু নেয়নি অর্জিত ছুটি।

আমার চোখ কিছু দেখতে চায়
দৃশ্য বা দ্রষ্টব্য নয়
অনন্তের গভীর হ্রদ থেকে লাফিয়ে ওঠে যে
বিন্যস্ত প্রতীম মীন
তার ছায়ার মাঝে খুঁজতে চায়
ধরিত্রীর ধারাপাত।

হে আমি, আমার চোখ বন্ধ কেন
মহাশূন্যের ক্রন্দন আমি ছাড়া
দেখার আর কে আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের নিঃসঙ্গ মানস

রোখসানা চৌধুরী

যে সময়টাতে বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসকে বিশ্বসাহিত্যের সমান্তরালে গ্রহণযোগ্য শিল্পমানসসম্পন্ন করে তুলেছেন আর শরৎচন্দ্র এই মাধ্যমটিকে নিয়ে গেছেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে—সর্বজনস্তরে এর পরপরই দেখা যাচ্ছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপন্যাসের আধুনিকায়ন করছেন। উপন্যাসে আরো অধিক বাস্তবতা দানে ব্যস্ত জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ প্রমুখ। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এই আলোড়িত সময়ে জীবনানন্দ দাশকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কবিতার আকাশকে নুতনতর নক্ষত্রে ভরে দিতে। তাঁর মৃত্যুর প্রায় বিশ বছর পর নতুন করে আবিষ্কৃত হলো জীবনানন্দ প্রতিভার আরেক আকাশ। প্রতিষ্ঠিত কবি হয়েও তিনি ছুঁয়েছেন, দেখেছেন উপন্যাসের ক্ষেত্রকে—এবং চূড়ান্ত দক্ষরূপেই। উপন্যাসচর্চার যে জল হাওয়ায় তাঁর বসবাস জীবনানন্দ তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কবিতার মতো উপন্যাসেও তিনি বিষয়-ভাবনায় প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যে নতুন রূপরেখা আঁকলেন প্রচলিত কাহিনী আর ভাষার ছক এড়িয়ে। জীবনানন্দের মৃত্যুও যেমন রহস্যময় তেমনি রহস্য তৈরি করে গেলেন এত বিপুল পরিমাণ গল্প, উপন্যাসকে অপ্রকাশিত রেখে গিয়ে। অথচ কথাসাহিত্য অংশে ব্যক্তি ও কবি জীবনানন্দের অন্তর্লোকে ঘনিষ্ঠতর অনুপ্রবেশের সুযোগ মেলে। বিশেষত দেশ বিভাগের পর (১৯৪৮) রচিত উপন্যাসগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে সমকাল চেতনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিক্ষুব্ধ বিবমিষা। কবি কোলকাতার নাগরিক জীবনের সংসর্গে এসে সেই পরিবর্ত্যমান, নষ্ট জীবনযাপনের তীব্র অভিঘাতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা পরবর্তীকালের মূল্যবোধের অবক্ষয়।

তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ত্রিশ বা চল্লিশ দশকেই সীমিত। তাদের সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে সময়সৃষ্ট হলেও জীবনানন্দ সুকৌশলে তাদের পৌছে দেন শূন্যতার এমন এক স্তরে যেখানে অর্থ-কীর্তি-স্বচ্ছলতা ছাড়াও আরো অন্য এক বিপন্ন বিস্ময় আর একাকীত্ব তাদের নিঃস্ব করে দেয়। এখানেই জীবনানন্দ এক নতুন চেতনার জগৎ তৈরি করে ফেলেন আর স্বতন্ত্র হয়ে যান সমসাময়িক সব উপন্যাসিক হতে। তাঁর সেই বিস্ময়কর আত্মমগ্নতা প্রকৃতি-আবিষ্ট রচনায় যেমন, সমকাল সচেতন বিক্ষুব্ধ রচনাতেও একইভাবে উপস্থিত।

এক : নৈঃসঙ্গ্যচেতনার তাত্ত্বিক ধারণা

'The sad truth is that we remain necessarily strangers to ourselves, we dont under-stand our own substance. we must mistake ourselves ; the assiom

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'Each man is forthest from himself' will hold for us to all eternity of ourselves we are not 'knowers' (নীৎশে, The Genealogy of Morals, p. 15)

নীৎশের কথার সূত্র ধরেই বলা যায়, মানুষের নিঃসঙ্গতা জন্মসূত্রেই প্রাপ্ত। মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ আর নৈঃসঙ্গ্যচেতনার ইতিহাস আজকের নয়। সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরেই এই বোধ জাগ্রত হয়েছে সচেতন, স্বশিক্ষিত মানুষের মননে। কারণ সমাজ ব্যবস্থা যতই ভারসাম্যপূর্ণ অথবা বৈষম্যহীনই হোক না কেন, মানুষ অতৃপ্ত হবার মতো এক অসীম ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে এই পৃথিবীতে। তাছাড়া, সমাজ কখনো একই সাথে সকল মানুষের চাহিদা মাফিক নীতিমালা ঘোষণা করতে পারে না। কি দাস, কি সামন্ততান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক অথবা পুঁজিবাদী সমাজ—সর্বাবস্থাকেই জ্ঞাত-অজ্ঞাত অসন্তুষ্টি মানুষকে নিঃসঙ্গ করে তোলে।

এটা অনস্বীকার্য যে পুঁজিবাদ মানুষের ব্যক্তি সত্তাকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু একই সাথে পুঁজিপতি আর শ্রমজীবী মানুষের মাঝে একটা ভয়াবহ দেয়াল নির্মাণ করে দিয়েছে। এর ফোকড় গলিয়ে জন্ম নিয়েছে আরেকটি শ্রেণী—'মধ্যবিত্ত।' দ্বিধাগ্রস্ত উন্মূল অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত এই শ্রেণীটিকে ঘিরেই মূলত নৈঃসঙ্গ্য চেতনা নামক আধুনিক ব্যাধিটির বিস্তার।

আমাদের মধ্যবিত্তের যে সমাজ জীবনানন্দ তো সেই মধ্যবিত্তেরই কবি। কমল চক্রবর্তীর মতে, 'জীবনানন্দ আগাপাশতলা মধ্যবিত্তের লেখক। তিনি আসমুদ্র হিমাচল মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত বাঙালির কবি। ... মানে তুচ্ছতা, হীনমন্যতা, অন্ধকার, ব্যর্থতা, হতাশা, না-পারা, ক্লান্তি, অবসাদ এবং জয়ের জন্য চেষ্টা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের, অসুখ থেকে সুখ, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের দ্বৈরথ অস্থিরতার থেকে স্থির ও লক্ষ্যহীনতা ও হিপোক্রিসি মানে যা বিশ্বাস করি ভাবি তা না বলে যা বিশ্বাস করিনা, ভাবিনা, পারিনা, সেসব কথা, সে হল মধ্যবিত্ত' (মধ্যবিত্তের কবি, পৃ. ১১৮)।

জীবনানন্দের উপন্যাসগুলো এই মধ্যবিত্তের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা শুরু হয় গ্রামীণ জীবন থেকে উন্মূল হওয়ার প্রক্রিয়ায়, এবং একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের মধ্য দিয়ে। সর্বশেষে তার বিচ্ছিন্নতাজনিত পিছুটান থেকে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় সেই দ্বিধা তাঁকে শেকড়হীন করে রাখে আজীবন।

দুই : উপমহাদেশে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার স্বরূপ

যদিও মানুষ নৈঃসঙ্গ্যচেতনার বীজ ধারণ করে জন্ম নেয় তবু দেশ-কাল পারিপার্শ্বিকতা এলিয়েনেশনের রূপকে প্রভাবিত করে বৈকি। তাই প্রাচ্যের নৈঃসঙ্গ্যভাবনা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়িত ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈরাজ্যকে ভিত্তি করে সৃষ্ট।

বাংলাদেশের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল কুৎসিত দারিদ্র্যের কাল। এই পর্বের রাজনৈতিক সচেতনতা ও উত্তালতার সঙ্গে ঠিক বিপরীতধর্মী সমশক্তিতে সমাজ ও অর্থনীতির অধঃপতন ঘটে। ১৯২৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ববাজারে মন্দা যাওয়ায় ঘটে মুদ্রাস্ফীতি আর বেকারত্ব। বাংলাদেশের বাড়তি দুভার্গ্য ছিল উপনিবেশবাদের নির্মম ভার। বাঙালির মন ও মননে বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন (১৯০৫-১১), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), সাম্যবাদী নতুন চিন্তার উন্মেষ ও বৃটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া এসে পড়েছিল ভারতবর্ষের উপরেও। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত হয় 'ওয়াল স্ট্রীট ক্যাশ' এবং এরপর ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মন্দা। 'একারণেই যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩০-৩৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময় বেকারত্বের জন্য প্রায় ৪ কোটি ৩০ লক্ষ শ্রমিক বৎসব নষ্ট হয় এবং প্রায় ১৬৫০০ কোটি ডলার মূল্যের উৎপাদন হ্রাস পায়' (সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা : খন্দ্রেনাথ সেন, পৃ. ২১৯)। তাই ১৯৪৩-এ দেখা দেয় ভয়াবহ মন্বন্তর। ভ্রান্ত সরকারি নীতির ফলে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মজুতদারি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরি ও খাদ্যশস্য সরবরাহের সরকারি অব্যবস্থার দরুন দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করে।

যুদ্ধ পরবর্তী দুর্দশার সংবাদ দিতে গিয়ে তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত পত্রিকা সজনীকান্ত দাশ সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠিতে' বলা হলো—

'সর্বাপেক্ষা কোলাহল উঠিয়াছে আহার্য ও অপর প্রয়োজনীয় বস্তুর বিক্রয় এবং বন্টনের অব্যবস্থায়। এই অব্যবস্থার জন্য প্রথমত দায়ী যাহাদের হাতে দেশের শাসনভার আছে তাহারা।....তাহারা এদেশীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাতে এদেশীয়দের অন্নবস্ত্র সমস্যা সমাধানের ভার দিয়া ভগবানের ও বিবেকের কাছে দোষমুক্ত আছেন।'

জওহরলাল নেহেরু এজন্যই এই দুর্ভিক্ষকে 'মনুষ্য সৃষ্ট' বলে উল্লেখ করেন। স্বাভাবিক-ভাবেই বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা মারাত্মক আকার ধারণা করে। 'কল্লোলের কাল'-এ জীবেন্দ্র সিংহ রায় বলেন :

'এই সময়ে লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনের প্যাটার্ণও ছিল মানবেতর। তাঁদের অনেকে ছিলেন চালচুলোহীন, দিনান্তে পেটভরে খাবার সংস্থান সকলের ছিল না। শরীর অসুস্থ অপুষ্টিজনিত যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগে কেউ আক্রান্ত। সবকিছু মিলে দেহে ও মনে সরস স্বাস্থ্যের অভাব। এর অনিবার্য পরিণাম লেখকদের মেলাংকলিয়া, তার শিকার হয়েছিল কল্লোলের সাহিত্য।'

এ সমস্ত কারণেই বিশ্বযুদ্ধোত্তর তরুণ লেখকদের অনেকের রচনাতেই সংশয় অবিশ্বাস ও হতাশার সুর বেজেছে। জীবনের প্রচলিত মূল্যবোধে দৃঢ় আস্থার অভাব এ যুগের সাহিত্যের একটা সাধারণ লক্ষণ। এসব কারণেই মানুষের মূলগত সংকট শুরু হয়। সর্বত্র মানুষের অসহায়ত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা মানুষের মনের অলৌকিক আশ্বাস দূর করে দেয়। সাথে সাথে মনুষ্যত্ববোধ, দায়িত্বচেতনা, ব্যক্তি সম্ভাবনা—এসব মানবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে প্রায়-দানব। উৎকেন্দ্রিক পরিবেশে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই শোষণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন প্রবাহকে নতুন খাতে বইয়ে দিল। একদিকে পুঁজিপতিরা তাদের কালো টাকা সদ্ব্যবহার করে বার, ক্লাব ইত্যাদি উঁচু তলার জীবন নিয়ে চমক সৃষ্টি করতে লাগল। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দিন দিন চাকরিজীবী হয়ে দারিদ্র্য সীমার নিচে নামতে শুরু করল। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে এবং চাকরির আশায় অনেকেই শহরবাসি হয়ে গেল এবং সাথে সাথে আসক্ত হলো নাগরিক জীবনের সমস্ত কৃত্রিমতা লাম্পট্য ও ভণ্ডামির প্রতিও।

এই সময়েই প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন অচিন্ত্যকুমারকে—'মানুষের দিকে তাকিয়ে আজকাল কি দেখতে পাই জানিস? সেই আদিম পাশব ক্ষুধা হিংসা বিষ আর স্বার্থপরতা। চোখের বাতায়ন দিয়ে শুধু দেখতে পাই সুসভ্য মানুষের অন্তরে আদিম পশু ওঁৎপেতে আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই জীবনানন্দ দাশ ঐ পেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নিরাশ্রয়-নিঃসহায়-নিঃসঙ্গ মানুষের স্রষ্টার কথা ভাবেন, স্রষ্টার বিবেচনাবোধ সম্পর্কেই তাঁর সন্দেহ হয়। 'পৃথিবীটা বাস্তবিকই বড় ভয়াবহ। জীবনের বিধাতা একজন নির্বোধ চামারের চেয়ে অক্ষম অমানুষ।'

১৯৩৯-এ যুদ্ধ আরম্ভের পর থেকে রাজনৈতিক ঘটনাগুলির পাশাপাশি চলতে থাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—হিন্দু-মুসলমানের অমানবিক সম্পর্কের জঘন্য রূপ।

কেবল হিন্দু-মুসলিম বলেই নয়, মানুষের পক্ষে যে কোনো রকমের অশুভত্বকে যারা অবিশ্বাস করেছে, তারাই আমূল ব্যর্থ হয়ে শেকড়হীন অবস্থায় 'অদ্ভুত অপৃথিবী'তে পাক খেয়েছে। এরাই জীবনানন্দীয় পৃথিবীর বাসিন্দা—সর্বত্রই যারা বিচ্ছিন্ন-পরিত্যক্ত-অচেনা-অদ্ভুত।

তিন : জীবনানন্দের উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার উপস্থাপন

জীবনানন্দের গদ্যরচনার সময়কাল ত্রিশ দশকের শুরু থেকে দেশবিভাগের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ এবং মন্বন্তর মিলে পৃথিবীময় এক তীব্র সংকটের দিনে তাঁর কথাসাহিত্যগুলো রচিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে আমরা সময়ের এক সুতীব্র বেদনা অনুভব করতে পারি। 'জীবনের প্রচুর ভাড়ার' নিঃশেষ করার আগ্রহ থাকলেও পৃথিবীময় মাছি, ইঁদুর আর পেঁচার কুৎসিত নৃত্য-উৎসব দেখে নিরস্ত হয়ে যান তিনি, বিশ্বাস থেকে ক্রমেই অবিশ্বাসের পথে হাঁটতে থাকেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

মানুষের কদর্য মানবেতর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে জীবনানন্দের নায়ক তথাকথিত স্রষ্টা অর্থাৎ অলৌকিক পুরাণ পুরুষের প্রতি সন্দেহ আর অবিশ্বাস স্থাপন করেছেন। জীবনকে কোনো মহত্তর উদ্দেশ্যের প্রতি দিকনির্দেশ না করে জীবনকে খাঁচার মতো বলে অভিহিত করেছেন।

'বিভা' উপন্যাসে বিভার বাবা বর্তমান সভ্যতার রূপ দেখেছেন জীবনের পথে চলতে গিয়ে। একটা পাখির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ সেই তুলনায় কতটা তুচ্ছ ব্যাপার তিনি তা জানেন।

> এই কাকাতুয়াটার অবস্থা আগাগোড়া ঠিক আমাদেরই মত...এমনি করেই জীবনের বিরুদ্ধে আমরা অসভ্যতার পরিচয় দেই।...এই দেখ, আমরা প্রত্যেকেই এরকম শিক কাটতে চেষ্টা করছি, কিছুতেই পারছিনা। এমনি গভীর প্রতিবাদ করছি, শুনছেনা, এমনি নিজের জীবনটাকে নিষ্ফলতার ফাঁকে ফাঁকে আঁচড়ে কামড়ে খিচড়ে ফেলছি, অন্য কারো তাতে কিছু এসে যাচ্ছেনা। তারপর অবসন্ন হয়ে জীবনের এক কোণে ঘাড় হেঁট করে পড়ে থাকছি। পাখিটার বেলা তুমি বরং এইসব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ। মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছ। নিজে অন্তত বেদনা পাচ্ছ। কিন্তু আমাদের বেলা তোমার মতন সমবেদনা পরায়ণ বিলাসি শৌখিন তৃতীয় ব্যক্তিকে হাতের কাছে কোথাও হাতড়ে পাচ্ছিনা।
>
> (জীবনানন্দ, বিভা ; দেবেশ রায় সম্পা., পৃ. ৯২-৯৩)

দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা তাঁর প্রায় সব উপন্যাসে প্রকাশিত। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি একইরকম নিস্পৃহ, কিছুটা ভীতও ছিলেন বলা যায়। 'এক-একদিন শেষ রাতে গভীর অন্ধকারে ও শীতের ভেতর ঘুমের বিছানা এত ভালো লাগে, জীবনের হৈ-হুটপাট কলরোল এত নিরর্থক মনে হয় যে, ভোরের আলোর কথা মনে করে ভয় করে তার' (মাল্যবান : জীবনানন্দ)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার ;
ভয় পেয়েছি
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা।

(অন্ধকার : বনলতা সেন)

পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়ানোর কর্ম নির্দেশ পেয়ে কবির হৃদয় ঘৃণায়-বেদনায়-আক্রোশে ভরে গেছে। তাই অন্ধকারের যোনির ভেতর, স্তনের ভেতর, অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছেন তিনি। কারণ, তিনি জানেন যেখানেই উদ্যম, চিন্তা, কাজ—সেখানেই প্রতিযোগিতা, স্বার্থপরতা, পুরস্কারপ্রাপ্ত আর পিছিয়ে পড়া মানুষের শ্রেণী বিভাজন।

'কারুবাসনা' উপন্যাসে নায়কের মেজকাকা অভ্যাগতরূপে আগত শহুরে সুসজ্জিত মেদপুষ্ট সচ্ছল একজন গৃহমালিক। অনায়াসে তিনি পঞ্চাশ টাকা মাইনে প্রাপ্ত ভাইয়ের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেন। একটি পয়সা নিজে খরচ করেন না। বরং তার ভুরিভোজনের বিলাস সামলাতে গিয়ে স্কুল শিক্ষক ভাইয়ের ঋণ দাঁড়ায় পাঁচ হাজারের উপরে। মেজকাকা নিজের জন্য আলাদা চাকর রাখেন, আলাদা খাবার তৈরি করান। কিন্তু বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দিয়ে কারো সাথে কথা বলার প্রয়োজন মনে করেন না।

নব্য সভ্যতার প্রসব এইসব 'কৃমিকীট' মানুষদের চরিত্রে রিপুজনিত সকল প্রকার অশুভ দিকেরই বিকাশ ঘটে। নির্লজ্জ নির্বিকারত্বে মেজকাকা নির্জন দুপুরে (বৌদির সঙ্গ কামনা করে। পুত্রবধূকে দিয়ে পায়ে তেল মালিশ করাতে চায়। বড়দাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়—'কামনাই বলুন প্রেমই বলুন সে-সব জিনিষের তাড়া আমার বড্ড বেশি ; কাজেই ডাক্তার, লোশন, অনেক কিছুই লাগে' (কারুবাসনা : জীবনানন্দ)।

গ্রামে এসেও তার সংযমের বালাই নেই। উপনিষদ পড়া দাদার শান্ত, পবিত্র সমাহিত পরিবেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সে তাঁর কাজ চালিয়ে যায়।

তাঁর প্রতিটি গল্প-উপন্যাসেই এইসব স্থূল রুচিসম্পন্ন মানুষের ভিড় লক্ষিত হয়। এই চরিত্রগুলোই তাঁর নায়কদের অবস্থানকে সংকুচিত আর নিরর্থক করে তুলতে যথেষ্ট। মেজকাকার সাড়ম্বর পদচারণা আর নির্লজ্জ দাবি-দাওয়াকে হেম-র বাবা, মা, পিসি সকলেই ন্যায্য বলে মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছে। বরং হেম যে বেকার সময়টা বসে বসে কাটাচ্ছে সে বিষয়ে তার মা পর্যন্ত সচেতন এবং অভিযোগ জানাতে তৎপর।

'জীবন প্রণালী' উপন্যাসেও একই আদলে সৃষ্ট কিছু স্থূল রুচির মানুষ দেখা যায়। শচীনের বাল্যবন্ধুরা ছুটিতে বাড়িতে এসে তার স্থবির কর্মহীন জীবনযাপন নিয়ে রসিকতা করে, তার দারিদ্র্য নিয়ে অভদ্রভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। সব উপন্যাসেই তিনি প্রতিবেশের বিরুদ্ধতাকে সংগ্রহ করেন নায়কের বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তুলতে। নায়ক নিশীথ বা শচীন ক্লান্তিহীনভাবে কথা বলে যায় সাক্ষাৎকার প্রদানের মতো করে। ঔপন্যাসিক যেন তা বিশেষ উদ্দেশ্যেই প্রণয়ন করেন।

'জলপাইহাটি'তে নিশীথ কলকাতার পথে পথে ঘুরে এদের দ্বারস্থ হয়। 'জীবনপ্রণালী' এবং 'কারুবাসনা'য় এরা বাড়ি বয়ে এসে নায়কের নিঃসঙ্গতার সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়ে যায়।

'কারুবাসনা'র মেজকাকা, 'জলপাইহাটি'র কুলদাপ্রসাদ বা 'জীবনপ্রণালী'র শ্রীবিলাস মোটামুটি একই ছাঁদের চরিত্র। জীবনকে উপভোগ করার সময় এদের কোনো পিছুটান বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্পণ্য থাকে না। এমনকি লুকোচুরির ইচ্ছেটুকুও নেই। তা সত্ত্বেও জীবনানন্দের নায়ক অত্যন্ত সরল ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে ছুটির দু'মাস শ্রীবিলাস কোনো থিসিসের পড়াশোনায় ব্যয় করেছে কিনা কিংবা এথিকস বা চাইনিজ সেইন্ট বলতে শ্রীবিলাস এখন শুধু একটা রেসের ঘোড়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে কিনা।

এই ভোগবাদী সমাজ জীবনের নান্দনিক দিককে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জীবনকে কতটা অপমান করে চলেছে শচীন যেন তাই দেখতে চায়। রাজেন বা যদুনাথ বাবুর মতো শ্রীবিলাসও শচীনের গায়ে পড়ে পরামর্শ দেয় চুপচাপ বসে না থেকে সাহেবি ক্লাবে স্টুয়ার্ড হয়ে যেতে। এক'শ টাকা ধার চাইতে গেলে অবশ্য আসল চেহারা প্রকাশ পেয়ে যায়। মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অপমান করতে থাকে। টাকা দেবার শর্তস্বরূপ প্রথমে জুতা ব্রাশ করে দিতে বলে, স্ত্রীসমেত শচীনকে বিক্রি করেও এক'শ টাকা হবে না তাও জানান দেয়। অবশেষে মর্টগেজ রাখার মতো কিছু নেই বলে রসিকতা আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেই ফিরিয়ে দেয় শচীনকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী যে মন্দা ভাব পরিলক্ষিত হয় এর পরের ইতিহাস ধারাবাহিক মুদ্রাস্ফীতি আর বেকারত্বের। এই সময়ে যে সব শিল্পী, লেখকের আবির্ভাব, তারা সকলেই এই কালিক বিপর্যয় আর বৈরী পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। জীবনানন্দের উপন্যাসগুলো রচিত হয়েছিল এমনি বৈরী বিপর্যস্ত সময়ে।

'আমিত্তির নাহান প্যাঁচে প্যাঁচে রস সেই জিনিসের হেইয়ার নাম ট্যাহা' (সুতীর্থ)। পুঁজিশাসিত কনজ্যুমার পৃথিবীর এই অমৃতবাণী জেনে গেছে বিরূপাক্ষ (সুতীর্থ)। অর্থনীতির ভাষায় অর্থ হলো সেই পণ্য যার বিনিময় যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। জীবনানন্দের উপন্যাসে প্রায় সব মানুষই অর্থের কাছে কম বেশি পরাভূত। পরাভূত তাদের প্রেম-ক্ষমা-বিশ্বাস।

তাই জীবনানন্দের পৃথিবী ভরে যায় তিমির পচনে, অমেয় দুর্গন্ধে। আজকের অদ্ভুত অপৃথিবীতে অর্থ ছাড়া অন্য কোনো কিছুরই অর্থ নেই—এই সরল বাক্যটিকে কবিতায় আর তত নগ্নভাবে প্রকাশ করা যাচ্ছিলনা হয়তো—তাই এই কীটদষ্ট সমাজ স্বদেশের চিত্রতুলে ধরতে উপন্যাসের আয়োজন করেছিলেন জীবনানন্দ। শুধু কীটদষ্ট সমাজ নয়, সেখানে একজন কারুতান্ত্রিক মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষের কোণঠাসা চূড়ান্ত নিঃসঙ্গতাকে তুলে ধরাটাই প্রাধান্য পেয়েছে উপন্যাসগুলোতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জীবনের অসফলতা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছলে এই সব মানুষ নিস্তব্ধতা আর ঘুমের দিকে—ঘুম আর মৃত্যুর দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছিল। এছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো পথ ছিল না। পথ থাকেও না। তবুও জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সফল করে তুলতে শচীন, নিশীথ, হেম—এরা কেউই কম চেষ্টা করেনি। এই প্রয়াস চালাতে চালাতে তারা প্রাণান্ত হয়েছে। জীবনের পথে তারা ছিড়ে গেছে, ফেঁড়ে গেছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের ভেঙে পড়া চেহারার এমন নগ্ন পীড়িত বিবরণ আর কোথাও পাই না।

তিনি অবাক হয়ে বলেন—

> পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,
> যেখানেই যাই আমি সেইসব সমুদ্রের উল্কায় উল্কায়
> কেমন স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক।
>
> (আদিম দেবতারা : মহাপৃথিবী)

পৃথিবীব্যাপী মানুষের ধারাবাহিক এই নষ্টমানতা দেখে তিনি স্বাভাবিক প্রমাণিত মহত্ত্বেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। তিনি শুধু জানেন 'অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ, অপরের মুখ ম্লান করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।' তাই, মাল্যবান ভাবে, 'প্রকৃতি এদের এত মোক্ষম কাম প্রবৃত্তি দিল কেবলই সন্তান বানিয়ে কেবলই সেগুলোকে ধ্বংস করবার জন্য। এদের লালসার বাড়াবাড়ির সুবিধা নিয়ে এদের দিয়ে কেবলই ঝাড়বংশ বাড়াচ্ছে কাটাচ্ছে খাচ্ছে মানুষ' (মাল্যবান : জীবনানন্দ)।

চার : ব্যক্তি জীবনানন্দ দাশের স্বভাব ও জীবনযাপন

আজ পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশের পূর্ণাঙ্গ কোনো জীবনী গ্রন্থ লেখা হয়নি। তাঁর অপ্রকাশিত বিপুল পরিমাণ গল্প, উপন্যাস অগোচরে থাকার বিশেষ কোনো কারণ ছিল কিনা তার জবাবদিহি করবার মতো কেউ নেই। প্রুফ সংশোধনের সময় পাননি নাকি নিজের গদ্যরচনার শক্তির উপর আত্ম-বিশ্বাসী হতে পারেননি—আজ আর সুনির্দিষ্ট উত্তর পাবার উপায় নেই।

তবে তাঁর জীবনেতিহাস না পাবার পেছনে কারণও আছে।

প্রথমত, তিনি আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট হওয়া তো দূরে, পুরোপুরি কুণ্ঠিত ছিলেন। 'হয়তো দৈনন্দিন জীবন নির্বাহে অনেক রকম ধাক্কা খেয়েই ওর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের চূড়ান্ত অভাব জন্মেছিল। ১৯৪৯-৫০-এর কথা বলছি। আমি, অরুন কুমার সরকার, নরেশ গুহ আরও কেউ ছিলেন কিনা এখন মনে নেই—একদিন ওর বাড়ি গেছি। আবদার জানিয়েছি ওর কবিতার ঝুলি থেকে অপ্রকাশিত কবিতা বের করে আমাদের যেন দেখান। খুব কুণ্ঠাভরে তোরঙ্গ খুলে 'অন্ধকার' কবিতাটি বের করলেন। এক্সারসাইজ বুকের রুলটানা পৃষ্ঠায় পেনশিলে লেখা, প্রায় ধূসর হয়ে এসেছে : 'এটা কি চলবে? পড়ে আমরা 'থ, আমাদের সমবেত চিৎকার—এ জিনিস এতদিন ফেলে রেখেছিলেন আপনি?'

জীবদ্দশায় জীবনানন্দ দাশের স্বীকৃতি না পাবার কারণ হিসেবে অশোক মিত্র এই ঘটনার উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্র পরবর্তী প্রধান কবি হওয়া সত্ত্বেও তার তেমন পরিচিতি ছিল না জনসাধারণ্যে। এর একটা কারণ হতে পারে তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা। তবে বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর খ্যাতি ছিল, তবে সেটা সুখ্যাতি নয়—কুখ্যাতি। কবিতার অশ্লীলতার দায়ে তার চাকরি চলে গিয়েছিল বলে তিনি মোটামুটি বিতর্কিত কবি ছিলেন।

তৃতীয়ত, তাঁর মৃত্যুর পরেও দীর্ঘদিন কোনো সঠিক মূল্যায়ন না হওয়ায় কোনো জীবনীকার তো বটেই, পরিবারের সদস্যরাও এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাননি।

এমনকি কবি পত্নী লাবণ্যদাশের যে স্মৃতিচারণা (মানুষ জীবনানন্দ) পাওয়া যায় সেখানেও কবির পরিচয় অনেকাংশে দূর থেকে দেখা মানুষের ছবি ফুটে উঠেছে। এটাই স্বাভাবিক, জীবনানন্দের নির্জন, নিস্তব্ধ স্বভাব সহজে কারো কাছে নিজেকে মেলে ধরবার পুরোপুরি বিপক্ষে ছিল। তাছাড়া, দাম্পত্য জীবনে উভয়েই যে পরস্পরকে নিয়ে অসুখী ছিলেন আজ তা সর্বজন বিদিত। তাই স্ত্রীর কাছে হয়তো আরো বেশি অবগুণ্ঠিত ছিলেন।

প্রকৃতির প্রতি আজীবন এক নিবিড় ঘনিষ্ঠতা অনুভব করেছেন জীবনানন্দ যা মানুষ বা মানুষের সমাজের সাথে কখনো করেননি।

দেখা হলে যখন জিজ্ঞাসা করতাম 'মানুষের সঙ্গে মেশেননা কেন? তার একটি মাত্র উত্তর শোনা যেত, ভালো লাগে না। মানুষের সঙ্গ তাঁর অসহ্য লাগত। সাহিত্যিক আলোচনার মধ্যে অন্যেরা যদি হাজার কথা বলতেন, জীবনানন্দের মুখ থেকে বেরুতো দু'একটি নিস্পৃহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্তব্য। নিজের মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল এই নিঃসঙ্গতাপ্রিয় কবির স্বধর্ম। আমার বিবেচনায় সবচেয়ে সত্তা উদঘাটক যে দুটি কবিতা—'বোধ' আর 'অন্ধকার' পড়ে মনে হয় উনি মানুষকে ভয় পেতেন। সম্ভবত মনুষ্যেতর চেতনা দিয়ে উদ্ভিদের প্রাণ, তার সত্তাকে অনুভব করতেন। নইলে অত সহজে কোনো কবিতায় ঘাস চিবানোর কথা, ঘাসের শরীর ছানবার কথা বলতে পারতেন না। মানুষকে ভয় পেতেন, কেননা মানুষ প্রকৃতিকে নিধন করে, ক্রুরতার আস্ফালনে প্রকৃতিকে নিঃশেষ করে। এবং নিঃশেষ করে পরস্পরকে। হয়তো এরই পরিপূরক তাঁর একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা বোধ।

এই সৌন্দর্যের উপাসক কবি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যতই মুখোমুখি হচ্ছিলেন নষ্ট সভ্যতার ততই গুটিয়ে যাচ্ছিলেন নিজের ভেতরে। ক্রমশ পৃথক হয়ে যাচ্ছিলেন সবার থেকে।

'তাঁর কবিতায় ক্রমশই লক্ষ্য করছিলাম একটি শান্ত স্বাগত ভাষণ' একটা গভীর দুঃখের, গভীর অভিজ্ঞতার উচ্চারণ—যেখানে তিনি প্রবল নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা কোন সমস্যা এড়াবার চেষ্টা থেকে নয়, এই নিঃসঙ্গতা কোন সমাজ সংসারের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবার বোধ থেকে নয়। তখন কোন কোন রাজনৈতিক কবি, তাঁরাও আমাদের প্রিয় ছিলেন—জীবনানন্দকে ধিক্কার দিয়েছিলেন পলাতক বলে। আমি যে নিঃসঙ্গতার কথা বলছি তা এই পলাতকের নিঃসঙ্গতা নয়, তা বরং মনীষার নিঃসঙ্গতা'(শিশিরকুমার, 'জীবনানন্দ : ব্যক্তিগত অনুভূতি', কোরক, পৃ. ২৪৬)।

এই মনীষার নামই হয়তো 'বোধ'। যার হাত থেকে কবি মুক্তি পাননি। সহজ লোকের মতো আর চলতে পারেননি নিজেরই মুদ্রাদোষে।

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
... ...
তাদের হৃদয় আর মাথায় মতন
আমার হৃদয় না কি?—তাহাদের মন—
আমার মনের মতো না কি?
তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী!
(বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

শেষ পঙ্‌ক্তিটি আর প্রশ্ন সূচক নয়, স্বীকারোক্তিমূলক। কবিতায় শুধু নয়, অচিন্ত্যকুমারকে লেখা চিঠিতেও তিনি স্বীকার করেন, 'আমার দোষ আমি সহজে কাউকে ধরা দিতে পারি না। কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্বের সুপরিসর সরসতা ছিল আলাদা জিনিস। এই সজীবতা ও স্নেহ আজকের পৃথিবীর সবদিকেই সব বিভাগেই বিরল। সাহিত্যে হয়তো সাহিত্য আছে। কিন্তু যে মানুষ তা সৃষ্টি করে সে সত্যিই প্রায়ই মানুষ নয়।'

মানুষের প্রতি অবিশ্বাস এভাবেই প্রোথিত ছিল তার মনে। নিজে তিনি স্বার্থবুদ্ধিহীন, বিশুদ্ধ মানুষ ছিলেন তার নানা রকম প্রমাণ আছে। এই বিশুদ্ধতা নিয়ে তিনি সকলের কাছে যেতে পারেননি।

কিন্তু কেন এই মানুষভীতি? মানুষের প্রতি কোনো অন্যায় অশোভন আচরণ তো তিনি করেননি। কৃত্রিম তো দূরে, প্রকৃত সাফল্যেও তিনি উদ্ধত হতে পারেননি। 'বাবা ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যন্ত প্রচার বিমুখ। রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন। পুরস্কারের ছোটখাটো জিনিস নিঃশব্দে খাটের নীচে রাখলেন। দেখতে পেয়ে বলেছিলাম এসব কি? বলেছিলেন, ওই...। কোন বিজয়ীর চিহ্ন কোথাও নেই। শুধু একরাশ নিস্তব্ধতা।'

এই প্রচার বিমুখতা তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় তো বটেই, মৃত্যুর পরও প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। কিছু সাহিত্য সমালোচকের কারণে 'ক্যাম্পে' কবিতায় অশ্লীলতার দায়ে তার চাকরি যায়, তিনি প্রতিবাদ করেছেন সামান্য, তারপর চুপ হয়ে গেছেন ঘৃণা নিয়ে। প্রত্যক্ষভাবে যা পারেননি, কবিতায় সেই ঘৃণা আকণ্ঠ প্রকাশ করলেন সব শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষকে চমকে দিয়ে। তাঁর কবিতার পক্ষে-বিপক্ষে প্রচুর সমালোচনা চলেছে, তিনি শুধু নীরব আর একা হয়ে নষ্ট সভ্যতা, নষ্ট মানুষের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করে চলেছেন—

> যে সব যুবারা সিংহীগর্ভে জন্মে পেয়েছিল কৌটিল্যের সংযম
> তারাও মরেছে—আপামর।
> যেন সব নিশিডাকে চলে গেছে নগরীকে শূন্য ক'রে দিয়ে—
> সব ক্বাথ বাথরুমে ফেলে।
>
> (একটি কবিতা : সাতটি তারার তিমির)

কিন্তু তিনি যে একই সাথে উপন্যাসে, গল্পে একইভাবে বরং আরো বেশি করে শুচিবায়ুতা পরিহার করে মানুষের নগ্নরূপ ফুটিয়ে চলেছেন তা তখন সকলেরই অজ্ঞাত। 'সাহিত্যে শুচিবায়ুতার দিন অনেক কালই অবসিত। তবু এই শূন্যগর্ভ সময়ের প্রতি যে ঘৃণার তীব্রতা জীবনানন্দের কলমে প্রকাশিত তেমন প্রকাশ আর কারো লেখায় দেখি না। আসলে এত ঘৃণাও কেউ করেননি। দিনকালের সঙ্গে মনের একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন আর সকলেই ; ঠিকঠাক গুছিয়ে নিয়েছিলেন জীবনটাকে। শুধু জীবনানন্দই পারেননি। চিরকালই থেকে গিয়েছিলেন অন্যমনস্ক, সঙ্গহীন, নিরাপদ বস্তু সাফল্যের জগতে আর সকলের চেয়েই ব্যর্থ এবং বড় জনের কাছেই শেষ পর্যন্তও নির্মমভাবে উপহসিত একজন মানুষ' (সুমিতা চক্রবর্তী, জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল,—লোকসাহিত্য, পৃ. ৬)।

তবে জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা তিনি করেননি তা নয়। কিন্তু এই চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি 'ছিড়ে গেছেন ফেঁড়ে গেছেন' তাঁর উপন্যাসের নায়কদের মতোই। তাঁর উপন্যাসে যে নায়কদের সন্ধান পাই তারাও তাঁর মতোই নিজের নীতিবোধের সঙ্গে সমঝোতা করতে অক্ষম। জীবনের সফলতা নির্মাণে মানুষ যেটুকু বিকৃতি স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় তিনি এবং তাঁর নায়কেরা সেটুকুও মেনে নিতে অক্ষম। তাই সারাজীবন জীবনানন্দ দাশ চাকরি বিষয়ে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন ছিলেন। জলপাইহাটির নিশীথ যেমন শেষ বয়সে জলপাইহাটি কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ঘুরে বেড়ায় কাজের আশায়, তেমনি জীবনানন্দ দাশও শেষ বয়সে ১৯৪৬ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু নিশীথ-শচীন-হেম-সুকুমারদের মতোই তিনিও বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারেননি।

শনিবারের চিঠির অবিরাম বিদ্রূপ এবং বুদ্ধদেব বসুর প্রচার সত্ত্বেও জীবনানন্দ তখনও সাধারণের কাছে অপরিচিত। শিল্প-সাহিত্যের নির্জনবাসী উচ্ছ্বাসগুলো তুলে ধরার মতো বিবেচনা ও নিঃস্বার্থ বুদ্ধি, আজকের মতো তখন কোনো পত্রিকাওয়ালার ছিল না। আয়ুর শেষ সীমানায় তাঁকে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের একশো টাকার পুরস্কারটি দিতেও কারো কারো আপত্তি ছিল। দুর্ঘটনায় তাঁর সাঙ্ঘাতিক আহত হবার সংবাদও কোনো দৈনিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাপা হয়নি। মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছিল, ছোট করে, ভিতরের পৃষ্ঠায়। সংবাদের সঙ্গে কোনো ছবি ছিল না। কিছু কিছু ভুল তথ্যও ছিল। বম্বের দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া'তে তার মৃত্যু সংবাদে তাঁর নাম 'জীবানন্দ' এবং জন্ম সাল ১৮৯৮ ছাপা হয়েছিল।

এইসব উপেক্ষা, অবহেলা আমৃত্যু তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। তিনি সকল বিষয়েই সবার থেকে পৃথক হতে পারতেন বলে তাকে 'পাগল-বদমাশ' উপাধি দিতেও কেউ দ্বিধা করেননি। কিন্তু একজন মানুষ কখন পৃথক হতে বাধ্য হন সমাজ সংসার হতে তা আমাদের জানতে হবে। গতানুগতিক চিরাচরিত পথে যারা চলে না তাদের অনেকেই 'ক্ষ্যাপা পাগল' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকেন। অসুস্থ বুর্জোয়া সমাজে যারা নিজেদের মানিয়ে নিয়ে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে তারাই সুস্থ? না, যারা দূষিত বিষাক্ত সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার দরুন অন্য পথে চলে, অন্য চিন্তা করে তারাই সুস্থ? (ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিলয়ের অভিভাবন',—প্রতিভাস, পৃ. ১১৫)।

জীবনানন্দ কিন্তু নিশ্চুপ হলেও সচেতন, কবিতায় তাঁর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে আমরা নীরব হাসি শুনতে পাই—

'বরং তুমি নিজেই লেখো নাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিন্ড দিলো না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা :
(সমারূঢ় : সাতটি তারার তিমির)

জীবনের এইসব তিক্ত অভিজ্ঞতাজনিত কারণে তিনি মানুষের সঙ্গ পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতেন।

এই সলজ্জ, অবগুণ্ঠিত ব্যক্তিত্ব, তাঁর শুভার্থীদের মধ্যেও বিস্তৃত ছিল। সেজন্যেই কবিতা বিষয়ে তার নিজস্ব ভাবনা, মতবাদ-মতামত সম্পর্কে আমরা বিশেষ কোনো তথ্য পাই না।

জীবনানন্দের জীবনে রক্ত মাংসের জীবন্ত রমণীর উপস্থিতি যে বিরল ছিল তা তাঁর পরিচিতিজনদের সাক্ষ্য এবং তার নিজের জীবনযাপনের নিভৃতচারিতাই প্রমাণ দেয়। তবু কখনো কখনো তার বহুল আলোচিত কবিতার চরিত্র 'বনলতা সেন' অতিকৌতূহলীদের ভাবিয়ে তোলে। কারণ আরেকটি উপন্যাসেও (কারুবাসনা) বনলতা সেন নামে একটি চরিত্র এসেছে যার সঙ্গে নায়কদের কুড়ি-বাইশ বছর আগে পরিচয় ছিল—পাশের বাড়িতে থাকত সে।

'নগ্ন নির্জন হাত', কবিতাটির এই অসাধারণ শিরোনাম আরেকটি উপন্যাসের (প্রেতিনীর রূপকথা) বিশিষ্ট স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও 'বনলতা' নামের সাথে অসম্ভব সাদৃশ্যপূর্ণ 'বিনতা' নামের এক অস্পষ্ট পরিচয়ের রমণীর স্মৃতিচারণায় বিভোর থাকে নায়ক।

কিন্তু ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত 'শিল্পরূপ' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে প্রেমেন্দ্র মিত্র বন্ধুদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'জীবনানন্দের নামে বনলতা সেনঘটিত কোনও কাহিনী শোনা যায়নি। তিনি এমন ধাতের মানুষ ছিলেন যে তার পক্ষে প্রেম বা অবৈধ প্রেম সম্পর্কের কোনও একটিও গড়া প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। কবিতায় যতই নারীকে পাওয়ার ইচ্ছা থাক, সাধারণভাবে নারীকে তিনি এড়িয়ে যেতেই ভালোবাসতেন...ক্লাশ ছাড়া বিশেষ কথাবার্তা ও মেলামেশা করার ব্যাপারে জীবনানন্দ বেশ অস্বাভাবিক থাকতেন, জানিয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপালচন্দ্র রায় রচিত 'জীবনানন্দ' বইয়ে ছাত্রী বকুল মজুমদার' (অদ্রীশ বিশ্বাস, 'জীবনানন্দ নারীধারণা, গদ্য আর কবিতা', শারদীয়া 'এবং মুশায়েরা' কলকাতা ১৪০৪)।

জীবনানন্দ দাশের চরিত্রের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এতক্ষণে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে তা হলো নির্লিপ্ততা। অসম্ভব নিরাসক্ত হৃদয় নিয়ে তিনি মানুষের সমাজে মিশেছেন।

এই নির্লিপ্ত নির্বিরোধী স্বভাবের জন্যই জীবনের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে প্রতিকার করতে তিনি ছিলেন ব্যর্থ। তাই সারাজীবনে তিনি না পেয়েছিলেন অর্থনৈতিক সাফল্য, না পেয়েছেন কবির স্বীকৃতি।

জীবনানন্দ দাশ 'শনিবারের চিঠি' নিয়ে খুব বিচলিত ছিলেন না, কিন্তু 'ক্যাম্পে' কবিতাটিকে অশ্লীল বলাতে তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর কৈফিয়ৎ হলো 'হৃদয়ের বোন' শব্দ বন্ধের জন্য তিনি শেলীর 'Souls sister' অভিব্যক্তির কাছে ঋণী। যাদের মন Prurient তাঁদেরই অবাধ শক্তি রয়েছে সব কিছুর ভেতরেই নিজেদের প্রয়োজনীয় খোরাক খুঁজে বের করার। তাঁদের কাছে 'ক্যাম্পে' অশ্লীল এবং আকাশের নক্ষত্রও শ্লীল নয়।

তিনি এই কবিতার জন্য যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তাঁর জীবনের এবং কাব্যভাবনার পরিচিত সুরটি ধরা পড়েছে। সেই পরিচিত সুর, নিরাশ্রয় ব্যর্থতার হাহাকার, নৈঃসঙ্গ্যচেতনার গভীর প্রদেশ থেকে উত্থিত।

তবে আঘাত শুধু শত্রুপক্ষ নয়, মিত্রশিবির থেকেও আসতে শুরু করল। 'শনিবারের চিঠির' রুচিহীন ব্যঙ্গস্রোতকে তিনি সয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা। কারণ এই উদার বুদ্ধি সম্পন্ন, মেধাবী ও আধুনিক মানুষটিই প্রথম জীবনানন্দ দাশের বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে। কিন্তু 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হলে তিনি কবিকে 'স্বভাবচ্যুত' ও 'ধর্মচ্যুত' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি আরো বলেন, হুজুগের হুঙ্কারে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন।'

তাঁর যুগোপযোগী হয়ে ওঠার প্রয়াসে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, আর যথেষ্ট যুগোপযোগী নন মনে করে তাঁর প্রতি বিমুখ ছিলেন অন্য এক দল কবি-সাহিত্যিক। রক্ষণশীল 'শনিবারের চিঠি' তাঁকে নির্মম আঘাত হেনেছে, প্রগতিশীল পরিচয়ও তাঁকে সমাদর করেনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দেবকুমার বসু—এঁরা প্রত্যেকেই জীবনানন্দকে বুঝে উঠতে না পেরে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কুণ্ঠিত স্বভাব এই মহাকবিকে শামুকের মতো গুটিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। যদিও এই সব 'স্বঘোষিত সমালোচকেরা' পরে অনেকেই তাঁদের বক্তব্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন।

এই মূল্যায়নের ভুলে তাঁর সাহিত্যিক জীবন যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমনি আর্থিক দিক দিয়ে কোনো দিনই দুর্দশাকে তিনি অতিক্রম করে উঠতে পারেননি। বলা যায়, আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠেছিলেন এবং আমৃত্যু এই সংকট উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

বিয়ের পর দীর্ঘ পাঁচ বছর তাঁকে বেকার জীবনযাপন করতে হয়। এই রচিত উপন্যাসগুলোতে তাঁর বেকার জীবনের হতাশা, নিঃসঙ্গতা, আত্মীয়স্বজনের উপেক্ষা-অবহেলা-উৎকণ্ঠা ধরা পড়েছে। দাম্পত্য জীবনে আর্থিক অনটন থেকেই অশান্তির বীজ রোপিত হয়। 'কারুবাসনা', 'জীবনপ্রণালী' এবং 'প্রেতিনীর রূপকথা' ১৯৩৩-এ রচিত এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনটি উপন্যাসেই নায়কের বেকারত্ব এবং তজ্জনিত দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতার চিত্র দেখানো হয়েছে। কিছুদিন জীবনানন্দ দাশ অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে অন্য কাজে বৈষয়িকভাবে সফল হতে চেষ্টা করেছিলেন। এ পর্যায়ে ইনশিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন, ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে কোনো এক বন্ধুর সাথে ব্যবসার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু কোনোটিতেই সাফল্য বা স্বচ্ছলতা আসেনি। কারণ 'জীবনকে তিনি চেৎলার হাটে কিনে মাৎলার হাটে বিক্রি করতে পারেননি। মুদ্রাকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনীতির নব্য চালচলনে কূটনৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন কৌশলী হওয়া ছাড়া কোনোরকম সাফল্যই আশা করা যায় না। সুতরাং অন্যরকম উপায়ে অর্থোপার্জন চেষ্টায় তাকে ইস্তফা দিতে হয়েছে। আর্থিক অবস্থার এমনই বিপর্যস্ত সময়ে জন্ম নেয় কন্যা মঞ্জুশ্রী (১৯৩১)। তাঁর উপন্যাসেই একটি রুগ্ন অবহেলিত কন্যা সন্তানের উপস্থিতি থাকে মঞ্জুশ্রীর আদলে। মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে টাকা যে একটা প্রবল শক্তি—এই উপলব্ধি সেই সময়ে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল তাঁর মনে।

শুধু উপন্যাসে নয় ছোটগল্প আর কবিতাতেও এসেছে তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতার নিদারুণ রক্তাক্ত অবক্ষয়ের ছবি।

সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বৃষের পরে ছুটে সারাদিন
হয়ে গেছে এখন পাথর ;

(একটি কবিতা : সাতটি তারার তিমির)

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে তাঁর কর্মজীবনের সবচাইতে দীর্ঘ স্থিতি। কিন্তু দেশ বিভাগের কিছুদিন আগে (১৯৪৭) বি.এম. কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে যান। এই সময় কোলকাতায় ল্যান্সডাউন রোডে ভাড়া বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। কিন্তু কখনোই গুছিয়ে বসতে পারেননি। ঘূর্ণ্যমান, পরিবর্তমান, বাণিজ্যিক পৃথিবীর সাথে তিনি সেই অর্থে কখনোই সমঝোতায় আসতে পারেননি। ১৯৪৭-এর পর কোলকাতায় দুই থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত তিনি বেকার জীবনযাপন করেন। অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না যে, অর্থ কষ্টের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি পৌঁছে ছিলেন। এই বিপর্যস্ত সময়ে তাঁর মা মারা যান (১৯৪৮)।

কলকাতার প্রতি তাঁর দুর্বার একটা আকর্ষণ ছিল। হয়তো আশা করেছিলেন, কূপমণ্ডুকতাকে ছাড়িয়ে এই মহানগরীতে তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন হবে। তিনি পৃষ্ঠপোষকতা পাবেন। কিন্তু কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু তিনি জানতেন না শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নগরকেন্দ্রিক হলেও আমলাতন্ত্র বলে এক ভয়াবহ জটিল চক্র সৃষ্টি করে রেখেছে নতুন অর্থব্যবস্থা।

নলিণী দাশের চিঠিতে পাওয়া যায় চাকরিজনিত অনিশ্চয়তা আর লেখার মতো স্বস্তিহীন পরিবেশের অভাবে তাঁর মন কলকাতায় আসা অব্দি কখনো শান্তি পায়নি। তাঁর উপর শুরু হয় আরেক ঝামেলা। অর্থের টানাপোড়েন কাটাতে তিনি এক ছাত্রের পরামর্শে হিন্দুস্থান ইন্সুরেন্স কোম্পানির এক মহিলা এজেন্টকে নিজের ঘরের একটি কামরা ভাড়া দেন। কিন্তু প্রতি রাত্রে ঐ মহিলার ঘরে গান-বাজনা, হৈহুল্লোড় ও নানারকম অসামাজিক কাজে ঘরের শান্তিকে বিনষ্ট করে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে পাওয়া যায়, বেশি ঠেকে পড়েছি, সেজন্য বিরক্ত করতে হল আপনাকে। এক্ষুণি চার-পাঁচশো টাকার দরকার। দয়া করে ব্যবস্থা করুন।...'আমার একটা উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয়—ছদ্মনামে) পূর্বাশায় ছাপতে পারেন। দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি। আমার জীবনস্মৃতি আশ্বিন কিংবা কার্তিক থেকে পূর্বাশায় মাসে মাসে লিখব। সবই ভবিষ্যতে, কিন্তু টাকা এক্ষুণি চাই' (জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, পৃ. ৮৬)।

তাঁর চিঠির ভাষায় সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদাটুকুও তিনি মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। আমৃত্যু তিনি মানুষ আর মানুষের সমাজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই নিঃশব্দ ব্যথিত হৃদয়ে তিনি বরিশালে ফিরে যাবার কথাও ভেবেছেন শেষের দিকে।

জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিগত জীবনের নিঃসঙ্গতা প্রসঙ্গে আবশ্যিকভাবে যে বিষয়টি উপস্থাপিত হওয়া উচিৎ তা হলো তাঁর অসুখী দাম্পত্য জীবন। তাঁর প্রায় সবগুলো উপন্যাসেই দাম্পত্য সমস্যা উপস্থাপিত। এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই দ্বন্দ্বের রূপটিকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন যে অধিকাংশ সমালোচক এগুলোকে উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে স্রেফ ডায়েরি বলে চালিয়ে দিয়েছেন, না হলে বড় জোর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

অনেকে কারণে অথবা অকারণে আশঙ্কা করেছিলেন জীবনানন্দের অস্বাভাবিক অকাল মৃত্যু এই পারিবারিক সম্পর্কের এক দুর্বোধ্য পরিণতি।

জীবনানন্দের উপন্যাসেও আমরা সাধারণত কবির 'নিশ্চল রমণী'দের দেখা পাই যারা জীবনের সূক্ষ্ম গভীরতম ডাকেও নিশ্চুপ থাকে। সহজ ভাষায়, তাঁরা অতিমাত্রায় বৈষয়িক, আর্থিক অভাবের কাছে শিল্প-সাহিত্যের প্রসঙ্গ তাঁদের কাছে অবান্তর। তাদের প্রণয় অবনত হয় বৈষয়িক সাফল্যের কাছে, মানুষ-অমানুষ নির্বিশেষে।

—এই সববধির নিশ্চল
সোনার পিত্তলমূর্তি : তবু, আহা, ইহাদেরই কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চ'লে গেল যুবকের দল ;
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।
(ইহাদেরি কানে : মহাপৃথিবী)

ভাবলে অবাক হতে হয়, জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পরেও লাবণ্যদাশ বৈষয়িক ক্ষতিগ্রস্ততার কথাই ভেবেছেন। 'জীবনানন্দের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি কাউকে বলেছিলেন, 'অচিন্ত্যবাবু, প্রেমেন্দ্র বাবু, সজনী বাবুরা যখন তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন এবং তোমাদের মত অল্প বয়সী এত সব ছেলেপিলেরা, তখন বলতেই হবে তোমাদের দাদা বড়ো লেখক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি হয়তো অনেক রেখে গেলেন, কিন্তু আমার জন্য কি রেখে গেলেন, বলো তো' (মিনু সরকার, 'ঘরোয়া জীবনানন্দ' কোরক, জীবনানন্দ সংখ্যা, কলকাতা ১৯৯৪ পৃ. ৩৩৩)।

দাম্পত্য-অপ্রেম অশান্তিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ করেছিল। কারণ তাঁর বাবাও জীবনে দারিদ্র্যের আঘাত কম সহ্য করেননি। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ছিল স্নিগ্ধ-নিবিড় দাম্পত্য সমঝোতা আর ঔপনিষদিক শান্তি। জীবনানন্দ কোনটিই পাননি। তাই পৃথিবীর পথে তিনি শুধু রক্তাক্তই হয়েছেন। তাঁর কোনো প্রতিষেধক ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের মৃত্যুকে ঘিরে অনেকের প্রশ্ন : এই মৃত্যু দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা? মানুষ আত্মহত্যা করে কোন মানসিক অবস্থায় তা আর জানার উপায় থাকেনা। এ প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথের উক্তি : 'যে সমাজ, ধর্ম বা সংস্কৃতিতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বা বিচ্ছিন্নতাবাদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেই সমাজ, ধর্ম বা সংস্কৃতির আবহাওয়ার মানুষ তত বেশি অসহায় বোধ করে এবং ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে অক্ষম হলে আত্মহননে প্রবৃত্ত হয়' (আত্মহত্যা : সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ, পৃ. ৫৭)।

জীবনানন্দ দাশও কি ব্যক্তি জীবনে, কি সাহিত্যিক জীবনে কোথাও সাফল্য—স্বস্তির দেখা পাননি। কর্মজীবনে অস্থিরতা, সাংসারিক জীবনে অপ্রেম-অসচ্ছলতা এবং সাহিত্যিক জীবনে পাঠকের ঔদাসীন্য ও সমালোচকের রুচিগর্হিত সমালোচনা তাঁকে ক্রমশই শীতল বিক্ষোভে জমাট বেঁধে ফেলছিল। ভয়াবহ ক্লান্তি তাঁকে গ্রাস করেছিল যা তাঁর শেষের দিকের সাহিত্য রচনার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কি কবিতায়, কি গল্প-উপন্যাসে। সর্বত্রই এক বিধ্বস্ত পৃথিবীর ছবি সেখানে বিচরণরত এক নিঃসঙ্গ পর্যবেক্ষক, জীবনানন্দের মতোই আদল সেই নায়কের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থ-সমালোচক জীবনানন্দ দাশ

তপন বাগচী

কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) মৃত্যুর পরে খুঁজে পাওয়া অজস্র কবিতার পাশে গদ্যের পরিমাণও কম নয়। শুধু গল্প, উপন্যাস নয়—ডায়েরি, আত্মকথা এবং বিশুদ্ধ প্রবন্ধের সংখ্যাও অনেক। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 'কবিতার কথা' (১৯৫৬)-য় গ্রন্থিত হয়েছিল ১৫টি প্রবন্ধ। এরপর কবি ও গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দ দাশের লিখিত ও মুদ্রিত ৭টি গ্রন্থালোচনা নিয়ে 'সমালোচনা সমগ্র' (১ম সং ১৯৮৩) সংকলন করেন। পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে ৯টি প্রবন্ধ জুড়ে দিয়ে 'সমালোচনা সমগ্র'র দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৮৬) প্রকাশিত হয়। এ-গ্রন্থের 'প্রবেশক' অংশে সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দ কবি জীবনানন্দ দাশের ৫০টি প্রবন্ধের তালিকা প্রদান করেছেন। আরো অনেক পরে আরেক সম্পাদক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী জীবনানন্দের 'কবিতার কথা'র প্রবন্ধগুলোর সঙ্গে আরও ৩৭টি প্রবন্ধ যোগ করে 'জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র' (১৯৯০) প্রকাশ করেন। এই ৩৭টি প্রবন্ধের সঙ্গে আরো ১২টি প্রবন্ধ যোগ করে তাঁর সম্পাদনায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৯)। এ-যাবৎ আবিষ্কৃত ও উদ্ধারকৃত ৪৯টি প্রবন্ধের মধ্যে আমরা সাহিত্য সম্পর্কে ও সাহিত্যিক সম্পর্কে আলোচনা ছাড়াও ৮টি গ্রন্থ-সমালোচনা এবং ২টি কাব্যের ভূমিকা পাই। কবির নিজের কাব্যের ভূমিকা, নিজের কবিতা সম্পর্কে সমালোচনার প্রতিক্রিয়া বাদ দিয়েও ১০টি গ্রন্থ সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের সমালোচনা পড়ে আমরা এক ভিন্ন জীবনানন্দকে আবিষ্কার করতে পারি। তাঁর এই গ্রন্থ-সমালোচক পরিচয়টি নতুন না হলেও এক আবদুল মান্নান সৈয়দ ছাড়া আর কেউ তেমন করে আলোচনা করেননি।

তিরিশের শক্তিমান কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু'র (১৯০৮-১৯৭৪) 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭) কাব্যের সমালোচনার মাধ্যমেই আমাদের গ্রন্থ-সমালোচক জীবনানন্দ দাশের যাত্রা শুরু হয়। তাঁর এই লেখাটি 'কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা' শিরোনামে ছাপা হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' (পৌষ ১৩৪৪) পত্রিকায়। পরবর্তী সময়ে 'কঙ্কাবতী'র কবিতা নিয়ে জীবনানন্দ দাশ 'কবিতা ও কঙ্কাবতী' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধও লেখেন। জীবনানন্দের মতো একজন কবি যখন বুদ্ধদেবের মতো একজন কবির কবিতা নিয়ে বিশ্লেষণ করেন, তখন পাঠকের মনে প্রবল কৌতূহলের সৃষ্টি না হয়ে পারে না।

সাধারণভাবে একটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে কিছু মন্তব্য এবং সমালোচকের ভালোলাগা-মন্দলাগার বিবরণই প্রাধান্য পায়। কখনো কখনো নির্দিষ্ট কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করে প্রকাশিত মন্তব্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করা হয়। সমালোচক জীবনানন্দ দাশও এই গতানুগতিকতার বাইরে নন। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে। বুদ্ধদেব তাঁর বন্ধু এবং সমসাময়িক কবি হলেও কবিতার মাননির্ণয়ে তিনি যথাসম্ভব নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। এই কাব্যের আগে বুদ্ধদেবের আরো ৩টি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই কাব্যে এসে তিনি সংহত ও সিদ্ধকাম। সেই কথাটি জীবনানন্দ দাশ প্রকাশ করেছেন বেশ জোরালোভাবে —

> বুদ্ধদেব বসুর কবিহৃদয়ের আভার থেকে 'কঙ্কাবতী'র জন্ম হয়েছে। বুদ্ধদেব অনেকদিন থেকে কবিতা লিখেছেন। 'কঙ্কাবতী' ছাড়া কবিতার বই আগেও আরো প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শুধু এই বইটির ভিতরেই নিহিত রইল তাঁর কবিযশ ; এবং রস পান করে বুঝতে পারলাম আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন প্রধান কবি ; প্রধানদের ভিতর অন্যতম ; তাঁর 'কঙ্কাবতী' অবশ্যম্ভাবী পিপাসা জাগিয়ে গভীর পরিতৃপ্তি–কুহক নিয়ে এসেছে।
>
> (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'সমালোচনা সমগ্র, পৃ. ৩৫)

এভাবে সরাসরি 'প্রধান কবি'র শিরোপা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর মন্দলাগা কবিতার উদ্ধৃতি দিতেও জীবনানন্দ দাশ ভুল করেননি। সম্পন্ন কবিসত্তার আবেগ তাঁর সমালোচক–সত্তার নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ন করেনি।

১. প্রেয়সীর 'চুল'–এর উপর কবিতা লিখেছেন তিনি। রূপসীর চুল নিয়ে কবিতা লেখা চলে যা কাব্যসাহিত্যে ক্লাসিক হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এ কবিতাটি সে অমরতার দাবি করতে পারে বলে মনে হয় না।

৩. বইটির কোনো কোনো কবিতায় পুনরুক্তি বেশি, কথার অজস্র ডালপালার ভিড়ে আবেগ চাপা পড়ে পাখা মেলতে পারেনি।

৩. কবিতায় সরল মৌলিক ভাষায় এ–রকম ব্যবহার 'প্রগতি' পত্রিকার যুগ থেকে শুরু হয়েছে বলে মনে হয় ; এবং বুদ্ধদেব এর একজন বড় Propagandist। কিন্তু এ–চেষ্টা সব সময় সম্যকভাবে উৎরেছে বলে মনে হয় না।

৪. 'মধ্যবর্তী', 'কোনো মেয়ের প্রতি', 'অন্য কোনো মেয়ের প্রতি' ঠিক কবিতা হয়েছে বলে মনে হয় না।

এই হচ্ছেন আমাদের গ্রন্থ–সমালোচক জীবনানন্দ দাশ। এই কাব্যকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর ভিন্ন প্রবন্ধ 'কবিতা ও কঙ্কাবতী'–তে আমরা প্রায় একই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি দেখি। জীবনানন্দ–গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ মনে করেছেন 'বুদ্ধদেব বসু'র 'কঙ্কাবতী' কাব্যের আলোচনারই প্রথম খসড়া খুব সম্ভব 'কবিতা ও কঙ্কাবতী' রচনাটি (আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭)। এর প্রায় দশ বছর পরে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৫৫) জীবনানন্দ আলোচনা করেন অল্ডাস হক্সলীর নাটক 'Gioconda Smile' সম্পর্কে। আলোচনা পড়ে জানা যায় যে, সাহিত্যিক অল্ডাস হক্সলীর একজন অনুরক্ত পাঠক আমাদের জীবনানন্দ দাশ। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবেও এসব গ্রন্থ তাঁর পাঠ করার কথা। এক ধরনের পাঠ–প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তিনি লিখেছেন, 'The journals of Andre Gide', টমাস মানের 'Doctor Faustus', টি এস এলিয়টের 'The Three Voices of Poetry', পি এম এস ব্ল্যাকেটের 'Atomic energy and Nations' প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনা। এ–সব রচনায় জীবনানন্দের পাঠের পরিধি সম্পর্কে যেমন ধারণা নেয়া যায়, তেমনি তাঁর মন্তব্য থেকে আমরাও বিশ্বসাহিত্যের অনেক অজানা আঙিনায় পা রাখতে পারি। পাঠকের সঙ্গে এই সংকেত স্থাপনের দায়িত্বটা জীবনানন্দ বেশ ভালোভাবেই করেছেন। এখানে অবশ্য তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতখানি কবি, তার চেয়ে বেশি অধ্যাপক। ইংরেজি গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতিকেই বেছে নিয়েছেন—

> মানের (টমাস মান) ডক্টর ফস্টাসের নায়ক অড্রিয়ান লেফেরকুন হচ্ছেন আজকের দিনের ফাউস্ট। মার্লোর ফস্টাস এমনকি গ্যেটের ফস্টাসের সঙ্গে লেফেরকুনের সাদৃশ্য খুব কম। ওদের মতো ওরকম সব-চেয়েছির মাৎসর্য কিছু কি ছিল লেফেরকুনের? না ; চমকপ্রদ ও রকম কিছুই ছিল না। লেফেরকুন একজন বেশ বড় সুরশিল্পী হয়ে দাঁড়াল—প্রগলভ আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হয়ে নয়—খুব সম্ভব নিজের ইচ্ছায়ও ততটা নয়—কিন্তু সহজাত প্রতিভা তাকে তার প্রার্থিত নিষ্কামনায় স্থির থাকতে দিচ্ছিল না বলে।
>
> (আ. মা. সৈ. সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২)

দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ দাশ জার্মান, ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকদের গ্রন্থ-সমালোচনায় ব্রতী হয়েছেন। বিশ্বসাহিত্যের অলিগলি যে তাঁর চেনা, এই ক'টি ছোট্ট লেখাই তার প্রমাণ দেয়।

সাহিত্যের বাইরের বিষয় নিয়েও তাঁর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। পারমাণবিক শক্তির সামরিক ও রাষ্ট্রিক সম্পর্ক নিয়ে লেখা বইয়ের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনাও তিনি লিখেছেন। আমরা যে জীবনানন্দকে কল্পনা করি প্রচারবিমুখ, আত্মমগ্ন এক কবিসাধকের চেহারায় ; তিনিও যে সমাজ নিয়ে, রাষ্ট্র নিয়ে আগ্রহ ব্যক্ত করেন, এই গ্রন্থ-সমালোচনা তার সাক্ষ্য দেয়। সেই কবেই তো জীবনানন্দ ভেবেছিলেন—

> Revolutionary discoveries about the great energies that atoms can release under certain conditions, have set scientists politicians and others seriously speculating and enquiring how this enormous power is likely to affect the future global wars ; incidentally its value in supplying energy for peaceful industrial purpose is also supposed to be very great. There is, however, much current misconception about the role of atomic energy and its wonder product, the atomic bomb, in future warfares.

আর যে দু'টি বাংলা গ্রন্থ-সমালোচনা জীবনানন্দ দাশ করেছিলেন, তা উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থ নয়। রঞ্জন নামক একজন কবির 'শীতে উপেক্ষিতা' এবং কবি কৃষ্ণ ধরের (১৯২৬) 'অঙ্গীকার' গ্রন্থদুটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বেশ সরাসরি মন্তব্য করেছেন। প্রথমটি কথাসাহিত্য, দ্বিতীয়টি কাব্য। 'শীতে উপেক্ষিতা' নিয়ে তিনি লিখেছেন, "যে ধারণা, সংকল্প ও রচনারীতির আকর, এই বইটি সে সবই সূচনার জিনিস ; নিজের নির্দিষ্ট সিদ্ধির ভূমিতে এখনো পৌঁছতে পেরেছে বলে মনে হল না"। এ থেকে লেখক রঞ্জন নিজের সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার কথা বুঝে উপকৃত হবেন। কিন্তু আমাদের পাঠকের লাভও কম নয়। তিনি যখন লেখেন—

> ...মিতব্যয়িতার কথাসাহিত্যের মেরুদণ্ডের কথা, কিন্তু তবুও এ নিয়ে সাহিত্যিকদের ভিতরেও দ্বিমত রয়েছে। কেউ এক আধ-কথায় অনেকখানি ব্যক্ত করবার শক্তিতেই সাহিত্যিকের গুণ মনে করেন ; অন্যদের কাছে হয় তো এই মনে হয় যে সত্য সহজে প্রতিভাত হবার জিনিয় নয়—তাকে বারবার উপমা জিজ্ঞাসা কথার বিস্তারে প্রমাণিত করে দেখবার চেষ্টা না করলে।
>
> (আ. মা. সৈ-সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬)

তখন আমরা সাহিত্যের করণকৌশলের ভেতরের রহস্য সম্পর্কে ধারণালাভ করতে পারি। চল্লিশ দশকের কবি কৃষ্ণ ধরের কাব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি জীবনানন্দ দাশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যবিশ্বাসও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ ধর চল্লিশের সমাজবাদী কবিদের একজন। অনেকটা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশে তাঁর কবিতা উচ্চকিত। জীবনানন্দের মতো কবিদের ভালোলাগার কথা নয় সেই সময়ের বক্তব্যধর্মী রাজনৈতিক কবিতা। তবে তিনি কৃষ্ণ ধরের কবিতার মূল সুর ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন—"অনেক সময় এদের পরিষ্কার লেখা অস্থির অশুদ্ধ রচনার ভিড়ে চাপা পড়ে থাকে"। কোনো রাখ-ঢাক কিংবা ভণিতা না করে জীবনানন্দ দাশ তাই সৎ সমালোচকের ভঙ্গিতে বলে দেন—

> এই লেখকের কোনো কোনো কবিতা তাঁর অব্যবহিত পূর্বজদের কথা মনে করিয়ে দেয় কিংবা আরো আগের কাউকে কাউকে। লেখকের ঢের কবিতায় অনেকটা ঠিকঠাক শব্দযোজনার চেয়ে বেশি কিছু স্বাদ পেলাম না। বাকি কবিতা—কতকগুলো পংক্তি—অন্য রকম ; কোনো অস্বচ্ছতা নেই এসবের ভিতর, আশা হয় কবির নিজের বিশেষ সুষ্ঠুতা পরে পাওয়া যাবে।
>
> (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬)

গ্রন্থ-সমালোচক জীবনানন্দ দাশ দু'টি কাব্যের ভূমিকা লিখেছিলেন। এটি আসলে অগ্রজ কবি হিসেবে অনুজ কবির প্রতি আশির্বাণী। এখানে কবি-সংবেদী জীবনানন্দকেই খুঁজে পাওয়া যায়। কবি রমাপতি বসুর 'শিলাহার' কাব্যের যে ভূমিকাটি তিনি লিখিছেন তা অবশ্য যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়নি। 'শিলাহার'-এ তিনি অগ্রজ কবির প্রভাব খুঁজে পেয়েছিলেন। খুব কৌশলে এড়িয়ে গেছেন রমাপতি বসুর কবিতার প্রশংসা করার থেকে। তবে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'স্বপ্ন-কামনা'র ভূমিকায় জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতার যথার্থ মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন—

> তিনি চলেছেন বুঝতে পেরে তাঁর প্রথম প্রয়াসের গোটা কয়েক কবিতা তাদের একতন্ত্রী বিপ্লবের সাধ ও সজীবতা নিয়ে আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। কিন্তু এক আধটি কবিতার ভিতর আমি বিপ্লব বা শান্তি কিছুই খুঁজি না, আমার মনে হয় তারা সেসব পরীক্ষা অতিক্রম করে গেছে।

এভাবে গ্রন্থ-সমালোচনার মধ্য দিয়ে কবি তাঁর পরবর্তী কাব্যধারা নির্মাণে একজন পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁর গ্রন্থ-সমালোচকের পরিচয় পেয়ে এখন আর তাঁকে আত্মভোলা কবি বলে মনে করতে পারি না। একান্ত আবেগের উপর ভর করে হয়তো কবিতা লেখা যায়, কিন্তু সমালোচনা লিখতে গেলে তাঁকে চোখ-কান খোলা রাখতে হয়, নির্ভর করতে হয় যুক্তি ও প্রজ্ঞার উপর। জীবনানন্দ দাশের সেই সুচেতনা প্রকাশিত হয়েছে এই সব গ্রন্থ-সমালোচনায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না। অনুরোধের ঢেঁকিও গিলতে হয় মাঝে মধ্যে। তাই জীবনানন্দের সমালোচক-সত্তার আরো ব্যাপক পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত রচনায়। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ,' 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রভৃতি প্রবন্ধেও তাঁর সমালোচনার শক্তিমত্তা প্রকাশিত। কবি, অধ্যাপক, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধকার পরিচয়ের পাশাপাশি একজন গ্রন্থ-সমালোচক জীবনানন্দ দাশের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মন্তব্য ও মূল্যায়ন সময়ের বিচারে হারিয়ে যায়নি, এখানেই তার মৌলিকত্বের প্রমাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে শব্দ-বৈচিত্র্য ও প্রয়োগ

সৌরভ সিকদার

কবিতা শব্দের শিল্প। শব্দ চয়ন ও বিন্যাসে যাঁর দক্ষতা যত বেশি, তিনি তত বড় কবি। প্রাচীন ভারতের আলঙ্কারিক থেকে শুরু করে এ যুগের সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ সবাই-ই কবিকে শব্দশিল্পী হিশেবে আখ্যায়িত করেছেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত হচ্ছে অজস্র শব্দ, অভিধানের পাতায় রয়েছে আরো অনেক। এই শব্দকেই কবি ধ্বনি আর অর্থ-ব্যঞ্জনায় নতুন মাত্রা দান করেন। এ কারণেই শিল্পের অন্য প্রকরণের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য 'সুচারুতম শব্দের পরিপাটিতম বিন্যাস' নৈপুণ্যের মধ্যেই। কবি হচ্ছেন শব্দের কারবারি। শব্দ নির্বাচন এবং তার বিন্যাস বৈচিত্র্যের মধ্যেই কবির সাফল্য নিহিত। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের পর মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাংলা কবিতার ইতিহাসে অন্যতম সফল শব্দ-কারবারি—নিঃসন্দেহে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। আমাদের সাহিত্যে এই কবি-প্রতিভার শব্দের জগৎ যেমন বিশাল, তেমনি বৈচিত্র্যময়। বাংলা কবিতায় শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এতো বৈচিত্র্য এবং অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আমরা অন্যকোনো কবির কাব্যে দেখিনি। পল্লির চাল-ধোয়া কিশোরীর স্নিগ্ধ হাতের পরশ থেকে শুরু করে হেমন্তের মাঠের সোনালি ফসলের গন্ধ, মিশরের পিরামিড, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ঘুরে তিনি আমাদের নিয়ে যান পিকাসো-মাতিসের রঙ-রেখার রাজ্যে। ইলোরা-অজন্তা ঘুরে জাভা-সুমাত্রা হয়ে, ম্যানিলা-টোকিও ছেড়ে কবি আমাদেরকে পৌঁছে দেন স্টালিনের সোভিয়েটে। পুরাণ-সভ্যতা-শহর-বন্দর-ফল-ফুল-বৃক্ষ-নদী-নক্ষত্র-রঙ প্রাণীজগৎ অর্থাৎ পৃথিবী এবং এই পৃথিবীর বাইরের সমস্ত শব্দাবলি যেন স্থান পেয়েছে জীবনানন্দ দাশের কাজে। কখনো দেশি কখনো বিদেশি, কখনো তৎসম-তদ্ভব কখনো-বা সভ্যতার নব আবিষ্কার সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক শব্দাবলি চয়ন করেছেন কবি অবলীলায়। বাংলা কবিতায় শব্দ নির্বাচনের প্রচলিত সংস্কার ভেঙে কবি খুলে দিলেন প্রথমবারের মতো স্বাধীনতার অপার দিগন্ত। পরিত্যাক্ত-অবহেলিত সাধারণ শব্দকে কবি আপন সৃষ্টির আনন্দে একের পর এক গেঁথে সাজিয়েছেন কবিতার ডালা। সে ডালার ফুলের সৌরভ আর বর্ণের বিদ্যুৎ ছটায় আমরা বিমোহিত।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, কবির এই শব্দের জগৎ নিয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনার অবকাশ রয়েছে। সন্ধানী চোখে জীবনানন্দ দাশের কাব্য পরিভ্রমণ করলে কবির শব্দ-চয়ন বিষয়ে কিছু সূত্র স্পষ্ট হয়। আর তা হচ্ছে—'বনলতা সেন' (১৯৪২) ও 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) কাব্যে দেশী এবং প্রকৃতি-সম্পৃক্ত শব্দাবলির আধিক্য। 'ঝরা পালক' (১৯২৭) কাব্যে রয়েছে আরবি-ফারসি শব্দর ব্যাপক সমাহার। 'বেলা অবেলা কালবেলায়' (১৯৬১) ইংরেজিসহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশি শব্দই প্রধান। আর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় (১৯৫৪) সভ্যতার উন্মেষে যন্ত্রের প্রসার ও নাগরিক শব্দাবলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উপস্থাপিত শব্দের শুধু বর্ণ-গন্ধই আমরা পাইনা, পাই— ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংকট, আনন্দ-বেদনাসহ মানবিক অনুভূতির এক শিল্পীত অর্থ-ধ্বনি ব্যঞ্জনা। কবি যখন বলেন—'লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ' বা 'চুরুট নীরবে জ্বলে' কিংবা 'চেঙ্গিস আজো বাহিরে ঘুরিতে আছে'। তখন নাশপাতি, চুরুট বা চেঙ্গিস এই সব শব্দ তার অর্থের সাধারণ সীমানা ছেড়ে পাঠককে পৌঁছে দেয় নতুন বন্দরে। সাধারণ শব্দকে বিন্যাস নিপুণতায় অসাধারণ ব্যঞ্জনা দেয়াই কবির প্রধান কাজ। এদিক দিয়ে জীবনানন্দের তুলনা নেই।

শব্দশিল্পী জীবনানন্দ দাশের শব্দ-বৈচিত্র্যে ও তার প্রয়োগের সঙ্গে পরিচিত হতে আমরা তাঁর কবিতার মধ্যে প্রবেশ করবো। দেখবো কত বিচিত্র এবং নতুন নতুন শব্দ কবি চয়ন করেছেন। শব্দের প্রকৃতি অনুসারে এখানে সাজিয়ে দেয়া হল জীবনানন্দের শব্দের জগৎ। বলা বাহুল্য এ তালিকা ও দৃষ্টান্ত কোনক্রমেই সম্পূর্ণ নয়।

দেশী শব্দ

আঁচ, উম, ফিকা, উপোসী, দিরি, জ্যান্ত, থ্যাঁতা, ফেড়ে, পিলাই, ফোঁকরা, রাতবিরেত, ঘেসেড়া, সাঙ্গাত, সোয়াদ (স্বাদ), রগড়, হাপড়, মড়া, ডাঙ্গী, টের, মাঠ, খড়, ঢেউ, চাল, ডাঁশা ইত্যাদি।

> ডাইনে তোমার ডাইনী মায়া—পিছের আকাশ *ফিকা*।
>
> (সাগর বলাকা : ঝরা পালক)

> *থ্যাঁতা* ইঁদুরের মতো রক্ত-মাখা ঠোঁটে !
>
> (আট বছর আগের এক দিন : মহাপৃথিবী)

> *মড়ার* খুলির মতো ধরে—
> আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
>
> (বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

> জলাঙ্গীর *ঢেউয়ে* ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ *ডাঙ্গায়*
>
> (আবার আসিব ফিরে : রূপসী বাংলা)

> একদিন অবশেষে *টের* পাওয়া গেল
> আমাদের দু-জনার মতো দাঁড়াবার
>
> (ভাষিত : সাতটি তারার তিমির)

> ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—ক্ষেতে *মাঠে* পড়ে আছে *খড়*
> পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।
>
> (ধানকাটা হয়ে গেছে : বনলতা সেন)

আরবি-ফারসি শব্দ

খারিজ, তাবিজ, নামাজ, আজান, আইন, সফেন, কোরান, ফকির, কাফের, বেগম, দলিল, জমিন, দরিয়া, দরাজ, কলিজা, তসবিহ, তালাস, কয়েদি, জাজিম, জবান, বেহুশ, খোশ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলাপ, পেয়ালা, মসজিদ, মিনার, জিঞ্জির, মস্তানা, জীন, তখ্‌ত, জুলফি, রেওয়াজ, মাস্তুল, মুসাফো, পাগড়ি, ফসল, সবুজ, খুন, কবর, আঁখি প্রভৃতি—

মুয়াজ্জেনের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে ;
জপে *ঈদগাতে তসবী ফকির*, পুজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা–উষায় বেদবাণী যায় মিশে *কোরানের* স্বরে ;
(হিন্দু–মুসলমান : ঝরা পালক)

উপনীত জাহাজের *মাস্তলের* সুদীর্ঘ শরীর
(মনোবীজ : মহাপৃথিবী)

সারাটি নিশীথ *খুন্‌–রোশ্‌নাই* প্রদীপে মনটি রেঙে
একাকী রয়েছি বসি, ...
—দূর দিগন্তে চ'লে গেছে কোথা *খুশ্‌রোজী* মুসাফের !
(জীবন–মরণ দুয়ারে আমার : ঝরা পালক)

কবর খুলেছে মুখ বার–বার যার *ইশারায়*
(অনেক আকাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

কে তার *পাগড়ি* খুলে পুব দিকে *ফসলের*, সূর্যের তরে
অপেক্ষায় অন্ধকার রাত্রির ভিতর
(বিভিন্ন কোরাস : মহাপৃথিবী)

ইংরেজি শব্দ

এরোপ্লেন, ক্লাব, ক্যাম্প কমিটি, জীপ, কম্পাস, এনামেল, গ্লাস, পিসটন, কোরাস, কেরেসিন, ক্যারাভ্যান, লিবিডো, এঞ্জিন (ইঞ্জিন), ট্রাম, বাজেট, টায়ার, ট্রাফিক, ফটোগ্রাফ, ডিনামাইট, ব্লেড, ব্যালট, ভোট, ব্যারাক, বাক্স, মাইল, অরেঞ্জ, মাইক্রোফোন, পোলিটিক্স, পার্টি, ফোর্ট, প্রেস, প্রিন্টিং, প্রপেলার, বাজেট, স্যাকারিন, হোটেল, ওয়েসিস, ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্কার, রিস্টওয়াচ, ক্যান্টিন ইত্যাদি—

সে চেতনা পিরামিডে পেপিরাসে *প্রিন্টিং–প্রেসে* ব্যাপ্ত হয়ে
তবুও অধিক আধুনিকতর চরিত্রের বল।
(চারিদিকে প্রকৃতির : বেলা অবেলা কালবেলা)

একটি পাখির মতো *ডিনামাইটের* 'পরে ব'সে।
(আবহমান : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সর্বদাই *ফুটপাতে*;
মাঝে মাঝে *এম্বুলেন্‌স* গাড়ির ভেতরে
(এইসব দিনরাত্রি : ঐ)

প্যারাফিন–লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে ...
(ঘোড়া : সাতটি তারার তিমির)

একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে ;
(অবশেষ : বনলতা সেন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিত্ব ধ্বনিমূলক শব্দ

উড়ে উড়ে, ঘুরে-ঘুরে, খেতে খেতে, একা একা, চষে চষে, ঘষে-ঘষে, ছেঁড়া ছেঁড়া, দেখে দেখে, ধরে ধরে, মাঠে মাঠে, লাল লাল, শুয়ে শুয়ে, হাতে হাতে, চূন-চূন, খড়ি-খড়ি, শাই শাঁই, গুঁড়ি গুঁড়ি, চুপে চুপে, বুকে বুকে, দূরে দূরে ইত্যাদি—

> আমার জানালার ভিতর দিয়ে, *শাঁই শাঁই* করে,
> সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো !
> (হাওয়ার রাত : বনলতা সেন)

> *চুপে চুপে* চলিতেছে বন পথ ধরি !
> আকাশের *বুকে বুকে* কাহাদের মেঘের গাগরী
> (আলেয়া : ঝরা পালক)

> চোখ দুটো *চূন-চূন,*—মুখ *খড়ি-খড়ি* !
> থুত্‌নিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—
> (পরস্পর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

> *গুঁড়ি গুঁড়ি* বৃষ্টি পড়ছে—কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
> (ফুটপাথে : মহাপৃথিবী)

> কতখানি রোদ—মেঘ—টের পাব *শুয়ে শুয়ে* মরণের ঘোরে।
> (ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন : রূপসী বাংলা)

> *দূরে,—দূরে,* আরো দূরে, আরো দূরে,
> অসীম মরুর পারাবার—পরে আকাশ-সীমানা জুড়ে
> (মরীচিকার পিছে : ঝরা পালক)

বিবিধ শব্দাবলি

জলসিঁড়ি, অশোক, বিম্বিসা, রূপমালি, ধানসিড়ি, প্রেতচোখ, রায়গুণাকর, দেশবন্ধু, দারুচিনি দ্বীপ, নষ্ট ইন্দ্রজাল, বিদিশা, টেরিকাটা, দাতকুড়ো, নটকান, হাটুভব, মৃতনক্ষত্র, হলুদ নদী, মাঘরাতে, সেরুণি, শীর্ণ, অতলান্টিক, দিয়াশালাই, টাইফুন, সূর্যঘড়ি, বীজগণিত, রোদ্রকণ্ঠী, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি—

> একদিন *জলসিড়ি* নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে
> বিশীর্ণ বটের নিচে শুয়ে রবো ;
> (একদিন জলসিড়ি নদীটির : রূপসী বাংলা)

> কান দিয়ে তার শব্দ শুনে,
> দাঁড়ায়ে ছিলাম গিয়ে *মাঘরাতে,*—কিংবা ফাল্‌গুনে।
> (পরস্পর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

> এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি—*রায়গুণাকর*
> আসিবে না—*দেশবন্ধু* আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার,
> (অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া : রূপসী বাংলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক ঘুরেছি আমি ; *বিম্বিসার অশোকের* ধূসর জগতে ...
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে *দারুচিনি*-দ্বীপের ভিতর
(বনলতা সেন : বনলতা সেন)

টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।
(শিকার : বনলতা সেন)

গাছ-গাছালি

অশ্বত্থ, ঘাস, জারুল, বাসুক, কদম, বেত, জাম, বাঁশ, সজিনা, হিজল, বাবলা, শিরীষ, শাল, দেবদারু, দারুচিনি, জিউলি, মাকাললতা, আকন্দবন, সুন্দরী, চালতা, ঝাউ, পিপুল, নারকেল, সুপারি, আম, নিম প্রভৃতি—

বেতের বনের ফাঁকে,—*জারুল* গাছের তলে রৌদ্র পোহায় ...
আলোকলতার পাশে গন্ধ ঢালে দ্রোণফুল *বাসকের* গায় ;
(কোথাও মঠের কাছে : রূপসী বাংলা)

হিজল গাছে *জামের* বনে হলুদ পাখির মতো
(তোমাকে : বেলা অবেলা কালবেলা)

অশ্বত্থ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী ;
(অশথ বটের পথে : রূপসী বাংলা)

একদিন খুঁজেছিনু তারে ...
মালতীর বনে *কদমের* তলে
(একদিন খুঁজে ছিনু তারে : ঝরা পালক)

ফিরে এসো প্রান্তরের পথে ;
যেই খানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে
(ফিরে এসো : মহাপৃথিবী)

শিরিষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে,
পিপুলের ভরা বুকে চিল নেমে এসেছে এখন ;
... করুণ হয়েছে *ঝাউবন*।
(শিরিশের ডালপালা : বনলতা সেন)

ফল ও ফুল

জলপাই, আতা, আমলকী, আম, জাম, বেতফল, বাতাবী, ধুন্দল, নাটা, নিম, হরিতকী, লিচু, নারকেল, সুপুরি, ডালিম, আপেল, আঙ্গুর, আনারস, জামরুল ; কাশফুল, বকুল, চাঁপা, জুই, শেফালি, কাঁঠালী চাঁপা, সজিনা, আকন্দ, ভাঁট, দ্রোণ, আলোকলতা, মোরগফুল, নাগেশ্বর ইত্যাদি—

সিঁদুরের মতো রাঙা *লিচু*
ঝরে পড়ে পাতা-ঘাসে ...
(চলে যাব শুকনো পাতা দাওয়া : রূপসী বাংলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেতের নরম ফল, *নাটা ফল* খেতে আসে *ধুন্দুল* বীজের
খোঁজ করে ঘাসে ঘাসে,—

(কোথাও দেখিনি : রূপসী বাংলা)

হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড় ;—ডাশা *আম কামরাঙা কুল*।

(যেদিন মরিয়া যাব : ঐ)

ভেসে *নারকেলবনে* কেড়ে নেয় কোরালীর ভ্রূণ ;
অকূল *সুপুরিবন* স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ

(শিরিষের ডালপালা : বনলতা সেন)

কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায় ;—দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে বুলায়ে ফেরে এইখানে *জাম লিচু* কাঁঠালের বন,

(এখানে আকাশ নীল : রূপসী বাংলা)

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল—
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, রাঙা *আপেলের মতো* লাল যার গাল

(ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল : ঝরা পালক)

এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে *সজিনার ফুল*
আকন্দ ফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ

(এখানে আকাশ নীল : রূপসী বাংলা)

আলোকলতার পাশে গন্ধ ঢালে *দ্রোণফুল* বাসকের গায়

(কোথাও মঠের কাছে : ঐ)

—সে বলিল, 'তোমার বকুল'
মনে আছে?—এগুলি কি, বাসি *চাঁপাফুল*?

(পরস্পর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

প্রাণিজগৎ

ইঁদুর, খঞ্জনা, ঘাসফড়িং, জোনাকি, ফড়িং, ফিঙ্গা, ঘুঘু, পায়রা, পেঁচা, ঘাই-হরিণী, চিল, কাঁচপোকা, বক, বুনোহাস, বাঘ, চড়ুই, মশা, মাছ, মৌমাছি, মাদি, রামছাগল, রাজহাঁস, লক্ষ্মীপেঁচা, শকুন, শুকর, শালিখ, সাপ, হাঁস, হরিণ, সুদর্শন, বেজি, বাদুড়, গঙ্গাফড়িং, কাঁচপোকা, শ্যামাপোকা, ঘোড়া প্রভৃতি—

হয়তো দেখিবে চেয়ে *সুদর্শন* উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;

(আবার আসিব ফিরে : রূপসী বাংলা)

হয়তো শুনিবো এক *লক্ষ্মীপেঁচা* ডাকিতেছে শিমুলের ডালে
এক *ঘাই হরিণীর* ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে !

(ক্যাম্পে : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

ধূ ধূ মাঠ,—ধানক্ষেত,—কাশফুল,—*বুনোহাঁস*,—বালুকার চর
বকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর ·

(সে দিন এ ধরণীর : ঝরাপালক)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঙ্গাফড়িঙের নীড়, *কাঁচপোকা*, *প্রজাপতি*, *শ্যামাপোকা* ঢের,
হিজলের ক্লান্ত পাতা—বটের অজস্র ফল ঝরে বারে বারে
(কোথাও দেখিনি : রূপসী বাংলা)

... *শালিখ খঞ্জনা* আজ কতদূর ওড়ে—
কতখানি রোদ—মেঘ—টের পাব শুয়ে শুয়ে মরণের ঘোরে।
(ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন : ঐ)

সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে *চিল* ;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে *জোনাকির* রঙে ঝিল মিল ;
(বনলতা সেন)

অজস্র *হরিণ* ও *সিংহের* ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি
(নগ্ন নির্জন হাত : ঐ)

রঙ

আকাশ-ধবল, কমলা, কস্তুরী আভা, গভীর সবুজ, জাফরান, নীল, পাণ্ডুর নীল, বাদামি নীলাভ, ধূসর, নেউল ধূসর, মাছের রঙ, মেরুন, ম্লান নীল, রূপালি, রাঙা, লাল-লাল, সবুজ, সোনালি, শাদা, হলুদ, মৌন নীল, হরিৎ, খয়েরি, রামধনু, বাদামি ইত্যাদি—

আন্‌মনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙুল-মেঘের পানে
মৌন নীলের ইশারায় কোন্‌ কামনা জাগিছে প্রাণে !
(আমি কবি,—সেই কবি : ঝরা পালক)

রয়েছি *সবুজ* মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে *নীল* হয়ে আকাশে আকাশে ;
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
(নির্জন স্বাক্ষর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

ধবল রোমের নিচে তাহার *হলুদ* ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে ...
দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—*শাদা* শাঁখা *ধূসর* বাতাসে
(তোমার যেখানে সাধ : রূপসী বাংলা)

মাছি আর ; *হলুদ* পাতার গন্ধে ভ'রে ওঠে অবিচল শালিখের মন,
মেঘের দুপুর ভাসে—*সোনালী* চিলের বুক হয় উন্মন
(সিন্ধুসারস : মহাপৃথিবী)

ফিরে এসো সুরঞ্জনা
নক্ষত্রের *রূপালী* আগুন ভরা রাতে
(আকাশলীনা : সাতটি তারার তিমির)

যখন *হলুদ* পাতা মিশিতেছে উঠানের *খয়েরি* পাতায়,
যখন পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়,
শামুক গুগ্‌লিগুলো প'ড়ে আছে শ্যাওলার *মলিন সবুজে*—
(যদি আমি ঝ'রে যাই : রূপসী বাংলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাঙা মেঘ—হলুদ হলুদ জ্যোৎস্না ; চেয়ে দ্যাখো যদি ; ...
লাল নীল মাছ মেঘ—*ম্লান নীল* জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন : *নীল লাল রূপালী* নীরব।

(শব : মহাপৃথিবী)

আকাশে *কমলা* রঙ ফুটে ওঠে সন্ধ্যায়—কাকগুলো নীল মনে হয় ;

(একদিন পৃথিবীর পথে : রূপসী বাংলা)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অজস্র রঙের উল্লেখ লক্ষ করা যায়। কবি বিশেষ করে 'রূপসী বাংলা' ও 'বনলতা সেন' কাব্যে বর্ণিল রঙের খেলায় মেতে উঠেছেন যেন। প্রকৃতির মতো কবিও একই জিনিসের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রঙের উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ রঙ বদলিয়েছেন। যেমন 'রোদ' কবির বর্ণনায় কখনো কমলা, কখনো জাফরান, কখনো হলুদ, কখনো সোনালি। কখনো বা একাধিক রঙের মিশ্রণ ঘটিয়ে রামধনু বা ময়ূরের পেখমের রঙের উল্লেখ করেছেন। রঙের এত বৈচিত্র্য আর কোনো কবির কাব্যে পাওয়া যায় না।

ঘ্রাণ/গন্ধ

মাটির গন্ধ, ঘাসের গন্ধ, শিশিরের ঘ্রাণ, রোদ্রের গন্ধ, ঝিঁঝির গন্ধ, ঘুমের ঘ্রাণ, শিশুর মুখের গন্ধ, ধানের গন্ধ, হলুদ পাতার গন্ধ, লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ, জলের গন্ধ, পেঁচার ঘ্রাণ, চালের ধূসর গন্ধ, রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ, ইঁদুরের ঘ্রাণ, চিতার গন্ধ, রাত্রির ঘ্রাণ, হরিণের মাংসের ঘ্রাণ, কাফনের ঘ্রাণ, শস্যের গন্ধ ইত্যাদি—

শরীরে *মাটির গন্ধ* মেখে,
শরীরে *জলের গন্ধ* মেখে

(বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

ধানের *খেতের গন্ধ* মুছে গেছে কবে
জীবনের থেকে যেন ; প্রান্তরের মতোন নীরবে

(নিরালোক : মহাপৃথিবী)

আদিম *রাত্রির ঘ্রাণ*
বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান !—

(সহজ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

প্রচুর *শস্যের গন্ধ* থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর *ইঁদুরের ঘ্রাণে* ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে !

(অবসরের গান : ঐ)

পৃথিবীর কোনো পথে ; নরম *ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ*,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, *চাঁদা সরপুঁটিদের*
মৃদুঘ্রাণ, ...

(আকাশে সাতটি তারা : রূপসী বাংলা)

বাদামী *পাতার ঘ্রাণ*—মধুকূপী ঘাস।

(গোধূলি সন্ধির নৃত্য : সাতটি তারার তিমির)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাণ বিষয়ক শব্দ

ত্রিশুল, নীলকণ্ঠ, ভূজঙ্গিনী, ইবলিস, ধূর্জটি, শিব, শিঙ্গা, পিনাক, ইন্দ্র, অক্ষৌহিনী, শাক্য, পৃথ্বী, গাণ্ডীব, বাসব, কুরুক্ষেত্র, তপোবন, অসুর, শালপ্রাংসু, হোমকুণ্ড স্ফীঙ্কস্, ইয়োসুফ, সব্যসাচী, এ্যাম্বক, চম্পা, নচিকেতা, বিদর্ভ, সম্বর, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, ওডিসিয়ুস, সীতা, শচী, অহল্যা, অনিরুদ্ধ, কর্ণ, দেবযানী প্রভৃতি—

উদ্যত ফণার নৃত্যের আস্ফালিত *ধূর্জটির কণ্ঠ–নাগ* জিনি,
ত্র্যম্বক–পিনাকে তব শঙ্খকুল ছিল সদা শত্রু *অক্ষৌহিনী*।...
গাণ্ডীবের টঙ্কারেতে মুহুর্মুহু বলেছিলে,—'আছি, আমি আছি!
কল্পশেষে ভারতের *কুরুক্ষেত্রে* আসিয়াছি নব্য *সব্যসাচী*।'
(দেশবন্ধু : ঝরা পালক)

কলুষ–পাতকে, *ধূর্জটি* তব *পিনাক* উঠিত রুখে,
হানিতে আঘাত দিবানিশি তুমি ক্লেদ–কামনার বুকে
অসুর–আলয়ে *শিব–সন্ন্যাসী* বেড়াতে শঙ্খ ফুঁকে!
(বিবেকানন্দ : ঝরা পালক)

*শচী*র মতন এসে দাঁড়াচ্ছে;
অথবা সে *ইন্দ্রাণীকে* ভেদ ক'রে *অহল্যার* মতো;
সহস্র চোখ না যোনি এতদিন পরে আজ কলকাতায় *ইন্দ্রের* শরীরে?
(এইখানে সূর্যের : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সভ্যতা, দেশ, শহর, স্থান ও ব্যক্তিনাম

সিন্ধু, ইলোরা, অজন্তা, ব্যাবিলন, মিশর, উজ্জয়িনী, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, নাটোর, বোম্বাই, তক্ষশীলা, নালন্দা, দিল্লী, লাহোর, সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, কুয়ালালামপুর, চীন, আলেকজান্দ্রিয়া, কলকাতা, লন্ডন, ক্রেমলিন, জেনেভা, ভার্সাই, পোল্যান্ড, প্যারিস, করাচী, নিউইয়র্ক, প্যালেস্টাইন, হনলুলু, ম্যানিলা, হাওয়াই, সোভিয়েট, ভিয়েনা, টোকিও, রোম, মিউনিখ, বল্লাল সেন, চাঁদ সওদাগর, রায় গুণাকর, দেশবন্ধু, চণ্ডীদাশ, রামপ্রসাদ, কনফুশিয়াস, মার্কোপেলো, চেংগিস, হিটলার, রুশো, লেলিন, ঈশা, মহাত্মাগান্ধী, মাতিস, সেজান, পিকাসো, সক্রেটিস, রবীন্দ্রনাথ, গেটে, স্টালিন, নেহেরু, চার্বাক, প্লেটো, ফ্রয়েড, পাবলভ, শেক্সপিয়ার, দান্তে, মার্কস্, হোমার প্রমুখ—

দূর উর—*ব্যাবিলন*—*মিশরের* মরুভূ'–সঙ্কটে,
কোথা *পিরামিডতলে,*—*ঈসিসের* বেদিকার মূলে,
(অস্তচাঁদে : ঝরাপালক)

ইন্দ্রদ্যুম্নে উজ্জয়িনীতে মথুরা বৃন্দাবনে!
পাটলীপুত্র শ্রাবস্তী কাশী কোশল তক্ষশীলা
অজন্তা আর *নালন্দা* তার রটিছে কীর্তিলীলা!
... ...
জেগেছে নবীন *মোগল–দিল্লী,*—*লাহোর,*—*ফতেহ্পুর,*
যমুনাজলের পুরানো বাঁশিতে বেজেছে নবীন সুর!
(হিন্দু–মুসলমান : ঝরাপালক)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

... স্বপ্ন কি দেখেনি বুদ্ধ—*নিউসিডিয়ায়* বসে দেখেনি মণিকা?
স্বপ্ন কি দেখেনি *রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা, দিল্লী, বেবিলন?*
(তুমি কেন বহু দূরে : রূপসী বাংলা)

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশিথের অন্ধকারে *মালয়* সাগরে
অনেকে ঘুরেছি আমি *বিম্বিসার অশোকের* ধূসর জগতে
(বনলতা সেন : বনলতা সেন)

নীলাভ জলের রোদে *কুয়ালালুম্পুর, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীন, বালি*
অনেক ঘুরেছি আমি—
(নিরঙ্কুশ : সাতটি তারার তিমির)

'তুমি কি *গ্রীস পোলান্ড চেক প্যারিস মিউনিক*
টোকিও রোম ন্যুইয়র্ক ক্রেমলিন আটলান্টিক
লন্ডন চীন দিল্লী মিশর করাচী প্যালেস্টাইন?
(অনন্দা : শ্রেষ্ঠা কবিতা)

আমাদের পিতা *বুদ্ধ কনফুশিয়সের* মতো আমাদেরো প্রাণ
(সুচেতনা : বনলতা সেন)

নচিকেতা জরাথুস্ট লাওৎ-সে এঞ্জেলা রুশো লেলিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
(সময়ের কাছে : সাতটি তারার তিমির)

আজ এই শতাব্দীতে *মহাত্মা গান্ধীর* সচ্ছলতা
এ-রকম প্রিয় এক প্রতিভাদীপন ...
(মহাত্মা গান্ধী : বেলা অবেলা কালবেলা)

মাতিসের—সেজানের—পিকাসোর;
অথবা কিসের ছবি? কিসের ছবির হাড়গোড়?
(অবরোধ : ঐ)

ঘুরে যায় *স্ট্যালিন, নেহেরু, ব্লুক* অথবা *রায়ের* বোঝা ব'য়ে,
ত্রিপাদ ভূমির পরে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদয়ে
(অনুপম ত্রিবেদী : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এখন শেল্‌ফে *চার্বাক, ফ্রয়েড, প্লেটো পাভ্‌লভ্‌* ভাবে
সুজাতাকে আমি ভালবাসি কিনা।
(লোকেন বোসের জর্ণাল : শ্রেষ্ঠকবিতা)

[এ প্রবন্ধের সমস্ত দৃষ্টান্ত আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৪ থেকে নেওয়া হয়েছে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনলতা সেন : কবিতার অন্বয় ও সাঙ্গীতিক নন্দনতত্ত্ব

মাসুদুল হক

বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ, আমাদের চেতন-স্তরের অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতাটি—শব্দের অনুকম্প স্থাপনা, দৃশ্যের উন্মোচনা, অদৃশ্যতা-চেতন-অবচেতন-বোধ সৃষ্টি ; তরঙ্গায়িত উপলব্ধির কাঠামো বিনির্মাণে একটি 'প্রত্নপ্রতীক' কবিতা। 'বনলতা সেন' কবিতাটি 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে জীবনানন্দ দাশ সম্ভবত ১৯৩৬-এ ডাকে পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটি হাতে পেয়ে বুদ্ধদেব বসু আর প্রেমেন্দ্র মিত্র খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রই প্রথম জানিয়েছিলেন 'বনলতা সেন' কবিতায় অ্যালেন পো রচিত 'To Helen' কবিতাটির সাদৃশ্য বিদ্যমান। তবে সাদৃশ্যের বেড়াজাল অতিক্রম করে কবিতাটি আমাদের পাঠক হৃদয়ে একটি মীথ হিসেবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মীথ বলতে আমরা বুঝি : "বাস্তব ও স্বপ্নে সেতুবন্ধ, মানুষ যা হতে চেয়েছে তারই আদর্শ, যা সে প্রকাশ করতে চেয়েছে তারই মূর্তায়ন।" আর এই ক্ষেত্রে আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে 'বনলতা সেন' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'ব্যক্তিগত মীথ' যা সর্বজনীন মীথে পরিণত হয়েছে। কবিতার মানসচর্যা ব্যক্তিগতকে সমষ্টিগত অধিআয়তনিক পরিসরে ; আত্মকে নৈরাত্মে, অভিজ্ঞতাকে বহুনন্দিত সারাংশে, দ্যোতককে অবিশ্রাম দ্যোতনায় স্পন্দিত এবং বিলম্বনে ; অত্যুচ্চ কল্পনাকে ব্যবহারিকে নিয়ে আসে। আর এভাবে বিষয় ও বিষয়-সত্তার পারম্পর্য, দৃশ্যকল্পে উপমায়—বাকপ্রতিমায় মরমের দুয়ার খুলে জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতাকে উপস্থাপন করেছেন ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক যাদুবৃত্তে (magic circle)। 'যাদুবৃত্ত' টার্মটি সুসান ল্যাঙ্গার ব্যবহার করেছিলেন কবিতা ও সঙ্গীতের মধ্যকার অন্বয় দেখানোর জন্যে। তাঁর মতে কবিতা এবং সংগীত দুই-ই-গড়ে উঠে : 'by waving magic circle'. ম্যাজিক শব্দটিতে বলা হয়েছে irrationality-র কথা। আর বৃত্ত বা circle শব্দটি এসেছে প্যাটার্নের প্রতীক হিসেবে। যাকে তিনি বলেছেন 'Natural Geometry' বৃত্তের প্যাটার্ন হলো তার 'organic wholeness'-এ পৌঁছানো। আমরা জানি ম্যাজিকের ধারণাটি প্রত্ন লোকায়ত বিশ্বাস থেকে উঠে আসা। কিন্তু ল্যাঙ্গার এই ধারণাটিকে একটি সুনির্দিষ্ট নান্দনিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি লেখেন : "The bodily sensations of the dancers, merging with sights and sounds, with the whole kaleidoscope of figures (frequently masked) and mystic gestures, hold the great rhythm together"[১] 'Kaleidoscope of figures'-টাই ল্যাঙ্গারের মতে প্যাটার্ন। এই প্যাটার্নের ধারণাটি ল্যাঙ্গার সংগীতের সংবর্তনতত্ত্বেও ব্যবহার করেছেন। "music is shape pattern which means nothing but itself"[২] ; তা হলে প্রশ্ন ওঠে প্যাটার্ন বলতে কি বোঝায়? প্রচলিত ধারণায় 'প্যাটার্ন' শব্দটির অর্থ ভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবর্তিত স্কিম। ভাষাগত উপাদানের তা ধ্বনির স্তরে হোক, পদ গঠনের স্তরে হোক বা অন্বয়ের স্তরে হোক, তা মূলত আবর্তিত রূপ। 'বনলতা সেন' কবিতা থেকে এই প্যাটার্ন–এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বাক্য ১. অনেক ঘুরেছি আমি

বাক্য ২. সেখানে ছিলাম আমি

দু'টি বাক্যের স্কিম সমান্তরাল। অর্থাৎ 'বাকযন্ত্রে' এই দু'টি বাক্যের ঘাত–প্রতিঘাত প্রায় একই রকম। বাক্য দু'টিকে উপরিতলে (surface structure) সাজালে বৃক্ষ চিত্র দাঁড়ায় নিম্নরূপ :

S_1 → VP, NP; VP → adv, V

S_2 → VP, NP; VP → adv, V

এত গেল বৃক্ষ চিত্রে প্যাটার্ন। আর নান্দনিক মাত্রায় প্যাটার্ন হচ্ছে : "imposition of an intellectual form on sensous body"। কবিতার body হচ্ছে meaning বা অর্থ। অর্থযুক্ত ভাষার সুনিরূপিত সংগঠন প্যাটার্নে পৌঁছে যায়। ফলে প্যাটার্নের অর্থ দাঁড়ায় 'representation of reality in Art', তা সম্পূর্ণ কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আর বিচ্ছিন্ন করে নিলেই তা স্কিমের অন্তর্ভুক্ত হবে। স্কিম বলতে শুধু ধ্বনিই আবর্তন বুঝায় না।[৩] স্কিম তখনই প্যাটার্নে রূপান্তরিত হতে পারে যখন তা কবিতার অন্তর্গত সংগঠনের (inner structure) অঙ্গ হয়ে যায়। কাজেই কবিতার ক্ষেত্রে প্যাটার্ন তা যেমন ধ্বনির হতে পরে, অর্থের হতে পারে, অন্বয়ের হতে পারে, এমনকি অলঙ্কারিক বিন্যাসেরও হতে পারে। আর এই গুণগুলির দিকে লক্ষ রেখেই বলা যায় 'বনলতা সেন' একটি 'প্যাটার্ন কবিতা' ; যেখানে কবিতা ও সংগীতের অন্বয় সংগঠিত হয়েছে। আবার ল্যাঙ্গারের দৃষ্টিতে প্যাটার্ন হচ্ছে একটি সুপ্রকল্প বিন্যাস বা 'Systematic order' যেখানে 'intellectual process'–টা অনেক বেশি ক্রিয়াশীল। ফলে প্যাটার্ন যেখানে 'Logical form' ; গানের ভাষায় প্যাটার্ন গড়ে ওঠে ভাব আর সুরের টানাপোড়েন আর স্থিতিতে। টানাপোড়েন শব্দের মধ্যে আবর্ত (vortex) এবং গতির (motion) কথা বলা হয়েছে। ফলে সংগীতের প্যাটার্নটি 'সুরের শুদ্ধসজ্জা'। ল্যাঙ্গার সংগীতের ভাষায় অর্থের প্যাটার্নও লক্ষ করেছেন সে অর্থ আবেগের স্পন্দন জাগায় না, সে অর্থ প্রতীকী। অর্থাৎ ল্যাঙ্গারের প্যাটার্ন ধারণা আর প্রতীকী ভাবনা প্রায় কাছাকাছি। "Music like language is an articulate form. ...Music has import and this import is the pattern of sentence, the pattern of life itself".[৪] তাহলে প্যাটার্ন হয়ে উঠেছে ল্যাঙ্গারের কাছে সংগীত। তাঁর কাছে শিল্পের পৌঁছে যাওয়াটাই সংগীতে পৌঁছানো। কাজেই ল্যাঙ্গার অনুসরণে আমরা বলতে পারি 'বনলতা সেন' কবিতাটি সংগীতের ভাব আর সুরের টানাপোড়েন আর স্থিতিতে, শব্দের আবর্ত (vortex) এবং গতির (motion)। পরিমিতিতে শিল্পের উৎকর্ষে পৌঁছে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টান্ত :

[...] চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের ’পর
হাল ভেঙ্গে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, ‘এতদিন কোথায় ছিলেন ?’
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। (বনলতা সেন)

অর্থাৎ ‘বনলতা সেন’ কবিতার অন্বয়ে সংগীতের অভিঘাত তখনই লাগছে যখন অন্বয়ের ভিতর দিকে কবি জীবনানন্দ দাশ প্যাটার্ন তৈরি করে নিয়েছেন। এখানে কবির প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল ‘right patterning’ এবং ‘designing of word’ যা কবিতাটিকে sublimity-র পর্যায়ে নিয়ে যায়। জীবনানন্দ শব্দকে দুটি দিকেই ব্যবহার করতে চেয়েছেন। একটি হচ্ছে ‘as sounds’ ; অন্যটি হচ্ছে ‘musical meaning’। আর তাই তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে সার্বিক অর্থে ইন্দ্রিয়ঘন জগৎ নিয়ে verbal pattern-এর আলোছায়ার অধ্যায়।

২. ম্যাকলিশের মতে কবিতা শিল্প হচ্ছে ‘means to meaning’ ; অর্থাৎ কবিতার ভাষার লক্ষ্য হচ্ছে অর্থের মাত্রায় পৌছানো। এ ক্ষেত্রে তিনি লেখেন : “And a meaning appears which is neither the meaning of the image nor the meaning of the other nor even the sum of both but a consequence of both—a consequence of both in their conjunction.”[৫] অর্থাৎ প্রবাহিত বাক্য ধারাকে শিকারী কবি কেবলই ফাঁদবন্দী করতে চান। লক্ষ a means to meaning-এ পৌছানো ; এক ধরনের জাদুবৃত্ত রচনা। ধ্বনি আর অন্বয়ের এই জাদুবৃত্ত জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘বনলতা সেন’ কবিতায় দেখান দু’ভাবে।

১. শুদ্ধ ধ্বনির design-এর ভিতর দিয়ে
২. ধ্বনি আর অর্থের আবর্তে দ্ব্যর্থকতা নির্মাণ করে।

প্রথমটির ক্ষেত্রে কবি ব্যবহার করেছেন অনুপ্রাস, ব্যঞ্জনসাম্য এবং পার্শ্বমিল এবং অন্ত্যমিলের প্রকরণ। এদের সাংগীতিক প্রতিভাসটি গড়ে উঠেছে জ্যামিতিক সুষমায়। এই জ্যামিতিক সুষমাই কবিতার অন্তর্গত প্যাটার্ন, তার নান্দনিক ভাব। ‘বনলতা সেন’ কবিতা থেকে একটি নমুনা সাজিয়ে নিলে এদের অন্তর্গত সংগঠনের আদলটি স্পষ্ট করা যাবে।

দৃষ্টান্ত :

[...] চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের ’পর
হাল ভেঙ্গে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা [...]

এখানে অনুপ্রাস, ব্যঞ্জনসাম্য, পার্শ্বমিল এবং অন্তমিলের প্রকরণ লক্ষণীয়।

তাছাড়া, ‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ...’ চালটি এক রৈখিক নয়, অনুভূমিক উল্লম্ব দু’টি তলেই ধ্বনির interaction-টা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ জাদুবৃত্ত নির্মাণের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘বনলতা সেন’ কবিতায় ধ্বনি আর অর্থের আবর্তে দ্ব্যর্থকতা নির্মাণ করেছেন। এই দ্ব্যর্থকতা অনেকটা মগ্নতলের (deep-structure)। তবে উপরিতলে রয়েছে সুরেলা স্বরধ্বনি এবং তরল ব্যঞ্জনের প্রবাহ। কিন্তু মগ্নতলে এক ধরনের আবর্ত সৃষ্টি হয়। যা ‘evc’ প্যাটার্নে সাজালে বিষয়টি অতি সহজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্য করা যায়। 'evc' প্যাটার্নের রুদ্ধদলে খেয়াল করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি রুদ্ধদল তৈরি হয়েছে সুরেলা তরল এবং শিস্ ধ্বনি দিয়ে।

ধ্বনির এই জটিল সাংগীতিক বিন্যাসের সঙ্গে সমান্তরাল বাক্যের সংগঠন একটি স্কিম এবং প্রবাহের টেনশন তৈরি করছে। স্কিমের কাজই হলো ভাষার প্রবাহকে বাধা দেওয়া। কিন্তু বাধার অচল মাত্রা ধ্বনির প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেলে তার ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় দ্ব্যর্থকতা নির্মাণের। পংক্তি দু'টির অন্বয়কে বিন্যাস প্রতীকে সাজালে দাঁড়ায় :

x	y	z
চুল	তার	কবেকার অন্ধকার ...
মুখ	তার	শ্রাবস্তীর কারুকার্য ...

এখানে বাক্যের সমান্তরাল স্কিম তৈরি হয়েছে আনুভূমিকভাবে। অর্থাৎ $N_1 + N_2 \rightarrow N_2 + N_1$–এর বিপর্যাস সংবর্তনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ধ্বনির মিল অমিলের দ্বান্দ্বিক চালটি গড়ে তোলা হয়েছে উল্লম্ব আয়াসে। বাক্যের সমান্তরাল স্কিমে এসেছে চল + অচল + চল–এর বিন্যাস আর ধ্বনি প্রবাহে সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে তরল ধ্বনির অনুরণন। বাক্যের এই স্কিম আর ধ্বনির মিল অমিলের টানাপোড়েন, যা ধ্বনি আর অর্থের আবর্তে পাঠক চৈতন্যে দ্ব্যর্থকতার ঘোর তৈরি করে। আর এই লক্ষণটির জন্যেই 'বনলতা সেন' কবিতাটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

৩. আমরা জানি ইতিহাস চেতনার কবিতাগুলির মধ্যে 'বনলতা সেন' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবি বর্তমান যুগে প্রেমের অচরিতার্থ রূপ দেখে ব্যথিত, সৌন্দর্যহীনতায় পীড়িত। কবি তাই ভূগোল ও ইতিহাসের বৃহত্তর পটে খুঁজেছেন প্রেম ও সুন্দরের প্রকৃত স্বরূপকে। Time ও Space–এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নাটোরের 'বনলতা সেন'–কে কবি ভূগোল ও ইতিহাসবোধের গভীর প্রেক্ষাপটের ভিতর থেকে উন্মোচিত করে নিয়ে আসেন তার নৈঃশব্দের অন্তর্লীন মানস–সংগঠনের কারণেই। 'বনলতা সেন' কবিতার ইতিহাস চেতনা প্রসঙ্গে দীপ্তি ত্রিপাঠী লেখেন : "...শ্রাবস্তী, বিদিশা কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কোনো মন্ত্র বলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক 'dream-heavy land' যেখানে ইচ্ছা, অনুভূতি ও কল্পনা পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায়। ইয়েটস যেমন প্রিয়ার আলিঙ্গনের মধ্যে যুগ যুগান্তরের কথা স্মরণ করেছিলেন ; তেমনি প্রিয়ার স্মৃতিচারণার মধ্যে জীবনানন্দের চোখেও ভেসে উঠেছে হারানো সৌন্দর্যের, হারানো পূর্ণতার নানা চিত্র। ...প্রেমের সৌন্দর্যরূপের মতো ব্যর্থতাকেও কবি ইতিহাসের মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, যেমন 'শ্যামলী'তে যুগে যুগে মানুষ প্রেমের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছে। প্রেমের শুল্ক দিতে, 'দ্রাক্ষা দুধ ময়ূর শয্যার কথা ভুলে" গিয়ে দুঃসাহসিক অভিযানে, হয়তো সাফল্য মেলেনি। ব্যক্তির মতো জাতিগণও তিল–তিল ঐশ্বর্য দিয়ে যে তিলোত্তমা সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল তার মর্মে ক্লান্তি নেমেছে। ...প্রতি সভ্যতা তার সংকল্প উদ্যম একদা কালের ধর্মে হারিয়ে ফেলে কিন্তু নারীর প্রেম মানুষকে যে প্রেরণা দেয় তার ক্ষয় নেই তার ক্ষয় নেই। ... তাই ধর্ম, সংঘ, শক্তির চেয়েও মানুষ চায় "আরো আলো, মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।"[৬] 'বনলতা সেন' কবিতাটি মোট তিনটি স্তবকে রচিত। প্রতিটি স্তবক নির্মিত হয়েছে ছয়টি পংক্তি দিয়ে। প্রথম স্তবকে পরিব্রাজকের আত্ম–পরিচয়, দ্বিতীয় স্তবকে কবিতার উদ্দিষ্টার আগমন, পরিচয় ও বর্ণনা এবং তৃতীয় স্তবকে মুখোমুখি দৃশ্য। মূলত তিনটি স্তরে বিভক্ত এই কবিতাটি ধ্বনি আর অর্থের আবর্তে দ্ব্যর্থকতার পর্যায়ে উন্নীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছকে সাজালে দাঁড়ায় :

	ধ্বনি মাধুর্য		অর্থ
১.	হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ; আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন, আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।	১.	পরিব্রাজকের আত্ম-পরিচয়
২.	চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের 'পর হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারায়েছে দিশা সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর, তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।	২.	কবিতার উদ্দিষ্টার আগমন, পরিচয় ও বর্ণনা
৩.	সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ; পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ; সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন; থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।	৩.	কবি ও বনলতার মুখোমুখি দৃশ্যের বৈজ্ঞানিক প্রতি-বাস্তবতার উপস্থাপন

'বনলতা সেন' কবিতার দ্ব্যর্থকতাবোধকে চিত্রের সাহায্যে দেখানো যাক :

প্রকাশ	প্রকাশ	প্রকাশ	সংগীত → দ্ব্যর্থকতা
	অনুষঙ্গ–২	অনুষঙ্গ–৩	
অনুষঙ্গ–১			

অর্থাৎ ধ্বনির প্রকাশ আর অর্থের আবর্তে সংগীতময়তায় দ্ব্যর্থকতার উন্মোচনই হচ্ছে 'বনলতা সেন' কবিতার অন্তর্গত প্যাটার্ন, নান্দনিক বিভা।

৪. যে কোনো কবিতাকেই গ্রাফে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। কবিতার শরীরকে উল্লম্ব ও অনুভূমিক অবস্থানে ফেলে—সারি (row) এবং কলাম (column) অনুসারে অক্ষরগুলি গণনা করে গ্রাফের নিয়ম অনুসারে X-অক্ষ এবং Y–অক্ষে বিন্দু স্থাপন করলে কবিতার অনুভূতির গতি, প্রভৃতি বোঝা যেতে পারে। কবি, তাঁর সত্য অনুভূতিজাত বোধের গভীরতা কতটা তীব্র এবং অনুভূতিকে শব্দ শিল্পে রূপান্তরে কতটা সফল—তার একটি পর্যালোচনা গ্রাফ থেকে বোঝা যেতে পারে। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটিকে গ্রাফে স্থাপন করলে একটি 'সরল রেখা' পাওয়া যায়। এতে কবির বোধের সাথে কবিতার শরীরগত অনুভূতির permutation ও combination-এর সাদৃশ্য রয়েছে। আবার 'বনলতা সেন' কবিতার বিষয়বস্তু অর্থাৎ যাযাবর জীবন যে কেবল পথে পথে ভ্রমণের নেশায় ঘুরে বেড়ায়—সরল যে পথ—সরল যে জীবন (ইতিহাসের চেতনায় স্পষ্ট) তার ইঙ্গিতও আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাফে পেয়ে যাচ্ছি। সরল ভালোবাসা-কাতর দীর্ঘ সরল পথের ক্লান্ত যাত্রী—সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন নিশ্চুপে সন্ধ্যা নেমে এলে, নাটোরের সরলবতী বনলতা সেন কেবলই মন্ত্রমুগ্ধ চোখে ক্লান্ত যাত্রীর মুখোমুখি বসে থাকে। জীবনানন্দ দাশের স্নিগ্ধ কাব্য মেজাজ, কাব্য-বিষয়—সবকিছুই যেন, তাঁকে আরো বেশি প্রতিষ্ঠিত করে তুলে বোধের অনুভূতির সাথে, শব্দ চয়ন বিন্যাস—সমাবেশ আর কবিতার শরীরের কাঠামোয়। দৃশ্য, মেজাজ, বিষয়বস্তু মস্তিষ্কের বিন্যাস, সমাবেশ—তার শব্দে রূপান্তরের শরীর ; সবকিছুই পেয়ে যায় সরল মাত্রিক ব্যঞ্জনা। দৃশ্য, চিন্তা ও প্রকাশের সাথে মিল খুঁজে পায় কবিতা। সবকিছু লুকিয়ে কবির বোধ-সঞ্চারণ—সঞ্চারিত হয়ে ওঠে পাঠক হৃদয়ে। গ্রাফে 'বনলতা সেন' কবিতার অবস্থান দেখানো হলো :

এখানে 'বনলতা সেন' কবিতার একটি মান স্তবক দেখানো হলো। এর ফলে আমরা একটি সরল রেখার নির্দেশ পাচ্ছি। অর্থাৎ কবিতাটির গভীরতল (deep-structure) এবং অধিতলের (surface-structure)–এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যা শেষ পর্যন্ত সাংগঠনিক কাব্য তত্ত্বের ভাষার সংবর্তনকেই অর্থের শক্তি দিয়ে 'কবিতা'র কবিতা হয়ে ওঠার মৌল-চিহ্ন প্রকাশ করে।

৫. 'বনলতা সেন' পাঠকের সামষ্টিক চেতনায় এক অনপনেয় প্রতীক। ধ্বনি আর অর্থের ব্যঞ্জনায় কবিতাটি 'ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট' হিসেবে পাঠক হৃদয়ে জেগে আছে ; জেগে থাকবে। 'বনলতা সেন' কোনো স্বপ্ন কিংবা বাস্তবতাকে প্রতিভাসিত করে না ; বরঞ্চ বলা যায়, এ এক মুদ্রার নির্মাণ, যার এক পিঠে বাস্তবতা, অন্য পিঠে স্বপ্নময়তা।

তথ্যসূত্র

১. Langer, K. Susanne, Feeling and form. Routedge & Kegan paul Limited. 1953, p. 199.
২. Davie, Doneld, Articulate Energy, Routledge & Kegan poul London, 1971, p. 16-17.
৩. Leech, N. Geoffrey, A Linguistic Guide to English poetry, Longman Group, Ltd, London, 1969, p. 74.
৪. Langer, K. Susanne, Feeling and form. Routledge & Kegan paul, 1953, p. 31.
৫. Macleish, Archibald, Poetry and Experience, Penguin books Ltd, Ringwood, 1960, p. 66.
৬. দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'জীবনানন্দ দাশ', *'সমালোচনা সংগ্রহ'*, সম্পাদক : অধ্যাপক মাহবুবুল আলম, ঢাকা খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮০, পৃ. ৫১২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কাব্য : রূপাঙ্গিকশৈলী উত্তরাধুনিকতা ও যাদুবাস্তবতা

আহাম্মেদ কবীর

জীবনানন্দের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, বোধের অন্তরালে অন্তর্বোধ সৃষ্টি করা, দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করা, একই সত্তার মধ্যে বহুত্বের ভাবকল্প তৈরি করে দৃশ্যকে দৃষ্টির সাথে দৃষ্টিকে সৃষ্টির নিয়মে নতুনত্ব দান করে অন্য এক ভাব ব্যঞ্জনার কাব্যস্বকীয়তার জন্ম দেওয়া।

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে ;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার,— চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয় ;—

(অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

অদ্ভুত এক মিলনের সমন্বয় ঘটেছে এ কবিতায়। আদিরসের দিক থেকে শৃঙ্গারের ভাবকল্প কিন্তু ভাবনাবোধে প্রাচ্যরীতি সুন্দর এক দ্যোতনা সৃষ্টি করে কাব্য ঘটনাকে নতুন ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করে তুলেছে। প্রতিদিনের রোদ এসেছে প্রেমিকের ছদ্মবেশে। প্রেম করছে প্রকৃতির সাথে, তৈরি করছে নতুন চিত্রকল্প (Image) যা বাংলা কবিতায় নতুনই বটে। শুধু চিত্রই নয় কার্তিকের ধান ক্ষেতের সবুজ ধান যেন রতিক্রিয়ায় রোদের স্পর্শ পেয়ে পেকে উঠেছে। এই যে পরিক্রমা, বোধের মধ্যে ভাবকল্প গতি পেয়ে—অগ্রসর হয়ে নতুন এক সম্ভাবনার কথা বলে—এটাই জীবনানন্দের রূপতত্ত্ব, আঙ্গিক বা প্রকরণ। এর মধ্যেই ব্যক্ত হয়ে ওঠে আধুনিকতা আর তার অগ্রসরমান প্রয়াসের আরেক শীর্ষবিন্দু উত্তরাধুনিকতা এবং ইন্দ্রিয়বোধের লীলাচিত্রখেলা বা যাদুবাস্তবতা।

যাদুবোধের বাস্তবতা (Magic-Realism) জীবনানন্দের কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কালের বিচার বিজ্ঞানে এই বৈশিষ্ট্যটি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা জুড়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। এক সময় অবশ্য ভাবা হতো জীবনানন্দ হলেন পরাবাস্তববাদী কবি। এভাবেই তাঁকে চিহ্নিত করে Critic-রা নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে আরো বেশি সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন। কেননা শুধুমাত্র পরাবাস্তবধারার কবিতাই তিনি রচনা করেননি। একই সঙ্গে ফবিইজম, মিউবিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ড্যাডাইজম, সিম্বলিজম, Image-ইজম, ইম্প্রেশিনিজম থেকে শুরু করে সে সময়কালের প্রচলিত প্রত্যেকটি আঙ্গিকের (Form) মালমশলা ব্যবহার করে কাব্য রচনা করেছেন বিধায় তাঁকে শুধুমাত্র পরাবাস্তববাদী কবি বলা অবশ্যই ভুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের যে ইন্দ্রিয়বোধ, গভীর চিন্তার মধ্যে অলৌকিক চিত্রময়তাকে খোঁজার সাথে সাথে বাস্তবের সম্ভব অথচ দৃশ্যমান নয় এমন কিছুর ছবি ফোটাবার প্রয়াসই হলো যাদুবাস্তবতা বা Magic-Realism, অর্থাৎ যাদু কিন্তু বাস্তব বা বাস্তব কিন্তু যাদুর মতো বোঝা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। জীবনানন্দের কবিতায় যাদু বাস্তবতার কিছু উদাহরণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১. দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে ;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

(মৃত্যুর আগে : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

কোনো মানুষই দেখতে পায় না কী করে গাছের পাতা হলুদ হয়? কেননা এটা দেখতে হলে দীর্ঘ সময়ের পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। আবার সেই পর্যবেক্ষণের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য সবুজ থেকে হলুদ হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে পরিবর্তন ও নান্দনিকতা পরিস্ফুট হয়ে উঠে সেটা দিব্য চোখে দেখে সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তেমনি সম্ভব নয়, আলো আর বুলবুলি কী করে খেলা করে হিজলের জানালায়? শীতের রাতে ইঁদুর কী করে তার রোমে খুদ মাখে? মাছ কী করে দেখে চালের ধূসর গন্ধে সৃষ্ট জলের তরঙ্গের রূপ? কিংবা পুকুরের পাড়ে সন্ধ্যার হাঁসের ঘুম ঘুম ভাবে মেয়েলি হাতের স্পর্শ কী ছবির সৃষ্টি করে? সেটা তাৎক্ষণিকভাবে ধরা না গেলেও সেটা কিন্তু বাস্তব। তবে কিছুটা যাদু, ইন্দ্রিয় বা অতি-বাস্তব অনুভূতিতাড়িত।

২. হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
... ...
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।
... ...
সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;

(বনলতা সেন : বনলতা সেন)

সময় নামক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারলে মানুষ ঠিকই একদিন হাজার বছর ধরেই পথ হাঁটতে পারবে। এ কোনো অসম্ভব কিছু নয় তবে বর্তমানে সম্ভব নয় বলেই এটাকে স্বপ্নের মতো অলৌকিক বলে মনে হতে পারে কিন্তু একদিন এই যাদুই বাস্তব হবে, মানুষ হাঁটবে হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে। যেমন হাঁটা শুরু করেছিলেন (করেছেনও বটে) কবি জীবনানন্দ দাশ। হাঁটতে হাঁটতে পাখির বাসার মতো চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করে কথা বলার মানুষ বনলতা সেনের মুখোমুখি হয়েছেন। সম্ভবের সম্ভাবনায় এও এক অসম্ভব মানুষের চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের আশ্চর্য প্রতিতুলনায়। পাখির নীড় দেয় আশ্রয় আর নাটোরের বনলতার চোখ দেয় আশ্রয়ের সূত্রে প্রশ্রয় হাজার বছর ধরে হেঁটে আসা ক্লান্ত প্রেমিককে। যা ভাবতে গেলে David Copperfield এর যাদুর মতোই শিল্পিত আবার আশ্চর্য-সৌন্দর্য সত্যের মতন মনে হয় নান্দনিক।

সন্ধ্যার আগমন শিশিরের শব্দের মতন আসতে কি পারে না? প্রশ্ন উঠতে পারে, শিশিরের শব্দ কেমন? কাব্যের ব্যঞ্জনায় কী করে সেটাকে ফোটানো যায়? আদৌ কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশিরের শব্দ মানুষ শুনতে পায়? চিলের ডানার মধ্যে রোদের যে গন্ধ থাকে সেটা কী করে চিল মুছে ফেলে? পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর আছে কিন্তু উত্তর দেওয়া সহজ নয়। যেমন যাদুকর পি. সি. সরকার শূন্যে মানুষ ভাসিয়ে দেন। ব্যাপারটা সত্যি যে মানুষটি ভাসছে। আবার এটাও সত্যি যে, যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণ রয়েছে সেহেতু কোনো মানুষ ভাসতে পারে না। সুতরাং যাদুটা বাস্তব কিন্তু সত্যি নয়। আবার সত্যি হতে পারে সেটা তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্র নির্বাচনের জটিলতা মানুষের উপর ছেড়ে দিয়েই কবিত্ব শক্তি বা কবিতার বিজ্ঞান (এ ক্ষেত্রে যাদু বাস্তবতার বিজ্ঞান) সৃষ্টিকল্পের নামই জীবনানন্দের কাব্য।

Metamorphosis বা রূপান্তরতত্ত্ব জীবনানন্দের কাব্যের একটি বিশেষ প্রয়াস-প্রক্রিয়া; ঘটনা সংঘটনের প্রচেষ্টা কাব্যে অনুভূতি ব্যক্ত করার বিশেষ বিক্রিয়া অথবা দ্বন্দ্ব (Dialecties)। তবে এ দ্বন্দ্ব বিকাশের সূত্র সত্যকে উজ্জ্বল করে তুলে বলেই এর অভিনবত্ব আজো আলোচিত। তাঁর Metamorphosis তত্ত্ব ভারতীয় জন্মান্তরবাদতত্ত্বের মিশ্রণে অন্যরকম ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে। সে শুধু পুনরায় জন্ম নিতেই চায়নি। বরং ক্ষণে ক্ষণে ঘটনার ব্যাখ্যা আবেগের বহির্প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে নিজের সত্তার রূপান্তর কামনা করে অদ্ভুত এক নতুন shape বা আকার আকৃতি প্রকৃতি দ্বারা নতুন চিত্রকল্প (Image) সৃষ্টি করে তাঁর চিন্তাকে শুধু নান্দনিকই করে তুলেননি বরং অর্থবোধক, ইঙ্গিতময়, অথচ কাব্যধর্মী বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধও করেছেন। একটি সত্তা অন্য একটি সত্তায় রূপান্তরের ইচ্ছা আবেগে লীলারত হতে হতে ইচ্ছার অসীমতায় বিলীন হয়ে সৃষ্টি করে নতুন ভাবের ভাবনা। যেমন :

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি;
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে;
... ...
নীল আকাশের খইক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।

(আমি যদি হতাম : বনলতা সেন)

মানুষের সমাপ্তি মৃত্যু নামক মহাসত্যে। কিন্তু রূপান্তরতত্ত্বে বস্তু অথবা আত্মার অবিনশ্বরবাদীতার কথা বলা হয়। আত্মার মৃত্যু নেই, বস্তুর ধ্বংস নেই। মৃত্যুর পর আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়। অন্যদিকে মৃত্যুর পর মানুষের দেহ মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি ও উত্তাপের স্বরূপে রূপান্তরিত হয়ে অন্য এক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য নিয়োজিত হতে থাকে। এই সব বিশ্বাস, সত্য বৈভবে পুষ্ট একজন বাঙালি কবি জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে, হয়তো, যদি, হ'ব ইত্যাদি ধারণা বিশ্বাসপ্রসূত শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছার Metamorphosis-কে ব্যাখ্যা ও ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর আগমনকে একইসঙ্গে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায়। সমস্ত কবিতার মধ্যে মানুষের ইচ্ছার সাথে আবেগের ইতিহাস বাস্তবতা বিবর্তনের নিয়মের সাথে উপমা প্রাসঙ্গিকতার আশ্চর্য সমন্বয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে মৃত্যুর শেষেও অমরত্বের সদিচ্ছা প্রত্যয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হ'ব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধে ভরা জলে ভেসে ভেসে ; ...
(আবার আসিব ফিরে : রূপসী বাংলা)

আদি বিশ্বাস, মানুষ মরে গেলে (ভারতীয় বিশ্বাস) চলে যায় অনেক দূরে তারার দেশে। সে ফিরে আর আসে না। এই যে চলে যাওয়ার বেদনা—এর গর্ভেই জন্ম হয় অধিবিদ্যাআশ্রিত দর্শনতত্ত্ব, যা আধুনিক মানবের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা অর্জিত সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান এবং জিজ্ঞাসা। তাই কবি বলতে পারেন :

নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
পথ ভুলে বারবার পৃথিবীর ক্ষেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল !—
(পিপাসার গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

ফসলের জন্ম-জন্মান্তরে মানবের স্বপ্ন-বিশ্বাস-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে পারে হৃদয়ে, বিবেকে—এই সত্যের জয়গানে মুখরিত কবি। কবির ঐতিহ্যবোধ সিরিজ নাটকের To be continued-এর মতোই ক্রমশ চলমান হতে হতে এক মৃত্যু শেষে আরেক মৃত্যুতে, এক প্রজন্মের আবির্ভাবের বিশ্বাসে আরেক প্রজন্মের পুনরাগমনের মাধ্যমে চলমান সত্যে রূপান্তরিত হতে আগ্রহী। কেননা, এই জীবন মৃত্তিকা-নিসর্গ-প্রকৃতি রূপময়তার অপরূপ রীতি-বৈচিত্র্য দেখার জন্যে, বিকাশের জন্যে, নান্দনিক কিংবা জীবনবাদী হিসেবে রূপায়িত করার জন্য এক জীবনের সীমাবদ্ধতার সীমায় সীমিত হয়ে তো লাভ নেই। তাইতো প্রয়োজন, জনম জনম, জন্ম-জন্মান্তরের প্রত্যাশা-স্বপ্ন-সত্য।

... এ জনমে নয় যেন—এই পাড়াগাঁর
পথে তবু তিন শো বছর আগে হয়তো বা—আমি তার সাথে
কাটায়েছি ; পাঁচশো বছর আগে হয়তো বা—সাতশো বছর
কেটে গেছে তারপর তোমাদের আম জাম কাঁঠালের দেশে ;
ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠে মাঠে কতবার কুড়ালাম খড়,
বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে,
(ঘুমায়ে পড়িব আমি : রূপসী বাংলা)

এখানে বিশ্বাস বিবৃত হয়েছে এমন এক রূপান্তর সত্যে বারংবার যার প্রয়োজন পড়েছে বাংলার চিরায়ত রূপ প্রকৃতির বর্ণনার মাধ্যমে মানবের অন্তরের স্বপ্নময়তায় ঐতিহ্যপ্রীতি ও বোধ জাগ্রত করার জন্যে।

মানুষের বিচ্যুতি যন্ত্রসভ্যতায় সৃষ্ট অন্তরের জটিলতা ও সংকটে যেমন নতুন ভাব ও প্রত্যয়ের জন্ম দেয় ফ্রানৎস ... Metamorphosis গল্প (নাকি উপন্যাস?) ঠিক তেমনি আধুনিক মানুষের আধুনিকতায় ছোট্ট একটি নির্যাস বা স্বস্তির কথা বলে উঠতে পারে জীবনানন্দের কবিতার রূপান্তর তত্ত্ব। নিচে ছোট্ট একটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

(কমলালেবু : বনলতা সেন)

অসুস্থ রোগীর বিছানার পাশে তার সেবার জন্যে, পুষ্টির জন্যে আগমনের এই প্রয়াস বা আকাঙ্ক্ষাই জীবনানন্দের রূপান্তরতত্ত্বকে মানবিক করে তোলে। মানুষের মমত্ববোধ মানবিকতা তত্ত্বের বিশেষ বিবেচনায় উপলক্ষ নয় কেন্দ্রসূত্রসত্য যখন হয়ে উঠে, তখন বিজ্ঞান এ কাব্যের বাণীভাষ্যে একাত্ম হয়ে যে ঘোষণা দেয় সেটাই প্রয়োজনীয়। কালের বিচারে সেটা classic, মননের বিচারে মানবিক, স্মৃতির বিচারে প্রাসঙ্গিক এবং রূপান্তর ও জন্মান্তরের অভিধায় Metamorphosis হিসেবেই বিচার্য।

আঙ্গিকের অসাধারণ বৈভবে পরিপুষ্ট জীবনানন্দের কাব্যের পরিসীমা। সে সময়ে প্রচলিত পৃথিবীর বিভিন্ন আঙ্গিকশৈলী তাঁর কাব্যে এসে অপূর্ব এক চিত্রকল্প, দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা ও ঐতিহ্যবাহী লোকবৃত্ত মানবিকতার সূত্র তৈরি করে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই অভিনবত্ব প্রকরণ বৈভবই তাঁর কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম লক্ষণ।

'১৯১৩ সালের মার্চে এফ. এস. ফ্লিন্ট এবং এজড়া পাউণ্ড মার্কিন পত্রিকা পোয়েট্রিতে আন্দোলনের মেনিফেস্টো ঘোষণা করেন। তাদের তিনটি নীতি এই—১. বিষয়ের সরাসরি উপস্থাপনা, তা-সে মন্ময় তন্ময় যাই হোক না কেন ২. এমন কোনো শব্দের ব্যবহার আদপেই না করা যা বিষয়ের উপস্থাপনায় কোনো সাহায্য করবে না, ৩. ছন্দ সম্পর্কে বক্তব্য : বাকলক্ষণারীতির পরিবর্তে সাংগীতিক ভাষ্যরীতি অনুযায়ী রচনা। পরবর্তীকালে রিচার্ড আলডিংটন এবং এমী লোয়েল কর্তৃক এই মূলনীতিত্রয়ই বিস্তৃতি লাভ করে। চিত্রকল্প সম্পর্কে এখানে পাউণ্ডের দেয়া সংজ্ঞা হচ্ছে, 'বুদ্ধিগত ও আবেগগত জটিলতা এক নিমেষে যাতে উপস্থাপিত হয়, তা-ই চিত্রকল্প। আমি জটিলতা শব্দটি হার্ট প্রমুখ অধুনাতর মনস্তাত্ত্বিকদের প্রথার্পিত টেকনিক্যাল অর্থে ব্যবহার করেছি...'[১]

আর চিত্রকল্প নিয়ে চিন্তার এই অগ্রগতি অত্যন্ত ভালোভাবে লক্ষ করে নিপুণ দক্ষতার সাথে বাংলা কবিতায় ব্যবহার করেছেন জীবনানন্দ দাশ। শব্দালংকার ও অর্থালংকার সৃষ্টিতে তাঁর এই চিত্রকল্প প্রকল্প বাংলা কবিতাকে আঙ্গিক উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ সহায়তা করেছে। কাব্যের অলংকার সৃষ্টিতে উপমা উদাহরণ এমনি এক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে যা বুদ্ধির উৎকর্ষ, বিজ্ঞানের বিকাশ, অগ্রগতির গতিক্রমে স্বপ্নময় ঐন্দ্রলৌকিক ভাব ও বস্তুর ব্যাখ্যায় কাব্যের ভাষা শব্দের ছবি তৈরি করে অপরূপ এক বিকাশ ঘটিয়েছে। সাংগীতিক ভাষ্যরীতি ছন্দকে নিয়ে হয়ে উঠেছে স্বতঃস্ফূর্ত। ভাব-বস্তুর মিলন ভাবনার সাথে বুদ্ধির সমন্বয় এমনি এক উদাহরণ সৃষ্টি করেছে যা ব্যাখ্যা করে নয় বরং চরণ পাঠ করেই বেশি উপলব্ধি করা সম্ভব। তাই কিছু চরণ নিচে উদ্ধৃত করা হলো যাতে বুঝা যাবে জীবনানন্দের চিত্ররচনার বা চিত্রকল্প সৃষ্টির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

১. 'আকাশে ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে
২. নির্জন জলের রঙ তাকায়ে রয়েছে
৩. কোথায় মাস্তুল তুলে জাহাজের ভিড় সব লেগে আছে মেঘে
৪. জানো না কি আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে
৫. বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে
৭. একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেলো কেশে–অস্থির পেট্রোল ঝেড়ে
৮. হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
৯. কোথায় পাহাড় দূরে শাদা হয়ে আছে যেন বাড়ির মতন
১০. বারবার রোদ তার সুচিক্কন চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায়
১১. নীলাভ আকাশ জুড়ে ফুটে থাকে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা–রং তার আশ্বিনের আলোর মতন
১২. যেখানে ভোরের মেঘে নাটার রথের মতো জাগিছে অরুণ।[২]

জীবনানন্দ ব্যাপকভাবে কিংবা ব্যাপক অর্থে পরিচিত একজন সুররিয়ালিস্ট কবি বা পরাবাস্তববাদী কবিতার প্রবর্তক হিসেবে। কবিতায় পশ্চিমের এই রীতি ব্যবহারকে পর্যবেক্ষণ করার আগে বোঝা যেতে পারে, মূলত সুররিয়ালিস্ট কবিতা বলতে কী বুঝানো হচ্ছে?

হার্বার্ট রীডের ভাষায় : 'The artist, whether poet or mystic or painter, does not seck a symbol for what is clear to the understanding and capable of discursive exposition : he realizes that life, especially the mental life, exists on two planes, one definite and visible in outline and detail, the other-perhaps the greater part of life submerge, vague, indeterminate. A human being drifts through time lilee iceberg, only partly floating above the level of the consciousness. It is the aim of the surrealist, wheather as painter or as poet, to try and realize some of the dimensions and charecteristics of his submerged being, and to do this he resorts to various kinds of symbolism'.[৩] অর্থাৎ মনের ভেতরে ডুব দিয়ে থাকা মনের ছবি ও অনুভূতি প্রকাশের প্রয়াস জীবনানন্দের কবিতায় প্রথম থেকেই ছিল। অন্তরের ক্লান্তি ক্লেদকে বা ছাইচাপা আগুন ছবিচিত্রকে লুকিয়ে রেখে নয়—অকপটে স্বীকার করার মধ্যেই কাব্যের স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে। সুররিয়েলিস্ট চিত্র আন্দোলনের পুরোধা ডালির মন্তব্য হলো, systematisation of confusion-কে উপস্থাপনের উপর জোর দিতে হবে। এই বিশ্বাস জীবনানন্দেরও ছিল।

আমি কবি,—সেই কবি,—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি' হেরি ঝরাপালকের ছবি!
(আমি কবি,—সেই কবি : ঝরাপালক)

দুঃখে ভারাক্রান্ত আকাশের কান্নার মতো ভেজা চোখ তুলে কবি দেখেন ঝরাপালকের ছবি। এ দেখার মধ্যে কিন্তু সার্বিক মানবিক বোধও জাগ্রত হয়ে ক্রিয়া করছে। সুররিয়ালিস্ট ম্যাক্স আর্নস্ট-এর ভাষায় : 'it is rather their aim to break down the barriers both physical and psychical, between the conscious and the unconscious, between the inner and the outer world, and to create a superreality in which real and unreal, meditation and action, conscious and unconscious meet and mingle and dominate the whole of life'.[৪] জীবনকে প্রভাবিত করে এমন এক সত্য জীবনের প্রয়োজনে উঠে আসা প্রয়োজন। জীবনকে ব্যাখ্যা করতে হলে, বুঝতে হলে তাই অবচেতন আর সচেতন মনের সমন্বয় ঘটনা উচিত। সেই সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য কিংবা যুক্তির বিচারে বিবেচনা সম্ভব নয় ধ্যান বিশ্বাসে বিশ্বাস্য আবার বিজ্ঞানের বিশ্বাসে বিশ্বাসযোগ্য নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ মনকে এক অদ্ভুত ভাবের ব্যঞ্জনায় অভিভূত কিংবা আকর্ষণ করে এমন কিছুতো কাব্যে উপেক্ষিত হতে পারে না। তাই জীবনানন্দের ঘোষণা :

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে
হরিণেরা ; ...
... ...
পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে ;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।
হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,—
(হরিণেরা : বনলতা সেন)

অর্থাৎ অদ্ভুত এক স্বপ্নময় ধ্যানলোক সৃষ্টির মাধ্যমে কবিতা স্বপ্নলোক আর বাস্তবের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে অন্যরকম এক ভাবের জন্ম দেয়। তাইতো কবি বলতে চাচ্ছেন—

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
... ...
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন ;
সেই মুখ আর আমি রবো সেই স্বপ্নের ভিতরে।
(স্বপ্ন : মহাপৃথিবী)

আসলে স্বপ্নেই প্রবেশ করা সম্ভব স্বাপ্নিক বাস্তবতায়। এই প্রবেশ প্রস্থান, গমন নির্গমনের অবাধ, স্বাধীনতাই শিল্পী সত্তাকে নিজস্বতা প্রকাশে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে। অন্তরের অনুভূতি অভিজ্ঞতার বিশ্বাস real, unreal meditation and action কে প্রকাশ করার রীতিধর্ম কবিতায় কবির অন্তর্জগতকে বহির্জগতের সামনে নিয়ে এসে কবিতাকে সমৃদ্ধতর শিল্পে রূপান্তরিত করতে পারে তার বলিষ্ঠ উদাহরণই জীবনানন্দের সুররিয়েলিস্ট ধারার কবিতাসমূহ।

অতি ব্যবহারে সৃষ্ট শিল্পের আবর্জনায় পিচ্ছিল বাস্তবতায় মানুষ অশ্লিলতা-যৌনতাকে নিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলা করে নাম দিয়েছে অদ্ভুত এক প্রকরণশৈলী Hobby Horse! বা Dada ইজম! ড্যাডাবাদীদের নোংরা প্রকরণশৈলীও জীবনের আরেক বাস্তবতা। এরা ফ্রয়েডের মত যৌনতাকে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে, ঘেটেছে বোঁদলেয়ার কিংবা লরেন্সের যৌনতার শৃঙ্গারের গন্ধ-সুগন্ধ। আবার সৃষ্টিও করেছে অদ্ভুত এক মহাসত্য, যা আছে, বিদ্যমান, অস্বীকার করা সম্ভব নয় আবার মেনে নিলেও বিকৃতির সমূহ সম্ভাবনা। তবুও এই বিতর্কিত শিল্প শত তর্ক সত্যের খোঁচা খেয়ে টিকে আছে।

১. কে যেন উঠিল হেঁচে,—হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া বুঝি।
(নিরালোক : মহাপৃথিবী)

২. মরখুটে ঘোড়া ঐ ঘাস খায়,—ঘাড়ে তার ঘায়ের উপরে
বিনবিনে ডাঁশগুলো শিশিরের মত শব্দ করে।
(পরিচায়ক : মহাপৃথিবী)

৩. চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে ! !

(অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

৪. হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।

(অন্ধকার : বনলতা সেন)

যন্ত্রযুগের কুশ্রীতা, যৌনতা, অসংগতি এবং হেয়ালীর চিত্র ফোটে ওঠে এসব কাব্যরীতি-কল্পে। তাইতো কবিরা, 'চাইছেন রাত্রির অন্ধকারের কাছে, মৃত্যুর কাছে আশ্রয়। ভোরের আলো তাঁর কাছে মনে হয় মূর্খ উচ্ছ্বাস, দিন সংঘর্ষ ও কর্মের প্রতীক, সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদ।'[৫] আর সেই আর্তনাদের জ্বালায় দগ্ধিভূত কবিমন স্থূল ও ভালগারের সূতিকাগারে খুঁজতে চেষ্টা করেন মুক্তির পথ ও পাথেয়। এ যেন রমণীর জঙ্ঘায় খুঁজে বেড়ানো প্রগতির রক্ত নিশানের পতপত শব্দ ও ঋতুবতী নারীর আহ্লাদ।

জীবনানন্দের আঙ্গিকশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ধ্রুপদী ধারার কাব্যের সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল অনুকরণ না করা। তাঁর কাব্যে সনাতন রীতি ভেঙে রূপ বৈপরীত্য পশ্চিমের ইমপ্রেশনিস্টদের মতো দীপ্তিমান। ইমপ্রেশনিস্টরা যেমন রীতি (classical) ভেঙেছে তেমনি গড়তে গিয়ে সাধারণ কোনো বস্তুকে অবহেলা করেননি। বরং এগুলোই বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার প্রক্রিয়ায় হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় এবং অন্যরকম দ্যোতনা সৃষ্টিকারী। 'ক্যাম্পে' কবিতায় মনুষ্যত্বহীনতা যান্ত্রিক সভ্যতারই একটি প্রতিচিত্ররূপে মূর্তমান হয়েছে। শিকারীর আগ্রাসন বন্দুকের বর্বরতা কী করে বিনষ্ট করছে সভ্যতার শান্তি সুন্দর প্রেম ও সৌন্দর্যের ভুবনের শুধু সেটাই নয়, চাঁদনী রাতের অপূর্ব স্নিগ্ধতায় মিলনাতুর হরিণ ও ঘাই হরিণীর কামনার রূপটিকে হনন করেছে শিকারীর ডিসে পরিবেশিত সুস্বাদু মাংস। সত্যি এ এক দুঃখসত্যের বাস্তবতা।

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি ;
সারারাত দখিনা বাতাস
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে !
... ...
আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমাকে কি চায় নাই ধরা দিতে ?
... ...
ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে ;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা ম'রে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন ;—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে—ভেবে।

(ক্যাম্পে : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইমপ্রেশনিস্টদের মতো জীবনানন্দ তাঁর আপন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছেন তাঁর মতো করে তাঁর পূর্বসূরীদের মত করে নয়। ফলে সবুজ দেখতে দেখতে সবুজের সজীবতায় বিলীন হয়ে যাওয়া তাঁর দৃষ্টি বলতে বাধ্য হয়েছে ভোরের সূর্যের আলোর রঙ সবুজ।

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
(ঘাস : বনলতা সেন)

অথবা—

ভোর ;
আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল :
(শিকার : বনলতা সেন)

অথবা—

রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল !
(অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

অথবা—

নীল আকাশে খইক্ষেতের সোনালী ফুলের মতো
(আমি যদি হতাম : বনলতা সেন)

'তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।' বুদ্ধদেব বসুর এ মন্তব্যের মাধ্যমে ফুটে জীবনানন্দের বহুত্বের প্রতি ঝোঁক এবং প্রকরণের সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু কবিসত্তা। সমস্ত ইউরোপ যখন 'যাব' কথাটির অর্থ বন্যজন্তু বুঝতে শিখলো তখন ইম্প্রেশনিজমের পরবর্তী শিল্প আন্দোলন কমিজম কিছুটা হলেও বিরোধিতার মুখোমুখি হলো। কিন্তু সে সময়ে দ্বিধা না করে জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে যথারীতি কবিইজমের স্বার্থক ব্যবহার শুরু করে দিলেন। এ ধারার প্রধান শিল্পী মাতিস হয়ে উঠলো তাঁর প্রিয় মানুষ। তিনিও বুঝলেন যাবিস্টদের মতো বিষম ও পাশবিক রঙে অঘটন ঘটিয়ে এক উদ্যাম গতিবান বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে হবে। যেখানে রং হয়ে উঠবে বলিষ্ঠ আবেগ আশ্রিত, কর্কশ এবং ধাতব বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ।

... তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে !
(কুড়ি বছর পরে : বনলতা সেন)

অথবা—

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;
(দুজন : বনলতা সেন)

অথবা—

রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
(নগ্ন নির্জন হাত : বনলতা সেন)

অর্থাৎ নদীকে হলুদ বলে, হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে জানালার কাচে রামধনুর সাত রঙের যে খেলা ও ভাবের জন্ম তা সত্যিই অন্যরকম ও অভিনব। বাংলা কবিতায় এ রঙ তুলি চিত্রময়তার খেলা (যাবিস্টদের ঢঙে) তাঁর আগে কেউ খেলেনি বলেই তাঁর আধুনিকতাকে প্রবাহমান সত্যের মতো আজো অগ্রসরমান বলেই মনে হয়। প্রজ্ঞার সাথে ইন্দ্রিয়ের, ধ্যানের সাথে বিজ্ঞানের দৃষ্টিসঙ্গমের মাধ্যমে সৃষ্ট এ কাব্য প্রয়াসই বলে উঠে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' এবং সেটা তিনি। মিনিটে যাট সেকেণ্ড বেগে এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর গতির ঘোড়া তার বিরামহীন গতিক্রমে। তাইতো এটা ক্লান্তিকর। আর এই ক্লান্তির মুক্তি আসতে পারে গতি বৃদ্ধি থেকে। motion ও speed কে প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে সৃষ্টি হয় দার্শনিক বের্গস ও অন্যান্যদের সম্মিলিত প্রয়াসে সৃষ্টি হয় ফিউচারিস্ট শিল্প আন্দোলন। কবি জীবনানন্দও এই ফিউচারিস্টদের Age of speed কে প্রকাশ করেছেন দুর্দম রূপময়তায় তাঁদের মতো করে নিজেদের কাব্য বৈভবের বিশালতাকে অলঙ্করণের জন্য।

১. এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতরে হয়তো—
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে।
(হাওয়ার রাত : বনলতা সেন)

২. আমাদের তির্যক গতি স্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস,
(আমি যদি হতাম : বনলতা সেন)

গতিকে ব্যাখ্যা করাই নয়—এ কাব্যধারায় গতিময়তা পাঠককেও আবেশিত করে। 'ফিউচারিস্টদের আর একটি লক্ষণ ছিল যুগজ্বরকে প্রকাশ করা। এ যুগ যেমন age of speed and steel তেমনি এ যুগ age of fever। দুর্দম গতি যেমন মানুষকে উদ্দীপিত করে তেমনি অবসন্নও করে।'[৬] যেমন :

আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে; শাঁই শাঁই করে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো !
(হাওয়ার রাত : বনলতা সেন)

জীবন বাঁচানোর তাগিদে জেব্রার মধ্যে সৃষ্ট গতির প্রয়াস কিংবা বাতাসের মধ্যে যে গতির শক্তি, শিল্প ও উদ্যামের আশ্চর্য সমন্বয় আরো বেশি বেশি উত্তুঙ্গ হয়ে উঠে হাওয়ার রাতে, মানুষের স্বপ্ন স্বস্তির মধ্যে চিন্তার চিত্রকল্প জুড়ে। এভাবেই ফিউচারিস্ট কাব্যরীতি জীবনানন্দের কাব্যে মূর্তমান হয়ে গতিশীল হয়েছে। জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টরা Distortion বিকৃতি, তাঁরা দৃষ্টিশৈলী ও exaggeration বা অত্যুক্তিকর, অতিরঞ্জক বিশেষ ভাবকে রূপ দিয়ে কবিতায় বিকৃতি-স্বেচ্ছাচার বিশৃঙ্খলা ইত্যাদিকে কাব্যময় করে তুললেন। যদিও এদের ভাবনা ছিল অসুস্থ. অস্বাভাবিক কখনো অদ্ভুত ও অশরীরী তাই জীবনের ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে তাঁরা আশ্রয় নিতে চাইলেন ক্যারিকেচার, স্থূলতা, ভৌতিক ও কুহেলিকাময়তার উপর। ফলে সৃষ্ট হলো তাঁদের নতুন প্যামফ্লেট। ১৯১২ সালে এক্সপ্রেশনিস্ট লেখক গটফ্রিড বেল এই প্যাথফ্লেটের নাম রাখলেন—লাশ কাটা ঘর। এই নামে জীবনানন্দেরও কবিতা আছে। এক্সপ্রেশনিস্ট রীতিতে লেখা জীবনানন্দের কিছু চরণ 'আট বছর আগে একদিন' কবিতায়—

১. ক্যারিকেচার—
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা এসে
বলেনি কি ; 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার !—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার !

২. স্থূল—grotesque রূপ—
এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি
রক্ত ফেনা-মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. প্রাণহীন বস্তুর পেছনে অদ্ভুত ভৌতিক জীবন—
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

এইভাবে জীবনের চিত্রময়তাকে অদ্ভুত উপমা চিত্রকল্পে প্রকাশের মাধ্যমে জীবনানন্দও চেষ্টা করলেন উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতায় কিংবা স্বপ্নময় কুহেলিচ্ছন্ন ভাষার মাধ্যমে আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে হিম হাতে কড়ির মত শাদা মুখ করে চিতার মত অন্তরে বাহিরে স্বপ্নে জাগরণে জ্বলে জ্বলে ক্ষীরে-গড়া মূর্তির মতো হয়ে উঠতে। তাঁর এই বিস্ফোরণ ধর্মী, বিশৃঙ্খল, গতিশীল, ভাবাবিষ্ট স্বেচ্ছাচারী ধারায় কাব্যরচনা বাংলা কবিতার আধুনিকতা ও সমৃদ্ধি সৃষ্টিতে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। সে সাথে উত্তরাধুনিকও হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্ট এক্সপ্রেশনিস্ট ধারার কাব্য। জীবনানন্দের আঙ্গিকশৈলীর সর্বাধুনিকতা হলো তাঁর ঐতিহ্যপ্রীতি (Traditon) বোধ এবং (Myth) পুরাণের ব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব লোকজ সংস্কৃতির উত্তরণ ঘটানোর স্বার্থে শেকড়ের (Root) সন্ধান করা। তাঁর নিজের ভাষায় : 'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়—চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো ; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূরে অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।'[৭]

দূর উর-ব্যাবিলোন-মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিডতলে,—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
... ...
আমারে দেখেছে সে যে আসীরীয় সম্রাটের বেশে
... ...
আমি ছিনু 'ক্রবেদুর' কোন দূর 'প্রভেন্‌স্‌'-প্রান্তরে !
(অস্তচাঁদে : ঝরা পালক)

কবির Tradition বোধ বিচিত্র প্রকরণশৈলী হতে রঙ নিয়ে কাব্য ছবি আঁকার প্রয়াস সত্যিই এক অত্যাশ্চর্য আধুনিকতা। এ আধুনিকতা কালকে অতিক্রম করার মতো শক্তিশালী, মহাকালে বিচরণশীল পাখির মতো সাবলীল, আধুনিকতার উত্তরণে উত্তরাধুনিকতার মতো গতিশীলা কালের প্রেক্ষাপটে যার উপযোগিতা রয়েছে. কালকে বয়ে বেড়াবার মতো যাঁর ক্ষমতা রয়েছে, তাকে বলা যেতে পারে চিরকালের। তার চিরকালের চিরায়ত (Classical) ভাবটি বাংলা কবিতায় উঠে আসে (নাকি উড়ে আসে?) যুগপরিক্রমায় নতুন নতুন শিল্প আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হয়ে, প্রেরণা হয়ে, ইস্তেহার হয়ে। ফিরে যেতে হবে শেকড়ে ঐতিহ্যে, ইতিহাসে, পুরাণে, উত্তোলন করতে হবে লোকজ ভাবধারায় ছাইচাপা পড়ে যাওয়া হাজার বছরের চিরায়ত কৃষ্টি সংস্কৃতি সংস্কার টোটেম ট্যাবু যাদু বাস্তবতা বিশ্বাস লোকযানকে তখন মনে পড়ে যায় (কিংবা মনে পড়ে যাবেই।) জীবনানন্দের কবিতার কথা। তাঁর কবিতার মধ্যে ফুটে উঠে বাঙালির প্রাণের ছবি। বাঙালির প্রাণের ছবি আঁকতে গিয়ে তাই তার ঘোষণা :

... নরম ধানের গন্ধ—কল্‌মীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত-শীত হাতখান
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস,—লাল-লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরি মাঝে বাংলার প্রাণ।
(আকাশে সাতটি তারা : রূপসী বাংলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ নিজেও জানতেন (?) আধুনিকতা যখন উত্তরণের প্রয়াস লক্ষ্যে উত্তরাধুনিক হয়ে উঠবে তখন তাকেও সাথে করে নিতে হবে। এই বিশ্বাস তাঁর জন্মান্তরবাদ বা Metamorphosis ধারার কবিতায় তিনি বারংবার উচ্চারণ করেছেন। 'আবার আসিব ফিরে'—এই কথা শুধু যে তাঁর দৈহিক আগমনের কথা তা নয় কিন্তু। তিনি কবিতা হয়ে আসবেন, বিবেক হয়ে আসবেন, উত্তরাধুনিকতা হয়ে আসবেন, প্রগতি অগ্রগতি ও বিকাশ হয়ে আসবেন, এতো তারই ঘোষণা। তবে তাঁর আগমন অন্যদের মতো নয়। একান্ত নিজস্বতা নিয়ে শুধু তারই মতো, শিশিরের শব্দের মতো কামরাঙালাল চোখের মতো, ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর-জনের শব্দের মতো, নিশীথের নীলের মতো, ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধের মতো, চালধোয়া স্নিগ্ধ হাতে, ধান মাখা চুলের মতো, শিয়রে বৈশাখ মেঘের মতো, নরম নদীর নারীর মতো, ধূসর পাণ্ডুলিপির মতো এমন এক কাব্য যা রূপসী বাংলার একান্ত আপনার বাঙালির স্বপ্নসত্য দুখবিরহের সুখের বৈভবে ভরা যাদু বাস্তবতার মায়াবাদী পরাবাস্তবী অথবা জীবনের কাব্য।

পরিশেষে এটাই বলা যায় যে, 'জীবনানন্দর জগৎ প্রায় সম্পূর্ণরূপে চোখে দেখার জগৎ। তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল—এটুকু বললেই জীবনানন্দর কবিতার জাত চিনিয়ে দেয়া সম্ভব হতে পারে।...উপমা তাঁর কাব্যের কারুকার্য মাত্র নয়, উপমাতেই তাঁর কাব্য।'[৮] কিন্তু এরপরেও কথা শেষ হয় না। কথা শেষ করা সম্ভব নয়। তাইতো বুদ্ধদেব বসুর গঠনমূলক মন্তব্যের পরও আরো বহু কথা বলা হয়, বলতে হয় তাঁর কবিতা নিয়ে। তাঁর সাথে সুর মিলিয়ে আমাদের বলতে হয় :

> হৃদয় ভ'রে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে
> দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের অঘ্রাণে,
> মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের
> চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
> জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায় ...

নীল মত্ততায় ছুটে চলা জীবনানন্দের কাব্য তাই সব যুগের সর্বকালের, নতুন সহস্রাব্দের উত্তরাধুনিক কাজের মতই আজো নতুন 'যেন পূর্বে বলা হয় নাই'-এর মতোই।

তথ্যসূত্র

১. জীবনানন্দের কবিতার চিত্রকল্প—আলম হায়দার উত্তরাধিকার—বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য-ত্রৈমাসিক অক্টোবর—ডিসেম্বর-১৯৮৮, পৃ. ১৮
২. প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ, পৃ. ১৯
৩. Herbert Read, The Meaning of Art, p-233 আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃ. ১৬২
৪. নির্জনতম কবি ?—স্নেহাবার ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি—সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, পৃ. ৪৯২
৫. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃ. ১৪৪
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৭. কবিতার কথা—জীবনানন্দ দাশ, প্রথম সংস্করণ ১৩৬২ সাল পৃ. ৪০
৮. জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন—বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি—সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, পৃ. ৩৪০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ : শত জলঝর্ণার গান

সৈয়দা আইরিন জামান

১.

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে অজেয় আসন জয় করে নেয়া কবি জীবনানন্দ দাশের সাহিত্য–উন্মেষ ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় জীবনানন্দ দাশ কিশোর ছিলেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে—'...প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকের সেই অপেক্ষাকৃত নির্দোষ পৃথিবী—আজ মনে হচ্ছে কোনো পিস্ কনফারেন্সই মানুষের বিক্ষিপ্ত জীবনে সেই অনবতুল সমাবেশ ফিরিয়ে দিতে পারবে কি আর : ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছে তো—কিন্তু সর্বান্তকরণে নয়। মূল্য চেতনায় বিশুদ্ধি হচ্ছে, মনীষী ও দিকনিরূপকদের মনে ও কাজেকর্মে এরকম দাবী চারিদিকে থেকেই খুব বিশেষ ওজনের সঙ্গে ঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু হৃদয় কি নির্মল ও নিঃস্বার্থ হচ্ছে, হৃদয়ে স্বার্থ ও রিরংশার অবলেশ কেটে না গেলে কি আর শান্তি আসবে জাতির বা মানুষের জীবনে...'।[১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির মাত্র ২১ বৎসর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণ–দামামা শুরু হয়ে যায়। জীবনানন্দের অধিকাংশ তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ রচিত হতে থাকে ১৯৩০ সাল থেকে। এ সময়ে লেখা 'রূপসী বাংলা'য় কবির স্বদেশপ্রেম সীমাহীন আকুতিতে ভরা। মূলত এ সময় থেকেই জীবনানন্দ ইতিহাস চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি তাঁর স্বদেশভূমির অস্তিত্ব দেখতে চেয়েছেন পৃথিবীর মানচিত্রে। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে দেখা গেছে খণ্ড খণ্ড মৃত্যুর আশঙ্কা (আমি যদি হতাম), যেখানে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস বলে আর কিছু নেই।

'তিরিশের কবিদের কাছে যুদ্ধ ছিল ততটা গুরুত্বপূর্ণ, যতটা ছিল এলিয়ট–পাউণ্ডের কাছে, অথবা ইয়েটস্–এর কাছে। তবে তারা প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব কতটা অনুভব করেছিলেন, সে–টি বড় কথা নয়। কিন্তু তাঁর প্রতীকী প্রভাব যে অনিশ্চয়তা, শঙ্কা, বিচ্ছিন্নতা এবং অনেক ক্ষেত্রে অবিশ্বাস উৎপাদন করেছিল তাঁদের ভিতরে যেমন, করেছিল এলিয়ট–পাউণ্ড–ইয়েটস্–এ—এটি সহজেই দৃশ্যমান। এলিয়ট পোড়োজমির চিত্রকল্প–উদ্ভাবন করেছিলেন, পাউণ্ড বিচ্ছিন্নতার এবং ইয়েটস্ বীভৎসতার—এ–সবই ছিল তিরিশীদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য। এলিয়ট বিলাপ করেছেন যুদ্ধজনিত মূল্যবোধের অবক্ষয়ের, যেখানে নৈতিকতা তিরোহিত। ইয়েটস্–এর এ রকম বোধ হয়েছিল যে 'মানবজাতি প্রাণহীন কোনো উৎকল্পনার ফসল'।[২] জীবনানন্দ যেমন বলেছিলেন, '... কবিতা রূপ পরিগ্রহ করে একটা অমেয় পরিধির ভিতর যেন—তাকে পাতালেও দেখা যায়, এবং নীলিমায়, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানত এই পৃথিবীর ভিতর, জনসমাজে...' অথবা তিনি যখন বলেন, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, 'কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান'।

২.০

জীবনানন্দ দাশের বেড়ে ওঠার সময়টি শুধু ভারতবর্ষের জন্য নয়, তাবৎ পৃথিবীর জন্যই ছিল ঘটনাবহুল ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। এই সময়ের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিশ্ববাসীকে 'মণিকা আলো' দেখিয়েছিল বটে, তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজ্ঞানের মারণ-কৌশল মানুষকে ভীষণভাবে মর্মাহত করেছিল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি দেখে মানুষ কুকড়ে গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এ সত্য প্রমাণ করেছিল যে, জীবনের মূল্য আসলে বেশি নয়। জীবনের চেয়ে মৃত্যুর আয়োজনেই বিশ্বনেতাদের অতিশয় ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস স্বার্থপরতা ক্রমেই মানুষকে গ্রাস করে ফেলে। সূক্ষ্ম বোধ থেকে সরে গিয়ে মানুষ ক্ষণস্থায়িত্বের চাকচিক্যে মেতে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কুফলের রেশ শেষ হতে না হতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা শুরু হয়ে যায়। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভেতরই লুকানো ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করুণ বেহাগ। এক কথায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি মাত্র। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন সেরাজেভোতে অষ্ট্রিয়ার আর্চ ডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনাণ্ড আততায়ীর গুলিতে সস্ত্রীক নিহত হন। সেরাজেভো শহরটি ছিল বলকান রাজ্যের অন্তর্গত আর আততায়ীদের বসবাস ছিল ক্ষুদ্র সার্ভিয়া রাজ্যে। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুরো ইউরোপ জ্বলে উঠল। জ্বলে উঠবারই কথা, কারণ নিহত ব্যক্তি স্বয়ং অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের উত্তরাধিকারী। এ সময়ে 'কাইজারের জার্মানী দাঁড়াইল অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর পক্ষে, জারের রাশিয়া সমর্থন করিল সার্ভিয়াকে, ফ্রান্স গেল রাশিয়ার দলে এবং বৃটেন দাঁড়াইল জার্মানীর বিপক্ষে। অষ্ট্রিয়া অগ্রসর হইল 'জাতীয়তাবাদী' সার্ভিয়াকে সমুচিত শিক্ষা দিতে, আর জার্মানী আক্রমণ করিল বেলজিয়মের ভিতর দিয়া ফ্রান্সকে। ১৯১৪ সালের জুন মাসে সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ১৯১৪-১৮ সালের পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের হত্যাকাণ্ডে পরিণত হইল এবং ইউরোপ বিধ্বস্ত হইল।'[৩]

১৯১৪ সালের পৃথিবী ৪০ হতে ৫০টি স্বাধীন বা সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তবে রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরের সম্পর্ক কি হবে এর কোনো রাজনৈতিক মানদণ্ড ছিল না। যদিও অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সূত্রে তাবৎ পৃথিবী মোটামুটি একটা আন্তর্জাতিক মিলনরেখায় পৌঁছেছিল। ১৮১৫ সালে ওয়াটারলু যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ দুই ঐতিহাসিক যুদ্ধ শেষ ও শুরুর মধ্যবর্তী শতবর্ষে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে। এ সময় বিজ্ঞান সর্বদাই মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত ছিল। ফলে মানুষের জীবন-যাত্রার মান বেড়ে গিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রসমূহ হয়েছিল সমৃদ্ধিশালী। তবু কেন সামান্য ঘটনা থেকে অসামান্য ঘটনার সূত্রপাত ঘটল। তবে কি এই ঘটনা হতে এ সত্য প্রমাণিত হল যে, বাহ্যিকভাবে সমৃদ্ধিশালী সমাজ ও রাষ্ট্রে ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরেছিল। 'রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ছিল অর্থনৈতিক সংঘাত, আর মানুষের সঙ্গে মানুষের ছিল সামাজিক সংঘর্ষ।'[৪] বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছিল। এ কারণেই একটি মাত্র ঘটনা হতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত মহাপ্রলয় ঘটতে পেরেছিল। আসলে সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুই কোটি মানুষের মৃত্যুর ভেতর দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে, ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর। ১৯১৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ফলে মিত্রপক্ষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে। 'যুদ্ধের দ্বারা চিরতরে যুদ্ধ শেষ' ও 'গণতন্ত্রকে রক্ষার' উদ্দেশ্য নিয়ে উইলসন সংগ্রামে যোগ দেন এবং যুদ্ধশেষে ১৪ দফা সর্তের প্রস্তাব করেন। এই ১৪ দফাই ইতিহাসে 'ফোর্টিন পয়েন্টস' নামে বিখ্যাত। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল তখনই যখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্লমেঁস বিভিন্নভাবে চক্রান্ত করে উইলসনের মহৎ উদ্দেশ্যকে মাটি করে দিতে চাইলেন। অবশ্য আমেরিকাকে একেবারে পাশ কাটিয়ে চলাও সম্ভব হল না। ফলে জোড়াতালি দেওয়া একটা সন্ধি উপস্থাপিত হল বটে, যা স্বয়ং উইলসনের মনঃপুত হল না। এসব সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ফ্রান্সের ভের্সাই শহরে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। যে কারণে এটি ভার্সাই সন্ধি নামে খ্যাত। এই সন্ধি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই সন্ধির '...একমাত্র লক্ষ্য ছিল মিত্রশক্তি কর্তৃক জার্মানীর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা।' যদিও রাষ্ট্রসংঘ (লীগ অব নেশন্স্) গঠনের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি বয়ে আনার প্রচেষ্টাও ছিল, তবে তা ছিল কেবলমাত্র উইলসনের অভিনবত্ব মাত্র। অন্যেরা রাষ্ট্রসংঘ চাননি। যার ফলে পৃথিবীতে শান্তি আসে নি। ভের্সাই সন্ধির ফলে জার্মানী ইউরোপেই ২৭ হাজার বর্গমাইল জমি এবং ৬৫ লক্ষ লোক হারায়। ডানজিগ স্বাধীন নগরীতে পরিণত হয় এবং মেমেল রাষ্ট্রসংঘের শাসনাধীনে চলে যায়। ১৯২৩ সালে লিথুয়ানিয়া মেমেল বন্দর দখল করে নেয়। এ ছাড়া জার্মানী সমুদ্রতীরবর্তী সমস্ত উপনিবেশ হারায়, যার আয়তন ২০ লক্ষ বর্গমাইলের বেশি। জনসংখ্যা ও ভূমিসম্পদ হারিয়ে জার্মানী প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাছাড়া জার্মানীর সমস্ত নৌবহর ও অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ শাসনকাজের জন্য মাত্র ১ লক্ষ 'পুলিশী সৈন্য' রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। ভের্সাই সন্ধির মর্মমূলে অঙ্কিত গভীর ত্রুটির কারণেই ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক বছর পর সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মি: লিটাভিনোফ (পরলোকগত) বলেছিলেন—'Peace is one and indivisible'—'শান্তি এক ও অবিভাজ্য।' এ জাতীয় কোনো উক্তি বা বোধ দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে কোনো রাষ্ট্রনায়কের মাথায় প্রবেশ করেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অধিনায়ক অ্যাডলফ হিটলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যাভেরিয়ান সামরিক বাহিনীর সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর এক সহকর্মী স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'আমাদের ঝাঁকে বকমাঝে হংস যথা—এই 'সাদা কাক' চলা ফেরায় আমাদের সঙ্গী হতে জানত না। অথচ ফ্রান্সের রণাঙ্গনে অস্তিত্ব বিপন্ন হবার মুখে এই ধবলকাক অভাবিত ক্ষমতায় জেগে ওঠে। একজন ইহুদী সামরিক অফিসারের কৃপায় কর্পোরাল হিটলার ১ম শ্রেণীর লৌহ ক্রস পদকে ভূষিত হয়।'[৫] ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে কর্পোরাল হিটলার যুদ্ধক্ষেত্রে জখম হন। পোমেরুনিয়ার হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি জার্মানীয় পরাজয়ের সংবাদ পান। এই হৃদয়-বিদারক সংবাদে তিনি ভেঙে পড়েন এবং তাঁর ভেতরে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জেগে উঠে। 'সমগ্র জার্মানীতে তখন বিপর্যয়, পরাজয়ের আঘাতে সকলে মুহ্যমান—দেশে রুটি নাই, আইন ও শৃঙ্খলা নাই, চতুর্দিকে দুর্দিন ও অন্ধকার।'[৬] হিটলার জন্মেছিলেন অস্ট্রিয়াতে, কিন্তু জার্মানী ও জার্মান জাতি ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

অ্যাডলফ হিটলারের মনে আগ্রাসন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জন্মেছিল শৈশব ও কৈশোরেই। হিটলারের বয়স যখন ১৩ বৎসর, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ভিয়েনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ললিতকলা একাডেমীতে তিনি দুইবার ভর্তির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর স্থাপত্য শিল্পে পড়াশোনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেখানেও তাঁর উচ্চতর পড়াশোনার সুযোগ হয়নি। এ সময় হিটলারের মায়ের মৃত্যু ঘটে। মায়ের মৃত্যুর পরে হিটলার মনে মনে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। এমনকি শহরের রাস্তায় ছবি এঁকে হিটলারকে নিজের আহার যোগাড় করতে হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অধিনায়ক হিটলার নতুন এক হিংসাত্মক ইহুদী বিরোধী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গোষ্ঠীই পরবর্তী সময়ের ন্যাশনাল সোসালিস্ট জার্মান ওয়ার্কাস পার্টি—বা নাৎসী দলের ভ্রূণ। এক বৎসরের মধ্যে তাঁকে মুখ্য নাৎসী প্রচারকের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। এরপরে হিটলারকে আর পেছনের দিকে তাকাতে হয়নি। ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে বৈপ্লবিক সব উত্থান-পতন লিখিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেনি, বরং ঘটেছে বাগ্মিতায়। 'অগ্নিক্ষরা বুলি ও বচনের বাগ্মিতা আয়ত্ত করাই ছিল তাঁর সাধনা।'[৭] আলবার্ট স্পিয়ার নামে এক তরুণ স্থপতি লিখেছিলেন, 'হিটলারের বাগ্মিতার মুখে সব সন্দেহ, সংশয় ও আপত্তি অতি সহজেই মুছে যেত।' বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশে নাৎসীনেতাদের বক্তব্য পেশ করা দেখেছিলেন মার্কিন সাংবাদিক লুই লকনার। তিনি লিখেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ বুদ্ধিজীবী ছাত্রসমাজ এক যুক্তিহীন আবেগের দাপটে ভেসে যাচ্ছে এটা দেখে আমি সেই সভ্যস্থল ত্যাগ করি।'

ব্যক্তিগত জীবনে হিটলার আঙেলিকা রাউবাল নামে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। মেয়েটি ছিল তাঁর সৎবোনের কন্যা। রাউবাল ছিলেন হিটলারের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট এবং সে ভিয়েনার একজন আর্টিস্টকে মনেপ্রাণে ভালবাসত। রাউবাল এবং তাঁর মাকে হিটলার দেখাশোনা করত। রাউবাল মামার সাথে এক বাড়িতেই বসবাস করত, মামা তাকে সর্বদাই আগলে রাখত পাছে সে অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। 'সোজা বাংলায় বলতে গেলে হিটলার এই কুমারীকে যেন দেবতার আসনে বসিয়ে পূজো করতেন।'[৮] শেষ পর্যন্ত মেয়েটি আত্মহত্যা করে। হিটলার যখন ন্যুরনবের্গ শহর ছেড়ে রায়রট শহরের দিকে যাচ্ছিলেন তখন তিনি মৃত্যুসংবাদ পান।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান বোমারু বিমানের সগর্জন আক্রমণের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস কাঁপানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে ! ছয় বৎসরব্যাপী এই ভয়াবহ যুদ্ধ কেবল পাঁচটি মহাদেশকে গ্রাস করেছে তাই নয়, পৃথিবীর বুকে বয়ে এনেছে দুর্ভিক্ষ, অনৈতিকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অবিশ্বাস, অনিশ্চয়তা—এ সবই। এই যুদ্ধে হিটলার ৫ কোটি মানুষকে কবরে শুইয়ে আপন গোর রচনা করেছিলেন। ৫ কোটি মানুষের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল বেসামরিক ও নিরপরাধ নাগরিক। সন্ত্রাস, বোমাবর্ষণ ও রাস্তায় রাস্তায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করাই ছিল হিটলারের যুদ্ধ অভিযানের কৌশল। সকলের স্নায়ুকে বিবশ করে হিটলার অগ্রসর হন। সে সময় তাঁর উচ্চারণ ছিল এরকম—'কালের শান্তি বয়ে এনেছি'—এ আশ্বাসবাণী শোনানোর সময় তিনি বুঝতে পারেননি, কতবড় অসত্য তিনি উচ্চারণ করছেন।

হিটলারের বদ্ধমূল ধারণা ছিল ইহুদীবাদই উদগ্র মুনাফাখোর সৃষ্টি করেছে। ইহুদীরাই তাঁদের সব ব্যর্থতার কারণ। এরাই অর্থনীতিকে হত্যা করেছে এবং শিল্পকর্ম, সংবাদপত্র ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদেরকে (ইহুদীদেরকে) বশে আনাই যথেষ্ট হবে না, নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই যথার্থ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিটলার সম্পর্কে বলতে গেলে একথা বলতে হয় যে, '...হিটলারের মধ্যে কোন অনন্যসাধারণ মনীষা, কোন গভীর অন্তর্দৃষ্টি কিংবা মানবিকতা ও মমত্ববোধ ছিল না—যদিও কূটনৈতিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সামরিক বিষয়ে তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান ও বক্তৃতা দানের আশ্চর্য শক্তি ছিল। এই অদ্ভুত লোকটি সমগ্র ইউরোপকে এবং সমসাময়িক পৃথিবীকে যেন পাগল করিয়া দিয়াছিল। এমনকি, অতীতের সমস্ত রণনায়ককে যেন অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। একথা নিঃসন্দেহ যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল—কিন্তু শয়তানের প্রতিভা !'[৯]

৩.

রূপসী বাংলা (১৯৫৭) কাব্যগ্রন্থ জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হলেও এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ রচিত হয়েছিল 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ রচনার পূর্বে, অথচ 'রূপসী বাংলা' কবি প্রকাশ করেননি অথবা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

কোনো কবি বা শিল্পী তাঁর কালিক উপলব্ধির বাইরে নন। জীবনানন্দ ত্রিকালদর্শী কবি। তিনি মনে মনে তাঁর প্রিয় ভূমিকে অখণ্ড ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করে নিয়ে রূপসী বাংলা নামকরণ করেছেন এবং 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন 'আবহমান বাংলা, বাঙালি'কে। জীবনানন্দের বাংলা—'রূপসী বাংলা', শাশ্বত বাংলার স্বপ্নরূপ। প্রাক–ভারত বিভক্তির যুগে আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম কী হবে জীবনানন্দের পক্ষে তা অনুমান করা সম্ভব ছিল না।

এই কাব্যগ্রন্থের অবয়বটি গড়ে উঠেছে একষট্টিটি কবিতার সমন্বয়ে। তার মধ্যে একত্রিশটি কবিতায় একান্নবার তিনি বাংলাদেশের (বাংলা) নাম উল্লেখ করেছেন। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র কবিতায় তাই স্বদেশ ও স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৮৬)–র উল্লেখ করা যায়। আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায় 'উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর এ দু'জন শ্রেষ্ঠ কবির ঐ দুটি শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থের কোনোটিই কলকাতায় প্রণীত নয়। 'চতুর্দশপদী' লেখা হয়েছিল ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের এক কঠিন দুঃসময়ে, প্রবল অর্থকষ্টের মধ্যে। আর জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের বরিশালে বসে, জীবনানন্দের বিবাহিত বেকার জীবনের পীড়িত দিনগুলোতে।' এই দুই কাব্যগ্রন্থের অভিন্ন রূপকল্প হলো সনেট। 'স্বদেশচেতনা জীবনানন্দ দাশের পূর্বে ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন প্রমুখ কবিদের কবিতায় অবয়ব নির্মাণ করে নিয়েছিল। এঁদের চিন্তা ও চেতনায় স্বদেশচেতনা উপেক্ষণীয় ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের অন্তরপ্রদেশের অন্তর্নিহিত রূপ বৈচিত্র্য যে কবিকে খ্যাতিমান করেছে তাঁর কবি–প্রসিদ্ধির শুদ্ধ সলিলে, তিনি জীবনানন্দ দাশ।'[১০]

নিসর্গের রূপকার জীবনানন্দ রূপসী বাংলার রূপে বিমোহিত, যেমনি করে একজন শুদ্ধ প্রেমিক তার অনন্যসাধারণ প্রেমিকার অপার সৌন্দর্য ঐশ্বর্যে সর্বদাই মুগ্ধ থাকেন। ঐ মুগ্ধতার সূত্র ধরে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে এই বাংলায় থাকবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন :

> তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও—আমি এই বাংলার পারে
> র'য়ে যাব ; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে ;
>
> (তোমারা যেখানে সাধ : রূপসী বাংলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ রূপসী বাংলার সৌন্দর্যের বিমুগ্ধ রূপকার। পৃথিবীর রূপ খুঁজতে তিনি মোটেই আগ্রহী নন। বাংলার প্রতি অগাধ ভালবাসার সূত্র ধরে তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ....
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিলো ;

(বাংলার মুখ আমি : রূপসী বাংলা)

এখানে কবি খণ্ডের ভেতর অখণ্ডের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। এরপর কবি তাঁর স্বদেশভূমির অস্তিত্ব দেখতে চেয়েছেন পৃথিবীর মানচিত্রে। অনাগত স্বদেশভূমির উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন :

তুমি কেন বহু দূরে—ঢের দূরে—আরো দূরে—নক্ষত্রের অস্পষ্ট আকাশ
তুমি কেন কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে এসে বলোনাকো একটিও কথা

(তুমি কেন বহু দূরে : রূপসী বাংলা)

রূপসী বাংলার কবিতার আবহের মধ্যে ঘুরে ফিরেই ইতিহাস লুকোচুরি খেলেছে :

এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হ'য়ে আছে।

(সেই দিন এই মাঠ : রূপসী বাংলা)

ইতিহাসের ঐতিহাসিক চরিত্রকে তিনি তাঁর কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তিনি বল্লাল সেন, রায়গুণাকর, দেশবন্ধু, চন্দ্রশেখর, রামনাথ ইত্যাদি ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ করেছেন :

মধুকূপী ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পাড়ে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি—রায়গুণাকর
আসিবেনা—দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার,
কালীদহে ক্লান্ত গাংশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়,
আসিয়াছে চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা ;
মৃত শত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।

(অশ্বথে সন্ধ্যার হাওয়া : রূপসী বাংলা)

বুদ্ধের স্বপ্ন দেখার কথাও তিনি ইতিহাস থেকে জেনেছেন। জেনেছেন রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা, দিল্লী, বেবিলনের স্বপ্নের কথা :

...—স্বপ্ন কি দেখেনি বুদ্ধ—নিউসিডিয়ায় বসে দেখেনি মণিকা?
স্বপ্ন কি দেখেনি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা, দিল্লী, বেবিলন?

(তুমি কেন বহু দূরে : রূপসী বাংলা)

৪.

'বনলতা সেন' (১৯৪২) এককভাবে জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি প্রেমোত্তীর্ণ হয়ে মহাপৃথিবী ও মহাসময়ের পথে যাত্রা করেছেন। এ প্রসঙ্গে নরেশ গুহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন—'বনলতা সেন' যখন ষোল পৃষ্ঠার বই হয়ে প্রথম বেরিয়েছিলো তখন আমাদেরই কোনো বন্ধু—কবিতা লিখতেন না তিনি—একসঙ্গে তার পনেরো কুড়ি কপি কিনে সব বন্ধুদের উপহার দিয়েছিলেন। সে-সব কবিতা একা একা উপভোগ করা তাঁর কাছে মনে হয়েছিলো স্বার্থপরতা'। জীবনানন্দের ইতিহাসচারিতার অগ্রগমন শুরু হয়েছিল 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ থেকেই। তিনি আণবিক সভ্যতার নেতিবাচক প্রভাব কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তিনি খণ্ড খণ্ড মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। যখন মানুষের মাঝ থেকে বিশ্বাস হারিয়ে গেছে :

হয়তো গুলির শব্দ আবার :
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না ;
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার ;
(আমি যদি হতাম : বনলতা সেন)

উল্লেখ্য যে, এই কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দ মূল্যবোধের নির্দেশিকা হিসেবে নারীকে উপস্থাপন করেছেন। কবি তাঁর মনোজাগতিক দর্শন থেকে বুঝেছিলেন যে, নান্দনিক নারী সৌন্দর্যের কোনো বিনাশ নেই। আর এই অবিনাশী সৌন্দর্যের বিশাল শক্তিকে তিনি মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত করেছেন। শ্যামলী কবিতায় শ্যামলীর মুখ অতীতের শক্তির সাথে তুলনীয়। ব্যাপক অর্থে শ্যামলী সেকালের একালের সর্বকালের শক্তি।

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন ;
... ...
তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
(সুচেতনা : প্রাগুক্ত)

'সুদর্শনা' কবিতায় সুদর্শনা নামক প্রতীকী মহিলা মৃত হলেও সুদর্শনার মত আরো অনেক মহিলা পৃথিবীতে বর্তমান এবং তাঁদের কাছে রয়েছে যুগের সঞ্চিত পণ্য।

একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হ'তে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

'সুরঞ্জনা' কবিতায় সুরঞ্জনা মেয়েটি কালের নীরব সাক্ষী। সে কালো চোখ মেলে গ্রীক, হিন্দু, ফিনিশীয় নিয়মের কঠিন আয়োজন প্রত্যক্ষ করেছে। মানুষের তৈরি নগর সভ্যতা মানুষ চেয়েছিল কিনা, মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে কিনা ইত্যাদি প্রসঙ্গও কবিতায় এসেছে। এক সময় দেখা গেছে তিলোত্তমা নগরীর সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে। অতীতের ভূমধ্যসাগরলীন এক দূর সভ্যতা হতেই বর্তমান আধুনিক সভ্যতার জন্ম। অতীতের সেই কলগুঞ্জনের আলাপচারিতার মূলীভূত রূপ সুরঞ্জনা। সুরঞ্জনাই সভ্যতার essence বা নির্যাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছ ;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন ;
...   .
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ নিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

(সুরঞ্জনা : প্রাগুক্ত)

'মিতভাষণ' কবিতায় কবি নারীর সৌন্দর্যকে অতীতের দানের সাথে তুলনা করেছেন। সে দান সদর্থক অর্থে আজও পৃথিবীতে বর্তমান।

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা–আলো হাতে নিয়ে তুমি

(মিতভাষণ : প্রাগুক্ত)

কবির চোখে অতীতের দান কালাতিক্রমিক এক সর্বকালীন উপকরণ, যা বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতেও প্রসারিত হতে পারে।

'সবিতা' কবিতায় কবি স্বগত সংলাপের ভঙ্গিতে সবিতাকে উদ্দেশ্য করে সব কথা নিবেদন করেছেন। সবিতা জন্মদাত্রী। অনুমান করা হয়েছে কোনো এক বসন্তের রাতে মানুষের জন্ম হয়েছে। মানুষের যাত্রা এক সুরভী আলোক হতে, সে যাত্রা শাশ্বত রাত্রি পেরিয়ে, বিকেল পেরিয়ে এগিয়ে গেছে সকলের অগোচরে। গ্রীক সভ্যতার পরে এসেছে মধ্যযুগের ঔজ্জ্বল্য। এরপর ইউরোপ জুড়ে খ্রিষ্টীয় সভ্যতার উত্থান ঘটে। বিংশ শতকীয় আণবিক সভ্যতার আলো এই শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে নেতিবাচক বলেই প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে আগুন জ্বলে তা অপচয়-প্রবণ, কিন্তু ক্ষান্তিহীন। এ সব সত্ত্বেও অস্তিত্ব আছে সবিতার। তাঁর মুখের রেখায় এখনো নতুন আলো। সে আলো অতীতের পৌত্তলিক সভ্যতা কিংবা ধর্মীয় খ্রিস্টান সভ্যতা অথবা সমুদ্রযাত্রার অন্ধকারকে পার করে এসেছে এবং নতুন সূর্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে :

তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কত পৌত্তলিক খৃস্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব-সূর্যে জাগার মতন ;

(সবিতা : প্রাগুক্ত)

'সুচেতনা' কবিতায় অস্থিরচিত্তের মানুষ স্থিরতার গভীরে প্রবেশ করতে পারছে না বলে 'সুচেতনা' একটা দূরতর দ্বীপ হয়ে আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেছে বিকেলের নক্ষত্রের কাছে। রণরক্ত কোলাহলে আলোড়িত সমগ্র মানব সভ্যতা এক নিদারুণ বিপন্নতার মুখে নিপতিত কিন্তু এসবই মানবেতিহাসের শেষ সত্য নয়। 'রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে' যিনি ভালবাসা দানে আগ্রহী তিনিই হয়তো ভাই-বোন, বন্ধু, পরিজনকে বাদ দিয়ে আধুনিক ধনতান্ত্রিক বিকাশ ব্যবস্থার স্বৈরাচারে লিপ্ত। এরপরও 'মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে—' কবি আশা করেন যে, কলকাতা একদিন কল্লোলিনী সৌন্দর্যে কল্লোলিত হয়ে উঠবে। সুচেতনাকে অর্জন করতে হলে শুধু বর্তমান সময়ের মধ্যে ডুবে থাকলে চলবে না, অতীত ইতিহাসের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে দাঁড়াতে হবে :

শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

(সুচেতনা : প্রাগুক্ত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫.

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ (১৯৪৪) প্রকাশের পর থেকে জীবনানন্দ তাঁর প্রিয় পাঠকদের কাছেও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন। এ সময় স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তুলেছিলেন। জীবনানন্দের কবিতার দুর্বোধ্যতার পক্ষে ইয়েটস্‌-এর উক্তির উদ্ধৃতি দেয়া যায়—'The form of sincere poetry, unlike the form of the popular poetry, may indeed be sometimes obscure or ungrammatical.' ইয়েট্‌স স্পষ্টতই বলেছেন যে, 'সিনসিয়ার কবিতায় কিছু কিছু দুর্বোধ্যতা থাকবেই, পপুলার কবিতায় তা নাও থাকতে পারে'।

'বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের ও বিশের দশকে সমস্ত বিশ্বে একটি ক্ষয়িষ্ণু চেতনা বিরাজ করছিল। যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় ও নানাবিধ সংকটে মানুষ ম্রিয়মাণ। সমস্ত পৃথিবীতে হতাশা ও ব্যর্থতার ছায়া বিস্তৃত হচ্ছে। এ রকম একটি যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যে কোন অনুভূতি সচেতন কবি দূর অতীতের স্বপ্নরাজ্যে কিংবা মৃত্যুর বিবর্ণতায় মুক্তি খুঁজতে চাইতে পারেন। ... জীবনানন্দ এই ব্যর্থতাকে রূপ দিতে চেয়েছেন কাব্যের ভাষায়।'[১১]

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের বিপন্নবিস্ময় 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি। কবিতাটি শুরু হয়েছে নাটকীয়ভাবে, একজন ব্যক্তির 'লাশকাটা' ঘরে যাবার সংবাদের ভেতর দিয়ে—যে পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা করবার সময়ে তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ছিল এরকম :

> বধূ শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
> প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
> কোন্ ভূত ? ঘুম ভেঙে গেলো তার ?
> অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

কবিতাটিতে এ তথ্যও দেয়া হয়েছে যে, একজন মানুষের সুখে থাকবার মত সব উপকরণ ঐ ব্যক্তির ছিল। তবে কি মানুষের সুখের সংজ্ঞা একান্তই তার ব্যক্তিগত ? কবিতার শেষের দিকে এসে কবি বলেছেন :

> অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
> আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
> খেলা করে ;
> আমাদের ক্লান্ত করে
> ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
> লাশকাটা ঘরে
> সেই ক্লান্তি নাই ;

এমন হতে পারে সবকিছু পরিপূর্ণ হবার কারণেই ঐ ব্যক্তি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা মিটে যাবার ফলেও মানুষের মধ্যে এক ধরনের হতাশা আসতে পারে।

জীবনের হিসাব বড় গোলমেলে। Man and Superman-এ বার্নাড শ' যেমন বলেছিলেন, 'There are two tragedies in life, one is to lose your heart's desire. The other is to gain it.'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সিন্ধুসারস' কবিতায় লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সিন্ধু–সারসের ভূমিকা তুচ্ছ, অনেকটা সাদা প্রেক্ষাপটের মতো যেন। এখানে যা সমস্যা, তা শুধু মানুষেরই নিজস্ব, সচেতন মানুষের। কিংবা এমনও ভাবা যায়, সিন্ধুসারস যেন যুদ্ধপূর্ব যুগের কোনো বনেদী মানুষের প্রতীক, যার বেঁচে থাকার সামাজিক ব্যাকরণ, ঠাট সব আলাদা ; যেন বহুযুগের ওপার হতে টাইম মেশিনে চড়ে সে আগন্তুকের মতো এসে পড়েছে এ দগ্ধ সমকালে। ফলে সে জানে না এই দহনের কারণ, যন্ত্রণার সঠিক ঠিকানা, যেহেতু তার 'নেই নিম্নভূমি—নেই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত !'[১২]

কবির আর্ত অভিপ্রায় :

জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহো নাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,
বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি ; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে
ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে-রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব ; নেই নিম্নভূমি—নেই আনন্দের অন্তরালে
প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।
(সিন্ধু সারস : মহাপৃথিবী)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলমান বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা। মহাযুদ্ধের আর্থ–সামাজিক ফলাফল কবিদের অসহায় করে তুলেছিলো। টি এস এলিয়ট তাঁর 'ওয়েস্ট ল্যান্ডে' লিখেছিলেন, 'London Bridge is falling down, falling down, falling down,' জীবনানন্দের 'পৃথিবীলোক' কবিতার অংশবিশেষ এরকম :

দূরে কাছে কেবলি নগর ঘর ভাঙে
গ্রাম পতনের শব্দ হয় ;
মানুষেরা ঢের দিন কাটিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।
এসব শূন্যতা ছাড়া কোনোদিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।

'আদিম দেবতারা' কবিতায় মহাপৃথিবী সৃষ্টির উপাদান মূলত আগুন, বাতাস, জল তা বলা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, আদিম দেবতারা সর্পিল পরিহাসে পৃথিবীকে রূপ দিয়েছে। এই রূপ 'ভয়াবহ নির্জন রূপ'। আর এই পৃথিবীর মানুষদের রক্তে দিয়েছে 'মাছির মতো কামনা'। 'মাছির মতো জ্ঞানহীন কামনার কারণেই মানুষের ভেতর থেকে মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে :

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিলো রূপ—
কী ভয়াবহ নির্জন রূপ তোমাকে দিলো তারা ;
তোমার সংস্পর্শের মানুষদের রক্তে দিলো মাছির মতো কামনা।
(আদিম দেবতারা : মহাপৃথিবী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি পৃথিবীর এই রূপকে স্থূল হাতে ব্যবহৃত হতে দেখেছেন এবং তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বার বার এই ব্যবহারের কথা বলেছেন :

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত ব্যবহৃত হ'য়ে
ব্যবহৃত-ব্যবহৃত—'

শেষ পর্যন্ত এই রূপ

'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'য়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়?
(আদিম দেবতা : মহাপৃথিবী)

'মহাপৃথিবী'র কিছু কিছু কবিতা পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়, মৃত্যু আর মৃত্যুজনিত বিষাদ ক্রমশ কবির ভাবনাকে উল্লম্ব আর অনুভূমিক রেখায় ছেদ করে রয়েছে। 'বনলতা সেন'-এর অন্ধকার কবিতা থেকেই এই বিষাদের অগ্রগমণ শুরু। সৌন্দর্য হারিয়ে যাচ্ছে, সৌন্দর্যকে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, সৌন্দর্যের প্রতীকসমূহ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না :

কোথাও কোনো হরিণ নেই আর ;
যতদূর যাই কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
(মুহূর্ত : মহাপৃথিবী)

এদিকে কোকিল ডাকছে—পউষের মধ্য রাতে ;
কোনো—একদিন বসন্ত আসবে ব'লে?
কোনো—একদিন বসন্ত ছিলো, তারই পিপাসিত প্রচার
(শীতরাত : প্রাগুক্ত)

কতবার হটেনটট জুলু দম্পত্তির প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম
(আজকের এক মুহূর্ত : প্রাগুক্ত)

অনেক মেধাবী মুখ স্বপ্নের বন্দরের তীরে
যদিও পৃথিবী আজ সৌন্দর্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে
(মনোবীজ : প্রাগুক্ত)

দুটো বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়ী পরিণতি সম্ভবত বিশ্বাসহীনতা। এই বিশ্বাসহীনতা 'মহাপৃথিবী'র অন্যতম অধীত বিষয় :

একদিন ছিল—তবু শোচনীয় কালের বিপাকে
হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস।
(বিভিন্ন কোরাস-২ : মহাপৃথিবী)

এই কাব্যগ্রন্থের Inner logic-এ রয়েছে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বিশ্বাসহীনতার ক্লান্তি, বেঁচে থাকবার মত পর্যাপ্ত জীবানুপাদানের ঘাটতি, অহেতুক সন্দেহ আর আশংকা। কবি যখন বলেন 'এই সব শীত রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে' (শীতরাত : মহাপৃথিবী)। এই 'শীত' সত্তার গভীরের শীত, প্রতিকূল কারণে সব মানবীয় অনুভূতির অবলুপ্তি। আবার কবি যখন বলেন, 'তারপর একদিন উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত এসে/কহিবে তোমারে চাই, তোমারেই...' (স্থবির-যৌবন : মহাপৃথিবী)। জীবনানন্দ কখনও কখনও মৃত্যুর ভেতর দিয়ে নির্বাণ চেয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফুটপাথে' কবিতায় কবি ট্রাম লাইন সম্পর্কে যে কূটাভাষ দিয়েছেন জীবনানন্দের জীবনে সেই কূটাভাষই চরম সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ট্রাম দুর্ঘটনায় :

> কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
> কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরার মতো
> এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
> পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
> অনুভব করে হাঁটছি আমি।
>
> (ফুটপাথে : মহাপৃথিবী)

কবির এই পথহাঁটা শুরু হয়েছিল 'বনলতা সেন' পর্বে। 'অনেক হেঁটেছি আমি ; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে ;' [পথ হাঁটা/বনলতা সেন], জীবনানন্দের পথহাঁটা শেষ হয়েছিল ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে আততায়ী ট্রামের অতর্কিত আক্রমণে।

৬.

'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) কাব্যগ্রন্থের নামকরণের আবহ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, এ কাব্যগ্রন্থটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আকাশলীনা', কবির মানসপ্রেমিক সুরঞ্জনা। সে অন্য যুবকের প্রতি উৎসুক হয়ে পড়েছে। মাঠে, ঢেউয়ে, হৃদয়ে কোথাও কবি তাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তাঁর মনোলীনা। সে যেন মাটিতে লীন আর তার প্রেমিক মৃত্তিকা উৎপন্ন ঘাস। অন্য যুবকের সঙ্গে সুরঞ্জনার এই একান্ততায় কবি বিষণ্ন হয়ে পড়েছেন। এই বিষণ্নতাবোধ থেকেই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে :

> সুরঞ্জনা,
> তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
> বাতাসের ওপারে বাতাস—
> আকাশের ওপারে আকাশ।

এই কবিতাটি পড়লে সুন্দরী সুকন্যা আঙেলিকা রাউবালের কথা মনে পড়ে যায়। এই মেয়েটি ছিল হিটলারের প্রেমিকা, হিটলার সত্যিই তাকে ভালবেসেছিলেন। তবে মেয়েটির প্রতি ছিল তাঁর নানা বিধি-নিষেধ এমন যে হিটলারের অমতে সে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, আলাপ পরিচয় করতে পারবে না এবং কোথাও যেতে পারবে না। রাউবাল ভিয়েনার একজন আর্টিস্টকে ভালবাসত এবং শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ জানা যায় না। হয়তো তাঁর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব কাজ করেছিল। দ্বন্দ্বটি হতে পারে : 'আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব', নয়তো 'আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব'। 'আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্বে' সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে, ভিয়েনার ঐ যুবকের কাছে ফিরে যাবে, না হিটলারের কাছে থেকে যাবে। 'আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্বে' সে যুবকের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে কিন্তু হিটলারের ভয়ে সে তা প্রকাশ করতে পারেনি। কারণ হিটলার তখন ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছেন এবং হিটলারের নৃশংসতাও নিশ্চয় রাউবালের অজানা ছিল না। আত্মহত্যার পর এই মেয়েটির স্মৃতি হিটলারকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এককথায় তিনি অনেকটা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

এই কাব্যগ্রন্থের একটি সার্থক পরাবাস্তব কবিতার নাম 'ঘোড়া'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাটির প্রথম পংক্তি—

'আমরা যাইনি ম'রে আজো—তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয় :' এখানে 'তবু' শব্দটি একই সাথে নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতার প্রমাণ বহন করে বলে মনে হয়। নিরপেক্ষ এজন্যই যে, আমাদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ওপর যেমন আবহমান দৃশ্যের জন্মরহস্য নির্ভর করে না, আবার একথাও ঠিক যে আবহমানতাকে অনুভব করতে পারে দ্রষ্টা, এবং এক্ষেত্রে আমি অনুপস্থিত থাকলেও আমরা থাকবোই।

প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায় ;

(ঘোড়া : সাতটি তারার তিমির)

এই পংক্তিসমূহ পড়লে বোধিবিন্দুতে জেগে ওঠে সালভাদর ডালির ছবি 'আটোমোবাইলের ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম-নেওয়া একটি অন্ধ ঘোড়া টেলিফোন চিবিয়ে খাচ্ছে' (১০৩৮)। যন্ত্র থেকে জন্ম নেওয়া ঘোড়া যন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে ফিরে যেতে চাচ্ছে 'প্রাগৈতিহাসিক পরানিসর্গে,' টেলিফোনটাকে নির্মূল করে দিয়েও তার শান্তি হয়নি, বৈদ্যুতিক বাল্বটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যও সে ঘাড় বাঁকিয়েছে, তার এই সংগ্রামী ভঙ্গিকে সমর্থন করছে রাত্রি ও চন্দ্রকলা, অর্থাৎ রাত্রি ও চন্দ্রকলার পটভূমিতে চিত্রিত হয়েছে চিত্রটি। রাত্রিও চন্দ্রকলা—এখানে শান্তি ও নিসর্গের প্রতীক। 'ঘোড়া' কবিতায় মহীনের ঘোড়াগুলোও যন্ত্রসভ্যতা থেকে প্রাণমনে মুক্তি পেতে চেয়েছে। 'মহীন' এখানে পুঁজিপতি সমাজের প্রতিভূ। ঘোড়াগুলোর 'জ্যোৎস্নার প্রান্তরে' ঘাস খাওয়া যেন প্রভুত্ব থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্খার স্মারক। এই কবিতায় 'বৈষম্যের ভিতর থেকে ফুটে ওঠে 'চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো', যারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয় উপায়ে ন্যস্ত হয়েছে, অর্থাৎ কয়েকটা বেড়াল ছানাই এখানে চায়ের পেয়ালার মতো সন্নিবিষ্ট, যারা উপভোক্তা মানুষের স্পষ্ট কর্তৃত্ব কোনোক্রমে এড়াতে পারলেও 'ঘুমে ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে' পড়ে বেশিদূর যেতে পারে না। তাদের সন্ত্রস্ত পলায়ন 'ও পাশের পাইস্-রেস্তোরা'তে অবসিত হয়ে পড়ে। হয়তো কানাগলির সেই অধ্যুষিত আবহাওয়া থেকে তারা ত্রাণ পেয়ে যেতেও পারে। এই ধরনের বোধেই 'প্যারাফিন লণ্ঠন' নিভে যায়। আস্তাবলটি মহীনে আবদ্ধ না থেকে বিস্তৃত হয়ে যায়, 'নিওলিথ স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে' বিরাজ করে 'সময়ের প্রশান্তি'।'[১৩]

'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের একটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা। এই কবিতায় অতীত যুদ্ধের বিরতি আর ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে বিরাজমান সংকটকে তিনি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন—

ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরিতকী বনে—জ্যোস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হ'য়ে গেছে সব ; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক-কর্কট—তুলা-মীন।

এই কবিতায় 'জীবনানন্দ দাশ কামান শব্দটি ব্যবহার করেছেন সাবধানে এবং সাংহাইকে দিয়েছেন একটি দূরবর্তী অবস্থান—'যদিও তার বিনষ্ট হ'য়ে যাওয়ার সংবাদ ওই নারীদের এবং গাছেদের সঙ্গে, আমরা শুনতে পাই। জীবনানন্দ দাশের যুদ্ধকালীন থিয়েটারটি হঙ্‌কঙ্‌ কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতপক্ষে বিনষ্ট হতে থাকা একটি ভূগোল। তাঁর বর্ণনায় যে সমৃদ্ধ চিত্রকল্প, যা ইন্দ্রিয়ঘন কিছু নির্মাণে একটি বিপরীত সম্ভাবনারই আভাস দেয় (সমৃদ্ধ Sensuality-র পেছনে সৌন্দর্যের পচন ধরায়)। তা যথাযথভাবে তুলে ধরে শিরোনামের গোধূলিসন্ধির নঞর্থক সংশ্লিষ্টতাকে। 'গোধূলিসন্ধি', একটি কালিক চিত্রকল্প হিসেবে গোধূলির বিকল্প নয় ; 'গোধূলিসন্ধি' শতাব্দী সন্ধির মত, এক ক্রান্তিকালীন অবস্থানবাচক'।[১৪] এই কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'তিমিরহননের গান'। এই কবিতায় কবি অন্ধকার তিরোহিত করার প্রত্যয়ে সোচ্চার :

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

'তিমিরবিলাসী' ও 'তিমিরবিনাশী' এই দুই শব্দের আপাত বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক আলো, যা আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসকে নাড়া দেয়। আমাদেরকে বিস্ময়ের সম্মুখীন করে তোলে। এ কবির 'বিপন্ন বিস্ময়' নয়। এখানে কবি বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করেছেন। যাকে অক্সিমোরন (Oxymoron) বলা যায়। আসলে আমরা তিমিরবিলাসী নই, আমরা তিমিরবিনাশী।

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে কবি যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক জীবন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। 'নাবিক' কবিতায় তিনি তাই জল-স্থলের মিলন মানব নাবিককে স্মরণ করেছেন—

হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে
অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও—দুপুর বেলায় ;
বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেকজান্দ্রিয়ার।

এখানে নাবিককে তিনি নব নব দিগন্তের খোঁজ করতে বলেছেন।

১৯৪৩ (পঞ্চাশের মন্বন্তর) সালের দুর্ভিক্ষে এদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। সে সময় '...বিশ্ব-বাতাবরণের মাঝে বাংলাদেশ পঞ্চাশের মন্বন্তর বুকে নিয়ে উদ্‌যাপন করছিলো পৃথক্ মৃত্যু মহোৎসব!' ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেন ঐ দুর্ভিক্ষের উপরে গবেষণা করে দেখান যে, এই আকাল ছিলো মানুষের তৈরি করা আকাল। তাঁর 'দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ' সংক্রান্ত গবেষণায় তিনি দেখিয়েছিলেন যে, ঐ বছর বাংলাদেশের মাথা পিছু খাদ্য উৎপাদন অনেক বেশি হয়েছিল। খাদ্য উৎপাদন বেশি হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এ কারণেই অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষকে অভিহিত করেছেন 'বিভেদের ঘটনা' হিসেবে।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে গ্রামের প্রতি শহরের মানুষের নিস্পৃহভাব জীবনানন্দ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'রাত্রির কোরাস', কবিতায় তিনি মর্মাহত হয়ে লিখেছেন :

তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি মৃত দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে

(রাত্রির কোরাস : সাতটি তারার তিমির)

'তিমিরহননের গান' ও 'ক্ষেতে প্রান্তরে' কবিতায়ও কবি দুর্ভিক্ষের আবহ তুলে ধরেছেন। দারিদ্র্যের কালনাগিনী ছোবল সহ্য করতে না পেরে মধ্যবিত্ত মানুষও লঙ্গরখানার অন্ন খাচ্ছে :

লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে ওঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।

(তিমিরহননের গান : সাতটি তারার তিমির)

কেবল খড়ের স্তূপ প'ড়ে আছে দুই-তিন মাইল,
তবু তা সোনার মতো নয় ;
কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।

(ক্ষেতে প্রান্তরে : সাতটি তারার তিমির)

এই কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দ রাত্রিকে তুলে ধরেছেন অমঙ্গল ও অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে। 'উন্মেষ' কবিতায় তিনি দেখেছেন :

চোখের উপরে
রাত্রি ঝরে ;
যে-দিকে তাকাই
কিছু নাই
রাত্রি ছাড়া ;

আবার 'রাত্রি' কবিতার শুরুতে দেখা যায়, হাইড্র্যান্ট খুলে কুষ্ঠ রোগী জল চেটে খাচ্ছে ; মোটরকারের চলাফেরাকে কবি তুলনা করেছেন গাড়লদের কাশির সঙ্গে। কবিতার শেষে নগরীর মহৎ রাত্রিকে কবির কাছে মনে হয়েছে লিবিয়ার জঙ্গল। জঙ্গলের জন্তুগুলোর বেতন অনেক বেশি এবং তারা দায়ে ঠেকে কাপড় পরে। এখানে কবি হিটলারের নাৎসী [জন্তুগুলো] বাহিনীর কথা বলে থাকবেন :

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

(রাত্রি : সাতটি তারার তিমির)

মূলত দুটো বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানুষের অন্তর্গত মূল্যবোধসমূহ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যক্তিস্বার্থই সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে। কবি 'রাত্রির কোরাস' কবিতায় মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূল্য দিতে দেখেছেন এভাবে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে ;
উঠে ভেঙে গেছে।
কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
(রাত্রির কোরাস : সাতটি তারার তিমির)

পৃথিবীতে ব্যক্তিস্বার্থ প্রধান হয়ে ওঠার কারণে প্রেমভালবাসাও অবসিত হতে দেখেছেন কবি—

প্রেম নেই—প্রেমব্যসনেরও দিন শেষ হ'য়ে গেছে ; (প্রাগুক্ত)

এই একই কবিতায় কবি পশ্চিমের ইউরোপকে আখ্যায়িত করেছেন 'প্রেত' হিসেবে, পূর্বদিকে এশিয়ার মাথাকে বলছেন প্রেতায়িত অর্থাৎ এশিয়া প্রেতদের রসায়নে প্রেতায়িত হয়েছে। পশ্চিমা শাসকবর্গ আফ্রিকার মানুষকে জন্তুর মতো ব্যবহার করেছে। আঠারো শতকে দাস ব্যবসার ফলে কেবলমাত্র আফ্রিকা তার তিনকোটি সন্তান হারিয়েছে। জীবনানন্দ দাশ 'ইয়াঙ্কী' জাতির ডলারের লেনদেনের কথা বলেছেন এবং সবশেষে আশার আলো দেখিয়েছেন :

পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ
পুবদিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা ;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা ;
ইয়াঙ্কীর লেদদেন ডলারে প্রত্যয় ; ...
"তবু রাত্রি করোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি
(রাত্রির কোরাস : সাতটি তারার তিমির)

৭.

'বেলা অবেলা কালবেলা'র মূল চিন্তাদর্শটি সাতটি তারার তিমিরে'রই একটি পার্শ্বিক সূত্র। 'সময়ের যে বেলাভূমিতে কবি এবং পাঠক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ক্ষয়ের সংক্রমণের ফলে এই 'বেলা' আসলে অবেলা অর্থাৎ যা কাঙ্খিত সেইটে রয়ে যায় অনার্জিত এবং যা অবাঞ্ছিত সেইটে শেকলের মতো পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে নেয় মানব সত্তাকে। সুতরাং সময়ের এই বেলাভূমি আসলে নেতি ও নৈরাজ্য দিয়ে আচ্ছন্ন এক কালবেলা মাত্র। কিন্তু কবিকৃতিতে নিহিত পরাভাষা স্বরন্যাসের বিশিষ্টতা দিয়ে পাঠককে জানিয়ে দেয় যে কালবেলাকে মেনে নেওয়ার কথা বলছেন না কবি ; তিনি আসলে উত্তরণের প্রেরণায় পৌঁছাতে চাইছেন। এই কবিতা সংকলনের মৌল অবলম্বন সময় ও সমাজ এবং সময়–সমাজের দ্বিবাচনিকতায় বিধৃত মানবসত্তা যা কিনা ব্যক্তি–আমি ও সমষ্টি–আমির মধ্যে সংযোগের নতুন ধরনের সেতু আবিষ্কার করে নিতে চায়। কবি যেহেতু শব্দশিল্পী, শব্দবিন্যাসের অভিনবত্ব এই জন্যে তাঁকে পেরিয়ে যেতে হয় খণ্ডকালের মাত্রা, এবং খুঁজে নিতে হয় আরো স্থির দিক্‌নির্ণয়ের মতো 'চেতনা'কে। কারণ গভীর সংবেদনশীলতা নিয়ে তিনি জেনেছেন, অভ্যাসের পৌনঃপুনিকতায় জীর্ণ সমকালীন কবিতার আকরণ সত্যভ্রম পুনরুৎপাদন করে শুধু। ফলে ঐ প্রতিবেদন কবিতার উদ্দিষ্ট সত্যকে প্রকাশ করে না, আচ্ছন্ন করার কৃৎকৌশল উদ্ভাবন করে যায়। সুতরাং জীবনানন্দকে এমন এক পাঠকৃতি গড়ে নিতে হল যার সূচনা 'মহাপৃথিবী'র পর্বে, বিকাশ 'সাতটি তারার তিমিরে' এবং সম্প্রসারণ 'বেলা অবেলা কালবেলা'য়।[১৫]

সম্প্রসারণ একারণেই যে, জীবনানন্দ বেঁচে থাকলে তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের স্বরূপ কি হতো তা আমাদের জানা নেই। আর শ্রেষ্ঠ কবির কাজই হল ক্রমপরিণতির পথে এগিয়ে যাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম্পরাগত জীবনবোধ দিয়ে তৈরি বাচনিক ঐতিহ্যে অবিরাম ভাঙচুর চলতে থাকলে কবিহৃদয়ে পুরনো মূল্যবোধ সম্পর্কে এক ধরনের আকুলতা থেকেই যায় :

ইতিহাসে মাঝে মাঝে এ রকম শীত অসারতা
নেমে আসে ; —চারিদিকে জীবনের শুভ্র অর্থ র'য়ে গেছে তবু,

(পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে : বেলা অবেলা কালবেলা)

একটি বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে নিভে গেছে প্রায়।
আমাদের আধো-চেনা কোনো-এক পুরোনো পৃথিবী
নেই আর।

(উত্তর সাময়িকী : প্রাগুক্ত)

দেশের জাতির দ্ব্যর্থ পৃথিবীর তীরে ;
ফেনিল অস্ত্র পাবে আশা ?
যেতেছে নিঃশেষ হয়ে সব ?
কী তবে থাকবে ?
আধার ও মননের আজকের এ নিষ্ফল রীতি
মুছে ফেলে আবার সচেষ্ট হয়ে উঠবে প্রকৃতি ?

(যতদিন পৃথিবীতে : প্রাগুক্ত)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু এর রেশ রয়ে গেছে সর্বত্র। সমাজ ও রাষ্ট্রে এই যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত আজও বিদ্যমান। বিজ্ঞান আশীর্বাদ বয়ে আনেনি, বয়ে এনেছে সীমাহীন নিকষ কালো অন্ধকার। বিজ্ঞানের আধুনিক উদ্ভাবনকে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কেরা হীনস্বার্থে ব্যবহার করেছেন :

হয়তো বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা ;
হয়তো বা রক্তেরি পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক—
মানুষও রক্তাক্ত হতে চায় ;
হয়তো বা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের
নিজেকে নবীন ব'লে—অগ্রগামী (অন্ধ) উত্তেজের
ব্যাপ্তি ব'লে প্রচারিত করার ভিতর ; ...
হয়তো বা বিজ্ঞানের, অগ্রসর, অগ্রসৃতির মানে এই শুধু, এই !

(মহাত্মা গান্ধী : প্রাগুক্ত)

আপাতদৃষ্টিতে 'প্রাণহীন' বিজ্ঞান নিজেও জানে না তাকে শোকাবহ প্রতারণা করতে হবে :

চারিদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে—মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে ;
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা ক'রেই ক্ষমতাশালী দেখ ;

(মহাত্মা গান্ধী : প্রাগুক্ত)

পুঁজি আর প্রযুক্তি যাদের হাতে চলে গেছে তারাই 'মাংসভুক প্রবণতা' (Carnivorous psychology) বিলাসী অতিমানবে পরিণত হয়েছেন।

কবি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবক্ষয়ী, অপচয়ী আগুনে সমাজ, ইতিহাস ও মানুষের সব কল্যাণকর উপকরণ বিনষ্ট হতে দেখেছেন। এর পাশাপাশি তিনি সৎ ও মহৎ কবির মতো মানুষের সর্বময় কল্যাণ কামনা করেছেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে।
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।'
(অন্ধকার থেকে : প্রাগুক্ত)

এমনকি 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাতেও নির্মোহ বেদনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এরপর আলো জ্বলে ওঠে :

ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।
(হে হৃদয় : প্রাগুক্ত)

জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্য এই—তিনি একই কবিতায় সমস্যার চিত্র আঁকেন, ভয়ংকর অন্ধকার যুগের কথা বলেন—আবার ঐ একই কবিতায় সমস্যা সমাধানের আভাস দেন, আলোকিত যুগের আসন্নতার কথা বলেন। এককথায় কবিতার শেষে তিনি 'শত জলঝর্ণার গান' শোনান।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ, আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), ১৯৮৪, জীবনানন্দ, চারিত্র্য, ঢাকা। জীবনানন্দের লেখা 'আমার বাবা মা' রচনা থেকে গৃহীত।
২. চৌধুরী, ফয়জুল লতিফ (সম্পাদিত), ১৯৯৫, গোধূলি সন্ধির নৃত্য, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা। প্রাগুক্ত কবিতাটির উপর রচিত সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের আলোচনা থেকে গৃহীত।
৩. মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, ১৯৮৬, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস (১ম খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, পৃ. ২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৫. শুক্রবার, ১৭ ভাদ্র, ১৩৯৬ তারিখ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা শুরু' রচনা হতে গৃহীত।
৬. মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, ১৯৮৬, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস (১ম খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, পৃ. ২৯
৭. শুক্রবার, ১৭ ভাদ্র, ১৩৯৬ তারিখ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা শুরু' রচনা থেকে গৃহীত।
৮. আলী, সৈয়দ মুজতবা, ১৩৮৭ (বাং), হিটলার, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা।
৯. মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, ১৯৮৬, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা।
১০. আসগর, ড. সৈকত, জীবনানন্দ দাশ : বিষয় আশয়, কালধারা, নজরুল ও জীবনানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা (১০ম), নিবেদন লিমিটেড।
১১. 'কোরক', সাহিত্য পত্রিকা, শারদ-১৯৯৪, জীবনানন্দ সংখ্যা। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বিপন্নবিস্ময়ের মহাপৃথিবী' থেকে গৃহীত।
১২. প্রাগুক্ত
১৩. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, ১৯৯২, জীবনানন্দ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা। পৃ. ৭৬।
১৪. চৌধুরী, ফয়জুল লতিফ (সম্পাদিত), ১৯৯৫, গোধূলি সন্ধির নৃত্য, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা। প্রাগুক্ত। কবিতাটির উপর সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের আলোচনা থেকে, পৃ. ৫৬।
১৫. কোরক, সাহিত্য পত্রিকা, শারদ, ১৯৯৪, জীবনানন্দ সংখ্যা। তপোধীর ভট্টাচার্যের লেখা 'বেলা-অবেলা-কালবেলা : নিবিড় পাঠের সূত্র সন্ধান' রচনা হতে গৃহীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধদেব বসুর জীবনানন্দ-কাব্য বিশ্লেষণের ধারা : পর্বান্তরের ইতিহাস

সৌভিক রেজা

কোনো কবির রচনা-কর্ম যখন 'রুচির সমগ্রতা' দিয়ে দেখবার চেষ্টা করা হয়, তখন তাঁর সৃষ্টিশীলতার পর্ব-পর্বান্তরের কথা নানাভাবেই ঘুরে-ফিরে আসে। এই সৃষ্টিশীলতা যখন সেই কবির জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করে, তখন জীবন আর সৃষ্টিশীলতার সাযুজ্যতা আমরা খুঁজে নিতে পারি। জীবন প্রসঙ্গে যেমন সচলতার কথা, সজীবতার কথা ভাবি ; তেমনি কবির জীবনের কেন্দ্র থেকে উৎসারিত সাহিত্যকর্মের সচলতার কথাও অগ্রাহ্য থাকে না। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর সৃষ্টিশীলতার কেন্দ্রে আমৃত্যু সজীবতাকে ধারণ করে গেছেন। তাঁর আদ্যরচনার সঙ্গে অন্ত্য-পর্যায়ের রচনা তুলনা করলেই তফাতটুকু গভীরভাবে টের পাওয়া যায়। একজন সজীব কবির জন্যে এটি আশ্চর্যজনক কোনো ঘটনা নয়, বরং স্বাভাবিক। একজন সচল ব্যক্তি যখন কোনো পথ দিয়ে হাঁটেন, তিনি কখনো পথের পাশ দিয়ে, কখনো মধ্যিখান দিয়ে, কখনো দ্রুত, কখনো ধীরে—এইভাবেই চলেন। আবার কখনো ভীড়ের মধ্যে দিয়ে, কখনো-বা ভীড়কে এড়িয়ে—নানাভাবেই তার চলমানতা। কবির ক্ষেত্রেও সেইরকম ঘটনা লক্ষ করি ; জীবনানন্দ নিজেও বিশ্বাস করতেন-'কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ', ফলে জীবন ও কবিতা দুই-ই তাঁর কাছে মর্যাদা পেয়েছে। এই মর্যাদাবোধের কারণেই তাঁর কবিতা কোলাহলপূর্ণ সময়েও 'প্রেরণাময়' মনে হয় ; পাঠক-সমালোচক দুই পক্ষের দিক থেকেও এটি সত্য। যদিও ব্যক্তিক-সত্য ব্যক্তিভেদে ভিন্ন।

জীবনের প্রায় অন্তিমে এসে জীবনানন্দের মনে হয়েছিলো, তাঁর কবিতা সম্বন্ধে যেসব আলোচনা হয়েছে, সেসবের 'প্রায় চৌদ্দ আনি... অসার'। এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় একজন পাঠকের তির্যকদৃষ্টি সমালোচকের দিকেই গিয়ে পড়ে। এবং আমরা এ-ও জানি, জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর কবিতা পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে তাঁকে পাঠকের কাছে নিয়ে গিয়েছেন, এঁদের মধ্যে প্রথমেই বুদ্ধদেব বসুর নাম স্মর্তব্য। শুধু 'কবিতা' পত্রিকার সময়েই নয়, বরং 'প্রগতি'র সময় থেকেই বুদ্ধদেব বসু ছিলেন জীবনানন্দ দাশের মুগ্ধ-অনুরাগী। আর সে-কারণেই জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে যেসব বিরূপ মতামত সেইসময় উচ্চারিত হয়েছে, তাকে প্রতিবাদের মাধ্যমে প্রতিহত করবার চেষ্টা করতেন বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দের বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করাকে বুদ্ধদেব বসুর কাছে একধরনের 'কর্তব্য' ব'লে মনে হয়েছিলো। এই কর্তব্যবোধের তাড়না এসেছিলো তাঁর নিজের ভিতর থেকেই ; এ বিষয়ে বুদ্ধদেবের সরল স্বীকারোক্তি : 'যেহেতু তাঁর (জীবনানন্দ) কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিনুম।' এই ভালোবাসার যে-প্রতিদান বুদ্ধদেব বসু দিয়েছেন, তার তুলনা আমাদের সাহিত্যে সবদিক থেকেই বিরল। জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঝরাপালক' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩৪ সালে। বুদ্ধদেব বসু ১৩৩৫-এর আশ্বিনের 'প্রগতি'তে লিখলেন : 'প্রতি যুগে সাহিত্য নব নব রূপে দেখা দেবে ;—এই নবত্ব অবশ্যম্ভাবী এবং এক হিসেবে সাহিত্যের স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ...বস্তুত জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে আমার মনে হয়। তিনি এ পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ। ... তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দ বাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ, তিনি ঝড়ের মত উড়ে এসে পাঠকের মন এক দম্‌কায় কেড়ে নিয়ে যান না। তাঁর কবিতা একটু ধীরে-সুস্থে পড়তে হয়, এবং আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়।' প্রায় একই সময়ে জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ একপত্রে জীবনানন্দকে লিখেছিলেন, 'তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে। বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে।'

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সন্দেহে'র পাশাপাশি বুদ্ধদেবের যথার্থ উপলব্ধি'র ধরন সম্পর্কে আমরা পরিষ্কার একটি ধারণা পেয়ে যাই। এবং সেই সঙ্গে আধুনিক কবি ও কবিতা বিষয়ে বুদ্ধদেবের মুগ্ধতা-বিষয়ে তাঁর বিবেচনাশক্তির যথার্থবোধও আমরা বুঝে নিতে সক্ষম হই। 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১১৩৫) জীবনানন্দ দাশের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই প্রকাশ করেছিলেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক পত্রে বুদ্ধদেবকে জানালেন, 'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।' এই কবিতাটি পরবর্তী সময়ে কবির 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৭) কাব্যের অন্তর্ভূত হয়।

২.

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের পর-পরই বুদ্ধদেব বসু এই কাব্য সম্পর্কে 'কবিতা' পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩৪৩) একটি বড় আলোচনা লেখেন। 'প্রকৃতির কবি'—এই শিরোনামযুক্ত আলোচনায় বুদ্ধদেব জীবনানন্দ দাশকে প্রকৃতির কবি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি অবশ্য এ-ও মেনে নিয়েছিলেন যে, সব কবিই কোনো-না-কোনো অর্থে প্রকৃতির কবি। কিন্তু সব কবি 'সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর' দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন না। যাঁরা পারেন, কেবল তাঁদেরকেই 'প্রকৃতির কবি' আখ্যা দেয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের সমগ্র-কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়, তবে ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের উপর্যুক্ত মতামত অবশ্যই মূল্যবান এবং যৌক্তিক। কেননা, এই কাব্যের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় কবি জীবন অথবা জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে গ্রহণের চেষ্টা করেছেন ; এবং এই চেষ্টা শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমিত থাকেনি, সেখানে তিনি 'শিল্পসিদ্ধি'ও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'নির্জন স্বাক্ষর'-মনোযোগ দিয়ে পাঠ করে বুঝা যায়, তিনি কতোটা প্রকৃতির ভিতর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন—

তুমি তা জান না কিছু, না জানিলে,—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে !
যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ?
…   …   …
রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে ;

এই কবিতাটিকেও যদি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চিত্ররূপময়' আখ্যা দেওয়া যায়, তাহলে সেইটিও অগ্রহণযোগ্য হবে না। বস্তুত, জীবনানন্দের কবিতার একটি বড় অংশ জুড়ে আছে প্রকৃতি, আর সেই প্রকৃতির সূত্রে এসেছে চিত্ররূপময়তা। জীবনানন্দ দাশের এইসব কবিতায় এক রহস্যময় সঙ্গীতগুণের প্রকাশ লক্ষ করেছিলেন বুদ্ধদেব। সেই সূত্রে আমরা এ-ও যোগ করতে পারি, শুধু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলোয় নয়, জীবনানন্দের পরবর্তী-পর্যায়ের কাব্যেও এই সঙ্গীতগুণের আধিক্য দেখতে পাই। এবং আমাদের কবিতায় এই সঙ্গীতের 'সুর' একেবারেই নতুন। 'কয়েকটি লাইন'-এর মতো দীর্ঘ কবিতাটিও শব্দ, ধ্বনি ও ছন্দের নানারকম সুরের মিশ্রণে অভিনব হয়ে ওঠে। এই কবিতাটির শেষে জীবনানন্দ বলছেন—

কেন আমি গান গাই ?
                    কেন এই ভাষা
বলি আমি !—এমন পিপাসা
বার-বার কেন জাগে !
প'ড়ে আছে যতটা সময়
এমনি তো হয়।

এই যে 'এমনি তো হয়'—বাক্যাংশ থেকে জীবনানন্দের কবি-প্রবণতার একটি বিশেষ দিক আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে ; সেইটি হচ্ছে, এই কবি তাঁর কবিতা রচনায় বুদ্ধির চেয়ে অনুভূতিকে, নিজের প্রেরণা, কল্পনা, ইন্দ্রিয়কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের উপমাকে, কল্পনাকে 'অনুভূতি প্রসূত' বলে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি এ-ও বলেছেন, 'আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক' ; তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়গত।' জীবনানন্দ নিজেও বিভিন্ন সময়ে—তাঁর চিঠি-পত্রে, প্রবন্ধে—স্বীকার করেছেন কবিতা রচনার ক্ষেত্রে আবেগ ও কল্পনার প্রাধান্যের কথা। বুদ্ধি দিয়ে কবিতা লেখার ব্যাপারটিতে তাঁর আস্থা ছিলো না। এক চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'যখনই ভারাক্রান্ত হই, সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোশাকে ততটা ভেবে নিতে পারি না, যতটা অনুভব করি ; একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি।' এই চিঠিরই আরেক জায়গায় তিনি বলছেন, 'প্রেরণা ছাড়া শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখা কি করে সম্ভব হতে পারে? যদিও কোনো কোনো কবি এর তাগিদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চান, তবুও তাদের ভালো কবিতা পড়ে বোঝা যায় যে তাঁদের আত্মালোচনায় অসম্পূর্ণতা রয়েছে। বুদ্ধিমান—এমনকি জ্ঞানী-বিজ্ঞানী মানুষের পক্ষেও নিছক বিজ্ঞান বা জ্ঞানসত্তার বলে প্রায় mechanically মহৎ কবিতা লেখা সম্ভব নয়।' এ প্রসঙ্গেই কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই আমাদের মনে পড়ে। তিনি কিন্তু কাব্যরচনায় প্রেরণার চাইতে অভিজ্ঞতাকে, অনুভূতির চেয়ে মননকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু যেভাবে জীবনানন্দ দাশের কাব্যকৃতির একটি বিশেষ দিক পর্যালোচনা করেন, সেটি সমালোচক হিসেবে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি গভীর নিষ্ঠা, কাব্যরুচি ও কবিতার প্রতি একাগ্রতার কথা আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করিয়ে দেয়। এই জিনিসটির অভাবেই আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য সেভাবে দাঁড়াতে পারেনি, যতোটা প্রত্যাশিত ছিল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতা ও এ-কাব্যের কবি সম্পর্কে বুদ্ধদেব মন্তব্য করেছেন, 'আমাদের কবিদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সম্বন্ধে—সূক্ষ্ম চেতনা জীবনানন্দের মতো আর কারুরই নেই ; তাঁর রচনায় তত্ত্ব নেই, চিন্তাশীলতা নেই ; কোনো কৃত্রিমতা কি অনুকরণ নেই ; তা স্বতঃস্ফূর্ত, বিশুদ্ধ ও সহজ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি ; তা নিছক কবিতা, কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।' বুদ্ধদেবের এই শনাক্তকরণ যে ভ্রান্তিমূলক ছিলো না, সেইটি এই প্রবন্ধ-রচনার প্রায় সাতবছর বাদে জীবনানন্দের এক বক্তব্য থেকেই স্পষ্টতা পায়। 'কেন লিখি' শীর্ষক এক রচনায় (মাঘ, ১৩৫০) জীবনানন্দ বলছেন, '...কবিতার উপর বাস্তবিক কোনো ভার নেই। কারু নির্দেশ পালন করবার রীতি নেই কবিমানসের ভিতর, কিম্বা তার সৃষ্ট কবিতায়। সৎ কবিতা খোলাখুলিভাবে নয়, কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দ সমগ্রতার উৎকর্ষে শোধিত মানবজীবনের কবিতা।' কবিতা লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে বুদ্ধদেব আর জীবনানন্দ প্রায় একই মনোভাব পোষণ করতেন ; আর সে কারণেও খানিকটা, জীবনানন্দ দাশের কবিতা বিশ্লেষণে বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচক-সুলভ সঠিক নির্দেশনা বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেবের এই আলোচনা তৎকালীন কবি-সমালোচক-পাঠকমহলে জীবনানন্দের কবিতা-সম্পর্কে একটি বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে। কেননা, 'কবিতা' পত্রিকার যে-প্রভাব তৎকালীন সাহিত্যের জগতে ছিল, তাকে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে অতি-তরুণ কবি—কেউই অস্বীকার করতে পারেননি। 'কবিতা' পত্রিকার পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেটি লিখেছিলেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। 'কবিতা' ও 'পরিচয়'-এর মতো দুটি বিখ্যাত পত্রিকায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আলোচনা, আধুনিক সাহিত্যের জগতে জীবনানন্দের প্রবেশকে যেমন সুগম, তেমনি তাঁর অবস্থানকেও 'দৃঢ়' করে তুলতে সাহায্য করেছিলো।

৩.

জীবনানন্দের বিখ্যাত কাব্য 'বনলতা সেন' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে (পৌষ ১৩৪৯)। কবির জনপ্রিয়তার নেপথ্যে এই কাব্যটির প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না। এখনও পর্যন্ত কারো-কারো কাছে তিনি শুধুই 'বনলতা সেন'-এর কবি ! কবির জীবদ্দশায় কেবলমাত্র এই গ্রন্থটিরই দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো। বুদ্ধদেব বসু পূর্বের মতো এই কাব্যপাঠেও তাঁর মুগ্ধময় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩৪৯) তাঁর সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পাঠ করে বুদ্ধদেব যেমন জীবনানন্দকে 'প্রকৃতির কবি' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, তেমনি 'বনলতা সেন' পাঠ করে তাঁকে আধুনিক কবিদের মধ্যে 'সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করলেন। বুদ্ধদেব কথিত এই 'নির্জনতম' অভিধা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলো, এবং এ-ও সত্য যে তিনি শুধুই 'নির্জনতম' কবি নন। বুদ্ধদেব বসুও সম্ভবত ব্যক্তি-জীবনানন্দের দিকে তাকিয়ে এই কথাটি বলেছিলেন। আবার এ-ও ঠিক যে, 'সবচেয়ে স্বতন্ত্রে'র স্বীকৃতি জীবনানন্দকে সাহসী করে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু-ই।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং তাঁর কবি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু যে মনোভাব পোষণ করতেন, 'বনলতা সেন'-পর্যায়ে এসে সেই মনোভাবই আরও দৃঢ়তর হয়েছে ; সমালোচকের উচ্ছ্বাসও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সঙ্গে গোপন থাকেনি। কাব্যালোচনায় ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস অনেক সময়ই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। অথচ আমরা বিস্মিতভাবে লক্ষ করি, বুদ্ধদেবের এই উচ্ছ্বাস সে-ক্ষেত্রে এক বিরল ব্যতিক্রম। জীবনানন্দ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলছেন, 'তিনি একে স্বভাব-লাজুক তায় মফঃস্বলবাসী—এইসব কারণে আমাদের সাহিত্য রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে তিনি সম্প্রতি যেন খানিকটা দূরে সরে গিয়েছেন। ...অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০-পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা হতেই পারে না।' বুদ্ধদেবের মন্তব্যের শেষ বাক্যটি পাঠ করে মনে হয়, যেন কোনো সমালোচক নয়, একজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা এটি বলছেন। সমালোচকও যে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সাহায্য নিয়ে নিজেকে 'ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা'য় কখনো-কখনো রূপান্তর করতে পারেন, বুদ্ধদেব বসু নিজে তার উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রইলেন। কবিতা আদতে অনুভবের জিনিস, বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কবিতার গঠন-কৌশল ধরা পড়লেও, তার ভেতরের সারবত্তা অনেকাংশে অস্পষ্টই থেকেই যায়। এ-ব্যাপারটি বুদ্ধদেবও স্বীকার করেছেন। সেজন্যে বলছেন, 'জীবনানন্দের কবিতার যেটি সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য বলে আমার মনে হয় সেটি—একটি সুর, আর কিছু না। তার বর্ণনা কেমন করে দেবো?' সুরের অসাধারণত্ব জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্য, সেটি ঠিকই বলেছেন বুদ্ধদেব। কবি-ভেদে এই সুরও আলাদা-আলাদা। শুধু জীবনানন্দেরই নন, তিরিশের আরো কয়েকজন কবির কবিতা সুরের নিজস্বতায় পাঠককে মুগ্ধ করে। বুদ্ধদেবের মতে, জীবনানন্দের কবিতার সুর এতটাই আলাদা ও অভিনব যে 'একবার কানে লাগলে তাকে...ভোলা শক্ত'। সমালোচকের এই মতামতের ভিতর আবেগের আতিশয্যতা কিংবা অত্যুক্তি যে নেই, নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা তার কিছুটা প্রমাণ পেতে পারি—

শিরীষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে,
পিপুলের ভরা বুকে চিল নেমে এসেছে এখন ;
বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরে মায়ের আবেগে
করুণ হয়েছে ঝাউবন।

নদীর উজ্জ্বল জল কোরালের মতো কলরবে
ভেসে নারকোলবনে কেড়ে নেয় কোরালীর ভ্রূণ ;
বিকেল বলেছে এই নদীটিকে : 'শান্ত হতে হবে—'
অকূল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ

হয়ে আছে। তার মুখ মনে পড়ে এ-রকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে ; চারিদিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো ; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

(শিরীষের ডালপালা : বনলতা সেন)

এই কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকে শেষ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত একটানা সুরের আশ্চর্য অমোঘতায় পাঠককে অন্তঃনিবিষ্ট হতেই হয়। 'অকূল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তিকল্যাণ/হয়ে আছে'—এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকায় (পৌষ, ১৩৬১) জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে বলেছিলেন, 'বিকেলের আলোর স্বচ্ছ গভীরতায়,—শুধু বাইরের প্রকৃতি নয়, আমাদের হৃদয় সুদ্ধ ডুবে গেলো শুধু একটা 'মাইল' শব্দ আছে বলে।' আরেকটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়ে তিনি এ-ও বলেন, 'দৃশ্যটিকে 'এক মাইলের' মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে ব'লেই এখানে অসীমের আভাস লাগলো।' কোনো সমালোচকের কাছ থেকেই একজন কবি সম্বন্ধে এর চেয়ে মুগ্ধ-প্রতিক্রিয়া বোধ হয় আশা করা যায় না।

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব প্রচলিত সমালোচনার রীতি-পদ্ধতি মেনে নিয়েই 'মূল কথা' বলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন, 'জীবনানন্দ সম্বন্ধে মূল কথা আমি যেটা বলতে চাই সেটা এই যে তিনিই বোধ হয় আমাদের একমাত্র কবি যিনি আজকের দিনেও কবিত্ব করতে ভয় পান না। তাঁর এই নির্লজ্জ উদাস কবিত্বকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি।' 'উদাস কবিত্ব' বলতে বুদ্ধদেব সম্ভবত জীবনানন্দের রোমান্টিক কবি-ধর্মকেই বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী একজন আধুনিক কবির রোমান্টিক ধর্মকে বুদ্ধদেব যেভাবে স্বাগত করলেন, সেটি আমাদের খানিকটা চমকিত করে বৈ কি ! কিন্তু বুদ্ধদেবের কাছে জীবনানন্দের এই রোমান্টিকতা প্রচলিত-পন্থার রোমান্টিকতার প্রায় বিপরীত বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। এছাড়া বুদ্ধদেবও স্বীকার করেছিলেন যে, রোমান্টিকতার প্রতিই তাঁর দারুণ পক্ষপাত। কেন? না, তিনি বিশ্বাস করতেন রোমান্টিকতা 'শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি।' ফরাসি কবি বোঁদলেয়ারের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলছেন, 'তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার করে নেয়—শুধু ইস্ত্রি করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ; তার মধ্যে যা-কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়—সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা।' জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব এই কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা এমন অকপটে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, ১৯৪০ সালে বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে 'কবিতা ভবন' থেকে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামে যে সংকলন গ্রন্থটি (প্রথম পর্যায়ে সম্পাদক ছিলেন যৌথভাবে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) প্রকাশিত হয়, সেখানে জীবনানন্দের চারটি কবিতা অন্তর্ভূত হয়। কবিতা চারটি হচ্ছে—'পাখিরা', 'শকুন', 'বনলতা সেন' ও 'নগ্ন নির্জন হাত'। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪ সালে এটি বুদ্ধদেব বসুর হাতে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ; 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র সেই সংস্করণে জীবনানন্দ দাশের ষোলোটি কবিতা অন্তর্ভূত হয়। তথ্যটি উল্লেখ করবার কারণ আর কিছুই নয়, এর মাধ্যমে বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ-মুগ্ধতাকে আরো খানিকটা স্পষ্টভাবে দেখে নেয়া।

৪.

জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী' গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে (১৩৫১)। কবির লেখা 'ভূমিকা' থেকে জানতে পারি এই গ্রন্থের কবিতাগুলো '১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮-এর ভিতর রচিত হয়েছিল'। 'মহাপৃথিবী'র ছত্রিশটি কবিতার মধ্যে বারোটি কবিতা পূর্ববর্তী 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। সে কারণেই সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুর কাছে মনে হয়েছিলো, এই কাব্যে 'কোনো নতুন সুর লাগেনি ; বস্তুত এই বই ভিন্ন নামে 'বনলতা সেনে'রই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।' বুদ্ধদেবের 'মহাপৃথিবী'র এই সমালোচনাটি প্রকাশিত হয় 'কবিতা' পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩৫১)। দেখা যায়, এ-সময় থেকেই বুদ্ধদেব বসুর মন থেকে জীবনানন্দ-মুগ্ধতা যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেটে-কেটে যাচ্ছে। 'মহাপৃথিবী'র 'আট বছর আগের একদিন'—একমাত্র এই কবিতাটিরই প্রশংসা করেছিলেন বুদ্ধদেব। তিনি লিখছেন, 'এ-বইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'আট বছর আগের একদিন', যেটি প্রথম বেরিয়েছিলো...'কবিতা'-য়। সে-সময়ে কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সে-মুগ্ধতা আজো ফিকে হয়নি। লাশ-কাটা ঘরের... বর্ণনাকে অভিনব বিষয়বস্তু হিসেবেই কাব্যক্ষেত্রে টেনে আনা হয়নি ; আত্মঘাতী মৃতদেহকে অবলম্বন করে গ'ড়ে উঠেছে জীবনানন্দীয় কল্পনার পরিমণ্ডল। কবিতাটি বীভৎস হতে পারতো কিন্তু হয়নি ; লাশ-কাটা ঘর থেকে স্বপ্নলোক পর্যন্ত একটি চন্দ্রালোকিত বঙ্কিম পথ কবি এঁকে দিয়েছেন।' 'আট বছর আগের একদিন' 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিলো চৈত্র, ১৩৪৪ সালে। এই কবিতাটির সূত্র ধরেই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'র কবি হিসেবে জীবনানন্দকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। এই ধরনের চিহ্নিতকরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। 'পূর্বাশা' পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩৫৩) তিনি লিখলেন, 'আত্মঘাতী ক্লান্তি আমার কবিতার প্রধান আবহাওয়া নয়, কোনোদিনই ছিল বলে মনে পড়ে না।' জীবনানন্দ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে, 'কবিতাটি Subjective নয়, একটা dramatic representation মাত্র। ... Hamlet বা Lear বা Macbeth-এর 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'র সঙ্গে শেক্‌সপীয়ারের যা সম্পর্ক, ও কবিতার ক্লান্তির সঙ্গে লেখকের সম্পর্কটুকুও সেইরকম। কবিতাটিতে Subjective note শেষের দিকে ফুটেছে ; কিন্তু সে তো লাশকাটা ঘরের ক্লান্তির বাইরে—অনেক দূরে—প্রকৃতির প্রাচুর্য ও ইতিহাসের প্রাণশক্তির সঙ্গে একাত্ম করে রেখেছে কবি।' জীবনানন্দ যে Subjective note-এর কথা বলেছেন, সেটি এই কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে এ-রকমভাবে—

> তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
> থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
> চোখ পালটায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
> চমৎকার !
> ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—'
>
> হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
> আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি
> ক'রে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার ;
> আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।
> (আট বছর আগের একদিন : মহাপৃথিবী)

এই কবিতায় 'আমি'র ব্যবহার করা নিয়ে জীবনানন্দ লিখছেন, 'আধুনিক কবিতায় যে 'আমি'র ব্যবহার করা হয় ... সে 'আমি' যে কবির নিজের ব্যক্তিগত সত্তা মোটেই নয়, কবিমানসের কাছে সমাজ ও কালের রূপ যে ভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভূ সত্তা ...।' নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মন্তব্য জীবনানন্দ দাশের কবিতার বিশেষ প্রবণতার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু 'মহাপৃথিবী'র আলোচনায় যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, সেইটি একজন কবির কবিতার পর্ব-পর্বান্তরের সঙ্গে বিশেষভাবেজড়িত ; যার কথা আমরা আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম। এই কাব্যের 'সিন্ধু-সারস' (দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি হে সিন্ধুসারস), 'মনোবীজ' (জামিরের ঘন বন ওইখানে রচেছিলো কারা?), 'বিভিন্ন কোরাস' (আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে) প্রভৃতি কবিতাকে বুদ্ধদেব 'চিত্তহারী'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর এটিও মনে হয়েছে, এইসব কবিতায় জীবনানন্দ তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যের কবিতাগুলোরই যেন 'পুনরুক্তি' করেছেন। বুদ্ধদেব এই প্রথম জীবনানন্দের সৃষ্টিশীলতার সচলতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইলেন। তিনি এই কবিতাগুলো সম্বন্ধে বলছেন, 'সেখানে দেখতে পাই যে যা ছিলো ভঙ্গি, তা হয়েছে মুদ্রাদোষ, যা ছিলো অনন্যতা, তা হয়েছে কেন্দ্রচ্যুতি।' এ-আলোচনার শেষের দিকে তিনি একে 'পুনরুক্তি' না বলে জীবনানন্দের নিজেরই 'অনুকৃতি' বলতে চেয়েছেন। এবং এ-'অনুকৃতি' প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন, 'কোনো কবি যখন নিজের অনুকরণ করেন তখন দেবতারা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।' 'বনলতা সেন'-পরবর্তী সময় থেকে জীবনানন্দের কাব্যপ্রবণতার পরিবর্তন ঘটছিলো ধীরে ধীরে। 'মহাপৃথিবী'তে সেটি খানিকটা আঁচ করা গেলেও 'সাতটি তারার তিমির' (১৩৫৫, ১৯৪৮) এবং তারও পরবর্তী-পর্যায়ের কবিতায় তা স্পষ্টত বোঝা যায়। জীবনানন্দের সেই প্রস্তুতি চলছিলো 'মহাপৃথিবী'র সময় থেকেই। এইটি বুদ্ধদেব বসু ঠিক অনুধাবন করতে সক্ষম হননি বলেই আমাদের ধারণা। কেননা, এই সময় জীবনানন্দের কবিতায় সমাজ-চেতনা ও ইতিহাস-চেতনা—দু'য়েরই নতুন পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য কিন্তু ব্যাপারটি ঠিকই শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে, এই সময় থেকেই কবির মনে 'ইতিহাসে, জীবন-বোধে, সমাজ-বোধে, নরনারীর সম্পর্কে আলো প্রবেশ করতে শুরু করে।' এবং এরই প্রতিক্রিয়া 'তিমির বিনাশী' পর্যায়ের পারিপার্শ্বিক চেতনার কবিতাগুলো লিখিত হয়েছে। বুদ্ধদেব ব্যক্তিগত অসূয়াবশত 'মহাপৃথিবী'র আলোচনায় জীবনানন্দের 'পুনরুক্তি'র সমালোচনা করেছিলেন, এটি ভাবা হয়তো সঙ্গত হবে না ; কেননা, 'সিন্ধু-সারস', 'মনোবীজ', 'বিভিন্ন কোরাস' প্রভৃতি কবিতাগুলো বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পত্রিকাতেই কিন্তু প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। তবে, তাঁর বক্তব্যের কঠোরতায় জীবনানন্দ দাশ নিঃসন্দেহে মর্মাহত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের এই আলোচনার বছর দু'য়েক বাদে তাঁর কবিতার জনৈক অনুরাগীকে (ভূমেন্দ্র গুহ-র মাধ্যমে আমরা এখন জানতে পারছি, এই অনুরাগীর নাম : প্রভাকর সেন) লেখা পত্রে জীবনানন্দ বলছেন, 'প্রথমেই 'কল্লোলে' কবিতা ছাপিয়েছি বল্লে ঠিক হবে না ; কিন্তু 'কল্লোলে'ই প্রথম কবিতা ছাপিয়ে ভালো লেগেছিল। ... 'কল্লোল', 'কালিকলম' ক্রমেই বিস্ত্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল।' এরপর তিনি আরো লিখছেন, 'বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসু'র কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয় ; স্পষ্টতাসম্ভবা তারা ; অতএব সাহস ও সততা দেখবার সুযোগ লাভ ক'রে চরিতার্থ হলাম—বুদ্ধদেব বাবুর বিচারশক্তির ও হৃদয়বুদ্ধির ; আমার কবিতার জন্য বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি' তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিকে।' জীবনানন্দের বিমর্ষতাবোধ ও দীর্ঘশ্বাস আর গোপন থাকে না, যখন তিনি লিখলেন, 'বনলতা সেন'-এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর (বুদ্ধদেব বসু) পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।' এই চিঠিতে তারিখ দেওয়া আছে : ২/৭/৪৬ (আষাঢ় ১৩৫৩)।

৫.

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যের কোনো আলোচনা বুদ্ধদেব বসু করেননি। তবে এই কাব্যেরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা যেমন, 'তিমির হননের গান', 'রাত্রি', 'মকর সংক্রান্তির রাতে', 'স্বভাব', 'সমারূঢ়' প্রভৃতি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো ; এখানে অন্তত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেবের উদারতার প্রশংসা করতেই হয়। তারপরও আমরা আশ্চর্য হই এ-জন্যে যে, ঠিক এই সময়েই বুদ্ধদেব 'কবিতা' পত্রিকায় 'সম্পাদকীয়'তে লিখছেন (আশ্বিন, ১৩৫৩) ; 'দেশে আজ সাহিত্যিক দল বলে কিছু নেই, লেখার আবহাওয়া তাই চ'লে গেছে। তার বদলে আছে পোলিটিকাল পার্টি : দল কথাটা শুনে শিউরে উঠতেন, এমন লোকও আত্মনিয়োগ করেছেন পার্টির পরিচর্যায়। ... শুধু নবীনদের কথাই বা বলি কেন। যাঁরা প্রবীণ, আমাদের আধুনিক সাহিত্যে অগ্রগণ্য তারাই অনেকে সংক্রমিত, উদ্‌ভ্রান্ত, ধর্মচ্যুত।' এইটুকু বলবার পরে বুদ্ধদেব তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লিখলেন, 'জীবনানন্দ দাশ কী লিখছেন আজকাল? এ প্রশ্ন সাধারণভাবে সাধারণ পাঠক করতে পারেন, আমরা তাঁর ভক্ত বলে বিশেষভাবে করতে পারি। অন্যদের বাদ দিয়ে বেছে-বেছে তাঁরই নাম করলুম এই কারণে যে উদাহরণ হিসেবে তিনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন। জীবনানন্দ দাশ আমাদের নির্জনতম স্বভাবের কবি। এই নির্জনতার বিশিষ্টতাই তাঁর প্রাক্তন রচনাকে দীপ্যমান করেছিল। মনে-মনে এখনো তিনি নির্জনের নির্ঝর, তাঁর চিত্ততন্ত্রী এখনো স্বপ্নের অনুকম্পায়ী। কিন্তু পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিস্ট, কুখ্যাত আইভরি টাওঅরের নির্লজ্জ অধিবাসী, সেইজন্য ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত ক'রে তিনি এইটেই প্রমাণ করবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন যে তিনি 'পেছিয়ে' পড়েননি। করুণ দৃশ্য, এবং শোচনীয়। এর ফলে তাঁর প্রতিশ্রুত ভক্তের চক্ষেও তাঁর কবিতার সম্মুখীন হওয়া সহজ আর নেই।'

এই উদ্ধৃতাংশের শেষের বাক্যটি বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করলে মনে হতে পারে, বুদ্ধদেব বোধ করি জীবনানন্দের কবিতায় দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তুলছেন, কিন্তু বিষয়টি তা নয় ; বুদ্ধদেবই ব্যাপারটি খোলাসা করে বলছেন, 'দুর্বোধ্য বলে আপত্তি নয়, নিঃসুর বলে আপত্তি, নিঃস্বাদ বলে।' 'সাতটি তারার তিমির' কিংবা তার পরবর্তী পর্যায়ের কবিতাকে বুদ্ধদেব যতই 'নিঃসুর' কিংবা 'নিঃস্বাদ' বলে আপত্তি করুন-না কেন, চল্লিশের দশকের কিংবা তারও পরবর্তী সময়ের কবি, সমালোচক, পাঠকের কাছে ঐ মন্তব্য সর্বাংশে গৃহীত হয়নি। জীবনানন্দের কবিতায় পরিব্যাপ্ত সুরের অনুরণন কখনোই তার পূর্বের চরিত্র বদলায়নি, যাকে একসময় বুদ্ধদেবও প্রশংসার চোখে দেখেছিলেন। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্য থেকে একটি কবিতার খানিকটা উদ্ধৃত করছি—

> বাতাসে ধর্মের কল ন'ড়ে ওঠে—ন'ড়ে চলে ধীরে।
> সূর্যসাগরতীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে
> কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হ'ল রক্তে—উপেক্ষায় ;
> বুকের সন্তান তবু নবীন সংকল্পে আজো আসে।
> সূর্যের সোনালী রশ্মি, বোলতার স্ফটিক পাখনা
> ... ...
> যে সারস-দম্পতির চোখে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো নদী এসে
> ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বে—হয়তো বা
> ফেলেছিলো সৃষ্টির আগাগোড়া শপথ হারিয়ে
> যে বাতাস সারাদিন খেলা করে অরণ্যের রঙে,
> যে বনানী সুর পায়,—
>
> (মনোসরণি)

এই কবিতার ভঙ্গি, বক্তব্য সবকিছুই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কিংবা 'বনলতা সেন' কাব্য থেকে আলাদা ; কিন্তু একে কি বলা যাবে, 'নিঃসুর' অথবা 'নিঃস্বাদ'। বুদ্ধদেব মূলত কবিতা রচনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক চেতনাকে সবসময়ই অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। ফলে, জীবনানন্দ দাশ যখন সমাজ, ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিক চেতনাকে কবিতায় শিল্পিতভাবে নিয়ে এলেন, তখন তাকে তিনি প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু পারিপার্শ্বিক চেতনাকে কাজে লাগিয়েও যে শিল্প-সার্থক কবিতা রচনা করে যেতে পারে, সেইটি বুদ্ধদেব তলিয়ে দেখতে চাইলেন না ; ব্যাপারটি খানিকটা দুর্ভাগ্যজনকই বলা যায়। কবিতা, একজন কবির অভিজ্ঞতারই শিল্পিত ফসল। আর কবি তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকৃতি, মানুষ থেকে শুরু করে ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি নানা উৎস থেকেই আহরণ করতে পারেন। এখানে বিচার্য হচ্ছে, কবি-রচিত কবিতাটি 'কবিতা' হয়ে উঠছে কিনা ; সমালোচকের দায়িত্ব সেইটুকু পর্যবেক্ষণ করা, বিশ্লেষণ করা—এর বেশি কিছু নয়। অবশ্য, বুদ্ধদেব বসু তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে কখনোই ঠিক সরে আসেননি। জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পরে 'কবিতা' পত্রিকার 'জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা'য় তিনি যে প্রবন্ধটি লেখেন (যেখানে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ ও কাব্যবিশ্লেষণ—দুই-ই ছিলো, সেখানেও দেখা যায়, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কিংবা 'বনলতা সেন'-এ পর্যায়ের কবিতা-গুলোরই উদাহরণ নানাভাবে দিয়েছেন, তাদের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন ; সেইসব কবিতার দ্যোতনাময়তাকে স্বীকার করেছেন। জীবনানন্দের অন্তিম-পর্যায়ের কবিতা নিয়ে তাঁর নিশ্চুপতা কিংবা অনাগ্রহ আজীবনই অক্ষুণ্ণ ছিলো। 'কবিতা' পত্রিকার ঐ 'স্মৃতি-সংখ্যা'তেও তিনি এই বলে তাঁর প্রবন্ধের সমাপ্তি টানেন : 'আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণীয় যে, 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধি'র মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।' অর্থাৎ জীবনানন্দ যে এই আধুনিক যুগে বসবাস করেও 'নির্জনতম কবি', 'প্রকৃতির কবি'—সেই দিকেই আবারও ইঙ্গিত প্রদান করলেন বুদ্ধদেব বসু। শুধু একজন কবির নিজেরই পর্ব-পর্বান্তর নয়, সেইসঙ্গে সমসাময়িক সমালোচকের রুচিরও সচলতা যে কতোটা জরুরি, বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্তের 'অনড়তা' আমাদের সেইদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সঙ্গে রুচির সমগ্রতায় কাব্যবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাও নিবিড়ভাবে অনুভূত হয়।

ক. সহায়ক গ্রন্থ :

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), 'জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত' ১৯৯৭।
২. বুদ্ধদেব বসু, 'প্রবন্ধ-সংকলন', ১৯৯১।
৩. মীনাক্ষী দত্ত সংকলিত 'বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা' ১-৩ খণ্ড।
৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) 'কেন লিখি' (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, ২০০০)।

খ. পত্র-পত্রিকা :

১. 'কবিতা : জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা' (সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু), পৌষ ১৩৬১।
২. ময়ূখ : জীবনানন্দ-স্মৃতিসংখ্যা (পরিবর্ধিত সংস্করণ, ভূমেন্দ্র গুহ সম্পা.) ২০০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কাব্যলোক : বর্ণ ও গন্ধ

আলম হায়দার

কবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ—বোধগম্যতার উর্ধ্বে এক ধরনের ভালোলাগা। দুর্বোধ্যতার সঙ্গে এই ভালোলাগা'র অভাবের জন্য আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকগণ এক বিরক্তিকর সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেও জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রে সূত্রটি প্রযোজ্য হয়নি। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় তাঁর কবিতার মূল বক্তব্যে উপনীত হ'তে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয় অথচ তিনিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। বস্তুত অস্পষ্টতা এবং ইন্দ্রিয়ঘন নিসর্গ চেতনাই তাঁর কাব্য সৌন্দর্যের এবং পাঠকপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি যে রহস্যময় ও অনুভবের জগতের কথা বলেন তা আমাদের কাছে অপরিচিত এবং আমরা সহজে এর ধরন বুঝতে না পারলেও এর মন্ময় আবেদন দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করে। ত্রিশোত্তর আধুনিক বাঙালি কবিদের অনিকেত জীবনবোধ প্রকাশের ক্ষেত্রে জীবনানন্দের কবিতাকে এই মন্ময়, রহস্যময় এবং অনুভবের জগতে উত্তীর্ণ করেছে তাঁর কাব্যে বর্ণ এবং গন্ধের স্বকীয় এবং বৈচিত্র্যময় ব্যবহার।

অভিজ্ঞতার বিকাশের সাথে সাথে তাঁর অজস্রমুখী বর্ণচেতনা ক্রমশ লক্ষ্যাভিসারী সংহতির দিকে এগিয়েছে এবং রূপদৃষ্টি ভাবের জগতে মন্ময় স্পর্শ রেখে গেছে। তাছাড়া বর্ণের অসংখ্য তারতম্যকে পৃথক পৃথক শব্দে নির্দেশ করা অসম্ভব বলে তিনি নানান বর্ণকে বিভিন্ন অনুষঙ্গ ও উপমা প্রতীকে চিত্রিত করে অনুভবগ্রাহ্য করেছিলেন। আমাদের ভাষায় মূল কয়েকটি বর্ণের নাম আছে মাত্র। কিন্তু প্রত্যক্ষদৃষ্ট যে কোনো একটি রঙের নির্দিষ্ট ছায়া-প্রচ্ছায়াটি যদি ভাষার মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলতে হয় তাহলে উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা জুটবে না এবং যদিওবা কিছু থেকেও থাকে তা চিত্রশিল্পীমহলেরই দখলে, সাধারণ লোক তা জানে না। জীবনানন্দকে এই দৈন্য পূরণ করতে হয়েছিল প্রাকৃতিক নানান বর্ণের উপমা এবং বিশেষণের যোগে। এ কারণে বর্ণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবি অপেক্ষা চিত্রশিল্পীর সুবিধা প্রচুর। একটি রঙের সাথে অপর একটি রঙের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি তৃতীয়মাত্রিক একটি রঙ তৈরি করতে পারেন। এভাবে রঙের হাজারো রকম উপ-রঙ তৈরি করতে তাঁর কোনো মানা নেই। অথচ সুবিধেটা হচ্ছে এইখানে যে—এই অসংখ্য উপ-রঙগুলোর নাম তাকে উল্লেখ করতে হয় না। পারিভাষিক শব্দের অভাবের জন্য কবি যখন নীলাভ, সোনালি, লালাভ, হলুদাভ ইত্যাদি বলার পর আর কোনো উপ-রঙের নাম খুঁজে পান না তখন তিনি বর্ণের যথার্থ রঙ ফুটিয়ে তোলার জন্য নিসর্গকেই নিসর্গের উপমায় ভূষিত করেন : 'ক্ষীরের মতন ফুল', 'সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু', 'খইরঙা হাঁস', 'থোড়ের মতো শাদা ভিজে হাত', 'মেঘের মতো চুল'—এখানে ফুল, লিচু, হাঁস, হাত এবং চুলের যথার্থ বর্ণকে পরিস্ফুট করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য ক্ষীর, সিঁদুর, খই, থোড় এবং মেঘের রঙের উপমার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। পদ্ধতিটি জীবনানন্দের কাব্যকে অপূর্ব লাবণ্য দান করেছে।

বর্ণের সাথে ঘ্রাণের সহযোগী এবং পরিপূরক ব্যবহার জীবনানন্দের চিত্রধর্মী কাব্য-চেতনাকে জীবন্ত এবং সচল করে তুলেছে :

"নরম ধানের গন্ধ-কলমীর মৃদুঘ্রাণ/হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের মৃদু ঘ্রাণ/কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত/কিশোরের পায়ে দলা মুথা ঘাস—লাল লাল বটের ফলের ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নিরবতা"—রূপসী বাংলার এই অংশটিকে যদি কোনো ক্যানভাসে তুলে ধরা যায় তাহলে ধান, কলমী, শর, জল, সরপুঁটি, হাত, বটফল ইত্যাদি তাদের পরিবেশগত ও বর্ণগত সামঞ্জস্য রক্ষা করে হয়তো সঠিকভাবে ফুটে উঠবে ; কিন্তু ধানের নরম গন্ধ, কলমীর ঘ্রাণ, চাঁদা সরপুঁটিদের মৃদু ঘ্রাণের অনুভব অন্যের অনুভবে অঙ্কিত চিত্রের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া অসম্ভব।

চিত্ররূপময় তাঁর কাব্যের বেশিরভাগ ঘ্রাণই অপরিচিত অনুভবের : দূরের নদীর ঘ্রাণ, শিশিরের ঘ্রাণ, স্বপ্নের গন্ধ, পরন কথার গন্ধ, বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণ, বেদনার গন্ধ, আদিম রাত্রির ঘ্রাণ, সিন্ধুর ফেনার গন্ধ, শিকারির শরীরের ঘ্রাণ, মমির ঘ্রাণ ইত্যাদি। এইসব গন্ধ অনুভবের কোনো ইন্দ্রিয়সাক্ষিক অভিজ্ঞতা আমাদের সাধারণ মানুষের নেই—কারণ এরা ইন্দ্রিয়জ নয়, মনোজ। অগত্যা এরা আমাদেরকে ভাবায়, অর্থ উদ্ধারের চেষ্টায় নিয়োজিত হবার পূর্বেই আমরা বারবার সেখানে ফিরে যাই—চিত্তবৃত্তির স্বেচ্ছাচারকে ভালোবাসি। অনুভবযোগ্য গন্ধেরাও আমাদের ইন্দ্রিয়কে আলো-আঁধারির গোলক ধাঁধায় দীর্ঘক্ষণ আলোড়িত করে রাখে : নদীর জলের গন্ধ, ফেন্‌সা ভাতের গন্ধ, বটফলের গন্ধ, মৌরির গন্ধ, কলমীর গন্ধ, কাঁচা বাতাবীর মৃদু গন্ধ, সবুজ ঘাসের সুঘ্রাণ, শিশুর মুখের গন্ধ, চালধোয়া গন্ধ, রূপসীর চুলের স্নিগ্ধ গন্ধ, ইন্দুরের শরীরের গন্ধ, নষ্ট শশার গন্ধ, শ্মশানের চন্দন কাঠের চিতার গন্ধ ইত্যাদি পড়ার সাথে সাথে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও আজন্ম পরিচয় সূত্রে জেগে উঠে।

২.

একথা ঠিক যে তাঁর সময়ে আর পাঁচজন কবির মতো তিনি মিশুক ছিলেন না এবং সাধারণ সংসারী লোকজনের মতো সামাজিকও ছিলেন না। এর অর্থ এই যে, নিঃসঙ্গ একাকী মানুষের মতো জীবনানন্দও তাঁর নিজস্ব একটি জগৎ গড়ে তুলেছিলেন। সেই জগৎ যেমন তাঁর ব্যক্তিজীবনে তেমনি তাঁর কবি জীবনেরও এক নিজস্ব পৃথিবী ; কবি মানসের শুদ্ধতম প্রক্রিয়ার পথে প্রকৃতি ও নৈঃসঙ্গ তাঁর অস্তিত্বের সাথে মিশে ছিল। নির্জনতা নির্মাণ করেছে তাঁর ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভব, আর তা আবর্তিত হয়েছে নিসর্গকে কেন্দ্র করে। জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনা, সময়চেতনা, জীবনভাবনা, ক্লান্তিচেতনা ইত্যাদি যাবতীয় অনুভবগুলো নিবিড়ভাবে প্রকৃতিলগ্ন। প্রকৃতি তাঁর কাব্যে ছবির আকারে পরিস্ফুট।—এই ছবি কখনো উজ্জ্বল, কখনো আলো-ছায়াময় কখনোবা অস্পষ্ট। ছবির দৃশ্যগত তারতম্যের প্রধান কারণ—ছবি আঁকার প্রধান উপকরণ 'রঙের' ব্যবহার।

জীবনানন্দের কবিতা পাঠে আমাদের এই ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, তিনি রঙ দিয়ে কবিমানসকে সাজিয়েছেন না কবিমানসকে রঙের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছেন? আসলে তাঁর কাব্যভাবনা এবং বর্ণচেতনা পরস্পর পরিপূরক। তাঁর বর্ণেরা প্রতিভাময় ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত—যাকে বলা যায় নিস্পৃহসুন্দর। বহুমাত্রিক ব্যবহারের ফলে বিচিত্র অর্থময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যঞ্জনায় বিধৃত প্রতিটি বর্ণেরই রয়েছে অসংখ্য প্রকরণ। বর্ণের একই রূপ কখনো বিপরীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কাব্যে :

ধূসর

জীবনানন্দ 'ধূসর' বর্ণের কবি, 'ধূসরতার কবি' ইত্যাদি অভিধায় বাংলা কাব্য সমালোচনায় যে বিতর্ক রয়েছে সে ব্যাপারে আমরা তৃতীয় অভিমতের উল্লেখ করতে চাই। কেউ বলেছেন তিনি ধূসরতার কবি, কেউ বলেছেন তাঁর কাব্যে ধূসরতার চেয়ে বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের প্রভাব অনেক বেশি। বস্তুত জীবনানন্দের কাব্যে 'ধূসর' শব্দের অর্থদ্যোতনার সঠিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। 'ধূসর'কে আসলেই তিনি বর্ণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন কিনা তাও বিবেচ্য। জীবনানন্দ বীক্ষার অনেকটা পথ পার হয়ে এসে আমরা এই সিদ্ধান্তে হয়তো উপনীত হতে পারি যে, জীবনানন্দের কাব্যে 'ধূসর' বা 'ধূসরতা' কোনো বর্ণের নাম নয়, একটি জীবনানন্দীয় কল্পনাস্তরের স্বরূপ। প্রচলিত সামাজিক জীবনে অনভ্যস্ত জীবনানন্দ তাঁর শূন্যতাময় অথচ স্বপ্নিল অনুভবকে এই 'ধূসর' শব্দটি দিয়ে প্রতিবিম্বিত করেছেন। এই বিশেষ মানসিক অবস্থার প্রভাব জীবনানন্দের সমগ্র বর্ণের উপর সাবলীলভাবে পড়েছে। 'ধূসর' শব্দটি যে সমস্ত বিষয়ের অনুসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তাদের বস্তুগত অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে আমরাও এক রোমান্টিক অনুভবের রাজ্যে আত্মসমর্পন করি : 'ধূসর মৃত্যুর মুখ', 'পেঁচার ধূসর ডানা', 'ধূসর কড়ির মতো হাত', 'বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর কপাট', 'বালিকার ধূসর রূপ', 'আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তি', 'নেউল ধূসর নদী', 'ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখ', অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি, ধূসর নদীর দেয়াল, ধূসর বাড়ী, ধুসরিম মহিলার নিকট সন্নত ইত্যাদি।

নির্বস্তুক বিষয়ের অনুষঙ্গে ধূসর : ধূসর স্বপ্নের দেশ, ধূসর সন্ধ্যা, ধূসর বাতাস, ধূসর আলো, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, আর্কিন ধূসর পাণ্ডুলিপি, ধূসর আকাশ, নদী আর মানুষের বিবর্ণ ধূসর হৃদয়, তুষার ধূসর মুখ ইত্যাদি।

'ধূসর' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে পোড়া, ম্লান, অসুস্থ, ফ্যাকাশে, পাণ্ডুর, বিবর্ণ, মলিন ইত্যাদি শব্দসমূহ : পোড়া জমি, অসুস্থ রক্ত, ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদ। পাণ্ডুর পাতা, মলিন পাখনা, পাণ্ডুর চাঁদ, বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ, রোগা শালিকের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো সূর্যের আলো ইত্যাদি।

শাদা

'শাদা' রঙ জীবনানন্দের কাব্যে বিশেষ ঐশ্বর্যমণ্ডিত। শাদা বলতেই যে সনাতন 'শ্বেত পদ্মের' উপমা, তা এখানে সমূলে দূরীভূত। জীবনানন্দের কাব্যে এই রঙটির হাত ধরে আমরা চলে যাই দূর অতীতে, শত শত বৎসর আগেকার প্রাচীন বাংলায়—যেখানে 'এক শঙ্খ বালিকা' ছিল, যার 'থোড়ের মতন ভিজে শাদা হাত', ক্ষিরের মতো মৃদুদেহ', যার 'ধবধবে বুকে সাপিনীর মতো দাঁত উঠেছে রেঙে' এবং 'রূপার মত চুল'।

জীবনানন্দের কাব্যে শাদা বর্ণ রোমান্টিক স্মৃতিচারণায় সমৃদ্ধ এবং বেশিরভাগ সময়েই তা বিষাদ, বিষণ্ণতাকে অতিক্রম করে গেছে। এই বর্ণটিও তাঁর কাব্যে অন্যান্য বর্ণের মতোই বহুবিধ ব্যঞ্জনায় বিধৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ অর্থে, 'প্রতীকী ব্যঞ্জনা যেখানে প্রমূর্ত নয়, সেসব স্থানেও 'শাদা'–দৃষ্টি অসম্ভব মনোহর : 'শাদা লঘু মেঘ বকের পাখার মতো', 'বক বধূটির মতো কুয়াশায় শাদা ডানা উড়ে যায় তার', 'চড়ায়ের শাদা ডিম মাঠের ভিতর', 'শাদা মেঘের পাহাড়', 'শাদা ছেঁড়া পাল', 'বরফের মতো শাদা ডানা', 'শাদা মাটির কঙ্কাল', 'সাগরের বড়ো শাদা পাখি', 'মালয় সমুদ্র পারে সে এক বন্দর আছে শ্বেতঙ্গিনীদের', 'শাদা পাখিদেরও স্খলন আছে', 'দুধের মতন শাদা পাখির জগৎ', 'ঘাসের ভিতর শাদা নীলফুল ফুটে হেমন্ত রাগে' ইত্যাদি।

এই শ্বেত বর্ণই আবার রোমান্টিক উপমা এবং পজেটিভ আইডিয়ার সহযোগে আমাদেরকে এক অপরিচিত জগতের বিস্ময়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় : 'আতার ক্ষীরের মতো সোহাগ', 'কাঁচের কড়ির মতন শিশিরের জল', 'বাসমতী চালে ধোয়া ভেজা শাদা হাত', 'কড়ির মতন শাদা পাহাড়', 'থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাত', 'চাল ধোয়া স্নিগ্ধ হাত', 'পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী', 'শুভ্র মানবিকতার ভোর', 'পৃথিবীর প্রতিভা হয়ে আকাশের মতো এক শুভ্রতায় নেমে/ নিজেকে মিলাতে চায়', 'শাদা চাদরের মতো বাতাসেরে জড়ালো সে একবার', 'তোমার পালক শাদা আরো শাদা হয়ে অমেয় নীলিমায় ঐ পৃথিবীর সাটিন পরা দীর্ঘ গড়ন নারীর মতো', 'শঙ্খমালা কাঁথা' ইত্যাদি।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে জীবনানন্দের কাব্যে একই বর্ণ বিপরীতার্থক দ্যোতনা জ্ঞাপকও বটে : 'চাঁদের চুন চোখ', 'কাফন ঢাঁকা বালু', 'বিধবা তারা', 'মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন', 'নষ্ট শাদা শসা', 'ভিজে শাদা হাত', 'চন্দন চিতা', 'কড়ির মতন শাদা মুখ', 'স্তন : তার করুণ শঙ্খের মতো দুধে আদ্র' 'শাদা রঙের সরোজিনীর মুখ, 'সময় এখন শাদা জলের বদলে বোন ভায়ের/ নিয়ত বিপন্ন রক্ত রোজ/ মানুষকে দিয়ে যায়' ইত্যাদি।

জীবনানন্দের কাব্যে শাদা বর্ণের একটি বিশেষ প্রকরণের নাম 'ফেনা' বা 'ফেনিল'। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অনিকেত অস্তিত্বকে অনুভব করেছেন : 'ফেনাময় সুরাপাত্র', 'ফেনার সেমিজ', 'ফেনার মত ঠাণ্ডা শাদা', 'ঢেউয়ের ফেনার মতো ক্লান্ত', 'ফেনানো পিরামিড', 'সমুদ্রের জলে ফেনার মতো ভাসি শীত রাতে', 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন', 'ফেনিল শব্দ তিলোত্তমা নগরীর গায়ে' ইত্যাদি।

জীবনানন্দের কাব্যে শাদা বর্ণের উজ্জ্বল সমান্তরাল রূপের নাম 'রূপালী'। এই বর্ণটি গ্লানিহীন, বিষণ্ণতাহীন এবং বিষাদমুক্ত অনুভবের ব্যঞ্জনায় বিধৃত : 'রূপালী চাঁদ', 'রূপার মত চুল', 'রূপালী বৃষ্টির জল', 'রূপালী মাছের কণ্ঠে কামনার স্বর'। 'আকাশের রূপালী শস্য'। 'নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা রাত', 'রূপালী জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শরের ভিতর', 'জ্যোৎস্নার নদীতে এক রাজহাঁস রুপোলী ঢেউয়ের পথ ধরে চলিতেছে ভেসে' ইত্যাদি।

লাল

জীবনানন্দের কাব্যে 'লাল' রঙ কয়েকটি অর্থজ্ঞাপক। সমসাময়িক অথবা ঐতিহাসিক নিধনযজ্ঞের প্রেক্ষিতে এবং দ্বন্দ্বময় মানস–যন্ত্রণাসংকুল অবস্থায় লাল রঙে ব্যক্ত হয়েছে তীব্র ক্ষোভের অনুভূতি। আবার উজ্জ্বল বর্ণ হিসেবে 'লাল' কখনো রোমান্টিক আকুলতার আকাঙ্খাকে ব্যঞ্জিত করেছে।

লাল যখন অম্লান ও স্বপ্নিল অনুভবসূচক : 'ডালিম ফুলের মতো রক্তিম আবেশ', 'লাল আলেয়া', 'লাল শাক–ছাওয়া মাঠ', 'রোদে লাল দিন/ রোদে লাল', 'রোদের নরম রং শিশুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গালের মত লাল', 'কিশোরীর লাল পাড়', 'কিশোরীর লাল পা', 'কামরাঙা লাল মেঘ', 'বুকে তার লাল পেড়ে ভিজে শাড়ি', 'বিকেলের রক্তিল বিন্যাস', 'নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মত লাল', 'গালিচায় রক্তাভ রোদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ', 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ'। 'বিকেলের লাল মেঘ', 'টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়', 'পুকুরের লাল সর' ইত্যাদি।

'লাল'—যখন গ্লানি এবং বিক্ষত মানসিকতার সহযোগী : 'রক্তের মতন অশ্রু', 'স্বপ্নে যেই রক্তাক্ততা আছে, আরক্তিম হাঙ্গর', 'উষ্ণ লাল হরিণের মাংস', 'রক্তফেনামুখো মড়কের ইঁদুরের মত ঘাড় গুঁজি', 'থ্যাঁতা ইঁদুরের মত রক্তমাখা ঠোঁট', 'মানুষ কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত', 'চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম চিতা জ্বলে', 'দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল' ইত্যাদি।

'লাল' বর্ণের বিশিষ্ট প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'রাঙা' শব্দটি এবং কখনো কখনো হিঙুল, পিঙল, লোহিত, কুমকুম এবং জাফরানেরও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এরা প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়ের সতেজ ও মথিত আবেগকে নির্মাণ করেছে। জীবনানন্দের কাব্যের প্রথম ভাগে বিশেষ করে 'ঝরাপালকে' (১৩৩৪) সত্যেন্দ্রনাথ—নজরুলের কিঞ্চিত প্রভাব থাকায় রাঙা শব্দটি তিনি আরবী–ফারসী শব্দের আবহে ব্যবহার করেছেন : 'স্বপন আবেশে রাঙা আঁখি', 'রাঙা নার্গিস', 'শরাব নেশায় রাঙিয়ে দিল আঁখি', 'রাঙা আপেলের মতো লাল গাল', 'চাঁদের রাঙা কপোল', 'রাতের ডাগর রঙিন আঁখি', 'নটকান রাঙা মেঘ', 'রাঙা রৌদ্র', 'সূর্যের রাঙা ঘোড়া', 'মাছরাঙা ঝিলমিল', 'নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ', 'অপরাহ্নের রাঙারোদ', 'নাটার মতো রাঙা মেঘ', 'সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু', 'রাঙা রাজকন্যা', 'রাঙা শার্টিনের মেঘ', 'রঙিন সাপ', 'রাঙা মেঘ', 'রঙিন তুলো', 'অল্পায়ু রঙিন রৌদ্র', 'ঘিয়ের রঙিন শাড়ি' এবং 'হিঙুল মেঘ', 'পিঙল আঁখি', 'লোহিত কপোল', 'কুমকুম রাঙা গাল', 'হেমন্ত সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্য' ইত্যাদি।

উজ্জ্বল বর্ণ হিসেবে লাল রঙের পাশাপাশি জীবনানন্দ দাশ সোনালী রঙ ব্যবহার করেছেন। 'সোনালী' বর্ণ দিয়ে জীবনানন্দ কখনো 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ'র স্মৃতিতে নিমগ্ন হয়েছেন, কখনোবা নিসর্গের উপর এর মনোরম আভা আরোপ করেছেন : 'পশ্চিমের মেঘের সোনেলা আলো', 'সোনালী খড়', 'সোনালী চিল', 'সোনার মতো সন্ধ্যা', 'সোনালি চিলের ডানা', 'রোদের সুচিকন চুল', 'সোনালি চিলের বুক', 'সূর্যের সোনার বর্শা', 'সোনালী রোদের ঢেও', 'সোনার ডিমের মতো ফাল্গুনের চাঁদ', 'শীতের সোনালী জরির কাজ', 'সূর্য যেন সোনালী চুলে ধর্মযাজিকার চোখ', 'সোনার বলের মতো সূর্য ছিল পুবের আকাশে', 'সোনালী চোখ', 'পাখির সোনালী চোখ', 'সোনার মতন সূর্য', 'সোনালী প্রেমের গল্প' ইত্যাদি।

কমলা ও গোলাপী

বর্ণের মহিমায় জীবনানন্দের কাব্যে 'কমলা' এবং 'গোলাপী' রঙের অবস্থান লাল এবং সোনালীর পাশাপাশি। কিন্তু লাল এবং সোনালীর মতো তীব্রতা এর মধ্যে নেই। এই বর্ণটি অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ—চোখে ধাঁধা না লাগিয়ে বরং আমাদেরকে মিষ্টি এবং সুন্দর আবেশে সম্মোহিত করে : 'আকাশে কমলা রঙ ফুটে উঠে সন্ধ্যায়', 'কমলা রঙের রোদ', 'অঘ্রাণের বিকেলের কমলা আলোক', 'কমলা রঙের মেঘ' ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীল

নিজস্ব নামে জীবনানন্দের কাব্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে নীল বর্ণ। 'নীল' ফুটিয়ে তুলেছে তাঁর মানস দ্বন্দ্ব এবং শুভ ও কল্যাণকামী বোধ। দৃশ্যগত বস্তুর আপন রূপকে ভুলে গিয়ে তিনি এই বর্ণটিকে সেখানে প্রতিস্থাপন করেছেন এবং এই প্রতিস্থাপনের প্রয়োগ অন্যান্য বর্ণের চেয়ে 'নীলে'র বেলায় একটু বেশি বলেই মনে হয়। অনুভবগত বিষয়ের অনুষঙ্গেও 'নীল'র ব্যবহারে জীবনানন্দ আধুনিক-মননের পরিচয় দিয়েছেন।

সাধারণ অর্থে বস্তুগত বিষয়ের অনুষঙ্গে 'নীলে'র ব্যবহার : নীল বাতায়ন, নীল নিচোল, নীল জানালা, উলঙ্গ নীল তরঙ্গ, নীল আকরি, নীল দরিয়া, নীল পৃথিবী, নীল আকাশের স্বাদ, নীল আকাশ, গাঢ় নীল অমাবস্যা, কার্তিকের নীল কুয়াশা, নীল বক, গাঢ় নীল সুপুরির বন, নীল বাংলার ঘাস, কাকগুলো নীল মনে হয়, নীল মঠ, নীল ধোঁয়া, বাংলার নীল সন্ধ্যা, নক্ষত্রের নীল ফুল, নীল জামবুল নীড়, নীলম্বরী নীল ভোমরা, নীল তেতুলের বন, হিজল বট আর তমালের নীল ছায়া, অকৃত্রিম নীল আলো, নীল মশার মৌন আকাঙ্খা, নীল সমুদ্রের নীড়, শিঙের মতো বাঁকা নীল চাঁদ, শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার, নীল মদের গেলাস, সমুদ্রের নীল মরুভূমি, নীল আভার পাহাড় ইত্যাদি।

নির্বস্তুক অনুভবের অনুষঙ্গে 'নীল' রঙ : মৌন নীলের ইসারা, নীল মায়াবীর রাঙা মুখ, নীল স্বপ্ন, নীল হাওয়ার সমুদ্র, সমুদ্রের নীল মরুভূমি নীলিমায় লীন, মানুষের সব গুণ শান্ত নীলিমার মত ভালো, আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে ইত্যাদি।

আধুনিক মননজাত যন্ত্রণাসঙ্কুল দ্বন্দ্বময় মানসিকতার অনুষঙ্গে 'নীল' : নীল নাভিশ্বাস, নীল মৃত্যু, প্রবল নীল অত্যাচার, জীবনের মতো নীল, যত নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেছে রৌদ্রের আকাশে, চারিদিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি ইত্যাদি।

রোমান্টিক এবং ভয়াল উপমার অনুষঙ্গে 'নীল' : অপরাজিতার মত নীল আকাশ, নীল কস্তুরী আভার চাঁদ, কেউটের মতো নীলা ইত্যাদি।

অপরাপর মায়াবী বিষয়ের অনুষঙ্গে 'নীল' : বেগুনী নীল প্রজাপতি, ম্লান নীল রূপের কুয়াশা, নীল হাওয়ার সমুদ্র শাদা বকের মতো উড়ছে, ময়ূরের সবুজ নীল ডানা, মেঘম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো, সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়ালো কবে যেন, শ্যামল নীল ব্যথা ইত্যাদি।

জীবনানন্দীয় বিশেষ স্বপ্নিল পটভূমিতে আমরা নীল বর্ণের অপর একটি মাত্রার ব্যবহার লক্ষ করি, তার নাম 'নীলাভ' : নীলাভ আকাশ, বাতাসে নীলাভ হয়ে আসে প্রান্তরের ঘাস, বিরাট নীলাভ খোঁপা, গভীর নীলাভতম ইচ্ছা, বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ, নীলাভ জলের রোদ, তাদের চোখের রং অনন্ত আকৃতি পায় নীলাভ আকাশে, নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িঙের হৃদয়ের মতো নীরবতা ইত্যাদি।

সবুজ

জীবনানন্দ বলেছেন, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/ খুঁজিতে যাই না আর।' বাংলার নদী-মাঠ ক্ষেতের ভালবাসায় নিমগ্ন ছিল তাঁর শান্ত সৌম্য নির্জন হৃদয়। এই নিসর্গের রূপ তাঁকে সম্মোহিত করেছিল। বাংলার নিসর্গ রূপ যে সবুজ নিবিড় সবুজ একথা বলাই বাহুল্য। এই বর্ণটির মাঝে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন শান্তি এবং সান্ত্বনা। জীবনানন্দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যে 'সবুজ' বর্ণ জাতিস্মর-স্মৃতি, সমসাময়িকবোধ এবং পূর্ণজন্মকে সজীব করে তুলেছে। এই বর্ণটি দিয়ে তিনি সব ক্লান্ত বেদনাকে ঢেকে দিতে চেয়েছেন। সবুজ বর্ণের অনুষঙ্গে তিনি প্রায়ই একটি বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন তার নাম 'ঘাস'। ঘাসের মধ্যে তিনি কখনো মাতৃত্বকেও আরোপ করেছেন। বস্তুত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও ঘাস ছিল আন্তরিক বন্ধুর মতো। জীবনানন্দ প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করেছেন—'ঘাস আমি দেখিয়াছি'। অনেক সময় বিপরীত রূপের ক্যানভাসেও তিনি এই বর্ণটি আরোপ করে ভালবাসায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন।

অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের অনুষঙ্গে সবুজ : সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা, জীবন সবুজ হয়ে ফলে, দেখেছি সবুজ ঘাস যতদূর দেখা যেতে পারে, অপরাহ্নের রাঙা রোদের সবুজ আভা, 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সবচেয়ে সুন্দর করুণ/সেখানে সবুজ ডাঙ্গা ভ'রে আছে মধুকুশী ঘাসে', 'এখানে সবুজ শাখা আঁকাবাঁকা-হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে', 'সবুজ ঘাসের দেশ যখন চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর', 'পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ', 'কালো হ্রদ ঘিরে ফুটে আছে সবুজ সিঙ্গারা'।

আবহমান গ্রাম-বাংলার লোকজীবনের বিলুপ্ত ঐতিহ্য এবং জাতিস্মর চিন্তনের অনুসঙ্গে 'সবুজ' : 'হয়তো তাহারা আমাদেরি মতো মধু উৎসবে উঠিত মেতে/চাঁদের আলোয় চাঁদমারী জুড়ে সবুজ চরায়',—'একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলায় জেগেছিল', 'ঐখানে একজন শুয়ে আছে/গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িঙ/আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ' ইত্যাদি।

ঘাসের অনুসঙ্গে 'সবুজ' : খাঁচার শুকের মতো গাহিতেছে গান/কোন এক রাজকন্যা—পরনে ঘাসের শাড়ি', 'ঘাসের প্রকাশ আমি দেখিয়াছি' '.../—পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনারে ঢেকে আছে', 'ঘাসের আঁচলে/ফড়িঙের মতো আমি বেড়িয়েছি', 'কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ', 'ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে জন্মাই কোন এক নিবিড় ঘাস—মাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে', 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস/অথবা সবুজ বুঝি ঘাস', 'সুরঞ্জনা তোমার হৃদয় আজ ঘাস', 'কোথাও সবুজ ঘাস আমাদের রাখিবে ঢেকে' ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং কল্পনাসম্ভব বিষয়ের অনুষঙ্গে 'সবুজ' : সবুজ অন্ধকার, সবুজ জল, ঝিঝির সবুজ মাংস, কচি লেবু পাতার মতো সবুজ আলোয় পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা, সবুজ বাতাস ইত্যাদি।

প্রাণিজগতের চিরন্তন জৈবমুদ্রার অনুষঙ্গে সবুজ : জীর্ণতম সমাধির ইঁট অসম্ভব পরগাছা ঘেঁষে সবুজ সোনালি চোখ ঝিঁঝি—দম্পতির ক্ষুধা আবিষ্কার করে।

সবুজ বিলীন হয়ে যায় বলে তাঁর বেদনার শেষ নেই : 'যে পাতা সবুজ ছিল তবুও হলুদ হতে হয়। সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা সব।'

সবুজ বর্ণকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎমুখী তথা জন্মান্তর সম্বন্ধীয় জীবনানন্দীয় অভিজ্ঞান : 'মনে হয় যেন কোন হরিতের নব হরিতের/সংগীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানুষের ভায়া/এ জন্মের আরো দূর জন্ম-জন্মান্তরের মুখোমুখি ফিরে এসে/অনাদি আলোর ভালোবাসা/সামাজিক অন্তহীন আকাশের নীচে/জ্বালিয়ে শ্যামল নীল ব্যথা হতে চায়'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলুদ

'ধূসর'-এর পর 'হলুদ' বর্ণের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ আপন অস্তিত্বের অনুসন্ধান করেছেন। হলুদ হেমন্তের রঙ। এ সময় গাছের পাতার সবুজ নষ্ট হয়ে যায় এবং শীতে ঝরে যাবার অপেক্ষায় দিন গোনে। মাঠে ফসল থাকে না। শর-কাশ-হোগ্‌লার মতো নদীও যেন হলুদ হয়ে যায়। এদেশে প্রকৃতি তার বৃদ্ধ ঐশ্বর্যকে নিবেদন করেছেন হেমন্তের কাছে। আর জীবনানন্দ নিজস্ব রোমান্টিক শূন্যতাবোধের সাথে আবিষ্কার করলেন এই ঋতুটির অন্তর্লীন সৌন্দর্য। হেমন্তের অনুষঙ্গ ছাড়াও জীবনানন্দের হতাশাময় ও রোমান্টিক বিবিধ অনুভবও হলুদ হয়েছে। হলুদের মধ্যে তিনি যেমন মৃত্যুর ছায়া দেখেছেন তেমনি হলুদের মাঝে বাঙালি নারীর আটপৌরে লাবণ্যকেও পর্যবেক্ষণ করেছেন। যে শালিক মরে যায় হেমন্ত—সন্ধ্যায় : শিশির ভেজা ঘাসে তার উর্ধ্বমুখী ঠ্যাং দেখে, তিনি যেমন হৃদয়ে বেদনা অনুভব করেছেন—তেমনি যে শালিকেরা হলুদ ঠ্যাং নিয়ে উঠান ডলেছিল অথবা সজনের ডালে, পাতার ছায়ায় নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল শান্ত-সৌম্য হৃদয়ে, সেই দৃশ্যও দেখেছেন। হলুদ ছিল জীবনানন্দের হৃদয়ের রঙ। হলুদের মধ্যে তাঁর বিহার ছিল স্বচ্ছন্দ।

সময়ের আপেক্ষিকতায় জীবনবোধের অনুষঙ্গে হলুদ : 'হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াউড়ি/কবরের থেকে শুধু আকাঙ্খার ভুত লয়ে খেলা', 'হেমন্ত আসেনি মাঠে, হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়ের বন', 'বনের পাতার মতো কুয়াশায় হলুদ না হতে/হেমন্ত আসার আগে হীম হয়ে পড়ে গেছি ঝরে', 'হলুদ ঘাসের কাছে হিম প্রজাপতিটির/সুন্দর করুন পাখা পড়ে আছে', 'আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল/ইতস্তত চলে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধ্যানে', 'হিজল গাছে জামের বনে হলুদ পাখির মতো/কে যে কোথায় কার হৃদয়ে কখন আঘাত করে', হলুদ পাতার ভিড়ে বসে/শিশির পালক ঘ'ষে ঘ'ষে/পাখার ছায়ায় ছায়া ঢেকে/ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে দেখে/মেঘে চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে/জাগে একা অঘ্রাণের রাতে সেই পাখি'—এ পাখি জীবনানন্দের ক্ষুধিত হৃদয়।

সমার্থক অনুভবকে রূপায়িত করার জন্য জীবনানন্দ দাশ প্রতিশব্দ হিসেবে 'বাসি', 'বিবর্ণ', 'অসুস্থ', 'বাদামী', 'পান্ডুর', 'বিশুষ্ক' এবং কখনোবা 'শুকনো' শব্দ ব্যবহার করেছেন : 'বাসি পাতা ভূতের মতন উড়ে আসে', 'অসুস্থ পাতার মতো ঢুলে তার মন থেকে পড়ে যাবে খসে (আলো)',—'তবু রক্তে তার রবে অসুস্থতা', 'জানিবনা কতকাল উঠানে ঝরিবে এই হলুদ বাদামী/পাতাগুলো মাদারের-ডুমুরের', 'বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ', 'বিবর্ণ বাদামী পাখি', 'মানুষের ইতিহাস-বিবর্ণ হৃদয়', 'চিনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস' ইত্যাদি।

২.

সকল বর্ণের উৎসই সূর্য—এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবীর মহান শিল্পীদের কাছে সূর্য, আলো, রোদ্দুর পরম সত্য এবং মঙ্গলময় হিসেবে দেখা দিয়েছে। পরমের অভীপ্সায় তাঁরা বারবার সূর্যালোকের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন। জীবনসায়াহ্নে গ্যয়টে তাঁর অন্তিম সংলাপ উচ্চারণ করেছিলেন : 'আরো আলো'। যাবার বেলায় পৃথিবীকে কোনো দার্শনিক বাণী শোনাবার জন্যে একথা উচ্চারণ করেননি তিনি। গৃহভৃত্যকে ঐ কথাটি বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঘরের জানালার পাল্লাটা খুলে দিতে, যাতে আলো ঘরে আসে। তবুও ঐ আটপৌরে কথাটা যে পৃথিবীর বুকে গভীর বাণীর প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল তার কারণ সম্ভবত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটাই এবং তা এই যে, পৃথিবী ও মনুষ্য সভ্যতা চিরদিনই আলোর কাঙাল। আর হয়তো সেই কারণেই পৃথিবীর মহৎ প্রাণদের নিকটে আলো চিরকালের বাঞ্ছিত। আলোর গান, আলোর স্তব, আলোর পিপাসা ও আলোকহীনতার প্রতি অনীহা পৃথিবীর প্রায় সকল মহত্তম কবিরই চরিত্র লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ আপন শৈশবের কথা বহুবার বলেছেন, যে শৈশবে তিনি অন্ধকার রাত্রির শেষে উদীয়মান নবীন সূর্যকে আপন চেতনায় প্রতিদিন জাগ্রত করতেন। রবীন্দ্রনাথ সূর্যের প্রথম প্রকাশকে দৃষ্টিগোচর করেছেন তাঁর পরিচিত পৃথিবীর পরিমণ্ডলে। প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে তিনি অনাদিকালের অস্পষ্ট বার্তা শুনেছেন। এমনকি বোদলেয়ার, যিনি কবিতার ফুল তুলতে নেমে যান আকণ্ঠ পঙ্কে, যাঁর কবিতার প্রধান চরিত্রেরা হলো বেশ্যা, রোগী, মাতাল, বন্দী, পশু, বৃদ্ধ, ভাঁড়, উন্মাদ নারী এবং প্রধান প্রতীকেরা হল শব, কফিন, কবর, কঙ্কাল, ডাইনী, পিশাচী ও অন্ধকার, সেই তিনিও সূর্যের উপাসক।

জীবনানন্দ দাশ কেবল অন্ধকারের, বিষাদের, শূণ্যতার, নির্জনতার, বিদ্রূপের এবং বিতৃষ্ণার কবিই নন। জীবনানন্দ আলোরও কবি। তাঁর কবিতায় রৌদ্রের অফুরন্ত উৎসব। তাঁর কবিতার কথা বলতে গিয়ে অমিয় চক্রবর্তী যখন জানান, "যখনই জীবনানন্দের কোনো কবিতা পড়েছি মনে হয়েছে স্নিগ্ধ রোদ্দুরে আপ্লুত" তখন তা বিশ্বাসযোগ্য মনে করার কারণ আছে, কেননা অজস্র উপাদান—উপকরণ কবি নিজেই জড়িয়ে রেখে গেছেন তাঁর রচনায়। আলো, রোদ, সূর্য, নীলিমা, জ্যোস্না, সকাল, বিকেল, রাত্রি, অস্ত ও উদয়ের উল্লেখ বারে বারে প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায়, পংক্তিতে পংক্তিতে। তাঁর একাধিক কবিতার নামকরণেও রয়েছে সূর্য অথবা আলো অথবা আকাশ অথবা রাত্রির উল্লেখ : আকাশলীনা, গোধূলী সন্ধির নৃত্য, অস্ত সূর্যের গান, তিমির হননের গান, আলোপৃথিবী, সূর্যতামসী, দীপ্তি, সূর্যপ্রতিম, সূর্যসাগর তীরে, উদয়াস্ত, সূর্য নক্ষত্র নারী, পৃথিবী রোদ্রে, সূর্য রাত্রি নক্ষত্র, জয় জয়ন্তীর সূর্য, পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে, মহা গোধুলী ইত্যাদি। "এইখানে সূর্যের"—এই একটি মাত্র কবিতাতেই আলো শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে ১২ বার, উজ্জ্বলতা ৩ বার, আলোক ১বার, আভা ১ বার, নক্ষত্র ৩ বার, ভোর ২ বার, প্রদীপ ১ বার, আগুন ১ বার, ভাস্বরতা ১ বার, জ্যোৎস্না ১ বার এবং সকাল ১ বার।

আকাশ এবং আলো এবং সূর্যালোককে তিনি যে তপোবনের ঋষির মতো এমন সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে দেখবেন, মাখবেন সেটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না যখন তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী আমাদের জানিয়ে দেয় : "প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে পিতার উপনিষদ আবৃত্তি ও মায়ের গান শুনতেন।"[৩] আর বহুরূপে বিচ্ছুরিত এই আলোকে তিনি দেখেছেন বহু বর্ণে। আজকের অসুস্থ পৃথিবীর মানুষের অনিকেত জীবনযাত্রায় জীবনানন্দ একটি পরম কান্তিময় আলোর আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে 'আলোর চুমায় পৃথিবীর জ্বর কমে যায়'। আলোর অভাবে তাঁর বেদনা আরো প্রগাঢ় হয়।

ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী এদুয়ার ম'নে (১৮৩২-৮৩) বলতেন, তাঁর ছবিতে আলোই প্রধান ব্যক্তি। নিজের কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দও একথা বলতে পারতেন। তাঁর কবিতা শুধু "চিত্ররূপময়' তাই নয়, ইম্প্রেশানিস্ট শিল্পীর মতো আলোর রহস্যময় খেলা এখানে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখবার আছে।

নিসর্গ দৃশ্যমাত্রেই আলোর একটি স্থান আছে। ভোর, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, চাঁদনী বা আঁধার রাত, মেঘলা বা বর্ষণ মুখরিত দিন—আলোক সম্পাতে দৃশ্যকে নানারূপ প্রাণবন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'রে তোলা যায়। ইম্প্রেশানিস্ট শিল্পীরা দৃশ্যকে পূর্ণাঙ্গ করতে আলো আঁকেননি—আলোকেই বর্ণনীয় করে তুলতে দৃশ্য এঁকেছেন, যেমন ক্লেদ্ মনে (১৮৪০–১৯২৬) একই দৃশ্য বারবার আঁকতেন শুধু সময়ানুযায়ী আলোর বৈচিত্র্য বোঝাতে।

জীবনানন্দের কবিতায় প্রতিটি নিসর্গদৃশ্যে নানা সময়ের আলোর বর্ণনাই শুধু নেই, আলোর বিন্যাসে দিন-রাত্রির রৌদ্র-জ্যোৎস্নার ক্রমিক অবস্থান্তর ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'সাতটি তারার তিমিরে'র (১৩৫৫) "হাঁস" কবিতায় সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যার নদীর ছবি আশ্চর্য আলোমাখা হয়ে আছে। ভোরে জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধজল, দিনমানে জলের গভীরে শাদা মেঘ, লঘু মেঘের ডুবে যাওয়া, বিকেলে অনেক সময় স্থির থেকে হেমন্তের জল নীল আকাশ বলে প্রতিপন্ন হলো, আবার অপরাহ্ণে খইয়ের রঙের মতো রোদের ঝিলিক ঝরে পড়লো—সব মিলিয়ে আলোর মায়াই দেখতে হবে।

তবু তাঁর কবিতায় আলোর ভূমিকা এতটুকু হলেই উল্লেখযোগ্য হতো না। আরো বড়ো কথা, নিসর্গের আলো ছাড়াও আরো এক নৈসর্গিক আলোর দ্যুতি সেখানে জাদুর মতো কাজ করে যায়। সেই আলো হচ্ছে নির্মল সভ্যতার প্রতীক একটি তত্ত্ববহ শব্দশরীর।

জীবনানন্দের কবিতায় বিকেল, সাঁঝ এবং রাত্রির পটভূমি নির্জন এবং শূন্যতাময়। শাদা-কালো বর্ণ দিয়ে তিনি এই লগ্নাবলীর অনুভবকে সাজিয়েছেন। বিশেষ করে পরিবেশই এই লগ্নসমূহের বর্ণকে নির্দেশ করেছে বিশুদ্ধভাবে।

জীবনানন্দের জীবনবোধের জটিলতা এই আলো অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। বিশেষত কবিজীবনের শেষ পর্বে তাঁর চেতনা যখন সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞ ও সংহত, তখনকার কবিতায় বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ বিলীয়মান। কালো, শাদা-কালো এবং আলো-অন্ধকারই এই সময়কার রূপসজ্জার কাজ করেছে। আমরা আরো একবার বলতে চাই যে জীবনানন্দের কবিতায় প্রত্যেকটি বর্ণই দুইটি অনুভবের অনুষজ্ঞে ব্যবহৃত হয়েছে—আনন্দের এবং বেদনার। জীবনানন্দের কবিতার অস্পষ্টতাকে এই বর্ণগুলি আরো প্রগাঢ় সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। শাদা রঙ জীবনানন্দের চেতনায় যেমন প্রজ্ঞা, সংস্কৃতি, অগ্রগতি, শ্রম এবং জীবনের প্রতীক, তেমনি কালো রং অজ্ঞানতা, সংস্কারাচ্ছন্নতা, হিংসা, হানাহানি এবং মৃত্যুর দ্যোতক। জীবনানন্দের কবিতায় আলো এবং অন্ধকার, শাদা আর কালো মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে দুই বিরোধী শক্তি। শঙ্খ শাদা সাগরই হলো জীবন, রৌদ্রই হলো জীবন, কালের মহাসাগরের রূপই হলো কালো, সেখানে ঘুমিয়ে পড়া মানে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাওয়া। শাদা কালোর এই ধাঁধার মধ্যে জীবনানন্দের বর্ণচেতনার অন্তিম পরিণতি খুঁজে পাওয়া যাবে।

আধুনিক জীবনলব্ধ অবক্ষয়, ভীতি, অসহায়ত্ব, হতাশা, মৃত্যু, গন্তব্যহীন যাত্রা ইত্যাদি সকল প্রকার কল্যাণের প্রতিকূল অনুভবের অনুষঙ্গে 'কালো' : 'শাদা-কালো', এবং 'আলো-অন্ধকার' : 'কঙ্কালের রাশি/দাউ দাউ চিতা/আধো আলো-আধেক আঁধারে/মোর সাথে মোর পিছু চলে এলো তারা', 'অন্ধকারে ইতিহাস পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়/যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই', 'চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড় অলীক প্রয়াণ', 'রাত্রির বর্ণের মতো কালো শিকারী বিড়াল', 'প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লোল সঙ্গীত', 'শাদা কালো রঙ এসে বার বার কেবলি মিশেছে অন্ধকারে', 'সকলেই আজ এই বিকেলের পরে এক তিমির রাত্রির/সমুদ্রের যাত্রির মতোন', 'মৃত্যু আর জীবনের কালো আর শাদা হৃদয়', 'দেখা যায় অবিরল শাদা আর কালো সময়ের ফাঁকে/সৈকত কেবলি দূর সৈকতে ফুরায়',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কৃষ্ণ সূর্য ক্রমেই গভীর হয়', 'দুদিকে ছড়ায়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ', 'আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে', 'এই বিশ শতকে এখন/মানুষের কাছে আলো আর আঁধারের আর এক মানে/যেখানে সূর্যের আলো নক্ষত্র বা প্রদীপের ব্যবহার নেই/সেইখানে অন্ধকার', 'অদ্ভুত এক আঁধার এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা'—ইত্যাদি।

কল্যাণ, সৌন্দর্য এবং সাবজেক্টিভ অনুভবের অনুষঙ্গে 'সন্ধ্যা', 'কালো', 'শাদা-কালো' এবং 'আলো-অন্ধকার' : সুদূর গোধূলি রঙিন জটা', 'মেঘবৌর খোঁপা খসা জ্যোৎস্নাফুল', 'ধূম্র-মৌন সাঁঝ', 'আধারের আলেয়ার আখি', 'দূরে কাছে দেখা যায় পৃথিবীর ধানক্ষেত ঘাস/আবার সন্ধ্যার রঙে ভরে উঠে সকল আকাশ', 'রাত্রিফুলের মতো ঘুমন্ত অন্তর', 'নরম জামের মতো চুল', 'আকন্দ ফুলের কালো ভিমরুল', গোধূলি মদির মেয়ে', 'মেহগনির মতো অন্ধকার', 'চোখ তার হিজল বনের মতো রক্তিম কালো', এ রকম হিরন্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে', 'মানুষের প্রয়াণের পথে অন্ধকার/ক্রমেই আলোর মতো হতে চায়', 'আমরা কি তিমির বিলাসী?/আমরা তো তিমির বিনাশী', 'তোমার মাথার চুলে কেবলি রাত্রির মতো চুল', 'অন্ধকার ভালো বলে শান্ত পৃথিবীর আলো নিভে আসে', 'দিঘির জলের মতো ঠাণ্ডা কালো নিশ্চিন্ত চোখ' ইত্যাদি।

জীবনানন্দের কাব্যে বর্ণচেতনা ক্রমশ একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনার লক্ষ্যাভিমুখী। 'ঝরাপালক' (১৩৩৪), 'ধূসর পান্ডুলিপি' (১৩৪৩), 'রূপসী বাংলা' (১৩৬৪), 'বনলতা সেন' (১৩৪৯) পর্বে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল বর্ণের বিচিত্র সমাহার পরবর্তী 'মহাপৃথিবী' (১৩৫১), 'সাতটি তারার তিমির' (১৩৫৫), 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৩৬৮) পর্যায়ে ধীরে ধীরে বিলীন হ'তে হ'তে সাদা-কালো, আলো-অন্ধকারে রূপ নিয়েছে। অর্থাৎ জাগতিক এবং নৈর্ব্যক্তিক শুভ ও অশুভ বোধে জীবনানন্দের বর্ণচেতনা ক্রমান্বয়ে একটি কাব্যসত্যে পরিণত হয়েছে।

৩.

জীবনানন্দের কাব্যে ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম অথচ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল, সজীব এবং বিস্ময় সঞ্চারী। স্থানিক সীমানা অতিক্রম করে এই ক্ষুদ্র অথচ ঐশ্বর্যবান জগৎটি কখনো দূর পৃথিবীর গন্ধে ভরে দিয়েছে আমাদের বাঙালী মনকে। তার কাব্যে স্বাদের অনুভব, দৃশ্যের অনুভব, স্পর্শের অনুভব, শ্রুতির অনুভবের ন্যায় ঘ্রাণের অনুভবও প্রকৃতি চেতনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাঁর ইন্দ্রিয়ঘন প্রকৃতিচেতনার প্রকাশ ঘ্রাণের অনুভবের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সোচ্চার এবং প্রাণবন্ত। নিসর্গের আকাশ, নদী, উদ্ভিদ, প্রাণী ও অজৈব বিষয়ে এবং ইন্দ্রিয়সচেতন অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত চেতনাকে নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর ঘ্রাণের জগৎ। যদিও জীবনানন্দের পরিণত মানসের কোনো অনুভবের মধ্যেই কৃত্রিমতা নেই; তবু একথা বললে বোধ হয় বেশি বলা হবে না যে, কেবলমাত্র ঘ্রাণের অনুষঙ্গেই তাঁকে 'প্রকৃতির কবি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কোনো বাধা দেখি না। কতরকম উদ্ভিদের ঘ্রাণের কথাই না বলেছেন তিনি : ঘাস, আমের মুকুল, ধান, বটফল, সর্ষে, বাবলা, দারুচিনি, লবঙ্গ, উসীর, চুয়া-চন্দন, অরেঞ্জপিকো, দ্রাক্ষা, গম, কলমী, মাঁদার, ডুমুর, যব, বাতাবী, বাসক, মৌরী, মালতী, লুপ্ত নাসপতি ইত্যাদি। জীবনানন্দের কবিসত্তা এইসবের সাথে নিবিড়ভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। হৃদয়ের গভীর স্তরের বিশ্বাস নিয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলায় জেগেছিল'। বাবলা বনের গন্ধে মাতাল হয়ে কখনো শরতের প্রকৃতির প্রশ্বাসের সাথে তাঁর প্রাণবায়ু মিশে থাকে। কখনো তিনি প্রজাপতি হয়ে 'সোঁদালে সর্ষেক্ষেতে' বিচরণ করেন মনের আনন্দে। আবার সময়ের চাপে বিষণ্ণ হয়ে পড়লে 'মৌরীর গন্ধমাখা ঘাসের শরীরে ক্লান্ত দেহটিরে' রেখে দেন। ঘাস তাঁর শান্ত্বনার সজীব আশ্রয়। তাই ছায়াচ্ছন্নতা নৈঃশব্দ মৃত্যু ক্ষয় ও জরার আক্রমণ থেকে সাময়িক স্বস্তির জন্য হলেও তিনি 'দিগন্ত প্লাবিত বলিয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে', 'বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে' হৃদয় ভরে রাখেন।

এই বাংলার অপরূপ নিসর্গে একঘেয়ে হয়ে নয় বরং তাঁর স্বপ্নবিলাসী মনের জন্যই জীবনানন্দ কোনো এক দূরতম পৃথিবীর প্রকৃতিলোককে আজীবন তাঁর কবিচেতনায় লালন করেছেন। আমরা বিভ্রান্ত হই যখন নির্দিষ্ট করতে পারিনা এই দূরত্বকে। জীবনানন্দের কবিতার অস্পষ্ট সৌন্দর্য এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে তরান্বিত করেছে।

একটি প্রচলিত প্রবাদ—'ধান নদী খাল/এই তিনে বরিশাল'। ধান নদী আর খালে সমৃদ্ধ নিসর্গের পটভূমি জীবনানন্দ ঘ্রাণে আস্বাদন করেছেন। জলের গন্ধ, নদীর গন্ধ, ধানের গন্ধ, শিশিরের আঘ্রাণ তাঁর আনন্দকে, ভাললাগাকে, তাঁর বিষাদকে, বেদনাকে, নির্জণতা ও শূন্যতাবোধকে ঘনঘোর ইন্দ্রিয়স্পর্শী করেছে। আমাদের মনে হয়, বাংলাদেশের বরিশালে জন্ম না হলে জীবনানন্দের কবিচারিত্র্য হয়তোবা অন্যরকম হতো এবং সমসাময়িক বা পরবর্তী প্রজন্ম আধুনিক যুগসঞ্জাত যন্ত্রণা ও হতাশার কোনো বিশুদ্ধ প্রতিভাস না পেয়ে হয়ে যেত আরো আশ্রয়হীন, আরো নিরালম্ব। জীবনানন্দকে ভালবেসে আমরা তাই কখনো বরিশাল প্রেমিক হয়ে যাই। কোলকাতায় একবার বোন সুচরিতাকে লিখেছিলেন "তুমি এখানে কয়েকদিন ছিলে, বেশ বাড়ির atmosphere বোধ করেছিলাম,—বিশেষত সেই অনেকদিন আগের বরিশালের মতন"। একথা ঠিক যে দেশ বিভাগের কিছুকাল পর বরিশাল থেকে সপরিবারে কোলকাতা প্রবাসী জীবনানন্দ বরিশালের 'করুণ সুন্দর' নিসর্গের নষ্টালজিয়ায় আমৃত্যু আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। ফাল্গুনের রাতে ঝাউয়ের পিছনে চাঁদ উঠতে দেখে, নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে আকাশের রূপালী শস্যের ভিতর গা ভাসিয়া দেয়ার মতো অকৃত্রিম বিস্তার ব্যথিত অতীতের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। এখানে 'পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়', 'ঘাসের আঘ্রাণে স্নিগ্ধ হয় সব জল'। যে কন্যা পালঙ্কে না শুয়েও সর্বক্ষণ সজীব এবং অম্লান—'লক্ষীপেঁচা শ্যামা আর শালিকের গানে তার জাগিতেছে প্রাণ/ সারাদিন সারারাত বুকে তার শুপুরির বন'—সেই কন্যার 'হৃদয়ে জলের গন্ধ'। রূপসী বাংলার এ কন্যার স্বরূপ আমরা উদ্ঘাটন করতে পারি না। শুধু জানি এ কন্যা রাজকন্যা এবং তার পরনে ঘাসের শাড়ি।

জীবনানন্দের অস্তিত্বে যে ধারণা সুপ্ত ছিল সম্ভবত তা হচ্ছে এই : প্রকৃতির রাজ্যে ঘাস এবং লতার জন্মের নিয়মে, অঙ্কুরিত বীজ থেকে ফসলের সম্ভাবনার নিয়মে এবং বৃক্ষের জন্মের নিয়মে 'একদিন এই পৃথিবীর পথে আমি ফলিয়াছি'। ফলে রক্ত মাংস সম্পন্ন তাঁর মানবিক দৃষ্টির সামনে ম্লানচুল, নরম শাড়ির শব্দ আর নদীর জলের গন্ধ একাকার হয়ে যায়। গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ তাঁর চোখে মুখে লেগে থাকে। অস্ফুট বৃষ্টির গন্ধে প্রকাণ্ড ময়দান জুড়ে একপাল ভেড়াকে দিগন্তের ওপারের বৃক্ষরাজির মতো স্থির চিত্র বলে মনে হয়। প্রাণী এবং উদ্ভিদজগতের প্রতি এই সমমাত্রিক মূল্যায়ন জীবনানন্দের প্রকৃতি চেতনাকে অনেক বেশি পরিমাণে ইন্দ্রিয়াসক্ত করে তুলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের ঘ্রাণের জগতের একটি বিশিষ্ট অংশ হেমন্ত কেন্দ্রিক। ঘ্রাণের প্রসঙ্গেও যখন পুরানো ক্ষেত, সুপক্ক যব, আমের মুকুল, হলুদ পাতা, পান্ডুর পাতা, শিশির, নতুন বীজ, ফলন্ত ধান এবং নবান্নকে দেখি, তখন বিশুদ্ধ হৈমন্তিক কবির রোমান্টিক এবং পেসিমিস্টিক অনুভবের সাথে আমরা আরেক বারের মতো আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। যদিও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধূসর রঙা আবহের অস্পষ্ট সৌন্দর্য থেকে এই অনুভবটিও বঞ্চিত হয়নি। এখানে 'ফুরানো ক্ষেতের গন্ধে ভাঁড়ার' পূর্ণ হয়েছে। হেমন্তের বিকেলের 'সুপক্ক যবের ঘ্রাণে' যে জীবনের সাধ বোঝে না—একমাত্র সেই পারে আত্মহননকে অবলম্বন করে 'থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে মর্গের গুমোটে পড়ে থাকতে। আমাদের সাদামাটা চোখে হেমন্ত যতই negative idea-র ধারক হোক না কেন চেতনার বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করতে করতে জীবনানন্দ বেঁচে থাকার সপক্ষে সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত থেকেছেন এই ঋতুটির ঐশ্বর্যের কাছে। ঘ্রাণের প্রসঙ্গে একথা অতিমাত্রায় সত্য। আমরা কখনো কি লক্ষ করেছি কিভাবে বারবার ফেনসা ভাতের গন্ধের 'সাথে' আম মুকুলের গন্ধ' মিশে যায়? এভাবে জীবনানন্দ আমাদেরকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সুদূর পুরানো অতীতচারিতায় বাধ্য করেন। যখন দেখি হেমন্ত আসার আগেই আমের কুঁড়িতে বাউল বোলতা, খুনসুড়ির মতো পতঙ্গ ঘ্রাণের আশায় ঢুঁ মেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়—তখন আমরা হেমন্তকে শূন্যতার ঋতু বলবো কোন যুক্তিতে। যখন দেখি কচি নরম ঘাসের গন্ধ আর শিশিরের ঘ্রাণের আস্বাদে পেকে ওঠা ধানের আশায় উজ্জ্বল হয় কৃষকের চোখ তখন এই বোধ মনে জাগে যে বাংলাকাব্যে গত কয়েক যুগ ধরে হেমন্ত আসলেই একটি জনপ্রিয় ঋতু। এই জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ জীবনানন্দের কাব্যপ্রয়াস। নতুন বীজের গন্ধে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়, কারণ একদিন এর থেকে শূন্যমাঠে ফসল ফলবে। আবার সেই ফলন্ত ফসলের গন্ধে-রঙে স্বাদে আমাদের সকলের দেহ-মন ভ'রে যাবে। তারপর আবার শূন্যমাঠ আবার নবান্নের ঘ্রাণ। জীবনানন্দ এই একটিমাত্র ঋতুর মধ্যেই বিভিন্ন পরিক্রমায় বিচিত্র প্রবহমান বৃত্ত তৈরী করেছেন।

ঘ্রাণের প্রসঙ্গেও জীবনানন্দের কাব্যে কখনো কখনো বিষণ্নতা, নৈঃশব্দ্য, মৃত্যু ও জরার অবগুণ্ঠিত ভাবনাকে লক্ষ করা যায়। জীবনের সজীবতার এই বিপরীত অনুভব কখনোবা হেমন্তের ক্ষণস্থায়িত্বের জন্যও সৃষ্টি হয়েছে। সহসা সচেতন হয়ে যখন তাঁর মনে হয় 'ধানের ক্ষেতের গন্ধ মুছে গেছে কবে/জীবনের থেকে যেন' এই ভাবনায় তাঁর হৃদয় যেমন শূন্যতায় ভরে ওঠে তেমনি' আমি চলে যাব বলে/চালতাফুল কি আর ভিজিবেনা শিশিরের জলে/নরম গন্ধের ঢেউয়ে'—জীবন থেকে নিঃশব্দে বিদায়ের এই অনুভবেও তাঁর হৃদয় বেদনায় আপ্লুত হয়ে যায়। বস্তুত জীবনানন্দ হেমন্তের মধ্যে জীবনেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন, বিশেষ করে চারিত্র্য এবং স্থায়িত্বের দিক থেকে। তাই তাঁর কেবলই আশঙ্কা হয় 'বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ শিশিরের ঘ্রাণ/কখন মরণ আসে কেবা জানে' এবং 'তোমার আলোয় আজ শিশিরের বুকে যেই ঘ্রাণ/রহিবে না কাল তার কোন স্বাদ/—কোন নিশ্চয়তা/পান্ডুর পাতায় রঙ গালে,—তবু রক্তে তার রবে অসুস্থতা'। এই হেমন্তেই একদিকে শিশিরভেজা বাতাবী লেবুর সুবাসিত ঘ্রাণে যেমন ভরে যায় 'বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের প্রান্তর', অন্যদিকে তেমনি' হলুদ পাতার গন্ধে ভরে ওঠে অবিচল শালিখের মন'। তাই পরিপূর্ণ হেমন্তেও তাঁর প্রশ্ন জাগে 'বাদামী পাতার ঘ্রাণ ভালো না কি?' এই হেমন্তেই তিনি হরিতকী—শাখাদের নিচে 'নৃমুন্ডের আবছায়া' আর নিস্তব্ধতার মতো ভৌতিক পরিবেশে 'বাদামী পাতার ঘ্রাণ' পান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.

ধান, নদী, জল, শূন্য মাঠ—এদের পাশাপাশি জীবনানন্দ একই পটভূমির বৃক্ষলতা, ঘাস, ফুল-ফলের আঘ্রাণেও মোহিত হয়েছেন। বলেছেন 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে সবচেয়ে সুন্দর করুণ : 'যেখানে সবুজ ডাঙ্গা ভ'রে আছে মধুকুপী ঘাসে অবিরল/ সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল'। এই পর্যায়ে জীবনানন্দের দৃশ্যের অনুভব, ঘ্রাণের অনুভব কখনোবা সাধের অনুভবও মিলেমিশে এক হয়ে আছে। কখনো তাঁর চোখে ভেসে ওঠে নিদ্রাহীন, অশ্রুহীন, প্রশ্নহীন বটফলগন্ধ—মাথা ঘাস। জীবনের ভঙ্গুর স্থায়িত্বের দিকে তাকিয়ে যখন মনে হয় 'এই সোঁদা ঘাসের ধুলায়/ জীবন কাটায়েছি এই বাংলায়' তখন বেদনায় হৃদয় রিণরিণ করে ওঠে। যখন 'কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ/ হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে' দেখি—তখনই ঘ্রাণের সাথে সৌন্দর্যময় প্রাকৃত-দৃশ্যের এবং সাধের অনুভূতি এক হয়ে যায়। এখানে বাতাবীর গন্ধ ঘাসের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ঘাসের ঐশ্বর্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এভাবে কখনো তিনি ফুলের ঘ্রাণকে নারীর মধ্যে বিতরণ করে তার ঐশ্বর্যকেও সমৃদ্ধ করেছেন। নজরুল বলেছেন পৃথিবীর মহান এবং কল্যাণকর সৃষ্টির অর্ধেক নারীর, অর্ধেক নরের শ্রমফসল। নজরুলের এই মূল্যায়নের পেছনে ছিল অবহেলিত নারী সমাজের প্রতি সমসাময়িক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। জীবনানন্দও রাজনীতি-সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনীতিবোধ সমসাময়িকতাকে অতিক্রম করে বিশ্বজনীন চেতনায় কালস্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। নারী এখানে সকল প্রেমের, শ্রেয়ের, কল্যাণের এবং শুদ্ধির উৎস। তাঁর কল্যাণের হাত যুগ থেকে যুগের দিকে প্রসারিত। অনেক অন্ধকার অবক্ষয়ের মাঝে সময়ের শতকের মৃত্যু হলেও এই নারী 'শ্রেয়োতর বেলাভূমি'র মতো 'মণিকা-আলো হাতে' দাঁড়িয়ে থাকে। অতীত-বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও সকল উদ্যম এবং সৃষ্টির মাঝে লেগে থাকবে তাঁর মালতী ফুলের মতো সৌরভ।

ঘ্রাণের অনুষঙ্গে জীবনানন্দের মৃত্যু-অতিক্রমী আকাঙ্খা এবং তাঁর পুনর্জন্মবোধ আবর্তিত হয়েছে বাংলার নিসর্গকে কেন্দ্র করে। কোনো কাঁঠাল গাছের নীচে অথবা ধলেশ্বরীর তীরে তাঁর শ্মশানে সারাদিনেও যখন কোনো মানুষের আবির্ভাব হবে না তখনও কাঁঠাল জাম তাঁর বুকের উপর ছায়া দিয়ে যাবে। তাঁর মুখের উপর নীরবে ঝরবে খয়েরী পাতা, বঁইছি শেয়াল কাঁটা তাঁর অস্তিত্বকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকবে। এবং একসময় চোখ মেলে দেখবে আনারস ফুলে ভোমরা উড়ছে, বাসকের গন্ধ ভেসে আসছে নাকে। জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনা তাঁকে একা এবং নিঃসঙ্গ করে দেয়, যখন তাঁর মনে হয় আবহমান কাল ধরে নিসর্গের যে লীলা চলিষ্ণু তা চলতেই থাকবে অনন্তকাল পর্যন্ত : পরথুপী মধুকুপী ঘাসে ঢাকা প্রান্তর, শালিখ পেঁচার উড়াউড়ি, মাদারের-ডুমুরের সোঁদা গন্ধ, মৌরির মৃদু গন্ধ মাখা ঘাস-সবই থাকবে অথচ থাকবেন না শুধু তিনি।

জীবনানন্দের অনুভবের জটিল বুনোট ঘ্রাণের অনুষঙ্গে কখনো অস্পষ্ট আলো-আঁধারীর, বলা যায় ভৌতিক আবহের সৃষ্টি করেছে। 'অরেঞ্জপিকোর ঘ্রাণ নরকের সরায়ের চায়ে ক্রমেই অধিক ফিঁকে হয়ে আসে' এই চিন্তনকে না হয় আমরা কষ্ট করে বুঝে নিলাম। কিন্তু তার পরই যখন শুনি অরেঞ্জপিকোর ঘ্রাণে 'নানারূপ জ্যামিতিক টানের ভিতরে/ স্বর্গ মর্ত্য পাতালের কুয়াশার মিলনে/একটি গভীর ছায়া জেগে ওঠে মনে, অথবা তা 'ছায়া নয়-জীব নয় সৃষ্টির দেয়ালের পরে' তখন আমাদের বোধ কিছুই সনাক্ত করতে না পেরে বিস্ময়ের গভীরে নিমজ্জিত হয়। সমুদ্র-চিলকে উদ্দেশ্য করে যখন বলা হয় "তোমার শরীরে জল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রাক্ষার আঘ্রাণ/তোমার হৃদয় পেকে ঝরিতেছে রৌদ্রের ক্ষেত/জাগিতেছে নব নব শস্যের সন্তান”—তখন তা জটিল চিন্তনের প্রক্ষেপন হলেও মনে হয় আমাদের বোধের অন্তর্গত।

ঘ্রাণের প্রসঙ্গে জীবনানন্দের কাব্যে প্রকৃতিরাজ্যের বিভিন্ন অবস্থানের বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর সাথে আমরা সাক্ষাৎ লাভ করি। আকাশে উড়ে বেড়ায় যে চিল, পেঁচা, হাঁস, বনে ঘুরে বেড়ায় যে হরিণ, বাঘ, পুকুর ও নদীতে চাঁদা-সরপুটি ; সমুদ্রের তিমি, ফসলের মাঠ খোঁড়ে যে ইঁদুর এবং মানুষ-মানুষের মধ্যে প্রেমিক, নাবিক, হরিণ শিকারী, সুন্দরী রূপসী, নোনা মেয়ে মানুষ—ঘ্রাণের আস্বাদে বিষাদে এরা সবাই জীবনানন্দের কাব্যে জীবন্ত হয়ে আছে।

পৃথিবীর অন্যসব পরিচয় ভুলে গিয়ে গভীর রাতের একাকীত্বে তাঁর কাছে 'ধানীগন্ধী' পেঁচাদের সবচেয়ে আপন মনে হয়। বাস্তবের হাঁস অপসৃত হলে পিছনে ফেলে আসা পাঁড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মায়াবী মুখের স্মৃতির সাথে মিলেমিশে কল্পনার হাঁস ও তার ঘ্রাণ হৃদয়ের জ্যোৎস্নার ভিতর ভেসে বেড়ায়। সমস্ত দিনের শেষে যখন শিশিরের অস্ফুট শব্দের মতো নিভৃতে সন্ধ্যা নামে, চিলের ডানা থেকে রৌদ্রের গন্ধ মুছে যায়, পাখিরা নীড়ে ফিরে, নদীরাও জীবনের দেনা-পাওনা থেকে অব্যাহতি পায়—রাত্রি শুরুর সেই নির্জনতায় বনলতা সেন ছাড়া আর সব মিথ্যে হয়ে যায়।

৫.

ঘ্রাণের প্রসঙ্গে কখনো কখনো হিংস্র ও শান্ত প্রাণীরা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বিধৃত হয়েছে। হরিণ এসেছে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য এবং নিসর্গের লাবণ্যের প্রতীক হয়ে। চিতা বাঘ এসেছে হন্তারকের প্রতীক হিসেবে। আমাদের রাজনীতিধ্বস্ত মন একে সমকালীন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনও ধরে নিতে পারি :

১. আকাশে জ্যোৎস্না-বনের পথে চিতা বাঘের গায়ের ঘ্রাণ ;
হৃদয় আমার হরিণ যেন :
রাত্রির এই নীরবতার ভিতর কোন দিকে চলেছি।
(মুহূর্ত : মহাপৃথিবী)

২. যেন কোন দূরে থেকে অস্পষ্ট বাতাস
বাঘের ঘ্রাণের মতো হৃদয়ে জাগায়ে যায় ত্রাস।
(অবশেষে : বনলতা সেন)

৩. আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংশের ঘ্রাণ আমি পাবো,
মাংস খাওয়া হ'ল তবু শেষ?
(ক্যাম্পে : ধূসর পান্ডুলিপি)

চাঁদা সরপুঁটিদের মৃদু ঘ্রাণে যেমন তিনি বাংলার নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করেন তেমনি পৃথিবীর সমস্ত রূপকে তাঁর কাছে বিশাল তিমি মাছের মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো মনে হয়। দুই রূপই তাঁর কাছে সহজ এবং স্বাভাবিক ঠেকে।

জীবনানন্দের কাব্যে পেঁচা আর ইঁদুর আবহমান বাংলায় কালের সাক্ষী। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে ফসলের সাথে ইঁদুরের রয়েছে চিরকালীন সখ্য। এই ভাবুক নিসর্গের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায় পেঁচার মধ্যে।

প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাড়াড়ের দেশে।
(অবসরের গান : ধূসর পান্ডুলিপি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের শেষ পর্বের কাব্যে অর্থাৎ 'মহা পৃথিবী' (১৯৪৪)—'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'বেলা অবেলা কাল বেলা' (১৯৬১) এবং আলো পৃথিবী (১৯৮২)'তে ঘ্রাণের জগৎ প্রাণী, উদ্ভিদ অথবা গ্রাম বাংলার নিসর্গের লাবণ্যকে নয়, বাস্তব জগতের বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ঘ্রাণের প্রসঙ্গে এই পর্যায়ের কাব্যে লক্ষ্য করা যায় নগর ও নাগরিক জীবনের অনাত্মীয় অবক্ষয়িত ও যান্ত্রিক পারপার্শ্বিক। ঘ্রাণেও নেই পূর্বের ঐশ্বর্য, কয়লাগ্যাস, কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়া, আস্তাবল, অঙ্গার, পথ, ঘর, সোঁদা ধুলো ও ফুটপাত প্রভৃতির ঘ্রাণ আমাদেরকে এই অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করে :

১. কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।
(রাত্রি : সাতটি তারার তিমির)

২. হাইড্র্যান্ট থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভিতরে
জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে তারা
ব্যবহার ক'রে নিতে গেল সোঁদা ফুটপাতে ব'সে।
(লঘু মুহূর্ত : সাতটি তারার তিমির)

এইসব সঙ্কট সত্ত্বেও তাঁর পথ ও মত আশার আলোর দিকে, জীবনের সপক্ষে—

পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান
লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে
সময়ের সমুদ্রকে বারবার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে ব'লে।
(পৃথিবীতে এই : বেলা অবেলা কালবেলা)

জীবনানন্দের ঘ্রাণের জগতের একটি বিশিষ্ট দিক হচ্ছে এই যে, কখনো কখনো তা প্রাণিজগৎকে নয়, উদ্ভিদজগৎকে নয়, এমনকি নির্জীব বস্তুকেও নয়—সম্পূর্ণভাবে নৈর্বস্তুক বিষয়কে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছে। মননশীল গভীর স্তরের সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়চেতনাসমৃদ্ধ এই অনুভবের স্বরূপ খুব সহজে নির্দেশ করা যায় না। পূর্বপরিচয় হিসেবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির এরকম প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথেরও খুব বেশি নেই এবং তাঁর পূর্বে তো আশা করা সম্ভবতই ছিল না। ঘ্রাণের এই জটিল প্রায়োগিক কৌশল এর উৎসের অনুভবকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা গেলে, আমাদের বিশ্বাস, জীবনানন্দের কাব্যের এবং কবিমানসের খাঁটি পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। এখানে তাঁর রোমান্টিক বিষাদ, নির্জন শূন্যতা, জটিল মননশীলতা, জন্ম-মৃত্যু বোধ এবং আশা হতাশার পরিণত ও অকৃত্রিম বাসভূমি খুঁজে পাওয়া যায়। নিসর্গের পটভূমিতে সৃষ্ট ঘ্রাণের এই অনুভব আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনোটিতেই সাড়া জাগায় না। হৃদয় বৃত্তির মহত্তম স্বেচ্ছাচারজাত এই অনুভবকে আমাদেরকেও উপলব্ধি করতে হয় হৃদয় দিয়েই। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে ঘন সন্নিবিষ্ট করে একটিতে পরিণত না করে এর মাহাত্ম্য সন্ধান অসম্ভব, যেহেতু সমস্ত মানবিক অনুভবেরই দিক নির্দেশক হচ্ছে মন। ইতোপূর্বে এই 'মনন' বা হৃদয়কেই আমরা জীবনানন্দের কাব্যে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে উল্লেখ করেছি। জীবনানন্দের কাব্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের এই সমন্বিত প্রয়াস আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন। পৃথিবীর অধিকাংশ কবিই প্রধানত নির্দিষ্ট দুই একটি ইন্দ্রিয়ের সচেতন কবি। সুইনবার্ণের কবিতায় পাই শ্রুতিসুন্দর পৃথিবীকে। রসেটির কবিতায় রূপের আল্পনা। কীট্‌সের কাব্যে পৃথিবীর বর্ণ গন্ধময় প্রকৃতির উদ্‌ঘাটন—যদিও রসের ভোজে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আমন্ত্রণ সেখানে অবারিত। রবীন্দ্রকাব্যে মুখ্যত ছবি ও গানের অত্যাশ্চর্য সমাহার। জীবনানন্দের কবিতায় সবচেয়ে বিস্ময়সূচক অভিজ্ঞতা হলো ইন্দ্রিয়সাধনার সর্বমুখী সূক্ষ্ম অনুশীলন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন দেখি চারিদিকে 'বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয় পৃথিবীতে', 'নগরীর ঘ্রাণের মতন নগরী ছড়ায়ে আছে', 'পরাণ–কথার গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে', আবারো স্বপ্নের গন্ধে মন কেঁদে ওঠে', 'মানুষের হৃদয়ের পুরনো নীরব বেদনার গন্ধ ভাসে', তখন বিচ্ছেদ, নগর, পরাণ–কথা, স্বপ্ন, বেদনা প্রভৃতি নির্বস্তুক ধারণার ঘ্রাণের বোধ আমাদের সবকটি ইন্দ্রিয় এবং অন্যান্য মানবিক উপলব্ধিকে একত্রে জাগিয়ে তোলে।

জীবনানন্দের স্বভাবলব্ধ, একই বিষয়কে বিচিত্র অর্থে ব্যবহার—ঘ্রাণের প্রসঙ্গেও বাদ পড়েনি। 'রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে স্বপনের'—এই রোমান্সচারিতার পরই 'রূপসী বাংলা' কাব্যে একই কবিতায় বলেছেন—'রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনার গন্ধ লেগে আছে'। পুণর্জন্মের আকাঙ্ক্ষায় কখনো শোনা যায় আশার বাণী :

পৃথিবীতে ঢের জন্ম নষ্ট হ'য়ে গেছে জেনে, তবু
আবার সূর্যের গন্ধে ফিরে এসে ধুলো ঘাস কুসুমের অমৃতত্বে কবে
পরিচিত জল, আলো আধো অধিকারিণীকে অধিকার ক'রে নিতে হবে।
(১৯৪৬–৪৭ : বেলা অবেলা কালবেলা)

ঘুমের প্রসঙ্গে একবার শুনি হৃদয়ের স্বপ্নিল অনুভূতির সুর :

যে–ধূপ নিভিয়া যায় তার ধোঁয়া আঁধারে মিশুক,
যে–ধোঁয়া মিলায়ে যায় তারে তুমি বুকে তুলে নিয়া
ঘুমানো গন্ধের মতো স্বপ্ন হয়ে তার ঠোঁটে চুমো দিও, প্রিয়া।
(জীবন–২৫ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

৬.

ত্রিশোত্তর বাংলা কাব্যে জীবনানন্দের (১৮৯৯–১৯৫৪) সমকালীন প্রধান কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১–১৯৬০), বিষ্ণু দে (১৯০৭–১৯৮২), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–১৯৮২), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১–১৯৮৬) প্রমুখের কাব্য–চারিত্র্য পৃথক হলেও কখনো তাঁদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় বিষয়ে, না হয় ভাষায়। জীবনানন্দ এঁদের মধ্যে অনন্য–স্বতন্ত্র। বিষয়ে ভাষায় মননে বিশেষ করে জীবনবোধে তিনি ছিলেন সকলের অপেক্ষা ভিন্ন। অন্যান্য কবি যখন নগর জীবনের যন্ত্রণা জটিলতা কৃত্রিমতা ও ব্যসনে বিমুখ হয়েও কাব্য–বিষয়কে শহুরে গণ্ডীর বাইরে নিতে পারেননি ; নগরযন্ত্রণা–বিক্ষত জীবনানন্দ তখন কাব্যবিষয়ে নিয়ে এলেন স্বপ্নিল গ্রাম বাংলার অকৃত্রিম নৈসর্গিক লাবণ্য। শহর থেকে দূরের পটভূমিতেও জীবনানন্দের কবিতায় স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ তাঁর নিসর্গের সঙ্গে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা কাব্যের এমনকি আবহমান বাংলার নিসর্গেরও মিল নেই। নিজের মনলোকে দেখা নিসর্গ নিজস্ব বোধে জারিত হয়ে নির্মিত হয়েছে তাঁর নিসর্গ চেতনা। ইন্দ্রিয়ঘন এই নিসর্গ চেতনার আলোকে জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। চিত্রকল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর স্পর্শের অনুভব, স্বাদের অনুভব, শ্রুতির অনুভব, দৃশ্যের অনুভব ও ঘ্রাণের অনুভব। এই অনুভবসমূহ প্রাথমিকভাবে ধূসরচেতনা দ্বারা আবৃত। এদের মধ্যে জীবনানন্দের কাব্যে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে বর্ণের ও ঘ্রাণের অনুভব। জীবনানন্দের কাব্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়চেতনার এই মৌলিক দিকগুলো বিশেষ গুরুত্ববহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কবিতা : নৈঃশব্দ্য চেতনা

ফজলুল হক সৈকত

কবিতায় বাজে ধ্বনি-শব্দ। শব্দের মখমল পিঠে চড়ে নৈয়মিক চলাচলে থাকে কবিতার শরীর। শব্দহীনতায় তবে কি কবিতা-বিশ্বের অস্তিত্বের সংকট? হবেও বা। অথবা উল্টোটা। বস্তুজাগতিক আটপৌরে সত্য সশব্দ আবহের গভীরে বিরাজিত প্রবল এক নৈঃশব্দ্যের ভুবন। কবির কথারাজি সে শব্দহীনতার গহীনরাজ্যে সাজায় ভাবনার নক্ষত্রমালা। কবিতা-কাঁথার নকশা বোনে রেশমি নৈঃশব্দ্য-সুতো। মানবের অনিত্য আনুভূতিক-তল অতলস্পর্শী নৈঃশব্দ্যলোকের গহীনজঠরকে, শীতলতাকে ছুঁয়ে যায় কোনো কোনো চিন্তাসন্ধি-ভাবসন্ধি বলয়ে। কবির চেতন-অবেচতন সত্তা এই শীতলতার শক্তিতে শাসিত বোধ করি। অন্তত জীবনানন্দীয় ভাবনাবিশ্বে নিঃশব্দ-শব্দবিভার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে বেশ জাঁকালো তা এখন নিঃসংশয়।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) বাংলা কবিতার নব উদ্বোধনের প্রারম্ভক। ঐতিহ্যিক কাব্য-প্রবাহ, রাবীন্দ্রিক ভাবনারাজ্য প্রভৃতি ধারণার দৃষ্টিসীমার বাইরে এক নতুন কাব্যশৈলী নির্মাণ করলেন তিনি। জীবনানন্দ বিরাজমান বাস্তবিকতার জাটিল্যে অনুভূতির বহুমাত্রিক বহুভূজ কাঠামোয় তৈরি করেছেন কবিতা-ভূমি। মানবিক আর্তির অমোঘতা, চেতনার গভীর গভীরতর বিলোড়ন, স্বপ্নময়তা আর কাল ও কল্পচিত্রের প্রতীকের হাত ধরে অনেক প্রতীক-প্রতিচিত্র জন্ম নেয় জীবনানন্দের কবিতা-ভূমিতে। কালের বিভ্রান্ত উদর থেকে সময়ের প্রগতির নিঃশব্দ প্রবল প্রকোষ্ঠ থেকে তিনি তুলে আনেন কবিতার অনবদ্য উপাদান--যেন কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে সাবধানী তৃষ্ণার্ত, স্নান-কামুক দড়ি টেনে তুলে আনছেন গভীর জল। অবশ্য তিনি ঐতিহ্যবিমুখ ছিলেন না ; ঐতিহ্যের স্বরকল্পন আত্মীকরণে স্বভূমি নির্মাণ প্রত্যাশী ছিলেন মাত্র।

জীবনানন্দ ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণের কবি, নবায়নের স্থপতি। তিনি জানতেন বস্তুজগতের কোন তাৎপর্যই সম্পূর্ণত বিলীয়মান নয়। কবিতার সচেতন পাঠককে যেন কানে কানে বলে যান বস্তু এবং সময় সামগ্রিকভাবে না ; খণ্ডিত পরিসরে মূর্তিমান থাকে সৃজনশীল মেধায়। যেমন শব্দমেদুর রৌদ্রের গন্ধ ডানা থেকে মুছে ফেলে পরিশ্রান্ত বেজার চিল, তেমনি শূন্যলোকের নৈঃশব্দ্যে কান পেতে কবি শুনতে পান (না কি দেখতে পান) নিবিড় শব্দপতন।

> সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
> সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
>
> (বনলতা সেন : বনলতা সেন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানববোধ সময়ের অস্তিত্ব সমর্থন করে ; তার গতিকে ধরতে পারেনা। মুহূর্ত গড়ায় ক্রমাগত পেছনে। কাল পরম্পরা বস্তুত অধরা। কাল কিংবা সভ্যতার অগ্রগমনে ক্লান্তি, অবসাদ নিত্য সহচর। সময়ের গতি বোধ করি অপরিশ্রান্ত। সময়ের নিরিখে দৃশ্যমান মানুষের সুস্থতা-অসুস্থতা, বিষণ্ণতা-প্রসন্নতা ; মানবিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিশেবের খাতার মলাটে কালিক প্রকৃত স্বরূপ বিদৃশ্যমান। অন্যভাবে বললে কথাটা এরকম দাঁড়ায়—কবির বোধ সময়কে ধরে আপাত দৃশ্যবস্তুর মোড়কে ; বস্তুবিশ্বের পরিবর্তনজনিত শব্দক্রিয়াকে নোট করার জন্যে। আর কবি দেখতে পান সশব্দ বাস্তবের সীমানায় বাস করে ধ্যানী এক তপস্বী-নিঃশব্দ। তাই 'পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই', আবার এরই বিপরীতে জীবনানন্দ অনুভব করেন অজাগতিক শব্দদ্যোতনা—'কলরব করে উড়ে যায়/শত স্নিগ্ধ সূর্য ...' —এ শব্দ কবির কর্ণকুহরে কি রিনিঝিনি মাতম তোলে? না কি তিনি চোখে দেখেন শব্দের রূপ, না কি তার মাথার ভেতরে মগজে আঘাত হাতে তীব্রতায় এ শব্দ।

বস্তুজাগতিক শব্দহীনতার আদলে কবিতায় যে শব্দ-যোজনা ফর্ম তৈরি হয় তাকে ধরতে হলে পাঠকের ইন্দ্রিয় সকল সচল, সক্রিয় থাকা চাই। কবির সঙ্গে পাঠকের এক গভীর যোগসূত্র তৈরি করে এখানে কবিতা। জীবনানন্দ বলেছিলেন 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি'। অনুরূপভাবে বলা যায় কবিতার পাঠক হয়ে ওঠা সকলের পক্ষেই সম্ভব নয়। হয়তো কবিতা পড়ে অনেকেই। কিন্তু সবাই যে কবিতার ভেতরে প্রবেশ করে মনন-দাঁত দিয়ে চিবিয়ে রস-উদ্ধার করতে পারে তা নয়। এর জন্য চাই শিক্ষা-রুচিবোধ-সৃজনশীলতার অপূর্ব সমন্বয়।

জীবনানন্দ নৈঃশব্দ্যের কবি। অতল নৈঃশব্দ্যলোকের জটাজালে তিনি বয়ন করেন কবিতাজাল। যে 'নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়'—তার গভীর স্পর্শ অনুভব করেন জীবনানন্দ। শীত যেমন প্রকৃতির বিষণ্ণতা কিংবা বস্তুগত স্খলনের জন্য সর্বক্ষণ উদগ্রীব, তেমনি শূন্যতার প্রবল শীত নক্ষত্রের আলোকে ম্লান করছে নিয়ত। আবার জীবনের যাপিত-শীতে হৃদয়ের পতনও অনিবার্য। সেই পতনের শব্দ শুনতে পান কবি। মানুষ, মানুষের হৃদয় অগাধ নৈঃশব্দ্যের দিকে ক্রমাগত ধাবমান—কিন্তু তা টের পায় না মানবীয় চেতন সত্তা। জীবনানন্দ দেখেন—

> যে-নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত
> লাগিতেছে আমার শরীরে,—
> যেই তারা জেগে আছে, তার দিকে ফিরে
> তুমি আছো জেগে—
> যে-আকাশ জ্বলিতেছে, তার মতো মনের আবেগে
> জেগে আছো ;—
> জানিয়াছ তুমি এক নিশ্চয়তা—হয়েছ নিশ্চয়।
> হয়ে যায় আকাশের তলে কত আলো—কত আগুনের ক্ষয় ;—
> ... ...
> তোমার আকাশে তুমি উষ্ণ হয়ে আছো, তবু—
> বাহিরের আকাশের শীতে
> নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়, নক্ষত্রের মতন হৃদয়
> পড়িতেছে ঝ'রে—
> ক্লান্ত হয়ে—শিশিরের মতো শব্দ করে!

(নির্জন স্বাক্ষর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি যেন বুঝতে পেরেছেন শ্রুতিসীমায়, স্পর্শসীমায় যে-জগৎ তা ধরা-ছোঁয়ার, নাগালের বাইরে। অথচ বিশেষ এক অনুভূতি মানুষের প্রায়-মৃত সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখে ব্যাকুলতার আবর্তেও—

যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে !—
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।

(নির্জন স্বাক্ষর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এই আত্মিক-চেতনা কবিকে বিরলতর চেতনালোকের ক্যানভাসে হাজির করে। মানুষের জীবন মহাকালের প্রান্তরে ধূলিকণা সমান। জীবনাবসান চিরায়ত। থাকে শুধু ম্লান স্মৃতি। মানবের মনেও তাই জায়গা থাকে প্রীতির—স্মৃতিকে বহন করার প্রয়োজনে। আর এই নশ্বর জগতে—জীবনের চেয়ে জগত বড়। জগতের চেয়ে অনুভূতি। কবির অনুভূতিতে বাঁচে জগতের চিত্রকাল। জীবনানন্দ তাই 'পৃথিবীর কানে/নক্ষত্রের কানে' গান গেয়ে যান অবিরত—অবিনশ্বরতাকে পাবার প্রত্যয়ে নয় ; অনন্যতার সৌন্দর্যে অবগাহনের বাসনায়।

আমাদের হৃদয়ে বাস করে অধীর—অস্থির এক পাখি। যে পাখি বুকের ওমে মুখ গোঁজার জন্য খুঁজে ফেরে নীড়ের মত ওই বুক। অথচ আলো-বাতাসের চলাচলে ফেঁসে যায় উদ্দাম-অন্বেষা। সন্ধ্যার আলো, রাতের আঁধার, সিন্ধুর উত্তাল ঢেউ-এ ঢেউ-এ আকাঙ্ক্ষার বোধ হোঁচট খায়। এরই মধ্যে একবার 'ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁট উঠেছিল হেসে !' কবি তখনও নির্মাণ করতে চান নৈঃশব্দ্যের কথকতা—

আলোর চুমায় এই পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর
ক'মে যায় ;—তাই নীল আকাশের স্বাদ—সচ্ছলতা—
পূর্ণ ক'রে দিয়ে যায় পৃথিবীর ক্ষুধিত গহ্বর ;
মানুষের অন্তরের অবসাদ—মৃত্যুর জড়তা
সমুদ্র ভাঙিয়া যায় ;—নক্ষত্রের সাথে কয় কথা

(অনেক আকাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এই অদম্য উৎসাহী পাখি সকল অবসাদ আর প্রকৃত প্রাপ্তির সন্ধান না পাওয়া মেকি সুখবোধে বিবস্ত্র, উন্মুলিত। তখন জন্ম নেয় এক নতুন বোধ। জগতের চলতি পথে লক্ষ-কোটি জনতার-প্রাণের আগমন ও প্রত্যাবর্তন এ নতুন বোধের কাছে অঅর্থক মনে হয়। সন্তান জন্ম দেয়ার দায়িত্ব সৃজনশীল সত্তার কাছে পরাজিত হয় পর্দার আড়ালে। জীবনানন্দ তাই টের পান 'মাথার ভিতরে/স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।' আর তখন তিনি মহাশক্তি কোনো দেবতা কিংবা পূজনীয় সকল প্রবলতা থেকে আপন সত্তাকে ছিঁড়ে আলাদা করে শুধুমাত্র হৃদয়িক-ব্যক্তিক অনুভূতির কাছে দাঁড় করান। এবং নিজের কাছেই হয়ে ওঠেন প্রশ্নাকুল। হৃদয়কে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয় !' প্রকৃত পক্ষে এ এক গভীর বিস্ময়, কোনো জিজ্ঞাস্য অভিব্যক্তি নয়। আর এই বিস্ময়বোধ, প্রশ্নবোধের আড়ালে যে বস্তুটি ক্রিয়াশীল তা হলো ফ্রিকোয়েন্সির বাইরের এক শব্দভুবন। এ শব্দ মানুষের কানে পৌঁছয় না। মূলত বাতাসে কম্পনও তোলে না এ শব্দ, মাথায় দোলা সৃষ্টি করে মাত্র। প্রখর অনুভূতি প্রবণতার কাছে, এ শব্দ অর্থময় ; অন্যত্র নয়। সচেতনভাবেই জীবনানন্দ তার কবিতার শরীরে এই শব্দের হাতুরি চালিয়েছেন বিস্তর পরিসরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নির্জনতার কবি' হিশেবে জীবনানন্দের একটা পরিচিতি রয়েছে সাহিত্য-মহলে। প্রকৃত অর্থে জীবনানন্দ ছিলেন 'আদতে কবি' বা 'প্রকৃত কবি'। তার অটল আনুগত্য ছিল শিল্পের প্রতি। এবং এই আনুগত্যের মূলধারা এক প্রবল বোধ তার সত্তার ভেতরে সারাক্ষণ সক্রিয় ছিল। এ 'বোধ'—যা তাঁকে তাড়না দেয় প্রতিক্ষণে—মানবসমাজ থেকে তাঁকে এক অর্থে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তৈরি হয়ে তার একাকিত্ব ; এক নিবিড় নিঃসঙ্গ ভুবন। এই নিঃসঙ্গ চেতনা কবিকে নিঃসন্দেহে ধীরে ধীরে বিচ্ছিদ্র ভাবনারাজ্যে ডুবিয়ে দেয়। আর সেখানে খেলা করতে থাকে বস্তুবিশ্বের অতীত এক শব্দ-চেতনা। জীবনানন্দ যেন সাধারণের অবোধ্য, শ্রাব্যাতীত সেই নৈঃশব্দ্যের শব্দমালা গাঁথেন বসে-হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। আর তাই 'ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে ;/সেখানে আকাশে কেউ নেই আর'—কবি সেই অসীম শূন্যলোকে শুনতে থাকেন শব্দের তীব্র নিনাদ। এ পৃথিবীতে মানুষের পদচারণা, বাসনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সবকিছুরই সমাপ্তি ঘটবে একদিন। বন্ধ হবে সকল কোলাহল। জীবনানন্দকে ক্রমাগত এ বিনাশ-চিন্তা কুঁকড়ে দেয়। আপাতভাবে এটি মৃত্যু-চিন্তা। কোনো মানুষই, মোট কথা, মৃত্যু-ভাবনাকে এড়াতে পারে না। ইচ্ছে-অনিচ্ছায় কখনো কখনো চেতনাকে গ্রাস করে মৃত্যুর ঘোর অমানিশা। কিন্তু জীবনানন্দ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী কবি। জন্মান্তরে রূপান্তরে আত্মপ্রকাশের বাসনার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন কবিতায়। আবার এমনও ভেবেছেন—যদি পৃথিবী থেকে যাবতীয় কোলাহল, প্রাণ-চাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়ে যায়—তবে ফাঁকা শূন্য ভুবনে কী বিরাজ করবে? তিনি অনুভব করেন কিংবা অজান্তেই প্রত্যাশা করেন—মানুষহীন ভুবনে, অনাগত কোনো কালে বিরাজ করবে মানুষের বিপুল স্বপ্নরাজি এবং সে ভুবন তার ভাবনায় ধরা দেয় স্পর্শযোগ্য, অনুভবযোগ্য শব্দময় এক চলমান কালের চিত্রে—

> তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
> পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
> মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :
> সেই মুখ আর আমি র'বো সেই স্বপ্নের ভিতরে।
>
> (স্বপ্ন : মহাপৃথিবী)

জীবনানন্দের জীবন ছিল প্রতিকূল। দাম্পত্য-জীবনে বেশ কিছুটা সময় বেকারত্বের কারণে সাংসারিক দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতে পারেন নি। সেহেতু তিনি সুখীও হতে পারেন নি। স্ত্রীর পত্র কিংবা কথালাপে প্রেম-কৌতুকের চেয়ে বিরক্তির ছাপ ছিল বেশি। এছাড়া জাগতিক জীবনের বিস্তৃত ক্যানভাসে কবিকে নানারকম প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। এই অসুস্থ পরিবেশ, জ্বরে কাতর সময়কে চিকিৎসা দিয়ে সারিয়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করতেন তিনি। আর তাই চিকিৎসার জন্য পরিবেশ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি নির্জন-নিঃশব্দ অসীম শূন্যলোককে গুরুত্ব দিয়েছেন সব সময়। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন জগতের অসুস্থ জাজিম থেকে ঘর্মাক্ত পিঠ টেনে তুলে জীবনানন্দ নিশ্চিত অন্তরাল খুঁজেছেন। কিন্তু তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, দিনলিপি, প্রবন্ধ প্রভৃতি পড়লে কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না যে, তিনি অন্তরালমুখী ছিলেন। বরং মনে প্রাণে আত্মপ্রত্যয়ী, আস্থাশীল এই সাহিত্যিক কারুণ্য-কোলাহল থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিভৃতে সাহিত্যাবৃতির একটা নির্মোহ ভুবন নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। সেখানে কোন হৈ-হুল্লোড় কিংবা চাওয়ার বহর তাকে, তাঁর আপন ভুবনকে ত্যক্ত-বিরক্ত করবে না। তিনি সেই চেতনালোকে শিল্পের চর্চা করতে চান, আর তার প্রবাহ দিয়ে অসুস্থ সমাজকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারিয়ে তুলতে চান। সবসময় তাই তার 'বোধ' কাজ করে গাঢ় এক অনুভবের সান্নিধ্যে—'অলঙ্ঘ্য অন্তঃশীল অন্ধকার ঘিরে আছে সব ;/জানে তাহা কীটেরাও পতঙ্গেরা শান্ত শিব পাখির ছানাও।/বনহংসী শিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব/স্বস্তি চায় ;'—এই অবাস্তবতার জালে কল্পবাস্তবের-সুচিকিৎসার সুতিকাগার চেতনার—মনোরম ভুবন তৈরি করতে চান কবি।

জীবনানন্দ নিঃসঙ্গতা পছন্দ করতেন। অবশ্য সমাজ-সংলগ্নতাও চেয়েছেন। ব্যক্তিসত্তা এবং সামাজিক সত্তার দ্বন্দ্বে তাঁর ভেতরে জন্ম নিয়েছে শক্তিশালী সাহিত্য-শিল্প চর্চার রহস্যময়তা। কবি ভেতরে ভেতরে নিঃসঙ্গ শিল্পী হয়ে উঠেছেন—যেখানে গভীর জনারণ্যেও একাকী, শব্দের গাঢ়তায়ও বড় নীরব, নিঃশব্দ। শিল্পে—বিশেষত রোমান্টিক শিল্পে বাস্তব থেকে কল্পনায় যে গতায়াত তাতে জীবনানন্দের নীরব, নিথর ভুবন, একাকী ক্ষেত্র। তবে তিনি দক্ষ শিল্পীর মত বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে সেই নীরবতার মধ্যেও সুরের ভুবন, শব্দের ভুবন সৃষ্টি করেন শিল্পের সুতোয়। কবিতাযন্ত্রের শব্দময়তায় ছায়ার ভিতর থেকে হীরের মত জ্যোৎস্নাকে খুঁড়ে বার করার সময় মাটি কাটার শব্দ, কিংবা বাতাসকে তরমুজের মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে আলাদা করার মুহূর্তে পটপট ছেঁড়ার শব্দ—কবির সেই একাকী নীরব ভুবনে স্পর্শাতীত, শ্রাব্যাতীত, অনুভূতিযোগ্য শব্দাবলি। আর তিনি বুঝতে পারেন মানবসত্তা, সচেতনতায় শব্দহীনতায় অউৎসাহী হলেও অবচেতনে, অচেতনে সেই গভীর শব্দহীনে অন্তলীন হচ্ছে ক্রমাগত—

> ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে
> আমাদের দুজনকে নিতে চায় যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে
> সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনোদিন সেদিকে যাবে না
> তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চলে যায় কি গভীর সহজ অভ্যাসে
>
> (ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত : অগ্রন্থিত কবিতা)

মূলত, সময়ের অমিত প্রবাহে মৃত্যুর দিকে চলে যাওয়া যেমন, তেমনি বস্তুজগতের আটপৌরে যন্ত্রণা-কাতর মানবমনে হৈ-চৈ সর্বস্বতা থেকে নৈঃশব্দ্যের অতলে যাবার উৎসাহও সত্য। জীবনানন্দকে 'স্পর্শ ও গন্ধের' কবি বলা সহজ। তাঁর কবিতায় বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে এসব অনুষঙ্গ। অসংখ্য উপমায় স্পর্শ-সচেতনতা স্পষ্ট। প্রেমিকার ধারালো ঠোঁটের চুম্বন, এমনকি যাকে কখনো দেখেন নি কবি—সেই প্রণয়ীর গভীর স্পর্শও যেন পেয়ে যান তিনি। তাঁর এই স্পর্শ-চেতনার প্রয়োগ কতোটা শক্তিশালী তা অনুভব্য উদ্ধৃত অংশে—'যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে/তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ/সঙ্গে করে এনেছে।' তারপরও কবির এই গভীর স্পর্শ ও গন্ধ-কাতরতা সত্ত্বেও তাঁর শব্দ-চেতনা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তিনি নৈঃশব্দ্যে শব্দ নির্মাণেরও কবি। যেমন নক্ষত্র, আকাশ, ঘাস, পাখি সবকিছু তার অনুভবের ভুবনের মধ্যে এসে যায়, তেমনি নিঃশব্দ মুহূর্ত আর স্থানও তাঁর কাছে শব্দময় সত্তায় প্রকাশ পায়। সাধারণের কাছে যে শব্দ শ্রুতির অযোগ্য, সে শব্দ জীবনানন্দের চেতনাবিশ্বে জাগায় অনাস্বাদিত উন্মাদনা। আর সেই উন্মাদনাকে আশ্রয় করে তিনি রূপ দেন নৈঃশব্দ্যের সমস্ত অরূপকে। কবি জীবনানন্দ এখানে নিঃসঙ্গ, একাকী পথিক। তাঁর এ পথে কোনো সহযাত্রী নেই, প্রতিদ্বন্দ্বীও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক এই সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত জীবনযাপনকে অর্থবহ করে তোলে। জীবনযাপনের কলেবর সে কারণে যত স্বল্পপরিসরের হোক না কেন, তা বোধকরি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। ১৯৩২ সালের লেখায় লেখকের এই ভাবনা উন্নতস্তরের এবং একজন সত্যিকার আধুনিক মূল্যবোধসম্পন্ন অস্তিত্বের অধিকারী বলেই অতি সহজে দ্বিধাহীনভাবেই এসব কথা উল্লেখ করতে পেরেছেন। উপন্যাসের শিল্পমূল্য বিচারে তর্ক–বিতর্ক থাকলেও বিষয়ভাবনায় জীবনযাপনের তর্কাতীত অবস্থান অটুট হয়ে থাকবে। জীবনানন্দের পরিপূর্ণ বিচার এখনও অনুদঘাটিত। তাঁর অপ্রকাশিত লেখাগুলো যতই প্রকাশিত হয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে, ততই জীবনানন্দকে নতুন করে বিশ্লেষণের দাবী উত্থাপিত হচ্ছে।

> জীবনানন্দ কবি হিসেবেই এক বহুমাত্রিক ও বহুকৌণিক সত্তা, এবং তার মনন ও বিশ্বাসের জগতে বহু উত্থানপতন এবং গলি ও রাজপথ আছে। তার উপর তাঁর কবিতার সঙ্গে যদি তাঁর প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস ধরে একসঙ্গে বিচার করি তাহলে লক্ষ্য করব, তাঁর কালচেতনা আর মানব সমাজবোধ বাঘা বাঘা সমাজ বাস্তবতার শিল্পীকেও লজ্জা দিতে পারে।
>
> (পবিত্র সরকার, ভূমিকা, করুণাসিন্ধু দাস রচিত আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়)

জীবনানন্দ স্বাতন্ত্র্যের কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। তাঁর বিচিত্র প্রতিভা ও বিস্তৃত ভাবনা বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্রময় করে তোলে। আর জীবনযাপনের প্রাসঙ্গিক আলোচনা জীবনানন্দকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা গেল। জীবনযাপন জীবনানন্দের অসামান্য প্রতিভার সাক্ষর বহন করে। যদিও উপন্যাসটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে, তথাপি পরিণতির সাফল্যটুকু অসমাপ্ত আবেদনে সমাপ্তি ঘটেছে। জীবনানন্দ চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন আপন বৈশিষ্ট্যে ও সম্ভাবনায়।

দুই. জীবনানন্দের আটটি উপন্যাস প্রসঙ্গে

জীবনানন্দের সব উপন্যাস নিয়ে এখনও বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা লক্ষ্য করা যায়নি। তবে বেশ কিছু উপন্যাস ইতিমধ্যে আলোচনায় এসেছে। "ক্লিন্টন বি. সিলি মন্তব্য করেছেন, এই সব উপন্যাসে জীবনানন্দের নতুন পর্ব উন্মোচিত হয় ; "...his handling of a down to earth, idiomatic, conversational Bengali and his ability to invent a make-believe world that is life, people with, in some cases, characters bearing a decidedly auto-biographical arena." উদ্ধৃতির তিনটি শব্দ লক্ষ্যণীয়। স্থিরীকৃতভাবে আত্মজীবনীমূলক এক অলৌকিক আভার কথা ক্লিনটন সিলি বলছেন। অর্থাৎ আত্মজীবনী নয়, তার আভা, সে আভাও লৌকিক নয়। আর এটাও চরিত্রদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নচেৎ যে জগৎ জীবনানন্দের উপন্যাসে আছে, তা জীবনের সৃষ্ট সত্য একটি 'make believe' বিশ্বের আবিষ্কার। সেই সঙ্গে ১৯৯০ পর্যন্ত প্রকাশিত জীবনানন্দের গল্পে–উপন্যাসে পেয়েছেন 'a standard, very colloquial idiom, সিলি আরও বলেন, "None of the uniquely personal, idiosyncratic hybrid Bengali found in Jibananda's poetry appears in his prose. The latter, though fiction, in reflective of the real world, stated in real world terms. Dialogues have the feel of authenticity, conversation flowing naturally, unselfconsciously. The vocabulary is extensive, rich and apt. In short, Jibananda takes full command of the language of fiction in order to depict vividly avery matter of fact human environment.' সিলির মন্তব্যে জীবনানন্দের মূল ভাবনা উপলব্ধি করা যায়। (পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের অপরাপর উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনার প্রারম্ভে তাঁর রচিত উপন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

১. পূর্ণিমা, নভেম্বর ১৯৩১ ২. কল্যাণী, জুলাই ১৯৩২ ৩. জীবনযাপন, ১৯৩২ ৪. বিভা, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ ৫. মৃণাল, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ ৬. নিরুপম যাত্রা, মার্চ ১৯৩৩ ৭. কারুবাসনা, অগাস্ট ১৯৩৩ ৮. জীবনপ্রণালী, অগাস্ট ১৯৩৩ ৯. বিরাজ, অগাস্ট ১৯৩৩ ১০. প্রেতিনীর রূপকথা, অগাস্ট–সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ ১১. জলপাইহাটি, এপ্রিল–মে ১৯৪৮ ১২. সুতীর্থ, মে–জুন ১৯৪৮ ১৩. মাল্যবান, জুন ১৯৪৮ এবং ১৪. বাসমতির উপাখ্যান, ১৯৪৮।

জীবনানন্দের উপন্যাসের সময় সব মিলিয়ে চার বছর। ১৯৩১, '৩২, '৩৩–এর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা দশ, আর ১৯৪৮ সালে চারটি। মাত্র তিন–চার বছরে এতগুলো উপন্যাস সৃষ্টি করা একজন বড় মাপের লেখকের পক্ষেই সম্ভব।

আলোচনার সুবিধার্থে ১৯৩১–৩৩–এ রচিত উপন্যাসগুলি দু'ভাগে বিন্যাস করা হয়েছে, প্রথমে উত্তম পুরুষে রচিত উপন্যাস এবং পরে অপরাপর উপন্যাস আলোচিত হলো।

ক. জীবনপ্রণালী

১৯৩১–এ একটি উপন্যাস—পূর্ণিমা, ১৯৩২–এ দু'টি কল্যাণী ও জীবনযাপন এবং ১৯৩৩–এ ৭টি উপন্যাস জীবনানন্দ লিখেছেন। এসব উপন্যাসের মধ্যে প্রেতিনীর রূপকথা, জীবন প্রণালী, কারুবাসনা, নিরূপম যাত্রা, বিভা নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক, গবেষক, প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন। কিন্তু সে অর্থে পূর্ণিমা, কল্যাণী, জীবনযাপন, মৃণাল, বিরাজ নিয়ে তেমন কোন আলোচনা লক্ষ করা যায়নি। প্রসঙ্গত আলোচিত–অনালোচিত উপন্যাসের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে।

'জীবন প্রণালী' নামক উপন্যাসটিতে এসে দেখা গেল একটি ব্যথিত শিল্পের বিকীর্ণ গালিচা, রোমান্টিক agony –র এক দ্যুতিমুখর পান্নাপাথর ফলকই ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে চলেছে নানাদিকে, নানাভাবে ; কোনো কোনো জলজ সাগর প্রাণী যেমন তার নমনীয় শুঁড়সমূহ চারদিকে ছুঁড়ে দিয়ে স্পর্শগন্ধের সংবাদ পেতে চায় অথবা অন্যকোন অদম্য বনলতা ক্রমাগত গাছের মাথায় বেড়ে চলে, ঠিক সেইভাবে উপন্যাসের শৈল্পিক আকুতি স্থানকাল মানুষের বিভিন্ন সংস্থান নেড়ে চেড়ে দেখছে। জীবন প্রণালীতে আমাদের পরিচিত জীবন তথা মধ্যবিত্তের জীবনের জটিল যন্ত্রণা উপস্থাপিত হয়েছে।

> বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে—এম–এ পাশ করেছেন এক যুগ আগে, তবুও একটা পয়সা যদি সম্বল নেই তোমার—মেয়েমানুষকে জীবনে আকাঙ্ক্ষা করতে গিয়েছিলে কেন?
>
> (জীবন প্রণালী)

জীবনপ্রণালী উপন্যাসে সংলাপ দীর্ঘ এবং এখানে সামাজিক গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এ উপন্যাসে 'আমি'–র সাথে সংযোগ ঘটে অপরাপর চরিত্রের। একের পর এক চরিত্র এসেছে, কিন্তু আমি নিষ্ক্রিয়, সমাজ অনুসন্ধানী। এ 'আমি' সংসার মানব জীবন ত্যাগ করে চলে যায় না। এর আঘাত–অপমান–অচরিতার্থতা গ্রহণ করে, আর সে সব পেরিয়ে এক নিঃসঙ্গ গাছের মত, পাখির মত চলতে চায়। জানে ঐ চলা এ মনুষ্য সমাজ স্বীকার করে না—একটা মৃত্যুর গুলি আসবেই, সে পর্যন্তই সে চলবে, সে বাঁচবে। আমি প্রত্যাখ্যান করে মানুষের এই কেবল মানবিক–আণবিক সভ্যতাকে।' জীবনপ্রণালী উপন্যাসে আমাদের চেনাশোনা এ দেশের গ্রামবাংলা ও প্রকৃতির চিত্র ভেসে ওঠে। জ্যোৎস্নার শুভ্রতা, আমকাঠালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু উপন্যাসগুলি পড়লেই বোঝা যায় এগুলি impulse জাত নয়, তাদের অনিয়ন্ত্রত ইচ্ছাপূরণ, প্রশয়ও নয়। শৈল্পিক তাগিদ অবশ্যই ছিল, ছিল কবিতায় বলতে না পারা কথাগুলির বহুস্বরিক উপস্থাপনার চাপ। কবিতায় সঙ্কেতিক ও বলা-না বলার আলো-ছায়াময় ভাষায় যে কথা জটিল, মাঝে মধ্যে দূরাবগাহ করে বলেছেন, তার অনেকটাই প্রত্যক্ষ, স্পষ্টভাবে বলেন উপন্যাসে।

(প্রার্থপ্রতিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮)

১৯৩২ সালে জীবনযাপন উপন্যাসটি লেখা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় যা ছিল, তাতে দেখা যায়—ইংরেজিতে লেখা Jibanananda das, Novel-1, August 1932, পৃষ্ঠার নিচে আছে অজিত-পূর্ণিমা। (বিভাব, জীবনানন্দ স্মরণ সংখ্যা, ভূমেন্দ্র গুহ সম্পা., পৃ. ২৫৬)

জীবনযাপন অসমাপ্ত আবেদন নিয়ে পর্যবসিত, কিন্তু তার শৈলী ও উপস্থাপনা, বক্তব্য ও বিষয় প্রাঞ্জল। এ উপন্যাসে তিনি একজন যুক্তিবাদী দার্শনিক।

জীবনযাপনের পদে পদে মানুষের ব্যর্থতায়, ক্ষুদ্রতায়, পতনে আঘাত পেয়েছেন। মর্মদাহের আগুনে তাঁর জীবনদৃষ্টিতে এসেছে নির্মোহ যুক্তিনিষ্ঠা। কালো-ধলোর সত্যরূপ হয়েছে শুষ্ক অপাবৃত। সমাজ সংস্কৃতি ভাবনায়, সাহিত্যকর্মে তাঁর অন্তর্যামী চোখের আলো সন্ধান করে ফিরেছে ইতিহাসের এই বরাবর অম্লান মনুষ্যত্বের রজত রেখা।

(করুণাসিন্ধু দাস, জীবনানন্দ শিল্পী এবং শিল্প, পৃ. ১০)

জীবনানন্দ সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মতো হয়তো বিশাল ক্যানভাসে উপন্যাস সৃষ্টিতে ব্রতী হননি। কবিতার 'চিত্ররূপময়'-এর যে খেলা দেখিয়েছেন তা এ উপন্যাসে ততটা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু সমাজের যে বাস্তবসত্য রূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন তা অনন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ প্রমুখের উপন্যাসের বিশাল ব্যাপ্তি ও জীবনের স্পর্শ যতটা গভীর, স্পর্শময়, ততটা স্পর্শিত হয় না জীবনানন্দের উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিতা লিখতেন। কিন্তু সেগুলো উপন্যাসের বিশাল খ্যাতির পাশে দাঁড়াতে পারেনি। অথচ তা মৌলিক স্বাতন্ত্রে ভাস্বর হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র যথার্থ বলেন—

গল্প-উপন্যাস যিনি লেখেন তাঁর হাত দিয়ে কবিতা বার হওয়া এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার অবশ্য নয়। একাধারে কাহিনীকার ও কবি আমাদের সাহিত্যে বিরল নন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ত' তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

তা সত্ত্বেও জীবনানন্দের গল্প লেখা বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা লেখা নিয়ে এত উচ্ছ্বাস উত্তেজনার কারণ এই যে এঁদের দু'জনের কারুর মধ্যেই উত্তরের বিন্দুমাত্র লক্ষণ ওপর থেকে ধরা পড়ে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন পুরোপুরি গদ্যের ডাঙার জীবন আর জীবনানন্দ কবিতার আকাশের। তাই সাহিত্যের স্থলচরের শরীর থেকে মানিক যে কখনো খেচরের ডানা বের করতে পারেন যেমন কল্পনাই করা যায় না, তেমনি যায় না জীবনানন্দের মতো আকাশচারীর দুঃসাহসী স্থলবিহার।

(প্রেমেন্দ্র মিত্র, মিথুন-সমীক্ষণ : ছায়ানট, সুব্রত রুদ্র সম্পা. প্রগুক্ত, পৃ. ৭৫৬)

সত্যিই যেন তাই। কবিতার আকাশ থেকে গল্প-উপন্যাসের স্থলভাগে প্রবেশ করেছেন সাহসের সাথে। জীবনানন্দের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৪। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্পের সংখ্যাও অনেক। সঙ্গতকারণে তাঁর চিত্তভূমি একটি স্তরে আবদ্ধ থাকেনি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর আবেদন স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল।

জীবনানন্দের উপন্যাস বাংলা পরম্পরায় একান্তই ব্যতিক্রম, এসব উপন্যাসের গঠন একেবারেই জীবনানন্দের। ১৯৩০-এর দশকে এমনকি চল্লিশের দশকেও তাঁর উপন্যাস পাঠ সহজ ছিল না।

(পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর কারণ এখনও অজ্ঞাত। তবে তাঁর উপন্যাস চর্চা স্বভাবসুলভ ভাবেই এসেছে।

> উপন্যাসকে তিনি শিল্পীসত্তার, তাঁর জীবন-বীক্ষার, বিশ্ববীক্ষার প্রকাশের একটি জরুরী মাধ্যম হিসাবেই দেখেছিলেন। এই তাঁর হয়ে ওঠার অন্যতম দিগন্তকে রেখে দিলেন অপ্রকাশের অন্ধকারে—কেন এখন তার হদিশ পাওয়া যায় না। আজ এ উপন্যাসগুলি বাংলা উপন্যাসের পরম্পরা সম্পর্কে নতুন করে ভাবায়। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫)

জীবনানন্দের 'জীবনযাপন' অসম্পূর্ণ আবেদন নিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। যেভাবে সূত্রপাত হয়েছিল, তা বিস্তৃত পরিসরে এগোয়নি। কিন্তু এই স্বল্পপরিসরে যা এসেছে, সেখানে জীবনানন্দকে অন্যরকম মনে হয়। কবিতার নিঃসঙ্গ. নির্জনতার আড়ালে তাঁকে এখানে সতেজ, সরস বলে অনুভূত হয়ে ওঠে। তাঁর ভাবনাগুলো যেন চরিত্রের সংলাপে ধরা পড়ে। উপন্যাসে যে সামাজিক বিষয়গুলো এসেছে তা শ্রেণীবদ্ধ করা যায়—

১. সাংস্কৃতিক বিরোধ—পরিবারের সাথে আধুনিক মনস্ক মানুষের কর্মের বিরোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেটি এসেছে আলাপচারিতায়। আলাপে-সংলাপে জীবনানন্দ আধুনিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জীবনের সত্য উপলব্ধি তুলে ধরতে গিয়ে এ উপন্যাসে পারিবারিক বিরোধ সামনে আসে। পরিবারের বৃত্ত ভেঙে জীবনানন্দ যে বৃত্তের জয়গান ঘোষণা করলেন—সে জীবন প্রতিকূলের। তাঁর কল্পনা ও ভাবনার বিষয়াদি উপস্থাপিত হয় এখানে। উপন্যাসে বিধৃত সংলাপগুলো জীবনের নানা ব্যাখ্যা উন্মোচিত করে।

২. থিয়েটার জগত ও পারিপার্শ্বিকতা—সম্ভাবনাময় থিয়েটার জগতকে শিল্পচর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। আর সেই থিয়েটার জগতে বাস্তব মানুষের জীবন কথা মঞ্চায়ণের উপর গুরুত্বারোপিত হয়েছে যুক্তির পরম্পরায়। থিয়েটারের সাথে মানুষের সংযোগ প্রত্যক্ষ। এ কারণে থিয়েটার জনমানুষের সচেতনতায় যতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে, অন্যকোন মাধ্যম ততটা পারে না। কিন্তু থিয়েটারের বাস্তবচিত্র অন্যরকম। সেখানে ভাল নাটক মঞ্চায়িত হয় না, নাটকগুলো একঘেয়েমীতে ভরা। নাটকের চরিত্রগুলোও জীবনের সাথে অন্বিষ্ট নয়। জীবনানন্দ এ কারণে থিয়েটারের সংশোধন চেয়েছেন। চেয়েছেন উন্নতমানের নাটক। সংশয়ান্বিত হয়েছেন—থিয়েটারের অবস্থা বিচারে। আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ভাল নাটক মঞ্চায়নের জন্য।

৩. নারী সমাজের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি—সামাজিক অবস্থায় নারী শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যে ক্রীড়ানক দায়িত্ব পালন করছে, তার প্রতিঘোরতর আপত্তিকর কথা শোনা যায়।

> হাজার হাজার বাঙালী রোজ মরে যাচ্ছে সেখানে আঠারো কুড়িজন করে জ্যান্ত বাঙালী প্রতিটি মেয়ের কাছ থেকে চালানি মালের মত জুটে যাচ্ছে এই অক্লান্ত ক্লেশ ও ধৈর্য্য একটা জাতকে রক্ষা করবার মতো, এই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের কি কোনো মূল্য নেই? (জীবনযাপন)

৪. অনাগত সম্ভাবনার ইঙ্গিত—

পারিবারিক, সামাজিক সংস্কার যে কোন নতুন পথ ও মতকে বাঁধাগ্রস্ত করে, যা খুবই সাময়িক। সেটি সভ্যতার অগ্রগতির কাছে টিকে থাকতে পারে না।

> একজন মানুষই দু'চার বছরের মধ্যে কত মুখোশ বদলে ফেলতে পারে—একটা স্টেজ বা দেশের পরিবর্তনের কি আর সীমা আছে অজিতবাবু? আজ আপনার মা টাকা নিলেন না—একদিন হয়তো এ দেশেরই কত বড় ঘরের কত মা তাঁদের মেয়েদের গিয়ে সাধবেন—অভিনেত্রী হবার জন্য। যে জিনিষ বস্তুনিষ্ঠ সৌন্দর্য্যের এবং হয়তো বা সত্যের একদিন তা তার মূল্য পাবেই। (জীবনযাপন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজিত সীমাবদ্ধ পরিবার জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছে আত্মচেতনা দ্বারা। যুক্তির পরম্পরায় তার অবস্থানকে তুলে ধরে সে। রাঙাখুড়ো তারকবাবুর সাথে সাংসারিক বিরোধ নিয়ে অজিতের কথা হয়। তারকবাবু ও অজিত সম্পূর্ণ দুই মেরুর। একজন পুরোনো মূল্যবোধকে আকড়ে ধরে অজিতকে ফেরাতে চায়, অপরদিকে অজিত আধুনিক মূল্যবোধে অটল ও দৃঢ়চিত্ত। অজিত পুরোনো মূল্যবোধ পেরিয়ে আধুনিক মনস্ক মানুষ। পারিবারিক বন্ধন তার শিল্পকর্মকে বাঁধা দিয়ে আটকে রাখতে পারেনি। তারকবাবু পরিবার সূত্রে অজিতের ঠাকুরদার বন্ধু। অজিতের পরিবার ধর্মচর্চা ও সঙ্কীর্তনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অজিত পরিবারের কথিত বংশগৌরব তথা মান সম্ভ্রবের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। অজিত এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক মানুষ।

উপন্যাসের সমগ্র আলোচনা সংলাপ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে থিয়েটারের সাথে মানুষের মূল্যবোধের বিরোধ, বিরোধ থিয়েটারের প্রচলিত নাটকের সাথে অজিতের ভাবনার। অজিত থিয়েটারকে মানুষের জীবনধর্মী করতে চেয়েছে। অভাব বোধ করেছে বাস্তব জীবন সংশ্লিষ্ট বইয়ের।

> জীবনটাকে সত্যিকারভাবে বুঝবার মতো প্রতিভা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েও দু'একজন লেখক তাদের আন্তরিক সংসত্য এমন অক্ষুণ্ণ রেখেছে দেখলাম যে সেটা আমারও ভালো লেগেছে—আপনারও লাগবে—সে সব বই স্টেজে যারা দেখতে আসবে তাদেরও খারাপ লাগবে না—
> (জীবনযাপন)

থিয়েটারের রূপ-রীতি আঙ্গিক নিয়ে কোনো যৌক্তিক উপস্থাপনা না থাকলেও প্রচলিত গ্রন্থের সাথে তার বিরোধ ছিল। অজিতের সংলাপের মধ্যে দিয়ে জীবনানন্দেরই অভিব্যক্তি স্পষ্টত ফুটে ওঠে।

> উপন্যাস রচনায় জীবনানন্দের কবি-মন চাতুর্যের আশ্রয় নেয় না, লোক দেখানো চোখধাঁধানো কোনো কিছু তৈরি করার চেষ্টা করে না, জীবনের পীড়া জীবনযাপনের অভ্যন্তরে নির্ণয় করতে চায়। (অরুণ মিত্র, জীবনানন্দের উপন্যাস : নিরুপম যাত্রা, সুব্রত রুদ্র সম্পা., পৃ. ৭৫৮)

আসলে তাই। জীবনানন্দের 'নিরূপম যাত্রা' প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক অরুণ মিত্র যে কথা বলেন, তা বোধকরি জীবনযাপন উপন্যাস প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। জীবনযাপনে অজিত, পূর্ণিমা, তারকবাবু, করুণাবাবু সকলেই যুক্তিবাদী। উপন্যাসের ভেতর চরিত্রের কোনো জটিলতা নেই, বরং তা আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল থেকেছে। পূর্ণিমা ও অজিত একই বৃত্তের হয়েও তাদের অবস্থান স্বতন্ত্র। অজিতের চেয়ে পূর্ণিমা আরো এক ধাপ এগিয়ে। পূর্ণিমার ভাষা বা অভিব্যক্তি যুক্তিবাদী অজিতকে বিচলিত করলেও তা ছিল ক্ষণিক স্পর্শ মাত্র। অভিমানী পূর্ণিমা থিয়েটারের গুরুগম্ভীর আলোচনার চেয়ে অজিতের মুখ দিয়ে অন্যকিছু শুনতে চেয়েছিল।

> আপনি ঢের শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছেন আমাদের চেয়ে—অনেক জানেন—অনেক বোঝেন—সদ্বংশের ছেলে-ভগবান আপনাকে ঢের ক্ষমতা দিয়েছেন—থিয়েটারে না এলেও আপনার কিছু এসে যেত না ; যেখানেই যেতেন সেখানেই আপনি মানুষের পূজো পেতেন ; থিয়েটারে আপনি এসেছেন এ আমাদের সৌভাগ্য কিন্তু একটা কথা বলি আপনাকে অজিতবাবু—বরাবর আদর আহ্লাদ পেয়েই হোক বা যে করেই হোক—মনে আমার বড় অভিমান ; সে অভিমান অজ্ঞাত সারেও যদি আপনি এক আধবার ঘা দিয়ে বসেন তা হ'লে বড় কষ্ট লাগে আমার।
> (জীবনযাপন)

পূর্ণিমা ও অজিত, নারী ও পুরুষ। কাছে থেকেও অনেক দূরে তাদের অবস্থান। নারীর মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ণিমা জানে জীবনের প্রয়োজনটাই আসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিনয় জগতে এসে মদের প্রতি তার কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি অজিতের। কথার ফাঁকে ফাঁকে অজিত ও পূর্ণিমা জীবনকে ব্যাখ্যা করেছে। তারা একে অপরের এতো কাছে এসেও তারা মিলনরেখা রচনা করতে পারেনি। জীবনের আবেগ, অনুভূতি পূর্ণিমাকে আড়ষ্ট করে রাখে। অনির্দিষ্ট দুঃখবোধ তাদেরকে পীড়া দেয়।

> হিজলডাঙ্গা নামের যে মধুরতা সে আমার নিজেরই জিনিস ছিল—আপনি এসব বুঝলেন কি করে অজিতবাবু? কেন আপনি জিজ্ঞেস করলেন সে সব মধুর গাছপালা মানুষ ছায়া নিস্তব্ধতার কথা মনে করে আমার দুঃখ করে কিনা? আপনি এসব বোঝেন কি করে? আমি ভেবেছিলাম আমার এ পাড়াগাঁকে আমি ছাড়া কেউ ভালোবাসে না—তার রূপও কেউ বোঝেনা, আপনি এসে বল্লেন—কতদিন হিজলের ফুল দেখি নি তাইতো এত সব ধরা পড়ে আপনার হৃদয়ে। (জীবনযাপন)

হিজলডাঙ্গার কথা মনে পড়ে পূর্ণিমার। শৈশব-কৈশোরের অব্যক্ত স্মৃতি তাকে বিমর্ষ করে দেয়। পারিবারিক জীবনের বাইরে এসে পূর্ণিমা থিয়েটারের ভেতর আপন সত্তার অনুসন্ধান পায়। গাঢ় অনুভূতিগুলো সজাগ হয়ে ওঠে তার সংলাপের ভেতর দিয়ে।

জীবনযাপন উপন্যাসে জীবনানন্দের মনন ও বুদ্ধিদীপ্ততার প্রখর দৃষ্টি উন্মোচিত হয়ে ওঠে। উপন্যাসের একটি মাত্র কপি উদ্ধার করা হয়েছে। দু'একটি বাক্যের কাটা-ছেড়ায় এর কপি পাওয়া যায়। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত গতিধারা থেকে প্রকাশিত জীবনানন্দের উপন্যাস সমগ্রে জীবনযাপনের অনুসন্ধান পাই। এছাড়া এই উপন্যাসটি বিভাব থেকে প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যায় (সম্পাদনায় সমবেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রকাশকাল ১৪০৫, ২য় মুদ্রণ) প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের নামকরণ জীবনানন্দের নয়। নামকরণটি বিভাব' সম্পাদক মণ্ডলীর। গ্রন্থিত উপন্যাসের আলোচনা এখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি। সে কারণে জীবনযাপন প্রসঙ্গে আলোচনা করার অভিপ্রায় থেকে বর্তমান প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের বিষয় বিচারে বোঝা যায় জীবনযাপন উপন্যাসটি যুক্তিবাদী উপন্যাস।

> কবি জীবনানন্দ সম্পর্কে কতকগুলি ধারণা তাঁর জীবৎকাল থেকেই চলে আসছে। নির্জন, রহস্যময় ইত্যাদি—বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত পাঠক তার শ্রেণীর নানা অবসন্নতায় জীবনানন্দকে নিজের মতো ক'রে দেখেছেন। আমরা তাই উপন্যাস আলোচনায়, বিশেষতঃ ১৯৪৮-এর উপন্যাস আলোচনায়, তাঁর মনন ও বুদ্ধিদীপ্ততার ওপর জোর দিয়েছি। সমাজ-ইতিহাস-সময় সম্পর্কে তাঁর যে উপলব্ধি, তাঁকে প্রায় সন্দর্ভর মতো তিনি প্রকাশ করেছেন নানা চরিত্রের মধ্যদিয়ে। প্রচলিত বিতর্ক হয়, নানা উক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে addessivity-তে সভ্যতা সম্পর্কেই এক বীক্ষা বেরিয়ে আসে। ব্যক্তি, দেশ থেকে পৃথিবী—একসূত্রে এসে যায়।
>
> (পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দের উপন্যাসের ভিন্নস্বর)

জীবনযাপনে তৎকালীন সময়ের কিছু চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চরিত্রের নানা উক্তির মাঝ দিয়ে। সংলাপ নির্ভর হয়ে ওঠে উপন্যাস। লেখকের নিজস্ব মতামতগুলো চরিত্রের সংলাপে জোরালো ভাবে ধরা পড়ে। মানবমনের দ্বান্দ্বিক অবস্থা এখানে নেই, আছে চরিত্রের সাথে চরিত্রের সমাজ সংসার বিষয়ক আলাপচারিতা। লেখকের দ্বৈতসত্তা বোধকরি উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মধ্যদিয়ে ফুটে ওঠে স্বাভাবিকভাবে। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে এ বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় চরমভাবে। যেমন মাল্যবান উপন্যাসটি কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেখানে ঘটনার মধ্যে কোনো সংঘাত সংঘটিত হয়নি। জীবনযাপনেও তাই। কোনরূপ সংঘাত নেই। অথচ সে সব উপন্যাস যেন ভিন্ন আয়োজনে সমাদৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনযাপন : অসমাপ্ত সম্ভাবনা

কামরুল ইসলাম

এক. সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস : জীবনযাপন

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতার বিস্তৃতির বাইরে গদ্য সাহিত্য রচনা প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাসে তাঁর একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ আমরা লক্ষ্য করি। কবিতার বিশাল বিস্তৃতি ও নতুনচেতনার বিপরীতে রচিত উপন্যাস জীবনানন্দকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। উপন্যাস প্রান্তরে তাঁর পদচারণা সত্যিই অভাবনীয়। জীবনের নানা ঘটনার প্রান্ত ঘেঁষে তাঁর আহ্বান যেন সময়ের স্রোতে প্রবাহিত অসংখ্য ঘটনার নান্দনিক উপস্থাপনা। জীবনকে বোঝার, জানার অভিপ্রায় কালে কালে সৃজনশীল মানুষকে সমাজের অভ্যন্তরে টেনেছে, অপরদিকে মানুষ সমাজের ভেতরে অবস্থান করেও তাঁর একক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বিচ্ছিন্ন করেছে পারিপার্শ্বিকতা থেকে। জীবনানন্দের কৌতূহল ও ভাবনার মাঝে উপন্যাসের উপস্থাপনা ছিল সরল, অথচ তা বাক নিয়েছে অন্তহীন পথে। জীবনানন্দের জীবনযাপন উপন্যাস অন্তহীন পথের পথিক, জীবনের জটিল ঘুরপাকে তা বার বার মোড় নেয় আমাদের চারপাশের অসংলগ্ন মূল্যবোধে। মূল্যবোধের টানাপোড়েন ও জীবনের নানা জটিলতায় তা যেন আরও জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

> মানুষের জীবনটা বুঝতে গিয়ে কোথাও ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই। এই সত্য প্রচেষ্টার ভিতর তবুও এমন সংসত্য রয়ে গেছে যে অনেক দুঃখ অনেক গ্লানি বিচ্ছেদ ও নিষ্ফলতার এই জীবনটাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে না-এর গভীর মূল্যের কথা ভেবে আপনাদের অবাস্তব নিয়ে পড়ে থাকতে ভালো লাগে না আর—(জীবনযাপন)

জীবনানন্দের জীবনযাপনে অজিতের সংলাপে যে কথার স্ফূরণ ঘটেছে তা আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনকে ধারণ করে। জীবনানন্দ জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন। সমাজ জীবনের অসংলগ্ন পরিস্থিতি যুক্তির পরম্পরায় উপস্থাপিত হয়েছে জীবনযাপনে। জীবনের অর্থ এখানে ভিন্ন, আয়োজন বিস্তৃত, সমান বাস্তব জীবন নির্মম এবং জীবনের অর্থ ফুটে ওঠে অন্যভাবে—

> আজ আমাদের জীবনে, প্রকৃত জীবনে, সত্তার নিগূঢ় প্রকৃতির সঙ্গে বাস্তবের দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অবচেতনার কামনা বাস্তবের ক্লেদে পরিণত। ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সাধনা নাই। বিজ্ঞান কেবলই বাইরের দিক দিয়ে শক্তিমান করে তুলছে মানুষকে—অন্তরে আমরা ক্রমশই একা, দুর্বল হয়ে পড়ছি। যতই সম্পদ এবং সুখের সাধনা করছি ততই নিঃস্ব এবং দুঃখী হচ্ছি। ঘা লুকিয়ে যতই হাসিমুখ দেখাবার চেষ্টা করছি ততই তাজা ন্যাকড়ার ফালি ঢুকে যাচ্ছে নালী ঘায়ে। দেখছি এ জীবনে হৃদয়ের জন পরিজন সব হারিয়ে যায়। আমাদের অমিযাশী হৃদয় সবরকম মাংস আস্বাদ আমাদের অস্তিত্বকে মিথ্যা করে দিচ্ছে। নিজেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা নিজের বিষয় করে নিয়েছি। নিজের অস্তিত্বের ভাঙা টুকরোগুলিকে খুঁজে চলেছি আমরা। (শৈলেশ্বর ঘোষ, জীবনানন্দ ও উত্তরকাল, শঙ্খ ঘোষ সম্পা., পৃ. ২৯)

জীবনানন্দের জীবনযাপন এ সবের অভিযাত্রাকে একসাথে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। অজিতকে ঘিরেই ঘটনার আবর্তন। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অজিত, বর্তমান পরিমণ্ডল থিয়েটার জগত। থিয়েটারের সংস্পর্শে আসার পর বাবা–মা, আত্মীয়–স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অজিত। অন্য এক জীবনে প্রবেশ করে সে। যে জীবনকে অজিতের পরিবার মোটেই মেনে নেয়নি। সামাজিক সংস্কারের বৃত্ত ভেঙে অজিত বেরিয়ে এলেও তার পরিবার সযত্নে দূরে থেকেছে। সেখানে এসেছে পূর্ণিমা। অজিত ও পূর্ণিমার পেশা এক। পূর্ণিমার প্রতি অজিতের আকর্ষণ তীব্র, অথচ তা সংযত আবেদনে পরিবেশিত।

> ভোরের আলো জানালার ভিতর দিয়ে এসে পূর্ণিমার মুখ ঘিরে একটা দিব্য রৌদ্রচক্র সৃষ্টি করেছিল ; সেই আভার ভিতর পূর্ণিমাকে আকাশযানী দিব্যযোনির মতন মনে হচ্ছিল।
>
> (জীবনযাপন)

অজিতের সাথে পূর্ণিমার স্বাভাবিক সখ্যতা গড়ে ওঠে পেশাসূত্রে। তা ধীরে ধীরে ভালো লাগার স্পর্শে স্পর্শিত হয়। কিন্তু সেই স্পর্শ গভীরে পৌঁছার আগেই ছেদ্পতন ঘটে। অজিত নামকরা শিল্পী। অভিনয়ে তার জনপ্রিয়তা সীমাহীন। ক্লান্তিহীন জীবনে এসে ভিড় করে খ্যাতির বিড়ম্বনা। খ্যাতির সীমানায় অজানা আরেকজনের সাথে দেখা হয়। অজিত জানতে পারে 'আকাশযানী দিব্যযোনি' পূর্ণিমা শুধু তার একার নয়। পূর্ণিমার অভিনয়খ্যাতি অজিতের মতো। সেখানে অসংখ্য মানুষের আনাগোনা। পূর্ণিমা অজিতের একমাত্র নয়। অজিত ফিরে আসে নিজের একক সত্তায়। জাগতিক জীবনের অসংখ্য নৈমিত্তিক ঘটনায় বিভোর হয় অজিত। এক বিস্তৃত সম্ভাবনার অসমাপ্ত আবেদন নিয়ে সমাপ্তি ঘটে উপন্যাসের।

জীবনযাপন উপন্যাসের অবয়ব বিশাল না হলেও তার আবেদন অনেক বেশি। ঘটনার একমুখী প্রবাহ এবং যে প্রবাহ নিয়ে উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা যেন এক অসমাপ্ত আবেদন। সংলাপ নির্ভর এ উপন্যাসে যুক্তি তর্কের নানা সংশ্লেষে সামাজিক জীবনের বিপরীত প্রবাহ ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে। থিয়েটর জীবনের কথা নিয়ে জীবনযাপনের অবয়ব। সমাজে থিয়েটারের মর্যাদা তখনও সকল স্তরে পৌঁছায়নি। অজিতের জীবন থিয়েটারের জীবন। বাবা–মা পরিজনদের আশাভঙ্গ করেছে সে। অজিত লেখাপড়া জানা উচ্চশিক্ষিত ছেলে। বাবা মায়ের আশা ছিল অজিত বড় চাকুরী করবে। অজিত চাকুরী পেয়েছিল ফার্মে কেমিক্যাল অ্যানালিস্টের এবং সাথে অধ্যাপনার। কিন্তু অজিতের মন সেখানে বসেনি। কবিতা লেখা ও ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করার অভ্যেস থাকলেও মন সেখানেও আবদ্ধ থাকেনি। অতৃপ্ত মন আরও কিছু চায়। সরাসরি থিয়েটার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয় অজিত। অজিতের কথাবার্তায় তার পরিচয় মেলে—

> কিন্তু বাংলা গল্পের আমাদের বাঙালীর জীবনের কথাবার্ত্তা নিজের মনের মতো ক'রে বলতে পারলাম এমনই মনের মতো করে যে নিজেই অনেক সময় বিমুগ্ধ হয়ে বসে থাকতাম, ভাবতাম এইতো কথাবার্ত্তা যা কতসময় আমরা বলি, কতসময় আমরা শুনি—এইতো সব ভাবরস যা এমন কিছু গভীর ধোঁয়ার জিনিষ নয়, কিন্তু তবুও এইসব উপকরণ ব্যবহার করেই যতক্ষণ না কবি তার বিধাতার মতো হাত নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে একটা গল্প তৈরি করল ততক্ষণ এসবের মর্যাদা আমরা বুঝতে পারলাম কৈ? —তারপর আমি এলাম, আমিও কবি ; নট আমি—মানুষের জীবনের গল্পের আশা সাধ বিচ্ছেদ নিষ্ফলতার আমিও এমন মর্য্যাদা দিলাম যে লোকে গল্প লেখককেও ভুলে গেল—(জীবনযাপন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬. ১২. '৩৩ তারিখে লিখেছেন : ' ... Our marriage is scrap ... সারাদিন কাঁদে ...আমায় ধুলোয় মিশিয়ে দেয় ... মুক্তি চায় ... উঠে পড়ি ...কি করব? আত্মহত্যা? হার্ট ফেল? শীতের রাতে অন্ধকারে পুকুরে ডুবে মরব? ...আগে এরকম করার পর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইত ...। (ঐ) সুকুমার ও মালতীর জীবনের নির্যাসটুকু এর থেকে অন্যরকম ছাঁদের বলে মনে হয় না। সুকুমার সাদা সিধে জীবনের কথা ভাবে। যা ভবিতব্য তা হবেই, তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই, কি হবে বলে মা দুশ্চিন্তা করলে সুকুমার বলে

> ভবিষ্যতে রোজগার করতে পারব আশা করি ! অন্তত না খেতে পেয়ে মরব বলে মনে হয় না ; আমি যতদিন বেঁচে আছি সিঁথিতে সিন্দুরের অভাব হবে না তার ; মরে গেলে বিধবার থান পরবে ; এর চেয়ে কী বেশি চাও তুমি আর? অনেকে তো এটুকুও পায় না।
>
> (প্রেতিনীর রূপকথা : জীবনানন্দ দাশ)

হার্ডির 'ওয়েসেক্স পোয়েমস' থেকে ছাতুকুরো মুছে ফেলে সাহিত্যে ও আর্টে এক বন্ধ্যাসময়ের ইঙ্গিত দিয়েছে কথক। হয়তোবা সে ভাল পাঠক, যে আনাতোল ফ্রান্স, ভোলতেয়ার ভিঁলো, হার্ডি কিংবা টি. এস. ইলিয়ট পড়তো এখন ইচ্ছা করেনা বা সময় পায়না বা কথক নিজেই লেখক এবং 'ওয়েসেক্স পোয়েমের' উপরে পড়া 'ছাতকুরো' তার কলমেও ধরেছে। উপন্যাসের প্রথম ভাগ সাংসারিক অনিশ্চয়তা, গৃহিনীর অনাদার, মায়ের দুঃশ্চিন্তা, কথকের বইগুছানো ও কলকাতা যাত্রা দিয়ে সন্নিবেশিত। এই অংশে প্রেতিনীর রূপকথা শুরু হয়েছে কি? ভাবতে গেলে আবার ফিরে যেতে হয় লেখকের ডাইরিতে। ৩১ আগস্ট, ১৯৩৪ তারিখের ডায়েরিতে জীবনানন্দ লিখেছেন : 'L-terrible অবস্থা for 3-4 days—দরজাবন্ধ, নাওয়া না, খাওয়া না, শুধুমুড়ি—দিনের পর দিন—কোনো অনুনয় বিনয় কিছু না ... Will starve to death ... এ বাড়ীর সবাই তার পর ... ওকে ভূতে পায় নাকি? (অমিতানন্দ দাশ সম্পা. : প্রাগুক্ত)। মালতি উপরের ঘরে শুয়ে রইলো। নেমে আসার প্রয়োজন বোধ করলোনা। মালতিকে ভূতে পেয়েছে নাকি? এই ধরনের একটা প্রশ্ন হয়তো সুকুমারেরও অবচেতনে কাজ করেছে। তাই প্রেতিনীর রূপকথা প্রথমভাগেই শুরু হয়েছে। এক স্ত্রীর কাছে প্রত্যাশিত প্রেমের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে এক প্রেতিনীর জন্ম হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতেই মালতি আসে অন্ধকারে। সুকুমার প্রশ্ন করে কে? মালতী বলে আমি। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু সুকুমার তাকে 'বস' বললেও তেমন জোড় সেখানে পাওয়া যায়না, কেননা অবশ্যম্ভাবী 'না' এর তোরে তা মুছে যাবে, এটা সুকুমার জানে এবং উত্তর আসে 'না'। কথক এবং তার স্ত্রী মালতীর এই সংলাপ, সংলাপ মাত্র নয় এ যেন তাদের আন্তঃবৈপরিত্যের এবং দ্বন্দ্বের স্রোতকেই বহমান করে। প্রেতিনীর অশরীরত্ব জানিয়ে দেয় না পাওয়ার এক বিশাল অঙ্ক অথবা পিউরিটান জীবনানন্দের আত্মিক চাওয়াই হচ্ছে অশরীরী প্রেম ! ১৩ মার্চ ১৯৩২-এর দিনলিপিতে জীবনানন্দ লিখেছেন : 'Whenever any one says অমুকে অমুকের পেট করে দিয়েছে—immediately. get shocked however free I might think me to be ... the moralist--the puritan inheritence still lingers' (আহমাদ মাযহার সম্পা. : জীবনানন্দ বিচিত্রা)

এই Puritan উত্তরাধিকারই হয়তো তাঁকে স্ত্রীর কাছে ইপ্সিত পুরুষ করে তুলতে পারেনি। কারণ তাঁর প্রেম দেহে নয়, আত্মার গভীরতায় বিশ্বাসী, বোধে বিশ্বাসী। 'প্রেতিনীর রূপকথায় তিন প্রেতিনীর দেখা মিলে। তাদেরকে জীবনানন্দের কবিতাতেও পাওয়া যায় :

> ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে
> অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
> ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে।
>
> (বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালতী এবং সুকুমারের আন্তঃসম্পর্কের সুন্দর ও সাবলিল বর্ণনাও পাওয়া যায় 'বোধ' কবিতায় :

> আমারে সে ভালোবাসিয়াছে
> আসিয়াছে কাছে
> উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
> ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে বারে
> ভালোবেসে তারে
> তবুও সাধনা ছিল একদিন—এই ভালোবাসা
> আমি তার উপেক্ষার ভাষা
> আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
> অবহেলা করে গেছি ; যে নক্ষত্র নক্ষত্রের দোষ
> আমার প্রেমের পথে বার বার দিয়ে গেছে বাধা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে 'বোধ' এবং প্রেতিনীর রূপকথা প্রায় একই সময়ে রচিত। কবিতায় উল্লেখিত 'নক্ষত্রের দোষ'ই হয়তো সুকুমারের বেকারত্বের কারণ। যা থেকে উত্তরণ কোনদিনই তার হয়নি। তাই 'বস' এর উত্তর অবশ্যম্ভাবী 'না' তে পর্যবসিত হয়েছে। উপন্যাসের দ্বিতীয় আখ্যানে নায়ক কলকাতার যাত্রী। স্টিমারের লোকের ভীড় এড়াতে সে বেছে নিয়েছে যাত্রীদের মূত্র ত্যাগের স্থানটিকে। তার নির্লিপ্ত ভাবটি এবং যে কোনো মূল্যে প্রকৃতিকে উপভোগ করার সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষাটি তার স্থান নির্বাচনের উদারতার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিতে ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুকুমারের প্রকৃতি প্রেম এবং প্রকৃতির মাঝে সুকুমারের অতীত, বর্তমানের মরে যাওয়া মানুষও আকাঙ্ক্ষার অন্বেষণ পুরো যাত্রা পথকে সমাচ্ছন্ন করেছে। স্টিমারের গতি ও নদীর স্রোতের সাথে বেগবান হয়েছে নায়কের আত্মকথন ও স্মৃতিচারণ। এ পর্যন্ত একজন বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত এম.এ. পাশ যুবকের আশা ও আকাঙ্ক্ষার নির্মম মৃত্যুর কাব্যময় গাথা, মাঝে মাঝে দু একটি বিচ্ছিন্ন সংলাপ এবং সর্বোপরি প্রকৃতির বিরাটত্ব ও নির্লিপ্ততা ও বিশাল আশ্রয় নিয়ে সর্বক্ষণিক উপস্থিতি সুকুমারের কলিকাতা যাত্রাকে এক বিশাল ক্যানভাস দান করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি একটি উপন্যাসের কাঠামো লাভ করেছে। এ যাত্রার উদ্দেশ্যের যেমন কোনো দৃঢ়তা নেই তেমনি কোনো পরিনতি বা সম্ভাবনাও নিশ্চিত নয়। কিছু একটা হবে বা হবেনা এমনই এক ধরনের গা এলানো ভাব আছে সুকুমারের। রূপকথার নায়কের মত কিছু জয় করে আনার বা ছিনিয়ে আনার কোনো দায়বদ্ধতা তার মধ্যে নেই। তবে রূপকথার কল্পজগতে বাস করতে সে খুবই ভালোবাসে। অথবা ইউটোপিয়া নিরন্তর তার মনের মধ্যে ভর করে থাকে। তাই দেখা যায় সুকুমারের চিন্তা কেমন যেন ভাসা ভাসা উর্ধ্বগামী। তার অলসতা হয়তো তার জন্মগত বৈশিষ্ট্য বা লেখক এটাই দেখাতে চেয়েছেন যে বিশ্বযুদ্ধত্তোর সময়ে বেকার সমস্যা, ভঙ্গুর অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের ছেলেরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে কিভাবে ক্রমান্বয়ে অলস হয়ে পড়েছিল সুকুমার নিশ্চিত জানে যে, যে সময়ে তার বাস, যে পৃথিবীতে তার জন্ম তা এক বন্ধ্যা সময়, তা এক 'অদ্ভুত অপৃথিবী'। তাই তার চাকুরি–সন্ধান–যাত্রা শেষ পর্যন্ত হৃদয় খুঁড়ে ভালোবাসা–সন্ধানের–অন্তর্যাত্রার থিতু হয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের ছেলের ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাশ করা কোনো বৈষয়িক সুবিধা আনে না, তার ক্ষুধা নিবৃত্তির কোনো সুযোগ নেই। এই অক্ষমতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের যে দ্বৈতসত্তা অন্তরে প্রবাহমান ছিল সর্ন্তপণে, তারই উদ্‌ভাসিত রূপ উপন্যাসের চরিত্রে। ১৯৩১ থেকে '৩৩ এর উপন্যাসে বেকার যুবকের আত্মসংলাপ, জীবনের নির্মমতা স্থান পেয়েছে, অপরদিকে '৪৮–এর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে স্বল্পবেতনে চাকুরেদের হতাশা ও জীবনের জটিল জিজ্ঞাসাসমূহ। এটি তাঁর যেন অসংখ্য আত্মজৈবনিক জিজ্ঞাসা। আধুনিক উপন্যাসের সার্থকতা জীবনের বিস্তারে, নাকি ব্যক্তি হৃদয়ের অন্তরতম ভাবনায়। তিনি জানতেন জীবনের বিস্তৃতি ও সমগ্রতায় উপন্যাস ধরা সম্ভব নয়।

জীবনানন্দকে নিয়ে এখনও অনেক আলোচনা চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। তাঁর অপ্রকাশিত রচনা যতই প্রকাশিত হচ্ছে, ততই জীবনানন্দ অন্যভাবে আবিষ্কৃত হয়ে ওঠেন। জীবনানন্দের অন্য আবিষ্কার তাঁর উপন্যাসে। এখানে তাঁর জীবনের ব্যাখ্যা ও দর্শনকে খুঁজে পাওয়া যায়।

জীবনানন্দের মতো একজন যুগ–প্রবর্তিয়তা সাহিত্যিকের পক্ষে তাঁর রচনাবলি–ই তার সমগ্রতা নয়। জীবনানন্দ আমাদের পঠনের সৃষ্টিশীলতায় আহ্বান করেন। জীবনানন্দ দুর্বল পাঠকের কবি বা লেখক নন। তিনি এক যুগকে ভাষা দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর পরবর্তী যুগের ভিতর বহুদূর পর্যন্ত করেছেন। এমন কবি ও লেখকের জন্য পাঠককে সাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে হয়। জীবনানন্দ তাঁর সেই পাঠকের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

(দেবেশ রায়, অন্য এক আরম্ভের অপেক্ষায়। শঙ্খ ঘোষ সম্পা., পৃ. ১৬১)

জীবনানন্দ পাঠকের সৃজনশীলতায় আরো আবিষ্কৃত হবেন—এই প্রত্যাশা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেতিনীর রূপকথা : ইচ্ছার অপমৃত্যু

কাকলী মুখোপাধ্যায়

প্রেতিনীর রূপকথা উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৩৩। ৪.৮.'৩৩ এ লেখা জীবনানন্দ দাশের ডাইরি থেকে পাই এক চরম অনিশ্চয়তার আভাস : 'What to do? Tea shop? Sweet shop? Bakery? Poultry? Fish farming? Opium selling? Wine shop? Shoe making? Plaster from roof fell on my head early morning ...' (অমিতানন্দ দাশ সম্পা. : জীবনানন্দের ডায়েরি থেকে সংকলন) 'প্রেতিনীর রূপকথা'র শুরু হয়েছে গৃহিনীকে শেষ সম্বল বসতবাড়ি বিক্রয় করে ঋণমুক্ত হবার সংবাদ দিয়ে। কাজেই What to do? এই প্রশ্ন দিয়েই উপন্যাসের নায়কের দিনের শুরু হয়েছে। সুকুমারের স্ত্রী মালতির মনে উদ্বাস্তু হবার সংশয় :

> জায়গা জমি কিছু আমাদের নেই?
> কিছু না
> কবে বিক্রি হল?
> প্রায় বছর তিন–চার আগে
>
> (প্রেতিনীর রূপকথা : জীবনানন্দ দাশ)

সুকুমার অগত্যা চাকুরির সন্ধানে কলকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ইনসিওরেন্সের দালালি বা মাস্টারি একটা জুটিয়ে নিতেই হবে। ইংরেজি সাহিত্যের এম. এ. পাশ সুকুমার ভাবে : ' ...ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হলেও ভাল হত, কিন্তু পাশ করলাম ইংরেজি লিটারেচারে এম. এ.। এখন এই বয়সেও আমার জুতো সেলাই শিখতে ইচ্ছা করে' (ঐ)। সংসারের আসন্ন দারিদ্র্য, অভাব মালতীকে বিমূঢ় করে। সুকুমার কলকাতায় যাবে, কিভাবে যাবে, কি নিবে এসব ভাববার রুচি বা প্রবৃত্তি তার হয় না। কারণ সে হয়তো তার স্বামীর ক্ষমতা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। সে যে সুবিধা করে উঠতে পারবে না তা সে বেশ জানে। মা ছেলের কাছে এসে দাঁড়ায়। বাক্স গুছাতে সাহায্য করে। স্বামী–স্ত্রীর এই দূরত্বের প্রতি কটাক্ষ করে। নিবারণ কাকা বিদেশে যাবার তিন দিন আগে থেকে বিভা কাকীমা কাঁদতো—ভালোবাসার এই মহান দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মা যখন মালতীকে দোষারোপে ব্যস্ত তখন সুকুমার বলে : 'ভালোবাসার পরিচয় কান্নার ভিতরেই নেই শুধু ... এক একজন মানুষের নতুনত্ব এক এক রকম'(ঐ)। এই একই সময়ে বেকার জীবনানন্দ তাঁর গৃহবিবাদের রোজ নামচায় লিখেছেন : ' ... The same old rejection—কথা বন্ধ ... তুমি আমার কি benefit করেছ চার বছরের মধ্যে? ... her great concern and solicitudes for me step by step brought down to this callous negativity ...' (অমিতানন্দ দাশ সম্পা. : প্রাগুক্ত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, নীল আকাশ থাকবে, নক্ষত্র থাকবে, ভোর থাকবে, রোদের মাছি থাকবে, হাজার হাজার বছর পরেও এমনই ফাল্গুনের বিকালের পড়ন্ত রোদের ভিতর হয়তো কোনো যক্ষ্মারোগীর ঘরের মাছিগুলো ডানা কাঁপাবে, উড়বে, খেলবে, জীবনের গভীর স্পৃহা ও আনন্দে বিচিত্র হয়ে থাকবে।' (মৃণাল)

১৯৩১ থেকে, ৩৩ পর্যন্ত উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাস আছে, কিন্তু সে সব ক্যানভাসের গতি মাঝে মাঝে শ্লথ হয়েছে। এসব উপন্যাসের আঙ্গিক শৈলী, শৈল্পিকতা বিচারে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়, কিন্তু একথা সত্য তিনি জীবনকে অন্যভাবে দেখেছেন। সে কারণে অপরাপর ঔপন্যাসিক থেকে তাঁর ভাবনা এবং অনুভব স্বতন্ত্র ছিল। জীবনের ব্যাখ্যা এখানে ভিন্নতর। পৃথিবীব্যাপী যে টানাপোড়ন ও সামাজিক অবক্ষয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশ তা সামগ্রিকভাবে মুখ্য হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসে।

১৯৪৮-এ রচিত উপন্যাসসমূহ

১৯৩৩-এর পনের বছর পর জীবনানন্দ আরো চারটি উপন্যাস লেখেন। অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের উপন্যাসগুলো হচ্ছে মাল্যবান, সুতীর্থ, বাসমতীর উপাখ্যান, জলপাইহাটি। ১৯৪৮-এর উপন্যাসের সাথে ১৯৩৩-এর উপন্যাসের পার্থক্য প্রচুর। ১৯৩৩-এর উপন্যাসে 'আমি' ন্যারেনেশনের উপস্থিতি আছে, যেটি ১৯৪৮-এ নেই। তাছাড়া '৪৮-এর উপন্যাসের জীবনের জটিল যন্ত্রণা ও গভীরতা তীব্রভাবে ধরা পড়ে।

ছ. সুতীর্থ

জীবনানন্দের 'সুতীর্থ' উপন্যাসটি সব দিক দিয়ে ব্যতিক্রম। নায়ক সুতীর্থ একসময় লিখতো, কিন্তু সে সব ছেড়ে দিয়েছে এখন। এই অবিবাহিত যুবকের পাশে ভিড় করে বিরূপাক্ষ, ক্ষেমেশ, মণিকা, জয়ন্তী। বিরুপাক্ষ ও ক্ষেমেশ দু'জন বিপরীত মেরুর। বিরূপাক্ষ অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করে, আর ক্ষেমেশ ক্ষুয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের শেষ প্রতিনিধি। বিরূপাক্ষের স্ত্রীর সাথে ক্ষেমেশের সম্পর্ক পুরনো প্রেমিক হিসেবে। সুতীর্থ বিরূপাক্ষ ক্ষেমেশের সাথে মিশতে পারে না। 'জীবনানন্দ অন্য নায়কদের মত সুতীর্থ কিন্তু নিজের গহন অন্তর প্রদেশে, উদ্ভিদ জগতে, পাখির মত করে, এক সেই অশ্বত্থগাছ—লালবাড়ির স্বপ্নে বাঁচতে চায় নি। সে জীবনের চ্যালেঞ্জকে বহির্বাস্তবেও গ্রহণ করে। অভিজ্ঞতার সিঁড়িগুলো টপকাতে চায়। সুতীর্থ টক্কর দেয় বিরূপাক্ষর মত লোকের সঙ্গে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।' (পার্থপ্রতিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮) সুতীর্থের সাথে জীবনানন্দের অন্যান্য উপন্যাসের নায়কদের পার্থক্য এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। সে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত, কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাস টানাপোড়নে সুতীর্থের আশাভঙ্গ হয়। "সুতীর্থর শ্রমিক ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়া আকস্মিক নয়—তার ছোটবেলা থেকে দল রাজনীতির ইতিহাস আছে। সেই সময় থেকেই বিপ্লবী দলের হত্যা, নেতাদের চেহারা সব দেখে। বার বার জেলে যায়। বিপ্লব করা, জেলে যাওয়া, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী নেওয়া, সাহিত্য করা—সব করেও তার কিছু হয় না। কারণ ধর্ম নেই। পৃথিবীটাই খারাপ। সুতীর্থ চেয়েছিল মণিকাকে ধর্মঘটে জড়াতে, চেয়েছিল জয়তীকে নিয়ে গ্রামে যেতে। বাঘ-বাঘিনীর উপমায় সুতীর্থ-র মণিকার প্রতি যৌন আকর্ষণের ইঙ্গিত থাকে—কিন্তু সুতীর্থ এ সীমা পেরিয়ে চলে যায় গ্রামে। কোন গ্রামে তা বলা থাকে না। গ্রাম যে ছায়া সুনিবিড় স্বর্গ নয়, সেখানেও শোষণ-বোকা মানুষ—বিশৃঙ্খল আছে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতীর্থ উপন্যাসে নির্মম বাস্তবতার যে ছাপ, তা জীবনানন্দের অন্য উপন্যাস থেকে ভিন্নতর। বিশ্বে মানুষ একা। তাকে বসবাস করতে হয় একক প্রচেষ্টায়। কারণ 'কেউ কারো কাছ থেকে কিছু লাভ করতে পারে না—পৃথিবী চলছে, সুতীর্থ চলেছে—সূর্য জ্বলে—এইসব মেধাবী গভীর মর্ত্যের থেকে কয়েক বছরে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল তার মন ; ফিরে আসতে চাচ্ছিল এসবের দিকে ; —কিন্তু পারছে না সূর্যের চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার। গ্রামের অনির্দেশ যাত্রায় সুতীর্থ এগিয়ে চলে।' (দেবীপ্রসাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৮)

জ. বাসমতীর উপাখ্যান

'বাসমতীর উপাখ্যান' উপন্যাস দীর্ঘ। 'বাসমতী ও জলপাইহাটি" ভিন্ন উপন্যাসের ভিন্ন কল্পিত নাম হলেও, আসলে তারা একই স্থানের দুটি নাম। সময়ও প্রায় এক—দেশভাগের আগে ও পরে। বাসমতীতে দেশ স্বাধীন হচ্ছে, আর জলপাইহাটিতে দেশভাগ হয়ে গেছে ; ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ও পাকিস্তান। এই সময়ের ঘাস, মানুষদের নিয়ে দুটি বৃহৎ উপন্যাস 'মিলে নিঃসন্দেহে' এক পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করে।' (পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২) এ উপন্যাসে প্রেক্ষাপট বিস্তৃত ও আলোচনাও দীর্ঘ। মধ্যবিত্তের জীবন তার সাথে সংযুক্ত হয় ব্রাহ্ম-আন্দোলন, ক্যাথলিক মিশনারী সহ ইতিহাস ও সমাজের নানা অভীপ্সা। '৪৭-৪৮-এর ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশভাগের সিদ্ধান্তের জটিল পরিস্থিতি ফুটে ওঠে বাসমতীর উপাখ্যান ও জলপাইহাটিতে।

> বাসমতীর উপাখ্যানে'র ঘটনা পরম্পরার সবটাই বিভাগ পূর্বকালের পূর্ববাংলার এক নদী আশ্রিত তথাকথিত মফঃস্বল শহর এবং বিশেষ করে তার কলেজ এলাকা। 'জলপাইহাটি উপন্যাসটিতে বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার এক কলেজকেন্দ্রিক শহরের পাশাপাশি এসেছে বিভাগোত্তর কলকাতা মহানগরীর জীবনবৃত্ত।
>
> (রণেশ দাশগুপ্ত, জীবনানন্দের মার্কস লেনিন কমিউনিস্টরা, সুব্রত রুদ্র সম্পা. পৃ. ৭৬০)

বাসমতীর উপন্যাস-এ জটিল উপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্তির সম্ভাবনা ও ইচ্ছার প্রকাশ পায়। রাষ্ট্র গঠনের মতামতের পাশাপাশি পূর্ববাংলার গ্রাম, সমাজ, তার নৈসর্গিক পরিবেশ, মেঘ,নদী, চাঁদ বৃক্ষরাজির চমৎকার বর্ণনা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এ উপন্যাসে।

জীবনানন্দের উপন্যাসের বিশাল বিস্তৃতির ব্যাপক আলোচনা ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। প্রায় সমগ্র উপন্যাস নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনার সূত্রপাত ঘটলো। জীবনানন্দের উপন্যাসে অসংখ্য সংলাপ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। যে সৌন্দর্যের সন্ধান তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়, এখানেও তার উপস্থিতি আছে। গ্রাম ও শহরের ব্যবধানের পাশাপাশি স্বতন্ত্র মানুষের উপস্থিতি ব্যাপক। তবে একথা সত্যি যে, উপন্যাসে জীবনানন্দ নিজস্ব স্টাইলে কাহিনী সৃষ্টি করেন। সে সব কাহিনী আমাদের চেনাশোনা জগতের, কিন্তু সেখানে তীব্র জটিলতা সেভাবে ফুটে ওঠেনি। ঘটনা এসেছে, বক্তব্য এসেছে, ভাবনা এসেছে, সংলাপের অভিনবত্ব আছে, কিন্তু কোথায় যেন এক ধরনের অতৃপ্তি ভর করে। এই অতৃপ্তি পাঠকের, নাকি জীবনানন্দের। যে জীবন জীবনানন্দ দেখেছেন, সে জীবন জটিল ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়ে প্রকৃতির অনুসন্ধানী হয়েছে। কাব্যিক স্পর্শে রঞ্জিত হয়েছে সে সব, রোমান্টিক ও প্রাকৃতিক ভাবালুতার সাথে একীভূত হয়েছে তাঁর মর্মচেতনা। চরিত্রগুলোও ঘুরে ফিরে অজানার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায়, মৃত্যু এখানে শীতল, বেঁচে থাকা সহজ-স্বাভাবিক, জীবনের ভাবনা দ্বৈতসত্তায় সংকুচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিজে ডালপালা, জামগাছ, লক্ষীপেঁচা—যেন এক অপূর্ব শোভায় শোভিত হয় এবং তার পাশে জীবনের উচ্ছ্বলতা ও যন্ত্রণাগুলো মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়।

খ. প্রেতিনীর রূপকথা

'প্রেতিনীর রূপকথা' অশরীরী প্রেমের কথকতা নিয়ে রূপায়িত। এ উপন্যাসের কাহিনী স্বতন্ত্র ও ভিন্নস্বাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানেও 'আমি' যেন নিঃসঙ্গ পথের পথিক। 'একদা জমিভিত্তিক পারিবারিক ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের মধ্যে এই ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাকীত্বের কথা, এভাবে ১৯৩৩-এ কেউ বলেননি। এই একাকীত্বের জন্যই সে যেতে চায় দেশের বাড়ীতে, যেখানে এখন হেমন্ত, ধান ঝরছে, মাঠ হয়ে আছে হলুদ, দোয়েলরা পোকা খুঁটে খায়, বিষণ্ন চিল উড়ে উড়ে কাঁদতে থাকে। অপরাহ্ন রোদের ভিতর বিমর্ষ মাছির দল গুঞ্জন করে ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে যায়। দিগন্ত নিস্তব্ধ : দু'চারটা শালিক ও চড়াই মাঠের ঘাসে ঘাসে ঠাংভাঙা দুঃখী ভিখিরির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে।' (প্রে. রূ) জীবনানন্দের এই উপন্যাসে চিত্রকল্পর ব্যবহার কবিতার মতো। কবি ও ঔপন্যাসিক যেন একসূত্রে ধরা দেন এ উপন্যাসে।

'এই সব দিগন্তে নিশুতির বুকের ভিতরেই সে যেন শরীরী হয়ে ওঠে : মাঠে যঠি ফুলের মতন ফিকে গোলাপি মুখখানা তার, হৃদয়ে তেমনি নরম নিভৃত গন্ধ, সোঁদা ঘাস মাড়িয়ে চলেছে সে, সাপের গর্ত এড়িয়ে, সাদা শাড়ি চোর কাঁটায় ভরে যাচ্ছে, আঁচলের বাতাসে কাশ দুলছে, এক বিষণ্ন হলুদ কলাপাতার পিছনে গ্রামের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।' (প্রে. রূ) এ উপন্যাসে লেখকের কবি দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে। এর কাহিনী, ভাষা, শব্দচয়ন, উপমা, প্রতীকের ব্যবহারের মধ্যে তাঁর স্বতন্ত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই স্বতন্ত্র উপলব্ধি কবিমানসজাত। এখানে সোনালি চিলের লগ্ন নির্জন হাতের সাথে অবাধ স্মৃতি, রূপকথা, অবলুপ্ত নগরী যেন এক অপূর্ব সৌন্দর্যে ধরা দেয়। এখানে 'আমি' উদভ্রান্ত, বিষণ্ন, পথহারা। সে কখনো পক্ষীর জীবন, আম-কাঁঠালের ডালের টুনটুনি, কখনো জঙ্গলের ময়না, কখনো অমাবস্যার অন্ধকারের শীর্ষ দাঁড়কাক অথবা শ্রাবণের মেঘের সাথে রাতের অন্ধকারের মিলনে আবদ্ধ। বাস্তবকে রোমান্টিক আবেগে উপমা-প্রতীকের ব্যঞ্জনায় উপস্থিত করেন এ উপন্যাসে।

গ. কারুবাসনা

'কারুবাসনা'ও যেন জীবনানন্দের আত্মকথন। এখানেও 'আমি' এসেছে। শিল্পী, সমাজ, সংসার, কারুজীবন যেন একসূত্রে গাথা। বস্তুত উপন্যাসের কথকতায় জীবনানন্দের জীবন যেন বার বার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

'টিনের সুটকেসে করে বইগুলো দেশে নিয়ে এলাম ; খড়ের ঘরের জানলার কাছে বসে পড়লাম ; বাইরে বিকেলের আলোয় সন্ধ্যার অন্ধকারে কখনো শরৎ কখনো হেমন্তকে দেখেছি ; শালিখ ঘাসে-ঘাসে পোকা খুঁটে খেয়েছে, ফড়িং উড়ছে, পাতা ঘসেছে, দাঁড় কাকের দল গভীর কীর্তির অব্যর্থতায় ঘরের দিকে উড়ে গেছে তাদের, সন্ধ্যামণির পাপড়ির মতো লাল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে।' (কারুবাসনা)

কারুবাসনায় লক্ষ করা যায়, কারুতান্ত্রিকরা সংসারের প্রতি উদাসীন। অদম্য স্পৃহা ও যন্ত্রণায়, মর্মান্তিক স্মৃতিচারণের মধ্যদিয়ে কারুশিল্পীর 'আমি' নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ই শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা, পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখ, লালসা, কলরব,আড়ম্বরের ভিতর কল্পনা ও স্বপ্ন চিন্তার দুশ্ছেদ্য অঙ্কুরের বোঝা বুকে বহন করে বেড়াবার জন্মগত পাপ। কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে। আমার সংসারকে ভরে দিয়েছে ছাই-কালি-ধুলির শূন্যতায়। যে-উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্কোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা স্বরাজ পার্টি গঠন করতে পারত, কিংবা কংগ্রেস অথবা একটা মোটর কার কিংবা একটা নামজাদা বই বা চায়ের দোকান অথবা একজন অক্লান্ত কর্মী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যবসায়ী উকিলকে, কিংবা সচ্চরিত্র হেড মাস্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে (সেই) আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম নেই আমার।'

ঘ. বিভা

'বিভা' উপন্যাসে 'আমি'র সাথে বিভার সংযোগ ঘটে। তবে এই সংযোগ প্রত্যক্ষ নয়, 'আমি' বিভাকে অবলোকন করে। 'আজ মনে হচ্ছে গঙ্গাসাগরের মেলা দেখতে গিয়ে মৃত সেই পাড়াগাঁর মেয়েটি, বিভা, আর রুথ, এই তিনজনের মুখে একই আদল লেগে রয়েছে যেন। একটা ছিপ ছিপে নিমীলিত চাঁপাফুল, কিংবা শীর্ণ একটা উন্মুখ চাঁপার কলির মত নারীর আঙুলের দিকে তাকালে এ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারা যায় যেন।' (বিভা)

'বিভা' উপন্যাসে বিভার উপস্থিতি দূর ছায়ার মত, স্পর্শিত নয়, অথচ অনুভবের নন্দিত স্পর্শে কল্পলোকে এক অভাবনীয় সৌন্দর্য ধরা পড়ে। গার্হস্থ জীবনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এখানে নেই। কবির কাল্পনিক দৃশ্যাবলী এখানে দৃশ্যত ফুটে ওঠে বার বার। বিভার মতো একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে এখানে। যার মৃত্যু হয়েছিল ষোল-সতেরো বছরে। সেই করুণ মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে রূপায়িত এ উপন্যাস।

ঙ. পূর্ণিমা

'পূর্ণিমা' উপন্যাস নিয়ে আলোচনা তেমন কোথাও লক্ষ করা যায়নি। পারিবারিক জীবনের সংকট, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের সাথে উচ্চবিত্তের বিরোধের কথা উচ্চারিত হয়েছে। পূর্ণিমা সন্তোষ, চামেলি, অমূল্য বিরাজ প্রমুখ চরিত্রের সংলাপে সেটি স্পষ্ট ভেসে ওঠে। জাগতিক জীবনের নির্মমতার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে পরিণতি হয়ে ওঠে মর্মন্তুদ।

'সন্তোষের চোখে সমস্ত পৃথিবী যেন নরম, কোমল, মধুর ও নিবিড় হয়ে উঠেছে; পূর্ণিমা সেই খোড়ো ঘরের ভিতর পা ছড়িয়ে বসে রুদ্ধ হয়ে নেই আর। প্রসবের ভোরের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর ভিতর সে ছড়িয়ে পড়েছে—'(পূর্ণিমা)

পূর্ণিমার পরিণতি সমাজ সংসারের কাছে আত্মবলিদানের মতো। অর্থ সংকট ও সামাজিক সমস্যা পারিবারিক জীবনকে কিভাবে বিধ্বস্ত করে, তার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় এখানে।

চ. মৃণাল

অসুস্থ 'মৃণাল'কে নিয়ে উপন্যাসের অবয়ব। মৃণাল উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃণাল এবং তার সাথে কথা হয় 'আমি'র। জীবনের অভিব্যক্তিগুলো নষ্ট সমাজের মাঝেও সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। এই 'মৃণাল'—এ-যেন তৎকালীন কলকাতার ভঙ্গুর চিত্র। তবুও মানুষ ভাবিত হয় জীবনের সায়াহ্নে অনাগত শতক সুন্দর হয়ে উঠুক। 'পৃথিবীতে সুন্দর কোনোদিনও শেষ হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুকুমারকে হতাশা ও ব্যর্থতায় এতটাই আচ্ছন্ন করেছে যে লোকের ভীড় থেকে নিজেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখতে মূত্র ত্যাগের স্থানটিকে সে তার উপযুক্ত জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে নির্দ্বিধায়। সুকুমারের এই সঙ্কটের কারণ ব্যাখ্যা করে বেগম আখতার কামাল বলেছেন

> মধ্যবিত্ত বাঙালির মেধামনন ও দৈহিক শ্রমের এই বিরোধাত্মক সম্পর্ক আমাদের খণ্ডিত রেনেসাঁসেরই বাস্তবতা, তিরিশের দশকে পুঁজিবাদী সম্প্রসারণজাত সংক্রান্তির পটে এর রূপ হয়ে ওঠে আরও বঙ্গুর, পঙ্গুপ্রায়, দূরপ্রসারী বিপর্যয়ে হত্যাশাব্যঞ্জক।
>
> (প্রাগুক্ত, জীবনানন্দ বিচিত্রা)

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির নির্লিপ্ততা ও বিরাটত্বের কাছে এটাই শিখেছিলেন যে সংসারের কোন দুঃখই দুঃখ নয়—প্রকৃতিতে আশ্রয় নিলেই তা সেরে যায়। পোস্টমাস্টারের নৌকা গ্রাম ছাড়িয়ে শ্মশানের পাশে যেতে যেতেই পালে হাওয়া লাগে এবং প্রকৃতি তাকে বেদনাউপশমের তত্ত্ব জানিয়ে দেয়। 'পৃথিবীতে কে কাহার' (পোষ্টমাষ্টার : রবীন্দ্রনাথ)। এমনই ভাবে জীবনানন্দও প্রকৃতির মাঝে নিজে আশ্রয় খুঁজেছেন এবং তার উপন্যাসের চরিত্রদেরকেও আশ্রয় খুঁজেছেন এবং আশ্রয় খুঁজিয়েছেন। স্টিমারে চাপবার পর ক্ষণিকের জন্য মা ও মালতীর কথা মনে হলেও কিছুক্ষণ পরেই সুকুমারের সমগ্র চেতনায় প্রকৃতি আসন গেড়ে বসেছে। তখন তার মনে হয় রেনেসাঁসের ইটালির শিল্পীরা নারী প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যে সুন্দর দূর বিচ্ছেদের দেশের কথা ভাবত, এই মেঘগুলোর ভিতরেই কি লুকিয়ে আছে সেই জায়গা? সেউত্রি বা ভালোয়া স্বপ্ন-দেখত—ঐখানেই যেন তা। ঐখানেই যেন দিদোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একটা গুহার মোড়ে অন্ধকারের কুয়াশার ভিতর—যেন পুরুরবার সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীর দিন কেটেছিল এই পাহাড়েরই কোনো এক চূড়ায়। তারা আজ ইতিহাসের পাতায় তারা আজ প্রেত। তাদের মতই সুকুমারের জীবনের চারুলতা, বিনতা আজ প্রেত হয়ে গেছে। এই ধূসরতা শরীরী প্রতিমা নিয়ে সুকুমারের হৃদয় জগতে খনন কার্য চালাতে থাকে। মাঝে নক্ষত্রের দোষে খাঁকি স্যুট পরিহিত সাহেব চেকারের আগমন ঘটে। কল্পনার ছেদ ঘটে সুকুমারের। এই ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থা, এই বুট, এই হ্যাট, এই খাঁকি কাপড় দুষ্ট গ্রহের মত কেড়ে নিয়েছে সুকুমারের প্রত্যাশিত প্রেম, বসতবাড়ি। প্রেতিনীর চিন্তার মাঝেও সেই বুট ছেদ ঘটায়। বৈশ্বিক সৌন্দর্যানুভূতির জগত থেকে হঠাৎ করেই চেতনে ফিরে আসে সুকুমার। এই ভাবে চেতন-অবচেতনে আসা যাওয়া চলে পুরো উপন্যাসেই। চেকারের সাথে কথার বিরতির পর-পরই বাংলার নিসর্গতাকে নস্টালজিক করে তোলে। বাংলার মাঠ-ঘাট পথের দিকে তাকিয়ে অসংখ্য কিশোরী ও পুরলক্ষ্মীদের 'নরম ডৌলের নিবির মুখ' সুকুমারের মনে পড়ে। তারা প্রশ্ন করে 'চিনতে পার তো?' সুকুমারের ঝরে যাওয়া ইচ্ছা ও প্রেম প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে—সুকুমারের অন্তর্জগতের এই বিশ্বাস তাকে দূরবর্তী প্রকৃতির মাঝে সেই সব প্রেমিকাদের চোখ, চুল, হাত আবিষ্কারে প্রবৃত্ত করে। তাদের চোখ 'বেতের ফলের মত', তাদের চুল 'নিস্তব্ধ বনের মত' তাদের হাত 'নগ্ন নির্জন'। গ্রামবাংলার জীবনের দারিদ্র্য, অভাবের কষাঘাতে যেসব পুরললনাদের সলজ্জ সাধ ও প্রেমের অকাল মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রেতেরাই অথবা অতীতে রাজস্থানের পদ্মিনীর সাথে যে সতির অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছিল তাদের প্রেতেরা অতৃপ্ত প্রেমিক প্রেমিকার রূপ নিয়ে সুকুমারের কল্পজগতে আন্দোলন চালায়। জল তেষ্টা পেলে সুকুমার স্টিমারের ক্যান্টিনে যায়। বাটলার এবং সুকুমারের কথোপকথনে সুকুমারের অর্থনৈতিক দৈন্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। সমাজ বাস্তবতার কাঠিন্য এবং পরবাস্তব কল্পজগতের দ্বিমুখী বৈপরীত্যের সহাবস্থান চলতে থাকে সুকুমারের মাঝে। ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থার বিষবাষ্পই যে আজ সুকুমারের হতাশা ; ব্যর্থতার একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান কারণ তা বেশ বোঝা যায়। স্টিমারের সার্চ লাইটে মৃত পোকাদের দেহ চীনা রেশমের মত নরম মনে হয় সুকুমারের। তাদের গায়ের কারুকার্য তাজমহলের কারুকার্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাজমহল প্রেমের সমাধি, চীনারেশম এক সভ্যতার অবলুপ্ত শিল্প। সুকুমারের চেতনে অবচেতনে হতাশা ও নৈরাজ্য এক অদ্ভুত মৃত্যুচেতনায় অবসিত। প্রাচীন বিদর্ভনগরের সুন্দরী রমণীরা, মুঘল হেরেমের মসলিন পরিহিতা রমণীরা অথবা গ্রামবাংলার উনুনের পাশে শূন্য ভাতের হাড়ি নিয়ে বসে থাকা অস্থি চর্মসার সহস্র চারুলতারা তাদের অব্যক্ত আকাঙ্খা, অতৃপ্ত ভালোবাসা বুকে নিয়ে প্রেত হয়ে গেছে—এরকম একটি বোধ সুকুমারের মাঝে কাজ করে। সে তাদের সাথে নিজের মিল খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র গায়ে যে মর্মন্তুদ ব্যথা লুক্কায়িত ছিল সেই ব্যথাই জীবনানন্দ দাশ আবিষ্কার করেছেন প্রকৃতির গাছপালা পাহার, বনের মধ্যে। প্রকৃতির এক একটি গাছপালা এক একজন মৃত রমণীর দেহ রূপে ধরা দেয় তার কাছে। সুকমার দেখে :

> দীর্ঘ নগ্ন দুধের মত শাদা শরীর ; ঝাউয়ের শাখা-প্রশাখার ফাঁকে জ্যোৎস্নাহীন নক্ষত্রহীন নিস্তব্ধ বনের মতো, অজস্র কালো চুল একজন মানুষী পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধূপের গভীর ধবল ধোঁয়ার মত-দাঁড়ায়ে একা—মিলিয়ে। (প্রেতিনীর রূপকথা)

জীবনে অতৃপ্তি থাকলে বা অপঘাতে মৃত্যু হলে সেই মানুষের আত্মা প্রেত হয়ে গাছে গাছে ধূ-ধূ মাঠে ঘুরে বেড়ায়, অন্ধকারে অনেকে হঠাৎ করেই তার কায়াহীন ছায়া দেখে ফেলে—এই চিরাচরিত প্রাচ্য সংস্কারটিকে জীবনানন্দ নতুন জন্ম দান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অনেক সময় প্রেতত্বলাভই মানুষের কাছে কাম্য হয়ে উঠে। সুকুমারের বড় সাধ হয় প্রেত হয়ে যেতে। কারণ সেই জীবনে কোনো কাজ করতে হতো না। চারশ বছর আগের কোনো প্রেতিনীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যেত, অতৃপ্ত কিশোরীর মুখ নিয়ে যে পুরনো পৃথিবীতে বাস করে তাঁকেও তার সঙ্গে বাস করতে বলে হয়তো ফড়িঙের পাখার মত মিলিয়ে যেত। 'আট বছর আগের এক দিন' কবিতার পুরুষটি যে জীবনে যাবার জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল সেই জীবনই হয়তো সুকুমারের প্রত্যাশা। এখানে প্রাচ্য সংস্কার টেনে আনলে এটা মেনে নিতে হবে যে আত্মহত্যা করলে কবিতার নায়কটি অবশ্যই প্রেতত্ব লাভ করেছে। এটা জেনেই সে আত্মহত্যা করেছে। কাজেই সুকুমারের প্রত্যাশা ও কবি জীবনানন্দ দাশের প্রত্যাশা সেই জীবন :

> যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
> এই জেনে।
>
> (আট বছর আগের এক দিন)

তবে আলোচ্য কবিতার নায়কের অন্তরে যে বিপন্ন বিস্ময় কাজ করে তা সুকুমারের উপস্থিত থাকলেও প্রচ্ছন্ন। সুকুমার বেকার, উদ্বাস্তু। সে দায়িত্ব পছন্দ না করলেও তার অক্ষমতার জন্য যারা কষ্ট ভোগ করছে তাদের জন্য তার মনে প্রচণ্ড সহানুভূতি আছে এবং অপরাধ বোধও আছে :

> একটা জীর্ণ শীর্ণ দাঁড়কাক আমাবস্যার অন্ধ স্রোতের মধ্যে তার অনেক দূরের নিঃসহায় শিশুদের জন্য যেমন অনুভব করে আমিও কি তেমন অনুভব করি না মা-তোমার জন্য ; তোমার জন্য মালতী। (প্রেতিনীর রূপকথা)

উপন্যাসের বিরাট অংশ জুড়ে আছে বনবিহারী ও সুকুমারের কথোপকথন। এই সংলাপ ধর্মীতা মাঝে মাঝে নাটকীয়তারও সৃষ্টি করেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে চারুলতার কথা। চৌদ্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর একসাথে পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেছে সুকুমার ও চারুলতা। হয়তো একটা গোপন ভাললাগাও ছিল তাদের পরস্পরের মধ্যে। বনবিহারী সুকুমারকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বলে : 'সে হতভাগিনীর কথা মিছি মিছি কেন ভাবতে যাও? যে কিনা দুবছরের মধ্যে দুটি সন্তান বিয়োতে পারে ; সে তোমার সব স্মৃতিই মনের থেকে মুছে ফেলেছিল—।' বাঙালি ঘরের পল্লীবালাদের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে হয় এবং তারা বিয়ের অব্যবহিত পরেই সংসারে সন্তান উৎপাদন, লালন ও গৃহপরিচর্যার কলে পরিণত হয়। এখানে তার কোন হাত থাকেনা। তাই মৃত্যুর অনেক আগেই তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটে সেই সাথে দারিদ্র্য তাদের করে তোলে কঙ্কাল সার। এই কথা বনবিহারী বুঝতে চায়না চারুলতার সন্তানের জন্ম দেওয়াটা যেন সুকুমারকে ভুলে যাবারই নামান্তর সে এই ধারণা পোষণ করে। কিন্তু সুকুমার চারুলতার মরে যাওয়া প্রেম, অব্যক্ত সাধের প্রেতাত্মার বেদনায় নীল হয়। বনবিহারীর একটি কথাই চরম সত্যে পরিণত হয় : 'কিন্তু মরলেই ছিল ভাল কি বলো?' ... —'অস্থি চর্মসার যা পেত্নি হয়ে দাঁড়িয়েছে চারু।' এই বেদনার ছায়া লক্ষ্য করা যায় নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় :

আহা বাসন্তী, আহা সেই বাসন্তী এখন বিহারে
ডাকাত স্বামীর ঘরে চার সন্তানের জননী হয়েছে।
(হুলিয়া : প্রেমাংশুর রক্ত চাই)

—এই পঙ্‌ক্তি দুটোতে। এই চারুলতার মতো একজন রমণীর কথা পাওয়া যায় জীবনানন্দ দাশের দিনলিপিতে : 'Aural girl beloved who might flower my life with love : Y wakes but Y is far from that. She might be that, but she is not that ... Ah, where could one find it ! ... if one could।

কাজেই চারুলতা বা সেই গ্রাম্য মেয়েটি হয়তো বা তার জীবনকে সুরভিত করতে পারতো কিন্তু জীবনানন্দ যাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলেন সেই 'Y' চারুলতা নয় অন্য কেউ। নতুন স্টেশন আসে। ল্যাট্রিনের অসহ্য গন্ধে চারুলতার প্রসঙ্গ পরিবর্তন হয়ে বিনতার প্রসঙ্গে কথা শুরু হয় বনবিহারীর সাথে। বিনতার গল্পই এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় রূপকথা। দুই বন্ধুর কথোপকথনকে গাল্পিক রূপ দিলে এরকম দাঁড়ায় : সুকুমার যখন কলেজে পড়ত তখন প্রতি পুজোর ছুটি এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে দুটি মেয়েকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পড়তো সুকুমারের উপর। সে প্রায় ষোল-সতের বছর আগের কথা। তাদের মধ্যে একটি মেয়ের কথা সুকুমার প্রায়সই বনবিহারীকে বলতো। নাম তার বিনতা। সুকুমার 'তাকে ভালোবেসে জীবনের গোড়ার দিকে বড় দুঃখ' পেয়েছে। আজ মনে হয় প্রেমের চেয়েও বিমূঢ় করে বেদনাই। মানুষকে বেশি কষ্ট দেয়।' মাঝে মাঝেই অপ্রত্যাশিত ভাবেই তার কথা মনে পড়ে যায় সুকুমারের। সুকুমারের আত্মকথন : 'কাউকে কিছু বলি না-চুপচাপ একান্তে হৃদয়ের ভিতর বিনতার মুখখানা—এ আমার জীবনের খুব একটা গোপন সঞ্চয়ের জিনিস। আজও হয়তো আমাকে দেখলে উপেক্ষা করে উড়িয়ে দেবে সে ; কিন্তু তবুও দেকতে ইচ্ছা করে তাকে—অনেকদিন দেখিনি।'

১৮ আগস্ট ১৯৩৩ তারিখে জীবনানন্দ লিখেছেন : 'All along while seeing চণ্ডীদাস, I thought of Y who had seen it previously. Did she understand all the points? Did she ever think of me? Or poets or poetry? ... my mind is now clear of that passion ... of the obsession that she was the only woman

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

and her love the only love for my soul ...' তবে কি সুকুমারের এই বিনতাই জীবননানন্দের 'Y' সুকুমার শুনেছে বিনতা বি. এ পাশ করে বিলেত গিয়েছিল। তার পর ফিরে এসে চাকরি নিয়েছে। বিয়ে করেছে কিনা বলতে পারেনা। পনের কুড়ি বছর আগে বিনতার বাবা বিপিনবাবু একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ছিলেন। তারই দুই মেয়ের এক মেয়ে বিনতা। ওরা কলকাতায় কলেজে পড়তো। বিনতার সাথে সুকুমারের খুব একটা আলাপ ছিল না। একবার তাকে একটা চিঠি দিয়েছিল সুকুমার। কিন্তু উত্তর মেলেনি। একদিন কুয়াশার কারণে স্টিমার আসতে দেরি করায় বিনতারা সাড়ে ছটার ট্রেন ফেল করেছিল। ওয়েটিং রুমে পার্শি ধাচে শাড়ি পরে তারা বসেছিল। টেবিলের উপর ছিল ক্রিসেনথিমাম না কিসের তোড়া। সুকুমার তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে বারান্দায় পায়চারি করছিল। হয়তো তারা উভয়ই উভয়ের সঙ্গ আশা করছিল বা করছিল না। বেলা বারোটায় ট্রেন। এতক্ষণ এই মেয়েগুলো চুপচাপ বসে থাকবে কি করে এই ভেবে সুকুমার ঘরে ঢুকলে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল লজ্জায় না উপেক্ষায় তা সুকুমার বুঝতে পারেনি। ষোল সতের বছর আগে স্টেশনের কেরোসিনের অস্পষ্ট আলোর নিচে বিনতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সুকুমার। অস্পষ্ট আলোয় তাকে অশরীরী প্রেতিনীর মতো মনে হয়েছিল তার। বিনতাদের সাথে অনেক বার গিয়েছে সুকুমার। তার সলজ্জ সাধ তাকে তাড়া করে নিয়ে গেছে সেই কেবিনে যে কেবিনে বিনতারা কাটিয়েছে একটি রাত। বিনতাকে দেখার আগে সুকুমার নারী সম্পর্কে ছিল একেবারেই অনভিজ্ঞ। তাকে দেখার আগে এক আঠারো বছরের পানআলীকে সে চিনতো যার মাঝে গোপনতার কোনো চেষ্টা ছিল না। তার মাঝে সুকুমার এক কামনালুব্ধা দুঃখিনীকে আবিষ্কার করেছিল-- 'জীবনে যে কোনদিন প্রেম পাবে না, চাবেও না হয়ত।' সুকুমারের আত্মকথনে শ্রমজীবী এক যুবতীর প্রেম, ভালোবাসা কি করে একদিন কতগুলো না বলা কথার স্তূপে চাপা পড়ে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে তার এক বাস্তব কঠিন চিত্র ঔপন্যাসিক অঙ্কন করেছেন সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে। সম্ভ্রান্ত বিনতার প্রেমের সূক্ষ্মতা এবং পানআলীর নির্লজ্জ নিবেদন ইচ্ছাকে লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে পৃথক করে দুই শ্রেণীর রমণীর চরিত্র ও মানসিক সঙ্কটকে অঙ্কন করেছেন। এটা তাঁর তিক্ষ্ণ সমাজ দৃষ্টিরই ফসল। হয়তো সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের অতৃপ্ত আত্মারাই প্রেত হয়ে সারা বাংলার বটগাছ, পাকুরগাছ, দীঘি-মাঠ দখল করে আছে। এক ঝড়-জলের রাতে বৃষ্টির জলে সুকুমারের বিছানাপত্র ভিজে গিয়েছিল। তাই অপ্রকাশিত অশরীরী প্রেম বোনের কটাক্ষকে উপেক্ষা করে ধবধবে বিছানার দাবি ত্যাগ করেছিল সুকুমারের জন্য। এক শীতের রাতে সুকুমার ভুলে তার আলোয়ানটি বেডিং এর সাথে বেঁধে ফেলেছিল। ওয়েটিং রুমের পর্দার ফাঁক থেকে ঝুপ করে একটি শাল তার কাঁধের উপর ছুড়ে দিয়েই উধাও হয়েছিল বিনতা। 'মেয়েটির সাদা নগ্ন হাতের পাঁচটি আঙুল ও কব্জি চোখে পড়েছিল শুধু।' উড়ন্ত পর্দার ফাঁক দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে সুকুমার দেখতে পেল : '... ঘিয়ে রঙের একটা শাল গায়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে বিনতা রয়েছে ঘুমিয়ে আর নিরাভরণা শাড়ির খুট গলায় জড়িয়ে থুতনিতে হাত রেখে পুবের জানালার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে আছে।'

সান্তাহার স্টেশনের রিক্সাওয়ালার কাছে সুকুমারের জন্য বিনতা ছেড়ে গিয়েছিল টমাস হার্ডির টেস। টেস পড়লেই তাই সুকুমারের বিনতার কথা মনে হয়ে যায়। তার অর্থ এই নয় যে 'টেস' এর সাথে বিনতার কোনো সাদৃশ্য আছে। সুকুমার বলে : 'টেস'-এর সঙ্গে জড়িত করেছি তাকে শেষে। আমার নিজেরই মনের কল্পনার বিহ্বলতায় এক এক সময় মনে হত 'টেস'-এর মতন বোধ করি সে। হয়তো তাই-ই হবে। হয়ত নয়। কিন্তু প্রথম যখন বিনতাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছিলাম দেহ ও মন সব দিক দিয়েই পদাবলির কিশোরীর কথা বারবার মনে পড়ত আমার।' সজনি ও ধনি, কী কর বাটে ... গোরচনা গোরী ... ' কাজেই 'টেস' এর সাথে সমালোচকেরা বিনতার যে সাদৃশ্যের কথা বলেছেন তা কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিবেচ্য বিষয়। টেসের জীবনসংগ্রাম বিনতাতে অনুপস্থিত। হয়তো বইটি বিনতা দিয়েছিল বলে প্রেমিক সুকুমারের কাছে বইটি এত প্রিয় অথবা টেসের সাথে বিনতার নয় জীবনানন্দের নিজের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। বিনতার প্রতি সুকুমারের আকর্ষণ কখনই দেহকেন্দ্রিক ছিল না। বিনতার অন্তরের উত্তাপ সুকুমারকে ছুঁয়েছিল। জীবনানন্দের অনেক উপন্যাসেই নর-নারীর যৌন অচরিতার্থতার যেমন নগ্ন প্রকাশ দেখা যায় আলোচ্য উপন্যাসই কেবল তার ব্যতিক্রম।

বিনতার সাথে সুকুমারের বিয়ের প্রস্তাব এসেও বিনতার বাবার কিছু তথাকথিত ত্রুটির কারণে তা ভেঙে যায়। বিনতা বিয়ে করেনা। চাকরি করে। যদিও দেখা হওয়ার বিস্তর সুযোগ ঘটে তবুও নানা কারণে তা ভেস্তে যায়। রামমোহনের মুখে বিনতার সংবাদ পেয়ে সুকুমার ছুটে যায় স্টেশনে। সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিনতাকে। ভাবে হাওড়া স্টেশনে নেমে বিনতাকে নমস্কার দিয়ে মনের কথা বলবে, কিন্তু হাওড়ায় নেমে বিনতাকে পেল না সুকুমার। পরে শুনেছে ওরা খরগপুরে নেমে গেছে। বিনতাকে আর সে দেখেনি। ১৭. ০৯. ১৯৩৩ তারিখে জীবনানন্দ লিখেছেন : 'The woman at Bongaon my seat given to her fascinating—she gets down at ঝিকুরগাছি ঘাট—never again in eternity shall I see her... ।' এইভাবে বিনতা একদিন স্মৃতি হয়ে যায়। সুকুমারের আত্মকথা ...'আজ স্মৃতি ও বেদনা নিয়ে কাল কাটিয়ে যেতে হবে। যদি পারা যায় এ স্টেশনে আসব না আর—তুমি চলে গেছ এই বাদামি তালের পাতা, জীর্ণ বাঁশের জঙ্গলের মড়মড় শব্দ, চিলের পাখনার মত গেরুয়া শূন্য ধানের ক্ষেত : এই সবের ভিতর আমার চোখ ও হৃদয়কে নামিয়ে দিয়ে মিছেমিছি ব্যথা ও অশ্রুর খেলা খেলে কী লাভ ! কিন্তু তবুও বারবার ফিরে ফিরে আসতে হয়েছে ; কথিত প্রেতও এমনি করে কবরের কাছে বার বার ফিরে আসে।' উপন্যাসের শেষ হয়েছে বিনতাকে নিয়ে পরজন্মে ঘর বাঁধার নিরন্তর কামনার মধ্যদিয়ে। এ প্রেম অবশ্যই দেহঅতিক্রান্ত সূক্ষ্ম-অনুভূতিময়। কিন্তু তা স্মৃতি সর্বস্ব বই আর কিছু নয়। প্রথমে চারুলতা ও পরে বিনতা যাদের নিয়ে গ্রামবাংলায় এক সুন্দর শান্তিকুঞ্জ গড়তে চেয়েছিলেন লেখক, যাঁদের তিনি ছুঁতে পারেননি, কেবলই অনুভব করেছেন, পৈতৃক সম্পত্তি, স্ত্রীর প্রেম, চাকুরীর মতো যারা আজ প্রেতে পরিণত হয়েছে তাদেরকে না পাওয়ার এক হাহাকারে উপন্যাস শেষ হয়েছে। মনে হতে পারে এ সমাপ্তি আকস্মিক। কিন্তু অন্যান্য উপন্যাসের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় যে এটা জীবনানন্দের নিজস্ব স্টাইল। হয়তো এরপর কাহিনীকে আরও প্রলম্বিত করলে জীবনানন্দের কাব্যিক ভাষার বাঁধুনী শ্লথ হয়ে রচনার শিল্পগুণ নষ্ট হতে পারতো। যে উদ্দেশ্যে উপন্যাসের নায়কের কলকাতা যাত্রা তা ছিল বস্তুধর্মী উপন্যাসের প্রারম্ভিকার মত। কিন্তু প্রকৃতিচারী নায়ক নদী, পাহাড়, বন, আকাশের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে জীবনের সুন্দরতম রূপের পাশাপাশি, জীবনের অচরিতার্থতা, হতাশা, কদর্যতার এক সুনিপুণ চিত্র অঙ্কনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এবং তা সবই তাঁর আত্মজৈবনিক স্মৃতি থেকে ছেঁকে তোলা। এই ছাঁকন ক্রিয়ায় এক সময় সংসারের অভাব, মা ও স্ত্রী চাপা পড়ে হৃদয় জগতে ডুব মেরে থাকা বিনতা উঠে আসে। ফলে উপন্যাসের বস্তুধর্মিতা ক্ষুণ্ন হয় এবং লেখকের চেতনাপ্রবাহ উপন্যাসের কাঠামো দখল করে ফেলে। বিনতা ও চারুলতার ছায়াপাত ঘটেছে 'রূপসীবাংলার' ম্লান কিশোরীর রূপে ও 'বনলতা সেনের' কল্প-প্রতিমায়। ঐ কবিতাগুলি এই সময়ের কাছাকাছিই লেখা হয়েছিল। এরপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যগ্রন্থেও ঘটে ভূমিবদল—উপন্যাসেও অধরা মানসীর দেখা পাওয়া যায় না আর। গতানুগতিক ধরনের রোমান্টিকতাবোধের টান এই পর্বের পর কাটিয়ে উঠেছিলেন জীবনানন্দ।'

তিরিশের দশকের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বেকার যুবকদের দ্বন্দ্বই হয়তো সুকুমারে প্রতিফলিত হয়েছে কিন্তু তার সাথে কবি জীবনানন্দের আত্মকথন যুক্ত হয়ে সুকুমার চরিত্রটি একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। 'Y' নাম্নী এক রমণীর বর্ণনায় তাঁর দিনলিপিতে জীবনানন্দ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন : 'The hawk-eyed hawk-rosed girl...on Lower Circular Road—a classic type of beauty, মায়াবী type, Arabian nights type, now almost extinct—And the Moslems and the alluring Eastern atmosphere created all about... ।

বিনতার বর্ণনাতেও এই ধরনের তুলনা দেখা যায়।

জীবনানান্দের ভাষা এতই অলঙ্কার সমৃদ্ধ এবং তাঁর শব্দের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা এতই গভীর যে এক একটি সংলাপ এক একটি চরিত্রকে তাঁর অন্তর্জগতের ব্যবচ্ছেদসহ উপস্থাপন করে। বনবিহারীর সংলাপে তাঁর শিক্ষা, রুচি ও সাংস্কৃতিক মান সহজেই পরিস্ফুট।

যে পারিপার্শ্বিকতা সুকুমারের সমস্ত সাধ এবং সাধ্যের মাঝে রচনা করে চলেছে মৃতের সমাধি সেই সমাজকে প্রতীকী শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগে লেখক বাঙ্ময় করে তুলেছেন। যেমন স্টিমারে করে কলকাতায় যাওয়া উপনিবেশ ইতিহাসের যোগাযোগ ব্যবস্থার কূটাভাস। বাটলারের পাগড়ী, চাপকান, চেকারের বুট, পার্শী কায়দায় শাড়ী পরা, চীনা রেশমের মতো পোকা ঔপনিবেশিক শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশ কোনো অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন না, দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রতিঘাতে আন্দোলিত হয়ে সমাজ পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা তিনি পোষণ করেন না। বরং তাঁর খোলা চোখে জীবনের যাবতীয় অসঙ্গতি, নির্মনন ও একঘেঁয়ে অবস্থানের অস্থির চিত্র তিনি অবলোকন করেন এবং প্রকৃতির মাঝে আশ্রয় খোঁজেন। মানুষের ইচ্ছাই এক জীবনে কোনো ভাবে পূরণ হয় না—তাই মানুষ সন্ধান করে জীবন তৃষ্ণার প্রতিরূপক। 'প্রেতিনীর রূপকথা' প্রাণের চিরায়ত অচরিতার্থতার অভিব্যক্তি সুকুমারের কলকাতা যাত্রা প্রকৃত অর্থে জীবনবাদের অভিব্যক্তি। প্রথাগত উপন্যাসের পাল্লায় ফেললে 'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাস নয়, বড় গল্পও নয়। কিন্তু বিনতার নারী এবং সুকুমারের মত বেকার যুবকদের প্রেমহীনতার অচরিতার্থতার কারণ পর্যবেক্ষণের বার্তা নিয়ে ভাববার এক বিশাল রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট লেখক পাঠকের জন্য এই উপন্যাসে রেখেছেন যা পাঠক তার মনোজগতে নিজে নিজে পূরণ করে বিশাল এক উপন্যাস পাঠের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। তদব্যতীত ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবসম্প্রদায়ের মনোজগতের অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের কল্প জগতকে বাক্ প্রতিমা দানের জন্য যে ঔপন্যাসিক পাঠককে পরাবাস্তব জগতে বার বার যেভাবে ঘুরিয়েছেন তা এই উপন্যাসকে অর্থবহুল এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকের উপযোগী করে তুলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প রি শে ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলরাম দাশ
[দাশগুপ্ত]

↑

সর্বানন্দ দাশ

↑

সত্যানন্দ দাশ

↑

কবি জীবনানন্দ দাশ
-এর বংশলতিকা

↓

মঞ্জুশ্রী দাশ | সমরানন্দ দাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব ং শ ল তি কা

১. পিতৃকুল

- বলরাম দাশ [দাশগুপ্ত]
  - তারিণীচরণ দাশ
  - ভোলানাথ দাশ
  - সর্বানন্দ দাশ
    - ১. হরিচরণ দাশ [সুশীলাবালা]
      - অমিয়া রায়
      - সুষমা দাশগুপ্ত
      - সুরুচি দাশ
    - ২. সত্যানন্দ দাশ [কুসুমকুমারী দাশ]
      - জীবনানন্দ দাশ [লাবণ্য দাশ]
        - মঞ্জুশ্রী দাশ
        - সমরানন্দ দাশ
      - অশোকানন্দ দাশ [নলিনী দাশ]
        - অমিতানন্দ
      - সুচরিতা দাশ
    - ৩. প্রিয়ম্বদা সেন [ব্রজেন্দ্রনাথ সেন]
    - ৪. যোগানন্দ দাশ [প্রফুল্লকুমারী দাশ]
      - নির্মলানন্দ দাশ
      - বিমলানন্দ দাশ
      - বেলা সেন
    - ৫. প্রেমদা চক্রবর্তী [মনোমোহন চক্রবর্তী]
      - কল্যাণী চক্রবর্তী
    - ৬. ডা. প্রেমানন্দ দাশ [সুপ্রভা দাশ]
      - ডা. অমলানন্দ দাশ
    - ৭ বিনোদ দাশ [অল্পবয়সে প্রয়াত]
    - ৮. স্নেহলতা দাশ [অবিবাহিতা]
    - ৯. অতুলানন্দ দাশ [সরযুবালা দাশ]
      - জ্যোৎস্না দাশ
      - অপরূপানন্দ দাশ
    - ১০. ব্রহ্মানন্দ দাশ [প্রভাময়ী দাশ]
      - সুপ্রিয়া দাশ
    - ১১. জ্ঞানানন্দ দাশ [অবিবাহিত]

২. মাতৃকুল

- চন্দ্রনাথ দাশ
  - ১. প্রিয়নাথ দাশ
  - ২. কুসুমকুমারী দাশ
    - জীবনানন্দ
    - অশোকানন্দ
    - সুচরিতা
  - ৩. সুকুমারী সেন
  - ৪. হেমন্তকুমারী সেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখক পরিচিতি

অঞ্জনা সাহা
কবি, সঙ্গীতশিল্পী।

অসীম সাহা
কবি, প্রাবন্ধিক।

আজহার ইসলাম
প্রাবন্ধিক, গবেষক।
অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, বাংলা একাডেমী।

আতাউর রহমান (১৯২৫-১৯৯৯)
কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ। প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আনিসুজ্জামান, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবদুল মান্নান সৈয়দ
কবি, কথাসাহিত্যিক, গবেষক, সমালোচক। সাবেক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি জগন্নাথ কলেজ।

আবু তাহের মজুমদার
কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

আবুবকর সিদ্দিক
কবি, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক। প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ড. (১৯৩৬-৮৯)
কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ।
প্রাক্তন মহাপরিচালক, শিল্পকলা একাডেমী, বাংলা একাডেমী (আমৃত্যু)। প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আবুল আহসান চৌধুরী, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক। সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

আবুল কাসেম ফজলুল হক
প্রাবন্ধিক, গবেষক, সমালোচক।
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবুল হোসেন
কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক।
প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা।

আমিনুর রহমান সুলতান
প্রাবন্ধিক।

আল মুজাহিদী
কবি। সাংবাদিক।

আলম হায়দার
প্রাবন্ধিক। কর্মকর্তা, বিজি প্রেস।

আলিমুজ্জামান চৌধুরী
কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক। সাবেক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতার এবং অধ্যাপক, বেসরকারি কলেজ।

আলী আনোয়ার
প্রাবন্ধিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আসমা চৌধুরী
প্রাবন্ধিক। সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়, বরিশাল।

আসাদ চৌধুরী
কবি, প্রাবন্ধিক, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব।
প্রাক্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমী।

আহমদ ছফা
কবি, কথাসাহিত্যিক, গবেষক।

আহমদ রফিক
কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক। সাহিত্যকর্মী।
প্রতিষ্ঠাতা, রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র।

আহমাদ মাযহার
প্রাবন্ধিক, সমালোচক। মুদ্রণ ব্যবস্থাপক।

আহসানুল কবির
প্রাবন্ধিক, সমালোচক। সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রংপুর ক্যাডেট কলেজ।

আহাম্মেদ কবীর
কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। ব্যবসায়ী।

ইকবাল আজিজ
কবি। এনজিও কর্মকর্তা।

কাকলী মুখোপাধ্যায়
প্রাবন্ধিক, গবেষক।
প্রভাষক, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর।

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, ড.
কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক। সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কাজী মোজাম্মেল হোসেন
শিল্পী, প্রাবন্ধিক। আর্টিস্ট, সায়েন্স ল্যাবরেটরি।

কাজী রোজী
কবি। কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর।

কামরুল ইসলাম
প্রাবন্ধিক, গবেষক। শিক্ষক, রেসিডেনসিয়াল মডেল হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

খায়রুল আলম সবুজ
কবি, কথাসাহিত্যিক, অভিনেতা। সাবেক অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, বেসরকারি কলেজ।

খালেদ হোসাইন
কবি, ছড়াকার, গবেষক। সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন
কবি, সমালোচক ও অনুবাদক।
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহাঙ্গীর ফিরোজ
কবি। সাংবাদিক।

জাহিদ হায়দার
কবি, কথাসাহিত্যিক। উন্নয়নকর্মী।

তপন বাগচী
কবি। কর্মকর্তা, প্রেস ইনস্টিটিউট।

দিলওয়ার
কবি, ছড়া লেখক।

নাসির আহমেদ
কবি, প্রাবন্ধিক। সাংবাদিক।

নির্মলেন্দু গুণ
কবি, কলাম লেখক। সাংবাদিক।

নুরুল আমিন
কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক। সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফজল-এ-খোদা
কবি, গীতিকার। প্রাক্তন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতার।

ফজলুল হক সৈকত
প্রাবন্ধিক। প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ, মিরপুর।

ফয়সাল শাহরিয়ার
প্রাবন্ধিক। কর্মকর্তা, কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ বিভাগ।

ফারুক নওয়াজ
ছড়া ও গল্প লেখক। প্রকাশনা শাখা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।

বিমল গুহ, ড.
কবি, প্রাবন্ধিক। পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক, সমালোচক।
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বেগম আকতার কামাল, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক, সমালোচক।
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বেলাল চৌধুরী
কবি। সাংবাদিক। সাবেক সম্পাদক, ভারত বিচিত্রা।

মনিরুজ্জামান, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মযহারুল ইসলাম, ড.
কবি, গবেষক, ফোকলোরবিদ, শিক্ষাবিদ। প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী। শিল্পপতি।

ময়ুখ চৌধুরী, ড.
কবি, গবেষক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক।
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মহাদেব সাহা
কবি, প্রাবন্ধিক। সাংবাদিক।

মাসুদুল হক
কবি, প্রাবন্ধিক। প্রভাষক, বেসরকারি কলেজ।

মাহবুব সাদিক, ড.
কবি, কথাসাহিত্যিক, গবেষক।
অধ্যাপক, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর।

মাহবুব হাসান
কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক। সাংবাদিক।

মাহবুবুল আলম গোরা
কবি। পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন।

মাহবুবুল হক, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক।
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মাহমুদ উল আলম, ড.
গবেষক, প্রাবন্ধিক। সামরিক কর্মকর্তা।

মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীরি, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক। অধ্যাপনা, বাংলা বিভাগ, মিরপুর কলেজ, ঢাকা।

মুহম্মদ নূরুল হুদা
কবি, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক। পরিচালক, বাংলা একাডেমী। প্রেষণে, নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট।

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, ড.
প্রাবন্ধিক, সংগীত-সমালোচক। অধ্যাপক, নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহন রায়হান
কবি।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড.
কবি, সমালোচক, গবেষক, শিক্ষাবিদ।
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ
কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক। সাংবাদিক।
প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট।

মোহাম্মদ রফিক
কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক। সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

রণেশ দাশগুপ্ত [১৯১১-১৯৯৯]
প্রাবন্ধিক, গবেষক, সমালোচক। সাংবাদিক।

রবিউল হুসাইন
কবি, প্রাবন্ধিক। স্থপতি।

রবীন সমদ্দার
প্রাবন্ধিক, গবেষক। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, সরকারি বি. এম. কলেজ, বরিশাল।

রেজাউদ্দিন স্টালিন
কবি। উপপরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট।

রোখসানা চৌধুরী
গবেষক, প্রাবন্ধিক। প্রভাষক, গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার।

লুৎফর রহমান
কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক। সহকারী অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুৎফর রহমান রিটন
শিশুসাহিত্যিক। সাংবাদিক।
সম্পাদক, ছোটদের কাগজ।

শান্তনু কায়সার
প্রাবন্ধিক, গবেষক, কথাসাহিত্যিক। অধ্যাপক,
ইংরেজি বিভাগ, সরকারি মহিলা কলেজ, কুমিল্লা।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম [১৯২৬–১৯৯৭]
কথাসাহিত্যিক।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

শামসুর রাহমান
কবি, প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক। সাংবাদিক।
সাবেক সম্পাদক, দৈনিক বাংলা।

শামসুল ইসলাম
কবি। প্রাক্তন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতার।

শাহাবুদ্দীন নাগরী
ছড়া লেখক, গীতিকার, প্রাবন্ধিক।
কর্মকর্তা, কাস্টম্‌স অ্যান্ড এক্সাইজ বিভাগ।

শাহেদ রহমান
কবি।
কমিশনার, কাস্টম্‌স অ্যান্ড এক্সাইজ বিভাগ।

শিমুল মাহমুদ
কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক। প্রভাষক, বাংলা
বিভাগ, এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাবনা।

শিশির ভট্টাচার্য্য, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক। সহকারী অধ্যাপক,
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিহাব সরকার
কবি, প্রাবন্ধিক। সাংবাদিক।

সনৎকুমার সাহা
প্রাবন্ধিক, গবেষক। অধ্যাপক, অর্থনীতি
বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সমুদ্র গুপ্ত
কবি। সাংবাদিক।

সরকার আবদুল মান্নান
প্রাবন্ধিক, গবেষক। সহকারী অধ্যাপক,
সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর।

সরকার আমিন
কবি। গবেষক, কলাম লেখক। কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমী।

সরদার আবদুস সাত্তার, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক, সমালোচক। সহযোগী
অধ্যাপক, সরকারি আনন্দমোহন কলেজ।

সাজজাদ আরেফিন
গবেষক। কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমী।

সিদ্দিকা মাহমুদা, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক, সমালোচক।
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিরাজুল ইসলাম
কবি। সরকারি কর্মকর্তা, সোনালী ব্যাংক।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক, সমালোচক, শিক্ষাবিদ।
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সুব্রত বড়ুয়া
কথাসাহিত্যিক, কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক।
পরিচালক, বাংলা একাডেমী।

সেলিনা হোসেন
কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক।
পরিচালক, বাংলা একাডেমী।

সেলিম আল দীন, ড.
নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, গবেষক। অধ্যাপক, নাটক
ও নাট্যতত্ত্ব। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সৈকত আসগর, ড. (১৯৫৪—২০০০)
কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক। সহযোগী অধ্যাপক,
সরকারি কলেজ (আমৃত্যু)।

সৈয়দ আজিজুল হক, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক, সমালোচক।
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক, ইতিহাসবিদ। অধ্যাপক,
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী।

সৈয়দ আলী আহসান
কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক। উপাচার্য, দারুল এহসান
বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর
বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমী।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ড.
কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক।
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সৈয়দ হায়দার
কবি। কর্মকর্তা, কাস্টমস্ অ্যান্ড এক্সাইজ বিভাগ।

সৈয়দা আইরিন জামান
গবেষক, প্রাবন্ধিক।

সৌভিক রেজা
প্রাবন্ধিক, গবেষক। সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সৌমিত্র শেখর, ড.
প্রাবন্ধিক, গবেষক। সহকারী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সৌরভ সিকদার
গবেষক, প্রাবন্ধিক। প্রভাষক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হায়াৎ মামুদ, ড.
কবি, শিশুসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, অনুবাদক।
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

হুমায়ুন কবির (১৯৪৮—১৯৭২)
কবি, গবেষক, প্রাবন্ধিক।
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (আমৃত্যু)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শি ল্পী প রি চি তি

অশোক কর্মকার
পেইন্টার, গ্রাফিক ডিজাইনার, ইলাস্ট্রেটর। সিনিয়র আর্টিস্ট, দৈনিক প্রথম আলো।

আবুল বারক আলভী
পেইন্টার। অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবুল মনসুর
পেইন্টার, আর্ট ক্রিটিক। অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

কাইয়ুম চৌধুরী
পেইন্টার, গ্রাফিক ডিজাইনার, ইলাস্ট্রেটর, ছড়া লেখক। অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কাজী হাসান হাবিব (১৯৪৯—১৯৮৮)
পেইন্টার, গ্রাফিক ডিজাইনার, ইলাস্ট্রেটর। সরকারি কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর [আমৃত্যু]।

কে. এম. এ. কাইয়ূম
পেইন্টার।
শিক্ষক, সরকারি চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম।

জামাল আহমেদ
পেইন্টার। সহযোগী অধ্যাপক (ড্রয়িং-পেইন্টিং), চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢালী আল মামুন
পেইন্টার। সহযোগী অধ্যাপক (ড্রয়িং-পেইন্টিং), চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ধ্রুব এষ
পেইন্টার, গ্রাফিক ডিজাইনার, ইলাস্ট্রেটর, ছড়া ও গল্প লেখক। ফ্রি-ল্যান্স শিল্পী।

নওয়াজেশ আহমেদ, ড.
পরিবেশ বিজ্ঞানী ও আলোকচিত্রী। কনসাল্টিং এডিটর, বাংলাদেশ এনসাইক্লোপেডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি। সাবেক উপদেষ্টা, বিশ্ব কৃষি ও খাদ্য সংস্থা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

নাসরীন বেগম
পেইন্টার। সহকারী অধ্যাপক (প্রাচ্যকলা), চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিসার হোসেন
পেইন্টার। সহযোগী অধ্যাপক (ড্রয়িং-পেইন্টিং), চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফরিদা জামান
পেইন্টার, ইলাস্ট্রেটর। অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মনসুর উল করিম
পেইন্টার, আর্ট ক্রিটিক। অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মামুন কায়সার
পেইন্টার, গ্রাফিক ডিজাইনার, ইলাস্ট্রেটর। সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ ইউনুস
পেইন্টার, গ্রাফিক ডিজাইনার, ইলাস্ট্রেটর। সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ কিবরিয়া
পেইন্টার, প্রিন্টমেকার। অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ নজীব
পেইন্টার, প্রিন্টমেকার। সহকারী অধ্যাপক, (কারুশিল্প), চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রফিকুন নবী
পেইন্টার, গ্রাফিক ডিজাইনার, কার্টুনিস্ট, ইলাস্ট্রেটর, কথাশিল্পী। অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শওকাতুজ্জামান
পেইন্টার, গ্রাফিক ডিজাইনার, ইলাস্ট্রেটর। সহকারী অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শাহ্‌জাহান আহ্‌মেদ বিকাশ
পেইন্টার। ড্রয়িং-পেইন্টিং বিভাগের এমএফএ-র শেষবর্ষের ছাত্র। চারুকলা ইনস্টিটিউট।

সফিউদ্দিন আহমেদ
পেইন্টার, প্রিন্টমেকার। অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সমরজিৎ রায় চৌধুরী
পেইন্টার, গ্রাফিক ডিজাইনার, ইলাস্ট্রেটর। অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হাসি চক্রবর্তী
পেইন্টার, আর্ট ক্রিটিক। শিক্ষক, সরকারি চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম।

হাশেম খান
পেইন্টার, গ্রাফিক ডিজাইনার, ইলাস্ট্রেটর। অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যচর্চা : স্কুলে থাকতেই বাংলা ও ইংরেজি রচনার সূচনা হয়েছিল, ছবি আঁকারও ঝোঁক ছিল। ১৯১৯ সালে 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, 'বর্ষ-আবাহন'। ১৯২৫ সালে 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকাতেই প্রথম গদ্যরচনা 'স্বর্গীয় কালীমোহন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে' প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে 'জীবনানন্দ দাশগুপ্ত' স্বাক্ষরে লিখতেন। ১৯২৭ সাল থেকে 'জীবনানন্দ দাশ'। জীবদ্দশায় কবি হিসেবেই পরিচিতি ঘটে—সাতটি কবিতাগ্রন্থ বেরিয়েছিল। মৃত্যুর পরে আরো অজস্র কবিতার সঙ্গে গল্প-উপন্যাসও প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত প্রবন্ধ-ও সমালোচনাও কিছু লিখেছিলেন। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন নিঃসঙ্গ, লাজুক, আত্মমগ্ন ও সুরসিক।

গ্রন্থপঞ্জি : ক. কবিতা [জীবদ্দশায় প্রকাশিত] ১. ঝরা পালক (১৯২৭), ২. ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), ৩. বনলতা সেন (১৯৪২, কবিতাভবন-সংস্করণ), ৪. মহাপৃথিবী (১৯৪৪), ৫. সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), ৬. বনলতা সেন (১৯৫২, সিগনেট প্রেস-সংস্করণ), ৭. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪)। [মৃত্যুর পরে প্রকাশিত] ১. রূপসী বাংলা (১৯৫৭), ২. ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৫৭, সিগনেট প্রেস-সংস্করণ, ভূমিকা : অশোকানন্দ দাশ), ৩. বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১ ভূমিকা : অশোকানন্দ দাশ), ৪. মহাপৃথিবী (১৯৬৯, সিগনেট প্রেস-সংস্করণ, সম্পাদনা : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ৫. সুদর্শনা (১৯৭৪, ভূমিকা : গোপালচন্দ্র রায়), ৬. জীবনানন্দ দাশের কবিতা (১৯৭৪, ভূমিকা : আবদুল মান্নান সৈয়দ), ৭. মনবিহঙ্গম (১৯৭৯), ৮. আলোপৃথিবী (১৯৮১, ভূমিকা : অশোকানন্দ দাশ), ৯. রূপসী বাংলা (১৯৮৪, প্রতিক্ষণ-সংস্করণ, সম্পাদনা : দেবেশ রায়), ১০. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৬, দ্বি সং ১৯৯৩, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ), ১১. জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ (১৯৯৩, সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)। **খ. প্রবন্ধ :** ১. কবিতার কথা (১৯৫৬), ২. সমালোচনা সমগ্র (১৯৮৩, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ), ৩. সমালোচনা সমগ্র (১৯৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ)। **গ. ছোটগল্প :** ১. জীবনানন্দ দাশের গল্প (১৯৭২, সম্পাদনা : সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফী), ২. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮৯, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ)। **ঘ. উপন্যাস :** ১. মাল্যবান (১৯৭৩), ২. সুতীর্থ (১৯৭৭)। **ঙ. চিঠি :** জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলি (১৯৮৬, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ)। **চ. বিমিশ্র :** জীবনানন্দ সমগ্র (১৯৮৫ : প্রথম খণ্ড, ১৯৮৫ : দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৬ : তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮৭ : চতুর্থ খণ্ড, ১৯৮৮ : পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯০ : ষষ্ঠ খণ্ড, ১৯৯২ : সপ্তম খণ্ড, ১৯৯৩ : অষ্টম খণ্ড, সম্পাদনা : দেবেশ রায়)।

সম্পাদনা : কয়েক মাসের জন্য দৈনিক 'স্বরাজ'-এর রোববারের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক (১৯৪৭)। 'সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র' নামক একটি সংস্থার মুখপত্র 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ (১৯৫০) থেকে অন্যতম সম্পাদক ; অন্য দু জন সম্পাদক ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-৮২) ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-৭৫)।

পুরস্কার : "বনলতা সেন" (সিগনেট প্রেস-সংস্করণ, ১৯৫২) : নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত। "জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা" (১৯৫৪) : ১৯৪৭-৫৪ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা বই বিবেচিত হওয়ায় ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক পুরস্কৃত।

মৃত্যু : ১৪ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে সন্ধ্যাবেলা বালিগঞ্জে ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ রাত্রি এগারোটা পঁয়তিরিশ মিনিটে কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে মৃত্যু।

মূল্য : [illegible] টাকা [illegible] টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~